দেশ

৮ম বর্ষ] ১০ই ফাল্গুন শনিবার, ১৩৪৭ সাল। Saturday, 22nd February, 1941 [১৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

সুভাষ দিবস—

আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারী ভারতের সর্বত্র সুভাষ দিবসের অনুষ্ঠান হইবে। সুভাষচন্দ্রের আদর্শ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ। 'দেশবাসীর হাতে দেশের সমস্ত অধিকার' ইহারই জন্য সুভাষচন্দ্রের তপস্যা এবং সাধনা। সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অর্থ, তাঁহার এই আদর্শের প্রতিষ্ঠায় প্রণোদনা লাভ করা এবং দেশবাসীর মধ্যে তাহা



সঞ্চার করা। প্রবলের মনে অনুগ্রহ এবং অনুকম্পার ভাব জাগাইয়া রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের আশার মূলে রহিয়াছে যে মর্মান্তিক দৈন্য, জাতিকে তাহা আজ ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে; ছাড়িতে হইবে তেমন কর্মপদ্ধতি, যে কর্মপদ্ধতির মধ্যে একান্তভাবে রহিয়াছে জাতির নিজের যোগ্যতার জোরে স্বাধিকার লাভের অবিশ্বাস এবং পরমুখাপেক্ষিতার প্রচ্ছন্ন মনোবৃত্তি। আজ সত্যের আলোকে মুক্ত করিয়া ধরিতে হইবে নিরর্থক ভাববিলাসিতা এবং দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ববাদকে এড়াইয়া। ভিক্ষার জন্য আতুরের মত অঞ্জলি বাড়াইয়া লাভ নাই। দেশ বুঝিয়াছে, জাতি দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে সেই সুকঠোর সত্যকে অভ্রান্তভাবে উপলব্ধি করিয়াছে; এখন প্রয়োজন প্রাণময় কর্মসাধনার। সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে অন্তর্ধানের উদ্বেগ সেই কর্মসাধনার প্রয়োজনকে একান্ত করিয়া তুলুক ইহাই আমরা কামনা করি। বাঙলার দুঃখব্রতী সাধক সন্তানকে লক্ষ্য করিয়া বাঙলার কবি একদিন যে কথা বলিয়াছিলেন, আমরা আজ সেই বাণীই উচ্চারণ করিয়া সুভাষচন্দ্রের আদর্শ এবং সাধনাকে অভিনন্দিত করিয়া বলিতে পারি—

"+ + + + বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার—
চেয়েছ দেশের হ'য়ে অকুণ্ঠ আশায়
সত্যের গৌরব-দৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে। তোমার প্রার্থনা আজি
বিধাতা কি শুনেছেন? তাই উঠে বাজি
জয় শঙ্খ তাঁর! তোমার দক্ষিণ করে
তাই কি দিলেন আজি কঠোর আদরে
দুঃখের দারুণ দীপ, আলোক যাহার
জ্বলিয়াছে, বিদ্ধ করি' দেশের আঁধার
ধ্রুব তারকার মতো? জয় তব জয়।"

বাঙলার বাজেট—

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী বাঙলার অর্থসচিব স্যার হোসেন সুরাবর্দী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪০-৪১ সালের আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ উপস্থিত করিয়াছেন। বাজেটে যে ঘাটতি দাঁড়াইবে অর্থসচিব আগেই তাহার ইঙ্গিত করেন এবং কর বৃদ্ধির দাবী হাঁকেন। বাজেটে ৩৪ লাখ টাকার ঘাটতি দেখাইয়া তিনি তাঁহার সেই দাবীর জোর বাড়াইয়াছেন। বিক্রয় কর তো বসান চাই-ই, আর কি কর বসান দরকার হইবে বলা যায় না। কর বসাইবার পক্ষে অর্থসচিবের যুক্তি সেই মামুলী যুক্তি—জাতিগঠন বিভাগের টাকা দরকার; দেশের কাজ চাই, জাতির উন্নতি চাই ইত্যাদি; কিন্তু এই জাতিগঠন বিভাগের নামে করভার বাড়াইয়া এবং ক্রমাগত সেই ধুয়া

তুলিয়া কাজ কি পরিমাণ হইয়াছে, অর্থসচিব কৃষি বিভাগ এবং সেচ বিভাগের অবস্থার কথা বিবৃত করিয়াই তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। অর্থসচিব বলেন, আমাদের কৃষি বিভাগে টাকার এত অভাব এই কয়েক বৎসরে গিয়াছে যে, এই বিভাগে বর্তমানে যে পরিমাণ লোক আছে, তাহাদের দ্বারা আবশ্যক কাজের সামান্য অংশও নিষ্পন্ন হইতে পারে না। সেচ বিভাগের যে দুর্দশা, তাহাতে তো রীতিমত বলা যায় একটা কেলেঙ্কারী। দেশের সমস্ত জায়গা হইতে হাজা মজা নদীর সংস্কার, বিল ডোবা প্রভৃতির জল নিষ্কাশনের অভিযোগ লাগিয়াই আছে। এইগুলির উপর শুধু জমির উন্নতি নয়, দেশের লোকের স্বাস্থ্য এবং জীবন-মরণ নির্ভর করে; কিন্তু এই বিভাগেও কর্মচারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। অর্থসচিবের বাজেট বক্তৃতার বিশেষত্ব হইল এই যে, জাতিগঠন বিভাগের সম্পর্কে যখন তিনি কথা বলিয়াছেন, ধরাবাঁধা কর্মপ্রণালী তাঁহারা এখনই কি অবলম্বন করিবেন তাহার আভাষ দেন নাই, কিন্তু কর্মচারী নিয়োগটা যে এখনই না করিলে চলে না ইহার উপরই আগাগোড়া জোর দিয়াছেন। দেশের লোকের বরাবর এই অভিযোগ যে, এই সব বিভাগের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়, পোষ্যদলের উদরান্নের সংস্থান করিতেই তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়। বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর দেখা যাইতেছে, কর্মচারী নিয়োগের দ্বারা এই পোষ্যপুষ্টিই প্রধান এবং প্রথম প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বাজেটে ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে, কেন ঘাটতি দাঁড়াইয়াছে, জাতিগঠনমূলক কাজে বেশী টাকা খরচের জন্য কি? অর্থসচিব কোথায়ও হিসাবে তাহা দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু ট্যাক্স চাই, যেন এই ট্যাক্স দেওয়াতেই দেশের লোকের চতুর্বর্গ সিদ্ধি হইবে। দেশের লোকের আর্থিক উন্নতি কিছুই হয় নাই। মিলওয়ালাদের সঙ্গে মন্ত্রিমণ্ডলের দহরম মহরমের মহিমা অর্থসচিব ফলাও করিয়া দেখাইয়াছেন; কিন্তু কার্যত পাটের দর কমতির দিকেই চলিয়াছে। বাঙলার কৃষকের উদরে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, বাঙলার ব্যবসা বাণিজ্যের বাজারে আজ পয়সা নাই, কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডলের দাবী বাড়িয়াই চলিয়াছে; কর দাও, কর দাও, নূতন নূতন কর। তাতেই কাপড়, তাতেই ভাত। অর্থসচিবের বক্তৃতায় প্রতিশ্রুতি আছে, কিন্তু নির্দিষ্ট কর্মপ্রণালী কিছু নাই এবং সেই প্রতিশ্রুতির মূল্য কি গত কয়েক বৎসরেই বুঝিতে পারা গিয়াছে। অন্নাভাবে জীর্ণ দেশবাসীর উপর নূতন নূতন কর বসাইবার নির্লজ্জ দাবী রহিয়াছে এই বাজেটে, বাঙলার সর্বত্র অর্থসচিবের এই প্রচেষ্টা নিন্দিত হইবে।

ফজলুল হকী রীতি—

প্রতিভাবান পুরুষদের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য তাঁহাদের লেখার মধ্যে এবং কথার মধ্যে থাকে, ইহাকে ষ্টাইল বলে। তাঁহারা এই ভঙ্গীর ভিতর দিয়া নিজেদের মনের ভাবটি ব্যক্ত করেন এবং তাঁহাদের ভক্ত এবং অনুগামিগণ সেই বিশিষ্ট ভঙ্গীর ভিতর দিয়াই তাঁহাদের অভিব্যক্ত আন্তরিকতাকে আস্বাদন করিয়া উদ্দীপনা ল করিয়া থাকেন। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌল ফজলুল হক একদিন এক কথা বলেন, আবার দ দিন পরেই তাহার প্রতিবাদ করেন বা সে কথা ঘুরাইয়া লই থাকেন, তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছে কেহ কেহ বলেন, হক সাহেব আত্মভোলা মানুষ, ক্ষণিকে উত্তেজনাকর মুহূর্তে তাঁহার মুখ দিয়া বেফাঁস কথন বাহির হইয়া যায়, তাঁহার অতটা খেয়াল থাকে না। হ সাহেবের মনস্তত্ত্বের এই ব্যাখ্যার ভিতর তাঁহার ঔদার্যে সম্বন্ধে সম্ভ্রমবুদ্ধি কতটা থাকে এ বিষয়ে আমাদের সংশ আছে। আমরা সুবে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী এবং বাঙলা লীগ-শার্দুলের চিত্তের স্থৈর্য সম্বন্ধে ততটা সন্দিহান নহি এবং তাঁহাকে তেমন অবিবেচক বা অব্যবস্থিতচি বলিয়াও মনে করি না। তাঁহার বক্তৃতা এব বিবৃতিসমূহ বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়া আমর ফজলুল হকী বিশেষ রীতির সন্ধান পাইয়াছি এবং সেই রীতির অন্তর্নিহিত কলাকৌশলে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। অভিব্যক্তির এই স্টাইলটি যেমন অভিনব তেমনই উহা অমোঘ। বাঙলা দেশের আদম সুমারীর সম্বন্ধে মৌলবী ফজলুল হকের কয়েকটি বিবৃতি পর পর যদি কেহ বিচার করিয়া দেখেন তাহা হইলেই এই বিশিষ্ট রীতির সন্ধান পাইবেন। প্রথমত হক সাহেব, হিন্দু মহাসভার নেতারা হিন্দুদের সংখ্যা বাড়াইয়া দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া অভিযোগ করেন। তারপর যখন সে অভিযোগের প্রতিবাদ হয়, তখন তিনি আবার সুর ঘুরাইয়া লন, কিন্তু লেখায় তাঁহার স্টাইল আবার ফুটিয়া উঠে অপর একটি বিবৃতিতে। এই বিবৃতিতে এনুমারেটর এবং সুপারভাইজারদিগকে আক্রমণ করিয়া বলেন যে, তাহারা আদম সুমারীর দলিলপত্র জাল করিতেছে। অভিযোগের সঙ্গে 'হিন্দু' শব্দটির প্রয়োগ নাই, কিন্তু স্টাইলের বিশেষত্ব রহিয়াছে কয়েক লাইন নীচেই। 'অনেকের মধ্যে এই ধারণা আছে যে, হিন্দুদের সংখ্যা বাড়াইতে পারিলেই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বাতিল করা সম্ভব হইবে,' তাঁহার এই উক্তির মধ্যে। বঙ্গীয় মুসলিম সেন্ট্রাল সেন্সাস বোর্ডের প্রেসিডেণ্টস্বরূপে মৌলবী ফজলুল হকের নামে যে ইস্তাহার বিলি হইয়াছে, তাহাতে ফজলুল হকী স্টাইলের চূড়ান্ত নজীর পাঠকগণ পাইবেন। এই বিবৃতিতে প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব স্বসম্প্রদায়ের নিকট প্রচারিত আবেদনে তাহাদিগকে সজাগ হইতে বলিয়াছেন, কারণ রাজনৈতিক শত্রুরা নাকি হিন্দুর সংখ্যা বাড়াইতেছে, মুসলমানের সংখ্যা কমাইতেছে। হক সাহেবের এই রাজনৈতিক শত্রুরা অবশ্য জার্মানি হইতে প্যারাসুটে চড়িয়া বাঙলা দেশে অবতীর্ণ হয় নাই, তবে ইহারা কাহারা? এইখানেই বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর স্টাইল বা বলা-কহার ভঙ্গীর বিশিষ্টতা এবং তাঁহার ভাবের ভাবুকগণ ইহার তাৎপর্য আস্বাদন করিয়াই উদ্দীপনা পাইয়া থাকেন।

স্পর্ধার মাত্রা—

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুত এন এম যোশী রাজবন্দীদের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। প্রকাশ্য আদালতে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত আইনে কেহ অপরাধী বলিয়া গণ্য হয় না, ব্রিটিশ ন্যায়পরতার এই সব আদর্শের উ'চুদরের কথা জানিয়াও এদেশে বিনা বিচারে নিগ্রহের নীতি কিভাবে চলে, ভারতের অন্য প্রদেশের চেয়ে আমরা বাঙালী আমাদের হাড়ে হাড়ে সে অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং ভারত সরকারের এ সম্বন্ধে উদাসীনতায় আমরা আশ্চর্য হই নাই। কিন্তু ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিবের পদে অধিষ্ঠানের সুযোগে স্যার রেজিন্যাল্ড যে উক্তি করিয়াছেন তাহার অন্তর্নিহিত ঔদ্ধত্য এবং অসৌজন্য দেশবাসীর চিত্তকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিবে। স্যার রেজিন্যাল্ড উত্তেজিত স্বরে বলিয়াছেন, "এই সব রাজবন্দী জঘণ্যতম বিশ্বাসঘাতকতা করিতে সক্ষম।" শ্রীযুত যোশী এ উক্তির উচিত জবাব দিতে কসুর করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—"এই সব বন্দীর অবলম্ব্য পথ ভুল হইতে পারে; কিন্তু যে বেতনভুক ইংরেজ ভদ্রলোক বিদেশী রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণের কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহার মুখে স্বদেশের স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ একান্তই অশোভন।"

বাঙালীর নূতন চটকল—

গত ৪ঠা ফাল্গুন রবিবার কলিকাতার নিকটবর্তী বেলঘরিয়ায় প্রবর্তক জুট মিলস্ লিমিটেডের চটকলের উদ্বোধন হইয়াছে। পাট বাঙলার একচেটিয়া সম্পদ; কিন্তু এই পাটের সম্পদ শুষিয়া লয় বিদেশীরা। বাঙলা দেশে একশতটি চটকল আছে, ইহার মধ্যে ৪টি মাত্র বাঙালীর, ২৫টি বাঙলার বাহিরের ভারতের অন্য প্রদেশের লোকের এবং ৭১টিই ইংরেজের; বিশেষভাবে স্কচদের। বিদেশী চটকল-ওয়ালাদের প্রভাব বাঙালীদিগকে শুধু যে আর্থিক ক্ষেত্রেই দুর্গত রাখিতেছে এমন নহে, বাঙলার রাষ্ট্রনীতিক পরাধীনতা এবং জাতীয় উন্নতির বিরোধী প্রতিক্রিয়ামূলক বিধি-ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে প্রবর্তনের মূলেও অনেকখানি রহিয়াছে বিদেশী এইসব ধনিকের প্রভাব। বাঙালী জাতিকে যদি রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতা লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে এই অর্থনীতিক দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে হইবে। প্রবর্তক সঙ্ঘ যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিলেন, বাঙলার ধনীদিগকে আমরা সেই আদর্শের অনুসরণ করিতে বলি এবং বাঙলা দেশে উত্তরোত্তর আরও অনেক চটকল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহার ফলে বাঙলার সম্পদ বাঙালীর নিজের ভোগে আসে আমরা ইহাই দেখিতে চাই।

জগৎজোড়া লড়াই—

আন্তর্জাতিক সমস্যা ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করিতেছে। গত রবিবার ব্রিটিশ নৌ বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা সিঙ্গাপুরের প্রবেশ পথে মাইন ফেলিয়াছেন এবং শ্যামদেশে ও জাপ্ অধিকৃত চীনে যে সব ইংরেজ নারী এবং শিশু আছে তাহাদিগকে ঐ সব স্থান ত্যাগ করিয়া আসিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। জাপান, সন্ধি সর্ত অনুসারে জার্মানি ও ইতালির বন্ধুশক্তি। ত্রিশক্তি চুক্তির ফল ফলিবার উপক্রম হইয়াছে। আটলাণ্টিকের উপকুল ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ওদিকে বলকানে সমস্যাও গুরুতর। রুমেনিয়া জার্মানি একরকম দখল করিয়া লইয়াছে বলিলেই হয়, বুলগেরিয়ার ভিতরও জার্মানি ক্রমে ক্রমে ঢুকিতেছে, ইহা এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। রুমেনিয়ার সঙ্গে ব্রিটিশের রাজনীতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইয়াছে। বুলগেরিয়ার ব্যাপারও ঘোরালো। বুলগেরিয়ার ব্রিটিশ রাজদূতের নিকট বুলগেরিয়ার প্রধান মন্ত্রী স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছেন যে, বুলগেরিয়ার মধ্যে জার্মানির সেনা আসিতে দেওয়ার অনুকূলে জার্মানির সঙ্গে কোনরূপ সন্ধি সর্তে বুলগেরিয়া আবদ্ধ হইবে না, বুলগেরিয়া ইংরেজের কাছে এমন কোন কথা দিতে পারে না। বুলগেরিয়ার মনোভাব যে জার্মানিরই দিকে এই উত্তর হইতেই তাহা বুঝা যায়। ইহার পরে, ইহাও শুনা যাইতেছে যে, জার্মানি এবং বুলগেরিয়ার নেতাদের মধ্যে সত্বরই একটা বৈঠক হইবে এবং সেই বৈঠকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, রুমেনিয়ায় মোট ৬ ডিভিসনে ৬ লক্ষ জার্মান সেনা রহিয়াছে। বুলগেরিয়াতেও জার্মানিরা ধীরে ধীরে ঢুকিতেছে এবং যে কোন মুহূর্তে জার্মান বিমানবহরের দ্বারা গ্রীস আক্রান্ত হইতে পারে।

জার্মানি বলকানে সেনা সজ্জা করিতেছে এবং অচিরেই প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করিবে বলিয়া মনে হইতেছে। ব্যাপার দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে, জার্মানির সঙ্গে বুলগেরিয়ার একটা চুক্তি হইয়াছে। তুরস্কের সঙ্গে বুলগেরিয়ার অনাক্রমণাত্মক চুক্তি হইয়াছে। জার্মানির পক্ষ হইতে তুরস্ককে ইংরেজের পক্ষ হইতে ভাগাইবার জন্য চেষ্টা হইতেছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। রুষিয়ার বিরুদ্ধতা করিয়া বুলগেরিয়া কোন কার্য করিবে বলিয়া মনে হয় না, এবং রুষ-রুমেনিয়া সীমান্তে রুষ সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে, এইরূপ সংবাদ পাওয়া গেলেও ইহা অনুমান করা কঠিন যে, জার্মানি রুষিয়ার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ ঘটে এমন কোন কাজ করিতে উদ্যত হইবে।

এদিকে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের গতিবিধিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, প্রশান্ত মহাসাগরের হেইনান দ্বীপ, ক্যাণ্টন, ওয়েসো দ্বীপ, সিমা দ্বীপপুঞ্জ, প্রেটলী দ্বীপপুঞ্জ এবং ফরাসী হিন্দুচীনে জাপানীদের সেনাশক্তির তৎপরতা আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের গভর্নর ব্রহ্ম সীমান্তে শান রাজ্য প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলে বিদেশীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া ইতিমধ্যেই আদেশ জারী করিয়াছেন দেখা যাইতেছে। জাপান কোন রকমে সুযোগ খুঁজিতেছে ইহা বুঝা যায়;

কিন্তু ইংরেজ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং জাতীয়তাবাদী চীন, ইহারা সকলেই জাপানের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছে। আমেরিকাকে না চটাইয়া জাপান যদি কিছু করিতে পারিত, তবে তাহার সুবিধা ছিল; কিন্তু জাপান তাহার সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে উদ্যত হইলে আমেরিকা কিছুতেই দূরে থাকিতে পারিবে না। এবং আর্থিক ব্যাপারে আমেরিকার উপর জাপানকে এতটা নির্ভর করিতে হয় যে, আমেরিকার বিরুদ্ধতা করিতে উদ্যত হইলে প্রশান্ত মহাসাগরে, ইতালির যে অবস্থা হইয়াছে ইউরোপে, সেই অবস্থা তাহারও হইবে। একথা সত্য যে, জাপান যাহাতে যুদ্ধে নামে এবং এশিয়ায় ইংরেজকে বিব্রত করিয়া তোলে সেজন্য জার্মানি জাপানের উপর খুবই চাপ দিতেছে; কিন্তু সে চাপে সাড়া দিতে গেলে জাপানকে সর্বনাশের ঝুঁকি লইতে হইবে, সাত সমুদ্র ডিঙগাইয়া জাপানকে সাহায্য করা জার্মানির পক্ষে সম্ভব হইবে না।

বাঙালী মুসলমানের মনোভাব—

কলিকাতা মিউনিসিপাল সংশোধন বিল এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার বিলের প্রতিবাদকল্পে সম্প্রতি কলিকাতায় যে সভা হইয়া গিয়াছে, সেই সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন, কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র মিঃ জ্যাকেরিয়া, বাঙলার ভূতপূর্ব মন্ত্রী সৈয়দ নৌসের আলী, সৈয়দ জালালুদ্দিন হাসেমী, মিঃ সামসুল হক এইসব বিশিষ্ট মুসলীম নেতৃবর্গ। বঙ্গীয় কৃষক প্রজা সমিতির সভাপতি সৈয়দ হবিবর রহমান এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ জামান মন্ত্রীদের অবলম্বিত নীতির তীব্রভাবে নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করেন। বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর মতে মন্ত্রীদের উদ্যমের বিরুদ্ধে হিন্দুদের যত আন্দোলন সবই নিছক সাম্প্রদায়িকতামূলক। গত রবিবারের সভা তাঁহার সেই উক্তি যে কত অসার তাহা অভ্রান্তভাবে প্রমাণিত করিয়া দিয়াছে। সৈয়দ হবিবর রহমান তাঁহার বক্তৃতায় দেখাইয়া দিয়াছেন হক সাহেবের মন্ত্রিমন্ডল বাঙলার মুসলমানদিগকে কোন্ দিকে লইয়া যাইতেছেন। তিনি বলেন, "বিগত কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচনে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার ফলে ২১টি মুসলিম আসনের ১৬টি গিয়াছে অবাঙালী মুসলমানদের হাতে। এমন কি সরকারী মনোনয়নে ২টি কাউন্সিলার এবং ২টি অল্ডারমানের পদও অবাঙালী মুসলমানই পাইয়াছেন। গত বৎসরের মার্চ মাস হইতে যতগুলি মুসলমান কর্পোরেশনে চাকুরী পাইয়াছে, তাহাদের প্রায় সকলেই অবাঙালী। বাঙলার মুসলমান সমাজ নিজেদের এই অবস্থা উপলব্ধি করিয়া লীগদলের প্রভাব হইতে বাঙলা দেশকে মুক্ত করিতে অবহিত হইবেন আশা করি।

পরলোকে ডাক্তার সুশীলকুমার—

গত ১লা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার কলিকাতার বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক এবং সার্জন ডাক্তার সুশীলকুমার মুখুজ্যে হুগলী জেলার তেলেনীপাড়ায় স্বীয় পল্লীভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙলা দেশ একজন বিশিষ্ট সন্তান হারাইল। ডাক্তার মুখুজ্যে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের চক্ষু সম্বন্ধীয় অস্ত্র চিকিৎসার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট এবং সিন্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। ডাক্তার মুখুজ্যে দেশের অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বাঙলার অন্ধত্ব নিবারণ সমিতির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তেলেনীপাড়া ভদ্রেশ্বর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া লাইন—

রেলওয়ে ফাইনান্স কমিটি কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া লাইন তুলিয়া দিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সুপারিশের কারণ কি, জানা যায় না; কারণ আর্থিক দিক হইতে এই লাইনে ক্ষতি হয় নাই, বরং লাভই হইতেছিল। লাইনে যদি লোকসান হইত, তবে ফাইনান্স কমিটির প্রস্তাবের মূল্য থাকিলেও থাকিতে পারিত; কিন্তু এক্ষেত্রে জনমতের বিরুদ্ধতা করাই তাঁহাদের সিদ্ধান্তের মূলে বোধ হয় বড় যুক্তি। ই বি রেল কর্তৃপক্ষ ঐ লাইন তুলিয়া দিবার সংকল্প ঘোষণা করিবার পর হইতেই দেশের সর্বত্র সে উদ্যমের প্রতিবাদ হইয়াছে এবং সেই প্রতিবাদের ফলে লাইন তুলিবার কাজ স্থগিত রাখিতে হয়। ইহার পর আবার এই সুপারিশ। ফরিদপুর এবং যশোর জেলার একটা ব্যাপক অঞ্চলে যাতায়াত এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের এই লাইনটিই একমাত্র পথ। এই লাইন তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত সমর্থন করার অর্থ বাঙলার একটা জনবহুল অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি করিয়া আর্থিক সংকট বৃদ্ধি করা এবং জনসাধারণের গতিবিধির পক্ষে ঘোরতর অসুবিধা সৃষ্টি করা। আমরা আশা করি, রেলওয়ে বোর্ড এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন এবং এমন অনর্থকর উদ্যম কার্যে পরিণত হইতে দিবেন না।

লোক গণনা—

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে লোক গণনা আরম্ভ হইয়াছে। গণনা ১লা মার্চ পর্যন্ত চলিবে। নিখিল বঙ্গীয় সেন্সাস বোর্ডের সম্পাদক শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন দত্ত এই গণনা সম্বন্ধে দেশবাসীকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন,—'বর্তমানে লোক গণনায় এবং প্রশ্নের উত্তরে কেবলমাত্র 'হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দিতে সকলকে অনুরোধ করিতেছি। অনেকে 'হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দিলেও গণনাকারীরা তাঁহাদের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদি বলিয়া লিখিয়াছেন। আমাদের বিশেষ নিবেদন, আমরা হিন্দুমাত্রেই 'হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দিব। গণনাকারীরা যাহা ইচ্ছা হয় লিখুন।' আমরাও এই মতই সমর্থন করি।

বাঙলার পল্লীর প্রাণ-পরিচয়

পাবনা জেলাবোর্ডকে ধন্যবাদ, উল্লাপাড়া স্টেশন হইতে শাহাজাদপুর এই দশ মাইল পথ গো-যানে অতিক্রম করিয়া পুনর্জন্ম লাভ ব্যাপারটা কি, সে সম্বন্ধে বিশেষ রকমের অভিজ্ঞতা আমাদের সেদিন তাঁহাদের কৃপায় ঘটিয়াছে। দুঃসাহসিকতার দৈন্যময় দুর্বল বাঙালীর জীবনে অন্তত এই কয়েক মাইল পথে জীবন-মরণ সমস্যার সৃষ্টি করিয়া জেলাবোর্ডের দেশপ্রেমিক সদস্যগণ শাহাজাদপুরের জমিদারী কাছারীগুলির মোটা পথকরের যে পুরাপুরি সদ্ব্যবহারই করিতেছেন, গাড়াদহের কাছে গভীর গর্তে পতিত হইয়া সে সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহের কিছুমাত্র অবসর থাকিল না। সমগ্র পথের এই সুবিপুল কম্পন এবং শিহরণের সংবেদনা সর্বাঙ্গে লইয়া বেলা নয়টার সময় শাহাজাদপুরে পেঁৗছিলাম। তরুণ বন্ধুদের হাসিমাখা মুখ দেখিয়া এবং তাঁহাদের আদর-আপ্যায়নে পথের স্মৃতি কিছুকালের জন্য ভুলিলাম বটে; কিন্তু এ কথা হলফ করিয়া বলিতে পারি যে, শাহাজাদপুর ও উল্লাপাড়ার রাস্তার সে স্মৃতি জীবনে ভোলা কঠিন।

শাহাজাদপুর পাবনা জেলার একটি বড় পল্লী, পল্লী হইলেও বাঙলার অনেক পল্লী হইতে শাহাজাদপুরের বিশিষ্টতা রহিয়াছে। অনেক শহর হইতে শাহাজাদপুর সমৃদ্ধ এবং অনেক দিক হইতে উন্নত। শাহাজাদপুরে গিয়া প্রথমেই দৃষ্টিতে পড়ে এই স্থানের তাঁতের কারবার। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙলার তাঁত-শিল্প মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল। মা লক্ষ্মী বাঙলার তাঁতীর ঘরে কিছু দিনের জন্য তাঁহার ঝাঁপি নামাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁত-শিল্পের সে অবস্থা আর নাই। মিলের প্রতিযোগিতায় পড়িয়া টাঙ্গাইল, শান্তিপুর প্রভৃতি যে সব স্থানের তাঁতীরা সূক্ষ্ম সুতার কারিগরী করেন, তাঁহাদের ব্যবসা একেবারে নষ্ট হইয়াছে। সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিয়াও তাঁতীদের দুই বেলা দুই মুষ্টি অন্ন জুটে না। দুর্দশার তাহাদের অন্ত নাই। কিন্তু এই সংকটকালেও শাহাজাদপুরের তাঁতের ব্যবসা বেশ চলিতেছে এবং তাহার জন্য বেকার সমস্যা এই পল্লীতে বড় বেশী নাই। গতর খাটাইতে পারিলে সকলেরই কিছু না কিছু আয়ের সুযোগ এখানে আছে। মিলের এই বিষম প্রতিযোগিতার বাজারেও শাহাজাদপুরের এই তাঁতের ব্যবসা যে ধ্বংস হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ এই যে, এখানে সূক্ষ্ম সুতার কাজ হয় না। টুইস্টেড ইয়ার্ন বা দোপাক মোটা সুতায় এখানে তাঁতগুলোতে নানারকমের সিট এবং টেকসই মোটা গোছের নানারকম শাড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই সুতা জাপানী সুতা। কোন রকমে এই জাপানী সুতা যদি বন্ধ হয় এবং সে সুতার উপর অতিরিক্ত ট্যাক্স চাপে, তাহা হইলে শাহাজাদপুরের এই শিল্পেরও সংকটকাল দেখা দিবে। বাঙলার প্রধান অভাবই হইল এই সুতার অভাব। এদেশে কাপড়ের ক[illegible]য়কটি হইয়াছে, কিন্তু সুতার জন্য বাঙলাকে এখনও প[illegible] দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয়। বাঙলায় কাপড়ের যে চাহিদা, তাহা মিলের সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে পূরণ হয় না, মোটা সুতার বস্ত্রের বাজার বাঙলা দেশে এখনও রহিয়াছে। এই অবস্থায় বাঙলা দেশে শুধু সুতার কল যদি কয়েকটি বসান হয় এবং যে সব স্থানের তাঁতীরা সূক্ষ্ম সুতার কারবারে মিলের প্রতিযোগিতায় দৈন্য দশায় পড়িয়াছে, তাহারা যদি তাঁত বদলাইয়া শাহাজাদপুরের ন্যায় ব্যবসা সুরু করে, তাহা হইলে মনে হয়, তাহাদের বাজারে দাঁড়াইবার ক্ষেত্র এখনও রহিয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সেদিন বাঙলার এই তাঁত শিল্পের সরকারী সাহায্য করার প্রশ্নটা উঠিয়াছিল, বাঙলা



সাহাজাদপুরে 'দেশ' সম্পাদক

সরকার বাঙলার তাঁত শিল্পকে যেভাবে সাহায্য করা উচিত এবং করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব তাঁহারা তাহা করেন না। মন্ত্রী মৌলবী তমিজুদ্দীন খান সাহেব অভিযোগ খণ্ডন করেন; অবশ্য কথায় খণ্ডন করিতে বাধা কিছুই নাই, কিন্তু সারা বাঙলার তাঁতীদের অবস্থা দেখিয়া তো মনে হয় না যে, বাঙলা সরকার তাঁতীদের সাহায্যের জন্য কিছু করিতেছেন। শাহাজাদপুরের যে তাঁত শিল্পটি আজ নিজের জোরে টিকিয়া আছে, শাহাজাদপুরের সেই তাঁতের কাপড়ের বাজার বাড়াইবার জন্য যে বাঙলা সরকার কিছু করিতেছেন, এমন কিছু আমরা জানিতে পারি নাই।

শাহাজাদপুরের এই তাঁতের কারবারে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই আছেন। এই ব্যবসায়ে বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় না, অতি অল্প মূলধনের সাহায্যে বড় ব্যবসা গড়িয়া তুলিয়াছেন, এমন লোকও এখানে দেখিলাম। যাঁহারা এই সব ব্যবসা করিতেছেন এবং যাঁহারা করিতে চাহেন, তাঁহারা যদি বাহির হইতে বিশেষ রকম শিক্ষা লাভ করেন এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে এই ব্যবসা চালান, তবে এই ব্যবসায়কে তাঁহারা আরও প্রসারিত করিতে পারেন। এদেশের

অনেকেই এই ধারণায় চলেন যে, শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য হইল চাকুরী এবং সেই ধারণাই বাঙলার সর্বনাশের কারণ হইতে বসিয়াছে। শাহাজাদপুরের তরুণেরা অনেকেই শিক্ষালাভ করিতেছেন এবং দেখিয়া সুখী হইলাম যে, তাঁহারা এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হন নাই, ইহা আশার কথা।

ব্যবসা-বাণিজ্যই শাহাজাদপুরকে বাঙলা দেশের অন্যান্য পল্লীর ন্যায় এখনও আর্থিক সঙ্কটের চাপে একেবারে অভিভূত হইতে দেয় নাই। এ দেশের শুধু শহর নহে, সুদূর পল্লী অঞ্চলে পর্যন্ত অবাঙ্গালীরা প্রবেশ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্র জুড়িয়া বসিয়াছে; কিন্তু শাহাজাদপুরে অবাঙ্গালীদের এই শোষণ-অভিযান এ পর্যন্ত সার্থক হয় নাই, তাই দেশের ক্ষুদকুঁড়া দেশের লোকেরই ভোগে লাগিতেছে। এখানকার বাজার বেশ বড় বাজার। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সবই এ বাজারে পাওয়া যায়। অন্যান্য পল্লীর মত এখানকার লোককে শহরের দিকে ছুঁচ-সুতার জন্য তাকাইয়া থাকিতে হয় না। উল্লাপাড়া স্টেশন হইতে রাস্তার অসুবিধা যদি না থাকিত, তাহা হইলে স্থানটি আরও সমৃদ্ধিশালী হইত। কিছুদিনের জন্য একটি মোটরবাস সার্ভিস উল্লাপাড়া হইতে শাহাজাদপুর পর্যন্ত চলে; কিন্তু পাশ্চাত্যের জড় বিজ্ঞানকে বাঙলার পল্লী-প্রান্তরের প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার কাছে অবশেষে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে। বাষ্প-প্রাণ যন্ত্র রাক্ষসের পঞ্জর দেহ ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গ প্রাকারে পতিত রহিয়াছে দেখিলাম।

শাহাজাদপুরের তরুণ বন্ধুগণ সত্যই আমাদের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছেন। বাঙলার পল্লী আজ প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে, পল্লীতে যৌবন নাই, তারুণ্য নাই, নাই উৎসাহ, নাই উদ্যম। কিন্তু শাহাজাদপুরের তরুণেরা উদ্যমশীল। নূতন কথা জানিবার, বুঝিবার এবং দেশের সম্বন্ধে চিন্তা করিবার আগ্রহ তাহাদের মধ্যে প্রবল। দেশের সাহিত্য, শিল্প এবং সংস্কৃতির দিকে তাঁহাদের বেশ ঝোঁক, যেকথা শুনিয়াছিলাম, এবার তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সত্যই প্রীতি লাভ করিয়া আসিয়াছি।

প্রতি বৎসর সরস্বতী পূজা উপলক্ষে শাহাজাদপুরের তরুণেরা সাহিত্য, সঙ্গীত এবং ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন। বাঙলার বিশিষ্ট মনীষিবর্গ এই উপলক্ষে শাহাজাদপুরে আমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। এই কয়দিন পল্লীর সর্বত্র একটা সাড়া পড়িয়া যায়। পল্লীগ্রামে সহস্র সহস্র শ্রোতার এমন আগ্রহপূর্ণ সমাবেশ আমরা খুবই কম দেখিয়াছি।

প্রসিদ্ধ সংগীত কলাবিদ শ্রীমান্ সুধীন্দ্র মজুমদার রাগরাগিনীতে মাধুর্য রসের মূর্ছনায় যমুনার জলকল্লোলকে যখন মূর্ত করিয়া তুলিতেছেন শ্রোতার দল অপরিসীম আগ্রহে তাহাও যেমন শুনিতেছে, তেমনই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ বড় বড় প্রবন্ধ পাঠ চলিতেছে, তাহাতেও তাহাদের অধীরতা নাই। সভা সমিতির কাজে এই যে একটা সুষ্ঠু সংযম এবং সৌজন্যের ভাব বাঙলা দেশের পল্লীতে কেন, শ্রোতা যেখানে সমধিক শিক্ষিত, সেইসব শহরেও দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রোতাদের অধীরতা এবং শ্রদ্ধাহীন লঘু-চিত্ততার আবহাওয়ার ভিতর সঙ্গীতের সুর ফুটে না; হট্ট-গোলের মধ্যে কণ্ঠের কসরৎ করিতে করিতেই বক্তার বাগ্মিতার বল এবং বিদ্যা অবসন্ন হইয়া পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের সাধনাপূত এই শাহাজাদপুর। ঠাকুর জমিদারদের যে কাছারী বাড়ীতে আমরা ছিলাম, তাহার এক অংশে রবীন্দ্রনাথ একদিন অবস্থান করিতেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রসিদ্ধ রচনা এই শাহাজাদপুরের কুঞ্জকুটীরে লিখিত হইয়াছে। কবির সেই পুণ্য স্মৃতি আমাদিগের অন্তর শ্রদ্ধান্বিত করিয়া রাখিয়াছিল এবং সেই শ্রদ্ধাই শাহাজাদ-পুরকে একান্তভাবে উপলব্ধি করিতে আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছে। পল্লীর সংস্কৃতির সহিত আমাদের ঘটিয়াছে এই কয়েকদিনে সুনিবিড় পরিচয়।

বাঙলার সংস্কৃতির আজ বড়ই সঙ্কট ভাব দেখা দিয়াছে। বাঙলার সভ্যতা, বাঙলার সংস্কৃতি সকল সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে। বাঙলার সংস্কৃতির এই যে প্রাণরস প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও শাহাজাদপুরে তাহা শুকাইয়া যায় নাই। হিন্দু এবং মুসলমান সকলের নিকট হইতে সমান আদর এবং আপ্যায়ন আমরা লাভ করিয়াছি। শাহাজাদপুর যে সত্যই প্রাণবান, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; কারণ যে প্রতিকূল আবহাওয়ার ভিতর দিয়া এই প্রাণরস সেখানে আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, সে প্রতিকূলতা সামান্য নহে।

সরস্বতী পূজা ছেলেদের একটা আমোদ উৎসব, ইহাই জানিতাম। সাম্প্রদায়িকতার দুরূহ এবং জটিল সমস্যা যে ছেলেদের এই উৎসবের মধ্যে জড়াইয়া উঠিতে পারে কেমন করিয়া আমাদের তাহা বুদ্ধির অগম্য; কিন্তু সামান্য এই সব ছুতানাতায় সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা জটিল হইয়া উঠিতেছে। সে জটিলতাও কি যেমন তেমন! পদে পদে বঙ্গরাজ্য বিপর্যস্ত হইবার ব্যাপার! সরস্বতী পূজা উপলক্ষে পাবনা এডওয়ার্ডস কলেজ ১৪৪ ধারার খবরদারীর মধ্যে ছিল, কলেজে ছেলেরা পূজা করিতে তো পারেই নাই, কলেজের সীমা সরহদ্দের মধ্যে যে সব অধ্যাপকের বাসা বাড়ী আছে, ঘরোয়াভাবে নিজেদের বাসা বাড়ীর মধ্যেও পূজা করাও তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। কলেজের ছেলেদের মধ্যে একদল এই আবেদন করে যে, তাহারা ফুল হাতে লইয়া শুধু স্তোত্র আবৃত্তি করিতে চায়, ইহাতেও কলেজের কর্তৃপক্ষ মহাসঙ্কটে পড়িয়া যান, স্তোত্র আবৃত্তি করে করুক, কিন্তু পৌরাণিক স্তোত্র নয়, বৈদিক স্তোত্র আবৃত্তি করিতে হইবে; এই যে রক্ষাকবচ, ইহাতেও বিশেষ বিবেচনার পরে দেখা যায় যে, সঙ্কট সম্যক্‌রূপে কাটে নাই। স্তোত্র না হয় পৌরাণিক ছাড়িয়া মূর্তির সম্পর্কশূন্য বৈদিক মন্ত্র হইল; কিন্তু যে ফুল তাহারা হাতে লইয়া আবৃত্তি করিবে, সেই ফুলের গতি

কি হইবে? সেই ফুল তাহারা যেখানে ফেলিবে, ইট, কাঠ, পাথর, পুঁথি, তাহাই যে ১৪৪ ধারার ভাষ্যক্রমে মূর্তি হইয়া দাঁড়াইবে না, ইহাই বা বিচিত্র কি? আইনের ব্যাখ্যা-ভাষ্যের এই বিপদের মধ্যে পা দিয়া কোন্ অধ্যাপক এমন ক্ষেত্রে ছেলেদের তদারকী করিবেন—সমস্যা সত্যই জটিল; তার পরে আশঙ্কার কারণ আরও আছে, ছেলেরা যদি পকেটে করিয়া একটা পুতুল বা তেমন কিছু লইয়া যায়, আর ফুলের মধ্যে পুরিয়া তাহাই ছুড়িয়া ফেলে, তবে সেই রঙ্গরসে বঙ্গরাজ্যের তো একেবারে বিপর্যয়। যাহা হউক, ছেলেদের মধ্যে আর একদল বাহিরে পূজা করার পক্ষে দাঁড়ানোতে সংখ্যালঘিষ্ঠের দাবী অগ্রাহ্য, এই রায় দিয়া কলেজের অধ্যক্ষ এই নিদারুণ সঙ্কট হইতে পরে পরিত্রাণ পান।

জেলার সদরে যেখানে এমন ব্যাপার, তখন মফঃস্বলই বা বাদ পড়িবে কেন? পাবনা কলেজে জারী ছিল ১৪৪ ধারা, শাহাজাদপুরে তাহা অবশ্য ছিল না; তবু সাবধানের মার নাই। স্কুল কমিটি অতি সাবধানী হইয়া স্কুলে সরস্বতী পূজা বন্ধ করিয়া দেন। ছেলেদের এমন একটা উৎসব-আমোদেও গুরুতর আশঙ্কার ভাব সকলের মনের উপর, একটা ভয়ের ভাব ভিতরে ভিতরে শাহাজাদপুরেও দেখিলাম। পূজা তো দূরের কথা, হিন্দু-মুসলমানের কোন সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নই যেখানে নাই, সেই সাহিত্য, সঙ্গীত এবং ধর্ম, এ সব আলোচনাও যেন আশঙ্কার ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। বাঙলার আকাশে বাতাসে আজ ভয়, অপ্রত্যয়, সংশয়। ভাইয়ে ভাইয়ে খোলাখুলি মনের মিল, প্রাণ খুলিয়া কথাবার্তা বলিবার সুবিধা আজ সংকুচিত হইতে বসিয়াছে। বাঙলা দেশে এমন দুর্দিন আর আসে নাই।

ছেলেদের এই সব অনুষ্ঠানের লঘুত্ব কিংবা গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতে চাহি না। আমাদের দুঃখ হয় এইসব ব্যাপারে ছেলেদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিবার মূলে যে বিশ্বস্তির অভাব সূচিত হয়, তাহারই জন্য। যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতা এড়াইবার দুর্বল যুক্তি দেখাইয়া এইসব ব্যাপারে ছেলেদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে চাহেন, তাঁহারা এ সত্য না বুঝেন এমন নহে যে, তাঁহাদের এ সব খবরদারী এবং হুসিয়ারীর ফলে ছেলেদের মন সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত থাকে না, বরং সাম্প্রদায়িকতার বিষ তাহাদের সরল প্রাণে দাগ কাটিয়াই বসে। তাঁহাদের অভিভাবকত্ব সার্থক হয় সেইখানে, যেখানে তাঁহারা স্নেহযুক্ত মর্যাদায় এসব ব্যাপারে নিজেরা নিরপেক্ষ থাকিয়া ছেলেদের অন্তরের স্বাচ্ছন্দ্যকে বজায় রাখিতে পারেন এবং সেই স্বাচ্ছন্দ্য যেখানে ক্ষুণ্ণ হয়, বাড়ায় উদ্বেগ সেখানে তাঁহাদের অভিভাবকত্ব হয় অনর্থক, তাহাতে ইষ্ট কিছু সাধিত হয় না, ঘটে একান্তই অনিষ্ট।

জাতীয় উন্নতির বড় বড় কথা অনেক আমরা শুনিতেছি; কিন্তু সকল কথার বড় কথা এই যে, অপ্রীতি এবং অনৈক্যের এই যে একটা ভাব বাঙলা দেশের আকাশ এবং বাতাসকে ভারাক্রান্ত করিতেছে, এই গুমোটকে কাটাইতে হইবে এবং তাহাকে কাটিবার মত ক্ষমতা শুধু তরুণদেরই আছে। এই বিভেদ, বৈষম্যের আশ্রয়ে যাহারা নিজেদের হীন স্বার্থের ব্যবস্থা চালাইতে চেষ্টা করিতেছে, তাঁহাদের টোপের মধ্যে যে বঁড়শীও রহিয়াছে, ইহা বুঝিবার মত ক্ষমতা অনেকের নাই। যাঁহাদের আছে, তাঁহারাও অনেকে উপরের আধারটুকুই খুঁটিয়া লইবার সেয়ানাপনা দেখাইতে ব্যস্ত, পরে যাহারা আসিতেছে, তাহাদের গলায় যে সেই বঁড়শী একদিন বিঁধিবে, দৃষ্টিকে এতটুকু দূরে লইবার মত সত্যনিষ্ঠা তাহাদের নাই। ক্ষুদ্র স্বার্থের পাক মানুষের মনকে এমন দুর্বল করিয়া ফেলে যে, যুক্তিবুদ্ধি তাহাকে কাটাইয়া উপরে উঠিতে পারে না। জাতি যখন এমন দুর্বিপাকে পড়ে, তখনই প্রয়োজন হইয়া পড়ে দুর্গম পথযাত্রী তরুণদের অভিযানের। তরুণদের স্বচ্ছচিত্ত হইতে মানবতার উচ্ছ্বাস উঠিয়া ইতরতার যত গ্লানি সব ভাসাইয়া দেয়। মহাভয় হইতে জাতি উদ্ধার পায় তরুণের ত্যাগময় এবং অমৃতময় অবদানে। জাতির মরাগাঙে তখন আবার জোয়ার আসে, শুষ্কতরু হয় মুঞ্জরিত। শীতের কুহেলি কাটিল মলয় বায়ু আবার বহে, শিক্ষা সভ্যতা সঞ্জীবিত হইয়া উঠে।

এমন প্রতিকূলতার মধ্যেও শাহাজাদপুরের তরুণ বন্ধুগণ বাঙলার সভ্যতা এবং সংস্কৃতির আশার বাতি জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ। আর বিশেষভাবে ধন্যবাদ তাঁহাদিগকে, যাঁহারা এই সব তরুণদের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন। সাম্প্রদায়িক অপ্রীতির যে আশঙ্কার ভাব আজ বাঙলার পল্লীর অন্তরকে আড়ষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে, বাঙলা দেশ কত দিনে তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবে জানি না। জানি না, বাঙলার পল্লীতে আবার ভাইয়ে ভাইয়ে সম্প্রীতির ভাব-সরোরুহ কবে ফুটিয়া উঠিবে; মদন হরকরার গান, লালন ফকীরের তানে মিশিয়া বাঙলার সংস্কৃতিকে আবার কবে সমৃদ্ধ করিবে, বলিতে পারি না। শাহাজাদপুরের বাণী সম্মিলনী এবং ভারতী সেবাসংঘের তরুণ বন্ধুগণ শিবরাত্রির সলিতার মত সেই আশাকে আজও আগুলিয়া রাখিয়াছেন এবং পল্লীর প্রাণরসকে বঙ্গের বিশিষ্ট সংস্কৃতির অবদানে তাঁহাদের বাৎসরিক এই আয়োজনে সমৃদ্ধ করিবার জন্য সাধনা করিতেছেন, এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। তাঁহাদের এই সাধনা শুধু সাময়িক না হইয়া নিত্য হউক এবং সত্য হউক।

কবিতা

ঘোড়া

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

ছুটেছে ঘোড়া—
দূর দিগন্তে আগুন জ্বলে।
পাথরে ও ক্ষুরে ঠোকাঠুকি লেগে ফিনকি ফোটে,
গায়ে ঘাম ঝরে, মুখ দিয়ে ফেনা ওঠে,
অন্ধ আবেগে দুর্গম পথে ছোটে,
সীমানাবিহীন কোন দূর নভোতলে।
ছুটেছে ঘোড়া—
অকূল আকাশে উল্কা ছোটে।
ডাইনে ও বাঁয়ে মাথা তুলে আছে খাড়া পাহাড়,
আঁকাবাঁকা সাপ ফণা ধরে আছে—অন্ধকার,
উচল উপলে প্রতি টক্করে খেয়ে আছাড়,
দিশাহারা বেগে দুরাশার ঘোড়া ছোটে।
ছুটেছে ঘোড়া—
সঙ্গে ছুটেছে দমকা ঝড়ী।
নেই ছুটি নেই, চল্‌তে হবেই,
সাপ্টে লাগাম ধরি!

উজ্জীবন

গোপাল ভৌমিক

আমার পৃথিবী কেন সীমাবন্ধ
বল হে ঈশ্বর?
মুক্তি-স্বাদ পাব নাকি, পাব নাকি
ঐশ্বর্যের বর?

অন্ধকারে রাতদিন কক্ষপথে
করি চক্রমণঃ
কচ্ছপ দেহের মাঝে বন্দী আমি
আত্মমুখী মন।

পৃথিবীর চাকা ঘোরে শঙ্কা ভীরু
হতাশ্বাসময়ঃ
সাগর-গর্জন-ধ্বনি শুনি না ত—
কোথা সূর্যোদয়?

চারিদিকে শুনি শুধু কাতরোক্তি
বুভুক্ষু রোদনঃ
পঙ্কিল রক্তের ঋণ চায় বুঝি
অঙ্গের শোধন!

তবু জানি মরি নাই, হে ঈশ্বর—
জীবন্ত আমরাঃ
ধূসরে সোনার রঙ দিবে জানি
অবশ্যই ধরা।

সামরী

(বড় গল্প—অনুবাদ)

শ্রীতারাপদ রাহা

[১]

যতদূরে চোখ যায় কেবল স্তেপ্ আর স্তেপ্। সুদূরে চক্রবাল রেখায় যেখানে আকাশ এসে ধনুকাকারে মাটির সঙ্গে মিশেছে—সেখানেই এসে মিশে গেছে য়ুরোপ আর এশিয়া। সেই সীমান্ত রেখার উপরে—দিগন্তে সংগীতমুখর পাখির চেয়েও ছোট কি যেন একটা দেখা গেল। সেটা ঘণ্টায় একশ' মাইল বেগে দুটি লোকের দিকে ছুটে আসছিল,—তবু দেখে মনে হয় সুনীল দিগন্তে ওটা স্থির হয়েই আছে: পৃথিবীটা এত বড়—আর এত বিরাট আমাদের এই আকাশ।

পনের মিনিটের আগে বুঝাই যায় নি—যে এটা একটা উড়ো-জাহাজ। পৃথিবী থেকে সমান দূরত্ব রেখেই জাহাজখানা চলছিল, তবু যত এগিয়ে আসতে লাগল—মনে হ'তে লাগল—যেন ওটা একটা মস্ত বড় বৃত্তাংশ রচনা করে ক্রমে আকাশে উঠে যাচ্ছে।

জাহাজটা যখন লোক দুটির ঠিক মাথার উপরে এসে হাজির হ'ল—তখন তার চালক একবার নিচে তাকিয়ে দেখে নিলে—এখানে ব্যাপারটা কি। সে উঁচু থেকে দেখলে স্তেপের বুকে একটা মস্ত বড় কালো ক্রুশ চিহ্ন: দুইটি লোক মাটির বুক খুড়ে খুড়ে—দীর্ঘ, বহু মাইল ব্যাপী এক ক্রুশের মত পরিখা খনন করেছে।

জনমানবহীন নিরালা স্তেপের মাঝখানে—এমনি ক্রুশের মত পরিখা খননের যে কি অর্থ হ'তে পারে তা বুঝতে না পেরে উড়োজাহাজের চালক আবার পশ্চিম দিকে জাহাজ ছুটাল। সমান উঁচুতেই সে জাহাজ চালাচ্ছিল—তবে দেখে মনে হয় আকাশের পথে একটা বিরাট ছাপ এঁকে সে ক্রমে নিচে নেমে যাচ্ছে। পনের মিনিট পরে একটা ছোট্ট পাখির মত হয়ে জাহাজটা দিগন্তরালে কোথায় হারিয়ে গেল।

স্তেপের বিপুল নির্জনতার মাঝে রইল শুধু দুটি লোক।

এই লোক দুটি নিজেরাও জানতো না স্তেপের বুকে এই ক্রুশের মত পরিখা খননের উদ্দেশ্য কি। শুধু তারা আন্দাজ করে নিয়েছিল—পরিখা খননের মতলবটা হয়ত কয়েক বছর আগেই হয়ে থাকবে: প্রয়োজন হ'লে—এটা জলে ভরতি করে বিপক্ষ সৈন্যকে বাধা দেওয়া যেতে পারে।

যুদ্ধের প্রারম্ভেই লোক দুটিকে বন্দী করে এখানে পাঠানো হয়েছে, সঙ্গে দেওয়া হয়েছে টিন ও লোহা দিয়ে তৈরি একখানা পোর্টেবল ছোট ঘর। মাসে মাসে তাদের খাবার জোগানো হয়। চারটি গ্রীষ্মকাল ধরে তারা এখানে খাল কাটছে,—দেখবার শুনবার কেউ নেই, না পাহারাওয়ালা, না অন্য কেউ। যখন খুশি তারা বিশ্রাম করে,—এবং যতক্ষণ ইচ্ছে,—স্তেপের ঘাসের মাঝে শুয়ে ঘুমিয়ে তারা অনেক সময় দিনের অর্ধেক কাটিয়ে দেয়। তার পরে তারা ইচ্ছে করেই কাজে ফিরে যায়: কোন কিছু না করে কি মানুষ থাকতে পারে।

স্তেপের উপরে খাবারের খোঁজে পাখিরা সব এদিক ওদিক অনবরত উড়ে বেড়াচ্ছে,—ফড়িঙেরা বিচিত্র সুর তুলে ঐক্যতান শুরু করেছে, আর তাদেরই মাঝে এমন এক গভীর নীরবতা বিরাজ করছে—যা দেখে মনে হয় যুবতী পৃথিবী বুঝি স্তব্ধ হয়ে বসে এদের গান শুনছে—আর ভাবছে।

গাঁইতি-কোদালের কোপে একটা পোকা আধখানা হয়ে গেল। যে লোকটা কোদাল চালাচ্ছিল—সে আধখানা পোকা মাটি থেকে তুলে শূন্যে ছুঁড়ে দিল,—সঙ্গে সঙ্গে একটা পাখি উড়ে এসে সেটা ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

"বিছানার ভিতরের দিকে দেয়ালের গা ঘেঁসে থাকতাম আমি, আর বউ থাকতো বাইরের দিকে। ভোর হ'লে আমাকে কিছু না বলেই সে বিছানা থেকে ধীরে ধীরে উঠে যেত। এমন ঠাণ্ডা স্বভাব ভাই,—কি বলব তোকে!"

"হ্যাঁ রে,—কতবার ত বলেছিস্ সে কথা! তুই ত গ্যাস চুল্লীর শিটি না শুনলে ঘুম থেকেই উঠ্‌তিস না।"

"সত্যি, ভাই,—প্রত্যেক দিন সেই একই সুর। আমি অনেক সময় উঠে দেখতে যেতাম। তার পরেই ত যুদ্ধে ডাক পড়ল"—এই বলে যে লোকটি বিয়ে করেছে—সে আবার মাটি কাটতে শুরু করলে। বহুদিন দাড়ি না কামিয়ে লোকটার মুখ একেবারে জবড়জং হয়ে উঠেছে।

সঙ্গীটি তার পাশে মাটিতে শুয়ে ঘাসের আগা চিবুচ্ছিল। সে বললে, 'আমি ত ভেবে পাই না তোর বউএর শরীরের অন্যান্য অংশের চেয়ে বুকটা এমন শাদা হ'ল কি করে?'

যার বউ সে কোন উত্তর দিলে না।

"তুই ত বলেছিস—ওখানটা ঠিক ব্রোঞ্জের মত—না?"

"একবার তুই যদি তাকে পেতিস, মাথা তোর বিগড়ে যেত—ঠিক।"

আধ ঘণ্টা কেটে গেল। পাখিরা সব ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে, পাকে পাকে ঘুরে—কেন যেন দূরে গিয়ে বসতে লাগল, তার পরে আবার দল বেঁধে ফিরে উড়ে এল। যে বিয়ে করেছে সে এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললে, "প্রায় চার বছর হয়ে এল ভাই। অনেক সময় ত আমি মনেই করতে পারি না সে দেখতে কেমন, মুখখানাও মনে আসে না। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়। কিন্তু জানিস, কার্ল, যখন আমি তার স্বপ্ন দেখি, তাকে ঠিক স্পষ্ট দেখতে পাই, একেবারে যেন জ্যান্ত—ইচ্ছে করলেই যেন তাকে আমি ছুঁয়ে ফেলতে পারি।"

"আমি জানি তোর বউ দেখতে কেমন।......তার চাল চলন সব। তোর বউএর কোন কিছু জানতে আমার বাকি নেই।"

"কিন্তু তুই ত দেখিস নি তাকে।.........কতদূরে রয়েছে সে! ঐ উড়োজাহাজটা চাপতে পেতাম—তা হ'লে হয়ত শীগ্‌গিরই দেখতে পেতাম তাকে।.........কতদিন?—ও চার বছর! হায় ভগবান, এতও সইতে হ'ল।

"তোর ত তবু জগতে এমন একজন আছে—যে তোর কথা ভাবে?"

"তা' ঠিক।"

"এমন একজন তোর আছে যে তোর পথ চেয়ে বসে রয়েছে,—আর আমার? আমি যখন আমার কথা ভাবি, চারিদিকে শুধু আঁধার দেখি—কেউ নেই—একেবারে কেউ নেই!"

"তা সত্যি। আমার জন্যে তবু একজন পথ চেয়ে আছে,—অবশ্য সে একজন যদি বেঁচে থাকে!"

"বেঁচে সে ঠিক আছে"—বলে বন্ধুটি মাটিতে বসে পড়ল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি নারী মূর্তি যাকে সে কোনদিন চোখে দেখে নি। দেখতে পেলে ভাল মেয়েটি যেন ঘরের কোণে ড্রয়ার খুলে ধুলো ঝাড়তে লেগে গেছে। ধুলো ঝাড়া শেষ হলে সে সোফার দিকে এগিয়ে তাহার ঢাকনিটা সমান করতে লেগে গেল। সোফার উপর সে একেবারে নত হয়ে পড়েছে। ঘরে ঢুকতেই—দরজার কাছে রয়েছে সোফা—লোকটা তা-ও জানে, ঢাকনিটার রং ও প্যাটার্ন সবই তার জানা—অথচ এ ঘরে সে একদিনও পদার্পণ করে নি।

ভাবতে ভাবতে লোকটা হঠাৎ বলে উঠল,—"রিচার্ড, শোন্ রিচার্ড—ধর—তোর বউ এক্ষুনি এখানে এসে গেছে,—পারিস তুই,—পারিস একবার শুধু আমার কাছে পাঠাতে?"

কোদালিটার হাতলের উপরে দুই হাত ন্যস্ত করে তার উপর থুতনি রেখে রিচার্ড থমকে দাঁড়ালো ঃ বউ যদি এখনই এখানে এসে যায়,—এ বলে কি!

"বল, শীগগির উত্তর দে।"

রিচার্ড অনেকক্ষণ তার সঙ্গীটির মুখের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবলে, তার পর গম্ভীর হয়ে বল্লে, "কি জানি—হয়ত পারি। আমারও যে দশা—তোরও সেই দশা,—এই কথা ভেবেই হয়ত শুধু একবার কাছে যেতে দিই।......কিন্তু ফের যদি তুই তার কাছ ঘেষবি ত এই যে গাঁইতি দেখছিস এই দিয়ে তোর মাথা চৌচির করে দেব।"

"আচ্ছা এখনও সেখানে এই গ্যাস চুল্লীর শিটি শোনা যায় ?"

দু'জনার মাথার উপরে একখানা মেঘ এসে ছায়া ফেললে। ফড়িংদের ঐক্যতানের সুর ক্রমে কমে কমে একেবারে স্তেপের মাঝে কোথায় মিলিয়ে গেল। একটা ফড়িং শুধু নিতান্ত কাছে থেকে একবার কিচির মিচির করে উঠ্‌লো। তারপর সেও চুপ করলো। এই বিপুল নিস্তব্ধতার মধ্যে লোক দুটি তাদের হৃদ্‌স্পন্দনের শব্দ যেন শুনতে পেতে লাগল। দূরে স্তেপের তৃণগুচ্ছ অস্তোন্মুখ সূর্যের কিরণে স্বর্ণাভ হয়ে উঠ্‌ল।

মেঘের ছায়া হালকা হতে হতে—সূর্যকিরণে একেবারে কোথায় মিলিয়ে গেল। দিগন্তে সুরু হ'ল আবার গ্রীষ্মের বিচিত্রসুরের ঐক্যতান। একটি ঘাসের পাতাও নড়ে না।

রিচার্ড বলে যায়, "কিন্তু অ্যানা এতে রাজি হবে না। সে রকম মেয়েই সে নয়,—পর-পুরুষের কাছেও ঘেষবে না সে। প্রথম রাত্রে তাকে নিয়ে কি বিপদে পড়তে হয়েছিল আমার,—তা'ত তোকে বলেছি। তার বয়স তখন কত হ'বে,—ধর—এই তেইশ। তোকে ত আমি সবই বলেছি, কার্ল,—তুই ভেবে দেখলেই সব বুঝতে পারবি।"

রিচার্ড লোকটা নিতান্ত নীরব প্রকৃতির,—কিন্তু দীর্ঘ চার'টে গ্রীষ্মকাল বউকে ছেড়ে থেকে তার মনের অবস্থা এমন হয়ে উঠেছিল—যে তার কথা কিছু বলতে পারলেও সে যেন বাঁচে; তাই তার সঙ্গীকে সে বউয়ের কথা সব খুলে বলেছিল। এই নিদারুণ বিচ্ছেদের সময় মিলনের দিনের দুঃখ কষ্টের কথাগুলি পর্যন্ত ভাবতে তার ভালো লাগতো ঃ সেই দুমুঠো অন্ন সংগ্রহের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম, সেই মাথা গুঁজবার মত একটুখানি স্থান সংগ্রহের চেষ্টা—সব। এখন ত তার চারিদিকে কেবল অসীম নীরবতা।

আর তার এই নীরবতার সাথী কার্ল জেনে নিয়েছিল যে তার ঘরের মেঝে কেমন তিনটে ছোট মাদুরে ঢাকা, অ্যানার চলার ভঙ্গী কেমন সুদৃঢ় সাবলীল ঃ কোন রকমে লজ্জাটা তার একটু ভেঙ্গে দিতে পারলেই হ'ল—বাস্, আর দেখতে হবে না। শুধু এই এক সময় ছাড়া অ্যানার প্রকৃতি একেবারে সম্পূর্ণ আরেক ধাঁচের ঃ শান্ত, সুষ্ঠু, পরিচ্ছন্ন। কার্ল জানত বাড়ির ছাইদানীটার হাতলটা পেতল দিয়ে তৈরী। অ্যানার গায়ের কোন্‌খানে 'সাটিন'এর মত বাদামি রঙের তিনটে তিল আছে তাও তার অজানা ছিল না। ঘরের কোন্ জায়গাটায় চুল্লী আর ছাইদানী রয়েছে—তা'ও তার জানা। জগতে আপনজন কেউই ছিল না বলেই হয়ত কার্লের সারা মনটা অ্যানার চিন্তায় একেবারে ভরে থাকত।

"আচ্ছা রিচার্ড, তুই ত এই চার বছর ওকে ছেড়ে এখানে পড়ে রয়েছিস, ধর,—এর মাঝে অ্যানা যদি তোর উপর নিষ্ঠা হারিয়ে থাকে,—অন্য কোন পুরুষ নিয়ে সে যদি ঘর করতে আরম্ভ করে থাকে! চার বছর সময় ত কম নয়,—তা' ছাড়া তার বয়সটা কি তা'ও দেখতে হ'বে।......তোর চারিদিকে এই সব ফড়িং না থেকে যদি কেবল মেয়েমানুষ থাক্‌তো,—তুই কি করতিস্ একবার ভেবে দ্যাখ না।"

রিচার্ড বল্লে, "সব কথা হয়ত তোকে বলা হয়নি, বলছি শোন। অ্যানা আর আমি শহরে এসে ছোট একটি ঘর ভাড়া নিয়ে দরকারী আসবাবপত্র এনে ঘর সাজিয়ে ফেল্‌লাম। ঐসবের একটিও আমাদের কেনা নয়,—ভাড়া হিসাবে কিস্তিবন্দী দিয়ে ঐগুলি কিনে নেবার কথা ছিল আমাদের। সাত দিন যেতে না যেতেই যুদ্ধে ডাক পড়ল আমার।"

"ও সব ত আমি জানি, মাসে মাসে ছ' 'মার্ক' করে দিতে হ'ত তোদের।"

"হাঁ,—কিন্তু যুদ্ধে আসবার আগেই আমরা ঠিক করেছিলাম যেমন করে হ'ক ঘরটা আমাদের গুছিয়ে নিতে হ'বে। আমি জানি অ্যানা সে সব কথা নিশ্চয়ই ভোলে নি। অন্য সব খেয়ালে মন দেবার সময় কোথা তার। বাড়ি ভাড়া আর খাওয়ার খরচ যোগাতেই তার প্রাণান্ত।"

"সেই জন্যই হয়ত সে—"

"এ সব কথায় তোর কি দরকার ? একটু মুখ সামলে কথা বলিস তুই। অ্যানা কেমন মেয়ে—সেত আমি জানি! এসব কাজের ধার দিয়েও সে যাবে না"—বলে রিচার্ড খুব জোর জোর কোদাল চালাতে সুরু করলো।

নিষ্ফল ব্যাকুলতার বেদনাকে চাপতে সে এই ক্রুশের মত পরিখাকে দীর্ঘতর গভীরতর করতে মন দিয়েছিল,—কঠিন পরিশ্রম দিয়ে সে তার সকল সন্দেহ আশঙ্কা ভুলে থাকতে চায়।

কার্লের বয়স যখন দুই বৎসর, তখন সে একদিন তার মায়ের নতুন টুপি দিয়ে এক গাড়ি তৈরি করেছিল। টুপির দুই পাশের ফিতে নিজের গলায় বেঁধে সে ঘোড়া সেজেছিল। তারপর উঠানে বৃষ্টির জল যাবার পথে সেটা রেখে খুব টানতে সুরু করে দিয়েছিল। সেই থেকে কিছু কল্পনা করতে গেলে সে আনন্দের চেয়ে বেদনাই পায় বেশি। রিচার্ড যখন জোর কোদাল কোপাতে শুরু করল—কার্ল তখন চিত্রার্পিতের ন্যায় নিজের জায়গায় বসে কত কি ভেবে শুধু যন্ত্রণাই পেতে লাগল। সূর্য ক্রমে পশ্চিমে ঢলে পড়ল,—রিচার্ডের কোদালের মস্ত বড় একটা ছায়া কার্লের পাশে দেখা যেতে লাগল।

পশ্চিম দিগন্তে তখন যেন আগুন লেগে গেছে। জ্বলন্ত স্বর্ণরথের চাকা তখনও একেবারে চক্রবাল রেখায় গিয়ে পেঁৗছেনি। আশে পাশের ঘাসের ডগায় তখনও সোনালি আভার রেশ রয়েছে, কিছু দূরেই স্তেপের উপর আঁধারের ছায়া ঘনিয়ে আসছে,—আর পুবের সুদূর চক্রবালে এর মাঝেই রাত্রির অভিযান সুরু হয়ে গেছে। চারিদিকে ফড়িঙের শব্দ,—আর গায়ে লাগছে ভিজে হাওয়ার স্পর্শ।

দিনের কাজের শেষে কর্মকার যেমন তার কাজ করবার বেঞ্চ থেকে যন্ত্রপাতি সরিয়ে পরিষ্কার করে রাখে, রিচার্ড তেমনি কোদালি দিয়ে পরিখার ঝুরো মাটি সরিয়ে তাকে পরিষ্কার করে কোটটি গায়ে দিয়ে নিলে।

মিনিট পনের চলবার পরই তাদের জুতো ভিজে একেবারে বোঝা হয়ে দাঁড়ালো। আকাশের রঙ হয়ে গেল ফ্যাকাশে। চারিদিকের অনন্ত ধূসর ক্ষেতের মাঝে তাদের 'করোগেট'এর ঘরটা দেখাতে লাগলো যেন একটা ছোট্ট পোড়ো বাড়ি।

পরদিন সকালেই তারা তাদের মাসের খাবার আনতে বন্দীদের ক্যাম্পে রওনা হ'ল। চার বছর ধরে তারা প্রত্যেক মাসে এমনি একবার করে খাবার আনতে যায়। সেখানে যেতে লাগে একদিন, আসতে একদিন। পথে যখন তারা একজনের পিছনে আর একজন পা ফেলে ফেলে চলে—লম্বা ঘাসের আগাগুলি একবার নিচু হয়ে আবার তখনই খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। যে পথে তারা গিয়েছে—পরক্ষণেই তা চেনা হয়ে ওঠা দায়।

রিচার্ড ও কার্ল—মাথায় দু'জনাই সমান, একই গাঁইতি

কোদালের কাজ করে করে তাদের গায়ের রঙ হয়ে গেছে সমান তামাটে।

ওরা যখন ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হ'ল, তখন একদল বন্দী কোথায় রওনা হবার জন্য দাঁড়িয়েছিল। গার্ড ওদের দেখা মাত্রই বলে উঠ্‌লেন,—এদের একজনের পেলেই আমাদের সংখ্যা মিলে যাবে। ডাক পড়লো রিচার্ডের।

পাঁচ মিনিট পরেই রিচার্ডকে যখন অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে এগিয়ে চলতে হ'ল—তখন সে কার্লের কাছ থেকে একবার বিদায় নেবারও ফুরসৎ পেলে না। এদের সব প্রথমে নিয়ে যাওয়া হ'বে রেলওয়ে স্টেশনে,—তারপর সেখান থেকে আরও কয়েকদিনের পথ পূবে পাঠানো হ'বে।

(২)

রিচার্ড চলে যাবার একদিন পরেই কার্ল ক্যাম্প থেকে পালালো। অ্যানাকে পাবার আশায় সে সুদূর পথে যাত্রা করলো।

ঘরে গিয়ে সে নিজেকে অ্যানার স্বামী রিচার্ড বলে পরিচয় দিয়ে অ্যানাকে নিজের স্ত্রী বলে সম্ভাষণ করবে—এই সে ঠিক করলো, কারণ তা ছাড়া অ্যানাকে চিরজীবনের মত পাবার আর কোন উপায় ছিল ন। ষড়যন্ত্রই তার উদ্দেশ্য নয়,—একজন মানুষকে প্রাণভরে ভালোবাসবার এবং তার কাছ থেকে প্রাণভরা ভালোবাসা পবার যে নিদারুণ আকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত—তাই তাকে এ পথে চালিত করেছিল।

কতকগুলি সুবিধা কার্লের ছিল ঃ

রিচার্ড ও কার্ল দুই'জনেরই পেশা এক, শরীরের গঠন একই রকম, চোখ আর চুলের বর্ণ এক, মিস্ত্রী কাজ করে করে দু'জনারই গায়ের রঙ এক,—এমন কি চোখের ভ্রূগুলি পর্যন্ত দুইজনের একই রকম ঘন আর বাঁকা।

এসব কথাও কার্ল মনে মনে ভেবে নিয়েছিল।

অ্যানা রিচার্ডের সঙ্গে যেমনভাবে জীবন কাটিয়েছে তার প্রত্যেক খুঁটিনাটি পর্যন্ত সে জানতো। অ্যানার ভাবে যেন তার সারা দেহ-মন ছেয়ে রয়েছে। কার্লের গার্হস্থ্য জীবনের একটা সুখময় স্বপ্ন যেন অ্যানার মাঝে রূপ নিয়েছিল। এক কথায় কার্ল অ্যানাকে মনে-প্রাণে ভালোবেসেছিল।

ক্যাম্প থেকে পালাবার তিন মাস পরে কার্ল—অ্যানা যে নগরে থাকে সেখানে গিয়ে পৌঁছলো।

এই সুদূর পথ অতিক্রম করতে তার বহু কষ্ট পোহাতে হয়েছে ঃ ধরা পড়বার ভয়ে রাত্রে শুধু পথ চলেছে—তাও বনের মাঝ দিয়ে। দিনের বেলায় কোথাও লুকিয়ে থাকত। কত নদীর রৌদ্রতপ্ত বালুতট বেয়ে কত সীমান্ত পার হয়ে অবশেষে সে এখানে এসে হাজির হয়েছে। এই তিন মাস একটি দিনের তরেও বুঝি সে কোন ঘরের মাঝে ঘুমুতে পায়নি।

কার্লের প্রথমেই নজরে পড়লো—শরৎকালে কাটা শস্যের মোথা-ভরা ক্ষেতের মাঝে শহরতলির ছিন্নবিচ্ছিন্ন ঘরগুলি কালো ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শহরটা সে অবশ্য চিনত না—কিন্তু যে বাড়িতে সে যাবে—সে বাড়িটি কেমন এবং তার নম্বর কত তা সে বেশ ভাল করেই জানত। যে পথে তার যেতে হ'বে তাও তার জানা। আর বেশি দূর নয়!

বিকেলে ঝড়ো হাওয়ায়—যারা বাড়ি আসছিল তাদের মুখ আর জুতো থেকে ধুলোগুলি সব সাফ করে দিয়ে গেছে।

কার্ল একটা নাপিতের দোকানে ঢুকে তার ভিজে খবরের কাগজে মোড়া ফিতে দিয়ে বাঁধা ছোট পুঁটলিটা একটা আসনের উপর রাখলে—আর তার টুপীটি রাখলে ওর মাথার উপর।

নাপিত টুপীটা সেখান থেকে তুলে নিয়ে একটা পেরেকে বাধালে, তারপর হাতের তালুটা উলটে তাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলে বসতে।

বন্দী থাকবার সময়ও কার্ল প্রতি শনিবারে দাড়ি কামাত। অনেক সময় সে রিচার্ডকেও বলত, আগে যদি তোর রোজ দাড়ি কামান অভ্যাস থাকে, বউএর কাছে এই এক মুখ দাড়ি নিয়ে গেলে সে তোকে প্রথমে চিনতেই পারবে না।

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর প্রবাসী স্বামী তার স্ত্রীর কাছে যে আগ্রহ নিয়ে ফিরে আসে সেই আগ্রহ নিয়ে কার্ল শহরের পথ ধরে অ্যানা যে ভাড়া-বাড়ির ঘরে বাস করে তার দিকে ছুটে চল্‌লো। বাড়িটার নিচের তলায় একটা জুতোর দোকান।

জানালার উপরে রয়েছে তিন জোড়া পুরানো জুতো। একটা ভাঙ্গা ফুলের-টব কে যেন সেখানে উলটো করে রেখে দিয়েছে—আর তারই পাশে একটা বেড়াল ঘুমুচ্ছে। কার্ল দোকান-ঘরটাকে ঠিক এমনি দেখবে আশা করেনি। রিচার্ডের কাছে সে যা শুনেছিল তাতে এই জানালায় থাকবার কথা অন্তত দু'শো জোড়া নোতুন জুতো—আর তদের গায়ে নীল টিকেটে হলদে অক্ষরে তাদের সব দাম লেখা। দোকানটার ঠিক সামনে কাঁচের প্লেটের উপর বসানো থাকতো বড় বড় পেটেণ্ট লেদারের বুট—উপরের অংশ তার হলদে রঙের। তাদের গায়ে ঝুলানো কার্ডে লেখা থাকতো—সবচেয়ে আধুনিক।

কিন্তু যুদ্ধ এসে সব ওলোটপালট করে দিয়েছে,—কার্ল দোকানটার পরিবর্তন দেখে কিছুমাত্র বিস্মিত হ'ল না। উদ্বেগে তার পেটের ভিতর কেমন মুচড়ে উঠতে লাগলো। তার আনন্দ আর আগ্রহ কোথায় যেন উবে গেল।

দুই নম্বর উঠানের বাঁয়ে যে দরজা, তাই দিয়ে তেতালায় গিয়ে বাঁয়ে দ্বিতীয় দরজা। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে কার্ল আশে-পাশের দেয়ালে যে নক্সাগুলি দেখতে পেল, সেগুলি রিচার্ড তাকে বাড়ির গল্প করবার সময় কতবার এঁকে এঁকে দেখিয়েছে। কার্লের পেটের মোচড়ানি যেন আর থামতে চায় না। একবার তার মনে হ'ল—এখন সে ফিরে গিয়ে—পরে আসে। সিঁড়ির শেষ দুই ধাপ উঠে সে একবার চারিদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল, তারপর আরও দুই এক পা গিয়ে একেবারে দরজার সামনে হাজির হ'ল। চোখে পড়ল—দরজায় নাম লেখা রয়েছে।

মনশ্চক্ষে সে দেখতে পেলে—অ্যানা গ্যাস চুল্লীর পাশে দাঁড়িয়ে গৃহস্থালীর কাজ করছে, তার গলার পিছন দিকটা বেশ দেখা যাচ্ছে, মাথাটা সে একটু নত করেছে,—এইবার সে কি কাজে টেবিলের কাছে গিয়ে আবার চুল্লীর পাশে ফিরে এল। তার গতিভঙ্গীর মাঝে যেন দেহ ও মনের পূর্ণ স্বাস্থ্য বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে, এর চেয়ে সুন্দর চলাফেরা যেন আর কিছু হ'তে পারে না। কার্লের এ সবই জানা।

অ্যানার হাবভাব, চেহারা কার্লের মনে এমন স্পষ্ট রূপ নিয়েছিল যে, দূর থেকে রাস্তার জনতার মাঝে অ্যানাকে যেতে দেখলেও সে অনায়াসে চিনতে পারতো।

দারুণ উদ্বেগে কার্ল জামার কলারের নিচে গলায় হাত দিল ঃ নিচেই নেমে যাওয়া যা'ক।

কিন্তু তা না করে সে হঠাৎ দরজায় ধাক্কা দিয়ে খুলে ডাক দিলে,—"অ্যানা!"

অ্যানা তখন জানলা থেকে ঘরের মাঝখানে এসে টেবিল থেকে একখানা প্লেট নিয়ে যাচ্ছিল।

এতদিন যে ছিল মানসী—আজ রক্ত মাংস গতি নিয়ে জীবন্ত হয়ে সে চোখের সামনে দেখা দিল। কার্ল দেখল প্রতিদিন যার স্বপ্নে তার মন বিভোর হয়ে ছিল—তার সত্যিকার মূর্তি আরও মনোহর, মনকে আরও বিভ্রান্ত করে দেয়।

অসহ্য আনন্দে সে বলে উঠল,—"অ্যানা! অ্যানা!—চিনতে পারছ আমায়?"

এতখানি আন্তরিকতা আর দরদ দিয়ে কার্ল এই কথাগুলি বলে উঠল—যে তার নিজের কাছেও এটা একটুও মিথ্যা বলে বোধ হল না।

কার্লের মুখে চোখে আনন্দ আর কণ্ঠে আন্তরিকতার সুর অ্যানার ভয় ভেঙে দিল। সে নির্ভয়ে সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করল,—কে তুমি?

একটা নীল মোটা সুতী কাপড়ের ফ্রক্ অ্যানা সেদিন পরে' ছিল, ধুয়ে ধুয়ে রঙটা তার একেবারে হালকা হয়ে গেছে, তা' ছাড়া শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে যেখানে সূর্যের আলো বেশি করে লাগবার সুযোগ পায়—সেখানে রঙটা একেবারে জ্বলে গেছে। অ্যানার মুখখানা প্রকৃতিদেবী যেন শক্তি, নিবিড়তা আর নিষ্কলুষ শুভ্রতার আদর্শ করে গড়েছেন।

এখানেও কার্ল নাপিতের দোকানের মত তার পুটুলীটা পুরানো চেয়ারের উপর রেখে তার উপর তার টুপীটা রাখলেঃ "চেয়ারগুলি সাফ করে ফের রং করতে হ'বে। তোমাকে তখনই বলি নি—এ রং টিকবে না?"

অ্যানার তখনই মনে পড়ে গেল।—তার স্বামী ঠিক এই কথা বলে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে যেন হতভম্ব হয়ে গেল।

"এইবার বোধ হয় চিনতে পেরেছ?"

"কে তুমি?"

বিবর্ণ মুখে সে উত্তর দিলেঃ রিচার্ড।

অ্যানা অমনি পেছিয়ে গিয়ে এক হাত টেবিলে দিয়ে টাল সামলে বলে উঠলঃ "আমার স্বামী? তুমি ত আমার স্বামী নও!"

"অ্যানা!"

ভাবাবেশে তার পা দুটো কাঁপতে লাগল। আরও দু'পা এগিয়ে সে হঠাৎ বসে পড়ে ডাকলঃ "অ্যানা!"

ডাকার সুরটা অ্যানাকে অভিভূত করে ফেলল।

ভাগ্য যখন কোন মেয়েকে কঠিন আঘাত করে—তখনও সে যেমন তার রোজকার টুকিটাকি কাজ করে যেতে থাকে—অ্যানাও তেমনি একবার গ্যাস চুল্লীর কাছে গিয়ে তিনটে দিয়াশলাইয়ের কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে এল। তার পর মাথাটা নিচু করে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবতে লাগল।

অ্যানার ঠিক এই মূর্তিই যেন কার্ল একটু আগে তার মনশ্চক্ষে দেখতে পেয়েছিল।

অমনি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল—যেন কিছুই হয় নি,—যেন এইমাত্র সে অন্য ঘর থেকে রান্নাঘরে এল। কপালের দুপাশ শুধু একটু রাঙা হয়ে উঠেছে।

এমন সুরে যে তাকে ডাক দিল তাকে সে অবিশ্বাস করে কি করে? তেমন তার স্বভাবই নয়। অথচ সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে এ তার স্বামী নয়। আক্রান্ত হয়ে আত্মরক্ষায় অসমর্থ নারী যেমন করে তাকায় তেমনি করে সে এই আগন্তুকের দিকে চেয়ে রইল।

"অ্যানা, তুমি আমায় বিশ্বাস করছ না?......জগতে আমার তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।"

তার পর সে এমন এক বিষণ্ণ করুণ হাসি হেসে বললে, "তুমি আমার স্ত্রী" যাতে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়—তার অন্তর থেকে সে সত্য কথাই বলছে জীবনের যত হাসি কান্না যেন মূর্ত হয়ে উঠল সে হাসিতে।

লোকটা যে সত্যি কথা বলছে না—অ্যানা তা' জানে, তবু সে বেশ বুঝতে পারল লোকটা ঠিক অন্তর থেকেই কথাগুলি বলছে। দুটি হাত বুকের নিচে আড়াআড়ি করে রেখে কিছুক্ষণ সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলঃ লোকটা যে চেয়ারের উপর জড়সড় হয়ে মাথা নুইয়ে বসে রয়েছে—এর মনের কথা তার অজানা নয়।

মাংসাদি তৈরী করবার টেবিলের কাছে এগিয়ে অ্যানা বলে উঠলঃ "কি সব তুমি পাগলের মত বলছ—বুঝছি না।"

একটা ড্রয়ার হাতড়ে একখানা পুরানো পোস্ট কার্ড বের করে কার্লের হাতে দিয়ে সে বললে, "চার বছর আগেকার কথা,—চার বছর!" হাত দু'টি আড়াআড়ি করে আবার সে বুকের নিচে রাখলে।

চিঠিখানা এসেছে সেনা বিভাগের কর্তৃপক্ষ থেকে। কার্ল পড়ে দেখল এতে লেখা রয়েছে—১৯১৪ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর রিচার্ড যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেছে। কার্ল চিঠিখানা, একবার পড়া হ'লে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আর একবার পড়লে; তার পর হেসে বললে,—"এ সব মিথ্যে, অ্যানা, সব মিথ্যে।"

নিজের হাতখানা অ্যানার হাতের দিকে এগিয়ে দিয়ে সে বললে, "কি সব মিথ্যে কথাই যে এরা সব লেখে!......আমার কথা তুমি বিশ্বাস কর—এ সব মিছে কথা।"

এই সব কথা বলতে গিয়ে কার্লের মুখে এমন একটা আনন্দের আভা ফুটে উঠেছিল যা দেখে অ্যানা তার হাতখানা আর তখনই টেনে নিতে পারলে না। অ্যানার মুখে চোখে ভয়ের ছায়া।—স্বামী মরে গেছে—শুনেও যদি কোন উন্মত্ত নারী আশা করে যে তার স্বামী আবার প্রতিদিনকার মত ঘরে ফিরে আসবে—তার মুখের ভাব যেমনি ধারা হয়—অ্যানার মুখে তাও ফুটে উঠেছিল।

তার ইচ্ছা হচ্ছিল সে বলে,—ক্ষিদে পেয়েছে তোমার? কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হ'ল সে একে তাড়িয়ে দেয়, সাহায্যের জন্য প্রতিবেশীদের সে ডাকে। এই সব ভাবতে ভাবতেই সে রুটি কাটতে লাগল, টেবিলের উপর ছুরি কাঁটা রাখল, প্লেটের উপর খানিকটা মাংস দিয়ে ওর সামনে এগিয়ে দিল। একটা আপেলও ছাড়িয়ে দেবে নাকি সে?

"তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই".........

সঙ্গে সঙ্গে অ্যানার মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল। অ্যানা যন্ত্র চালিতের মত তাড়াতাড়ি একটা আপেল ছাড়িয়ে,—চার টুক্রো করে ভিতর থেকে বিচি ফেলে পরিপাটি করে টেবিলের উপর রাখল।

কার্লের জীবনে এই প্রথম। কার্ল যাকে ভালবেসেছে—এমন নারী এই প্রথম তাকে পরিবেশন করলে।

অ্যানা হঠাৎ তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে একটা অজানা আনন্দে সে একেবারে কেমন হয়ে পড়েছে। অ্যানার স্বভাব-গম্ভীর মুখের উপর দিয়েও যেন এক টুকরো হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল; প্লেটটা সে আরও একটু ওর কাছে এগিয়ে দিলে।

"আচ্ছা আমাদের সেই কাঁটাটা কি হ'ল—যার তিনটের একটা ইয়ে ছোট ছিল?"

অ্যানা স্বপ্নাভিভূতের মত গিয়ে ড্রয়ার থেকে সেই কাঁটাটা বের করে আনলে।

লোকটা দেখে খুশি হয়ে বললে,—"হাঁ, এইটাই বটে!"—তার পর অ্যানার মুখের দিকে চেয়ে রইল। অ্যানার মুখ থেকে তখনও স্বপ্নের ভাব কাটে নি।

তারা দুইজন শুধু ঘরের আলোর নিচে সামনাসামনি বসে রইল। ঘরের চারটে দেয়াল তাদের বাইরের জগৎ থেকে একেবারে আড়াল করে রেখেছে। গ্যাস চুল্লীর মাথা থেকে একটা কেমন অস্ফুট গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তাদের ডাইনে রয়েছে বিছানা, বাঁয়ে মাংসাদি কাটবার টেবিল, সামনে দেয়ালের গা ঘেঁসে সেই পুরানো সোফা। জানলাগুলি সমচতুর্ভুজের মত দেখতে—আর ছোট। সারা ঘরময় জাঁয়িয়ে-রাখা ফল আর ময়দার মৃদু গন্ধ।

দেয়ালের পাশের তাকে রয়েছে ছ'টা পাত্র ভরতি ফল। ঘরের শোভা যেন এরা বাড়িয়ে তুলেছে।

অনেক দিন ধরে দু'জন লোক যখন এক সঙ্গে বাস করে—তখন তারা একে অন্যের হাবভাব রীতি নীতি অনেক না জেনেও আয়ত্ত করে ফেলে,—এমন কি কথা বলার ভঙ্গীটি পর্যন্ত বাদ যায় না। খাবার সময় লোকটাকে রিচার্ডের মত যখন ফালি দিয়ে রুটি কাটতে দেখা গেল অ্যানা তখন রীতিমত ভয় পেয়ে গেল।

এতদিন অ্যানা নিরালা জীবনযাপন করে আসছিল। কার্ল এসে তার হাবভাব, তার উচ্ছ্বাস, তার আশা আকাঙ্ক্ষা দিয়ে সব যেন ওলোটপালট করে দিতে চায়। অ্যানার মনেও যেন বাঁচার মত বাঁচবার একটা আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠতে লাগল। তার অন্তরের রুদ্ধ উচ্ছ্বাস যেন বিচারের বাঁধন ভেঙে বাইরে আসতে চায়। মাঝে মাঝে যখন সে আর ভাল করে ভেবে দেখছিল না, তখন সে যেন বিশ্বাস করে ফেলছিল।

"সোমবারে বেরিয়ে তা'হলে কাজের চেষ্টায় লেগে যাই—কি বল ?"

ক্ষণকালের জন্য অ্যানার মনে হ'ল—তা' হ'লে তাকে আর কাজে বেরুতে হ'বে না। তারা তা' হ'লে আবার আগেকার মত জীবনযাপন করতে পারবে। হয়ত আগেকার চেয়েও ভালভাবে তাদের দিন চলবে—কে জানে ?......পরক্ষণেই সে বলে বসল :

"তুমি কেন বলছ—তুমি আমার স্বামী ?—এ কথা কেন বলছ তুমি ?"

"অ্যানা, অ্যানা, কি বলছ তুমি যা তা !"

"কত ভাল লাগত তাকে আমার। কত ভাল ব্যবহার করত সে আমার সঙ্গে,—কত ভাল ! সে সব কথা কি ভুলবার। তাকে আমি ভুলতে পারব না কোন দিন।"

শোনা মাত্র কার্লের মনে ঈর্ষা জেগে উঠ্‌ল। কিন্তু একবার যদি অ্যানা সে কথা বুঝতে পারে—তবে সব মাটি হয়ে যাবে। কার্ল তাই এবার জ্ঞাতসারে মিথ্যা বলতে শুরু করলে। সে মনে করেছিল—অ্যানাকে সে এর মাঝেই জয় করে নিয়েছে,—সঙ্গে সঙ্গে তার ভয় হচ্ছিল—একটু ভুলে সে সব পণ্ড করে না ফেলে।

প্লেটটা ঠেলে দিয়ে সে চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে : "জানলার পরদাগুলি সব বদলেছ দেখতে পাচ্ছি। তুমি আমি দু'জন মিলে একসঙ্গে যেগুলি কিনেছিলাম,—তার রং ছিল হলদে। দোকানদার বললে—আমরা নাকি জিনিস কিনে জিতেছি। মনে আছে তোমার সে কথা ?"

অ্যানা চমকে উঠে বললে, "হাঁ, আছে !"

"আসবাবপত্রের কিস্তিবন্দী দেবার কি ব্যবস্থা হয়েছে, অ্যানা ?"

"আমি এই চার বছর ধরে সে সব টাকা শোধ দিয়েছি।"

লোকে যেমনি করে গোঁফে তা' দেয়—তেমনি করে কার্ল নিজের ভ্রূতে হাত বুলোতে লাগল। এ অভ্যাসটা তার রিচার্ডের কাছ থেকে নেওয়া। দেখে অ্যানা আতঙ্কে শিউরে উঠল।

"আর বেশি বিপদ ঝুঁকি না সহ্য করে জীবনটা আবার নতুন করে আরম্ভ করা যাক, কি বল অ্যানা ?......আমার দিকে একবার তাকাও, অ্যানা লক্ষ্মীটি, একবার তাকাও।"

বুকের উপর আড়াআড়ি রাখা দুখানি হাতের উপর অ্যানা মাথাটা নত করলে।

"আবার তুমি এ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে"—বলে কার্ল অ্যানার মাথার চুলে ধীরে ধীরে হাত বুলাতে লাগল। অনবরত স্নেহ স্পর্শ পেয়ে অ্যানার কম্পমান অন্তর ক্রমে স্থির ও শান্ত হয়ে উঠল।

এইবার অ্যানা উঠে দাঁড়ালো। তাহার দেহ মন দুই-ই এবার অনেকটা শান্ত ও কর্মোপযোগী হয়ে উঠেছে।

সে গিয়ে টেবিলটা পরিষ্কার করে ফেলে—নিরবে ঘরের একটা কোণে গিয়ে মাথা নত করে দাঁড়াল।

কার্ল যদি তখন একটা কিছু বেসুরো কথা বলে ফেলত—তা' হ'লে তার সব আয়োজন পণ্ড হয়ে যেত।

অ্যানা যেমন করে টেবিল পরিষ্কার করলে,—যেমন করে মাঝে মাঝে কার্লের দিকে তাকাতে লাগল—যে ভাবে জানলা বন্ধ করে পরদা টেনে দিলে—এর সব কিছুতেই বুঝা যায় সে তার এই নতুন পরিস্থিতিটি ভাল করে বুঝে নিতে চায়। এই অভিনব ব্যাপারের ফল কি গিয়ে দাঁড়াবে সেটা সে দেখে নিতে চায়।

কার্লের প্রতি প্রশ্নের জবাব সে পটাপট দিয়ে যেতে লাগল। সে জানালে যে কার্ড বোর্ডের বাক্স তৈরি করবার একটা কারখানায় সে কাজ করে,—এবং সেখানে সে কত আয় করে তাও জানালে। 'জেরানিয়াম' গাছ থেকে কয়েকটা ফুলের পাপড়ি খসে পড়েছিল,—কথা বলতে বলতে অ্যানা সেগুলি কুড়িয়ে নিলে।

দিনের কাজ করবার আজ কিছু বাকি রইল না। এইবার শোবার পালা। অ্যানা পিঠটা জানলার তাকে ঠেসান দিয়ে স্থির হয়ে বসলে।

প্রণয়ী যুগলের মাঝে প্রেমের আবির্ভাব হ'য়েছে—অথচ তেমন ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে নি—এমন সময় তারা একটা নির্জন ঘরে আটক পড়লে তাদের যেমন দশা হয়,—অ্যানা ও কার্লের ভেতর ঠিক তেমনি অবস্থা দেখা দিল।

হঠাৎ উল্লসিত কণ্ঠে কার্ল বলে উঠ্‌ল,—"আমার কাছে কিন্তু মোটে প'ইত্রিশ 'ফেনিং' আছে।"

অ্যানা আঙুল দিয়ে কার্লকে সোফা দেখিয়ে দিয়ে বললে, ঐখানে শোবে তুমি। তার পরেই সে তার হাতটা আবার জানলার তাকে রাখলে।

কার্ল সোফার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে অ্যানার দিকে আবার চাইবার আগেই অ্যানা উঠে সিন্দুক খুলে কাপড় বের করতে লেগে গেছে। সব চেয়ে ভাল চাদরটা বের করে—নিজের বিছানার একটা বালিশে ভাল ওয়াড় পরিয়ে অ্যানা কার্লের শয্যা রচনা করল।

"সোফাটা একটু ঠেলে দেয়ালের গায়ে লাগিয়ে দিলে ভাল হয়।"

দুজনে মিলে সোফাটা ঠেলে দেয়ালের দিকে নিয়ে গেল।

বিছানা পরিপাটি করতে অ্যানা যখন সোফার উপর নুয়ে পড়ল কার্ল তখন তাকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে লাগল। হাজার হাজার মাইল দূরে থেকে কার্ল তাকে এই মূর্তিতে কতবার মনশ্চক্ষে দেখেছে।

বাইরে রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। অ্যানা বললে, এইবার আলো নিভিয়ে দিচ্ছি।

কাপড় ছাড়তে ছাড়তে কার্ল একবার থেমে কান পেতে—অ্যানার শব্দ শুনতে চেষ্টা করলে। অ্যানাও আর নড়েচড়ে না, মোজাটা তার মাত্র অর্ধেক খোলা হয়েছে; সেই অবস্থাতেই এক পায়ের উপর আর এক পা দিয়ে দুই হাত মোজার উপর রেখে অ্যানাও চুপ করে পড়ে রইল।

দুই হাত মাথার নিচে রেখে চিৎ হয়ে চোখ খুলে কার্ল সোফার উপর পড়ে ছিল : প্রত্যেক শব্দটা সে শুনে নিতে চায়। কিছুক্ষণ সে কিছুই শুনতে পেলে না। তার পর কার্ল জিজ্ঞাসা করলে : "শুয়ে পড়েছ তুমি ?"

কোন উত্তর না পেয়ে সে আবার জিজ্ঞাসা করলে,—"শুয়েছ ?"

অ্যানা উত্তরে যে সুরে এবার 'হাঁ'—বললে তা' শুনে কার্ল

(শেষাংশ ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাঙালীর শিক্ষাসমস্যা

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

আজ দেশের সম্মুখে যে সমস্যার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার বেশির ভাগ রাজনৈতিক সমস্যা এবং সে সমস্যার নিরাকরণ করিবার যোগ্যতা কেবল রাজনৈতিক নেতাদেরই আছে, শিক্ষকের প্রবেশাধিকার সেখানে থাকিলেও তাহার যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উঠিতে পারে। আমি প্রথমেই বলিতে চাই, সে অনধিকার চর্চা করিবার ইচ্ছা কোন দিনই আমার নাই। তবে আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, শিক্ষার ন্যায় একটি নিরপেক্ষ ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রনৈতিক কলহের কণ্টকগুল্ম নানা শাখাপ্রশাখা প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। সুতরাং একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প সমস্তই এক উত্তপ্ত রাজনৈতিক কটাহে নিক্ষিপ্ত হইতে চলিয়াছে। আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে, যে, বৃক্ষের শীতল ছায়ায় আমরা বসিয়া আছি, তাহারই মূলচ্ছেদ করিবার প্রাণান্তকর চেষ্টা আজ আমরা যৌথভাবে করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি কেন! যে শিক্ষার প্রসাদে আমরা মানুষ হইয়াছি, আমাদের পুত্র-পৌত্রাদি বংশপরম্পরায় মানুষ হইবে, তাহারই ব্যবস্থা আমরা অব্যবস্থিত চিত্তে করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছি কিসের জন্য?

কিন্তু বাস্তবিকই এত ব্যস্ততা কিসের? মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা সত্যই কি এত অ-থই জলে পড়িয়াছি যে অবিলম্বে ইহাকে উদ্ধার না করিলে চলিতেছে না? যদি প্রকৃতই শিক্ষা-পদ্ধতির দোষত্রুটি দূর করিয়া ইহাকে উন্নততর, বিশুদ্ধতর, যোগ্যতর করিবার ব্যবস্থা হয়, তবে কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার অন্তরায় হইবে? আমাদের শিক্ষা প্রশস্ততর, দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হউক, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বোর্ড স্থাপিত হউক, সর্ব সম্প্রদায়ের লোক তাহাতে নিশ্চয়ই সম্মতি দিবে। কিন্তু সে রকম কোন পরিকল্পনার আভাস বিলে কোথাও দেখা যায় না,—আছে শুধু অধিকারের কথা, শাসন কর্তৃত্বের কথা, প্রভুত্বের কথা। যাঁরা বিলের জনক, উদ্‌ভাবয়িতা বা পরিপোষক, তাঁহারা এই কথাই সর্বত্র ঘোষণা করিতেছেন যে আজ আমরা কর্তৃত্ব পাইয়াছি, আমরা শিক্ষা ব্যাপারেও কর্তৃত্ব করিব না কেন? সংক্ষেপত ইহাই তাঁহাদের মনের ভাব। আমরাও শঙ্কিত হইয়াছি এইজন্যই। মুসলমান ভ্রাতৃগণ অনেক বিষয়ে কর্তৃত্ব করিতেছেন,—শিক্ষা বিভাগেও তাঁহাদের কর্তৃত্ব বা অধিকার এখনই অপ্রতিহত হইয়াছে—তাহাতে কেহ কোন দিন আপত্তি করে নাই, শিক্ষা-বিষয়েও তাঁহারা স্বাভাবিক নিয়মে কর্তৃত্ব করিলেও কেহ আপত্তি করিত কিনা সন্দেহ। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁহারা বলিলেন যে, আমরা চাই শিক্ষার শাসন কর্তৃত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে, সে মুহূর্তেই আর সকলে চমকিত, শঙ্কিত, ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাহার কারণ এই যে, শিক্ষা একটি মূল্যবান জাতীয় সম্পদ, ইহা অনেক সাধনার বস্তু। বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সন্তান-সন্ততি তুল্যরূপে ইহার অধিকারী। কাজেই শিক্ষা সম্বন্ধে হস্তার্পণ করিতে হইলে শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার সম্বন্ধেই সর্বপ্রথম ধ্যান দিতে হইবে, প্রভুত্বকল্পনা লইয়া আসিলে চলিবে না। 'কন্‌ট্রোল' জিনিসটা শিক্ষার আসল বস্তু নয়। আমি দেখিতেছি এই কন্‌ট্রোল কুঠারই যত সর্বনাশ ঘটাইয়াছে। হিন্দুরা এই কন্‌ট্রোল নামক পদার্থ কখনও আইনের দ্বারা লাভ করেন নাই, এই কন্‌ট্রোল হস্তে রাখিবার জন্যও তাঁহারা কোন আইনের সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন না। কাজেই এই কন্‌ট্রোলের জন্য কাহাকেও লালায়িত হইতে দেখিলেই স্বভাবতঃই আশংকা হয় যে শিক্ষা বুঝি বা চক্রবালের অন্তরালে অস্তমিত হইবে, থাকিবে শুধু প্রভুত্বের রক্তশিখা। একটি উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট হইবে। মনে করুন, এই জেলায় একটি স্কুল আছে; তাহাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্র পড়ে। সে স্কুলে যদি হিন্দু বা মুসলমান হইলেই তাহাকে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়,—যোগ্যতার দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে সে স্কুলের তিন চারশত ছাত্রের শিক্ষার যখন অবনতি ঘটে, তখন লোকসান হয় কার?

শিক্ষাকে যদি শিক্ষা বলিয়াই মনে করা যায়, তাহা হইলে ইহাকে কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের উচ্চাভিলাষে ইন্ধন যোগাইতে নিয়োজিত করা উচিত নহে। তার পরে আপনারা মনে রাখিবেন যে হিন্দু এবং মুসলমানকে লইয়াই বাঙলার সমস্যা নিঃশেষিত নয়। আমরা বারো রাজপুত তেরো হাঁড়ি। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বারজীবি, মাহিষ্য, স্বর্ণকার, কর্মকার নানা ছোট বড় সম্প্রদায় লইয়া আমাদের এই সোনার বাঙলা। কাজেই একবার ঐ সাম্প্রদায়িক জালাটার মুখ খুলিয়া দিলে যে দৈত্যের আবির্ভাব হইবে, তাহার ক্ষুধা মিটাইতে আমাদের দেশের লক্ষ কোটি সন্তানকে তাহার জঠরে সমর্পণ করিতে হইবে।

মুসলমান ভ্রাতৃগণ মনে মনে হয়ত এই ধারণা পোষণ করেন যে হিন্দুদের কর্তৃত্ব খর্ব না করিলে তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হইবে না এবং শিক্ষা-প্রণালীর কর্তৃত্ব করায়ত্ত হইলেই তাঁহাদের সম্প্রদায়ের শিক্ষা দ্রুত বেগে অগ্রসর হইবে। আমার মনে হয় এই ধারণা ভ্রান্ত। হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাগত যে বৈষম্য দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময়ে, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনকালে হিন্দুরা চাকরির প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। চাকরির জন্যই ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত হয় এই দেশে। প্রতীচ্য শিক্ষা-প্রণালী যখন প্রচলিত হইল, তখন হিন্দুরা দলে দলে ছুটিল ইংরেজি শিক্ষার প্রলোভনে। ইহার ফলে তাহাদের অবস্থা দিন দিন ভাল হইতে লাগিল। কাজেই তাহারা আরও উৎসাহের সহিত নিজেদের সন্তানদের লেখাপড়া শিখাইবার ভাল বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা স্কুল স্থাপন করিল, চাঁদা তুলিল, কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিল, ভাল ভাল শিক্ষক নিযুক্ত করিল—কাজেই হিন্দুরা এগিয়ে গেল। মুসলমানের মধ্যে অনেকে চাষবাস, লইয়া, ব্যবসা বাণিজ্য লইয়া সন্তুষ্ট রহিলেন। কিন্তু চাষবাসে প্রচুর অর্থ হয় না। তাঁহাদের সন্তানদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা পিছাইয়া গেল। এই যে বৈষম্য আপাতত দেখিতে পাওয়া যায়, বিশ্বের ক্ষতিপূরণ নিয়মে (Law of Compensation) ইহার অন্য একটা দিক্ আছে, সেটা সব সময়ে আমাদের চোখে পড়ে না। সেটি এই যে, মাতৃস্তন্য ছাড়িয়া যাহারা বোতলের বিলাতি দুধ খাইতে অভ্যাস করিল, তাহাদের সে দুধের আমদানী যখন হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল, তখন মৃত্যুর ছায়ায় তাহারাই আগে ম্রিয়মান হইয়া পড়িল। অর্থাৎ যাহারা চাষবাস লইয়া ছিল, তাহাদের দু'মুঠো খাইতে পাইবার বাধা ঘটিল না। আর যাহারা চাকরির জন্য উধাও হইয়া ছুটিয়াছিল, তাহারা চাকরির অভাবে মরিতে বসিয়াছে। পল্লীগ্রামের দিকে চাহিয়া দেখুন, ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু নিজের অস্ত্রে নিজে কাটা পড়িয়াছে। অন্নাভাবে, ঔষধ ও পথ্যের অভাবে হিন্দুরা ধ্বংসের পথে যাইতেছেন আর মুসলমানগণ ধনে জনে বাড়িতেছেন। গ্রামে যাহা কিছু জমি জোৎ আছে, তাহা প্রায়ই তাঁহাদের অধিকারে। এখন তাঁহারা চাষবাস ছাড়িয়া অবশ্য শিক্ষার দিকে আগাইয়া আসিতেছেন। ইহার মধ্যেই মুসলমান ছাত্রগণ প্রাথমিক পরীক্ষায় হিন্দু ছেলেদের যে শুধু সমকক্ষ হইয়াছে তাহা নহে, দুই একটি বিভাগে তাহারা অনেকখানি ছাড়াইয়া গিয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষায়ও তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। হিন্দুর ছেলেরা এখন অন্নাভাবে ক্লিষ্ট, তাহাদের জমি নাই, জিরাৎ নাই। লেখাপড়ার খরচ তাহারা আর কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। ব্যবসা-বাণিজ্যে যে কষ্ট-সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, তাহাও পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত আয়েষের গতিকে হিন্দুর ছেলেরা হারাইয়া ফেলিয়াছে। কলিকাতার শহরে একটু ঘুরিলেই দেখিতে পাইবেন, দোকানপসার প্রায়ই

মুসলমানদের হাতে। ফলে ব্যবসায়ে হিন্দুদের কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে আরও অনেক ব্যবসা মুসলমান ছেলেদের একচেটিয়া। চাঁদনীতে, রাধাবাজারে, মুর্গীহাটায়, চীনাবাজারে, ধর্মতলায় যে দৃশ্য দেখা যায়, তাহা হিন্দুদের পক্ষে বড় বেশি আশাপ্রদ নহে। সুতরাং মুসলমান ভ্রাতৃগণ যে মনে করেন হিন্দুদের পক্ষপাতিত্বের ফলে তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, একথা একেবারেই সত্য নয়। হিন্দুরা অনেকস্থলে নিরুপায় হইয়াই ইংরেজি শিক্ষার দিকে ধাবিত হইতে বাধ্য হন।

আর একটি নিগূঢ় কারণ এই যে, হিন্দুদের মনোবৃত্তি কতকটা উদার ধরণের। যে ইংরেজি শিক্ষার অনুকরণে আমাদের দেশের শিক্ষাপদ্ধতি রচিত হইয়াছে তাহা অসাম্প্রদায়িক, এমন কি ধর্মের সঙ্গে সংস্রববর্জিত বলিলেও বলা যায়। হিন্দুরা দলে দলে সেই non-denominational বা Secular শিক্ষা গলাধঃকরণ করিতে সম্মত হইল। কিন্তু মুসলমানগণ সকলের উপরে, শিক্ষার উপরে দিলেন ধর্মের স্থান। ধর্মের আদর্শ হইতে বিচ্যুত যে শিক্ষা, সে শিক্ষা তাঁহাদের নিকট কখনও আমল পায় নি—এখনও পায় না।

এই জন্যই শিক্ষার কর্তৃত্ব তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিতে অন্য সমস্ত সম্প্রদায় ভয় পায়। তাঁহাদের ধর্মপ্রাণতা যতই প্রশংসনীয় হোক্, আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী সে দিকে কখনও জোর দেয় নাই। তাহা ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে সে বিচারে প্রয়োজন নাই; কথা এই যে, আমরা যে শিক্ষাকে বরণ করিয়া লইয়াছি—ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, সেই শিক্ষার দৌলতে বাঙালীর যাহা কিছু পসার প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা; ভারতের সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাঙলাদেশের প্রাধান্য। যে প্রণালীতে এই প্রাধান্য আমরা অর্জন করিয়াছি, অতি কৃচ্ছ্রসাধনে তাহা বিসর্জন দিলে আমরা সর্ববিষয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িব। আমরা যাহারা শিক্ষা লইয়া আছি, তাহারা অন্নের চেয়েও এই শিক্ষাকে মূল্যবান মনে করি, প্রাণের চেয়েও প্রিয় বলিয়া গণনা করি। এই শিক্ষার ফলে আমরা বাঙলাদেশে কত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, কত শ্রেষ্ঠ কবি, কত শ্রেষ্ঠ বাগ্মী, কত শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ পাইয়াছি—আমরা সভ্য মানুষ বলিয়া জগতের দরবারে পরিচয় দিতে পারিয়াছি, সেই মহামূল্য সংস্কৃতি ও শিক্ষার উপর হস্তক্ষেপ করিলে আমাদের পক্ষে বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক নয় কি?

আমার একজন মুসলমান বন্ধু সেদিন বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, এতদিন তোমরা চালাইয়াছ, দিনকতক আমাদের চালাইতে দিতে ক্ষতি কি? আমাদের দোষে যদি দেশের শিক্ষা নষ্ট হয়, অধোগতি প্রাপ্ত হয়, তবে মুসলমান ছাত্রগণেরই ক্ষতি হইবে বেশি। কাজেই আমরা সেরূপ কাজ কেন করিব? ঠিক কথা! ঐ একই কারণে অন্য সম্প্রদায়ও আপত্তি করিতেছেন। মুসলমান সন্তানেরাও যেমন, হিন্দু সন্তানেরাও তেমন। শাসন কর্তৃত্ব মাত্র প্রলুব্ধ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির দ্বারা ইহাদের অনিষ্ট হয়, ইহা কেহই ইচ্ছা করে না। সেই জন্যই ত মুসলমান ব্যতীত প্রায় অন্য সকলেই এই বিলের বিরোধী। দেশের যত গণ্যমান্য ব্যক্তি সকলেই ইহার নিন্দা করিয়াছেন। দেশের সন্তানেরা কুশিক্ষার প্রভাবে বা শিক্ষার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, ইহাই সকলের দুশ্চিন্তাপূর্ণ উদ্বেগের কারণ। যুক্তি অপেক্ষা ধর্ম যেখানে প্রবল, সাম্প্রদায়িক মমত্ব যেখানে যোগ্যতাকে উপেক্ষা করে, প্রভুত্ব সেখানে স্বাধীনতাকে পদদলিত করিতে পরাঙ্মুখ হয় না, সেখানে প্রকৃত শিক্ষার আশা করা অসম্ভব।

আমাদের দেশে যেভাবে মাধ্যমিক শিক্ষাপদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই শিক্ষা যে সর্বাঙ্গসুন্দর, তাহা কেহই বলিবে না। ইহার উন্নতিতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু বর্তমান অবস্থার কোনও উন্নততর পরিণতি প্রত্যাশা করিতে হইলে কতকগুলি উপাদানের সংবলন আবশ্যক। প্রথমত ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। অর্থাৎ যে প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা কতকটা সুফল পাইয়াছি, তাহাকে একেবারে পরিবর্জন করিলে চলিবে না। অতীত সর্বত্রই ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক। অতীত ইতিহাসকে অস্বীকার করিলে সংস্কারের নামে অগ্নিসৎকার করা হইবে। দ্বিতীয় কথা এই যে, ধর্মের ক্রীতদাসীরূপে শিক্ষা কোনওকালে স্ফূর্তি লাভ করে নাই। ইয়ুরোপের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই কথার সত্যতা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে, রাষ্ট্রনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক—আজকাল এই উভয় শব্দ একই অর্থবোধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সতরঞ্চ খেলার বোড়ে হিসাবে শিক্ষা কখনও সুফলপ্রসূ হইবে না। ইতিহাসের সাক্ষ্য ইহার বিপক্ষে।

প্রভুত্বের জন্য মত্ত লোলুপতা দেখিয়া আশঙ্কা হয় যে, ইহার দ্বারা যে মতিচ্ছন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে, তাহা আমাদের জাতীয়তার পক্ষে কখনও মঙ্গলজনক হইবে না, হইতে পারে না। যে আদর্শ ধরিয়া আমরা এতদিন চলার পথে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, সে আদর্শ পরিত্যাগ করিবার যুক্তিযুক্ত কারণ যতক্ষণ পাওয়া না যাইতেছে, ততক্ষণ কোনও বাঙালী ইহাতে সম্মত হইবে না।

সম্প্রতি ডাঃ জেঙ্কিন্‌স্ এক সভায় বলিয়াছেন যে, Secondary Education in Bengal is in a chaotic condition, মাধ্যমিক শিক্ষা ঘোর বিশৃঙ্খলাময় অবস্থায় উপনীত। বাস্তবিক কি তাই। ইহার জবাব একমাত্র বাঙলাদেশের শিক্ষকেরাই দিতে পারেন। কারণ যাঁহারা স্কুলের শিক্ষক, স্কুলের সঙ্গে পরিচয় তাঁহাদের যতখানি ঘনিষ্ঠ, সাহেবের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। আমাদের দেশের অবস্থা ইংলণ্ডের মত নহে। আমরা গরীব, অনন্যোপায়, কিন্তু শিক্ষার জন্য আমাদের আগ্রহের অন্ত নাই। কুঁড়ে ঘরে আমাদের ছেলেরা থাকে, কুঁড়ে ঘরে তাহাদের স্কুল বসে, শিক্ষকেরা আধপেটা খাইয়া তাহাদের শিক্ষা দেন। ডাঃ জেঙ্কিনস্ মোটা মাইনের সরকারী কর্মচারী। কাজেই এই সকল ব্যবস্থা দেখিলেই তিনি চমকিত হন। তিনি আমাদের হিতের জন্য স্কুলের সংখ্যা কমাইয়া দিতে বলিয়াছেন—মাদ্রাজে ৩৯২টি স্কুল আছে, বাঙলাদেশে ১৩০০। মাদ্রাজ যদি ৩৯২টি স্কুলেই চালাইতে পারে, তাহা হইলে বাঙলাদেশে ঢের কম স্কুলে চলা উচিত, এই তাঁহার মত। অথচ আর একটি বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, সংবাদপত্রের মারফতে তাঁহার প্রভুও বলিয়াছেন যে, স্কুলের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় নহে। কিন্তু আইনের পাণ্ডুলিপির মুখবন্ধেও ঐ কথা আছে দেখিতেছি যে, বাঙলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার planningএর অভাব ঘটিয়াছে। ইহার সহজ অর্থবোধ হয় এই একই জায়গায় ২।৩টি স্কুল আছে, আবার তার ৩।৪ মাইলের মধ্যে হয়ত একটিও স্কুল নাই। অতএব গোবিন্দপুরের তিনটি স্কুল ভাঙ্গিয়া একটিকে চালান করা হইবে রসুলপুরে, আর একটিকে লইতে হইবে পাথরঘাটায়। বেশ ব্যবস্থা! কিন্তু ঐ রসুলপুরে এবং পাথরঘাটায় ছেলে আসিবে কোথা হইতে? শিক্ষক থাকিবেন কোথায়? স্কুলের বাড়িঘর আসবাবপত্রই বা কেমন করিয়া জোগাড় হইবে। কারণ যাঁহারা গোবিন্দপুরে তিনটি স্কুল করিয়াছেন, তাঁহাদের বাড়িঘর ভাঙ্গিয়া লইয়া ত রসুলপুরে চালান করা হইবে না। যাহারা ঐ স্কুলগুলি গড়িয়াছে, তাহাদের উৎসাহ, তাহাদের অর্থ বাদ দিয়া কি প্রকারে স্কুল হইতে পারে, তাহা ত বুঝি না।

স্বীকার করি যে, পাড়াগাঁয়ের দলাদলিতে কতকগুলি ক্ষীণ-

জীবী স্কুল অকারণে আবির্ভূত হইতেছে, কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে দলাদলি মিটাইয়া দুইটি স্কুলকে মিলাইয়া দিবে কে? বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যাঁহারা সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁহারা জানেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণপাত চেষ্টা অনেক স্থলে ব্যর্থ হইয়া যায়। মাননীয় ফজলুল হক সাহেব জানেন যে, তাঁহার চেষ্টাও কোনও কোনও স্থলে সফল হয় নাই। আমার মনে হয়, বোর্ডের দ্বারাও এ বিষয়ে অধিকতর সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই। ইহার একমাত্র প্রতিকার হইতে পারে, যদি প্রতি জেলায় এক একটি শিক্ষাসমিতি স্থাপিত হয় এবং তাহার স্থানীয় অবস্থাজ্ঞানসম্পন্ন নিরপেক্ষ সদস্যেরা যদি চেষ্টা করেন, তবেই দলাদলি, রেষারেষি মিটিতে পারে এবং বিলের সংকল্পিত planning কথঞ্চিৎ সম্ভব হইতে পারে। অন্যথা আরব্যোপন্যাসের গুপ্ত অর্থভাণ্ডারের চাবি যদি বোর্ডের হস্তে পতিত হয়, তবেই এই দুর্বোধ্য প্ল্যানিং নামক রহস্যের একটা কুল-কিনারা হইতে পারে। সরকারী অর্থভাণ্ডার অফুরন্ত নহে। করভারপীড়িত প্রজাদের অর্থ শোষণ করিয়া এমন বাবুয়ানাও চলিতে পারে না। একটি কি দুইটি কলেজ বজবজে লইয়া ফেলা হয়ত বা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু বাঙলাদেশের সমস্ত মাধ্যমিক শিক্ষার সম্বন্ধে বজবজ্ নীতি কখনও প্রযুক্ত হইতে পারে না।

ডাঃ জেন্‌কিনস্ ইহার মধ্যে আর একটি চাল চালিতেছেন। এই বিলের প্রতিবাদকারীরা একবাক্যে বলিতেছেন যে, বিলে শিক্ষকদের বেতন ও উন্নতি সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থার আভাস মাত্রও নাই। এইজন্য তিনি তাঁহার কয়েকটি বক্তৃতায় শিক্ষকদের বেতন সম্বন্ধে অনেক আশা ভরসা দিতেছেন। তাঁহার চুঁচড়া বক্তৃতায় তিনি বলিতেছেন, শিক্ষকদের বেতন ৬০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা হওয়া উচিত। বুভুক্ষু শিক্ষকরা এই আশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। বঙ্গদেশে শিক্ষকদের মাহিনা এখন গড়ে ৩০৲। সে ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে হইবে—মাহিনার নিম্নহার হইবে ৬০৲। কিন্তু টাকা দিবে কে? স্কুল দিবে কি? অর্থাৎ যে স্কুলে শিক্ষকদের বেতন ৬০৲ টাকার কম, সে স্কুলকে প্রস্তাবিত মাধ্যমিক বোর্ড অনুমোদন (Recognition) প্রদান করিবেন না। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে অনেক স্কুলই কাৎ হইবে। যদি ছেলেদের বেতনের হার বাড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেও ঐ একই ফল হইবে। অর্থাৎ অধিকাংশ অভিভাবক এই ব্যয়ভার বহন করিতে পারিবেন না, তাঁহাদের ছেলেরা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইবে। হিন্দুর ছেলেরাও পড়িতে পাইবে না, মুসলমানের ছেলেরাও পড়িতে পাইবে না; স্কুল উঠিয়া যাইবে। শিক্ষকেরা এখন যাহাও বা পাইতেছেন, তাহাও পাইবার সম্ভাবনা ঘুচিয়া যাইবে।

সরকার এত টাকা দান করিবেন গরীব শিক্ষকদের প্রতি দরদ বশত একথাও স্বতঃসিদ্ধভাবে মানিয়া লওয়া যায় না। কিছু দিন আগে আমাদেরই একজন মন্ত্রী প্রভাসচন্দ্র মিত্র স্যাডলার কমিশনের মন্তব্য মোতাবেক বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার ফল কি হইয়াছে শিক্ষকদিগকে জিজ্ঞাসা করুন। তাঁহারা সকলেই জানেন, যে অল্প কয়েকটি স্কুলের বেতনের টাকা পিছু দুপয়সা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, সে সব স্কুলেও অনেক শিক্ষক এ সুযোগ পান না টাকার অভাবে। আমি একজন শিক্ষাব্রতী হিসাবে এই কথা বলিতে চাই যে, যদি সত্যই শিক্ষকদের উন্নতি করা তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত হয়, তবে এখনই কিছু করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দাও না? তাহা হইলে তোমাদের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে কাহারও মনে দ্বিধা হইবে না। এখনকার দিনে সাহেবের উক্তি বেদবাক্য বলিয়া কে মানিবে? অবশ্য এমন যুক্তি কখনও গ্রাহ্য হইতে পারে না যে, বোর্ড হইলে টাকা বন্যার মত ভাসিয়া আসিবে, আর যতক্ষণ বোর্ড না হইতেছে ততক্ষণ কিছুই হইবে না।

আমি প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরূপে বঙ্গদেশের স্কুলের অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া আসিতেছি, দুইটি প্রধান ডিভিশনেও আমি পরিদর্শকরূপে কার্য করিয়াছি, সর্বোপরি আমার ছেলে-মেয়েরা বিভিন্ন স্কুলে পড়ে। কাজেই আমার অভিজ্ঞতা ডাঃ জেনকিনসের অপেক্ষা কম নহে। তবে সাহেবের মস্তিষ্কের উদ্‌ভাবনী প্রতিভা আমি কোথায় পাইব? তাঁহার দেশও আমি কিছু কিছু দেখিয়া আসিয়াছি। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষকদের যে সভা বা association আছে, তাহা এত বৃহৎ যে পার্লামেণ্টের সনন্দ লাভ করিয়াছে। সেই সভার প্রবেশিকা ৩ গিনি; প্রত্যেক শিক্ষক-সভ্যকেই দিতে হয়। ইহার সভ্য-সংখ্যা ১৯৩৬ সালে ছিল ১৮ হাজার! আমাদের দেশের শিক্ষকরা কি ইহা কল্পনায়ও আনিতে পারেন? এই গরীব দেশে সে সকল সুযোগ ও সুবিধা কল্পনারও অতীত। এদেশের অবস্থা যাঁহারা ভাল করিয়া না জানেন, তাঁহাদের হস্তে আমাদের শিক্ষার planning-এর ভার অর্পণ করিলে এইরূপ নানা উদ্‌ভট কথা শুনিতে হইবেই।

ইহা বলা বাহুল্য যে, আমাদের দেশের সর্বপ্রধান অভাব অর্থ। অর্থ নাই বলিয়াই আমাদের স্কুলের অবস্থা মলিন, শিক্ষকেরা দীনাতিদীন, শিক্ষা সৌকর্য-বিহীন। অর্থ না দিতে পারিলে কোনও উন্নতি সম্ভবপর হয় না। সুতরাং আমাদের বর্তমান শিক্ষাতন্ত্রকে গালাগালি দেওয়া নিরর্থক। আমরা স্বীকার করি আমাদের শিক্ষাতন্ত্রে অনেক গলদ আছে। কিন্তু সে কি শুধু মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে? প্রাথমিক শিক্ষাই কি সুব্যবস্থিত হইতে পারিয়াছে? নিরক্ষরতা কমাইবার জন্য সরকার এ পর্যন্ত কিছু কি করিতে পারিয়াছেন? মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য আইন করিবার পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় করিলে হইত না? সুতরাং ব্যাপার দাঁড়াইতেছে এই, লোকেরা তাহাদের প্রয়োজনমত ব্যবস্থা করিয়া লউক, সরকার শুধু এই শিক্ষাপ্রণালীর উপর প্রভুত্বের প্রলেপ দিয়া সকল ক্ষত আরোগ্য করিয়া দিবেন। বিলের এই এক উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনও সার্থকতা দেখিতে পাই না। এখনকার মাধ্যমিক শিক্ষায় কোনও প্ল্যান নেই, অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা অবস্থা (chaotic) অতএব শীঘ্রই আইন করিয়া তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা ও সুন্দরভাবে সজাইয়া (planning) তোলা দরকার। কিন্তু বিনা পয়সায় সে কার্যটি কেমন করিয়া হইতে পারে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। তাই আমাদের প্রাণে সংশয় ঘনাইয়া উঠিতেছে। অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তোলা কারো পক্ষে সাধ্য নয়। একটি কথা মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছে—টাকার কি আর অভাব হইবে? এখন ২৫ লক্ষ টাকা দিবার কথা হইয়াছে, কিন্তু একবার শাসনভার বোর্ডের হস্তে সমর্পণ কর, তখন আরও টাকা আসিবে। কিন্তু এইসব ফাঁকা কথায় আমাদের মন সায় দেয় না। টাকা কিভাবে পাওয়া যায়, তাহাত আমাদের অজানা নেই। যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতে পারিলে সকলেই তাহা মাথা পাতিয়া লইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে পড়িয়া মাধ্যমিক শিক্ষা যদি অসন্তোষজনক হইয়া থাকে, তবে বর্তমান অর্থকৃচ্ছ্রতার সংকটে দোষ ত্রুটিগুলি যথা সম্ভব সংশোধন করিয়া লইলেই হয়। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য বলিয়া আমার সাক্ষ্য হয় ত গ্রাহ্য হইবে না, কিন্তু অভয় দিলে আমি বলিতে পারি যে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান যে গলদ তাহা গভর্নমেণ্টের সৃষ্টি। এখনও

গণতন্ত্রে গঠিত সরকারের মনোবৃত্তি ঠিক আগেকার আমলাতন্ত্রের মতই আছে। জেলার ম্যাজিস্ট্রেটই মাধ্যমিক শিক্ষার হর্তাকর্তা—শিক্ষা বিভাগ তাঁর তাঁবেদার। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষা বিভাগের যাহা কিছু সংঘর্ষ তাহা এখানেই। বর্তমান পরিস্থিতি সেই জন্যই অসন্তোষজনক, ইহা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে চাই। জনমতের প্রতিনিধি মন্ত্রিমণ্ডলী কি এ সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থাই করিতে পারেন না? জেলার ম্যাজিস্ট্রেট নির্ভর করেন পুলিশের উপর, শিক্ষা বিভাগ নির্ভর করেন ম্যাজিস্ট্রেটের মধুর ইচ্ছার উপর। এই নিয়মই চলিতেছে। কর্তৃত্বের জন্য যদি এত স্পৃহা থাকে, তবে শিক্ষামন্ত্রী কি সাহস করিয়া পুলিশের এই কর্তৃত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করিতে পারেন না? এখন বোর্ড যেরূপ-ভাবে গঠিত হইবে, তাহাতে সরকারী প্রভাব অনেক বেশি থাকিবে নিশ্চয়। সুতরাং শিক্ষা বিভাগ ও বোর্ডের মধ্যে আর কোনও সংঘর্ষ থাকিবে না। উভয়ে একযোগে পুলিশনীতি প্রয়োগ করিবেন বিদ্যালয়গুলির উপর, আমার ইহাই অনুমান হয়। ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান-প্রধান বিদ্যালয় উভয়েরই স্বাধীনতা খর্ব হইবে।

কিন্তু ব্যবস্থা পরিষদে, সেনেটে এবং অন্যত্র দেখিতেছি মুসলমান বন্ধুগণই এই বিলের সমর্থনকারী। প্রথম হইতেই এই বিলকে বেষ্টন করিয়া সাম্প্রদায়িক কলহ জাগ্রত করিবার চেষ্টা হইতেছে। আমরা শিক্ষকমণ্ডলী কখনও এই সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার সমর্থন করি নাই। আমার দীর্ঘ শিক্ষক জীবনে কখনও ভেদবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হই নাই এবং আমার কোনও সহকর্মীকে সেরূপ হইতে দেখি নাই। হিন্দু মুসলমান ও অনুন্নত জাতির ছাত্রগণ সমান অধিকারে অধিকারী, আমাদের স্নেহ-প্রীতির ধারা তুল্যরূপেই তাহাদের উপর বর্ষিত হয়। যোগ্যতার পুরস্কার ও অযোগ্যতার তিরস্কার করা হয়—ইহা ব্যতীত অন্য কোনও বৈষম্য দেখি নাই। সুতরাং আমরা সাম্প্রদায়িক রেষারেষির সমর্থন করিতে যাইব কেন? আমরা মনে করি হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক, শিক্ষার উদার দরবারে কাহারও আসন উচ্চে বা কাহারও আসন নিম্নে হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। যোগ্যতা, পরিশ্রম এবং শ্রদ্ধাই একমাত্র মানদণ্ড। আমরা যে ত্রিবর্ণ পতাকা বহন করি, তাহা সত্য শিব ও সুন্দরের স্বর্গীয় বর্ণ-বিভায় উদ্ভাসিত। এই পতাকার তলে আমরা শিক্ষক সমাজ সকলকেই চিরদিন সমানভাবে আহ্বান করি।

আমরা মনে করি সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির মত আত্মঘাতী নীতি আর নাই। শিক্ষার পক্ষে ত আত্মঘাতী বটেই, জাতীয়তার পক্ষে, দেশাত্মবোধের পক্ষেও এই ভেদবুদ্ধি আত্মঘাতী। এই নীতির বিষময় ফল এখনই ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে—এখনও কিন্তু বিল আইনে পরিণত হয় নাই। স্কুলের হিন্দু শিক্ষকদিগকে সরাসরিভাবে সরাইয়া দিয়া তাঁহাদের স্থলে মুসলমান শিক্ষক নিযুক্ত করিবার অন্যায় চেষ্টার সংবাদ কোনও কোনও স্থান হইতে পাওয়া যাইতেছে। সেদিন এক মুসলমান ভদ্রলোক বিশ্ববিদ্যালয়ে কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন, কোনও একটি বিশেষ কেন্দ্রে মুসলমান ছাত্র হিন্দু ছাত্র অপেক্ষা বেশি সংখ্যায় ফেল করিয়াছে কেন? কোনও কোনও স্কুল ও কলেজে সরস্বতী পূজা লইয়া হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইতেছে তাহা আর গোপন করিলে চলিবে না। আগে ত কখনও এমন হয় নাই। আপনারাও হয়ত জানেন যে স্থানীয় কলেজে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের মধ্যে সদ্ভাবের বিলক্ষণ অভাব ঘটিতেছে এমন সব ব্যাপার লইয়া যাহা শিক্ষার সীমানার মধ্যে পড়ে না। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা জাতীয়তার মূর্ত-আদর্শ অশ্বিনীকুমারের অমর আত্মা কি ইহাতে ক্ষুব্ধ, ব্যথিত হইবে না? অবশ্য আমার ভুল হইতে পারে, কিন্তু আপনারা একটু অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবেন যে স্কুল কলেজের আবহাওয়া দ্রুতবেগে প্রীতি ও শান্তির পরিপন্থী হইয়া উঠিতেছে এবং শিক্ষাবিধান অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। ইহার জন্য কে দায়ী, সে কথা একবার একটু চিন্তা করা উচিত নয় কি? যাঁহারা শিক্ষার পবিত্র মন্দিরে ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় দিয়া আকাশ বাতাস বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহারা দেশের শত্রু নয় ত কি বলিব?

আজকাল পাঠ্য পুস্তকের কথা ভাবিলে অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয়। ইতিহাস পড়ানো একরূপ অসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। অন্ধকূপহত্যা না হয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে অর্ধচন্দ্র লাভ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল, কিন্তু সত্যের মাপকাঠি কি এই? ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়িবার সময় আমাদের ছাত্রেরা যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া পড়ে, তাহাদের নিজের দেশের ইতিহাস সেভাবে পড়িতে পারিবে না কেন? ইংলণ্ডের ইতিহাসে ছেলেরা এলিজাবেথের চরিত্র, স্কটল্যাণ্ডের রাণী মেরীর চরিত্র, দ্বিতীয় চার্লসের চরিত্র যে সত্যদৃষ্টিতে আলোচনা করে, ভারতের ইতিহাস পঠন-পাঠনে সে নীতির ব্যতিক্রম করিতে হইবে। সত্যকে মনোমত সাজ পরাইয়া ছাত্রদিগকে পরিবেশন করিতে হইবে। সত্য নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করা ইতিহাসের কর্তব্য। সত্য-সন্ধিৎসা হইতে বঞ্চিত হইলে তাহাকে ইতিহাস বলিব না উপন্যাস বলিব? কথা এই যে, সত্যকে অন্য কোনও ধারণার দ্বারা বিকৃত করিলে আমাদের ছাত্রেরা কি সেই সত্যানুরাগ, সেই সত্যনিষ্ঠা শিখিবে যাহা জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ? ফরমাইসী ইতিহাস পড়ানো অপেক্ষা আমার মতে পাঠ্য তালিকা হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাস নির্বাসিত হওয়া ভাল। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার শিরায় ইহুদী রক্ত আছে বলিয়া জার্মানীতে তাঁহার এই নববিজ্ঞান 'ইহুদী বিজ্ঞান' নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু সেখানেও হিটলারের নাৎসী বাহিনী তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই। তাহারা বরং ডাঃ ফিলিপ লেনার্ড ও জোহানেস্ ষ্টার্ক (Nobel Laureate) নামক দুইজন জার্মান অধ্যাপককে লাগাইয়া দিয়াছে—ইহুদী পদার্থবিদ্যার অসারতা প্রমাণ করিতে। কোনও স্থলে ঐতিহাসিক সত্য পছন্দসই না হইলে তাহার সত্যাসত্য নির্ধারণ করিতে যে কোনও চেষ্টা করা যায়, তাহাতে কেহই মানা করিবে না। কিন্তু সত্যকে ছাঁটিয়া কুঁদিয়া মানানসই করিলে তাহা আর সত্য থাকে না।

আমাদের সাহিত্য একটি অমূল্য সম্পদ। বহু শতাব্দীর সাধনায় ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে; ইহা আমাদের জাতীয় উন্নতির মানদণ্ড স্বরূপ। আমাদের সাহিত্যই জগতের নিকট আমাদিগকে পরিচিত করিয়া দিয়াছে। সুতরাং ইহাকে বিকৃত করিলে বড়ই ব্যথা লাগে। কিন্তু সাহিত্যের রূপ বদলাইয়া দিবার জন্য হঠাৎ এক নূতন প্রচেষ্টার আবির্ভাব হইয়াছে। বিল আইনে পরিণত হইলে এই চেষ্টাই আরও ব্যাপকভাবে হইবে বলিয়া আমাদের মনে আশঙ্কা হইতেছে। যেরূপভাবে পাঠ্য নির্বাচন সমিতির কাঠামো বিলে নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় ২০ বৎসর মধ্যে বাঙলা ভাষার শোচনীয় রূপান্তর ঘটিবে। এখনই তাহার যে সকল নমুনা পাওয়া যাইতেছে, তাহা প্রকৃতই বিস্ময়জনক। সাহিত্যে জল না লিখিয়া পানি লিখিলে আর কিছু ক্ষতি হয় না, সাহিত্য আর জল-চল থাকে না। বাঙলা ভাষা যে কারণেই হউক, সংস্কৃত ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। আবশ্যকমত অন্য ভাষার শব্দও সময়ে সময়ে বাঙলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু সে ত জোর করিয়া নহে। জোর করিয়া কতকগুলি শব্দ কোনও ভাষার মধ্যে প্রবেশ করাইতে গেলে সে ভাষার প্রতিভা খর্ব করা হয়, গতি ব্যাহত করা হয়, পবিত্রতা নষ্ট করা হয়। যুগযুগান্তের

(শেষাংশ ১০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ছদ্মবেশী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

পুরাতন বালীগঞ্জের একটা অভিজাত পল্লীতে অবনীশ মিত্রের বাড়ি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উদ্ভিদ বিদ্যায় এম-এস্ সি পাশ করিবার কয়েক বৎসর পরে উচ্চতর শিক্ষা-লাভের জন্য সে এডিনবরায় গিয়াছিল। তথা হইতে উক্ত বিদ্যায় পি এইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছে।

দেশে ফিরিবার দিন পনেরোর মধ্যে অবনীশ কোনো আত্মীয় গৃহে শ্রীমতী সুলেখা দত্তের প্রথম দর্শন লাভ করে; এবং সেই প্রথমদর্শনজাত অতিবলিষ্ঠ দ্রুতগতিশীল প্রেম অচিরাৎ বর্ধিত হইয়া বিবাহ-বন্ধনে পরিসমাপ্ত হয়। সে অতি অল্প দিনের কথা।

সুলেখার পিতা কলিকাতার একজন নামজাদা ধনী ব্যক্তি। মনোমত জামাতা পাইয়া বিশেষ সমারোহের সহিত তিনি কন্যার বিবাহ-কার্য সম্পন্ন করেন, কিন্তু তথাপি বিবাহোৎসব সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা লাবণ্যর স্বামী প্রশান্তকুমার ঘোষ এলাহাবাদ হাই-কোর্টের একজন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার। সুলেখার বিবাহের সময়ে লাবণ্যর একটি বালক পুত্র গুরুতরভাবে পীড়িত ছিল বলিয়া লাবণ্য অথবা প্রশান্ত কেহই কলিকাতায় আসিয়া বিবাহে যোগদান করিতে পারে নাই। সেই দুঃখ যথাসম্ভব লাঘব করিবার অভিপ্রায়ে তাহারা অবনীশ এবং সুলেখাকে সনির্বন্ধে এলাহাবাদে নিমন্ত্রণ করিয়াছে।

প্রশান্তকুমার লিখিয়াছে,—'এখনও এক মাসও হয় নাই তোমাদের বিবাহ হইয়াছে। সম্মুখে বড়দিনের ছুটি। তোমরা দুজনে যদি অবিলম্বে চলিয়া আসিয়া এখানে মধু-যামিনী যাপনের ব্যবস্থা কর তাহা হইলে বড়দিনের কয়েকটা ছুটির দিনকে সত্যই বড় করিয়া তোলা যায়।'

লাবণ্য সুলেখাকে লিখিয়াছে,—'লক্ষ্মী ভাই সুলেখা, অবনীশের সঙ্গে তুই এখানে চলে আয়। তোরা এলে কি আনন্দ যে হবে তা কি আর বলব! তোর বিয়ে দেখতে না পাওয়ার দুঃখ অনেকটা তা হলে কমবে।'

প্রশান্ত এবং লাবণ্য দুজনেরই চিঠিতে সানুনয় এবং পৌনঃপুনিক অনুরোধ।

প্রস্তাবটা অবনীশ এবং সুলেখার ভালই লাগিল। নব-পরিচয়ের যে নূতন প্রেমে সম্প্রতি উভয়ের হৃদয় আপ্লুত হইয়া রহিয়াছে, আত্মীয়চক্ষুর অন্তরালে যাইতে পারিলে তাহা খানিকটা অবাধ হইবার সুযোগ লাভ করে। ভায়রাভাই এবং ভগ্নীপতির গৃহও অবশ্য আত্মীয়েরই গৃহ; কিন্তু যেখানে বাধা লঙ্ঘন করিলে বিশেষ একটা গুরুতর অপরাধ হয় না, সেখানকার বাধা মানিয়া চলারও একটা আনন্দ আছে। এলাহাবাদ যাওয়া একপ্রকার স্থির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময়ে বেড়াইতে আসিল সুলেখার দাদা হরিপদ।

হরিপদ বলিল, "এলাহাবাদ থেকে প্রশান্তর আজ এক চিঠি পেলাম। তোমাদের দুজনকে তাগিদ দিয়ে এলাহাবাদে পাঠাবার জন্যে বিশেষ করে আমাকে লিখেছে।"

সুলেখা বলিল, "আজ আমরাও দিদির আর জামাইবাবুর চিঠি পেয়েছি দাদা। আমাদেরও বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন।"

অবনীশ বলিল, "আমাদের খুব বেশি তাগিদ দেবার আপনার দরকার হবে না দাদা। এলাহাবাদে যাওয়া আমরা একরকম স্থির করেই ফেলেছি।"

হরিপদ বলিল, "খুব ভাল কথা। একটা পর্ব তা হলে সহজেই শেষ হ'ল। কিন্তু আর একটা কথা যে তারা লিখেছে তার জন্যে একটু চিন্তিত হয়েছি।"

সকৌতূহলে অবনীশ বলিল, "কি কথা দাদা?"

হরিপদ বলিল, "একজন ভাল বাঙালী ড্রাইভার পাঠাবার জন্যে লিখেছে। তাদের দুখানা গাড়ী, কিন্তু ড্রাইভার একজন। একজন ড্রাইভারে সময়ে সময়ে অসুবিধে হয়, তাই এবার থেকে দুজন ড্রাইভার রাখবে স্থির করেছে। তা ছাড়া, যে ড্রাইভার আছে বড়দিনের ছুটিতে সে বাড়ি যাবে। এদিকে তোমরা সেখানে গেলে তোমাদের নিয়ে লম্বা লম্বা দৌড় দেবার মতলবও আছে। সেই জন্যে দু'তিন দিনের মধ্যে একজন ভাল ড্রাইভার পাঠাবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে।"

অবনীশ বলিল, "ড্রাইভার পেয়েছেন?"

হরিপদ বলিল, "অত ফরমাশি ড্রাইভার কি একদিনেই পাওয়া যায়? তাই ভাবলাম তোমাকেও একটু সন্ধান রাখবার জন্যে বলে যাই।"

সুলেখা বলিল, "কার্ত্তিকের ভাইকে পাঠিয়ে দাও না দাদা, সে ত' মাঝে মাঝে আমাদের গাড়ি চালিয়েছে। মন্দ চালায় না ত?"

কার্তিক হরিপদর ড্রাইভারের ছোট ভাই।

হরিপদ বলিল, "কার্ত্তিক শুধু গাড়ি চালাতেই জানে, লেখাপড়া ত' আর জানে না। তা ছাড়া, কলকাতায় তার পাকা চাকরি হয়েছে; সে চাকরি ছেড়ে বিদেশে যাবে কেন?"

ঈষৎ বিস্ময়ের সুরে অবনীশ বলিল, "ড্রাইভারের অত লেখাপড়া জেনে কি হবে দাদা?"

সহাস্যমুখে হরিপদ বলিল, "তবে আর ফরমাসি বলছি কেন? সদ্বংশের সন্তান হওয়া চাই; ভাল গাড়ি চালাতে জানা চাই; তা ছাড়া, পেটে লেখাপড়ার বিদ্যেও কিছু থাকা চাই। প্রয়োজন মত গাড়ি চালাবে, আর অবসর মত ওদের পাঁচ বছরের মেয়ে দীপুকে কিছু লেখাপড়া শেখাবে। অবশ্য

উপযুক্ত লোক হলে তারা আশী টাকা পর্যন্ত মাইনে দিতে রাজি আছে। তা ছাড়া, খাওয়া পরা থাকা।"

সুলেখা বলিল, "একটু চেষ্টা করলে এমন লোক পাওয়া শক্ত হবে না দাদা। রাণী দিদিদের ড্রাইভারের ত' পঞ্চাশ টাকা মাইনে; অথচ বামুনের ছেলে, বি-এ পাশ।"

গম্ভীর মুখে অবনীশ বলিল, "কতকটা এমনি একজন লোক আমার সন্ধানে আছে দাদা। আপনিও তাকে জানেন।"

সকৌতূহলে হরিপদ বলিল, "কে, বল দেখি?"

অবনীশ বলিল, "ডক্টর অবনীশকুমার মিত্র, এম-এস সি ক্যাল, পি এইচ-ডি এডিন্।"

অবনীশের কথা শুনিয়া হরিপদ উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। সুলেখার ওষ্ঠাধরেও মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল।

কথাটা বলিবার সময়ে হয়ত' অবনীশও পরিহাসের ছলেই বলিয়াছিল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে কথাটা অলঘু হইয়া উঠিল। অনুনয়ের কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "এর ব্যবস্থা আপনি নিশ্চয় করে দিন দাদা। বড়দিনের ছুটিতে বেশ চমৎকার একটা প্রহসন হবে, তা ছাড়া ফাঁকতালে কিছু টাকাও কামিয়ে নেওয়া যাবে। আর ভয়েরও কোনো কারণ আপনার নেই। আমি যে সত্যিসত্যিই একজন ভাল ড্রাইভার, তার প্রমাণ ত আপনাকে কয়েকবার দিয়েছি। তা ছাড়া—"

অবনীশকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া সুলেখার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া সহাস্যমুখে হরিপদ বলিল, "তা ছাড়া, পেটেও কিছু বিদ্যে আছে।"

অবনীশ বলিল, "হয়ত' আছে।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া হরিপদ বলিল, "ভাল করে অভিনয় করতে পারলে প্রহসনটা অবশ্য মন্দ হবে না। কিন্তু যা করতে হয় প্রশান্তর দরওয়ানের লাঠি থেকে মাথাটা বাঁচিয়ে তারপর কোরো। প্রশান্তরও বন্দুক আছে সে কথাও ভুলে থেকো না।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

অবনীশ বলিল, "কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না দাদা, প্রহসনটা শেষ পর্যন্ত প্রহসনই হবে, ট্র্যাজেডি হবে না।"

হরিপদ বলিল, "প্রহসনের শেষাঙ্ক বোধ হয় আমারও উপভোগ করা চলবে। আমাকেও তারা যেতে লিখেছে। কিন্তু আমার যেতে ২৪শে ডিসেম্বরের আগে নয়।"

হরিপদর কথায় অতিশয় খুসি হইয়া অবনীশ বলিল, "আপনি না যাওয়া পর্যন্ত প্রহসন আমি চালু রাখব, এ আপনি নিশ্চয় জানবেন।"

হরিপদ প্রস্থান করিলে সুলেখা বাঁকিয়া বসিল। বলিল, 'তুমি আমার পাঁচ ছ' দিন আগে চলে যাবে; তারপর এলাহাবাদে পেঁছেও হয়ত দু তিন দিন তোমাকে অধিকাংশ সময় ছেড়ে থাকতে হবে, এ কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগছে না।"

অবনীশ বলিল, "কিন্তু এলাহাবাদের সেই দু তিন দিন ছেড়ে থাকার আনন্দে সব দুঃখ পুষিয়ে যাবে সুলেখা। এক বাড়িতে এক গাড়িতে কাছাকাছি আছি অথচ পাশাপাশি হতে পারছিনে, মাঝে মাঝে লুকিয়ে চুরিয়ে চোখে চোখে চাওয়া-চায়ি, মুখে মুখে হাসা-হাসি, কখনো সখনো বা কানে কানে চুপি চুপি গুনগুনোনি, তার আস্বাদ একেবারে স্বতন্ত্র। এই যে প্রতিদিনকার সহজে এক সঙ্গে থাকা, অবাধে কথাবার্তা কওয়া, এর চেয়ে সে অনেক মিষ্টি।"

চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া সুলেখা বলিল, "আর শীতের এই লম্বা লম্বা রাত্রি ছাড়াছাড়ি হয়ে কাটানো?—আমি থাকব দোতলার ঘরে, আর তুমি থাকবে একতলার গ্যারাজে,—সেও খুব মিষ্টি।"

স্মিতমুখে অবনীশ বলিল, "বেশ ত, দোতলার ঘর থেকে একতলার গ্যারাজে নেমে এসে তুমি যদি তাকে মিষ্টি না করতে পার, তা হলে আমিই না-হয় এক-আধদিন একতলার গ্যারাজ থেকে দোতলার ঘরে উঠে গিয়ে মিষ্টি করব।"

অবনীশের কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়া সুলেখা বলিল, "ছি, ছি! বোলোনা ও কথা!"

"কেন, তাতে অন্যায় কি আছে? আসল স্বামী স্ত্রী যদি লুকিয়ে চুরিয়ে গোপনে মিলিত হয় তাতে ত' দোষের কিছু নেই।"

সুলেখা বলিল, "না, না, বাইরে থেকে যে ব্যাপারের চেহারা কুৎসিৎ, আসলে ভাল হলেও তা করা চলে না।"

সুলেখার কথায় চিন্তিত হইয়া অবনীশ বলিল, "আমার ভয় হচ্ছে সুলেখা, অভিনয় করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তুমি সমস্ত পণ্ড করে না দাও!"

সুলেখা বলিল, "ইশ্, তাই ত'! যদি করি ত' তোমার চেয়ে ঢের ভাল অভিনয় করব। জান?—আমি আমাদের কলেজের অভিনয়ে সোনার মেডল পেয়েছিলাম।"

অবনীশ বলিল, "আর জান?—এডিনবরায় আমি আমাদের কলেজের অভিনয়ে সোনার মেডেল পাইনি।"

অবনীশের কথায় দুইজনেই হাসিয়া উঠিল।

পরদিন অবনীশ প্রশান্তর চিঠির উত্তর দিয়া লিখিল,— আপনাদের স্নেহের আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করলাম। আমাদের দুজনের কিন্তু এক সঙ্গে যাওয়া হয়ে উঠবে না। একটা প্রয়োজনীয় কার্যে আমাকে তিন চার দিন পরে পাটনা যেতে হবে। সেখানকার কাজ সেরে চব্বিশে ডিসেম্বরের কাছাকাছি আমি এলাহাবাদে পেঁছিব। ইত্যবসরে সুলেখার যাওয়ার একটা সুবিধা হয়ে গেছে। আমার ছোট ভাই শশাংককে একটা সরকারী কাজ সংক্রান্ত ইন্টারভিউয়ের জন্য ২০শে ডিসেম্বর দিল্লীতে উপস্থিত হতে হবে। ১৯শে সকালে আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসে দিল্লী যাওয়ার পথে সে এলাহাবাদে সুলেখাকে নামিয়ে দেবে। তার একেবারে সময় থাকবে না, সুতরাং আপনারা অনুগ্রহ করে ষ্টেশনে এসে সুলেখাকে নামিয়ে নেবেন। এ বিষয়ে সুলেখা পরে যথাসময়ে আপনাদের তারে সংবাদ দেবে।

চিঠি শেষ করিয়া পাঠাইয়া দিয়া অবনীশ একটা ভাল দোকানে গিয়া তাহার নিজ দেহের মাপে উৎকৃষ্ট গরম বস্ত্রের একটা শোফারের পোষাকের জরুরী ফরমাস দিয়া আসিল।

তিন দিন পরে হরিপদর নিকট হইতে প্রশান্তর নামে

একটা চিঠি লিখাইয়া লইয়া, সুলেখা এবং হরিপদকে প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দিয়া, একটা সুটকেস ও একটা বেডিং লইয়া সে এলাহাবাদ রওনা হইল। বাড়িতে সকলকে বলিয়া গেল, পাটনা যাইতেছে।

শোফারের পোষাকটা গোপনীয় দ্রব্য ছিল, সুতরাং সুলেখাকেই সেটা সুটকেসের তলদেশে গোপনে ভরিয়া দিতে হইল। ভরিতে ভরিতে সুলেখা বলিল, "পাঁচ ছয় দিনের জন্যে এত খরচ করে এটা ত করালে—পরে এর কি গতি হবে?"

সহাস্যমুখে অবনীশ বলিল, "এলাহাবাদ থেকে ফিরে এসে তোমার জন্যে যে গাড়ি কিনব, এটা তার ড্রাইভারের পোষাক হবে।"

সুলেখা বলিল, "তোমার মাপে করিয়েছ, অপরের গায়ে হবে কেন?"

অবনীশ বলিল, "প্রথমে আমার দেহের আড়ার মত ড্রাইভার খুঁজে বার করবার চেষ্টা করব; যদি না পাই তখন নিজেই তোমার ড্রাইভার হব।"

বিদায়কালে সুলেখার মনটা বিষণ্ণ হইয়াই ছিল, তাহার উপর স্বামীর এই সোহাগ পরিহাসে তাহার দুই চক্ষু ভরিয়া জল উছলিয়া আসিল। (ক্রমশ)

সামরী

(৯৫ পৃষ্ঠার পর)

বুঝলে সেও চোখ খুলে কি বুঝে নেবার জন্যে কার্লেরই মত চুপ করে পড়ে রয়েছে।

শহরের চাপা কলরব,—দূর অদূরের মোটরের হর্ন শুধু ঘরের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দিচ্ছিল।

বিন্দুমাত্র শব্দ পাছে কোন রকম ঘনিষ্ঠতার ভাব মনে জাগিয়ে দেয় তাই অ্যানা মোজাতে হাত রেখেই চুপ করে পড়ে রইল। তারপর কার্লের ঘুমের নিশ্বাস যখন সে বুঝতে পারল —তখন সে ধীরে ধীরে মোজা খুলে পা ছড়িয়ে পাশ ফিরে শুলো।

কার্ল কতকাল এমন সুন্দর বিছানায় ঘুমাতে পায় নি। এই তিন মাসের অতিরিক্ত অনিয়মিত পরিশ্রমে তার শরীরের স্নায়ুগুলি সব সংকুচিত জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তার মাথার ভিতরে কত নদীর তীর,—কত প্রশস্ত চক্‌চকে জলতল, কত কঠিন পাহাড়, নিবিড় অরণ্য, সীমাহীন কত পথ, সুদূরের কত দৃশ্য, আশেপাশের কত ছোটখাটো দেখবার জিনিস কখনও বায়োস্কোপের ছবির মত পর্যায়ক্রমে কখনও একসঙ্গে কখনও ছিন্নভিন্নভাবে এসে দেখা দিয়ে আবার কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ তার কল্পনায় এল তার বাল্যকালের এক অভিনব দৃশ্য। কার্লের বয়স যেন বছর দশেক হবে। সে যেন তার বাপের সঙ্গে শহর থেকে বেরিয়ে পাড়াগাঁয়ের দিকে বেড়াতে চলেছে। রবিবারের সকাল। ক্ষেতের পর ক্ষেত পার হয়ে উঁচু পাহাড়ে ঘেরা একটা ছোট্ট পাড়াগাঁয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ক্রমে তারা গ্রামের সরাইখানাতে এসে পাশের একটা পুরানো গাছের নিচে এসে বসল। পাশেই ফুলে ভরা একটা বাগান। বুড়ো মালিটা এসে তাদের নমস্কার করে গ্রামের নির্জন পথে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। কার্লের বাপ তখন ওখানকার জমিদারের মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি আরম্ভ করে হঠাৎ তার হাত ধরে ফেললে।

কার্ল অমনি বলে উঠ্‌ল,—"ওকে ধর না তুমি, ও অ্যানা।" বাপ অমনি তার হাত গুটিয়ে নিলে।

সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের মেয়েটি কার্লের গলা ধরে এক গ্লাস দুধ তার দিকে এগিয়ে দিল। চোখে তার মায়ের মমতা।

কার্ল যেন বাঁচল। এক অপরূপ তৃপ্তি আর আনন্দের মধ্য দিয়ে তার ঘুম ভেঙে গেল।

অ্যানা তখন অকাতরে ঘুমুচ্ছে।

এক অভিনব দায়িত্বের ভাবে কার্লের হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠল। সে এক অপরূপ তৃপ্তি নিয়ে ঘুমন্ত নারীর রহস্যময় নিশ্বাস-ধ্বনি কান পেতে শুনতে লাগলো। ধন্যবাদ! জীবন তার আজ একেবারে ধন্য হয়ে গেছে। (ক্রমশ)



মনে ছিল আশা

(উপন্যাস—অনুবৃত্তি)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

(২৫)

সেদিন সারারাত্রি অমল ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিল না। উত্তেজিত চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে টুকরা টুকরাভাবে যেটুকু ঘুম হইল তাহাও কমলা, জ্যোৎস্না ও পারুলের স্বপ্নে ভরিয়া রহিল। কিন্তু পরের দিন অতৃপ্ত নিদ্রা লইয়া উঠিলেও তাহার কোন গ্লানি বোধ হইল না, কারণ চোখে তখন দস্তুর মত রং ধরিয়াছে।

সেদিন আর তাহাকে বাগানে মাঠে আশ্রয় লইতে হইল না। সে নানা কাজে ব্যস্ত হইয়া বাড়ীর মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং কল্পনা করিতে লাগিল যে, এই বাড়ীরই কক্ষে কক্ষে তাহার সুন্দরী বধূ নানা কাজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মুখে সলজ্জ হাসি এবং আনতদৃষ্টি, ক্ষণে ক্ষণে তাহার চোখের সহিত মিলিয়াই আবার নামিয়া যাইতেছে।

পারুলকে যে বিবাহের পরে খুবই সুন্দর দেখাইবে সে বিষয়ে আর তাহার সংশয়মাত্র ছিল না। যেটুকু খুঁত এখন চোখে পড়িতেছে তাহা বিবাহের পরে নিশ্চিহ্নভাবে ঢাকিয়া যাইবে, সে বিষয়েও সে নিশ্চিন্তই ছিল। জ্যোৎস্না ও কমলাকে তাহার চোখে সুন্দর লাগিয়াছে—সুতরাং এই কথাটাই ধরিয়া লইয়াছে যে, বিবাহের পরে সব মেয়েকেই সুন্দর দেখায়।

আসন্ন উৎসবের আভাসে বাড়ী মুখরিত। এই কয়টা দিন দারিদ্র্য তাহার ম্লান ছায়া লইয়া বিদায় লইয়াছে। বন্ধুবান্ধব কেহ তাহার নাই—এই গ্রামে যেসব বাল্যবন্ধু তাহার ছিল, তাহাদের কাহারও সহিত সে আর মিশিতে পারে না—এই অভাবটা মধ্যে মধ্যে পীড়া দিতে থাকিলেও অমল ভাই বোনদের লইয়াই মাতিয়া উঠিয়াছিল। হাস্য-পরিহাসের জোয়ার আসিয়াছিল, এমন কি হরনাথবাবুরও অথর্বতা যেন চলিয়া গিয়াছিল। আসন্ন বিবাহের আনন্দে পুঁটিও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার যে কৈশোর আসিয়াছে, একথাটা এই প্রথম অমল উপলব্ধি করিল। মোটের উপর সবটা মিলিয়া অমলের ভালই লাগিতেছিল।

জমিদারবাবুরা কুড়িটি টাকা দিয়াছেন, সরকারবাবুরা দিয়াছেন দশ টাকা। তবু হরনাথবাবু সরকারদের গদী হইতে পুরা একশ'টি টাকাই ধার লইলেন, বলিলেন, এমন আনন্দের দিনে অত টেনেটুনে চালাতে পারব না। না হয় দু-দশ টাকা বেশীই ধার হবে।

তাঁহার এক প্রাক্তন ছাত্র আধ মণ মাছ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, সেই ভরসাতে তিনি লোকও নিমন্ত্রণ করিয়াছেন বিস্তর। দুই দিনই যে পরিমাণ লোক খাইবে তাহাতে ঐ মাছ এবং একশ' ত্রিশ টাকায় কুলাইবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তবু অমল বাধা দিল না। তাহারও মন এই কয়দিনের জন্য যেমন সমস্ত দুর্ভাবনা ও দুঃখের উপরে উঠিয়াছে, উহারাও না হয় তেমনি ভুলুক অতীতের দুঃখ এবং ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা!

শনিবার রাত্রিও কাটিল খানিকটা হল্লা করিয়া এবং খানিকটা টুকরা টুকরা ঘুমে। অবশেষে শেষ রাত্রে তাহার পিসতুতো বোন সুহাস যখন দধিমঙ্গলের জন্য ডাকিয়া তুলিল তখন আর সে বিছানাতেও ফিরিয়া গেল না, প্রথম ঊষার অস্পষ্ট আলোতে মাঠ পার হইয়া নদীর ধারে গিয়া উপস্থিত হইল।

সেখানে পায়চারী করিতে করিতে কত কথাই তাহার মনে হইতে লাগিল। সেই প্রথম যৌবনে উন্নতির আশায় রাত্রের নিঃশব্দ অন্ধকারে গৃহ ত্যাগ, তাহার পর কলিকাতায় বিভিন্ন মেসে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অদৃষ্টের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ। সেদিনকার প্রতিটি দিনের সেই দারিদ্র্য ও উঞ্ছবৃত্তির কথা মনে পড়িলে আজও শিহরিয়া উঠে!... তাহার পর সেই সুদূর প্রবাসে যাত্রা করা—একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে মনে মনে বলিল, পারিলাম না, কিছুই করিতে পারিলাম না! এ জীবনে কোথাও কোন উন্নতি আমার অদৃষ্টে নাই। তাহার চেয়ে এই ভাল, পিতৃ-পিতামহের মত নিজের দারিদ্র্যের কাছে আত্মসমর্পণ করাই ভাল। এই সংসার, এই অভাব অনটনের মধ্য হইতেই যেটুকু মধু পাওয়া যায় সেইটুকুই ভাল......

বৃহস্পতিবার দিন অফিস হইতে বাহির হইয়া সে জ্যোৎস্নাকে একখানা চিঠি দিয়াছিল, তাহার বিবাহের কথাটা সে যে একটা অজ্ঞাত সঙ্কোচে তাহাকে জানাইতে পারে নাই তাহার জন্য ক্ষমা চাহিয়া তাহার শুভেচ্ছা প্রার্থনা করিয়াছিল। নিতান্তই একটা আকস্মিক আবেগের ফলে এই চিঠি লেখা—এবং সে জন্যও পরে তাহার লজ্জার অবধি ছিল না। জ্যোৎস্নার সহিত পত্র ব্যবহার করাও তাহার পক্ষে উচিত হইয়াছে কি না, এ প্রশ্নও মনে মনে খোঁচা দিতেছিল।

নদীর ধার হইতে আটটা নাগাদ বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, জ্যোৎস্নার নিকট হইতে উত্তর আসিয়াছে। ছোট চিঠি, আর তিনখানি দশ টাকার নোট।

চিঠিতে সে লিখিয়াছে—

মাষ্টার মশাই,

আপনার চিঠি পেয়ে যে কি আনন্দই হল, তা লিখে জানাতে পারব না। আপনি যে সেদিন আমার কাছ থেকে পালিয়েই গেলেন তা আমি বুঝেছিলুম, আর সেই জন্যে মনে একটু কষ্ট ছিল। কিন্তু এখন আপনার চিঠি পেয়ে সব গ্লানি ধুয়ে মুছে গেল। বুঝলুম যে আপনি আমাকে যথার্থই মার্জনা করেছেন, নইলে এ চিঠি দিতেন না।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনি এবার সুখী হোন—যথার্থ শান্তি পান। আপনাদের জীবন যেন নিষ্কণ্টক হয়।

একটি ভিক্ষা আছে। ত্রিশটি টাকা পাঠালুম, দয়া করে ভাল দুটো চুণী বসানো দুল তৈরী করে দেবেন আপনার বউকে। সে দুল দুটো যেন তিনি বারমাস পরেন। যখনই তিনি কাজকর্ম্ম করে বেড়াবেন, দুলগুলো নড়তে থাকবে আর সেই চুণীর লাল আভা তাঁর সুন্দর গালে পড়ে আরও

ভাল দেখাবে। তখন কি একবার মনে পড়বে না জ্যোৎস্নার কথা? বিয়ে করে ত আমাদের ভুলে যাবেনই, মনে করিয়ে দেবার জন্যে তাই এত ফন্দী।

বড় ভয় হচ্ছে কিন্তু আপনার জন্যে। যেমন আপনার, যিনি আসছেন তিনি তার হদিশ পাবেন ত? শান্তি দিতে পারবেন ত? কে জানে!

যাক—চিঠির জবাব দিতে বলব না, এমন কি, আবার আসবেন, একথাও বলব না। তবে সুদূর ভবিষ্যতে যদি কখনো কোন কারণে জ্যোৎস্নার কথা মনে পড়ে, তবে নিশ্চয় তার কাছে আসবেন, একটুও দ্বিধা করবেন না। এইটুকুই প্রার্থনা জানানো রইল।

নমস্কার নেবেন। ইতি—

আপনার জ্যোৎস্না।

অমল চিঠিখানি ও নোটগুলি সযত্নে জামার বুক পকেটে তুলিয়া রাখিল। জ্যোৎস্নার চিঠি পাইয়া আনন্দ হইল বটে; কিন্তু কোথায় যেন একটু বিষাদের সুরও বাজিতে লাগিল। কোথায় যেন একটা গোলমাল রহিয়াছে, সেই কথাটাই হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল!

বিবাহের সময় আসন্ন হইয়া উঠিল। গোলমাল, লোক-জন, কোথাও একটু কান্না তাহার মৃতা জননীর উদ্দেশে, পরক্ষণেই কোথাও পরিহাস। তাহারই মধ্যে এক সময় বর-বেশে অমল গিয়া পাল্কীতে উঠিল। সে এক পথ দিয়া যাইবে, তবে অপর পথে আসিবে তাহার ভাবী ভগ্নিপতি—

বিবাহ বাসরে যখন পারুলকে আনা হইল তখন তাহার সমস্ত মন একাগ্র হইয়া উঠিল, কৌতূহলে, আশঙ্কায় ও আশায়। বহু দিন আগেকার দেখা, সে স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। কে জানে কেমন দেখিতে হইবে সে। কিন্তু কৌতূহলের অপেক্ষাও তখন লজ্জা প্রবল, শুভদৃষ্টির সময় প্রাণপণ চেষ্টাতেও যেন চোখ তোলা যায় না সেদিকে—

ওমা, এ কী বরগো, চোখ চায় না কেন। চাও, চাও, দেখ একবার মুখতুলে—

বহু চেষ্টায় অমল চোখ তুলিল। পারুল কিন্তু তাহার আগেই চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিল, তাহার সহিত চোখোচোখি হইতেই ফিক করিয়া হাসিয়া চোখ নামাইল।

অকস্মাৎ যেন কে একটা চাবুক মারিল অমলকে। কোথায় যেন একটা রূঢ় আঘাতে তাহার স্বপ্নভঙ্গ হইয়া গেল। এ যেন বড় বেশী স্পষ্ট, বড় বেশী প্রগলভ, ইহার মধ্যে সেই লজ্জাটি কোথায়, যাহা কুৎসিৎ মেয়েকেও রমণীয় করিয়া তোলে?

সামান্য ব্যাপার! কিন্তু তবুও তাহার কাছে যেন সমস্তটা বিস্বাদ ঠেকিল। সে মনকে ধমক দিতে লাগিল, এ কিছু নয়, তোমারই দৃষ্টির ভ্রম। এ তোমার নিতান্তই বাড়াবাড়ি।

যাহাই হউক—বিবাহ বাড়ীর একটা মাদকতা আছে, যাহাতে বেশীক্ষণ দুশ্চিন্তা থাকে না। রেশমী সাড়ীর খসখসানি, কারণে অকারণে চাপা ও সুশব্দ হাসি, চোখে চোখে কটাক্ষবিনিময়, ঠাট্টা বিদ্রূপ ও নানা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের মনেই নেশা লাগে। বিশেষত অমল বর, সেই উৎসবের সেই নায়ক, তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই সব কিছু—সুতরাং শীঘ্রই আশঙ্কা কাটাইয়া আশার দিকেই তাহার মন ঝুঁকিল। সে আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। যেটুকু আশঙ্কা থাকিতে পারিত সেটুকুও চলিয়া গেল, যখন অপরের অন্যমনস্কতার ফাঁকে সে বারকতক পারুলের দিকে চুরি করিয়া চাহিয়া লইল। মুখে অবগুণ্ঠন, সেটা ভাল করিয়া দেখা গেল না বটে, তবে শুভ্র সুন্দর যে হাতখানি লাল বেনারসী কাপড়ের উপর পড়িয়াছিল তাহা সত্যই দেখিবার মত। সে ঠকে নাই।

সে নিশ্চিন্ত হইয়া দিদি-শাশুড়ীর সহিত রসিকতায় যোগ দিল। আজিকার রাত্রি জীবনে আর আসিবে না, এ রাত্রির সমস্ত আনন্দটা উপভোগ করিয়া লওয়া চাই।

২৬

পরের দিনকার অনুষ্ঠান শ্বশুরবাড়ি হইতে সারিয়া গৃহে ফিরিল সন্ধ্যার অল্প মাত্র আগে। কিন্তু ফিরিবার পথেও অমলের আর একটা খটকা লাগিল। পাল্কী করিয়া যখন তাহারা ফিরিতেছে, সেই অল্প সময়ের মধ্যেই পারুল দুই তিনবার ফিস ফিস করিয়া কি কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই চেষ্টাটা তাহার ভাল লাগে নাই, এ যেন তাহার স্বপ্নের সঙ্গে মেলে না।

কিন্তু তখন আর সেদিকে মন দিবার সময় ছিল না, পরের দিনই বৌ-ভাত ও ফুলশয্যা। তাহার আয়োজন করিতে করিতে গভীর রাত্রি হইয়া গেল, তাহার পর শুইবা মাত্র গভীর ক্লান্তিতে তাহার চোখ বুজিয়া আসিল। কিছু ভাবিবার বা স্বপ্ন দেখিবার অবসরও পাইল না।

তবে পরের দিন সকাল হইতেই তাহার বারবার মনে পড়িতে লাগিল যে, সেদিনটা তাহার ফুলশয্যা। ফুলশয্যার কথা মনে হইতেই কমলা ও ইন্দুর কথা মনে পড়ে, কারণ আর কোন বিবাহের অভিজ্ঞতা তাহার ছিল না, আর কোন ছবিও মনে পড়ে না। সে স্বপ্ন দেখে সেই চন্দনচর্চিত, স্বেদসিক্ত, লজ্জাতুর একখানি মুখ, অর্ধনিমীলিত দৃষ্টি এবং মুখের একটি অপূর্ব লজ্জাজড়িত প্রসন্নভাব। স্বপ্ন দেখে কথা কওয়াইবার জন্য সেই একান্ত সাধাসাধি, বধূর প্রেমকে জয় করিবার সেই বাঞ্ছিত তপস্যা!...দেখে, আর আগ্রহে অধীর হইয়া ওঠে সেই পরম মুহূর্তটির জন্য। সমস্ত যৌবন তাহার দেহের মধ্যে উন্মুখ, চঞ্চল হইয়া ওঠে পরম প্রতীক্ষায়! অকারণে সে ছুটাছুটি করে।

সামান্য আয়োজন, বেশী দেরী হইবার কথা নয়, তবুও রাত্রি একটা বাজে। তাহার পর নানা অনুষ্ঠান শেষ করিয়া যখন জীবনের দুর্লভতম আনন্দের সম্মুখীন হইল সে, তখন আরও এক ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে, রাত প্রায় দুইটা। কিন্তু ভগ্নী ও অন্যান্য সধবারা যখন তাহাদের বিছানার উপর বসাইয়া রাখিয়া একে একে বিদায় লইলেন, তখনও বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল যে, তাঁহারা একেবারে চলিয়া গেলেন না, কাছাকাছিই কোথাও অপেক্ষা করিতেছেন।

নিঃশব্দ চাপা কৌতুকে বাতাস ভারী হইয়া আছে, এখনই সামান্য কারণেই তাহাতে বর্ষণ সুরু হইবে।

কপাট তাঁহারা ভেজাইয়া দিয়াই গিয়াছেন, কী করিয়া উঠিয়া গিয়া এখন সেটা একেবারে বন্ধ করা যায়, সেই কথাটা অমল ভাবিতেছে, এমন সময় চকিত হইয়া উঠিয়া সে দেখিল যে নববধূ নিজেই উঠিয়াছে। পারুল চট করিয়া উঠিয়া গিয়া নিজেই দরজায় খিল লাগাইয়া দিল, তাহার পর পিলসুজ সুদ্ধ প্রদীপটা কোণে একটা তোরঙ্গের আড়ালে সরাইয়া রাখিয়া আসিল, যাহাতে বিছানার দিকটায় ছায়া পড়ে।

অমলের মনে হইল অকস্মাৎ যেন একটা হিমশৈত্য তাহার মাথা হইতে মেরুদণ্ড বাহিয়া নীচে নামিতেছে। নিমেষের মধ্যে সে যেন পাথর হইয়া গেল।

পারুল বিছানায় ফিরিয়া আসিয়া কহিল, ওরা কেউ যায়নি, সব এখানে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আমিও তেমনি, আড়াল থেকে দেখা ওদের ঘুচিয়ে দিয়েছি।

তাহার পরই আবার একবার উঠিয়া তক্তাপোষের নীচেটা উঁকি মারিয়া কহিল, দেখি নীচে আবার কেউ সেঁধিয়ে বসে আছে কিনা!......না, কেউ নেই।

তাহার পর নিজের গলা হইতে ফুলের মালা ও গা হইতে ফুলের গহনাগুলি খুলিয়া একপাশে সরাইয়া রাখিল, বিছনাতেও কে ফুলের পাপড়ি ছড়াইয়া রাখিয়াছিল, সেগুলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে দিতে কহিল, বিছনাতে আবার ফুল দেওয়া দুচোক্ষে দেখতে পারি না।

ইহারই জন্য এত স্বপ্ন দেখা, এত কল্পনা!

অমল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চাদর ও মালাটা খুলিয়া ফেলিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার তখন সত্যই শোওয়া প্রয়োজন তবে সে অন্য কারণে। পারুলও বেশ সপ্রতিভভাবে উঠিয়া আসিয়া পাশে শুইয়া পড়িল।

বাহিরে তখনও তরুণীর দল প্রথম মিলন রজনীর রসালাপের মধু অস্বাদ করিবার লোভে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহা ভিতর হইতেই স্পষ্ট বোঝা যায়। তাহাদের সেই শাড়ীর খসখসানি ও চাপা হাসির অতি মৃদু শব্দের দিকে কান পাতিয়া শুইয়া রহিল।

একটু পরেই পারুল তাহাকে গায়ে হাত দিয়া কহিল, তারপর আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে কবে?

বোধ হয় তখন সে কমলার কথা ভাবিতেছিল। চমকিয়া উঠিয়া কহিল, কোথায়?

কলকাতায়।...জেঠাইমা বলছিল যে, এখানে লোকের অভাব, তাই তাড়াতাড়ি তোকে বিয়ে করছে। এইখানেই থাকতে হবে তোকে। আমি বলেছি যে, হ্যাঁ বয়ে গেছে আমার, আমার বলে কতদিনের সাধ কলকাতায় বিয়ে হবে!

অমল খানিকটা বাদে জবাব দিল, কিন্তু কলকাতায় যে বাসায় আমি থাকি সেখানে ত মেয়েছেলে নিয়ে গিয়ে রাখা যায় না। তা ছাড়া আমার এখন এমন আয়ও নয় যে আমি বড় বাসা ভাড়া করি—

পারুল বেশ একটু ঝাঁঝের সহিত কহিল, বেশ ত!... তুমি দিব্যি কলকাতায় থেকে মজা মারবে আর আমি এখানে তোমার ঐ চরচরে বুড়ো বাপের সেবা করে দিন কাটাব। ভারী চমৎকার ব্যবস্থা!...ওসব বেশী দিন চলবে টলবে না বলে দিলুম, আমি তাহ'লে অনথ বাধাব।

অমলের নিকট হইতে কোন জবাব না পাইয়া একটু পরে নিজেই আবার কহিল, তুমি কি রাগ করলে? না, তা নয়, তবে নতুন বিয়ে হলে কে আর বরকে ছেড়ে থাকতে চায় বলো? আমার নতুন বৌদিকে অমনি প্রথম নতুনদা নিয়ে যেতে চায়নি, আফিং খাবার ভয় দেখাতেই তবে নিয়ে গেল। বোধ হয় দু-তিন মাস নতুনদা একলা ছিল, তাইতেই বৌদি রোজ একখানা করে চিঠি লিখত। তবু ফি শনিবার রবিবার নতুনদা বাড়ি আসত!

পরক্ষণেই সহসা নিবিড়ভাবে অমলকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, তুমিও ফি শনিবারে বাড়ি আসবে ত?.........

অমল অতি মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, চেষ্টা করব।

ওমা, ও আবার কি কথার ছিরি। নিয়েও যাবে না, আধার শনিবারেও আসবে না, তবে আমি থাকব কি করে? সে হবে না, তাহলে আমি সত্যি সত্যিই গলায় দড়ি দোব—

আরও খানিকটা পরে কহিল, নতুনদা' ফি শনিবারে যখন বাড়ি আসত, তখনই যা হোক একটা না একটা কিছু বৌদির জন্য নিয়ে আসত। তুমি কি আনবে আমার জন্যে?

অমল কোন উত্তরই দিল না। কিন্তু তাহাতে পারুলের উৎসাহ কিছুমাত্র কমিল না, সে কহিল, আমার বাবু অত বাজে জিনিস চাই না, তোমায় এমনি কিছু আনতে হবে না, তুমি বরং যত তাড়াতাড়ি পারো আমায় একটা আর্মলেট গড়িয়ে দিও, বেশ মিনের কাজ করা। আমার ভারি সখ—

অমল সহসা নড়িয়া চড়িয়া উঠিল। কহিল, আমার সত্যিই বড় মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে। আমাকে একটু ঘুমোতে দাও।

পারুল অপ্রতিভ হইয়া কহিল, ও তাইত বড় অন্যায় হয়ে গেছে, মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেব?

অমল তাড়াতাড়ি কহিল, না, না, তুমিও ঘুমোও, একটু চুপ করে থাকলেই আমি ঘুমিয়ে পড়ব এখন।

পারুল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া শুইল এবং বোধ করি একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু অমলের চোখে ঘুম আসিল না। তাহার সত্যই রীতিমত মাথার যন্ত্রণা শুরু হইয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন মাথাটা ফাটিয়া যাইবে।

অনেকক্ষণ ছট্‌ফট্ করিবার পর সে আস্তে আস্তে খিল খুলিয়া বাহিরে আসিল। আড়ি পাতিবার দল তখন হতাশ হইয়া সকলে ঘুমাইতে গেছে। বাহিরে সব নিস্তব্ধ। নিস্তব্ধ এবং অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে অমল বহুক্ষণ নিঃশব্দে পায়চারী করিল। কিন্তু বাহিরের সে অন্ধকারের অপেক্ষাও তাহার মনের অন্ধকার যেন আরও নিবিড়।

তাহার যেন কোথাও কোন দিশা নাই, কোন আলোর রেখামাত্র নাই।

অকস্মাৎ অমলের মনে হইল যে, তাহার জীবনের সবটা একাকার হইয়া গিয়াছে। কোন অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই এমন কি বর্তমানও নাই। এই একটা অপরিসীম শূন্যতা-বোধ যেন তাহার গলা চাপিয়া ধরিল, মনে হইল যেন নিঃশ্বাস এখনি বন্ধ হইয়া যাইবে।

সে ছুটিয়া ঘরে গিয়া তাহার জামাটা খুঁজিয়া গায়ে দিল। পকেটে হাত দিয়া দেখিল জ্যোৎস্নার চিঠিখানা এখনও সেখানে আছে, তাহার সহিত টাকাগুলাও। সে আর দ্বিধা না করিয়া পুনরায় বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু হরনাথবাবু তখন ঘুম ভাঙিয়া পাইখানায় যাইতেছিলেন, অন্ধকারে পদশব্দ শুনিয়া কহিলেন, কেরে ওখানে?

অমল কাছে আসিয়া কহিল, বাবা আমি।......... আপনাকে সেদিন বলিনি, অফিস থেকে খুব জরুরী চিঠি এসেছিল, আজই জয়েন করতে হবে। শুনলে সবাই হৈ-হৈ করতো ব'লে বলিনি, আমি এখনই কলকাতায় যাচ্ছি।

বিস্মিতকণ্ঠে হরনাথবাবু কহিলেন, কিন্তু এই ভোরের ট্রেণে যাবি? খেয়ে গেলে হ'ত না?

না বাবা, সে মিছিমিছি অনেক জবাবদিহি করতে হবে, সবাই পীড়াপীড়ি করবে—

অকস্মাৎ হরনাথবাবু গাড়ুটা নামাইয়া রাখিয়া তাহার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, আমার কাছে লুকোস্‌নি খোকা, সত্যি ক'রে বল্‌—বৌমাকে কি তোর পছন্দ হয়নি?

অমল হেঁট হইয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া কহিল, না, না, সে সব ঠিক হবে বাবা, আপনি কিছু ভাববেন না, তবে আজকে আমার না গেলেই নয়।

সে আর দাঁড়াইল না। দ্রুত বাহির হইয়া পড়িয়া মাঠের রাস্তা ধরিল।

ভোরের বিশেষ দেরী ছিল না, কিন্তু তখনও অন্ধকার তরল হয় নাই। দূরস্থিত নক্ষত্রের ম্লান আলোকে কোন-মতে অস্পষ্টভাবে পথটা দেখা যায় মাত্র। সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেই অমল স্টেশনের দিকে চলিতে লাগিল।

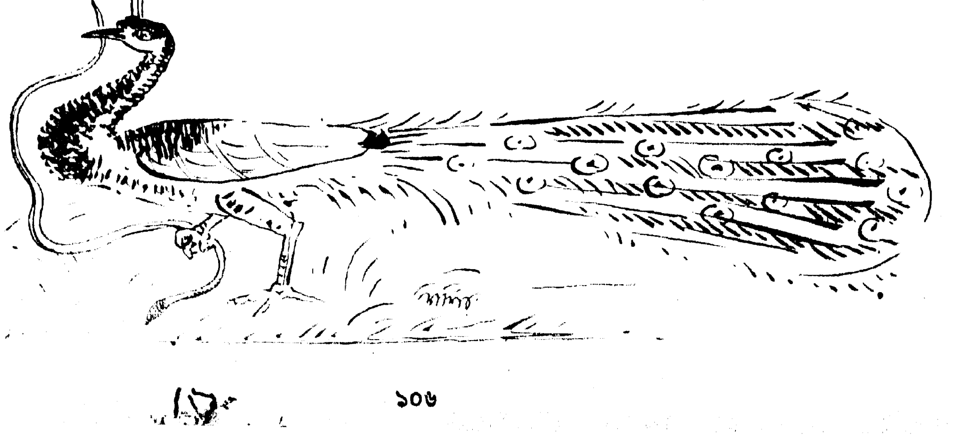
সমাপ্ত

বাঙালীর শিক্ষা সমস্যা

(৯৯ পৃষ্ঠার পর)

সঞ্চিত সাধনা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের স্বর্ণপেটিকা সাহিত্য। ইহার উপর জুলুম করিলে কেহই তাহা সমর্থন করিতে পারে না। আমি আজ বঙ্গের সমস্ত শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতিনিধিস্বরূপে মাননীয় বন্ধু ফজলুল হক সাহেবের দ্বারে ভিক্ষার্থী। তিনি এই বিলের উপলক্ষ্য করিয়া শিক্ষার অপঘাত ঘটাইবেন না, ছাত্রদের মধ্যে ভেদবুদ্ধির আমদানী করিবেন না, এই ভিক্ষা আমি আজ তাঁহার গৃহদ্বারে আসিয়া চাহিতেছি। আশা করি, তিনি আমাদিগকে বিমুখ করিবেন না।

যদি আমাদের একান্তই বিমুখ হইতে হয়, তবে আমার পরামর্শ এই যে যাঁহারা এই ভেদনীতির বিরোধী, তাঁহারা শিক্ষাকে বর্জন করুন। আমার ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া না শিখুক, সেও ভাল; তবু এরূপ সংকীর্ণতা কলুষিত শিক্ষাকে কিছুতেই স্বীকার করিব না।



শত্রু

পুলকেশ দে সরকার

নাইট্-সিফ্‌ট সারিয়া দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার ব্যবস্থা করিতেছি; স্ত্রী বলিলেন, তাহ'লে তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোও, আমি একটু ওবাড়ি যাই।

সত্যই ত! আমিও ঘুমাইব, স্ত্রীও জাগিয়া থাকিবেন, জাগিয়া থাকিবেন অথচ কোথাও যাইবেন না, এমন হইতে পারে না। বিশেষ বাড়ি পাহারার যুক্তিও অচল। ততক্ষণে মেয়ের মাথা আঁচড়ানো সুরু হইয়া গিয়াছে। এ কূটনৈতিক চালে আমি স্বভাবতই মূক হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম আমার নিশ্চিন্ত ঘুম সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া আমার সহ-ধর্মিনী আমারই আত্মজার মুখে পাউডার দিতেছেন। লেপ্‌টা টানিয়া লইয়া একেবারে বিপরীত দিকে মুখ ঘুরাইয়া শুইলাম।

মেয়ের সাজ বোধ হয় হইয়া গেল। কেননা একটু দূরে, আন্দাজে বুঝিলাম ট্রাঙ্কের পাশে দাঁড়াইয়া স্ত্রী বলিতেছেন, কি বল?

অর্থাৎ এখনও অনুমতির অপেক্ষায় আছি।

তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে হইল না। কে ঘরে প্রবেশ করিল। বোধ হয় চাকর। স্ত্রী বলিলেন, মনোরথ, ছাদ থেকে কাপড়গুলো নিয়ে এস, আর চট্ ক'রে খেয়ে নাও, আমার সঙ্গে ওবাড়ি যাবে, বুঝলে?

অতি বিনয়াবনত বাধ্য চাকর প্রস্থান করিল।

মেয়ে লেপ টানিতেছে। তখনও ঘুম আসে নাই, কাজেই ঘুমের ব্যাঘাতও ঘটিতেছে না। কিন্তু স্ত্রী বলিলেন, এই মেয়ে, এদিকে আয়।

মেয়ে গেল না এবং আপত্তি জানাইল।

আমি হাসিলাম। সুযোগ পাইয়া স্ত্রী বলিলেন, কিছু ব'ল্‌লে না তো?

জবাব দিতেই হইল। বলিলাম, কি ব'ল্‌ব?

যাব কি না—

সংক্ষেপে বলিলাম, যাও......

তোমার কোন অসুবিধে হবে না?

এ কী প্রশ্ন! যে যাইবার জন্য মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছে তাহার মুখে এই প্রশ্ন! বলিলাম, না।

তবে আর যেতে বাধা কি? তোমার যখন—

অর্থাৎ ইহা আসল কথা নহে। ইহা অভিমানের কথা। স্ত্রীর উপস্থিতির প্রয়োজন নাই। যে-স্ত্রী যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছেন, তিনিও তাঁহার অনুপস্থিতিতে অসুবিধা হইবে না এই কল্পনায় বিষাইয়া উঠেন, অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, আচ্ছা।

আতঙ্কিত হইলাম। বুঝিলাম, এবার কথার মোড় ফিরিল। সত্যিই ফিরিল। স্ত্রীর প্রতি আমার অনুরাগ কমিয়াছে, বিবাহের প্রাথমিক উষ্ণতা আর নাই, আজ আর যেন তাঁহার কিছু আকর্ষণীয় নাই (অর্থাৎ প্রচুর থাকিতেও আমি অন্ধ হতভাগা অনুভূতিহীন হইয়া পড়িয়াছি।) পুরুষ এমনই ইত্যাদি ইত্যাদি

কিন্তু যাওয়া বন্ধ হইল না। চাকরকে পাহারাদার লইয়া গিন্নী বাহির হইয়া পড়িলেন। রহিল তোমার এ ঘর দুয়ার, কিন্তু কেষ্টাকেও লইয়া গেলেন, কেন না আবার ফিরিয়া আসিবেন। সি-অফ্ করিবার প্রয়োজন হইল না, কন্যাকে কাঁখে তুলিয়া অদৃশ্য হইলেন। যানবাহনের ব্যবস্থা করিতে পারি নাই, পারি নাই অর্থে মর্যাদা সম্ভ্রম রক্ষা করিবার মত কিছু করিতে পারি নাই, রিক্সার জন্য বারটা পয়সার ব্যবস্থা করিয়াছি—স্ত্রী শুনিলে রাগ করিবেন, হয়ত আয় বাড়াইবার জন্য খাওয়া বন্ধ করিবেন, অতিপ্রিয় এক পয়সার তেলে ভাজা পর্যন্ত কষ্ট করিয়া মুখে তুলিবেন না বা চায়ের তেষ্টায় কী যে করিবেন ঠিক নাই। কাজেই রিক্সার পয়সা ক'টা থাক্, আমিও ট্রামবাসের চাকার নীচে নেহাৎ কম পয়সা লুটাইয়া দিই না!

মোট কথা, গিন্নী গেলেন। সঙ্গে মেয়েটাও গেল। চাকরও নাই। বাড়িটা স্তব্ধ। ঘুমাইবার পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা বটে। লেপ টানিয়া আবার চোখ বুজিলাম। মাথায় সংসার গিজ্‌গিজ্ করিতেছে। ড্রামে চাল নাই। আহা, 'নাই' বলিতে নাই; বলিতে হয় বাড়ন্ত! আহা 'বাড়ন্ত' বলিলেই যদি রক্ষা পাইতাম। কালও আবার বাজার করিতে হইবে। কালও, পরশুও, তার পরদিনও। রোজ রোজ। এই এক ঘেঁয়েমির ক্ষান্তি নাই, বিরাম নাই, বিরতি নাই। 'কত ক'রে আলু? পাঁচপো কত?' এই আলু। আলু ছাড়া তরকারী কল্পনা বৃথা, আলু চাই। কম হইলে চলিবে না, রীতিমত চাই। 'এই কটা আলু এনেছ?' বাজারেও গিন্নীর কণ্ঠ কানে লাগে। স্তূপীকৃত ট্যাংরা মাছ, মাছের বাজারে ওয়েসিস্ কিন্তু 'রোজ ট্যাংরা?' সমস্ত মাছগুলিতেই তখন এই জিজ্ঞাসা চিহ্ন ফুটিয়া উঠে। রোজ ট্যাংরা? হ্যাঁ, রোজ ট্যাংরা, নিশ্চয়ই ট্যাংরা, ট্যাংরা না তো কি? 'এই দাও তো একপো।' অনেক বুদ্ধি করিয়া এই মাছ ঠিক করিয়াছি। গরীবের এত আপত্তি করিলে চলিবে কেন? কোথায় চার আনা আর কোথায় আট আনা। যত আহ্লাদ! পেঁয়াজ দেখি আধ্‌লার। আর আধ্‌লার লংকা নিতে হবে—ঝাল লংকা। 'কপি কত ক'রে আজ? কেন তিন পয়সার এক রকম না ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ, ও হ'লেই হবে।.........' বাজার, কয়লা-ওয়ালা, তেল নুন, ডাল। ইস্ কয়লা কি ভীষণ পোড়ে। এরই নাম পাথুরে কয়লা। আর তেল? তরকারী যেন তেলে সিদ্ধ না করিলেই নয়। ঘন ডাল ছাড়া ডাল খাওয়া চলে না। তাহ'লেই ছোট লোক। বেশ ছোট লোক, তারপর বাজার যখন একেবারেই.........বালিশের এ পাশটা গরম হইয়া উঠিয়াছে। ঘুরিয়া ও পাশ হইলাম।

স্থির করিলাম, 'যাক্‌গে ওসব, এবার ঘুম।' ঘুম—নাইট সিফ্‌ট্ আসন্ন। সর্দি বেশ বাগাইয়া উঠিয়াছে। এবার ঘুম।

আলমারীর বই অস্পৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে। ওকি! বই নড়ে কেন। হ্যাঁ নড়েই তো। চোখের ভ্রান্তি নয়—ঠিক নড়িতেছে। আঃ [illegible] সর্বদেহ লেপের অভ্যন্তরে

সবে গরম হইয়া উঠিয়াছে, এখনই ল অব্ থার্মোডিনামিক্সের ......নাঃ উঠিতেই হইল, ইঁদুর, স্পষ্ট ইঁদুর, নেংটে, এগুলিই তো......সর্বনাশ, বই আর ইঁদুর এক জায়গায় থাকিতে পারে না। সর্বনাশ! মানে, উঠিলাম।

আলমারী খুলিতেই দেখি, এই এতটুকু একটা ইঁদুর এক কোণায় আমার দিকে চোখের তাগ্ করিয়া কাঁপিতেছে। কাঁপুক, বইয়ের শত্রু, শত্রু রাখিতে নাই। হাত বাড়াইতেই সাজানো বইয়ের পিছনে আশ্রয় লইল। এত ছোট ইদুঁর—এই এতটুকু! অনায়াসে বইয়ের পিছনে আছে। বইগুলি চাপিলাম। একটা আর্তনাদ কানে গেল। আর্তনাদ—কিন্তু মর্মভেদী নাকি? ধীরে ধীরে বই সরাইয়া দেখি একটি চোখ, অতি ক্ষুদ্র চোখ, কালো এক ফোঁটা জলের মত টলটল করিতেছে, ছোট মাথাটায় সন্ত্রস্ত ভাব। কিন্তু যতই সুন্দর হউক, এটি ইঁদুর, কেউটের ডিমও ফণা তোলে। বই দিয়া ইঁদুরটাকে আরও চাপ দিলাম। দিব না দিব না মনে থাকায় চাপটা একটু বেশীই হইল। আর একটা আর্তনাদ। বুঝি সত্যই মরিল। বই সরাইয়া দেখি, হ্যাঁ নিস্তেজই বটে। একটা কাগজে চাপিয়া মেজেতে ফেলিলাম। ইঁদুরটা গা ঝাড়া দিয়া একবার পলাইবার চেষ্টা করিল। দপ করিয়া আমার অভিমান আহত হইল। ওরে শত্রু এতই কি শত্রুতা যে মরিয়াও বাঁচিতে হয়? পায়ের জুতা দিয়া......... মানুষ নাকি ৯০ মণ বায়ুর চাপ মাথায় করিয়া বেড়ায়, তাহার উপর নিজের মণাধিক ওজন আছে। শত্রু মরিল।

ইহার মৃত্যুতে কেহ শোক করিবে কি না জানি না। ইহার মৃত্যুকে কেহ শহিদী মৃত্যু বলিবে কি না তাহাও জানি না। ইহার ভস্মস্তূপে উত্তুঙ্গ শৌধ গড়িয়া উঠিবে কিনা তাহাও জানি না। কিন্তু হঠাৎ আমার মেয়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। অল্পবয়স্ক মেয়ে। একমাত্র মেয়ে। অতি আদুরে মেয়ে। এখনও কথা বলিতে শিখে নাই। এখনও স্থির হইয়া বহুক্ষণ দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু এমন সুন্দর মুখ আমার সচরাচর চোখে পড়ে না। নিঃসহায়-নিষ্পাপ। কিন্তু নির্বাক নহে, নিশ্চুপ নহে। দুরন্ত। এত দুরন্ত যে জিনিসপত্র টানিয়া ফেলিয়া ভাঙ্গে। যাহা ভাঙ্গে তাহা আর জোড়া লাগে না। গরীবের সংসার। হাতের কাগজ টানিয়া ছিঁড়িয়াছে। দামী বই তাহার নাগালের মধ্যে রাখা বিপদ। তবু কই একবারও তো মনে হয় না সে অনিষ্ট করে! বাচ্চা ইঁদুরটা, ইহারও মা আছে, ইহারও......

মনকে ভীষণ ধমক দিলাম। একী ভাবপ্রবণতা। প্রকৃতির ইহাই তো নিয়ম। বাঁচিতে হইলে একে অপরকে গ্রাস করিবে, একে অপরকে বিনাশ করিবে। প্রকৃতির রীতিতে নিষ্ঠুরতা বা অমন কোন নীতিবোধ নাই। মাছ খাই, মাংস খাই। তা'ছাড়া আমার অতিপ্রিয় পুস্তক কাটিয়া তছনছ্ করিবে। ভাবিলাম, ইহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু উদগ্র কৌতূহল। ইঁদুরটাকে জানালা দিয়া গড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছি। ঐ তো ওখানে পড়িয়া আছে, নিস্তেজ, নিষ্প্রাণ।

গৃহে স্ত্রী নাই, তার চাইতে বড় অতিআদরের কন্যাটি নাই। গা ঝাড়া দিয়া একবার মনকে অবিচলিত করিতে চেষ্টা পাইলাম। নাইট্ সিফট্—ঘুমাইতে হইবে। লেপের ওড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে, ভিতর দিকে পা বাড়াইলেই ফর্ফর করিয়া ছেঁড়া দীর্ঘতর হয়। চাদরেও কিঞ্চিৎ ময়লা জমিয়াছে কিন্তু বালিশে নাকটা বেশ সুসহ হইয়া গিয়াছে। মন্দ নয়—মন্দ নয়, ক্লান্তি, ক্লান্তি, ক্লান্তি কি সুন্দর, কি মোলায়েম, লেপের মত, নীচে তোষকের মত, মাথার বালিশের মত, বালিশে নাক ডুবিয়া যাওয়ার মত।........

হঠাৎ কি কারণে তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। দেখি সমস্ত অন্ধকার। ঘুমের সুবিধার জন্য জানালা বন্ধ করিয়া শুই বটে, কিন্তু এমন অন্ধকার? এত গাঢ়? ত্রস্তে উঠিলাম। কি যেন একটা চকিত ভাব চারিদিকে। সত্যিই অন্ধকার ছাপাইয়া আসিয়াছে। এঘর হইতে ওঘর, ওঘর হইতে পরের ঘর যাইতেই চাকরের মুখোমুখি। তাহার হাতে এক-গাদা এলোঝেলো কাপড়, তাহার সর্বাঙ্গে জলের পদচিহ্ন।

কি হে জল হ'চ্ছে?

হ্যাঁ।

ফিরিয়া আসিয়া ঘড়িটা উল্টাইলাম। আমার ঘড়ি উপুড় করিয়া না রাখিলে চলে না। ঘড়ি উল্টাইয়া সুইচ্ টিপিতে হইল। পৌনে তিনটা। ঘড়ি রাখিয়া চোখ ফিরাইতেই...... একি!

মনোরথ! আতঙ্কে চাকরকে ডাকিলাম।

চাকর আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, খুকীর গরম জামা নিয়ে যায় নি?

মনোরথ জবাব দিল না। অনেক কথার জবাব দেওয়াই সে অবান্তর মনে করে। ধৈর্য হারা হইয়া বলিলাম, এই শীতের মধ্যেও গরম জামা নিয়ে গেল না?

স্ত্রীকে বকিতেছি, মনোরথ ইহার কি জবাব দিবে? বাহিরে তখন টপ্ টপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। মনে হইল বৃষ্টির ছাঁট গায়ে লাগিতেছে।

তুমি ওবাড়ি চেন?

সে বলিল, চিনি।

তাহলে এই নাও। একটা গরম জামা, একটা গরম ইজের তাহার হাতে দিলাম। পরে কি মনে হইল, স্ত্রীর গরম জামাটাও তাহার হাতে দিলাম। জানি, এ জামা আমার প্রিয়া ভার্যার শ্রীঅঙ্গে উঠিবে না। কিন্তু আমার হাতে উঠিল, বলিলাম, তুমি শীগ্গির যাও, একটা জামা গায় দাও, আর ছাতাটা নাও, বোলো জল থাক্লে যেন না বেরোয়, বুঝলে? মেয়েটার একটা অসুখবিসুখ না বাধিয়ে ছাড়বে না, দেখ্ছি। ওবাড়ি চেন তো?

মনোরথ জবাব না দিয়া জামা গায় দিল, ছাতা লইল, সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। জল পড়িতেছে। তোড়ে পড়িলে এ ছাতা মানিবে না। কিন্তু সে চাকর, আমি মনিব, আমার হুকুম তামিল করিতে.........মনোরথ দরজা পার হইয়া গেল।

যেন রাত হইয়া গিয়াছে, এমন রাত। প্রথমে সব ক'টা

(শেষাংশ ১১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফ্রেডেরিক শ্যোঁপা

—ভৈরব—

পাশ্চাত্য সংগীতে পোল্যাণ্ডের দান অসামান্য এবং পোল্যাণ্ডের মধ্যে সব চেয়ে কৃতী সংগীতকার হ'লেন ফ্রেডেরিক শ্যোঁপা। শ্যোঁপার জন্ম হয় ওয়ারশয়, কিন্তু ২১ বৎসর বয়েস থেকেই তিনি প্যারীতে প্রবাস-জীবন যাপন করেন এবং তাঁর যা কিছু সৃষ্টি সমস্তই প্যারী থেকেই হ'য়েছে। অত্যন্ত শৈশবেই শ্যোঁপা সংগীত রচনায় অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। স্কুলে পড়বার সময়ে পিয়ানোর মধ্য দিয়ে রাত্রির এমনি আবহাওয়া ফুটিয়ে তুলতেন যে, অতি দুরন্ত ছেলেও সে সংগীতে আকৃষ্ট হয়ে উঠত। তাঁর সংগীতের মধ্যে এমনি একটা উন্মাদনাশক্তি বিরাজ করতো যা বিশেষ করে মেয়েদের একেবারে অভিভূত করে তুলত। এই কারণেই তাঁর সংগীতের মারফতে তিনি বহু নারীর সঙ্গে প্রেমঘটিত ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর স্বভাবও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল। যার ফলে যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়ে তিনি অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শ্যোঁপার জীবনীকারেরা তাঁর তিনজন প্রধান প্রেমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম তিনি প্রেমে পড়েন বিশ বছর বয়সে, ওয়ারশ'র সংগীত বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীর সঙ্গে—একে তিনি দূরে থেকেই পূজো করে এসেছেন। এর পাঁচ বছর পর পোল্যাণ্ডের কোনো অভিজাত কুলোদ্ভবা এক নারীর প্রেমে পড়েন কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হন। তৃতীয় পাত্রী হলেন বিখ্যাত ফরাসী লেখিকা জর্জ স্যাণ্ড (ব্যারনেস দুদেভাঁ)—এ'র সঙ্গেই তিনি জীবনের শেষ দিনকটি কাটিয়েছিলেন।

জর্জ স্যাণ্ডের সাহচর্যে আসার পরই শ্যোঁপা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন। শ্রীমতী তাঁর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তাঁকে মেজরকাতে নিয়ে যান। সেখানে তাঁরা এক জীর্ণ বহু পুরাতন মঠে বসবাস করতে থাকেন। স্থানীয় অধিবাসীরা কেউ তাঁদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতো না। এখানে শ্যোঁপার অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে আসতে থাকে। একদিন স্থানীয় সেরা ডাক্তার তিনজনকে ডাকা হল, শ্যোঁপার নিজের কথায়—"একজন এসে আমার থুতুটা শুঁকে দেখলে, দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে গলায় মৃদু চড় মেরে দেখলে আর তৃতীয় জন আমার থুতু ফেলার শব্দটা মন দিয়ে শুনলে। প্রথম ব্যক্তি বললে যে, আমি মারা যাব, দ্বিতীয় বললে, আমি মরতে বসেছি আর তৃতীয় জন বললে আমি তো মারাই গিয়েছি। আমি কিন্তু যেমন বেঁচেছিলুম, তেমনই রইলুম।"

এই অবস্থাতেই তিনি 'প্রস্তাবনা' নামক তাঁর অদ্বিতীয় সংগীতটি রচনা করেন। জর্জ স্যাণ্ড তাঁর আত্মজীবনীতে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "সাহসের সঙ্গে সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করলেও তিনি তাঁর কল্পনার ব্যাকুলতাকে চেপে রাখতে পারেন নি। মঠটা তাঁর কাছে প্রেতালয় বলে মনে হত......... ছেলেদের নিয়ে নৈশবিহার শেষ করে ফিরে এসে দেখি উনি পিয়ানোর সামনে বসে আছেন, চোখদুটো হিংস্র, মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছে। আমাদের ঠাওর করে চিনতে তাঁর বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগলো। তারপর জোরে হেসে ওঠবার চেষ্টা করে তাঁর সদ্য রচিত সংগীতটি পিয়ানোয় বাজাতে আরম্ভ করে দিলেন। মাধুর্যের পরিবর্তে একাকিত্ব, দুঃখ ও ভয় মিশে সে সংগীতের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠল তার মনের ভয়াবহতা, তাঁর হৃদয়ের আর্তনাদ যা তাঁকে অহরহ উদ্ব্যস্ত করে তুলেছিল।"

শ্যোঁপা অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। মানুষের স্বভাবের সঙ্গে মানিয়ে চলা তিনি পছন্দ করতেন না এবং অবৈধ সংস্রবে তাঁর যথেষ্ট সংকোচ ছিল। বাস্তবকে তিনি গ্রাহ্য করতে চাইতেন না—তারই মধ্যে সন্নিহিত ছিল তাঁর যতকিছু পাপ-



ফ্রেডেরিক শোঁপ্যা

পুণ্য; তাঁর মহত্ত্ব এবং দুর্বলতা। মন খুলে তিনি কথা বলতে পারতেন না, তিনি ছিলেন অতিরিক্ত বিনয়ী এবং গম্ভীর প্রকৃতির তাই সহজে তাঁর মনের হদিশ পাওয়া যেত না। সংগীতই ছিল তাঁর একমাত্র সহচর।

শ্যোঁপার রচনার মধ্যে তাঁর চারিত্রিক পরিচয়ও নিহিত দেখতে পাওয়া যায়। রচনাগুলির মধ্যেতেই তিনি তাঁর যতকিছু ভাব, আশা-নিরাশা, কামনা সমস্তই প্রকাশ করতেন। তাঁর রচনাই তাঁর শ্রেষ্ঠ জীবনী, কারণ তাঁর জীবনে এমন কোনো ঘটনা নেই যার প্রভাব তাঁর রচনাগুলির মধ্যে ব্যক্ত হয়ে পড়েনি।

শেষ সময়ে জর্জ স্যাণ্ডের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে, কিন্তু কেন, তার কোনো সঠিক কারণ কেউ নির্ধারণ করতে পারেন নি। মৃত্যুশয্যায়ও সাক্ষাতের ইচ্ছা উভয়েরই থাকা সত্ত্বেও

কেন যে তা ঘটে ওঠেনি সেটাও একটা রহস্য থেকে গিয়েছে। এই বিচ্ছেদের পর শ্যোঁপা অল্পকালই বেঁচেছিলেন এবং সে সময়ের মধ্যে আর একটি সংগীতও রচনা করেন নি।

শ্যোঁপার জীবনকাল হ'চ্ছে মাত্র ৩৯ বৎসর; কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের মধ্যেই তিনি সাফল্য-গৌরবের শেষ শিখরে উঠতে পেরেছিলেন। নারী এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদের কাছ থেকে প্রশংসা শুনতে তিনি খুব ভালবাসতেন। তিরিশ বছরে পড়বার আগেই শুম্যান তাঁকে, সে সময়কার নির্ভীক-তম গর্বোন্নত কাব্যশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বলে অভিহিত করেন। অল্পবয়সেই তিনি পিয়ানো সংগীত রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রখ্যাত হন।

তাঁর জীবনে আভিজাত্য ছিল। বোতাম, ছড়ি ও গলাবন্ধ সঞ্চয়ের তাঁর অত্যন্ত সখ ছিল। পোষাক যতটা সম্ভব জমকালোই পরতে ভালবাসতেন। বেগুনে রঙের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব একটু বেশী ছিল; ঘর সাজাবার খুঁটিনাটি জিনিসটারও তিনি তদ্বির করতেন। সামান্য কিছুতেই তাঁর রুচিতে আঘাত লাগলে তিনি প্রচণ্ড মনোব্যথা পেতেন।

তাঁর সমসাময়িক লিজ্‌ট্ (Liszt)এর ভক্ত সংখ্যায় তাঁর চেয়ে বেশী কেন হবে, তা তিনি সইতে পারতেন না। লিজ্‌ট্ যে-প্রকৃতই তাঁর চেয়ে বড় সংগীতজ্ঞ ছিলেন তা নয়, তার আসল কারণ ছিল এই যে, তাঁর সংগীত এত সূক্ষ্ম, মার্জিত ও মৃদু ছিল যে, তা বিরাট কোনো আসরে জম্‌তো না। এ ব্যাপার নিয়ে তাঁর কাছে কেউ সহানুভূতি প্রকাশ করলে তিনি প্রাণখুলে তার কাছে • নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করতেন। তিনি বলতেন যে, লোকে তাঁকে ভগ্নোদ্যম করে দিতে চায়, তাদের নিঃশ্বাসে তাঁর দম আটকে আসতো। নেহাৎ দরকার না পড়লে তিনি 'অন্দর মহলে' বাজাতেই ভালবাসতেন। ওস্তাদ বাজিয়ে বলতে আমরা যা বুঝি শ্যোঁপা ঠিক সে ধরণের ছিলেন না—যন্ত্রের ওপরে ঘা দিয়ে দিয়ে নিজের কায়দা না ফলিয়ে তিনি যেন যন্ত্রকে তার নিজের শক্তি প্রকাশের সুযোগ ক'রে দিতেন।

তাঁর অঙ্গুলি সঞ্চালনে পিয়ানো একটা পারকিউশান যন্ত্র মাত্রে পরিণত হ'য়ে থাকত না। পা-দান (pedals) তিনি এমনিভাবে ব্যবহার করতেন, যেমন ক'রে চিত্রকর রঙের আঁচড় লাগায়। তিনিই সর্বপ্রথম সুরের প্রতিমূর্তি অর্থাৎ theme বা melodyর চতুষ্পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত মিহি সুরের একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি ক'রে মূল সুরটি তার ওপর ভাসিয়ে রাখার প্রথা প্রচলিত করেন। গানের সঙ্গে তিনি তাল রেখে যেতেন না বলে' সমালোচকদের ধারণা ছিল যে, তাঁর তাল জ্ঞান ছিল না এবং অন্যান্য সংগীতজ্ঞের রচনা বাজাতে বসে' প্রায়ই তা একেবারে মাটি করে দিতেন। তাঁর নিজের রচনাও তিনি প্রত্যেকবার একইরকম বাজিয়ে যেতে পারতেন না, মনের ভাব অনুযায়ী তা প্রত্যেকবারই বদলে যেত।

শ্যোঁপা তাঁর সমস্ত সংগীতই পিয়ানোর সাহায্যে রচনা করেছেন। যাবতীয় রচনাই তাঁর উন্মত্ত ও দ্রুতসঞ্চারী মনোভাবের ফল। সমস্তগুলিতেই দরদ প্রতিফলিত হয়ে ওঠে; পাণ্ডিত্য ও নীতিশিক্ষার বোঝায় কোনটিই ভারাক্রান্ত নয়। যা বলবার তা তিনিই যতটা সম্ভব সংক্ষেপেই বলেছেন। কোথাও এতটুকু ফেনানো নেই, পুনরাবৃত্তিও কোথাও নেই। রচনার প্রত্যেকটি ভাগে তিনি একটা নতুন জিনিসের অবতারণা করেছেন; এবং প্রত্যেক অবতারণাটির একটা যুক্তিও তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন। শ্যোঁপার সমস্ত সংগীতে ভাব ও রূপ, বিষয় ও পদ্ধতি, সমস্তই সুন্দরভাবে সংযোজিত।

একথা হয়ত ঠিক যে, ভাবজাত বস্তুমাত্রই বিরাট কিছু নয়; সেটা নির্ভর করে ব্যক্তির জীবনের অভিজ্ঞতা ও দর্শনের ওপর। তাঁর সংগীতের মধ্যে আমরা পাই মানসিকতার একটি উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।

শত্রু

(১১২ পৃষ্ঠার পর)

সুইচ্ টিপিয়া দিলাম। পরে ইলেক্‌ট্রিকের বিল মনে পড়ায়, আর সব নিভাইয়া দিয়া নিজের ঘর আলো করিয়া দিলাম। জল থামে নাই। আমার এদিকে একটা জানালা আছে সেটা গলির ঠিক উপরেই এবং সেখান দিয়া গলা বাড়াইয়া বড় রাস্তার খানিকটা দেখা যায়। মনোরথকে পাঠাইয়া অবধি বার বার এই জানালা দিয়া গলা বাড়াইতে লাগিলাম। বার বারই জলের ছাঁট মুখে চোখে লাগিল। বার বার চমকাইয়া উঠিতে লাগিলাম। জলভেজা এবং ঠাণ্ডা এবং একবার বসিয়া গেলে।.........

হঠাৎ মনে হইল, অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে, মনোরথের আসা উচিত। একেবারে জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। জলের ছাঁট আসিতে লাগিল, উপেক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল। ক্রমে একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব আসিতে লাগিল। দেখিলাম যাহা আশঙ্কা করিয়াছি তাহাই হইয়াছে। একটা রিক্সা আসিয়া গলির মোড়ে দাঁড়াইয়াছে। চারিদিকেই ঘেরাও আছে বটে, কিন্তু ভিজিয়া জ্যাব্‌জেবে। ইহার মধ্যে যাহারা ছিল বা বাহির হইতেছে তাহাদের কথা অনুমান করিতে হয় মাত্র। চাকর নিজে ভিজিয়া ছাতাটা আগাইয়া ধরিল বটে; এবং ইহাও সত্য যে কন্যাকে যথাসম্ভব বুকে জড়াইয়াই গিন্নী নামিলেন, কিন্তু বর্ষা যে এই সস্নেহ আশ্রয়কে উপেক্ষা করিয়াই গিয়াছে তাহা আমার দৃষ্টিতে এড়াইল না।

বর্ষা চাপিয়া আসিয়াছে। ঘূর্ণমান সিঁড়ি দিয়া তাহারা আসিতেছে তাহাও টের পাইলাম। কিন্তু একটা অসম্ভব অনাগ্রহ আমাকে সেই জানালায় কঠিন করিয়া রাখিল। তাহারা ঘরে প্রবেশ করিতেছে ইহাও টের পাইতেছি, কিন্তু আমার দৃষ্টি ততক্ষণে একটা বিশেষ স্থানে সন্নিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সেখানে বাচ্চা ইঁদুরটা চীৎ হইয়া পড়িয়া আছে। সমগ্র ধূসর দেহের মধ্যে বুকের রোঁয়াগুলি খানিকটা সাদা।

রঙ্গজগৎ

শীতটা সবে সরে পড়েছে আমার ছেঁড়া কম্বলটাকে নিয়ে। নতুন বসন্তের হাওয়ায় গলির মোড়ের জঞ্জালগুলো উড়ু উড়ু। শত তালি দেওয়া সার্টখানা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে পড়্‌লুম—পথে। ছেঁড়া স্যাণ্ডেল জোড়া দড়ি দিয়ে পায়ের তলায় বেঁধে নিলুম।

চলেছি টলিউডের পথ ধরে। রোদে ফাটা ফুটপাথের ফাটলের ফাঁক দিয়ে ধরিত্রী বসন্ত-অনিলের সাথে প্রেম কর্‌বেন। রাস্তার কালো পিচগুলোও আজ প্রেমের তাপে গল্‌তে সুরু করেছে। কার বাড়ির খাঁচায় কোকিলটা ডাক্‌চে। পাতানেড়া নিমের ডালে একটা পাতিকাক ঘাড় বাঁকিয়ে ভেংচাচ্ছে। সে উড়্‌তে জানে—বসন্তের হাওয়ায়। আর আমি উড়্‌তে জানি অথচ পারি না।

কাক! তুমি কাকই! কোকিল নও। সিনেমায় superএ পাঠ কর্‌বার উমেদার আমাকে ঠাট্টা করো। জানো! চরণতরীই যার চল্‌বার পথের একমাত্র যান, জগতে তার চেয়ে আত্মনির্ভরশীল আর কেউ নয়!

আমার চরণতরী অনেক পরিশ্রমে আমাকে চৌরঙ্গীর Y. M. C. A.-র সামনে এনে বান্‌চাল হয়ে গেল।

ছেঁড়া জামার পকেটটা অপ্রয়োজন বোধে অনেক আগেই ছিঁড়ে ফেলেছি। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলেও যে পাশের খোট্টা পান সরবৎওয়ালাটা এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানকে বিনি পয়সায় এক ফোঁটা জলও দেবে না সে জ্ঞান আমার আছে। কাজেই সেজন্য চেষ্টা না করে, Y. M. C. A.র গাড়ী-বারান্দার নীচে, ফুটপাথের উপর, চোখ বুজে বসন্তের আরাধনা কর্‌তে লাগ্‌লুম।

হে বসন্ত, হে মলয়বাহন—আজ যেন এই সময় একটি সুন্দরী রূপসী সিনেমা তারকা তাঁর 'ধূপছায়া' রঙের শাড়ীখানা পড়ে, রোলস্ রয়েস্ হাঁকিয়ে, আমার পাশ দিয়ে আঁচলের সাথে ধূলি উঁড়িয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে যায়। আর আমাকে হঠাৎ দেখ্‌তে পেয়ে, সযতনে তার গাড়ীতে, তার পাশে বসিয়ে......... একদম টলিউড!

হায় আকাশ কুসুম! হায় বেইমান বসন্ত! কোথায় রূপসী সিনেমা তারকা! বেইমান্ বসন্ত আমার কাছে এনে হাজির কর্‌ল—মদ্‌নাকে। আমাদের সেই মদ্‌না পাগ্‌লাকে।

মদ্‌না নাচ্‌তে নাচ্‌তে চলেছে পথ দিয়ে। হাতে একটা উর্দু বুলেটিন। মাঝে মাঝে সেটা গভীরভাবে পড়্‌চে আর নেচে উঠ্‌চে।

মাথার ঝুঁটি ধরে আমায় টেনে তুল্‌ল। সেও টলিউড চলেছে। বুলেটিনখানা দেখিয়ে বল্‌লে—পড়ে দেখ্! শান্তারামের 'পড়োশী'র বুলেটিন! দেখ্‌চিস্—ফরাসী দার্শনিকের উক্তি এতে তুলে দিয়েচে—পুরুষের সাথে একমাত্র পুরুষেই প্রেম করতে পারে এবং মেয়ের সাথে প্রেম করতে পারে সুধু মেয়েরাই। ডিরেক্টারের সেরা শান্তারাম তার বইতে সেটা প্রমাণ করে দিয়েচে। তাই ভাব্‌ছিস্ কি! তোকে আর সুপারের পাঠ কর্‌তে হবে না। তোর সাথে প্রেম কর্‌বো আমি। আমি হিরো



'চিত্র লেখা' চিত্রে নান্দ্রেকার ও মনিকা দেশাই

তুই হিরোইন্! জানিস্! বাইবেলেও তাই লেখা আছে! ঈশ্বর বেটা পুরুষ—জানিস্! এই Y. M. C. A.-র সামনে কি লেখা ছিল পড়েছিলি?—ঈশ্বর মানবকে এমন প্রেম করিলেন যে. তাহার একমাত্র পুত্রকে.........ইত্যাদি! ইত্যাদি!

এটা পেশোয়ারীদের উক্তি নয়রে ফ্যালারাম!—ধর্মতত্ব। দর্শনের কথা! শান্তারামের প্রতিপাদ্য বিষয়! চ!

আমার স্যাণ্ডেল জোড়া দড়ির বাঁধন কেটে বিদায় নিল। চরণযুগলে ফোস্কা পড়ে ঘা হয়ে গেল। মদ্‌নার তাতে কী আসে যায়! তার মনে প্রাণে বসন্তের হাওয়া। আমায় টেনে হিঁচ্‌ড়ে এনে, মদন স্টুডিওর ফটকের সামনে ফেল্‌ল।.........মদনই মদ্‌নার কদর বুঝবে!

দারোয়ান ছুটে এল গলাধাক্কা দিতে! কিন্তু তার আগেই মদ্‌না রুখে ফিরে দাঁড়াল। না—সে ঢুক্‌বে না এই স্টুডিওতে। কী? কোথাকার কে এক অচেনা, অজানা বি. অধিকারী। সে ডাইরেক্ট কর্‌বে। মদনাকে নাচের 'টেস্টো' দিতে হবে তার কাছে! মদনও বুঝ্‌বে না মদ্‌নার কদর!

কভী নেহি। আহা, বড়ুয়া গো! আসামে কি নাচটাই তুমি দেখিয়েছিলে! তুমি যে মদ্‌নার মনে প্রাণে 'মুক্তি' এনে দিয়েছিলে!

আজ, সিন্ধি দরিয়ানী, সিন্ধু দরিয়ায় তোমাকে এমন

হাবুডুবু খাওয়াচ্ছে! আজ তুমি সুধু ক্যামেরাম্যান ও অভিনেতা! পরিচালক আর নও!

মদ্‌নার শোক রয়না চিরকাল! এক লাফে সে রাস্তার ধারের ফুলে ছাওয়া স্বর্ণ-কাঞ্চন গাছটায় উঠে বস্‌ল! হাঁকিল—কুছ্ পরোয়া নেহি! চ'।

যেমন চকিতে লাফিয়ে উঠেছিল, তেমনি চকিতে লাফিয়ে নেবে, আমার হাত পাকড়ে নিয়ে—দে ছুট! চল্! চল্! নিউ থিয়েটার্স!—

ভারতের সরকার—ইংরেজ বাহাদুর! আর নিউ থিয়েটার্সের সরকার বি. এন. সরকার। তারা মদ্‌নার নাচের কদর বোঝে! শতকরা ৯৫ খানা বই নাচগান থেটর নিয়ে বানায়! মাস প্রতি তিন হাজার তংকা দিয়ে সাধনা বোসকে আন্‌চে! মধুকে দেড় হাজারী ডিরেক্টার বানিয়ে দিচ্ছে। অহো! মধুসাধনা! সাধনায় কি মধু!

খবরদার! থাম্‌ছিস্ কেন? দেখ্‌ছিস্! এই বুলেটিন! দেখিয়ে বি. এন. এস.কে থ' বানিয়ে দেব না। সাধনাকে আর চাকুরী পেতে হবে না। পুরুষ কর্‌বে পুরুষের সাথে প্রেম। আমি হব—তিন হাজার তংকার হিরোয়িন্। তুই হবি হিরো—ডাইরেক্টার।

আমরা কি তখন ওদের মতো 'রোলস্' মিনার্ভা বুইক্ হাঁকিয়ে আসব—ছোঃ! মাটিতেই পা পড়বে না। এরোপ্লেনের পাখার উপর চড়ে, হাওয়ায় ভর করে নাচ্‌তে নাচ্‌তে স্টুডিওতে আসা যাওয়া কর্‌ব।—আর—

বুঝেছিস্! এ'ক্কালতক্, আমাদের গায় যারা থু থু ছিটিয়েছিল, উপর থেকে তখন তাদের গায় থু থু ফেল্‌ব।

নিউ থিয়েটার্সের গেটের সামনে এসে পড়্‌লুম। মদ্‌নার থু থু যাদের গায়ই পড়ুক, আপাতত আমাকে সিক্ত করে তুলেচে। আর পারা যায় না। এর থেকে রেহাই পেতেই হবে।

যাক্। নিউ থিয়েটার্সের দারোয়ানরা সহায়! মদ্‌না নিমেষের জন্য আমাকে ছেড়ে দিয়ে, নাছোড়বান্দা দারোয়ানের বগলের তলা দিয়ে সুড়ুক্ করে স্টুডিওর মধ্যে ঢুক্‌ল। আমিও আর কথা নেই। চোঁ চাঁ দৌড় সোজা দক্ষিণ দিকে। টালির নালায় ঝাঁপিয়ে পড়ে একদম খালের ওপাড়ে।

বাবা! আবার মদ্‌নার সাথে! আর না। মাথায় রইল—হিরো-ডাইরেক্টার হওয়া। সিনেমায় male super হয়ে কাজ করারও আর দরকার নেই। —দুরবীণ

নিউ সিনেমায়—"পাগল"

শ্রীরঞ্জিত মুভিটোনের নূতন চিত্র "পাগল" সম্প্রতি নিউ সিনেমায় প্রদর্শিত হইতেছে। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন পৃথ্বীরাজ, মাধুরী, চার্লি, খাতুন, সিতারা প্রভৃতি। হাস্য-রসিক চার্লিকে দেখা যাইবে পাগলা গারদের এক পাগলের ভূমিকায়।

এই চিত্রের গল্পাংশের মধ্যে খানিকটা অভিনবত্ব আছে, কারণ বৈদেশিক ছবিতে বরিস কারলফ প্রমুখ অভিনেতাদের লইয়া যেসকল "horor picture" প্রদর্শিত হয় রঞ্জিত মুভীটোনের "পাগল" চিত্রটিকে সেই ধরণের বিভীষিকাপূর্ণ করিবার প্রয়াস আছে কিন্তু সে প্রয়াস স্থানে স্থানে অক্ষম পরিচালনা ও দুর্বল ঘটনাসমাবেশে খানিকটা ব্যর্থ হইয়াছে।

"মনোম্যানিয়া" একরকম মানসিক ব্যাধি এবং চিত্রটির নায়ক ডাক্তার বসন্ত মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করিতে গিয়া নিজেই সেই রোগে আক্রান্ত হন। এই রোগের কারণ প্রেমোন্মাদনা এবং ব্যর্থ প্রেমের পরিণতিস্বরূপ একজন শিক্ষিত ডাক্তার কিভাবে বীভৎস দানবে পরিণত হয় এই চিত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ধরণের ছবি আমাদের দেশে বিরল, একেবারে নাই বলিলেই চলে। মিলন বিরহের মামুলি প্রেমোপাখ্যান দেখিয়া যাঁহারা বিরক্ত এবং বীভৎস ছবি দেখিবার বাতিক যাঁহাদের আছে তাঁহারা "পাগল" দেখিয়া কিছুটা অভিভূত হইবেন বলিয়া মনে হয়।

ডাঃ বসন্তের ভূমিকায় পৃথ্বীরাজের বলিষ্ঠ অভিনয় উল্লেখযোগ্য, মাধুরীর অভিনয়ে আড়ষ্টতা নাই। চার্লির ভাঁড়ামী আমাদের পছন্দ হয় না, চুট্‌কী নাচ ও গানের আয়োজনও আছে। পরিচালক কারদারের চেষ্টা প্রশংসার্হ তবে আরও সাধনার দরকার।



খেলাধূলা

এ্যাথলেটিকস স্পোর্টসে বাঙালী বালিকাগণ

এ্যাথলেটিকস স্পোর্টস বিষয়ে বাঙালী বালিকাগণের আশাতীত উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সজীবিতার নূতন পথের সন্ধান পাইয়া তাহারা যেন মাতিয়া উঠিয়াছে। উন্মুক্ত আকাশতলে দৌড়-ঝাঁপ করায় দেহের স্বাভাবিক ক্ষীণত্ব ও দুর্বলতা যে দূর হয়, তাহা তাহারা যেন উপলব্ধি করিয়াছে। নিজ নিজ স্কুল কলেজের, আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ, এমন কি সাধারণ প্রতিযোগিতাসমূহে পর্যন্ত দলে দলে বাঙালী বালিকাগণ যোগদান করিতেছে। যোগদানকারিণীদের মধ্যে শাড়ির ব্যবহার পর্যন্ত বিরল হইয়া উঠিয়াছে। প্রাথমিক স্কুলের ছোট ছোট বালিকাগণ হইতে আরম্ভ করিয়া



বাঙালী বালিকাগণের ত্রুটিপূর্ণ হার্ডল অতিক্রমের দৃশ্য

কলেজের উচ্চ শিক্ষিতা বয়স্থা বালিকাগণ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতেছে। সংরক্ষণশীল স্থবির সমাজ রক্ষকগণের প্রতিবাদ, কটূক্তি কোন কিছুই বাঙলার বালিকাগণকে এ্যাথলেটিকস স্পোর্টস হইতে বিরত করিতে পারিতেছে না। কলিকাতা মহানগরী এই জাগরণের উৎপত্তিস্থল ছিল, কিন্তু বর্তমানে ইহা ধীরে ধীরে বাঙলার পল্লী অঞ্চলে পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বালিকাগণের পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, অভিভাবক অভিভাবিকাগণ বালিকাগণ প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করিলে গর্ব অনুভব করিয়া থাকেন। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় চার পাঁচ বৎসর পূর্বে বাঙালী বালিকাগণের এ্যাথলেটিক স্পোর্টসে যোগদান করিবার যে সকল অসুবিধা বা বাধা ছিল, তাহা বর্তমানে অপসারিত হইয়াছে। ইহা খুবই আনন্দদায়ক ও উৎসাহ বর্ধক।

বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা

বাঙালী বালিকাগণের এ্যাথলেটিকস স্পোর্টস বিষয়ের এত উৎসাহ, এত উদ্দীপনা সমস্তই ব্যর্থ হইবে যদি না আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত এ্যাথলেটিকসের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই উক্তি শুনিয়া অনেকেই আশ্চর্যান্বিত হইবেন আমরা জানি, কিন্তু না করিয়া উপায় নাই। কারণ বাঙলার বালিকাগণ স্পোর্টসের বিপুল উৎসাহে মত্ত হইয়া আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা হইতে বঞ্চিত থাকায় অযথা দৈহিক শক্তিক্ষয় করিতেছেন, ইহার প্রমাণ আমরা বহু অনুষ্ঠানেই পাইয়াছি। একমাত্র দৈহিক শক্তি যে অপূর্ব সাফল্য আনয়ন করিতে পারে না, কৌশল শিক্ষার প্রয়োজন আছে ইহা যোগদানকারিণীদের মধ্যে অধিকাংশই জ্ঞান রাখেন না। তাহাদের এই অজ্ঞানতার জন্য তাহাদিগকে সম্পূর্ণ দোষী করা চলে না, এই জন্য বেশি দোষী যাঁহারা বালিকাদের স্পোর্টস পরিচালনা করেন। পরিচালকগণের



এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বালিকাগণের নিখুঁত হার্ডল অতিক্রমের দৃশ্য

উচিত স্পোর্টসের যোগদানকারিণী প্রত্যেক বালিকাকে বুঝাইয়া দেওয়া, এ্যাথলেটিকস স্পোর্টসের বিভিন্ন বিষয় সাফল্য লাভ করিতে হইলে কি কি বিষয় জ্ঞান রাখা দরকার, কোন প্রতিযোগিতার জন্য কিরূপ ব্যায়াম ও কিরূপ কৌশল শিক্ষা করিতে হইবে। কিরূপ স্বাস্থ্যলাভ না করিলে এ্যাথলেটিকসের সকল বিভাগে সাফল্যলাভ করা যায় না। বিভিন্ন বিষয়ের ক্রমোন্নতি করিতে হইলে কিরূপ ব্যবস্থা ও কিরূপ শিক্ষা প্রণালী অনুকরণ করিতে হইবে। বৈদেশিক দেশসমূহের বালিকাগণ, যাঁহারা নিজ নিজ দেশের সম্মান পৃথিবীর ক্রীড়াক্ষেত্রে বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। উপরে যে সকল বিষয়গুলির প্রতি বাঙলার বালিকা এ্যাথলিটগণের দৃষ্টি

আকর্ষণের কথা আমরা উল্লেখ করিলাম, পরিচালকগণ, শুনিলেই বলিবেন "অনেক দিন আগেই আমরা এই সকল বিষয় বালিকাগণ যাহাতে জানিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি।" কিন্তু আমরা দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি পরিচালকগণের ঐ সকল বিষয়ের প্রতি কোন দৃষ্টি নাই। তাঁহারা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াই সন্তুষ্ট। বালিকাগণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে অথবা অযথা শক্তিক্ষয় করিতেছে, উন্নতি করিতে পারিতেছে না কেন ইহা তাঁহারা ভুলিয়াও কোন সময় চিন্তা করেন না। যদি করিতেন, তবে বাঙলার বালিকাগণের এ্যাথলেটিকস স্পোর্টস স্ট্যান্ডার্ড এত নিম্ন স্তরের হইত না। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বালিকাগণ পূর্বের ন্যায় এ্যাথলেটিকসের বিভিন্ন বিষয় বাঙালী বালিকাগণকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিতে পারিতেন না। আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বালিকাগণের পক্ষে ইহা কেবলমাত্র সম্ভব হইয়াছে বাঙালী বালিকাগণকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা হইতে বঞ্চিত রাখায়।

এ্যাথলেটিকস স্পোর্টসের বিভিন্ন বিষয় সাফল্যলাভ করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন পূর্ণ স্বাস্থ্য। বাঙলার এ্যাথলেটিকস পরিচালকগণ এই বিষয় মোটেই যে দৃষ্টি দেন না তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় যে কোন একটি স্পোর্টস অনুষ্ঠানে যোগদান করিলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাইবে, স্বাস্থ্যহীনা ক্ষীণকায়া অথবা স্থূলাঙ্গী বাঙালী বালিকা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছে; নিখুঁত নিটোল পূর্ণ স্বাস্থ্যবতী এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বালিকাগণের সহিত স্বাস্থ্য বিষয়ে এইরূপ তারতম্য হইলে যাহা হয়, তাহাই হইতেছে। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বালিকারা সাফল্যলাভ করিতেছে আর শক্তিক্ষয় করিয়া অপমানিত অপদস্থ হইতেছে বাঙালী বালিকাগণ।

এ্যাথলেটিকস স্পোর্টসের বিভিন্ন বিষয় সাফল্য লাভ করিতে হইলে দ্বিতীয়ত প্রয়োজন হয় কৌশলের। এই কৌশল শিক্ষা বিষয় যে যত নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করিতে পারিবে সে তত সহজে সাফল্য লাভ করিতে পারিবে। এই কৌশল শিক্ষার সময় বাঙালী বালিকাগণ নিখুঁতভাবে শিক্ষা করে ইহা পরিচালকগণ চেষ্টা করেন না। কি দৌড়ের আরম্ভ, কি দৌড়ের শেষ, কি রিলে রেসে, কি হার্ডল রেসে বাঙালী বালিকাগণ এইরূপ সকল কৌশল প্রদর্শন করেন যে সাধারণ বাঙালী পুরুষ এ্যাথলীটদের পর্যন্ত লজ্জায় মাথা হেঁট করিতে হয়। প্রতিযোগিতার সময় অনেক সময়েই বাঙালী এ্যাথলিটগণকে বলিতে শোনা যায় "কেন বাঙালী বালিকাগণ স্পোর্টসে যোগদান করে যদি তাহারা কৌশলের প্রাথমিক নিয়মগুলি পর্যন্ত না জানে।" এই সকল উক্তি শুনিয়াও বাঙালী বালিকাগণ সম্বন্ধে হতাশ হই নাই; কারণ আমরা জানি বালিকাগণ নিজেরাই একদিন এই অবস্থার পরিবর্তন করিবেন। তবে ইহা শীঘ্র সম্ভব হয় যদি এ্যাথলেটিক স্পোর্টসের পরিচালকগণ এই বিষয় দৃষ্টি দেন। তাঁহারা কি বাঙলার মাতৃজাতির সম্মানের কথা স্মরণ করিয়া এইটুকু করিবেন না?

ঢাকায় বিশেষ প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা

ঢাকায় সম্প্রতি বেঙ্গল জিমখানা দলের সহিত বাঙলার লাটের দলের এক বিশেষ প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা হইয়া গিয়াছে। এই খেলা তিন দিন ব্যাপী হইয়া শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। বাঙলার লাটের পক্ষে মেজর সি কে নাইডু, নওমল, এস ব্যানার্জি, বিনু মানকড়, রামপ্রকাশ প্রভৃতি ভারতের বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় যোগদান করেন। উভয় দলে বারজন করিয়া খেলোয়াড় খেলেন। বাঙলার লাটের দল যেভাবে গঠিত হইয়াছিল তাহাতে অনেকেই আশা করিতে পারেন নাই যে বেঙ্গল বাঙলার লাটের দলের সহিত অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করিয়া পারিবে। বেঙ্গল জিমখানা দলের খেলোয়াড়গণ শক্তিশালী বাঙলার লাটের দলের সহিত অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করিয়া ইহাই প্রমাণিত করিয়াছেন যে, বাঙলার ক্রিকেট খেলোয়াড়দের ভারতীয় বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের তুলনায় যেরূপ নিকৃষ্ট ভাবা হয় তাহারা সেইরূপ নহে। তাহারা ভারতীয় বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের সহিত সমপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মত শক্তি রাখে। বিশেষ করিয়া ব্যাটিং বিষয় বেঙ্গল জিমখানার খেলোয়াড়গণ যেরূপ ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছে তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয়। মেজর নাইডু, নওমল, এস ব্যানার্জি, বিনু মানকড় প্রভৃতি নামজাদা বোলারদের বিরুদ্ধে তাহাদের অধিকাংশই রাণ করিয়াছে। বাঙলার ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ উত্তরোত্তর উন্নতি করুক ইহাই আমাদের কামনা।

মেজর নাইডুর প্রশংসনীয় ব্যাটিং

মেজর সি কে নাইডু একা বাঙলার লাটের দলের পক্ষে ১৫৬ রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে অপূর্ব সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। তিনি উক্ত রাণ সংখ্যার মধ্যে ৯টি ওভার বাউণ্ডারী এবং ১৩টি বাউণ্ডারী করেন। প্রবীণ বয়সে নাইডুর এই কৃতিত্ব উচ্ছ্বসিত প্রশংসার যোগ্য। ক্রিকেট খেলার মাঠ হইতে অবসর লইবার সময় নাইডুর এখনও হয়নি ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছে।

খেলার ফলাফল—

বেঙ্গল জিমখানা প্রথম ইনিংস—৩৪১ রাণ (এস গাঙ্গুলী ৩৩, এ দাস ২৮, কার্তিক বসু ৬৫, রামচন্দ্র ৩৯, এস দত্ত নট আউট ৫৪, বিমল মিত্র ২১; এস ব্যানার্জি ৪৯ রাণে ১টি, নাজির আলী ৪৯ রাণে ৩টি, মানকড় ৯৯ রাণে ৪টি, সি কে নাইডু ৬৮ রাণে ২টি উইকেট পাইয়াছেন)।

বাঙলার লাটের দল প্রথম ইনিংস—৪১৮ রাণ (এস ব্যানার্জি ৭৬, বিনু মানকড় ৬৪, মেজর সি কে নাইডু ১৫৬, অমূল্য বসু ৩৯; বি মিত্র ৬২ রাণে ২টি, কে ভট্টাচার্য ৯০ রাণে ৬টি, এস দত্ত ৭৫ রাণে ৩টি উইকেট পান)।

বেঙ্গল জিমখানা দ্বিতীয় ইনিংস—(১১ উইঃ) ২১৪ রাণ (এস গাঙ্গুলী ৩৯, কে ভট্টাচার্য ৩১, এ দাস ৫০, কে বসু ৩২, এস দত্ত ১৮; মেজর সি কে নাইডু ৭০ রাণে ২টি ও নওমল ৭৭ রাণে ৯টি উইকেট পান)।

(খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ)

বিচিত্র বার্তা

যে কোন সাধনায় বাধাবিঘ্ন আসা স্বাভাবিক। তবে বাণীসেবককে যতখানি দুঃখ দৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয় ততখানি অন্য সাধনার মধ্যে নাকি কারওকে করতে হয় না। বাঙলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে মাইকেল প্রমুখ বাণী সেবকদের দুঃখ দৈন্যে বিপর্যস্ত কাহিনী যেমন মর্মন্তুদ তেমনি রহস্য-পূর্ণ। কিন্তু এ দৃশ্য কেবল এদেশে নয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ভাগ্যলক্ষ্মী বাণী সেবকদের ঠিক এমনি ভাবেই উপেক্ষা করেছেন। যশভাগ্য তাঁদিকে পৃথিবীতে অমর করেছে; আমরা আমাদের সমস্তখানি অন্তরের ভালবাসা দিয়ে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি, তাঁদের দুঃখ দৈন্য পরিপূর্ণ জীবন-কাহিনী পড়তে পড়তে সমবেদনায় মন ভারক্রান্ত করে তুলি। আজ আধুনিক যুগের দু'জন পৃথিবী বিখ্যাত চিত্র শিল্পীর দুঃখময় জীবনের ইতিহাস পড়ছিলাম। খ্যাতনামা দু'জন মাথা পাগলা চিত্রশিল্পী--উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। এক-জনের নাম Paul Gauguin অপরের নাম Vincent Van Gogh. গগাঁ (১৮৪৮-১৯০৩) ডেনমার্ক শহরের একজন কোম্পানির কাগজের দালাল ছিলেন। তিনি হঠাৎ ৩৯ বৎসর বয়সে স্ত্রী-পুত্র এবং ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজে বাস করতে চলে আসেন। মনের ভাল অবস্থায় তিনি চমৎকার চমৎকার ছবি আঁকতেন। ফ্রান্সের উপনিবেশবাসীরা ছবি দেখবার জন্যে তাঁর বাড়ীতে ভিড় জমাত। তার মধ্যে অনেকে আবার তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ করত। গগাঁ কিন্তু এসব অত্যাচার সহ্য করতে পারতেন না, এক মনে কাজ করার খুবই অসুবিধা হত। দর্শক এবং উপযাচকদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে তিনি তাঁর ঘরের দরজায় নগ্ন চিত্র এঁকে রাখতেন।

পরে তিনি তাঁর চেয়েও বেশী মাথা পাগলা শিল্পী ভ্যান গগের বন্ধুত্ব লাভ ক'রে এক সঙ্গে বাস করতে থাকেন এবং আরও কলুষিত জীবন যাত্রার মধ্যে এসে পড়েন। ৫৫ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একরকম দৃষ্টি-শক্তি হারিয়ে ফেলেন, দীর্ঘকাল স্থায়ী এ্যাকজিমার আক্রমণে তিনি জীবনের শেষের দিকে ভাল করে হাঁটতে পর্যন্তও পারতেন না। নিজেরই একটা মাটীর মূর্তিকে সামনে বসিয়ে সস্তার মদ নিবেদন করে পূজো দিতেন। তাঁর মত শিল্পীর শেষ জীবন এমনই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

ভ্যানগগ (১৮৫৩-১৮৯০) ছিলেন একজন ডাচের ছেলে। তাঁর মেজাজ বরাবরই ছিল রুক্ষ ধরণের। তিনি ধর্ম প্রচারক হন এবং প্রচারের কাজে এমনি লেগে গেলেন যে তাঁকে সংসারের সমস্ত কিছু, এমন কি সামান্য শয্যাবস্ত্র থেকে বঞ্চিত করে গৃহ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। জীবিত অবস্থায় তাঁর ভাই ছাড়া তাঁর অঙ্কিত শিল্প ধারার উপর কারও আস্থা ছিল না। একদিন সুরাপান করতে করতে গগাঁ তাঁর উপর উচ্ছিষ্ট সুরা নিক্ষেপ করেন। এই ঘটনায় ভ্যানগগ এত বেশী ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন যে, তিনি নিজের একটা কানই কেটে ফেলেন। এর পর তিনি কিছুদিন পাগলাগারদে অবস্থান করতে বাধ্য হন। মুক্তির পরেই আত্মহত্যা দ্বারা তাঁর জীবন শেষ হয়।

* * *

উইলিয়াম হ্যাজলিট তাঁর শয়ন ঘরের দেওয়ালে কবিতার টুকরো, খ্যাতনামা লেখকের লেখার বাছাই করা অংশ এবং তাঁদের ভাব লিখে রাখতেন। মাঝে মাঝে ঘরের দেওয়ালে, উপরের ছাদে কলি ফিরিয়ে দিয়ে ঘরের সংস্কার করা হ'ত। শাদা দেওয়ালের গায়ে আবার ফুটে উঠত পেন্সিল কলমের লেখা।

* * * * *

আমেরিকার লেখক চার্লস ডাডলে ওয়ার্ণার তাঁর ঘরের সমস্ত দেওয়াল সাধারণ ব্রাউন কাগজ দিয়ে ঢেকে রাখতেন। ছবির ব্যাক গ্রাউন্ডের পক্ষে এরকম কাগজই তাঁর রুচিতে সব থেকে ভাল লাগত।

* * * * *

মিঃ সিসিল রোহেডেস নানা দেশের বিচিত্র মানচিত্র খুবই পছন্দ করতেন। তাঁর ঘরের সমস্ত দেওয়ালে নানা দেশের মানচিত্র ঝোলান থাকত। তিনি বলতেন, এই সব মানচিত্র তাঁকে স্বপ্ন দেখতে এবং নতুনের পরিকল্পনা করতে অনুপ্রাণিত করে।

* * * * *

পোটাটো, টোমাটোর কথা শুনেছেন। কিন্তু এ দু'টি ছাড়া আর একটি ঐ ধরণের নামের শব্জী আবিষ্কৃত হয়েছে। বৈজ্ঞানিকগণের ব্যাপার আলাদা। তাঁরা কিছু দিন হ'ল 'টোপাটো' নামে একটি ফলের জন্ম দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক উপায়ে। আলু এবং বিলাতী বেগুনের বৈজ্ঞানিক সংমিশ্রণে এই 'টোপাটো'র জন্ম। সাধারণ আলুর মতই এই গাছের শিকড়ে "টোপাটোর" জন্ম হয়, আর গাছের উপরের শাখা প্রশাখায় দেখা যায় বিলাতী বেগুন। এই নব আবিষ্কৃত গাছের জন্য কোন মাটির প্রয়োজন হয় না। কাঁকরের মধ্যে এরা বেশ জন্মাতে পারে। সাতটি রসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে যে তরল পদার্থ প্রস্তুত হয় তাহাই এই গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্য।

* * * * *

ফুলের সৌন্দর্য কেবল একজন মানুষকেই মুগ্ধ করে না। বিভিন্ন ফুলের আকৃতি, সৌন্দর্য এবং গন্ধ কোন ব্যক্তি বিশেষকে কেবল মুগ্ধ না করে একটা সমগ্র জাতিকেও করতে পারে। তার পরিচয় রয়েছে যথেষ্ট। পৃথিবীর কয়েকটি

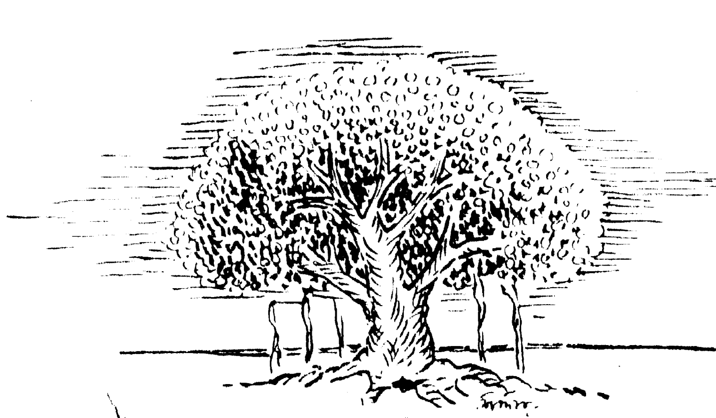
সমৃদ্ধশালী জাতি তাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুলকে জাতীয় চিহ্ন হিসাবে পরিচয় দেয়। ফুলের নামে বা চিহ্নতেই দেশকে বুঝায়, পৃথকভাবে দেশের নাম করতে হয় না। Indiaকে বুঝাতে গেলে Lotusএর নাম করলেই যথেষ্ট। সেই রকম Englandএর Rose, Germanyর Cornflower, Italyর White Lily এবং Franceএর Fleur-de-lisই হচ্ছে ঐ দেশের জাতীয় চিহ্ন।

* * * * * * * *

সংবাদ যে একেবারে খাঁটি, তার প্রমাণ দিতে হলে বিদেশী কাগজের উল্লেখ না করলে অনেকের মন আবার সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। কিছুদিন আগে বামুন-পাড়ার হতভাগা অটল ভাতের উপর ৪৯টি রসগোল্লা গিলে যে পটল তুললে, এ সংবাদ কোন বিলেতী কাগজে না ছাপা হলেও চিত্রগুপ্তের খাতায় যে ছেপে বের হয়েছিল, সেকথা পাড়ার ছেলেরা হলপ করে সাক্ষী খাড়া করে প্রমাণ করাতেও পাড়ার মোড়ল নিবারণ চাটুজ্জে বিশ্বাস করলে না, বললে ও বাজে, বিলেতী কাগজ হলে...। শেষে তারা দলবেঁধে চাটুজ্জেকে শ্মশানঘাটের অফিস ঘরে চ্যাংদল্লা করে তুলে নিয়ে গিয়ে খাতার উপর দেখিয়ে দিলে, লেখা আছে, অটলের মৃত্যু কলেরায়। আর কলেরা যে ঐ রকম রাক্ষুসে খাওয়ার ফলেই হয়েছিল, তা জানতে হলে যে ডাক্তারী বিদ্যার দরকার, তা তারা চাটুজ্জেকে বার বার ক'রে বুঝিয়ে দিলে। চাটুজ্জে বললে, অটল এমন কি আর খেয়েছে, যার জন্যে তোরা তার স্মৃতিতর্পণ ক'রে পাড়া মাথায় করেছিস। জানিস আমার বয়স যখন............ছেলের দল চাটুজ্জের কথায় কান দিলে না। একজন তার মুখ চেপে ধরলে। উপায় না দেখে পকেট থেকে একখানা বিলেতী কাগজের টুকরো ছেলেদের সামনে ফেলে দিয়ে বললে, দেখ কাগজটা, একেই বলে একজন খাইয়ে। এ একটা রীতিমত রেকর্ড। কাগজের লোকে ছবি তুলেছে তার উপর কত কি লিখেছে। আর তোরা?" বিলেতী কাগজের লেখাটা একজন তর্জমা করে শুনাল—ম্যাক্সহিনেসল নামে এক ভদ্রলোক দশ মিনিটে ৭৫টা ডিম খেয়ে ফেলে সকলকে 'হাঁ' করে দিয়েছে। লোকের খিদে বেড়ে গেছে। খবর শুনে পেটুকদের পেট ব্যথা করতে আরম্ভ করেছে।" শেষ হতেই ছেলেরা চাটুজ্জের দিকে তাকাল। চাটুজ্জে বললে, এ পেটব্যথা কলেরার পূর্ব লক্ষণ নয়, জঠরের ক্ষুধা।



রেডিও অভিনেতা মিঃ জ্যাকস্মার্ট শান দেওয়ার মেসিনে তাঁর দাঁতগুলিতে ধার দিয়ে নিচ্ছেন। ছায়াচিত্রের অভিনেত্রী এবং অভিনেতারা যে বসন্ত উৎসবের আয়োজন করেন, তাতে 'আপেল খেলা' একটি বিশেষ দর্শনীয় অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে যোগদান ক'রে সকলেই প্রচুর আনন্দ পান। মিঃ জ্যাকস্মার্ট কিন্তু দাঁতে ধার না থাকায় কোন সময়েই দাঁত দিয়ে আপেল সংগ্রহ করতে পারেন না। মিঃ স্মার্টের উৎসাহ কম নয়?



পুস্তক পরিচয়

বাংলা সাহিত্যের ভূমিকাঃ—শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। প্রকাশক—চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি কোং, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা।

কোনো সাহিত্যের ঠিক মতো পরিচয় দিতে গেলে সাহিত্যিকের মন ও হৃদয় নিয়েই তার উপলব্ধি এবং প্রকাশের প্রয়োজন হয়। কোনো ব্যক্তির, দেশের বা যুগের সাহিত্য-সৃষ্টির বিচার শুধু পুঁথিপত্র পড়া থাকলেই বা পুরানো পাণ্ডুলিপির স্তূপ হাতের কাছে মজুত থাকলেই সম্ভব হয় না, বিশেষ করে' যেখানে বিচার ও বিচারগত সিদ্ধান্ত দিয়ে সাধারণ পাঠকের মনে একটা সম্যক বোধ জন্মাতে হবে। এ কাজে সাহিত্যের উপরকার দৃষ্টি ও শ্রুতি-গোচর রূপ ছাড়াও তার গভীরতর সত্ত্বা সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়; প্রখর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণের যতখানি প্রয়োজন হয়, ততখানি প্রয়োজন হয় ব্যাপক অনুভূতিময় সংশ্লেষণের। বলা বাহুল্য, এ কাজ অসাহিত্যিকের নয়।

আমাদের প্রদেশে সাহিত্য-সৃষ্টি যদিও অনেকখানি এগিয়ে গেছে এবং পৃথিবীর প্রধান প্রধান সাহিত্যের পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে, তবু পরম্পরাগত সাহিত্যের পরিচয় দেবার কাজ সীমাবদ্ধ থেকেছে প্রধানত অসাহিত্যিকদের মধ্যে; অন্তত সাহিত্যের প্রাণধারার পরিচয় কেউ দেন নি। শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তের বই এই প্রথম বাঞ্ছনীয় ব্যতিক্রম ঘটালো। এক কথায় বলা যায়, এ জাতের সাহিত্য-ইতিহাস বাঙলায় নেই। নন্দবাবু নিজে সুসাহিত্যিক; সমস্ত বইটাতে তাঁর গভীর রসানুভূতি এমনভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, অন্যের হৃদয়ে তার ছোঁয়াচ লেগে যায়। সব জায়গায় তিনি মূল বক্তব্যকে দৃষ্টান্ত, তুলনা ও পারিপার্শ্বিকের উল্লেখে জীবন্ত করে' তুলেছেন; ফলে বাঙলার বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন শ্রেণীর সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার সমগ্র ধারণা পাঠকের মনে অনায়াসে গড়ে ওঠে।

এ বইয়ের সব চেয়ে বড় গুণ হয়েছে এই যে, লেখক কোথাও সাহিত্যকে জীবন থেকে বিশ্লিষ্ট করে' বিচার করেন নি, সর্বত্রই তিনি সামাজিক অবস্থার পশ্চাদ্‌পটে সাহিত্যের বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করেছেন। সৃজনী-প্রতিভার অভিব্যক্তির সঙ্গে বৈষয়িক পরিমণ্ডলের মূলগত যোগকে এইভাবে প্রাধান্য দিয়ে তিনি নিঃসংশয়ে বাঙলা সাহিত্যের ধারাবাহিক বিবরণীকে উন্নত স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নন্দবাবুর বিচার নিরপেক্ষ। একাধিক প্রাচীন 'মহালেখকের' খ্যাতির ঝুটা বনিয়াদকে টলিয়ে দিতে যেমন তিনি দ্বিধা করেন নি, তেমন অনেক অপেক্ষাকৃত অল্পখ্যাত সাহিত্যিকের কৃতিত্বকে পাকা গাঁথুনিতে বসিয়েছেন। তবে সাম্প্রতিক রচনার আলোচনায় তাঁর ত্রুটি আছে। পূর্বগামী সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে যে নিরপেক্ষ মনোভাব তিনি দেখিয়েছেন, সমসাময়িকদের সম্বন্ধে তা দেখাতে পারেন নি। কাব্য, সাময়িকপত্র, উপন্যাস ও গল্প—এই কয়টি বিভাগে এ ত্রুটি বিশেষ করে' ধরা পড়ে। কারো কারো বেলায় স্নেহাধিক্য এবং কারো কারো প্রতি ঔদাসীন্য বা উপেক্ষা তাঁর মতামতকে দুর্বল করেছে।

বইটি মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত—প্রাচীনকালঃ বৌদ্ধ সহজিয়া সাহিত্য থেকে রামপ্রসাদের সময় পর্যন্ত; আধুনিককালঃ ঈশ্বর গুপ্ত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। বিষয়গুলি চমৎকারভাবে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক অধ্যায়ের গোড়ায় একটা সংক্ষিপ্তসার দেওয়ায় পাঠকের খুব সুবিধে হয়েছে।

কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলেও এ বইখানি যে বাঙলা-সাহিত্যের পরিচায়ক হিসেবে খুব মূল্যবান হয়েছে, একথা জোর করে বলা যায়।

গীতাকল্প কৌমুদী, শ্রীশ্রীচণ্ডীকল্প কৌমুদীঃ—শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, কবিভূষণ, তত্ত্বনিধি প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ছাত্র পুস্তকালয়, ২০।১-সি, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা। উভয় পুস্তকেরই প্রত্যেকখানার মূল্য রাজ সংস্করণ ॥০ এবং সাধারণ সংস্করণ ।৵০ আনা।

গীতা এবং চণ্ডী হিন্দুর আদরের গ্রন্থ। গ্রন্থকারের পদ্যানুবাদ পাঠ বেশ প্রাঞ্জল হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহারাও এই অনুবাদ পাঠ করিয়া মূলের রস উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

পরিচয় (ফাল্গুন)—সম্পাদক শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও হিরণকুমার সান্যাল।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিশু মুখোপাধ্যায়, অমূল্যচন্দ্র সেন, সুধীরচন্দ্র কর, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, গৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, নরেশচন্দ্র রায়, সরোজকুমার নন্দী, নবেন্দু বসু প্রভৃতির রচনায় সমৃদ্ধ হইয়া ফাল্গুন সংখ্যা 'পরিচয়' প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংখ্যার প্রত্যেকটি প্রবন্ধই পাণ্ডিত্যপূর্ণ, কবিতাগুলিও সুখপাঠ্য।

ব্রহ্ম প্রবাসে শরৎচন্দ্র—যোগেন্দ্রনাথ সরকার রচিত ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২।০ মাত্র।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে যে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা লেখকের নিজের জীবনেরই প্রতিচ্ছবি বলিয়া তাহা বাস্তব ও প্রাণবন্ত হইয়া আমাদের মনকে অভিভূত করে। শরৎচন্দ্রের এই বৈচিত্র্যময় জীবনের যে রূপটি সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজ সেবায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই রূপটিই এই গ্রন্থের কয়েকটি প্রবন্ধে সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। 'সংগীতানুরাগী শরৎচন্দ্র', 'চিত্রশিল্পানুরাগী শরৎচন্দ্র', 'দরদী শরৎচন্দ্র', 'অধ্যয়নানুরাগী শরৎচন্দ্র', 'সাহিত্য-সাধক শরৎচন্দ্র', 'সমাজতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র' প্রভৃতি প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের ব্রহ্ম প্রবাসকালীন জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। নিজের কথা নিজে বলাতে শরৎচন্দ্রের স্বাভাবিক সঙ্কোচ ছিল বলিয়া তাঁহার জীবন সম্বন্ধে খুব সামান্যই আমরা জানিতে পারি। বিশেষ করিয়া রেঙ্গুন প্রবাসকালে শরৎচন্দ্র বাঙালীর নিকট অজ্ঞাত ও অপরিচিত, সুতরাং তখনকার জীবন খুব কম লোকেই জানেন। যোগেন্দ্রনাথ সরকার ছিলেন রেঙ্গুনে একই অফিসে শরৎচন্দ্রের সহকর্মী ও বন্ধু। শরৎচন্দ্র যখন বাঁচিয়া ছিলেন, তখন শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'বাঁশরী' নামক পত্রিকায় যোগেনবাবু শরৎচন্দ্রের ব্রহ্ম প্রবাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন এবং সেই প্রবন্ধগুলি যথাযথ সম্পাদনার পর শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বসু পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকের ভাষা সহজ ও ঝরঝরে, বর্ণনাভঙ্গীটি সুন্দর।

সাহিত্য সংবাদ

প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতা

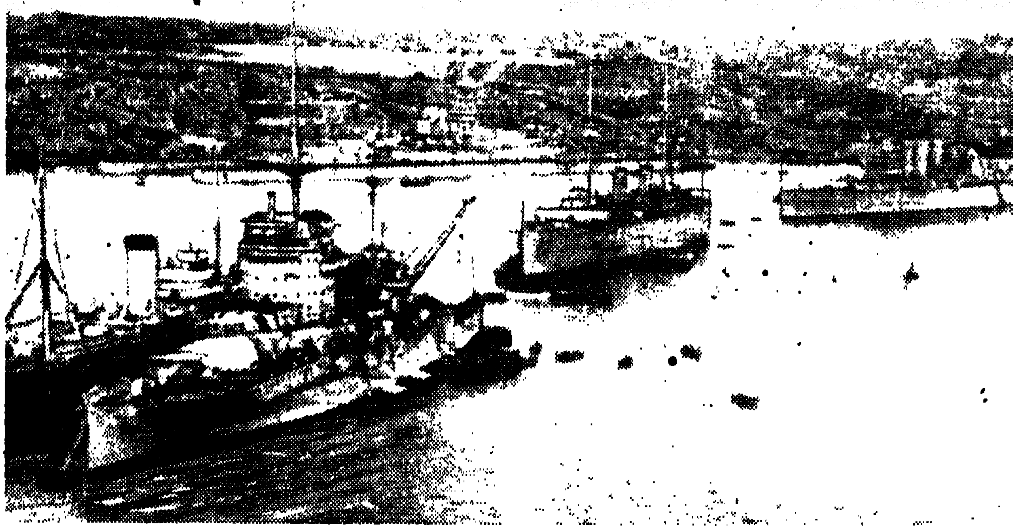
ঢাকার 'সাহিত্য-সংসদ'-এর বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে আমরা একটি প্রবন্ধ, একটি গল্প ও একটি কবিতা প্রতিযোগিতা আহ্বান করিতেছি। নরনারীনির্বিশেষে সকলেই ইহাতে যোগদান করিতে পারিবেন। কোন রকম প্রবেশমূল্যও নাই। প্রত্যেক বিষয়ের শ্রেষ্ঠ লেখককে একটি করিয়া রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে। সংসদের বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। রচনা—১৩৪৭ সনের ৩০শে চৈত্রের পর (ইং ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪১) আর গৃহীত হইবে না। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট অক্ষরে লিখিতে হইবে। কোনরূপ অনুসন্ধানের জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট প্রয়োজন। প্রতিযোগিতার ফলাফল উপযুক্ত সময় জানানো হইবে।

প্রবন্ধঃ—বর্তমান শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র আন্দোলনের প্রকৃষ্ট পন্থা ও তৎসম্ভাবিত পরিণতি (যে কোন একটি বিষয় লইয়া প্রবন্ধ লিখিলেও চলিবে)।

গল্পঃ—যে কোন ছোট গল্প হইলেই চলিবে।

কবিতাঃ—যে কোন কবিতা, কিন্তু তাহা মৌলিক হওয়া চাই।

রচনাদি পাঠাইবার ঠিকানাঃ—শ্রীবিভূতিভূষণ রায়, ২নং ঢাকেশ্বরী মিলস্, "দেশবন্ধু বিল্ডিংস্", পোঃ লক্ষ্মীনারায়ণ মিলস্, ঢাকা।



মাল্টায় বৃটীশ নৌবহরঃ সম্প্রতি এই স্থানে নাৎসী আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

৮ম বর্ষ] ১৭ই ফাল্গুন শনিবার, ১৩৪৭ সাল। Saturday, 1st March, 1941 [১৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব—

পরাধীনতার চাপ মারাত্মক। জাতির আত্মাকে তাহা অবসন্ন করে। দীর্ঘ পরাধীনতার চাপে জাতি তাহার আত্মাকে হারাইয়া ফেলিতে বসিয়াছিল, জড়ত্ব এবং পশুত্বে সে হইতেছিল অভিভূত আত্মমর্যাদা ও আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে; জাতির এমন সংকট মুহূর্তে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব এক অভূতপূর্ব এবং অলৌকিক ব্যাপার। একান্তই অচিন্ত্যনীয় এই লীলা। পাশ্চাত্যের শিক্ষাদীক্ষায় পরানুকরণ যখন জাতির হইয়াছিল লক্ষ্য, দাসত্বের দিকেই তাহার গতি হইয়াছিল দুর্নিবার; ভারতের অতি ঘোর সেই দুর্যোগ সন্ধিক্ষণে ভাগীরথীর তীরে এক নিরক্ষরপ্রায় ব্রাহ্মণের ভিতর দিয়া প্রকাশ হইল ভারতের সত্য এবং শাশ্বত আত্মার স্বরূপ—স্বয়ং জ্যোতিঃ অনিমানং অখণ্ডিতং। সেই অরুণ আলোকে ফুটিয়া উঠিল বাঙলার ভাব শতদল মনুষ্যত্বের অমর মহিমায়; পশুত্বকে পরাভব করিয়া উঠিবার প্ররোচনা লাভ করিল আবার বাঙালী। বাঙলার জাতীয়তার উদ্বোধনের মন্ত্রগুরু হইলেন ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। বাঙলার এই যে জাতীয়তা ইহা কোন দিনই ভেদকে স্বীকার করে নাই, চাহিয়াছে সমন্বয়কে। এই দিক হইতে ভারতের ভাবসম্পুট হইল এই বাঙলা দেশ। ঠাকুর শুনাইলেন সমন্বয়ের বাণী। তিনি দেখাইলেন জীবনের পথ, মানব-মহিমার উৎসের তিনি দিলেন সন্ধান। সেই মুহূর্তে জাতি হইল সঞ্জীবিত। মৃত্যুর পথ, পরধর্ম; পরবশ্যতার পথ হইতে জাতি মোড় ঘুরিয়া দাঁড়াইল আত্মার উন্নয়নের পথে, সে ধরিল জীবনের ধারা। বঙ্গ জাতীয়তার প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে উন্মুখ হইল, ব্যাকুল-আকুল ছন্দে; সমগ্র ভারতভূমিকে প্লাবিত করিয়া ছুটিল সে স্রোত বিশ্বের অভিমুখে, ভারতের আত্মসত্তার অমৃতময় অবদানের অর্ঘ্য লইয়া। ভারত তবে মরে নাই! বিশ্ববাসী চমকিয়া চাহিল আবার ভারতের দিকে। ভারতের আত্মার স্বীকৃতিতে সে সত্যের সন্ধান পাইল। অশ্রদ্ধা এবং অমর্যাদার পথ মৃত্যুরই পথ। মানুষকে অশ্রদ্ধা এবং অমর্যাদা করিবার এই মৃত্যুময় পথের মোড়ে সমন্বয়ের স্বয়ং জ্যোতি স্বরূপে দাঁড়াইলেন ঠাকুর তাঁহার বরাভয়ময় দিব্য হাসি লইয়া।

জানি, মোড় এখনও ফিরে নাই, মানব আত্মার যে পরিপূর্ণ মহিমা দেখাইলেন ঠাকুর, জগৎ তাহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই। যদি সে জিনিষ উপলব্ধি করিত, পরপীড়ন এবং নির্যাতন-স্পৃহার যে প্রচণ্ড তাণ্ডব আজ চলিতেছে তাহার অবসান হইত। অস্বীকার করিতে পারি না, এ সত্যকে যে, জাতি ঠাকুরের আদর্শকে আজও অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। যদি পারিত, পরাধীনতার জোয়াল কাঁধ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে মানুষের মত দাঁড়াইত। জাতির সর্বতোমুখী দুঃখ দৈন্য এবং বুভুক্ষাকে স্বীকার করিয়া—পশুত্বের সংগে আপোষ করিবার মত কার্পণ্যকে জাতি মানিয়া লইতে মুহূর্তের জন্যও সক্ষম হইত না। তবে আশা আছে, আত্মপ্রত্যয় জাতির একবার যদি জাগে তাহা একেবারে সুপ্ত এবং লুপ্ত হয় না। ঠাকুরের আবির্ভাব যে শক্তির সঞ্চার করিয়াছে জাতির অন্তরে, তাহার বীর্যময় প্রকাশ দেখিয়াছে জাতি স্বামী বিবেকানন্দের সাধনায়। সেই সাধনার আগুন জ্বলিতেছে আজও বাঙলার বুকে, নিভে নাই এবং কোনদিন নিভিবেও না। সে সাধনা সত্য হইয়া উঠিবে ভারতের মুক্তির ভিতরে। বিশ্ব-মানবের সংগে ভারতের সেদিন হইবে ঐকান্তিক যোগ। মানুষকে অমর্যাদা করিয়া মহামৃত্যুর পথে জগতে চলিতেছে যে আসুরিক অভিযান, মানবত্বের মহিমায় জাগ্রত ভারত সেই মহামোহ হইতে জগৎকে উদ্ধার করিবে। ঠাকুরের স্মৃতিপূজা আমাদিগকে আত্মপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত করুক; আমরা যেন মানুষ হইতে পারি, সবল হইতে পারি, পরাধীনতার ভিতর দিয়া জাতির মর্যাদাহানিকারী যে প্রবৃত্তিকে আমরা প্রশ্রয় দিতেছি, মনুষ্যত্বের মর্যাদায় তাহাকে যেন প্রতিরোধ করিতে প্রেরণা পাই। সেই পথে নিজেরাও বাঁচিব এবং মানুষকে অমর্যাদা করিবার আসুরিক স্পর্ধায় যাহারা মৃত্যুর উপাসনা করিতেছে তাহাদিগকেও বাঁচাইতে সক্ষম হইব।

গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্র—

সুভাষচন্দ্রের গৃহত্যাগের পূর্বে তাঁহার এবং গান্ধীজীর মধ্যে পত্রের যে বিনিময় হইয়াছিল, সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রগুলি পাঠ করিলে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, সমস্ত মতানৈক্য সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র বিনা সর্তে বর্তমান আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং সেজন্য গান্ধীজীর অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী সে অনুমতি দেন নাই। না দিবার কারণ এই যে, গান্ধীজীর মতে সুভাষচন্দ্র অহিংসায় পূর্ণ বিশ্বাসী নহেন। গান্ধীজী অহিংসার তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ এবং ওস্তাদ। তাঁহার উপর এবিষয়ে কথা কহিবার যে কেহ আছে এই ভূভারতে ইহা তিনি স্বীকার করেন নাই। কিন্তু অহিংসার তৌলদণ্ডে মহাত্মাজীর একান্ত অন্তরঙ্গ শ্রীরাজাগোপাল আচারী, সর্দার বল্লভভাই, পণ্ডিত জওহরলাল প্রভৃতি অখিল ভারতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির পুণার অধিবেশনে প্রস্তাব পাশ করিয়াও অহিংস থাকিলেন এবং কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ দেশরক্ষার জন্য অন্য উপায় ব্যর্থ হইলে অস্ত্রধারণও সমর্থন করিবেন, এ কথা ঘোষণা করিয়াও মহাত্মাজীর অহিংসার মানদণ্ডে নৈষ্ঠিক অহিংস রহিলেন, অথচ সুভাষচন্দ্র কথায় এবং কার্যে অহিংসার নীতির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ না করিয়াও অহিংসায় পূর্ণ বিশ্বাসী নহেন বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন এই রহস্য বুঝিয়া উঠা লোকের পক্ষে কঠিন হইবে। এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে ত্রিপুরী পর্যন্ত যাইতে হইবে। বাঙলায় পূর্ণ স্বাধীনতার প্রেরণাময় জনমর্যাদানিষ্ঠ জাতীয়তাবাদের আদর্শকে ব্যক্তিত্বের অন্ধ আনুগত্যে অভিভূত করিবার চক্রান্ত আরম্ভ হইয়াছিল সেই স্থান হইতে। যে চক্রের প্রতিষ্ঠা হয় তখন, সেই চক্রের ঘূর্ণনেই বাঙলার আত্মত্যাগী সন্তান আদর্শনিষ্ঠ সুভাষচন্দ্র রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইবার উপযোগী বলিয়া মহাত্মাজীর মতে বিবেচিত হইলেন। মহাত্মাজীর প্রতি আমরা অশ্রদ্ধা পোষণ করি না, ভারতের রাষ্ট্রীয় সাধনার ইতিহাসে তাঁহার অবদান অসামান্য। জগতের কাছে কংগ্রেসের দাবীর জোর তিনিই বাড়াইয়াছেন। কংগ্রেসের আজ যে প্রতিষ্ঠা এবং মর্যাদা তাহাও তাঁহার সৃষ্টি; কিন্তু কংগ্রেসের আদর্শ ব্যক্তি বিশেষের বিচার বিবেচনার ঊর্ধ্বে, এই আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইলে বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে। ভারতে ব্যক্তি বড় হইয়াছে কিন্তু জাতি জাগে নাই। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দাবাইয়া ব্যক্তিত্বের বিলাস ও বিশ্বপ্রেমের মোহান্তগিরির মাহাত্ম্যের মোহে জাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মুখ্য আদর্শকে যেন পরিচ্ছিন্ন না করে, বাঙলা দেশ ইহাই চায়। সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রক্ষেত্র হইতে অন্তর্ধানে সে আদর্শ পরিম্লান হইবে না।

যায় বঙ্গ সিংহাসন—

বাঙলার প্রধানমন্ত্রী হকসাহেবের অন্তরে সত্যের আগুন অহরহ জ্বলিতেছে, তবে আমরা বাঙালী জাতি, সত্যের পুরাপুরি আলোটা আমরা সহ্য করিতে পারি না। মেকলে সাহেব একথা বলিয়াছেন, একথা শুনাইয়াছেন কার্জন সাহেব, আর হক সাহেব সুবে বাঙলার কর্তা হইয়া সত্যের আলোকে সেই সত্যকেই বড় করিয়া দেখিয়া, অবাঙালীরা আমাদিগের সত্যনিষ্ঠা নাই বলিয়া যে অভিযোগ করে, এই কথাটাও আমাদিগকে শুনাইয়াছেন এবং সত্যের মহিমা সমঝিয়া চলিবার জন্য ধমকাইয়াছেন। কৃত্রিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরেই তাঁহার পদ মান এবং প্রতিষ্ঠার মূলে সুতরাং সেই সংখ্যা-গরিষ্ঠতা ক্ষুণ্ণ যাহাতে না হয় সেজন্য আকুলি বিকুলি তাঁহার হইবে এবং সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার কূটকৌশল তিনি প্রয়োগ করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। স্বার্থের টান বড় টান। তাঁহার বিবৃতির বচনভঙ্গী এবং তাহার তাৎপর্যার্থ যিনি উপলব্ধি করিবেন, তিনিই বুঝিবেন বেসামাল তিনি নহেন। স্বার্থ সামলাইবার দিকে তিনি ষোল আনার উপর আঠার আনা হুঁসিয়ার। সত্যনিষ্ঠার মহিমায় উদ্দীপ্ত হইয়া হকসাহেব অভিযোগ করিলেন যে, হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেখাইবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। যে মুহূর্তে তাহার প্রতিবাদ হইল, সত্যের মহিমা অটুট রাখিবার পরম প্রয়োজনে তিনি পাল্টা সুরে জবাব দিলেন, আমি "হিন্দুরা" সে কাজ করিতেছে, একথা বলি নাই। হিন্দুর নাম করি নাই। ঠাকুর ঘরে কে—কলা খাই নাই—সুতরাং তোমরাই কলা খাইয়াছ। ইহার পর সেন্সাস যখন আসিয়া পড়িল, তখন সত্যের মহিমা হকসাহেবের মধ্যে একান্ত হইয়া উঠিল; হিন্দুরাই যে দুষ্কৃতকারী এই কথা তিনি ঘোষণা করিলেন এবং হিন্দু দুষ্কৃতকারীদিগকে সাজা দিবার ভয় দেখাইলেন। আইনসভার ভাই বেরাদারদের প্রতি যে প্রেম মাঝে মাঝে উথলিয়া উঠে, সেই প্রেম তাঁহার উথলিয়া উঠিল; কারণ সত্যের ধ্বজাধারী যে তাঁহারাই। কিন্তু ইহার পর আরও আছে। সে বিবৃতি যেমন চমকপ্রদ তেমনই দুষ্কৃতকারী হিন্দু গণনাকারী ও হিন্দু সুপারভাইজারগণের পক্ষে চিত্ত ত্রাসকর। হকসাহেব বলিয়াছেন—"মুসলমানদের সংখ্যা হ্রাস এবং হিন্দুদের সংখ্যা বর্ধিত করিয়া দেখাইবার ষড়যন্ত্র কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য আমি শীঘ্রই একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিতেছি। তাহাতে আমি সকল কথাই প্রকাশ করিব। আমার বন্ধুরা যদি প্রত্যহ অন্তত ছয় কলম করিয়া জায়গা এজন্য খবরের কাগজে দিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে আমি এখন হইতেই আমার সংগৃহীত সংখ্যাগুলি প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছি। আমি যখন সকল সংখ্যা প্রকাশ করিব, তখন জগতের লোক দেখিতে পাইবে যে, বাঙলার মুসলমানদের সংখ্যা হ্রাস করিয়া দেখাইবার এবং সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর হিন্দু মহাসভার আধিপত্য স্থাপনের জন্য বহু বৎসর ধরিয়া কিরূপ গভীর ষড়যন্ত্র চলিয়া আসিতেছে।" হকসাহেবের এই চালও নূতন নহে, সুতরাং ইহার ফলে বিশ্ব জগতে বিপর্যয় ঘটিবার কোন কারণ আছে, এমন ভয় নাই। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের ফর্দ ঝাড়িয়া তিনি একদিন হিন্দু মন্ত্রীরা কংগ্রেসী প্রদেশে মুসলমানদের উপর কেবল অত্যাচার করিতেছে সেই বর্ণনায় জগৎকে স্তম্ভিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং 'স্টেটস্‌ম্যান' বহু কলম ব্যয় করিয়া জগৎকে তাহা শুনাইতেও

কস্‌র করে নাই; কিন্তু ফলে হইল কি? যাঁহারা লীগওয়ালার পিছনের পেলা তাঁহাদেরই তরফ হইতে প্রতিবাদ আসিল। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের কার্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ যাঁহারা সেই সব ইংরেজ গভর্নর প্রভৃতি করিলেন প্রতিবাদ। মুসলিম লীগের তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পর্যন্ত ধোপে টিকিল না। হক সাহেবের বহুবিস্তৃত এই বিবৃতি বা বিবৃতি সম্বলিত পুস্তকের পরিণতিও তাহাই হইবে। হক সাহেবের লক্ষ্য অভিযোগের প্রমাণ-সাপেক্ষতার উপর নয়, প্রমাণ-নিরপেক্ষ অভিযোগের একটা প্রচার-মূল্য আছে। তাঁহার উক্তি অনেকের মতে বেফাঁস বলিয়াই মনে হইবে কিন্তু ফাঁস তাহাতে যথেষ্টই আছে। সেই ফাঁস জাতির শিক্ষা, সভ্যতা এবং সংস্কৃতির কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া সর্বনাশের পথই উন্মুক্ত করিতেছে।

রেলওয়ে বাজেটের বাড়তি—

কোন বিদেশী পর্যটক ভারতের প্রসিদ্ধ একটি মর্মর সৌধ দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহার প্রশংসা করিব কি, কত কোটি কোটি লোকের রক্ত কররূপে শোষণ করিয়া এই সৌধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া আমার চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। রেলওয়ে বাজেটে অপ্রত্যাশিত উদ্বৃত্ত টাকার পরিমাণ দেখিয়াও আমাদের মনেও তেমনই উল্লাস বাড়ে নাই, বরং দুঃখই বাড়িয়াছে। কারণ এই যে টাকাটা উদ্বৃত্ত হইয়াছে গরীবের উপর ভাড়া এবং মাশুলের চাপের অনুপাতেই। যে পরিমাণ উদ্বৃত্তের প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ যাত্রী ও মালের উপর মাশুল বাড়াইয়াছিলেন, কার্যক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়ায় ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, অত বেশী ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধি করা সঙ্গত হয় নাই। তারপর এই ভাড়া এবং মাশুল বৃদ্ধির ফল ভোগী যদি হইত, দেশের গরীবের তাহা হইলেও সুখের বিষয় কিছু থাকিত; কিন্তু ভাড়া ও মাশুল কমাইবার কোন ভরসা কর্তারা দেন নাই। উদ্বৃত্ত টাকাটা বেশীর ভাগই জোয়াইয়াছে অবশ্য গরীব তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা, তাহাদের সেই ভারই বহন যদি করিতে হয়, তবে বাজেটের বাড়তিতে তাহাদের কি লাভ? যদি একটা পর্ব পড়িলেই ভেড়ার পালের মত দাঁড়াইয়া এবং সময়বিশেষে গাদাবন্দী হইয়া রেল ভ্রমণের প্রমোদ পোহাইবার দুর্ভোগই না তাঁহাদের কাটে, তবে গরীবের পক্ষে কর্তাদের কেরামতি দাঁড়ায় কোন্ দিকে? ইহার পর আমরা বাঙালী, আমাদের আতঙ্ক রহিয়াছে কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া লাইনটির সম্পর্কে বিশেষভাবে। জানি না, রেলওয়ে কর্তাদের কি মর্জি হইবে, কারণ কর্তার ইচ্ছায় কর্মই এখানকার ধারা, দেশের লোকের সুবিধা-অসুবিধার বিচার এদেশে হয় খুবই কম। যদি ঐ রেল-লাইনটি তুলিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে রেল-বাজেটের বাড়তির মজা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিবার অবসর আমাদের আরও জুটিবে।

ভারতসচিবের বক্তৃতার ধারা—

ভারতসচিব আমেরী সাহেব গত সোমবার লণ্ডন হইতে এক বেতার বক্তৃতা করিয়াছেন। এই বক্তৃতাতেও অন্যান্য বক্তৃতার বিশেষত্ব তাঁহার বেশ বজায় আছে, তবে মুসলিম লীগকে পিঠ চাপড়ানিটা এ বক্তৃতায় আরও কিছু সুস্পষ্ট। বক্তৃতায় ভারতসচিব সুর উঁচুতে চড়াইয়া বলিয়াছেন, 'আমরা যে আদর্শ লইয়া লড়াই করিতেছি, সেই আদর্শের সহিত ভারতে ব্রিটিশ নীতির সম্পর্ক কি? তাহার ফলে ভারতে কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে এবং এই মহাযুদ্ধের মূল লক্ষ্যে ভারতের স্থানই বা কোথায়? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়, ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্ত-শাসন—এই তিনটি জীবন্ত নীতি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহার জন্যই আমরা সংগ্রাম করিতেছি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে আমরা এবং লণ্ডনের অন্যান্য অংশ যে সব অংশীদারত্ব উপভোগ করিয়া থাকি, তাহাই ভারতের সম্পর্কে আমাদের বিঘোষিত নীতি। পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর মর্যাদা এবং অধিকতর স্বাধীনতা আর কোথায়ও নাই। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে সেই লক্ষ্যের দিকে একটা বিরাট পদক্ষেপ রহিয়াছে। বাঙলা, পাঞ্জাব, আসাম এবং সিন্ধু ভারতের চারটি প্রদেশে এখনও পূর্বোক্ত আইন অনুসারে শাসনকার্য নির্বাহ হইতেছে। প্রায় নয় কোটি লোকের বাসভূমি এই চারটি প্রদেশে ভারতীয় মন্ত্রিগণ গণতান্ত্রিক রীতিতে নির্বাচিত আইনসভার নিকট দায়ী থাকিয়া জনসাধারণের দৈনন্দিন কার্যকলাপের সহিত যুক্ত রহিয়াছেন। অন্যান্য প্রদেশে যে এই শাসনতন্ত্র বিকল হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, ভারতের বৃহত্তম এবং সর্বাপেক্ষা সংগঠিত রাজনীতিক দল অর্থাৎ কংগ্রেস অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—, গণতন্ত্রের নামে ভারতের জটিল রাজনীতিক জীবনে অন্যান্য প্রয়োজনীয় অংশের দাবী পদদলিত করিতে চাহিতেছেন। ভারতের নয় কোটি মুসলমান এবং দেশীয় রাজ্যগুলি সুদীর্ঘ বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সম্প্রতি জানাইয়া দিয়াছেন যে, যুদ্ধ শেষ হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব ভারতীয় ভাবধারার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইবে বটে; কিন্তু সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র যেমন জাতীয় জীবনের প্রধান প্রধান শ্রেণীর সম্মতিক্রমে রচিত হইয়া থাকে, ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রও সেইরূপভাবে রচিত হইবে।' ন্যায়, ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্তশাসন ব্রিটিশ জাতির এই তিনটি জীবন্ত নীতির প্রীতিরস ভারতবাসীরা কি আন্দাজ ভোগ করিতেছে, আমরা সে কথা বলিতে চাহি না; কারণ সে কথা বলিয়া লাভ নাই। যাহারা দুর্বল, তাহাদের পক্ষে ব্রিটিশ জাতির কাম্য ঐসব বড় জিনিষ কথার কথা মাত্র। আমরা শুধু জিজ্ঞাসা করিতে চাহি আমেরী সাহেবকে এই কথাটাই যে, কংগ্রেস ভারতের প্রয়োজনীয় অংশের দাবী পদদলিত করিতে চাহিতেছে, এ তত্ত্ব কোন্ পরম সত্যের আলোকে তাঁহার চিত্তে উন্মুক্ত হইল? সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থের ছুতা ধরিয়া গণতান্ত্রিকতাকে যাহারা দাবীয়া রাখিবার চেষ্টা

করিতেছে এবং সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথার বিষ শাসনতন্ত্রের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া যাহারা গণতান্ত্রিকতার করিয়াছে মূলোচ্ছেদ, গণতন্ত্রের নিন্দাই তাহাদের মুখে শুনায় ভাল, ইহা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু গণতন্ত্রের নামে কংগ্রেস ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের দাবী পদদলিত করিয়াছে, এ তথ্য তিনি কোথা হইতে পাইলেন; মুসলিম লীগের চাঁইয়ের নিকট হইতে নিশ্চয়! আমাদের তো মনে হয় সম্প্রতি মুসলিম লীগের কাউন্সিলের অধিবেশনে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে শাসাইয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, আমেরী সাহেবের বক্তৃতাতে রহিয়াছে, তাহারই সহানুভূতিসূচক সাড়া। মুসলিম লীগের মোড়লেরা ব্রিটিশ প্রভুদিগকে শাসাইয়া বলিয়াছেন—মুসলিম লীগের দাবীর প্রতিকূলে কংগ্রেসকে যদি কোন অধিকার দেওয়া হয়, তবে মুসলিম লীগ সমস্ত শক্তি লইয়া তাহাতে বাধা দিবে। এতদিন ভারতসচিব প্রকারান্তরে কংগ্রেসকে খোঁচা দিতেন এবং লীগওয়ালাদিগকে উস্কাইয়াছেন। এখন প্রখর উল্লাসের চোটে ভারত সচিবের মুখ একেবারে খুলিয়া গিয়াছে, কংগ্রেসের নাম খোলসা বলিয়া দিয়া পাকিস্থান ওয়ালাদিগকে তিনি পিঠ চাপড়াইয়াছেন। ভারতের নয় কোটি মুসলমানের মধ্যে মুসলিম লীগের প্রভাব কতখানি, ভারতের বর্তমান জাতীয় আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অবদানের ব্যাপারটা চোখের সম্মুখে দেখিয়াও চোখ বুজিয়া সত্যকে অস্বীকার করাতে লজ্জা বোধ মিঃ আমেরী শ্রেণীর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর নাই, ইহা আমরা জানি; কিন্তু এমন ধাপ্পাবাজীতে জগতের লোককে ভুলান যায় না।

বশংবদ মন্ত্রিমণ্ডল—

পাট কলওয়ালা শ্বেতাঙ্গদের বার্ষিক সভায় বক্তৃতাকালে চটকলওয়ালা সমিতির সভাপতি মিঃ ওয়াকার বলেন, '১৯৪০ সালে চটকলে মজুরদের কার্যকাল সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা হইতে কমাইয়া ধীরে ধীরে ৪৫ ঘণ্টায় নামান হয়। ইহা ছাড়া গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে মাসের মধ্যে এক সপ্তাহ করিয়া কল বন্ধ রাখা হইয়াছে। খাটুনীর হার যেমন যেমন হইয়াছে, সেই হারে মজুরদের সাপ্তাহিক রোজগারও তেমনই কমিয়াছে, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও গত বৎসরের আগষ্ট মাস হইতে এপর্যন্ত কোন চটকলে ধর্মঘট হয় নাই।' এই হিসাব দেখিয়া সাধারণের ধারণা হইবে মজুরদের পেটে ক্ষুধা যতই বাড়ান যাইবে, ধর্মঘটও ততই কমিবে। অন্য সব শ্বেতাঙ্গদের দেশে ইহার বিপরীত রীতিই দেখা যায়; কিন্তু কালা আদমীর দেশে বোধ হয় ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু ধর্মঘট কমিবার এই আনুমানিক কারণ ছাড়া ওয়াকার সাহেব প্রমাণিক কারণও দেখাইয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে হক মন্ত্রিমণ্ডলের প্রশস্তি কীর্তন করিয়াছেন। তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলেন, শ্রমিক আন্দোলনকারীদের সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের যে প্রতিশ্রুতি হক মন্ত্রিমণ্ডল দিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের এতৎসম্পর্কিত ব্যবস্থায় আমরা সন্তুষ্ট হইতেছি। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং—মন্ত্রিমণ্ডলের তাহাতেই চতুর্বর্গ সিদ্ধি। কারণ দেখা যাইতেছে, শ্বেতাঙ্গ স্বার্থবাহদের স্বার্থরক্ষায় মন্ত্রিমণ্ডলী বশংবদ হইলেও চটকলওয়ালারা মন্ত্রিমণ্ডলের নিকট বশংবদ নহে। চটকলওয়ালারা মাসে যে পরিমাণ পাট কিনিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তাহারা তাহা পালন করে নাই। ওয়াকার সাহেবই স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহারা গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে ১৭ লক্ষ মণ পাট কম খরিদ করিয়াছেন। বাঙলার গরীব পাটচাষী এবং মিল মজুরদের জন্য বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের দরদের প্রমাণ ইহার চেয়ে আর কিছু হইতে পারে না। বাঙলার গরীবদের অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক। ওয়াকার সাহেব এবং তাঁহার শ্রেণীর সার্টিফিকেটই বাঙলার মন্ত্রীদের বুকে আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়াছে। সে তরঙ্গের ভঙ্গী অর্থসচিব সুরাবর্দী সাহেবের বাজেট বক্তৃতাতেই বিচ্ছুরিত হইয়াছে।

বাঙলা ভাষার স্থান—

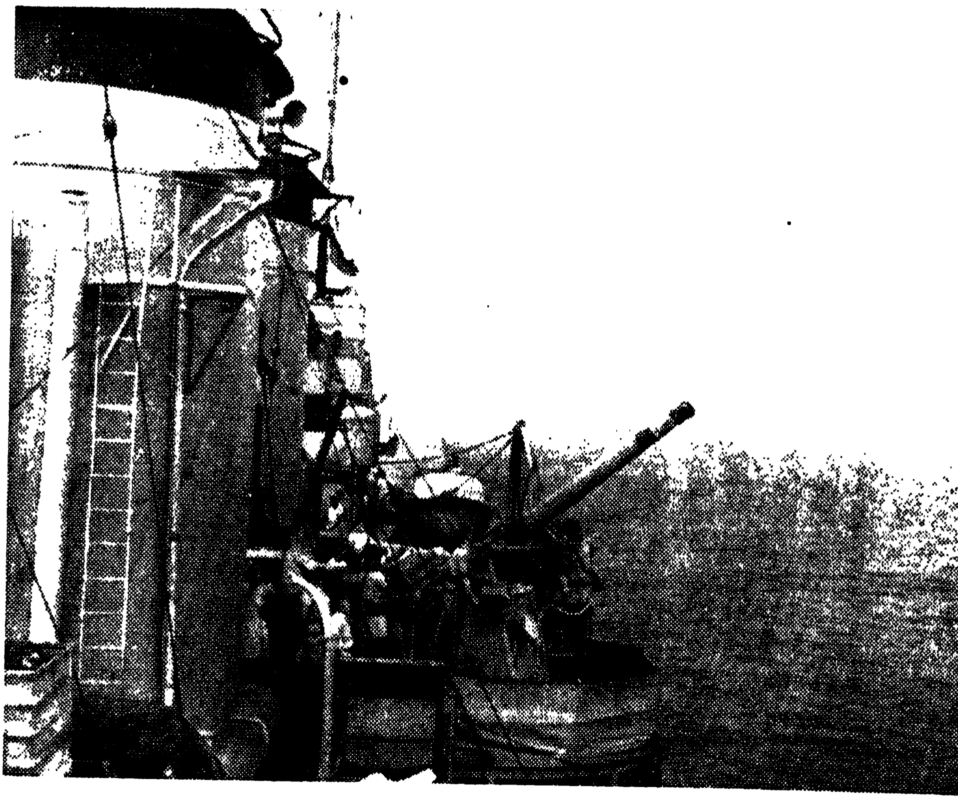
এলাহাবাদের এংলো-বেঙ্গলী ইণ্টার মিডিয়েট কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় যুক্ত প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ জে সি প্রাইস্ বলেন, "বাঙলা সাহিত্য একটি প্রাণবন্ত সাহিত্য। এই ভাষা বহু বড় বড় কবি ও লেখকের জন্মদান করিয়াছে। আমি নিজে সর্বদাই এই ভাষাকে ভারতের ফরাসী ভাষা বলিয়া মনে করি।" বাঙলা ভাষাকে এই মৌখিক প্রশংসা করার সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশে বাঙলা ভাষাকে চাপিয়া মারিবার চেষ্টা হইতেছে ইহাই দুঃখের বিষয়। বাঙলা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের জাতীয়তাবাদের বিস্তার বিদেশী প্রভুদের ছিল এই ভয়, এই ভয়ে তাহারা বাঙলা দেশের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া বাঙালীকে দুর্বল করিতে যেমন চেষ্টা করিয়াছেন, বাঙলা ভাষারও বিস্তারে সর্বতোভাবে তেমনই বাধা দিয়াছেন। এখনও বিভিন্ন প্রদেশে শুধু বিদেশীদের মনে নয়, এই দেশের লোকের মনেও বাঙলার জাতীয়তাবাদের প্রসারের সেই ভীতি বাঙলা ভাষা চর্চার পথে বাধা দিতেছে; যাহারা বাঙালীর ছেলে, মাতৃভাষা যাহাদের বাঙলা, তাহাদিগকে হিন্দী অথবা উর্দু মাতৃভাষারূপে শিখিতে বাধ্য করান হইতেছে। যুক্ত প্রদেশও এইরূপ ব্যবস্থার বাহিরে নয়। বিদেশীরা বাঙলা ভাষাকে, বাঙলার জাতীয়তাবাদকে যতই ভয় করুক, ভারতবাসীর অন্তত সে ভয় করা উচিত নয়। বাঙলা ভাষার প্রাণশক্তি হইল স্বাধীনতার প্রেরণা এবং সে স্বাধীনতা সর্বভারতীয় জাতীয়তার অনুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতা। এই প্রেরণা পাওয়াতে লাভ সকলেরই। আমরা কাহাকেও নিজের মাতৃভাষা ছাড়িতে বলিতেছি না, তবে বাঙলা ভাষাকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখিতে বলিতেছি এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা ভাষা শিক্ষার সুবিধা যাহাতে হয়, তেমন ব্যবস্থা করিতে বলিতেছি। সর্বোপরি বাঙলার বাহিরে যেসব বাঙালী বাস করেন, তাহাদিগকে মাতৃভাষা শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টার অনিষ্টকারিতা নিরপেক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া তেমন সঙ্কীর্ণতা হইতে তাহাদিগকে মুক্ত হইতে বলিতেছি।

জগৎ জোড়া সমরের আশঙ্কা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রনীতিক সিনেটার জর্জ গত ৯ই ফাল্গুন মার্কিন রাষ্ট্রসভায় তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, জার্মানি যে অতি দ্রুত অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমার মনে হয়, আগামী ১০ দিনের মধ্যেই গুরুতর রকমের কিছু ঘটিবে। মার্কিন সেনাধ্যক্ষ জেনারেল জর্জও মার্কিন সিনেটের রাষ্ট্র সমিতির গোপন বৈঠকে এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরের পরিস্থিতি অতি সঙ্কটজনক।

পক্ষান্তরে জাপানের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ মাৎসুওকা প্রশান্ত মহাসাগরে ইংরেজ, মার্কিন এবং অষ্ট্রেলিয়ান ও নিউজীলাণ্ডের বেগ পাইতে হয় না। যখন ইংরেজ ব্রহ্ম ও ভারতের রাস্তা খুলিয়া দিবে এই ঘোষণা করে, তখন জাপান চোখ রাঙাইয়া ছিল যথেষ্ট, কিন্তু পরে আবার সুর ঘুরাইয়া লয়; সেইরূপ জাপান জার্মানি ও ইতালির সঙ্গে সন্ধি সর্তে আবদ্ধ হইয়া আমেরিকাকে চোখ রাঙাইতে থাকে, তারপর আমেরিকা একটু কড়া ভাব দেখায়, তখন জাপানের সুর কোমলের খাদে নামিয়া আসে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, জাপান সাম্রাজ্যবিস্তার প্রয়াসী। নব এসিয়া গঠন প্রভৃতি নীতি এবং আদর্শবাদের অন্তরালে সাম্রাজ্যবাদীসুলভ



সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ নৌঘাঁটি

সতর্কতার ব্যবস্থা অবলম্বন সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া বলেন, আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য ইংরেজ এবং আমেরিকা প্রস্তুত হইতেছে, ইহা সত্য হইতে পারে। সকলেই বুঝিতে পারিবে যে, এই সব বিধিব্যবস্থা জাপানকে লক্ষ্য করিয়াই হইতেছে। যদি তাহাই হয়, তবে আমি এই কথা বলিতে ইচ্ছা করি যে, উহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক কারণ ইংরেজ এবং আমেরিকার পক্ষে উদ্বেগের কারণ সৃষ্টি হইতে পারে জাপান দক্ষিণ সমুদ্রে এমন কিছু করে নাই। এ তো মুখের কথা, ভিতরের মতলব কি, বুঝিবার উপায় নাই। জাপানের মন্ত্রীরা কখনও কড়া কখনও কোমলে সুর ধরিতেছেন কিন্তু তাঁহাদের এই সব কথার আড়ালে কাজের দিকে নজর একটা আছে এবং সে নজরটা কোন্ দিকে বুঝিতে এই বুভুক্ষাই তাহার মনে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে এবং "বুভুক্ষিতং কিং ন করোতি পাপং,"। সকল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই যখন সেই পথের পথিক তখন কথায় বিশ্বাস কেহই করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। জাপান ত্রিশক্তির সঙ্গে যে মৈত্রীতে বদ্ধ হইতেছে তাহার কারণও আর কিছু নয়, রাজনীতিক চাতুর্যে যদি সাম্রাজ্য-বিস্তার ক্ষুধা কিছু মিটাইয়া লওয়া যায় ইহাই অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ মেঞ্জিস সেদিন "রয়টারের" প্রতিনিধির নিকট সেই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন, এই সত্যটি বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, বর্তমান সংগ্রামে জাপান আমাদের বন্ধু নহে, কারণ, জার্মানি এবং ইতালির সঙ্গে সে মৈত্রীর সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে।

ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীর দল এসিয়ার কালা আদমী উদ্ধারের মন্ত্র আওড়ায় যে উদ্দেশ্যে ইউরোপের গুরুদের যোগ্য চেলা জাপানও নূতন এসিয়ার গঠনের মন্ত্র আওড়াইতেছে সেই একই উদ্দেশ্যে। সকলের এক এবং অখণ্ড আদর্শ হইল বিশ্ব শান্তি এবং মানব মৈত্রী। জাপান এই মহান্ কর্তব্য পালনে ফুরসুৎ যদি কিছু পায়, তবে যে ছাড়িবে না ইহা সকলেই বুঝে। চীনের সাধারণ-তন্ত্রীদের সমূলে উচ্ছেদ করিবার সংকল্পে সে কয়েক বৎসর ব্যাপী যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে তাহাতেই সে পরিচয় পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে যাহারা সুবিধা করিয়া লইয়াছে, তাহারা যেমন নিজেদের স্বার্থটা যাহাতে পাকা থাকে শান্তির মন্ত্র আওড়াইয়া সেই চেষ্টা করিতেছে, তেমনই সাম্রাজ্যবাদের নূতন সাধকেরা সাম্রাজ্যবিস্তারের জন্য শান্তির মন্ত্র উচ্চারণে ব্রতী হইয়াছে। সুতরাং সেয়ানে সেয়ানে এখানে কোলাকুলি—সমধর্মী সকলেই।

জাপানের মন্ত্রীরা শান্তির বাণী যতই বলুন, বিশ্বাসের কোনই কারণ নাই। যে কোন মুহূর্তে চাকা ঘুরিয়া যাইতে পারে, কড়ি হইতে সুর যেমন কোমলে নামিয়াছে, তেমনই কোমল হইতে কড়িতে উঠিতেও আটক নাই। জাপান সাম্রাজ্য-বিস্তার চায়, এ বিষয়ে কাহারও মনে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু এবিষয়ে কতকগুলি বাধা তাহার আছে। প্রথমত সে চায় ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করিতে; কিন্তু এই কাজটি সে এমনভাবে করিতে চায় যাহাতে আমেরিকা না চটে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যেমন সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণতার স্তরে পেঁছিয়াছে, তাহাতে জাপানের পক্ষে এই কাজ করা অত্যন্তই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। আমেরিকা যদি এই বিষয়ে অন্তরায় না হইত, তাহা হইলে হিন্দুচীনের দিকে হস্ত বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে জাপান গোপনে গোপনে ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পথেও আগাইয়া আসিত এবং সিঙ্গাপুরের ঘাঁটীর মুখে সমুদ্র-পথগুলি জুড়িয়া বসিতে চেষ্টা করিত। সিংগাপুরে ব্রিটিশের ঘাঁটীর সম্বন্ধে জাপানীদের প্রীতির ভাব যে কোন দিনই নাই এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।



অস্ট্রেলিয়ার সামরিক ঘাঁটি

নরফোক্ দ্বীপ

আমাদের মনে হয়, জাপানের ভবিষ্যৎ নীতি বর্তমান যুদ্ধ হইতে একটা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নহে। ইউরোপে, বিশেষভাবে বলকানে হিটলারের এবং মুসোলিনীর চাল কি আকার ধারণ করে, সে তাহারই অপেক্ষা করিতেছে এবং সেই অনুসারে জাপানের রাষ্ট্রনীতির গতি ঘুরিবে। এ কথা সত্য যে, ইতালির পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া সামলাইবার উদ্দেশ্যে হিটলার অবিলম্বেই বলকানের ভিতর দিয়া এবং যদি সম্ভব হয়, স্পেনের পথে নূতন একটা চাল চালিবেন। বলকানের এই সমস্যা দিন দিনই ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। ইংরেজ স্ত্রীলোকদের বুলগেরিয়ার রাজধানী ত্যাগের সংবাদে বুঝা যাইতেছে সেখানকার হাওয়া কোনদিকে বহিতেছে। জার্মানি যদি বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করে, তাহা হইলে তুরস্ক কি করিবে? বুলগেরিয়ার সঙ্গে তুরস্কের একটা অনাক্রমণ চুক্তি হইয়াছে বটে; কিন্তু জার্মানি বুলগেরিয়ার সম্মতিসূত্রে যদি সেখানে প্রবেশ করে, তবে তুরস্ক তাহাতে বাধা দিবে এমন কোন সর্ত তাহাতে নাই বরং সর্ত তাহা না করিবারই অনুকূলে রহিয়াছে। এইদিক হইতে তুর্ক-বুলগার চুক্তি ইংরেজের সহায়ক হয় নাই, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। হিটলার গ্রীসের দিকে আগাইবার উদ্যম নানাদিক হইতে পাকাইতেছেন। গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী নাৎসী দলের একবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা দিবসে বক্তৃতাকালে হের হিটলার বলিয়াছেন, 'আমরা আমাদের নূতন ডুবো-জাহাজগুলির জন্য অপেক্ষা করিতেছি; মার্চ এবং এপ্রিল মাসে নৌসংগ্রাম আরম্ভ হইবে। ইংরেজ, ইউরোপ-ভূখণ্ডের যেখানেই সৈন্য নামাইতে চেষ্টা করিবে, আমরা তাহাদিগকে বাধা দিব। গ্রীসের ভিতর জার্মান সেনার প্রবেশের সংকল্পের ইহাতে আভাষ পাওয়া যায়; তার পরে আফ্রিকায় গিয়া সংগ্রামের হুমকিও হিটলার দিয়াছেন। তিনি বলেন, বিগত শরৎকালে ইংরেজেরা বলিয়াছিল যে, জার্মানেরা যদি ইংলণ্ডে অবতরণ করিতে চেষ্টা করে, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ১৯৪১ সালের বসন্তকালে গ্রেট ব্রিটেন ইউরোপের যুদ্ধে জয়লাভ করিবে। অবশ্য তারপর দেখা যাইতেছে, তাহারা তাহাদের জয়ের বছর অন্যত্র সরাইয়া লইয়াছে। আমাদের তাহাদের পিছু ছুটিতে হইবে। তাহারা যেখানে যাইবে,

খ‍ুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদিগকে আঘাত করিতে হইবে এবং আমাদের সে আঘাত অত্যন্ত মারাত্মক হইবে।" হিটলারের এই উদ্যমের সম্ভাবনা ব‍ুঝিয়াই ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব মিঃ ইডেনের মিশরে এই তৃতীয়বার গমন। হিটলার যদি গ্রীস আক্রমণ করেন কিংবা উত্তর আফ্রিকার দিকে সেনাদলের অভিযানে উদ্যত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রবলভাবে বাধাদানের ব্যবস্থা করাই যে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব মিঃ ইডেন ও স্যার জন ড্রিলের মিশর গমনের ম‍ুখ্য না হইলেও অন্যতম কারণ, এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

জাপান জার্মানির বন্ধ‍ুশক্তি। জার্মন উপদেষ্টারা জলপথে গিয়া জার্মানি কেতায় রণবিদ্যায় জাপানী সৈন্যদিগকে তৈয়ার করিতেছেন এবং তাহাদের এই কাজ বহ‍ুদিন হইতেই চলিতেছে বলিয়া শ‍ুনা যাইতেছে। জাপান এশিয়ায় যদি ইংরেজের উপর চাপ দেয়, তাহা হইলে হিটলারের পক্ষে ইউরোপের দিকে বিশেষ স‍ুবিধা হইবে, হিটলার তাঁহার বসন্তকালীন সমরারম্ভে জাপানের দিক হইতে এই আন‍ুকূল্যের আশায় থাকিবেন ইহা অসম্ভব নয়; কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, আমেরিকার মনে সন্দেহের ভাব স‍ৃষ্টি না করিয়া জাপানের পক্ষে তাহা সম্ভব হইবার উপায় নাই। পক্ষান্তরে জাপানের সঙ্গে আমেরিকার যদি য‍ুদ্ধ বাধে তাহা হইলে আমেরিকা হইতে ইংরেজপক্ষ সমরোপকরণ প্রভৃতির যে সাহায্য পাইতেছেন, আমেরিকা আর তেমনভাবে সে সাহায্য করিতে পারিবে না; স‍ুতরাং হিটলার ইংরেজকে কাব‍ু করিতে পারিবেন, ত্রিশক্তির মনের ধারণা এমনও থাকিতে পারে। কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মিঃ র‍ুজভেল্ট সেদিন স্পষ্টভাষায় এই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, আমেরিকাকে যদি জাপানের সঙ্গে য‍ুদ্ধে নামিতেই হয়, তাহা হইলেও ইংরেজকে আমেরিকা যেভাবে সাহায্য করিতেছে তাহার ক্ষ‍ুণ্ণ হইবে না।

আমেরিকা জাপানের বির‍ুদ্ধে য‍ুদ্ধে নামিবে কি না, একথা এখনও বলা যায় না; তবে ইহা সত্য যে, ইংরেজকে সে সাহায্য করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও যতটা পারে সাহায্য করিতে ত্র‍ুটি করিবে না। জার্মানি কিংবা জার্মানির বন্ধ‍ুদের ইহা মনঃপ‍ূত নয়। ম‍ুখে বোলচাল যাহাই হউক না কেন, ভিতরে ভিতরে সকলেই হ‍ুঁসিয়ার আছেন এবং থাকা স্বাভাবিকও। মালয় দ্বীপে অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যদের অবতরণ ও সিঙ্গাপ‍ুরের প‍ূর্বদিকের প্রবেশপথে ব্রিটিশ নৌবিভাগ কর্তৃক মাইন পাতাতে জাপান চটিয়া উঠিয়াছে এবং বলিতেছে আমরা কি করিয়াছি যে এমন চাঞ্চল্য, আমরা তো নিছক শান্তিই চাই প্রশান্ত মহাসাগরে। ইহার পর, ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা হইতে দ‍ুই শত সামরিক উড়োজাহাজ সিঙ্গাপ‍ুরে পেশৌছিয়াছে; শ‍ুধ‍ু তাহাই নহে, চীনের যে জাতীয় দলের সঙ্গে জাপানীদের লড়াই চলিতেছে এবং যে চীনা জাতীয় দল চীনে জাপানের বিশ্ব শান্তি এবং মানব মৈত্রী, বিশেষভাবে এসিয়াবাসীদের সভ্য করিবার অভিযানের একান্ত পরিপন্থী, সেই চীনা জাতীয়তাবাদী গভর্নমেণ্টকে সাহায্য করিবার জন্য আমেরিকা হইতে ৭০খানা উড়োজাহাজ পাঠান হইয়াছে। ইহার পর আরও আছে। ওলন্দাজ প‍ূর্ব ভারতীয় দ্বীপপ‍ুঞ্জেও বারজন ব‍ুড়া গোছের মার্কিন বিমানবীর যাইতেছে, সেখানে গিয়া তাঁহারা উড়োজাহাজে লড়াই শিক্ষা দিবেন। হল্যাণ্ড এখন জার্মানির দখলে। জার্মনেরা হল্যাণ্ডের কোন গভর্নমেণ্ট আছে ইহা স্বীকার করে না। জাপানের পররাষ্ট্রসচিবের বক্তৃতায় প্রকাশ পাইয়াছিল যে, জাপানের বন্ধ‍ু জার্মানি কর্তৃক খারিজ লণ্ডনস্থ সেই হল্যাণ্ডের গভর্নমেণ্টের সঙ্গে জাপান ওলন্দাজ প‍ূর্ব ভারতীয় দ্বীপপ‍ুঞ্জ সম্বন্ধে আলোচনা চালাইতেছিল। এই আলোচনার ফলে কি ঘটিয়াছে, এখনও সরকারীভাবে জানা যায় নাই, তবে আমেরিকা কর্তৃক প‍ূর্বভারতীয় দ্বীপপ‍ুঞ্জের ওলন্দাজ গভর্নমেণ্টের সৈন্যদিগকে বিমানবিদ্যা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে বিমানবীর পাঠানোতেই তাহার কিছ‍ু আঁচ পাওয়া যায়।

ফরাসী হিন্দ‍ুচীনে জাপানের সেনাসন্নিবেশে ইংরেজ এবং আমেরিকার উদ্বেগ হওয়া যে স্বাভাবিক একথা জাপসচিব মিঃ মাৎস‍ুওকা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, কি করিব, প‍ূর্ব এসিয়ায় শান্তি স‍ুনিশ্চিত করিবার দায়েই আমাদিগকে উহা করিতে হইয়াছে। চীনের জাতীয়তাবাদী গভর্নমেণ্ট আমাদের সেই শান্তি প্রয়াস পণ্ড করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগকে সায়েস্তা করিবার জন্যই ফরাসী হিন্দ‍ুচীনের গভর্নমেণ্টের সঙ্গে চুক্তি করিয়া আমরা ঐ কাজ করিয়াছি। কিন্তু জাপানের ব‍ুঝা উচিত ছিল এই সত্যকে যে, বিশ্বে শান্তি এবং মৈত্রী প্রতিষ্ঠার ব্রত তাহারই একচেটিয়া নহে, এক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী আরও আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ দিকে জাপানীরা হাত বাড়াইবার চেষ্টা যে করিতেছে, স্পেনের জাপ রাষ্ট্রদ‍ূত মিঃ ইয়াকি সিরোস‍ুমাও তাহার একটা ভাষ্য দিয়াছেন। তিনি বলেন, আমেরিকা এবং ইংরেজ এই ক্ষেত্রে জাপানের সম্বন্ধে ভুল ব‍ুঝিয়াছে। জাপানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল শান্তিপ‍ূর্ণভাবে ঐসব অঞ্চলে অর্থনীতিক অভিযান অর্থাৎ আর্থিক প্রতিপত্তি স্থাপন।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে শান্তির জন্য জগৎজোড়া একটা তোলপাড় আরম্ভ হইয়াছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার মহান্ ব্রতের প্রতিপালনের জন্য সকলেই আকুল। এই আকুলতার ফলে বিশ্বের অবস্থা কি দাঁড়াইবে, ইহা বলা যাইতেছে না। বিলাতে ইংরেজ সাংবাদিক মিঃ ভার্নন বার্টলেট জাপানের কার্যাবলীকে ব্রিটেনের বির‍ুদ্ধে এক্সিস শক্তিবর্গের প‍ূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিবার বিশিষ্ট পরিকল্পনার একটা অংশ বলিয়াই অন‍ুমান করিয়াছেন। জাপানের মালয় অথবা প‍ূর্ব ভারতীয় দ্বীপপ‍ুঞ্জে আগমনের সম্ভাবনা, জার্মানির বলকানের ভিতর দিয়া প‍ূর্ব ভূমধ্যসাগর অতিক্রম এবং স্পেন অথবা ফ্রান্স কর্তৃক প‍ূর্ব ভূমধ্যসাগর আক্রমণের জন্য চাপ দেওয়া, এক সঙ্গে এইগ‍ুলি আরম্ভ করাই নাকি হিটলারের মতলব, তিনি এই কথা বলেন। যদি তাহাই হয়, তবে জগতের সর্বত্র সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে এবং ভারতের তোরণদ্বারেও তাহা আসিয়া পেশৌছিবে এমন আতঙ্কের কারণ রহিয়াছে।

কবিতা

বসন্ত

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

হে বসন্ত এলে তুমি বৎসরান্তে ফিরিয়া আবার,
এখনো রয়েছি হেথা টুটেনি বন্ধন এ ধরার।

তবু জানি বিদায়ের দিন
আমার ঘনায়ে আসে হে চির-নবীন,
আমি চলে যাব,
সেই সাথে চিরতরে তোমারে হারাব।

তাই এ মাটিরে আমি প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরি,
তোমার সমীর স্পর্শে কিশলয়ে আপনারে ভরি।
মোর ডালে ডালে
কোকিল আজিও বসি কুহুতান ঢালে।

সমাসন্ন বিরহ-সন্ত্রাসে
বহু স্মৃতি ঘনীভূত সুরবনির্যাসে
তার মধু কণ্ঠস্বর হয়েছে মধুরতর আজি,
ইন্দ্রিয়ের তারে তারে সুরকম্প্র স্মৃতি ওঠে বাজি।

এই চৈত্রনিশি
বহু চৈত্র রাত্রি সনে গেছে আজ মিশি
স্মৃতিমাখা দর্পণে দর্পণে
একা সে বিচিত্রা হয়ে দেখা দিল এ মুগ্ধ নয়নে।

আমার অতীত বর্তমান
একাকার হয়ে আজি ঘুচায়েছে সব ব্যবধান,
সর্ব দেশকাল
আমার চৌদিক ঘেরি রচিয়াছে চারু চক্রবাল।

এই সান্দ্র অন্তিম যৌবনে
আবার ভরিলে মোরে হে বসন্ত নবমুঞ্জরণে।

শালবন

সুশীল রায়

অপরূপ পরিচ্ছন্ন বন—
আকাশে অঙ্গুলি তুলি' যেন কা'রে করে সম্ভাষণ।
চারিদিকে স্তব্ধতার নিখুঁত বুনন
এই শালবন।

চতুর্দিকে নির্বিকার পরিষ্কার অপরূপ শিলা—
এখানে আসার হেতু বায়ু পরিবর্তন-অছিলা।
এখানে বাতাসে নাই শহরের উচ্ছৃঙ্খল শীত
এখানে আকাশে পাই নম্রতার প্রসন্ন ইঙ্গিৎ।
প্রাতঃভ্রমণ সারি পান করি' ভোরের কুয়াশা
দুপুর কাটাই সুখে আলস্যে ও অবকাশে ঠাসা।
লতায় পাতায় ঘেরা মোর কাষ্ঠনির্মিত প্রাসাদ—
সকালে বিকালে রাতে দেয় মোরে নূতন আস্বাদ।

একদা বসিয়া শূন্যমন—বেলা দ্বিপ্রহর,—
অতর্কিতে মোরে আসি, আক্রমণ করিল শহর।
ভাঙ্গা-ইংরাজিতে শুনি যুদ্ধবার্তা ঃ জর্মান-রেডিয়ো;—
পাশের বাঙলায় কাল এসেছেন প্রবীণ এস-ডি-ও
সসৈন্যে—সপরিবারে। মেয়েতে ও সোফারে চাকরে
কম ক'রে দশ জন শুধু মোরে দেখিছে হাঁ ক'রে।
কমলা গৌরী ও রাণী আরতি ও সুনীলা সরকার—
বুঝিনে আমায় দেখা তাহাদের এত-কী দরকার।

বীভৎস বিকৃত এই বন—
নীরবে করিল জীর্ণ অতর্কিত এই আক্রমণ।
বেতারে অনেক রাত্রে শেষ হ'লো দিল্লীর প্রোগ্রাম—
'পারেনি' 'সারেনি' ব'লে সুরু হ'লো হারমোনিয়াম।
রাতারাতি মালপত্র বেঁধে ফেলি একাই ঝটপট—
প্রত্যুষে প্রথম ট্রেণে নিরিবিলি দিলেম চম্পট॥

মৃগতৃষ্ণা

শ্রীপরেশনাথ সান্যাল

সোনার হরিণী ছোটে ঃ জনারণ্যে মৃগয়া বিহার।
আকাঙ্ক্ষার উজ্জীবনে সাফল্যের সোনালী বিলাস
ধনুকে যোজিত শর লক্ষ্য ভুলে ব্যর্থ বারম্বার।

দিগন্তে মাটিরে ছুঁয়ে আকাশ নোয়াল নত শির।
গা-সহা আরামে শান্তি? ব্যর্থতা তো সমাধান নয়।
প্রত্যূষের আশীর্বাদে পূর্ণ করি নতুন তূণীর।

জীবনে পতন আছে। ভবিষ্যের সীমানা কোথায়?
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে বন্ধ্যা আশা পিপাসা কাতর;
সোনার হরিণী ছোটে অনিশ্চিত শত্রু শূন্যতায়।

সামরী

(বড় গল্প—অনুবাদ)

শ্রীতারাপদ রাহা

রিচার্ড কর্গেট টিনের ঘরে 'ক্যাম্প'শয্যায় বসে বলছে,—'শোন্', তারপরে ঠোঁটটা জিভ দিয়ে ভিজিয়ে বাড়ির সেই গ্যাস শিটির অনুকরণ করে সে শব্দ করতে আরম্ভ করে দিল।

ট্রেণখানা সমতলভূমির উপর দিয়ে দ্রুতবেগে গিয়ে একটা রেখার মত হয়ে চক্রবালের গা ঘেঁষে কোথায় চুপি চুপি হারিয়ে যাচ্ছে; কানে ভেসে আসছে তার দূরের টানা অস্পষ্ট শব্দ। শব্দটা অবশ্য রিচার্ডের ভিজে ঠোঁটের ভেতর থেকেই বেরুচ্ছে।

কার্ল এবার চোখ মেললে।

সারা ঘর সকালের রৌদ্রে ভরে গেছে। গ্যাস চুল্লীর উপর অ্যালুমিনিয়ামের কড়াতে জল ফুটছে। চাপা দেওয়া চুল্লীমুখ থেকে এক অদ্ভুত একঘেয়ে শিটি বেরিয়ে আসছে। অ্যানাব বিছানায় অ্যানা নেই,—বিছানার ঢাকনীটা পেছন দিকে উল্টে ফেলা।

"কি বল্‌লে—চারখানা?—কিন্তু তুমি ত দু'খানার বেশি কোনদিন নাও নি?" রুটিওয়ালা তার স্তূপাকার রুটী থেকে আরও দুখানা লালচে রুটী টেনে নিয়ে অ্যানার হাতে দিলে। অ্যানা ঐ ধরণের রুটীই ভালবাসে। "আজ তাহ'লে তোমার চার-খানা রুটীর দরকার,—বেশ!"

অন্তরের আনন্দ অ্যানার লজ্জারুণ মুখে একটি স্মিত হাসির রেখা ফুটিয়ে দিল। দুই সারি দাঁত তার বেশ একটু বড়, সমান আর ধবধবে।

লালচুলে মেয়েদের যেমন দুধে গায়ের রঙ থাকে, অ্যানার রঙটা ঠিক্ তাই বটে, কিন্তু তার ঘন কেশদামের মাঝে লালচে আভা বড় খুঁজে পাওয়া যায় না। তার নাকের দুপাশে চোখের কাছে কয়েকটা ছোট ছোট খাঁজ।

কয়েক বৎসর ধরে 'কার্ডবোর্ড ফ্যাক্টরী'তে কাজ করবার সময় প্রতিদিন হাজার হাজার বার হাত নেড়েচেড়ে অ্যানার হাত দু'খানা এমন হালকা হয়ে উঠেছে যে, দেখে মনে হয় সে কোন ভালো ঘরের মেয়ে ভালো কাজ করে জীবন কাটিয়ে এসেছে।

দেহের গঠনের তুলনায় তার পা দুটী একটু ছোট। সেই ছোট্ট পা দুটীতে সে আজ তার সবচেয়ে ভালো জুতাজোড়া পরেছে। গায়ে গ্রীষ্মকালের যে পোষাকটা সে আজ পরেছে, তার আঁটসাট উপকরণের ভেতর দিয়ে তার দেহের সুগঠন নির্দোষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দরজা খুলে দুধের রঙে মৃৎপাত্রটি নিয়ে যখন সে ঘরে ঢুকলে, কার্ল তখন গ্যাস চুল্লীর উপর নত হয়ে কি যেন দেখছে।

দেখে মনে হয়, সে যেন ভাবছেঃ যুদ্ধে যাবার আগেই এটা আমি ঠিক করতে চেয়েছিলাম। অ্যানার অকস্মাৎ আগমনে সে এমন অভিভূত হয়ে পড়ল যে, ঐ কথাগুলি সে আর মুখে উচ্চারণ করতে পারলো না। কিন্তু উচ্চারণ করলেও ওটা তার পক্ষে তখন মিছে কথা হ'ত না।

নোতুন সাজে অ্যানাকে তখন খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল—সে যেন আজ ফুলের পোষাক পরেছে।

দরজার পাশে টাটকা দুধের মত অ্যানাকে দেখে কার্ল অজান্তে তার শার্টের কোণগুলি টেনে কালো রোমে ভরা ব্রোঞ্জের মত সুদৃঢ় বুকটা ঢাকতে চেষ্টা করলো। গায়ে তার কোন কোট ছিল না,—ছিল কেবল পাজামা আর কোমরবন্ধ। সাদা শার্টটি তার একেবারে কুঁকড়ে গেছলো। কয়েকদিন আগে নিজের সঙ্গে শার্টটাও সে নদীর জলে ডুবিয়ে রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়েছিল।

কার্ল দাড়ি কামিয়ে হাতমুখ ধুয়েছে বটে, কিন্তু গা থেকে তার নদী, বন আর পথের গন্ধ যায় নি। অনেক কষ্টের পরে সে সভ্যতার লীলাভূমিতে ফিরে এসেছে,—এখানে রয়েছে সুকোমল শয্যা, চারটি দেয়ালের আড়াল আর অ্যানা।

অ্যানা এসে বললে, সুপ্রভাত। কণ্ঠের স্বর তার চেহারা, চলাফেরা, দেহ আর মুখেরই মত মধুর।

যে হাতে সে দুধের কেঁড়ে ধরেছিল, তারই বগলে ছিল রুটীর ঠোঙা, সুতরাং কেঁড়ে রাখতে তাকে নত হতে হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বাঙ্গ প্রকাশিত না হয়ে পারল না।

টেবিলটা সে এমন যত্ন করে ঠিক জায়গায় বসালে যে, দেখে মনে হয় বিশেষ অন্তরঙ্গকে নিয়ে একটা প্রীতিভোজ হবে বাড়িতে। টেবিলটা সে আবার নেড়েচেড়ে দেখলে—ঠিক হয়েছে কি না, তারপর তার উপর দুখানা কাগজের সুন্দর ঢাকনি পরিপাটি করে পাতলে। আর একটা লোক জানলার পাশে দাঁড়িয়ে এই সব একদৃষ্টে দেখছিল।

আগেকার দিনের সন্ধ্যার সব মুস্কিলের ভাব কেটে গেছে। অ্যানা যেন আর সে অ্যানা নেই। রাত্রের ঘুমে তার সব দ্বন্দ্ব কেটে গেছে। এখন সে যেন নোতুন করে জীবন যাপনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

কার্ল অনুক্ষণ চেয়ে আছে এর গতিবিধির উপর। অ্যানা যখন তার পাশ দিয়ে ফলের পাত্রটা আনতে যাচ্ছিল, তখন কার্ল আর কথা বলে প্রেম নিবেদন করতে ফুরসুৎ পেলে না।

ঝড়ের আগে যেমন বনের শিহরণ লাগে—কার্লের বাহুপাশে বদ্ধ হয়ে অ্যানার দেহ ঠিক তেমনি করে কেঁপে উঠ্‌লো।

কার্লের গলা থেকে হাত ছাড়িয়ে না নিয়েই সে চেয়ারের উপর গড়িয়ে পড়ে বল্‌লে, আগে খেয়ে নাও।

কার্ল বুঝলে—অ্যানার কথার মাঝে প্রতিশ্রুতির সুর ধ্বনিত হয়েছে।

রুটি তৈরী করে কার্লকে দিবার সময় অ্যানা তাকে একবার কটাক্ষে দেখে নিলে। নিজে সে কিছুই খেতে পারলো না। কোলের উপর দুটী হাত রেখে সে কেবল সামনে তাকিয়ে রইল।

"কি সুন্দর দুটী তোমার হাত,—একেবারে বড়ঘরের মেয়েদের মত।"

অ্যানা লজ্জা পেয়ে উঠে ধীরে ধীরে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

কার্ল তার হাবভাবে সম্মতি লক্ষ্য করে—মৃদু হাসিতে আকৃষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে গলায় হাত রাখলে। পরস্পরের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হয়ে তারা দুজন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কার্ল যখন চোখ খুলে তাকালে, তখনও দেখলে অ্যানার ঠোঁট দুটী আবেশে উন্মুখ হয়ে কাঁপছে, কার্ল বার বার তাদের সাদরে অভ্যর্থনা করে নিলে, একটি কথাও উচ্চারিত হ'ল না।

ম্লান হাসি হেসে অ্যানা তার কাঁধের জামা ঢিল করে দিলে এবং জামার সঙ্গে সঙ্গে সেও কার্লের দিকে ঢলে পড়ল। সাদা চাদরে ঢাকা বিছানা তখন সূর্যকিরণে ছেয়ে গেছে।

কার্ল তার কোমরবন্ধে এক হেঁচকা টান দিয়ে পিছিয়ে দাঁড়াল। তার বেশ মনে আছে ঘরের দরজায় তালা চাবি আছে, সুতরাং দরকার হ'লেই ওটা বন্ধ করে রাখা যায়।

রৌদ্রস্নাত বিছানায় অ্যানা শুয়ে রয়েছে,—কার্ল এবার তার কাছে এসে দাঁড়াল। তার মনে হতে লাগল—সত্যিকার প্রেমাস্পদ এসে যদি কখন আত্মসমর্পণ করে, তার মত আনন্দ কি আর জগতে আছে?

অ্যানাকে সে এবার পেয়ে গেছে—এই আনন্দে মুহ্যমান হয়ে

দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় অ্যানা তাকে দেখবার সুযোগ না দিয়ে 'ট্রাউট' মাছের মত তড়িৎগতিতে ছুটে গিয়ে কার্লকে কাছে টেনে নিল।

ছয়টা জীর্ণ বাড়ি নিয়ে এদের এই ভাড়াটে ব্যারাক। ছয়টা বাড়ি একসঙ্গে মিলে তিনটে উঠান ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। কমসে কম একশ ঘর গরিব বাসিন্দা এখানে বাস করে। এদের সবাই শ্রমজীবী। যুদ্ধের ফলে এদের সবার দশাই এক। একই রকম দুঃখ কষ্ট, একই দারিদ্র, একই খাদ্য, একই রোগ।

জলা জায়গায় যেমনি করে ব্যাঙ ডাকে, চারিদিকে ওঠে তেমনি শিশুর ক্রন্দন আর কলরব; অনেক সময় তারা যেন 'কোরাস' সুরু করে দেয়, আর থামতে চায় না। একেবারে চুপ থাকতে এদের কখনও দেখা যায় না। এই রবিবারের সকালে তারা 'মাউথ অরগান'এর বাজনার সঙ্গে চীৎকার করতে সুরু করে দিয়েছিল।

একটা বড় মেয়ে হঠাৎ বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে খোলা জানালার নীচের কাঠে বাঁধা একটা বাই-সিকেলের ঘণ্টা নিয়ে জোর বাজাতে সুরু করে দিল, শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। একটা হাত সে শুনবার জন্যে কানে রাখল।

একটু পরেই আর একটা বড় মেয়ে রাত্রির পোষাক পরে সামনে ঘরের খোলা জানলায় এসে দাঁড়াল। সেও এসে সাইকেলের ঘণ্টা বাজাতে লাগল,—আর একটা হাত তার কানে, সেটা হচ্ছে 'টেলিফোন রিসিভার।'

"এলফি কথা বলছে।"

"সুপ্রভাত, এলফি। অ্যালমা কথা বলছে। রাত্রে ভাল ছিলি ত?"

"আরে, অ্যালমা, তুই!, লক্ষ্মী তুই,—আমাকে টেলিফোনে ডেকে তুলেছিস!"

এই দুই বন্ধু একই তালায় বাস করে, এইভাবে টেলিফোন করবার সময় তারা পরস্পর মুখ দেখতে পাচ্ছে। মাঝে মাত্র আঠার ফুট উঠানের ব্যবধান।

"অ্যালমা, তুই আজ কি পরবি, ভাই,—আমি পরছি আমার নীলরঙের জামাটা।"

"আমি জানি সে কথা। আমি পরছি আমার হলদে রঙেরটা।"

রবিবারে পরবার মত তাদের মাত্র একটা ক'রেই জামা আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে তারা অদল বদল ক'রে লোককে দেখায়—তাদের জামা মাত্র একটা করে নয়।

"আজ সন্ধ্যাকালে বায়স্কোপে গেলে বেশ হয়—না?...... ওরে বাবারে,—কি গোলমালই সুরু করেছে এরা?"

পাঁচতলায় অ্যানার কালো রবারের চাকার মত যে বন্ধুটি থাকে সে কয়েকবার অ্যানার সঙ্গে দেখা করতে এসে দরজা বন্ধ দেখে ফিরে গিয়ে কলের গান বাজাতে সুরু করে দিয়েছে। মেশিনটায় আঁকা রয়েছে শিঙার সামনে একটি কুকুর। বাজছে সৈন্যদের একটা কুজকাওয়াজ করে যাবার একটা সুর। এই সুর শুনতে শুনতে দেশের লাখ লাখ লোক যুদ্ধ যাত্রা করেছে।

"আর এ চীৎকার শুনতে পারা যায় না, ভাই, কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেল। আমি টেলিফোন বন্দ করে দিচ্ছি। পরে তোকে আবার ফোনে ডাকব—কেমন?" এলফি 'সাইকেল-বেল'এ চাপ দিলে। অ্যালমার ঘণ্টাধ্বনি কলের গানের মিলিটারী সুর ছাড়িয়েও উপরে উঠল। দুটি মেয়েই সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একেবারে নিচে সানবাঁধানো চারকোণা জায়গায় একরাশ সুন্দর চুলওয়ালা একটি চার বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আকাশের দিকে মুখ করে সে প্রাণপন শক্তিতে চীৎকার করে গান ধরেছেঃ

"ম্যারিচেনের খোকা হ'ল,—
বাপ—কে তার, সে না জানিল।"

কে যেন এসে দরজায় ধাক্কা দিল। অ্যানা চমকে উঠে নিজের বুকে হাত দিয়ে চেপে ধরলো। চিঠির বাক্সের ভেতর দিয়ে একখানা খবরের কাগজ ঘরে এসে পেঁছলো।

"তুমি আগে ঠিক এমনি ছিলে না, অ্যানা। এর চেয়ে আর একটু লজ্জা তোমার আগে ছিল।"—কথাটা বলেই সে উপরের দিকে চেয়ে যেন অ্যানার আগেকার সলজ্জ ব্যবহারের কথা গভীর ভাবে ভাবতে আরম্ভ করে দিলে।—"মনে নেই তোমার—প্রতিবারই —ইয়ে—মানে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আগে তুমি কি রকম সব অজুহাতের কথা তুলতে? আর শুতেও তুমি অন্য ভাবে।"

অ্যানা আস্তে আস্তে নিজের অজ্ঞাতেই তার কাছ থেকে সরে গেল। ভেবে সে একেবারে অবাক্ হয়ে গেছে—কি করে লোকটা তার সমস্ত ঘনিষ্ঠ ব্যবহারের কথা জানলো! বিস্ময়ে সে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল,—বিচার করবার—ভেবে দেখবার শক্তি পর্যন্ত সে হারিয়ে ফেললেঃ কে যেন একখানা ধারালো ছুরি দিয়ে তার চিন্তাশক্তি একেবারে খানখান করে কেটে ফেলেছে।

'একেবারে আলাদা'—বলে কার্ল মৃদু চাপ দিয়ে তার ডান পা টা সরিয়ে—ডান কাঁধটা নিজের দিকে টেনে এনে বললে, "ঠিক এই রকম।"

অ্যানার মাথাটা আপনাআপনি পিছনে সরে গেল। এই পরিচিত অবস্থানে এসে—আজকার দিনে রেচার্ডের সঙ্গে কাটানো দিনগুলির কথাই অ্যানার মনে পড়ে গেল। নিজেকে বিলিয়ে দিবার সময় তার মনে হ'তে লাগলো—রিচার্ডের বাহুবন্ধনেই সে ধরা দিয়েছে এবং চুপি চুপি তারই নাম ধরে সে ডাকতে লাগলো। অ্যানার কাছে তখন অতীত আর বর্তমান দুই মিলে যেন এক হয়ে গেছে।

এর পরের কয় ঘণ্টা ধরে অ্যানা মনে মনে বিশ্বাস আনবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো—যে কার্লই তার স্বামী। এই চেষ্টা করবার সময় সে বুঝতে পারলে যে, লোকে জোর করে মনে কোন বিশ্বাস না আনতে পারলেও—নিদারুণ কোন চিন্তাকে প্রত্যাহার করতে পারে।

'কার্ল রিচার্ড নয়'—এইরূপ কোন চিন্তা তার মনে আসতে চাইলেই সে যখন তাকে বাধা দিতে চাইছিল তখনই তার পেটের উপরে বুকের নিচের একটা মাংস পেশীর উপর জোর পড়ছিল,—এটাকে না কি বলে আত্মিক পেশী।

কার্লের মনে এ সব সন্দেহের কোন বালাই ছিল না, মন তার অ্যানার প্রেমে ভরপুর। সে যখন পরমানন্দে অ্যানাকে আদর করছিল আর অ্যানার আদর পাচ্ছিল, সে তখন ভাবছিল, কোন পথে চললে, কি উপায়ে কঠিন পরিশ্রমে সর্বশক্তি প্রয়োগ করলে অ্যানাকে চিরতরে লাভ করবার সকল বাধা তিরোহিত হয়।

শহরে আসবার পর রিচার্ড মাত্র এক হপ্তা কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিল। তার পরেই যুদ্ধ বাধল, ডাক পড়ল তার যুদ্ধে যাবার। যে কোম্পানীতে সে কাজ করতো—তার নাম ছিল 'কিপ এ্যাণ্ড গ্রাফ'; এখানে যে মজুরী মিলত, রিচার্ড তাতে সন্তুষ্ট ছিল না।

অ্যানা কাপড় পরছিল এমন সময় কার্ল বললে, কাজের জন্যে এবার আর কিপ গ্রাফের কাছে যাচ্ছি না, ওদের যা অবস্থা, মাইনে কড়ি তেমন দিতে পারে না।

আগেকার সেই সব কথা মনে পড়ে অ্যানার সারা গা যেন একবার কেঁপে উঠলো। কিন্তু তখনই তার সে ভাবটা আবার কেটে

গেল। আজ তার মনের যা অবস্থা তাতে সে যেন হাওয়ার উপর ভেসে বেড়াচ্ছে, মনের যত কাঠিন্য যত গুরুভার সব যেন জল হয়ে গেছে, ভাবনা চিন্তার কোন কথা আজ তার কাছেও ঘেঁষতে পারছে না।

দুপুরে খাওয়ার জন্য আর কিছু সওদা করতে যখন সে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যাচ্ছিল,—তখন তার মনে হ'ল—সিঁড়ি যেন আজ আর সে সিঁড়ি নয়। সবই চেনা অথচ আগের থেকে অনেক যেন তফাৎ হয়ে গেছে। আজ অ্যানাই যে আজ সে অ্যানা আর নেই।

ক্রমে সে রাস্তায় এসে পড়লো। সারা রাস্তায় রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। সকালের বাতাসটাও যেন আজ নূতনতর—বয়ে আনছে নব জীবনের বার্তা। অগণিত লোক চলেছে পথে। এক বুড়ি চুপড়ি হাতে ধুঁকে ধুঁকে চলেছে। ছেলেরা সব আশেপাশে খেলছে আর চেঁচাচ্ছে। একটা কসাইয়ের গাড়ি ঘর্‌ঘর্‌ করে সামনে দিয়ে চলে গেল। দুটো মজুর তাদের রবিবারের শার্ট পরে তাদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। অ্যানা চলেছে কসাইয়ের দোকানে—তাকে হিসাব করে বলতে হবে কতটা মাংস আজ তার চাই। যা তা বললে চলবে না—মাংস আবার দু'জনার কম না পড়ে। অ্যানা ভাবতে লাগলো। হৃদয়বৃত্তি কমে গিয়ে চিন্তা হয়ে উঠল প্রবল। কাঁধ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত দেহের ভার যেন তার সমুখে ঝুঁকে পড়লো,—মাথাটা হয়ে উঠ্‌ল খাড়া,—সর্ব ভার মুক্ত।

"না, না—ওতে হবে না, আর আধ পো বেশি দাও"—অ্যানা মাংসওয়ালাকে বললে।

তার ঘরে আজ আর একজন লোক আছে। তারও খাবার চাই। একজন আগন্তুক এসেছে তার ঘরে। হাঁ আগন্তুক।

হাঁ, ঠিকই,—আগন্তুকের কাছ থেকে অ্যানা যেন অনেকখানি তফাৎ হয়ে পড়ল। অ্যানার সঙ্গে ঐ লোকটার কি দরকার? হঠাৎ কাল ও কেন এল। চার চারটে বছর অ্যানা একা একা কাটিয়ে হঠাৎ কাল একটা অপরিচিত লোক এসে হাজির হ'ল!

আর সকাল বেলাটা? আজ সকালে অকস্মাৎ কি হয়ে গেল তার?—"হাঁ, একখানা হাড়ও দাও, ঝোল করতে হবে একটু।"—কি করে এটা সম্ভব হ'ল?—যাকে কোনদিন চিনি না—শুনি না। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। অ্যানা রীতিমত ভয় পেয়ে গেল।

ফিরবার পথে একজন পরিচিত লোকের সঙ্গে অ্যানার দেখা হ'ল। লোকটা দুঃখ করতে লাগল,—জিনিস পত্রের দাম আগের চেয়েও অনেক বেশি চড়ে গেছে,—ময়দা, চর্বি সব। কি যে হবে।—শুনে অ্যানা ভয় পেয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

"হাঁ,—ভাই,—প্রতি হপ্তায় লোকের খরচের বিল কত বেড়ে গেল—দেখ ত! লোকটা হিসাব করতে লেগে গেল।"

অ্যানার বাড়ি যেতে ভয় করতে লাগল। সেই লোকটা ত ঘরে রয়ে গেছে। সে ভাবতে লাগলে—বাড়ি গিয়ে যদি দেখে লোকটা আর নেই তো বেশ হয়! অ্যানা নিজে নিরালায় ব্যাপারগুলি একবার ভাল করে ভেবে নিতে চায়;—এর প্রত্যেক খুঁটিনাটি। এখন তার কিরূপভাবে চলা উচিত? যা ব্যাপার দাঁড়িয়েছে—এর ফল কি হবে?

মেয়েরা যখন হঠাৎ কোন দুঃসাহসের কাজ করে ফিরে আসে, সাধারণত পথের ভিন্ন হাওয়া, সাধারণ লোকের চলাফেরার মাঝে এসে পড়ে মাথা ঠান্ডা হ'তেই তারা ভাবে: তাই ত—কি করে এলাম আজ! অ্যানার আজ এই রকম ধরণের একটা অনুভূতি হচ্ছিল।

পর পুরুষের সঙ্গে প্রেম করে স্বামীর ঘরে ফিরে আসতে মেয়েদের মনের যেমন ভাব হয়,—সিঁড়ির পথে উপরে উঠতে অ্যানার মনে ঠিক তাই হচ্ছিল।

দোতলায় পা দিয়েই সে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। বাইরের এই বিরাট পৃথিবীর কোথা থেকে হঠাৎ একটা পুরুষ আমার ঘরে—আমার কাছে এল,—কি করে সে আমার জীবনের যত কথা সব জানল। আমার কথা সে আমার চেয়েও বেশি জানে। আমি আত্মসমর্পণ করবার আগে (আর কি করেই বা আমি এ পারলাম) সে বলে দিল—আমার দেহের কোন্‌ জায়গায় তিনটে তিল আছে। যে সব ব্যাপার আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম—হঠাৎ এসে সে আমার সেই গোপন কথা মনে করিয়ে দিলে! এই সব কথা ভাববার সময় অ্যানা সিঁড়ির আশে পাশের দেয়ালের গায়ের নক্সাগুলির দিকে চেয়ে ছিল।

একবার মনে হ'ল—আরও দুতলা ছাড়িয়ে সে তার বন্ধুর কাছে যায়। চার বছর ধরে যেমন চলছে—সেই জীবনই রয়েছে সেখানে। সেই পরিচিত নিরাপদ জীবন। বন্ধুর কাছে গিয়ে সব বললে কেমন হয়? হয়ত সে কোন পন্থা বাৎলে দিতে পারে। কিন্তু তার নিজের ঘরে—চেয়ারের উপরে যে একটা পুরুষের শাদা সার্ট ঝুলছে। সব এলোমেলো হয়ে গেল। ......অ্যানা ঘরে ঢুকে তাকে কি অবস্থায় দেখবে? কোথায় দাঁড়িয়ে থাকবে সে?—জানলার ধারে? ঘরে নতুন পরদা কেনা হয়েছে—সত্যিই ত। আগেকার পরদাগুলি কিনবার সময় রিচার্ডের সঙ্গে নিজে গিয়েছিল। রিচার্ড!—রিচার্ড আজ চার বছর হ'ল মারা গেছে। মারা সে গেছেই—হা ভগবান্‌! কিনবার সময় দোকানদার বলেছিল, "জিতে গেলেন আপনারা।" ও লোকটাও সে কথাটি অবিকল বলে দিল, "জিতে গেলেন আপনারা।" দোকানদারটার সরু কালো গোঁফ ছিল,—বেশ ছোট করে ছাঁটা,—আর কপালে ছিল তার দুটি ব্রণ। রিচার্ড অ্যানাকে তা দেখিয়েছিল।

মাত্র কালকে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে,—সে আমায় অ্যানা বলে ডাকল কি করে? দরজার হাতল ঘোরাবার আগে অ্যানা ভাবতে লাগল। প্রতারক,—প্রবঞ্চক সে!—না হয়ে যায় না। আর তার সঙ্গে আমি এমন করলাম! রাগ লজ্জা আর বিরক্তিতে অ্যানা দিশেহারা হয়ে গেল।

অ্যানা ঘরে ঢুকে দেখলে লোকটা সোফা থেকে চাদর বালিশ উঠিয়ে নিয়ে ওটাকে দেয়ালের গায়ে ঠেলে দিয়েছে। খাবারের টেবিল একেবারে পরিষ্কার। অ্যানার বিছানাও ঠিক করা হয়ে গেছে,—তেমন পরিপাটি হয় নি বটে,—তবে একরকম কাজ চালানো গোছের মত হয়েছে। সমস্ত ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অ্যানা দেখলে লম্বা হাতলওয়ালা ঝাড়নটা দিয়ে ঘরটা একবার ঝাঁট দিয়ে কার্ল দ্বিতীয় বার ঝাঁট দিতে লেগে গেছে: প্রতিটি ধূলি কণা সে ঘর থেকে মুছে ফেলতে চায়।

অ্যানার মনে পড়ল—রিচার্ডও মাঝে মাঝে এমনি করে ঝাড়ু দিত বটে। ঘরের কাজ। কিন্তু ঘরের কাজ করতে তাকে ত এমন খুশি দেখাত না!

একজন প্রতারকের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে বলে এতক্ষণ তার মনে যে রাগ লজ্জা আর বিরক্তি গোল পাকাচ্ছিল এ মুহূর্তে সে সব কর্পূরের মত উবে গেল। সে দেখলে কার্ল ঝাঁটার লম্বা ডান্ডার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে;—যেমনি করে ঝাড়ুদার রাস্তা ঝাঁট দিতে দিতে পথিকের সঙ্গে দুটো কথা বলবার জন্য মাঝে মাঝে দাঁড়ায়।

সকাল বেলার আদরের কথা তার মনে পড়ে গেল: রিচার্ড ছাড়া আর কার কাছ থেকে সে অমন করে আদর নিতে পারে? কিন্তু ঝাড়ু নিয়ে যে লোকটা ঘরে দাড়িয়ে রয়েছে সে ত রিচার্ড নয়। তার স্বামী আর কার্লের ভিতরে—অতীত আর বর্তমানের মধ্যে পার্থক্যটা এখন তার কাছে স্পষ্ট করে ধরা দিল।

চার বৎসর ধরে রিচার্ডকে সে যতটা না বুঝেছে আজ সে

ততটা বুঝে ফেলল। কার্ল থেকে সে সম্পূর্ণ আলাদা। সে কার্লের মত চালাক নয়, মন্থর,—কার্ল কা'ল যেমন করে কথা বলেছে এমন করে কথা বলতেও সে কোনদিন পারে নি। কা'ল সে একবার বললে—মাঠে শুয়ে একটা ঘাসের ডগা না চিবিয়ে থাকতে পারে এমন লোক নাকি জগতে নেই। রিচার্ড শান্ত প্রকৃতি, দৃঢ়বিশ্বাসী (গালে প্রায় সব সময়েই খোঁচা খোঁচা কালো দাড়ি) কঠিন পরিশ্রমের দরুন ঈষৎ নুব্জ। এ লোকটার মত সব তাতে এগিয়ে চলবার স্বভাব তার কোনদিনই নাই। এ লোকটা যেন একটা পাকানো স্প্রিং। তীব্র ভয়ানক এর গতি। অ্যানা তা আগেই লক্ষ্য করেছে।

রিচার্ডের সঙ্গে অ্যানা আগে যে জীবনযাপন করেছে তাকে যেন সকালের ব্যাপারটা একেবারে যাদু করে ফেললে,—এমন আর কিছুতেই করতে পারে নি। এই ব্যাপারটাই আবার দুজনার ভিতরকার পার্থক্যটা বেশ চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলে।

বিছানায় শুয়েই বা সে কি করে এক মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পারলে যে এই লোকটা রিচার্ড—তার রিচার্ড? এমনি হতজ্ঞান সে কি করে হ'ল? আর শেষে এরই শয্যাভাগী সে হ'ল? এরই বাহুপাশে সে ধরা দিল, মুখে মুখ লাগল। অথচ লোকটাকে অচেনা—অপ্রীতিকর লাগল না ত। এখনও লাগছে না। আশ্চর্য! এর সঙ্গে যে ব্যাপারটা হয়ে গেল সেটা তত খারাপ লাগত না—যদি লোকটা এমনি জোর করে নিজেকে রিচার্ড বলে জাহির করতে জিদ্ না করত।

"এ সব তুমি কি করছ? এ নাকি তোমার কাজ!"

"কেন—কি হয়েছে?"

অ্যানা হঠাৎ তার কাছ থেকে সরে দাঁড়াল। রাগে তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল,—চোখে জল দেখা দিল:

"আর কখ্খনও বলবে না তুমি আমার স্বামী, কখ্খনও বলবে না।"

"কিন্তু আজ সকালে তুমি নিজ মুখেই যে বললে—আমি তোমার স্বামী। আমায় 'রিচার্ড' বলে ডাকলে।.........একসঙ্গে আমাদের ঘরকন্না—তোমার আর আমার!"

"না, মোটেই না। তোমাকে এর আগে আমি কোনদিন দেখিই নি। সবে কাল তুমি এখানে এসেছ।.........আমার স্বামী হয়ত এখনও বেঁচে আছে,—হয়ত বেঁচেই আছে। তুমি নিজেই এ কথা বলেছ। যে কোন মুহূর্তে সে ফিরে আসতে পারে।"

"বেশ ত—কি হয়—তা হ'লে? সে ফিরে এলে কি হয়? কি হবে বলে তুমি মনে কর?"—বলতে বলতে কার্লের চোখ দুটি কেমন ক্ষিপ্তের মত হয়ে উঠল,—কেমন একটা গভীর বিষন্ন ধ্বনি উঠল তাতে। ঠোঁট দুটি কঠিন করে অনুচ্চ কণ্ঠে সে বললে, "কে এল না এল—তাদের আমার কিছুই এসে যায় না। একসঙ্গে আমাদের ঘর।"

কার্লের মাংসপেশী ক্রমে নরম হয়ে এল,—মুখের রেখা হ'ল নরম। "সবই ভাগ্য, অ্যানা, সবই ভাগ্য।" মুখের হাসি আর কণ্ঠস্বরে ক্রমে আত্মপ্রত্যয়ের স্নিগ্ধতা ফিরে এল।

কার্লের নাকটির গঠন বড় সুন্দর, সবল বাহু, চক্ষু দুটিতে বুদ্ধির দীপ্তি।

রকম দেখে অ্যানা প্রায় হেসে উঠে আর কি। হাসিরই ব্যাপার: উত্তেজনায় কার্ল তারপর পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ঝাঁটার ডান্ডাটা চেপে ধরেছিল, নইলে যেন এখ্খুনি সে পড়ে যেত। তার রকমসকম দেখে অ্যানার মন থেকে আবার সকল সন্দেহ তিরোহিত হ'ল। তাকে আর প্রবঞ্চক বলে মনে হ'ল না। একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে লোকটা যেমন করে নিজের উন্মত্ততাকে চেপে রাখতে লাগল—তা দেখে অ্যানার বিস্ময়ের সীমা রইল না।

ঠিক বিচার করে নয়—রাগ, বিরোধ আর বাসনায় মিশান মনের একটা সহজাত ভাব দিয়ে অ্যানা হিসাব করে দেখলে এই লোকটা যেমন করে তার অতীত জীবনকে যাদু করে রেখেছে—তাকে জয় করতেও তেমনি করে পারত। কিন্তু নিজেকে সে তার স্বামী বলে প্রচার করে নিজেই সে অতীত জীবনের ভাগী হ'তে যেয়ে সব মাটি করে ফেলছে।

না, এত বরদাস্ত করা যায় না। আমাকে ও ভেবেছে কি। নিজের মনোভাব মনে চেপে রাখতে না পারায় অ্যানার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল: বাজে যত সব! জানলার ধারে তরকারির চুপড়ি কোলে করে বসে—সে দ্রুত তরকারি ছাড়াচ্ছিল আর কুটছিল। সে হঠাৎ উঠে চুপড়িতে মস্ত বড় এক ঝাঁকুনি দিয়ে গাজরের উপর নিজের মনের ঝাল ঝেড়ে নিল।

কাজ করতে সে এমন একটা রাগের ভাব—এমন একটা ছাড়াছাড়া আক্ষেপ দেখাতে লাগল—নিরালায় একক জীবনযাপন করলে যা সে কোনদিনই দেখাতে পারত না। কখনও সে দাঁড়াচ্ছে,—কখনও কোঁচড় থেকে গাজরের টুকরো ঝেড়ে ফেলছে—কখনও থালাটা নিয়ে গ্যাস চুল্লীর কাছে দুপদাপ করে যাচ্ছে। কোমরটা সে এমনি করে ঝাঁকি দিয়ে চলেছে যা সে সাধারণ অবস্থায় কিছুতেই পারত না। যে লোকটা তার পিছনে সোফার উপর চুপ করে বসে আছে—তার প্রতি একেবারে উদাসীন হলেও সে এমনটি পারত না।

দুই হাতে মাথাটা ধরে গুঁড়ি মেরে লোকটা বসে আছে। তার মনের মধ্যে যে দৃঢ়সংকল্পের ক্রিয়া চলেছে—কোন প্রবল ইচ্ছাশক্তি বা বাহুবলের দ্বারা তা বাইরে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। দেখে মনে হয় এখনই হয়ত সে ওখান থেকে লাফিয়ে উঠে বলে বসবে:........"বেশ ত তোমার ভাল না লাগে, আমি এই চললাম!"

কিন্তু এই চলে যাওয়ার অর্থ কি সে জানে। তার হাড়ের মধ্যে সে অর্থ এখনও গিজ্‌গিজ্ করছে। নির্জনতার পক্ষাঘাত সে বহু বৎসর ধরে নিজের মনে প্রাণে অনুভব করেছে।

নিজের একক জীবনের বেদনার কথা একবার সে রিচার্ডকে বলেছিল: কি করে যে এ সহ্য করা যায় বারবার মনকে জিজ্ঞাসা করি,—কোন উত্তর মেলে না; কোন উত্তর নেই এর। এ কেমন জানিস? একটা কীট যেন হাজার হাজার মাইল উত্তপ্ত বালুর উপর দিয়ে চলেছে, পায়ের নিচে তার মাটি আর মেলে না। এই হচ্ছে আমার জীবনের রূপ।

চরিত্রের দৃঢ়তা আর জীবনীশক্তি কার্লের এত বেশি ছিল যে তা দিয়ে পর পর দশটা মানুষের জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়,—কিন্তু যাকে অবলম্বন করে জীবন কাটাবে—এমন কেউ তার ছিল না। অভাব তার সেইখানে।

সোফার উপর গুঁড়ি মেরে সে বসেই রইল। সে মনে মনে জানে আজ যদি সে চলে যায়, কাল আবার সে ফিরে আসবে। যে নিষ্ঠা আর ইচ্ছাশক্তির বলে তার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়েছে—তারই বলে তার অন্তরের দুর্নিবার ক্রোধকে সে বারবার চেপে রাখতে লাগল। ভিতরের উত্তেজনায় তার গলার পেশীগুলি বারবার ফুলে উঠতে লাগল।

মুখ না ফিরিয়েই অ্যানা হঠাৎ বলে উঠল: "আমার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনে আমার বন্ধুকে কি বলেছিলাম তাও বোধ হয় তোমার অজানা নেই? বিয়ের আগে ছেলেবেলায় আমি যা করেছি তাও বোধ হয় তুমি জান?" রাগের মাথায় একবার তার ইচ্ছা হ'ল সে বলে: আমার জন্মের আগের কথা জানতেও বোধ হয় তোমার বাকি নেই?

ধীর গম্ভীর স্বরে কার্ল উত্তর করলে: "না, আমি সে সব জানি না। তবে তুমি কি ধরণের মেয়ে ছিলে—সে কথা

আমি জানি। অন্যান্য মেয়েদের মত তুমি নিজেকে জাহির করতে চাইতে না বা বদমেজাজী ছিলে না। তোমার মা যখন তোমার চুল আঁচড়ে দিতেন—তখন তুমি একটুও অধীর হয়ে উঠ্‌তে না। তুমি সব কিছুর জন্যই অপেক্ষা করে থাকতে পারতে, মনটা তোমার একরকম সর্বদাই প্রফুল্ল থাকত, অথচ সে বিষয়ে তুমি সচেতন ছিলে না। আমার মনে হয়—একটা আপেল যেমন ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে পরিপক্কতা লাভ করে—তুমিও ঠিক তেমনি পরিপূর্ণ হয়ে উঠছিলে।"

এই কথাগুলি বলা শেষ হ'লে তবে কার্ল হাতের ভেতর থেকে মাথা তুললে। "আমি চিরদিন আকাঙ্ক্ষা করে আসছি। এই আকাঙ্ক্ষা করা যে কি তা তুমি কোনদিন জান নি, এখনও বোধ হয় জান না।"

অ্যানাকে ভালবেসে কার্ল যে দৃষ্টি লাভ করেছে তারই ভিতর দিয়ে অ্যানা জীবনে এই প্রথম তার শৈশব আর যৌবনের দিনগুলিকে যেন প্রত্যক্ষ করলে। অন্তর তার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

কার্লের বলা শেষ হবার আগেই অ্যানা বিশেষ বিচলিত হয়ে বলে উঠল : "কি বলছ তুমি ?"

কথাটা শুনে কার্লের মনে হ'ল : হয় অ্যানা আমাকে ভালবেসেছে, নয় ত সব শেষ হয়ে গেল—সব আশা নির্মূল। যদিও আমার ভালবাসার একটুও পরিবর্তন হয় নি। সে বলে চলল—

"স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তুমি তোমার বন্ধুকে কি বলেছিলে—জিজ্ঞাসা করেছ। যদিও সংবাদটা সত্যি নয়, তবু অমন একটা সংবাদ শুনে অন্যান্য মেয়েদের যে অবস্থা হয়, তোমারও ঠিক সেই অবস্থা হয়েছিল। বুকটা তোমার একেবারে ভেঙে গিয়েছিল।.........কিন্তু তোমায় ত আমি জানি; এমন দুর্ভাগ্য যে তোমার তখন ঘট্‌তে পারে, বা কখনও ঘট্‌তে পারে—এ কথা তুমি বিশ্বাস কর নি। তুমি একটা নেবুর পাতার মত,—দেখতেও তেমনি। কথাটা তুমি সত্যি বলে মনে করলেও অন্তরে বিশ্বাস করতে পার নি। তার পর এমন সময় এল যখন তুমি কেবল বেঁচে থাকতে চাইলে,—কিন্তু কিসের জন্যে যে বাঁচা তা' তুমি নিজেও জানলে না। একজনের জন্য শুধু পথ চেয়ে তুমি রইলে। এমনি করে চাওয়া যে কি—তা আমি জানি।.........তুমিও জান নিশ্চয়। কেমন—জান ত ?"

অ্যানা কোনদিন রিচার্ডের উপর রাগ করতে সুযোগ পায় নি। অ্যানার কথা কোনদিন ভুল করেও কেউ বোঝে নি, সত্যি করেও কেউ বোঝে নি। রিচার্ডের সঙ্গে তার কথা হ'ত শুধু সংসার নিয়ে। অ্যানা অবশ্য এখনও এদের দু'জনের তুলনা করে দেখছে না। এই লোকটাকে সে প্রতারক মনে করেছিল বলে শুধু সে লজ্জায় মরে যাচ্ছে।

অনেক সময় কার্লের কথা, দৃষ্টি ও স্বরে অ্যানা বুঝতে পারছিল তার মনের কোথায় যেন খানিকটা অনাবাদি জায়গা পড়ে রয়েছে। গত রাত্রি থেকে সে নিজের মনে সম্পূর্ণ একটা নতুন ভাবের সাড়া পাচ্ছিল—মনের গহন তলের সকল খবর কি মানুষ রাখতে পারে ? অনেক জিনিস হয়ত সারা জীবন অনাবিষ্কৃতই থেকে যায়। কয়েক মিনিট ধরে তার মনে এখন একটা নতুন অনুভূতি জেগে উঠছিল। কিন্তু স্বভাবতই সে একটু ধীরে সুস্থে কাজ করতে ভালবাসে,—হঠাৎ কোন একটা কাজ সে কোনদিনই করে বসে নি। নিজের কাছে সে চিরকাল খাঁটি থাকতে ভালবাসে,—কাজে, চিন্তায়, জীবনযাপনে, এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাসে পর্যন্ত। তার মনে হচ্ছিল রিচার্ডের সঙ্গে যে জীবন সে কাটিয়েছে তা যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেল, এখন সে নিজের মধ্যে এক নতুন জীবনের সাড়া পাচ্ছে, আগের জীবন যেন হারিয়ে মুছে গেল।

আর এ দিকে কার্ল বুঝছিল প্রেমের নিষ্ঠার অর্থ হয়ত অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

গত জীবনের স্মৃতির দংশনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে অ্যানা কার্লকে আর কাছে এগুতে দিচ্ছিল না, অথচ বাইরের এই প্রত্যাখানের আড়ালে তার সত্যিকার মনটা কার্লের কাছে আত্মসমর্পণ করতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। ঘুমের ঘোরে নিশিতে পেলে লোকের যেমন পক্ষাঘাতের মত অবস্থা হয়, অ্যানার অবস্থা হয়েছিল ঠিক তেমনি।

নিজেকে রিচার্ড বলে জাহির করতে গিয়ে কার্ল অ্যানার শৈশবের যে রূপ দিয়েছিল তাতে অ্যানার মনে মস্ত বড় একটা দোলা দিয়েছিল। কার্লের দেওয়া এই রূপ ছাড়া অ্যানার অন্য সব কিছু যেন মিথ্যা। তার যেন অন্য জীবন কোনদিন ছিল না। যে অ্যানা অন্য একটা পুরুষের জীবন-ভাগী হয়েছে সে যেন এ অ্যানা নয়, সে যেন কার্লের অ্যানা নয়। এ অ্যানার সঙ্গে যেন কার্লের সেই অনাদিকালের সম্বন্ধ। মুখে হয়ত কার্ল মিথ্যা কথাই বলেছে কিন্তু তার মনের কাছে এটা মিথ্যাও নয়, মায়াও নয়,—একেবারে সত্য।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় কাজের সন্ধান করে যখন সে ফিরে আসত—সামনে দেখতে পেত বিরাট এক বাধা, এ বাধা তার নিজেরই সৃষ্টি করা, নিজের মনোভাবকে অমান্য না করে এ বাধা তার দূর করবার সাধ্য ছিল না। অ্যানা আর সে জীবনের এমন এক স্তরে এসে পেঁৗছেছে যেখানে প্রাণের সকল উৎস শুকিয়ে গেছে, সকল চেষ্টা বিফল, শারীরিক মিলন একেবারে অসম্ভব।

এই কয়েক সপ্তাহ ধরে অ্যানা তাকে গোপনে তার ঘরে যাতায়াত করতে বাধ্য করেছিল। কার্ল যে রাত্রে অ্যানার ঘরে বাস করে—একথা কেউ জানতে পায় নি।

(৪)

অ্যানার বন্ধু মেরী তার বোনকে নিয়ে পাঁচতলার একটা কুঠুরিতে থাকতো,—সামনে পড়েছিল তাদের বাড়ির তিনটে উঠানের দ্বিতীয় উঠানটি। মেরী যে অংশে থাকত তার দৈর্ঘ এত কম যে তার ছোট্ট লোহার খাটটাতেই তা জুড়ে যেত।

জানালার কাছে ঘরটা একটু চওড়া হওয়ায় যে একফালি জায়গা পাওয়া গেছে—তাতে একটা লোহার তেপায়ার উপর মুখ ধোয়ার গামলা রাখা হয়েছে। চেয়ার টেবিল রাখবার এক ফোঁটা জায়গা নেই। সকালে হাত মুখ ধোয়ার সময় মেরী বিছানায় জানু পেতে বসেই গামলার জলে মুখ ডুবাত।

একদিন রবিবারের বিকেলে অ্যানা এই ঘরে এসে বন্ধুর বিছানার নিচে বসেছিল, আর মেরী তখন অনাবৃত-দেহা হয়ে বিছানায় দাঁড়িয়ে বেড়াতে যাবার জন্য কাপড় পরছিল।

পাশের বড় ঘরটায় একটা পুরুষ একটা মরচে পড়া 'সেটি'তে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল। লোকটা মেরীর বোনকে নিয়ে থাকে—মেরীর ভগিনীপতি গিয়েছে যুদ্ধে। বোনের আট বছর ও ন বছর বয়সের দুটি ছেলে একটা পুরানো ঠেলাগাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বড় ভাবছে। ঠেলাগাড়িতে ওদের এক ছয়মাস-বয়সের ভাই, ঐ ঘুমন্ত পুরুষের ছেলে দুই গালে দুই মুঠ রেখে শুয়ে আছে। বড় দুই ভাই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে—বিকেলের খেলার জন্য কি করে একটা চাকা-ওয়ালা তক্তা জোগাড় করা যায়।

বড় ভাইয়ের হাতে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার ছিল। সে বললে, "আমরা ত অনায়াসেই গাড়ির উপর অংশটুকু খুলে ফেলতে পারি, তা হ'লেই ত নিচেরটুকু নিয়ে আমরা খেলা করতে পারবো।"

"আস্তে আস্তে খুলবি, নইলে ওটা আবার চিল্লাতে সুরু করে দেবে।"

দুই ভাই তখন আস্তে আস্তে আটটা 'স্ক্রু' খুলে ছোট

ছেলেটা সমেত ঠেলাগাড়ির উপর অংশ নিচে নামিয়ে রাখল, তারপর চাকা-সমেত ঠেলাগাড়ির নিচের অংশ নিয়ে চুপে চুপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। "রাত্রে আমরা আবার এটা লাগিয়ে রাখব—কেমন?.........আরে মলো যা, ওটা আবার চিল্লাতে সুরু করলো।"

পুরুষটাও এইবার জেগে উঠলো। লোকটা মোটার-মিস্ত্রীর কাজ করতো। চোখ মেলেই সে খুঁজতে লাগল: "প্যারাম্বুলেটার"টা কোথায় গেল, যেখানে সেটা ছিল সে জায়গা ত ফাঁকা। এদিকে ত আবার একটা ছেলে কাঁদছে শুনতে পাচ্ছি। চোখ দুটো বেশ করে রগড়ে নিয়ে যখন সে ভালো করে নিচে তাকিয়ে দেখলে—তখন ত ছেলের অবস্থা দেখে সে অবাক। একটু পরেই সে হেসে ছেলেকে কোলে নিয়ে ঘরের মাঝে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলো।

লোকটার এ দশা ঘটল এমনি করে—

একটা ঘুমোবার জায়গা খুঁজতে খুঁজতে সে একদিন এসে মেরীর বোনের ঘরে তার স্বামীর শোবার বিছানাটা ভাড়া নিলে,—বিছানার মালিক গেছেন তখন যুদ্ধে। প্রথম প্রথম দুই বিছানার মাঝে থাকত একটা টেবিল—ঐ যেন একটা সীমানার পাঁচিল। প্রথম হপ্তায় শোবার সময় তারা আলো নিবিয়ে শুত। সস্তা 'রেস্তরাঁ'তে গিয়ে যা-তা খেতে লোকটার যে পয়সা খরচ হ'ত—তাই দিয়ে মেরীর বোন ঐ লোকটার সঙ্গে একটা গোটা পরিবারের খাবার জোগাত। সুতরাং দুই বিছানার মাঝ থেকে টেবিলখানা গেল সরে,—বিছানা দুটি পাশাপাশি হল আবার।

মেরীর বোন ঝাঁটা হাতে দরজায় এসে হাজির হল, ধোওয়া ধোওয়ি করতে তার উপরকার কাপড় গেছে ভিজে।

"কাঁদছে ও?"

স্ত্রীলোকটার মুখটা হয়ে গেছে তামাটে রঙের, কিন্তু গায়ের চামড়া বেশ নরম। ঠোঁট দুটি লালচে-বাতাবী, মসৃণ ও দৃঢ় রক্তে যেন টস্‌টস্ করছে। প্রশ্ন করবার সময় সেই ঠোঁট যখন সে ফাঁক করে—চোখে প্রশ্নের ভঙ্গী ফুটে উঠে তখন তাকে দেখায় বেশ।

মোটার মিস্ত্রী আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বেশ উচ্চকণ্ঠেই বল্লে, "দ্যাখ একবার ব্যাপারখানা!"

"কাল রাত্রে বিছানায় শুয়ে পাজী দুটো এই যুক্তিই করছিল।" স্ত্রীলোকটা তার ছোট খোকাকে স্তন দিতে লাগল। তাতে রয়েছে যৌবনের পরিপূর্ণতা, সাদা রঙের উপর কয়েকটি হালকা নীল শিরা। দেখতেও তেমন বড় নয়।

পায়জামার পকেটে হাত রেখে মোটার-মিস্ত্রী এক দৃষ্টে তার খোকার দুধ খাওয়া দেখতে লাগল: রাক্ষসটা ঠোঁট দিয়ে চুষে কেমন করে খাবলে খাবলে গিলছে।

দুই একদিনের মধ্যেই স্ত্রীলোকটির স্বামী ছুটিতে বাড়িতে আসছে।

পাশের ছোট্ট ঘরটি মেরীর হাস্যধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে। সে এখনও সেই বিছানার পর দাঁড়িয়ে। সে সকাল বেলা একটা ছোট শেমিজ তৈরি করেছে। অ্যানার সাহায্য নিয়ে এবং তার সমালোচনা শুনতে শুনতে সেটা সে পরতে চেষ্টা করছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে মোজাটা টেনে নিল। তলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত তার পা'টা সরু, কুমারী মেয়েদের ধাঁচের এবং সুন্দর। হাঁটুর ঠিক উপরে যেখানে গার্ডারের দাগ পড়েছে সেখান থেকে নারীর দেহ আরম্ভ হয়েছে, ক্রমে বাইরের দিকে স্ফীত হয়ে কোমল বর্তুল রেখায় বেড়ে উঠেছে; গায়ের ত্বক্ বিবর্ণ এবং স্থান বিশেষে বন্ধুর হয়ে উঠেছে।

তার অন্তর্বাসের বন্ধনীতে মেসিনের চলন-সই কারুকার্য করা—সেটা দিয়ে কোমরের যেখানে বাঁধন দেওয়া হয়েছে তার উপরেই একটা শিশুর মত কোমল পিঠ আরম্ভ হয়েছে। দেখে মনে হয় কোনদিন কোন কঠিন কিছুর ছোওয়া পড়ে নি এতে।

অ্যানা তার হাতে নীল ডোরা দেওয়া একটা সুতী ফ্রক দিল। ফ্রকের মাঝে মাথা আর হাত গলিয়ে দিতে দিতে মেরী বলতে শুরু করল—অ্যানার সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার পরে তাদের এই ব্যারাকে কি কি ঘটেছে।

প্রথমে বেরিয়ে এল ছোট আর চওড়া নখওয়ালা আঙুলগুলো। তার পর দেখা দিল ছোট দৃঢ় মাথাটি, মুখখানায় তার একরকম দুষ্প্রাপ্য কাঠের রং—চোখদুটি সুন্দর। সুগন্ধি চুলের চেয়ে তার ভ্রূ আর চোখের পাতার রোঁয়াগুলির রং কালো। সুদৃঢ় মসৃণ দুটি গালে কথা বলতে বা হাসতে গেলেই তার টোল খায়।

সে হঠাৎ সোজা হয়েই পিছন দিকে পড়ে আনন্দের আতিশয্যে একটা গড়াগড়ি দিয়া মাদুরটা জড়িমড়ি করে অ্যানার কোলে মাথা তুলে দিল। অ্যানা দুই হাত দিয়ে তার সুন্দর মুখখানা চেপে ধরলে।

নিচের তলায় কে একটা পুরুষ যেন দম ফাটিয়ে চিৎকার করছে। তার চিৎকারের শব্দ দেয়ালে প্রতিহত হয়ে—উঠানে প্রতিধ্বনিত হয়ে—পাঁচ তলার জানলা ছাড়িয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছে। এক নিশ্বাসে যতটা পারা যায়—লোকটা আর একবার ততটা সিংহনাদ করে উঠল। তার পরেই শোনা গেল একটি বামাকণ্ঠের কর্ণভেদী চিৎকার।

মেরী চমকে উঠে বললে, "মিনসে আবার মাগীটাকে ঠেঙাচ্ছে। প্রত্যেক দিন এই ঝগড়া মারামারি, তবু ওরা ছাড়াছাড়ি হ'বে না।"

যে স্ত্রীলোকটা এমনি করে ঠেঙানি খাচ্ছে,—স্বামী যুদ্ধে গেলে সে আর একটা পুরুষের সঙ্গে বাস করত। অনেকেই অবশ্য এমনি করত,—এবং সে কথা গোপন রাখতে পারত না। এই ভাড়াটে ব্যারাকে যত দুঃখ কষ্ট, ঘৃণা, যন্ত্রণা, রোগ, অপরাধ—এমন কি প্রেম-নিষ্ঠা এবং দরদের ব্যাপার ঘটত—মেরী তা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকে যেতে পারত।

অ্যানা মনে মনে ভাবতে লাগল: আমার ব্যাপারও এই রকম দাঁড়াল দেখতে পাচ্ছি। স্বামী এখানে নেই—বা ছেড়ে গেছে বলে আমিও ত আরেকজনকে নিয়ে ঘর করতে যাচ্ছি। এখানে হামেশাই এমনি হচ্ছে।

এদিকে তেতালায় বন্ধ জানলার ধারে বন্দীর মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কার্ল শিখছে।—কি করে অপেক্ষা করতে হয়।

মেরীর পাশের ঘর থেকে মোটার-মিস্ত্রীর কথা শুনা যাচ্ছে: "তোমার স্বামী ফিরে এসে যখন দেখবে—আমরা কি করছি—তখন যদি সে এমনি করে ঠেঙানি শুরু করে!"

উঠানের এক কোণে ভিড় জমে গেছে। অর্ধ নগ্ন, বিবর্ণ, ক্ষীণদেহ ছেলেপিলে, ছেঁড়া-কাপড়-পরা মেয়েলোক—শুধু সার্ট পরা পুরুষেরা সব এসে চারিদিক ঘিরে দাঁড়িয়েছে। মুখে তাদের দারিদ্র্যের কালিমা। একটা বুড় না খেতে পেয়ে মূর্চ্ছা গেছে। তাকে সবাই ধরে বাইরে এনেছে। তাকে নিয়েই এই ভিড়।

একজন শক্তিশালী তরুণ মজুর তীরন্দাজের ভঙ্গী নিয়ে পিঠটাকে প্রায় সমকোণের মত বাঁকিয়ে উঠানের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। পাঁচ ফুট লম্বা সোজা একটা ইস্পাতের চ্যাপটা পাত বাঁকিয়ে প্রায় অর্ধ বৃত্তাকার করে সে ধনুক করে নিয়েছে, তার পর নিকেল করা ইস্পাতের ফাঁপা নলের তীর বানিয়ে সেটা একেবারে সোজা উপরে ছুড়লে সে। তীরটা শাঁ শাঁ করে উপরে উপরে উঠে একটু থেমেই আবার নিচে উঠানের মাঝখানে এসে পড়ল। হাত সায়েস্তা না করে এমন চোখাল অস্ত্র নিয়ে খেলা করায় বিপদ আছে,—সে কথা কেউ ভাবে না,—তীরটা হয়ত যে ছুড়েছে তার গায়ে এসেও বিঁধতে পারে।

লোকটা বার বার এমনি তীর ছুঁড়ে খেলা করতে লাগল। সবাই উঠানের এক কোণে সরে এসে উপরে তাকিয়ে দেখতে লাগল। একটু আগে যে বুড়ার মূর্ছা হয়েছিল,—সে-ও।

সাইকেলের ঘণ্টায় টেলিফোন বাজিয়ে এলফিকে ডেকে তার বন্ধু বললে, "আমাদের ফ্রা অ্যানার ঘরেতে অতিথি এসেছে আজ। ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।.........আচ্ছা করে খেয়েছিস ত?"

"হাঁ রে; গাজর খেয়েছি।"

"গাজর?"

একটু পরেই তারা তাদের রঙীন জামা পরে হাত ধরাধরি করে পথে বেড়াতে বেরুল, যে পথ বেয়ে কয়েক হপ্তা আগে কার্ল এসে-ছিল। দু'জনারই সরু সরু কাঠির মত পা,—পায়ের ডিম এখনও গড়ে ওঠে নি। চুলে উজ্জ্বল সবুজ রংএর ফিতে,—বাতাসে ফর ফর করে উড়ছে।

মেরীও নিচে? অ্যানার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল: কার্ল তখনও স্থির হয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"তোর ঘরে কে অতিথি এসেছে,—বল না, ভাই!"

অ্যানা অনেকক্ষণ কোন কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মেরী বুঝল অ্যানা কথাটা স্বীকার করছে। অ্যানা বেশ একটু বিচলিত হয়ে গম্ভীরভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এরূপ মন নিয়ে ঘরে গিয়ে এখন আর তার শূন্য ঘর দেখতে হবে না। ঘরে এখন লোক আছে। আর তাকে শুধু এক অপরিচিত লোকের পর্যায় ফেলা যায় না। এরূপ অবস্থায় দু'জন মানুষের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে, প্রাণের বন্ধন দৃঢ় হয়। ঘরে গিয়ে সে এখন লোকের সঙ্গ পাবে। আর সে সঙ্গটা এখন অপ্রীতি-কর হবে না। ঘরটা এখন আর শৃঙ্খলিত হয়ে খাঁ খাঁ করবে না।.........আচ্ছা স্বামী কি তার এখনও বেঁচে আছে। ও ত এসে তার স্বামী বলে প্রচার করতে চায়,—সেও ত ওকে প্রায় সেইভাবে মেনে নিতে চলেছে! না, না, ওকে ঐ কথাটা বলা ছাড়াতে হবে—কি সব পাগলামি, ওকে ঐ সব বলা ছাড়াতেই হ'বে। অ্যানা তার চালাকির কাছে হার মানবে না।

আচ্ছা ধর স্বামী যদি এখনও বেঁচে থাকে। এখনও যদি সে বেঁচে থাকে,—তা'লে কি হ'বে?.........তা' হ'লে ত সবই ওলোটপালট হয়ে যাবে। স্বামী বর্তমানে কেউই ত তাকে ছেড়ে লক্ষ্মী মেয়ের মত আরেক পুরুষের সাথে ঘর করতে পারে না। ব্যাপারটা ত অত সোজা নয়।.........তার দুটি চোখের কথা মনে পড়ে। কেমন সরল স্নেহের দৃষ্টি দিয়ে সে তাকাত। সেই সবল শ্রমোপযোগী দুটি হাত। অ্যানার তার উপর কত গভীর বিশ্বাস আর নির্ভরতা ছিল। তার সঙ্গে জীবনযাপন কত নিরাপদ ছিল, কত সত্য। সে জীবনে অ্যানার একটুখানি ভয় ভাবনা ছিল না।

"তোমার আপত্তি না থাকলে চল আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।" কার্ল উত্তরে—'বেশ' বলে নিজের জামা কাপড়ের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলে।

"ইচ্ছা করলে তুমি আমার স্বামীর শাদা কলারগুলির একটা ব্যবহার করতে পার।"

"না, আর কোন কিছুরই দরকার নেই আমার,—কোন কিছুরই না।"

কেবল আমাকে চায় সে। এক আমাকে ছাড়া কোন কিছুই নেবে না ও তার কাছ থেকে। "তুমি নিজেই বল সে বেঁচে আছে—তবু আমায় তুমি তোমার স্ত্রী হতে বল!"

এক বিষণ্ণ দৃষ্টির সঙ্গে কার্ল উত্তর দেয়, "কি এসে যায় তাতে!" তারপরেই এ সম্বন্ধে আর কোন কথা উত্থাপন না করে সে অন্য প্রসঙ্গ তোলে। তার কথার সুর শুনেই অ্যানার মনে হয় কথাটা সে বলবে বলে আগে থেকে ভেবে রেখেছে।

কার্ল বলে—"যে দোকানদার এই পরদাগুলি আমাদের কাছে বিক্রী করেছিল—তার খুব ছোট কালো গোঁফ ছিল,—এই এতটুকু!—আর কপালের উপর তার দুটো ব্রণ ছিল,—আমি তোমাকে তা দেখিয়েছিলাম, আরও জানতে চাও তুমি?

অ্যানার সর্বাঙ্গের ভিতর দিয়ে একটা ক্রোধের বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে বললে—"জানি না আমি কোত্থেকে তুমি এ সব কথা পেলে। রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। যে সব ব্যাপার তুমি আরম্ভ করেছ—এ ঘৃণ্য, অতীব ঘৃণ্য।"

শুনে নিষ্ফল নৈরাশ্যে কার্লের মুখের রেখা কঠিন হয়ে উঠল—দেখে মনে হয়—যেন তার উপর কোন দারুন অবিচার করা হয়েছে।

রবিবারের বিকেলে বেরিয়ে—এতক্ষণ কোনও কিছু দর্শনীয় না পেয়ে যারা ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়েছিল,—অ্যানা ও কার্লকে দেখে তাদের মনটা যেন একবার দোলা দিয়ে উঠল। সুগঠিত পা ফেলে ফেলে সুন্দরী সপ্রতিভ অ্যানা এমন হালকা-ভাবে পথ চলছিল যে তার পাশে কলারহীন জামা পরা এই জবড়জং লোকটাকে নিতান্তই বিসদৃশ দেখাচ্ছিল। জ্বলন্ত অঙ্গারের গায়ে যেন খানিকটা ভস্ম।

তারা ক্রমে শহরের দিকে এগুচ্ছিল। একসঙ্গে বেড়ান তাদের এই প্রথম। তিন মাস নিদারুণ কষ্ট করে কত সীমান্ত কত বন অতিক্রম করে—এসে এ কি আনন্দের পরিসমাপ্তি! আজ তার প্রিয়ার পাশে পাশে বেড়াতে পাচ্ছে।

অ্যানা কেমন করে হাঁটে দেখবার জন্য কার্ল দুই এক পা পেছিয়ে পড়ল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল—সুদূর স্তেপে থাকবার সময় অ্যানার কেমন মূর্তি সে মনশ্চক্ষে দেখতে পেত। সে দেখত এক মসৃণ বাতাবী রংএর আঁট জামা পরে অ্যানা যেন মৃতের ন্যায় এক কায়াহীন নারীর ন্যায় পরিচিত পথে তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে দেখা করতে আসছে। তৃপ্তির আনন্দ উবে গিয়ে এক নিমেষে কার্লের মুখখানা কালি হয়ে গেল।

কার্ল মনে মনে সংকল্প করলে—দরকার হ'লে সে বহু বৎসর অপেক্ষা করে থাকবে,—কিন্তু তার এক মিনিটও যেন আর সবুর সয় না।

অ্যানা হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল। মুখে তার বুদ্ধির দীপ্তি, চোখে তার সংযম আর মমতার ছায়া. তার মনে পড়ে গেছে বহুদিন আগের একটি সুন্দর সন্ধ্যায় নিজের ভাবপ্রবণ হৃদয়ের একটি উজ্জ্বল ছবি। হঠাৎ সে কার্লকে বলে বসল—"এও কি সম্ভব"—

অ্যানা কি বলতে চায় কার্ল তা বুঝেছে। ঐ একটি কথাকে কেন্দ্র করে তার মনের যত ভাবনারাশি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে উত্তর দিলে,—"শুধু সম্ভব নয়—এ সত্যি।"

"যে আমি তোমার সাথে এখানে আগে বেড়িয়েছি?"

শহরতলি থেকে শহরে যাবার যে রাস্তার দুই ধারে সারি সারি গাছ রয়েছে—ক্রমে দুইজন সেখানে এসে হাজির হ'ল। কার্ল মনে মনে কতদিন এই রাস্তার স্বপন দেখেছে। কার্ল বললে, "এই গাছের নিচে তুমি একদিন এসেছিলে,—সন্ধ্যাকালে এইখানে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলে।"

রিচার্ড কোনদিন তাকে এ কথা বলে দেয় নি,—কিন্তু কার্ল জানত এ কথা সত্যি। সে যেন দিব্য চক্ষে দেখতে পেত—অ্যানা তার প্রিয়ের প্রতীক্ষায় এখানে পাদচারণ করছে। যে সত্য সে মনে মনে উপলব্ধি করেছে তাই সে আজ কথায় প্রকাশ করল।

অ্যানার বাঁ দিকে সর্বাঙ্গে কার্ল মৃদু প্রেমের স্পর্শ বুলিয়ে চলল। কঠিন বাস্তবতার কথা আর কারও মনে রইল না,—অন্তরের সত্যিকার ভাব যেন বাইরে মূর্ত হয়ে উঠল। দু'জনের হৃদয়ের ধারা এক হয়ে মিশে গেল।

অ্যানা আর কিছু ভাবলে না। তার মনে যা এল তাই সে

বিশ্বাস করলে। মাধুর্যের পুনোর্পলব্ধি করবার জন্য অন্তরের ভাবকে সে কথায় রূপ দিতে চাইল। তার ইচ্ছা হ'ল—সে একবার নাম ধরে ডাকে,—তাই সে হঠাৎ ডেকে উঠল: "রিচার্ড।"

কার্ল তাকে বহুপাশে জড়িয়ে নিয়ে গোপন কথার মত করে বললে: "আমি তোমায় ভালবাসি।"—তারপর তারা এগিয়ে চললে।

"খোকন ? একটা খোকন হ'লে আমাদের কেমন হয় ? একটা খোকন চাও না তুমি ?"

অ্যানা ঠোঁট দুটি কার্লের দিকে তুলে ধরল, চোখের পাতা দুটি নত হয়ে ক্রমে বুজে গেল। অ্যানা স্বভাবতই ধীর।

অ্যানার ওষ্ঠে ওষ্ঠের স্পর্শ দিয়েই কার্ল আবার তার কথাটা জিজ্ঞাসা করলে। কোন কথা না বলেই অ্যানা যে উত্তর দিলে—তারই পরিতৃপ্তি নিয়ে কার্ল তার দীর্ঘাঙ্গী স্ত্রী নিয়ে বাগানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে।

ছেলেবেলায় কার্ল একবার এখানে আসে নি ? সেই যে জমিদারের মেয়েটি অ্যানা তার গলা ধরে—এক গ্লাস দুধ তার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল না ?

বাগানের একটা নির্জন কোণে একটা গাছের নিচে গিয়ে তারা দু'জন কিছুক্ষণ অত্যন্ত কাছাকাছি হয়ে বসল,—অ্যানা ও রিচার্ড যেন কোনদিন একসঙ্গে জীবন কাটায় নি; যে অদৃষ্ট নানাভাবে মানুষকে নানা ভুল পথে নিয়ে তাদের চিরকাল ভাগ্য নির্দেশ করে দেয়—সেও যেন দুটি হৃদয়ের আবেগ আর আকাঙ্ক্ষার কাছে হার মেনেছে। দুটি হৃদয় যেন আজ কান পেতে নতুন করে পরস্পরের উচ্ছ্বসিত হৃদয়স্পন্দন শুনছে, আর এ যেন শুধু আজ নয়,—সৃষ্টির আদি থেকে যেন তারা পরস্পরকে ভালবেসে এসেছে।

পাশেই একটা টেবিলের ধারে একটা মজুর-পরিবার এসে হাজির হ'ল। বসবার আগেই গিন্নী তাড়াতাড়ি কতকগুলি স্যাণ্ডউইচ বের করলে; সঙ্গে সঙ্গে তার চারটি ছেলেমেয়ের মধ্যে খাবার নিতে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, টেবিলটি তারা পুরোপুরি নাগাল পায় না—তাদের নাকগুলি কোনমতে টেবিলের উপরে এসে পৌঁছয়। দেখে মনে হয় মা-পাখী যেন দিনের শেষে খাবার নিয়ে তার বাসায় ক্ষুধার্ত ছানাদের কাছে পৌঁছল। প্রেমিকযুগল এইবার যেন বহির্জগতে ফিরে এল।

অ্যানা এইবার আবার ভাবতে শুরু করলে। হাজার হাজার লোকের মধ্যে একজনের ভাগ্যে অকস্মাৎ যা ঘটে যায়, অ্যানার আজ তাই ঘটেছে: সে ভালবেসেছে। সে আজ এমন এক প্রয়োজনের খপ্পরে পড়েছে—যার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, —যা কোন কিছুর হিসাব করে না,— যা স্বতঃস্ফূর্ত—স্বাধীন। এ প্রেমাস্পদের রূপ গুণ চরিত্রের বিচার করে না,—কোন কিছু ভেবে দেখে না। জগদ্দল পাথরের মত সারা বুক চেপে বসে থাকে —অথচ এ একটা সৌরভের মতই বস্তুহীন। একটা পরমাণুর চেয়েও ছোট এ, অথচ আবার পৃথিবীর মত বড়,—মানুষকে এ হয় আনন্দের স্বর্গে তুলে ধরে—অথবা এমন এক নরকযন্ত্রণায় নিক্ষেপ করে—যে সে হতভাগা একটা ইঁদুরকেও নিজের চেয়ে সুখী বলে মনে করে। এই অজ্ঞেয় রহস্য অ্যানার হৃদয়-অবগুণ্ঠন মোচন করেছে।

আটটার সময় 'ব্রাস্ ব্যাণ্ড' শুরু হল। বাগান একেবারে লোকে ভরে গেছে। যারা বাগানে বেড়াতে আসে তারা সব ঠিক সময় মত বাগানে এসে গেছে। চারিদিকে যে সব লোক বসে আছে—তাদের চোখের দিকে কার্ল একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল। অ্যানার সঙ্গে তার সম্বন্ধ এখন এমন ঘনিষ্ঠ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে এখন আর ভয় করবার কিছু নেই,—পরস্পরের প্রতি একটা গভীর সহানুভূতি তাদের মধ্যে জেগে উঠেছে।

পূর্বরাগপর্বের সব কিছুই কার্ল এক রকম ছাড়িয়ে এসেছে,—সুন্দরী নারীর সহচর বলে বিজ্ঞাপিত করবার যে ইচ্ছা পুরুষের মনে জেগে থাকে—তাও সে অতিক্রম করেছে। বাইরের জগত কোন কিছু দিয়েই আর তাদের ব্যাঘাত করতে পারে না। জীবনের শত ডামাডোলের ভিতর দিয়ে তারা এগিয়ে এসেছে,—এর মাঝে তারা পরস্পরের পক্ষে ও বিপক্ষে কত যুদ্ধই না করেছে; প্রত্যেক আঘাতে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে—পর মুহূর্তে দৃষ্টির প্রলেপে আবার সে ক্ষত মিলিয়ে গেছে।

এক জরাজীর্ণ বুড়ো একরাশ লাল নীল সবুজ বেলুন নিয়ে —এক টেবিল থেকে আর এক টেবিলের পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন—উড়োজাহাজের নিচে একটা ছোট কালো গাড়ি।

অ্যানা ও কার্ল আবার সেই তরুছায়াঘেরা রাজপথে ফিরে চললো,—আসবার সময় যেভাবে তাদের হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল তার রেশ যেন এখনও সারা রাস্তা ভরে রয়েছে। দুইজনই সেই কথা ভাবতে ভাবতে চললো। একটিও কথা না বলে, তারা ধীরে ধীরে পথ চলতে লাগলো: এখন তারা দুজনা পরস্পরের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে।

অ্যানা অবশ্য বাধা দিয়েছিল। তার মনে এই বাধার ভাব আসতে একটুও দেরি হয় নি। এখন পর্যন্ত তার মন একেবারে পরিষ্কার হয় নি। কিন্তু এই রকম অস্থির সংশয়ের ভাব বহন করতে তার মন একেবারে নারাজ হয়ে উঠেছিল। ঠিক এই সময়ে তার গত জীবনের সমস্ত স্মৃতি মুছে ফেলে দিয়ে কার্লকে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করবার একটা দুর্জয় ইচ্ছা তাকে যেন একেবারে পেয়ে বসলে। সে মনে করলে, এখনকার মত ত আর কিছু ভাবতে পারি নে।

তারা দু'জন যখন সদর দরজা দিয়ে ঢুকলো—সেই দুটো ফড়ফড়ানি মেয়ে দুটো মাথা কাছে এনে কি যেন কানে কানে বলাবলি করল। তাদের হাত মুখ একেবারে রোদে পুড়ে গেছে। এলফি এবার হলদে জামাটা পরেছে—আর অ্যালমা পরেছে নীল। দীঘিটার ধারে তারা জামা বদল করে নিয়েছে।

একজন পুরুষ সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছিল—কার্ল ও অ্যানার সঙ্গে দেখা হলে সে বলে উঠল: "ফ্রা অ্যানা, তোমার ভাগ্য ভাল, মরার খবর আসবার পরেও অবশ্য দুই একজন লোক ঘরে ফিরে এসেছে,—কিন্তু তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম।"

এলফি অমনি চেঁচিয়ে উঠল: "আমরা এ খবর কা'ল রাতেই শুনেছি।"

লোকটা প্রায় এক তলা নিচে নেমে গিয়েছে,—সেখান থেকেই জিজ্ঞাসা করলে: "কার কাছ থেকে ?" অ্যানাও শুনতে পেলে —উত্তরে মেয়েটি বলছে—"ফ্রা বস্‌চের কাছ থেকে।"

ফ্রা বস্‌চ একেবারে বুড়ী, অথচ এই ভাড়া ব্যারাকের যত খবর তার রাখা চাই,—এবং যে কোন একটা শ্রোতা পেলেই সে অমনি সেই সব নিয়ে গল্প করতে লেগে যায়।

অ্যানা ভাবতে লাগল: এর পর? সহসা তার বন্ধুর বাহুপাশে বদ্ধ হয়ে গেল,—চেয়ে দেখলে মেরীর দুই চোখ জলে ভরে এসেছে: "আমাকে বলিস নি কেন তুই ?—এখন দেখছি আমি ছাড়া আর এখানকার সবাই এ কথা জানে! সব কথা তুই আমার কাছে চেপে রাখতে চাস্! আমি দেখব তাকে চল.........হায় রিচার্ড, এখনই আমি তোমাকে দেখতে যাচ্ছি।" সিঁড়িতে তখন অন্ধকার।

"বেশ ত,—তুই কি বলতে চাস্ ?"

"আমি কত যে খুশী হয়েছি !"

খুশী অ্যানাও হয়েছে। সে ভাবল, এ খুশীর কি মাত্রা!

(শেষাংশ ১৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

আধুনিক বাঙলা কবিতা

শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল

মতবাদ মাত্রেই যে মূলত বাক্যের কসরৎ একথা মুখে স্বীকার করতে অনেকে কুণ্ঠিত হলেও মনে মেনে নিতে দ্বিধা বোধ করবেন না বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ মৌখিক কৃত্রিমতাকে পরিহার করতে না পারলেও, অন্তরটা আমাদের ততটা পরিমাণে মার্জিত হওয়াই সম্ভব, যাতে করে সত্যকে সত্য বলে চিনতে ও বুঝতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। কাজেই একথা বললেও বোধ হয় কেউ আপত্তি তুলবেন না যে, সেই মতবাদই তখন প্রবল ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যে মতবাদে তৎকাল প্রচলিত মতবাদের চেয়ে প্যাঁচের আধিক্য বেশি আছে। যে দেশে বেদ-উপনিষদ তথাগতী প্যাঁচে ঘায়েল হয়েছে এবং পরে নিজেকে আবার শাংকর দাপটে প্রায় দেশান্তরী হতে হয়েছে সে দেশে যে এর প্রমাণের জন্য অন্ধকারে হাতড়াতে হবে না তা বলাই বাহুল্য। বিশেষ করে নব্য ন্যায়ের ঐতিহ্যপুষ্ট বাঙালী আমরা, আমাদের কাছে তো একথা স্বতঃসিদ্ধ বলে গণ্য এবং মান্য হওয়াই উচিত।

মতবাদের এই মল্লযুদ্ধ যে কেবল ধর্ম আর দর্শনের ক্ষেত্রেই হয়েছে তা নয়, রাজনীতি, সমাজনীতি এমন কি সাহিত্যকে নিয়েও যুগে যুগে বিষম মাতামাতি চলেছে। আর যে বস্তু যত ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তাকে নিয়ে মাতামাতিটা হয়েছে তত বেশী। বস্তুত শ্রীকৃষ্ণের কথার কায়দায় বিপর্যস্ত হয়ে যে দুঃখে অর্জুন বলেছিলেন—'ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে', তা নিত্য নূতন মতবাদ-বিমূঢ় মানুষ মাত্রেরই দুঃখ, আর মানুষ মাত্রেরই ঐ অভিযোগ যে, এলোমেলো সব কথা বলে আমাদের বুদ্ধিটাকে যেন ঘুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গীতাতে অর্জুনের স্বীকৃতি সত্ত্বেও তাঁর বুদ্ধির মূঢ়তা ঘুচেছিল কিনা জানি না, তবে মানুষের বিমূঢ়তা যে ঘুচে নি তার পরিচয় তো নিত্য নূতনই পাওয়া যায়।

ধর্ম দর্শনাদি যখন সম্প্রতি আমাদের আলোচনার এলাকা-ভুক্ত নয়, তখন তা বাদ দিয়ে সাহিত্যে এ সম্বন্ধে কি রকমের কসরতটা চলেছে তার দু'একটা মাত্র উদাহরণ দেব। কারণ এ ধরণের ব্যাপার দু'চারটা করে সকলেরই জানা থাকা সম্ভব। প্রথম স্বদেশের কথাই বলা যাক। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস আজ নির্বিরোধে শ্রেষ্ঠ কবির আসন দখল করে আছেন। কিন্তু এমন দিন ছিল যখন গুণবিচারে তাঁর জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছিল 'শিশুপাল বধম্' প্রণেতা মাঘের নীচে। সেকেলে সমালোচকের প্রকর্ষ পরিমাপক এ প্রসিদ্ধ শ্লোকটি সকলেরই জানা থাকা সম্ভব।

"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থ গৌরবম্
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ।

কিন্তু আজ এই ত্রিগুণ বিশিষ্ট মহাকবি (?) যে বেঁচে আছেন সে কেবল কলেজের পাঠ্যতালিকার কল্যাণে। শুধু তাই কেন, ভাসের মতে এত বড় কবির কাব্য এমন কি তার নাম পর্যন্ত এ দেশের লোক ভুলে ছিল সুদীর্ঘকাল ধরে। মাইকেলের মেঘনাদবধকে ব্যঙ্গ করে "ছুছুন্দরী বধ" কাব্য রচনা আর হেমচন্দ্রকে মাইকেলের চেয়ে বড় কবি বলে তুলে ধরা তো সেদিনের ব্যাপার। স্বদেশে রবীন্দ্র প্রতিভার স্বীকৃতি যে কি বন্ধুর পথে ও মন্থরগতিতে এসেছে, তার সাক্ষ্য দেবার লোক এখনও অগণিত। ইংরেজ কবি কীট্‌সের সমসাময়িক সমালোচক তাঁকে কাব্য ছেড়ে ওষুধের ফোঁটা ঢালতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। রিচার্ডসনের একখানা সাধারণ উপন্যাস "পামেলা"কে গ্যয়টের মত কবি ও সমালোচক বলেছিলেন অপূর্ব। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। তবে প্রসঙ্গত এ কথাটা বলে রাখা ভাল যে, এ সব সত্ত্বেও রসবস্তুর নিত্যতা ও রস বিচারের শাশ্বত মাপকাঠির কথা যাঁরা জোর গলায় প্রচার করেন তাঁদের দূর থেকে নমস্কার জানান ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অবশ্য তাই বলে এঁদের কারো সঙ্গেই আধুনিক কবিদের আমি তুলনা করছি না। কিন্তু এহেন যখন অবস্থা তখন আধুনিক কবিতা নিয়ে যে মতের লড়াই চলবে এবং কোন্ মতবাদ প্রবল হবে, তার উপর যে ওর স্বীকৃতি অস্বীকৃতি নির্ভর করবে এ নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, 'আধুনিক কবিতা' যখন বৈঠকে মজলিসে, সভায় আর পত্রিকায় আলোচনার বস্তু হয়েছে তখন প্রকারান্তরে এর গুরুত্ব মেনে নেওয়া হয়েছে বৈ কি।

বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে সে দেশে সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় ঘটে, তার ধাক্কা তার চিন্তা রাজ্যেও ওলট পালট ঘটিয়ে দেয়। যুদ্ধের সময়ে রুশিয়ার মহাবিপ্লব আর যুদ্ধের পরবর্তী কালে ফ্যাসিস্ত মতবাদের অভ্যুত্থান ইউরোপে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তার ফলে ইউরোপীয় সাহিত্যে দেখা দেয় দুটো বিপরীতমুখী ভিন্নধর্মী ধারা। তার একটা রূপ নেয় আত্মকেন্দ্রিকতার মধ্যে—"সিম্বলিস্ট" ও "ইমেজিস্ট" কাব্য যার বাহ্য রূপ। আর একটা ধারা সমাজচেতনা ও ঐতিহাসিকবোধের প্রেরণায় পুষ্ট,—বর্তমানের পচনশীল সমাজ-ব্যবস্থার অবসান কামনা এবং ন্যায় ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক ভবিষ্যৎ সমাজের কল্পনা যার খোরাক। রুশীয় বিপ্লবের অভূতপূর্ব সাফল্য আর যুদ্ধ পরবর্তীকালে মার্কসীয় দর্শনের সমাদর বৃদ্ধি ও ব্যাপক প্রসারের ফলে এই পরবর্তী ধারাই এখন প্রবল হয়ে উঠেছে এবং ক্রমবিবর্তনের পথ ধরে চলছে। অবশ্য একথা অস্বীকার করা চলে না যে, এই উভয় ধারারই অপব্যবহার অল্প-বিস্তর হয়েছে, যার ফলে প্রথম ধারার কাব্য এমন একটি স্তরে এসে পেঁৗছেছে যা মানুষের মনের সুস্থ ও স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিকে রীতিমত ব্যঙ্গ করেই চলেছে। পক্ষান্তরে আদর্শবাদের দোহাই দিয়ে অপর ধারায়ও এমন সব বস্তুকে কবিতা বলে জাহির করা হয়েছে, যার স্থূলতা তাকে আর যাই হোক কাব্যের মর্যাদা দিতে পারে নি।

যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের চিন্তাধারার ধাক্কা এই বাঙলা দেশেও এসে পেঁৗছয় এবং এ দেশের কাব্যেও অনিবার্যভাবেই রঙ ও রূপের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অনিবার্য এই জন্যেই বলতে হল যে, রবীন্দ্রনাথের মত স্বপ্রতিষ্ঠ কবির চিত্তও তার ছোঁয়াচ থেকে রেহাই পায়নি এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না ঘটলেও বিষয়বস্তু, ছন্দ ভাষা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তা আত্মপ্রকাশ করেছে। যাঁরা আধুনিক বাঙলা কবিতাকে ইউরোপীয় কাব্যধারার প্রভাব-পুষ্ট বলে ঠাট্টা করেন তাঁদের মধুসূদন থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙলা কাব্যের ইতিহাস নেড়েচেড়ে দেখার জন্যই সবিনয় অনুরোধ জানাব।

যা হক ইউরোপীয় চিন্তাধারার সংঘাত এবং সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের অভিভাব থেকে মুক্তির দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা—এই দুটিই রয়েছে বাঙলা সাহিত্যে আধুনিক কাব্যসৃষ্টির প্রেরণার মূলে। রবীন্দ্র প্রভাবের এলাকার বাইরে এ হয়তো এখনও সম্পূর্ণরূপে যেতে পারে নি—ইউরোপীয় চিন্তাধারার সূত্রগুলি এখনও হয়তো তার সম্পূর্ণ আত্মস্থ হয় নি—কিন্তু যতটুকু যেতে পেরেছে এবং যতটুকু হয়েছে ততটুকু আধুনিকত্বের দাবী মেনে নিতে আপত্তি কি?

অথচ আধুনিক বাঙলা কাব্য যে 'আধুনিক' এ কথাটা মেনে নিতেও আমাদের দেশে কত দ্বিধা, সংকোচ আর কৃপণতা। পূর্ববর্তী কাব্যের শিথিলতা ঘুচে এর ভাষায় যে এসেছে একটা সংহত ঘনতা ও তীব্রতা, এর উপমায় উৎপ্রেক্ষায় যে নূতনত্বের সৃষ্টি হয়েছে, এর বিষয়বস্তুর যে পরিবর্তন ঘটেছে এবং প্রেম, জীবন, পরিবার, পৃথিবী সম্বন্ধে যে এর দৃষ্টিভঙ্গীর বদল হয়েছে, তা যে কেউ একটু দরদী মন নিয়ে এ কবিতার আলোচনায় [illegible]

তার কাছেই ধরা পড়তে বাধ্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে তুরীয় প্রেমের বাষ্পিক উচ্ছ্বাসে এ যুগের কবি বিশ্বাসবান নন, ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে তাঁর জেদী আস্থা আর নেই, ঈশ্বর যদি কোন ফাঁকে এ কাব্যের অঙ্গনে প্রবেশ করে বসেন তবে তাঁর ভাগ্যে জোটে একমাত্র শ্লেষ না হয় বিদ্রূপ। অনাহারের মহিমা প্রচার করে, ধনীর দানশীলতার স্তুতি গেয়ে, আর অর্থের বদলে রাজার গলা থেকে মাল্য উপহার নিয়ে এ যুগের 'সুরদাস' কৃত কৃতার্থ হন না, বিলাসী জীবনের ফুল, চাঁদ আর মলয়ের চেয়ে দৈনন্দিন জীবনের নিত্যসঙ্গী ধোঁয়া আর ধুলো তাঁর কাছে অধিকতর স্বীকৃতি পেয়েছে। আর এ যদি হয়ে থাকে তবে তা স্বাভাবিক নিয়মেই হয়েছে। কারণ কবি যে কোন তুরীয় লোকবাসী কিম্ভূতকিমাকার জীব নন, নিতান্তই রক্ত মাংসের মানুষ তা আজ প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। কাজেই He cannot stand completely outside the process of history in which he is involved and outside his own environment.

অর্থাৎ যে ঐতিহাসিক প্রবাহের মধ্যে তিনি আছেন এবং যে পরিমণ্ডলের মধ্যে তাঁহার বাস তার সম্পূর্ণ বাইরে তিনি যেতে পারেন না।

অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ইউরোপীয় সাম্প্রতিক কাব্যধারার সংক্রমনের সঙ্গে সঙ্গে তার দোষগুলোও বাঙলা কাব্যের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। symbolism আর imagery-র সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার পাল্লা দিতে দিতে তাকে যে বুদ্ধিভ্রংশী লোকে ইউরোপীয় কবিরা উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন এবং অবচেতন মন আর অবদমিত বাসনার দোহাই দিয়ে যে উদ্ভট পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করেছেন, তার প্রভাব আধুনিক বাঙালী কবিকেও আক্রমণ করেছে এবং যবন পণ্ডিতদের এই গুরুমারা চেলারা এই অবোধ্যতা আর আজগবিত্বের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠে সত্য সত্যই আমাদের বিভ্রান্ত করে ফেলেছেন। এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে, ইউরোপীয় সাম্প্রতিক কাব্যের যে দুটো ধারার কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি তার প্রথম ধারাটার বন্যাই আমাদের দেশে প্রথম এসেছিল। দ্বিতীয় ধারার কাব্য রচনা আরও আধুনিক এবং এই ধারাকেই অতিসাম্প্রতিক আখ্যা দেওয়া চলে।

কিন্তু পূর্বধারা সম্বন্ধে আরও একটা কথা এখানে বলার প্রয়োজন আছে। তা'হল এই যে, এই ধারার কাব্যে যে আত্মকেন্দ্রিকতা, নৈরাশ্যবাদ, অবসাদ ও নিউরসিসজনিত খেয়ালের সন্ধান মেলে—যার জন্যে এ যুগের কবি বলেন—

'পৃথিবীকে চূর্ণ চূর্ণ করে'
আকাশে ছড়িয়ে এসো অন্ধকারে আমতেই আজ।'
(অভীপ্সা, বিষ্ণু দে)

কিংবা 'মণ্ডুকের কূপে মোরে চিরতরে রাখো, ভগবান।'
(প্রার্থনা, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

অথবা নিত্য ব্যর্থতার লাঞ্ছনায় যখন তাঁরা বলে উঠেন—

'ব্যাপ্ত মোর চতুর্দিকে অনন্ত আমার পটভূমি;
সর্বি সেথা বিভীষিকা, এমন কি বিভীষিকা তুমি॥'
(নরক, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

বা

আজিকার ব্যাধি সেরে যেতে পারে হাসপাতালে,
জীবনের ব্যাধি সারিবার নয় জীবনকালে।'
(হাসপাতাল, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত)

তখন তাঁরা সমসাময়িক ঐতিহাসিক ধারারই একটা প্রতিধ্বনি করেন মাত্র। মানুষের এই ক্লৈব্য, ও দৈন্য অবাঞ্ছিত হতে পারে; কিন্তু ইতিহাসে এর অনিবার্যতাকে অস্বীকার করা চলে না—কাজেই কাব্যবিচারে ঐতিহাসিক চেতনায় যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের কাছে এরা আর যাই হোক নিন্দনীয় হতে পারেন না। এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের অন্যতম সাম্প্রতিক কবি ও সমালোচক Stephen Spender তাঁর "The Destructive Element" নামক সমালোচনা গ্রন্থের একস্থানে যা লিখেছেন নীচে তা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তিনি বলেছেন—

It seems, then, that if literature is suffering from a neurosis, we cannot escape from it by ignoring it, and by observing only the shell of our world, and attacking our own faults as we find them in our friends."

অতএব মনে হয় যে, সাহিত্যে যদি 'নিউরোসিস'এর প্রাদুর্ভাব হয়েই থাকে তবে তাকে উপেক্ষা করে আমরা তাকে এড়াতে পারব না। আমাদের জগতের বাইরেটাকে দেখে এবং নিজেদের দোষ গুলোই আমাদের বন্ধুদের মধ্যে দেখলে তার নিন্দা করে আমরা ওর থেকে পরিত্রাণ পাব না।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, ইউরোপীয় সাহিত্যের দ্বিতীয় ধারার আমদানী আমাদের দেশে খুব বেশী দিনের কথা নয়, কিন্তু বর্তমানে যাঁরা কাব্য সৃষ্টি করছেন তাঁরা প্রধানত এই ধারার অনুসরণ করেই চলেছেন। এ ধারা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধভাবে কোন কিছু বলার সময় এখনও না এলেও একথা অনায়াসেই বলা চলে যে, এ পথের যাঁরা পথিক তাঁদের অন্তত কয়েকজনের কাব্যের প্রাঙ্গণে পদপাত এমনই দৃঢ় যে তাতে শুধু আশার নয়, মনে নির্ভরতারই সৃষ্টি করে। এ কবিরা জানেন যে, পৃথিবীতে যে দুই পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘাত আজ চলেছে তার মধ্যে নিরপেক্ষতার ভান করা আত্মহত্যারই নামান্তর। যেদিকেই হক একদিকে ভিড়ে না পড়ে রেহাই নেই—কবি সিসিল ডেল্যুইসের ভাষায় 'Only ghosts can live between two fires'। শুধু তাই নয় ডেল্যুইস এ সতর্ক বাণীও উচ্চারণ করেছেন যে—'The innocent wing is soon shot down.' তাই এরা সেই জীবন দর্শনের দিকেই ঝুঁকে পড়েছেন, যে দর্শন মানুষকে নৈরাশ্য, ব্যর্থতা ও দুঃখ বেদনার মধ্যে নিরাশ করে ফেলে না, ভবিষ্যতের বাস্তব চিত্র সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ করে অন্তরে ও দেহে বলাধান করে, সমাজ চেতনা ও ইতিহাসবোধকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে দাঁড় করিয়ে মনের দ্বিধাগ্রস্ত বৈকল্যের অবসান ঘটায়। বিশ্বাস এদের অবিচল, তাই এরূপ দৃঢ় ভাষায় এরা বলতে পারেন—

শক্ত মুঠোয় স্বর্গ ছিনিয়ে নেওয়া
দেবতারা পারে ঠেকাতে আর কি, বলো?
(লাল ইস্তাহার, অরুণ মিত্র)

বা

আর গলিত নখ পৃথিবীতে আমরা রেখে যাব
সংক্রামক স্বাস্থ্যের উল্লাস।
(পদাতিক, সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

কিন্তু এখানে আমাকে একটা বিষয়ে ভুল বুঝবার সম্ভাবনা রয়ে গেছে। তাহল এই যে, যিনি পদ্যে মার্কসীয় বুলি আওড়াবেন, তাঁকেই বুঝি আমি নির্বিবাদে কবি বলে মেনে নিতে বলছি। কিন্তু তা যে মোটেই নয় সে কথা আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলছি। কারণ আমি জানি যে, পদ্য তখনই কবিতা পদবাচ্য হয় যখন কবির "style is dictated by the needs of his poetry, it does not merely contain the poetry,' অর্থাৎ কাব্যের প্রয়োজনে যখন ছন্দ গড়ে ওঠে, ছন্দে বানিয়ে কবিতা লেখা হয় না। কিন্তু তা'হলেও সাম্যবাদী কবির সমালোচক A. Selivenovsky-র নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলো বিশেষভাবেই ভেবে দেখবার মতো।

"To become an artist of socialism means, if you come from the intelligentsia, that not only must you be convinced that the ideas of socialism are correct, but that you must alter your previously-formed poetic style. It means that you must overcome and discard many of your former ideas about life: you must change your way of looking at the world. But this alteration does not imply, of course that the subject matter, imagery, and style of the poet of socialism is made to lose all individuality, is reduced to complete uniformity. This is far from the case. The fact is that it is socialism that ensures the all-round development and growth of human individual." (Poetry of Socialism).

"আপনি যদি বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থেকে এসে থাকেন, তাহলে সাম্যবাদী শিল্পী হতে হলে, আপনাকে সমাজতন্ত্রবাদের চিন্তা-ধারার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় তো হতে হবেই, অধিকন্তু আপনাকে আপনার পূর্বগঠিত কাব্যের ধাঁচ বদলাতে হবে। তার অর্থ, জীবন সম্বন্ধে আপনার পূর্বে যে ধারণা ছিল, তার অনেকগুলোকে আপনার জয় করে উঠতে হবে; অনেক-গুলোকে একবারে পরিহারও করতে হবে। জগৎ সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু এই পরি-বর্তনের অর্থ এ নয় যে, সমাজতন্ত্রবাদী কবির বিষয়বস্তু, চিত্র-রূপ এবং ধাঁচ সব রকমের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে এক রকমের হয়ে যাবে। আসলে তা মোটেই নয়। কারণ সমাজতন্ত্রবাদেই শুধু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সর্বাঙ্গীন পরিবৃদ্ধি ও বিকাশের নির্বাধ সম্ভাবনা আছে।"

আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ বহুল ও বিচিত্র। আমার নিজেরও এর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে। সেই কথাটা প্রথমে বলে নেব। লেনিন বলেছিলেন—"It (art) ought to be intelligible to the masses and loved by them." কিন্তু কোন কোন কবিতার ভাষার কারুমিতি, কাটছাঁটের আতিশয্য এমন এক স্তরে এসে পেঁছেছে যে কোন আধুনিক লেখক কথিত 'ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের' অধিকারী হয়েও তার মাধুর্য হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এ সব কবিতা জনসাধারণ তো দূরের কথা শিক্ষিত জনেরও অনধিগম্য থেকে যায়। আমার মনে হয় কাব্যের রাজ্যে এ এক প্রগতিবিরোধী অভিযান এবং অন্তত সাম্যবাদী বিচারে এ শিল্পের উপর ব্যর্থতার অভিযোগ আরোপ করা চলে। আমি পূর্বেই বলেছি আধুনিক কবিতাকে বহু প্রকারের অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়, তার সবগুলি কান পেতে শোনার মত না হলেও তার অনেক-গুলিই যে খতিয়ে দেখবার মত তা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে যাঁরা অভিযোগ তোলেন, তাঁদের অনেকেই আধুনিক কবিতা পড়বার ক্লেশ স্বীকার করেন না। অবশ্য যাঁরা আধুনিক কবিতা পড়েন তাদেরও এর বিরুদ্ধে অভিযোগ কম নয়। বিচিত্র অভিযোগের লাঞ্ছনা সব যুগের সব কবিকেই সহ্য করতে হয়েছে, কাজেই এ যুগের কবি যে তার ব্যতিক্রম করেন, এ আশা করা নিতান্তই দুরাশা মাত্র। তবে এ বলবার অধিকার আধুনিক কবির নিশ্চয়ই আছে যে, গালি আমরা মাথা পেতেই সয়ে যাব, কাব্যপাঠের সম্মানটুকুন যদি অভিযোক্তা অন্তত আমাদের দেন। কারণ বৃদ্ধ বিষ্ণু শর্ম্মার এ কথায় আজও তারা আস্থা হারান নি যে, "পণ্ডিতোঽপি বরং শত্রু।"

আধুনিক কবিদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করা হয় তার সবগুলোর আলোচনা সম্ভবপর হবে না। এখানে একজন বিখ্যাত লেখকের একটা অভিযোগ সম্বন্ধেই দু'একটা কথামাত্র বলব। তিনি বলেছেন, "তার (আধুনিক কবির) কথা এ নবীন কাব্যের যে নূতনত্ব তা কেবল নূতন নয়, তা চরম। এ কাব্যে যে ছন্দ চলেছে তার আবিষ্কারে পুরাতন সব ছন্দ বাতিল হয়ে গেছে। তারা হয়ে রইল ঐতিহাসিক: প্রকৃত যারা কবি তারা এখন থেকে এই ছন্দেই কাব্য রচনা করবে।' আধুনিক কবিদের মধ্যে কে বা কারা এ দাবী করেছেন কিম্বা করেন নাই তা আমার জানা নেই। তবে একথা নিঃসংশয়েই বলা চলে যে সাম্যবাদে বিশ্বাসী কোন কবির পক্ষে এরূপ উক্তি করা সম্ভব নয়, কারণ চরম পরম (absolute) প্রভৃতি কথাগুলির সঙ্গে তাঁদের মতবাদের মূলগত পার্থক্যই রয়ে গেছে। অপর কেউ যদি সত্যিই এ কথা বলে থাকেন তবে 'চরম পরম' আদি শব্দগুলি সম্বন্ধে ধারণা যে তাঁদের অতি উদ্ভট রকমের তা স্বীকার করতেই হবে।

পরিশেষে Stephen Spenderএর আর একটা সুন্দর উক্তি উদ্ধৃত করেই আমি এ প্রবন্ধের উপসংহার করছি। তিনি বলেছেন—

Good architecture is a criticism of slums. Good painting is a criticism of the pictures we have, the clothes we wear, all the appearances with which we surround ourselves. Good poetry is a criticism of language, of the way in which we surround ourselves. Our industrial civilization has proved almost impervious to that criticism of life which we find in architecture, painting, music and poetry. Art has been resisted and the artists have been driven to form cliques with a private language and private jokes. But no system can afford to be without the criticism of art. The whole point of artists adopting a revolutionary position, is that their interests may become social, and not anti-social, and that their criticism may help to shape a new society.'

"সুন্দর স্থাপত্যের সঙ্গে তুলনা করলেই বস্তির প্রকৃত স্বরূপটা বুঝা যায়। ভাল চিত্র দেখলে আমরা বুঝতে পারি আমাদের যে সব ছবি আছে, আমরা যে পরিচ্ছদ পরি, আর যে সব বস্তুতে আমরা নিজেদের ঘিরে রাখি তার আসল চেহারা কি। ভাল কাব্য আমাদের চিনিয়ে দেয় আমাদের ভাষার সত্যিকার রূপ এবং যার দ্বারা আমরা পরিবৃত থাকি তার কদর। স্থাপত্য, চিত্র, সঙ্গীত ও কাব্যে জীবনের যে সমালোচনা আমরা দেখতে পাই, আমাদের শৈল্পিক সভ্যতা আমাদের তা সম্বন্ধে অন্ধ করে ফেলেছে। শিল্প পেয়েছে বাধা আর শিল্পী নিজস্ব ভাষা আর রসিকতা নিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে দলগঠন। কিন্তু সব সমাজ ব্যবস্থাতেই শিল্পের সমালোচনা না হলে চলে না। যে শিল্পী একটা বৈপ্লবিক মনোভাব গ্রহণ করবে তার দৃষ্টি হতে হবে সমাজবোধসম্পন্ন, সমাজচেতনাবিরোধী নয়। কারণ তাতে করেই তাদের সমালোচনা নূতন সমাজ গঠনে সহায়তা করবে।"

এতক্ষণ আমি যা বলছি তার সঙ্গে যে সকলেই একমত হবেন এ আশা যে আমি করি না, তার আভাস পূর্বেই আমি দিয়েছি। যোগ্যতর আলোচনায় আমার কথাগুলি যদি বাতিল হয়ে যায়, তাও আমি প্রসন্নচিত্তেই মেনে নিব।

আপেক্ষিক

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

চলন্ত ট্রাম।.........

ডালহাউসি থেকে কালীঘাট।.........

আপিস-ফেরত কেরাণী-বোঝাই নিউ মডেল কারখানি ছুটে চলেছে ফুলস্পীডে।—ডাইনে অবারিত ময়দান আর বাঁয়ে অ্যাস্‌ফাল্টের চওড়া চৌরঙ্গী।

গল্প চাই? ঢুকে পড়ো ঠাসাঠাসি ভীড়ের মধ্যে—ফার্স্ট ক্লাস্ কি সেকেন্ড ক্লাসে, যেখানে খুশী। অফুরন্ত গল্প। অগুন্তি কাহিনী।.........

বাছবিচারের প্রয়োজন নেই! ওয়ান, টু, থ্রী বলে চোখ মেলেই যাকে ভাল লাগে, মানে যে প্রথম চোখে পড়ে, তাকে নিয়েই—অবশ্য সময় আর সুযোগের শুভ যোগাযোগ ঘট্‌লে—রীতিমত একখানি সুবৃহৎ এপিক নভেল লিখে ওঠা যায়। আপাতত ছোট্ট একটি গল্প হতে বাধা কি!

নীতিশ রায়। বাঁ দিকের সামনের সীটে জানালার পাশের ঐ আনমনা লোকটি। মার্চেণ্ট আপিসের কেরাণী। ধোপদস্ত জামা-কাপড়। চোখে চশমা। বুকে একটা ফাউণ্টেন-পেনও। তবু কত আর মাইনে! ত্রিশ? চল্লিশ? পঞ্চাশ? বড় জোর ষাট-পঁয়ষট্টি।

তা হক্। তবু সে আজ অজেয় সীজার বা বিজয়ী নেপোলীয়ান! আজ মাসের দোসরা। মাইনের তারিখ। বুক-পকেটে টাকা। বুক টান করেই বসে আছে আজ। আজকের দিনটাই সারা মাসের একটি মাত্র দিন। মাইনের তারিখ। দোসরা। বেঁচে থাক্ এই সংখ্যা দুই। এই দিনটির জন্যই গোটা মাসের অর্থ হয়। সারা জীবন চলে-না চলে-না করেও চালিয়ে যেতে ইচ্ছা যায়।

গল্পের ঘটনা-কাল যদি ছবি হয়, অতীত তার পটভূমি। নীতিশেরও একটা ইতিহাস আছে।—সবারই থাকে। তাকে ভালো করে চিনে নিতে তাই একটু সময় নিয়েছে—এই যা। বছর দশেক আগেকার কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারী, ইণ্টার-কলেজিয়েট ডিবেট্ কম্পিটিশনের একজন বাজখাঁই-গলার প্রতিযোগী, যাদের জুতোর তলায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ঘাসগুলি সব ক্ষয়ে ক্ষয়ে অঙ্কুরশুদ্ধ সাবাড় হয়ে গেল সেই প্রচণ্ড দেশোদ্ধার-ব্রতীদের অন্যতম ও একনিষ্ঠ নীতিশ রায় এখন পোষমানা পাখীর মত মিটমিট করে চেয়ে দেখছে চৌরঙ্গীর আপ-এন্ড-ডাউন মোটর গাড়ির অফুরন্ত মিছিল।.........

সংসারী। বিবাহিত। সন্তানের পিতা। বিধবা জননীর পুত্র। অনূঢ়া ভগ্নীর ভ্রাতা। স্বামী-পরিত্যক্তা পিশিমার ভ্রাতুষ্পুত্র। সেই নীতিশের আজ 'কনোটেশন' বেড়ে গেছে চতুর্গুণ।.........

কল্পনার শক্তিও তার বেড়ে গেছে অপরিসীম। আজ—এই এখন—বুক পকেটে সযত্নে ভাঁজ-করা নোট কয়খানাকে কেন্দ্র করে নীতিশ মনের আকাশে ছেড়ে চলেছে যত বেলুনের পর বেলুন। ফেলে-আসা অতীতকে ঢেলে সাজতে চায় বার বার। যা কোন দিন হয়নি বা কোন মতে হতেও পারত না, সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে অনায়াসে। সেই অনাস্বাদিত নতুন নতুন ভূমিকায় নানান ঢঙে অভিনয় করতে করতে কখন বর্তমানের গণ্ডী ছাড়িয়ে নীতিশ রায় চলে যায় সুস্পষ্ট, সুসঙ্গত, সুনিশ্চিত ভবিষ্যতে!.........

এদিকে চলে এসেছে কলকাতা ছেড়ে ভবানীপুরে। এক একটা রঙীন বেলুন ফেটে যায় এক সঙ্গে এক মুহূর্তে। হুঁস হয়, আজ তাকে খানিকটা আগেই নামতে হবে—জগুবাবুর বাজারের কাছে। ডক্টর মুখার্জির ডিস্‌পেন্সারী থেকে ছোট খোকার এক্‌জিমার ওষুধ নিয়ে যাবার কথা। কিন্তু—এখনো যে টিকিট করা হয়নি। কণ্ডাক্টার এতবার করে তার সামনে দিয়ে ঘুরে গেল, পয়সা চাইল না একবারও। ভেবেছে, তার মান্থলি টিকিট আছে। তা হলে ভুল করে শেষ পর্যন্ত তার কাছে আর আসবেই না।

"ওহে কণ্ডাক্টার", উদার উদাত্ত কণ্ঠে হাঁক ছাড়ে নীতিশ। লোকটাকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে একটু সচেতন করে দেবে এমনি ভাবখানা।

কণ্ডাক্টার এগিয়ে আসে।

"টিকেট," কণ্ডাক্টারের হাতে একটা টাকা দিয়ে নীতিশ উঠে দাঁড়ায়, "জলদি দাও। সামনের স্ট্যাণ্ডে নাবব।...... সবগুলই আনি আর পয়সা, সিকি নেই?"

টুক্ করে একখানি পাঁচ পয়সার টিকেট কেটে কণ্ডাক্টার পাশ কেটে সরে দাঁড়ায়—নির্লিপ্ত, উদাসীন।

আধ ঘণ্টা বাদে ১৩।২।১ ডি রাণী শঙ্করী লেনের বড় বাড়িটার পুব দিকের অংশের ভাড়াটেদের চাতালের উপর সে কি মহোল্লাস!

দেড়সের ওজনের ইলিশ মাছ দেখে ছেলে-বুড়ো সবাই খুশী। টাকার মত চক্‌চকে মাছটা ঘিরে দাঁড়িয়েছে বাচ্চু, পেনু, বুলী আর মায়া—অনূঢ়া ছোট বোন বিজলী আর সতের বছরের কলেজে-পড়া ছোট ভাই ক্ষিতীশচন্দ্রও।

মায়া তার চুলের ফিতা পেয়ে নিশ্চিন্ত। বিজলীর একটা সেমিজ এসেছে। বাচ্চুর এসেছে মাঠে যাবার খাকীর হাফ্-প্যাণ্ট। পেনু তার কলম-কাটা ছুরি পেয়ে এক দৌড়ে সটান শোবার ও-ঘরে পড়ার টেবিলের কাছে।.........

"ওগো শুনছ, সবাই মিলে জটলা করছ আর এদিকে আমি সারা দিন খেটে এসে—আমার হাতে একটু জল দে না রে বিজু! মাছের হাতে তোদের বালতি ছুঁলে ত এক্ষুনি তোদের ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে।"—আজ কিন্তু হেসে হেসেই বলল নীতিশ।

হেসে হেসেই এগিয়ে আসে রেণুকণা—ভার্যা, গৃহিণী, সচিব, পাচিকা, পরিচারিকা, একাধারে সব কিছুই।

"জামাটা নাও। বুক পকেটে টাকা আছে—মাকে দিয়ে এসো।—বাজার এসেছে ৸৵ আনার। ওদের জামা-কাপড়

এতে-ওতে দু'টাকার মত গেছে। ৪২৶১০ পয়সা গুণে নিয়ো।—আর, পাঁচ পয়সা গেছে আমার আসবার ট্রাম ভাড়া।"

স্ত্রী মুখের দিকে তাকায়।

"বড্ড ভীড় ছিল আজ সেকেণ্ড ক্লাসে।—সেকেণ্ড ক্লাসে যত সব জোচ্চোর আর পকেটমারের ভীড়। মাইনের তারিখ এক পয়সা বেশী দিয়ে ফার্স্ট ক্লাসে আসাই ভালো, কি বলো?"

* * * * *

মাসের শেষে।.........

বেলা সাড়ে ন'টা।.........

সেই ১৩।২।১ডি রাণী শঙ্করী লেনের পুব দিকের অংশের বার-দুয়ারটা সশব্দে বন্ধ করে সেই নীতিশ ঊর্ধশ্বাসে পথ চলে।......

ঝগড়া করে বার হয়েছে। মেজাজ গেছে বিগড়ে। আজো লেট হতে হবে। যত রাজ্যের কথা উঠবে কি নীতিশ যখন সারা দিনের মধ্যে দু'মুঠো গিলতে বসবে ঠিক সেই সময়টাতেই? অমন সংসার জাহান্নামে যাক্। যেমন মা তেমনি বৌ। মেয়ে জাতটাই খারাপ। বেড়ালের জাত! রোজ একবার কোঁদল না করলে রাত্রে ভাল ঘুম হয় না ওদের। ইডিয়ট!.........

সেই পুরনো হাজরা রোডের মোড়। সেই একটানা ট্রাম লাইন। সেই দেখে-দেখে অর্থহীন দু'ধারের বাড়িগুলি। সেই অভ্যস্ত একঘেয়ে কলকাতা!......

চলন্ত ট্রাম। সেকেণ্ড ক্লাস। গাদাগাদি ভীড়। দোরের কাছেও লোক বাদুড়ের মত ঝুলে চলেছে।—কালীঘাট-টু-ডালহাউসি। পৌনে দশটা।.........

নীতিশকে আজো মিনিট পাঁচেক লেট হতে হবে। টিউসনি থেকে ত আজ সকাল করেই ফিরেছিল। তবু—। ....ডালহাউসির উত্তর পাড়ে নেমে তাকে হাঁটতে হবে পাঁচ মিনিটের পথ। ট্রাম লাইন ক্লাইভ স্ট্রীট ধরে আর খানিকটা এগিয়ে গেলে কোম্পানীর কি এমন ক্ষতিটা হত! প্রাণপনে ছুটলেও মিনিট চারেক লেট হবে নির্ঘাত। বড়বাবুও কোন্ আর মিনিট চারেক মুখ বিড় বিড় না করবেন।.........

এলগিন রোড পিছনে ফেলে আপিসের ট্রাম চলে এল ময়দানে। ভীড় ঠেলে ঠেলে কণ্ডাক্টার পয়সা নেয় আর টিকেট দেয়—যথারীতি, যথাযথ।.........

নীতিশ পকেট থেকে চারটে পয়সা বার করে তৈরী হয়ে আছে। বাইরে তাকিয়ে ভাবতে থাকে এ-মাসের ভুল আর ও-মাসের ভাবনার কথা। বিজলীর সেমিজ আর বাচ্চুর প্যাণ্ট সামনের মাসে কিনলেও চলত। যতীন রাহার খুচুরা দেনাটা মাইনে পেয়েই শোধ করে দেওয়া উচিত ছিল। লোকটা যে এমন ছোটলোক সে-কথাটা মাইনের তারিখের দিন ভুলে থাকা উচিত হয়নি। যদুবাবুকেও গোটা দুই টাকা দিলে মাস কয়েক মুখ বন্ধ করে রাখা যায়।.........কেবলি ভুল আর গড়মিল। এবার থেকে নীতিশ শক্ত হবে। দোসরা তারিখে ভুলবে না কাউকে। মাসে মাসে কিছু কিছু শোধ দিলে তবে ত আবার হাত পাতার ভরসা থাকে।.........

আজ নীতিশ হুঁসিয়ার লোক। অতি প্রাক্‌টিক্যাল। বিবেচক। হিসেবী। বুদ্ধিমান।.........

থিয়েটার রোড.........আর্মি এণ্ড নেভি.........হল এণ্ড এণ্ডারসন.........ফারপো.........গ্র্যাণ্ড হোটেল.........

মাইনে পেতে এখন পুরো সাত-সাতটা দিন। এদিকে যে—

ট্রাম ছুটে চলে।.........

মেট্রো গেল, এসপ্ল্যানেডের মোড় গেল, গেল ইম্পিরীয়াল লাইব্রেরী।......এজ্‌রা ম্যান্‌সনও যায়-যায়। এই মোড়টুকু ঘুরলেই সটান চোখে পড়ে ডালহাউসি স্কোয়ার।.........আর মিনিট দেড়েক, ভাবতে থাকে নীতিশ, ওপার থেকে তাদের আপিস চার মিনিটের কম নয়। এখনো ছ'মিনিট। তবু পাঁচ মিনিট লেট হওয়া আজ আটকাবে কে! লালদীঘির ওপার থেকে তাদের আপিসটা যদি আর একটু কাছে হত!.........

নীতিশ চট্ করে উঠে পড়ে। এখনো টিকিট কাটেনি। চাইলে না ত তার কি দোষ!—সারা পথ কাটিয়ে এসে শেষকালে কি.........হঠাৎ ভুল করে যদি ব্যাটাচ্ছেলে সামনে এসে বলেই বসে "টিকেট, বাবু!"

—কালীঘাট থেকে ডালহৌসি। এক আনা। চার পয়সা।......

ঐ ত ডালহাউসি.........ঐ ত দেখা যায় রাইটার্স বিল্ডিং। কতটুকু বা পথ। গোটা তিনেক স্ট্যাণ্ড শুধু বাকী। তিন-চার মিনিটের রাস্তা। পাঁচ মিনিট লেট ত হয়েইছে, দু'মিনিট বেশীতে আর এমন কি এসে যাবে। বড়বাবুর দু'ট কথাই নয় বেশী শুনবে।.........

"এই কণ্ডাক্টার বাঁধো, জলদি বাঁধো"—বলতে বলতে ভীড় ঠেলে দাঁড়ানো যাত্রীদের প্রায় ধাক্কিয়ে পা মাড়িয়ে নামবার দোরের কাছে পেঁাছে গেল নীতিশ যেন চোখের পলকে।

"টিকেট হয়েছে, বাবু?" সন্দিগ্ধ কণ্ডাক্টার থামাবার বেল দিয়ে প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ-হ্যাঁ। বাঁধো জলদি।"—নীতিশ প্রায় রুখে ওঠে।

হেস্টিংস স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম ভাল করে থামতে না থামতেই নীতিশ রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে। পড়েই সলজ্জ মুখ তুলে থাকায় কণ্ডাক্টারের সরোষ মুখখানির দিকে।

"যত সব জোচ্চোর আর বাটপার—" বলেই কণ্ডাক্টার কটমট করে তাকিয়ে ছাড়বার বেল বাজাল। এবার নীতিশ কি জানি কেন মুচকি হাসে।

ছদ্মবেশী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২

১৫ই ডিসেম্বর। অফিস ঘরে বসিয়া প্রশান্তকুমার কাজ করিতেছিল এমন সময়ে একজন বেয়ারা আসিয়া একটা পত্র দিল।

হাতের লেখা দেখিয়াই প্রশান্ত বুঝিল হরিপদর চিঠি। খাম ছিঁড়িয়া চিঠি পড়িয়া প্রশান্ত খুশী হইল। হরিপদ লিখিয়াছে, পত্রবাহক গৌরহরি বসু সত্য সত্যই ভদ্রবংশের সন্তান; সে একজন সুদক্ষ ড্রাইভার এবং শিক্ষিত মেক্যানিক; লেখাপড়াও কিছু জানে, অন্তত দীপুকে এক আধ বছর পড়াইবার মত নিশ্চয়ই জানে; বিশ্বস্ত, চরিত্রবান এবং হরিপদর পরিচিত। আপাতত ষাট টাকা মাহিনা দিলেই চলিবে।

বেয়ারা অপেক্ষা করিতেছিল; প্রশান্ত বলিল, "বাবুকে ডেকে নিয়ে আয়।"

অবনীশ ঘরে প্রবেশ করিয়া নত হইয়া প্রশান্তকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

ড্রাইভারের আকৃতি দেখিয়া প্রশান্ত প্রীত হইল। চমৎকার ভদ্রলোকের মত চেহারা। আশ্চর্যই বা কিসের? —সত্য সত্য ভদ্রলোকই ত বটে। বেশ-ভূষাও ভদ্রলোকের মতই পরিচ্ছন্ন।

হৃষ্টচিত্তে প্রশান্ত বলিল, "তোমার পরিচয় হরিপদবাবুর চিঠিতে পেলাম। আমার দুখানা গাড়ি আছে—"

প্রশান্তকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, ভক্সল্ আর ডজ্।"

লোকটির তৎপরতা দেখিয়া প্রশান্ত খুশী হইল,—ইহারই মধ্যে সন্ধান করিয়া জানিয়া লইয়াছে। বলিল, "হ্যাঁ, ভক্সল্ আর ডজ্। তুমি কোন্‌টা চালাতে ইচ্ছে কর?"

"যেটা যখন দরকার হবে স্যার।"

উত্তর ভাল,—প্রশান্ত প্রীত হইল।

এমন সময়ে কক্ষে প্রবেশ করিল লাবণ্য। লাবণ্যকে দেখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "এস লাবণ্য। তোমার দাদা ড্রাইভার পাঠিয়েছেন।"

লাবণ্য বলিল, "তাই শুনেই ত' দেখতে এলাম।"

প্রশান্তর মনটা প্রসন্ন ছিল, একটু পরিহাস করিবার সুরে বলিল, "বাপের বাড়ির লোক—তুমি ত' interested feel করবেই।" বলিয়া অল্প একটু হাসিল।

লাবণ্য নিকটে আসিতে অবনীশ আগাইয়া গিয়া তাহাকেও ঠিক প্রশান্তেরই মত নত হইয়া অভিবাদন করিল।

একটা চেয়ারে উপবেশন করিয়া লাবণ্য অবনীশের প্রতি ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তোমার নাম কি?"

বিনীত কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে মেমসায়েব, আমার নাম গৌরহরি বসু।"

সহসা মেমসায়েব সম্বোধন শুনিয়া লাবণ্য মনে মনে একটু চমকিত হইল;—একটু খুশীও যে হইল না, তাহা নহে। ঝাড়ুদার হইতে আরম্ভ করিয়া ড্রাইভার পর্যন্ত সকলেই এ বাড়িতে প্রশান্তকে সাহেব বলিয়া সম্বোধন করে, কিন্তু লাবণ্যকে তাহারাই মা বলিয়া ডাকে। মেমসাহেব সম্বোধন এই নূতন, কানেও নিতান্ত মন্দ লাগিল না। একটু বিলাতিয়ানার গন্ধ আছে বটে; কিন্তু প্রশান্ত যদি সাহেব হইতে পারে, তাহা হইলে সে মেমসায়েব হইলে অপরাধ কোথায়?

লাবণ্যকে মেমসায়েব সম্বোধনের নূতনত্বে এবং মিষ্টত্বে প্রশান্তও খুশী হইয়াছিল। এই পদোন্নতির জন্য কুঞ্চিত চক্ষে এবং সহাস্যমুখে লাবণ্যর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশান্ত তাহাকে নিঃশব্দে অভিনন্দিত করিল।

লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়ির মেক্যানিজ্‌ম্ কিছু বোঝো?"

অবনীশ বলিল, "সামান্য বুঝি মেমসায়েব।"

সহসা প্রশান্তর খেয়াল হইল যে, হরিপদর নিকট হইতে একটা পত্র আসিয়াছে যাহাতে এই সকল কথাই স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে। তখন ব্যস্ত হইয়া সেই চিঠিখানা লাবণ্যর হস্তে দিয়া সে বলিল, "তোমার দাদার চিঠি; প'ড়ে দেখ, সব জানতে পারবে।"

চিঠি পড়িয়া খুশী হইয়া লাবণ্য চিঠিখানা প্রশান্তকে ফিরাইয়া দিল।

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "লেখাপড়া কতদূর করেছ গৌরহরি?"

অবনীশ বলিল, "বেশি নয় স্যার।"

"বাঙলা ভাল জান?"

"কতকটা জানি।"

"ইংরেজি?"

"সামান্য।"

বাঙলার জ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্য প্রশান্ত বলিল, "আচ্ছা, বল দেখি, সমীচীন শব্দে কি কি ঈকার আছে?"

অবনীশ বলিল, "দুটই দীর্ঘ ঈকার স্যার।"

"ঠিক। মরীচিকায়?"

"প্রথমটা দীর্ঘ ঈকার, পরেরটা হ্রস্ব ইকার।"

"ঠিক বলেছ। আচ্ছা, দুঃসহ শব্দে কোন্ স?"

অবনীশ বলিল, "দন্ত্য স।"

"আর দুর্বিষহে?"

"মূর্ধন্য ষ।"

"বাঃ! ঠিক বলেছ।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, বিজিগীষা শব্দের মানে কি বল দেখি?"

অবনীশ বলিল, "জয় করবার ইচ্ছা।"

সপ্রশংস নেত্রে অবনীশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশান্ত বলিল, "তুমি ত' বাঙলা ভাল জান হে গৌরহরি!"

অতঃপর বাঙলার বিষয়ে আর কোনও প্রশ্ন করা অনাবশ্যক মনে করিয়া অবনীশ ড্রাইভারের ইংরেজি ভাষার জ্ঞানের বিষয়ে পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইল; বলিল, "আচ্ছা, 'তিনজন গভর্নর জেনারেল'এর ইংরেজি কি হবে বল দেখি?"

অবনীশ বলিল, "থ্রি গভর্নর জেনারেলস্।"

প্রশান্তর প্রফুল্ল মুখমণ্ডল ঈষৎ ম্লান হইল; বলিল, "এটা ত' ভুল করলে হে।"

"কি হবে স্যার?"

প্রশান্ত বলিল, "থ্রি গভর্নরস্ জেনারেল হবে। আচ্ছা, 'গভর্নর জেনারেলের বাড়ি'র ইংরেজি কি হবে বল দেখি।"

অবলীলাক্রমে অবনীশ বলিল, "গভর্নরস্ জেনারেল হাউস।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া প্রশান্ত বলিল, "এটাও ভুল করলে।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অবনীশ বলিল, "কেন স্যার? কি হবে তা'হলে?"

"হবে গভর্নর জেনারেলস্ হাউস।"

"আগেরটাতে আগে এস হবে, আর পরেরটাতে পরে?"

প্রশান্ত বলিল, "হ্যাঁ, তাই হবে। আগেরটা প্লুরাল এস্; আর পরেরটা পজেসিফ্ কেসের অ্যাপস্ট্রফি এস্।"

প্রশান্তর দিকে ক্ষণকাল একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া অবনীশ বলিল, "বুঝলাম না স্যার!"

সে কথায় মনোযোগ না দিয়া প্রশান্ত বলিল, "দশ টাকার ইংরেজি কি বল ত?"

অবনীশ বলিল, "টেন রুপীস্।"

"বেশ। দশ টাকার নোটের ইংরেজি কি?"

অবনীশ বলিল, "টেন রুপীজ্ নোট।"

একটু হাসিয়া প্রশান্ত বলিল, "এঃ! ইংরেজিতে গৌরহরি, তুমি দেখ্‌ছি একেবারে মা সরস্বতী!"

বিস্মিত কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "কেন স্যার? ভুল হ'ল?"

"হ'ল বৈ কি। হবে টেন রুপী নোট।"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে তাকাইয়া থাকিয়া দুই হাত জোড় করিয়া অবনীশ বলিল, "কিছু যদি মনে না করেন স্যার, তা হ'লে একটা কথা বলি।"

"কি, বল না।"

দুঃখার্তকণ্ঠে অবনীশ বলিল, "এই অবিচারের জন্যেই ইংরেজি শিখিনি! একটার জায়গায় দুটো টাকা হ'লে হয় টু রুপীজ্, আর নোটের বেলায় দশ টাকায় হ'ল টেন রুপী? টেন রুপীজ্ নোট বললে কি অন্যায় হ'ত বলতে পারেন স্যার? বলুন না, বলতে পারেন? টু রুপীজ্ ঠিক, আর টেন রুপীজ্ নোট ভুল,—এ অবিচার নয়?"

মৃদুকণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "না, অবিচারের কথা এর মধ্যে ঠিক নেই। সব জিনিসেরই ত' ভঙ্গী আছে, ভাষারও ভঙ্গী আছে। এটাও সেইরকম ভঙ্গীর কথা।"

অবনীশ বলিল, "এ ত' গোঁজামিলের কথা হ'ল স্যার, মুখখু মানুষকে আপনি গোঁজামিল দিচ্ছেন। আচ্ছা, ও কথা না-হয় ছেড়ে দিন, নিউমোনিআর কথাই ধরুন। বলবার সময়ে বলি আমরা নিউমোনিআ, অথচ লিখি পিনিউমোনিআ। নিউমোনিআর নাকের ওপর মিছিমিছি ঐ বোবা পি অক্ষরটা জুড়ে দিয়ে কি সুবিধে হয়েছে বলতে পারেন? উচ্চারণ থাকবে না অথচ স্থান থাকবে, এর কোনও যুক্তি আপনি দেখাতে পারেন?"

বরং টেন রুপী নোটের একটা কোনও যুক্তি দেখাইলেও দেখানো যাইতে পারিত, কিন্তু, প্রশান্ত ভাবিয়া দেখিল, এই মূক 'পি'র অকারণ নিউমোনিআর নাকের উপর বসিবার কোনও যুক্তিই সে দেখাইতে পারে না। অন্তত এখন ত' একেবারেই কিছু মনে পড়িতেছে না। কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া সে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। ভাবিয়া-চিন্তিয়া গড়িয়া-পিটিয়া একটা কোনও চলনসই যুক্তি দেখাইতে সাহস হয় না,—গৌরহরি গোঁজামিলের কথা তুলিবে, সে ভয় আছে।

ওদিকে একটু আড়ালে বসিয়া লাবণ্য মুখে অঞ্চল গুঁজিয়া হাসিয়া অস্থির হইতেছিল। স্বামীর দুরবস্থা দেখিয়া তাহার একটু দুঃখও যে হইতেছিল না, তাহা নহে। চাকা সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ঘুরিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন প্রশ্ন করিতেছিল গৌরহরি এবং প্রশান্ত যে সে-সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিতেছিল না তাহা সুস্পষ্ট।

অবনীশ বলিতে লাগিল, "আপনাদের আশ্রয়ে যখন পাকা-ভাবে রইলাম, তখন ক্রমে ক্রমে এসব কথা নিশ্চয় জেনে নেবো। পণ্ডিতের ঘরে এসে যদি কিছু না শিখলাম তা হ'লে ঘর ছেড়ে এত দূরে এলামই বা কেন। কিন্তু যাই বলুন স্যার, ইংরেজি ভাষা ভারি অবিচারের ভাষা, এর মধ্যে বিচার নেই, বিবেচনা নেই।"

তাহার পর হাস্যোদ্ভাসিতা লাবণ্যর দিকে একটু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, "আপনার কাছে একটু নিবেদন করি মেমসাহেব, যে ভাষায় বি ইউ টি বাট্ হয়, অথচ পি ইউ টি পুট হয়, সে ভাষায় বিচার-বিবেচনা আছে বলা যায় কি? আমাদের বাঙলা ভাষায় 'ব'য়ে আকার 'ব'য়ে আকার বাবা হয়, তা' ব'লে 'দ'য়ে আকার 'দ'য়ে আকার দিদি ত কখনও হয় না।"

অবনীশের কথা শুনিয়া লাবণ্য হাসিয়া ফেলিল; সহাস্য-মুখে বলিল, "ইংরেজি ভাষার আলোচনা এইখানেই আজ বন্ধ থাক গৌরহরি, দীপুকে তোমার ইংরেজি পড়াতে হবে না, শুধু বাঙলাই পড়িয়ো। এখন একটু গাড়ি চালিয়ে দেখাবে চল। তোমার পোষাক আছে?"

"আছে মেমসায়েব।"

"আচ্ছা, তা হ'লে আগে মুখ-হাত-পা ধুয়ে চা-খাবার খেয়ে নাও, তারপর গাড়ি বার ক'রে আমাদের খবর দিও। আমি ব'লে দিয়েছি, বেয়ারা বাইরে আছে, তুমি গেলেই সে তোমার সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে।"

অবনীশ বললে, "কোন্ গাড়ি বার করব মেমসায়েব ?"

"ভক্স্‌লটাই বার কোরো।"

"যে আজ্ঞে, আমি মিনিট দশ পনেরর মধ্যেই গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি এনে হর্ন দেবো।"

প্রশান্ত বলিল, "না, না, তাড়া নেই, আজ রবিবার। তুমি চা-টা খেয়ে নাও।"

অবনীশ বলিল, "আমি ট্রেন থেকে নেমে বাজারে খাবার খেয়ে নিয়েছি স্যার, এখন আর খাবার দরকার নেই।"

বাজার অর্থে এলাহাবাদ স্টেশনের প্রথম শ্রেণীর রেস্তোরাঁ এবং খাবার অর্থে ব্যয়বহুল ব্রেক ফাস্ট কোর্স, সে কথা প্রশান্ত অথবা লাবণ্য কেহই বুঝিল না।

যাইতে যাইতে ফিরিয়া চাহিয়া অবনীশ বলিল, "নিউ-মোনিআর কথাটা একদিন আপনার কাছে ভাল ক'রে জেনে নেবো স্যার।"

প্রশান্ত চুপ করিয়া রহিল, কোনও উত্তর দিল না।

অবনীশ অদৃশ্য হইলে প্রশান্ত বলিল, "একটু ফাজিল ব'লে মনে হয় না লাবণ্য ?".

লাবণ্য বলিল, "ঠিক ফাজিল না হ'লেও একটু বাচাল বটে।"

প্রশান্ত বলিল, "তার্কিকও মন্দ নয়।"

"সে ত' বোঝাই যাচ্ছিল। তোমার মত ব্যারিস্টারকেও এক-একবার তর্কে চুপ করিয়ে দিচ্ছিল। তা ছাড়া, ইংরেজি তোমার চেয়ে ও কম জানে, না তুমি ওর চেয়ে বেশি জান, তাও ঠিক বোঝা গেল না।" বলিয়া লাবণ্য হাসিয়া উঠিল।

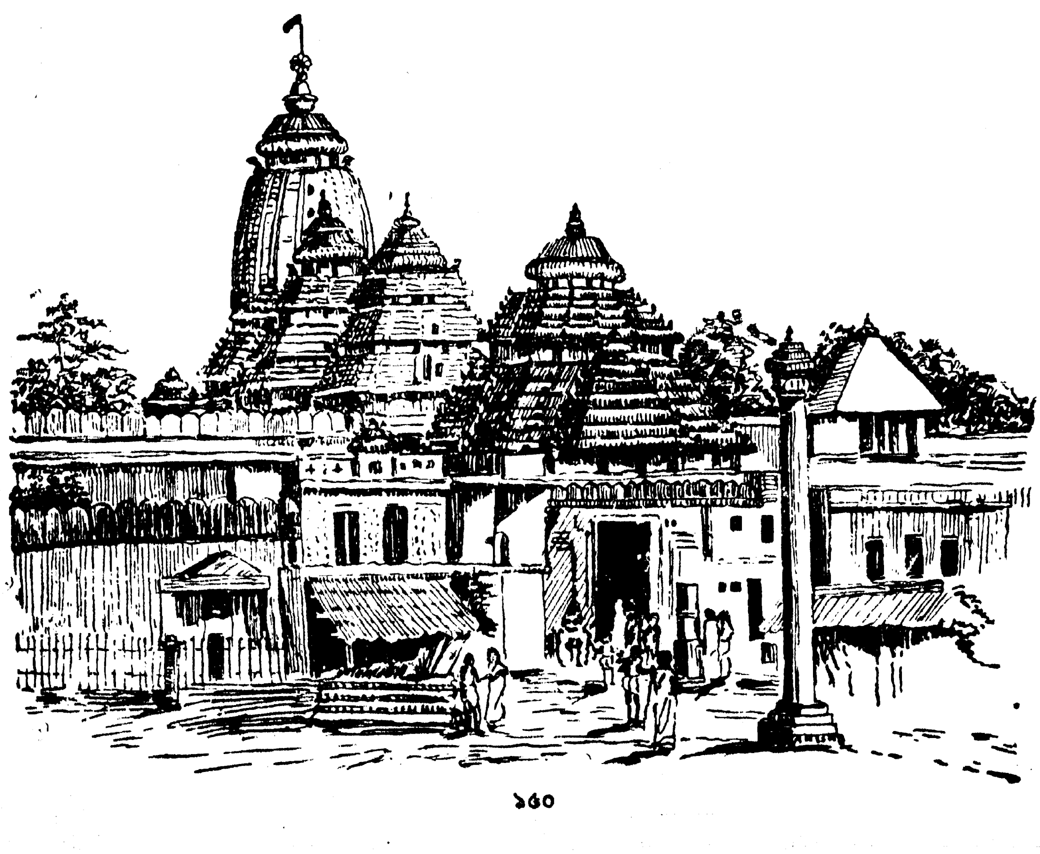
স্মিতমুখে প্রশান্ত বলিল, "কি করি বল, যত সব উদ্ভট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল। তুমি জান না লাবণ্য, মূর্খ লোকের আলগা প্রশ্নে অনেক সময়ে পণ্ডিত লোকেরা বিপদে প'ড়ে যায়।"

সহাস্যমুখে লাবণ্য বলিল, "তা'ত দেখতেই পাচ্ছিলাম।"

প্রশান্ত বলিল, "আবার যাবার সময়ে নিউমোনিআর বিষয়ে নোটিস্ দিয়ে গেল। জ্বালাতন করলে ! এ ত' আইনের কথা নয়—ফাইললজির কথা; কোনও প্রফেসার প্রফেসারের কাছে জেনে নিতে হবে। কিন্তু বাঙলায় ও পণ্ডিত। 'দুর্বিষহ'র বানান আর বিজিগীষার মানে যখন বলতে পেরেছে তখন আর ওর মার নেই।"

প্রশান্তর কথা শুনিয়া লাবণ্য হাসিতে লাগিল।

(ক্রমশ)



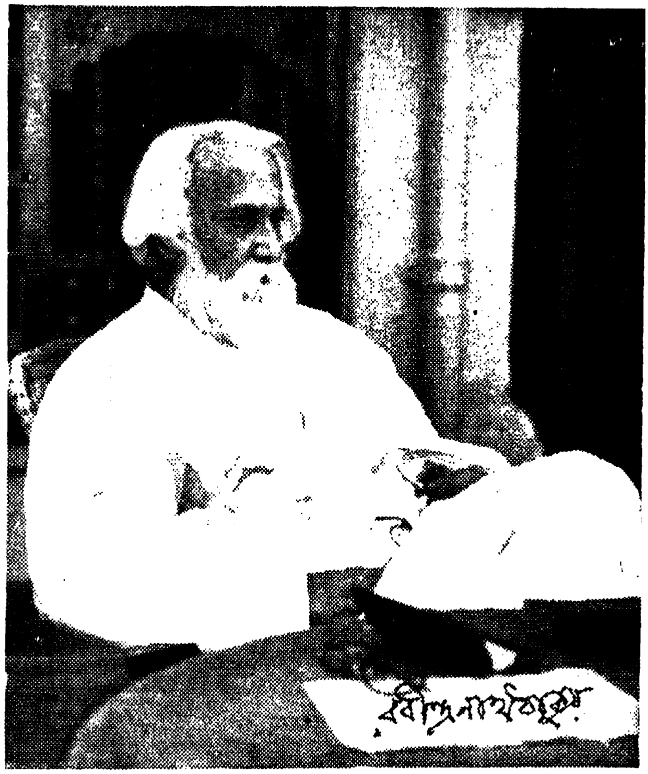
আশ্রমের মন্দির

শ্রীকিরণবালা সেন

আজ ১১ই মাঘ। শরীর সুস্থ নেই বলে পূজনীয় গুরুদেব সন্ধ্যার উৎসবে মন্দিরে উপস্থিত হতে পারেন নি। কিন্তু তিনি তাঁর বাণী লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর লেখা অন্যের মুখে আমরা মন্দিরে শুনলাম। এতকালের মধ্যে, আশ্রমে উপস্থিত থেকেও গুরুদেব বিগত ৭ই পৌষের উৎসবে আর আজকের এই ১১ই মাঘের উৎসবে মন্দিরে আসতে পারলেন না।

"তোমার কাছে শান্তি চাব না
থাক না আমার দুঃখ ভাবনা।"

গুরুদেবের এই গানটি আজ মন্দিরে গীত হোলো। নানা দুঃখ দুর্গতিতে বসুন্ধরা আজ ক্লিষ্ট পীড়িত। অশান্তির আগুন চারদিকে ছেয়ে গেছে। এর উপরে প্রাকৃতিক অঘটনও কত আছে। অনাবৃষ্টিতে এদেশে তেমন ফসল নেই এবার।



সামনের ধূ ধূ করা মাঠের দিকে চেয়ে আজ শীতের বেলায় গুরুদেবের 'এল যে শীতের বেলা' গানটি মনে পড়ছিল। কাজের অন্তে সফলতার তৃপ্তিপূর্ণ শান্ত সন্ধ্যার একটি রূপ মনে এসে মনকে স্নিগ্ধ করে গেল। কিন্তু মনে তবু ব্যথা বাজে, দেশে শান্তি নেই।

ফসল না হোক, দুর্গতি আসুক তবু পূর্ণ মনে আঙিনায় আসন পেতে অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

"নেবে নিবুক প্রদীপ বাতাসে
ঝড়ের কেতন উড়ুক আকাশে
বুকের কাছে ক্ষণে ক্ষণে
তোমার চরণ পরশনে
অন্ধকারে আমার সাধনা॥"

অশান্তির মধ্যে ও সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে সত্যের রূপ তা উপলব্ধি করার আয়োজন, কত উৎসবে পূজনীয় গুরুদেব করে রেখেছেন এই আশ্রমে।

"বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান,
সেই সুরেতে জাগব আমি
দাও মোরে সেই কান।"

যত ঝড় ঝঞ্ঝাই চলুক না কেন, বিধাতার বিধানে তার ক্ষতি পূরণেরও ব্যবস্থা আছে। প্রতি দিনের সংসারের অসহ্য দুঃখ, ক্ষতি শোকের তীব্রতায় মানুষ যখন মুষড়ে পড়ে একেবারে, আনন্দের ক্ষীণ একটি রেখাও দেখতে পাবে মনে করে না তখনও দেখা যায় প্রতিকারের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা হয়ে গেছে, দুঃখ নিবারণের শুশ্রূষা চলেছে।

দেখা যায় প্রভাত তার নির্মল রূপটি নিয়ে প্রতিদিন উদ্ভাসিত হচ্ছে। দিনের শোভা, সন্ধ্যার শান্তি যথা নিয়মেই দেখা দিচ্ছে। এই বাণীও রয়েছে এখানে। ঋতুর পর ঋতু যখন পর্যায়ক্রমে তার ঐশ্বর্য সম্ভার নিয়ে এসে উপস্থিত হয় এই প্রান্তরে, তখন গুরুদেব কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে আহ্বান করে নেন তাদের। তারপর প্রকৃতির সৌন্দর্যের স্পর্শে, আনন্দে বিভোর কবির অন্তর্নিহিত চির-নবীন শ্যামল রূপটিও প্রকাশ হয়ে পড়ে তাঁর গানে, তাঁর রচনায়। কবির সৃষ্টিতে সমস্ত আশ্রম তখন যেন আনন্দ অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে মনে হচ্ছে 'মানসী' বইখানির আলোচনা প্রসঙ্গে গুরুদেব একদিন বলেছিলেন, বিশ্বের সৌন্দর্যের স্পর্শে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের মিলন হয়। এই সৌন্দর্য নানা অনুভূতিরও হতে পারে। বিশ্ব প্রকৃতি, নানা দিক থেকে নানা সুরের বিচিত্র বাণী অহরহ আমাদের মনে বহন করে আনছে। আমরা অন্যমনস্ক থাকার দরুণ সব সময়ে সে সব বাণী আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে না। তাই সাড়াও পাওয়া যায় না। কিন্তু

যখন স্পর্শ করে তখনই বাহিরের সঙ্গে মিলন হয় অন্তরের। এই মিলনে যে আনন্দটি তাই প্রকাশ সাহিত্যে। সেদিনের তাঁর কবিতার একটু অংশ উদ্ধৃত করি এখানে।

"বাহিরে পাঠায় বিশ্ব
কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে
ব্যথা ভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।
সেই মোহ মন্ত্র গানে
কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা
ছাড়ি অন্তঃপুর বাসে
সলজ্জ চরণে আসে
মূর্তিমতী মর্মের কামনা;
অন্তরে বাহিরে সেই
ব্যাকুলিত মিলনেই
কবির একান্ত সুখোচ্ছাস।"

প্রতি বৎসর যথাযথ ঘনঘটা করে মহাসমারোহে বর্ষা এসে উপস্থিত হয় এই প্রান্তরে, বসন্ত তার বিপুল সৌন্দর্য নিয়ে এসে উপস্থিত হয়, তখন তার নানারূপ সুখ দুঃখের নিবিড় অনুভূতি কবির লেখনী থেকে নানা ছন্দে অজস্র ধারায় ঝরে পড়তে থাকে। গানে গানে তাঁর অন্তর পূর্ণ হয়ে ওঠে। তাঁর এই অফুরন্ত আনন্দ নির্ঝরের ধারা চিরকাল নিখিল মানকে অভিষিক্ত করে চলবে।

আজ এই উৎসব দিনে গত বছরের এই উৎসব দিনটি মনের মধ্যে ছবির মতো ভাসছে। সেদিন মাটীর প্রদীপের আলোকে আলোকিত মন্দিরটি ধূপ ধুনো ফুলের গন্ধে ভরে গিয়েছিল। তার মধ্যে বেদীর সামনে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে থাকে থাকে নৈবেদ্যর চূড়োর মতো করে প্রদীপের সারি সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই সুন্দর আলোর মধ্যে, সেই সকল প্রদীপের শিখার সামনে বসে গুরুদেব তাঁর অন্তরের কথা বলছিলেন। তাঁর অন্তরের দীপ্তি দিয়ে প্রকৃতির সকল আনন্দ রূপের মধ্যে আর বিশ্বমানবের মধ্যে যে সত্যের রূপ তিনি দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন তাই বলছিলেন।

গুরুদেবের 'শান্তিনিকেতন' বই থেকে একটুখানি এখানে উদ্ধৃত করে এই লেখাটুকু শেষ করি। "এই আশ্রমে আছে কী? মাঠ এবং আকাশ এবং ছায়াগুলি, চারদিকে একটি বিপুল অবকাশ এবং নির্মলতা। এখানকার আকাশে মেঘের বিচিত্র লীলা এবং চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারার আবর্তন কিছুতে আচ্ছন্ন হয়ে নেই। এখানে প্রান্তরের মাঝখানে ছোটো বনটিতে ঋতুগুলি নিজের মেঘ আলো বর্ণ গন্ধ ফুল-ফল নিজের সমস্ত বিচিত্র আয়োজন নিয়ে সম্পূর্ণ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। কোন বাধার মধ্যে তাদের খর্ব হয়ে থাকতে হয় না। চারদিকের বিশ্বপ্রকৃতির এই অবাধ প্রকাশ এবং তার মাঝখানটিতে শান্তম শিবমদ্বৈতমের আরাধনা, আর কিছুই নয়।"

শুকতারা

(১৫৫ পৃষ্ঠার পর)

ঃ তুমি আমায় ভুল বুঝো না বনোয়ারী—আমি সত্যই পাপী, আমি মদ খাই—ভিক্ষা করি।

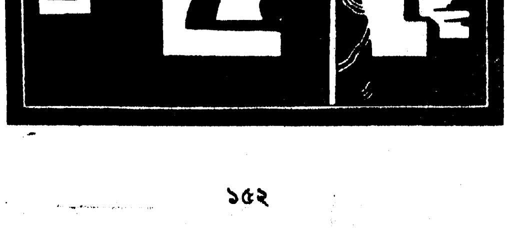
ঃআমি তোমায় এখনও ভালবাসি।

ঃ না, না, আমায় ঘৃণা কর। তোমার জীবন ব্যর্থ করে দেবার জন্যে আমায় অভিশাপ দাও!

বনোয়ারী কঙ্কনকে আকর্ষণ করিয়া বলিল, তবু আমি তোমায় ভালবাসি।

ঃ তবু তুমি ভালবাস।

কঙ্কন আর কোন প্রতিবাদ করিল না। জীর্ণ শীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানি বনোয়ারী মুখের 'পর তুলিয়া ধরিল।



শুকতারা

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার

কঙ্কন নতমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। চোখ তুলিয়া চাহিতে সে পারিতেছে না। লজ্জায় কুণ্ঠায় তাহার মনটা রি রি করিয়া উঠিতেছে।

বনোয়ারী কিন্তু উল্লসিত হইয়া উঠিল। বাঁশের নল দিয়া কাঠ কয়লার আগুনে ফুঁ দিতেছিল। তাড়াতাড়ি নলটা একপাশে রাখিতে রাখিতে বলিল, অনেক দিন পরে—আমি প্রায়ই ভাবি যাব একবার, ভয়ানক কাজ পড়ে গেছে, তাগিদার ঠেলায় একদণ্ড বিশ্রাম করবার ফুরসুত পাইনে! দাঁড়িয়ে কেন—বস কঙ্কন।

কঙ্কন দাঁড়াইয়াই রহিল, কোন কথাও কহিতে পারিল না, এমন কি চোখ তুলিয়াও চাহিতে পারিল না। দুর্বলতায় শরীরটা তাহার ইসৎ কাঁপিতেছে।

বনোয়ারী আজ কুড়ি একুশ বছর যাবৎ কামারের কাজ করিতেছে সেজন্যই চোখে তেমন ভাল দেখে না এবং কানেও একটু কম শোনে। বয়স তাহার যথেষ্ট হইয়াছে, পঁয়তাল্লিশের উর্দ্ধে! আজও সে অকৃতদার, বিবাহের জন্য যথেষ্ট পীড়াপীড়ি হইয়াছে, কিন্তু সে বিবাহ করে নাই।

বনোয়ারী একটু সন্দিগ্ধ হইয়া কঙ্কনের মুখের দিকে চাহিল। কঙ্কনের দুঃখের কথা সে জানে এবং তাহার দুঃসহনীয় দাম্পত্য জীবনের সকল খবরই সে রাখে।

বনোয়ারী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া কঙ্কনের হাত ধরিল। বনোয়ারীর পরশে কঙ্কনের সর্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল।

বনোয়ারী আবেগ কণ্ঠে বলিল, কঙ্কন, কি হয়েছে? তোমাকে এত রোগা, এত ক্লিষ্ট দেখাচ্ছে কেন?

কঙ্কন করুণ নয়নে বনোয়ারীর দিকে চাহিল! বেশিক্ষণ চাহিতে পারিল না, বুকের ভিতর কেমন যেন শির্ শির্ করে। বনোয়ারীর পরশ সে সহ্য করিতে পারে না, শীতল রক্ত কেমন যেন চঞ্চল হইয়া উঠে! দুঃখ কষ্ট, রোগ শোকের সঙ্গে প্রাণান্ত সংগ্রাম করিয়া আজ জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছে তবু বনোয়ারীর সান্নিধ্যে, তাহার চাহনিতে, তাহার কথায়, তাহার স্পর্শে প্রাণে চঞ্চলতা আনিয়া দেয়, হৃদয়ের শত ছিন্ন তারে নূতন সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিতে চায়।

কঙ্কন আপনাকে যথাসাধ্য সংযত ও কঠোর করিয়া বলিল, বনোয়ারী কিছু পয়সা ধার দিতে পার?

ঃ ধার! কত?

কঙ্কনের মনে হইল বনোয়ারী যেন তীব্র বিদ্রূপ করিল! বহুবার সে ধার বলিয়া টাকা পয়সা নিয়াছে কিন্তু কখনও শোধ করে নাই।

কঙ্কন আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না। দুই দিনের অনাহারে ও মাতাল স্বামীর প্রহারে তাহার শরীর ভীষণ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। পেটে তাহার যেন আগুন জ্বলিতেছে! কঙ্কন মরীয়া হইয়া বলিল, আট আনা!

বনোয়ারী কোন কথা না বলিয়া ট্যাঁক খুলিল, ট্যাঁকে মাত্র সাতটি পয়সা আছে।

কঙ্কন হাত বাড়াইয়া বলিল, তাই দাও, আজ দু'দিন ধরে—আর বলিতে পারিল না, ক্রন্দনোচ্ছ্বাসে কণ্ঠ জড়াইয়া গেল। শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। অস্থি চর্ম সম্বল বুকের পাঁজরাগুলি মৃদু মৃদু কাঁপিতে লাগিল।

বনোয়ারী বলিল, তুমি একটু দাঁড়াও কঙ্কন। মা'র কাছে পয়সা আছে, আমি এনে দিচ্ছি!

বনোয়ারী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কঙ্কন কম্পিত বক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেক কথাই আজ কঙ্কনের মনে পড়িতেছে। বনোয়ারীর সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব আবাল্যের। যখন তাহার বিবাহ হয় তখন পারিল, স্বামীর ভালবাসায় কৈশোর মন অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল সেদিন কঙ্কন প্রথম জানিতে পারিল যে বনোয়ারীর আসন বহুকাল পূর্বেই তাহার হৃদয়ে পাতা রহিয়াছে। বহু চেষ্টা করিয়াও সে আসন তুলিতে পারে নাই। যতই সে বনোয়ারীকে ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছে ততই যেন সে নিবিড়তররূপে অন্তরের অন্তরালে আসন করিয়া লইয়াছে।.........

বনোয়ারী ও তাহার মা'র কথা ভাল করিয়া শোনা যাইতেছে না। কঙ্কন পা টিপিয়া টিপিয়া বেড়ার উপর কান পাতিল।

বনোয়ারীর মা বলিতেছেন, তোর মত বোকা ছেলে আর দেখি নি! তোকে বোকা পেয়ে বারবার ঠকাবে, তবু বুঝতে পারিস নে। ও কি সহজ মেয়ে!

ঃ না মা, তুমি বিশ্বাস কর কঙ্কন আমায় কখনও প্রতারণা করে না। কঙ্কন দু'দিন খেতে পায় নি।

ঃখেতে পায় নি তা'তে তোর কি। যে তোর জীবনটা এমনিভাবে ব্যর্থ করে দিল, তার সঙ্গে কথা বলতে তোর লজ্জা করে না।

ঃ কঙ্কন যে আমায় ভালবাসে মা!

বনোয়ারীর মা অতি দুঃখেও হাসিয়া ফেলিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, পুত্রের এত বয়স হইল, এতবার প্রতারিত হইল তবু লোক চিনিতে পারিল না। লোকে যাহা বলে তাহাই সে বিশ্বাস করে।

বনোয়ারী অনুরোধের সুরে বলিল, আর কখনও চাইব না, আমার হয়ে কঙ্কনকে তুমি ক্ষমা কর মা।

বনোয়ারীর মা কঙ্কনকে অনেক কথা শুনাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারিলেন না। আঁচল হইতে আট আনা পয়সা খুলিয়া দিতে দিতে বলিলেন, বলে দিস আর কখনও যেন পোড়ারমুখ না দেখাতে হয়।

বনোয়ারী সম্মতি সূচকভাবে ঘাড় নাড়িয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। বনোয়ারীর মা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কঙ্কন পয়সা পাইয়া বেশিক্ষণ আর দাঁড়াইতে পারিল না। এখনও যেন প্রলোভনে তাহার দেহের প্রতি রক্তকণা কাঁপিয়া উঠে। বনোয়ারী হয়ত অন্য কিছু ভাবিবে কিন্তু কঙ্কন দাঁড়াইতে পারিল না, ভয়ে সে পলাইয়া আসিল। এখনও তাহার ভয়; এত বিপর্যয়ের পরেও সে ভয় কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। কি একটা অস্পষ্ট ভয় ও সংস্কার তাহাকে সর্বদা সন্ত্রস্ত করিয়া রাখে।

'দারিদ্র্য ও মাতাল স্বামীর অত্যাচারে এক এক সময় কঙ্কনের মনে হয় বনোয়ারীর প্রস্তাবই সে গ্রহণ করিবে। সমাজে সম্মান হয়ত সে পাইবে না কিন্তু শান্তি ত পাইবে। দিনের পর দিন এত অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করিয়া যাওয়ার মধ্যে সামাজিক সম্মান থাকিতে পারে কিন্তু সুখ শান্তি নাই, মনুষ্যত্বও নাই।

কঙ্কন যখন বস্তিতে ফিরিয়া আসিল তখন বেশ রাত্রি হইয়াছে। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল তাহার স্বামী শঙ্করলাল তিন দিন পরে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। শঙ্করলালকে দেখিয়া কঙ্কনের চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল।

গত তিন দিনে কঙ্কন অনেক খুঁজিয়াছে, কিন্তু কোথায়ও শঙ্করের কোন পাত্তা পায় নাই। ক্ষুধার জ্বালায় তাহাকে অনেক খুঁজিতে হইয়াছে। হাতে একটি পয়সা ছিল না, শরীরের সামান্য গহনাগুলিও বহু পূর্বেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। গত দুই দিন সে এক দানা খাবার মুখে তুলিতে পারে নাই। যে স্বামী এমন দুরবস্থায় মদ খাইবার জন্য জোর করিয়া পয়সাকড়ি কাড়িয়া লইয়া

তাহাকে আজ কঙ্কন কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিল না, সহ্যও করিতে পারিল না।

শঙ্কর সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়া আসে নাই। তাড়ির নেশায় মাথা তুলিতে পারিতেছে না, মেঝেতে পড়িয়া আছে। তাড়ি ও বমির দুর্গন্ধে ঘরটি ভরিয়া গিয়াছে। দুর্গন্ধে ও নোংরামিতে ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত কঙ্কনের গা বমি বমি করিতে লাগিল।

শঙ্কর মাথা তুলিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল, হারামজাদী ফিরেছে!

কঙ্কন ভয়ে সরিয়া গেল এবং আঁচল হইতে পয়সা খুলিয়া অন্যত্র লুকাইয়া রাখিল।

শঙ্কর খাটিয়াটি ধরিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল, হারামজাদী পালিয়েছে, বনোয়ারীর সঙ্গেই পালিয়েছে।—দুটোকেই খুন করব। এ্যা, এই যে চাঁদ। অনেকক্ষণ যাবৎ বসে আছি, বলি কোথায় অভিসারে যাওয়া হয়েছিল? খালি বাড়ি পেয়ে খুব মজা লুটছ—না?

কঙ্কন কোন জবাব দিল না এবং প্রহার হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

: কোথায় যাচ্ছিস-রে হারামজাদী! শঙ্কর টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিল। শঙ্কর কঙ্কনের হাত ধরিয়া বলিল, মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব! আবার তেজ আছে। পাজী, শুয়ার যাচ্ছিস কোথায়?

কঙ্কন ঝাপটা মারিয়া হাত ছুটাইয়া বলিল, যমের বাড়ি।

: হারামজাদীর তেজ আছে। এক ঘুসিতে নাকের ডগা গুঁড়িয়ে দেব।

কিল ঘুসি নূতন নয়, নিত্য নৈমিত্তিক, কঙ্কন ভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল।

শঙ্কর বলিল, পয়সা দে!

: পয়সা! সরম করে না বলতে।

: যা, যা বেশি বকতে হবে না, ভালয় ভালয় আঁচল থেকে খুলে দে, নইলে বুঝতেই ত' পারিস।

শঙ্করকে কোন বিশ্বাস নাই। প্রকাশ্য স্থানে মারধর করিতে পারে। পয়সা খুঁজিবার জন্য কাপড় খুলিয়াও ফেলিতে পারে। কঙ্কন ভয়ে তাড়াতাড়ি এক পাশে সরিয়া গেল।

: দিবি কিনা বল, নইলে ভাল হবে না বলছি।

: আমার কাছে পয়সা নেই, থাকলেও একটি পাই দিতুম না।

: আমার সঙ্গে চালাকি। আমি কোন খবর রাখি না বলতে চাস হারামজাদী। বনেয়ারী এখানে ছিল না?—সে তোকে পয়সা দেয় নি?—আমি অত বোকা নই। দে বলছি।

কঙ্কন ভয়ে ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া আসিয়া বলিল, বনোয়ারী ছিল বেশ করেছে। ও রোজই থাকবে। অসুখে যখন পড়েছিলুম তখন ফেলে যাবার সময় মনে ছিল না। তুই মরিস না কেন? তুই মরলে আমার হাড় জুড়ায়।

: কি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! শঙ্কর ঘুসি বাগাইয়া অগ্রসর হইল।

কঙ্কনের মন প্রথম হইতেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাই আজ আর নীরবে অত্যাচার সহ্য করিতে পারিল না। দরজা বন্ধ করিবার বাঁশটা তুলিয়া লইয়া শাসাইয়া বলিল, এক পা এগিয়েছিস কি খুন হয়েছিস। রোজ রোজ মেরে আস্পর্ধা বেড়ে গেছে, আজ আর আস্ত রাখব না।

মাথার উপর উঁচান বাঁশটি দেখিয়া শঙ্কর ভয়ে সরিয়া গেল। স্ত্রীর নিকট পরাজয় সে মানিতে পারে না, সেজন্য দূর হইতে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে লাগিল।

কঙ্কন বাঁশটি নামাইয়া দরজায় দাঁড়াইয়া রহিল। মনে হইল, এই ত' সমাজ জীবন, এই ত' দাম্পত্য জীবন। সামাজিক হইয়া থাকিবার লোভে এবং ভদ্র নারীর সম্মানের মোহেই বনোয়ারীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নাই। বনোয়ারীর আমন্ত্রণ যদি গ্রহণ করিত তবে হয়ত সে খুশী হইতে পারিত, সুষ্ঠুভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিত।

কঙ্কনের মনে পড়িল, পাঁচ বৎসর পূর্বে শঙ্করের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া কঙ্কন একটু মুক্তির নিশ্বাস লইবার জন্য বাহির হইয়া পড়ে। ইতস্তত ঘুরিতে ঘুরিতে বনোয়ারীর ছোট কারখানায় আসিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়ায়। বনোয়ারী কঙ্কনকে দেখিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং কত আদর যত্ন করিয়া কত সাংসারিক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। কঙ্কনের প্রতি মুহূর্তের সংবাদে বনোয়ারী কত আনন্দ পাইয়াছিল। বনোয়ারীর হাবভাবে, ব্যবহারে ও তাহার প্রশ্নে কঙ্কনের মনে হইয়াছিল, সে যেন বনোয়ারীর নিকট চিরন্তন বিস্ময়।

ভাবিতে ভাবিতে কঙ্কনের আরও মনে পড়িল, সে কোন দুর্বল মুহূর্তে নিজের ব্যর্থ জীবনের সকল দুঃখ ও গ্লানির কথা বলিয়া একসময় হঠাৎ লজ্জিত হইয়া উঠে। তাহার মনে হইয়াছিল, পরপুরুষকে কেন সে দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতা এমনভাবে ব্যক্ত করিল? সে কি পরপুরুষকে ভালবাসে। ভাবিতেও কঙ্কনের লজ্জায় ভয়ে মাথা নত হইয়া পড়িয়াছিল।

কঙ্কন সন্ত্রস্তভাবে বনোয়ারীর বাহুবন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইতে লইতে বলিয়াছিল, আমায় ক্ষমা কর বনোয়ারী; আমি হিন্দু স্ত্রী, স্বামী জীবিত থাকতে আমার আর বিয়ে হতে পারে না। আমার সমাজ আছে, সমাজ জীবনের সুনাম ও ভদ্রতা আছে—আমি ত' কুলত্যাগ করে যেতে পারি না।

বনোয়ারী ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়াছিল, কোন জবাব দেয় নাই।

কঙ্কন একটু সরিয়া বসিয়া বলিয়াছিল, তুমি আমার দুরদৃষ্টের সুযোগ নিয়ে আমায় প্রলোভন দেখাবে তা আমি ভাবি নি বনোয়ারী। আমি ঋণ সম্পর্কে কথা বলতে এসেছিলুম। আমার স্বামী এখন আবার মিলে কাজ করতে যাচ্ছে, চুরির মামলা থেকে রেহাই পেয়েছে। এবার ঠিক তোমার ঋণ শোধ করে দেব।

বনোয়ারী তবু কোন জবাব দেয় নাই। কঙ্কন বনোয়ারীর পাণ্ডুর মুখখানির প্রতি আর তাকাইতে সাহস পায় নাই, ভয়ে চলিয়া আসে। রাস্তায় নামিয়া তাহার দুই চোখ ভরিয়া জল নামিয়াছিল। কঙ্কন ভাবিয়াছিল এত বড় মিথ্যা অভিযোগ সে জানিয়া শুনিয়া কি করিয়া বনোয়ারীর উপর চাপাইতে পারিয়াছিল। এত বড় আঘাত ভিন্ন কি তাহার আত্মরক্ষার আর অন্য কোন উপায় ছিল না?

এর জবাব কঙ্কন তখনও পায় নাই, আজও পায় না। তাহার শুধু দুঃখ বনোয়ারী তাহার অশ্রুজল দেখে নাই, যদি দেখিত তবে হয়ত তাহাকে সে ক্ষমা করিতে পারিত।

শঙ্কর যে হঠাৎ দূর হইতে ঢিল ছুঁড়িতে পারে, তাহা কঙ্কন অনুমান করিতে পারে নাই। সে খুঁটিতে হেলান দিয়া অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঢিলটি আসিয়া মাথায় পড়িতেই 'ও-মা-গো' বলিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। ক্লান্ত ও দুর্বল, কঙ্কন আঘাত সহ্য করিতে পারিল না, অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

কঙ্কনের যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন বেশ রাত্রি হইয়াছে। দুর্বলতায় ও ক্লান্তিতে সর্ব শরীর শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। মাথাটা এত ভারি হইয়া পড়িয়াছে যে অতি চেষ্টাও তাহা তুলিতে পারিতেছে না।

আহত স্থানে অসহ্য ব্যথা করিতেছে। কঙ্কন ব্যথা অনুভব করিতেছে কিন্তু কি যে ঘটিয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। ঢিল লাগিয়া ললাট ফাটিয়া গিয়াছে এবং ফাটা স্থানটা

রক্ত জমিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কঙ্কনের মনে হইল, ক্ষুধার জন্যই সে এত ব্যথা অনুভব করিতেছে।

কিছু না খাইলেই নয়, কঙ্কন আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। মনে হইতেছে পেটের আগুনে যেন সব কিছুই পুড়িয়া যাইতেছে। সে আগুনের তাপে সর্ব শরীর জ্বলিয়া যাইতেছে, মাথাটা ভাঙিয়া যাইতেছে। কঙ্কন আর অপেক্ষা করিতে পারে না। মৃত্যু যেন আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কঙ্কন ভয়ে ভয়ে ভাবিল, এই কি মৃত্যু? হয়ত হইবে নতুবা এত জ্বালা, এত ব্যথা এত বিভীষিকা কেন?

কঙ্কন ভয়ে, দুঃখে, ব্যথা ও অনুশোচনায় ছটফট করিতে করিতে একসময় ঘুমাইয়া পড়িল।

সেই যে আঘাত করিয়া শঙ্কর পালাইয়াছে আর ফিরিয়া আসে নাই। হয়ত কয়েক দিন আর এমুখো হইবে না। না আসুক, সেজন্য কঙ্কনের কোন চিন্তা নাই, বরঞ্চ একটুক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে থাকিতে পারে।

কিন্তু কঙ্কন বনোয়ারীকে লইয়া ভীষণ দমিয়া গেল। সত্যই কি বনোয়ারী তাহার জন্য গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে! দুই দিন যাবৎ বনোয়ারী কোথায় যে গিয়াছে কেহ জানে না। কঙ্কন পয়সা লইয়া চলিয়া আসিবার পর বনোয়ারী বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়, তারপর আর ফিরিয়া আসে নাই।

বনোয়ারীর মা বনোয়ারীর সন্ধানে আসিয়াছিলেন। তাহার ধারণা ছিল বনোয়ারী এখানেই আসিয়াছে। বনোয়ারীর মা'র কটূক্তিতে কঙ্কন একটুকুও দুঃখিত হয় নাই, কোন প্রতিবাদও করে নাই। বনোয়ারীর ব্যর্থ জীবনের জন্য, বৈরাগ্যের জন্য এমন কি গৃহত্যাগের জন্য কঙ্কনই দায়ী।

তাহার ও বনোয়ারী সম্পর্কে মানুষের মিথ্যা সন্দেহ, দুর্নাম, তাহার এই দুরদৃষ্ট, সব কিছুর জন্য সে নিজেই সম্পূর্ণ দায়ী। বনোয়ারীর মা নানারূপ ভর্ৎসনা করিয়া, চোখের জল মুছিয়া অভিশাপ দিতে দিতে চলিয়া গিয়াছেন। অভিশাপ শুনিয়া কঙ্কনের মনে মনে একটু হাসিই পাইল। মনে হইল অভিশাপ পূর্ণ হইবার মত তাহার আর কি দুরবস্থা হইতে পারে!

কঙ্কন বনোয়ারীর অন্তর্ধানের সংবাদ পাইয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিল না। বনোয়ারীর খোঁজ করিবার জন্য নিজে বাহির হইল। কঙ্কন যাহাকে বনোয়ারীর কথা জিজ্ঞাসা করে সে মুচকি হাসি হাসিয়া উঠে। বনোয়ারীর কোন সন্ধান সে পাইল না।

কঙ্কন রাগিয়া উঠে না; সত্যই ত' তাহার কি আর বনোয়ারীর খোঁজ করিবার বয়স আছে। মরিতে চলিয়াছে, এখনও যদি সে বনোয়ারীর জন্য লজ্জা সরমের মাথা খাইয়া প্রকাশ্যে চাঞ্চল্য প্রকাশ করে, ছুটাছুটি করে তবে লোকে হাসাহাসি করিলে কিংবা অশ্লীল মন্তব্য করিলে কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না।

কঙ্কন বনোয়ারীর খোঁজ করিতে করিতে তাড়ির আড্ডাখানায় আসিয়া পেঁছিল।

বেশ ভিড় জমিয়াছে। কঙ্কনের মনটা কেমন করিয়া উঠিল। গৃহস্থ বউ হইয়া সমাজের কুলশীলা ভদ্র নারী হইয়া সে কি তাড়ি খাইতে পারে! লোকে যাই বলুক সে ত' সত্য সত্যই অভদ্র কিংবা চরিত্রহীনা নারী নয়।

মাত্র তিন আনা পয়সা আছে। বনোয়ারী নিরুদ্দেশ হইয়াছে, শঙ্কর হয়ত আবার ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু একটি পয়সাও দিবে না, হয়ত চুরি করিবার অপরাধে আবার জেলও হইতে পারে। তাহারও কোন কাজ জুটিবে না—তিন আনা পয়সায় কি বাকি জীবন চলিবে না? কঙ্কনের মনটা কেমন করিয়া উঠিল।

কঙ্কন নানা তর্ক করিতে করিতে ভিতরে প্রবেশ করিল।

'কত?'

'কত!' কঙ্কন আঁচল হইতে তিন আনা পয়সা বাহির করিয়া দিল।

কঙ্কন কি করিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সম্মোহন অবস্থায় সে ভিতরে ঢুকিয়াছিল এবং নেশায় চুর হইয়া টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিল।

কঙ্কন জ্বরের জন্য কয়েকদিন ঘর হইতে বাহির হইতে পারে নাই। কাঁথা জড়াইয়া পড়িয়াছিল, মুখে একটু জল ঢালিয়া দিবারও লোক ছিল না। দরজা বন্ধ দেখিয়া এবং তাহার কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া লোকে হয়ত ভাবিয়া থাকিবে যে, সে কোথায়ও চলিয়া গিয়াছে, নতুবা মৃতদেহটা দেখিবার জন্যও কেহ হয়ত একবার আসিত।

জ্বর সারিয়া গিয়াছে। কঙ্কন কিছু খাবার জোগাড় করিবার জন্য বাহির হইল।

বড় রাস্তার উপর দাঁড়াইলে দুই তিনটি পয়সা ভিক্ষা মিলিবে। কঙ্কন ভিক্ষার আশায় শহর অভিমুখে চলিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে আঁধার নামিয়াছে। লোকজন সান্ধ্য ভ্রমণ শেষ করিয়া গৃহে ফিরিতেছে।

'বাবু' কঙ্কন একটি ভদ্রলোককে সম্বোধন করিয়া হাত বাড়াইল।

ভিক্ষুক দেখিয়া ভদ্রলোকটি তাড়াতাড়ি পা ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। কঙ্কন দুর্বল শরীরে সমানে সমানে চলিতে পারিল না।

কঙ্কন আর একজন লোককে বলিল, বাবু দয়া করে একটা পয়সা দিন।

লোকটি তাহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া চলিয়া গেল। কঙ্কন সাত আটজনের নিকট ভিক্ষা করিয়া দেড়টি পয়সা পাইল। আর কয়েকটি পয়সা পাইলে কিছু তাড়ি খাইতে পারিবে।

কঙ্কন ভিক্ষা চাহিতে চাহিতে শহরের ধার পর্যন্ত আসিয়া পেঁছিয়াছে। চারিদিকে বেশ জমাট আঁধার জমিয়াছে। দূর হইতে শহরের গ্যাস আলোকগুলি জোনাকী আলোকের মত দেখাইতেছে।

একটি লোককে পাশ কাটিয়া যাইতে দেখিয়া, কঙ্কন বলিল, বাবু শুনুন।

অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না। লোকটি একটু সন্দিগ্ধভাবে কঙ্কনের দিকে চাহিল।

কঙ্কন এত বুঝিতে পারিল না, বলিল, একটি পয়সা দিন দয়া করে। তিনদিন যাবৎ খেতে পাইনি বাবু।

লোকটি কঙ্কনের আপাদমস্তক একবার তাকাইয়া বলিল, সঙ্গে এস।

কঙ্কন নিঃশব্দে পিছনে পিছনে চলিল। একটি গ্যাস আলোকের নিচে আসিয়া কঙ্কন থমকিয়া দাঁড়াইল।

লোকটি বলিল, কি হল?

ঃ বনোয়ারী—তুমি! কঙ্কন কোন দিকে পলাইয়া যাইবার জন্য চারিদিকে চাহিল।

বনোয়ারী বলিল, চল কঙ্কন!

ঃ কোথায় যাব? না আমি যাব না, আমায় ক্ষমা কর!

বনোয়ারী কঙ্কনের হাত ধরিয়া বলিল, আমার বাড়ি চল। আমার মা মারা গেছেন জান?

ঃ জানি! আমায় ক্ষমা কর বনোয়ারী, আমি যেতে পারি না।

তবে আর কোথায়ও চল কঙ্কন।

(শেষাংশ ১৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শরৎ সাহিত্যে নারী

কুমারী শিপ্রা দত্ত

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে আরও দুইজন ঔপন্যাসিকের প্রসঙ্গ স্বতঃই আসিয়া পড়ে। কারণ তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া শরৎচন্দ্রের আলোচনা চলে না। তাঁহাদের একজনের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিপরীত না হইলেও তাঁহাদের মধ্যে বেশ দূরত্ব আছে এবং অন্যজনের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ। বাঙলা উপন্যাসের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের মূলনীতির ও শরৎচন্দ্রের মূলনীতির বিলক্ষণ পার্থক্য আছে, অন্যপক্ষে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণতর বিকাশ শরৎচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণভাবে পৃথক বলা চলে না, বরং শরৎচন্দ্রের মধ্যে বঙ্কিমের প্রভাব আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক নায়িকা শরৎচন্দ্রের নায়ক নায়িকা। কিন্তু তাহাদের রূপের পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং নিশ্চিতভাবে তাহাদিগকে চিনিয়া লইতে হইলে বঙ্কিমের আদর্শ, বঙ্কিমের যুগ ও শরৎচন্দ্রের আদর্শ, শরৎচন্দ্রের যুগের আলোচনা অপরিহার্য। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটে, যদি এই সত্য মানিয়া লই, তবে চিনিয়া লইতে বেগ পাইতে হইবে না যে "হীরা" "কিরণময়ীতে" রূপান্তরিত হইয়াছে এবং "চন্দ্রশেখর" "হারাণচন্দ্রের" "শৈবলিনী", "বিরাজ-বৌর" এবং "প্রতাপ" দেবদাসের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রকান্ড রূপান্তর গ্রহণের কারণ অন্বেষণ করিতে গেলে শরৎচন্দ্রের প্রাধান্য ও মৌলিকতা পরিস্ফুট হইবে।

শরৎচন্দ্রের বড় অখ্যাতি তিনি বিদ্রোহী, অর্থাৎ চিরাচরিত নীতিকে তিনি মানিয়া লন নাই। সমাজশাসনের নিকট তিনি নতি স্বীকার করেন নাই। তাঁহার পূর্ববর্তী বাঙলা উপন্যাস-সাহিত্যের প্রবর্তক, বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের ঋষি, বঙ্কিমচন্দ্র যে সমাজ ও ধর্মকে অকুণ্ঠিত নিষ্ঠার সহিত অবিচলিত একাগ্রতার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্র সেই সমাজ ও ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করিয়াছেন। সমাজের নিকট একটা প্রকান্ড কৈফিয়ৎ তিনি দাবী করিলেন। তিনি নির্মম, বধির ধর্মকে ও নির্দয় সমাজকে প্রশ্ন করিলেন, তাহারা মানবের কোন্ কল্যাণ সাধন করিতে পারিয়াছে? তাঁহার অন্নদা দিদি তাঁহার রাজলক্ষ্মী, তাঁহার অভয়া প্রভৃতি হতভাগিনিগণকে সমাজের ও ধর্মের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তিনি এক বিরাট প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় সমাজ বিচার-বিহীন, সামাজিক বিচার সামঞ্জস্যহীন ও সমাজশক্তি দুর্বলের উপর সবলের উৎপীড়ন। দৃষ্টিভঙ্গির এই বিভিন্নতার দরুণ শরৎচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন পথগামী। ধর্ম ও সমাজের উপর এইরূপ ক্ষোভ ও অভিমান শরৎ-সাহিত্যের মূল ভিত্তি। তাই ধর্মের ও সমাজের নিকট যাহারা বলি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের জন্য তাঁহার অন্তঃকরণ সহানুভূতিতে সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সমাজে যাহারা উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে, তিনি তাহাদের জীবন অতিশয় গভীরভাবে দরদ দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাদের নিগৃহীত, প্রপীড়িত হৃদয়ে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন এবং তাহাদের পুঞ্জীভূত বেদনাকে সহানুভূতি দিয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, বিচারবিহীন সমাজের অনুশাসনের শ্রেষ্ঠ বলি "নারী"। তাই নারীর প্রতি তাঁহার এত গভীর অনুকম্পা, এমন অকৃত্রিম দরদ। পুরুষের দুষ্কার্যের ফলভোগ করে নারী, তাই তিনি রমা, সাবিত্রী, অভয়ার পক্ষ লইয়া ধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে জীবনপণ করিয়া লড়িয়াছেন। এইক্ষেত্রে বাঙলার জনৈকা প্রথিতযশা লেখিকার কথা উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি একটি রূপকের সাহায্যে খুবই মনোজ্ঞভাবে হাজার হাজার বছরের লাঞ্ছিত নারী সমাজের Great Champion (গ্রেট্ চ্যাম্পিয়ান) করিয়াছেন শরৎচন্দ্রকে।

"বিসুবিয়াসের বুকের তলায় হাজার বৎসরের আগুন জমে থাকে, একটা দিনে সে—ক্লেদ বার করে ফেলে; কত জনপদ তার ধাতু নিঃস্রাবে তুষ্ট হয়, কত লোক মরে, বাঙলার বুকে তেমনিই আগুন জমে ছিল, তারা এমন একটা কাউকে চেয়েছিল, যিনি এসে তাদের ব্যথা প্রকাশ ক'রবেন, এই অচল অনড় সমাজকে নাড়া দিয়া এর মধ্যে যত ক্লেদ, যত আবর্জনা জমে আছে, সব প্রকাশ করে দেবেন। মূক নরনারীর নীরব আবেদন যথাস্থানে গিয়ে পোঁছেছে, তাদের ডাকে আজ বাঙলার আকাশে শরৎচন্দ্রের পূর্ণ বিকাশ হ'তে দেখেছি। দরদী বন্ধু প্রকৃত দরদ দিয়ে এই সব মূকদের বেদনা লেখনীর মুখে ফুটিয়ে চলেছেন।" শরৎচন্দ্রের একটি স্বীকারোক্তি শরৎচন্দ্রের জীবনের মহাব্রত সম্বন্ধে দেবী সরস্বতীর পূর্বোক্ত উক্তিকে সমর্থন করে।

"যারা সংসারে শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনো হিসাব নিলে না, নিরুপায়, দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিনই ভেবে পেলে না—সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই, এদের বেদনাই দিলে আমার মুখে—এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাই আমার কারবার শুধু এদের নিয়ে।"

"নারীই" শরৎ-সাহিত্যকে জুড়িয়া রহিয়াছে। শরৎ-সাহিত্যে পুরুষের স্থান অপেক্ষাকৃত গৌণ, পুরুষ চরিত্রের প্রয়োজন হইয়াছে কেবলমাত্র নারী-চরিত্রের পূর্ণতর বিকাশের সহায়ক-রূপে। শরৎচন্দ্রের চরিত্র সৃষ্টির একটি বৈশিষ্ট্য আছে, তাঁহার নারীকল্পনার অমরাপুরীর নয়, তাঁহার সাহিত্যে যে সমস্ত নারীদের দেখি, তাহারা আমাদের বাস্তব জীবনের অতি সাধারণ লোক, সংসারের সাধারণ পথের যাত্রী—আমাদের মা, বোন, যাহাদের প্রতি মুহূর্তে আমাদের চারিদিকে বিরাজ করিতে আমরা সারাক্ষণ দেখিতেছি। শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্রকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—যথা প্রেমপ্রপীড়িতা নারী ও স্নেহাতুরা জননী। নারী-হৃদয়ের এই দুইটি প্রবৃত্তিই তাঁহার নিপুণহস্তে সুন্দর রূপ পাইয়াছে। সাহিত্যাকাশে শরৎচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব বাৎসল্যরসের দুর্লভ অমৃতপাত্র হাতে লইয়া। নারায়ণীর হৃদয়ে অফুরন্ত স্নেহ, বিশ্বেশ্বরীর অন্তঃকরণ স্নেহ ও করুণায় ভরপুর। জননী বিশ্বেশ্বরীর স্নিগ্ধ মাধুর্য "পল্লী-সমাজের" সমস্ত পঙ্কিলতার মধ্যে সুধাসিন্ধু। এ সমস্ত নারী-চরিত্রে সকল দেশের, সকল কালের জননী-হৃদয়ের বাৎসল্য-রস অতি মহনীয় ও মর্মস্পর্শীভাবে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে—যাহা শাশ্বত ও বিশ্বজনীন। ইহাদের স্নেহমমতার কল্যাণরশ্মি সম্পাতে সংসার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্র এই রকম বহু চরিত্র আঁকিয়াছেন, কিন্তু প্রত্যেক চরিত্রে তিনি তাঁহার শিল্প-নৈপুণ্য সম্পূর্ণ অব্যাহত রাখিয়াছেন। এই সমস্ত চিত্র বাৎসল্যরসের সহজ এবং সাধারণ চিত্র নয়। নিজের সন্তান সন্ততির প্রতি স্নেহ স্বাভাবিক, কিন্তু শরৎচন্দ্রের আখ্যায়িকায় বাৎসল্য স্নেহ এই স্বাভাবিক সম্বন্ধের সীমাকে লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে, এই স্নেহ রক্তের সম্বন্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এই স্নেহ কোন কোন ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় ক্ষরিত হইয়াছে, ঈষৎ দূরসম্পর্কীয় সন্তান প্রতিম আত্মীয়ের উপর। উদাহরণস্বরূপ রমেশর প্রতি নারায়ণীর স্নেহ, রমেশের প্রতি জননী বিশ্বেশ্বরীর এবং কেষ্টর জন্য মেজদিদির স্নেহের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সাহিত্যে বাৎসল্যরসের এইরূপ প্রাণস্পর্শী ছবি অতীব বিরল, এইরূপ চরিত্র অঙ্কনে শরৎচন্দ্রের গৌরব অতুলনীয়। এই

বাৎসল্যরসের অভিব্যক্তি কোন শ্রেণী বিভাগ করে নাই। কোন কোন আখ্যায়িকাতে এইরূপ নিঃসন্তান রমণী হৃদয়কেও উদ্বেলিত করিয়াছে, কোন কোন স্থানে দেখা যায় এই করুণ-রসের স্নিগ্ধ স্পর্শে মুখরা, তেজস্বিণী, অভিমানিনীও তাহার চতুঃপার্শ্বে কল্যাণ বিতরণ করিতেছে, কোন কোন চরিত্রে ইহাও পরিলক্ষিত হয় যে, এই অপত্যস্নেহ নানা উৎপীড়নে উৎপীড়িত ও মথিত হইয়া তীব্র হলাহল উদ্গীরণ করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের রচনায় বাৎসল্যরসের শ্রেষ্ঠত্ব কিন্তু ইহার এক অলৌকিক শক্তিতে। এই পবিত্র করুণরস রাজলক্ষ্মীকে একটা বিরাট পতন হইতে রক্ষা করিয়াছে, শুধু রাজলক্ষ্মী কেন, যে সমস্ত নায়িকার জীবন দিয়া শরৎচন্দ্র ট্র্যাজেডিকে একটা অভিনব রূপদান করিয়াছেন। তাহাদের চরিত্রকে গুরুতর স্খলন হইতে রক্ষা করিয়াছে অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের মাতৃত্বের প্রকাণ্ড অভিযান। শরৎচন্দ্র, পূর্বেই বলা হইয়াছে, বাৎসল্য লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। যদিও বাৎসল্যরসের ছবি সাহিত্যে তাঁহার অন্যতম অবদান, কিন্তু তাহা প্রধানতম নয়।

শরৎচন্দ্রকে পতিতার সাহিত্যিক বলিয়া অভিহিত করা হয়। কারণ শরৎ-সাহিত্যের আর একটা দিক গড়িয়া উঠিয়াছে সমাজের পতিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত, অভাগী ভ্রষ্টা নারীদের লইয়া। সমাজ যাহাদের অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদেরই চরিত্রের মাধুর্য, তাহাদেরই অনিবার হৃদয় সৌরভ তিনি বিতরণের ভার নিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের "সংস্কার"এর স্থান নাই, তাই তাঁহার লেখায় নারীর সত্যরূপ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। "যে নারী সমাজের বাহিরে পা বাড়িয়েছে, তার মন্দভাগ্য হ'তে পারে, কিন্তু সকল দিক হ'তে মন্দের দিকে অহর্নিশি তাকে ঝুলিয়ে দেবার যত প্রকার ফন্দি আছে, তিনি তার একটিকেও অবলম্বন করেন নাই।" তাই তাঁর সাবিত্রী, চন্দ্রমুখী, রাজলক্ষ্মী মনুষ্যত্বের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। একদিন হয়ত তাহাদের পদচ্যুতি ঘটিয়াছিল, কিন্তু মানুষে যে এই একটা কথাকেই অনুক্ষণ জপ করে না, ইহা ব্যতীতও তাহার চিত্ত অসীম, মন বিচিত্রতর, একদিনের কোন গভীর অপরাধও যে তাহার জীবনের আকাশকে কালিমাময় করিয়া রাখিতে পারে নাই এবং একথা যে স্ত্রীলোকের পক্ষেও নিরতিশয় সত্য, তিনি কোন ছলেই ঢাকিয়া রাখিতে চাহেন নি। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব যে কেবল সতীত্বের সহিত একান্ত নয় এবং ইহা হইতে অনেক বড় এবং সর্বাঙ্গীণ, সেকথা সামাজিক এবং সাংসারিক দিক হইতে না হউক, বুদ্ধির দিক হইতে সকলেই বুঝিতে পারে। অথচ এই পরম সত্য কথা শরৎবাবু তাঁহার লেখনী দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন বলিয়া দেশবাসী শরৎবাবুর উপর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। অনেক পুরাতনের নিকট শরৎচন্দ্র অস্পৃশ্য।

শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, তাঁহার আখ্যায়িকার শ্রেষ্ঠ চরিত্র রাজলক্ষ্মী, অভয়া, কিরণময়ী, সাবিত্রী ইত্যাদি সামাজিক আদর্শের কষ্টিপাথরে এইসব চরিত্র ঘৃণ্য। তাহাদের জীবন পঙ্কিলতাপূর্ণ। অতএব তাঁহার রচনায় সমাজের যাহারা আবর্জনাস্বরূপ, তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে শরৎচন্দ্রের রাজলক্ষ্মী, অভয়া বা সাবিত্রী কোন চরিত্রই ঘৃণার বস্তু নয়। তাহাদেরও চরিত্রে মাধুর্য আছে তাহাদেরও গৌরব করিবার বস্তু আছে। এ কয়েকটি চরিত্র সৃষ্টি করিয়া শরৎচন্দ্র সমাজকে কঠোর ব্যঙ্গ করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের মনীষার প্রকৃত স্বরূপ ধরিতে হইলে তাহার রচনার সূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন আছে। শরৎচন্দ্রকে বিচার করিতে গেলে আরেকজন বিদেশীয় শ্রেষ্ঠ মনীষীর কথা মনে আসে। তিনি হইতেছেন আনাতোল ফ্রান্স। সমাজ ও ধর্ম এক নয়। ধর্মের নাম ধরিয়া সমাজ অত্যাচারের যে জগদ্দল পাষাণ নর-নারীর বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে তাহাকে নির্বাকমুখে সহ্য করিবার যুগ কাটিয়া গিয়াছে। "সমাজ আমার বরণীয়, সমাজ আমার ধর্ম," এই যুগের মহা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন লোক বুঝিতে পারিয়াছে অন্নদাদিদির মত সতীকুল শিরোমণি সমাজের চোখে কুলটা, সমাজ তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছে এবং তাহার নামোচ্চারণ পাপ। অন্নদাদিদির প্রতি সমাজের এই কঠোর ব্যঙ্গ বর্তমান যুগ সহ্য করিবে না। তাই এই যুগের লক্ষ্য বাক্য—"না জানিয়া নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ার লাভ নাই।" শরৎচন্দ্র নারীকে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে সুযোগ পাইয়াছেন। তাহাদের সত্যকার রূপ উদ্ধার করিয়া সমাজের নিকট দিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সমাজ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছে। কারণ সত্যের জৌলস সহ্য করিবার মত নৈতিক সাহস আমাদের কুসংস্কারে অন্ধ সমাজ হারাইয়া ফেলিয়াছে। জনৈক সমালোচকের একটি উপমা উদ্ধার করিয়া বক্তব্যটি পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছি।

"ষোড়শোপচারে নৈবেদ্য সাজিয়ে সাধারণত যা'র পূজো চলে, সে দেবতা নয়—মাটি। আসল দেবতা হঠাৎ একদিন যদি মূর্তি থেকে বেরিয়ে এসে নৈবেদ্য ভোজন ক'রতে বসে যায়, পুরোহিত যজমান সকলেই মূর্চ্ছা যাবে।" আমাদের সমাজও হইয়া পড়িয়াছিল প্রকাণ্ড একটা মিথ্যার উপাসক। কৃত্রিম সত্যের বৈষ্ণবী মার্কা দিয়া মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল খুব জাঁক-জমকের সহিত। কিন্তু মিথ্যা বেশী দিন টিকিতে পারে না। সত্য একদিন প্রকাশ পাইবেই। মিথ্যা সমাজের উপর দিয়া শরৎচন্দ্র বহাইলেন সেই সত্য গঙ্গা। নবোদ্যম যিনি করিয়া থাকেন তাঁহার পুরস্কার তীব্র সমালোচনা কখনও কখনও বা তীব্র লাঞ্ছনা। শরৎচন্দ্রের অদৃষ্টেও এই সাধারণ নিয়মের লঙ্ঘন ঘটে নাই। শরৎচন্দ্রের উপর উপাধি বর্ষিত হইল—শরৎচন্দ্র পতিতার সাহিত্যিক, শরৎচন্দ্র কালাপাহাড়, শরৎচন্দ্র বিদ্রোহী।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, নারীচরিত্র সৃষ্টিই শরৎচন্দ্রের বিশেষত্ব, রাজলক্ষ্মী, অভয়া, সাবিত্রী, কিরণময়ী, রমা, বড়দিদি ইত্যাদি নায়িকা তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই সমস্ত চরিত্রের মধ্যে শরৎচন্দ্রের আদর্শের স্বরূপ নির্ণয় করাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য বস্তু। শরৎচন্দ্রেরও একটা আদর্শ আছে। অবশ্য নীতিবিদের নিকট ইহা একটা Paradoxএর মত শুনাইবে। কারণ যে সাহিত্যিক কালা-পাহাড় বা সমাজ বা নীতিবিদ্রোহী তাঁহার কোন আদর্শ থাকিতে পারে, হয়ত তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রেরও আদর্শ আছে। যদিও পূর্বে বলিয়াছি যে সমাজের নিকট, সংস্কারের নিকট তিনি নতিস্বীকার করেন নাই, তবুও তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, বাঙলার অন্যতম লেখিকা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী যেরূপ হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজের আদর্শকে আঘাত করেন নাই সেরূপ শরৎচন্দ্রও হিন্দু সমাজের ত্রুটীবিচ্যুতি সমাজের সম্মুখে উলঙ্গ করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন বটে কিন্তু সমাজকে আঘাত করেন নাই। হিন্দুকুলবধূ অনুরূপার সৃষ্ট 'কমলা' এবং পল্লীসমাজের রমার কোন প্রভেদ নাই। সামাজিক সংস্কার ও সত্য প্রেমের সঙ্গে সেই চিরন্তন সংঘর্ষ। উভয় চরিত্রে সংস্কারই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিয়াছে। তবে Those who swim upon superficies তাঁহাদের চোখে শরৎ-চন্দ্র প্রকাণ্ড একজন সমাজবিদ্রোহী।

ট্র্যাজেডি কি? শরৎ-সাহিত্য ট্র্যাজেডির নূতন একটি রূপ দান করিয়াছে। বৈদেশিক সাহিত্যে ট্র্যাজেডি আসে মৃত্যুর ভিতর দিয়া শরৎ-সাহিত্যে ট্র্যাজেডির অন্যরূপ শরৎচন্দ্র নারীচরিত্রের

মধ্যে অবচেতন প্রবৃত্তির সহিত সচেতন সংস্কারের সংঘাতকেই বৃহত্তর করিয়া দেখাইয়াছেন। ভালবাসার আকর্ষণ অয়স্কান্ত মণির আকর্ষণের মত প্রবল আবার তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবার শক্তিও দুর্বার। ইহাই শরৎচন্দ্রের নায়িকার জীবনের বড় ট্র্যাজেডি। শ্রীকান্তকে পাইবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা রাজলক্ষ্মীকে উদ্বেলিত করিতেছে তাহার হৃদয় মথিত করিয়াছে কিন্তু রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে অতি নিকটে পাইয়াও ত্যাগ করিয়াছে। সতীশের জন্য সাবিত্রীর দুর্নিবার প্রেম। সংসারে সতীশই তাহার প্রিয়তম, কিন্তু অনুরূপ দুর্নিবার আকর্ষণই তাহাকে সতীশের নিকট হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীকে বা সাবিত্রীকে বাধা দিবার জন্য 'পল্লীসমাজ' ছিল না, বাহিরের সমাজ তাহাদিগকে আক্রমণ করে নাই, কিন্তু সমাজ তাহাদের অন্তরে বাসা বাঁধিয়া তাহাদের সংস্কারকে কঠিন করিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে। এই সমস্ত চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় শরৎচন্দ্র সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেও সমাজ ও সংস্কারের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছেন। সমাজের পীড়নে বেত্রাহতবৎ হইয়া দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্রের হৃদয়ে বিধবার প্রতি যে করুণার বাণ ডাকিয়াছিল, শরৎচন্দ্রের হৃদয়ও নারীর দুঃখে অনুরূপ সাড়া দিয়াছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত তিনি সমাজ ও সংস্কারে গলা টিপিয়া সমাজের বুকের উপর দাঁড়ান নাই, সমাজের দুর্নীতির প্রতি কটাক্ষ ইঙ্গিত করিয়াছেন মাত্র। তাঁহার রাজলক্ষ্মী, অভয়া, রমা, সাবিত্রীর স্থান হিন্দু সমাজের সতী-সাধ্বীর নীচে নয়, (দৈবাৎ পদস্খলন ঘটিলেও নারী চরম পতনের দিকে সচরাচর ধাবিত হয় না) তাহারাও নারী, তাহারা মহীয়সী, অন্যান্য নারীচরিত্র সম্বন্ধেও একই সত্য প্রযোজ্য। শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্রের মধ্যে 'কমলের' স্থান কিছু স্বতন্ত্র। She is a type by herself.

শরৎচন্দ্রকে সঠিক বুঝিতে হইলে তাঁহার যুগকে বাদ দিলে বিদ্যাসাগরের মত তিনি সমাজ-অনুশাসনের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ প্রকাশ পাইয়াছে তাহার ধ্বনি সাহিত্যকেও আলোড়িত করিয়াছে। শরৎচন্দ্র এই Social revolution হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। সমাজের নির্মম বন্ধন ও অনুশাসন তাঁহাকে পীড়া দিয়াছে, তাহার পরিচয়, তাহার নায়িকার জীবনে পাই। সামাজিক সমস্যার প্রতি সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে যতটুকু আঘাতের প্রয়োজন ততটুকু আঘাত তিনি করিয়াছেন। সমাজকে ব্যঙ্গ করিয়া তাহার ভুল-ত্রুটীর প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু সমাজকে উপেক্ষা করেন নাই। ইহাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের প্রকৃত পরিচয়।

সামরী

(১৪২ পৃষ্ঠার পর)

আছে! প্রাণ ভরা খুশী! বড় খুশী! অ্যানা খুশী মনেই গিয়ে ঘরের দরজা খুললে, আলো জ্বাললে।

সে অনায়াসেই বলতে পারত কার্ল তার স্বামী নয়,—তার ভালবাসার জন। এতে গোপন করবার কিছুই ছিল না। সবাই করছে এ ঃ ভাড়াটে বাড়িতে যে সব মেয়েদের স্বামী যুদ্ধে গিয়েছে তারা প্রকাশ্যেই অন্য পুরুষের সঙ্গে বসবাস করছে,—কেউ আর গোপন রাখবার প্রয়োজন বোধ করে না।

আবার সে এও বলতে পারত যে—এই লোকটাই তার স্বামী,—কেউ তাকে দোষ দিতে পারত না,—মিছে কথা বলছে বলে কোন অভিযোগ আনতে পারত না। কারণ যুদ্ধে যাবার মাত্র আট দিন আগে তারা এই শহরে এসেছিল,—এই আট দিন রিচার্ড কারও সঙ্গে মেশে নি,—প্রতিবেশীদের কারও সঙ্গে কথাটি পর্যন্ত বলে নি। তার পরে ত আরও চার বছর কেটে গিয়েছে।

এ সব যুক্তিই অবশ্য অ্যানার মনে অতি দ্রুতগতিতে বিদ্যুতের মত খেলে গিয়েছে,—অ্যানা যে তবুও কিছু না বলে চুপ করে রয়েছে তার মূলে কারণ রয়েছে অন্য ঃ কার্লের সঙ্গে এই নতুন জীবনের উন্মাদনাই তাকে নীরব করে রেখেছে, ইচ্ছা করেই সে কোন উচ্চবাচ্য করে নি।

এ লোকটা রিচার্ড কি না—এ প্রশ্ন এখন তার কাছে নিষ্প্রয়োজন। অ্যানা জানে এ যা বলছে—তার এক বর্ণ মিথ্যা নয়। আর তার নিজের মনের আবেগ আর অনুভূতিও মিথ্যা নয়। মনে তার আনন্দ—প্রকৃত, সত্যিকার আনন্দ। এই যে আমার স্বামী—ভাবুক না যার ইচ্ছে, ভাবুক—যার খুশী ভাবুক,—ক্ষতি কি!........অ্যানার নিজেরও কি একবার এমনি করে—একবার এমনি করে ভাবতে ইচ্ছে হয় নি?

ঘরে দাঁড়িয়েই কার্ল মেরীর দিকে একটি হাত এগিয়ে দিল; একটুও বিচলিত হয় নি সে। হাসিমুখে স্থির হয়েই সে অ্যানার বন্ধুকে সম্বর্ধনা জানালে।

অ্যানাও সর্বান্তঃকরণে এ-ই কামনা করেছিল। সে উল্লসিত হয়ে উঠল।........এই পাগলা লোক—জানলার তাকের ঐ 'জিরেনিয়াস' গাছের মত সে অমনি স্থির—অবিচলিত হয়ে থাকতে পারল—কারণ সে-ও আজ সুখী,—সে-ও আজ আর জগতে একা নয়,—একা নয়! কি আনন্দের কথা এ!—ওঃ কি সুখ! কি শান্তি!........মেরীর মুখখানাও কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আনন্দে হাসির সঙ্গে সঙ্গেই সে কাঁদছে,—চোখে তার সত্যি সত্যি জল গড়িয়ে পড়ছে। মানুষের জীবন কত সুন্দর কত আনন্দের! এতদিন সেই জীবন অ্যানার কাছে শুধু ধরা দেয় নি।

বিকেলের সেই নানাজনের সোরগোল আর ঝগড়ার পরিবর্তে এখন সারা বাড়িতে যেন মধুর শান্তি। নিচে থেকে মৃদু মধুর সংগীত ধ্বনি ভেসে আসছে এখন। ব্যারাকের দুইজন বাজিয়ে তাদের ঘরে তৈরি বাদ্যযন্ত্রে সুর দিচ্ছে ঃ একটা বিশ ইঞ্চি লম্বা দেবদারু কাঠের—শিরীষে আঁটা বাক্সে শাদা কালো চাবি লাগিয়ে পিয়ানো করা হয়েছে,—আর একটা পুরানো সিগারেটের বাক্সে তার লাগিয়ে করা হয়েছে একটা বেহালা।

একজন একটা বেঞ্চ এনে সযত্নে পিয়ানোটা তার উপর ঠিক করে রাখল—যেন পড়ে ভেঙে না যায়; আর একজন বেহালার কানটা সযত্নে ঘুরিয়ে, তার মাথাটা বেঞ্চের উপর ঠেসান দিয়ে রাখলে। অতি সাবধানে সন্তর্পণে বাজনা শুরু হ'ল।

পিয়ানো বাজিয়ে মজুর—দুজনারই মোটা মোটা আঙুল,—সে আঙুল বাদ্যযন্ত্রে জোরে লাগাতে তাদের ভয় ভয় করছিল ঃ এখনই হয়ত আঙুলের চাপে তাদের বাদ্যযন্ত্র ভেঙে যাবে। বাধ্য হয়ে মৃদু স্পর্শ করতে গিয়ে তাই বাজনা হয়ে উঠেছিল মধুর। সঙ্গে সঙ্গে তারা গান সুরু করলে। ভাড়াটে বাড়ির শত শত লোক উৎকর্ণ হয়ে সেই সংগীত শুনতে লাগলো। কেউ একটু শব্দ করছে না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত চুপ হয়ে গেছে। অ্যানার ঘরে তিন বন্ধু বসেও এই বাজনা শুনছিল। সুরটা সত্যিই বড় মিঠে লাগছিল।

বাজনা যখন শেষ হয়ে গেল,—সেই সুন্দর চুলওয়ালা চার বছরের ছেলেটা তার সেই গানটা ধরলে—"ম্যারিচেনের খোকা হল—", না গেয়ে সে আর পারছিল না। গানের সুরে তাকে যেন পেয়ে বসেছে। তার ফুসফুসে যতটা দম আছে—তার সবটুকু প্রয়োগ করে—আকাশ ফাটিয়ে সে ঐ গান ধরেছে। এ ছাড়া অন্য গান আর তার জানা নেই। পরমোৎসাহে হাত-পা নেড়ে সে গেয়ে যাচ্ছে—"বাপ কে তার, সে না জানিল।" (ক্রমশ)

আজ-কাল

হকসাহেব ও সেন্সাস

সেন্সাস নিয়ে এখন বাঙলায় খুব হৈ চৈ চলছে। এই হট্টগোলের প্রধান পাণ্ডা বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক। এমন দিন প্রায় যায় না যেদিন মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের রোমহর্ষক ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করে তিনি বিবৃতি না দেন। হিন্দু সংখ্যাগণকেরা মুসলমানদের সংখ্যা কমাবার এবং হিন্দুদের সংখ্যা বাড়াবার জন্যে কি রকম যে ভয়াবহ চেষ্টা করছে তার একটা স্বতঃসিদ্ধ অভিযোগ গড়ে তোলবার মতো করে' তিনি এলোপাথাড়ি চীৎকার করছেন। তাঁর এই সব অদ্ভুত দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তিতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি হচ্ছে। হিন্দু নেতাদের বাধ্য হয়ে তাঁর অভিযোগের উত্তর দিতে হচ্ছে। ফলে উত্তেজনা আরো বাড়ছে। একটা প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী যে এতখানি বিকারগ্রস্ত হতে পারেন আগে জানা ছিল না। সেন্সাসের মতো একটা ব্যাপারে একটা সম্প্রদায়ের পক্ষ নিয়ে আর একটা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এইভাবে নির্লজ্জ প্রচারকার্য একজন প্রধান মন্ত্রী চালাচ্ছেন—এ দৃশ্য আগে দেখা যায় নি।

হক সাহেবের কার্যকলাপ এমন বিসদৃশ হয়ে উঠেছে যে, সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ কংগ্রেসনেতা শ্রীশরৎচন্দ্র বসু পর্যন্ত অবশেষে তাঁর দায়িত্বজ্ঞানহীন বাচালতার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছেন। আইন সভায় মুসলমান সদস্যদেরও যে সেন্সাসী সাম্প্রদায়িকতায় ভিড়িয়ে দিয়ে কার্যোদ্ধারের চেষ্টা হচ্ছে, এই সন্দেহ তিনি প্রকাশ করেছেন।

গান্ধী-সুভাষ পত্রাবলী

গৃহত্যাগের আগে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর সঙ্গে যে পত্রালাপ করেন, তা প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রাবলী থেকে দেখা যায় যে, বর্তমান সময়ে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সঙ্গে বাঙলা কংগ্রেসের বিরোধ থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন; দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিক থেকেই তিনি এই সহযোগিতার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী 'মূলগত মতপার্থক্যের' দোহাই দিয়ে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। পরে তিনি এক চিঠিতে এই মূলগত পার্থক্যকে হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি হিংসার এই অভিযোগের সমর্থনে কোথাও কোনো যুক্তি বা প্রমাণ দেন নি।

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের উদ্যোগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে 'সুভাষ দিবস' প্রতিপালিত হয়েছে। এই উপলক্ষে সর্বত্র সভা ও শোভাযাত্রা হয়েছে। কলকাতার জনসভা ও মিছিলে বহু লোকসমাগম হয়েছিল। সভায় সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে এবং তাঁর ব্যক্তিগত মঙ্গল কামনা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সত্যাগ্রহ

যেসব কংগ্রেসী সত্যাগ্রহী ধরা পড়ছেন না তাঁরা গান্ধীজীর নির্দেশ অনুযায়ী কেউ কেউ সত্যাগ্রহ করতে করতে পদব্রজে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, কেউ কেউ নিজের প্রদেশেই ঘুরছেন। কারো কারো প্রতি আবার গঠনমূলক কাজ করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সত্যাগ্রহ থেকে যাতে কোন রকমে বৃটিশ সামরিক শক্তির সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ বিরোধ না বাধে এবং বৃটিশ সশস্ত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে যাতে গণবিক্ষোভ জাগ্রত হতে না পারে সম্ভবত সেই উদ্দেশ্যে গান্ধীজী ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকায় সত্যাগ্রহ নিষিদ্ধ করেছেন এবং ক্যাণ্টনমেণ্ট এলাকায় কংগ্রেস কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এ সপ্তাহে শ্রীযুক্তা ফ্রেডা বেদী (ইংরেজ মহিলা) ও শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।

আন্তর্জাতিক

বল্কান

বল্কানের অবস্থা আগের মতোই রহস্যাবৃত রয়েছে। বুলগেরিয়ান কর্তৃপক্ষ বলছেন যে, জার্মানরা বুলগেরিয়া দখলের মতলব করে নি; কিন্তু বৃটিশ পর্যবেক্ষকরা বলছেন জার্মানি কয়েক দিনের মধ্যেই বুলগেরিয়া দখল করবে। জার্মানরা আবার পাল্টা অভিযোগ করছে যে, বৃটিশ সৈন্য সালোনিকায় অবতরণ করেছে। বৃটেনের বিরুদ্ধে এই দোষারোপ করে জার্মানি বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করবে এমন সন্দেহ কেউ কেউ করছেন। জার্মানদের বুলগেরিয়া প্রবেশের তোড়জোড় সম্বন্ধে নানা রকম সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। এর অনেকগুলি বুলগেরিয়ান কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করেছেন। তবে বুলগেরিয়ায় বেশ একটা উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই; সে কিছু কিছু সামরিক সতর্ক ব্যবস্থাও অবলম্বন করেছে। বুলগেরিয়ার নিষিদ্ধ বামপন্থী দলগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ রাজা বোরিসের সঙ্গে দেখা করে পররাষ্ট্রীয় অবস্থার আলোচনা করেছেন।

বল্কান-প্রসঙ্গে বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেনের মিশর ও তুরস্কে গমন বিশেষ লক্ষ্যনীয়। বৃটিশ আধাসরকারী মুখপত্র "টাইমস্" এ সম্পর্কে লিখেছেন যে, বৃটিশ সামরিক অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে কূটনীতিকেও শক্ত করতে হবে এবং সমগ্র ব্যাপারের স্নায়ু-কেন্দ্র হচ্ছে বল্কানে।

সোভিয়েট এক বিবৃতিতে বলেছে যে, তুর্কী-বুলগেরিয়ান চুক্তিতে তার কোন হাত নেই। তুর্কী পররাষ্ট্র-সচিব মঃ সারাজোগ্লু বলেছেন যে, বৃটেনের সঙ্গে তুরস্কের যে চুক্তি আছে, সে চুক্তি তুর্কী-বুলগেরিয়ান চুক্তি দ্বারা কোন রকমে ব্যাহত হয় নি।

সুদূর প্রাচ্য

সুদূর-প্রাচ্যেও অবস্থা সমান জটিল রয়েছে। বৃটেন ও আমেরিকা সেখানে ব্যাপক সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করছে। মালয়ে বহু অস্ট্রেলিয়ান সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছে; আমেরিকা থেকে ২০০ বিমান সিঙ্গাপুরে আনা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়াতেও সাজ-সাজ রব পড়েছে। অস্ট্রেলিয়ান প্রধান মন্ত্রী মিঃ মেঞ্জিস

সলা পরামর্শের জন্যে ইংল্যান্ডে গেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রশান্ত মহাসাগরীয় ঘাঁটিগুলির জন্যে বিপুল ব্যয় বরাদ্দ করেছে।

কিন্তু জাপান আবার বলেছে যে, বৃটেন ও আমেরিকা অনর্থক সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা বিক্ষুব্ধ করে' তুলছে। বৃটিশ ঘাঁটি সিঙ্গাপুর আক্রমণের কোনো অভিপ্রায় জাপানের নেই। তবে তারা গোলমাল বাধালে জাপান পিছপাও হবে না।

থাই-ফরাসী ইন্দোচীন বিরোধের মিটমাটের জন্যে টোকিওতে এখনো আলোচনা চলছে। যুদ্ধ-বিরতির মেয়াদ আরো সাত দিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত সুদূর প্রাচ্যে বৃটেন ও আমেরিকার তৎপরতায় ভরসা পেয়ে ইন্দোচীন কিছু দৃঢ়তা দেখাচ্ছে। তবে জাপান জানিয়ে দিয়েছে যে, থাই-ইন্দোচীন ব্যাপারে সে অন্য কোনো শক্তিকে হাত দিতে দেবে না।

মিঃ ইডেন থাই-ইন্দোচীন বিরোধে জাপানের মধ্যস্থতা সম্পর্কে জাপ পররাষ্ট্র-সচিবের কাছে তথ্য জানতে চেয়েছিলেন। তার উত্তরে মিঃ মাৎসুওকা জানিয়েছিলেন যে, জাপান সর্বত্র শান্তিস্থাপনে আগ্রহান্বিত, বিশেষত ইউরোপীয় যুদ্ধের মিটমাটে এবং যে কোনও বিরোধে মধ্যস্থতা করতে সে রাজী আছে। জার্মানি বৃটেনের সঙ্গে শান্তি স্থাপনে উদ্‌গ্রীব হয়েছে, এই রকম ধারণা মিঃ মাৎসুওকার কথা থেকে জন্মাতে পারে বলে' জার্মানি জাপানের কাছে প্রতিবাদ জানায়। ফলে মিঃ মাৎসুওকাকে প্রকৃতপক্ষে তাঁর ঐ বিবৃতি প্রত্যাহার করতে হয়েছে।

হিটলার ও মুসোলিনী

এ সপ্তাহে মুসোলিনী ও হিটলার বক্তৃতা দিয়েছেন। মুসোলিনী তাঁর বক্তৃতায় এবার আস্ফালন বিশেষ কিছু করেন নি এবং প্রকারান্তরে ইতালীর অসাফল্যের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ইতালী কার্যত যুদ্ধ চালাচ্ছে অনেক আগে থেকে, ১৯২২ সালে যখন ফাসিস্ট শক্তির প্রথম অভ্যুত্থান হয় তখন থেকে। তবে তিনি জয়লাভ না করা পর্যন্ত বৃটেনের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার সঙ্কল্প ব্যক্ত করেন।

হিটলার তাঁর বক্তৃতায় আবার ভয় দেখান যে, বসন্তকালে বৃটেনের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক সাবমেরিন-আক্রমণ আরম্ভ করা হবে। এ উদ্দেশ্যে অনেক নতুন ইউবোট তৈরী করা হচ্ছে। তিনি মুসোলিনীর সঙ্গে তাঁর অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বেরও উল্লেখ করেন।

ভূমধ্যসাগর

ভূমধ্যসাগরে ইংরেজরা বিস্তৃত এলাকায় মাইন পেতেছে। মধ্য ভূমধ্যসাগরে জার্মান বোমারু বিমান আবার বৃটিশ রণতরী ও কনভয় আক্রমণ করে; কিন্তু বৃটিশ পক্ষে কোন ক্ষতি হয় নি বলে' সংবাদ দেওয়া হয়েছে। আলবেনিয়া ও আফ্রিকার যুদ্ধের গতি পূর্বানুরূপ। ইতালীয়দের পাল্টা-আক্রমণ ও অসাফল্যেরই খবর আসছে। এরিত্রিয়া, আবিসিনিয়ায় ও ইতালীয় সোমালিল্যান্ডে বৃটিশবাহিনী নাকি আরো অগ্রসর হয়ে গেছে। লিবিয়ায় বিশেষ কিছু ঘটে নি।

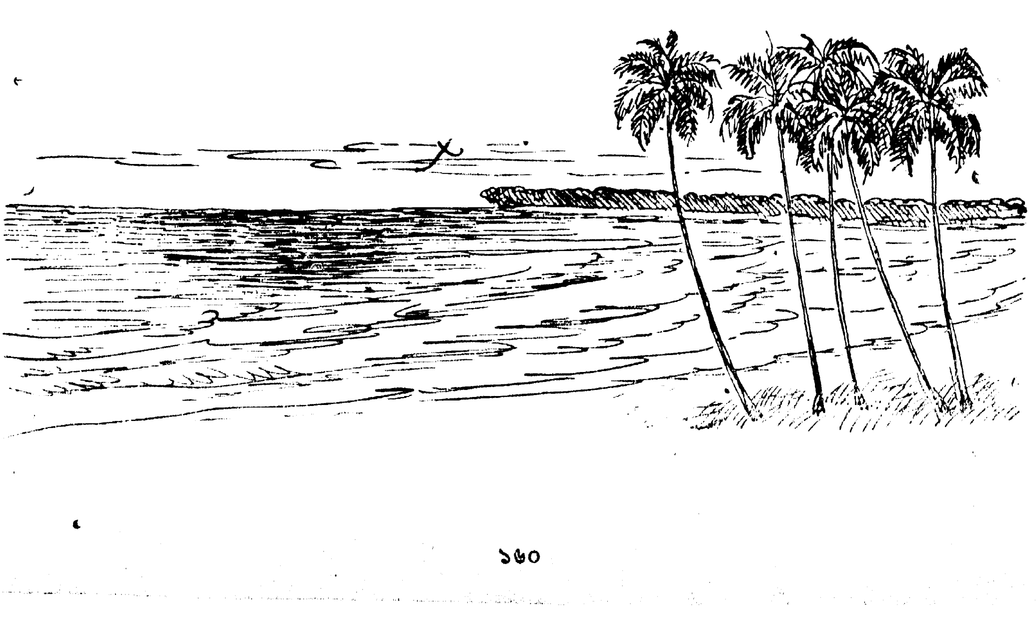
বিমান হানা

বৃটেনের উপর এ সপ্তাহে জার্মান বিমান আক্রমণ বেশ জোর হয়। দক্ষিণ ওয়েলস্, ইস্ট এংলিয়া ও ডোভার এলাকাতেই প্রবল বোমাবর্ষণ করা হয়। লণ্ডনেও জার্মান বিমান হানা দেয়।

বৃটিশ বিমানবহর ভিলহেলমস্‌হাফেন, এমডেন এবং জার্মান-অধিকৃত হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের বন্দর ও ঘাঁটিগুলির উপর প্রবলভাবে আক্রমণ চালায়।

২৫।২।৪১

—ওয়াকিবহাল



রঙ্গজগৎ

রূপবাণীতে "জয়দেব"

ঐতিহাসিক চরিত্রে যে দূরত্ববোধ জাগে, জয়দেব তাহা অপেক্ষা পৃথক। কেন্দুবিল্বের জয়দেবের সহিত বাঙলা ও বাঙালীর একটা আত্মবোধ আছে। জয়দেব বলিতে আধুনিক কলিকাতার বালীগঞ্জ বুঝায় না, বুঝায় না সিনেমা স্টুডিয়োর স্বপ্ন কাহিনী। জয়দেব বলিতে বুঝায় বাঙলার পল্লী, আধুনিক ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত পল্লী নহে, প্রাচীন কুটিল সমাজ। এই সমাজের নীতিবোধ বৃহৎ রাষ্ট্রনীতির অপেক্ষায় প্রায়ই বসিয়া থাকে নাই এবং যখন কোন সংঘাত ঘটিয়াছে তখন তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়াছে এই গ্রাম্য সমাজ।

বাঙলা তথা ভারতে রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। এদেশে শাক্ত ও বৈষ্ণবের লড়াই বহুকাল ধরিয়া চলিয়াছে। কোথাও বৈষ্ণব দেবতায় শাক্ত দেবতার পোষাক উড়িয়া আসিয়া পড়িয়াছে; কোথাও শাক্ত দেবতায় বৈষ্ণব দেবতার ছাপ পড়িয়া গিয়াছে। এই জয় পরাজয় লইয়া বহু কাহিনী, বহু গল্প গাঁথা রচিত হইয়াছে। বৈষ্ণবের দেবতা কোথায় কিভাবে শাক্তের দেবতাকে পরাজিত করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বাঙলায় এরূপ কাহিনীর অভাব নাই। ইহারই মধ্য দিয়া সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীও কখন বদলাইয়া গিয়াছেন। আজ যেমন ধর্ম সরিয়া পড়িয়া অর্থটাই বড় হইয়া গিয়াছে, স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং এখানে রাজনীতি ও অর্থনীতিকে চিনিতে দেরী হয় না, বাঙলায় বা ভারতের অতীত সেরূপ নহে, কুয়াসাচ্ছন্ন ও ফেনিলাবর্তময়। ধর্ম দিয়া এখানে সমাজ বুঝিতে হয়; রাজধর্মকে ভেদ করিয়া তবে রাজনীতি, রাজনীতিকে ভেদ করিয়া তবে অর্থনীতি বুঝা যায়।

জয়দেব এমনই এক যুগের কাহিনী। প্রক্ষিপ্ত সামাজিক ইতিহাস। জয়দেব কবি এবং তখন কবিরা কাব্য ভূর্জপত্রে লিখিয়া রাখিতেন। কিন্তু কাব্য যেখানে লিপিতে বাধা পড়িয়াছে ইতিহাস সেখানে মূক। তাই ইতিহাস বুঝিতে কাব্য হাতড়াইতে হয়।

আলোচ্য কাহিনী নাকি প্রক্ষিপ্ত ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া পল্লবিত হইয়াছে; বলা ভাল, হইতে চাহিয়াছে। কেননা কাহিনীর ঘটনাকে পল্লবের সহিত তুলনা করিলে বলিতে হয় এ বৃক্ষে পল্লবাভাব, যাহাকে পল্লব বলা হইতেছে তাহা কৃত্রিম আভাস মাত্র। কাহিনী বলিতে কিছুই নাই। সে যুগের বাঙালীও কথা বলে নাই; সে যুগের বাঙালীর যথাযথ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এমন বলাও মুস্কিল বা জয়দেব চরিত্রের সব কিছুই বা পরিপূর্ণ রূপ, যথার্থ ছবি পাওয়া গিয়াছে একথাও বলা শক্ত। অর্থাৎ কাহিনী, সংলাপ, ঘটনাসমাবেশ সমস্ত দিক দিয়া এমন একটা ব্যর্থসৃষ্টি আমাদের খুব বেশী চোখে পড়ে নাই। মুভী টেকনিক কোন্ ভরসায় যে ইহাকে বাজারে ছাড়িয়াছেন জানি না কিন্তু সেলুলয়েডের এই দুষ্প্রাপ্তির দিনে এতবড় একটা অসার্থক প্রচেষ্টা আদৌ কেন হইল আমরা ভাবিয়া পাই না।

একটা কথা উঠিয়াছে। বোম্বাই চিত্রের প্রশংসা ও বাঙলা চিত্রের অপযশ প্রচারের ফলে বাঙালী আত্মঘাতী হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ সমালোচনা উচিত নহে। কথাটা আংশিক সত্য হইলেও হইতে পারে। কিন্তু উহাই স্বাভাবিক। বাঙালী সমালোচকের পক্ষে বাঙলা চিত্র কঠোর সমালোচনার বস্তু হইতে বাধ্য। প্রথমত বাঙলীর সাহিত্যরুচি অনেক উচ্চস্তরের; দ্বিতীয়ত বাঙলা সমাজের সহিত তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয়। সমালোচনার ফল হয়তো এই হয় যে, অবাঙালীদের প্রচারের সুবিধা হয়; তাহারা প্রয়োজনানুরূপ উদ্ধৃতাংশ সমালোচনা পুনঃপ্রচার করিয়া বাঙলার অপযশ করে এবং তাহাদের প্রশংসা ভুলিয়া ব্যবসায়ের সুবিধা করে।

কিন্তু সেই ভয়ে এমন একখানা চিত্রেরও যদি প্রশংসা করিতে হয় তবে সমালোচনার প্রয়োজন নাই। বাঙলা চিত্রের বাঁচিয়াও দরকার নাই। যে চিত্রে কাহিনী নাই, সংলাপ নাই, ঘটনা নাই, ঘটনা সমাবেশ নাই, সর্বোপরি একটিও অভিনেতা বা অভিনেত্রী নাই, পরিচালন নৈপুণ্যের আভাস এতটুকুও নাই, সে চিত্রকে যদি মাথা কুটিয়া ভাল বলিতে হয় তবে সে চিত্রের ভবিষ্যৎ কামনা না করাই ভাল। সে চিত্রের অপমৃত্যু পূর্বাহ্নেই ঘটিয়াছে। কিন্তু বাঙলায় এরূপ চিত্রের উদ্ভব সচরাচর হয় না। বাঙালা চিত্রের কাহিনীর অভাব ঘটিয়াছে, কিন্তু সংলাপের অভাব এত দেখা যায় নাই, ভাষার দৈন্য এত দেখা যায় নাই, অভিনয়ও এত নিকৃষ্ট হয় নাই। এ যেন কে কত নিষ্প্রাণ অভিনয় করিতে পারে তাহার প্রতিযোগিতা। সাধারণ হিন্দী ছবির বিরুদ্ধে এই একটা নালিশ আছে উহাতে প্রায়ই অত্যন্ত বেশী ভোজবাজি থাকে, যাহাতে ভক্তি না আসিয়া হাসি আসে। জয়দেবেও তাহা বিপুল। অলৌকিক রহস্যের এই লৌকিক সংস্করণ শিব গড়িতে অক্ষম কারিগরের হাতে যাহা হয় তাহাই হইয়াছে। আগুন লাগিয়া ঘর পুড়িয়া গেল, কিন্তু রাধাশ্যামের গায়ে আঁচও লাগিল না, ইহা সম্ভব; লৌকিক ব্যাপারে এমন অনেক অসম্ভবই ঘটে—মানুষের জীবন মৃত্যুও দৈবদুর্বিপাকে এমন বিস্ময়কর চুলচেরা হিসাবে ঘটিয়া যায় এমন উদাহরণ বিরল তো নহেই—অজস্র। কিন্তু হাত কাটিয়া ফেলিবার পর হাত জোড়া লাগার অসম্ভাবিত ব্যাপারটি বাদ দিলে জয়দেব চরিত্র ক্ষুণ্ন হইত আমরা মনে করি না। অথচ এত করিয়াও জয়দেব চরিত্র একটি চরিত্রের আকার গ্রহণ করিতে পারে নাই। হীরেন বসু শ্রোতা ও দর্শকবৃন্দের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনর্গল বক্তৃতা ও জড় গতির ভঙ্গি দ্বারা সামান্য দাগও কাটিতে পারেন নাই। যিনি স্বয়ং এরূপ অভিনয় করেন এবং যাঁহার অভিনয় হয় অব্যক্ত অথবা অস্পষ্ট অভিব্যক্তিতে স্ফুটনোন্মুখ তাহার পক্ষে পরিচালন ভার লওয়া হয়তো অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু তাহাতে হীরেনবাবুর অকৃতিত্বের মাত্রা বাড়িয়াছে। গোটাকয়েক দৃশ্য মাথায় ঢুকিলেই যেমন তাহা কাহিনী হয় না, গোটাকয়েক সিনেমা ষ্টাণ্ট ছুড়িয়া মারিলেই তাহা চলচ্চিত্র হয় না—এ কথা বোধ হয় হীরেনবাবুর জানা নাই। দুঃখের বিষয়, হীরেনবাবুকে কোন ক্ষেত্রেই আমরা অভিনন্দিত করিতে পারি না।

আমাদের দেশে কোন সাধু সন্ন্যাসীর চরিত্র আঁকিতে গিয়া অজ্ঞ পরিচালকেরা প্রায়ই পক্ষাঘাতগ্রস্ত নিষ্প্রাণ ব্যক্তির সৃষ্টি করে। সাধু সন্ন্যাসী সম্বন্ধে ইহা তাঁহাদের কল্পনা মাত্র। ঘর পুড়িয়া গিয়াছে, নির্লিপ্ত সংসারী কবি জয়দেব তাহাতে সাধারণ মানুষের মত বিচলিত না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার শ্যামসুন্দর সম্বন্ধে যে

নিশ্চিন্ত ভাব তাহা যেন অনেকটা পরাশ্রয়ী ব্যক্তির মত—সনাতন আগুন খুঁচাইয়া দেবতাকে বাহির না করিলে হয়তো দেবতার জন্য জয়দেব বাহিরে বসিয়াই হাহুতাশ করিতেন—যতক্ষণ না আর একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে। ভাবটা যেন সনাতনের কাছে একটা ডিমনস্ট্রেশন করা। ওহে সনাতন দেখ, এই আমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম, এই তুমি দেখছ দেবতা নেই, ওয়ান...টু...থ্রি...দেখ্‌ছ? কি দেখ্‌ছ? আর অমনি যাত্রাগানের অনুকরণে কবি জয়দেব "চলরে—" বলিয়া এক চীৎকার করিলেন। হিপনটাইজ্‌ড্ সনাতন জয়দেবের পিছন লইল। জয়দেবের এমন একটা 'ভেক্যান্ট লুক' আর আড়ষ্ট গতি যে আমরা ভাবিয়া পাই না বাঙালী জাতি এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বাঁচিবে কি করিয়া? চিত্র সম্পাদনার দক্ষতার অভাবে এই গতি শ্লথ, মন্থর এমন কি কোন কোন স্থলে একেবারেই স্থির হইয়া গিয়াছে। চলচ্চিত্রের এই অতি প্রাথমিক টেকনিক যাহাদের জানা নাই তাহাদের পক্ষে চিত্র পরিচালন ও অভিনয় ও গ্রহণ সাহসের কথা বটে।

আমরা কোথাও মানুষ জয়দেবকে পাই না। দেবমন্দিরে পদ্মাবতীর পালিত পিতা পর্যন্ত দেবনির্দেশ পান; ঘর ছাড়া কবি জয়দেবের গলায় কন্যার মালা দুলিয়া পড়ে। জয়দেব আবার সংসারে ফিরিয়া আসে। সঙ্গে সনাতন। কিন্তু ঐ কালের একালের সুপরিচিত ভোজপুরী দারোয়ানটি তারানাথের বাড়ি জুটিল কি করিয়া? সেকালে নোটিশ দিয়া ডাকাতি হইত সেকালেও বাঙালী এমনই বীর্যহীন ছিল যে, ঘরবাড়ি সামলাইতে বিংশশতাব্দীর আপটুডেট হিন্দুস্থানী দারোয়ান কি করিয়া আসিল বুঝা দায়। তারানাথ ক্রূর প্রকৃতির লোক—লোভী মহাজন। কিন্তু বৈষ্ণব উৎখাতের জন্য তাহাকে যেভাবে চিত্রিত করিতে চেষ্টা হইয়াছে তাহার কারণ ও সংজ্ঞা স্পষ্ট হয় নাই।

নরেশ মিত্র তাহার সরু কণ্ঠস্বর লইয়া সাধারণত প্রথম শ্রেণীর অভিনয় করিয়া থাকেন; কিন্তু হীরেনবাবুর দুর্ভাগ্য, তিনিও 'জয়দেবে'র সমপর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছেন। চরিত্রের গতি ও পরিণতিটা অত্যন্ত একঘেয়ে এবং কামুক চরিত্র বলিয়া আঁকিতে চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা প্রকাশ পায় নাই। আমাদের 'যতো ধর্ম স্ততো জয়' সম্বন্ধে যে একটা ছেলেমানুষি ধারণা আছে এখানেও সেই আদিম চিন্তাই প্রাণ পাইতে চাহিয়াছে। পাপের ফল!

সতীত্ব সম্বন্ধেও আমাদের সেই একই ধারণা—এবং সতীর উপর সেই একই ধরণের আক্রমণ এবং ঠিক সেরূপ একজন সাধু ডাকাত-টাকাতের অকস্মাৎ আবির্ভাব—অমনি হাততালি। সংসারে এমন আকস্মিকতার স্থান আছে, ডিটেকটিভ উপন্যাসেও এমন সব ভোজবাজি আছে। কিন্তু থাকিলে কি হইবে? আকস্মিক ঘটনা এক—তাহারই উপর কবির রচনা পৃথক বস্তু—পৃথক বলিয়াই তাহা কবির সৃষ্টি, তাহাতে সামঞ্জস্য থাকিবে, বক্তব্যের সঙ্গতি ও সৌকর্য থাকিবে।

বৈষ্ণবেরা সেকালেও অস্পৃশ্যতা মানেন নাই, সমগ্র চিত্রের মধ্যে এঁটুকুই রিলিফ কিন্তু পরিচালক তাহা পরিপূর্ণরূপে এক্সপ্লয়েট করিতে পারেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আসিয়া কবি জয়দেবের ভূমিকায় পাদপূরণ করিয়া গিয়া, আধুনিকপুষ্ট ও উন্নত মনস্তত্ত্বের সাহায্যে তাহার নবরূপ দিতে পারেন নাই। অথচ তাহা করিয়াও "জনপ্রিয় অতীন্দ্রিয়" ব্যাপার ঘটান যাইত। কবি বা লেখকেরা যখন যে বিষয়ে লিখেন তখন তাঁহারা সেই বিষয়ে বিষয়ীভূত হইয়া যান বা তদ্গত (তৎগত) ও তন্ময় (তৎময়) হইয়া যান। এই আচ্ছন্নতার জন্য কেহ পাগলও হন, কেহ কবি বলিয়া পূজা পাইয়া যান। এই আচ্ছন্নাবস্থায় (অবসেসান!) মানুষের জাগরণ ও নিদ্রায় পার্থক্য থাকে না এবং লেখক মাত্রেরই এই অভিজ্ঞতা আছে যে, যাহা জাগ্রত অবস্থায় পাওয়া যায় নাই তাহা "স্বপ্নদত্ত" হইয়াছে। স্বপ্নে কবিরা কবিতা লেখেন, গল্প লেখকেরা প্লট পান, পড়ুয়ারা পাঠ করেন। ইহাতে অলৌকিকতার স্থান নাই অথচ জনপ্রিয় অলৌকিকতার অবসর আছে। মানুষের চিন্তাক্ষেত্র বিরাট ও বিপুল—অক্ষয় ভাণ্ডার। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যেখানে আবির্ভূত হন সেখানে জয়দেবেরই সংহত সৃষ্টি প্রচেষ্টার বিকাশ পায়—সবই সেই—মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং—

শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় ছোট ছেলেটীর অভিনয় মোটেই সুপরিচালিত হয় নাই; এ যেন হাঁপাইয়া পড়া কাকাতুয়া। আমাদের দেশের এই বালসুলভ দৃষ্টির ফলে বালক বা শিশুর ভূমিকায় একটি অভিনয়ও উৎরায় না; ছোট ছেলের পাকা কথা জুড়িয়া দিয়া আমরা পুলকিত হই—ময়না পাখীর মুখে যেমন অকথ্য গালাগাল শুনিয়া রোমাঞ্চ হয়।

পদ্মাবতীর ভূমিকায় চিত্রার অভিনয় অনুল্লেখযোগ্য। সনাতনের স্ত্রীর ভূমিকায় রেবার অভিনয়দক্ষতা স্বীকার করিতে হয়। সত্য মুখার্জি দেউলিয়া হইয়াছেন; তাঁহার মুখ ও কথনভঙ্গি ক্রমেই কাতুকুতু হইতে খোঁচায় পরিণত হইয়াছে। তিনি ছুটী নিন, নতুবা হাস্যরসের আরও নূতন টেকনিক শিখুন।

স্তব স্তোত্র পাঠে যে গাম্ভীর্য রণিত হইয়া উঠে, জয়দেবে তাহা করুণ হইয়াছে। চণ্ডীর স্তব পাঠ করিবার কি লোক জুটে নাই? সংস্কৃতের ঐশ্বর্য ও ঝংকার ইঁহাদের হাতে পড়িয়া, অনভিজ্ঞ ও 'কণ্ঠহীন' গায়কের কাছে সংগীতের যে হাল হয় এবং সেই নির্লজ্জ 'গায়ক' সকলকে উপেক্ষা করিয়া গান গাহিতে থাকিলে যেরূপ হয়, স্তব পাঠাদি সেরূপ হইয়াছে।

গানের দিক দিয়া যে কোন বৈঠকী কীর্তন ইহা অপেক্ষা ভাল।

চিত্রগ্রহণ মোটামুটী মন্দ নহে। তবে এখানে ক্যামেরা ডিনামিক নহে—স্ট্যাটিক্।

পরিশেষে আমাদের নিজেকে দুর্ভাগ্যতম মনে হইতেছে যে, এরূপ একটি বিরূপ সমালোচনার অপ্রিয় কাজ আমাদিগকে করিতে হইল।

খেলাধুলা

আন্তঃকলেজ মহিলা স্পোর্টস

আন্তঃকলেজ মহিলা স্পোর্টস এসোশিয়েশনের ষষ্ঠ বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি বিপুল সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার ভিক্টোরিয়া, স্কটিশ চার্চ, বেথুন, আশুতোষ, লেডী ব্রাবোর্ণ, পোষ্ট গ্রাজুয়েট প্রভৃতি কলেজের বহুসংখ্যক ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন বিভাগের ফলাফলও গত বৎসর অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের ছাত্রীগণ বিভিন্ন বিভাগে সাফল্য লাভ করিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক পয়েন্ট সংগ্রহ করায় দলগত চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন। স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রী কুমারী মিলিসেণ্ট এক্কা গোলা ছোড়া, বর্শা ছোড়া ও ডিসকাস ছোড়ায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ৩৬ পয়েণ্ট পাইয়া



আন্তঃ কলেজ মহিলা স্পোর্টসের দলগত চ্যাম্পিয়ান ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনের ছাত্রীগণ

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন। লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজের মুসলমান ছাত্রীগণ গত বৎসর এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া কোন বিষয়েই স্থানলাভ করিতে পারিয়াছিলেন না। কিন্তু এই বৎসর তাঁহারা সেই দুর্নামের ভাগী আর হন নাই; প্রতিযোগিতার কয়েকটি বিষয় স্থানলাভ করিয়াছেন। উন্নততর কৌশল আয়ত্তের জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন তাহার প্রমাণও তাঁহারা দিয়াছেন। উক্ত কলেজের ছাত্রী কুমারী রাবেয়া খাতুন হার্ডল রেসে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। তিনি যে শীঘ্রই হার্ডল বিষয় বাঙলার মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবেন তাহার নিদর্শন এই প্রতিযোগিতায় দিয়াছেন। প্রতিযোগিতা পরিচালনায় কোনরূপ ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় নাই। পরিচালকগণ অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যে বিশেষ শ্রমস্বীকার করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

শাড়ি পরিহিতাদের সংখ্যা

শাড়ি পরিহিতাদের সংখ্যা এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ কম পরিলক্ষিত হইয়াছে। আপাদলম্বিত শাড়ি পরিহিত অবস্থায় এ্যাথলেটিকস স্পোর্টের বিভিন্ন বিষয় সাফল্যলাভ করা যায় না ইহা উচ্চ শিক্ষারতা ছাত্রীগণ উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। এই বৎসর যে কয়েকজন ছাত্রী শাড়ি পরিহিত অবস্থায় প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিলেন আগামী বৎসরে তাঁহাদের ঐরূপ অবস্থায় দেখা যাইবে না বলিয়াই আমাদের ধারণা।

শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজন

উচ্চ শিক্ষিতা ছাত্রীগণের স্পোর্টস বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহারা সাফল্যলাভের জন্য শাড়ি ত্যাগ করিয়া ফ্রক বা প্যাণ্ট ব্যবহার করিতেছেন। ইহা খুবই সুখের ও আনন্দের বিষয়। তবে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষার যে প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। গত ছয় বৎসর ধরিয়া এই প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং এই ছয় বৎসরের মধ্যে কোন কলেজেই যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত এ্যাথলেটিকস শিক্ষার ব্যবস্থা করেন নাই, তাহার প্রমাণ আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি। কি বর্শা ছোড়া, কি ডিসকাস ছোড়া, কি গোলা ছোড়া, কি হার্ডল রেসে কোন একটি বিষয়ের প্রতিযোগিতার সময় কোন একটি ছাত্রীকেও নিখুঁত কৌশল প্রদর্শন করিতে দেখি নাই। এইরূপ উক্তি করার ফলে কেহ যেন না মনে করেন যে, আমরা বিভিন্ন কলেজের ছাত্রীগণকে হীন প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমরা বাঙলার উচ্চ শিক্ষিতা ছাত্রীগণকে বিশেষ উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে দেখিতে চাহি বলিয়া এইরূপ উক্তি করিতে বাধ্য হইতেছি। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কৌশল শিক্ষা করিলে তাঁহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা লাভ করিবে, ইহা আমরা দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি।

নিম্নে প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

১০০ মিটার দৌড়—১ম—তপতী ভট্টাচার্য (আশুতোষ), ২য়—ইলা সেন (বেথুন), ৩য়—শোভা বসু (ভিক্টোরিয়া)।

বর্শা ছোড়া—১ম—মিলিসেণ্ট এক্কা (স্কটিশ চার্চ), ২য়—

শোভা বসু (ভিক্টোরিয়া), ৩য়—রাবেয়া খাতুন (লেডী ব্রাবোর্ণ)।

২০০ মিটার দৌড়—১ম— তপতী ভট্টাচার্য (আশুতোষ), ২য়—শোভা বসু (ভিক্টোরিয়া), ৩য়—ইলা সেন (বেথুন)।

ডিসকাস ছোড়া—১ম—মিলিসেণ্ট এক্কা (স্কটিশ চার্চ), ২য়—বেলী দাস (ভিক্টোরিয়া), ৩য়—রাবেয়া খাতুন (লেডী ব্রাবোর্ণ)।

দৈর্ঘ লম্ফন—১ম—প্রীতি বসু (ভিক্টোরিয়া), ২য়—লীনা ব্যানার্জি (লেডী ব্রাবোর্ণ), ৩য়—মৃণালিনী বিশ্বাস (স্কটিশ চার্চ)।

গোলা ছোড়া—১ম—মিলিসেণ্ট এক্কা (স্কটিশ চার্চ), ২য়—অনিলা সেন (আশুতোষ), ৩য়—তপতী ভট্টাচার্য (আশুতোষ)।

রিলে রেস—বেথুন কলেজ দল বিজয়ী।

৮০ মিটার হার্ডল—১ম—রাবেয়া খাতুন (লেডী ব্রাবোর্ণ), ২য়—মৃণালিনী বিশ্বাস (স্কটিশ চার্চ), ৩য়—করুণা গুহ (ভিক্টোরিয়া)।

ব্যালেন্স রেস—১ম—করুণা গুহ (ভিক্টোরিয়া), ২য়—প্রীতি বসু (ভিক্টোরিয়া), ৩য়—শোভা বসু (ভিক্টোরিয়া)।

দলগত চ্যাম্পিয়ান—ভিক্টোরিয়া।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান—মিস মিলিসেণ্ট এক্কা (স্কটিশ চার্চ কলেজ)।

পূর্ববর্তী ব্যক্তিগত ও দলগত চ্যাম্পিয়ান

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান—১৯৩৬ সালে কুমারী সারা এজরা (স্কটিশ চার্চ কলেজ), ১৯৩৭ সালে শোভনা বসু (ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন), ১৯৩৮ সালে কুমারী কৃষ্ণা সেন (ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন), ১৯৩৯ সালে কুমারী কনক গাঙ্গুলী (স্কটিশ চার্চ কলেজ), ১৯৪০ সালে কুমারী শোভা বসু (ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন)।

দলগত চ্যাম্পিয়ান—১৯৩৬ সালে আশুতোষ কলেজ ১৯৩৭ সালে ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন, ১৯৩৮ সালে ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন, ১৯৩৯ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ ও ১৯৪০ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ।

ঢাকায় আন্তঃকলেজ মহিলা স্পোর্টস্

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণ কলিকাতার আন্তঃকলেজ মহিলা স্পোর্টস এসোসিয়েশনের পাঁচ বৎসরের কার্যকলাপ দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া এই বৎসর ঢাকা আন্তঃকলেজ মহিলা স্পোর্টসের এক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠানে বহুসংখ্যক ছাত্রী যোগদান না করিলেও, অনুষ্ঠানটি বেশ দর্শনযোগ্য হইয়াছিল। ঢাকার বিভিন্ন কলেজের ছাত্রীগণ এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া ও প্রতিযোগিতার সময় দলে দলে উপস্থিত হইয়া প্রতিযোগিগণকে উৎসাহিত করেন। কলিকাতার ন্যায় এই অনুষ্ঠানটি যে শীঘ্রই বিশিষ্টতা লাভ করিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। ঢাকার সকল কলেজের ছাত্রীগণ এই অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া আমরা আশা রাখি।

মহারাষ্ট্র ক্রিকেট দলের কৃতিত্ব

মহারাষ্ট্র ক্রিকেট দল রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল খেলায় উত্তর ভারত দলের বিরুদ্ধে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এই খেলায় তাঁহারা রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় আরও তিনটি নূতন রেকর্ড করিয়াছেন। নিম্নে উহা প্রদত্ত হইলঃ—

(১) এই খেলায় মহারাষ্ট্র দল প্রথম ইনিংসে মোট ৭৯৮ রাণ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার এই বৎসরের প্রথম খেলায় বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে ৬৭৫ রাণ করিয়া মোট রাণ সংখ্যার নূতন রেকর্ড করিয়াছিলেন। উত্তর ভারত দলের বিরুদ্ধে ৭৯৮ রাণ করায় পূর্বের রেকর্ড ভঙ্গ হইল।

(২) এই খেলায় তিনজন খেলোয়াড় অধ্যাপক দেওধর, ভাজেকার ও যাদব প্রত্যেকে শতাধিক রাণ করিয়াছেন। অধ্যাপক দেওধর ১৯৬ রাণ, ভাজেকার ১২০ রাণ ও যাদব ১১৫ রাণ করেন। রণজি প্রতিযোগিতায় ইতিপূর্বে কোন দলের তিনজন খেলোয়াড় এইরূপ একটি ইনিংসের খেলায় শতাধিক রাণ করিতে পারেন নাই।

(৩) এই খেলায় অধ্যাপক দেওধর পর পর তিনজন খেলোয়াড়ের সহযোগিতায় শতাধিক রাণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ইতিহাস কেন, ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে একজন খেলোয়াড়কে এইরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে দেখা যায় নাই। অষ্ট্রেলিয়া বা ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট ইতিহাসে এইরূপ কোন দৃষ্টান্ত আছে কি না সন্দেহ। ইহা একটি নূতন পৃথিবীর রেকর্ড বলা যাইতে পারে।

খেলার বিবরণ

মহারাষ্ট্র দল প্রথম খেলা আরম্ভ করেন। ভাজেকার ও সোহনী খেলা আরম্ভ করেন। ১৫৮ হইলে সোহনী আউট হন। এম এম নাইডু ও নিম্বলকার বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন না। হাজারী খেলায় যোগদান করিয়া খেলার গতি পরিবর্তন করেন। ২৭৭ রাণে প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়। ভাজেকার ১২০ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। হাজারী আউট হন। পরদিন ভাজেকার আউট হইলে অধ্যাপক দেওধর খেলিতে আরম্ভ করেন। দ্বিতীয় দিনের শেষে মহারাষ্ট্র দলের সাত উইকেটে ৬১২ রাণ হয়। অধ্যাপক দেওধর ১৬৪ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। তৃতীয় দিনে অধ্যাপক দেওধর ১৯৬ রাণ করিয়া আউট হন। যাদব ১১৫ রাণ করিয়া আউট হন। মহারাষ্ট্র দলের প্রথম ইনিংস ৭৯৮ রাণে শেষ হয়। মধ্যাহ্ন ভোজের পর উত্তর ভারত দল খেলা আরম্ভ করেন। তৃতীয় দিনের শেষে উত্তর ভারত দল চার উইকেটে ১৮৮ রাণ করেন। রামপ্রকাশ ৬৯ রাণ ও মহম্মদ সরিফ ৬৬ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। চতুর্থ দিনে সরিফ ১১৮ রাণ করিয়া আউট হন। কিন্তু রামপ্রকাশ দলের শেষ পর্যন্ত খেলিয়া ২০৯ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। উত্তর ভারত দলের প্রথম ইনিংস ৪৪২ রাণে শেষ হয়। মহারাষ্ট্র দল প্রথম ইনিংসে ৩৫৬ রাণে অগ্রগামী থাকায় খেলায় বিজয়ী হন।

খেলার ফলাফলঃ—

মহারাষ্ট্র প্রথম ইনিংসঃ—৭৯৮ রাণ (ভাজেকার ১২০, সোহনী ৬৮, হাজারী ৬৫, সারভাতি ৬৩, অধ্যাপক দেওধর ১৯৬, গোখেল ৭৫, যাদব ১১৫; হাবিবুল্লা ১৭৪ রাণ ৪টি, গুলমহম্মদ ১২২ রাণে ৩টি, সুফরাজ ১৪৯ রাণে ২টি ও রামজান ১০৩ রাণে ১টি উইকেট পান)।

উত্তর ভারত প্রথম ইনিংসঃ—৪৪২ রাণ (রামপ্রকাশ নট আউট ২০৯, মহম্মদ সরিফ ১১৮ আনওয়ার হোসেন ২৫; পট্টবর্ধন ৪৭ রাণে ১টি, হাজারী ১১৬ রাণে ৩টি, সোহনী ৭০ রাণে ২টি, সারভাতি ৬৯ রাণে ৪টি উইকেট পান)।

(মহারাষ্ট্র দল প্রথম ইনিংসের ফলে বিজয়ী)

সমর বার্ত্তা

১৯ ফেব্রুয়ারী

সিঙ্গাপুরের সংবাদে প্রকাশ যে, হাজার হাজার অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্য সিঙ্গাপুরে গিয়া পৌঁছিয়াছে এবং তাহারা ট্রেনযোগে মালয়ের বিভিন্ন স্থানে যাত্রা করিয়াছে।

লণ্ডনের একটি হাসপাতালের উপর বোমা বর্ষিত হওয়ার ফলে ১৯ জন নিহত এবং ৫২ জন আহত হয়।

কায়রোর এক ইস্তাহারে আবিসিনিয়ার এনজাবারা দখলের এবং বহু ইতালীয় সৈন্য বন্দী করার সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভা গুয়াম ও সামোয়ার নৌ ও বিমানঘাঁটি স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং নৌঘাঁটি-সমূহের উন্নতির জন্য ২৪ কোটি ২০ লক্ষ ডলার ব্যয় মঞ্জুর করেন।

২০শে ফেব্রুয়ারী

দক্ষিণ আবিসিনিয়ার মেগাস্থিত ইতালীয়ান সৈন্যদল আত্ম-সমর্পণ করে। ৬০০ শত ইতালীয়ান সৈন্য বন্দী হইয়াছে এবং বহু কামান ও মেশিনগান হস্তগত করা হইয়াছে। সাম্রাজ্যিক বাহিনী সাফল্যের সহিত ইতালীয়ানদের সমস্ত পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করিয়া জুবা নদী অতিক্রম করে। মাল্টায় বাধ্যতামূলক সামরিকবৃত্তি প্রবর্তিত হয়।

থাইল্যাণ্ড হইতে ইংরেজ নারী ও শিশুদিগকে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

২১ ফেব্রুয়ারী

ওয়াশিংটনস্থিত বৃটিশ দূতাবাস হইতে ঘোষিত হয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূল হইতে আকাশ পথে সুদূর প্রাচ্যে বহু বিমান প্রেরণ করা হইতেছে।

জাপানের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ মাৎসুওকা অদ্য এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ইউরোপের যুদ্ধ ব্যাপারে মধ্যস্ততা করি-বার জন্য জাপানের পক্ষে কোন প্রস্তাব করা হয় নাই। আমে-রিকার সহিত জাপানের বিরোধিতাপূর্ণ মনোভাবের যে সংবাদ রটিয়াছে তাহা কাহারও অলীক দুঃস্বপ্নপ্রসূত কাহিনী মাত্র সুদূর প্রাচ্যে আমেরিকা অথবা বৃটেনকে বিব্রত করার কোন সংকল্প জাপানের নাই।

রুমানিয়া হইতে ইস্তাম্বুলে আগত সমর বিশেষজ্ঞগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, রুমানিয়ায় কম পক্ষে পঁচিশ ডিভিসন সৈন্য আছে; তন্মধ্যে সাত ডিভিসন যন্ত্রসজ্জিত এবং তিন ডিভিসন সাঁজোয়া বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত।

২২ ফেব্রুয়ারী

টোকিও সংবাদে প্রকাশ যে, জাপ নৌবহরের অন্তর্গত চারটি বিমান ইন্দোচীনের কোন এক ঘাঁটি হইতে ইউনানের রাজধানী কুনমিং-এর সামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর বোমা বর্ষণ করে। কুনমিং চীন-ব্রহ্ম পথের চীনা এলাকার শেষ সীমানায় অবস্থিত।

বেলগ্রেড-এর একটি অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ যে, বৃহ-স্পতিবার হইতে জার্মান সৈন্যগণ বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করিতেছে।

বৃটিশ নৌবিভাগের এক ইস্তাহারে মধ্য ভূমধ্যসাগরের এক নূতন এলাকার মাইন স্থাপন করায় উক্ত এলাকা জাহাজ চলাচলের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। মাল্টাকে মধ্য ভূমধ্য-সাগরের উক্ত বিপজ্জনক এলাকার কেন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

দক্ষিণ চীন সমুদ্রস্থিত জাপ নৌবহরের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বার্মা রোডের যোগসূত্র সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করা হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। তদুপরি ইহাতে বলা হইয়াছে যে, মেকং নদীর উত্তরাংশ যে স্থানে বার্মা রোড নদী অতিক্রম করিয়াছে, জাপ বোমা বর্ষণে সেই স্থানের সেতুসমূহ ধ্বংস হইয়াছে।

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ যে, দানিয়ুব নদীর ৫০ মাইল ব্যাপী একটা অংশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহার দুই প্রান্তে জার্মানরা পন্টুন সেতু পাতিয়াছে।

এরিত্রিয়া ও আবিসিনিয়ায় বৃটিশ বাহিনীর কর্মতৎপরতা অক্ষুণ্ণ আছে। ইতালীয়ান সোমালিল্যাণ্ডের জুবা নদীর মোহনা-স্থিত জাম্বো বন্দর সাউথ আফ্রিকান বাহিনীর করতলগত হইয়াছে। বৃটিশ সৈন্যগণ কিসমাউএর নিকটে দুইটি গুরুত্ব-পূর্ণ দ্বীপ দখল করিয়াছে।

২৩ ফেব্রুয়ারী

সিনর মুসোলিনী রোমে এক বেতার বক্তৃতায় ইতালীবাসী এবং সমস্ত জগৎবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন যে, শুধু ভূমধ্যসাগরই নহে, পৃথক পৃথক অথচ বিস্তীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রের সর্বত্রই বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে ইতালী অসুবিধা বোধ করিতেছে। তবে তিনি এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন যে, শেষ পর্যন্ত জয়-লাভ ঘটিবেই।

২৪ ফেব্রুয়ারী

আনকারার সংবাদে প্রকাশ যে, বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়া গ্রীস আক্রমণের জন্য জার্মানির আয়োজন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। প্রকাশ যে, জার্মান সৈন্যগণ দানিয়ুব নদী পার হইবার পর স্ট্রুমা ও মেষ্টা উপত্যকার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া স্যালোনিকা হইতে প্রায় ৭৫ মাইল দূরবর্তী কুলা নামক স্থানে গ্রীক সীমান্তে পৌঁছিবে।

মিউনিকের বিখ্যাত বিয়ার সেলারে হিটলার এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার প্রথমাংশে তিনি ভার্সাই সন্ধির নিন্দা করেন। আসন্ন যুদ্ধের ইঙ্গিত করিয়া তিনি বলেন যে, আগামী মার্চ ও এপ্রিল মাসে এমন নৌযুদ্ধ আরম্ভ হইবে, শত্রুপক্ষ তাহা কল্পনাও করে নাই। মুসোলিনীর সহিত সম্পর্কের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মুসোলিনীর সঙ্গে তিনি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

২৫শে ফেব্রুয়ারী

পশ্চিম আফ্রিকানবাহিনী গতকল্য ইতালীর সোমালিল্যাণ্ডের কিসমাউর ১৬০ মাইল উত্তরে অবস্থিত ব্রাভা বন্দরটি দখল করিয়াছে।

বৃষ্টি ও ঘন কুয়াসার জন্য আলবানিয়ায় ইতালীয়দের বিরুদ্ধে গ্রীকদের আক্রমণ অনেকটা সীমাবদ্ধ আছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এ পর্যন্ত ইতালীর ১ লক্ষ ২২ হাজার সৈন্য হতাহত ও নিখোঁজ হইয়াছে।

বৃটিশ বিমানবহর ব্রেষ্টের উপর প্রবল নৈশ বিমান আক্রমণ চালায়।

বৃটেনে জার্মান বিমানের কর্মতৎপরতা খুব সামান্য ছিল। গতকল্য নৈশ বিমানহানায় পূর্ব এঙ্গালিয়ার একটি শহরে কয়েকজন লোক নিহত হয় ও কয়েকটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৯ ফেব্রুয়ারী

কলিকাতায় এবছরের লোকগণনা সম্পর্কীয় কার্য আরম্ভ হইয়াছে। এই লোকগণনার কাজ আগামী ৪ঠা মার্চ পর্যন্ত চলিবে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ও রাষ্ট্রীয় পরিষদে রেলওয়ে বাজেট পেশ করা হয়। উহাতে ১৯৪০-৪১ সালে ১৪ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া দেখান হইয়াছে এবং ১৯৪১-৪২ সালে ১১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন কলিকাতা শহরের ময়লা জল নির্গমনের জন্য চীফ ইঞ্জিনীয়ার কর্তৃক প্রস্তাবিত বনতলা হইতে বামনগাছি পর্যন্ত সাময়িকভাবে একটি কাঁচা খাল কাটিবার পরিকল্পনা অনুমোদন করেন এবং উহার জন্য ১ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করেন।

পাহারের হোসিয়ারপুরে একজন সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করিবার কালে পুলিস জনতার উপর লাঠি চালনা করে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় প্রচণ্ড ঝড় ও শিলাবৃষ্টির ফলে চারিজনের মৃত্যু হয়।

২০ ফেব্রুয়ারী

ঢাকা জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যকে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যনির্বাহক পরিষদের এক সভায় বর্তমান আদমসুমারী সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী মিঃ ফজলুল হকের আচরণে ক্ষোভ করিয়া এবং দেশবাসীকে লোকগণনা কার্যে পূর্ণ সহযোগিতা করিতে অনুরোধ জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রেঙ্গুনে ব্রহ্মরক্ষা বিধানানুযায়ী ব্যাপক খানাতল্লাস ও ধরপাকড় হয়।

২১ ফেব্রুয়ারী

মিসেস অরুণা আসফ আলী সত্যাগ্রহ করিবার অভিযোগে দিল্লীর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ভারত সরকার রুমানিয়াকে শত্রুরাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

সিন্ধুর মন্ত্রিমণ্ডলের এক সভায় শক্করের মঞ্জিলগাঁ মুসলমানদের হস্তে অর্পণ করিবার সিদ্ধান্ত করা হয়।

সিন্ধু পরিষদের সদস্য পীর এলাহি বক্স সিন্ধু মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন।

২২ ফেব্রুয়ারী

গত মাসে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর আকস্মিক গৃহত্যাগের পূর্বে তাঁহার ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে যে পত্রবিনিময় হইয়াছিল, তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে জানা যায় যে, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশানুযায়ী কাজ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু মহাত্মা গান্ধী 'গুরুতর মূলনীতিগত মতভেদের' অজুহাতে ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

ইংরেজ মহিলা মিসেস ফ্রেডাবেদী লাহোর হইতে ৫0 মাইল দূরস্থ ডেরাবাবা নামক স্থানে গতকল্য সত্যাগ্রহ করেন। তাঁহাকে ছয়মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

২৩ ফেব্রুয়ারী

কলিকাতায় ও ভারতের নানাস্থানে নিখিল ভারত সুভাষ-দিবস প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষে কলিকাতায় ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষক ও নাগরিকগণের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সভা, শোভাযাত্রা এবং দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের নিরাপত্তা ও তাঁহার আরব্ধ কার্যের সাফল্যের নিমিত্ত সমষ্টিগতভাবে প্রার্থনার অনুষ্ঠান হয়।

দিল্লী প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লকের কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীমতী রাজদুলারী সুভাষ দিবস উপলক্ষে সমবেত শ্রমিকগণের সভায় বক্তৃতাকালে গ্রেপ্তার হন।

২৪ ফেব্রুয়ারী

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উদ্যোগে বালীগঞ্জে এক বিরাট হিন্দু সম্মেলন হয়। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বর্তমান সেন্সাসে প্রত্যেক হিন্দুকে নিজ নিজ গৃহ ও পরিবারস্থ প্রত্যেক নরনারীর নাম লিখাইতে অনুরোধ জানাইয়া বিশিষ্ট হিন্দু নেতাগণ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন এবং এই সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর একটি প্রস্তাবে বাঙলার নিপীড়িত হিন্দুদের আত্মরক্ষার্থ হিন্দু মিলন মন্দির স্থাপন ও রক্ষিদল গঠনের জন্য অনুরোধ জানান হয়।

২৪শে ফেব্রুয়ারী

ভারত সচিব মিঃ আমেরী এক বেতার বক্তৃতায় বলেন যে, ন্যায় ও সুবিচারের জন্যই বৃটেন আজ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ভারতের সম্বন্ধেও তাঁহারা ন্যায় বিচার করিবেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলেই যতশীঘ্র সম্ভব তাঁহারা ভারতকে বৃটিশ কমনওয়েলথএ সমান অংশীদাররূপে গ্রহণ করিবেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ডিরেক্টর শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদার বাঙলার জনগণের পক্ষ হইতে মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকট যে দশ দফা দাবী উত্থাপন করিয়াছেন এবং ঐ দাবীর ভিত্তিতে দেশব্যাপী যে আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে, উহা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সর্বসাধারণকে উহাতে যোগ দিতে আহ্বান জানাইয়া বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের দলপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন।

বাঙলার গবর্নর ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী হইতে প্রত্যহ কলিকাতা শহর ও শহরতলীতে নিষ্প্রদীপের ব্যবস্থা করিয়া এক জরুরী আদেশ জারী করিয়াছেন। উক্ত আদেশ লঙ্ঘন করিলে ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইবে।

ফরাসী মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করা হইয়াছে। মার্শাল পেত্যাঁ নূতন মন্ত্রিসভায় কয়েকজন নূতন লোক গ্রহণ করিয়াছেন। এডমিরাল দারলাঁ সহকারী প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্রসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিব এবং জেনারেল হুণ্টজিগার দেশরক্ষাসচিব হইয়াছেন।

বিখ্যাত কানাডিয়ান বৈজ্ঞানিক স্যার ফ্রেডেরিক ব্যানটিং এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাজেট সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হয়।

...**সত্যাগ্রহ সংবাদ**—শ্রীমতী কেশর দেবী, পণ্ডিত সত্যদেব শর্মা ও উমাশকর শাস্ত্রী কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে সত্যাগ্রহ করেন, কিন্তু ধৃত হন নাই। মেদিনীপুর জেলার বাসুদেবপুরে সত্যাগ্রহ করিয়া গৌরাঙ্গচরণ মাইতি ধৃত হইয়াছেন। কলিকাতার কয়েকজন সত্যাগ্রহী দিল্লী যাত্রা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলে উহার জবাবে তিনি বলেন যে, "যে সকল সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করা হয় না, তাঁহারা দুই এক মাস সমগ্র জেলা সফর করিলে কোন অন্যায় হয় না। এই সফরের পরেই তাঁহারা দিল্লী যাত্রা করিতে পারেন।

বিচিত্র বার্তা

হলিউড সম্বন্ধে কত কথাই না আমরা পড়েছি। সেখানকার ছায়ালোকের অভিনেত্রী-অভিনেতাদের দৈনন্দিন সুখময় জীবনের কাহিনী, চারিপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য, ঐশ্বর্য, বৈজ্ঞানিকদের নূতন নূতন আবিষ্কৃত বস্তুর রহস্য আমাদের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। কল্পনার মতই আমাদের সেখানকার ইতিহাস আবিষ্ট করেছে। স্বর্গের যে একটা কল্পিত রূপ আমাদের মনের উপর বহু সহস্র বৎসর ধরে ছায়াপাত করে রয়েছে সেটাকেই আমরা নিঃসন্দেহে হলিউডের রূপের মধ্যে যে দেখতে পাচ্ছি এমনতর অভিমতও আবার অনেকে করে বসেছেন। স্বর্গের ঐশ্বর্য আমাদের কল্পনার বস্তু আর হলিউডের চাকচিক্য ছায়ালোকের পর্দায় এবং বইয়ের পাতায় দেখা, সুতরাং কোন রকম আলোচনার মধ্যে অগ্রসর হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় বলেই মনে করি। ছাপার অক্ষরে পড়তে পড়তে মনটা হঠাৎ দমে গেল; ভূস্বর্গ হলিউডের মধ্যেও নাকি ঘুণ ধরেছে। এটা অনেককে নিরাশ করবে, কেউ কেউ বেদনা অনুভব করবেন, আবার অনেকে শত্রুপক্ষের হীন প্রচার কার্য বলেই ধরে নেবেন। আমরা ছাপার অক্ষরে যা পড়লাম তারই একটু আভাস দিলাম। হলিউডের ভিতরকার অস্বচ্ছলতার কথা লিখছেন সামুয়েল গোল্ডউইন। প্রডিউসার হিসাবে ছায়াচিত্র জগতে এর খ্যাতি বহু দেশ-প্রসারিত। সুতরাং ঘটনার সততার উপর আমরা অনেকখানি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস আরোপ করতে পারি। হলিউডের যে দুর্দিন আসন্ন সে সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি কারণ দেখিয়েছেন। তার মধ্যে পরিচর্যার হ্রাসটাকেই তিনি প্রধান কারণ বলেছেন। এছাড়া আরও কতকগুলি কারণকে তিনি প্রধান কারণের মধ্যেই ফেলেছেন। তাদের মধ্যে জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি, বিশেষ করে চাকুরিতে পারিশ্রমিকের মূল্যবৃদ্ধি।

ব্যবসায়েতে আয় ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। মোটামুটি ব্যবসায় শতকরা চল্লিশ ভাগ আয় বিদেশ থেকেই আসে। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতিতে আয়ের সাত ভাগ হ্রাস পেয়েছে। যে সব ফিল্ম ব্যবসায়ী এই শ্রেণীর ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন যুদ্ধের ফলে তাঁরা নাকি ক্রমশ এ ব্যবসা পরিত্যাগ করে মূলধন অন্য ব্যবসায় খাটাবার মতলবে ছুটছেন।

তারপর রেডিওর সঙ্গে প্রতিযোগিতা দিনদিন বেড়ে চলায় ফিল্ম ব্যবসা অনেকখানি কাবু হয়ে পড়েছে। রেডিওর অনুষ্ঠান লিপি উচ্চশ্রেণীর, দিন দিন আরও জনপ্রিয়তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আধুনিক মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কিরূপ রুচিসম্পন্ন 'প্রোগ্রাম' হওয়া দরকার তা রেডিও কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে মানুষের রুচির উপযোগী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন। রেডিও আজ কেবলমাত্র নাগরিক জীবনে চিত্তবিনোদনের যান্ত্রিক সহায়ক নয়। জনসাধারণের মধ্যে, নিরক্ষর পল্লীবাসীর মধ্যে জনশিক্ষা যাতে দ্রুত প্রসার লাভ করে তার উপযোগী নানা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে। ফলে দেশবাসীর সহানুভূতি এবং গভর্নমেণ্টের সাহায্য দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। তিনি আরও বলেছেন, রেডিওর গ্রাহক হওয়ার আর একটা সুবিধা হচ্ছে, যখন অনুষ্ঠানে যোগদান করার কোন রকম মনের অনুকূল অবস্থা থাকে না অথবা মনের রুচি বিকার ঘটে তখন অনায়াসেই বৈদ্যুতিক বোতামের সাহায্যে সেই মুহূর্তের জন্য মনকে বিশ্রাম দিতে পারি—এবং রুচিকে সংযত করতে পারি। রেডিও প্রতিদিনের অনুষ্ঠানের কোন না কোন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন রুচির মানুষকে মনের সাধারণ অবস্থায় সুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে আনন্দ দিতে সক্ষম হয়। এটা তাদের অনুষ্ঠান ব্যবস্থার সুফলেই সম্ভব হয়।

কিন্তু ছায়াচিত্রের সকল বইগুলিই দর্শকদের সমান পরিমাণে আনন্দ দিতে পারে না। তিনি বলেন, দশখানা ছবি দেখতে গিয়ে অনেক সময় নয়খানা ছবিতে দর্শকরা কোনরকম নূতনত্বের পরিচয় পায় না, একঘেয়েমির মধ্যে দর্শকরা সর্বক্ষণ একটা মনের অস্বচ্ছলতা অনুভব করে এবং একমাত্র অর্থব্যয়ের মনঃপীড়ার জন্যই জোর করে আসনের উপর বসে সময় কাটান। এ ব্যাপারটা ওদেশের বেতার অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রোতাদের হয় না। যাঁর যে রকম রুচি তিনি সেরকম 'প্রোগ্রামে' যোগদান করে মনের মধ্যে একটা সহজ আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারেন। জোর করে মনের বিপরীত অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় না। ছায়াচিত্রে নটনটীর স্বরূপ লাভ করে দর্শকেরা যে একটা মনের আনন্দ পেত, দেশ বিদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য, প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার ছবি দেখে দর্শকদের মন পর্দায় যতখানি আকর্ষণ করত ততখানি এখন আর করে না। টেলিভিসন যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে দর্শকদের দৃষ্টি রেডিওর উপর পড়েছে; নূতনের উপর মানুষের একটা আকর্ষণ ত রয়েছে তাছাড়া টেলিভিশন যন্ত্র রেডিওর 'প্রোগ্রাম'কে আগের থেকে অনেকখানি লোভনীয় করে তুলেছে। এর উপর নাট্যমঞ্চের উপর দর্শকদের আকর্ষণটা ওদেশে বেশী করেই রয়ে গেছে। অথচ দৃশ্যপট সংযোজন ব্যাপারে ছায়াচিত্র যতখানি সাফল্যের পরিচয় দিতে পারে তার কণামাত্রও নাট্যমঞ্চে সম্ভব হয় না। দর্শকদের মনের উপর যতখানি "হ্যারিক্যান" চিত্রের ঝড়ের দৃশ্যটি ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করবে ততখানি নাট্যমঞ্চের উপর যে সম্ভব হবে না এটা দর্শকেরা ভালভাবেই বুঝেন। এ দৃশ্যটিকে সংগ্রহ করে তুলতে পূর্ণ এক বৎসর সময় নিয়েছিল এবং পর্দার উপর মাত্র সাত মিনিটের জন্য এর প্রয়োজন হলেও ছবিটি তুলতে ৭০,০০০ পাউণ্ড খরচ পড়েছিল। তাঁর মতে যাঁরা এই দৃশ্যটি একবার দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাঁরা বেতারে ঝড়ের দৃশ্য দেখেও সহজে একে ভুলতে পারবেন না, বহুদিন সেই দৃশ্য চোখের উপর থেকে যাবে। সময়ে সময়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছে একখানি উৎকৃষ্ট ছবি তুলতে সব থেকে কোনটির বিশেষ প্রয়োজন—অভিনেতা, পরিচালক, না কি? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'লেখক। ভাল গল্প না হলে

ছবি কোনমতেই ভাল জমে না। শ্রেষ্ঠ অভিনেতার অভিনয় শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পরিচালনা এ সমস্ত কোন দিনই নিকৃষ্ট শ্রেণীর বইকে দর্শকদের মনে বেশীদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। হ্যারিকেন চিত্রের কথাই ধরা যাক। ডোরথি লামুর এই চিত্রাংশে অভিনয় করবার পূর্বে এতখানি যশ বোধ হয় অর্জন করে উঠতে পারেন নি, জন হলও কোন ছবিতে এত চমৎকার অভিনয় করেন নি। এর একমাত্র কারণ বইখানির গল্পাংশের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার জন্যই উভয়ের অভিনয় এতখানি দর্শকদের কাছে সমাদর লাভ করেছে।

বর্তমানে হলিউডে প্রতি বৎসর ৬০০ শত শ্রেণীর বইয়ের সুটিং চলে। ঐ সমস্ত বইয়ের বেশীর ভাগই যে প্রথম শ্রেণীর হয় এমন নয়। এর জন্য দোষ লেখকের এবং পরিচালকের। ব্যবসায়ীদের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে সেখানে এত দ্রুত কাজ এগিয়ে চলে যে, প্রথম শ্রেণীর বইয়ের আশা রাখা আর চলে না। একখানা বই শেষ হলেই তাঁরা পরবর্তী বইখানার জন্য উঠে পড়ে কাজে লেগে যান। অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের মধ্যেও বর্তমানে একটা সমস্যা দেখা গেছে। তাঁদের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছে ফলে অনেক সময় নিম্নশ্রেণীর ছবিতে নামজাদা অভিনেতা অভিনেত্রীদের নামান হয়েছে। পূর্বে অর্থাৎ বেশী দিন আগে নয় একজন অভিনেতার প্রতিভা মোটামুটি দশ পনের বৎসর পর্যন্ত বজায় থাকত কিন্তু সেটা বর্তমানে এসে পড়েছে মাত্র পাঁচ বৎসরে। অবশ্য কয়েকজনের ব্যতিক্রম থাকবে।"

যা কিছ বলা হল সে সমস্ত ওদেশের। এখানকার কথা না বলাই ভাল, সেটা জনসাধারণ কেবল কল্পনা নয় চাক্ষুস দেখছেন।

* * * * *

বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বিমানচালকদের কি জাতীয় খাদ্য ভক্ষণ করা উচিত এ নিয়ে রীতিমত গবেষণা আরম্ভ করে দিয়েছেন। তাঁরা এ বিষয়ে প্রচুর সময় ও অর্থ ব্যয় করছেন। বর্তমানের বিমানচালকদের জীবনযাত্রা ভিন্ন ধারায় এসেছে। গত মহাযুদ্ধের পর বিমানের গতিবেগ বহুগুণ বেড়ে গেছে। ফলে বিমানচালকদের উপর একটা সাময়িক ক্লান্তি প্রচুর বাড়তে দেখা গেছে। বিমানচালক যে সময় কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ বাঁকের পথে বিমানটাকে চালনা করে সে সময় তারা কিছু সময়ের জন্য চোখে অন্ধকার দেখে। এ ছাড়া ধরাপৃষ্ঠ থেকে ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ ফিট উপরে পাড়ি দেওয়া বিমানচালকদের নিত্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরূপ উচ্চ স্থানের অভিযানে তাদের অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করতে বাধ্য করে। ডাঙায় মাছের যে অবস্থা হয় এরূপ উচ্চতায় এসে ঠিক তাদের সেই অবস্থায় পড়তে হয়। ফলে শরীরের উপর অতিরিক্ত ক্লান্তির আবির্ভাব হয়। এই ক্লান্তিকে উপেক্ষা করা বা পোষণ করা বলশালী বিমানচলকদের পক্ষেও অনিষ্টকর। বিশেষজ্ঞরা বলেন, পরিশ্রান্ত বিমানচালকের দেহ বলকারী খাদ্যই একমাত্র স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারে।

* * * * *

মানুষের কণ্ঠস্বর তার সবচেয়ে যেমন প্রিয় বন্ধু হতে পারে আবার তেমনি সব থেকে বড় শত্রুও হয়। সুতরাং কণ্ঠস্বরকে একেবারে উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করে এ সম্বন্ধে নানা কাজের কথা বলেছেন। মানুষের আকৃতি যেমন অপরকে আকৃষ্ট করে তেমনি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর অতি সহজে বহু জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা শরীরের অন্য বিষয়ে বহু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমাদের সাফল্যলাভ করতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করে এবং এই কণ্ঠস্বরই আলাপ আলোচনায় প্রথম সভ্য সমাজের সঙ্গে মানুষের পরিচয় করিয়ে দেয়। বিকৃত কণ্ঠ বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথার মধ্যেও জনসাধারণের মন আকৃষ্ট করতে পারে না। গায়কেরা যত শীঘ্র সুমিষ্ট কণ্ঠে দর্শকদের মুগ্ধ করে ততখানি ছন্দময় বাক্যরাশি নিয়ে কেহ বিরস কণ্ঠে একজনেরও মন আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয় না। জন্মের পর আমরা প্রায় সকলে সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী থাকি, কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠের মিষ্টতা লোপ পেয়ে বিকৃত হয়ে পড়ে। এর কারণ অনুসন্ধান করে বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন, ঠাণ্ডা লাগা অবস্থায় ফুটবল মাঠে চিৎকার করে মনের আনন্দ প্রকাশ করার জন্য, পরিশ্রান্ত অবস্থায় উচ্চকণ্ঠে পড়াশুনা, অথবা অসুস্থ অবস্থায় চিৎকারে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই আমরা আমাদের কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা হারিয়ে ফেলি।

শরীরের অন্য যে সব অঙ্গের অসুস্থতায় আমরা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ঔষধপত্র ব্যবহার করি তেমনি যদি যথাসময়ে কণ্ঠস্বরের অসুস্থতাকে উপেক্ষা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিই তাহলে অকালে এভাবে কণ্ঠের মিষ্টতা আমরা হারাব না। কিন্তু এ ব্যাপারটা আমরা উপেক্ষা বেশী করেই করে থাকি। কর্কশ কণ্ঠের তিক্ততায় আমাদের দেশের বয়স্থা গৃহিণীরা বোশেখ মাসে মধুপাত্র দানের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন, ফল কতখানি হয় জানা নেই। বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন, আলাপ আলোচনার পূর্বে মৃদুহাস্য কণ্ঠের মিষ্টতা অনেকখানি এনে দেয়। মনের প্রফুল্লতা এবং ব্যগ্রতা এ দুটিকে আলাপ আলোচনার মধ্যে সর্বক্ষণই আমাদের রাখা উচিত। নার্ভাস অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক কণ্ঠের মাধুর্য লোপ পায়। বৈজ্ঞানিকদের মতে সে অবস্থায় স্বাভাবিক কণ্ঠের মিষ্টতা ফিরে পেতে হলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করে শরীরের স্নায়ুগুলিকে শান্ত রাখতে হবে। চাকুরীর সন্ধানে উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে, অথবা নিজের বিবাহ সম্বন্ধে অপর পক্ষের অভিমত জানতে গিয়ে নার্ভাস অবস্থায় পড়ে কণ্ঠের স্বাভাবিক স্বর আমরা হারিয়ে ফেলি। এ অবস্থায় নিশ্বাস প্রশ্বাস খুব দ্রুতবেগে চলতে থাকে। অর্থাৎ উপরিভাগের বক্ষঃস্থল থেকেই নিশ্বাসের প্রশ্বাসের কাজ চলে। স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে হলে পায়ের পাতা মাটির মেজের উপর রেখে নিশ্বাস প্রশ্বাস খুব লম্বাভাবে নিতে হবে। লম্বাভাবে নিশ্বাস গ্রহণ করা শরীরের স্বাস্থ্যের পক্ষে এবং কণ্ঠের স্বাভাবিক মিষ্টতায়

পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে। স্বাভাবিক কণ্ঠের মিষ্টতা রক্ষা করতে হলে বৈজ্ঞানিকগণ নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করতে উপদেশ দিয়েছেন (১) মাটির নিচে ট্রেণে ভ্রমণকালে কথা বলা উচিত নয়, (২) গলায় ঠাণ্ডা লাগা অবস্থায় কথা একেবারে বন্ধ করা উচিত। (৩) রাগান্বিত অবস্থায় চিৎকার নিষিদ্ধ। এ অবস্থায় চিৎকার করলে সূক্ষ্ম শিরাগুলি আঘাত পায়। (৪) খেলার মাঠে উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করা নিষিদ্ধ। (৫) হঠাৎ ক্রোধ প্রকাশ করা উচিত নয়। এরূপ ক্রোধ প্রকাশের ফলে কণ্ঠের সিরাগুলি দৃঢ় হয়ে যায়। (৬) বেশী কাঁদা উচিত নয় (মহিলারা অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন)। বেশী কান্নার ফলেও কণ্ঠের সিরাগুলি দৃঢ় হয় এবং তাদের উপর একটা গুরুভার পড়ে। (৭) পরিশ্রান্ত হলে নিস্তব্ধভাবে বিশ্রাম প্রয়োজন। কথা একেবারে না বলাই উচিত।

পুস্তক পরিচয়

নাচঘর (মাসিকপত্র)—সম্পাদক সুশীল রায়, পরিচালক ধীরেন ঘোষ, ৮নং ধর্ম্মতলা স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত, মূল্য প্রতি সংখ্যা চারি আনা।

আলোচ্য পত্রিকাখানি দীর্ঘ আট বৎসর গৌরবের সহিত প্রকাশিত হইবার পর কিছুকাল লুপ্ত হইয়া ছিল। গত মাঘী পূর্ণিমায় পুনরায় তাহা নানা প্রবন্ধ, গল্প ও চিত্র সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি নির্ভীক প্রকাশভঙ্গি ও গঠনমূলক মতবাদ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শিল্পকলা, সাহিত্য নৃত্যকলা সংগীত ও সিনেমা প্রসঙ্গে আলোচনাগুলি প্রণিধানযোগ্য। কবিতাগুলি সুখপাঠ্য। শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী মাত্রই পত্রিকাখানি পাঠে আনন্দলাভ করিবেন ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

সাহিত্য সংবাদ

কোন্নগর জহৎ সংঘ:—কোন্নগর জহৎ সংঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত তৃতীয় বার্ষিক **প্রবন্ধ, কবিতা ও ছোট গল্প** প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নে দেওয়া হইল:—

প্রবন্ধ: প্রথম—অসীমা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)
দ্বিতীয়—জগদীশ রাহা (চুঁচুড়া)
কবিতা: প্রথম—শিবচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ (কলিকাতা)
দ্বিতীয়—জ্যাপিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা)
ছোট গল্প: প্রথম—শান্তিপদ গাঙ্গুলী (দিল্লী)
দ্বিতীয়—নভোনাথ শেঠ (মহেশতলা—হুগলী)

যাঁহারা বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম হইয়াছেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই প্রত্যেকে এক একখানা রৌপ্য পদক পুরস্কার পাইবেন। পুরস্কার মার্চ মাসের মধ্যে (১৯৪১) পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। (স্বাঃ) সমরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সম্পাদক, কোন্নগর জহৎ সংঘ (হুগলী)।

বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলন

সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর আয়োজন

বিগত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে কলিকাতায় বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন হইতেছে। এতদুপলক্ষে চারিটি বিভিন্ন শাখার অধিবেশন হইবে। যথা—(১) সাহিত্য, (২) দর্শন, (৩) কাব্য ও (৪) কীর্তন। সম্মেলনের অধিবেশনের ঠিকানা, তারিখ ও কার্যতালিকা যথাসময়ে সংবাদপত্র মারফৎ বিজ্ঞাপিত হইবে। বিভিন্ন শাখায় পাঠোপযোগী প্রবন্ধ, কবিতা সাহিত্যিক, কবি ও ভক্তবৃন্দের নিকট আহ্বান করা যাইতেছে। মহিলাবৃন্দের সহযোগিতাও প্রার্থনীয়। প্রবন্ধাদি আগামী ২০শে মার্চ ১৯৪১ তারিখের মধ্যে সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীকুঞ্জকিশোর দাস বি-এ, ২৭ আটাপাড়া লেন, কাশীপুর পোঃ—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। (স্বাঃ) শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, সভাপতি; শ্রীকুঞ্জকিশোর দাস, সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি।

"দেশ"এর নিয়মাবলী

(১) সাপ্তাহিক **"দেশ"** প্রতি শনিবার প্রাতে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। মফস্বলের কাগজ ঐ দিন ডাকে দেওয়া হয়।

(২) চাঁদার হার। (ক) ভারতে:—ডাকমাসুল সহ ৬৷৷৹ সাড়ে ছয় টাকা; ষাণ্মাসিক ৩৷৹ টাকা। (খ) ব্রহ্মদেশে:—৮৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৪৲ টাকা ও ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশে:—ডাকমাসুল সহ বার্ষিক ১১৲ টাকা; ষাণ্মাসিক ৫৷৷৹ টাকা।

(৩) ভি পি-তে লইলে যতদিন পর্যন্ত ভি পি-র টাকা আসিয়া না পৌঁছায় ততদিন পর্যন্ত কাগজ পাঠান হয় না। অধিকন্তু ভি পি খরচ গ্রাহককেই দিতে হয়, সুতরাং মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠানই বাঞ্ছনীয়।

(৪) যে সপ্তাহে মূল্য পাওয়া যাইবে, সেই সপ্তাহ হইতে এক বৎসর বা ছয় মাসের জন্য কাগজ পাঠান হইবে।

(৫) কলিকাতায় হকারদের নিকট এবং মফস্বলে এজেণ্টদের নিকট হইতে প্রতিখণ্ড **"দেশ"** নগদ ৵০ দুই আনা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

(৬) টাকা পয়সা ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে **"দেশ"** কথাটি স্পষ্ট উল্লেখ করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণতঃ নিম্নলিখিতরূপ:—

সাধারণ পৃষ্ঠা

	১ বৎসর	৬ মাস	৩ মাস	১ মাস	এক সংখ্যার জন্য
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা	২৫৲	৩০৲	৩৫৲	৪০৲	৪৫৲
অর্ধ পৃষ্ঠা	১৩৲	১৬৲	১৮৲	২২৲	২৪৲
সিকি পৃষ্ঠা	৭৲	৯৲	১০৲	১২৲	১৪৲
⅛ পৃষ্ঠা	৪৲	৫৲	৬৲	৭৲	৮৲

এক বৎসর, ছয় মাস, তিন মাস বা এক মাসের জন্য এককালীন চুক্তি করিলে দরের তারতম্য হয়। বিশেষ কোনও নির্দিষ্ট স্থানে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে টাকা প্রতি চারি আনা হইতে আট আনা বেশী লাগে। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলে বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে জানা যাইবে।

বিজ্ঞাপনের 'কপি' সোমবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার মধ্যে **"আনন্দবাজার কার্যালয়ে"** পৌঁছান চাই। বিজ্ঞাপনের টাকা পয়সা এবং কপি ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন এবং মনিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে "দেশ" কথাটি উল্লেখ করিবেন।

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরত চাহিলে সঙ্গে ডাক টিকিট দিবেন। অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

সম্পাদক—"দেশ", ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশ

৮ম বর্ষ] ২৪শে ফাল্গুন, শনিবার, ১৩৪৭ সাল। Saturday, 8th March, 1941 [১৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

সেন্সাস ও বাঙলা—

সেন্সাস পর্ব শেষ হইল। কিন্তু বাঙলার ভয় কাটিল না, কারণ আদমসুমারীর ফলাফল কি দাঁড়ায় এবং তার পর সুবে বাঙলার সর্বময় কর্তা যিনি সেই হক সাহেব কখন কি করেন, কিছুই ঠিক নাই। গত ১লা মার্চ সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী জিগীর ছাড়িয়া বলিয়াছেন,—"আমি জীবনে কোন দিন কাহাকেও এবং কোন কিছুকেই ভয় করি নাই—ইহাতেও আমি বিন্দুমাত্র ভীত হই নাই। অতীতের ন্যায় এখনও যদি বাঙলায় অসাধুতাই জয়ী হয় এবং আদমসুমারীর নামে কতকগুলি হাস্যকর সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে আমি সুনিশ্চিতভাবে পাকিস্থানের সমর্থন করিব, তখন আমার বন্ধুরা দেখিতে পাইবেন যে, আমি জিতি না হারি। ঈশ্বর আমার সহায়, সকল চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিই আমার পশ্চাতে রহিয়াছেন; কাজেই ভয় করিবার মত আমার কিছুই নাই।" এক ঈশ্বর যাহার সহায়, তাহার আবার কিসের ভয়; কিন্তু বেচারা ঈশ্বরকে আজকালকার দিনে বড় কেহ পাত্তা দেয় না এবং ঈশ্বরের ভরসায় কেহ থাকে না, হক সাহেবও সে ভুল করেন নাই, তাই তিনি শাসাইয়া দেশের লোককে শুনাইয়া দিয়াছেন, সকল চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিই আমার পশ্চাতে রহিয়াছেন। চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা হক সাহেবের পিছনে যখন রহিয়াছেন, তখন হক সাহেবের বিরুদ্ধতা করিতে দাঁড়াইয়াছেন কাহারা? নিশ্চয়ই যাঁহারা চিন্তাশীল নয়, বুদ্ধিমান বলিয়াও যাঁহারা গণ্য হইতে পারে না তাঁহারাই। ইঁহারা কাহারা? তাহা না বুঝিলে তো হক সাহেবের বলাবল হিসাব করা যায় না; তাই হক সাহেব তাঁহার বিবৃতিতে সূত্রাকারে চিন্তাশীলতাহীন এবং বাঙলার অবুদ্ধিমানদের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'ব্যবহারজীবী, বৈমানিক, অধ্যাপক, রাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ এবং সকল জাতি ও শাখাজাতি একযোগে মিথ্যা কথা বলিতে এবং নিজেদের সংখ্যা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বিবৃতি দিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা জীবন ভরিয়া যুবকদিগকে শিক্ষাদান করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাও বিন্দুমাত্র বিবেকের দংশন অনুভব না করিয়া মিথ্যা বিবৃতি দিতেছেন এবং বাক্‌চাতুরী, মিথ্যা ও শঠতার আশ্রয় লইয়া মুসলমানদের সংখ্যা কমাইতে উদ্যত হইয়াছেন।' হক সাহেব বাক্‌চাতুরী, মিথ্যা ও শঠতা অবলম্বনকারীদের যে ফর্দ দিয়াছেন, তাহাতে বাঙলা দেশে বাদ পড়িল কে এবং কাহারা এই 'সকল চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিমান' বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য থাকিল, বুঝিতে যদি আপনাদের বেগ পাইতে হয়, তাহা হইলে হক সাহেবের বিবৃতির অনুবৃত্তি ধরিয়া আপনাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে এবং মুসলমানদের সংখ্যা কমাইতে যাঁহারা উদ্যত হইয়াছেন, এই উক্তির মধ্যে 'ব্যবহারজীবী, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক, রা ... াহ্মণ অব্রাহ্মণ, সকল

জাতি ও

অবলম্বনকা

বস্তুত হি

চাতুরী, মি

উক্তিতে

আমরা ম

প্ররোচনা

ভয়।

সমর্থন

অনিশ্চি

তিনি

করিতে

দের

কাছাব

ঊর্ধ্বে

থাকিবে কোথায়, আমরা ইহাই ভাবিতেছি। কারণ বাঙলা এবং পাঞ্জাব পাকিস্থানের এই দুই-ই তো প্রধান অঙ্গ, তাহার মধ্যে পাঞ্জাবের মন্ত্রী স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খান তো দেখিতেছি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্যই ব্যস্ত, শুধু কথায় নহে, কাজে সেই মিলন সার্থক করিবার জন্য তিনি বাজেটে মোটা টাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন; সুতরাং সুনিশ্চিতভাবে পাকিস্থানের সমর্থনে পাঞ্জাব মুল্লুকে সুবিধা হওয়া সুকঠিন; এদিকে বাঙলায়ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য পাকিস্থান প্রচেষ্টা পস্তাইবে।

স্বাধীনতার শত্রু কাহারা?—

জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলের চা-কর সাহেবদের রাজনীতির স্বরূপ সেন্সাস সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত দুইখানি গোপন পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই চিঠিতে এই আতঙ্ক প্রকাশ করা হইয়াছে যে, সেন্সাসে হিন্দুর সংখ্যা বাড়িলেই কংগ্রেসের প্রভাব বাড়িবে, আর কংগ্রেসের প্রভাব বাড়িলেই ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থ টলমল হইয়া উঠিবে; পক্ষান্তরে মুসলমানের আনুপাতিক হার বাড়িলে, মুসলমান মন্ত্রীর সংখ্যাও বাড়িবে এবং তাহার দ্বারা ব্রিটিশ কায়েমী স্বার্থের প্রভাবই বাড়িবে, এই তত্ত্বটি যেমন চা-বাগানের সাহেবেরা না ভুলেন এবং তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন—(১) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে দাবীই করুক, আসলে ইহা প্রধানত হিন্দু প্রতিষ্ঠানই। তবে সকল হিন্দুর মনোভাব ইহাতে প্রকাশ পায় না; (২) উক্ত কংগ্রেস ব্রিটেন এবং সর্বপ্রকার ব্রিটিশ বস্তুর প্রতি ভীষণ বিদ্বেষপূর্ণ। (৩) সেই কারণে তাহারা ব্রিটিশ সঙ্গীনের সাহায্যে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে দাবাইয়া রাখিতে চায়; (৪) শেষে ব্রিটিশের স্বার্থ বে-দখল করিয়া তাহাদের ভারত হইতে বহিষ্কৃত করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য; (৫) ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইউরোপে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে তোষণ নীতির ব্যর্থতা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে। কংগ্রেস সম্পর্কেও তোষণ নীতি বর্জন করিতে হইবে; (৬) বাঙলায় যখন সন্ত্রাস চলিতেছিল, তখন বড় বড় কংগ্রেসওয়ালারা প্রত্যক্ষভাবে তাহাতে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং ব্রিটিশ কর্মচারীর হত্যা সম্পর্কে প্রত্যেক শহরেই মহোৎসব পড়িয়া গিয়াছিল।

হিন্দুদের সংখ্যা যাহাতে 'যথাযথ' লিপিবদ্ধ হয়, সেই প্রেরণা প্রখর করিবার জন্যই যে কংগ্রেসের স্বার্থ এবং হিন্দু স্বার্থের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদকে জড়ান হইয়াছে, ইহা বুঝিতে কষ্ট পাইতে হয় না। চা-কর সাহেবেরা বুঝিয়াছেন, ভারতের স্বার্থ অব্যাহতভাবে শোষণ করিবার পথে কংগ্রেসের চেয়ে বড় শত্রু এবং মুসলীম লীগের চেয়ে বড় মিত্র আর কেহ নাই। কংগ্রেস চায় জাতির স্বাধীনতা, আর মুসলীম লীগের নীতির মুখ্য অর্থ হইল ব্রিটিশের গোলামি। ভারতের স্বাধীনতার শত্রু হিসাবে মুসলেম লীগ এবং শ্বেতাঙ্গ স্বার্থসেবীদের মধ্যে এই হিসাবে [illegible] রহিয়াছে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতাকে দাবাইয়া, ভারতের দুর্দশাকে দাসত্বের মধ্যে চিরন্তন করিয়া যাঁহারা এইভাবে হীন স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, একটা জাতিকে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ফাঁকা দোহাই দিয়া দীর্ঘকাল মাতৃভূমির স্বাধীনতার বিরোধী করিয়া রাখা যায় না। জগতের হাওয়া বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। ক্রীতদাসের ঘৃণিত জীবন বহন করিতে তরুণ ভারত আর রাজী নয়।

ভারত সরকারের বাজেট—

গত ১৬ই ফাল্গুন ভারত সরকারের নূতন বাজেট ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে উপস্থিত করা হইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালে ভারত সরকারের এই বিলে কুড়ি কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ঘাট্‌তি হইবে বলিয়া অর্থসচিবের অনুমান। হিসাবের বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে আমরা যাইতে চাহি না। প্রতি বৎসরেই আমাদের ঘাড়ে করের বোঝা পড়িতেছে, এ বৎসর কি পড়িল, ইহাই আমাদের জানা দরকার। গত বৎসর শতকরা ৫০৲ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত লাভকর ধার্য হইয়াছিল, রেলের মাশুল বৃদ্ধি পাইয়াছিল, পেট্রলের উপর এবং চিনির উপর শুল্ক বৃদ্ধি হইয়াছিল। গত নবেম্বর মাসে অতিরিক্ত বাজেট উপস্থিত করিয়া ডাক ও টেলিগ্রামের মাশুল বৃদ্ধি করা হইয়াছে, আয়কর ও কর্পোরেশন ট্যাক্সের উপর শতকরা ২৫৲ টাকা অতিরিক্ত সারচার্জ চাপিয়াছে। এখন আবার অতিরিক্ত লাভকরের উপর শতকরা ৫০৲ টাকার স্থলে ৬৬৲ টাকা এবং আয়কর প্রভৃতির উপর সারচার্জ বৃদ্ধি করা হইল। দিয়াশলাইয়ের উপর উৎপাদন শুল্কের হার দ্বিগুণ হইল। কৃত্রিম রেশমের উপর আমদানী শুল্ক পর্যন্ত প্রতি তিন আনার স্থলে পাঁচ আনা হইল এবং রবারের টায়ার ও টিউবের উপর মূল্যের শতকরা দশ টাকা হিসাবে উৎপাদন শুল্ক বসিল। এইবার অনুমান করুন ব্যাপার কি? অর্থসচিব আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, দিয়াশলাইয়ের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধির জন্য খরিদ্দারদের কাছে দিয়াশলাইয়ের দর বাড়িবে না; কিন্তু এ উক্তির যাথার্থ সকলেই সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতেছেন। সরকারী মূল্য নিয়ামকই দিয়াশলাইয়ের দর চড়া হারে বাঁধিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রশ্ন উঠিবে এই যে, সরকারের বেহুদা ব্যয় সকল দিক হইতে কমাইয়া তার পর কি এই করবৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া হইয়াছে? এই দুর্দিনে গরীবের ঘাড়ে বোঝা বাড়াইবার আগে সে বিবেচনা কি করা উচিত ছিল না; কিন্তু ভারতের সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন চিরকালই অবান্তর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। 'লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন', এই নীতিই হইল ভারতের কর্তাদের নীতি এবং ভারত যতদিন পরাধীন থাকিবে, ততদিন ভারতের 'গৌরী সেন'রূপী গরীবদের দোহন-ক্রিয়াই চলিবে।

কমলা নেহরু হাসপাতাল—

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদে স্বর্গীয়া কমলা নেহরুর

স্মৃতিরক্ষাকল্পে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী হাসপাতালের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয়া কমলার পাতিব্রত্য, তাঁহার স্বদেশপ্রেম এবং অকুতোভয় আত্মবদান ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার পথ কুসুমে আস্তৃত নয়, তাহা ত্যাগী সন্তানের হৃদয়ের শোণিতে চর্চিত। স্বর্গীয়া কমলা ভোগৈশ্বর্যের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া এবং ঐশ্বর্যশালী সমৃদ্ধ পরিবারের বধূ হইয়াও ভারতের পুণ্যশ্লোকা মহিলাদের আদর্শ অনুসরণ করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে যোদ্ধা তাঁহার স্বামীর দুঃখব্রতের সঙ্গিনীরূপে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং সেই দুঃখব্রতের উদ্‌যাপনেই তিনি আত্মদান করিয়া গিয়াছেন। অপরিম্লান ত্যাগের মহিমায় উদ্দীপ্ত তাঁহার জীবন। কমলার আদর্শ ভারতের মহিলা-সমাজে স্বাধীনতার সাধনায় নূতন উদ্দীপনা আনিয়া দিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম হইতে ভারতের নারী আর দূরে নাই। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মহিলাদের সেবার জন্য এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার দ্বারা এই মহিয়সী মহিলার উপযুক্ত স্মৃতিরই ব্যবস্থা হইয়াছে। এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা চাঁদা চাওয়া হইয়াছিল; সংগৃহীত হয় পাঁচ লক্ষ দশ হাজার টাকা। কিন্তু এমন বিরাট প্রতিষ্ঠানের জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন। আমরা আশা করি, এমন মহদুদ্দেশ্যে অর্থের অভাব হইবে না।

সত্যনিষ্ঠার নমুনা—

সম্প্রতি পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় শ্রমিক সদস্য মিঃ সোরেনসেনের প্রশ্নের উত্তরে ভারতের নীতি সম্বন্ধে বিলাতের কর্তাদের একটা কারসাজী ধরা পড়িয়াছে। সোরেনসেন সাহেব এই অভিযোগ করেন যে, ভারতের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত প্রকৃত সংবাদ চাপা দিয়া সুকৌশলে রচিত একদেশদর্শী ও ভ্রান্তিকর কতকগুলি 'নোট' বক্তাদের ব্যবহারের জন্য পার্লামেণ্টের সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হইতেছে। ভারতসচিব এমন 'নোটের' কথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই এবং নোটগুলি যে নির্ভুল বা নির্দোষ, এমন কথাও সরাসরি বলিবার সাহস তিনি দেখান নাই; তিনি কিছু আমতা আমতা করিয়া বলেন যে, নোটগুলির অন্তর্গত খুঁটিনাটি বিষয়গুলি সংশোধন করা হইতেছে। কিন্তু এই সব ছেঁদো কৈফিয়ৎ সত্ত্বেও প্রশ্নোত্তর হইতে ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতারা যে সব বিবৃতি পাঠাইতেছেন, পার্লামেণ্টের সদস্যদিগের কাছে সেগুলি যেমনটি তেমনভাবে দেওয়া হইতেছে না, তাহার উপর কর্তাদের কিঞ্চিৎ কারিগরী চলিতেছে। অন্য পক্ষে জিন্না সাহেবের সম্পর্কে হইয়াছে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। মিঃ পার্কারের প্রশ্নের উত্তরে আমেরি সাহেব বলেন, মন্ত্রিগণ সম্প্রতি মিঃ জিন্নার পত্র পড়িয়াছেন এবং সে পত্রের বিবৃতিও অবিকৃতভাবেই প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, এই পত্রে লীগের দাবী বর্ণনা করিয়া মিঃ জিন্না কংগ্রেসের দাবী অগ্রাহ্য করিতে বলিয়াছেন। মিঃ জিন্নার বিবৃতি যে ঠিক উহাই এবং উহা অবিকৃত উক্তি মিঃ জিন্নাও তাহা সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কারসাজী প্রয়োজন হইতেছে, শুধু জিন্না ব্যতিরিক্ত অন্যান্য নেতাদের বিবৃতির বেলায়। ইহার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট, ভারতের স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসনে ব্রিটিশ রাজনীতিকদের আন্তরিকতারই ইহা প্রমাণ।

বিক্রয় করের প্রতিবাদ—

গত মঙ্গলবার নিখিল বঙ্গ বিক্রয় কর প্রতিবাদ দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। বাঙলা দেশের মন্ত্রিমণ্ডল জনমতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। নিজেদের মতলব-বাধা স্বার্থসংবদ্ধ দলের জোরেই এখানে মন্ত্রীরা বলীয়ান, পিছনে আছেন শ্বেতাঙ্গ স্বার্থবাহের দল। জনমতের মূল্য যদি এখানে কিছু থাকিত, তাহা হইলে বিক্রয় কর বিলের ন্যায় জনস্বার্থবিরোধী ব্যবস্থা নিতান্ত অনাবশ্যক রকমে তাঁহারা উপস্থিত করিতে সাহসী হইতেন না। অনাবশ্যক বলিতেছি এই হিসাবে যে, জাতি গঠনমূলক সুনির্দিষ্ট কোন কর্মপ্রণালী তাঁহারা দেশের লোকের কাছে এ পর্যন্ত উপস্থিত করিতে পারেন নাই। কর বৃদ্ধি করিবার জন্যই, এ যেন কর বৃদ্ধি। বাঙলায় জনসাধারণ নানারকম করভারে এমনই প্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাদেশিক সরকার ট্যাক্স চাপাইয়াছেন বহু দিক হইতে ইতিপূর্বে তাঁহাদের ঘাড়ে, তার উপর ভারত সরকার যেখানে যেটুকু রস আছে, নিংড়াইয়া, শুষিয়া লইতে কসুর করিতেছেন না। যুদ্ধের বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ রকমে মন্দা। এই মন্দার বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর ইনকাম ট্যাক্স আছে, সুপার ট্যাক্স আছে, সারচার্জ আছে, অতিরিক্ত লাভের উপর ট্যাক্স আছে, এক্‌সাইজ ট্যাক্স আছে, প্রফেসনাল ট্যাক্স আছে, ইহার উপর যদি আবার চাপে বিক্রয় কর, তবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যে যাহারা কিছু করিয়া খাইতেছিল, তাহারা আর বাঁচিবে না। সেই সঙ্গে গরীব খরিদ্দারদের জীবনও এই দুর্মূল্যের দিনে দুর্বহ হইয়া উঠিবে। কিন্তু মন্ত্রীদের সেজন্য চিন্তা নাই। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সাম্প্রদায়িকতার 'পান' দেওয়া দিব্য দো-ধারা করাত চালাইতেছেন, তাঁহার বিবৃতির ভিতর দিয়া। সে সব বিবৃতির এমনই তাৎপর্য যে, প্রতিবাদ না করিলেও তাহা কাটিবে এবং প্রতিবাদ করিলে বিবৃতির সে করাত উল্টা টানে আরও বেশী করিয়া কাটিবে। সুতরাং সেই সুকৌশল তাঁহার হাতে থাকিতে তাঁহার মন্ত্রীগিরি খসায় কে এবং তাঁহার অনুগত অন্যান্য মন্ত্রীরা, তাঁহারা মুসলমানই হউন, আর হিন্দুই হউন, প্রধান মন্ত্রীর এই বিশেষ-নীতি প্রয়োগ কৌশলের বলেই মজা লুটিতে

থাকিবেন। মুসলমান মন্ত্রীদের চিন্তা নাই, তাই হক সাহেবের রায়েই তাঁহারা সায় দিতেছেন, হিন্দু মন্ত্রীদেরও হিন্দুদের মতামতের জন্য কোন চিন্তা নাই, তাই সমগ্র হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে অবাচ্য বাক্য মোড়লের মুখে শুনিয়াও তাঁহাদের কানে মধু বর্ষণই হইতেছে। তাঁহারা জানেন, এজন্য তাঁহারা হিন্দু সমাজের কাছে অপদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও, তাঁহাদের পক্ষে পরম পদার্থ প্রাপ্তিতে কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না। কারণ, তাঁহাদের মধ্যে পদার্থ থাকিলে তাঁহারা মৌলবী ফজলুল হকের সর্বশেষ বিবৃতির পর, বিশেষভাবে ৬ই মার্চ কলিকাতা টাউন হলে যে সভা হইয়াছে, সেই সভায় জনমতের সুতীব্র অভিব্যক্তির পরও কিছুতেই অক্ষত বিবেকে মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন না। জানি, অতীতের অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিয়াছি, আত্মমর্যাদা বুদ্ধির লেশমাত্র তাঁহাদের মধ্যে নাই; জনমতকেও তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও জনমতের কাছে একদিন তাঁহাদিগকে জবাবদিহি হইতেই হইবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমতের জাগরণই একটা বিশেষ আশার কথা।

আদর্শ বিজ্ঞান সাধনা—

ইনসুলিনের আবিষ্কর্তা স্যার ফ্রেডারিক ব্যাণ্টিং সম্প্রতি নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়াছেন। তাঁহার বিজ্ঞান সাধনার ফলে মানব সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। এমন বিজ্ঞান সাধনাই সার্থক। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে, স্যার ফ্রেডারিক বিষাক্ত গ্যাস হইতে আত্মরক্ষার একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং এই আবিষ্কারের সাফল্য পরীক্ষা দ্বারা প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি ইংলণ্ডে গমন করিতেছিলেন। দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহার আবিষ্কারের ফল হইতে মানব সমাজ বঞ্চিত হইবে না। তিনি ঐ প্রক্রিয়া অপরকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। পশুবলে উদ্ধত বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্র প্রয়োগের যুগেও স্যার ফ্রেডারিকের এই মানব-মঙ্গল সাধনা তাঁহার স্মৃতিকে চিরদিন জাগরূক করিয়া রাখিবে।

সাহিত্যের আদর্শ—

সম্প্রতি কয়েকটি সাহিত্য সম্মেলন হইয়া গেল; তন্মধ্যে বীরভূম সাহিত্য সম্মেলন, এলাহাবাদ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন এবং মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি সম্মেলনের সভাপতি এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিগণ সুচিন্তিত এবং সারগর্ভ আলোচনার দ্বারা সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছেন এবং বিশিষ্ট মনীষিবৃন্দ আলোচনায় যোগ দিয়া সংস্কৃতির সম্প্রসারণে সাহায্য করিয়াছেন। মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুত অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয় সাহিত্যে স্বাধীনতার দাবী করিয়াছেন। তাঁহার মত আমরাও সমর্থন করিয়া বলি, সাহিত্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতারই রাজ্য, পরাধীনতার প্রতিবেশ-প্রভাবে প্রকৃত সাহিত্য ফুটে না; কিন্তু এই স্বাধীনতার অর্থ হইল অহঙ্কৃত বিচারকে অতিক্রম করিয়া আত্মানুভব, সোজা কথায় বৃহতের সঙ্গে, দেশের সঙ্গে, দশের সঙ্গে যোগ; সুতরাং সমাজের হিতের সঙ্গে সাহিত্যের এই দিক হইতে বিরোধ থাকে না। যেখানে পরধর্ম, পরানুকরণ—বস্তু যেখানে সহজ নয়, প্রকৃতপক্ষে যেখানে সাহিত্য সাহিত্যই নয়, বিরোধ ঘটে সেইখানেই। সাহিত্য যে 'জনকয়েকের ফলার হচ্ছে, জনসাধারণের পাতে পেঁছাচ্ছে না' এইখানেই আমাদের বেদনা।

ভারত ও বর্তমান যুদ্ধ—

ভারতসচিব মিঃ আমেরী লণ্ডনের ভোজসভার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, বুলগেরিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জার্মানির ট্যাঙ্ক ও কামানের গুরু গুরু গর্জন ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। এই ঘটনার মধ্যেই সারা বিশ্বের নাট্যমঞ্চে একটি নূতন অঙ্কের সূচনা করিয়া যবনিকা উত্তোলিত হইতেছে। আমাদের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আঘাত দিবার আশঙ্কা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে সত্য; কিন্তু তদপেক্ষা আশঙ্কার বিষয় এবং ঘোরতর বিপদ হইল মর্মস্থলে আঘাত হানিবার উদ্যোগ ক্রমেই আমাদের ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। মিঃ আমেরী যে কথা বলিয়াছেন, ভারতের সম্বন্ধেও সে কথা প্রযোজ্য। সম্প্রতি জোড়হাটের যুদ্ধ কমিটির এক সভায় বক্তৃতাকালে আসামের গভর্নর স্যার রবার্ট রীড ভারতের উপর জাপানীদের আক্রমণের আশঙ্কার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, দূরত্ব এত বেশী যে, জাপানের পক্ষে সিঙ্গাপুর ছাড়া অন্য স্থান আক্রমণ করা কঠিন হইবে। কিন্তু সে যদি তেমন চেষ্টা করে, তাহা হইলে যুদ্ধ পূর্বাপেক্ষা ভারতের কাছে ঘেঁসিয়া আসিবে। জাপান তখন ডিব্রুগড় এবং তিনসুকিয়ার তেলের কলগুলির উপর হানা দিতে পারে। কিন্তু তেমন ক্ষেত্রেও ভারতের লড়াই চূড়ান্ত হইবে, ভারত হইতে বহু দূরে। সে লড়াই হয় সিঙ্গাপুরে, অথবা তুরস্কের সীমান্তে হইবে। যুদ্ধ ভারতের নিকটবর্তী হইতেছে, এমন আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট। গত সোমবার কলিকাতায় নিষ্প্রদীপের মহড়া হইয়া গিয়াছে এবং এখনও অনির্দিষ্টকালের জন্য দীপালোক সঙ্কোচের ব্যবস্থা চলিতেছে। শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমণ করিতে আসিলে কিরূপে সতর্কতা অবলম্বনের সঙ্কেত বংশী ধ্বনিতে জানান হইবে, কলিকাতা, কলিকাতার শহরতলী এবং চট্টগ্রাম শহরের অধিবাসীদিগকে তাহা বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে। এ সব ব্যবস্থা আত্মরক্ষার একটা দিক মাত্র। অন্য উপায়েও সে সব ব্যবস্থা কি হইতেছে? বিমানবিধ্বংসী কামান এক্ষেত্রে আত্মরক্ষার মুখ্য অস্ত্র। ভারতে ইহা নির্মাণ করিতে এবং ইহার ব্যবস্থায় দেশের লোককে সুশিক্ষিত করিতে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, দেশের লোক ইহাই জানিতে চায়; কারণ তাহা না হইলে আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

আত্মবৎ সর্বভূতেষু

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

পাশাপাশি দুখানা ঘরে বাস করে দুজন গৃহস্থ। একজনের বাড়ি চট্টগ্রাম, আর একজনের বাড়ি শান্তিপুর।

প্রথমটায় এই ঘরখানায় আসে রতিনাথ, সঙ্গে তার মেয়ে ক্ষ্যান্ত, শান্তিপুরের অধিবাসী, কথাগুলো বলে টেনে টেনে একটু পেঁচিয়ে, সরল সহজ করে কোনদিনই কথা বলে না। কথায় কথায় গালে হাত দিয়ে বিস্ময়ে দুই চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে থাকে।

এই পরিবার আসার বৎসরখানেক পরেই পাশের ঘরে এলো সন্তোষ।

খাঁটি চট্টগ্রামের লোক, কথার উচ্চারণ আর অস্পষ্ট, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি। সম্পূর্ণ একা সে, কিন্তু এখানে এসে সম্প্রতি সে সঙ্গী হিসাবে একটা বিড়াল পেয়েছে এবং কাজ কর্মের অবসরে তাকে নিয়েই এখন স্বচ্ছন্দে তার দিন কাটে।

মাস দুই আগেকার কথা—

একদিন এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত সন্তোষ বাড়ি ফিরছিল—পথের ধারে একটা ঝোপের পাশে ছোট্ট বাচ্চা ডলি অত্যন্ত নির্জীবভাবে পড়েছিল। এতটুকু একটি বাচ্চা, অত্যন্ত শীর্ণ, অত্যন্ত দুর্বল, নড়বার ক্ষমতাও যেন তার ছিল না। সন্তোষ চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, তারপর চলে যেতে উদ্যত হয়ে যে মুহূর্তে পা বাড়িয়েছিল, সেই মুহূর্তে কানে ভেসে এল সেই এতটুকু বিড়ালছানার করুণ আর্তনাদ—"মিউ অর্থাৎ—এলে যখন, একা চলে যাচ্ছ কেন?

সন্তোষ ফিরে এল, অতি সন্তর্পণে তাকে কোলে তুলে নিলে, তারপর হন হন করে ঘরে এল।

সেই ডলি আজ মানুষ হয়েছে।

তার দিব্য নধর চেহারার পানে তাকালে মনে হয়, হ্যাঁ, ডলি যত্ন পায় বটে। বেচারা সন্তোষের আগে সংসার বলে কোন বালাই ছিল না, বর্তমানে ডলি তাকে সংসারের অস্তিত্ব বুঝিয়েছে; আগে কেবল ডাল আলুসিদ্ধ ভাত খেয়ে সন্তোষের দিন চলত, আজকাল মাছ তাকে আনতেই হয় এবং ডলির জন্য রাঁধতেও হয়। সে হিসাবে এই দেড়মাসের মধ্যে যে সন্তোষের চেহারাও ফিরেছে, এ কথা যে দেখবে, সেই বলবে।

এ পাশের ঘরে বিধবা ক্ষ্যান্ত উনানে ভাত বসিয়ে দিয়ে বঁটি পেতে তরকারী কুটতে বসে, ও পাশের ঘরের মাছের গন্ধ নাকে এলে সে নাকে আঁচল চাপা দেয়; চেঁচিয়ে ওঠে—"মাগো, গন্ধে মলুম। ভাল আপদ হয়েছে, এ ঘরে থেকে জাত-জন্ম আর রাখা চলে না দেখছি।"

ও পাশের ঘরে বেচারা সন্তোষ কুঁকড়িয়ে এতটুকু হয়ে যায়।

মাছের গন্ধে জাত-জন্ম যায়—ও ঘরের প্রতিবেশিনী চোখে দেখতে না পেলেও কথাগুলো বুঝতে পারে সে বিধবা।

সন্তোষ মনে করে, সে আর মাছ আনবে না, অনর্থক বিধবা মেয়েটির জাত-জন্ম ঘুচাবে না, কিন্তু রাতটা গেলেই ডলির দিকে তাকিয়ে সে আগের দিনের কথা ভুলে যায়, চুপি চুপি আবার দুই পয়সার মাছ কিনে ফেলে। ভাজতে গেলে গন্ধ ছাড়বে ভয়ে সিদ্ধ করে নেয় মসলা দিয়ে; মুখে স্বাদ না লাগলেও কেবলমাত্র বিধবার ধর্মরক্ষার জন্য তাই অম্লানমুখে খায়।

কিন্তু কথাই আছে বিড়াল জাত।

ওদের এ পর্যন্ত কেউ বেঁধে পুষতে পারে নি এবং একটু বয়োপ্রাপ্ত হ'লেই চৌকাঠ ডিঙায়, তারপরে এ বাড়ি, ও বাড়ি ঘুরতে সুরু করে—শেষে এপাড়া ওপাড়া পর্যন্ত অবহেলায় পাড়ি দেয়। হয় তো সে ছোট জাত, তার উপর চট্টগ্রামে বাড়ি, শান্তিপুরের লোক অর্থাৎ ক্ষ্যান্তর সেজন্য আক্ষেপের, তাচ্ছিল্যের শেষ নাই।

প্রথমেই সে পিতার কাছে খবর নিয়েছে চট্টগ্রাম কোথায়, তারপর প্রায়ই রাত্রে পিতাকে ভাত দিয়ে কাছে বসে মুখ বিকৃত করে বলে, "এখান হতে বাসা বদলাও না বাবা, আর ঘর পাওয়া যায় না?"

রতিনাথ জিজ্ঞাসা করে—"কেন, এখানে থাকতে কি অসুবিধাটা হচ্ছে শুনি?"

ক্ষ্যান্ত বলে, "আমরা হলুম শান্তিপুরে লোক, আমাদের সম্বন্ধ এই অঞ্চলের লোকদের সঙ্গে, ঐসব চাঁটগায়ের লোকের সঙ্গে আমাদের কি মিলতে পারে—ছ্যা।

সে এমনভাবে ছ্যা কথাটা উচ্চারণ করে, যাতে পাশের ঘরে সন্তোষ একেবারে মরমে মরে যায়, সেই মুহূর্তে তার মনে হয়, সে যদি চট্টগ্রামে না জন্মে শান্তিপুরে জন্মাত, হয়তো ঐ মেয়েটির কাছে তার অনেকখানি মর্যাদা থাকত।

পর মুহূর্তেই সে সচকিত হয়ে ওঠে—

চট্টগ্রাম আর চট্টগ্রাম—সে যদি এই শান্তিপুরের পরি-বারকে একবার দেখে নেওয়ার সুযোগ পায়, বুঝিয়ে দেবে ওদের চেয়ে সে কতখানি উঁচুতে।

ইচ্ছা ক'রেই এ পাশের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সে আলাপ করে নি। প্রৌঢ় রতিনাথ সারাদিন ধরে রেলওয়ে কোম্পানীর স্টোরে কাজ করে সন্ধ্যার সময় শ্রান্তভাবে ঘরে ফিরে এসে শুয়ে পড়ে, তখন একটু নিশ্চিন্তভাবে চোখ মুদে সে তামাক খায়। পাশের ঘরে বা আশে পাশে যে কেউ থাক না কেন, তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার প্রবৃত্তি কোনদিন তার জাগে নি। রবিবারদিনটা ছুটি থাকলেও সে বার হয় না, পরম নিশ্চিন্তভাবে তামাক খেয়ে ও ঘুমিয়ে সে ছুটির সদ্ব্যবহার করে।

কিন্তু যুবক সন্তোষ সে রকমভাবে ছুটি উপভোগ করতে পারে না। সে রাঁধে রাত্রে, একেবারে পরদিন দুপুরের জন্যে ভাত তরকারী রেখে দেয়, কারণ ভোর ছয়টায় কাজে বার হয়ে দুপুরে এক ঘণ্টার ছুটি পেলেও সে সময়টুকুর মধ্যে

রান্না করা চলে না, কাজেই রাত্রে রেঁধে রাখতে হয়। ডলিকে ঘরে খাইয়ে বন্ধ করে রেখে সে কাজে যায়, দুপুরে ফিরে তাকে স্নান করান, খাওয়ান কাজ করতে হয়, নিজের স্নানাহারও সারতে হয়।

সন্ধ্যার সময় ফিরে সে ডলিকে নিয়ে খানিক ঘুরে আসে, গল্প ক'রে আসে, তারপর রান্না সারা হয়।

যতদিন ডলি ছোট ছিল, তাকে নিয়ে জ্বালা পোহাতে হয় নি, কিন্তু ক্রমেই ডলির অত্যাচারে ও লোকের নালিসে তার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবার দিন এসেছিল।

সেদিন বাড়িতে ফিরেই সে পাশের ঘরে খুব তর্জন গর্জন শুনতে পেলে; সে তর্জন গর্জন যে তাকে লক্ষ্য করেই হচ্ছে, তা বুঝতে তার দেরী হয় নি।

"আদর করে বেড়াল পোষা হয়েছে, অথচ পুষে রাখবার ক্ষমতা নেই। আজকাল রোজ ওদের ডলি বেড়াল আমাদের ঘরে আসতে সুরু করেছে বাবা,—প্রথম প্রথম ভাবতুম, যাক গে, দুটো ইঁদুর মেরে যাবে, ক্রমে আস্কারা পেয়ে বেড়াল একেবারে মাথায় উঠে বসেছে। আজ কি না স্বচ্ছন্দে ঐ পাঁচিল টপকে এসে যা কিছু ছিল, সব উল্টে পাল্টে নষ্ট করে খেয়ে গেছে।

মৃদুকণ্ঠে রতিনাথ কি বললে শোনা গেল না। ক্ষ্যান্তর তীব্রকণ্ঠস্বর শোনা গেল, "না, আমি তোমার ওসব কথা শুনব না বাবা, তুমি তোমার ওই পাশের ঘরের লোকটাকে সাবধান করে দিয়ো। ফের যদি আবার ওর বেড়ালকে আমাদের দিকে আসতে দেখি আমি কিন্তু ওর পা খোঁড়া করে দেব।"

বেচারা ডলি, নির্দোষ ডলি—

সন্তোষের ইচ্ছা হল সে চীৎকার করে জানিয়ে দেয়—ইঁদুর ধরতে গিয়ে যদি ভাতের হাঁড়ি কড়া উল্টে গিয়ে থাকে, তা বলে ডলি যে সেই নিরামিশ ভাত তরকারী খেয়ে এসেছে একথা সে কিছুতেই স্বীকার করবে না; নিরামিশ ভাত তরকারী ডলি ঘৃণা করে, মুখে দেওয়া দূরে থাক, তার দিকে চেয়েও দেখে না।

বলা যেতো, কেবল আবার চট্টগ্রামের নামে ধিক্কার শুনবার ভয়ে কোন কথা বলা হলো না; নির্দোষ ডলি তার পায়ের কাছে পড়ে ঘোঁত ঘোঁত করে নিশ্চিন্তভাবে ঘুম দিতে লাগলো, সন্তোষ কেবল ভাবতে লাগলো—কি করা যায়।

অবশেষে সম্পূর্ণ ভালোমানুষ রতিনাথকে বার হতেই হল—ক্ষ্যান্তর তাড়না আর সহ্য করা যায় না।

সে দিন ছিল রবিবার—সন্তোষ গামছায় করে বাজার নিয়ে ফিরছে। সেই গামছায় যে মাছও আছে তাতে রতিনাথের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

নেহাৎ অসহ্য হওয়াতেই রতিনাথ বার হয়েছে, সন্তোষও নিজের ঘরের দরজার মাঝামাঝি জায়গায় তার প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে অবিশ্রান্ত তামাক টানছিল।

"বলি ও—ওহে ছোকরা—"

বলেই রতিনাথ অবাধ্য জিহ্বাটাকে সামলে নিলে। "ও মশাই—একটা কথা আছে—"

"আমাকে বলছেন—" বলে সন্তোষ থমকে দাঁড়ালো।

রতিনাথ বললে, "কেউ যখন নেই তখন তোমাকেই বলা হচ্ছে জানা উচিত। আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, তোমায় তুমি বলে কথা বলছি বলে মনে কিছু করো না যেন। হ্যাঁ, আমি আজ নিজেই তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলুম—"

এ আলাপ করার হেতু কি তা সন্তোষ এক আঁচেই বুঝেছে; আজ ছয় মাস একটা দেয়াল এবং উঠানের ছোট্ট একটা পাঁচিলের ব্যবধানে তারা বাস করে আসছে, এতদিনের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচয় করার সুবিধা হয় নি, পরোক্ষভাবে তাঁর কন্যা এ পর্যন্ত নির্বিরোধ আক্রমণ চালিয়ে এসেছে—অপর পক্ষ থাকতো সম্পূর্ণ নির্বিকার, একেবারেই নিস্তব্ধ। এই যে প্রত্যক্ষ পরিচয় আজ হচ্ছে এর মূলে যা আছে তা বোঝা সন্তোষের পক্ষে কঠিন নয়।

রতিনাথ পাঁচটা কথা তুললে,—তার বাড়ি কোথায়, নাম কি, সুদূর চট্টগ্রাম হতে এখানে এই আসানসোলে কেন কাজ করতে এলো ইত্যাদি অনেক প্রশ্নই সে করলে।

নিজের পরিচয়ও এরই ফাঁকে নিজের অজ্ঞাতে কখন প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল তা সে বুঝতেও পারেনি। নানা কথার পর এলো বর্তমান জগতের কথা,—"হ্যাঁ, বাজার করা হল বুঝি? কি কেনা হল?"

সন্তোষ বিড় বিড় করে কি বললে বোঝা গেল না—এটুকু বোঝা মুস্কিল হল না যে, মাছও এসেছে।

রতিনাথ গম্ভীরমুখে বললে, "সবই তো ভালো বাপু, তোমার বেড়ালটা ভারি মুস্কিল করছে। আজই সকালে ক্ষ্যান্তর মাথার বালিসের কাছে জলজ্যান্ত একটা মাছের কাঁটা পড়ে আছে দেখলুম, এতক্ষণে তার সব বিছানা কাচা হল। এ রকম করলে হিঁদুর ঘরের বিধবার জাতজন্ম কি থাকতে পারে, জিজ্ঞেস করি? তোমাদের দেশে আচার বিচার কিছু নেই বুঝি?"

সন্তোষ অকস্মাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো—"না, যত আচার বিচার আইন কানুন সব আছে তোমাদের সেই ধাবধাড়া গুবিন্দিপুর শান্তিপুরে, চাটগাঁয়ে কিছু নেই। যেয়ো একবার চাটগাঁয়ে—তোমাকে দেখিয়ে দেব কত শান্তিপুর চাটগাঁয়ের পায়ের তলায় লুটোপুটি খায়।"

দুমদাম করে পা ফেলে সে নিজের ঘরের ভিতর চলে গেল, নিতান্ত ভালোমানুষ রতিনাথ আশ্চর্য হয়ে শুধু তাকিয়ে রইলো।

আজ ঘরে সন্তোষ নীরব রইলো না, নিজের দেশের সত্ত্বা বজায় রাখবার জন্য সে একাই চেঁচিয়ে, কথা বলে, অবশেষে হাত হতে বাটি, বালতি ফেলে চারিদিক শব্দায়িত করে তুললে, যাতে করে ও ঘরের ক্ষ্যান্ত পর্যন্ত থতমত খেয়ে গেল, আর রতিনাথ পরম বিস্ময়ে বললে, "এ, ছোকরা ক্ষেপে গেল না কি?"

এরপর দুপুরে আহারাদির পর্ব শেষ করে রতিনাথ একটু দিবানিদ্রা দেওয়ার উদ্যোগ করছিল, তখন ওঘরে গানের সুর উঠেছে—"ও ওরে সাবধানি পথিক, বারেক পথ ভুলে মর ঘুরে—এ এ, এ—"

ক্ষ্যান্ত অবাক হয়ে গালে হাত দিলে, লোকটা সত্যই পাগল হয়ে গেল না কি? আজ ছয় মাসের মধ্যে যার মুখের একটি কথা পর্যন্ত কানে আসেনি সে আজ গান গায়—কি আশ্চর্য!

এরই মাঝে ডাক শোনা যায়—"ডলু—"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিড়ালটা যেন উত্তর দেয়—"মিউ—"

ক্ষ্যান্ত দাঁতের পরে দাঁত রাখে।

ও ঘরের লোকটা যেন তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, "সত্যি বল তো ডলি, রুই মাছের ঘিভরা মুড়ো খেতে ভালো, না আলু বেগুনের তরকারী খেতে ভালো? কেমন লাগলো খেতে তাই বল—একেবারে কাঁটাশুদ্ধ তো খেয়েছিস, হজমও করিস, তবু কেন যে পরের বাড়ির বেগুন তরকারী খেতে যাস তা তো বুঝি নে। ওর যদি কোনদিন নালিশ শুনি তা হলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন বুঝিয়ে দেব হতভাগা—"

সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালটা বিকট রবে চেঁচিয়ে ওঠে, মনে হয় তার মনিব তার লেজ কিম্বা কান সজোরে আকর্ষণ করেছে।

এরই একটু পরে আশ্চর্য হয়ে ক্ষ্যান্ত দেখলে পাঁচিল ডিঙিয়ে বিড়ালটা ঝুপ করে নেমে পড়লো—কেমন যেন ভয়ার্ত ভাব তার চোখে,—আস্তে আস্তে সে এসে বসলো বেঞ্চের তলায়।

মনিবের কাছে বেচারা আজ উৎপীড়ন সহ্য করেছে তাই পালিয়েছে।

অকস্মাৎ ক্ষ্যান্ত যেন তার পরে সদয় হয়ে উঠলো।

বেচারা বিড়াল, নিতান্ত অবোলা জাতি, তার পরে এ রকম নির্যাতন কোন হৃদয়বান মানুষ করতে পারে? বিড়ালকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তোলা হয়েছে কাজেই সে এখন আত্মবৎ সর্বভূতেষু করে সব জায়গায় বেড়াচ্ছে—সেই হেতু বিড়ালের মনিবকে কথা শুনতেই হবে, বিড়ালকে কথা শুনতে হবে না। যার বিড়াল পুষবার ক্ষমতা নেই, সে পোষে কেন—মোট কথা এইটুকু।

আজ প্রথম ক্ষ্যান্ত ডলির পানে তাকাল।

না, চেহারাটা ভালো, বেশ লোম আছে, চোখ দুটো ভারি সুন্দর।

কি জানি কেন—ক্ষ্যান্তর আজ প্রথম ইচ্ছা জাগলো সে বিড়ালটাকে কোলে নেবে, তাকে পোষ মানিয়ে মনিবের সর্বনাশ করতে শিখাবে।

বিড়ালটাকে সে আস্তে আস্তে ডাকলে—এলোনা দেখে সে নিজেই তার কাছে এগিয়ে গেল; তারে গায়ে সাহস করে হাত দিলে, তারপর তাকে কোলে টানতে গেল।

নিমকহারাম বিড়াল—ঠিক মনিবের প্রকৃতিই আর কি। ক্ষ্যান্তর আদর সে বুঝলে না—ম্যাও করে একটা বিকট শব্দ ছেড়ে সে আঁচড়ে কামড়ে ছুটে পালিয়ে গেল। ক্ষ্যান্তর আর্তনাদে রতিনাথ উঠে দেখলে ক্ষ্যান্তর হাত দুখানাই বিড়ালের আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।

নিদারুণ ক্রোধে রতিনাথের চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠলো, একটা বাক্যস্ফূর্তি হল না, কেবল বো বো করতেই তার এক ঘণ্টা সময় কেটে গেল।

বস্তির সবাই উত্যক্ত হয়ে উঠলো—

সত্যই তুমুল ব্যাপার; একদিকে পিতা কন্যা অপর দিকে একা সন্তোষ। রতিনাথ অনেকদিনকার বাসিন্দা কাজেই বন্ধুবান্ধব তার অনেক, আর সন্তোষ মাত্র কয়েক মাস এসেছে, তার বন্ধুবান্ধব তেমন নেই।

যে দুই একজন আছে তারা বললে—"ওঘর ছেড়ে দাও, ঘরের ভাবনা কিসের, অনেক ঘর পাবে।"

বুক ফুলিয়ে সন্তোষ উত্তর দিলে, "কক্ষণো যাব না।"

বন্ধুরা বললে, "তবে ডলিকে বিদায় কর।"

পুরুষ সিংহ সন্তোষ উত্তর দিলে—"না—"

এদিকে ডলির অত্যাচারে প্রতিবেশীরা অস্থির। কারও দুধটুকু খেয়ে যায়, কারও মাছটুকু শেষ করে দেয়। লোকে তার ঠ্যাং ভাঙ্গবার যোগাড়ে থাকে, কিন্তু বিড়ালও তেমনি চালাক, তাকে চোখে দেখা দুষ্কর।

এদিকে শান্তিপুর ও চট্টগ্রাম দুজনেই কোমর বাঁধে। এক হাতে হুঁকো আর এক হাতে লাঠি ধরে রতিনাথ বলে, "ফের যদি ঐ ডলি বিড়াল আসে—আমি ওই লোকটার মাথা ফাটাব।"

সন্তোষ তার পাঁচ হাত লম্বা লাঠিতে তেল মাখায়, উত্তর না দিলেও তার মুখের ভাবটা বড় সুবিধার মনে হয় না, চোখ দুটোও কেমন যেন সন্দেহজনকভাবে পিট পিট করে।

দেখে শুনে ক্ষ্যান্ত আতঙ্কিত হয়ে ওঠে—;

রতিনাথকে বলে, "থাক বাবা, তুমি ও লোকটার সঙ্গে লাগতে যেয়ো না, ওকে কিছু বলে কাজ নেই। ওর চেহারা দেখছো না, ঠিক ডাকাতের মত, যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, গায়ের জোরও তেমনি; আবার লাঠিকে তেল মাখায় দেখেছো—?"

সে শিউরে ওঠে।

রতিনাথ অবহেলার সঙ্গে বলে, "হলই বা, তবু আমি ওকে একবার দেখে নেব তুই দেখিস ক্ষ্যান্ত। এত বড় অপমান, আমার সতী বিধবা মেয়ে, বেড়াল পাঠিয়ে তাকে অপমান,—রতিনাথ এ কখনও সইবে না, তুই দেখে নিস ক্ষ্যান্ত। ও আবার বলে কি—আমরা শান্তিপুরের লোক, আমাদের গায়ে জোর নেই, জ্বরে ভুগে ভুগে আমাদের নাকি মাথাটাই মোটা হয়েছে, আর ওরা চাটগেঁয়ে লোক, ওরা নাকি সূর্যিকে পর্যন্ত জব্দ করতে পারে; সমুদ্দুর সাঁতরে পার হতে পারে, দরকার পড়লে লাঠির ঘায়ে একশো জনের মাথা ফাটাতে পারে।"

ক্ষ্যান্ত আঁতকে ওঠে—"তা ওরা পারে বাবা, চেহারা দেখছো না—?"

রতিনাথ ধমক দিয়ে বলে, "ছো ছো, চেহারা থাকলে কি হবে, মাথায় বুদ্ধি নেই।"

বুদ্ধি না থাকার অপবাদ ও ঘরে সন্তোষ সইতে পারে না, সে জোর গলায় হুঙ্কার ছাড়ে,—"এ দিক্‌কার লোকেরা

জবরে ভুগে ভুগে বুদ্ধির চাষ করে, শরীর নাড়ানোর ক্ষমতা থাকে না কি না, মগজে বুদ্ধি খেলাতে চায় তাই বেশী। আমরা রীতিমত সমুদ্দুরের হাওয়া খাই, ঢেউয়ের ওপর সাঁতার দেই, পাহাড়ে উঠে লাফ দেই—"

ক্ষ্যান্ত রতিনাথের লাঠি চেপে ধরে, "তোমার পায়ে পড়ি বাবা, তুমি যেয়ো না। পুলিশে খবর দাও, ও লোকটা ডাকাত, ডাকাতি করে এসে লুকিয়ে আছে।"

"ডাকাত—"

পাশের ঘরে সন্তোষ মহাস্ফুর্তিতে লাঠির পরে ভর দিয়ে সাতপাক ঘুরে নাচলো, লাফালো। কিন্তু রতিনাথ ভয় পাওয়ার লোক নয়; হলোই বা বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স, তবু সে তিন হাত লাঠিটা অবহেলার সঙ্গে তুলে নিলে, হুঁকা ফেলে সে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো, সেই লাঠি ঘুরিয়ে সে হুঙ্কার ছাড়লে, "একবার বাইরে আয় শা——, ঘরের থেকে জারিজুরি কেন, বাইরে এসে দাঁড়া।"

সন্তোষের ঘরের দরজা খুলে গেল, মস্ত বড় লাঠিটা আন্দোলন করে ঠোঁটের উপরকার অর্ধ ইঞ্চি পরিমাণ গোঁফে আঙুল বুলিয়ে সে গর্জন করলে, "সাবধান, গাল দিয়ো না বলছি, ভদ্রলোকের মত কথা বল।"

"ওরে আমার ভদ্রলোক রে,—"

বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সেও রতিনাথ লাফিয়ে উঠলো। ডলি ঠিক এই সময় গজেন্দ্রগমনে মুক্ত দ্বারপথে বার হয়ে চলছিল পাশের বাড়িতে—

রুক্ষকণ্ঠে রতিনাথ চেঁচালে, "এই তোর বিড়ালকে মারলুম, আর নিস্তার নেই—"

ভগবানের মার দুনিয়ার বার। তাই না লাফিয়ে উঠে ছুটতে গিয়ে বেচারা রতিনাথ আছাড় খেয়ে পড়লো, ডলি যেমন ধীরে সুস্থে চলছিল তেমনি চলে গেল।

"ওরে বাবা রে—ক্ষ্যান্ত মা, গিয়েছি গো—"

ক্ষ্যান্ত ছুটে এলো, হাহাকার শব্দ তার মুখে; চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে।

পিতাকে ধরে সে তুলবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু মাজায় বেজায় লাগায় রতিনাথ পড়ে পড়ে আর্তনাদই করতে লাগলো, ক্ষ্যান্তর হাত ধরে উঠবার কোন চিহ্নই তার দেখা গেল না।

অপ্রস্তুত সন্তোষ হাতের লাঠি ঘরে ফেলে এগিয়ে এলো, "সরো সরো, ও তুলবার ক্ষমতা তোমার হবে না, আমি উঠাচ্ছি।"

কাছাকাছি কেউ নাই।

ডাকাতের মতলব, কোলে তুলে গলা টিপতেও পারে। ক্ষ্যান্ত একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল।

পিতা আর্তনাদ করে উঠলো—"ওরে ক্ষ্যান্ত—"

বজ্রস্বরে সন্তোষ ধমক দিলে, "চুপ,—এখানে পড়ে ষাঁড়ের মত চেঁচাবে আর লোককে বলবে বেড়াল মারতে গিয়ে পড়ে মরেছি, তাতে বড় পৌরুষ বাড়বে না? ফের চেঁচালে পরে বাপ মেয়ে দুজনেরই গলা টিপে দেব, চুপ করে ঘরে শোবে চল।"

অবলীলাক্রমে রতিনাথকে দুটি হাতের পরে তুলে নিয়ে সন্তোষ ক্ষ্যান্তকে একটা বিছানা তৈরী করতে বললে। তার পেশীবহুল সুগঠিত দেইটার পানে পলকের দৃষ্টিপাত করেই ক্ষ্যান্ত ঘরে প্রবেশ করলে।

কেউ আর গোলমাল শুনতে পায় না, আগুন জ্বলতে জ্বলতে যেন হঠাৎ নিভে গেছে। সন্তোষ রতিনাথের সেবা করে,—সেঁক দেয়, মালিশ করে, অবাধ্যতা করলে প্রচণ্ড ধমক দেয়, ভয়ে রতিনাথ চুপ করে থাকে।

মনে মনে শাসায়—আচ্ছা, থাকো তুমি, আগে ভালো হই, মাজার ব্যথাটা সারুক, তারপরে তোমায় দেখে নেব।"

ডলি এখন যখন তখন এ বাড়ি আসে, এ যেন তার নিজের ঘর, নিজের বিছানা। আশ্চর্য দেখা যায়—ক্ষ্যান্ত লুকিয়ে রতিনাথের বাক্স হতে এক আধ পয়সা সরিয়ে দুধ কেনে। ডলি তার বাধ্য হয়ে পড়েছে বোধ হয় সেই টুকুরই লোভে।

রতিনাথ গোঁ গোঁ করে—"হতচ্ছাড়া বেড়াল—"

ক্ষ্যান্ত প্রতিবাদ করে, "না বাবা, বেড়ালটা ভালো, বেশ ভদ্র, শান্ত। কেবল শিক্ষার দোষে অধঃপাতে গেছে বই তো নয়, নইলে দেখতে ডলি সত্যি একটা মানুষ হতো।"

গরম হয়ে রতিনাথ বলে, "দেখলি ক্ষ্যান্ত চাটগাঁয়ের প্রাণে ভয় ঢুকেছে তাই আমার সেবা করে মন গলাতে এসেছে, কিন্তু আমি হচ্ছি শান্তিপুরী লোক, ওটুকু জলে এ চিঁড়ে ভিজবে না তুই দেখে নিস।"

উৎসাহে নড়তে গিয়ে মাজাটা কটকট করে ওঠে, রতিনাথ চীৎকার করে—"ওরে বাবা রে—গেলুম।" ক্ষ্যান্ত তাড়াতাড়ি লণ্ঠন জ্বালিয়ে আনে, মালিশ করে নেকড়া গরম করে সেঁক দেয়।

অপ্রসন্ন মুখে রতিনাথ বলে, "তুই কিছু পারিস নে ক্ষ্যান্ত, সন্তোষ দেয় বটে, ব্যথা তার মালিশের গুণে পাঁচ মিনিটে জুড়িয়ে যায়।"

খানিক চুপ করে থেকে বলে, "ওই তো শক্ত মুগুরের মত হাত পা, কেমন করে আস্তে আস্তে মালিশ করে, আমি তাই ভাবি।"

ক্ষ্যান্ত রাগ করে বলে, "তোমায় গুণ করেছে।"

"গুণ!"

রতিনাথ শুয়ে শুয়েই ক্ষেপে ওঠে, নড়তে সাহস হয় না পাছে আবার মাজায় লাগে; কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলে, "গুণ এতটুকু করতে পারে নি, এ তুই দেখে নিস ক্ষ্যান্ত; আগে ভালো হয়ে উঠি তার পর দেখিস—ওই লাঠি ওর মাথায় আমি ভাঙবই—ছাতু করে দেব গুঁড়িয়ে। ওর ওই ডলি বেড়ালটা—"

বেঞ্চির তলায় ডাক শুনা যায়—অতি কোমলতাময়—মিউ—

"দূর করে দে ক্ষ্যান্ত, ওটাকে দূর করে দে—"

রতিনাথ হাত দুখানা আস্ফালন করে, ঘনঘন মাথা নাড়ে, অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাড়বার সাহস নাই।

সেই মুহূর্তে ঘরে প্রবেশ করে সন্তোষ, তাকে দেখেই পিতাপুত্রীর মুখ এতটুকু হয়ে যায়, ডলি খড়র খড়র করতে

করতে এসে একেবারে রতিনাথের বুক ঘেঁষে বসে। রতিনাথের সর্বাঙ্গ শির শির করে ওঠে, ঘৃণায় সমস্ত শিরায় শিরায় আকুঞ্চন বিকুঞ্চন চলে, তবু চোখ মুদবার যো নেই, ধাক্কা দেওয়ার যো নেই।

সন্তোষ নিজের কাজ করে যায়;—মালিশ করে সেঁক দেয়, হোমিওপ্যাথী ওষুধ নিয়ে এসে খাওয়ায়। মুখ দেখে বুঝবার যো নেই এই লোকটাকে মারবার জন্যে সে আজ দুইটি মাস ধরে লাঠিতে তেল মাখিয়ে উনোনের ধারে দেয়।

সে চলে যায় কাজ সেরে, ডলিও সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়।

হতাশভাবে রতিনাথ ডাকে—"ক্ষ্যান্ত—"

ক্ষ্যান্তও ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দেয়।

রতিনাথ দৃঢ়কণ্ঠে বলে, "তুই ঘাবড়াসনে ক্ষ্যান্ত, ওকে আমি জব্দ করবই—ওকে এখান হতে আমি উঠাবই এ তুই দেখে নিস। আগে ভালো হয়ে উঠি—তারপর, তুই দেখিস ক্ষ্যান্ত। উঃ, তোকে অপমান, আমাকে অপমান, পাড়াশুদ্ধ লোককে অপমান, কেউ আমরা সইব না ক্ষ্যান্ত, কেউ সইব না।

নিষ্ফল ক্রোধে বিছানায় পড়ে রতিনাথ কেবল হাঁপায়।

মাস দুই পরের কথা—

রতিনাথ সম্পূর্ণ সুস্থ, প্রতিজ্ঞাপালনের কথা তার মনে জেগেছে। ডলিকে সে দেখতে পেলেই ইঁট ছোঁড়ে, এর জন্য একদিন সন্ধ্যার পরে একঝুড়ি ইঁটের টুকরা এনে সে জমা করে রেখেছে। তবু ডলি আসে;—

ক্ষ্যান্ত তার ভক্ত হয়ে পড়েছে; প্রতিদিন দুধ জ্বাল দিয়ে রেখে দেয়, পিতা ও সন্তোষ যখন কাজে যায় তখন ডলিকে ডাকলেই সুবোধ বালকের মত এসে সে খেয়ে যায়।

পিতা মোটেই এ কথা জানে না; কিন্তু কিন্তু সন্তোষ জানে। ডলি কোথায় কি খায় না খায় সব সন্ধান সে রাখে। একদিন হঠাৎ ধরা পড়ে গিয়ে ক্ষ্যান্ত আর মুখ তুলতে পারে নি,—সন্তোষ পাঁচিলের উপর উঠে স্বচক্ষে দেখেছিল ক্ষ্যান্তর কোলে বসে ডলি বাটিতে করে দুধ খাচ্ছে। ক্ষ্যান্ত অপমানের ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সন্তোষ পরম ঔদার্যের সঙ্গে বলেছিল —"আচ্ছা, তুমি খাওয়াতে পারো।"

বিচারক যেন হত্যাকারীকে ফাঁসির হুকুমের পরিবর্তে মুক্তির আদেশ দিলেন—ঠিক সেই ভাব তার।

রতিনাথ এদিকে তার বন্ধুদের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছে সন্তোষকে যে কোন রকমে জব্দ করা চাই-ই, এই হয়েছে তার জীবনের একমাত্র ব্রত।

কিন্তু এরই মধ্যে হঠাৎ যেদিন দেখা গেল—সন্তোষের ঘরের সামনে একটা কুলি দাঁড়িয়ে, মাথায় তার সন্তোষের রং-চটা টিনের বাক্স, তার চট জড়ানো সামান্য বিছানা, সন্তোষের হাতে একটা ছোট বাক্স আর প্রকাণ্ড একটা বোঁচকা, তখন রতিনাথ হঠাৎ যেন স্বর্গ হতে মর্তে পড়ে গেল।

তেলে পাকানো পাঁচ হাত লাঠিটা রতিনাথের দরজার কাছে দাঁড় করিয়ে রেখে সহাস্যমুখে সন্তোষ বললে, "লাঠিটাও রইলো, তোমার লাঠিটা ডলিকে মারতে গিয়ে ভেঙ্গে গেছে, এই লাঠিটা দিয়ে কাজ চালিয়ো। মাজা একবার যখন মচকেছে, আবার মচকাবেই, তখন একটা লাঠি না হলে ভারি কষ্ট হবে। লাঠিটা যত্ন করে রেখো, কেবল তোমার ভার কেন, তোমার বংশের সকলের ভার সইতে পারবে, এ খুব পাকানো লাঠি, নুইবে না, ভাঙ্গবে না—অর্থাৎ ঠিক আমারই মতন। অনেক কাল আমার কাছে ছিল, তোমায় দিয়ে যাচ্ছি, আশা করছি তোমার মেয়ে যেমন ডলির ভার নিয়েছে তুমিও তেমনি এর ভার নেবে।"

"আমার মেয়ে—ক্ষ্যান্ত—ডলিকে----"

রতিনাথ হাঁপিয়ে ওঠে।

সন্তোষ উত্তর দিলে, "হ্যাঁ, ডলি বেশ সুখে শান্তিতে থাকতে পারবে, ওর সম্বন্ধে আমি পরম নিশ্চিন্ত হয়েছি।

রতিনাথ হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "কিন্তু তুমি যাচ্ছো কোথায়?"

সন্তোষ উত্তর দিলে, "রাণীগঞ্জে কাজ পেয়েছি—সেখানেই চললুম।"

চোখের সামনে দিয়ে সে চলে গেল, সামনে পড়ে রইলো তার লাঠিটা—

আর ঘরের মধ্যে শুনা গেল অতি কোমল অতি শান্ত সুর—"মিউ—"

পাশের ঘর একেবারে খালি—

এ ঘরের অধিবাসীরা যেন মিইয়ে পড়েছে; স্ফূর্তি নাই, আনন্দ নাই; পাড়া যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

ডলিও সঙ্গে সঙ্গে কোথায় উধাও হয়ে গেছে, কদাচিত কখনও তাকে দেখা যায়, পাঁচিলটার পরে—অতি বিশ্রী চেহারা তার; সেই সযত্নে ন্যস্ত লোমগুলি ঝরে গেছে, গায়ে ঘা—

বদ্ধ ঘরের আশপাশে সে ঘুরে ঘুরে বিকটসুরে চীৎকার করে—"ম্যা—আও, ম্যা----আও।"

গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে আঁৎকে রতিনাথ বিছানায় উঠে বসে—"দূর দূর,—দূর হ অলক্ষুণে বেড়াল; ক্ষ্যান্ত, ও মা ক্ষ্যান্ত—"

ক্ষ্যান্ত জেগেই থাকে, তার মুদিত দুইটি চোখের কোণ বেয়ে নিঃশব্দে জলধারা গড়িয়ে পড়ে মাথার বালিশটাকেই ভিজিয়ে দেয়। সে জাগার সাড়া দেয় না, বিড়াল তাড়ায় না; নিজের খুসিতে কেঁদে ডেকে সন্তোষের ডলি কখন আস্তে আস্তে চলে যায়। বস্তিপথে অনেক দূর হতে শোনা তার বিকট চীৎকার ক্রমে মিলিয়ে আসে।

ক্ষ্যান্ত চোখ মোছে।

ল্যাবরেটরি

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

সম্প্রতি 'তিনসঙ্গী' গল্প গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের যে তিনটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে 'ল্যাবরেটরি' গল্পটি অনন্য-সাধারণ। অথচ এ পর্যন্ত ঐ গল্প সম্বন্ধে যে সব সমালোচনা শুনিয়াছি এবং পড়িয়াছি তাহাতে বুঝিতে পারি, সমালোচক-গণের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে 'সোহিনীর' চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকে।

'ল্যাবরেটরি' নামটিই গল্পের বিষয়বস্তুর বিচারের প্রতি আমাদের বৈজ্ঞানিক মনোভাবকে আহ্বান করে। কাজেই, সাধারণ মনোভাব এবং চলতি সংস্কার লইয়া ল্যাবরেটরির বিশেষত্বের বিচার করা অনুচিত। সত্যান্বেষণের বিচারগৃহ হইল ল্যাবরেটরি। উচ্চাঙ্গের সাহিত্যই মানব-মনের ল্যাবরেটরি একথা বলিলে অন্যায় বলা হয় না। বিধি-নিষেধ, শাসন-অনুশাসন, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, ধর্মা-ধর্ম ভাব ইত্যাদির সংস্কার বিজড়িত প্রচলিত সামাজিক রাজ্যে যেসব পেটেন্ট ভালো মন্দ বিষয় লইয়া গতানুগতিকভাবে আমরা সংসারযাত্রা নির্বাহ করি, দেখা যায় সেসব ভাবের প্রতি সর্বত্র আনুগত্য ও শ্রদ্ধা চর্চা করা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের রীতি নয়। উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের এই রীতির স্বপক্ষে বিস্তর নজীর উপস্থিত করা চলে, কিন্তু এই প্রবন্ধের স্থান স্বল্প পরিসর, সুতরাং সে সকল নজীর এখানে সংগ্রহের উপায় নাই, প্রয়োজনও নাই এই কারণে যে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের এই রীতি, সাহিত্যিক এবং সাহিত্যপাঠকদের অজানা নাই।

প্রত্যেক মানুষের চরিত্রই অল্প বিস্তর প্রায় একই প্রকার ছাঁচে ঢালাই হইয়া যায় এক একটি জাতির সামাজিক দাবির অনুপাতে। সেই জন্য মানব চরিত্রের ভালো মন্দ বিচারের মাপকাঠিও এক এক সমাজে এক এক রকম। এইরূপ বিচারের রাজ্যে সচ্চরিত্র এবং অসচ্চরিত্রের একটা বাঁধি ধাপ বা স্ট্যান্ডার্ড তৈরি হইয়া আছে। এই রূপের স্ট্যান্ডার্ড বাঁধানো রাজ্যে, অনেক স্ত্রীলোক এবং পুরুষ অনেকটা প্রকাশ্যভাবে অসচ্চরিত্র হইয়াও সচ্চরিত্রের পঙক্তিতেই সসম্মানে আসন পাইয়া থাকেন। কেন না বাঁধি স্টার্ন্ডার্ডের এবং রীতির মধ্যে কোথাও এমন বেড়াজাল নাই, যে জালের মধ্যে ইহারা স্বতন্ত্র হইয়া ধরা পড়িতে পারে অসচ্চরিত্ররূপে। গোলে হরি-বোলের এইরূপ রাজ্যের মধ্যে এমন একটি বিশেষ চরিত্র আমাদের সামনে আসিয়া পড়ে, যাহার সামাজিক পদ বা পজিসন তথাকথিত পতিতারই মতন, কিন্তু ল্যাবরেটরি বৈজ্ঞানিক মনোভাবের বিচারে যখন উহার চরিত্রকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তখন উহার বৈশিষ্ট্য ও অনন্যাসাধারণতা আমাদের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ল্যাবরেটরি গল্পের মধ্যে সেই অনন্যাসাধারণ এবং বিস্ময়কর চরিত্র সোহিনী এবং তারপরই ইন্‌জিনিয়ার। সাধারণের চলতি যেটা সামাজিক রাজ্য, সে রাজ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে রক্তমাংস সংশ্লিষ্ট কামনা এবং লালসার যে ধর্ম চলিতেছে, সামাজিক দৃষ্টিতে এবং ভালো মন্দ বিচারের ধার্য মাপকাঠিতে সে রাজ্যে সোহিনী নিছক দুশ্চরিত্রা সে বিষয় সন্দেহ পোষণ করিবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই এবং তাহার রক্তমাংসের সেই কামনার [illegible] জন্য। কিন্তু এই সোহিনীর মধ্যেই ছিল আর একটি বিস্ময়কর বিশেষ দিক, সেটা ছিল একটা বড় জিনিসকে বড় শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের সহিত, জোরের সহিত রক্ষা করিবার অসাধারণ শক্তি। সেই বড় জিনিসটা কী ছিল? ছিল সোহিনীর স্বামীর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান চর্চার ল্যাবরেটরি। আমরা এই শ্রেণীর অসাধারণ চরিত্রকে পুরুষের ক্ষেত্রে স্বীকার করিতে ও শ্রদ্ধা করিতে অভ্যস্ত। রবীন্দ্রনাথ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইঙ্গিতে অনেক জটিল বিষয়ের উল্লেখ করেন, এই গল্পেও তিনি ইঙ্গিতেও নয় বরং একটু স্পষ্টভাবেই সে কথা ইন্‌জিনিয়ারের চরিত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। চরিত্রের এই চলতি রাজ্যে ইন্‌জিনিয়ারও ছিল ডিস্‌অনেস্ট। কিন্তু তাঁর এই সাধারণ অসাধু-মানুষের পাশে পাশে প্রতিদিন জাগিয়া উঠিতেছিল এমন একটি উচ্চাকাঙ্খা, যাহার ফল ভোগ করিবে বিশ্বের সকলে এবং সেই ফল ভোগের মধ্যে থাকে না ইন্‌জিনিয়ারের ব্যক্তিগত জীবনের অসাধুত্বের কলুষ। এটা একটা ফ্যাক্ট। সাহিত্যে এই রকমের ফ্যাক্ট সম্বন্ধে বিচারের দুটি পথ আছে। এক রকমের প্রচলিত সাহিত্য আছে যা মানুষের কাছে সামাজিক দাবি দাওয়ারই পক্ষে করে ওকালতি এবং তদ্বির। গতানুগতিকভাবে বিরাট জনসাধারণের কাছে এই সাহিত্যের চাহিদা বেশি, কেন না জনসাধারণ এই সাহিত্যে তাহাদের বাঁধি চিন্তা এবং সংস্কারের খোরাক পায় বেশি। মানুষের মনের দুটো স্তর আছে একটা হচ্ছে তার নিচের স্তর আর একটা তার উপরের স্তর। যাঁহারা এই দুই স্তরের সংঘর্ষের মধ্যে যেদিক দিয়া যতটা পারুক উপরের স্তরকে জীবনে সাফল্য দিতে পারেন তাঁহারা ততটাই অসাধারণ। এই অসাধারণত্বের স্তরে মানুষের যৌক্তিক চিত্ত, যাকে বলে Rational mind, সেইটাই কাজ করে বেশি। এই যৌক্তিক চিত্তের বিচারের মধ্যে অনেক সময়ই অন্য স্তরের চিরাচরিত রীতিনীতির সংস্কার অন্ধভাবের ধাক্কা দিয়া বিক্ষোভের সৃষ্টি করে, কিন্তু শক্তিশালী ব্যক্তি মাত্রেই সেই বিক্ষোভকে দূর করিয়া উচ্চ স্তরের সার্থকতা সাধন করিতে পারেন। যাঁহারা জীবনে সার্থকতা প্রতিষ্ঠায় অনন্যসাধারণ শক্তির পরিচয় দিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা সুলভ নয় এবং তাঁহাদের সংখ্যা সুলভ নয় বলিয়াই তাঁহারা, সাধারণের মামুলি এবং সুলভ ভক্তি ও শ্রদ্ধা হইতেও বঞ্চিত। এই যে দুর্লভ চরিত্রের বা চরিত্র বৈশিষ্ট্যের কথা বলা গেল, এরকম বিশিষ্ট চরিত্রের প্রকাশকেও বিশ্লেষণ করিয়া ঠিক চরিত্রটি অঙ্কণ করাও সাধারণ সাহিত্যিকের কর্ম নয়। একটি চরিত্রের একটি দিককে সাধারণ স্তরের সর্বপ্রকার দারিদ্র্যের মধ্যে লিপ্ত রাখিয়া তাহারি সঙ্গে সঙ্গে তাহার আর একটি দিককে ক্রমাগত উজ্জ্বল করিয়া আঁকিবার ক্ষমতায়ও অসাধারণত্ব প্রয়োজন, সেই জন্য ল্যাবরেটরিতে সোহিনীর আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের কলমেই এমন সার্থকরূপে সম্ভব হইয়াছে। চিত্রশিল্পীর মনোভাব লইয়া এ বিশেষ চরিত্রকে বিচার করিতে হইলে মনে হইবে এ যেন অত্যন্ত এবড়ো খেবড়ো কালো রঙের ক্যানভাসের পটে একটি শ্বেত শতদলের ছবি, অর্থাৎ যে পটভূমির উপরে চিত্রটি স্থাপিত, সেই পটভূমির অবাঞ্ছনীয়

ত্রুটিগুলি এবং প্রচুর কলঙ্কই যেন চিত্রটির ঔজ্জ্বল্যকে অত্যন্ত জোরের সহিত প্রকাশ করিতেছে। সাধারণ বিচারে শ্রেয় সাহিত্যে কলঙ্কিত জীবনের পবিত্র পরিণতি বহুস্থলে দেখা যায়, পপুলার নীতিবাদী সাহিত্যে এরূপ পবিত্র চরিত্রের ইতস্তত বহুল সংখ্যা বহু সাহিত্যরসিকদের কাছে প্রায় এক-ঘেঁয়ে হইয়া উঠিয়াছে। এই সব পবিত্র চরিত্রের পূর্ববর্তী ইতিহাসকে পরবর্তী জীবনের সহিত যোগযুক্ত রাখা হয় না, অর্থাৎ যখন এইসব চরিত্রের পবিত্র অবস্থাকে পাঠক সমাজের কাছে প্রকট করা হয়, তখন আর ঐসব চরিত্রের পূর্বের তথা-কথিত কলঙ্কের লেশমাত্র চিত্র থাকে না, তখন সেসব চরিত্রের যাবতীয় অপরাধ উত্তম সাবানে কাপড় কাচার মতন হইয়া আসে। এরকমভাবে ধোলাই পদ্ধতিতে অপবিত্র চরিত্রকে পবিত্র করিবার রীতিও সাধারণ সাহিত্যে প্রচলিত। কিন্তু চরিত্রকে তাহার দুই বিপরীত অবস্থার মধ্যে যথাযথভাবে ফুটাইয়া তোলায় গল্প লেখকের অসাধারণ কৃতিত্বেরই পরিচয় দেয়। ল্যাবরেটরি গল্পে আমরা যে কয়েকটি চরিত্রের চিত্র পাই তন্মধ্যে ইন্‌জিনিয়ার এবং সোহিনীর চরিত্রে সাধারণ স্তরের দৈন্য যথেষ্ট লক্ষ্য করি। ইন্‌জিনিয়ার যে খুব ধার্মিক ছিলেন তা নয়, অর্থ সংগ্রহ এবং অর্থ রোজগার ব্যাপারে প্রচলিত এবং সর্বজন স্বীকৃত সাধুতা তাঁহার ছিল না, এই চরিত্র দৈন্য ছিল তাঁর ভিতরে যে সামাজিক মানুষটি ছিল, তারই মধ্যে। কিন্তু যে মানুষ নিজের সীমাবদ্ধ ত্রুটি এবং রক্ত-মাংসের লালসাকেই জীবনের কেবলমাত্র সম্বল না করিয়া, বড় কাজ, বড় বড় চিন্তা ও উদ্দেশ্যকেও নিজ বিচার এবং যুক্তির দ্বারা জীবনে সার্থক করিতে চায়, ইন্‌জিনিয়ারের সেই মানুষের মনে, ধ্যানে জাগ্রত ছিল ল্যাবরেটরিরূপে একটা বড় সত্যের অন্বেষণ এবং সত্যকে মানুষের বিজ্ঞানের পূজামন্দিরে প্রতিষ্ঠা দিবার ইচ্ছা।

পূর্বেই বলিয়াছি, পুরুষ মানুষের এই greatness কিম্বা মহত্বের সমাদর করিতে আমরা অনভ্যস্ত নহি। কিন্তু নারীদের সম্বন্ধে আমাদের বিচার বিবেচনা এবং সংস্কার অন্য রকমের। পরাধীনতার আশ্রয়ে যেসব জীব জন্তুরা মানুষের চিত্ত বিনোদনের কাজে যেসব তালিম দেওয়া সদ্গুণের চর্চা করে, সেই সব সদ্গুণের জন্য, সেই সব জীব জন্তুরা মানুষের স্নেহ, আদর ও প্রশংসাভাজন হয়। কিন্তু ঐসব জীবের মধ্যে যদি দৈবাৎ কোন একটি জীব মানুষের প্রভুত্বকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে চাহে, অমনি ঐ জীবটি মানুষের অথবা পালকের বিষদৃষ্টিতে পড়ে। সাধারণত আমাদের সমাজে অনেক মেয়েদের অবস্থা অনেকটাই পোষমানা জীবের মতন। পুরুষের পক্ষে নারী যে যে কারণে প্রিয় সেই কারণগুলিকে আমরা তাহাদের চরিত্রের অলঙ্কার করিয়া দিয়াছি। মেয়েরা সত্যিই অলঙ্কার প্রিয় কিনা, সূক্ষ্মভাবে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি নাই। চলতি মতে আপাতত মানিয়া লইলাম মেয়েরা অলঙ্কার প্রিয়। সেই জন্য তাহারা দেহে নানাবিধ অলঙ্কার ব্যবহার করে, বুকের সাতনলি হার হইতে পায়ের নূপুর পর্যন্ত কত অলঙ্কারই না পরে তাহারা। তাহাদের চুড়ির ঠুন্‌ঠুন্, কাঁকনের নিক্কন, নূপুরের ঝঙ্কার, মলের মঞ্জুলধ্বনি, কানের দুলের রঙ, বিছের বাহার এসব কাহার বা কাহাদের মনকে ভুলায় সেটাও কি এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য নয়? কত যুবতী তাঁহাদের ঘন কালো চুলের পদ্ম খোঁপায় পরেন বেলফুলের ঠাস গাঁথুনির হার, ফুলহারে সজ্জিত সেই খোঁপার সৌন্দর্য কি সুন্দরীর নিজের চোখে একটুও স্বপ্ন মায়ার সৃষ্টি করে? সুন্দরী তো যান আগে আগে, পিছে পিছে যায় তাঁর খোঁপা। তবেই বুঝিতে পারা যায় নারীর দেহ অলঙ্কারের মধ্যেও প্রচ্ছন্নভাবে, পুরুষের ভালো লাগার ইঙ্গিত আছে। এই ইঙ্গিতটি হয় তো পুরুষ আদেশ-বাক্যে নারীকে গ্রহণ করতে বলে নাই। কিন্তু রসিক পুরুষদের কাব্য মনে, এইসব অলঙ্কারের স্তুতিবাদই, নারীকে হয়তো এইসব অলঙ্কার পরায়ন করিয়া তুলিয়াছে। মনের দিক হইতেও তাঁরা যেসব সদ্গুণাবলী তাঁহাদের স্বভাবে ও আচরণে অভ্যাস করিয়া পুরুষের কাছে প্রশংসার পাত্রী বিবেচিত হন, সেসব গুণা-বলীও রমণী চরিত্রে অবশ্য রক্ষণীয় বলিয়া পুরুষেরা তো মনে করেনই, নারীরাও সেগুলিকে পছন্দ করেন দীর্ঘ বৎসরের সংস্কারের ফলে। এইজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় কোনো মেয়ের সামান্য স্খলন বা ত্রুটি নারীদের কাছেই অমার্জনীয় অপরাধরূপে গণ্য হয় বেশী। এই কারণেই বধূর প্রতি শাশুড়ীর উৎপীড়নের সংবাদই পাওয়া যায় বেশী; বধূর প্রতি শ্বশুরের উৎপীড়নের নজীর কম পাওয়া যায়। যাই হোক, এত কথার মূল প্রামাণ্য বিষয় মেয়েদের এইরূপ মানসিক অবস্থার এবং সামাজিক অবস্থার জন্য পুরুষেরাই বেশির ভাগ দায়ী এবং এইসব অবস্থার পরিবেষ্টনের মধ্যে যে নারী স্বকীয় বুদ্ধিদীপ্ত দ্বারা নিজের ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যকে অসাধারণ-রূপে প্রকাশ করিতে পারে বা পারিয়াছে, তাহার সেই অসাধারণত্বের প্রতি আমাদের দেশের কি পুরুষ কি নারী কেহই শ্রদ্ধা পোষণ করে না, কিন্তু ল্যাবরেটরি গল্পে আমরা দেখিতে পাই ইন্‌জিনিয়ারটির ভিতরের সেই অসাধারণ মানুষটি সোহিনীর অন্তর্নিহিত অসাধারণত্বকে চিনিতে পারিয়াছিল, সেইজন্য তিনি সোহিনীর সাধারণ দিকের স্তরে যথেষ্ট কলঙ্ক আছে জানিয়াও সোহিনীকে নিজের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সোহিনীও অসাধারণ সত্যের জোরেই স্বামীর নির্বাচনের অসাধারণতাকে প্রাণ দিয়া পূজা করিয়া-ছিল। সোহিনী সত্যিই অসাধারণ নারী ছিল সেই জন্য সে নিজের কন্যাকে স্পষ্ট বাক্যেই কোনো রকমের ঢাকাঢুকি না রাখিয়াই জানাইয়া দিয়াছিল যে, সে যাহাকে নিজের পিতা বলিয়া জানে, সেই ইন্‌জিনিয়ার তাহার পিতা নহে, সেই জন্য পুত্রী যে মৃত ইন্‌জিনিয়ারের সম্পত্তির উপর লোভ পোষণ করিতেছিল, সে সম্পত্তি যে সবটাই যাইবে ল্যাবরেটরি পালনে, সে কথাও সোহিনী তাহার পুত্রীকে জানাইয়া দিয়া-ছিল। সোহিনী বুঝিতে পারিয়াছিল তাহার কন্যা উত্তরাধিকারীসূত্রে মায়ের সাধারণ স্তরের লালসা এবং

(শেষাংশ ১৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ছদ্মবেশী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৩

হর্নের শব্দ শুনিয়া প্রশান্ত ও লাবণ্য বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল গাড়িবারান্দায় মোটর আনিয়া অবনীশ দাঁড়াইয়া আছে। লাবণ্য ও প্রশান্তকে দেখিবামাত্র সামরিক প্রণালীতে স্যালিউট্ করিয়া সে গাড়ির দ্বার খুলিয়া দিল।

শোফারের মূল্যবান ঘন কালো রঙের ড্রেসে সজ্জিত অবনীশের দীর্ঘ সুগঠিত দেহে এবং সুশ্রী কান্তিমান মুখাবয়বে এমন একটা আভিজাত্যের দীপ্তি যাহার প্রভাবে, প্রশান্ত এবং লাবণ্যর মনে হইল, তাহাদের অভিজাত ভক্সল্‌ও যেন আরও খানিকটা আভিজাত্য লাভ করিয়াছে।

প্রশান্ত এবং লাবণ্য গাড়ির ভিতর উঠিয়া বসিলে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া অবনীশ নিজের সীটে গিয়া বসিল; তাহার পর গাড়িতে স্টার্ট দিয়া সবেগে গাড়িবারান্দা ছাড়াইয়া খানিকটা আগাইয়া গিয়া সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল; তৎপরে নিমেষের মধ্যে ব্যাক গীয়ার দিয়া প্রায় তেমনি বেগেরই সহিত পিছাইয়া আসিয়া গাড়িবারান্দা ছাড়াইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

অবনীশ যে গাড়িখানা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল তাহা বুঝিতে প্রশান্ত এবং লাবণ্যর বিলম্ব হইল না। গাড়ি-বারান্দার ভিতর দিয়া অত জোরে ব্যাক করিবার সময়ে গাড়ি একটুও বামে বা দক্ষিণে না বাঁকিয়া সোজা মধ্যপথ ভেদ করিয়া পিছাইয়া আসিল লক্ষ্য করিয়া তাহারা খুসি হইল।

অবনীশ বলিল, "বেরোবার আগে গাড়িখানা একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নেবো মেম-সায়েব?"

লাবণ্য বলিল, "বেশ ত', নাও না।"

আদেশ পাইবামাত্র অবনীশ সবেগে অগ্রসর হইয়া সদর গেট অতিক্রম করিয়া বাঁ-দিকে ঘুরিয়া রাজপথে গিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর হড় হড় করিয়া গেট ছাড়াইয়া খানিকটা পিছাইয়া আসিয়া মুহূর্তের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পুনরায় গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একেবারে গ্যারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

অবনীশের হাতে পড়িয়া গাড়ি যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে। অবনীশ যেন কেবলমাত্র চালক নহে, সে যেন লোহা-লক্কড়ের গাড়ির ভিতরকার ইচ্ছানিয়ামক মনোযন্ত্র। যেরূপ অবলীলার সহিত গাড়ি চলিতেছে ফিরিতেছে, আগাইতেছে পিছাইতেছে তাহাতে মনে হয় গাড়ি এবং অবনীশ যেন একই সচেতন দেহের দুইটি পৃথক অংশ।

গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া অবনীশ বলিল, "গাড়িতে একটু শব্দ আছে স্যার।"

প্রশান্ত বলিল, "হ্যাঁ, কাল থেকে ঐ শব্দটা হচ্ছে। মোসাহেব বলে ডিফারেন্সিয়ালে কোন দোষ হয়েছে, কারখানায় পাঠাতে হবে।"

"আপনার আবার মোসাহেবও আছে না-কি স্যার?"

কথা শুনিয়া লাবণ্য মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে হাসিল।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশান্ত বলিল, "সে মোসাহেব নয়। আমার এখানকার ড্রাইভারের নাম মোসাহেব লাল।"

"ও বুঝেছি স্যার। সরি, বেগ ইয়োর পার্ডন। এ কিন্তু ডিফারেন্সিয়ালের শব্দ নয়। আচ্ছা, আমি দেখচি।" বলিয়া অবনীশ গাড়ির বনেট খুলিয়া কলকব্জা পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পর দুই একটা যন্ত্রের সাহায্যে কি একটু করিয়া লইয়া গাড়ি চালাইয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

বিস্মিত হইয়া প্রশান্ত বলিল, "শব্দটা ত' আর হচ্ছে না দেখচি। কি করলে হে গৌরহরি?"

গাড়ি চালাইতে চালাইতে অবনীশ বলিল, "টাপেট একটু অ্যাড্জস্ট্ ক'রে দিলাম স্যার। ডিফারেন্সিয়ালে কোন দোষ ছিল না।"

লাবণ্যর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে প্রশান্ত বলিল, "এই—বেঁচে গেল।" বলিয়া দুই হাতের দশটি আঙ্গুল নিঃশব্দে দেখাইল। ততোধিক মৃদুকণ্ঠে বলিল, "গাড়ি একবার কারখানায় গেলে ওর কমে আর কামড় নেই।"

এদিকে ক্লীনার, ঝাড়ুদার, বেহারা প্রভৃতি পারিষদবর্গের দ্বারা পরিবৃত হইয়া মোসাহেব লাল কিছু দূরে দাঁড়াইয়া সপ্রশংস ঈর্ষার সহিত সদ্যাগত ড্রাইভারের গতিবিধি কার্য-কলাপ নিরীক্ষণ করিতেছিল। গাড়ি অদৃশ্য হইলে ক্লীনার নূতন ড্রাইভারের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না; বলিল, "বহুৎ কাবিল আদমি মালুম পড়তা হ্যায়।"

অবনীশের আকৃতি, বেশভূষা এবং গাড়ি চালাইবার কায়দা-কৌশল দেখিয়া মোসাহেব লালের মনে এমনই প্রতিষ্ঠালাঘবের আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহার উপর নিজের অনুগত ক্লীনারের মুখ হইতে এই উচ্চ সার্টিফিকেট শুনিয়া তাহার মুখ শুকাইল। তথাপি মুখমণ্ডলে একটা কপট তাচ্ছিল্যের ভাব আনিয়া বলিল, "আরে, ঘরকা ভিতর সব্‌হি কোই কাবিল হ্যায়। যব আক্সিডেণ্টকা হিসাব হোগা তবহি না কাবিল আউর গৈরকাবিল মালুম পড়ে গা।"

এ যুক্তিতে কিন্তু ক্লীনার সন্তুষ্ট হইল না, তাহার মনে হইল আক্সিডেণ্টের হিসাবেও নূতন ড্রাইভারের মহিমার লাঘব হইবে না। কিন্তু উপরিওয়ালার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সে আর-কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ঘণ্টাখানেক পরে প্রশান্ত ও লাবণ্য ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় বাহিরের অফিস ঘরে প্রবেশ করিল।

লাবণ্য বলিল, "খাসা চালায় কিন্তু।"

প্রশান্ত বলিল, "কল-কব্জাও চমৎকার বোঝে।"

লাবণ্য বলিল, "স্পীডের ওপর কনট্রোল দেখেছ?"

প্রশান্ত বলিল, "আর ব্রেকের ওপর? প্রায় টপ্ স্পীড

থেকে দশ ইয়ার্ডের মধ্যে ডেড স্টপ্‌ করে, অথচ জার্ক নেই।"

লাবণ্য বলিল, "আর স্টীয়ারিং-এর ওপরেও কি রকম বলো?—এই বাঁ দিকে যাচ্ছে, এই ডান দিকে যাচ্ছে, এই সামনে যাচ্ছে। এই গেল গেল!—অথচ ঠিক বেঁচে গেল।"

প্রশান্ত বলিল, "কণ্ট্রোলই ত' হ'ল মোটর চালাবার প্রথম কথা। সেটি ওর বিলক্ষণ আয়ত্ত আছে।"

লাবণ্য বলিল, "সব ভাল; খালি একটু ফাজিল বেশি।"

প্রশান্ত বলিল, "তা হোক, বাঙলাটা ভাল জানে।"

কোন উত্তর না দিয়ে লাবণ্য চুপ করিয়া রহিল।

৪

১৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার পর দ্বিতলের বসিবার ঘরে বসিয়া প্রশান্ত খবরের কাগজটা আর একবার ভাল করিয়া দেখিতেছিল, এমন সময়ে লাবণ্য আসিয়া বলিল, "ওগো শুনেছ, থাইসিসের জন্যে ত' আমার প্রাণ যাবার দাখিল হয়েছে!"

তাড়াতাড়ি খবরের কাগজটা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া ভয়চকিত নেত্রে প্রশান্ত বলিল, "তার মানে?"

স্মিতমুখে লাবণ্য বলিল, "তার মানে টিউবারকুলসিস্‌ থাইসিস্‌ নয়; পি এইচ টি এইচ আই এস আই এস থাইসিস্‌।"

রহস্যটা বুঝিবার চেষ্টায় লাবণ্যের মুখের দিকে এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া "গৌরহরি?" বলিয়া প্রশান্ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "আচ্ছা ফোক্কড় ত! খুবই জব্দ করেছে তোমাকে দেখছি! ভেবে ভেবে বার করেছেও ত' মন্দ নয়।" বলিয়া প্রশান্ত পুনরায় খানিকক্ষণ ধরিয়া আর এক চোট হাসি হাসিল।

কপট বিরক্তির সুরে লাবণ্য বলিল, "হাসছ যে?"

সহাস্যমুখে প্রশান্ত বলিল, "দুঃখ কোরো না লাবণ্য,—এ সমবেদনার হাসি। যে দুঃখ নিজে সর্বদা পাচ্ছি সেই দুঃখ তুমিও পাচ্ছ শুনে দুঃখের হাসিই হাসছি। জানো? গাড়িতে উঠতে আজকাল আমি সত্যি সত্যি ভয় পাই? ওঠবার সময় কিছু বলে না, কিন্তু নামবার সময়ে দশবারের মধ্যে অন্তত সাতবার বলবে, সায়েব নিউমোনিয়ার 'পি'-টার বিষয়ে কিছু দেখেছিলেন কি? কি পাগল বল ত? এ ত দেখছি ক্রমশ আমাকেও পাগল ক'রে তুলবে!"

লাবণ্য বলিল, "তোমার নিউমোনিয়ায় তবু ত মাত্র একটা অক্ষর পি; আমার থাইসিসে দুটো,—পি-এইচ্‌।"

হাসিতে হাসিতে প্রশান্ত বলিল, "তা নিউমোনিয়াব চেয়ে থাইসিস গুরুতর ব্যাপারও ত' বটে।"

লাবণ্য বলিল, "শুধু কি তাই? তার চেয়েও ব্যাপারটাকে ও গুরুতর ক'রে তুলেছে। বলে, মেমসায়েব, আপনিও ত একজন গ্র্যাজুয়েট্‌, আমাকে বুঝিয়ে দিন, থাইসিসের বানান যদি টি এইচ আই এস আই এস হোত, আর 'থাই'-এর বানান যদি পি এইচ টি এইচ আই জি এইচ হোত তা হলে কি অন্যায় হোত। কি জ্বালা বল দেখি! এ আমি এখন কোথা থেকে সংগ্রহ ক'রে ওকে বোঝাই!" তারপর চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে বলিল, "আচ্ছা, তুমি ওর এই রকম বেয়াড়া উপদ্রব বরাবর সহ্য করবে না-কি?"

স্মিতমুখে প্রশান্ত বলিল, "কি করি বল?—তোমার দাদা অত সুখ্যাতি করে এই বিদেশে ওকে পাঠিয়েছেন, দু দিন রেখে তাড়িয়ে দিলে তিনিই বা কি ভাববেন? তার চেয়ে, তিনি আসুন, তারপর তাঁকে দিয়েই একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু যাই বল, গৌর গাড়ি চালায় ভাল, আর বাঙলা জানে চমৎকার।"

বিরক্তিকটু কণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "আরে, রেখে দাও তোমার বাঙলা জানে চমৎকার!"

প্রশান্ত বলিল, "না, না লাবণ্য, ডেভিলকে তার প্রাপ্যটুকু দিতেই হবে। কাল বার-লাইব্রেরীতে আমি পাঁচ জনকে বিজিগীষার মানে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। চারজন বললে জানে না, আর একজন বললে, বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা।" বলিয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

ঠিক এই সময়ে একজন বেয়ারা একটা টেলিগ্রাম লইয়া প্রবেশ করিল।

পরদিন প্রাতে সুলেখা আসিতেছে সেই খবর লইয়া কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে।

ক্ষণকাল পরে নীচে নামিয়া আসিয়া অবনীশকে ডাকাইয়া আনাইয়া লাবণ্য বলিল, "কাল সকালে কলকাতা থেকে আমার ছোট বোন আসছে গৌর।"

অবনীশ বলিল, "শুনেছি মেমসায়েব। সুতপা দিদি আসছেন না-কি?"

লাবণ্য বলিল, "না, সুতপা নয়। সুতপার বড় সুলেখা আসছে।"

অবনীশের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল; হর্ষোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "তিনি আসছেন?—ভারি আনন্দের কথা! আমার ওঁকে খুব ভাল লাগে। উনিও আমাকে খুব ভালবাসেন।"

একজন ড্রাইভারের কথার মধ্যে এই ভাল লাগা আর ভালবাসার অস্তিত্ব লাবণ্য ঠিক পছন্দ করিল না; বলিল, "তুমি ওদের জান না-কি?"

অবনীশ বলিল, "জানি বৈ কি মেমসায়েব, খুব জানি। হরিপদবাবুর ড্রাইভার কার্ত্তিক যে আমার মামা হয়। সুলেখা দেবীর বিয়েতে আমাকে কি কম পরিশ্রম করতে হয়েছিল। সেই পাকা দেখা থেকে আরম্ভ করে ফুলশয্যায় গিয়ে রেহাই। কিন্তু যাই বলুন মেমসায়েব, জামাই আপনাদের দেখতে শুনতে একটুও ভাল হয়নি। আমার বেয়াদপি মাফ করবেন, সুলেখা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক যেন বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা হয়েছে। সত্যি কথা বলতে হ'লে, আমাদের সায়েবের বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলের যোগ্যও তিনি নন।"

পারিবারিক ব্যাপারে অবনীশের এরূপ অসংযত কথাবার্তায় লাবণ্য উত্তরোত্তর বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু অবনীশের কথার শেষাংশে সেই বিরক্তি আপনা-আপনিই খানিকটা লঘু হইয়া গেল; বলিল, "তুমি ভুল বলছ গৌর।

আমার ভগ্নীপতি অবনীশ খুব বিদ্বান লোক; বট্যানিতে সে ডক্টর উপাধি পেয়েছে। তা ছাড়া, শুনেছি দেখতেও ভাল।"

অবনীশ বলিল, "আমিও শুনেছি তিনি শাক-সব্জির ডাক্তার। কিন্তু সে ত' ভদ্র সমাজের ডাক্তার নয় মেমসায়েব, চাষাড়ে ডাক্তার; চিরকাল মাঠে মাঠে চাষাভুষোদের মধ্যে কাটবে। আর, দেখতে ভাল বলছেন, সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাইনে, কাল এলে স্বচক্ষেই দেখবেন।"

লাবণ্য বলিল, "আমার ভগ্নীপতি কাল আসছেন না, তিনি কয়েক দিন পরে আসবেন।"

"আচ্ছা বেশ, কয়েকদিন পরেই তা হ'লে দেখবেন। বেঁটে, কালো, মুখের মধ্যে একটা যেন টেঁয়াপাখীর ভাব। তবে হ্যাঁ, একথা সত্যি, আমাদের সায়েবের মত ভবিষ্যযুক্ত চেহারা ক'টা বাঙালীরই বা আছে।"

লাবণ্যর মনে বিরক্তির পরিমাণ বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে স্বামী-প্রশংসার প্রভাবে পুনরায় কিছু কমিয়া গেল। মনে মনে বলিল, "বেশী বাঙালীর না থাক, সায়েবের ড্রাইভারের ত নিশ্চয় আছে।" প্রকাশ্যে বলিল, "খবরদার গৌর, সুলেখার সামনে এ-সব কথার বিন্দুবিসর্গও উচ্চারণ কোরোনা।"

জিভ কাটিয়া মুখে বিস্ময়ের 'তিচ্' শব্দ উচ্চারণ করিয়া অবনীশ বলিল, "তাও কখনো বলে মেমসায়েব?—তিনি আমাদের বাড়িতে অতিথি হবেন, সব রকমে তাঁকে খুসি করাই আমাদের কর্তব্য হবে।

লাবণ্য বলিল, "আচ্ছা, এখন যেতে পার। কাল ষ্টেশনে যাবার জন্যে খুব সকাল সকাল তৈরী হোয়ো।"

"ঠিক সওয়া সাতটার সময়ে আমি গাড়িবারান্দায় গাড়ি নিয়ে হাজির হব।"

লাবণ্য বলিল, "আচ্ছা, তা হ'লেই হবে।"

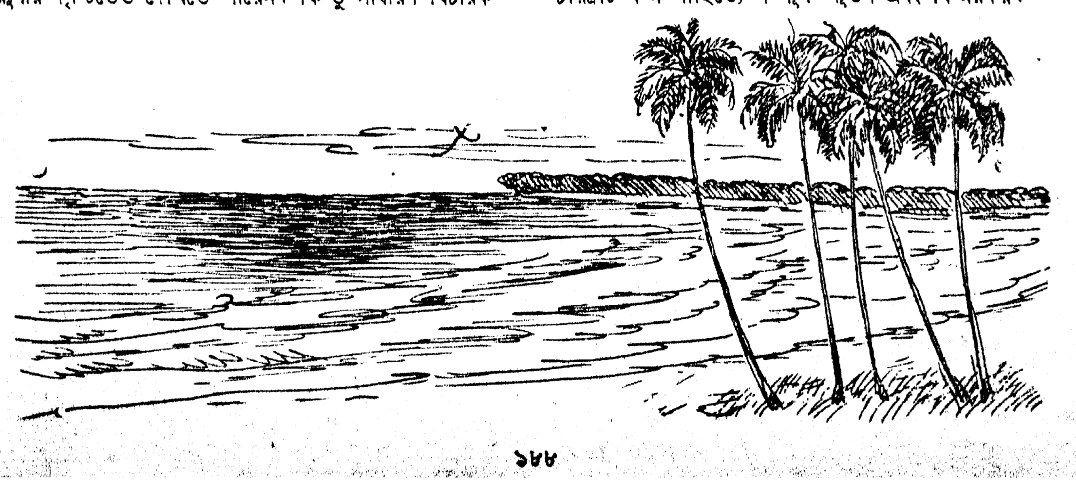
লাবণ্যকে অভিবাদন করিয়া অবনীশ চলিয়া গেল।

(ক্রমশ)

ল্যাবরেটরি

(১৮৫ পৃষ্ঠার পর)

কামনার অংশই পাইয়াছে, পায় নাই তাহার চরিত্রের অন্য স্তরের দিকটা, সেই জন্য সোহিনী প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে বীর্যের সহিত কন্যার প্রতি আসক্তদের হাত হইতে পরলোকগত স্বামীর অর্থকে বাঁচাইতে। যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের কাছে শুনিয়াছি, আশ্রমে উপস্থিত সত্যকামের কাছে যখন আশ্রম-ঋষি জানিতে পারিলেন যে সত্যকামের জননী, সত্যকামকে অসঙ্কোচে জানাইয়া দিয়াছেন যে সত্যকামের পিতা যে কে তাঁহা সত্যকাম-জননী জানেন না। তখন ঋষিবর সত্যকামকে স্নেহাশীর্বাদ জানাইয়া বলিলেন, তুমিই সত্য। সামাজিক সাধারণ রীতি এবং নীতির দিক দিয়া বিচার করিলে এরূপ জননী সমাজে নিন্দার পাত্রী এবং এরূপ পুত্রও অনেকেরই বিদ্রূপের পাত্র, কেহ কেহ বা তাহাকে করুণার দৃষ্টিতেও দেখিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ বিচারকদের মাপকাঠিতে সঠিক সত্যের বিচার হয় না।। এইরূপ মারাত্মক সামাজিক সত্যকে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়া একটি বড় উদ্দেশ্যকে জীবনে সফল করিবার চরিত্র-শক্তি সত্যিই সমাজে দুর্লভ। এই দুর্লভ চরিত্রের একটি দৃষ্টান্ত ল্যাবরেটরির সোহিনী। চরিত্রে এই অসাধারণত্বের উৎকর্ষণ আমাদের দেশে মহিলাদের মধ্যে হওয়া সহজে কেন সম্ভব নয় তার কারণ কি, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। সমাজে সোহিনীর আসনের পঙ্‌ক্তি তার সাধারণ নিচু স্তরে পাতা থাকিলেও, সাহিত্যে তাহার অন্য স্তরের মহত্বের স্বীকৃতি রহিবে। উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের ধর্মও এইজন্য সাধারণ স্তরের সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সাহিত্য বিচারের দিক দিয়া একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে, "ল্যাবরেটরি"র এই সোহিনী-চরিত্রটি বঙ্গ সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন এবং বিস্ময়কর।



চিকাগো

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

চিকাগোর এক নিগ্রো পাড়ায় আমার থাকার স্থান ঠিক হলো। যে ব্লকে আস্তানা নিয়েছি, সেখানে আমরা কয়েকজন ছাড়া সকলেই আমেরিকান্ শ্বেতকায়। আমাকে যিনি আশ্রয় দিয়েছেন, তিনি একজন হিন্দু। তাঁর পূর্বপুরুষ আঁখের চাষ করবার মজুর হয়ে প্রথম ত্রিনিদাদে আসেন। শিক্ষায় এবং চালচলনে তিনি নিজেকে হিন্দু প্রমাণ করতে পেরেছেন বলেই শ্বেতকায়দের ব্লকে স্থান পেয়েছেন।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই হিন্দু পরিবারের সঙ্গে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। কারণ এরাও নিগ্রোদের ঘৃণা করে। উপায় নেই, আমি যখন তাদের অতিথি, তখন আমার পক্ষে কিছু বলাটা শোভনীয় নয়। তাদের এই নিগ্রো-বিদ্বেষ যাতে বেশী না দেখতে হয়, তার জন্য বাইরে বাইরেই কাটাতে লাগলাম। দুপুরে একটার সময় ঘুম থেকে উঠে বের হতাম, রাত চারটার আগে ফিরে আসতাম না। সমস্ত শহরটাকে একবার ঘুরে দেখার ইচ্ছা হোলো। এই শহর খুন ও ডাকাতির জন্যে বিখ্যাত। এখানে চোর আছে, বিশ্ববিদ্যালয় আছে, মিউজিয়াম আছে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কশাইখানা আছে। এই নগরের বিশেষত্ব হলো, এখানে অনেক বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক থাকেন। বৈজ্ঞানিক এবং সাহিত্যিকেরা এই নগরকেই তাঁদের প্রধান আস্তানা করে নিয়েছেন, তার একটা কারণ আছে। সাধারণত যাঁরা সাহিত্য এবং বিজ্ঞান চর্চা করেন, তাঁরা নির্জনতাপ্রিয় এবং দারিদ্র্য তাঁদের চিরসঙ্গী। যার আয় নেই, তার অনটন হবেই। কিন্তু এই নগরে অনেক গলিঘুঁচি আছে, যেখানে সস্তায় থাকা যায়। সেজন্যই দরিদ্র বৈজ্ঞানিক এবং সাহিত্যিকদের এখানে এসে থাকতে হয়। এদেশে সাহিত্যিকরা সাহিত্যকে পেশা করেন নি, সাহিত্য তাঁদের সাধনার বস্তু। নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থেকেও এঁরা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এঁদের সত্য ও নির্ভীক মতবাদকে প্রকাশ করেন। এই দরিদ্র সাহিত্যিকের পাড়ায় একদিন হাজির হলাম।

বেলা তখন তিনটা। রাস্তায় লোক চলাচল কমে এসেছে। একদিকের ফুটপাথের ছায়ায় বসে একদল ছেলে জুয়া খেলছিল। তাদেরই কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, যেন তাদের জুয়া খেলা দেখতে আমি ভয়ানক ইচ্ছুক। একটি ছেলে মিনিট দশেকের মধ্যেই বেশ কিছু পয়সা করে নিলে। একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানকার যিনি সবচেয়ে বড় লেখক, তিনি কোথায় আছেন বলতে পারেন ?

ছেলেটি বললে, নিশ্চয়ই, তবে তিনি আজ সকালেই লস্ এঞ্জেলে চলে গেছেন, ফিরতে এক সপ্তাহ দেরী।

আর কোন লেখক কাছাকাছি কোথাও আছেন কি না জিজ্ঞাসা করায় ছেলেটি আমাকে একটি বাড়ি দেখিয়ে বললে, "এই বাড়িতে অনেক লেখক আছেন, যাঁদের পেশাই হলো লেখা।" বাড়িটাকে লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে চললাম।

দোতলা বাড়ি। নিচের তলায় বৈঠকখানা আছে। বাইরে থেকেই কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখা যায়, অনেকগুলি লোক বসে বই পড়ছে। ভেতরে ঢুকে সকলকে নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে আপনারা কি সকলেই লেখক ?

একজন বললেন, "হাঁ, আপনার জন্যে কিছু লিখতে হবে কি ?" কথাটা শুনেই আমার রাগ হলো, কিন্তু সবিনয়ে বললাম, "লেখকদের দর্শন পেতেই এসেছি, কিছু লেখাতে নয়।" আমার কথা শুনে প্রথমে সকলেই হেসে উঠল। আমার পরিচয় দেবার পর কেউ আর বিশ্বাস করতে চায় না যে, আমি একজন হিন্দু। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমার জাত সম্বন্ধে মনে হচ্ছে আপনাদের সন্দেহ এখনো দূর হয় নি।"

একজন প্রকাশ্যেই বলে ফেললেন যে, "আমি নিগ্রো ছাড়া আর কিছুই হতে পারি না।

জায়গাটি আমার ভাল লাগল। সকলেই আমাকে অনুরোধ করলেন কিছু বলবার জন্যে। দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা সুরু করে দিলাম। সর্বপ্রথমেই বললাম যে, যারা নিজেদের লেখক বলে পরিচয় দেয়, অথচ একজনের মুখ দেখে বুঝতে পারে না, লোকটি কোন্ জাতীয়, সেই লেখকরা করুণার পাত্র ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। উপসংহারে বলতে বাধ্য হলাম, যাদের মাঝে এত নিগ্রো-ভয় রয়েছে, তারা কি করে লেখক হতে পারে, তাও বিবেচ্য বিষয়। লেখকগণ আমার কথা শুনে আমাকে অপমান করতে প্রবৃত্ত হন নি। তারা নিজের ভুল বুঝতে পেরে দুঃখিত হয়েছিলেন। আমার মনে হয়, হয়ত তাদের লেখার কিছু খোরাক আমি জুগিয়েছিলাম। লেখক যে দেশের লোক হোক না কেন, অন্তত নূতন কিছু জানবার আগ্রহ তার থাকেই। কথাটা মনে রেখেই এত কথা বলতে সাহস করেছিলাম।

চিকাগো আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তর নগর; অন্ততঃপক্ষে তিন মাস থাকতে পারতাম, তবে অনেক কিছুই জানতে পারতাম আর অনেক কথাই বলতে পারতাম। কিন্তু সে সুযোগ আমার হয়ে ওঠে নি। যে কয়দিন ছিলাম, বুঝতে চেয়েছিলাম, চিকাগোতে এত দস্যুবৃত্তি হয় কেন। এই দুঃসাহসিক দুর্বৃত্তদের সম্বন্ধে এখানে অনেক কাহিনী শোনা যায়। অনেকে বলেন, যারা অলস, তারাই এসব দুরন্ত কাজ করে থাকে। কিন্তু ব্যাপারটি আসলে ঠিক তা নয়।

এব্রাহাম্ লিন্‌কন প্রচারিত 'কাজ কর, ভিক্ষা করো না' নীতিতে কাজের ফল ভোগ করে পুঁজিবাদী, আর মজুরকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে সামান্য কিছু দিয়ে থাকে মাত্র। যারা লিন্‌কন-মত মানেনা, কাজকে সোসিয়ালাইজ করতে চায় তারাই কাজ ছেড়ে দিয়ে পুঁজিবাদীদের ধনরত্ন অপহরণ ক'রে জীবন কাটায়। কথাটা শুনতে বেশ লাগে, কিন্তু কার্যত তা নয় বলেই মনে হলো। বড় দুঃখের সঙ্গে বলছি, যারা আমেরিকা হ'তে ফিরে এসে গ্যাংস্টারদের কথা নিয়ে রোমাঞ্চকর গল্প রচনা করেন, তাদের কথার কোন মূল্য নেই। এ সব গল্প সিনেমার জন্যেই লেখা এবং সিনেমাতেই তা শোভা পায়। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের ডাকাতরা চিকাগোর ডাকাতের তুলনায় আরও ভীষণ এবং নরপিশাচ। চিকাগোর বদনাম পূর্বে ছিল, কিন্তু বর্তমানে চিকাগোর ডাকাত চিকাগো

ছেড়ে ক্যালিফোর্ণিয়াতে পালিয়ে গেছে। কারণ চিকাগোতে এখন ভিখারীর আড্ডা। আমেরিকানরা বলে যেখানে পোলাণ্ডের লোক এবং ইহুদী বাস করে, সেখানে টাকা থাকতে পারে না। পোলরা সস্তায় কাজ করে, আর ইহুদীরা টাকা জমায়। চিকাগোতে সিনেমা, সিগারেট, ঘরভাড়া, প্রভিসন অন্য যে কোন শহর হতে সস্তা, কারণ লোকের কিনবার ক্ষমতা কমে গেছে।

চিকাগো থেকে বিদায় নেবার জন্যে আমি উৎসুক হয়ে উঠলাম। এই শহরের সকলেই যেন আলাদিনের প্রদীপ খুঁজে বেড়াচ্ছে রাতারাতি বড়লোক হবার জন্যে। চিকাগোর কথা শুনে এই নগরীর বিরাটত্ব সম্বন্ধে মনে যে কল্পনা ছিল, চোখে দেখে তা চুরমার হয়ে গেল। একটা প্রকাণ্ড নগর, বুভুক্ষা রাক্ষসী যেন হাঁ করে আছে। চিকাগো থেকে বিদায় নিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এবার যেতে হবে ক্যালিফোর্ণিয়ার পথে।

চিকাগো শহর ছেড়ে আসার পর আমরা পথে তেমন কোন বড় শহর পাইনি। কিন্তু প্রত্যেক গ্রামে এসেই আমরা দেখতে পেয়েছি, Private Hotel, Travellers Hotel এবং কেবিন। কিন্তু সল্ট লেক্ সিটি না পৌঁছান পর্যন্ত আমরা শান্তি পাইনি। কারণ পথিকের জন্য এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমাদের কোন সুবিধা মেলে নি; যেহেতু আমাদের রং সাদা নয়। প্রত্যেকটি হোটেল, ইন্, কেবিন যেন আমাদের বলছে এস না। হয়ত আমি একাকী থাকলে কোন কষ্টই হতো না, কারণ আমার সঙ্গী সদাসর্বদা সাদা লোকই জোটে। কিন্তু এ যে সোনায় সোহাগা, তিনজনই হিন্দু এবং তিনজনই একরঙা।

ক্রমাগত মোটর চালিয়ে আমরা সল্ট লেক্ সিটিতে এসে বিশ্রাম করি। সেই বিশ্রামের তুলনা হয় না। একটানা বারো ঘণ্টা ঘুমিয়েও যেন ঘুমের শেষ নেই। ঘুম থেকে উঠে মরুভূমির উপর হলিউডের স্টুডিও দেখতে গেলাম। স্টুডিও দেখবার জন্যে বেশ লোক সমাগম হয়ে থাকে। স্টুডিওগুলিতে মরুভূমির চিত্র উঠাবার মত বন্দোবস্ত যা আছে, তা প্রচুর নয় বলেই মনে হয়। দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়াতেও মরুভূমির ছবি তুলবার ভাল বন্দোবস্তই আছে।

সল্ট লেকের পাশ দিয়ে বেশ সুন্দর পিচ্ দেওয়া পথ চলে গেছে। পথের পাশেই স্বচ্ছ জল, তিক্ত স্বাদ। যে কোন লোক গিয়ে সেখানে সাঁতার কাটতে পারে। জলে ডুবে যাবার ভয় মোটেই নেই। রাবণ হ্রদের জলে মানুষ ডোবে না শুনেছিলাম, কিন্তু তা দেখবার সুযোগ হয়ে ওঠেনি; কিন্তু সল্ট লেক্ দেখে বুঝলাম, বাস্তবিকই যে জলে প্রচুর পরিমাণে লবণ রয়েছে, সেখানে লোক জলের নীচে যেতে পারে না। আমি তিরিশ হাত জলের নীচ হতে ডুব দিয়ে মাটি উঠাতে পারি, কিন্তু এই হ্রদের জলে তিন হাত নীচে গেলেই যেন দমবন্ধ হয়ে যায়।

হ্রদের তীরে কোথাও একফুট, কোথাও অর্দ্ধফুট উঁচু হয়ে লবণ পড়ে আছে। কিন্তু আমেরিকার লোক এখনও তত গরীব হয়নি, যাতে করে এখান হতে লবণ উঠিয়ে, সেই লবণের ব্যবসায় প্রবৃত্ত হয়। বোধ হয়, এমন কোন আইন আছে, যাতে করে এখান হতে লবণ উঠিয়ে অন্যত্র নেবার আদেশ নেই।

অনেকক্ষণ হ্রদে, হ্রদের তীর আর স্টুডিওগুলিতে ভ্রমণ করে আমরা সামনের পর্বতমালার দিকে অগ্রসর হলাম। রকি এবং আন্দিজ পর্বতমালার নাম পৃথিবীতে সুপরিচিত। আমরা এই পর্বতমালার উপর দিয়ে চললাম।

দুদিন দুরাত্রি ক্রমাগত মোটর চালিয়ে আমরা ক্যালিফোর্ণিয়ার সীমান্তে এসে পেঁছিলাম। ক্যালিফোর্ণিয়ায় পেট্রলের দাম প্রত্যেক গেলন আঠার সেণ্ট এবং প্রসিদ্ধ সিগারেট প্রত্যেক প্যাকেট ষোল সেণ্ট দেখে আমাদের চমক ভাঙ্গল। আমেরিকার নন্দন কাননে জিনিসের দাম বেশী বলেই মনে হতে লাগল। কেবিনগুলির প্রত্যেক রাত্রের জন্য দেড় ডলার করে দিতে হলো। বুঝতে পারলাম, আমেরিকার ধনরত্নের কেন্দ্রস্থলে আমরা এসে পেঁছেছি।

অতি কষ্টে ছোট একটা কেবিন ভাড়া করে দুরাত্রি অবিরাম ঘুমিয়ে ফের আমরা রওনা হলাম এবং পথে কোনো দিকে লক্ষ্য না করেই একটানা গাড়ি চালিয়ে সান্ ফ্রানসিস্‌কোতে এসে পেঁছালাম।

মিঃ মোহিত ঘোষ আমাকে clay street-এর কাছে নামিয়ে দিয়ে বললেন, "এবার আপনার হোটেল আপনি ঠিক করে নিন।" কম করে পনেরোটি হোটেল খোঁজাখুঁজির পর কোথাও জায়গা পেলাম না। অগত্যা মিঃ মোহিত ঘোষের কাছেই ফিরব বলে স্থির করেছি, এমন সময় একজন লম্বা, ধবধবে সাদা যুবক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—

"কি চাই আপনার?"

"হোটেলে থাকবার জায়গা, কিন্তু এদেশে যে আমাদের জায়গা পাওয়াই মুস্কিল হয়ে উঠেছে।"

যুবক আমকে বিনাবাক্যব্যয়ে একটি হোটেলে নিয়ে গেলেন, নাম তার International Hotel. মালিক তার একজন ফরাসী ভদ্রলোক। আমার দেশ ও জাতির পরিচয় না জেনেই তিনি আমাকে একটি ঘর দেখিয়ে দিলেন। মোহিতবাবুর কাছ থেকে আমার যথাসর্বস্ব পুটলিটা এনে ঘরে রাখলাম, তার পর ফের তাঁকে গিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে এলাম। তিনি যাবেন শান্তিয়াগো, স্বামী যোগানন্দের আশ্রমে।

তাঁকে বিদায় দিয়ে যুবকটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে ফিরছিলাম। পথে ঐ যুবকের সঙ্গে আরও কয়জনা লোকের কথাবার্তা হলো, তারা প্রত্যেকে তাকে কমরেড বলে সম্বোধন করতে লাগল। বুঝে নিলাম, যুবকটি কোন্ জাতীয় লোক হবে। কথা প্রসঙ্গে যুবক আমাকে জানালেন, আগামী কাল সকালে এসে আমার কাজের সাহায্য করবেন। যুবক পরদিন আমার কাছে তার আত্মকাহিনী বলেছিলেন এবং তাঁরই লেখা "life in grapes bush" পাঠ করতে দিয়েছিলেন। এখান থেকেই আমার ক্যালিফোর্ণিয়া ভ্রমণ সুরু হলো।

সামরী

(বড় গল্প—অনুবাদ)

শ্রীতারাপদ রাহা

৫

প্রতিবেশীদের কাছে অ্যানার মর্যাদা কিছুমাত্র ব্যাহত হয় নি। কার্লকে তারা অ্যানার স্বামী বলেই জানত। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাকে "হার্ রিচার্ড" বলেই ডাকত। মুদী, রুটীওয়ালা, মাংসওয়ালা সবাই অ্যানাকে তাদের আনন্দ জানিয়েছিল ঃ অ্যানার স্বামী ফিরে এসেছে এতে তারা সবাই খুশি, তারা সবাই আগে মনে করেছিল রিচার্ড মরে গেছে। পাশের ঘরের ভাড়াটেরা কার্লকে রোজ সকাল সন্ধ্যায় "হার রিচার্ড" বলে সম্ভাষণ জানাতো। মেরী ত এক রকম তার প্রেমেই পড়ে গিয়েছিল,—অবশ্য খুব বেশি নয়। কেবল তাকে শুধু 'রিচার্ড' বলে ডাকবার অধিকার পেয়েছিল। আর সবাই ডাকত—'হার্ রিচার্ড'। অ্যানা নিজেও তাকে রিচার্ড বলে ডাকত। আর শুধু ডাকাই নয়—দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রাণেও সে তাকে ঐভাবেই বরণ করে নিয়েছিল।

অ্যানার নিজের আর কাজে বেরুবার দরকার হয় না, তার স্বামীই এখন একটা কাজ জোগাড় করে নিয়েছে। সপ্তাহের শেষে শনিবারে মাইনে পেয়ে এসে সে শেষ পেনি পর্যন্ত অ্যানার হাতে ঢেলে দেয়। তারপর সে বেল্টে একটা হেঁচকা টান দিয়ে ছোট্ট ছেলের মত হাত বাড়িয়ে সে অ্যানার কাছে হাত খরচের পয়সা চায়—আন্যাও তার পকেট খরচের জন্য কিছু দেয়।

অ্যানার বিছানাটা বেশ বড়, ঠিক দুইজনের শোবার মত। কার্ল শোয় দেয়ালের দিকে। অ্যানা খুব ভোরে কার্লের অজ্ঞাতেই উঠে সকালের খাবার তৈরী করে। ঠিক আগে যেমন করত।

অ্যানা তার অনুচ্চারিত প্রতিশ্রুতি রেখেছে ঃ সে সন্তান-সম্ভবা,—এই তিন মাস চলেছে।

কার্ল তাকে বেশি নড়চড় করতে দেয় না, কোন ভারি জিনিস তুলতে দেয় না। কাজ থেকে ফিরে এসে সেই সিঁড়ী বেয়ে ছুটা-ছুটি করে—নিচে থেকে কাঠ কয়লা আলু নিয়ে আসে ; ঘরের মেঝে সেই নিজে হাতে ঘষে।

জগতে এমন কতকগুলি লোক আছে,—অনুকূল অবস্থার মাঝে থাকলে যারা চিরকাল ভালই থেকে যায়,—এমন অনেক মেয়েলোক আছে যারা প্রেমে পড়লে অসম্ভব সুন্দর হয়ে উঠে ; চোখে মুখে তাদের সর্বদা এমন একটা আনন্দের দীপ্তি থাকে যে, পথ দিয়ে যাবার সময় কেউ সে দিকে একবার না তাকিয়ে পারে না।

দিনের মাঝে কত শতবার অ্যানা আনন্দে মুহ্যমান হয়ে পড়তঃ যখনই সে তার ভালবাসার জনটিকে দেখতে পেত,—বা তার কথা ভাবত,—যখনই মনে পড়ত কোন ভালবাসার কথাটি সে বলেছে—কেমন করে সে তাকিয়েছে—তার শিশুকে কত আদরে সে নিজের দেহে বহন করছে—তখনই আনন্দের বন্যা বয়ে যেত তার দেহে মনে। অন্তর থেকে যেন কি এক রাগিনী বেজে উঠত। তার ভালবাসা একদিকে ছিল যেমন উদ্দাম,—অন্য দিকে ছিল তেমনি সুকুমার রক্ষণশীল,—ঠিক যেন শিশুর উপর মায়ের ভালবাসার মত। এদিকে কার্ল ঘরে, বাইরে, কারখানায় রাস্তায় যেতে আসতে—সর্বত্রই অ্যানাকে দেখত, সর্বদাই ভাবত তার কথা। তার জীবনটাই অ্যানা-ময়। তার দেহের শোণিত যেন অ্যানার মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। সে অ্যানার সঙ্গে একেবারে এক হয়ে গেছেঃ অ্যানা তাকে ভালবেসেছে।

সন্ধ্যাকালে সে ঘরে বসে একটা যন্ত্র নির্মাণ করত। সে রকমের যন্ত্র আগেই ছিল,—তারই এক উন্নত ধরণ করবার জন্য চেষ্টা করছে সে। যন্ত্রটা পরখ করেও দেখা হয়ে গেছে,—এতে কয়েক শত মার্ক ঘরে এসেছে তার। পয়সা তাদের চাই ঃ খোকন আসছে!

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেই সে অ্যানাকে দেখতে পাবে—এই চিন্তা ছিল তার হৃদয়ে এক স্বচ্ছতোয়া নীল হ্রদের মত প্রীতিকর। স্বপ্নে যেন তার মন বিভোর হয়ে থাকত। একদিন সন্ধ্যায় ঘরে এসে সে অ্যানাকে দেখতে পেল না ; ঘরে অ্যানা না থাকলেও তার অস্তিত্বের সাক্ষ্য রয়েছে সর্বত্র ঃ গ্যাস চুল্লীর পাশে যেমন করে গেলাসটা রাখা হয়েছে, কড়াটা যেমনি করে ঝুলেছে, সেলাইয়ের চুপড়ীটা যেমনি করে তাকের উপর পড়ে রয়েছে—এর সব কিছুতেই যেন অ্যানা মিশে রয়েছে।

অ্যানা যখন ঘরে ফিরে এল—কার্ল তখন চুপ করে বসে কেবল তাকে দেখতে লাগল;—বাতাসে যখন অ্যানার কপালের ঝুরো চুলগুলিতে দোল দিয়ে গেল—তখন কার্ল খুশি হয়ে উঠল। অ্যানার বুঝতে কিছুই বাকি রইল না। রাত্রের খাবার তৈরী করতে করতে কার্লের পাশ দিয়ে যাবার সময় অ্যানা তার মাথায় আর কাঁধে হাত বুলিয়ে গেল।

"তুমি কোথায় গেছলে, অ্যানা?"

আনন্দে গলে গিয়ে মধুর স্বরে অ্যানা বললে, "গেছলাম আমি মুচীর দোকানে,—তোমার জুতো সেলাই করাবার জন্যে।"

কার্ল শুনলে—অ্যানা যেন বলছে,—"আমি তোমায় ভালবাসি প্রাণের চেয়েও।"

কার্লও তার নিজের প্রাণের চেয়ে হাজার গুণ অ্যানাকে বেশি ভালবাসত। এখানে আসবার আগে তার জীবন ছিল একটা শাশ্বত অতৃপ্তি, নির্জনতার একটা নিদারুণ ব্যথা।

অন্যান্য সকলের সঙ্গে এই দুইজনের যে পার্থক্য ছিল—সবার উপরে এরা দুইজন যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল—তার কারণ—এরা নিজেদের আনন্দ সম্বন্ধে সচেতন ছিল। জীবনের কোন মুহূর্ত তারা বৃথা চলে যেতে দিত না। প্রেমে ছিল গভীরতা আর দরদ, যে কোন সময়ের দৃষ্টির মধ্যে তা ধরা পড়ে যেত।

দেহের মিলনের সাথী ছিল তাদের প্রেমের আলো, তাই মিলনে তাদের বিরহ ছিল না। প্রত্যেক আদরের স্পর্শের ভিতর তারা জীবনের অর্ঘ্য আর পরিপূর্ণতা আবিষ্কার করতো।

কথায় তারা বেশি কিছু বলত না,—উঁচু দরের বলনেওয়ালা তারা কেউ ছিলও না। হৃদয়ের স্পন্দনে, আন্তরিক কাজে, আর মুখের হাসিতে তাদের সব কিছু বলা হয়ে যেত। তারা ধনী ছিল হৃদয়ের ধনে।

সেলাই করতে করতে অ্যানা যখন সেলাইয়ের জিনিসপত্র ঘরের এক কোণে ছুড়ে ফেলে দিত,—কার্ল অমনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে বলত, "চলো এইবার বাইরে বেরিয়ে পড়া যা'ক।"

তাদের বেড়ানোর জায়গা ছিল—জনবহুল সহর, খোলা মাঠ, বন—এই সব, অন্য লোকের সঙ্গ তারা চাইত না, কারণ—পরস্পরের সঙ্গ পেয়ে তাদের অন্তর ভরে উঠেছে।

একদিন তারা রেলওয়ের মেন লাইন ধরে অনেক দূর বেড়াতে গিয়েছিল, টেলিগ্রামের থাম্বাগুলি একের পর একটি গিয়ে কোন সুদূরে হারিয়ে গেছে—দেখতে বেশ লাগছিল। যখন তারা বেড়িয়ে ফিরে এল মেরী এসে তাদের ঘরে কেঁদে পড়ল।

তার বোনের স্বামী ছুটিতে সীমান্ত থেকে ঘরে ফিরে এসেছিল। মোটর মিস্ত্রীর ছেলের দিকে অনেকক্ষণ ধরে সে চেয়ে থাকল,—তার বউয়ের যা কিছু সব বলবার ছিল সব সে কান পেতে শুনলে, তারপর একটিও কথা না বলে সে ফেরতা ট্রেনে আবার সীমান্তে ফিরে চলে গেছে।

তিনজনই আলোর নিচে টেবিলের পাশে বসলে। মেরীর চোখে তখনও জল। সে হাত বাড়াতে অ্যানা তার হাতে নিজের রুমালখানা দিলে।

"ও যে অমনিধারা করবে—এ কথা আমরা কখনও ভাবি নি।"

অ্যানা প্রথমে কার্লের দিকে, তারপর মেরীর দিকে তাকালো। "কি করা তার উচিত ছিল?" দমটা যেন অ্যানার বন্ধ হয়ে আসছিল, কেন যে এমন হচ্ছিল—সে বুঝতে পারছে না। "অ্যানা ত ওরই স্ত্রী।"

"ফ্রা মোসারের স্বামী যখন ফিরে এল, ফ্রিজ্ নামে যে লোকটা তার সংগে বাস করছিল, সে অমনি সরে পড়ল। এই ত ঠিক। আর হার হাস্‌লারের কান্ড দ্যাখ না—স্বামী তার আজ তিন হপ্তা ফিরে এসেছে, অথচ পোস্টাফিসের কর্মচারী যে লোকটা ওর সংগে থাকত তার তবু সরবার নাম নেই, অন্য একটা ঘর না পাওয়া পর্যন্ত সে আর নড়ছে না। তিনজনে মিলে একই ঘরে শুচ্ছে—ব্যাপার দেখ।" মেরী যখন এই কথাগুলি বল্‌লে তখনও সে কাঁদছে।

অ্যানা বললে, "মেরী, তুমি সব জিনিসই বড্ড বেশি হালকা-ভাবে দেখ। হার লিনার্ট তার বউয়ের সংগে কেমন ব্যবহার করেছে? সে তার বউকে এমন মার মারত—যে দেখে মনে হ'ত এক্ষুনি সে মারা যাবে। শেষে গিয়ে তারা ছাড়াছাড়ি হ'ল।"

"সব জায়গায়ই এমনি হয় না,—দোষ খানিকটা আমাদেরও। ......ফিরে সে আসবেই, আমি জানি সে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে, আর তখন আমি গিয়ে তার ঘাড়ের উপর পড়ব, দেখো তুমি, অ্যানা, ঠিক গিয়ে আমি তার ঘাড়ে পড়ব।"

"তুমি বলছ—ওরা তিনজনে একই ঘরে রাত কাটাচ্ছে?" অ্যানা কার্লের দিকে চাইলে। এ পর্যন্ত সে একটিও কথা বলে নি। তার চোখ দুটি যেন আর এ রাজ্যে নেই। অ্যানাও বুঝতে পারছে না—তার বুকের স্পন্দন হঠাৎ এমন দ্রুত হয়ে উঠলো কেন।

"আমি গিয়ে তার গলা ধরব, আর অমনি সব রাগ তার পড়ে যাবে।" অ্যানার সুন্দর মুখে এইবার হাসি ফুটে উঠেছে। গালে আবার টোল দেখা দিয়েছে। কার্লও অ্যানাকে বললে, "আমি এইবার একটু কফি তৈরী করতে যাচ্ছি!"

মেরীর প্রকৃতিটা একটু অদ্ভুত ধরণের ঃ সবাই যখন মনমরা হয়ে বসে থাকে—তখন হয়ত সে হো হো করে হাসতে সুরু করে দেয়,—আবার সবাই যখন ঠাট্টা তামাসা করছে তখন হয়ত সে কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। প্রত্যেক ব্যাপারই তাকে অতি দ্রুত প্রবলভাবে অভিভূত করে ফেলে। মন আবার তার চাঙ্গা হয়ে ওঠেও খুব তাড়াতাড়ি ঃ ঠিক যেন একটা কর্কের মত,—প্রত্যেক ঢেউয়ের আঘাতেই সে ডুবে যায় কিন্তু পরক্ষণেই আবার মাথা খাড়া করে ওঠে—প্রবল ঝড়ে একেবারে ডুবে যায় না।

কার্লের সারা মন পড়ে রয়েছে—ইউরোপ আর এশিয়ার মাঝে সেই স্তেপের মাঝে। আর এদিকে বুকের কাঁপন থামাতে অ্যানা বারবার নিজের কণ্ঠের নিচে চেপে চেপে ধরছে।

কার্ল যে নোতুন যন্ত্রটা তৈরী করছিল সেটা ছিল জানলার তাকে। অফিসের মেসিনে সে খানিকটা কাজ রোজ সেরে আসত—কিন্তু উকো দিয়ে ঘষে ফিট করতো বাড়িতে এসে সন্ধ্যা বেলা। এইবার সে প্রমাণ আকারের শেষ 'মডেল' তৈরী করছিল। দেখতে একটা শিশুর মুঠের চেয়েও ছোট।

এইবার সে উঠে মডেলের ছোট ছোট অংশগুলি তাক হতে নিয়ে উকো বেছে নিয়ে কাজ করতে সুরু করে দিল। অ্যানা ভাবতে লাগল লোকটা খাটতে খাটতে একেবারে মারা যাবে।

ভাগ্যে যে তাদের কি আছে—ভেবে দুইজনেই আতঙ্কে শিউরে উঠলো। সে রাত্রে তারা গভীর আলিঙ্গনে বন্ধ হয়ে হৃদয়ে হৃদয় মিলিয়ে বারবার বিধাতার কাছে আবেদন পাঠালে—তিনি তাদের জীবনমৃত্যু যা খুশি হয় দিন,—কিন্তু বিচ্ছেদ যেন না দেন। মনে তাদের পাপের ভাব আর রইল না।

এর আট দিন পরে মেরীর বোন সামরিক কর্তৃপক্ষ থেকে সংবাদ পেল—তার স্বামী ছয় দিন আগে মারা গেছে।

বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেরা আগে কোন দিন তার সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করে নি,—কিন্তু এই খবর শুনে তারা তাকে নিন্দা করতে লাগল। কত জনে কত লাঞ্ছনা গঞ্জনার কথা বলতে লাগলো ঃ সেই তার স্বামীকে তাড়িয়ে মারলে। অনেকে গালাগালি দিয়ে তাকে বেনামি চিঠি লিখতে লাগলো। মোটার মিস্ত্রী নিজের দোষের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে—সকাল বিকালে উঠান পার হবার সময় এদিকে ওদিকে রুক্ষ মেজাজে চাইত। নিজেদের ঘরেও তারা দুইজনে নিতান্ত প্রয়োজন না হলে আর কথা বলত না। স্ত্রীলোকটা নিজের মনে শুধু কাজ করে যেত। কয়েক সপ্তাহ গেলে শোক কমে গিয়ে আবার তাদের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল।

সিঁড়ির পথে উঠানামা করবার সময় প্রতিবেশী মোটার মিস্ত্রীকে আবার নমস্কার করতে সুরু করলে,—মেরীর বোনেরও আর বড় গঞ্জনার কথা শুনতে হ'ত না; বাড়ির যে সাধারণ ধোঁতাগারে সবাই পালা করে কাপড়চোপড় ধোয়, সেখানে সে কাপড় ধুতে গেলে, অপরের স্বার্থহানি হলে সে কেবল মাঝে মাঝে দুই চারটে কথা শুনত।

এর দুটী ছেলেকে শুধু অন্যান্য ছেলেদের সংগে ভয়ানক-ভাবে লড়তে হত। দিনের মাঝে কতবার যে ছেলের দল এদের মাকে উদ্দেশ করে যা তা গালাগালি দিত তার ঠিকঠিকানা নেই,—ছেলে দুটি মাকে বাঁচানোর জন্য প্রাণপণ লড়ত।

অ্যানা এতক্ষণ সোফার উপর শুয়ে ছিল, সে হঠাৎ উঠে ড্রয়ারটা খুললে, তারপর খোলা ড্রয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে সে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ঃ সে কি চায়?

কিছুক্ষণ পরে সে একটা পুরানো পোস্টকার্ড টেনে বের করলে। চার বৎসর আগে সামরিক কর্তৃপক্ষ তাকে এই চিঠিখানা লিখেছিল। এতে লেখা আছে—রিচার্ড মারা গেছে। বহুদিন পরে চিঠি-খানার উপর সে যখন যন্ত্র চালিতের মত আবার চোখ বুলাল তখন একখানা ধারাল ছুরি যেন তার শরীরের ভিতর দিয়ে চলে গেল।

কিন্তু ও ত এখনই যে কোন মুহূর্তে ঘরে আসছে ঃ এই ভাবনার সংগে সংগে তার মনে আবার শান্তি ফিরে এল। "বিয়ের আগে যা কিছু করেছি—তুমি বোধ হয় তা-ও জানো,—আমার নিতান্ত শিশুকালের কথাও বোধ হয় তোমার অজানা নেই?"

অ্যানা কিভাবে এই কথাগুলি বলেছিল—সে কথা তার বেশ মনে আছে।......সে কিন্তু সত্যিই সব জানে। অ্যানার জীবনের কথা তার মত জগতের কেউ জানে না—এমন কি অ্যানা নিজেও বুঝি—না। কারণ সে অ্যানাকে প্রাণভরে ভালবাসে। অ্যানাও সর্বান্তঃ-করণে তাকেই চায়—তার সংগে অ্যানার জীবন একেবারে মিশে গেছে। অন্য কিছু একেবারে অসম্ভব,—আর কোন কথা ভাবতেও পারা যায় না।

"১৯১৪ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেছে।" —এ যেন এ যুগের কথা নয়। এই পুরানো পোস্টকার্ড ছাড়া এর আর কোন কিছু অবশিষ্ট নাই। আচ্ছা, সংবাদটা কি সত্যি? ও ত বল্‌লে সামরিক কর্তৃপক্ষ ভুল করেছে।.........কি ভুল করেছে ওরা?—যে মারা গিয়েছে তাকে অ্যানার স্বামী মনে করা ভুল? না—আর কিছু? সহসা অ্যানার মাথা আর হাত পা এত অবসন্ন বোধ হ'তে লাগল যে, সে আর দাঁড়াতে পারলে না,—কোন রকমে আসবাবপত্রের কিনারা ধরে টাল সামলে সে সোফায় গিয়ে পড়লে। সংগে সংগে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ছ'টা বাজল, সাতটা বাজল, অ্যানা অঘোরে ঘুমুচ্ছে,—তার সারা

গায়ের পেশী, স্নায়ুগুলি সব এলিয়ে পড়ল। পিয়ন এসে দরজায় ঘা মেরে একখানা চিঠি গলিয়ে গেল।

নিস্তব্ধ আবহাওয়ায় প্রথম বজ্রনাদের মত অকস্মাৎ তার শিথিল স্নায়ুকে চমকিত করে—তৎক্ষণাৎ এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মাঝে স্বপ্ন সুরু হ'ল ঃ ভয় পেয়ে চমকে উঠে অ্যানা দরজার কাছে এগিয়ে গেল। মেঝের উপর একখানা চিঠি পড়ে রয়েছে। চিঠি এসেছে রিচার্ডের কাছ থেকে। অ্যানা চিঠিটা বের করতে পারলে না,—খাম তার-কাঁটা দিয়ে আচ্ছা করে আঁটা।

আমি যে পড়তে প্যরলাম না এ ভালোই হ'ল। ও এসে আগে পেরেকগুলি খুলে ফেলুক। ও ত এক্ষুণি এসে যাবে।......কিন্তু ও পড়ে ফেললে হয়ত আমার সবই শেষ হয়ে যাবে। সব শেষ। ভাবতে পারি না।

অ্যানা চিমটে নিয়ে এল, তারপর হাঁটু গেড়ে বসে তিনটে পেরেক খুলে ফেললে, আরও তিনটে খুলতে বাকি। আরও চারটি পেরেক বাকি রয়েছে যে। তা ভালোই,—কেউ খুলতে পারবে না চিঠি। অ্যানা খুশি হয়ে ঘুমানোর জন্য শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম ভেঙে গেল।

ওঃ আমি ত্'লে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম। চিঠি যে পেরেক দিয়ে আঁটা এ ত্'লে স্বপ্ন। চিঠি ত ঐ মেঝের উপর পড়ে রয়েছে। আমি ত এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম। এইবার গিয়ে চিঠিখানা কুড়িয়ে আনতে হ'বে। অ্যানা দরজার কাছে চিঠির দিকে তাকাতেই দেখতে পেলে রিচার্ড যেন এক আকাশ জোড়া অদৃশ্য আলোর পাঁচিলের মত সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অ্যানার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,—"চোখের ভুল এ।"

রিচার্ডের যেন মাথা নেই, সুতরাং চোখও তার থাকতে পারে না ; অথচ কি করে দুই চোখে সে অ্যানার দিকে তাকিয়ে বলছে ঃ "আমাদের সেই কাঁটাটা কোথায়- দাও।"

অ্যানা সেই কাঁটাটা রিচার্ডের দিকে এগিয়ে দিল। রিচার্ডের মাথা নেই,—তবু টেবিলের পাশে বসে সে লম্বা ফালি দিয়ে রুটি কাটতে লাগল।

ওঃ এও ত দেখতে পাচ্ছি স্বপ্ন। আর না,—এবার আমায় যেমন করে হ'ক জাগতেই হ'বে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত অসাড় দেহে কোন মতে বিছানা ছেড়ে লম্বা লম্বা দু ধাপ এগিয়ে চিঠিটা তুলে নিয়ে খুললে, কিন্তু বুকের ভিতর তার এমন করতে লাগল যে চিঠিটা সে আর পড়তে পারলে না।

অ্যানা দুই হাতে মুখ রেখে তখনও অকাতরে ঘুমুচ্ছে। রিচার্ডের মাথা নেই তবুও সে টেবিলের ধারে বসে আছে। সে ঘাস চিবুতে চিবুতে হাসিমুখে বলছে ঃ "তাতে কি হয়েছে,—আমি সব বুঝি। এ অবস্থায় এমনি ঘটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তুমি আর একটু ঘুমোও।"

অ্যানার মনে নিবিড় শান্তি নেমে এল। সে স্বপ্ন দেখলে—সে যেন আবার ঘুমিয়ে পড়ছে এবং ঘুমুতে ঘুমুতেই ঘুমের গভীর শান্তি অনুভব করতে লাগল।

চিঠিখানা মেঝেতে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বপ্ন ভেঙে গেল। স্বপ্নটা আরম্ভ হয়েছে যখন পিওন এসে দরজায় ধাক্কা দিয়েছে। দুইয়ের মাঝে ব্যবধান মাত্র এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ—কিন্তু ঘুমের মাঝে তার মনে হচ্ছিল সে যেন চার ঘণ্টা ধরে স্বপ্ন দেখছে।

চিঠিটা মেঝেতে পড়বার শব্দে সে চমকে জেগে উঠল, পিওন নাল দেওয়া জুতো পরে' কাঠের সিঁড়ী দিয়ে ঠকঠক্ করে নিচে নেমে যাচ্ছে—সে শব্দ তার কানে এল। তখনই তার মনে পড়ে গেল—রিচার্ডের কাছ থেকে একখানা চিঠি আসার স্বপ্ন দেখছে সে।

বুকের স্পন্দন যেন তার থেমে গেল। সে তখনও স্বপ্ন দেখছে মনে করে উদ্বেগে দুই হাত দিয়ে গলাটা আচ্ছা করে চেপে ধরলে। একখানা চিঠি কিন্তু সত্যিই মেঝের উপর পড়ে রয়েছে।

খামের উপরে ওলন্দাজ ডাক টিকেট মারা,—লাল পেনসিলের দাগ আর সেন্সারে রবার স্ট্যাম্পে চিঠিখানা একেবারে যা-তা হয়ে গেছে, তারপর আবার কার্বলিক এসিডের গন্ধ ভুর্ ভুর্ করছে। অ্যানা খুললে চিঠিখানা।

বিয়ের আগে একবার অ্যানা স্বপ্ন দেখেছিল—তার মা'র কাছ থেকে চিঠি এসেছে। মা তার এক অনাথ আশ্রমে থাকে,—কয়েক বৎসর সে চিঠি লেখে না। ঘুম ভাঙার পর অ্যানা দেখে—চিঠির বাক্সে মায়ের চিঠি রয়েছে।

এবারকার চিঠি পেয়ে তার মনে হ'ল চিঠিখানা না পড়েই সে পুড়িয়ে ফেলে। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে সে চিঠি নিয়ে গ্যাস চুল্লীর কাছে এগিয়ে গেল।

"প্রিয় অ্যানা,—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—আমি এখন কাদের বন্দী—ইংরেজের—না—জাপানীদের। মোট কথা এখন আমি জাহাজে চলেছি। থাকতে দিয়েছে এক কয়লার গুদামে,—গরমে প্রাণ বেরিয়ে যায়। একখানা জাহাজ কাল 'মাইনে'র উপর পড়ে শেষ হয়ে গেল,—দুইবার মাত্র বিস্ফোরণ হল, বাস্—সব শেষ। কয়েক ঘণ্টা শুধু চারিদিকে একটা দুর্গন্ধ রইল। আমাদেরটারও এই দশা হতে পারত,—তোমায় আমায় আর দেখা হ'বার সম্ভাবনা থাকত না—তা' হলে। আজ আবার আমাদের জাহাজ ছেড়েছে,—চারিদিকেই 'মাইন' পাতা; তার ভিতর দিয়েই চলতে হচ্ছে আমাদের। কোথায় যে আমরা চলেছি তাও কেউ বলতে পারে না। একজন ওলন্দাজকে এরা ছেড়ে দিচ্ছে,—বাড়ি যাচ্ছে সে—তারই হাতে এই চিঠি দিচ্ছি আমি। আমার অ্যানা, এই চিঠি যদি তুমি পাও, তুমি জেনো আমি তোমায় আগেকার মতই ভালবাসি। কবেই যে আমাদের সেই ছোট্ট ঘরটিতে তোমার কাছে ফিরে যেতে পারব—তাই ভাবছি। খাবার কষ্ট আমাদের নেই—জেনো।"

মানুষ চলতে চলতে বজ্রাঘাতে যেমন হঠাৎ একেবারে স্থির হয়ে যায়—অ্যানাও চিঠিখানা পড়ে ঠিক তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

খামে যে ওষুধের গন্ধ ছিল তার চেয়ে অনেক তীব্র গন্ধ ছিল চিঠিতে। সেই গন্ধ নাকে গিয়ে অ্যানার শরীর অস্থির করতে লাগল ঃ এখনই হয়ত পেটের অন্নজল সব বেরিয়ে পড়বে। তাকের উপর যেখানে ফলের পাত্র ছিল, অ্যানা তাড়াতাড়ি তারই পাশে চিঠিখানা রেখে দিল। খানিকটা তার তাকের বাইরে বেরিয়ে ছিল সে আঙুলের ডগা দিয়ে আস্তে সেটা সরিয়ে ঠিক করে রাখলে।

দেহের ভিতর খোকনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। অ্যানা দৌড়ে দোকানে চললো। রিচার্ড যে কোন মুহূর্তে ঘরে এসে যাবে,—এসেই বলবে খেতে দাও, এত ক্ষুধার্ত হয়ে আসে সে। কিন্তু চিঠি এসেছে যে —এর কি করা যায়! রিচার্ডের চিঠি! এখনও ছুটে গেলে হয়ত কয়েকটা ডিম পাওয়া যায়।.........আরেকখানা জাহাজের কথা যা লিখেছে—ওখানায় ও থাকলে আর আমাদের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা থাকত না।......ডিমের দোকান ত একটু দেরী করেই বন্ধ হয়।

দোতালায় নেবে আসতে আসতে অ্যানা এর মাঝে আবার সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উপরে উঠে গিয়ে নিজের ঘর খুললে। চিঠিখানা সে আর একবার পড়ে নিল। নিশ্চয়ই এ সব ভুল। একখানা কাগজে শুধু পেনসিল দিয়ে কতকগুলি কথা লেখা। কোন এক গত-জীবনের কথা এ সব। সামরিক কর্তৃপক্ষ যেমন সেই পোষ্টকার্ড পাঠিয়েছিল! সে কি আজকের কথা। জীবনের প্রতিদিন যখন সহজ সৌন্দর্যে মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে—তখন শুধু কতকগুলি কথা এসে তার জীবনটাকে একেবারে ওলোটপালট করে দেবে?

"......তুমি জেনো আমি তোমায় আগেকার মতই ভালবাসি। কবেই যে আমাদের সেই ছোট্ট ঘরটিতে তোমার কাছে ফিরে যেতে পারব—তাই ভাবছি। খাবার কষ্ট আমাদের নেই—জেনো।"

অ্যানা এখানে এল কি করে? সিঁড়ী বেয়ে নেমে রাস্তায় হেঁটে সে এর মাঝে দোকানে এসে গেছে? কি করে হ'ল? মনে মনে সে ত এখনও নিজের ঘরে চেয়ারে বসে চিঠি পড়ছে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে সে একবার মাথা তুলে চাইলে।

ডিমওয়ালী বললে,—"ফ্রা অ্যানা—তোমার শরীরটা যেন তেমন ভালো নেই। তা' এ অবস্থায় শরীরের একটু ভালো মন্দ হয়েই থাকে। এই একটু আগে তোমার স্বামী এখানে এসেছিল। ভয় নেই, ভয় নেই, আমরাও ত মা হয়েছি,—জানি, তোমার কেমন লাগছে—জানি। ভয় নেই তোমার। তোমার স্বাস্থ্য ত বেশ ভালই আছে।

এদিকে কার্ল এসে দরজার হাতল ঘোরালে। "বাড়ি নেই।" দরজা খুলে ঘরে ঢুকে চারিদিকে সে একবার তাকিয়ে দেখলে। চিঠির গন্ধটা নাকে এসে লাগল। কার্বলিক এসিড?—তবে কি কি কিছু ঘটল?—রীতিমত ভয় পেয়ে গেল সে।

"আমার স্বামী কেন এসেছিলেন—এখানে?"

"তোমার জন্যে আর কিছু দুধ দিতে পারি কিনা জিজ্ঞাসা করতে। যা পারি তা ত তোমাদের দিচ্ছিই আমি।"

ব্যাপারটার স্বরূপ জানতে অ্যানার আর বাকি নেই। বাড়ি গিয়েই ওর মুখোমুখি দাঁড়াতে তার বুক দুর দুর করছিল। রাস্তায় চলতে চলতে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অ্যানা নিজের মনকে দৃঢ় করে নিতে চেষ্টা করল।

কার্ল দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। ভয়ে সে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিলঃ কি জানি কি ঘটে,—অসময়ে ছেলে হতে গিয়ে অ্যানা যদি মারা যায়। হঠাৎ মনে হল সে যেন রেল-পথে দুই লাইনের মাঝে চলন্ত গাড়ীর সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়ে আছে, ছুটে আসছে তার ভাগ্য; বাধা তাকে সে দেবেই প্রাণ যায় তা-ও স্বীকার।

পরক্ষণেই একটা পরিচিত পদধ্বনি তার কানে এল, কান পেতে সে শুনতে লাগল। সিঁড়ীতে এমনি করে আর কারো পায়ের শব্দ হয় না। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বলে উঠলঃ "এই যে এসেছ,—কি ব্যাপার বল ত?"

দরজার সামনে মুখোমুখী তারা দুইজন দাঁড়াল। "স্বামীর কাছ থেকে একখানা চিঠি এসেছে।" তুই যখন দূরে পড়ে রয়েছিস,—ধর সে তখন তোর উপর নিষ্ঠা হারিয়ে আর একজনের সঙ্গে ঘর করছে। স্তেপের ঘাসের উপর শুয়ে সে যেন রিচার্ডের কাছ থেকে এ কথার উত্তর শুনছে,ঃ "তোর এ সবে কাজ কি—অ্যানার সম্বন্ধে তুই একটু মুখ সামলে কথা বলবি। অ্যানাকে তা হলে আমি—" সে দেখতে পেলে গাইঁতিটা বোঁ করে ঘুরিয়ে রিচার্ড যেন একেবারে অ্যানার মাথার উপর নিয়ে এসে ফেললে।

কিন্তু অ্যানা ত তাকে প্রতারণা করে নি, এ ত একেবারে অন্য ব্যাপার। দরজা খুলে সে অ্যানাকে ঘরে আসতে ইসারা করলে। অ্যানা ঘরে এসে কাগজের ঠোঙাটা রেখে কার্লের দিকে চাইল। "এইবার আমায় সব খুলে বল।" অ্যানার হাব-ভাব দেখে মনে হয়—হৃদয়ের সত্য ও ভাগ্যকে মেনে নেবার জন্য সে যেন প্রস্তুত হয়ে আছে,—সে যেন বলতে চায়,ঃ ভাগ্যে যা হয় হক, আমি অন্য কিছু আর করতে পারব না। ফিরে এসে সে যদি আমায় মেরে ফেলে, ফেলুক, আমি একটুও শব্দ করব না।

কোন রকম হৈ চৈ করবার লোক কার্লও নয়। কিন্তু সে পুরুষ, শেষ পর্যন্ত প্রাণপণ লড়ে তবে সে মরবে। মরণকে সে বরণ করতেও রাজি আছে,—কিন্তু অ্যানাকে ছাড়বে না সে,—কিছুতেই না। অ্যানাকে সে মনের কথা আগাগোড়া সব খুলে বললে।

রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এল, তারা দুইজন সেইখানে ঠায় বসে রইল। জনহীন স্তেপে যে চারটে গ্রীষ্ম কেটেছে—বন্দী-নিবাসে যে শীতকাল,—শুনতে শুনতে এর প্রতিটি দিনের ঘটনা অ্যানার চোখের সামনে বায়োস্কপের ছবির মত ভেসে উঠতে লাগল। কার্ল কোন কথাই গোপন রাখলে না। অ্যানার কাছে নিজের অন্তরের রূপ সে অনাবৃত করে দেখালে, রিচার্ডের মুখে শুনে শুনে কি করে অ্যানাকে সে ভালবাসতে আরম্ভ করেছে, সে ভালবাসা কেমন করে শেষে দুর্বার হয়ে সব বিধিনিষেধ ছাড়িয়ে উঠেছে—সব কথা খুলে বলতে তার ভালোই লাগছিল।

শুনতে শুনতে অ্যানা মাঝে মাঝে তাকে প্রশ্ন করছিল, কার্ল সে প্রশ্নের এমনভাবে উত্তর দিচ্ছিল যে, শুনে মনে হয় সে নিজের সঙ্গেই কথা বলছে।

রিচার্ড একদিন আমায় বলেছিলঃ "প্রত্যেক স্বামী তার স্ত্রীকে যেমনি করে ভালবাসে আমিও অ্যানাকে ঠিক তেমনি করে ভালবাসি। অ্যানা ও অন্যান্য স্ত্রীর মত আমার ভালবাসার প্রতি-দান দেয়। স্বামীর প্রাপ্যটুকু সে আমায় কড়ায় গণ্ডায় বুঝে দেয়, সে হিসাবে তার একটুও ভুল হয় না, বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে সে।" সহসা আমি দেখলাম তুমি যেন একটা রাস্তায়—মানে সেই রাস্তাটায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছ। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আর কেউ নেই সেখানে, শুধু তুমি। আমাকে যেন ভূতে পেয়ে বসলঃ তুমি অপেক্ষা করে আছ। অপেক্ষা করছ—এছাড়া আর অন্য কিছু আমি বলতে পারি না। তুমি যেন এ জগতের কেউ নও। এই চিন্তাই আমার শেষ করলে। তুমি সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে রইলে, দিনরাত আমি তোমায় দেখতে লাগলাম। সেই থেকে তোমার সম্বন্ধে আমার আর কিছুই অজানা নেই।

শুনতে শুনতে অ্যানার দুই চোখ বুজে এল,—সে কার্লের দিকে হেলে পড়ল, গালে গাল দিয়ে দুইজনে চুপ করে বসে রইল। মিলনের সেই পরিপূর্ণ শান্তির মাঝে তারা জীবনের যত দুঃখ কষ্ট সব কিছু যেন ভুলে গেল, কালের গতি যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে। এ শান্তি মানুষ বেশিক্ষণ ভোগ করতে পায় নাঃ পাশেই থাকে জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনা—দেখতে না দেখতেই স্রোতাকারে জীবনের সাথে তার গতি সুরু হয়ে যায়।

"সে যদি আমায় না ছাড়ে,—তা'হলে আমরা কি করব?"

কার্ল বিমর্ষভাবে বললেঃ "আর কি কোন উপায় নেই!" বোঝা গেল দুইজনাই মৃত্যু বরণ করে নিতে প্রস্তুত। মনে একটু যেন শান্তি এল।

অ্যানা রাত্রের খাবার তৈরী করতে থাকে—কার্ল কাজ করতে চেষ্টা করে,—কিন্তু রাঁধাবাড়া, খাওয়া, কাজ করা, চলাফেরা কোন কিছুরই যেন আর অর্থ নেই,—করতে হয় তাই করা। এখন থেকে প্রতিদিন ধরে কেবল অপেক্ষা করে থাকতে হবেঃ ভাগ্যে কি হয়! আর মানুষের জীবনে এর চেয়ে মারাত্মক বুঝি আর কিছু নেই।

কার্ল কাজ বন্ধ করে রিচার্ডের চিঠিখানা নিয়ে আর এক-বার টেবিলের ধারে বসলে। দুই হাতে মাথা রেখে এমন ভঙ্গীতে সে বসলে যে দেখে মনে হয়—কোন গুরুতর বিষয় সে চিন্তা করছে।

অপরে শুনতে পায় এমন স্পষ্ট করেই সে পড়ল—"...আমাদের জাহাজ আজ আবার চলতে সুরু করেছে—চারিদিকে তার 'মাইন পাতা', পড়তে পড়তে তার মনের ইচ্ছাটা হঠাৎ মুখে বেরিয়ে গেল, সে বলে ফেললো—"এমন যদি হয় যে—" কথাটা শেষ করে বলা আর তার হল না।

সবটা না বললেও কার্ল যা বলতে চেয়েছিল অ্যানা তা তখনই বুঝে চোখ নত করলে।

তারা দুজনেই আকার ইঙ্গিতে মনের এমন কথা প্রকাশ করে ফেলেছে যাতে মুখ তুলে আর চাওয়া যায় না।

কিন্তু তবুও যখন তারা একটু পেছিয়ে পরস্পর মুখের দিকে চাইল, দুজনের চোখেই তখন দেখা গেল প্রেমের অতল স্পর্শ রহস্যময় গভীরতা, রিচার্ডের অধিকারের কথা এর কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। তার মৃত্যু কামনা করবার আর প্রয়োজন থাকে না, এ প্রেমের জন্য তারা যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত।

দুইজন যখন এমনি গভীরভাবে পরস্পরকে ভালবাসে—সারা জগতকে নিজেদের জীবনের সাথে তখন তারা নতুনরূপে দেখে, কোন দুঃখ কষ্টকেই তারা আর দুঃখ কষ্ট বলে মনে করে না। বিপদকে তারা ভয় করে না।

ক্রমে নভেম্বর এল।

—ইউরোপের মাটিতে বরফ হয়ে উঠলো রাঙা, লক্ষ লক্ষ লোকের খুন মিশে গেছে এর সাথে। কত বড় বড় বংশ সব নির্বংশ হয়ে গেল। জনহীন নগরগুলি সব সৈন্যে পূর্ণ হয়ে উঠল।

এর পর সুরু হল—বন্দী বদল, ব্যারাকের যে দু'একটি লোক বন্দী ছিল, তারা ফিরে এল। কার্ল ও অ্যানা অপেক্ষা করতে লাগলঃ যে কোন মুহূর্তে রিচার্ড এসে যেতে পারে। বলা যায় না, আসতে তার এক মাস বা এক বছর দেরীও হতে পারে, অথবা একেবারে সে না-ও আসতে পারে।

কার্ল যেন তার সমগ্র ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে ফেললে, বুকটা তার প্রায় সব সময়েই ভয়ে কাঁপত। অ্যানার সঙ্গে বিচ্ছেদ সে কিছুতেই সইতে পারবে না। আনা ভাবত—যা হয় কিছু একটা হয়ে যা'ক,—এমনি করে আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব আর কত সওয়া যায়,—মৃত্যুর জন্যেও সে প্রস্তুত।

প্রতিবেশীরা এসে প্রায়ই গল্প করে যায়—পুরুষ সব ফিরে এসে তাদের বউদের কাণ্ডকারখানা দেখে কি রকম অনর্থের সৃষ্টি করছে। এক ঘরের ব্যাপার ত একেবারে মারাত্মক হয়ে উঠেছিল আর কি! পুরুষটা যুদ্ধে গুলী চালাত—সে এসে তার বউকে গেল সোজাসুজি 'রিভলভার' দিয়ে গুলী করতে।

এদিকে কার্লের চাকরি থাকা ভারঃ নোতুন শহরে একটা মিল বসানো হচ্ছে,—কোম্পানী কার্লকে সেখানে মেসিন ঠিক করতে পাঠাতে চায়, কিন্তু কার্লের সেখানে যাবার মন নেই। বাড়ি ছেড়ে বেরুবার পর মুহূর্তেই তার বুক ভয়ে কাঁপতে থাকেঃ এই বুঝি রিচার্ড তার অসাক্ষাতে ঘরে ফিরে এল। ট্রামে বসে তার শান্তি নেই, কাজ করবার বেঞ্চে বসে তার স্বস্তি নেই। ঘরে এসে অ্যানার পাশে বসবার আগে এক মুহূর্ত তার নিশ্চিন্তে কাটানোর উপায় নেই।

একদিন সকালে সে ট্রামে করে কারখানায় যাচ্ছে—হঠাৎ মনে হল, যে ট্রামটা উল্টো দিক থেকে ওদের ছাড়িয়ে গেল তাতে যেন রিচার্ড যাচ্ছে। অমনি সে ট্রাম থেকে লাফিয়ে পড়ল। দৌড়ে এসে সে দেখলে একটা লম্বা কোট পরে একজন সৈনিক বাড়ির দিকেই যাচ্ছে। বাড়ির দরজায় ঢুকবার সময় তার মনে হল—তার বুকে যেন কে মস্ত এক 'ঘা' বসিয়ে দিয়েছে। কি সাংঘাতিক ব্যাপারই যে ঘটবে এখন! ধীরে ধীরে সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। ঘরের দরজায় এসে তার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। কেমন করে কখন যে সে দরজা খুললে তা সে বুঝতেও পারলে না।

কিন্তু কই—কোন সৈনিক ত ঘরে নেই। অ্যানা জানালার ধারে নির্জীবের মত বসে রয়েছে। অপেক্ষা করছে সে। এমন ছন্নছাড়ার মত কার্লকে ফিরে আসতে দেখে সে একটুও আশ্চর্য হল না।

কার্ল কোন কিছু না বলে অ্যানার মাথাটা বুকে একবার টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

৬

বরফ ছাওয়া পথে যেমনি করে সাধারণ গাড়ী চলে—ঠিক তেমনি ধীরে ধীরে একখানা রেলগাড়ী চলছিল; গাড়ীটা লম্বাও তেমনিঃ ইঞ্জিনটা যখন আর একটা গ্রামের স্টেশনে পৌঁছেছে, এ স্টেশন থেকে তখন তার শেষ বগীখানা দেখা যায়।

গাড়ীর দু'ধারের খোলা পাটাতনের উপর পর্যন্ত লোক সব দাঁড়িয়ে, বসে। সবাই সৈনিকঃ কেউ বা বন্দী ছিল, ছাড় পেয়েছে,—কেউ বা এমনি বাড়ি যাচ্ছে। সবারই সাথে রয়েছে বাক্সো, বস্তা আর পুঁটলী। জানালার ভেতর দিয়ে মানুষের মাথা, পিঠ, বোঁচকা সব বেরিয়ে পড়েছে। এমন কি গরু ঘোড়া বইবার যে গাড়িতে—"আটটা ঘোড়া যাইবেক"—বলে লেখা রয়েছে—তাতেও মানুষ ঠাসা, সামনের চওড়া দরজাটা তার খুলে ফেলা হয়েছে। মোট কথা যে গাড়িতে তিন হাজার লোক যাবার কথা—তাতে ঠাসা হয়েছে দশ হাজার। দুরবস্থার আর শেষ নেই,—গাড়ি চলেছেও তেমনি জায়গা দিয়ে।

গাড়ির যে স্বাভাবিক গতি,—চলেছে তার দশ ভাগের এক ভাগ গতি নিয়ে। সময়ের আর হিসাবটিসাব নেই। ড্রাইভার অনেক সময় পথে নেমে পড়ছে,—'স্টীম' তৈরী হলে আবার উঠছে। ইঞ্জিনের অবস্থাও শোচনীয়,—আর তাতে যে কয়লা দেওয়া হচ্ছে তার অর্ধেকই বালু আর পাথর।

পাশের গেঁয়ো পথ দিয়ে একটা লোক সাইকেলে চড়ে রেল-গাড়ির জানালার ধারে-বসা একটা সৈনিকের সাথে দিব্বি গল্প করতে করতে চলেছে। "হাঁ, হাঁ—এ বিপ্লব ছাড়া আর কি! একেবারে নোতুন যুগ। সব পালটে যাবে এবার।" রেলগাড়ি থামলে সাইকেলে-চড়া-লোকটা এগিয়ে চলে গেল। টিকেট ফিকেটের আর কারবার নেই, কোন কিছুরই দরকার হচ্ছে না আর।

পাতাল পুরীর একটা আঁধার গহ্বর মত, ধুঁয়া আর ঘামের গন্ধে ভরা, স্যাঁৎসেঁতে একটা কামরাতে একটা সৈনিক হঠাৎ কোটের পকেট থেকে রুপালী কাগজে মোড়া এক পাত চকলেট বের করে ফেললে। সে এমন এক দেশ থেকে আসছে যেখানে এই বস্তুটা এখনও দুর্লভ নয়। বস্তুটি দেখবার সঙ্গে চারিদিকে অমনি সোরগোল পড়ে গেল ঃ একজন ব্যাভেরিয়ার লোক বলে উঠল ঃ

"আরে, আরে,—কোথায় পেলে তুমি ? ভারি চমৎকার ত—ভারি চমৎকার। দেখি একটু শুঁকে দেখি। খাঁটি জিনিস ত ?"

তাকে শুঁকতে দেওয়া হ'ল। সবার নজর এসে পড়ল ঐ চকলেটের 'পর। রুপালী কাগজের দিকে সবাই তাকিয়ে দেখতে লাগল ঃ অন্ধকার পাতাল পুরীতে যেন একটা তারা উঠেছে।

বেশ একটু রসিকতাও চলতে লাগল এ নিয়ে। চকলেটের মালিক গম্ভীরভাবে পকেট থেকে একখানা ছুরি বের করে খানিকটা কেটে ভাগ করে আশে পাশের সবার হাতে একটু একটু দিলে। হাত সবার পাতাই ছিল। বাকিটা সে পকেটে রাখতে রাখতে বললে, "এটুকু রইল আমার বাচ্চাকাচ্চার জন্যে।"

এর পর সে তার স্ত্রী আর ছেলেপিলের ফোটো বের করে দেখালে। ক্রমে সবাই ব্যাগ থেকে নিজের নিজের বাড়ির লোক-জনের ছবি বের করতে আরম্ভ করলে। ছবি সব হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে কত গল্প, কত কথা, কত উল্লাস ধ্বনি শুরু হয়ে গেল। মনের আবেগ আর চোখের জল সামলাতে গিয়ে অনেকের গলা গেল ধরে। বাড়ি ফিরে যাচ্ছে তারা—প্রাণে তাদের কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা !

রিচার্ড চকলেটের মালিককে ছবিখানা ফিরিয়ে দিয়ে বললে, "আমার বউএর একখানা ছবিও আমি সঙ্গে করে বেরুই নি,—অথচ থাকলে কত ভালই না হ'ত,—এ কয় বছর কত ভেবেছি,—তার মূর্তিটা আর কিছুতেই মনে আনতে পারি না। যা'ক—আর বেশি দেরি নেই—এইবার তাকে চোখেই দেখতে পাব।"

ব্যাভেরিয়ার লোকটা বললে, "হাঁ—এবার তার আসল মূর্তিই দেখতে পাবে।" লোকটার মুখে সর্বদাই এক অদ্ভুত হাসি লেগে আছে। গায়ে তার কালচে রংএর বেসামরিক পোষাক, মাথায় নরম ফেল্টের একটি টুপি, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। লোকটা বোঁচকা রাখার তাকটা ধরে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং নির্বিচারে সবার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে।

ট্রেনটা হঠাৎ ঝাঁকুনী দিতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পরেই গাড়ি একেবারে থেমে গেল। যাত্রীদের এ সব দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে। তাদের গল্প গুজব আগেকার মতই চলতে লাগল। বোঁচকার যে স্তূপ হয়ে রয়েছে—রিচার্ড সেগুলি ডিঙাল,—যাত্রীরা সব পা মেলে বসে রয়েছে—তাও ডিঙালো, অনেক লোক গাড়ির মেঝেতে বসে রয়েছে—তাদের পার হয়ে সে দরজার কাছে আসতে যাচ্ছিল,—কিন্তু দরজা সব মালপত্রে বন্ধ রয়েছে—সুতরাং সে জানালা গলিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

প্রায় প্রত্যেক বগি থেকেই এমনি দু'একজন বেরুতে আরম্ভ করলো। হাই তুলে মোড়ামুড়ি ছেড়ে তারা দেহটাকে একটু চালু করে নিচ্ছিল। কেউ কেউ আবার কোটের বোতাম খুলে দিল। উঠবার সময় আবার আরও মুস্কিল, দরজা সব বন্ধ, উঠবার উপায় নেই,—কোন মতে উঠলেও দাঁড়াবার জায়গা নেই,—তাই কেউ কেউ জানালা গলিয়ে গাড়ির পায়খানায় উঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রিচার্ড গাড়ি থেকে বেরিয়ে বিশেষ সন্তর্পণে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে শুরু করল। সে হাঁটতে পারে কিনা একবার পরখ করে দেখে নিচ্ছে। রওনা হবার কয়েক দিন আগে তার পায়ের উপর দিয়ে একখানা গাড়ির চাকা চলে গেছে। এই দুই হপ্তা রয়েছে সে পথে। গাড়িটা কিছুক্ষণ এখানে থাকবে সে যখন ঠিক বুঝতে পারলে,—তখন সে বরফ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে কিছুদূর গিয়ে একটা জায়গায় বসলে। তারপর পাজামাটা খানিকটা টেনে উঠিয়ে নিজের পাটা দেখতে লাগল ঃ পায়ের নীচু থেকে হাঁটু পর্যন্ত—চামড়ার রং হয়ে গেছে একেবারে গাঢ় সবুজ,—ঠিক যেন কাঁচা কুল।

আর যারা বাইরে এসেছিল তারা সবাই গিয়ে গাড়িতে উঠেছে, সুদূরে বিস্তৃত তুষার ক্ষেত্রের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে—একা রিচার্ড, তফাৎ থেকে তাকে দেখাচ্ছে যেন একটা ছায়া মূর্তি ঃ কাঁধ দুটি বেজায় চওড়া,—টুপিতে 'ব্যাজ' নেই,—লম্বা সামরিক কোটটায় পায়ের গোড়ালি অবধি ঢাকা। কতদিন দাড়ি কামায় না,—মুখটা হয়ে উঠেছে যেন এক ঘন জঙ্গল,—এক নাকের ডগা ছাড়া মুখের আর কিছুই প্রায় দেখা যায় না। চোখ দুটি দেখে মনে হয়—কোন নিরালা জানোয়ার যেন সাথী খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কালো, নোংরা,—যুদ্ধের-নিষ্ঠীবনের-মত রিচার্ড যখন এই বিংশ শতাব্দীর বাষ্পীয়যানের নিকট এগিয়ে আসছিল—তখন তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একজন প্রাগৈতিহাসিক আদিম মানব সবে মাত্র গুহা থেকে বেরিয়ে আসছে।

রিচার্ড মনে মনে ভাবছিল,—আর ঘণ্টা দুই,—তার পরেই আমাদের ছোট্ট ঘরে গিয়ে অ্যানাকে দেখতে পাব আমি। ঠিক সেই সময়েই—অ্যানার ঘরে—অ্যানাকে পরীক্ষা করতে করতে ধাত্রী বলছিল "কোন গোলমাল নেই।" অ্যানার অবশ্য শারীরিক অস্বস্তি কোন কিছুই ছিল না,—তবু কার্ল নাছোড়বান্দা—পরীক্ষা সে একবার করাবেই। অ্যানা বাধ্য হয়ে শেষে রাজি হয়েছিল।

পরিষ্কার সুখোষ্ণ ঘরটি ভাজা আপেলের গন্ধে ভরপুর। সোফার উপর শায়িত অ্যানার শুভ্র অনাবৃত দেহ দেখে বৃদ্ধা ধাত্রী মৃদু হেসে বলছিল—"কি সুন্দর! আমি জীবনে ত কম দেখলাম না, কিন্তু তোমার মত আমি একটিও দেখলাম না। সবাই শরীরের যত্ন নিতে জানে না। তোমাকে দেখলে অনেক মেয়েরই হয়ত চোখ টাটাবে।"

এদিকে আলুথালু-চুল দাড়িওয়ালা মাথাটা নিয়ে রিচার্ড ট্রেনের জানলার পাশে এসে হাজির হল। দুইটি লম্বা হাত জানলা দিয়ে গাড়ির মধ্যে বাড়িয়ে দিলে—সাথীরা সব তাকে টেনে তুলে নিলে।

সন্ধ্যার কাছাকাছি ট্রেনটা শহরতলির ঘরগুলি ছাড়িয়ে লম্বা কারখানা ঘরের পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল। এই কারখানা ঘরে কার্ল তখনও তার বেঞ্চে বসে কাজ করছে।

প্রত্যেক কামরাতেই যাত্রীরা সব পরস্পরেই পরিচিত হয়ে উঠেছিল। সুতরাং নিজেদের মধ্যে গল্প গুজব কথাবার্তা তাদের খুবই চলছিল। যে কোন সামান্য বিষয় নিয়েও তাদের কথা বলতে আপত্তি ছিল না। গল্প তখনও সমানে চলছিল। কিন্তু কথার পুরো জবাব কেউই দিতে পারছিল না,—পুরো দৃষ্টি দিয়েও কেউ চাইতে পারছিল না ঃ মন পড়ে রয়েছে—সবারই নিজের বাড়ির দিকে।

রিচার্ডের শারীরিক বলের মত মনের বলও ছিল অসাধারণ; সুখ দুঃখের কোন কিছুতেই তার মুখের ভাবের কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারত না,—অবশ্য সহ্যের অতিরিক্ত কিছু ঘটলে স্বতন্ত্র কথা,—কিন্তু সেই সহ্য শক্তিও তার বড় কম ছিল না।

বন্দীনিবাসে থাকবার সময়—সেখানকার কঠোর অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে অনেকে একেবারে ভেঙে পড়েছিল, আত্মসম্মানের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত অনেকের মন থেকে মুছে গিয়েছিল,—রিচার্ডকে কিন্তু কিছুতেই একটুও বিচলিত করতে পারে নি। তার সহ্যের শেষ সীমা না ছাড়ান পর্যন্ত সে এমনভাবে চলাফেরা করেছে—যেন কিছুই হয় নি।

শুধু একবার তার মনের দৃঢ় বাঁধ অকস্মাৎ ভেঙে দিয়েছিল। সারাদিন না খেয়ে কঠিন পরিশ্রমের পর সে ক্যাম্পে ফিরে এসেছে। এমন সময় ব্যারাকে এল গার্ড। বলা নেই কওয়া নেই—গার্ড অমনি তার হাত থেকে খাবারের থালাটা কেড়ে নিয়ে—খাবারটা নোংরা মাটিতে ফেলে দিয়ে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললে,—"খা, শুয়োর, খা,—মাটিতে নেমে খা।" তার পরেই রিচার্ডের গালে খামাখা একটা চড় লাগিয়ে দিলে।

রিচার্ড তখনও একটুও রাগ দেখায় নি। মেসিনের অংশ বিশেষের উপর সামান্য স্পর্শ লেগেই অনেক সময় যেমন কল বিগড়ে যায়,—গতি থাকলেও সংযোগ গ্রন্থি হয়ে যায় ভিন্ন,—রিচার্ডের দশা হল ঠিক তেমনি।

রিচার্ড—বেশি জোরেও নয়—বেশি আস্তেও নয়—স্বাভাবিক গতিতেই সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে সে যন্ত্রপাতির ঘরে ঢুকে তার গাঁইতি কোদালটা তুলে নিলে। সে মনে মনে ঠিক বুঝেছিল—যে গার্ডকে খুন করবার আধ ঘণ্টা পরেই তাকে গুলী করে মারা হ'বে। তা' হ'ক গিয়ে,—তাতে আর তার বড় আসে যায় না। গার্ডকে সে ঠিক করে দিচ্ছে ঃ বড্ড বাড় বেড়েছে সে। এতে আর ভাববার কিছু নেই। এ ছাড়া করবারও আর কিছু নেই। গার্ডকে মারতেই হ'বে—এটাও যেমন তার স্বতঃসিদ্ধ,—এর ফলে তার যা ভোগ করতে হ'বে—সেটাও তেমনি স্বতঃসিদ্ধ। কোন কিছু না বলে সেটা সহ্য করা ছাড়া আর কি উপায় আছে?

(ক্রমশ)

বিগত বসন্ত

শ্রীফনীভূষণ চক্রবর্তী

ঢং—

দেওয়ালে টানান বড় ঘড়িটায় একটা বাজলো। সম্মুখে সেক্রেটারীয়েট টেবিল, চারিদিকে কাগজপত্র ফাইলে স্তূপীকৃত, তিল ধারণের বুঝি আর জায়গা নেই। আর একটা ফাইল টেনে খস্ খস্ করে কয়েক কলম লিখে প্রবোধ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল।

নিশীথ স্তব্ধতা সারা বাড়ি ভরে বিরাজ করছে। পৃথিবী নিঝুম, থমথম করে গভীর রাত। পিসীমা বারান্দার এক কোণে বসে মালা জপছিলেন। ঈপ্সিত ইষ্ট নাম জপের মধ্যে কথা বলতে নেই। আঙুল তুলে রান্নাঘর দেখিয়ে প্রবোধের সাথে এসে দরজার পাশে দাঁড়ালেন।

পশ্চিমা ঠাকুরটি তখন উনুনের একপাশে ময়লা গামছা বিছিয়ে অঘোর ঘুমে অচেতন। অনেক ডাকাডাকির পর চোখ রগড়ে মাতালের মত টলতে টলতে প্রবোধের সামনে এনে ভাতের থালাখানি রাখল।

খাওয়া প্রায় হয়ে এসেছে, এমন সময় তাঁর জপ শেষ হ'ল। মালাগাছি ভক্তিভরে কপালে ছুঁইয়ে বললেন, হ্যাঁরে, এমনি করে আর কতকাল চালাবি, বলতো? সারা দিন ত ক'দিন থেকে কাজের চাপে বাড়িমুখো হ'তে পারিস না। কিন্তু রাতেও যে সকাল সকাল দুটি খাবি, তা-ও কি তোর বরাতে লেখেনি রে?

—আর ক'টা দিন একটু সবুর কর পিসীমা। তোমাকে ত আগেই বলেছি, ঢাকুরীয়ার বাড়িটার দুখানা ঘর আর পুকুরটা এ ক'দিনের মধ্যেই শেষ করে দিতে হবে। আসছে ১৭ই ওদের গৃহপ্রবেশ। এর পর নাকি দীর্ঘকাল অকাল চলবে—কী করব পিসীমা বল, যখন পরের কাজ নিয়েছি তখন—কিন্তু তুমি কেন রোজ রোজ এত রাত অবধি জেগে থাক?

—কী করব বাছা বল! ঘরে যে আর দ্বিতীয় মনিষ্যিটি নেই যার উপর তোর খাওয়ার ভার দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমুব। কত করে বলছি একটা বিয়ে কর। যেমন কপাল করে এসেছিলাম, নইলে—

—কিন্তু পিসীমা, তোমার এই চাল-চুলোহীন ভাইপোটির জন্যে কে মেয়ে নিয়ে বসে আছে? আমাকে কেউ মেয়ে দেবে না।

মুহূর্তে পিসীমার মুখে আনন্দের আলো খেলে গেল। চোখের জল মুছে বললেন, দেবে না আবার। দিতে পথ পাবে না। ঐ মিত্তিরদের মমতার মা ক'মাস ধরে ঘুরঘুর করছে, একবার মুখের কথাটি বেরলেই হয়। তা মমতা মেয়েটিও বড় ভাল, যেন লক্ষ্মীর পিরতিমে!

প্রবোধ মুখ ধুতে কলঘরে গেল। মৌনভাব সম্মতির একটা বড় লক্ষণ মনে করে, পিসীমার চোখের সামনে একটি অনাগত শুভ রজনী সকল সমারোহ নিয়ে ক্রমশ উজ্জ্বলতর হতে লাগল।

শোবার ঘরে এসে একটা চুরুট ধরিয়ে আপনার ক্লান্ত দেহটাকে প্রবোধ একটা কোচে ঢেলে দিলে। চারিদিকে ঐশ্বর্য, সম্পদ্, প্রাচুর্যের প্রবাহ, কিন্তু এমন দিনে প্রতিমা... প্রতিমা কই?......

ছেলেবেলা থেকেই প্রতিমা বড় চঞ্চল, আজও কী তেমনি আছে। এই বার বছরে বোধ হয় ভারিক্কি হয়ে উঠেছে। নাঃ—বাইরে বার বছর কেটে গেলেও নিশ্চয়ই প্রতিমা আজও তেমনি হাস্যমুখরা, কলনাদী ঝরণার মতই আছে।

একদা নিশীথকালে যা ঘটেছিল, আজও তা প্রবোধের চোখের উপর জ্বলজ্বল করে, এতদিনে এতটুকুও ম্লান হয় নি।

চুড়ির ঝন ঝন শব্দে প্রতিমা আসছে বুঝতে পেরে প্রবোধ সহসা বইয়ের পাতায় তন্ময় হয়ে গেল। পা টিপে টিপে এসে প্রতিমা পিছন থেকে তার দু চোখ চেপে ধরল।

ছলনা করে প্রবোধ মুখ খুলল—এই ধীরেন, না, না, মণি, কি হচ্ছে ছেড়ে দে!

—মণি! নয়নমণি না মাথার মণি একবার চেয়ে দেখ দেখি!

পাশের বাড়িতে আজ অতসীর বিয়ে হচ্ছে। সে উপলক্ষে বিশেষ সাজসজ্জা করায় প্রতিমাকে রাজেন্দ্রানীর মত দেখাচ্ছিল। পানখাওয়া পাতলা ঠোঁট দুটি টকটকে রাঙা।

—প্রবোধদা, ও প্রবোধদা, ও-মা কানের মাথা খেয়ে পড়ছো নাকি?

মন-ভুলানো সুরে সানাই বাজছিল। প্রবোধ ঘাড় ফিরিয়ে বলে—কেন প্রতিমা?

—যাক্, তবু ভাল, একবার আমার দিকে ফিরে চাইতে পারলে! আচ্ছা বল না ওটা কি বাজছে—

—সে ত তুমিও শুনতে পাচ্ছ।

—হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, তবু বল না লক্ষ্মীটি, ওটা কি বাজছে।

—সানাই।

—নামটা ত আমিও জানি, কিন্তু কেন বাজছে, বল না।

অতসীর বিয়ে তাই, আমি তোমার সঙ্গে বকতে পারি না।

আড়চোখে প্রবোধের দিকে চেয়ে মুখ টিপে টিপে হেসে প্রতিমা বললে,—বল ত দেখি, তুমি কেমন পণ্ডিত, তোমার আর আমার বিয়ের সানাই কবে বাজবে?

আমার কথা বলতে পারি না—প্রবোধ ঢোক গিলে বললে—কেননা, আমার মত দরিদ্রের পক্ষে ওটা বিলাস বই অন্য কিছু নয়, কিন্তু তোমার বিয়ের সানাই এ মাঘ-ফাল্গুনে যদি না বাজে ত বোশেখ-জ্যৈষ্ঠিতে যে বাজবে, তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই, কাকা যেমন করে বর খুঁজে বেড়াচ্ছেন!

—পণ্ডশ্রম! বর তো আমার সামনেই—বর আমার তুমি!

গভীর বিস্ময়ে প্রবোধের মুখফুটে বেরয়—বল কি প্রতিমা? আমি?

প্রতিমা আরও দৃঢ় হয়ে বললে—হ্যাঁ তুমিই! এ-ও কি এতদিন ধরে বুঝতে পার নি? বলতে বলতে প্রতিমা দু'হাত দিয়ে প্রবোধের গলা জড়িয়ে ধরল।

সচকিত হয়ে প্রবোধ বলল, ছাড়, ছাড় প্রতিমা, কেউ দেখে ফেলবে।

কিন্তু ততক্ষণে প্রতিমার দুখানি কোমল বাহু প্রবোধের গলায় কঠিন হয়ে উঠেছে, আর অবরুদ্ধ আবেগের ধারা দুনয়ন বয়ে প্রবোধের বুক ভাসাচ্ছে।......

......প্রতিমা আজ কোথায়? কে সে ভাগ্যবান যার ঘর সে আলো করে আছে? সুদীর্ঘ বার বৎসরের মধ্যে প্রবোধ তাদের কোন খবরই রাখে না।

শুধু মনে পড়েঃ

শরীর সুস্থ না থাকায় সেদিন আর প্রবোধ বিকেলে বেড়াতে যায় নি। ঘরে শুয়েছিল। সন্ধ্যা কিছুক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, অথচ আলস্যের জন্য ঘরে বাতি জ্বালান হয় নি।

পাশের ঘর থেকে কণ্ঠস্বর কানে আসে।

ঃ প্রতিমার বিয়ে চৌধুরীদের ছোটছেলের সাথেই ঠিক করে এলাম। প্রফুল্লদা গিয়েছিলেন, দেখে ভারী খুসী। এখন ভালয় ভালয় দুহাত মিলে গেলে বাঁচি। তা তোমার বুঝি পছন্দ হ'ল না, কেমন?

—আমার আবার পছন্দ অপছন্দ কি? তবে তোমার মেয়ে যে পছন্দ করে আছে প্রবোধকে তাই বলছিলাম—

—রাধামাধব, বলি ও গিন্নি, তোমার কি ভীমরতি ধরেছে। অমন বনেদী বংশ, আর অমন উপযুক্ত ছেলে ফেলে কি না চাল-চুলোহীন ঐ প্রবোধের সঙ্গে প্রতিমার বিয়ের কথা তুলছো। অমন কথা মনেও স্থান দিও না। বন্ধুর ছেলে, অনাথ, তাই লেখাপড়া শিখিয়েছি, এখন কাজকর্ম করুক গে যাক্, কিন্তু আমার মেয়ের জামাই হ'বার সাধ যেন বাছাধন না করেন। ....

প্রথম প্রণয়ে কঠিন আঘাত! প্রবোধ সহ্য করতে পারলে না। কাউকে না জানিয়ে সেই রাতেই কলকাতায় চলে আসে। তার পর কয় বছরের কঠোর পরিশ্রমে ভাগ্যদেবী প্রসন্নদৃষ্টি ফেরালেন। এই বার বছর অহর্নিশ প্রেতের মত প্রবোধ অর্থের জন্য পরিশ্রম করেছে, কারণ এ দুনিয়ায় অর্থহীনতা যে কত পাপ ও কত বড় অভিশাপ, তা বুঝেছে প্রতিমার বিবাহ ব্যাপারেই। উঃ জীবনের কয়টা পৃষ্ঠা কত বেদনাই না ভরা!......

প্রবোধ কৌচ থেকে উঠে দাঁড়াল, চুরুটটা অর্ধদগ্ধ হয়ে কখন নিভে গেছে। আকাশে শুকতারা দপ্ দপ্ করছে। রাত বোধ হয় সামান্যই বাকি আছে। প্রবোধ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল।

ঢাকুরীয়ার বাড়ি ও পুকুরটা দেখে গৃহস্বামী অবনীবাবু খুব খুসী। সবিনয়ে বললেন—আসছে রোববার, অর্থাৎ ঐ গৃহপ্রবেশের দিন আমার কয়েকজন একান্ত আত্মীয় ও বন্ধুদের চায়ের নেমতন্ন করেছি, আপনাকে কিন্তু ওদিন বিকেলে এসে যোগদান করে আমাদের আনন্দবর্ধন করতে হবে, প্রবোধবাবু।

ঘাড় নুইয়ে সম্মতি জানিয়ে প্রবোধ বললে,—আচ্ছা আসব।

গেটের পাশে অবনীবাবু ও তাঁর আট বছরের মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল। গাড়ি থেকে নামতেই অবনীবাবু অভিবাদন করে বললেন, আসুন, প্রবোধবাবু, পরক্ষণেই বিস্মিত হয়ে বললেন,—এ কি করেছেন?

প্রবোধ ম্লান হেসে উত্তর দিল—ওঃ, আমার এই হাফ-প্যাণ্ট আর খাকী সার্ট দেখে বলছেন! কিন্তু বদ্‌লাবার আর সময় পেলাম কই! যা-কাজের চাপ ক'দিন থেকে পড়েছে, ঐ ক'দিন ত দিনে আমার ভাতই খাওয়া হয়ে উঠছে না।

বলতে বলতে তারা চায়ের টেবিলের কাছে এসে পড়লেন। পুকুরের পাশের জমিটায় চায়ের জন্য কয়েকখানা টেবিল বসান হয়েছে। চারিদিকে ছেলেমেয়েদের ছুটোছুটি তরুণীদের প্রসাধন ও শাড়ির ঔজ্জ্বল্য এবং কানাকানি স্থানটিতে একটি মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

অবনীবাবু প্রবোধকে নিয়ে আসন গ্রহণ করে বললেন,—আসুন এবার সবার সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দি। ইনি আমার স্ত্রী—ওকি! তুকি এ'কে চেনো নাকি?

অবনীবাবুর স্ত্রী টেবিলের ওপাশে বসে চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিচ্ছিলেন, আপনাকে সামলে নিয়ে বললেন,—নাঃ, আমি চিনব কি করে?

নমস্কার। আসুন এবার আরম্ভ করা যাক্।

নানাজনের টুক্‌রো কথার স্রোতে এবং আনন্দ কোলাহলে অবনীবাবুর পরিচয় পর্ব আর অগ্রসর হ'তে পারল না।

চা-পর্ব শেষ হ'লে অবনীবাবু উপস্থিত সকলকে বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাবার জন্য চললেন। প্রবোধকে লক্ষ্য করে হেসে বললেন—আপনার হাতেরই এ বাড়ি তৈরী আপনাকে আমি আর কি দেখাব? আমি এ'দের নিয়ে ঘুরে আসি, আপনি ততক্ষণ বসে একটা সিগার খান্।

অবনীবাবুর স্ত্রী ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়াচ্ছিলেন, প্রবোধ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ডাকল—প্রতিমা।

ঘাড় ফিরিয়ে অবনীবাবুর স্ত্রী উত্তর দিল—কেন?

—আমাকে, আমাকে তুমি কি সত্যিই চিনতে পার নি।

চকিত-চাহনি চারিদিকে ঘুরিয়ে এনে প্রতিমা বলল—না, তোমাকে চেনা আজ আমার পক্ষে একান্ত নিষ্প্রয়োজন, আর আজ তোমায় চিনে আমার ক্ষতি বই কোন লাভ নেই!

—লাভ লোকসানের চুলচেরা হিসেবই কি সব, দুনিয়ায় কি এছাড়া আর কিছু নেই, প্রতিমা?

—হ্যাঁ লাভ লোকসানই সব। এই যে তুমি এত পরিশ্রম করে আমাদের বাড়িটা তুলে দিয়েছো, তার মধ্যে কি লাভ-

লোকসানের প্রশ্নটাই সব চেয়ে বড় নয়? তুমি কি শূন্য হাতে ফিরে যাওয়ার জন্যই এত পরিশ্রম করেছ?

ক্ষণকাল মৌন থেকে প্রবোধ বলল—আচ্ছা প্রতিমা, অতসীর বিয়ের কথা আজ তোমার মনে পড়ে?

—হ্যাঁ মনে পড়ে, সেদিন ছেলেবয়সে না বুঝে একটা ভুল করে ফেলেছিলাম, আর সে ভুলের ভার কি জীবনভোর বয়ে বেড়াতে হবে?

সেটা শুধুই ছেলেবেলার ভুল? অন্য কিছু নয়?

না।

—কিন্তু প্রতিমা, প্রবোধ আকুল হয়ে বলল, —আমি যে তোমাকেই মনে করে আজও—

দেখ নাটুকেপনা আমার ভাল লাগে না। আমি মেয়ের মা। আমার সুখের সংসার যা এতদিন ধরে গড়েছি, তা কি তুমি ধূমকেতুর মত এসে ভেঙে দিতে চাও?

সেদিনকার সে প্রতিমা যে প্রিয়তমকে তুচ্ছ একদিন না দেখার জন্য জীবন দিতে পারত, আজ আর সে প্রতিমা নেই। আজ প্রতিমা জীবনে সম্পদ ও সম্ভ্রমের জন্য পুরাতন দিনের প্রিয়তমকে চিরজীবনের জন্য অম্লান মুখে না দেখে থাকতে পারে।

কুমারী জীবনে প্রতিমা একদিন নির্জন গৃহকোণে বলেছিল—প্রবোধদা তুমি আমার জীবনের ধ্রুবতারা। দেখো, মরে গিয়ে আমায় যেন পথহারা করে মেরো না।

সে কথা স্মরণ হওয়া মাত্র প্রবোধের মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। টেবিলের উপর থেকে প্রতিমার হাতখানি টেনে নিয়ে বজ্রমুষ্টিতে ধরে ভ্রূকুটি করে প্রশ্ন করল—কি আমি ধূমকেতু? তোমার সাধের সংসার ভেঙে দিতে চাই?

প্রতিমা ভয় পেল। চারিদিকে কেউ নেই। ও-পাশ থেকে অভ্যাগতদের কণ্ঠস্বর কানে আসছে।

ভীতা হরিণীর মত সন্ত্রস্ত হয়ে বলল—ছাড়ো! ছাড়ো! কেউ দেখে ফেলবে। কঠিন হস্তে তেমনি প্রতিমার হাত ধরে রেখে প্রবোধ বলল—বল আমি ধূমকেতু? বল—আপনার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে মরিয়া হয়ে প্রতিমা টেবিলটা ঠেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে পেয়ালা পিরিচ শুদ্ধ টেবিলখানা প্রবোধের উপর পড়ল। চক্ষের পলকে পাশের দরজা দিয়ে প্রতিমা ঘরে ঢুকল।

টেবিল পতনের শব্দে সকলে এসে ধরাধরি করে প্রবোধকে তুললেন।

আপনি পড়ে গেলেন কেমন করে, প্রবোধবাবু!—অবনীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

—চুপচাপ বসেছিলাম, টেবিলটা টানতে গিয়ে হঠাৎ—

আচ্ছা আমি তাহলে এবার আসি—প্রবোধ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো। গেট পর্যন্ত অবনীবাবু এগিয়ে দিয়ে বললেন—বাকী কাজ আপনি কাল থেকে আরম্ভ করতে পারেন, আমি আজ রাতেই এটা ভ্যাকেট করে দিয়ে আগেকার কোয়ার্টার-এ চলে যাবো। কাজ শেষ হলে সুবিধে মত আসবো।

অনেক রাত পর্যন্ত ইডেন গার্ডেনের একটা বেঞ্চিতে কাটিয়ে প্রবোধ বাড়ি ফিরল। অধীর প্রতীক্ষায় বহুক্ষণ কাটিয়ে বৃদ্ধা পিসিমা তখন বারান্দার একপাশে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুমন্ত ঠাকুরকে আর ডাকলে না, নিজের ঘরে এসে একটা চুরুট ধরালো। অধীরচরণে প্রশস্ত ঘরখানির এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পাইচারী করতে লাগলো। সহসা আয়নায় সামনে আপনাকে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বলল—ধ্রুবতারা থেকে ধূমকেতু, না? হাঃ হাঃ হাঃ—বিকট হাসিতে নিশীথ নগরী কেঁপে উঠল।

রোজকার নিয়মমত ভোরের আলো ফুটতেই রাজমজুরেরা এসে জড় হতে লাগলো। উন্মাদের মত টলতে টলতে অফিস ঘরে এসে প্রবোধ সহসা থপ করে বসে পড়ল।

রাজমজুরদের সর্দার দোরঙ্গী মিস্ত্রী এসে সেলাম দিতেই প্রবোধ বলল—আজ আমার দু'শো মজুর চাই, এখুনি এনে দিতে হবে, মজুরী ডবল লাগে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার চাই। তুমি মজুরদের নিয়ে ঢাকুরীয়া কুঠি যাও—আমি যাচ্ছি দোরঙ্গা।

বিগত বৈকালের উৎসবের চিহ্ন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। কুলীগুলি এখনো আসেনি। প্রবোধ ধীরে ধীরে পুকুরের পারে এসে দাঁড়াল। তার চোখের সামনে ফুটে উঠল ঃ পুকুরের কাকচক্ষু জলে আবক্ষ ডুবিয়ে প্রতিমা স্নান করছে। হঠাৎ উপরে দৃষ্টি ফেলতে দেখল, তার স্বামী বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসছেন। 'চুপি চুপি আমার নাওয়া দেখছো দুষ্টু কোথাকার!' বলেই প্রতিমা ডুব দিল...রৌদ্রালোক জলের উপর চিকমিক করছে, চারিদিকে কেউ কোথাও নেই প্রবোধ পাগল হয়ে গেল নাকি?

উপরে উঠে প্রতিমার জন্য নির্দিষ্ট অর্ধ সমাপ্ত শয়নকক্ষে এসে প্রবোধ দাঁড়াল। তার মনে হ'ল ঃ ঘরের মাঝখানে একখানা মেহগনি বার্নিশ করা খাট পড়েছে, পালকের মত সাদা বিছানায় প্রতিমা মধ্যাহ্ন সুখ উপভোগ করছে একখানি মাসিক পত্রিকার পাতায় আপনাকে মগ্ন করে, পাশে আট বছরের মেয়েটি অঘোরে ঘুমিয়ে।

ওপাশের দরজা দিয়ে পা টিপে টিপে এসে অবনীবাবু প্রতিমার মুখের কাছে মুখ নামিয়ে আনছিলেন।

—কে? বলেই ধড়মড় করে প্রতিমা উঠে বসল, পরক্ষণে সারামুখ হাসিতে ভাসিয়ে বলল—ওমা, তুমি, এ সময়ে যে!

—আজ যে শনিবার বলেই সুরসংযোগ করে অবনীবাবু বললেন—"সে কথা কি গেছ ভুলে?"

কচি খুকীটির মত আহ্লাদে প্রতিমা খিলখিল করে হেসে উঠল। আঙুলে কান ঢেকে প্রবোধ তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলো।

দোরঙ্গী বলল—কী কাজ করতে হবে, হুজুর!

একটা মস্ত বড় ভুল হয়ে গেচে—প্রবোধ বলল—দোরঙ্গী, বাড়িটা ভাঙো।

(শেষাংশ ২০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জাপানে নারীপ্রগতি

শ্রীশোভা দেবী

বিদেশে যেতে আমি যে খুব উৎসাহ অনুভব করি তা' নয়—কারণ বিদেশে গিয়ে পদে পদে নিজেদের দৈন্য ও অক্ষমতা এত বেশি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে আনন্দের পরিবর্তে একটা বেদনাদায়ক হতাশা নিয়েই ফিরে আসতে হয়। কিন্তু জাপানে যাবার সুযোগ এল কিছুতেই তা' প্রত্যাখান করতে পারলুম না। জাপান প্রাচ্যের গৌরব বলেই একটা দুর্নিবার আগ্রহ অবশেষে আমাকে জাপানের দিকে টেনে নিয়ে গেল। জাপানী মেয়েদের জীবনযাত্রাই আমি বিশেষ করে লক্ষ্য করেছি। জাপানী মেয়েদের সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে তাদের প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষা থেকেই আরম্ভ করা যাক। জাপানে ছয় বছর প্রাথমিক শিক্ষার বাধ্যতামূলক রীতি প্রবর্তন করা হয়েছে। জাপানী অক্ষরগুলো অত্যন্ত জটিল এবং আয়ত্তে আনা এক দুরূহ ব্যাপার। ওদের বর্ণ পরিচয় শেখা আমাদের বর্ণ পরিচয় শেখার মত সহজসাধ্য নয়। তুলির কলমের সাহায্যে পাতলা কাগজের ওপর সেইসব জটিল অক্ষর অভ্যাস করা ছোট ছোট মেয়েদের পক্ষে কত কঠিন ও ধৈর্যসাপেক্ষ চোখে না দেখলে তা বোঝবার উপায় নেই। দেখে মনে হয় এ' যেন লেখাপড়া শেখানো নয় ছবি আঁকা শেখানো হচ্ছে। কে জানে হয়ত এর জন্যেই শিল্প সম্বন্ধে জাপানীদের এত প্রবল অনুরাগ এবং শিল্পজগতে এদের দান অপরিসীম। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে' লেখাপড়া শেখার পরেও মেয়েদের নিস্কৃতি নেই। ছুটির পর স্কুলের বাড়িঘর ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা, খেলার মাঠ পরিষ্কার করা এসব তাদের নিজের হাতে করতে হয়। মেয়েদের প্রশ্ন করলুম সারাদিন লেখাপড়া করার পর আবার এ'সব ধোয়ামোছার কাজ তাদের ভাল লাগে কি না। তারা অম্লানবদনে জবাব দিলে এই হ'ল স্কুলের নিয়ম। (মেয়েদের সাথে আমাদের কথাবার্তা অবশ্যি ওদের সেক্রেটারীর মধ্যস্থতায় সম্পন্ন হত—কারণ পরস্পরের ভাষা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ)। ওদের স্কুলের সাথে আমাদের স্কুলের তুলনা করলে মনে হবে আমরা যেন শিক্ষার নামে খেলাঘর সাজিয়ে বসে আছি। যে জাতের ছোট ছোট মেয়েরাও নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে তাদের ভবিষ্যত যে উজ্জ্বল সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না। ছয় বছর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করার পর মেয়েরা খবরের কাগজপড়া, বইপড়া ও চিঠিপত্র লেখা ইত্যাদি লেখাপড়ার কাজগুলো মোটামুটিভাবে আয়ত্ত করতে পারে। তারপর তারা বেরিয়ে পড়ে কাজের সন্ধানে। জাপানের অর্থ-



জাপানের আধুনিক তরুণী

নৈতিক জীবনে ও শিল্পের প্রসারে মেয়েরা যে স্থান অধিকার করে রয়েছে তার কথা ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। কর্মজগতে এমন কোন জায়গাই নেই যেখানে মেয়েদের কাজ করতে দেখা যায় না। যেসব দোকানে আমরা জিনিসপত্র কিনতে যেতুম সেখানকার বিক্রেতা ও অন্যান্য কর্মচারীরা সকলেই মেয়েমানুষ। তাদের কারো বেশভূষা পাশ্চাত্য ধরণের, কারো আবার তাদের স্বদেশী পোষাক কিমোনো পরা। দোকানে ঢুকতেই তারা আমাদের হাসিমুখে অভ্যর্থনা করত।

বড় বড় দোকানগুলো সবই অবশ্যি পাশ্চাত্য ধরণে সুসজ্জিত, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের বিক্রেতারা যেমন দশ রকম জিনিস দেখিয়ে ক্রেতাদের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা করে থাকে জাপানী বিক্রেতাদের মধ্যে তেমন উৎসাহ ও মনোভাব দেখতে পাওয়া গেল না। এ সম্বন্ধে এরা যেন খানিকটা আমাদের দেশের দোকানীদের মতই। ক্রেতা এসে নানারকম জিনিস দেখতে চাইলে এরা যেন মনে মনে একটু বিরক্ত ও অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। ছোট বড় সব দোকানে প্রায় একই রকম ব্যবস্থা। এ ছাড়া হাটে বাজারে সর্বত্রই মেয়েদের কর্মব্যস্ততা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে মেলা অথবা প্রদর্শনীতে যেমন ছোট ছোট দোকান দেখতে পাওয়া যায়, জাপানের হাটে বাজারে সর্বত্রই অসংখ্য মেয়েরা তেমনি ছোট ছোট দোকান সাজিয়ে বসেছে। এমন কি বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীরাও কেউ বা ফিরি করে, কেউ বা দোকান সাজিয়ে বসে ধর্মসংক্রান্ত নানারকম ছবি ও গৃহস্থদের ঠাকুর ঘরের যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপকরণ ও তৈজস-পত্র বিক্রী করছে। ট্রামে বাসে মেয়ে কণ্ডাক্টররা যে তৎপরতা ও শৃঙ্খলার সাথে কাজ করে যাচ্ছে তার কাছে আমাদের দেশের পুরুষ কণ্ডাক্টরকেও হার মানতে হবে। পাশ্চাত্য ধরণের আধুনিক হোটেল, প্রাচীন সরাইখানা যেখানেই গিয়েছি সেখানেই দেখেছি মেয়েরা কাজ করছে। আগন্তুকদের আদর অভ্যর্থনা, খাবার পরিবেশন সমস্ত কাজই মেয়েরা এমন সহজ ভদ্রতার সাথে নিখুঁতভাবে করে যাচ্ছে যে দেখে খুশী না হয়ে উপায় নেই।

জাপান আজ শিল্প ও বাণিজ্যে পৃথিবীতে যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে তার মূলে জাপানী মেয়েদের যে কৃতিত্ব রয়েছে চোখে না দেখলে তা ধারণা করবার উপায় নেই। জাপানে ছোট বড় এমন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে জাপানী মেয়েরা কাজ করছে না। অনেক কারখানায় এমন অনেক বিভাগ আছে যেখানে সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত তাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়—এক মুহূর্তও বসবার উপায় নেই। মাঝখানে বিশ্রাম ও জলযোগ করবার ছুটি মাত্র এক ঘণ্টা। অফিসের কেরাণী, টেলিফোন অপারেটার ও টাইপিস্টের কাজ সবই মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বিদেশী ব্যাঙ্ক অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে যেসব মেয়েরা কাজ করে তারা সাধারণত ইংরেজী শিক্ষিতা হয়ে থাকে। আমাদের দেশের ইংরেজী শিক্ষিতা মেয়েদের চাইতে এদের ইংরেজী উচ্চারণ ও কথাবলার কায়দাকানুন ঢের বেশি নিখুঁত ও সুন্দর। পাড়াগাঁয়ের মেয়েরাও চুপ করে বসে নেই। ঘরের কাজ সেরে তারা মাঠে বেরিয়ে যায় যেখানে তাদের স্বামী পুত্রেরা চাষের কাজ করছে। ক্ষেতের ছোট বড় সব কাজই মেয়েরা করে থাকে।

জাপানী মেয়েদের কষ্টসহিষ্ণুতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম দেখলে বিস্ময়ে চেয়ে থাকতে হয়। জাপানী মেয়েরা এত বেশি কর্মপরায়ণা বলেই জাপানী পুরুষেরা ছোটখাট কাজ থেকে মুক্তি পেয়ে বৃহত্তর কাজে মনোযোগ দেবার অবকাশ পেয়েছে এবং তার ফলে সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তিতে আধুনিক জগতে জাপান আজ শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। এর জন্যে জাপানী মেয়েদের ঘরের কাজ অনেক সংক্ষেপ করতে হয়েছে —গৃহস্থালীর আয়োজনে বিলাসিতা ও আরামপ্রিয়তা অনেক কমাতে হয়েছে। আমাদের দেশের মেয়েদের মত গৃহের



জাপানের পল্লীবালিকা

অনাবশ্যক আড়ম্বর ও খুঁটিনাটির মধ্যে বাস করে নিজেদের আদর্শ গৃহিণী মনে করে' ভাবপ্রবণতায় গদগদ হয়ে থাকার মত স্থূল প্রবৃত্তি জাপানী মেয়েদের নেই। অনেকের ধারণা আমাদের দেশের মেয়েরাই জগতে আদর্শ গৃহিণী, তাদের বাইরের কাজে লাগালে ঘরের কাজকে তারা অবহেলা করবে এবং ঘরের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট করবে। কিন্তু তারা নিতান্ত কূপমণ্ডূক এবং বাইরের জগত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলেই এ কথা বলে থাকেন। জাপানী মেয়েদের সংসারযাত্রা চোখে দেখলে তাদের ভ্রান্ত ধারণা ঘুচে যেতে বেশি দেরী হবে না। সংসারের কাজে জাপানী মেয়েদের বিন্দুমাত্র অবহেলা বা অনিচ্ছা নেই। গৃহিণী হিসাবে আমাদের দেশের মেয়েদের চাইতে তাদের স্থান অনেক উঁচুতে। তার কারণ আমাদের দেশের মেয়েদের মত তারা ভুঁইফোঁড় গৃহিণী নয়। বিদ্যালয়ে গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজ শিক্ষা দিয়ে তাদের আদর্শ গৃহিণী হিসাবে গড়ে তোলা হয়। আমাদের দেশের শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে ঘরের কাজে একটা অনাসক্তি দেখতে পাওয়া যায় বটে, তার কারণ আমাদের গৃহের কুরুচিপূর্ণ ব্যবস্থা। পশুরা যেমন গুহায় বাস করে' নির্বিকারভাবে প্রাণী সৃষ্টি করে থাকে আমাদের গৃহও তেমনি শুধু প্রাণী সৃষ্টি করার গুহা-বিশেষ—তাতে বাইরের আলো প্রবেশ করবার কোন উপায় নেই। কিন্তু জাপানী মেয়েরা পুরুষদের শুধু কামনার সামগ্রী নয়—তার জন্যেই জাপানী পুরুষেরা নানারকম কুসংস্কারের প্রাচীর দিয়ে বাইরের আলো বাতাস থেকে তাদের বঞ্চিত করে' তাদের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করে রাখেনি। জাপানী মেয়েদের আমার খুব ভালোই লেগেছিল। ওদের সুস্থ সবল স্বাভাবিক জীবনে জটিলতা নেই—সমস্যার দ্বন্দ্ব নেই। মনে ওদের কোন দ্বিধা নেই, সংশয় নেই—ওরা যা ভাল মনে করে, কাজেও নিঃসংশয়ে তার অনুসরণ করে থাকে। স্বাধীন বলেই চিন্তায় ভাবনায় ও কাজে ওদের চমৎকার সামঞ্জস্য। আমাদের দেশে যেসব মেয়েরা অত্যন্ত পর্দানশীন অবস্থায় বাস করে বিদেশে গেলে তারাও ঘোমটা ফেলে দেয়। আমারও যেন অনেকটা সেই অবস্থা—এক নিমেষে সমস্ত সংস্কার ও অতীতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলে গিয়ে আমি যেন ওদের সাথে এক হয়ে গেলুম। ওরা কিছুই জানতে পেল না আমার এই আধুনিক ধরণের বেশভূষা ও চালচলন আসলে সমস্তই এক বিরাট ফাঁকি—এর আড়ালে মনের কত বড় দৈন্য ও অক্ষমতা আমি গোপন করে চলেছি। ভাবছি বুদ্ধিতে তো আমরা জাপানী মেয়েদের চাইতে বিশেষ খাটো নই, তবু কেন আমাদের এই অবস্থা। এই কি ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য না অদৃষ্টের উপহাস মাত্র। আমাদের ভবিষ্যত ইতিহাসই একদিন এই প্রশ্নের জবাব দেবে।

বিগত বসন্ত

(১৯৯ পৃষ্ঠার পর)

দোরঙ্গী বললে, যেটুকু কাজ খারাপ হয়েছে সেটুকু ভাঙুন, গোটা বাড়িটা ভাঙলে যে অনেক টাকার লোকসান হবে।

এগিয়ে এসে প্রবোধ বলল—না, না, তা হয় না দোরঙ্গী। সবটাই ভেঙে ঐ পুকুরটায় ফেলতে হবে—আমি আর পুকুরটার দিকে তাকাতে পাচ্ছি না। তারপর দোরঙ্গীর হাত'দুটি ধরে উন্মাদের মত বলল—দশ বছর পয়সা উপায় করেছি, আজ একদিনে একটা ভুলের জন্য যদি পঁচিশ হাজার উড়ে যায়, থাক্ ক্ষোভ করবার ত কেউ নেই!

সারারাত জাগরণের ও দুশ্চিন্তায় কাটানোয় প্রবোধের মুখ বড় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। তাই দোরঙ্গী আর দ্বিরুক্তি না করে মজুরাদের কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিলো।

বারান্দার উপর প্রবোধ অস্থির চরণে ঘুরছিল সহসা চীৎকার করে উঠল—ভাঙো—ভাঙো; শত হস্তের শাবলের ঘায় চতুর্দিকে যেন সহস্র জলতরঙ্গ একত্র বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল, বৃহৎ ইমারতের ইঁট, বালু খসে পড়ে। এমনই বুঝি চিরন্তন নিয়ম, মানুষ এক হাতে গড়ে, ভাঙে অপর হাতে।

ইঁট কাঠ ভেঙে পড়ার শব্দে প্রবোধের মাথায় যেন খুন চেপে গেল। সে এক হাত দিয়ে নিজের মাথার চুল টানছে আর ভাঙা গলায় কেবলই চিৎকার তুলছে—ভাঙো, ভাঙো...

সন্ধ্যার সময় দোরঙ্গী এসে বলল—চলুন সাহেব, কাজ হয়ে গেছে।

একটা টুলের উপর গালে হাত দিয়ে স্তব্ধ পাষাণ মূর্তির মত প্রবোধ বসে ছিল। স্বপ্নোত্থিতের মত দাঁড়িয়ে বলল—ধ্রুবতারা থেকে ধূমকেতু, না? ভাঙো—ভাঙো।

রঙ্গজগৎ

• জ্যোতি সিনেমায় 'পুনর্মিলন'

'হিমাংশু রায় প্রতিষ্ঠিত বোম্বে টকীজের ছবি। প্রযোজক দেবীকারাণী। কাহিনী রচনা করিয়াছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সংগীত পরিচালনা করিয়াছেন রামচন্দ্র পাল। ছবির পরিচালক এস নাজমল হাসান নাক্‌ভী। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন স্নেহপ্রভা, কিশোর সাহু, অঞ্জলি দেবী, শাহ্ নওয়াজ, পিঠাওয়ালা, জগন্নাথ বাবুরাও।

প্রথমে কাহিনী সংক্ষেপে বলা যাক্। জমিদার গোপীনাথ তাহার একমাত্র পুত্র কুমারের অষ্টাদশ জন্মতিথি উৎসবের রাত্রে মাতাল হইয়া বন্ধু গঙ্গারামকে হত্যা করিলেন। পিতাকে বাঁচাইবার জন্য কুমার খুনের দায় নিজেই বহন করিয়া সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করিল। পরদিন পুলিশ আসিয়াছে, কিন্তু গোপীনাথ পূর্বরাত্রির মর্মান্তিক আঘাতে পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হইয়া শয্যাশায়ী, বাক্‌শক্তিও তাহার লোপ পাইয়াছে। পুলিশ কুমারকেই খুনী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য পরওয়ানা জারী করিল। এদিকে গৃহত্যাগী কুমার আশ্রয় পাইল শহরের এক ভিক্ষুণী নর্তকী কোয়েলীর কুটীরে। কুমারের একমাত্র ভগ্নী জয়ন্তী পিতা গোপীনাথের চিকিৎসার জন্য সেই শহরে আসিয়া উপস্থিত, সেখানে কোয়েলীর নৃত্যে ও গানে মুগ্ধ হইয়া জয়ন্তী তাহাকে গৃহে আহ্বান করিয়া তাহার সহিত আলাপ করিল। ধনী দুশ্চরিত্র মনোহর জয়ন্তীর সহিত পরিচয় করিল এবং জয়ন্তীকে খুশী করিবার জন্য কোয়েলীর নৃত্য প্রদর্শনীর আয়োজন করিল। সেইখানে জয়ন্তীর সহিত কুমারের অকস্মাৎ দেখা হইয়া যায়, কুমার আত্মগোপন করে। কিন্তু মনোহরের দৃষ্টি এড়ায় নাই। সে খোঁজ লইয়া কুমারের বিষয় সবই জানিতে পারিল। এই ব্যাপারটিকে অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করিয়া মনোহর কুমতলবে জয়ন্তীকে ভয় দেখাইয়া ডাক-বাঙলোয় লইয়া যায়। ইতিমধ্যে কুমার তাহার পিতা ও ভগ্নীকে দেখিবার জন্য কোয়েলীর সাহায্যে গোপনে পিতার নিকট যায় এবং ভগ্নীর দুঃসংবাদ পাইয়াই নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়া মনোহরের হাত হইতে জয়ন্তীকে রক্ষা করে, কিন্তু পুলিশ সন্ধান পাইয়া কুমারকে গ্রেপ্তার করিল। ইতিমধ্যে গোপীনাথ বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে, সে সত্য ঘটনা পুলিশের নিকট স্বীকার করিয়া জানাইয়া দিল প্রকৃত খুনী কে। কাহিনীর এইখানেই সমাপ্তি এবং এইখানেই পিতা পুত্র, ভ্রাতা ভগ্নী, প্রেমিক ও প্রেমিকার পুনর্মিলন।

শুধু কাহিনীর দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে বলিতে হয়—এই চিত্র বোম্বে টকীজের গৌরব রক্ষা করিতে পারে নাই। বোম্বে টকীজের কাহিনীর সহজ সারল্য, স্বাভাবিক গতি, পল্লীসমাজের সুস্থ পরিবেশ, বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী—ইহার কোনটাই 'পুনর্মিলনে' পাওয়া যায় না, অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজের সহিত এ কাহিনীর যোগ নাই, ইহাতে রহিয়াছে একটি হত্যা-কাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া ডিটেকটিভ কাহিনী রচনার প্রয়াস। ঘটনাগুলি খাপছাড়া, দানা বাঁধে নাই। চিত্র পরিচালনার দক্ষতার অভাবে গল্পের গতি শ্লথ মন্থর—এমন কি কোন কোন স্থলে স্থির হইয়া গিয়াছে।



'খাজাঞ্চি' চিত্রে শ্রীমতী রমলা

তথাপি 'পুনর্মিলন' চিত্রকে আমরা ব্যর্থ বলিতে পারি না। এক ধরণের ছবি আছে যেখানে কাহিনী মুখ্য এবং কাহিনীর জোরেই ছবি উৎরাইয়া যায়, তেমনি আরেক ধরণের ছবিতে কাহিনী থাকে গৌণরূপে, ছবির treatmentএর জোরেই তাহা দর্শকদের ভুলাইয়া রাখে। পুনর্মিলন দ্বিতীয় ধরণের ছবি। কাহিনী অপেক্ষা চিত্তবিনোদনের দিকে পরিচালক দৃষ্টি দিয়াছেন বেশী এবং কৃতকার্যও হইয়াছেন। ছবিটি নৃত্যগীত-মুখর। কাহিনীর দুর্বলতাকে আগাগোড়া নাচে ও গানে ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অভিনয়ের ভিক্ষুনী নর্তকী কোয়েলীর ভূমিকায় স্নেহ-প্রভার সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ অভিনয় প্রশংসনীয়। তাঁহার নৃত্যে ও গানে ছবি প্রাণ পাইয়াছে। নায়কের ভূমিকায় কিশোর সাহু উপযুক্ত অভিনয়ক্ষমতা দেখাইতে পারেন নাই, অত্যন্ত পৌরুষের অভাব। দুর্বৃত্ত মনোহরের ভূমিকায় শাহ্ নওয়াজের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। রামচন্দ্র পালের সংগীত

পরিচালনা এই চিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, কয়েকটি গানের হাল্কা মধুর সুর কানে গুঞ্জরণ করিতে থাকে। নৃত্য পরিচালনায় মমতাজ আলী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। প্রত্যেকটি নৃত্যের চটুল ছন্দ ও দেহভঙ্গিমা চিত্তে দোলা দেয়। সুতরাং কাহিনীর দিক দিয়া এই ছবি বিফল হইলেও চিত্তবিনোদনের দিক দিয়া ইহা একটি প্রথম শ্রেণীর চিত্র—একথা নিঃসংশয়েই বলা যাইতে পারে।

মিনার্ভায় 'গীতা'

সিরকো পিকচার্সের সামাজিক চিত্র 'গীতা' ৮ই মার্চ (শনিবার) হইতে মিনার্ভায় প্রদর্শিত হইবে। ছবিটি পরিচালনা করিয়াছেন অস্তেকর, মিস্রো কটরকের কাহিনী অবলম্বনে গৃহীত। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন চন্দ্রমোহন ও দুর্গা খোটে।

ছবিটি যদিও 'সামাজিক চিত্র' বলিয়া প্রচারিত হইতেছে তথাপি ইহাকে ধর্মমূলক চিত্ররূপে আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। নায়িকা দুর্গা খোটে গীতার ধর্মকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন করিয়া সমাজ, দেশ ও সমগ্র মানবজাতির সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন, ধর্মকেই তিনি কর্মের পথ করিয়া লইলেন। তাঁহার স্বামী চন্দ্রমোহন ছিলেন বিপরীত প্রকৃতির লোক, সংসারের ঝড়-ঝাপ্টা, অত্যাচার নিপীড়নে তিনি সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন, তাঁহার বালক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তিনি অধর্মের পথে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য নিরুদ্দেশ হইলেন। ধর্মের জয় ও অধর্মের পতন এই নীতিই ছবিটিতে দেখানো হইয়াছে—গান্ধীবাদের প্রচারও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।

পরিচালনার অক্ষমতায় কাহিনী সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলেও গল্পের বলিষ্ঠ রূপ আছে, মাঝে মাঝে দর্শকদের অভিভূত করিবার মতো ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতও আছে।

একেই ছবিটি অত্যন্ত দীর্ঘ, তাহার উপর একঘেয়ে সুরের দশটি গানকে স্থানে অস্থানে প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে জুড়িয়া দিয়া দর্শকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইবার উপক্রম করিয়াছে। ছবির ঘটনা যেখানে দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে সেখানে অপ্রাসঙ্গিকভাবে যে ক'খানি গান ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা কাঁচিছাঁটাই করিলে ভাল হয়।

পিতা ও পুত্র উভয় ভূমিকায় চন্দ্রমোহনের অভিনয় ছবির গতি কোথাও শ্লথ হইতে দেন নাই। দুর্গা খোটে আপন চরিত্রকে সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অন্যান্য ভূমিকা অনুল্লেখযোগ্য।

ছায়ালোকের টুকিটাকি।

সম্পাদক ভায়া,

নিউ থিয়েটার্সকে গালাগালি করাটা কি আজকাল অনেকের ফ্যাসানে দাঁড়িয়েছে? নিউ থিয়েটার্সের ছবি হলেই বল্‌তে হবে—'কিস্‌সুনা,' Rot নয়ত লোকে সমজ্‌দার বলবে না!.........

ভালো! আবার শুনচি নাকি, নিউ থিয়েটার্স পটল তুলছে, Liquidation পত্রে যাচ্ছে। অবাঙালীরা কিনে নিচ্ছে।.........

বল্‌তে পারো ভায়া, এ সব গুজব রটান কোন্ 'চোরা-ফেউ'রা? তাদের পিছনে কাদের টাকা আর মাথা? তারা কি বাঙালী।

ভায়া, তারা নিশ্চয়ই জানে, নিউ থিয়েটার্সই একমাত্র সিনেমা কোম্পানী, যারা শুধু ব্যবসা করেন না, নূতন নূতন পরিচালক, ক্যামেরাম্যান, শব্দযন্ত্রী প্রভৃতি টেকনিসিয়ানও গড়েন।.........

বছরে যতখানা করে ছবি এ'রা তোলেন, তার সিকি আন্দাজ ছবিও ভারতের অন্য কোন ষ্টুডিও তোলেন না, অনেক ছবি তোলেন বলেই এ'দের কোন কোনটা ভাল পয়সা দেয়, আবার কোন কোনটা দেয় না। লোকসান খাবার ভয়ে ভীত না হয়েও রকমফের ছবি তোলবার সাহস এ'রা রাখেন।.........হালে আবার একটা মজার কথা শুনতে পাচ্ছি—দেবকী বোস, ফণি মজুমদারকে না কি অকেজো বলে নিউ থিয়েটার্স তাড়িয়ে দিচ্ছেন। অবশ্য তাদের মধ্যে দু'একজন প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন—'নাহে বন্‌চে না বলেই তারা সরে যাচ্ছে।

ভায়া, এ দুটোই মিথ্যে—তা তো তুমি জানই। নিউ থিয়েটার্সের কর্মীরা বাইরে গেলেও যে নিউ থিয়েটার্স-এরই লোক থাকে, সে জ্ঞানটা ঐ দুর্নাম রটনাকারীদের কবে হবে বলতে পারো? ফণি মজুমদার, দেবকী বোস বাইরে গিয়ে এটাই দেখাতে চান, নিউ থিয়েটার্স যেমন নিজেদের জন্য, তেমনি ভারতের অন্যান্য ষ্টুডিওর জন্যও টেকনিসিয়ান তৈরী করেন।

ভারতের ষ্টুডিওগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বাঙলার গৌরব, এই কোম্পানীটি সিনেমা-ছবি তোলার ব্যবসা কর্‌লেও তাঁদের ষ্টুডিও দুটোকে সিনেমা শিল্পী গড়্‌বার institute হিসাবে দেখে থাকেন তাতে এ'দের ব্যবসাবুদ্ধি নেই বলে রাগ করোনা ভায়া। এ'রা তোমার আমার মতই বাঙালী। কাজেই art খাটিয়ে ব্যবসা করতে বসলেও এ'রা ভুলতে পারেন না—নূতন art, নূতন নূতন শিল্পী, নব নব উচ্চাঙ্গের চলচ্চিত্রের সৃষ্টি করতে পারলেই তাঁরা সার্থক হবেন, বাঙালীর জাতীয় প্রতিভার বিশেষত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হবেন। পরিচালনার ক্ষেত্রে এই যে দুজন পরিচালক অন্য কোম্পানীতে সরে যাচ্ছেন, তাঁরা স্থান করে দিচ্ছেন—নিউ থিয়েটার্সের ভিতর হতে গড়া, দুজন নূতন পরিচালকের।

......দেখ্‌তে পাচ্ছো না কি ভায়া, আজ ভারতের কতগুলি ষ্টুডিওতে নিউ থিয়েটার্সের প্রাক্তন কর্মীরা, যশ বিকিরণ করছেন? ......যে সব কুচক্রী ছিঁচকে বদ্‌মাসরা এ ভাবে নিউ থিয়েটার্সের বদনাম করে বেড়ান, এমন কি নিউ থিয়েটার্সের কর্ম্মীদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ঘটাবার জন্য, নিজেদের বা অন্যদের গাঁটের কড়ি খরচ করান—তাদের জন্য আমার বড্ড দুঃখ হচ্ছে ভায়া! আহা!" বেচারারা গোড়াতেই ভুল করছে। তাদের বুঝিয়ে দিও, নিউ থিয়েটার্সের কর্মীরা পরস্পরে ঝগড়াঝাটি করে বটে, কিন্তু সাথে সাথে পরস্পরে হাতে হাত মিলিয়েও চলে। তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা অদ্ভুত হৃদ্যতার সম্পর্ক বিদ্যমান। নিউ থিয়েটার্স তাদের বড় আপনার। ইতি।

ছবির নাম খাজাঞ্চী। জাত-হিন্দী। ছবিখানা বিখ্যাত 'Way of all flesh'এর না বলিয়া অনুবাদ করা গল্প (চুরি করা বল্‌বে না—আইনে বাধবে), প্রডিউসার্স পাঞ্চোলী পিকচার্স। মালিক মিঃ দলসুখ পাঞ্চোলী, তিনি দিল্লীর বিখ্যাত 'সিনেমা কাগজ' 'রূপবাণী'কে তার করচেন—

'Press public acclaimed 'Khajanchi', as best entertainment in last three years. Songs considered easily surpassing superb numbers of Bakavali and Yamla Jat.'

প্রডিউসার প্রেসকে তার করচেন!!! বাঙালী প্রডিউসাররা বুঝতে পাচ্ছেন কি, কেন তাঁরা সিনেমা ব্যবসায় ভারতের ওপাড়ার কাছে হেরে যাচ্ছেন? এদের মত এ ধরণের publicity দিতে তাঁরা শিখেছেন কি?

ভায়া, নিউ থিয়েটার্সের ছবি নাকি আজকাল ভারতের সর্ব্বত্রই অচল? তবে, কেন এ কথা বলায়, অবিনাশদা আমায় এ ভাবে মেরে হাড়গোড় ভেঙ্গে দিল। অবিনাশদাকে তো তুমিও চেনো ভায়া। সারা দেশের সিনেমা হাউসগুলির Sale Report তাঁর নখদর্পণে। অবিনাশ দাদা বলতে চান—ও দেশের hit picturesএর ৯৯ খানাই নাকি সিনেমা কাগজগুলোর পাতাতেই hit হয়। দর্শক show house এ ঢুকে পয়সা দিয়ে তা hit করেন না।.........

বড় বিপদ ভায়া—অবিনাশদার কথা অবিশ্বাস করে দুচারজন distributorsএর হিসেবের খাতা গোপনে খুলে দেখি—অবিনাশদার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। নিউ থিয়েটার্সের ছবি নিত্য hit হয় না, তবে high standard sale দেয়। Distributorরা নিউ থিয়েটার্সের ছবি থেকেই সব চেয়ে বেশী পয়সা কামান। তাঁরা দশজনের আড়ালে আবডালে স্বীকারও করে ফেলেন, নিউ থিয়েটার্সের ছবির সম্মানই ভারতে সবচেয়ে বেশী।

—[illegible]

খেলাধুলা

কলিকাতা হকি-লীগ প্রতিযোগিতা

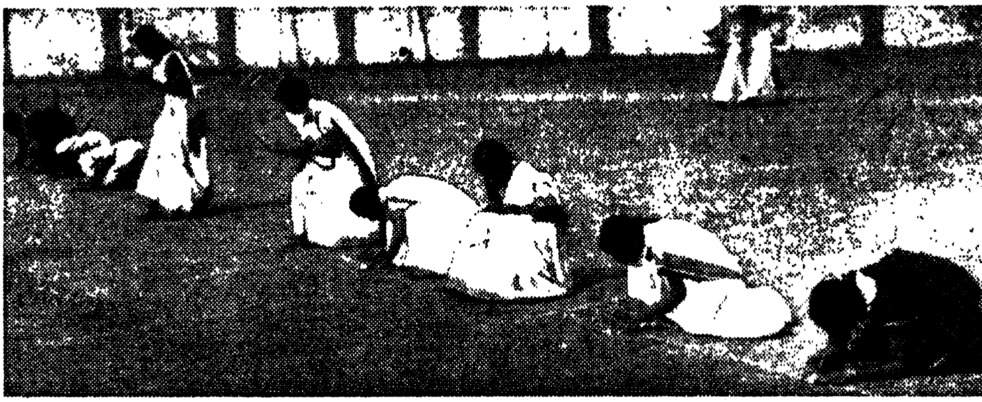
বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন পরিচালিত কলিকাতা হকি লীগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগের খেলা আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম বিভাগীয় লীগ প্রতিযোগিতায় ১৭টি দল যোগদান করিয়াছে। ক্যালকাটা দলের এই বিভাগে খেলিবার কথা ছিল, কিন্তু খেলোয়াড়ের অভাবের জন্যই যোগদান করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহাদের বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণের মধ্যে অধিকাংশই যুদ্ধের কার্যে ব্যস্ত আছেন। অন্যান্য বৎসর এই বিভাগীয় প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলায় যেরূপ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইত এই বৎসর সেইরূপ হইতেছে না। প্রতিযোগিতার শেষের দিকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে বিভিন্ন দলকে দেখা যাইবে তাহারও বিশেষ সম্ভাবনা নাই। সকল দলের খেলাই একরূপ নিরুৎসাহপূর্ণ হইতেছে। এইভাবে যদি লীগ প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি হয়, তবে বাইটন কাপ প্রতিযোগিতার সময় বাঙলার বিভিন্ন দল বিশেষ ভাল ফল প্রদর্শন করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। বাঙলার হকি খেলোয়াড়গণের পক্ষে ইহা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়। এই পর্যন্ত যতগুলি খেলা হইয়াছে তাহাতে গত বৎসরের লীগ বিজয়ী বি জি প্রেস দল লীগ তালিকার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার পরেই কাষ্টমস ও আর্মেনিয়ান্স দল। এই তিনটি দলের পয়েণ্ট সমান সমান। বি জি প্রেস দল যেরূপ খেলিতেছে তাহাতে সে এই স্থান শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দলের অবস্থা খুবই সঙ্গীন। এই দুই দলের পক্ষে চ্যাম্পিয়ান হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। পোর্ট কমিশনার্স দলের খেলা সকল ক্রীড়ামোদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। অনেকের ধারণা এই দলটি চ্যাম্পিয়ান হইতে পারিবে। তবে এইরূপ ধারণা আমরা করি না। কারণ প্রতিযোগিতা সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত কোন্ দলের কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। নিম্নে প্রথম বিভাগীয় লীগের তালিকা প্রদত্ত হইলঃ—

বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত

প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবার পূর্বে বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষগণ প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, এই বৎসরের লীগ খেলায় কোন দল বিভাগীয় লীগ তালিকায় সর্বনিম্ন স্থান অধিকার করিলেও নামিয়া যাইবে না অথবা তালিকায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলে উঠিবে না। ইহার জন্য খেলোয়াড়গণ হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং সেইজন্যই কোন খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হইতেছে না।

নিখিল ভারত বনাম বাঙলা দলের খেলা

সম্প্রতি নিখিল ভারত দলের বাঙলা হকি দলের এক প্রদর্শনী খেলা হইয়া গিয়াছে। এই খেলায় বাঙলা দল ২—১ গোলে বিজয়ী হইয়াছে। বাঙলা দলের এই সাফল্য প্রশংসনীয় হইলেও কৃতিত্বপূর্ণ হয় নাই। বাঙলা দল একরূপ সৌভাগ্যবশত বিজয়ী হইয়াছে। নিখিল ভারত দলের খেলাও খুব উচ্চাঙ্গের হয় নাই।



ভারত স্ত্রী শিক্ষাসদনের বার্ষিক স্পোর্টসে বালিকাদের অঙ্ক কষিয়া দৌড়ের একটি দৃশ্য

বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর ধ্যানচাঁদ এই দিন খেলায় মোটেই সুবিধা করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভ্রাতা রূপসিংহের খেলাও বিশেষ সন্তোষজনক হয় নাই। তাঁহার খেলায় সহযোগিতার অভাব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ধ্যানচাঁদ ও রূপসিংহের খেলা হইতে অবসর গ্রহণের যে সময় হইয়াছে ইহা বলিলে কোনরূপ অন্যায় হইবে না। এই খেলা দেখিয়া অনেকেরই মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে ভারতের হকি ষ্ট্যাণ্ডার্ড খুবই নিম্নস্তরের হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় হকি দলের পক্ষে "বিশ্ববিজয়ী" নাম রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। আমরা কিন্তু এইরূপ ধারণা পোষণ করি না। কারণ আমরা জানি অনুশীলনের অভাবেই ভারতীয় দলের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। ধ্যানচাঁদ ও রূপসিংহকে ছাড়িয়া দিলে এই দলের মুন্না সিংহ, দুর্গা, মুস্তাক আমেদের খেলায় উচ্চাঙ্গ নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারা নিয়মিতভাবে অনুশীলন করিলে ভারতীয় দলের সম্মান রক্ষা করিতে পারিবেন। অনুসন্ধান করিলে এইরূপ হকি খেলোয়াড় আরও যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া যাইবে ইহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। ঐ সকল খেলোয়াড়গণকে একত্র করিলে পুনরায় নিখিল ভারত দল একটি শক্তিশালী দলে পরিণত হইবে।

খেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

খেলা আরম্ভ হইবার পরই বাঙ্গলা দলের কার ট্যাপসেলের নিকট হইতে বল পাইয়া চরঞ্জিৎকে দিলে চরঞ্জিৎ প্রথম গোল করেন। (১-০)। ইহার পর বাঙ্গলা দলের খেলায় দ্বিগুণ উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। ১৮ মিনিটের সময় কার চরঞ্জিতের পাস হইতে দ্বিতীয় গোল করেন (২-০)। এইরূপে বাঙ্গলা দল প্রথমার্ধে দুই গোলে অগ্রগামী থাকে দ্বিতীয়ার্ধের খেলায়

নিখিল ভারত দল ভীষণ চাপিয়া খেলে। তৃতীয় মিনিটেই ধ্যানচাঁদ একটি গোল পরিশোধ করেন (২-১)। নিখিল ভারত দলের খেলায় উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। তাঁহারা পুনরায় গোল করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে; কিন্তু সাফল্যলাভ করে না। বাঙ্গলা দলের রক্ষণভাগ এই সময় ভাল খেলে। খেলার শেষ সময় পর্যন্ত নিখিল ভারত দল চাপিয়া খেলিয়া ও দ্বিতীয় গোলটি পরিশোধ করিতে পারে না। নিম্নে উভয় দলের খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল।

বাঙ্গলা দল:—এলেন, ট্যাপসেল, হজেস, মামুদ দার, কাপুর, গ্যাঙ্গিবাড়ী, এ মিত্র, চরঞ্জিৎ, আর কার (অধিনায়ক), জানসেন ও জব্বর।

নিখিল ভারত দল:—ফ্রাঙ্কা, মুস্তাক আমেদ, মহম্মদ হোসেন, মুন্না সিং, দুর্গা, ডবলিউ ফার্নেণ্ডিজ, কিশেন, হাকিম, ধ্যানচাঁদ, রূপ সিং ও পি ফার্নেণ্ডিজ।

বালিকাদের এ্যাথলেটিক স্পোর্টস

বাঙ্গালী বালিকাগণের এ্যাথলেটিকস স্পোর্টস বিষয় বিপুল উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দলে দলে তাঁহারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতেছেন। ২।৩ বৎসর পূর্বে যে সংখ্যক বাঙ্গালী বালিকা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিত তাহার বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি জাতীয় যুব সঙ্ঘ, বৌবাজার শান্তি সঙ্ঘ, ভারত স্ত্রী শিক্ষা সদন, বাণীমন্দির বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটিতে শত শত বাঙ্গালী বালিকাকে যোগদান করিতে দেখা গিয়াছে। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন বিষয় বহু সংখ্যক বালিকা যোগদান করায় হিট বা প্রাথমিক প্রতযোগতার ব্যবস্থা করতে হইয়াছে। সকল প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিষয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ের ফলাফলও পূর্ব বৎসর অপেক্ষা উন্নততর হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার সাহায্য পাইলে এই সকল বালিকা অভাবনীয় উন্নতি করিতে পারিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য বাঙ্গলার ও দুর্ভাগ্য বালিকাগণের যে এইরূপ শিক্ষাদানের কোন প্রতিষ্ঠান নাই। শীঘ্র যে গঠিত হইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। যে সকল প্রতিষ্ঠান বালিকাগণের স্পোর্টসের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন তাঁহাদেরও আর্থিক অবস্থা এত ভাল নহে যে, তাঁহারা এইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারেন। দেশের ব্যায়াম উৎসাহী ধনীগণের সাহায্য ব্যতীত ইহা হওয়া অসম্ভব। এইরূপ একটি শিক্ষাকেন্দ্র খুলিতে না পারিলে বালিকাগণের এত উৎসাহ, এত উদ্দীপনা সকলই কয়েক বৎসরের মধ্যে নষ্ট হইয়া যাইবে অর্থাৎ তাঁহাদের ক্রমোন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে। এ্যাথলেটিকস স্পোর্টস ব্যায়াম চর্চার প্রথম সোপান। এই এ্যাথলেটিকস স্পোর্টসের উন্নতির উপরই ব্যায়াম চর্চার উন্নতি নির্ভর করিতেছে। আবার ব্যায়াম চর্চার উন্নতির উপর দেশের মাতৃজাতির স্বাস্থ্যোন্নতি নির্ভর করিতেছে। মাতৃজাতির স্বাস্থ্যোন্নতির উপর দেশের ভবিষ্যৎ কর্মশক্তি, বা দেশের ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছে। সুতরাং দেশের ধনী সমাজের সাহায্য পাওয়া যাইবে না ইহা কি খুবই পরিতাপের বিষয় নহে?



ভারত স্ত্রী শিক্ষাসদনের বার্ষিক স্পোর্টসে দাঁড় টানাটানির একটি দৃশ্য

বিচিত্র বার্তা

চৌর্যবৃত্তি বেরালের জাতস্বভাব হ'লেও আমরা সেটাকে একরকম উপেক্ষা করেই তাদের ঘরে স্থান দিই। ছেলে বুড়ো সকলেই বেরালের উপর খুব বেশী আকৃষ্ট হয়, অনেকের বাৎসল্যপ্রীতি তাদের উপর আবার প্রবল হয়ে ওঠে। গৃহস্থের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে বেরালের একটা সুনাম আছে, তারা গৃহস্থকে আশু বিপদ থেকে কত রকমে যে রক্ষা করেছে, তার ঘটনা আমরা বহুদিন থেকেই শুনে এবং দেখে আসছি। বেরাল যে কেবল আমাদের সখের পশু নয় প্রকৃত বন্ধু এবং উপার্জনশীল, তা প্রমাণ করে দিয়েছে আমেরিকার 'চীসী'। চীসী একটি বেরালের নাম। দশ বছর আগে চীসী কোন খ্যাতনামা রেলওয়ে কোম্পানীর প্রচার বিভাগে যোগদান করে। নরম বালিশের উপর মাথা ডুবিয়ে, গায়ের উপর একটা চাদর ফেলে চীসী এক দর্শনীয় ভঙ্গিতে নিদ্রার অভিনয় করে, আর সে ছবি তুলে ছাপা হয় রেলওয়ে কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে। সহস্র সহস্র পাঠক সেই বিজ্ঞাপনের উপর চোখ ডুবিয়ে চীসীর নিদ্রালু চোখের মধ্যে কি যেন এক সুখ স্পর্শের আমেজ খুঁজে পায়, চীসীর শয়নের ভঙ্গিমার মধ্যে সকলেই নিজের দেহে যেন একটা আরামদায়ক স্পর্শ অনুভব করে। শত শত মাইল রেল-ভ্রমণের মধ্যেও আরোহীরা যে চীসীর মতনই সুখ নিদ্রার মধ্যে গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছাবেন, এটাই ছিল বিজ্ঞাপনের অর্থ। প্রচারপত্রে চীসীর ছবিই সমস্ত কিছু অর্থ প্রকাশ করে, আরোহীদের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য বাক্য সংযোগের প্রয়োজন হয় না। চীসীর ছবি লক্ষ লক্ষ দেওয়ালের গায়ে দর্শনীয় চিত্র-অভিনেত্রীদের পাশেই স্থান পায়। সে ছবি দর্শকদের যতখানি আকর্ষণ করে, ততখানি অপরের ছবি করে না। অথচ রংয়ের বাহুল্য এবং চাকচিক্যের পরিমাণ—এ দুটোর অভাব সেখানে বেশী থাকে। আমেরিকার সর্বত্রই চীসীর নাম দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়েছে। যথাসময়ে মিঃ পিক নামে এক বেরালের সঙ্গে চীসীর বিয়ে হয়ে যায়। মিসেস পিক এখন এক বৃহৎ সংসারের কর্ত্রী। চীসীর ছেলেমেয়েরা তারই মত দেখতে সুশ্রী হয়েছে, চালচলনে মায়ের নাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এখন চীসীর ছেলেমেয়েদের ছবিও বিজ্ঞাপনের পাতায় ছাপা হচ্ছে। মায়ের মতন ভঙ্গী নিয়েই তারা পাঠকদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসালাভ করেছে। নরম গদির উপর সুখ নিদ্রা, সংসারের ছেলেমেয়েদের খোঁজ খবর রাখা ছাড়া চীসীকে অনেক বড় বড় ধনী এবং খ্যাতনামা লোকের সামনে দেখা দিতে হয়। চীসীর চালচলনে মনে হয়, সে যেন সকলের কথা বেশ বুঝতে পারে, থাবার সঞ্চালনে, লেজের আস্ফালনে মনের আনন্দ প্রকাশ করে এবং তাঁদের কথার উত্তর ইঙ্গিতে প্রকাশ করে। আলাপ আলোচনার মধ্যে শুভাকাঙ্ক্ষীদের সেই স্পর্শে চীসী মৃদু হাস্যে বিনয় প্রকাশ করে, সর্বক্ষণই অতিথির প্রতি যথেষ্ট ভদ্রতা রক্ষা করে চলে। অনিদ্রায় যাঁরা দীর্ঘকাল ভুগছেন, তাঁদের চীসীর সুখনিদ্রার ছবির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ঔষধ ব্যবসায়ীরা প্রচারকার্য চালাতে আরম্ভ করেছে। বলা বাহুল্য, ব্যবসায়ীদের চীসী প্রচুর অর্থ উপার্জনে যথেষ্ট সহায়তা করে আসছে। চীসী এতখানি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে যে, তার ছবি বিজ্ঞাপনে দেখে পাঠক অতি সহজেই বিজ্ঞাপনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, ব্যবসাবুদ্ধির সততার উপর সন্দেহ প্রকাশ করে না।

প্রচার বিভাগের বিশেষ কর্তারা বলেন, এক হাজার গাল-ভারী কথায় বিজ্ঞাপন যা না কাজ দেয়, তার চেয়ে বেশী কাজ দেয় চীসীর মাত্র একটা ছবি। বিজ্ঞাপনে চীসীর ছবির সঙ্গে বেশী কথা লেখার আবশ্যক হয় না। চীসীর সম্বন্ধে এত কথা শুনেও একটা কথা মনে এসে যায়—'বেরালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া'; আমাদের দেশেও বেরালের আদর আছে বটে, তবে এত-খানি কোথায়?

* * * *

ঘাম নির্গত হবার জন্য মানুষের চামড়ায় (সারা শরীরে) ২০ লক্ষাধিক কূপ বা মুখ রয়েছে।

* * * *

প্রতি বৎসর সূর্য যে পরিমাণে উত্তাপ সৃষ্টি করে, তা তৈরী করতে আমাদের প্রয়োজন হবে ৪০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ টন কয়লার।

* * * *

অত বড় ভুখন্ড আইসল্যান্ডে একটি বৃক্ষও নেই।

* * * *

একটি মাছি তার শরীরের আয়তন অনুপাতে একটি মানুষের চেয়েও বেশী শক্তিশালী হয়।

* * * * *

এক গ্যালন সমুদ্রের জলে প্রায় এক পাউন্ড লবণ বিদ্য-মান থাকে।

* * * * *

এক আউন্স রেডিয়াম্ তৈয়ারী করতে ১৪০০০ টন ওর (ore)এর প্রয়োজন।

* * * * *

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, মশা কাল রংয়ের মানুষের দেহকে দংশন করার চেয়ে ফর্সা লোকের দেহকে দংশন করতে বেশী পছন্দ করে।

* * * * *

সাধারণ একজন নগরবাসীর ফুসফুসের মধ্যে প্রতি ষাট সেকেন্ডে ৯০০,০০০,০০০ ধূলিকণা যাওয়া আসা করে।

* * * * *

দেওয়ালের গায়েতে যে সব বিজ্ঞাপন লাগান হয় সেগুলি

দেশ

সাধারণত কাগজের উপরেই ছাপা হয়। সম্প্রতি বিজ্ঞাপন-ওয়ালারা কাপড়ের উপর নানা রংয়ের কালিতে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে সাধারণের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করেছে। এই সব কাপড়ের উপর ছাপা বিজ্ঞাপনগুলি রাস্তার সৌন্দর্যও অনেকখানি বাড়িয়ে তুলে। কাগজের উপর যেমন সুন্দর ছাপা হয় ল্যাঙ্কাসায়ারের তৈয়ারী বিশেষ মসৃণ কাপড়ের উপরও সেরকম সুন্দর স্পষ্ট ছাপাই উঠে। কাগজের চেয়ে এই জাতীয় কাপড়ের দাম কিছু বেশী হলেও বেশ টেকসই হয়, সহজে নষ্ট হয় না। ইউরোপের বড় বড় শহরে এই জাতীয় কাপড়ের উপর বিজ্ঞাপন ছাপান বেশ বেড়ে চলেছে। এদেশে এখনও এর আবির্ভাব হয় নি।

*　　*　　*　　*　　*

চীনের প্রজাপতি জাতীয় এক শ্রেণীর পতঙ্গের ডানা দুটি প্রায় নয় ইঞ্চি পর্যন্ত বাড়তে দেখা গেছে।

*　　*　　*　　*　　*

সাধারণত একজন লোক তার শরীরের ওজনের ১,৪০০ গুণ জল এবং খাদ্য সারা জীবনে গ্রহণ করে থাকে। অথবা ২০০,০০০ পাউন্ড জল বা খাদ্য ভক্ষণ করে।

"দেশ" এর নিয়মাবলী

(১) সাপ্তাহিক **"দেশ"** প্রতি শনিবার প্রাতে **কলিকাতা হইতে** প্রকাশিত হয়। **মফস্বলের কাগজ ঐ দিন ডাকে** দেওয়া হয়।

(২) চাঁদার হার। (ক) ভারতেঃ—ডাকমাসুল **সহ** ৬॥০ সাড়ে ছয় টাকা; ষাণ্মাসিক ৩।০ টাকা। **(খ) ব্রহ্মদেশেঃ— ৮৲** টাকা; ষাণ্মাসিক ৪৲ টাকা ও ভারতের **বাহিরে অন্যান্য দেশেঃ**—ডাকমাসুল সহ বার্ষিক ১১৲ টাকা; ষাণ্মাসিক **৫৷৷০** টাকা।

(৩) ভি পি-তে লইলে যতদিন পর্যন্ত ভি পি-র টাকা আসিয়া না পৌঁছায় ততদিন পর্যন্ত কাগজ পাঠান **হয়** না। অধিকন্তু ভি পি খরচ গ্রাহককেই দিতে হয়, সুতরাং মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠানই বাঞ্ছনীয়।

(৪) যে সপ্তাহে মূল্য পাওয়া যাইবে, সেই সপ্তাহ হইতে এক বৎসর বা ছয় মাসের জন্য কাগজ পাঠান হইবে।

(৫) কলিকাতায় হকারদের নিকট এবং **মফস্বলে** এজেন্টদের নিকট হইতে প্রতিখণ্ড **"দেশ"** নগদ ⁄০ দুই আনা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

(৬) টাকা পয়সা ম্যানেজারের নামে পাঠাইতে হইবে। টাকা পাঠাইবার সময় মনিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে **"দেশ"** কথাটি স্পষ্ট উল্লেখ করিতে হইবে।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণতঃ নিম্নলিখিতরূপ :—

সাধারণ পৃষ্ঠা

	১ বৎসর	৬ মাস	৩ মাস	১ মাস	এক সংখ্যার জন্য
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
পূর্ণ পৃষ্ঠা	২৫৲	৩০৲	৩৫৲	৪০৲	৪৫৲
অর্ধ পৃষ্ঠা	১৩৲	১৬৲	১৮৲	২২৲	২৪৲
সিকি পৃষ্ঠা	৭৲	৯৲	১০৲	১২৲	১৪৲
⅛ পৃষ্ঠা	৪৲	৫৲	৬৲	৭৲	৮৲

এক বৎসর, ছয় মাস, তিন মাস বা এক মাসের জন্য এককালীন চুক্তি করিলে দরের তারতম্য হয়। বিশেষ কোনও নির্দিষ্ট স্থানে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে টাকা প্রতি চারি আনা হইতে আট আনা বেশী লাগে। বিজ্ঞাপন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখিলে বা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে জানা যাইবে।

বিজ্ঞাপনের 'কপি' সোমবার অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার মধ্যে "আনন্দবাজার কার্যালয়ে" পৌঁছান চাই। বিজ্ঞাপনের টাকা পয়সা এবং কপি ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন এবং মনিঅর্ডার কুপনে বা চিঠিতে "দেশ" কথাটি উল্লেখ করিবেন।

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরত চাহিলে সঙ্গে ডাক টিকিট দিবেন। অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

সম্পাদক—"দেশ", ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশ

৮ম বর্ষ] ১লা চৈত্র, শনিবার, ১৩৪৭ সাল। Saturday, 15th March, 1941. [১৮শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

নেতাদের বৈঠক—

বাঙলা গভর্নরের উদ্যোগে বঙ্গীয় আইন সভার বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের ঘরোয়া বৈঠকের সিদ্ধান্ত কি হইবে আমরা জানি না। গভর্নর যে প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ভাল এই পর্যন্তই আমরা শুধু বলিতে পারি; কিন্তু এই প্রচেষ্টার মূলে যে শুভেচ্ছা আছে তাহা বর্তমান অবস্থায় কতটা কার্যে পরিণত হইবে, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। ভারতীয় শাসন-সংস্কার বিধি অনুসারে শাসনকার্য চালাইবার প্রত্যক্ষ ভার মন্ত্রীদের হাতে রহিয়াছে এবং সেই মন্ত্রীদের মন্ত্রিগিরি নির্ভর করিতেছে সাম্প্রদায়িক জোটবাঁধা দলের উপর। সাম্প্রদায়িকতাকে নীতির ভিতর দিয়া ভাঙ্গিতে হইতেছে অনেকটা তাঁহাদের মন্ত্রিগিরি বজায় রাখিবারই দায়ে। যে সরিষায় ভূত, সেই সরিষায় ভূত ছাড়ান কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? এই বৈঠক সম্পর্কিত সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, কিছুদিন হইতে বাঙলা সরকার বাঙলার সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতি উদ্বেগ সহকারে লক্ষ্য করিতেছেন। বাঙলা সরকার বলিতে সপারিষদ গভর্নরকে বুঝায়। পরিষদ অর্থাৎ মন্ত্রীদের এ সম্পর্কে উদ্বেগ আমরা একটুও গুরুত্বের সঙ্গে দেখিতাম না; কারণ, কিছুদিন আগে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সাহেব হলফ করিয়া সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সভা ডাকেন, কিন্তু তাহার কার্যকর ফল কিছুই হয় নাই বরং সাম্প্রদায়িক সমস্যার অবনতিই যে ঘটিয়াছে সরকারী ইস্তাহারেই তাহা স্বীকৃত হইয়াছে এবং সে অবনতির মূলে বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর নীতি এবং বিবৃতিও যে বিশেষ-ভাবে রহিয়াছে ইহা অস্বীকার করা চলে না। হক সাহেবের সব বিবৃতিই সাম্প্রদায়িকতা ঘেঁসিয়া। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে তিনি বাঙলা দেশের প্রধান মন্ত্রী এবং সে বাঙলা দেশে হিন্দু ও মুসলমান দুইয়েই বাস করে এবং দুইয়েরই স্বার্থ এখানে আছে। কলিকাতার টাউন হলে হক সাহেবের এই মনোভাবের প্রতিবাদ হইল এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে—কংগ্রেসের সঙ্গে কিংবা হিন্দু সভার সঙ্গে যাঁহার সংস্রব নাই, সেই স্যার নৃপেন্দ্রনাথের মত লোকের সভাপতিত্বে হইল সে প্রতিবাদ; তবু সুবে বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্র-দায়িকতামূলক প্রচারকার্য থামে নাই। তিনি সে সভার খবর পাইয়াও হুংকার ছাড়িয়া বলিয়াছেন, বাঙলার হিন্দু নেতারা সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি ছাড়িয়া যদি ঘাঁট স্বীকার করে এবং তাহারা যে পাপ করিয়াছে তাহা শোধরায় এবং বাঙলা দেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যা গরিষ্ঠ-তাকে স্বীকার করিয়া লয় তবেই মৈত্রী মিলন হইতে পারে। বাঙলার হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, কি মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, ইহা নির্ভর করিতেছে আদম সুমারীর হিসাবের উপর। আদম সুমারীর হিসাবে হিন্দুরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, তবে দেখিতেছি বাঙলার সর্ব্বনাশ, হক সাহেব সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াই রাখিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বেচারা হিন্দুরা এ ক্ষেত্রে দোষ করে নাই—প্রধান দোষী ভারত সরকার। হক সাহেবের উচিত ছিল ফরমান জারী করিয়া বাঙ্গলা দেশে আদম সুমারী একেবারে বন্ধ করা এবং ইহাই ঘোষণা করা যে, আমি সুবে বাঙলার হর্তাকর্তা বিধাতা, হিন্দুদের সংখ্যা আমার মুল্লুকে যাহাই হউক; আর মুসল-মানের সংখ্যা হিসাবে যাহাই দাঁড়াক, মুসলমানই এখানে সংখ্যা গরিষ্ঠ, অর্থাৎ শতকরা ৬০ জন—ইহাই ধার্য হইবে। এইরূপ হইলে হয়ত বাঙলা দেশে আদম সুমারীর এ ঝঞ্ঝাট কর্তাদিগকে পোহাইতে হইত না। আমাদের বক্তব্য এই যে, লাটসাহেবের তাঁবেদারীতে এই বৈঠকের পর বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর মেজাজ দিন কয়েকের জন্য হয়ত ভাল হইতে পারে, কিন্তু, ব্যক্তিগত এমন শুভ বুদ্ধির খেয়ালের মূল্য কিছুই নাই। রাজনীতির প্রধান নীতিই হইল এই যে, ক্ষমতা যে হাতে পায়, সে ক্ষমতার অপপ্রয়োগের সম্ভাবনাও অহার দ্বারা যে আছে ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হয় এবং জনগণের

নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্বই সেই অপপ্রয়োগের সম্ভাবনার সুনিশ্চিতভাবে নিরাকরণ করিতে পারে। সাম্প্রদায়িক সমস্যার এই অবনতির ঝুঁকি হইতে বাঙলা দেশকে যদি সত্যই রক্ষা করিতে হয়, তবে সাময়িক শুভ বুদ্ধি বা সদুপদেশে তাহা হইবে না। মন্ত্রীদের চাকুরী নিয়ন্ত্রিত হয় যে নির্বাচনের দ্বারা সেই নির্বাচন নীতিকে সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত করিতে হইবে, বাঙলা দেশের সর্ব শ্রেণীর স্বার্থকে সে ক্ষেত্রে করিতে হইবে সংহত। বাঙলা দেশের সমস্যার যদি সমাধান করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমে প্রয়োজন সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তকে নাকচ করিয়া দেওয়া। গভর্নরের পক্ষে তাহা সম্ভব হইবে কি? বিলাতের কর্তাদের মতিগতি দেখিয়া আমরা সে বিশ্বাস করিতে পারি না।

বর্ত্তমানের প্রতীকার—

বাঙলার নেতাদের ঘরোয়া বৈঠকে কি কি বিষয় লইয়া আলোচনা হইয়াছে, আমরা বলিতে পারি না। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হইল এই যে, বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর নীতি এবং কার্যে বাঙলার বর্তমান এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। কড়া কথার জন্য এ সমস্যার সৃষ্টি হয় নাই যে, মিষ্টি কথাতেই তাহা মিটিয়া যাইবে। তেমনভাবে এই সমস্যা যদি ধামাচাপা দিতে চেটা করা হয়, সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। ইহার প্রতীকার হইল বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী যে সব সাম্প্রদায়িকতামূলক বিধি বাঙলায় চালাইতে উদ্যত হইয়াছেন সেগুলি হইতে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করা, সেই সব বিল নাকচ করিয়া দেওয়া; যদি তাঁহারা তাহাতে রাজী না হন, তাহা হইলে গভর্নরের কর্তব্য হইবে হাতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা এবং দেশের শান্তিরক্ষার জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা আছে তাহা প্রয়োগ করা এবং শাসনভার নিজের হাতে লওয়া। বর্তমান শাসনতন্ত্রে দেশের লোককে প্রকৃত কোন অধিকার দেওয়া হইয়াছে আমরা ইহা স্বীকার করি না, বরং সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের বিষক্রিয়া বাঙলায় সমাজ-জীবনে বিপুল অনর্থেরই সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং—তৈরি কুত্তা বোলাও লে রাম, স্বায়ত্ত শাসনের মহিমা বাঙালী কয়েক বৎসরে যথেষ্টই উপভোগ করিল, এখন কর্তারা বাঙালীকে এমন স্বায়ত্ত শাসন হইতে অব্যাহতি দিন। তারপর সময় যদি আসে বাঙালী দেশের লোকের প্রকৃত অধিকারই শাসনতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম—

বঙ্গীয় শিক্ষাপরিষদে সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্বাক্ষরে সম্প্রতি বাঙলার শিক্ষাব্রতীদের নিকট একটি আবেদনপত্র প্রচারিত হইয়াছে। এই আবেদনে শিক্ষাপদ্ধতিতে সাম্প্রদায়িকতা ঢুকাইবার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে এবং তজ্জন্য আন্দোলন চালাইতে তাঁহাদিগকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতা-প্রভাবিত মন্ত্রিমণ্ডলের কর্তৃত্ব বাঙলাদেশে প্রতিষ্ঠিত, এখন যাঁহারা শিক্ষাব্রতী, এই কার্যে প্রত্যক্ষভাবে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে অন্তরায় তাঁহাদের অনেক আছে জানি; কিন্তু এখন হইতে যদি তাঁহারা প্রতিকারের জন্য বদ্ধপরিকর না হন, তাহা হইলে অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিবে। অন্যান্য দেশে শিক্ষাব্রতীদের যে মর্যাদা আছে, এদেশের শিক্ষাব্রতীদের তাহা না থাকিলেও কতকটা এখনও আছে; কিন্তু অবস্থা যেমন দাঁড়াইতেছে, তাহাতে যাঁহারা শিক্ষা এবং সংস্কৃতিবিহীন বাঙলার শিক্ষাব্রতীদিগকে তাঁহাদেরই গোলামী করিতে হইবে। বাঙলার শিক্ষাব্রতিগণ জাতিকে সেই সংকট হইতে রক্ষা করিবার জন্য জাগ্রত হউন। প্রদেশের শিক্ষাব্রতীদের টাকা-পয়সার সুবিধা নাই, আছে একটু মর্যাদা, আছে আদর্শ সাধনায় একটু আত্মতৃপ্তি, এবং সে জিনিষকে তাঁহারা ক্ষুন্ন হইতে দিবেন না, ইহা নিশ্চিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ—

স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ছাত্রদের সম্মুখে এই পাকিস্থানী দুষ্ট প্রচারকার্যের দিনেও ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারতের আদর্শকে তিনি উদ্দীপ্ত করিয়া ধরিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"আমাদের সম্মুখে যে মৌলিক প্রশ্ন বর্তমানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ভারতের স্বাধীনতা, অর্থাৎ ভারতের এমন একটি মর্যাদা ও শক্তি লাভ করা, যাহার দ্বারা সে বিশ্বের দরবারে আপনার স্থান লাভ করিতে পারে। এই সম্পর্কে বহু মতবাদ ও মতভেদ দেখা দিয়াছে, কিন্তু আমার বলিতে ইচ্ছা করে যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এইসব মতবাদের সংগ্রামক্ষেত্র না হইয়া পরিবেশনক্ষেত্রে পরিণত হওয়া উচিত।" স্যর তেজবাহাদুর বলেন, "আমি এই নিবেদন করিতে চাই যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেন ভেদবিরোধের প্রচারক্ষেত্রে পরিণত না হয়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধ্যাপকেরা অথবা তরুণেরা যদি সম্প্রদায় বা দলবিশেষের প্রচারক এবং পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়েন, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্তব্য যথাযথ প্রতিপালিত হইবে না। আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে আলোক চাই, অন্ধকার চাই না, তাঁহারা সেই প্রীতির আলোক আমাদিগকে প্রদান করুন।" বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্বাধীনতা সংস্কৃতির স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখা বৈদেশিক শাসন এবং শোষণ স্বার্থ-প্রভাবিত পরাধীন দেশে অত্যন্তই কঠিন। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইলে অখণ্ড জাতীয়তাবোধ সত্য হইয়া দাঁড়ায়। জাতিকে অধীন করিয়া রাখিয়া যাহারা জাতির স্বার্থ শোষণ করিতে চায়, তাহাদের পক্ষে উহা প্রীতিপ্রদ হইতে পারে না; এজন্য তাহারা এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধতা করিতে

সর্বপ্রযত্নে ব্রতী হয়। কিন্তু এই দেশের অন্নজলে পুষ্ট হইয়া যাহারা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভেদবিভেদকে প্রশ্রয় দিতেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতা ঢুকাইতে চেষ্টা করিতেছে, ধিক্কার দিতে হয় সেইসব দেশদ্রোহীদিগকে। এদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভারতবাসীরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, সুতরাং ভারতবাসীরা 'নেশন' বা জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী এবং তাহার মন্ত্রশিষ্য মোস্লেম লীগওয়ালাদের যুক্তি—বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক যে যুক্তির পোষকতা করেন, সেই যুক্তি যে কত তুচ্ছ, স্যর তেজবাহাদুর তাঁহার অভিভাষণে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন এই কথাটা স্পষ্ট করিয়া যে, বিভিন্ন জাতি এবং ধর্মের অস্তিত্ব এবং বৈষম্য সত্ত্বেও তাহাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ভারতে একটি অখণ্ড সংস্কৃতি রহিয়াছে। ইহা হিন্দুর সংস্কৃতিও নয়, মুসলমানেরও নয়, ইহা ভারতবাসী সকলের। এই সংস্কৃতির গর্বই ভারতবাসীদের জাতীয় গর্ব, ইহার উপলব্ধিতেই তাহাদের জাতীয়তা, ঐক্য এবং সংহতি। সংহতি যাহার নাই, বর্তমান জগতে পরের ক্রীতদাসত্ব তাহাকে স্বীকার করিয়া পশুর জীবনই বহন করিতে হইবে। তরুণেরা যদি সেই পশুত্ব হইতে ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে এবং মানুষের মত উন্নত মস্তকে জীবনযাপনের প্ররোচনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পায়, তবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাহাদের পক্ষে সার্থক হইবে।

বাঙলা ভাষার মর্যাদা—

সম্প্রতি প্রয়াগ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে এই মর্মে একটি প্রস্তাবে নিজেদের ভিতর কথাবার্তা বলিবার সময় এবং বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের নিকট চিঠি লিখিতে বাঙলা ভাষা ব্যবহার করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে এবং অন্য এক প্রস্তাবে প্রবাসী বাঙালীগণ কর্তৃক প্রকাশিত বাঙলা মাসিক ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকাবলী ক্রয় করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক বাঙালীকে অনুরোধ করা হইয়াছে। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলিবার সময় এবং আত্মীয়-স্বজনের নিকট চিঠিপত্র লিখিবার সময়ও বাঙালীকে যে বাঙলা ভাষা ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতে হয়, কতটা মর্যাদাহানিকর এই অবস্থা তাহা ভাবিলে আমাদিগকে লজ্জিত হইতে হয়। জগতের যে জাতির আত্মমর্যাদাবোধ এবং মাতৃভাষার প্রতি প্রীতি কিছুমাত্র আছে, তাহাদের এমন দুর্দশা হয় না; কিন্তু কথাটা অপ্রিয় হইলেও স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের সে মর্যাদাবোধ এখনও সত্য হইয়া দাঁড়ায় নাই। দীর্ঘ পরাধীনতার যে ঘুণ অস্থিমজ্জায় ধরিয়াছে, তাহা পরকীয় ভাষার অনাবশ্যক দাসত্ব স্বীকারের মধ্যে মাতৃভাষার মর্যাদাহানির গ্লানির বেদনা অনুভূতিকে লুপ্ত করিয়াছে। খাঁটি বাঙলায় কয়েকটি কথা গোছাইয়া বলিতে পারেন, বিদেশী ভাষার ভেজাল না দিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষভাবে এমন যোগ্যতা দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। মাতৃভাষা ছাড়িয়া আত্মীয়স্বজনের কাছে চিঠি না লিখিলে ইঙ্গ-বাঙালী সমাজের অনেকের মাথা যেন হেঁট হইয়া আসে। প্রয়াগ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে এই শ্রেণীর ঘৃণ্য পরানুকরণের প্রতি যে কশাঘাত করা হইয়াছে, আমরা আশা করি, বাঙালী সমাজকে তাহা সজাগ করিবে এবং বাঙালী শুধু কথায় নহে, দৈনন্দিন আচরণে তাহার মাতৃভাষাকে মর্যাদা দিতে শিখিবে। ইহা ছাড়াও এই প্রস্তাবের গুরুত্ব জাতীয়তার দিক হইতেও আছে অনেক-খানি। বিদেশী বুলি মিশ্রিত ভেজালে ভাষা সৃষ্টি করিবার ফলে বাঙলার তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙলা দেশের যাহারা মেরুদণ্ডস্বরূপ জাতির সেই বৃহত্তর জনসাধারণের সম্পর্ক হইতে ছিন্ন হইতেছে। বাঙালীর পৌর-প্রভাবযুক্ত শিক্ষিত লোকের ভাষা অনেকক্ষেত্রে বাঙলার গ্রামবাসীর পক্ষেই হইয়া পড়িতেছে দুর্বোধ্য। এমন ক্ষেত্র অবশ্য আছে, যেখানে বিদেশী ভাষা ব্যবহার না করিলে মনের ভাব ষোল আনা ব্যক্ত করা যায় না; কিন্তু সে অভাবও দেশীয় ভাষার দ্বারা যাহাতে পূর্ণ হইতে পারে, সেজন্য চেষ্টা করা উচিত এবং বাঙলা ভাষায় সে চেষ্টা যে না হইতেছে এমন নহে। বাঙলা দেশের সংবাদপত্র সাধনার ভিতর দিয়াও সে অভাব অনেকটা পূরণ হইয়াছে এবং হইতেছে; কিন্তু গোড়ায় থাকিয়া যাইতেছে গলদ, তাহা হইল বিদেশী ভাষার প্রতি দাসসুলভ একটা মর্যাদাবুদ্ধি। ইংরেজী না বলিলে এখনও অনেকের কাছে কথার মর্যাদা বাড়ে না, ইংরেজী হরফে ছাপা না হইলে অনেকের চোখে কাগজের মর্যাদা চড়ে না, এই মনোবৃত্তি বাঙালী সমাজে যত সত্বর পরিত্যক্ত হয়, ততই ভাল। দেশের জন্য রাজনীতিক সাধনা সকলে করিতে না পারেন, কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি মর্যাদাবুদ্ধি জাগাইয়া দাস-মনোবৃত্তি হইতে জাতিকে বাঁচাইতে সাহায্য করিতে পারেন সকলেই। জাতির মর্যাদা বাড়াইতে পারি আর না পারি জাতির অমর্যাদার ভার যেন আমাদের আচরণে না বাড়াই, অন্তত এটুকুরও মূল্য কম নয়।

বাঙলার সংস্কৃতির আদর্শ—

"আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, বাঙলার নিকট আমাদের ঋণ অকিঞ্চিৎকর নয়। ভারতের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আমাদের যে ঋণ, তাহার চেয়ে তাহা নিশ্চয়ই বেশী," স্যর তেজবাহাদুর নিজের প্রদেশ—যুক্তপ্রদেশে সম্বন্ধে এই যে কথা বলিয়াছেন, ভারতের সকল প্রদেশের সম্বন্ধেই সে কথা সত্য। বাঙলার সংস্কৃতির অবদান প্রাদেশিকতার প্রত্যঙ্গের মধ্যে বদ্ধ থাকে নাই, তাহা অখণ্ড ভারতের আত্মাকেই স্পর্শ করিয়াছে। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, রাজনীতির ক্ষেত্রে সুরেন্দ্র-নাথ, আনন্দমোহন বসু, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ভারতের সর্বত্র নবজাতীয়তার স্রোত বহাইয়া দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের অবদান সমগ্র ভারতের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, বিভিন্ন সূত্রে এবং বিভিন্ন ধারার ভিতর দিয়া বাঙলার সংস্কৃতির অবদানের এই

উজ্জীবন ভারতের সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া সত্য হইয়া উঠিয়াছে এবং স্যার তেজবাহাদুর যাহাকে বর্তমানের প্রথম এবং মৌলিক প্রশ্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, বাঙলার বিভিন্ন সূত্রে অবদানের ভিতর দিয়া ভারতের সেই স্বাধীনতাকেই দিয়াছে উদ্দীপনা। ভারতের রাজনীতিক জীবনে বাঙালী করিয়াছে স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধন। এই হিসাবেই বলিতে হয় যে, বাঙলার রাজনীতিক জীবনের উপরই সমগ্র ভারতের রাজনীতিক সাধনা অনেকখানি নির্ভর করিতেছে এবং এইজন্যই বাঙলা দেশের উপর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের বিশেষ অনুগ্রহ। এইজন্যই ভূতপূর্ব ভারতসচিবকে একদিন এই কথা শুনাইয়া ভারতের স্বার্থশোষণকারী দলকে আশ্বাস দিতে হইয়াছিল যে, আমরা ভারতীয় শাসন সংস্কার আইনে এমন ব্যবস্থাই আঁটিয়া দিয়াছি যাহাতে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের ভিতর দিয়া, বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদে জাতীয়তাবাদীর দল কিছুতেই প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে না। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সেই বিষ প্রয়োগের ফল আজ বাঙলায় ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের কৃপায় ভেদবিভেদবাদীর দল বাঙলার বিশিষ্ট সংস্কৃতিকে আজ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতাকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকাইয়া। বাঙলার এই বিপদ শুধু বাঙলারই নয়, সমগ্র ভারত আজ এই দিক হইতে বিপন্ন হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের বৈঠক—

স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর সভাপতিত্বে গত বৃহস্পতিবার বোম্বাইয়ে নেতৃসম্মেলনের উদ্বোধন হইয়াছে। গন্ডায় আন্ডা মিলাইবার দলে আমরা নই। আমরা মডারেটী নেতাদের উদ্যোগে আহূত এই বৈঠকের সাফল্যের সম্বন্ধেও সেইজন্য আশাশীল নহি। স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু নিজেও এই বৈঠকের সম্বন্ধে আশাশীল নহেন। এই বৈঠকের একটা ফল হইবে এই যে, যাঁহাদের কথাকে ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ, কংগ্রেসী মনোভাবদুষ্ট বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন না, তাঁহাদের মত এই বৈঠকে পাওয়া যাইবে। স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, যিনি মডারেটী রাজনীতিতে হাত পাকাইয়াছেন, তিনি হইবেন সভাপতি, এবং সভার উদ্যোক্তা হইলেন স্যার জগদীশপ্রসাদ, যিনি কিছুদিন পূর্বেও বড়লাটের শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। যেরূপ শুনা যাইতেছে, এই বৈঠক হইতে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের যদি খসড়া প্রস্তুত হয় এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহা উপস্থিত করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে আর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সাম্প্রদায়িক মতবিরোধের অজুহাত দেখাইতে পারিবেন না। কারণ ইঁহাদের দাবী কংগ্রেসীদের দাবীও নয়, হিন্দু মহাসভার দাবীও নয়; কিংবা মুসলিম লীগের দাবীও নয়। ব্রিটিশ নিয়মতান্ত্রিক নীতির প্রতি মর্যাদা বুদ্ধিসম্পন্ন এমন নেতাদের তেমন দাবীর জবাব একটা কর্তাদিগকে দিতেই হইবে এবং কর্তারা সেক্ষেত্রে কোন্ কারসাজী খেলেন তাহাও হইবে দ্রষ্টব্য। অন্য লাভ না হউক, বোম্বাইয়ের বৈঠকে এই একটা লাভের দিক আছে বলিয়া আমরা মনে করি। কংগ্রেস দাবী তুলিলেই ভারতসচিব ছেঁদো যুক্তি দেখান যে, কংগ্রেসের কথা আমরা ভারতের ঈশ্বর-নির্দিষ্ট অভিভাবক, আমরা কেমন করিয়া গ্রহণ করি? সে দাবীতে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থকে পদদলিত করা হয়। এইভাবে বাজে কথার ধাপ্পায় তিনি পাশ কাটাইয়া যান। ব্রিটিশ নিয়মতান্ত্রিকতার সেবার দ্বারা ব্রিটিশ রাজনীতিকদের কাছে মর্যাদা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, একবার তাঁহাদের তরফ হইতে দাবীর উত্তরে কর্তারা কি বলেন, তাহা শুনা মন্দ নয়; কারণ, ইহাতে তাঁহাদের স্বরূপ অধিকতর উন্মুক্ত হইবে এবং পরোক্ষভাবে ভারতের জাতীয়তাবাদীদের অভিযোগের যৌক্তিকতাই সুদৃঢ় হইবে।

পাকিস্থানীর শেষ সম্বল—

পাকিস্থানীদের এখন সম্বলস্বরূপে রহিলেন দেখা যাইতেছে একমাত্র বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক। পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী প্রকাশ্যভাবে পাকিস্থানী আন্দোলনকে একরকম না-পাক বলিয়াই বরবাদ করিয়া দিয়াছেন। তিনি এখন সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-প্রথা তুলিয়া দিবার প্রবল সমর্থক। সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় স্যার সেকেন্দার বলিয়াছেন,—"তৃতীয় পক্ষরূপে হস্তক্ষেপের জন্য আমরা ব্রিটিশের দোষ দিয়া থাকি। কিন্তু আপনারা আমাকে বিশ্বাস করুন, পাঞ্জাবে আমাদেরই মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে এখানে পৃথক্ নির্বাচন-প্রথা প্রবর্তিত হইত না এবং পাঞ্জাব আজ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পথপ্রদর্শক হইতে পারিত। যে বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন বহাল হইয়াছে, সে বিশ্বাসঘাতকতার পাপ হইতে পাঞ্জাবকে মুক্ত করাই যে স্যার সেকেন্দার বাঞ্ছনীয় মনে করেন, তাঁহার উক্তিতে তাহা সুস্পষ্ট। ওদিকে সিন্ধুর মন্ত্রিসভা হইতে পাকিস্থানী দল নিতান্ত হতমান হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জিন্না সাহেব সিন্ধুতে যে মতলব পাকাইয়া আসিয়াছিলেন তাহা পস্তাইয়া গিয়াছে। খান বাহাদুর আল্লাবক্স পুনরায় প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন এবং তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আজাদের নির্দেশিত ব্যবস্থা অনুসারে তিনি শাসনকার্য চালাইবেন। খান বাহাদুর আল্লাবক্স জাতীয়তাবাদী মোস্লেম দলের অন্যতম নেতা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পাঞ্জাব এবং সিন্ধু এই দুই প্রদেশ হইতে পাকিস্থানওয়ালাদের কার্যত পাততাড়ী গুটাইতে হইল। সাম্প্রদায়িকতার জিগীর ছাড়িয়া নিজেদের হীন স্বার্থ সিদ্ধি করিবার মতলববাজী ক্রমেই ধরা পড়িয়া যাইতেছে এবং সর্বত্র সমাজের সুস্থচিত্ত ব্যক্তিরা এইপ্রকার হীনতার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিতেছেন। মোস্লেম লীগওয়ালাদরে বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে সব প্রদেশে—বাঙলার মুসলমান সমাজও আর আত্মপ্রবঞ্চিত থাকিবে না।

হিন্দু সংস্কৃতির দুই একটি কথা

হুগলী জেলার হিন্দু ছাত্রদের এই সম্মেলনে হিন্দু সংস্কৃতির সম্বন্ধে কিছু বলার ভার আমাদের উপর পড়িয়াছে। হিন্দু সংস্কৃতি খুব বড় জিনিষ, দশ পনেরো মিনিটএর মধ্যে কিছু বলা যায় না। কিন্তু সময় সংক্ষেপ, সুতরাং সূত্রের আকারে কয়েকটি কথা বলিয়া আমাকে আড়াআড়ি পাড়ি দিয়া উপসংহারে পৌঁছিতে হইবে এবং যে কয়েকটি কথা বলিতে হইবে ছেলেদের বুঝিবার মত করিয়া বলিতে হইবে।

হিন্দু সংস্কৃতির সার সত্য হইল আত্মানুভূতি। সকলকে আপনার করিয়া পাওয়া এবং সেই মমত্বের মাধুর্য সম্পর্কে সকলকে আপনার করা। সংস্কৃতি বলিতে আমি এই জিনিষটিই বুঝি এবং ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে আমি বিশেষজ্ঞ না হইলেও আমার বিশ্বাস এই যে, জগতে এই যে আত্মতত্ত্বের অবদান ইহা হিন্দু সংস্কৃতিরই বিশেষ দান। এই ভারত হইতে ভারতের অন্যান্য স্থানে এই সংস্কৃতি প্রসারিত হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীকেরা, যাহারা বলিতে গেলে এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতের গুরু, তাঁহারাও এই সংস্কৃতি হিন্দুদের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। এইজন্য বলা হইয়াছে, অন্য সব দেশ ভোগভূমি এবং ভারত জ্ঞানভূমি। এই যে আত্মানুভূতি, ভারতের ঋষিদের সাধ্য এবং সাধনার বস্তু এই যে অভেদ দর্শন, ইহাই জ্ঞান—জ্ঞানং অভেদ-দর্শনং। সকল সংস্কৃতির মূলে রহিয়াছে ইহাই ত। ইহা মানুষের মনুষ্যত্ব; এ জিনিষের অভাবে মানুষে আর ইতর জন্তুতে কোন প্রভেদ থাকে না।

সকলকে মিত্র করিয়া দেখিব, আত্মানুভূতির এই অনুপ্রেরণা বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র স্থাপন করে। ভারতবাসীরা তলোয়ার ধরিয়া বিদেশীকে পদানত করিতে বাহির হয় নাই। বিশ্বজগতে তাঁহারা লইয়া গিয়াছিলেন, এই মৈত্রীর বাণী, প্রেমের বার্তা; কারণ তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, 'স্থানজয়াৎ পুনর্ভবাৎ'। স্থান জয় করিবার মূলে থাকে ভোগের প্রবৃত্তি, কামের প্রবৃত্তি এবং 'কামাদেব কলেনৃণাং'; তাহার ফল মারামারি, কাটাকাটি, পশুবৃত্তি এবং বর্বরতা ছাড়া তাহা অন্য কিছু নয়। উদ্ধবের নিকট এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আত্মানুভূতির মধ্যে পরকে ভালবাসিয়া যে সুখ পাওয়া যায়, সভ্যতার ভিত্তি হইল সেই সুখ। আর পরের সর্বস্ব কাড়িয়া যাহারা সুখ পাইতে চায়, তাহারা জগতে অনর্থই সৃষ্টি করে। নিজেরাও যেমন সুখী হইতে পারে না, অপরের সুখও তেমন নষ্ট করে। জগতকে শত্রু করিয়া তুলিয়া তাহারা নিজেদের অসহায়ত্বই শুধু বাড়ায়। প্রাচীন ভারতের অবদান হইল এই সভ্যতা।

যাঁহারা মনে করেন, ভারতের সংস্কৃতি শুধু ভারতের ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল, এই দিক হইতে তাঁহারা যেমন ভুল করেন, তেমনই যাঁহারা মনে করেন যে, ভারতের সংস্কৃতি কোনরূপ পরিবর্তনকে স্বীকার করে নাই, তাঁহারাও করেন সেই রকম ভুল। ভারতের ঋষিরা বলিয়াছেন, সকলের মধ্যেই রহিয়াছেন আত্মা। যিনি ব্রহ্ম তিনি বিরাজ করেন সর্ব ঘটে। যাহারা কিরাত, যাহারা দস্যু তাহারাও ব্রহ্মস্বরূপ। সাম্প্রদায়িকতার সকল গণ্ডী কাটাইয়া সার্বভৌম মানব-মহিমার এমন অনুভূতি হিন্দু সংস্কৃতিরই আছে, বড় গলায় প্রত্যেক হিন্দু এ কথা বলিতে পারেন। এবং এই আত্মোপলব্ধির জ্ঞানবলেই ভারতের সংস্কৃতি বিশ্বকে আপনার করিয়া বাঁধিয়াছিল। ভারতের সভ্যতা বিয়োগবাদী নয়, তাহা প্রাদেশিক নয়; তাহা সমন্বয়বাদী। আধুনিক সভ্যতার কল্যাণে, বিশেষত ইংরেজের কৃপায় বিশ্বের দরবারে ভারতের স্থান হইয়াছে, এমন কথা স্বীকার করিয়া লইলে ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করা হয়; পক্ষান্তরে এই কথাই বলিতে হয় যে, আধুনিক সভ্যতা বাহিরের দূরত্বের গণ্ডী কাটাইলেও ভিতরের দূরত্বকে বাড়াইয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষ তাহার নিজের সংস্কৃতিকে যখন ক্ষুণ্ণ হইতে দিয়াছে, তখনই ভারতবর্ষ হইয়া পড়িয়াছে একঘরের মতন।

মানুষের সুখ-দুঃখ ব্যবহারিক জগতকে জড়াইয়া একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এবং ব্যবহারিক জগৎ পরিবর্তনশীল। ভারতের আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ হইল মৈত্রী এবং সেবা। পরকে আপন করিয়া দেখিলে ইহাই স্বাভাবিক। সেই ভারতের আধ্যাত্মিকতা ব্যবহারিক বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তনকে সব সময় স্বীকার করিয়া লইয়াছে, কারণ তাহা স্বীকার না করিলে মৈত্রী বা সেবা কিছুই সার্থক হয় না, অকেজো মানস-বিলাসে থাকিয়া যায় মাত্র। ভারতের সংস্কৃতির মূল তত্ত্ব মৈত্রী এবং সেবার সনাতনত্ব এইভাবে ব্যবহারিক বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তনকে স্বীকার করিয়া লইয়াই সম্ভব হইয়াছে। কোন ব্যবহারিক বিধি-ব্যবস্থাকে হিন্দু সংস্কৃতি অপরিবর্তনীয় বলিয়া আঁকড়াইয়া থাকে নাই, থাকে নাই ভারতের সংস্কৃতি সনাতনত্বে বিধৃত বলিয়াই। পরিবর্তনকে স্বীকার না করিলে সনাতন ধর্মের মহিমা বাড়ান হয় না, বরং ব্যবহারিক পরিবর্তনের সংঘাতে বিপন্ন মানুষের দুঃখ কষ্টের নিরাকরণে ক্লৈব্যকে প্রশ্রয় দিয়া সনাতন ধর্মকে ক্ষুণ্ণই করা হয়। চাই সেবা, চাই মৈত্রী এবং সেই আদর্শ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, এইজন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তনকে স্বীকার করিবার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ভারতের সংস্কৃতি পরিবর্তনশীল, এইজন্যই তাহা সম্প্রসারণশীল এবং তাহাতে সাশ্রয়তা আছে। অন্য দেশে ধর্ম বিশ্বাস এবং মতের বিরোধিতা যেখানে ঘটিয়াছে, মানুষ সেখানে মানুষকে জ্যান্ত পোড়া করিয়াছে এবং সেই পরম পুণ্যকার্যের জোরে স্বর্গে কোঠার উপর পাকা কোঠা তুলিবার তাণ্ডব ফলাইয়াছে। এই যে বর্বরতা, ভারতের সংস্কৃতি ইহা হইতে মুক্ত। কবির কথায়, এই ভারতের মহামিলনের সাগর তীরে বিভেদ ভুলিয়া নানা জাতি এবং নানা সম্প্রদায় এক দেহে লীন হইয়াছে এই ভারতীয় সংস্কৃতিরই প্রভাবে। মুসলমান যুগেও সে প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল না। পাশ্চাত্যের সর্বতোভূমি পরাধীনতায় ভারতীয় সংস্কৃতির সেই প্রভাব অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইতে বসিয়াছে, ইহা সত্য; কিন্তু এখনও লুপ্ত হয় নাই। সে শক্তি সাময়িকভাবে লুপ্ত হইলেও জাগরণের সম্ভাব্যতা তাহার রহিয়াছে। বর্বরতা বা পশুবলে এ জিনিষ বিজিত হইবার নয়।

এই কথারই সঙ্গে আর একটা কথা আসিয়া পড়ে তাহা এই যে, হিন্দু সংস্কৃতি ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধি এবং তাহার সংশ্লিষ্ট জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনাকেও উপেক্ষা কোন দিন করে নাই। যাঁহারা মনে করেন, ভারতের সংস্কৃতি কেবল মানুষকে চোখ বুজিয়া জঙ্গলে থাকিতে বলিয়াছে, তাঁহারা এই দিক হইতে গুরুতর ভুল করেন। বরং এই কথাই বলিব যে, অনেক ক্ষেত্রে ভারতের সংস্কৃতি মোক্ষকেও তুচ্ছ করিয়া মানুষের এই আর্থিক দুঃখ কষ্ট দূর করাকে বড় করিয়া দেখিয়াছে। সন্ন্যাসের চেয়ে সংসারীর মহিমা বেশী গাহিয়াছে। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের কাছে বলিয়াছিলেন এই কথা। তিনি বলেন, ঋষিরা, শ্রমণেরা ব্রহ্মাখ্যধামে যাইতে চায় কিন্তু আমি তাহা চাহি না। আমি এই সংসারে থাকিয়াই কর্ম করিতে চাই। সকল মানুষের মধ্যে দেখিতে চাই ব্রহ্মসত্তাকে এবং সেই দর্শনের বলে অজ্ঞানতাকে খণ্ডন করিতে চাই। মানুষ দুঃখে কষ্টে মরিবে আর আধ্যাত্মিকতার নেশায় মসগুল হইয়া

থাকিব এমন হৃদয়হীনতাকে ভারতের সংস্কৃতি সমর্থন করে নাই। তেমন হৃদয়হীনতা অবীর্যই বলিয়াছে এবং অহিংসার নামে এমন অবীর্যকে কোন দিনই প্রশ্রয় দেয় নাই। দুঃখের বিষয়, আমরা অহিংসাকে আজকাল অনেক সস্তা করিয়া ফেলিতেছি এবং মনে করিতেছি যে, অহিংসার জন্য আর কোন সাধনের প্রয়োজন নাই। অহিংস হইবার জন্য হুকুম করিলেই ছেলে বুড়া সকলেই পরম অহিংসাচারীতে পরিণত হইতে পারে। আমরা ইহা বুঝিতেছি না যে, অহিংসার নামে এক্ষেত্রে মিথ্যাচারকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়; অহিংসা একটা বড় রকমের শক্তি এবং সে শক্তি সকলে পায় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে অহিংসার আড়ালে দুর্বলতা এবং ক্লীবতাই মহিমান্বিত হয়। জাতির পক্ষে ইহা মারাত্মক। ভাগবতে বলা হইয়াছে, নিজেরা সমদর্শী, শান্ত এই সব বড় বড় কথা মুখে বলিয়া যাহারা দরিদ্রের প্রতি অত্যাচারের প্রতিকার করিতে দাঁড়ায় না, তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারে, তাহাদের ব্রহ্মত্ব ছেঁদা কলসীর জলের মত বাহির হইয়া যায়। ভারতের ঋষিরা বলিলেন, সাধুদের প্রধান লক্ষণ হইল এই যে, লোকের জন্য তাঁহারা তাপ বোধ করেন এবং সেই তাপ দূর করিবার জন্য কাজ করেন, এই কাজ হইল ধর্ম। কোন্ কর্ম কর্তব্য এবং কি অকর্তব্য —এই সংশয়ের ক্ষেত্রে কর্তব্যের নিরিখ বাঁধিয়া দিয়াছেন ভারতের ঋষিরা ঐ সূত্র বিন্যাস করিয়া।

এইখানে কর্মের মধ্যে আসিয়া পড়িতে হয়, বলের ব্যাপার আসে। ভারতের সংস্কৃতি বিশ্বভাবনাকে বড় করিয়া দেখিয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া স্বাদেশিকতাকে, স্বদেশ-প্রেম, স্বজাতি প্রীতিকে কোন ক্ষেত্রেই গৌণ করে নাই। কারণ আদর্শনিষ্ঠা থাকিলে এ গুলিকে গৌণ করা চলে না। বিশ্বের কাছে আমাদের আবেদন যদি পৌঁছাইতে হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্র-মর্যাদা আগে প্রয়োজন এবং তাহার মূলে রহিয়াছে জাতীয়তা। এ জাতীয়তা অন্যকে দাবাইবার জন্য নয়, অন্যকে সেবা করিবারই জন্য। হিন্দু সংস্কৃতি জাতীয়তাকে মান্য করিয়াছে। আপনারা মনে করিবেন না যে, শ্বেতাঙ্গ সভ্যতারই এদেশে এই জিনিষ নূতন দেওয়া। অখণ্ড ভারতের জাতীয়তা হিন্দু সংস্কৃতির একটা বিশেষ দান। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-নর্মদা-সিন্ধু-কাবেরী বিধৌত এই ভারতের বিভিন্ন অংশকে হিন্দু সংস্কৃতির অখণ্ড আত্মীয়তার অনুভূতিতে এক করিয়া বাঁধিয়াছিল এবং অনেক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়াও হিন্দু সংস্কৃতির সেই বিশেষ অবদান আজ যে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে ইহা বলা যায় না। আজকাল আন্তর্জাতিকতার যুগ আসিয়াছে। এ যুগেও ভারতের এই অখণ্ড আত্মীয়তার অনুভূতি, এই জাতীয়তার ভাবকে শিথিল করিলে চলিবে না। তরুণদের বড় করিয়া দেখিতে হইবে এই জিনিষটি। বিশ্বের সঙ্গে বিরোধ করিবার জন্য নয়, বিশ্বের সঙ্গে মিলিবারই প্রয়োজনে।

বিশ্বের অবদান আমরা গ্রহণ করিব না, পরের কিছু আমরা লইব না, এমন পরামর্শ কোন বুদ্ধিমান লোকই দিবেন না। কিন্তু পরের জিনিষ গ্রহণ করার অর্থ নিজকে হারান নয়। আত্মসাৎ করিতে পারে সেই যে নিজের আত্মাকে বুঝে। যে জাতির আত্মপ্রত্যয় নাই, সে মনুষ্যত্বের অধিকারী হইতে পারে না—ক্রীতদাসের জীবন, পশুর জীবনই তাহাকে পোহাইতে হয়। তরুণ বন্ধুগণ, তোমাদিগকে এই মানুষ হইতে হইবে, তোমাদিগকে বুঝিতে হইবে এই সত্যকে একান্ত করিয়া যে, মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার তোমাদের আছে। জগতের প্রাচীনতম সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতির উত্তরাধিকারী তোমরা, বিশ্বকে দিবার মত জিনিষ তোমাদের আছে এবং এই দেওয়ার আনন্দই মানুষের সব চেয়ে বড় আনন্দ। পরাধীন যে, গোলাম যে, অপরের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির আক্রমণে অভিভূত যে, দেওয়ার এই আনন্দ সে উপভোগ করিতে পারে না। দেওয়াতেই সুখ, দ্বিগুণিত হইবে বিশ্বজগতকে তোমাদের নিজেদের অবদান। তোমরা মানুষ, তোমরা পশু নও এবং অখণ্ড ভারতের জাতীয়তার অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ না হইলে এই দেওয়ার আনন্দ, সেবার আনন্দ তোমরা পাইবে না, তোমাদিগকে পরের লাথিই খাইতে হইবে।

আমার তরুণ বন্ধুগণ, অখণ্ড ভারতের একাত্মতার উদ্বোধন করিয়াছে এ যুগে বাঙালী। ভারতের অন্ধকার যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির এই বর্তিকা জ্বালাইয়া দিয়াছেন বাঙলার সাধক সন্তানগণ। মহাপ্রভুর কথা এখানে তুলিব না। বাঙলার রামমোহন বাঙলার কেশবচন্দ্র, পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, ইঁহাদের স্মৃতি তোমাদের মধ্যে উদ্দীপ্ত করিয়া রাখ। ভারতের অখণ্ড জাতীয়তার বিরোধী যে সব উদ্যম, সেগুলিকে বাধা দিবার মত মনের বল তোমাদের মধ্যে জাগুক। তোমরা মনে রাখিও এই কথাটি যে, ভারতের স্বাধীনতার উপর বিশ্বমানবের প্রকৃত স্বাধীনতা নির্ভর করিতেছে। ভারত যখন স্বাধীন হইবে নিজের সংস্কৃতির অবদান স্বচ্ছন্দ পরিমাণে জগৎকে দিতে পারিবে সে তখন এবং ভারতের অমৃত সাধনার সেই অবদানে পশুবল উন্মুক্ত জগৎ আত্মস্থ হইবে। ত্যাগ ও সেবার মধ্যে পাইবে আপনার মুক্তির আস্বাদন। ভারত অসংখ্য সমস্যা নিজের করিয়া লইয়া বিশ্ব সমস্যার সমাধানের জন্যই বুঝি অতন্দ্রিতভাবে সাধনা করিতেছে। সহস্রশীর্ষ নারায়ণ জাগিবেন এই ভারতভূমি হইতে, এবং বহুর সেবার মধ্যে আপনার আনন্দ সত্তার উপলব্ধি পথ জগৎ দেখিবে, তাহাই বিষ্ণুর পদ—পদং তৎ পরমং বিষ্ণোঃ মনো মন্ত্র প্রসীদতি। সেই সেবাতেই মানুষের মন প্রসন্ন হয়; মানুষ মানুষ হয়।

আজকাল মার্ক্সবাদের যুগ। জাতীয়তার কথা এবং আত্মানুভূতির সঙ্গে যাহার প্রধানত যোগ রহিয়াছে সেই ভারতের সংস্কৃতির কথা তরুণেরা কেহ কেহ পছন্দ করেন না। তাঁহাদের মনের ভাব না বুঝি ইহা নয় এবং সেই সব তরুণ বন্ধুদিগকে এই কথা বলিতে চাই যে, মার্ক্সবাদের আদর্শ যে সাম্য, সকল মানুষের মর্যাদাকে স্বীকার, সকলের অধিকারকে স্বীকার, তাহার সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতির মৌলিক বিরোধ নাই। সাম্য ভারতেরও সাধনা, ভারতের সংস্কৃতিও সাম্যকেই চাহিয়াছে। এই সাম্যকে স্বভাবের মধ্যে কেমন করিয়া পাওয়া যায়, ভারতের সংস্কৃতি দেখাইয়াছে সেই পথ। এবং ভারতের সংস্কৃতির কথা এই যে, অপরের প্রতি সমান ব্যবহার তখনই হয় সত্য, তখন অপরে আমার আপনার। সেবাতে সেখানে পাই আনন্দ, সাম্য সেখানে হয় সত্য। এই পথে মনুষ্যত্বের স্বচ্ছন্দ বিকাশ ঘটে, মানুষের সকল স্বার্থ সিদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে আইনের জোরে যে সাম্য, সেখানে মানুষের এই স্বাভাবিক আনন্দসত্তার উপলব্ধি নাই। সেখানে সাম্য যান্ত্রিক সাম্য, তাহা পশুতা, বৃহত্তের অনুভূতি নাই সেখানে আছে সংকীর্ণতা; ভাব নাই সেখানে বরং আছে ভয়। এই ভয়ের পথে মানুষের জীবনে সমস্যার স্বাভাবিক সমাধান হইতে পারে না। হীন স্বার্থ হিংস্রতায় পাক ঘুরিয়া দাঁড়াইবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। চিত্তের যে প্রশান্তি মানুষের কাম্য তাহা নষ্ট হইয়া এখানে জাগে উদ্বেগ—বিশ্বস্তি এবং আশ্বস্তির ঘটে একান্তই অভাব। সাম্যের পূজারী হও তোমরা। প্রবলের পীড়ন, অভিজাতের শোষণ হইতে জাতিকে উদ্ধার কর তোমরা কে ইহা না চায়। মার্ক্সবাদের এ আদর্শ গ্রহণ কর, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির অবদান, এই যে আত্মানুভূতি তাহাকে যুক্ত করিয়া লও। তবেই সাম্য তোমাদের জীবনে সত্য হইবে, সহজ হইবে; তোমাদের স্বভাবের সঙ্গে সেই সাম্যের যোগ ঘটিবে এবং মনুষ্যত্বের অনপেক্ষ

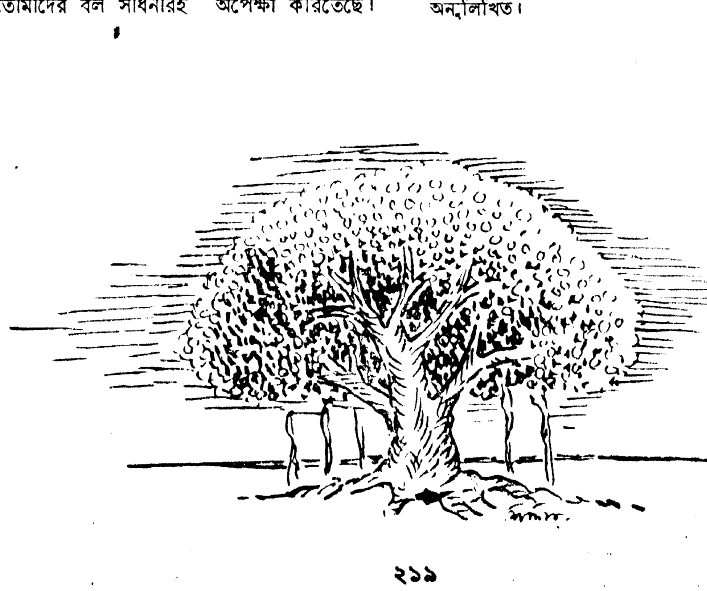
মর্যাদায় তোমরা প্রতিষ্ঠিত হইবে। অন্ধভাবে পরের অনুকরণ করিও না, নিজেদের মধ্যে ভাল যাহা আছে, তাহাও জান, বুঝ, এবং বুঝিয়া দূরের জিনিষ নিজের কাজে লাগাও। মার্ক্সবাদীরা বিপ্লবের যত বড় বড় কথা বলিতেছেন, মনে করিও না, ভারতের সংস্কৃতিতে সে সব অনুভূতি ছিল না; ছিল মানবের দুঃখকষ্ট বেদনার তীব্র অনুভূতি এ দেশে অতি উগ্র আকারে। সকলকে সমানভাবে দেখিবার, এবং সমান করিবার উদ্দীপনা একান্তভাবে আছে এ দেশের সংস্কৃতিতে। সেই সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া আধুনিক সাম্যবাদকে তোমরা রূপ দিতে আগাইয়া যাও। গীতার সেই বাণী স্মরণ কর, যে নিজের উদরপূর্তিই বড় বলিয়া বুঝে এবং সেই জন্যই অর্থ আহরণ করে সে চোর। এই উক্তি পরিপোষক যুক্তি আরও অনেক আছে, মনুতে আছে, ভাগবতে আছে, না আছে কোথায়? ঈশ্বরকে না মান আপত্তি নাই; কিন্তু সেবার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইবে কেন? আর্থিক সমস্যাই নয় মানুষের একমাত্র সমস্যা। পশুর জীবন যে দৈন্যময় জীবন। ভারতের সংস্কৃতিকে বিসর্জ্জন দিয়া পশুর দৈন্যময় জীবন বরণ করিয়া লইও না। হিন্দু সংস্কৃতির অবদান যে আত্মানুভূতি, সেই আত্মানুভূতির আলোকে জীবনকে উদ্দীপ্ত করিয়া অসাম্যকে সমাজ দেহ হইতে উৎখাত কর।

অবীর্যকে অতিক্রম কর, উদার বীর্য হও। মিনমিনে ঘিনঘিনেপণা ধার্মিকতা নয়, সে সব প্রবৃত্তি যেন তোমাদের সরল চিত্তে ঘুণ না ধরায়। বল বাড়াও, দেহের বল, মনের বল! দুর্বলতা পরিহার করা, অভয়ত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া ইহাই স্বত্ত্বসংশুদ্ধি, ভারতের ইহাই সংস্কৃতি। ব্রহ্ম বল বড় বল; কিন্তু শুধু বড় কথায় সে বল একান্ত, সে বল অত্যন্ত তাহা পাওয়া যায় না, সেবার ভিতর দিয়া তাহা সার্থক করিয়া তুলিতে হয়। কর্মের ভিতর দিয়া তাহাকে মনে সত্য করিয়া পাইতে হয়; সুতরাং বাহুবলকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। বরং তোমাদের আগে দরকার সেই জিনিষের। তোমরাই ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী। জ্ঞানের বল, বিজ্ঞানের বল, সকল বল দিয়া ভারতের সংস্কৃতিকে তোমাদিগকে সত্য করিয়া তুলিতে হইবে মনুষ্যত্বের জন্য ইহা প্রয়োজন।

বল বাড়াও, এই কথাই বিশেষ করিয়া বলিবার আছে। ভুলিও না, দেশ তোমাদের বল সাধনারই অপেক্ষা করিতেছে। যে আর্ত, যে বিপন্ন, তাহাকে রক্ষা করিতে ছুটিয়া যাও, অত্যাচার এবং নির্যাতন হইতে তাহাকে রক্ষা কর বাহুবলের দ্বারা। যে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়া আছে তাহাকে দাও জ্ঞানের বল, বিদ্যার বল। সকল দিক হইতে কর্ম তোমাদের সাধনার সার্থক হইয়া উঠুক, ভারতের সংস্কৃতি তাহাতেই সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

ভয় করিও না, মহৎ আদর্শের প্রেরণার মুখে আদর্শের সাধনায় ঝাপাইয়া পড়াতে ক্ষতি নাই বরং লাভ আছে। হিসাব নিকাশের দিক হইতে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বল মন বিবেচনার নামে অবিবেচনা করিয়া বসে। স্বার্থ সংকীর্ণতা উদার দৃষ্টিকে রোধ করে। কিন্তু আদর্শের প্রেরণা মানুষকে যতখানি আগাইয়া লইয়া যায়, হিসাবনিকাশে বাঁধা সুবিবেচনা তাহা লইতে পারে না। সুবিবেচনার নামে এই সংকীর্ণতা যেন তোমাদিগকে আদর্শ সাধনায় অগ্রসর হইতে সংকুচিত না করে। জানি, প্রতিবন্ধক আছে, অনেক আছে। দীর্ঘ দিনের পরাধীনতার দৈন্য জাতির ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে, বৃহৎ ভাবনার মধ্যে বিপর্যয়ের আশঙ্কায় সে শিহরিয়া উঠে। সংকীর্ণতার মধ্যে যে নিরাপত্তা তাহাকেই সে শুভ বলিয়া মনে করে। তোমাদিগকে সমাজ-দেহ হইতে এই গ্লানি দূর করিতে হইবে—যত সংকীর্ণ বিধিনিষেধ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে তোমাদিগকে। যে সব আচার বিভেদমূলক, পীড়নমূলক, মানুষের অধিকার যেগুলি স্বীকার করে না, আত্মাকে করে সংকুচিত, সেগুলির উৎখাত করিবার জন্য তোমাদিগকে আগাইয়া যাইতে হইবে। উদ্বোধন করিতে হইবে মানুষের মর্যাদার। ভারতের সংস্কৃতির ইহাই বাণী, সেই শক্তিতেই সে সংস্কৃতির সনাতনত্ব। ভারতের সংস্কৃতির সার সত্য যে আত্মানুভূতি এবং অভেদ দর্শন, তোমাদের সেবানিষ্ঠ কর্মে তাহা সত্য হইয়া উঠুক। বাঙলা ইহাই আশা করে। বাঙলা ভাষা, বাঙলা সাহিত্য, বাঙলার সভ্যতা আজ চাহে যজ্ঞ, চাহে পরার্থে আত্মনিবেদন এবং 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ, যজ্ঞই ভারতের সংস্কৃতির স্বরূপ।*

* হুগলী জেলা হিন্দু ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সংস্কৃতি সম্মেলনের সভাপতিরূপে 'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতা হইতে অনুলিখিত।



মাটির মেয়ে

শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল

চাঁদের আলোকে আজি রাত্তির জেগেছে বুঝি,
জেগেছে আধেক-তপ্ত-হিমেল বাতাস লেগে?
হোরির মাতাল ঢোলকে ভেঙেছে ঘুমের পুঁজি,
ঘুমমন্থর চোখ মেলে রাত উঠেছে জেগে।

রাত্রি জেগেছে—মোর কেটে গেছে ঘুমের নেশা,
ছাদে গলাগলি রাত আর আমি রয়েছি চেয়ে,
ধূসর মাটির বিছানায় পড়ে' রুক্ষকেশা
ঘুমের পাহাড় চাপা পড়ে' আছে মাটির মেয়ে

মাটির মেয়ের বুকে থেমে গেছে ঝড়ের নাচা?
চীন জাপানের যুদ্ধ কি গেছে হঠাৎ থেমে?
ধোঁয়া-মাখা ভারী নিঃশ্বাস টেনে আজো তো বাঁচা,
লোহার চাকার ঝাঁঝ বুকে আজো আসিছে নেমে?

পুরুষের চোখে কামনার স্থূল প্রদীপ জ্বলে,
ধূমল শিখায় পাকে পাকে দেয় জীবন ছেয়ে,
বিকৃত ক্ষুধা আজো খোঁচা দেয় বুকের তলে,
তবুও আজিকে অঘোরে ঘুমায় মাটির মেয়ে।

অঘোরে ঘুমায় বুকে জাগে তার মরুর মায়া,
জ্যোৎস্নার চোখে ঘুমের আলস ভেঙেছে বুঝি?
রাত চাঁদ মোর ঘুমহারা চোখে ঘনায় ছায়া,
মাটির মেয়ের বুকের নাচনে কী-যেন খুঁজি!

সুরধুনী

কানাই সামন্ত

আজি আলো ঝলোমলো করে
অকারণে মোর অন্তরে অন্তরে।
সুরসুরধুনীস্রোতে
ভেসে আসে কোথা হতে
নির্মাল্যের ফুলউপহার
মল্লীমালতী-থরে।
আলো ঝলোমলো করে
চঞ্চল বীচিভঙ্গে
রঙ্গে
অন্তরে অন্তরে।

হে অভিসারিণী ধারা,
বিষ্ণুচরণসরোজপ্রসূত—
শিব জটাজুটে-হারা
তান্ডব উৎসবে
গুরু গম্ভীর কভু ডমরুর রবে
কলকল্লোল মিলায়ে কি মণি
ভূষণ ফণীর সনে
মেতেছিলে নর্তনেঃ
বিসারিত জটাতমিস্রে লীন
ইন্দু তপন তারা।
হে উন্মাদিনী ধারা!

আনন্দময় নন্দনউপকূলে
যেথা অমলিন মন্দারফুলে ফুলে
চিরমলয়জ বয়,
প্রাচী দিগ্‌ভাল স্থির-উষসীর সুচির-হাস্যময়,
সুরবালিকারা অর্ঘ্য ভাসায় জলে,
অপ্সরা বধূ সন্তরে কুতূহলে
কাঞ্চনতনুবিভায় হায় রে বিদ্যুৎ শত হানি',
কুলু-কুলু-কুলুবাণী
কল-কলরব তুলে',
চিরপ্রবাহিনী, বহ আনন্দে
নন্দন উপকূলে।

অয়ি চিন্ময়ী ধারা,
তোরে ভালোবেসে মর্ত্যে এসে গো
আজি যে আত্মহারা
এই মৃন্ময় ঘাটে
মন্দির রচি আমার দিবস কাটে।
ভঙ্গুর তট, ভঙ্গুর দেবালয়;
সদা মনে জাগে ভয়।
আঁধারে-আলোয়-শতেক-ছলনাময়
কত রূপে মোরে ভুলাও রে মায়াবিনী,
অস্থির রাতদিনই
জোয়ারভাটায়। —কভু হায় নিরাকারা,
সুরসুরধুনীধারা!

ও চিরপ্রবাহে তুলে
ভাসায়ে লও-না, কত আর উপকূলে
গণি গো লহরীমালা।
বিষাদআঁধার-ঢালা
অমাবস্যার রাতি
তাও তো কেটেছে, সুখের-দুখের-সাথী,
ভূলোকে দ্যুলোক ভুলে'।
কেন হায় উন্মূলে'
নিরন্ত স্রোতে আমার নিলে না তুলে?

আলো ঝলোমলো করে
অকারণে আজ অন্তরে অন্তরে।
সুরসুরধুনীস্রোতে
ভেসে আসে কোথা হতে
নির্মাল্যের ফুলউপহার
মল্লীমালতী-থরে।
আলো ঝলোমলো করে
চঞ্চল বীচিভঙ্গে
রঙ্গে
অন্তরে অন্তরে।

স্বপ্ন

সমীর ঘোষ

ভারী ভালো লাগিতেছিল কণার। দুই হাতে দ্রুত-গতিতে সে রান্নাঘরের কাজ সারিতেছিল আর গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছিল। গানটা ভারী সুন্দর। কণার দুঃখ, সে গানটার প্রথম দুই লাইন ছাড়া জানে না। না জানুক, তাহার তাহাতে গান থামাইবার কোনো কারণ ঘটে নাই। গানের এই দুই লাইনই সে কাজের অবসরে, মনের আনন্দে গাহিবে। এখনও সে গান গাহিতেছিল, আনন্দে তাই বোধ হয় কণার দুইটি চোখ উদ্ভাসিত, শুকনা দুইটি ঠোঁট কোমল।

রান্নাঘরের কাজ সারা হইয়া গেল। টুকিটাকি দুই একটা জিনিস গোছাইয়া লইয়া সে রান্নাঘর ধুইয়া দিল। তারপর কেরোসিনের বাতি হাতে করিয়া দরজার শিকল তুলিয়া বাহিরে আসিল। তখনও গুন্ গুন্ করিয়া তাহার গান চলিতেছে। এককালে কণা গাহিত ভালোই, অনেক মেয়ের চাইতে তাহার গলা সুন্দর। কেরোসিনের আলোটা নিভাইয়া দরজার বাহিরে রাখিয়া ঘরের দরজা সে বন্ধ করিয়া দিল।

ছোট্ট বারান্দাটুকু পার হইয়া সে শুইবার ঘরে আসিল। তাকের উপর হইতে দুধ পাড়িয়া স্পীরিট্ ল্যাম্প জ্বালাইয়া তাহার চারি মাসের ছোট মেয়ে খুকুর জন্য দুধ গরম করিতে লাগিল। এই কাজটা কণার মোটেই ভালো লাগে না। সারাদিন পরিশ্রমের পর এই সময়ে তাহার চোখ দুইটি ঘুমে বুজিয়া আসে. মাথা ভারী হইয়া বারবার নুইয়া পড়ে। মুহূর্তের পর মুহূর্ত ধরিয়া তাহার মন পড়িয়া থাকে বিছানার উপরে, সুনীলের পাশের ওই সংকীর্ণ স্থানটুকুতে। অথচ ওই স্থানের মোহ উপস্থিত কাটাইয়া দুধ তাহাকে গরম করিয়া লইতেই হয়। দুধ গরম হইবার আগে খুকু জাগিলে আর রক্ষা নাই। কণাকে বাধ্য হইয়া মেয়েটার গালে ঠাণ্ডা দুধ দিতে হয়। দুধ খাইতে আরম্ভ করিলে পেট ভরিয়া দুধ খাইয়া, তবে মেয়েটা ছাড়িবে। তাহা না হইলে চেঁচাইয়া সে বাড়ি মাথায় তুলিবে। ভয়ে কণার বুক টিপ টিপ করিতে থাকে। এই দুই তিন দিন আগে খুকুর কি সর্দিই না হইয়াছিল, পাড়ার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বকুবাবু বলিয়া ছিলেনঃ ঠাণ্ডা দুধ খাইয়া এই সর্দি হইয়াছে। সকলের কাছে কথাটা অস্বীকার করিলেও নিজেকে তো কণা ফাঁকি দিতে পারে না।

আজকে দুধ গরম করিতে কণার মোটেই কষ্ট হইল না। বাটিতে হাত দিয়া তাহার মনে হইল ঃ দুধ যেন বেশী গরম হইয়া গেছে। কলাই করা ডিসে দুধটা জুড়াইতে দিয়া তোয়ালে ও ঝিনুক গুছাইয়া লইয়া সে খুকুকে কোলে তুলিয়া লইল।

কি ভাবিয়া আবার সে মেয়েকে বিছানায় শোয়াইয়া দিল। মেয়েটা অঘোরে ঘুমাইতেছে। আর একটু না হয় ঘুমোক। দুধও অনেক বেশী গরম হইয়া গেছে—ততক্ষণে একটু ঠাণ্ডা হইয়া আসুক। তা ছাড়া কণার আজ মোটেই ঘুম পাইতেছে না। দুধের উপরে একটা তারের ঢাকনা ঢাকা দিয়া, কেরোসিন লণ্ঠনের উজ্জ্বল শিখা কমাইয়া সে অল্প করিয়া দিল।

ঘরে একঝলক শান্ত সুন্দর আলো আসিয়া পড়িল। বিস্মিত কণা লঘুগতিতে পিছন ফিরিয়া দেখিল, গলির ওপারে বোসেদের দোতালার বাড়ির ছাদের আলিসা ডিঙাইয়া একফালি হলুদরঙা জ্যোৎস্না কণার ঘরের জানালা বহিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কণা জানালার ধারে সরিয়া আসিল।

কোথা হইতে একটা মিষ্টি গন্ধ আসিতেছে। জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইবার সংগে সংগে কণা সকল কিছু বুঝিতে পারিল। বাড়ির অন্যতম ভাড়াটে শ্রীমন্তবাবুর বেজায় ফুলের সখ। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই আজ কিছু ফুল কিনিয়াছেন। ফুলগুলি কোথায় রাখা হইয়াছে, জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া কণা যেন তাহাও দেখিতে পাইল। শ্রীমন্তবাবু মাসখানেক হইল চোরাবাজার থেকে একটি লতাপাতায় বিচিত্রিত চীনামাটির ফুলদানী আনিয়াছেন। এই ঘরের জানালার মতোন শ্রীমন্তবাবুর ঘরেও গলির ধারে একটি জানালা আছে। সেই জানালার ধারে শ্রীমন্তবাবুর তক্তপোষ আর তক্তপোষের পাশে ছোট্ট একটা টিপয়ে একখানা ফুলকাটা জাপানী ঝাড়নপাতা। সেই টিপয়ের উপর লতায়পাতায় বিচিত্রিত ফুলদানীটিতে ফুল রহিয়াছে। কি ফুল? রজনী-গন্ধা? হ্যা, শ্রীমন্তবাবুর সখের চীনাফুলদানীতে শুভ্র রজনী-গন্ধা রহিয়াছে—কণা যেন এই ঘরে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতে পাইল।

জানালার গরাদ ধরিয়া কণা দাঁড়াইয়া আছে। এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার বড় ভালো লাগিতেছে। গান সে আর গাহিতেছে না। কোনো কিছু ভাবিতে গেলে, গান গাওয়া চলে না। মনের আনন্দে হালকা স্নায়ুতে ভাসিবার প্রয়োজন থাকিলে তবে গান গাওয়া চলে। কণা এখন অনেক কিছু ভাবিতেছে। তাই তাহার মুখে গান নাই, অথচ চোখে আনন্দ রহিয়াছে, ঠোঁটে কমনীয়তা ফুটিয়া আছে, মুর্শিদাবাদ সিল্কের ছাপা শাড়ীর চাপাফুলের রং সাধারণ কণাকে অপূর্ব করিয়াছে, এক ঝলক রূপালী জ্যোৎস্না সেই শাড়ীর রংয়ের সহিত যেন সহযোগিতা করিতেছে।

আজ সকালে কি সুন্দর রোদ্র উঠিয়াছিল। কণার এতো সুন্দর লাগিয়াছিল! অনেকদিন সে এতো সুন্দর সকাল দেখে নাই। কাল রাত্রিতে এমন সময় সুনীল কথা দিয়াছিল, যদি আজ সে মাহিনা পায়, তবে নিশ্চয়ই সে কণাকে সিনেমায় লইয়া যাইবে। সুনীল জানিত প্রথম তারিখে মাহিনা কিছুতেই মিলিতে পারে না, যদিও পরের দিন রবিবার পড়িয়াছে। আগেও অনেকদিন আজকের মতোন প্রথম তারিখ শনিবার, দ্বিতীয় তারিখ রবিবার হইয়াছে, কিন্তু মাহিনা মিলে নাই। তাই সে নিশ্চিন্ত হইয়া কণাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। সুনীলের কাছে প্রতিশ্রুতি পাইয়া কণা, তাহার ঘরের দেয়ালে টাঙানো মা কালীর পটের সামনে দাঁড়াইয়া বারবার প্রার্থনা করিয়াছে, সুনীল যেন আজ মাহিনা পায়। অন্য ক্ষেত্রে যাহাই হোক না কেন, উপস্থিত কণার প্রার্থনা মা কালী নামঞ্জুর করিলেন না। অফিসে গিয়া সুনীল দেখিল, বাবুরা বড় সাহেবের কাছে এক দরখাস্ত করিতেছেঃ আজ

শনিবার, এক তারিখে যদি তাহাদের মাহিনা মিলে তো অত্যন্ত ভালো হয়, কেন না তাহা হইলে তাহাদের অনেকে দেশে যাইতে পারে। অতএব বড় সাহেব যদি দয়া করিয়া আজকে মাহিনা দেওয়ার হুকুম দেন তো এই বিশ্বস্ত, প্রভুভক্ত চাকরেরা অত্যন্ত বাধিত, কৃতজ্ঞ থাকিবে। ইত্যাদি।

সকলে সই করিয়াছে। সুনীল কিছুতে সই করিবে না। সহকর্মীরা ছাড়িল না। বড় সাহেব দেড়টায় বাহির হইয়া গেলে দেখা গেল, বাবুদের দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে।

কোনো দৈববাণী শুনিতে না পাইলেও, অথবা বেতারে কোনো সংবাদ না পেঁাছিলেও, কণা আজ কলে জল আসিবার আগে ঘরের শুকনো কাজ সারিয়া ফেলিল। কলঘর হইতে যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন একমাত্র রান্নাঘরের কাজ ছাড়া আর কিছু তাহার করিতে বাকি নাই। অন্যদিন হইলে উনানে আগুন দিতো, আজ দিলো না। স্টোভ জ্বালিয়া সুনীলের জন্য হালুয়া করিল, তারপরে খুকুর সাবু চড়াইয়া দিলো। সাবু শেষ করা হইয়াছে—সুনীল ঘরে ঢুকিল। মুখ তাহার গম্ভীর, হাতে তাহার একটা খাবারের ঠোঙা।

সুনীলের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া কণা শংকিত হইয়া উঠিল। তাহার সকল আয়োজন কি ব্যর্থ হইয়াছে, মা কালী সকাতর প্রার্থনা না-মঞ্জুর করিয়াছেন? কোনো কথা না বলিয়া সে সুনীলের হাত হইতে খাবারের ঠোঙা লইল—পাখাখানা আগাইয়া দিল।

উভয় পক্ষে কোনো কথা নাই। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল ঃ কণার ভয়, সুনীল মাহিনা পায় নাই। সুনীল ভাবিতেছেঃ কি সে করিবে? মিথ্যা কথা বলিতে তাহার মন চাহিতেছে না, অথচ সত্য বলিলে.........

কলঘর হইতে স্নান সারিয়া সে নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিল কণার এতোক্ষণে চা তৈয়ার হইয়া গেছে। একখানা চীনামাটির রেকাবে সে সুনীলের আনা কচুরী ইত্যাদি সাজাইয়া, একপাশে হালুয়া দিয়া, পেয়ালায় কেটলী হইতে চা ঢালিতে লাগিল। খাবার খাওয়া শেষ করিয়া চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া সুনীল হঠাৎ বেজায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল ঃ কই তোমার এখনো কোনো গোছগাছ হয়নি—তুমি আবার ছবি দেখতে যাবে!

কণা যেন নিজেকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। কতকটা সংশয়ে আর ভয়ে আর অস্ফুটস্বরে সে জিজ্ঞাসা করিল, মাইনে পেয়েছো?

একটু হাসিয়া সুনীল বলিল, হ্যা, মাইনে তো আমি পেয়েছি, কিন্তু তোমার তো এখনো কোনো কাজ সারা হয়নি। ছ'টা পোনেরোয় শো আরম্ভ, তুমি কাজ সারবেই বা কখন, যাবেই বা কখন?

আমার, আমার তো সব কাজ সারা হোয়ে গেছে। শুধু খুকুকে.........

কথা অসমাপ্ত রাখিয়া কণা ছুটিয়া গিয়া দোলনা হইতে ঘুমন্ত খুকুকে টানিয়া তুলিল। অকস্মাৎ যে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, আজ সকালের সেই ঝকঝকে রৌদ্র যেন তাহাকে নতুন প্রাণশক্তি দিয়াছে। ছোট চঞ্চল মেয়ে যেমন পুতুল লইয়া অতি সন্তর্পণে অথচ সহজ স্বাভাবিক হাতে নাড়াচাড়া করে, তেমনিভাবেই সে খুকুর প্রসাধন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে খুকুকে দুধ খাওয়ানো, জামা বদলানো, পাউডার মাখানো, কাজল পরানো শেষ হইল। সুনীলের কোলে খুকুকে দিয়া কণা কাপড় বদলাইতে গেল। খুকুকে আদর করিতে করিতে সুনীলের হাসি পাইল ঃ ছয়টা পনেরোর শো আরম্ভ হইতে আর মাত্র পঁচিশ মিনিট আছে। বাড়ি হইতে হাঁটিয়া যাইতে প্রায় পনের মিনিট লাগিবে। বাকী দশ মিনিটের মধ্যে কণার প্রসাধন শেষ হইবে একথাটা অবিশ্বাস্য। একটু হাসিয়া সুনীল খুকুর কোমল গালচে গাল টিপিয়া দিল।

কণা ঘরে ঢুকিল। ঘড়ির দিকে চাহিয়া সুনীল গম্ভীর হইল। খুকুর প্রতি আদর হঠাৎ যেন কমিয়া গেল।

—নাও তোমার মেয়ে ধরো, সুনীল খুকুকে কণার দিকে আগাইয়া দিল।

—আমি ধরবো কি, তুমি নেবে না!

কণার জিজ্ঞাসায় সুনীল যেন চটিয়া গেল, হ্যা, তোমার মেয়ের টিপি বয়ে আমি যাবো তোমায় ফিলিম দেখাতে। কাঁদলেই লোকের গালাগালি শুনতে হবে।

কণাকে কে যেন অকূলসমুদ্রে ফেলিয়া দিল। মেয়ে লইয়া সুনীল কিছুতেই ছবি দেখিতে যাইবে না। কণাই বা কোথায় মেয়ে রাখিয়া যায়? কণার মনে হইল, সামনের বোসেদের ছোট বৌয়ের মতোন তাহার শাশুড়ী থাকিলে বড় ভালো হইত। সে অনায়াসে তাঁহার কাছে মেয়ে রাখিয়া যাইতে পারিত।

শেষ পর্যন্ত ছবি দেখিতে গেল দোতলার সই বকুলের কাছে মেয়ে রাখিয়া। বকুলের কাছে মেয়ে রাখিতে কণার মোটেই মন সরিতেছিল না। বকুল বড় ছেলেমেয়ে চটকায়। বোধ হয় বকুলের কোনো ছেলেমেয়ে নাই বলিয়াই। সে যাহাই হোক, বকুল আদরের সংগে খুকুকে লইল—কণা সুনীলের সহিত পথে বাহির হইয়া পড়িল।

ফিরিবার পথে সুনীলের কথা কণার একেবারে ভালো লাগিতেছিল না। সুনীল তখন মুখে মুখে হিসাব করিতেছে, আজ তাহার টিকিটে, সিগারেটে, আইসক্রীমে কতো খরচ হইয়াছে। বারবার সে কণার দিকে চাহিতেছিলঃ চুলগুলি কণা এলোমেলোভাবে এলানো খোঁপায় বাঁধিয়াছে। শাড়ীটা পরিয়াছে অত্যন্ত সাধাসিধেভাবে। একটা মোড়ের মাথায় উজ্জ্বল বিজলীর আলোকে সুনীল আরো আবিষ্কার করিল, তাড়াতাড়িতে প্রসাধন শেষ করার জন্য সামান্য একটু স্নোর ডেলা কণার ডান পাশের গালের তলায় লাগিয়া আছে। মুখে না বলিলেও, মনে মনে সুনীল বলিল, কণার এই ত্রুটিপূর্ণ দ্রুত প্রসাধনই এই মোটা খরচের জন্য দায়ী।

এক ঘণ্টার মধ্যে কণার ভাত আর মাছের একটা তরকারী রান্না শেষ হইল। সুনীল নামে মাত্র খাইয়া বিছানায় গিয়া

আশ্রয় লইল। তাহার ক্ষিধে ছিল না। মাত্র ঘণ্টা আড়াই আগে যে আইসক্রীম, চপ আর প্রায় এক প্যাকেট সিগারেট খাইয়াছে, তাহার যে-এর মধ্য ক্ষিধে হইতে পারে না এটা ঠিক। তবু অন্যদিন হইলে কণা আরো কিছু খাইবার জন্য সাধাসাধি করিত, কম খাইয়া সুনীল উঠিয়া গেলে সে ভীত হইয়া পড়িত। আজ কিন্তু সেদিকে তাহার বিশেষ লক্ষ্য পড়িল না। সুনীল উঠিয়া গেলে সে বাকী কাজ সারিতে সারিতে সহসা তাহার নতুন গানের একটা কলি গুন গুন করিয়া গাহিতে আরম্ভ করিল।

জানালার গরাদ ছাড়িয়া ধাপের উপর কণা বসিল! ছবিতে দেখা ছেলে মেয়ে দুইটি কি সুন্দর, কি সুখী! কথায় কথায় মেয়েটির কি অভিমান। ছেলেটিও কম যান না। কি সুন্দর তাহারা সংসার গড়িয়াছে। লোকজন, গাড়ী, আসবাবপত্র, কি সুন্দর বাড়ি! কণার সাধ যায়, অমন বাড়ি তাহার হয় অমন লোকজন, অমন ঐশ্বর্য। আর সেই সকল আনন্দ আয়োজনের মাঝখানে, সে ওই মেয়েটির মতোন মাঝে মাঝে অভিমান করিয়া বসিবে। ওই ছেলেটির মতোন সুনীল কতো নতুন কৌশল বাহির করিয়া তাহার অভিমানে নীরব দুইটি ঠোঁটে একটুখানি হাসি ফোটাইয়া দিবে, অসম্পূর্ণ একটি চুমা... .. কণার চোখ মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, খাইবে। এইবার সুনীল যে দূরে সরিয়া থাকিবে, কণা কিন্তু তাহা সহিবে না। সে নিজের তরফ হইতে সকল কিছু সম্পূর্ণ করিয়া দিবে। আর খুকু? খুকু থাকিবে তাহাদের দুই-জনের মাঝখানে। তাহার মুক্তার মতো ছোট্ট ঝকঝকে সাদা দাঁতে যে হাসি ফুটিবে, ঠোঁটে যে মিষ্টতা জাগিবে, তাহা তাহাদের দুইজনকে সকল সময়ে স্মরণ করাইয়া দিবে, খুকু তাহাদের পৃথক পৃথক সত্তার মাঝখানে সেতু বাঁধিয়া দিয়াছে।

ছবির গল্প কিন্তু এইবার অন্য পথ ধরিল। ঐশ্বর্য জিনিসটা বড় খারাপ। লোকজন, বন্ধুবান্ধব, নতুন নতুন অদ্ভূত নেশা কোথায় যে মানুষকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহা কি কেহ জানে? রাত্রির পর রাত্রি কাটিয়া যায়, মেয়েটির ফুল দিয়া সাজানো বাসর, সকল ঐশ্বর্য দিয়া রচিত প্রসাধন, যৌবনপুষ্পিতা দেহবল্লরী ব্যর্থতার আড়ালে লুকায়, লুকাইয়া কাঁদে ঃ ওগো চাও, ফিরিয়া চাও, অভিমানিনীর সম্মুখে আসিয়া একটা কথা বলো—সকল অভিমানের বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া সে তোমার ওই সবল উন্নত বুকে আবার লুটাইয়া পড়িবে, পড়িতে চায়।

হায় রে! পথভোলা পথিক ফিরে না। আলোকের সহিত সকল সম্বন্ধ চুকাইয়া, সে তখন অন্ধকার উদ্বেল খেয়ায় পাড়ি দিতেছে নিত্য নতুন আবিলতার সন্ধানে! সেই সকল নেশার ধারাবাহিকতার নেশা একদিন ভাঙ্গিয়া পড়িল। আবার তাহারা এক সংগে মিলিল বস্তীর খোলার ঘরে। তারপর অনেক দিনের কথাগুলি বাদ দেওয়া যাক। সেই দিনগুলিতে বিপুল পরিশ্রম করিতে হইয়াছে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঁচিতে। সেই সংগ্রামে তাহারা জয়ী হইল কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু একদিন আবার দেখা গেল, কোনো দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের মৃত্যু এদের পুনরায় ঐশ্বর্য দিয়াছে। আবার সেই লোকজন, গাড়ী, আসবাবপত্র, কি সুন্দর বাড়ি! সেই মান অভিমানের পালা, অসম্পূর্ণ চুম্বনের উপর চঞ্চল উষ্ণ চুম্বনের বন্যা। আর তাহারি ফাঁকে ফাঁকে পাখীর লঘু শিশ দেওয়ার মতোন গান। গানটি কণার এতো ভালো লাগিয়াছে!

খুকীর কান্নায় চমক ভাঙ্গিল। জানালার ধার হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া আলো বাড়াইয়া দোলনা হইতে মেয়েকে তুলিয়া লইল। মার কোলে আসিয়াও কিন্তু খুকুর কান্না থামিল না। সুনীলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পাশ ফিরিয়া সে বলিল, ব্যাপার কি? বাড়ি যে মাথায় উঠছে।

অন্যদিন হইলে কণা বলিত, ওতো, ওই রকমই, ঘুম যদি মেয়ের একবার ভেঙ্গেছে তো নিস্তার নেই।

আজ কিন্তু কথা বলিতে কণার মোটেই ইচ্ছা করিতেছিল না। তাই সে কোনো কথা বলিল না। খুকুর কান্না বাড়িয়া চলিল, দুধ একেবারে জুড়াইয়া ঠাণ্ডা হইয়া গেছে। আজকাল গরম দুধ খাওয়া তাহার অভ্যাস হইয়াছে—ঠাণ্ডা দুধ সে মুখে লইবে না।

বিছানার উপর হইতে সুনীল তাহা লক্ষ্য করিল, বলিল, হুঁ! তাই তো বলি এতো কান্না কিসের! জোর করলে অবশ্য ঠাণ্ডা দুধ খাওয়ানো যায়, কিন্তু কান্না থামানো যায় না। সিনেমা দেখতে গেলেই এই সমস্ত হয়, সংসারের কাজ করবার, দুধ গরম করবার কথা মনে থাকে না।

মুখ তুলিয়া কণা বলিল, মিথ্যে বক্ বক্ করো না। ঘুমোচ্ছিলে ঘুমোও।

খুকু পা ছুঁড়িল। কণার হাতে ঝিনুকে দুধ ভর্তি ছিল। সেই দুধ ছিটকাইয়া কনার কাপড়ে পড়িল।

—না বক্ বক্ করার কোনো প্রয়োজন নেই। বাইরে গিয়ে যদি পয়সা উপায় করে আনতে হোত, তা হোলে বুঝতে সিল্কের শাড়ী পরে মেয়েকে দুধ খাওয়ানো চলে না।

পাশ ফিরিয়া সুনীল শুইল। এই তীক্ষ্ন শ্লেষ বাক্যে কণার দুই চোখ ভরিয়া টপ টপ করিয়া জল খুকুর গায়ে পড়িয়া গেল। দুধের বাটি সরাইয়া রাখিয়া মাই দিয়া সে খুকুকে সন্তুষ্ট করিল।

খুকু ঘুমাইয়া পড়িলে সে স্পীরিট ল্যাম্প জ্বালাইয়া দুধ গরম করিয়া মেয়েকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দোলনায় শোওয়াইয়া দিল। তারপরে কলঘরে গিয়া শাড়ীর যেখানে দুধ পড়িয়া গিয়াছিল, সেই স্থানটুকু ধুইয়া দিল। ঘরে ফিরিয়া শাড়ীখানা শুকাইবার ব্যবস্থা করিয়া, সে একখানা আটপৌরে কাপড় পরিয়া জানালার ধারে আসিয়া গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইল। দুই চোখ দিয়া তাহার তখনও জল পড়িতেছে। আর মনে পড়িতেছে কিশোরকালের দিনগুলির কথা। সেদিন তাহার কতো স্বাধীনতা ছিল, সেদিন সে দৈনন্দিন কাজের বাহিরে গিয়া সিনেমা দেখার মতো কতো কাজ করিয়াছে, কই কেহ তো সে জন্য কোনো কথা বলে নাই। সেদিন তাহার অফুরন্ত ছুটি ছিল, আর আজ? আপনার

(শেষাংশ ২২৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ইটালীর সংগীত-সম্রাট রশ্যিনি

—ভৈরব—

সংগীতজগতে রশ্যিনি সুকৃতীসম্পন্ন সুরজ্ঞদের অন্যতম। জনগণের মনকে তিনি ভাল করেই চিনেছিলেন এবং তাদের অন্তর স্পর্শ করার কায়দা তিনি জানতেন; তাই সাফল্যলাভে তিনি ব্যর্থ হন নি। সেই সঙ্গে সংগীতের নবধারা প্রবর্তন এবং পুরাতনের সংস্কার কার্যেও তাঁর



গিয়োচিনো এ্যান্টোনিও রশ্যিনি

দৃষ্টি তীক্ষ্ম ছিল। তাঁর মধ্যে দিয়ে ইটালীয় সংগীত-জগতের একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচিত হয়েছে। সংগীত ব্যাপারে যাতেই তিনি হাত দিয়েছেন, তাতেই সোনা ফলিয়েছেন এবং লোকে তাঁকে এমনিভাবে গ্রহণ করেছিল যে, তাঁর সংগীতে আচ্ছন্ন জনগণকে ফিরিয়ে আনা সমকৃতী-সম্পন্ন সংগীতজ্ঞদের পক্ষেও দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠেছিল।

১৭৯২ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ভেনিস উপসাগরের তীরবর্তী পেসারো নামক স্থানে রশ্যিনি জন্ম-গ্রহণ করেন। রশ্যিনির পিতা ছিলেন শহরের সরকারী তুরীবাদক (trumpeter) এবং জবাইখানার (slaughter house) পরিদর্শক।

রশ্যিনি শৈশবে শিক্ষালাভ করার কোন সুযোগ পান নি। অল্পবয়সেই একটা কসাইখানায় শিক্ষানবীশ হিসেবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তারপর প্রিনেট্টি নামক এক শুঁড়ীর কাছে তিনি একটা কাজ জুটিয়ে নেন। মদের ব্যবসা ছাড়াও প্রিনেট্টি সংগীত শিক্ষাদানও করত। প্রিনেট্টির অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শোনা যায়—মাত্র দুটি আঙুলের সাহায্যে সে হার্প বাজাতে পারত, আর ঘুমতে পারত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। রশ্যিনির মত ফাজিলী প্রকৃতির ছেলের পক্ষে বেশীদিন এখানে টিকে থাকা সম্ভব হল না। তবে এর কাছ থেকে সামান্য যেটুকু শিখতে পেরেছিলেন, সেটুকু ভাল করেই আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন।

রশ্যিনির পিতা গ্রামে গ্রামে ঘুরে গেয়ে বেড়াবার জন্যে এই সময়ে একটি দল গঠন করেন। তিনি নিজে অর্কেস্ট্রার দলে ট্রাম্পেট বাজাতেন; রশ্যিনির মা গান গাইতেন আর রশ্যিনি কখনও যৌথগানের ধুয়া ধরতেন, কখনও শিঙা বাজাতেন, আবার কখনও ছোটখাট ভূমিকায় অভিনয়ও করতেন। এই দলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরেই তিনি লোকের পছন্দ-অপছন্দ, খেয়াল-খুসী প্রভৃতির অন্তরে প্রবেশ করবার সুযোগ লাভ করেন। রশ্যিনি সংগীত এবং কৌতুকের বড় ভক্ত ছিলেন।

সংগীত শাস্ত্রে শিক্ষালাভ তাঁর ভাগ্যে তেমন কিছু ঘটে ওঠেনি—গুরুর উপদেশের চেয়ে স্বীয় মনের উদ্ভাবন ক্ষমতাই তাঁকে বড় করে তুলেছে। বড় বড় সংগীতজ্ঞদের মত তিনিও প্রথমে যেমন মনে আসত সুর রচনা করে ফেলতেন এবং পরে সেটা বিশ্লেষণ করে দেখতেন। নামকরা পূর্বতনদের সংগীতগুলি তিনি নিয়মিত পড়তেন। তাঁর ছন্নছাড়া এবং খেয়ালী জীবনযাত্রা দেখে পিতা একদিন তাঁকে ভর্ৎসনা করে ট্রাম্পেট বাজান শিখতে বললেন। রশ্যিনি জানালেন যে, তিনি সংগীত রচনা শিক্ষা করছেন এবং এই কাজই করবেন। পিতা সে কথা শুনে ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছিলেন, রশ্যিনি তাহলে দুমুঠো অন্নসংস্থানও করতে পারবে না। রশ্যিনির পিতার সে অনুমান কিন্তু মোটেই ঠিক হয় নি। একুশ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি এমনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন যে, সে সময়ে ভেনিসের সান মোজ্ থিয়েটার ছেড়ে যখন তিনি ঐ শহরেরই আর একটি থিয়েটারে যোগদান করতে যান, তখন প্রথমোক্ত থিয়েটারের ম্যানেজার তাঁর মতলব টের পেয়ে তাঁকে যেতে দিতে চাইলে না। চুক্তি অনুযায়ী আর একটা অপেরা রশ্যিনির রচনা করবার কথা। ম্যানেজার বদমায়েসী করে এমনি দুর্বল একটি কাহিনী নির্বাচন করলে যে, তাকে কেন্দ্র করে ভাল রকম সুর রচনা একরকম অসম্ভব। রশ্যিনিও শোধ নিতে ছাড়লেন না—সংগীতাংশ এমনি যা-তা করে রচনা করলেন যে, লোকে তা শুনে দস্তুরমত বিগড়ে গেল। রশ্যিনিও মানে মানে সেখান থেকে মিলানে সরে পড়লেন।

মিলানে তিনি কুমার বেলজোকোশোর অতিথি হন। প্রতিদিন কুমার এবং তাঁর অতিথিবৃন্দ শীকারে বহির্গত হতেন; ফিরতেন একেবারে সন্ধ্যার পর। রাত্রের খাওয়ার পূর্ব থেকে খাওয়া শেষ হওয়ার মধ্যের সময়টুকুতেই রশ্যিনি তাঁর নতুন অপেরা 'Tancredi' রচনা করে ফেলেন। স্বর-লিপির পাতা ভর্তি করে তারপর তিনি গিয়ে বসতেন পিয়ানোর সামনে এবং সকলকে ডেকে গলা ছেড়ে গান আরম্ভ করতেন। সপ্তাহঅন্তে অপেরাটি রচনা সমাপ্ত হয়।

আগের অপেরাটিতে তিনি যে বদনাম করেছিলেন, সেই ভয়ে এইটি যখন ভেনিসে মঞ্চস্থ হয়, তখন নিজে তিনি

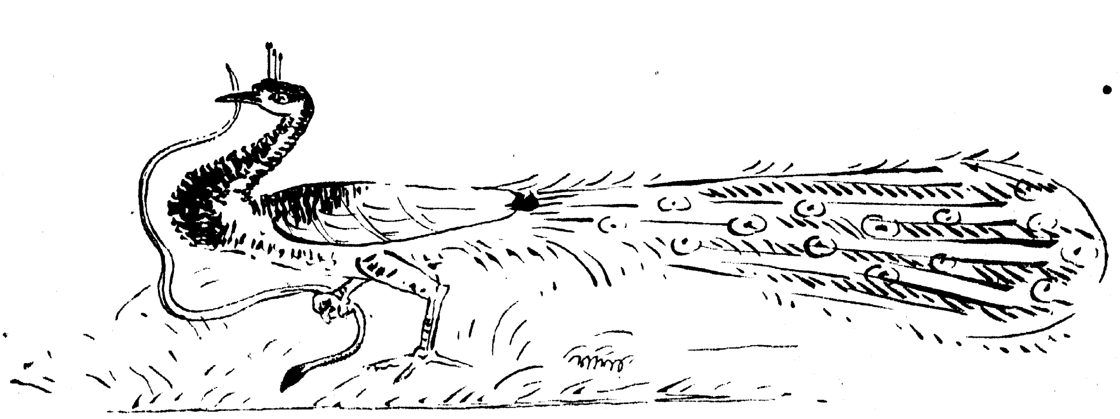
প্রথমটায় সামনে বের হন নি, পর্দার আড়ালে লুকিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু ক্রমশই যখন শ্রোতারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল, তখন তিনি বেরিয়ে এসে নিজেই সংগীত পরিচালনা করতে লাগলেন। এই অপেরাতে তিনি অমর কীর্তি স্থাপন করেন।

এরপর রশ্যিনি ইটালীয় অপেরাতে অনেকগুলি পরিবর্তন সাধিত করলেন। সুরসহযোগে বক্তৃতার অংশ তিনি সংক্ষিপ্ত করে দিলেন এবং সেই জায়গায় ঐক্যতান বাদ্যকে এগিয়ে নিয়ে এলেন। তিনিই প্রথম "arias" রচনা প্রবর্তন করেন; তাঁর মতে এই অংশও গাওয়া উচিত। তাঁর পূর্বে সংগীতজ্ঞরা কেবল সুরের কাঠামোটাই বেঁধে দিতেন এবং তা গাইয়েদের ইচ্ছামত ভরিয়ে নেবার সুযোগ দিতেন। এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে অপেরাটা নেহাৎ গলার কসরৎ না থেকে নাটকীয় এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল।

১৮১৬ সালে রশ্যিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব 'সেভিলির নাপিত' অপেরাটি রচনা করেন। শোনা যায় মাত্র তের থেকে পনের দিনের মধ্যেই তিনি এটি রচনা করে ফেলেছিলেন। প্রথম অভিনয় রজনী কিন্তু অসাফল্যের এক চরম নিদর্শন হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে রশ্যিনির এক প্রতিদ্বন্দ্বী পাইসিয়েল্যোও এই একই বিষয়বস্তু নিয়ে একটি অপেরা রচনা করেছিলেন। সুতরাং পাইসিয়েল্যোর ভক্তেরা ঠিক করলে যে, রশ্যিনির অপেরাকে জমতে দেওয়া হবে না। তারা দল বেঁধে হট্টগোল সুরু করে দিলে এবং শেষ পর্যন্ত অভিনয় শেষ না করেই পর্দা ফেলে দেওয়া হল। সকলে ভাবলে রশ্যিনি মর্মাহত হয়েছেন, কিন্তু তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে দেখা গেল যে, পরম নিশ্চিন্তে তিনি নিদ্রা দিচ্ছেন। পরের দিন অবশ্য অভিনয় ভালই জমেছিল।

তারপর রশ্যিনি আট বৎসর ধরে ইটালীর বহু শহর পরিভ্রমণ করেন। ১৮২৩ সালে ভেনিসে দুখানি অপেরা মঞ্চস্থ করে লণ্ডন গমন করেন। লণ্ডনে প্রভূত সাফল্যলাভ করে প্যারীসে ফিরে আসেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেখানেই কাটান। কোন অজ্ঞাত কারণে মাত্র প'য়ত্রিশ বছর বয়সেই তিনি রচনা ছেড়ে দেন—কেউ বলে আলস্যের জন্য, কারুর মতে তাঁর ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়ারবেয়ারের নাম হতে দেখে তিনি পেছিয়ে যান, আবার কেউ-বা বলেন, ১৮৩০ সালের জুলাই-বিদ্রোহের পর একাডেমীতে তাঁর রচনা 'উইলিয়াম টেল'কে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট অপেরার চেয়ে নিচে আসন দেওয়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হন। এগুলি বিশ্বাসযোগ্য নয়, কারণ প্রতিভা কখনও অলস থাকে না—রশ্যিনির ব্যাপার রহস্যাবৃত। 'উইলিয়াম টেল'ই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। আলস্যের কথা তুললে তিনি বলতেন, ওটা তাঁর ধর্ম। যাই হোক, ঊনিশ বছরে তিনি সর্বসমেত তিরিশটি অপেরা রচনা করে গিয়েছেন।

রশ্যিনি চিরকালই শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করে গিয়েছেন এবং ইটালীতে তাঁর প্রতিপত্তিও অসীম ছিল। এক সন্ধ্যায় ৩য় নেপোলিয়ন অপেরা দেখতে গিয়েছেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন যে, সামনে কিছুদূরে একটি মোটাগোছের লোক বেশ আসর জমিয়ে বসেছে, পরিচারককে দিয়ে তিনি তাকে ডাকতে পাঠালেন। মোটা লোকটি আর কেউ নন, স্বয়ং রশ্যিনি। সম্রাটের সামনে এসে রশ্যিনি সান্ধ্য-পোষাক না পরে আসার জন্য ক্ষমা চাইলেন। সম্রাট তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'সম্রাটে সম্রাটে সাক্ষাৎ, তার আবার সাজ পোষাক কি দরকার!' বাস্তবিকই রশ্যিনি ইটালীর সংগীত জগতে সম্রাট ছিলেন।



সামগ্রী

(বড় গল্প—অনুবাদ)

শ্রীতারাপদ রাহা

রিচার্ড যখন গাঁইতি নিয়ে ফিরে এল—গার্ড তখন সেখান থেকে চলে গেছে। একেই বলে দৈব। গার্ড হঠাৎ চলে গিয়ে নিজেও বেঁচে গেল, রিচার্ডকেও বাঁচিয়ে গেল ঃ দুটি প্রাণ এক সঙ্গে রক্ষা পেল।

ট্রেনটি অবশেষে স্টেসনে এসে থামল। রিচার্ড তার স্বাভাবিক স্থৈর্যের সঙ্গে সঙ্গীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে চলল। মুখ দেখে মনের ভাব কিছু বুঝবার উপায় নেই। এদিকে অ্যানা সেই সময়ে বাড়িতে কার্ল আর তার নিজের জন্য খাবার টেবিল সাজাচ্ছে; আর কার্ল তার দিনের কাজের শেষে কারখানা ছেড়ে পুঁটলি বগলে স্টেসনের বাগানটা পার হয়ে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে এগোচ্ছে। হৃদয়ের আবেগ আনন্দ—কিছুতেই তার গতি আর দ্রুততর করে তুলতে পারে না। দীর্ঘ চার বৎসর ধরে সে মনে মনে অ্যানাকে কামনা করেছে; সঙ্গে সঙ্গে শিখেছে যে কি করে অপেক্ষা করতে হয়। তার মনের কামনা সিদ্ধ হয়েছে ঃ অ্যানাকে সে লাভ করেছে। কিন্তু কার্যসিদ্ধি তার মনের স্থৈর্য নষ্ট করতে পারে নি।

বিরাটকায় হস্তীর চারিদিকে হালকা শরীর প্রজাপতি যেমনি করে ঘুরে বেড়ায়—কার্লের অসীম ধৈর্যের আশে পাশে তার মনের রঙীন নেশা তেমনি হালকা পাখা মেলে একটু শুধু ওড়ে।

.কারখানা থেকে বাড়ি অনেকটা দূর; ট্রামেরও কোন ব্যবস্থা নেই। রিচার্ড যে পথে আসছে—কার্লের পথ তার চেয়ে খানিকটা বেশি, তবুও সুস্থ সবল পায়ে সে একটু জোরেই আসছিল।

অ্যানা খাবারের টেবিল ঠিক করে—রুটি আনতে বাইরে গিয়েছিল। সন্ধ্যায় যখন কার্লের আসবার সময় হ'ত—অ্যানার মনটা তখন একটু ভাল লাগত।

পেছন খোলা দু' ঘোড়ায়-টানা একখানা গাড়ি রিচার্ডের পাশে দিয়ে যাবার সময়—গাড়োয়ান একবার জিজ্ঞাসা করে গেল, "গাড়ি চাই আপনার ?" রিচার্ডের খুঁড়িয়ে চলা দেখে গাড়োয়ান মনে করেছিল লোকটা গাড়ি চাপবে। রিচার্ড কোন কথা না বলে একটু পিছিয়ে পড়লে,—গাড়িটা ঘড় ঘড় করে সামনে দিয়ে চলে গেল।

বাকি পথটুকু রিচার্ড হেঁটেই চলল। রাস্তার ধারে বাড়ির যে দরজা—তার সামনে মোটর মিস্ত্রির সাথে মেরী দাঁড়িয়েছিল। বাড়ির সামনে এসে রিচার্ড বেশ ভাল করে বাড়িটাকে একবার তাকিয়ে দেখতে লাগল। চার বছর আগে বাড়িটা কেমন নতুন ছিল,—এর মাঝেই কি জরাজীর্ণই না হয়ে গেছে !

অ্যানার বন্ধুটি ভয়ে ভয়ে এই নবাগত সৈনিকের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল ঃ উস্কোখুস্কো মাথাওয়ালা সৈনিকের সব কিছু যেন লোহা দিয়ে তৈরী,—শক্তি ও সামর্থ্যের প্রতীক,—সর্বাঙ্গে যেন তার যুদ্ধের কঠোরতা ছাপ মেরে দিয়েছে। মোটর মিস্ত্রী জিজ্ঞাসা করলে ঃ "কাউকে খুঁজছ তুমি ?"

রিচার্ড খুশি হয়ে বললে, "হাঁ, হাঁ, আমার স্ত্রী থাকে এখানে। অ্যানা। অ্যানা আজকাল এখানেই আছে না ?"

"হাঁ, আছে,—কিন্তু"—মেরী আর কিছু গুছিয়ে বলতে পারলে না।

একটা অল্প বয়সের মজুর—সুরে বেশ একটু টিট্‌কিরি দিয়ে মেরীর অসমাপ্ত কথাগুলি শেষ করে দিয়ে বললে,—"আছে,—কিন্তু ফ্রা অ্যানার এক সঙ্গে দু'টো পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হ'ল কি করে বুঝতে পারছি না যে!" ছেলেটা দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে যখন কথা বললে রিচার্ড তখন তাকে ছাড়িয়ে উপরে উঠে গেছে।

রিচার্ড খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে উপরে উঠতে লাগল। তার লম্বা কোটটা সিঁড়ি যেন ঝেঁটিয়ে চলেছে। রিচার্ডের দেহ ক্লান্তিতে নুয়ে পড়েছে, সর্বাঙ্গে মালিন্য, পোষাক নোংরা। দেখে মনে হয় চার বছর দুঃখ কষ্ট ভয় বিপদের মধ্য দিয়ে একা পথ বেয়ে সে যেন আজ তার গন্তব্য স্থানে এসে পেঁাছেছে।

উপর থেকে এই অদ্ভুত চলার শব্দ শুনে অ্যানার মনে হচ্ছিল দুইজন লোক বুঝি একটা ভারি বোঝা সিঁড়ির পথে টেনে উপরে আনছে। সন্তান-সম্ভবা অ্যানার রূপ যেন উছলে পড়ছিল।

রিচার্ডের আর কড়া নাড়বার দরকার হ'ল না। দরজা খোলাই ছিল। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল—একটা অপরিচিত কালো মূর্তি।

মুখে কেউই কিছু বললে না। অ্যানার দৃঢ়নিবদ্ধ দৃষ্টিই যেন প্রথম প্রশ্ন করলে। ঘরের চারিদিকে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে রিচার্ড বললে, "অ্যানা, আমায় চিনতে পারছ না ?"

অ্যানা সত্যিই তাকে চিনতে পারে নি। রাস্তায় দেখা হ'লে অ্যানা কিছুতেই তাকে চিনতে পারত না। এখানে অবশ্য সে মনে করে নিল,—এ সে-ই, সে না হয়ে আর যায় না। হাত পা থেকে রক্তের স্রোত যেন তার মাথায় উঠে আসছে,—চামড়ার নিচে কে যেন অসংখ্য গরম সূঁচ বিঁধিয়ে দিচ্ছে।

রিচার্ড তার কাছে এগিয়ে গিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিলে। অ্যানা তার ঠাণ্ডা হাতটা তার হাতের উপর রাখলে। সম্বন্ধটা যেন অটুটই আছে। এক রাশ দাড়িতে-ঢাকা রিচার্ডের মুখখানা অ্যানার মুখের কাছে এগিয়ে গেল। অ্যানার মুখ আপনি সরে গেল।

"বড়ই নোংরা—না ? এতদিন পথে পথে কাটাতে হয়েছে—তাই।" রিচার্ড এইবার তার বোঁচকা নামালে। কয়েক মাস আগে কার্ল যে চেয়ারটার উপর তার বোঁচকা রেখেছিল রিচার্ডও তারই উপর রাখলে। কোটটা খুলতে খুলতে তার নজর পড়ল ঃ কি নোংরা হয়ে গেছে এ-টা, কত পর্দা মাটি পড়েছে যে এ-তে তার ঠিক নেই,—এই ঝক্‌ঝকে ঘরটার কোথায় যে সে এটা রাখে !" দিশে না পেয়ে রিচার্ড খানিকক্ষণ কোটটার কলার ধরে দাঁড়িয়েই রইল।

রিচার্ড আর একবার ঘরটা চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। এই ধূলি বর্জিত পরিচ্ছন্ন সুখোষ্ণ ঘরটিতে সে এখন আরামে দিন কাটাতে পারবে—ভেবে তার অন্তর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ল। অ্যানার দিকে চেয়ে সে উল্লসিত হ'য়ে বলে উঠ্‌ল ঃ "অ্যানা, আমার অ্যানা, কতদিন তুমি পথ চেয়ে দিন কাটিয়েছ—আজ আমি সত্যিই এসে গেছি—বড় আশ্চর্য লাগছে—নয় ?"

অ্যানা আগে কত শতবার ভেবেছে—রিচার্ড এলেই তাকে সব কথা খুলে বলবে,—কিন্তু প্রথম মুহূর্তে একটি কথাও তার বলা হ'ল না। এতে একরকম মিছে কথাই তার বলা হ'ল। কি করবে সে,—খুন করতে ত আর পারে না ? আগে সে এ নিয়ে যতই কেন ভাবুক না রিচার্ডের সাথে মুখোমুখি দাঁড়াবার আগে ব্যাপারটার গুরুত্ব সে এমনি করে বুঝতে পারে নি।

কথা বলবার শক্তি যেন তার লোপ হয়ে গেছে। বলবার মত একটা কথাও সে আর খুঁজে পাচ্ছিল না। কথা কাটাকাটি করবারও কিছু নেই। রিচার্ডের স্তব্ধ দৃষ্টির সমুখ দিয়ে অ্যানার শবটা যেন ধীরে ধীরে দরজার কাছে এগিয়ে গেল, তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সিঁড়ী ও উঠানের পথে অ্যানার গতি দ্রুত হয়ে উঠল। রাস্তা বেয়ে ছুটল সে কার্লের কাছে।

ট্রাম চলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল,—কার্ল তাই বড় রাস্তা ছেড়ে তাড়াতাড়ি আসবার জন্যে চোরা পথে আসছিল, তাই অ্যানার সংগে তার আর দেখা হল না।

যে ছোকরা মজুরটা একটু আগে রিচার্ডকে বলেছিল "ফ্রা অ্যানার ত আর দুটো পুরুষের সংগে বিয়ে হতে পারে না",—সে দরজার সামনে তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। কার্লকে দেখে সে একটু মুচকি হাসলে। তার দুটি বন্ধু তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল তাদের সে জিজ্ঞাসা করলে, "কি রকম ব্যাপারটা হবে এখন বল ত?" ভাড়াটে বাড়ির সবাই এর মধ্যে জেনে ফেলেছে যে একজন সৈনিক পুরুষ এসে অ্যানাকে তার স্ত্রী বলে দাবী করছে।

কার্ল যখন তাড়াতাড়ি উঠান পার হচ্ছিল—চারিদিকের জানলার পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশীরা সব তার দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

যেদিন থেকে রিচার্ডের ফিরে আসার আশংকা অ্যানা ও কার্লের মনে ভুতের মত চেপে বসেছিল—সেইদিন থেকে তারা দুজনে যেন আর এ বাস্তব জগতে নেই। পরস্পরকে হারানোর আশংকাই তাদের প্রেমকে গভীরতর করে তুলেছিল। পাছে হারায় এই ভয়ে তারা পরস্পরকে কেবলি যেন প্রাণপণে আঁকড়ে ধরছে। অতি ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়েও যেন তাদের প্রেম নিবেদনের কার্য চলেছে।

দোতালায় পা দিয়েই কার্ল বরাবর তার গতি শ্লথ করে নেয়, কেন যে করে সে কথা সে কোন দিন ভেবে দেখে নি। আজ দোতালায় এসে গতিবেগ পরিবর্তনের সময়ই তার মনে হচ্ছিল অ্যানা ব্যাকুল হয়ে তার পথ চেয়ে বসে আছে।

অ্যানা নিশ্চয়ই তার পদশব্দ শুনতে পেয়েছে এবং তারই মত দু-বাহু বাড়িয়ে মিলনের ক্ষণ গণছে—এই বিশ্বাস নিয়েই কার্ল ঘরের দরজা খুললে।

কিন্তু এ কি! ঘর থেকে বেরিয়েই কোন লোক যদি কোন কারণ বশত তৎক্ষণাৎ ফিরে আসে এবং সরল বিশ্বাসে মেজের উপর পা দিতে গিয়েই মেঝে না থাকায় ফাঁকার মাঝ দিয়ে পড়ে যায় —তার মনের অবস্থার সংগে কার্লের মনের অবস্থার তুলনা করা যায়।

কার্লকে দেখেই রিচার্ড আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল, "আরে, তুই?" মুখের ভাব তখনও তার স্থির শান্ত। খোলা বোঁচকার উপর একটা ময়লা শার্ট সে ছুড়ে ফেললে। "আবার যে তোর সাথে এত শীগগির দেখা হবে এ ভাবি নি!......এই মিনিট তিনেক হল আমি এখানে এসেছি।......বস, বস।" রিচার্ড কার্লকে চেয়ার দেখিয়ে দিলে। "কিম্বা ঐ সোফায়ও বসতে পারিস।"

কেন না জানি কার্ল—অ্যানা কোথায়—জিজ্ঞাসা করতে পারল না। সে গিয়ে বসলো, সোফার উপরেই বসলো। পথের অনেক ঝঞ্জা বিপদ কাটিয়ে যখন কোন শক্তিশালী পুরুষ নিজের গন্তব্য স্থানে গিয়ে হাজির হয়—তখন তার মুখে যে তৃপ্তি ও আনন্দের আভা দেখা যায়—রিচার্ডের মুখে তখনও তাই লেগে ছিল।

"তুই তা'লে এই বাড়িতেই থাকিস?......কিছু খাওয়া হয়েছে ত? ফিরলি কবে তুই?......ও এক্ষুণি ফিরে আসছে। এলেই খেতে বসা যাবে। সব তৈরী।"

বড়দিনের নিমন্ত্রণে সামনে অনেক মিষ্টি সাজানো টেবিল দেখে ছেলেপেলেদের যেমন আনন্দ হয় রিচার্ডের মুখে চোখে তেমনি আনন্দের চোরা ঢেউ খেলে যাচ্ছিল, কার্লের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে যেন বলতে চায় ঃ দেখবি এখন কি নিয়ে আমি ঘর করি। অ্যানা, সকল অভাব পুরণ করে দেয় এক অ্যানা। অ্যানা থাকলে আর কিছুর দরকার নেই।

রিচার্ড ময়লা কাপড়চোপড় কোণের চেয়ারের উপর ছুড়ে দিয়ে ফর্সাগুলি ড্রয়ারে উঠাচ্ছিল—দেখে কার্লের বুকের চাপ যেন আরও খানিকটা বেড়ে উঠলো।

"অ্যানা ঐগুলি সব ধুয়ে ফেলবে। সোডা দিয়ে আচ্ছা করে ওগুলি ফুটিয়ে ফেলতে হবে।"

রিচার্ডের মুখে একটুখানি উদ্বেগের চিহ্ন নেই। বেশ খোশ মেজাজে সে পূর্বাভ্যাস মত উপরের ড্রয়ার টেনে দরকারী কাগজ-পত্রগুলি তার ডান কোণে রেখে দিলে।

"কোট খুলে বেশ ভালো হয়ে বস, নিজের বাড়ির মত।.........কতদিন পরে তোর সংগে দেখা!"

কার্ল ভাবলে ঃ ও নিজে বাড়িওয়ালা হয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করছে, তাই অ্যানার কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি নি।......আর দেরী করা চলে না, সব কথা খুলে বলতে হচ্ছে ও-কে। আর দেরী না।

এই মনে করার সংগে সংগে তার মনের সব অসাড়তা যেন ঘুচে গেল। হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তি সব যেন তিরোহিত হয়ে গেল। জীবণ মরণ সমস্যা এ—ভাবলে কার্ল। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নামবার আগে মানুষের স্নায়ু যেমন বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে যায়, সে যেমন ভাবতে থাকে—হয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে মারবে, নয় নিজে মরবে—কার্লের মনের অবস্থা হয়ে উঠল ঠিক তাই।

"এই যে অ্যানা আসছে"—বলে কার্ল উঠে দাঁড়াল।

এই কথার যে কি অর্থ হতে পারে রিচার্ড অতসত ভেবে দেখলে না।

অ্যানার সর্বাংগ ঘামে ভিজে গেছে, চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠছে, কিছুই যেন সে দেখতে পাচ্ছে না, কপালের উপর কতক-গুলি চুল ছড়িয়ে পড়েছে। পাগলের মত ঘরে ঢুকেই সে বলে উঠলো—"এখানে এসেছে সে?" প্রথমে সে একটা ভুল দিকে চাইল, তারপরেই কার্লকে দেখতে পেয়ে তার বুকে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অ্যানার শীতল দেহটা বুকে পেয়ে কার্লের হৃদয় সেই মুহূর্তেও কানায় কানায় ভরে উঠল। রিচার্ডের মনে তখনও কিছু সন্দেহ জাগে নি, সে ভয় পেয়ে অ্যানার কাছে ছুটে এসে বললে, কি হ'ল অ্যানা, শরীরটা খারাপ লাগছে খুব?

অ্যানা কোন মতে নিজেকে কার্লের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে নিয়ে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়ালে, চোখ দুটি সমুখে নিবদ্ধ,— বিভ্রান্ত।

কার্ল যখন বলে উঠলো—"অ্যানাকে তোমার ছাড়তে হবে"— তখন তার নিজের কাছেই মনে হ'ল সে যেন একটা গুলী ছুড়ছে।

রিচার্ড প্রথমে কথাটা কিছুই বুঝতে পারেনি। কথার অর্থটা যেন অনেক দূর থেকে আসছে—এখনও রিচার্ডের কাছে এসে পেঁছয় নি। কথার অর্থ পরিস্ফুট হবার আগেই সে একবার মনে মনে ভেবে নিলে কার্ল যদি ওকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়—তবে? তবে আমি ওদের দু'জনকেই এমনি মার দেব যে আর উঠতে হবে না,.........পরক্ষণেই অ্যানাকে চিরকালের মত হারানোর ভয়ে তার মন যেন আবার ক্ষমা করতে রাজি হয়ে গেল।

রিচার্ড ভাবলে কার্ল কি সব বাজে বকছে, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করে নিয়ে সে অ্যানার দিকে তাকিয়ে বললে, "কি হয়েছে— বল ত, অ্যানা, ব্যাপার কি? এস, বলো দেখি।"

অ্যানা কোন উত্তর দিলে না। রিচার্ড অ্যানার কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল। কার্ল দু'জনের মাঝে এসে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো ঃ অ্যানা—আমার স্ত্রী, যা বলতে হয় আমিই বলছি।

রিচার্ড এইবার তাকিয়ে দেখলে অ্যানা অন্তঃসত্ত্বা।

"ওঃ এই ব্যাপার?......তুই আমাকে কি বুঝাবি রে শুয়ার!—কথাটা রিচার্ড বললে বটে, কিন্তু বাইরে তার মুখে চোখে একটুখানি উত্তেজনা ছিল না। বন্দী নিবাসে এক দিন সে যে মুখে গাঁইতি আনতে গিয়েছিল—এ সেই মুখ।

উনি অ্যানাকে নিয়ে এই কান্ড করেছেন, অ্যানা সন্তান সম্ভবা, এখন উনি আমায় ব্যাপার বুঝাতে এসেছেন, শুয়ার! অ্যানা ভুল করে যা করে ফেলেছে, তা মাপ করা যেতে পারে, যে কোন অবস্থাতেই ওকে আমি গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু ঐ শুয়োরটা?—কি করলি তুই,—পাজি? একেবারে অমার্জনীয়। যে কোণে গাঁইতিটা ছিল রিচার্ড সেইদিকে এগিয়ে গেল।

ঠিক এই সময়ে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এক নিদারুণ আঘাত রিচার্ডের উপর এসে পড়ল। অ্যানা হঠাৎ ছুটে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে বললে,—"ও ছাড়া বাঁচব না আমি, আর কারো ঘর করতে পারব না আমি, মারবে, মারো, আমায় মেরে ফেলো।"

"ও ছাড়া বাঁচবে না তুমি?—আর কারো ঘর করবে না তুমি? ....অ্যানা, তুমি আমায় চাও না? আমায় চাও না তুমি"

"এখন আর এ ছাড়া আমার উপায় নেই।"

রিচার্ড এ কি শুনলে! সে ত আর সহ্য করতে পারছে না। আঘাত করার সকল শক্তি সে হারিয়ে ফেললে। অন্তরটা তার একেবারে মুসড়ে পড়ল।

সে যেন এখনও কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না। টেবিলে ভর দিয়ে বসে সে পাগলের মত বলে যেতে লাগল ঃ "তুমি পারো না?—অ্যাঁ—অ্যানা, পারো না তুমি আমার সঙ্গে ঘর করতে?—কেন পারো না অ্যানা,—কেন?—কেবল ও-কেই ভালো লাগে তোমার?"

জীবন প্রদীপ যখন একেবারে নিভে গেছে—তখন যেন সে ওটাকে উজ্বল করে তুলতে চেষ্টা করছে। একেবারে হতাশ হয়ে সে অ্যানাকে ডাকতে লাগল,—"এসো না অ্যানা, আমায় ভালো করে বুঝিয়ে বলো কি হয়েছে?......হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো, "আচ্ছা, আমি দেখছি, দেখছি।" কিন্তু কি সে ছাই দেখবে বুঝতে না পেরে আবার চেয়ারে বসে পড়ল। এর পর একটা কথাও তার মুখ দিয়ে আর বের হল না।

অ্যানা ও কার্ল দুইজন তাকে তাকিয়ে দেখলে। রিচার্ড চেয়ারের উপর জবুথবু হয়ে বসে আছে, সারা গায়ে আর জামায় তার ময়লার চর পড়ে গেছে, দেখে মনে হয় সকল সম্বল সে হারিয়ে বসেছে। লোকটা কি করে কাঁদতে হয়—ছেলে বেলায়ই ভুলে বসে আছে, শুকনো চোখে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ারের উপর কুঁজো হয়ে তাকে বসে থাকতে দেখে ওদের দুজনেরই মায়া হতে লাগল। আর তাদের ভয় করবার কিছু নেই।

অ্যানা শুনলে কার্ল বলছে "এইবার ওঠো।" বলেই সে একটা ছোট ব্যাগে জিনিসপত্র গুছাতে সুরু করে দিলে।

রিচার্ডের পাশ দিয়ে অ্যানা কতবার চলাফেরা করলে তার দিকে কয়েকবার তাকিয়েও দেখলে, কিন্তু তার ব্যথায় ব্যথিত হয়ে তার সঙ্গে ঘর করতে মন তার একবারও চাইল না। ভালবাসার মত এমন নিষ্ঠুর জগতে আর কিছুই নেই। বিচিত্র এর স্বভাব, এতে যেমনি আছে নিবিড় নিষ্ঠা, কঠোর আত্মোৎসর্গ—তেমনি রয়েছে অপরকে খুন করে নিজের বাঁচতে ইচ্ছা।

মেরী এসে দরজায় টোকা দিলে। ভিতরে এল সে। কেউ কোন কথা বললে না। সে এসে অ্যানাকে জিনিসপত্র গুছাতে সাহায্য করতে লাগলো। তার চোখের সামনে চলতে লাগল নীরব হত্যাকান্ড।

ড্রয়ার খুলে সব জিনিসপত্র বের করে ওরা প্যাক করতে লাগলো, কিছুই রিচার্ডের চোখে পড়ল না, কোন শব্দই তার কানে এল না। অ্যানার সঙ্গে কাটানো অতীত দিনের ছবিগুলি তার মনে একে একে এসে আবার কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছিল। সবই কত সুন্দর ছিল। রিচার্ড এইবার একটু নড়লে, মাথাটা আর কাঁধটা তুলে এইবার সে যেন কিছু বলতে চায়, কিন্তু বলা আর তার হল না, মাথাটা তার আবার আস্তে আস্তে নুয়ে পড়ল।

অ্যানার সব গোছানো হয়ে গেছে। হ্যান্ড ব্যাগটা নামিয়ে রেখে সে একবার ডাকলে ঃ রিচার্ড। তখনই ব্যাগটা আবার সে হাতে তুলে নিল।

"যাও" শুধু এই কথাটা ছাড়া উত্তরে রিচার্ড আর কিছু বলতে পারলে না। দেখা গেল একরাশ দাড়ির মধ্যে তার মুখখানা কেমন বিকৃত হয়ে উঠেছে।

বিদায় নিতে অ্যানা তার কাছে আর হাত এগিয়ে দিতে সাহস করল না, অসহায়ের মত কার্ল আর মেরীর দিকে চেয়ে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

যে উকিল ফাঁসির আসামীর পক্ষে ওকালতি করেছে লোকটার ফাঁসি হবার দিন সকালে ঘণ্টাখানেক আগে সে যদি লোকটার সঙ্গে দেখা করতে যায়, বিদায় নেবার সময় লোকটার কাছ থেকে কি বলে বিদায় নেবে সে যেমন ভেবে পায় না, কার্লের দশাও হল ঠিক তেমনি। রিচার্ডকে কোন কিছু না বলে সে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মেরীর পিচ ফলের মত ফুলো ফুলো দুটি রাঙা গালে কাদার চিহ্ন লেগেই ছিল, এইবার তাতে আবার নতুন করে জল গড়াতে সুরু করলো।

তেতালা থেকে নামবার সিঁড়ীর ধারে কয়েকজন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে ছিল, অ্যানা ও কার্ল যখন তাদের পাশ দিয়ে নেমে গেল তারা একটুও উচ্চবাচ্য করল না। দুই নম্বর উঠানে ঢুকবার পথে কতকগুলি প্রতিবেশী একত্র হয়ে এদের কথাই বলাবলি করছিল, কার্ল ও অ্যানা তাদের কাছে এলে তারা এদের পথ দিয়ে সরে দাঁড়াল, তারপর এরা এগিয়ে গেলে এদের পিছু পিছু শোভাযাত্রা করে চললো।

একদল ছেলেপিলে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিললো, পরস্পর বাহু-বন্দী হয়ে সেই দুটি ফড়ফড়ানি মেয়েও এই শোভাযাত্রায় যোগ দিল। শীতে তারা একেবারে নীল হয়ে যাচ্ছে—তবুও। প্রতি জানলার ধারে মানুষের মুখ ঃ সবাই রেগে গেছে। একজন হঠাৎ কি একটা যেন গালাগালির কথা বলে ফেললো—সঙ্গে সঙ্গে সবাই চীৎকার করে এক সঙ্গে গালাগালি দিতে সুরু করলো।

ভাড়াটে বাড়ির অনেক লোক এসব ব্যাপারে তেমন কিছু মনে করত না। তাদের চোখের সামনেই কত বিবাহিতা স্ত্রীলোককে তারা পরপুরুষের সঙ্গে ঘর করতে দেখেছে—তারা কিছুই বলেনি ত, তারা দেখেও দেখে নি, কিন্তু অ্যানা—এই অ্যানা তাদের সবার চোখে ধুলো দিয়ে এ ছয় ছয়টা মাস একটা পরপুরুষ নিয়ে ঘর করে গেল, কিছু ধরতে পারলে না তারা! মেয়েটা ত কম পাজী নয়!

চারিদিকে লোকের চীৎকার আর গালাগালি,—কার্ল আর অ্যানার গা ঠেসে লোকের অসম্ভব ভীড়। বন্ধু চলে যাচ্ছে,—এই সব নানা কারণে মেরীর চোখের জল আর এক মুহূর্ত থামছিল নাঃ সে তখনও ভাবছিল অ্যানা স্বামীর সঙ্গেই চলে যাচ্ছে।

ঠাট্টা বিদ্রূপ আর উচ্চকণ্ঠের গালাগালিতে বাড়ি ঢুকবার দেয়ালগুলি যেন ফেটে পড়তে চায়। এইসব শুনতে শুনতে কার্ল আর অ্যানা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। কার্লের হাতে রয়েছে শুধু একটি ব্যাগ।

পথ একেবারে বরফে ঢাকা। যারা ওদের পিছু পিছু যাচ্ছিল—

খানিকটা গিয়েই তাদের একদল পেছিয়ে পড়ল, রইল শুধু কতক-গুলি চ্যাংড়া ছেলের দল। একটি ছেলে বরফের একটা ঢিল ওদের দুইজনের গায়ে ছুড়ে মারল। তারপর সেও প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মাথা খাড়া করে সরে পড়ল।

অ্যানা তার বন্ধু মেরীকে মিনতি করে বললে, "তুই রিচার্ডের কাছে ফিরে যা, ভাই।"

মেরী এর আগেই মনে মনে ঠিক করেছিল—রিচার্ডকে সে একা থাকতে দেবে না। আর কয়েক পা গিয়েই সে থামল। এর মাঝেই সে তার মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়েছে, স্বরে আর তার একটুখানিও জড়তা নেই; বেশ খুশি হয়েই সে বলে উঠল. "তা'লে আসি, ভাই, অ্যানা মনে রাখিস।" শহর আর শহরতলির মাঝে যে বিস্তীর্ণ খোলা মাঠ পড়ে রয়েছে—কার্ল আর অ্যানা ক্রমে সেইখানে এসে পড়ল। শুভ্র তুষারের বুকে পড়ল তাদের নীরব পায়ের রেখা।

এইবার ঘুরে তারা বড় রাস্তা ধরলো। স্তেপে ঘাসের উপর শুয়ে কার্ল এই রাস্তার স্বপ্ন দেখত ঃ অ্যানা যেন এইখানে এসে অপেক্ষা করছে। রাত্রি হয়ে গেছে, আকাশে চাঁদ উঠল, রুপালি বরফের পাতের উপর পড়ল চাঁদের আলো। বরফে ঢাকা গাছের পাতার ছায়া পড়েছে বরফে ঃ সাদার উপর কে যেন রংবেরং-এর নক্সা এ'কে গেছে। উপরে তারার ঝলমলানি।

দুজনের একজনও কথা বলছে না,—ভাবছেও না কিছু তারা। এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় জীবন পথে তারা ক্রমে এগিয়ে চলেছে, এক মরণ ছাড়া অন্য কিছুতেই তাদের বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না আর।*

(সমাপ্ত)

*জার্মান লেখক হের্ লিওনার্ড ফ্রাঙ্ক-এর "কার্ল এন্ড অ্যানা" গল্পের অনুবাদ

স্বপ্ন

(২২৩ পৃষ্ঠার পর)

মনে সে যদি কিছুক্ষণ বসিয়া কিছু ভাবিয়াছে তো, তাহার কাজে অবহেলার সীমানা থাকে না, তাহার জন্য তাহাকে ......কনা ডান হাতের উল্টা পিঠ দিয়া চোখের জল অপসারিত করিল ঃ তাহার আজ ছুটি নাই, ঘরের প্রত্যহের কর্তব্য ছাড়িয়া বাহিরের কোন কিছুতে মন দিবার অধিকার তাহার হারাইয়া গেছে।

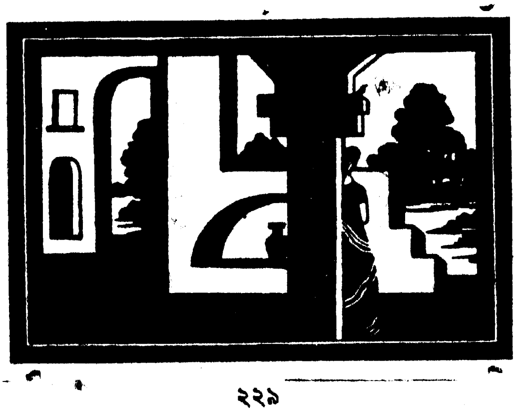
কিছুক্ষণের মধ্যে সেই একফালি জ্যোৎস্না বোসেদের ছাদের আড়ালে বোধ হয় কণার কথা ভাবিয়া সরিয়া গেল। চারিপাশে পাতলা অন্ধকারের স্তর ছড়াইয়া পড়িল। বাতাস নাই, দুই পাশের উঁচু নীচু গলির মধ্য কি গুমোট, মনে হয় কেউ বুঝি যত গরম আবহাওয়াকে এই কারাগারের কয়েদী করিয়া দিয়াছে। শ্রীমন্তবাবুর খোলা জানালা হইতে মাঝে মাঝে শুধু ক্ষীয়মান ফুলের অত্যন্ত মৃদু সৌরভ এই জানালার গরাদে আসিয়া লাগিতেছে।

কণার মনে হইল ঃ কিশোরকালের সকল সুখস্বপ্নের এটুকুন বুঝি এখনও বাকী আছে। ছেলেবেলায় সে সেই যে সাজি ভরিয়া অজস্র শিউলি ফুল কুড়াইয়া আনিত কাপড় রাঙাইবার জন্য, সেই কথাটি মাঝে মাঝে মনে করাইয়া দিবার মানসে যেন বাড়ির অন্যতম ভাড়াটে শ্রীমন্তবাবুর ফুলের সখ আছে।

আর কিছুক্ষণ জানালার সামনে দাঁড়াইয়া, কণা ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া আসিল। সরিয়া আসিবার সময় হঠাৎ তাহার চোখ পড়িল দোলনায় ঘুমন্ত খুকুর উপর। সে নত হইয়া খুকুর অকলঙ্কিত শুভ্র ললাটে একটা চুমা খাইল ঃ চুমা খাইবার সময় কে জানে কেন তাহার দুই চোখ ভরিয়া আবার অজস্র অশ্রুবিন্দু জাগিয়া উঠিল। সে বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

সুনীল বোধহয় জাগিয়াই ছিল। কণা বিছানায় শুইবামাত্র সে হাত বাড়াইয়া কণাকে একেবারে বুকের উপরে টানিয়া লইয়া বলিল, কণা, লক্ষ্মীটি রাগ করো না। আমায় ক্ষমা করো। আমি তোমায় মিছেমিছি অনেক অন্যায় কথা বলেছি। তোমার দোষ নেই।

কণা ফু'পাইয়া উঠিল। সুনীলের বুকে মুখ গুঁজিয়া দিল, কিন্তু কোনো কথা বলিল না অথবা বলিতে পারিল না। বোধ হয় প্রচন্ড অভিমানে, তাহার গলা বুজিয়া গিয়াছিল।



৩

প্রাচীন সভ্যতার এক অধ্যায়

কুমারী বাণী গুপ্তা এম এ

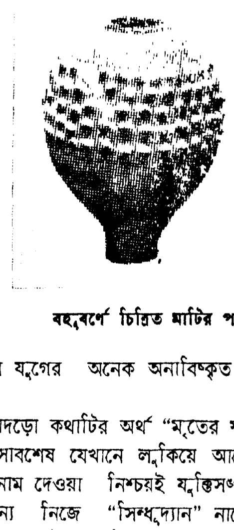
ভারতের সভ্যতা, শিক্ষা, সমাজ, শিল্প-বাণিজ্য চিরদিনই জগতের লোকের চোখে ছিল শ্রদ্ধা ও সম্মানের জিনিস। বর্তমান ভারতের চারিদিকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা হয়তো আজ তাকে দুর্দশার সবচেয়ে নীচের ধাপটিতে নামিয়ে এনেছে, কিন্তু চিরদিনই তার এমনি ছিল না। সেদিন ভারতবাসীর ঘরে ঘরে এত অভাব অনটনের হাহাকার ছিল না, ঘরে ঘরে, পরিবারে পরিবারে জীবন এমনিধারা অশান্তিময় হয়ে ওঠেনি। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে পুরাকালের ভারতীয় সমাজ ছিল রীতিমত উন্নত এবং সেকালের সেই সমাজ আমাদের একালের মত কেবল পুরুষজাতিকে নিয়েই গড়া



যোগী মূর্তি

হয়নি, তাই সেকালে মেয়েদের দেশ, জাতি ও সমাজসেবার অধিকার ছিল ভারী সহজ ও সুন্দর। বৈদিক যুগের ইতিহাস আলোচনা করলে সেটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় এবং যীশুখৃষ্ট জন্মাবার আনুমানিক দেড় হাজার বছর আগের (ঋগ্বেদের যুগ) এমন একটি সুন্দর সুপ্রতিষ্ঠিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজের ইতিহাস জেনে অবাক হয়ে যেতে হয়। এ কি কম বিস্ময়ের জিনিস? কিন্তু এর চেয়েও বড় বিস্ময় আমাদের ইতিহাসে জমা আছে। আজ আমরা সবাই জানি বৈদিক যুগই ভারতের সবচেয়ে পুরানো আর সর্বাঙ্গসুন্দর সভ্যতার যুগ নয়—তারও অনেক আগে উত্তর ভারতে যে অপূর্ব সভ্যতার ইতিহাস একদিন গড়ে উঠেছিল তাকে ভারতের এক পরম গৌরবময় যুগ বলা যেতে পারে। এখানে পাঞ্জাবের মণ্টগোমারি জেলার হরপ্পা, লারকানার সভ্যতাকেই উল্লেখ করা হচ্ছে। এই সভ্যতার পরিধি অবশ্য আরও বিস্তীর্ণ, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তানের আরও অনেক জায়গায় এরূপ নানাপ্রকারের পুরাকীর্তি পাওয়া গেছে, তা থেকে বোঝা যায় যে, এই সভ্যতা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিছুদিন আগে বিহারের অন্তর্গত বক্সারের কাছেও পঞ্চাশ ফিট মাটীর নীচে পুরানো মূর্তি এবং অন্যান্য নিদর্শন পাওয়া গেছে। কাজেই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে গঙ্গাতীরেও এইরূপ বা কথঞ্চিৎ অনুরূপ প্রাচীন সভ্যতা ছিল।

এই সভ্যতাকে এক কথায় 'সিন্ধু-সভ্যতা' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। খৃঃ পূঃ প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্বের এই সভ্যতার ইতিহাস কোন প্রাচীন সাহিত্যে উল্লেখ নেই। মোহেঞ্জোদড়োতে প্রায় ৫৫০টি ছাপ দেবার মোহর বা সীল পাওয়া গেছে। মোহরগুলি কোনটি গোল কোনটি বা চতুষ্কোণ। প্রায় সবগুলিতেই একটি করে জন্তুর মূর্তি আঁকা আছে। অনেকগুলি জন্তু বেশ চেনা যায়—যেমন বাঘ, হাতী, ষাঁড় প্রভৃতি। মোহরগুলির উপরে এক অদ্ভুত রকম অক্ষরে সিন্ধুবাসীদের নিজস্ব লিপি লেখা আছে। কিন্তু নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আজ পর্যন্তও তাদের পাঠোদ্ধার সম্ভবপর হয়নি। যেদিন সে সবের অর্থ আবিষ্কার করতে পারা যাবে সেদিন



বহুবর্ণে চিত্রিত মাটির পাত্র

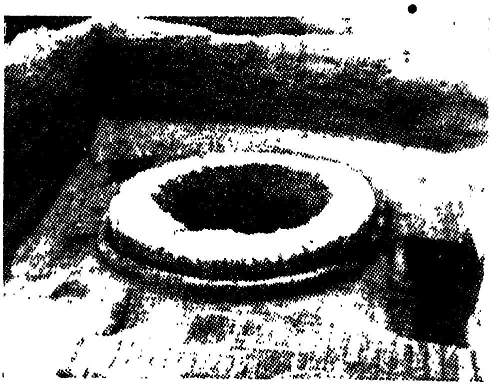
হয়তো বা সে যুগের অনেক অনাবিষ্কৃত তথ্যই আমরা জানতে পারব।

মোহেঞ্জোদড়ো কথাটির অর্থ "মৃতের স্তূপ"। বহু প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ যেখানে লুকিয়ে আছে মাটীর নীচে, তার এমন একটা নাম দেওয়া নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত। লারকানা জেলা উর্বরতার জন্যে নিজে "সিন্ধুদ্যান" নামে আখ্যাত হ'লেও মোহেঞ্জোদড়ো এর উষর ভূমিতে অবস্থিত। সিন্ধুনদ এর পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই সিন্ধুনদকেই আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল সিন্ধুসভ্যতা এবং এরই স্রোতে বারংবার তা লুপ্ত হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত ৭টি মোহেঞ্জোদড়ো শহর আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতানুযায়ী আরও শহর এখনো নদীগর্ভে লুপ্ত আছে। মোহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার ক্রমিক পরিণতির দিকে লক্ষ্য রাখলে একথা বেশ সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, এই বিবর্তনের জন্যে খুব বেশী সময় তাদের প্রয়োজন হয়নি। অর্থাৎ একবার শহর বন্যায় ধ্বংস হলে তা' আবার গড়ে উঠেছে খুব অল্প সময়েই। স্যার জন্ মার্শালের মতে মোহেঞ্জোদড়ো-সভ্যতা ৫০০ বৎসরের মধ্যেই তার চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। যে ৭টি শহর আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের মোটামুটি ৩টি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম তিনটি শহর পরবর্তী যুগের, দ্বিতীয় তিনটি

মধ্যযুগের এবং অবশিষ্টটি আদিযুগের বলে' মনে করা হয়। এই তিনটি স্তরের মধ্যে পরবর্তী যুগের ৩টি শহরের অবশিষ্ট অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পাওয়া গেছে, মধ্যযুগীয় সভ্যতাকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর বলা যেতে পারে।

মোহেঞ্জোদড়োর সভ্যতাকে সাধারণভাবে তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা বলা যেতে পারে। প্রস্তর যুগের মত প্রস্তরের প্রাধান্য এতে নেই—তামার প্রচলন ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে—এমনি একটা সময়কেই বলা যেতে পারে তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অত্যন্ত আচর্শ্যভাবে এই প্রাচীন সভ্যতাকে বর্তমান জগতের কাছে আবিষ্কার করে ভারতের তথা পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে উজ্জ্বল আলোকসম্পাত করে গেছেন। তারপর থেকে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ বহুতর অর্থব্যয়ে এ স্থানের



মহেঞ্জোদড়োর কূপ

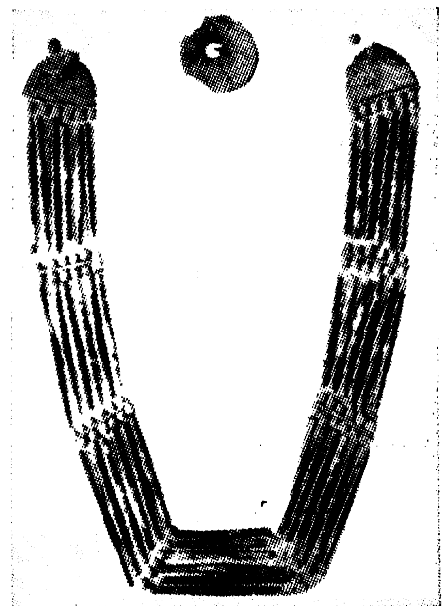
খননকার্য সুসম্পন্ন করেন এবং আমরা জানতে পারি যে, বৈদিক-যুগেরও বহুশতবর্ষ আগে ভারতের সভ্যতা জগতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেছিল। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীর যে কয়টি স্থানে আমরা সভ্যতার নিদর্শন পাই তাদের প্রত্যেকেই বৃহত্তম নদীগুলিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল—নীল নদের তীরে মিশর, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে মেসোপটেমিয়া এবং সিন্ধুনদতীরে মোহেঞ্জোদড়ো।

মোহেঞ্জোদড়ো নগরীর পরিকল্পনা দেখলে একথা বেশ বোঝা যায় যে, বর্তমান সময়ের মত সেই অতি প্রাচীন কালের শহরটি সুদক্ষ শিল্পী কারিগরের নির্দেশে গড়ে উঠেছিল। এই নগর যাঁদের হাতে গড়ে উঠেছিল তাঁরা যে স্থপতিবিদ্যায় পারদর্শী এবং সুসভ্য ও সুশিক্ষিত ছিলেন—সেটা নগরের যে কোন একটি বাড়ি, যে কোন একটি পথ বা পয়ঃপ্রণালী দেখলেই বোঝা যায়। স্বাস্থ্য ও সুবিধার দিক থেকে দেখলে আজকালকার বিশেষজ্ঞগণও এ শহরের কোনও ত্রুটি আবিষ্কার করতে পারবেন না একথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে। শহরটি বড় বড় রাস্তা দ্বারা বিভক্ত হয়ে ছোট ছোট পল্লীতে পরিণত হয়েছে। পল্লীগুলি আবার সুবৃহৎ ইমারতে সুসজ্জিত।

মোহেঞ্জোদড়োর পরিকল্পনাকে আধুনিক "চকমিলান" পরিকল্পনা বলা যেতে পারে। অট্টালিকাগুলি প্রাচীন পোড়া ইঁটে তৈয়ারী। ঐ সময়ে নিকটবর্তী অন্যান্য অনেক দেশের লোকেরা রৌদ্রে-পোড়া ইঁট ব্যবহার করতো। এই পোড়া ইটের ব্যবহারেও মোহেঞ্জোদড়োর উন্নততম সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষ্য করার বিষয় যে সাধারণ ব্যবহারের গৃহগুলি ছাড়া কোন গৃহের মুখই রাজপথের দিকে ছিল না। গলির মধ্যে গৃহপ্রবেশের দ্বার ছিল। প্রত্যেক গৃহেই কূয়ার ব্যবস্থা ছিল বলে মনে হয়। কূয়ার গঠনপ্রণালী মনকে অত্যন্ত বিস্মিত করে।

চারিপাশের অপরিষ্কার জল যাতে কূয়ার ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্যে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চারপাশের দেয়াল পাকা ইটে গেঁথে তোলা হ'ত।

গৃহগুলি সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ—১। বাস-গৃহ, ২। দেবালয়, ৩। সাধারণের স্নানাগার। বাসগৃহের দেয়াল-গুলি খুব পুরু ছিল, সম্ভবত গৃহগুলির দ্বিতল বা ত্রিতলও ছিল। গহগুলির প্রধান আকর্ষণীয় জিনিস হচ্ছে "নীরেট ঘর" বা Solid Room। এ ঘরগুলির উচ্চতা প্রায় দোতলার মত। কিন্তু ভিত্তিটা আগাগোড়া নীরেট ইটের। সম্ভবত বন্যার প্রকোপ



ব্রোঞ্জ নির্মিত কর্নোলিয়ানের নেক্‌লেস

থেকে বাঁচবার জন্যেই গৃহের অধিবাসীরা ওই ঘরগুলির সৃষ্টি করেছিল।

দেবালয় হিসাবে যেগুলি বলা যায় সেগুলি অনেকটা আধুনিক গৌরীপট্টের মত। এখানে প্রথমেই চোখে পড়ে, একটা মন্দিরের বিরাট ধ্বংসাবশেষ। বহুশতবর্ষ আগে কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক এখানে এক বিরাট বৌদ্ধস্তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এখন সেই বৌদ্ধ-স্তূপ বহু পরিমাণে ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও এখনো এই স্তূপ বহুদূর থেকে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মোহেঞ্জোদড়োর সাধারণ স্নানাগারগুলি অত্যন্ত সুন্দর। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে স্নানাগারটি আবিষ্কৃত হয়েছে সেটি আধুনিক সভ্যজগতের বিস্ময়ের বস্তু।

স্নানাগারটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৬ হাত ও প্রস্থে প্রায় ১৫½ হাত। স্নানাগারটির মধ্যে প্রাঙ্গণ ও সন্তরণবাপী আছে। এর পাশেই জল গরম করবার বন্দোবস্তও ছিল এবং নিকটবর্তী প্রকাণ্ড কূপ হতেই স্নানাগারের জল সরবরাহ করা হ'ত। অপরিষ্কার জল নিকাশের জন্য প্রশস্ত পয়ঃপ্রণালী আছে। স্নানাগারের চারপাশের অট্টালিকাগুলিকে দেবালয় বলে অনুমিত হয়।

শারীরিক পরিচ্ছন্নতা এ দেশের বিশেষ প্রিয় ছিল। সমস্ত গৃহেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার আদর ছিল। কাঁচা পাইপের সাহায্যে গৃহের অপরিষ্কৃত জল বাইরের রাস্তায় এসে পড়তো এবং সুন্দর প্রশস্ত রাজপথগুলির দুপাশে অবস্থিত পাকা পয়ঃপ্রণালীর ভিতর দিয়ে সে জলগুলি যাবার ব্যবস্থা ছিল।

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পয়ঃপ্রণালীগুলির উপরে আধুনিক কালের মত আবরণ থাকত। এইজন্য অধিবাসীদের স্বাস্থ্যহানির কোনও সম্ভাবনা ছিল না। ইট অথবা পাথরের স্বারা এই আবরণ সৃষ্টি করা হ'ত এবং অতি সহজেই পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার করা যেত।

এইবার শহরের কথা বাদ দিয়ে তার অধিবাসীদের কথা আলোচনা করা যাক। পোষাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে বলতে গেলে দেখা যায় যে, মোহেঞ্জোদড়োর অধিবাসীরা সুতার কাপড় ব্যবহার করতে জানতো। মোহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত মূর্তিগুলি থেকে কাপড় পরার নমুনা খুব ভাল করে বোঝা না গেলেও কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। পুরুষেরা বাঁ কাঁধের উপর বেষ্টন



জল প্রণালী

করে ডানহাতের নীচে দিয়ে উত্তরীয় ব্যবহার করতো। পরবর্তী বৌদ্ধযুগে এই প্রকার উত্তরীয় ব্যবহারের নমুনা প্রচুরভাবে দেখতে পাওয়া যায়। পোড়ামাটির (terracotta) পুরুষ মূর্তিগুলি মস্তকাভরণ ও অন্যান্য সামান্য অলংকার ভিন্ন সাধারণত নগ্ন। পোড়ামাটির স্ত্রী মূর্তি, মাতৃকামূর্তি কিংবা শক্তিময়ী মাতৃদেবীর প্রতীক্। মোহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পাতে অসংখ্য মৃন্ময়ী মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি যে মাতৃকামূর্তি কিংবা মাতৃকাস্থানীয় অন্য কোনও প্রতিমূর্তি, সেটা অনুমান করা যেতে পারে। কারণ, ভারতবর্ষে মাতৃকামূর্তির পূজা যেরূপ প্রাচীন, পৃথিবীর অন্যত্র তেমন দেখা যায় না। এর থেকে আমরা তৎকালীন সমাজে মাতৃজাতির প্রাধান্য সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারি। এই সব মাতৃকামূর্তির পরিচ্ছদ হিসাবে যা দেখতে পাই, তাকে আধুনিক 'স্কার্টের' সাথে বেশ তুলনা করা যেতে পারে। মাতৃকামূর্তি ভিন্ন আর একপ্রকার নারীমূর্তি পাওয়া গেছে, সেগুলিকে নর্তকী মূর্তি বলে মনে হয়। এই সব মূর্তি ব্রোঞ্জ নির্মিত। নানাপ্রকার অলংকারভূষিতা হ'লেও মূর্তিগুলি নগ্ন। এই সকল মূর্তি ভিন্ন অন্যান্য যে সব মূর্তি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে 'লাইম স্টোনের' একটি মূর্তি উল্লেখযোগ্য। একে কোন যোগীর প্রতিমূর্তি বলে মনে হয়।

একাগ্র চিন্তায় সমস্ত মুখখানি উদ্ভাসিত এবং একটি সুন্দর আত্মস্থ ভাব এর চোখের অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে প্রকাশ পেয়েছে। মূর্তিটির আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য জিনিস এর পরিচ্ছদটি। যতদূর বোঝা যায়, পরিচ্ছদটি সুদৃশ্য ডিজাইনে খচিত। মূর্তিটি মোহেঞ্জোদড়ো আর্টের একটি বিশিষ্ট ধারা প্রকাশ করে। মোহেঞ্জোদড়োর নরনারী উভয়েই সুচারুরূপে কেশবিন্যাসে দক্ষ ছিল। দীর্ঘ কেশরাজি দিয়ে সাধারণত সুন্দর খোঁপা বাঁধত। মাথার সামনে সুতা ও স্বর্ণের বেষ্টনী দেখতে পাওয়া যায়। এই রকম "বেষ্টনী" বোধ হয় মোহেঞ্জোদড়োতেই প্রথম পাই। আজকালকার সিঁথি, জাল (net) প্রভৃতি জিনিসগুলি ওই 'স্বর্ণ বেষ্টনীর'ই অপভ্রংশ, একথা বললে বিশেষ ভুল হবে না বোধ হয়। আবার দীর্ঘ কেশরাশিকে ঘাড়ের পরে অনেকটা টুপির মত সাজিয়ে খোঁপা বাঁধার রীতিও পোড়ামাটির পুতুলে দেখতে পাওয়া যায়। নর্তকী মূর্তিতে চুলের শিথিল কবরী বিন্যাসের নিদর্শনও পাই।

গহনা চিরকালই সবদেশে নারীদের বিশেষ আদরের সামগ্রী। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মোহেঞ্জোদড়োতেও তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি। বহু প্রকার গহনার প্রাচুর্যে আমরা সিন্ধুতীরবাসীদের অলংকার বিলাসের নমুনা দেখতে পাই। স্ত্রী, পুরুষ, সকলেই গহনা ব্যবহার করত। স্বর্ণ, রৌপ্য, গজদন্ত, মূল্যবান পাথর প্রভৃতি স্বারা সাধারণত ধনী লোকেদের গহনা তৈয়ারী হ'ত। দরিদ্ররা শাঁখা, হাড়, তামা, ব্রোঞ্জ ও পোড়ামাটির গহনা ব্যবহার করত। অলংকারের মধ্যে সোনার নেকলেস, বলয়, দুল বা কানবালা, মাথার বন্ধনী, চূড়া প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেখলাগুলিতে মালার লহর থাকত। ঐ লহরগুলি তামা কিম্বা ব্রোঞ্জের সরু তারের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করানো হ'ত। উভয় সীমান্তে দুটি মুখসাজ থাকত। কণ্ঠহারের অসংখ্য ছিন্নমালা পাওয়া গেছে। উজ্জ্বল মূল্যবান পাথরের তৈয়ারী যথেষ্ট হারও আবিষ্কৃত হয়েছে। বলয় সাধারণত বামহাতেই প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হত'। নর্তকী মূর্তিটি থেকে তার প্রমাণ আমরা পাই। আধুনিক কালে গুজরাট ও রাজপুতনায় এই রকম বলয় ব্যবহারের প্রথা দেখা যায়।

গৃহস্থালীর জন্যে যে যে জিনিস আজকাল আমাদের দরকার হয়, সে সবই মোহেঞ্জোদড়োতে পাওয়া গেছে। থালা, ঘটি, বাটি, শিলনোড়া, যাঁতা প্রভৃতি বেশীর ভাগ মাটী বা পাথর দিয়া তৈয়ারী হ'ত; করাত, ক্ষুর, কাস্তে ও মাছ ধরিবার ব'ড়শীর জন্য তামা ব্যবহৃত হ'ত। অস্ত্রশস্ত্রাদির মধ্যে নানাপ্রকার কুঠার, বর্শা, খড়্গ, তীর, ধনুক প্রভৃতি পাওয়া গেছে।

চিত্রকলায় মোহেঞ্জোদড়োর স্থান প্রাচীন জগতের ইতিহাসে অতি উচ্চে। মোহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় পোড়ামাটির পাত্রগুলি অত্যন্ত মসৃণ। এই সকল পাত্রের গায়ে লালের উপর কাল রংয়ের জ্যামিতিক চিত্রসমূহ বিশ্বের বিস্ময় সৃষ্টি করে। উল্লিখিত চিত্রসমূহের মধ্যে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বলয়, চিরুণী, মৎস্য, বৃক্ষ, লতাপাতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বহুবর্ণবিশিষ্ট মৃৎপাত্রে বর্ণ সমাবেশ অত্যন্ত সুন্দর।

মোহেঞ্জোদড়োর Glazed Pottery অর্থাৎ কাচের মত মসৃণ পাত্র জগতের ইতিহাসে নূতন। মাটী পুড়িয়ে কাচের মত ক'রে বর্ণবিন্যাসপ্রণালী সেই যুগের পৃথিবীর অন্য কোনও জাতি জ্ঞাত ছিল না। কাজেই মোহেঞ্জোদড়ো সভ্যতা বৈজ্ঞানিকগণের মতে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন।

(শেষাংশ ২৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ছদ্মবেশী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৫

পরদিন প্রাতে প্রশান্ত, লাবণ্য ও দীপুকে লইয়া অবনীশ যথাসময়ে স্টেশনে উপস্থিত হইল। শোফারের পরিচ্ছদে সে সজ্জিত হইয়া গিয়াছিল সে কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য।

গাড়ির কাছে রহিল অবনীশ ও একজন ভৃত্য। লাবণ্য ও দীপুকে লইয়া প্রশান্ত প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিল। মিনিট দশেকের মধ্যে আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস আসিয়া পড়িল। একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে সুলেখা মুখ বাড়াইয়া ছিল, প্রশান্তদের দেখিতে পাইয়া আনন্দে হাত নাড়িতে লাগিল।

এলাহাবাদে নামিয়া স্নানাহার সারিয়া ঘণ্টা দুই আড়াই পরে দিল্লী মেলে দিল্লী যাইবার জন্য প্রশান্ত শশাঙ্ককে অনুরোধ করিল, কিন্তু সময়াভাব বশত শশাঙ্ক কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইল না।

সুলেখা বলিল, "কাজ নেই জামাইবাবু, অত্যন্ত জরুরি কাজে ঠাকুরপো যাচ্ছেন, কোনো কারণে দেরি হয়ে গেলে ভারি অসুবিধায় পড়তে হবে।"

এ কথার পর আর পীড়াপীড়ি না করিয়া প্রশান্ত কুলির মাথায় জিনিসপত্র চড়াইয়া সুলেখা প্রভৃতিকে লইয়া প্ল্যাটফর্ম হইতে বাহির হইয়া আসিল।

প্ল্যাটফর্মের বাহিরে আসিলেই অবনীশের সাক্ষাৎ লাভ করিবে সুলতা তাহা জানিত। ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালিত করিতেই দেখিতে পাইল, দূরে একটা বৃহৎ মোটরের সম্মুখে ড্রাইভারের ইউনিফর্ম পরিয়া মাথায় টুপি দিয়া অবনীশ খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিবা মাত্র এত শীতেও তাহার কান দুইটা গরম হইয়া উঠিল এবং বুকের ভিতর ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল।

সুলেখার মনে হইল, এই নূতন পরিবেশের মধ্যে অভিনব বেশে সজ্জিত অবনীশ শুধু যেন তাহার নববিবাহিত স্বামীই নহে; এলাহাবাদ স্টেশনে এই মুহূর্তে যে বিচিত্র এবং কঠিন নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের পটোত্তোলন হইল, অভিনয়-সজ্জায় সজ্জিত অবনীশ যেন তাহার নায়করূপে নায়িকার সহিত প্রথম সংঘর্ষ প্রত্যাশায় দৃশ্যভূমির উপর স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। নায়কের এই কঠিন কঠোর ভঙ্গী দেখিয়া অভিনয়-শঙ্কিতা নায়িকার দুর্বল হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠিল।

সুলেখা বুঝিতে পারিল, এই উত্তেজনা হইতে মনকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে না পারিলে অবনীশের আশঙ্কাই সত্য দাঁড়াইবে,—অভিনয় পণ্ড হইবে। যথাসাধ্য চিত্তদমন করিয়া সে মোটরের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু মোটরের সম্মুখে আসিবামাত্র অবনীশ যখন সামরিক কায়দায় তাহাকে স্যালিউট করিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল, তখন চিত্তনিরোধ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও সুলেখার মুখ জবাফুলের মত আরক্ত হইয়া উঠিল।

অবনীশের প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিতে তাহার চোখের মধ্যে নিঃশব্দ শাসনের মৃদু ভ্রূকুটি নিরীক্ষণ করিয়া সুলেখা কোনরূপে তাহার নিজ অংশের প্রথম পাঠ আবৃত্তি করিল। বলিল, "গৌরহরিবাবু না?"

স্মিতমুখে অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ সুলেখা দেবী—আমি গৌরহরি।"

প্রশান্ত এবং লাবণ্যর দৃষ্টি হইতে নিজের মুখকে লুকাইবার জন্য তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠিতে উঠিতে সুলেখা বলিল, "এখানে আপনি কবে এলেন?"

অবনীশ বলিল, "মাত্র দিন চারেক হ'ল এসেছি। আপনার দাদাই ত ঘোষ সাহেবের ড্রাইভার ক'রে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।"

এ কথার আর কোন উত্তর না দিয়া সুলেখা নিঃশব্দে গাড়ির এক কোণে বসিয়া পড়িল।

দীপালিকে লইয়া গাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া সুলেখার পার্শ্বে বসিয়া লাবণ্য সুলেখার কানে কানে মৃদুস্বরে বলিল, "গাড়ি চালায় চমৎকার।"

সুলেখাও তেমনি মৃদুস্বরে বলিল, "হ্যাঁ, জানি। খুব ভাল ড্রাইভার।"

একটা ঠিকা গাড়িতে সুলেখার দ্রব্যাদি চড়াইয়া বেয়ারার সহিত রওনা করাইয়া দিয়া প্রশান্ত মোটরের সম্মুখের সীটে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "চল।"

মোটর গৃহাভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

৬

বেলা তখন তিনটা। একতলার পশ্চিম দিকের বারান্দায় বসিয়া লাবণ্য সুলেখার নিকট হইতে তাহার বিবাহের গল্প শুনিতেছিল। লাবণ্যর পুত্র জয়ন্ত এবং কন্যা দীপালি স্কুলে গিয়াছে; বেলা সাড়ে চারটার সময়ে তাহারা নিজ নিজ বাসগৃহে ফিরিবে।

সুলেখা বলিল, "তোমার ড্রাইভার আসছে দিদি।"

"কে? মোসাহেব?"

"না, পার্শ্বচর; জামাইবাবুর বিজিগীষা।" বলিয়া সুলেখা হাসিতে লাগিল।

স্মিতমুখে লাবণ্য বলিল, "ও? গৌরহরি?—তখন ত' তোকে পুরোপুরি এক ঘণ্টা বকিয়েছে; আবার বকাতে আসছে না কি?"

সুলেখা বলিল, "কি জানি দিদি। ওর কার্ত্তিক মামার খবর নেওয়া আর শেষ হয় না কিছুতেই।"

লাবণ্য বলিল, "কার্ত্তিক মামার কথা আর কটা জিজ্ঞাসা করে?—খালি ত' বাজে ফোক্কড়িই করে। শুধু কথা চালাবার

জন্যে মাঝে মাঝে এক-আধবার কার্ত্তিক মামার কথা তোলে।"

সুলেখা হাসিমুখে বলিল, "একটু ফোক্কড় আছে,—না দিদি?"

"একটু না, বিলক্ষণ। উনি বিজিগীষা আর গাড়ি চালানোয় এমন মজে গেছেন যে, ঠিক গোলাপ ফুলের কাঁটার মতো ওর ফোক্কড়ি সহ্য করেন।"

লাবণ্যর কথা শুনিয়া পুলকিত হইয়া সুলেখা হাসিতে লাগিল।

নিকটে আসিয়া লাবণ্যর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অবনীশ বলিল, "হাইকোর্টে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি মেমসায়েব।"

লাবণ্য বলিল, "এই ত সবে তিনটে বাজল, এরি মধ্যে কেন?"

অবনীশ বলিল, "আজ সায়েব সকাল সকাল ফিরবেন,—আমাকে তিনটের আগেই যেতে বলে দিয়েছেন।"

লাবণ্য বলিল, "তা হলে যাও।"

সুলেখার প্রতি অবনীশ ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল।

সুলেখা বলিল, "চল না দিদি, আমরা দুজনেও যাই। খানিকটা বেড়িয়ে আসাও যাবে, জামাইবাবুকে নিয়ে আসাও হবে।"

সুলেখার বিবাহের গল্পে লাবণ্য এরূপ মগ্ন হইয়া গিয়াছিল যে, তাহা ছাড়িয়া হাইকোর্টে বেড়াইতে যাওয়ার প্রস্তাব তাহার একেবারেই ভাল লাগিল না; বলিল, "না, না, তুই গল্প কর। এখন কোথাও যেতে হবে না। উনি এলে চা-টা খেয়ে বেড়াতে যাওয়া যাবে অখন।"

বিনীত কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "অপরাধ যদি না নেন মেমসাহেব, তা হলে কিছু নিবেদন করি।"

সকৌতুহলে লাবণ্য বলিল, "কি?"

"এখন গেলে কিন্তু ভাল দেখাত।"

ঈষৎ উগ্র স্বরে লাবণ্য বলিল, "কেন?"

"সুলেখা দেবীর খাতিরে সায়েব যখন আজ সকাল সকাল বাড়ি আসছেন, তখন সুলেখা দেবী এগিয়ে গিয়ে তাঁকে নিয়ে এলে একটু ভাল দেখাত বই কি মেমসায়েব।"

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "কেন? সুলেখা দেবীর পক্ষ থেকে তা' হলে পাল্টা খাতির দেখানো হত বলে?"

প্রফুল্ল মুখে অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে ঠিক তাই মেম-সায়েব, পাল্টা-খাতির দেখানো হত বলে।"

দৃঢ় স্বরে লাবণ্য বলিল, "কিচ্ছু তার দরকার নেই। এলাহাবাদে শুধু এসে সুলেখা দেবী সায়েবকে যে খাতির দেখিয়েছেন, তার পাল্টা খাতির দেখাতে সায়েব সকাল সকাল বাড়ি আসছেন। আর এলাহাবাদে সুলেখা দেবী দয়া করে যতদিন থাকবেন ততদিন সায়েবই সুলেখা দেবীকে নানাভাবে পাল্টা খাতির দেখাবেন। বুঝলে?"

তৎপরতার সহিত মাথা নাড়িয়া অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ মেমসায়েব,—জলের মত।"

উত্তর শুনিয়া লাবণ্যর দুই চক্ষু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

সাহাস্যমুখে সুলেখা বলিল, "পাল্টা খাতিরের কথা অবশ্য কিছু নয়; কিন্তু, দিদি, শালী গিয়ে এগিয়ে নিয়ে এলে ভগ্নীপতি একটু খুসি হন, তা নিশ্চয়।"

টপ করিয়া অবনীশ বলিল, "অন্তত আমি ত হই। গরিব হলেও আমাদেরও ত' শালী শালাজ আছে, আমরাও ত' খানিকটা বুঝি।"

অবনীশের অনধিকার চর্চার দুঃসাহস এবং বিস্তার দেখিয়া লাবণ্য কি বলিবে হয়ত' ভাবিয়া পাইতেছিল না, তাহার সেই বিহ্বলতার মধ্যেই সুলেখা কথা আরম্ভ করিয়া দিল। বলিল, "আপনার আবার শালী শালাজ কোথায়? আপনার ত' এখনো বিয়েই হয়নি।"

মৃদুভাবে ঘাড় নাড়িয়া অবনীশ বলিল, "হয়েছে বই কি সুলেখা দেবী, হয়েছে।"

সুলেখার মুখে একটা রুদ্ধ হাস্যের ক্ষীণ আভা ফুটিয়া উঠিল। পর মুহূর্তেই মুখ গম্ভীর করিয়া লইয়া একটু চিন্তা করিবার ভান করিয়া বলিল, "কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ছে গৌরহরিবাবু, আমার পাকা দেখার কিছু আগেও শুনেছিলাম বাবার সদর মুহুরী রামগোপাল বাবুর সেজ মেয়ের সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা হচ্ছে। মেয়েটির বাঁ পা একটু খোঁড়া বলে আপনি রাজি হচ্ছিলেন না। আমার পাকা দেখার সময়েও আপনার বিয়ে হয়নি, এ কথা আমার বেশ মনে পড়ছে।"

অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে ঠিকই মনে পড়ছে সুলেখা দেবী, পরে হয়েছে।"

সুলেখার কঠিন জেরার উত্তরে বাচাল অবনীশের কি বলিবার আছে শুনিবার জন্য লাবণ্য সরোষে অপেক্ষা করিয়া ছিল; অবনীশের উত্তর শুনিয়া ফোঁস করিয়া উঠিয়া সে বলিল, "অমনি পরে হল?" অবনীশের বিবাহের কাহিনী যে কথা চালাইবার জন্য ষোল আনা বাজে কথা, সে বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না।

লাবণ্যর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া কাঁচুমাচু মুখে অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে হল বই কি মেমসায়েব,—না-ই যদি হবে, তা হলে হ'ল কেমন করে বলুন?"

রুষ্ট কণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "না হলে যেমন করে হয় না, তেমনি করেই হল না।"

মুখের ভাব যথাসাধ্য করুণ করিয়া অবনীশ বলিল, "তা হলে হয়নি-ই ধরা যাক। আপনারা হলেন মনিব, আপনাদের ওপর কথা কওয়া কি আমার মতো ড্রাইভার মানুষের চলে!"

লাবণ্য বলিল, "সেইটেই ত' তোমার বেশি চলে দেখতে পাই। তুমি বেশি কথা বল; আর, বেশি কথা বল ব'লে বাজে কথা বল। এ তুমি অস্বীকার করতে পার না গৌরহরি।"

দীন নেত্রে লাবণ্যর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অবনীশ বলিল, "এ আমি অস্বীকার করছিনে, স্বীকারই করছি। আমার স্বভাবে ঐ একটিমাত্র দোষ আছে। কিন্তু চাঁদেও ত কলঙ্ক আছে মেমসায়েব?"

উপমার চটক দেখিয়া কুপিতা মেমসাহেবেরও মুখ নিরুদ্ধ হাস্যে লাল হইয়া উঠিল।

সুলেখা এতক্ষণ নিঃশব্দে হাসিতেছিল; এবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আর, গোলাপেও ত' কাঁটা আছে!"

সুলেখার উপমা শুনিয়া এবং হাসি দেখিয়া লাবণ্য আর সামলাইয়া থাকিতে পারিল না; মুখে অঞ্চল দিয়া সে-ও হাসিতে লাগিল।

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া নিরতিশয় কাতর কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "প্রাণে বড় আঘাত পেলাম মেমসায়েব! আমি গরিব বলে আপনারা আমাকে এইরকম করে অবজ্ঞা করছেন। কিন্তু হরিপদবাবু আমাকে ঠিক আত্মীয়ের মতো যত্ন করেন।" তাহার পর সুলেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "করেন কি-না আপনিই বলুন না সুলেখা দেবী, আপনি ত' স্বচক্ষে দেখেছেন। আর করবেনই বা না কেন? ড্রাইভার বলে ত আর সত্যিসত্যি নীচ জাত নই, আপনাদের স্বজাতিই ত' বটি। দু-চার মিনিট খোঁজ তল্লাস করলে চাই-কি একটা সম্পর্কও বেরিয়ে যেতে পারে। এখানেও শেষ পর্যন্ত আত্মীয়ের মতো ব্যবহার পাব সে ভরসা হরিপদবাবু না দিলে আমি কিছুতেই আত্মীয়-বন্ধু ছেড়ে এই বিদেশে আসতাম না।"

অবনীশের এই কাতরোক্তি শুনিয়া ঈষৎ অনুতপ্ত-কণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "কিন্তু তুমি ত' নিজের দোষেই সে ব্যবহার পাচ্ছ না গৌরহরি। আমরা তোমাকে অবজ্ঞাও করিনে, ড্রাইভার বলে নীচও ভাবিনে। কিন্তু তুমি থেকে থেকে আমাদের কথার মধ্যে টিপ্পনী কাটো, এ তোমার একটা বিশ্রী দোষ।"

অবনীশ বলিল, "অস্বীকার করছিনে মেমসায়েব, এ দোষও আমার আছে। অন্যায় কথা শুনলে আমি টিপ্পনি না কেটে থাকতে পারিনে।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া লাবণ্য বলিল, "তুমি তা হলে বলতে চাও যে, আমরা অন্যায় কথা বলে থাকি?"

সচকিতে মাথা নাড়িয়া অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে না!"

"তবে?"

"আজ্ঞে, তবে কিছুই না।"

পুনরায় খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া সুলেখা বলিল, "কিছুই যদি না, তা হ'লে চলুন গৌরহরিবাবু, জামাইবাবুকে নিয়ে আসাই যাক।" বলিয়া লাবণ্যর দিকে চাহিয়া বলিল, "যাবে দিদি? এইত এক্ষণি ফিরে আসব। যাবে?"

লাবণ্য বলিল, "আমার এখন যাবার সময় নেই। তোমার যখন অত ইচ্ছে তখন যাও। কিন্তু কাপড় বদলাবি নে?"

সুলেখা বলিল, "গাড়ি থেকে যখন নাববই না, তখন শুধু শুধু কাপড় বদলাতে যাব কেন? তা ছাড়া, যা পরে আছি তাও ত' যথেষ্টই ভাল।"

কপট ক্ষোভের বিমর্ষ কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "আমি গাড়ি বার করে গাড়িবারান্দায় এনে হর্ণ দিলে আপনি ওদিকে যাবেন।"

সুলেখা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, না, আবার মিছিমিছি এদিকে গাড়ি আনবেন কেন? চলুন, আমি আপনার সঙ্গে গ্যারেজে যাচ্ছি, ঐখানে উঠে একেবারে ঐ দিক দিয়ে বেরিয়ে গেলেই হবে।"

"আচ্ছা, তা হলে তাই আসুন।" বলিয়া অবনীশ অগ্রসর হইল।

লাবণ্য লক্ষ্য করিতে লাগিল, অবনীশ ও সুলেখা পাশাপাশি চলিতে চলিতে গ্যারেজের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার পর অবনীশ গ্যারেজ হইতে গাড়ি বাহির করিয়া গ্যারেজের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া সুলেখাকে গাড়িতে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। (ক্রমশ)

প্রাচীন সভ্যতার এক অধ্যায়

(২৩২ পৃষ্ঠার পর)

এত বড় একটা সুসভ্য জাতির শিশুদের জন্য খেলনার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই ছিল। মোহেঞ্জোদড়োতে শিশুদের খেলনাসমূহ সত্যই মনে শ্রদ্ধা আনে। ঝুমঝুমি, বাঁশি, পাখির খাঁচা, গাড়ি, পশুপক্ষী, পুতুল প্রভৃতি জিনিস উল্লেখযোগ্য। এই সব জিনিস সিন্ধুবাসীদের মার্জিত রুচির পরিচায়ক।

ধর্মের দিক দিয়ে দেখতে গেলে দেখা যায়, মোহেঞ্জোদড়ো শাক্ত ধর্মের উপাসক ছিল। পূর্বোল্লিখিত মাতৃকাপূজার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লিঙ্গপূজাও প্রচলিত ছিল। বৃক্ষোপাসনা, নাগপূজা, বিভিন্ন জীবজন্তুতে দেবত্ব আরোপ প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়।

সিন্ধুপত্যকায় মৃতের সমাধি প্রধানত তিন প্রকারের ছিল। ১। পূর্ণ সমাধি; ২। আংশিক সমাধি; ৩। দাহান্তর সমাধি। মোহেঞ্জোদড়োতে শেষোক্ত দুই প্রকারের সমাধির প্রচুর নিদর্শন বর্তমান আছে।

এইটুকুই হ'ল মোহেঞ্জোদড়োর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা। প্রাগৈতিহাসিক ভারতবাসী বেলুচিস্তান, পারস্য ও মেসোপটেমিয়ার অতি প্রাচীন সুসভ্য জাতিদের সঙ্গে যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের একসূত্রে আবদ্ধ ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ, মোহেঞ্জোদড়ো হ'তে সিন্ধু প্রদেশে ও বেলুচিস্তানের সীমা পর্যন্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু স্তূপ ও সুদীর্ঘ পথ বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ননীগোপাল মজুমদার আবিষ্কার করেছিলেন। মোহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার প্রত্যেক দিক বা অঙ্গ সুন্দরভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। নাগরিক ও সামাজিক জীবনেরও প্রত্যেক অংশ সম্পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করেছিল। সিন্ধু-সভ্যতাকে তৎকালীন সভ্যতার চরম বিকাশ বলা যেতে পারে। কাজেই এটা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, এই পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার পশ্চাতে বহু শত বর্ষের সাধনা রয়েছে, হয়তো বা কোনদিন অপ্রত্যাশিতরূপে সেই অতীতের রহস্য উদ্ঘাটিত হবে এবং মানবের ধারাবাহিক উন্নতির ক্রমপর্যায়ের ইতিহাসে আরও পৃষ্ঠা সংযোজিত হ'বে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

একটি প্রবচন আছে, "জন্মনাজায়তে শূদ্র সংস্কারাদ্‌দ্বিজমুচ্যতে" অর্থাৎ মানুষমাত্রেই শূদ্রত্বে জন্মলাভ ক'রে সংস্কারের প্রসাদে দ্বিজত্ব লাভ করে। মৌল মানবত্ব হচ্ছে এই শূদ্রত্ব। এই নিম্নস্তরে মানুষে মানুষে বড় একটা পার্থক্য নেই। তারপর মানুষ এই জীবনেই জন্মান্তর লাভ করে সংস্কারের ভিতর দিয়ে। সংস্কার কথাটি বিবিধ কর্মানুষ্ঠান জানিত শুদ্ধি ও ব্যুৎপত্তি অর্থে যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি আবার পূর্ব-কর্মজবাসনা ও জ্ঞান যখন অজ্ঞাতসারে স্বাভাবিক মনো-বৃত্তিতে পরিণত হয় তখনও তাকে বলি সংস্কার। এই সংস্কার মানুষকে বৈশিষ্ট্য দান করে। আদিম মানব-সন্তান তখন আপনাকে অপরাপর থেকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখে। এই পার্থক্যবোধে সে যখন দানা বেঁধে ওঠে, তখন স্বগোষ্ঠির মধ্যেই ভেদবুদ্ধিতে দ্বিজত্বে উপনীত হয়। প্রাণীজগতে মৌলিক সৃষ্টি এমনি ক'রেই বোধ করি পরিস্থিতির প্রভাবের যোগফলটিকে ব্যক্তিত্বের মধ্যে বংশপরম্পরায় রক্ষা ক'রে নানা উদ্ভিজ্জে ও জীবজন্তুতে বিচিত্র হয়ে উঠেছে। এই আপাত-বিভেদকে আবার পুনর্মিলিত করতে চায় মানুষের প্রেম। পারিপার্শ্বিকের প্ররোচনায় অধুনা যেখানে স্বাতন্ত্র ও সংগ্রাম, আগামীকালে সেখানে দেখি সহযোগ ও পরস্পরের বিভিন্ন সম্পদের বিনিময়। কেন এ কথাগুলি এখানে বলছি, সেটা প্রকাশ করেই বলি।

মহাত্মা রামমোহন এই বাঙলা দেশে তাঁর সহজাত ও সমকালজাত সংস্কারের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন মানুষের আদিম বর্ণাশ্রমে। প্রতীকোপাসনার দেশে প্রবর্তিত করতে চাইলেন তাঁর নবসংস্কারলব্ধ অমূর্ত ব্রহ্মোপাসনা। বাধল দ্বন্দ্ব। তিন পুরুষ কেটে গেছে তারপর। সত্যের স্ববিরোধী নানারূপ আমাদের অপূর্ণ দৃষ্টিতে। একটি সত্যের আপাত-দৈন্যের বিরুদ্ধে জাগে প্রতিবাদাত্মক সত্যের ঘোষণা। কিন্তু তারও থাকে সঙ্কীর্ণতার, খণ্ডতার ক্ষুদ্রতা আমাদের অদূরদর্শী দর্শনের চৌহদ্দির মধ্যে। শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব নিয়ে একটি উদ্ভট শ্লোক মনে আসছে—

"উভয়ো প্রকৃতিস্তেকা প্রত্যয়ভেদাদ্‌ বিভিন্ন বদ্ভাতি।
কলয়তি কশ্চিন্মূঢ়ো হরিহর ভেদং বিনা শাস্ত্রম্‌॥"

হৃ ধাতু বা প্রকৃতির থেকেই বিভিন্ন প্রত্যয়ে হরি ও হর এই দুটি শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়েছে। উভয়ের প্রকৃতিগত অভিন্নতা ভুলে গিয়ে প্রত্যয় বিকল্পে অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বৈষ্ণব শাক্তে বাধে যুদ্ধ। আজ যেখানে সংগ্রাম, কাল সেখানে সন্ধি। দুটি বিরুদ্ধমতের সমন্বয় আনে উত্তরকাল। আজ আমাদের দেশে এই সমন্বয়ের যুগ এসেছে—যুক্তিতর্কের ব্যর্থ আস্ফালনের মধ্যে নয়, বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করে প্রেমের মৈত্রী বন্ধনে। আমরা সকলেই ত্রিলোচন। আমাদের তৃতীয় নেত্রটি যখন নিমীলিত থাকে, তখন পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যকেই বড় ক'রে দেখি। যখন সে চক্ষু উন্মীলিত হয়, তখন সুস্পষ্ট হয় আমাদের অন্তর্জ্ঞাতিত্ব তখন আমরা মিলিতকণ্ঠে গেয়ে উঠি—

"মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
(ওরে) ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে?"

গত পঞ্চাশ বৎসরে সরস্বতী মূর্তির স্থাপত্যে যে অপূর্ব পরিবর্তন এসেছে, ইউরোপ হলে এর ক্রমবিবর্তনের ধারাবাহিক চিত্রাবলী অঙ্কিত দেখতে পেতাম ছবির বইয়ের পাতায় পাতায়। মানসী প্রতিমাকে রূপ দেন শিল্পী। শিল্পীর মনে সমসাময়িক প্রভাব তার ছায়াঙ্কপাত করে। তার নিদর্শন আজ আমরা লক্ষ্য করছি বিচিত্র দেবীপ্রতিমার নব্য রূপায়নে। কবিতায় বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে কি পরিবর্তন ঘটেছে, তার প্রতিলিপি ত আমাদের ঘরে ঘরেই আছে। সম্প্রতি কাব্যলক্ষ্মীর যে রূপান্তর দেখছি, সেটা সকৌতুকে লক্ষ্য করবার জিনিস। বাঁধভাঙা বন্যাজলের মত পাশ্চাত্যভাব ও চিন্তা আমাদের মনের আনাচে কানাচে ঢুকেছে। তার ফলে এক শ্রেণীর কবিতার আবির্ভাব হয়েছে, যেটা ভাবে ও ভাষায় হয়েছে পশ্চিমের ব্যঙ্গানুকৃতি। স্বীকরণ ও অনুকরণে একটা প্রভেদ আছে। কাব্য বিশ্ব-ভারতীয়। কিন্তু তার প্রকাশ জাতীয় অভিজ্ঞতা অনুভূতি ও রুচিকে আশ্রয় করে যদি না ফুটে ওঠে, তবে আমাদের এই হ্যাট্‌কোটের প্রসাধনের মত নিতান্ত বেখাপ্পা হয়ে ওঠে। খাদ্যটা পরিপাক লাভ করলে দেহের রসরক্তে পরিণত হয়ে আমাদের স্বাস্থ্যে, শক্তিতে ও মুখশ্রীতে প্রকটিত হয়। অন্যথা অজীর্ণ উদ্গারে উদরস্থ আহারটা ভুক্তবিকারের একটা দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। যা বলি, যা লিখি, সেটা যে উপলব্ধিগত আত্মোক্তি নয়, এরূপ লক্ষণ উৎপাদন করে কর্মপীড়া। তাই মনে পড়ে গ্যেটের সেই সাবধান বাণী তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশে—(অন্তর্গূঢ় অনুভূতি) ও জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে যা লাভ কর নি, সেটা পরের কথার ছন্দানুবর্তী হয়ে বলতে চেষ্টা ক'র না। কাব্যলক্ষ্মীর দুর্গতির কথা স্মরণ করে এক কবি বলেছিলেন—

"বাল্মীকের্জনি প্রকাশিতগুণা ব্যাসেন লীলাবতী
বৈদর্ভীকবিতা স্বয়ং বৃতবতীশ্রীকালিদাসং বরং।
যা সুতামরসিংহশঙ্কুধনিকান্ সেয়ং জরা নীরসা
শূন্যালঙ্করণা স্খলন্ মৃদুপদা কং বাজনং নাশ্রিতা॥"

আদি কবি বাল্মীকির ললাটিকা তনয়া তুমি যে।
শৈশবের খেলাঘরে ব্যাসের ক্রীড়ার সহচরী,
বিকচ যৌবনে কবি কালিদাসে মাল্য দিলে নিজে।

যে তুমি অমরসিংহ শকুনিকেরে কোলে করি
লভেছিলে মাতৃমূর্তি, সেই তুমি জরায় নীরসা
অলঙ্কারহীনা এবে। মৃদুপদে চলিতে চলিতে
পতনে উন্মুখা হও বারংবার হেন দীন দশা!
যারে পাও ধর তুমি তারি হাত নিজেরে রক্ষিতে।

আত্মপ্রকাশের একটা সাঙ্কেতিক উপায় হচ্ছে ভাষা। এই ভাষাকে বাগ্‌বৈদগ্ধে পরিপূর্ণ ক'রে তুলেছে কেবল মানুষ। জীবজগতে কণ্ঠধ্বনির ব্যবহার আছে ভাব ব্যক্ত করবার জন্যে, কিন্তু সে কেবল শব্দের টুক্‌রা মাত্র। ভাষার এই ধারাবাহিক ব্যঞ্জনা ফুটেছে কেবল মানুষের মুখে। শুধু তাই নয়, বাক্যের নিহিতার্থকে আরও স্ফুটতর করবার জন্যে উদ্ভাসিত হয়েছে ছন্দ এবং সুর। সোজা কথায় প্রতিদিনের আটপৌরে ব্যবহার চলে। কিন্তু সূক্ষ্মতম অনুভূতি ও ভাবকে প্রকাশ করবার জন্যে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি আবিষ্কার করেছে ছন্দোবদ্ধ কবিতা ও তান-লয়সম্বলিত সংগীত। জড় জগতের অন্তরালে মানুষের সন্ধানী চক্ষু বিশ্বস্রষ্টাকে অন্বেষণ করেছে। ভারতের প্রাচীন ঋষি জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে যে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁকেই আবার অন্তরে উপলব্ধি ক'রে বলেছেন—

"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দ রূপামৃতং যদ্বিভাতি।"

অর্থাৎ ধীর ব্যক্তিরা বিশিষ্ট জ্ঞানময় দৃষ্টিতে জ্ঞানময় দেবতাকে আনন্দময় অমৃতময় বলিয়া দেখেন। কলাকুশলী, কবি ও শিল্পী অমূর্তকে আকার দান করেন রূপকশ্রীতে। এই কাব্য ও সংগীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর 'বীণাপুস্তক রঞ্জিতহস্তা' মূর্তি কল্পনা করেছে ভক্তের ধ্যানদৃষ্টি। এই মাতৃমূর্তিকে স্মরণ করে এক প্রাচীন কবি বলেছেন,—

"সংগীতং কাব্যশাস্ত্রঞ্চ সরস্বত্যা স্তনদ্বয়ম্।"

বাগ্‌দেবীর একটি স্তন সংগীত, অপরটি কাব্যশাস্ত্র—উভয়েই অমৃতধারা দান করে সন্তানের মুখে।

গত একশ বৎসরের মধ্যে বাঙলা ভাষার উন্নতি বিস্ময়কর। কিন্তু এখনও আমাদের এই মাতৃভাষার অনেক দৈন্য ও অপূর্ণতা আছে। চল্‌তি ভাষা প্রাণের আবেগে আপনার পথ কেটে চলবে। তার জন্যে চাই প্রাণের খোরাক, যা অপর্যাপ্ত পরিমাণেই আসছে পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ যেন সে অনুপাতে দিন দিন বিচ্ছিন্ন হয়েই আসছে। প্রাচীনকে রূপান্তরিত ক'রেই নবীনের উদ্ভব, তাকে বাদ দিয়ে নয়। আজকাল পশ্চিমে Clas-icsএর বিরুদ্ধে একদল মুখর হয়ে উঠেছেন। সেই খেই ধরে আমরাও কেউ কেউ সংস্কৃতকে কোণঠাসা করবার চেষ্টায় আছি। এতে কেবল যে আমাদের ভাষার পরিপুষ্টি শীর্ণতা লাভ করবে শুধু তাই নয়, আর্য সংস্কৃতির মূল সম্পদগুলির থেকেও আমরা ক্রমশ বঞ্চিত হব। বাঙলা অনুবাদের সাহায্যে সংস্কৃত পুঁথিতে প্রবেশ লাভ করতে হলেও দেবভাষার সঙ্গে কতকটা পরিচয় থাকার প্রয়োজন। তদ্‌ভাবে সংস্কৃত ভাষা আমাদের কাছে ল্যাটিন গ্রীকের মতই দুর্বোধ্য হয়ে উঠবে এবং সেই সঙ্গে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের যোগসূত্রটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। জাতীয় জীবনের পক্ষে এটা মারাত্মক বিপত্তি। এ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক না হ'লে আর দু'পুরুষেই আমরা প্রাচ্য সংস্কৃতির উৎসমূল হারাতে বসব। আজ এই বাণী-পূজার দিনে দেবীপ্রতিমান পুঁথিটির দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সে গ্রন্থ দেবভাষায় লিখিত, ইংরাজিতে নয়। তার উপর পাশ্চাত্য পুস্তকের স্তূপ যদি চালান, ক্ষতি নেই। সেটা হবে পাথরে পাঁচ কিল, পাকা বনেদের উপর বিশ্বভারতীয় মন্দির।

নিসর্গ চক্ষু চিকিৎসক। "জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া" অস্ত্রোপচারে চোখের "মতিয়াবিন্দু"টি উৎপাটিত করেন। চশ্‌মা নাকে এঁটে সংসারটাকে আবার নতুন চোখে দেখতে শিখি। এই কৃত্রিম আনুকূল্যে যে দৃষ্টিটা অন্তিমে আমাদের চোখে ফোটে, আগামী যুগে সেইটেই সহজ দৃষ্টি হয়ে উত্তরকালের তরুণদের চোখের আলো হয়। প্রান্তিক যুগ স্বনির্বাচিত উত্তরাধিকারীকে আপনার গদিতে বসিয়ে তবে অবসর গ্রহণ করে। অস্তোন্মুখী যুগান্ত যে কুঙ্কুমরঞ্জনা পশ্চিমাকাশে মাখিয়ে যায়, সেই অরুণরাগই ফুটে ওঠে পূর্বাশার উদয়াচলে। অতীত ও ভবিষ্যের গাঁটছড়া বাঁধা পড়ে এই অধুনার রক্তাম্বরে।

ফুটবল খেলায় পিছনের খেলুড়ে বলটাকে সম্মুখের ঘাঁটিদারের পায়ের কাছে গড়িয়ে দেয়, তার অগ্রসারিণী গতিকে ক্রমপরম্পরায় 'গোলের' লক্ষ্যমুখে প্রধাবিত ক'রে। জাতীয় জীবনে বিবর্তনের এই অগ্রগতিতে সম্মুখ-পশ্চাতের ঐক্যবন্ধন প্রাচীন নবীনের সহযোগিতায় কেবল সম্ভবপর হয়।

জুলে

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ন রায়

(১)

সংসারে এক রকমের লোক আছে যাহারা এই মাটির জগৎটার মোটা মোটা বাস্তবতাগুলির সংগে কিছুতেই আপনাদিগকে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে না। নিজের কল্পনার রঙীন তুলি দিয়া জীবনের প্রারম্ভেই বসবাসের উদ্দেশ্যে তাহারা এমনই এক অবাস্তব জগৎ সৃষ্টি করিয়া রাখে যাহার সংগে পরে আর তাহারা এই আসল জগতের কোনই সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায় না এবং পায় না বলিয়াই শামুকের মত ক্রমশ আপনাদিগকে বহির্জগৎ হইতে গুটাইয়া লইয়া স্বীয় কল্পনাসৃষ্ট অবাস্তব জগতের মধ্যে গিয়া আশ্রয় লয়। ইহারা জীবনে কতটা সুখী হয় বলা যায় না, তবে অপর যাহারই সংস্পর্শে তাহারা আসুক না কেন, তাহাকে যে দলিয়া পিষিয়া একেবারে তাহার সর্বনাশ করিয়া যায় সেকথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

বৈষ্ণবপুরের মনোমোহন চাটুয্যের একমাত্র সন্তান যোগেশ ছিল ঠিক এই প্রকৃতির লোক। মনোমোহনবাবু জমিদারি ও তেজারতি করিয়া পল্লী অঞ্চলে সম্পত্তি করিয়াছিলেন বিস্তর এবং উহারই হেফাজতের দায়িত্ব লইয়া যৌবনেই এত বেশী বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পত্নীবিয়োগের পর দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবারও যেমন অবসর পান নাই তেমনই মাতৃহীন শিশুসন্তানের প্রতি মনোযোগ দিবার সময়ও তাঁহার হয় নাই। মাতার স্নেহ, পিতার যত্ন ও শাসন উভয় হইতেই বহুদূরে অপরিসীম প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হইয়া যোগেশ প্রায় বাল্যকাল হইতেই নিজের চেষ্টায় নিজের বসবাসের জন্য ইন্দ্রধনুর উপাদান দিয়া এক অভিনব জগৎ সৃষ্টি করিতে লাগিয়া গিয়াছিল।

যোগেশ বাল্যকালে গৃহদেবতার মন্দিরে ঠাকুর পূজা ও আরতি দেখিয়াছিল, কৈশোরে পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের চেলাদের সংগে মিশিয়া দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষার চাউল সংগ্রহ ও ব্রহ্মচর্য-ব্রত পালন করিয়াছিল এবং প্রথম যৌবনেই কয়েকজন উগ্রপন্থী দেশপ্রেমিকের পাল্লায় পড়িয়া বোধ করি বা ডাকাতি করিবার ও বোমা প্রস্তুত করিবার শিক্ষাও লাভ করিয়াছিল। ইহার উপর মাসিকপত্রের সম্পাদকদের আদর অনাদর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া কবিতা ও গল্প লিখিতেও কোনদিন সে ক্লান্তি বোধ করে নাই এবং পরে কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আসিয়া সাধারণ ছাত্রদের মত সে কেবল পরীক্ষার পর পরীক্ষাই পাশ করে নাই, অধীত পুঁথি ও স্বীয় প্রতিবেশ হইতে মৌমাছির মত বিন্দু বিন্দু মধু আহরণ করিয়া নিজের মনের মধ্যে সে এক অপরূপ মধুচক্র সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল।

মোট কথা, এই মাটির জগতের সত্যকার রূপটি স্বীকার করা দূরে থাকুক, যোগেশ কোনদিন উহার দিকে ভাল করিয়া যেন চাহিয়াই দেখে নাই। সাহিত্য ও দর্শনের অসংখ্য পুঁথি পাঠ করিয়া সেক্সপীয়র, শেলি, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট অসংখ্য অশরীরি নায়ক-নায়িকার মনের মধ্যে রোঁলা, শ', বারট্রান্ড রাসেল ও ফ্রয়েড প্রভৃতির মতবাদ এবং তাহাদের দেহে ও দৈনন্দিন জীবনের উপর বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন, সরোজিনী নাইডু ও কমলাদেবী প্রভৃতির অশান্ত কর্মচাঞ্চল্য আরোপ করিয়া তাহার নিজেরই কল্পনাসৃষ্ট এই জীবগুলিকে লইয়া সে তাহারই নিজস্ব এক অভিনব জগতে বাস করিত।

অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা সুরু হইবার কয়েক মাস পূর্বেই এ হেন যোগেশকে জরুরি তারের আহ্বানে দেশের বাড়িতে ডাকিয়া আনিয়া মনোমোহনবাবু কোনপ্রকার ভূমিকা না করিয়াই কহিলেন, "তোমার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করা হয়েছে যোগেশ। আসচে মাসেই তোমাকে বিয়ে করতে হবে।"

যোগেশ যেন আকাশ হইতে পড়িল, কহিল, "বিয়ে!"

মনোমোহনবাবু একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন, তারপর গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, "হ্যাঁ, বিয়ে। আমার বন্ধু জ্যোতির্ময় বাঁড়ুয্যেকে তুমি জানতে। তার মেয়ে শোভা--তাকেও ছেলেবেলায় তুমি দেখেছ। জ্যোতির্ময় গরীব, মেয়ের বিয়ের কোন সংস্থান করবার আগেই হঠাৎ নিউমোনিয়ায় সে মারা যায়। তার মৃত্যুশয্যায় আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে তার মেয়েকে পুত্রবধূ করে আমি আমারই ঘরে আনব। সেই প্রতিশ্রুতি পালন করবার সময় এখন এসেছে। মেয়ে বড় হয়েছে, তাকে আর আইবুড়ো রাখা যায় না। তাছাড়া তার জ্যাঠামশায় ও অভিভাবক কাশীবাস করতে যাবেন; তার পূর্বেই, অর্থাৎ আসছে মাসেই এ বিয়ে হওয়া চাই। তুমি এখন কলকাতায় ফিরে যেতে চাও যাও, তবে বিয়ে আসছে মাসেই হবে। এখন তবে তুমি যেতে পার।"

অত্যন্ত স্পষ্ট কথা সোজা করিয়া বলা হইল। ঘূর্ণিবায়ু অকস্মাৎ উঠিয়া যেমন করিয়া প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় ভালমন্দ সব কিছু উড়াইয়া লইয়া যায়, মনোমোহনবাবুর আদেশও তেমনই প্রবল বিক্রমে যোগেশের সমস্ত আপত্তি অসম্মতি ভাঙিয়া পিষিয়া চূর্ণ করিয়া উড়াইয়া লইয়া যাইবার প্রয়াস পাইল। হতবুদ্ধি বিহ্বল যোগেশ করিবার মত কাজ বা বলিবার মত কথা একটিও ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

সব কথা সে বুঝিল না, বোধ করি ভাল শুনিলও না। কেবল পিতার মুখে ঐ যে জ্যোতির্ময়বাবুর কন্যা শোভার উল্লেখ হইল উহারই সূত্র ধরিয়া তাহার স্মৃতি অতীতের অসংখ্য জঞ্জালের অন্তরাল হইতে যে বালিকার মুখখানি খুঁজিয়া বাহির করিল, তাহা যেমনই কুৎসিৎ তেমনিই নিষ্প্রাণ ও জড়। অনশন ও রোগক্লিষ্ট শীর্ণ শ্যামবর্ণ যে মুখখানি কোনদিন কোন কারণে তাহার মনের মধ্যে অতি সামান্য কৌতূহলেরও সৃষ্টি করে নাই, তাহারই অধিকারিণীকে স্বীয় জীবনসঙ্গিনী কল্পনা করিতেই লজ্জা ও বিতৃষ্ণায় যোগেশের অন্তর ও দেহ দুইই রি রি করিয়া উঠিল।

কিছু বলিতে না পারিয়া যোগেশ দাঁড়াইয়াই রহিল এবং অপাঙ্গে উহাই লক্ষ্য করিয়া মনোমোহনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কিছু বলবার আছে?"

যোগেশ প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় করিয়া শুষ্ক অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল, "না বাবা, এ বিয়ে হতে পারে না।"

"কেন?" মনোমোহনবাবুর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

যোগেশ ঢোক গিলিয়া কহিল, "মেয়ে—"

কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না, মনোমোহনবাবু ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মেয়ে কালো, না? তোমরা এ কালের শিক্ষিত যুবক কি না! তাই পিতার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবী স্ত্রীর রূপের কথা নিজের মুখে বলতে তোমাদের আটকায় না। তা না আটকাক; কিন্তু তোমরা শিক্ষার বড়াই কর, নারীর দুঃখে তোমাদের বুক ফেটে যায়, তোমরা দেশ উদ্ধার করবে বলে বেড়াও!

আর তাদেরই একজন তুমি—তুমি একটি কালো মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না?"

যোগেশ পুনরায় ঢোক গিলিয়া কহিল, "কালোর কথা হচ্ছে না বাবা, আমি বিয়ে করব না।"

"বিয়ে করবে না?" মনোমোহনবাবু কঠোরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এত বড় চাটুয্যে বংশ বংশধরের অভাবে লোপ পেয়ে যাবে?"

যোগেশ পিতার এ কণ্ঠ চিনিত, তাই সংকুচিত হইয়া কহিল, "একেবারে করব না বলিনি ত। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন? কিছুদিন পর—"

মনোমোহনবাবু পুনরায় বাধা দিয়া কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিলেন, "কিছুদিন পর এই কালো মেয়ে অপ্সরী হয়ে উঠবে নাকি?"

নিরুপায় যোগেশ উত্তর ভাবিয়া পাইল না, সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল।

মনোমোহনবাবু রাশভারী লোক, তিনি গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, "আমি বাদানুবাদ চাই না। এই বিয়ে তোমাকে করতে হবে এবং আসছে মাসেই। এখন যাও।" কথাটা বলিয়াই যোগেশের যাওয়ার জন্য অপেক্ষা না করিয়া তিনি নিজেই উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

কিন্তু নিজের অদম্য ইচ্ছার প্রবল ঝঞ্চার বেগে মনোমোহনবাবু যোগেশের যে আপত্তিকে তখনকার মত খানিকটা হালকা আবর্জনার মতই উড়াইয়া লইয়া গেলেন উহা নষ্ট না হইয়া বরং ঐ ঝঞ্চাবেগেই ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িল এবং দুই চারিদিনের মধ্যেই পাত্র ও কন্যাপক্ষের অনেকেই জানিতে পারিল যে, শোভার সঙ্গে বিবাহে যোগেশের সম্মতি ত নাইই বরং অমত যথেষ্ট আছে।

শুনিয়া শোভার জ্যেষ্ঠতাত হরিহর বাঁড়ুয্যে কাঁদ কাঁদ হইয়া মনোমোহনবাবুকে কহিলেন, "এ সব কি শুনছি বেয়াইমশায়? বিয়ে কি তবে হবে না?"

মনোমোহনবাবু উত্তর দিলেন, "আপনি কি শুনেছেন তা আপনি জানেন। তবে আমি জানি যে যোগেশ আমার পুত্র এবং তার বিয়ে আমার মনোনীতা পাত্রী শোভার সঙ্গেই হবে।"

মনোমোহনবাবুর নিজের আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যেও অনেকেই সংশয় প্রকাশ করিয়া কহিল, "যোগেশের অমতে বিয়ে দিলে কাজটা কি ভাল হবে চাটুয্যেমশায়? দু'একদিনের ব্যাপার ত নয়? এ যে সারা জীবনের সম্বন্ধ।"

মনোমোহনবাবু স্মিতমুখে সকলকেই একই উত্তর দিলেন, "সারা জীবনের সম্বন্ধ হবে বলেই ত বিয়ে দিচ্ছি। শোভার সঙ্গে ঘর করতে হবে—একথা পাকাপাকি ঠিক হয়ে গেলেই শ্রীমানের আপত্তিও আর থাকবে না। রূপগুণের ভাবনায় যোগেশের মনের মধ্যে আজ যে বিতৃষ্ণা দেখা যাচ্ছে তা দূর করবার ভার নেবেন স্বয়ং কামদেব। দেবতার কাজের ভার দেবতার হাতে ছেড়ে দিয়ে আমাদের যা কাজ অর্থাৎ দু'হাত এক করে দেওয়া তাতে মনোযোগ দেওয়াই আমাদের কর্তব্য।"

হইলও তাহাই। স্বর্গীয় বন্ধুর প্রতি কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়া মনোমোহনবাবু কাহারও আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না এবং তাহার স্বনির্দিষ্ট-কার্যক্রম অনুসারেই একদিন শুভ লগ্ন সুতহিবুক যোগে মহা ধুমধামের মধ্যে শোভার সঙ্গে যোগেশের বিবাহ হইয়া গেল। পুরোহিত ফুলের মালা দিয়া দুই হাত একসঙ্গে বাঁধিয়া দিয়া কহিলেন, "বিধাতার হাতের এই বন্ধন—দেহে ও মনে এ অক্ষয় হয়ে থাকবে।"

(২)

যোগেশ বিবাহ করিল যন্ত্রচালিতের মত। মুখে সে একটি মন্ত্রও উচ্চারণ করিল না এবং অবশ্যকর্তব্য প্রক্রিয়াগুলি সে কলের মত প্রতিপালন করিয়া গেল। শুভদৃষ্টির সময় সে ইচ্ছা করিয়াই চক্ষু চাহিল না এবং বাসরঘরে গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া আত্মীয়া অনাত্মীয়া সকল স্ত্রীলোকের রঙ্গকৌতুক সে নীরবে সহ্য করিয়া গেল।

ফুলশয্যার রাত্রিও চুপ করিয়াই কাটাইয়া দিবে মনে করিয়া যোগেশ শোভার দেহের সান্নিধ্য যথাসম্ভব এড়াইয়া অতবড় শয্যাটির একপ্রান্তে শুইয়া পড়িয়াই চক্ষু মুদিয়াছিল, কিন্তু চেষ্টা করিয়াও তৎক্ষণাৎ সে ঘুমাইতে পারিল না। শোভার দেহ ও দেহসজ্জার উগ্র গন্ধ ফুলশয্যার অন্যান্য অনেক গন্ধের সঙ্গে মিশিয়া তাহার অন্তরকে ক্রমেই যেন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতে লাগিল এবং যাহাকে সে নিজের জীবনের কোন অংশে ঠাঁই দিবে না স্থির করিয়া রাখিয়াছিল তাহারই চিন্তা তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া নিষ্ঠুর সংঘর্ষে এমনই আগুন জ্বালাইয়া তুলিল যে শত চেষ্টা করিয়াও সে আর ঘুমাইতে পারিল না। তথাপি সে চুপ করিয়াই শুইয়া রহিল এবং হয়তো বা চুপ করিয়াই বাকি রাতটুকুও কাটাইয়া দিত,, কিন্তু সহসা শোভার একটি দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ কানে গিয়া তাহার সকল সংকল্পই ওলটপালট করিয়া দিল।

যোগেশ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখনও ঘুমাও নি?"

ছোট্ট উত্তর হইল, "না।"

যোগেশ কহিল, "ঘুমাও, রাত অনেক হয়েছে।"

কিন্তু শোভাও ঘুমাইল না, যোগেশ নিজেও ঘুমাইতে পারিল না। অথচ দুইজনেই যে জাগিয়া রহিয়াছে তাহা বুঝিয়াও দুইজনেই অনেকক্ষণ নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শোভাই কিছুক্ষণ পর মৃদুস্বরে কহিল, "একটা কথা বলব?"

সচকিতে ঘাড় ফিরাইয়া যোগেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা?"

শোভা যোগেশের দিকে একটু সরিয়া আসিয়া পূর্বের মতই মৃদুস্বরে কহিল, "আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলে তোমার খুব দুঃখ হয়েছে?"

যোগেশ যেন তাহার দেহের মধ্যে অকস্মাৎ বিদ্যুৎস্পর্শ অনুভব করিল। সে বিদ্যুৎপৃষ্টের মতই সচকিতে পাশ ফিরিয়া শোভার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিল। অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না, যোগেশের কৌতূহলেরও পরিতৃপ্তি হইল না এবং সেই জন্যই সে কন্ঠস্বরে অনেকখানি সংশয় এবং অনেকখানি আগ্রহ একসঙ্গে ঢালিয়া দিয়া কহিল, "দুঃখ হয়েছে? এ কথা তোমায় কে বললে?"

শোভা উত্তর দিল, "কেউ বলে নি। তবে সবাই এ কথা জানে, আমিও জানি।"

যোগেশ স্তব্ধ বিস্ময়ে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে কহিল, "এ আলোচনা নিরর্থক। এখন ঘুমাও।" বলিয়া সে নিজে শোভার দিকে পিছন ফিরিয়া পুনরায় চক্ষু মুদিল।"

ক্ষণকাল পর শোভাই পুনরায় কহিল, "এখন দুঃখ করেও কোন লাভ নেই—বিয়ে যখন হয়ে গেছে। আর ত তুমি আমায় ফেলতে পারবে না।"

যোগেশের বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। সদ্য বিবাহিতা তরুণীর মনের মধ্যে কি ভাব যে তরঙ্গ তুলিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে তাহা জানিবার জন্য তাহার যথেষ্ট কৌতূহল হইল।

সে পুনরায় শোভার দিকে পাশ ফিরিয়া কহিল, "ফেলবার কথা ত হচ্ছে না। তুমি এখানে এই বাড়ীতেই থাকবে।"

শোভা কহিল, "না।"

"কি না?"

"আমি এখানে থাকব না।"

"এখানে থাকবে না তবে কোথায় যাবে?"

"তোমার সংগে। তুমি যেখানে থাক সেই জায়গায়।"

এই নিঃসংকোচ সুস্পষ্ট দাবী শুনিয়া যোগেশের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইল। সে কহিল, "এ সব তুমি বলছ কি শোভা? বাবা তোমাকে ঘরে এনেছেন তার নিজের প্রয়োজনে। এখানে এই এত বড় সংসারে কোন গৃহকর্ত্রী নেই; বাবাকে দেখবার, তাকে যত্ন করবার কোন লোক নেই। এখন থেকে এ সব যে তোমাকেই করতে হব।"

শোভা পুনরায় ছোট্ট করিয়া কহিল, "না।"

"কি না?" যোগেশ জিজ্ঞাসা করিল।

শোভা উত্তর দিল, "তোমাদের সংসার, বাবার যত্ন এতদিন যেমন চলেছে এখনও তাই চলবে। আমি তোমার সংগে যাব, তোমার কাছে থাকব।"

যোগেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, তারপর কহিল, "কিন্তু এই ঘরবাড়ি, এই সংসার—এ সবের কি হবে? এই সবই ত এখন থেকে তোমার জিনিস।"

শোভা যোগেশের আরও একটু নিকটে সরিয়া আসিয়া কহিল "তা জানি। এ সব আমার এবং আমারই থাকবে। কিন্তু তুমিও আমার, আমি তোমাকেও চাই। সেইটাই আমার সকলের আগের পাওনা।" বলিতে বলিতে অন্ধকারেও সে কিছুমাত্র ভুল না করিয়া যোগেশের দক্ষিণ হস্তখানি চাপিয়া ধরিল।

ঐ ভাষা, ঐ কণ্ঠস্বর ও সর্বোপরি ঐ স্পর্শ—উহাদের নির্মম অধিকারের দাবী ও নিঃসঙ্কোচ স্বার্থপরতা দিয়া অকস্মাৎ যেন তুষারশীতল স্পর্শে যোগেশের সমস্ত অনুভূতিকে নিশ্চল করিয়া দিল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস সযত্নে চাপিয়া রাখিয়া সে কহিল, "কিন্তু আমার লেখাপড়া এখনও ঢের বাকি রয়েছে।"

কিছুমাত্র ইতস্তত না করিয়া শোভা উত্তর দিল, "অনেক ত পড়েছ। কি দরকার আর বেশী লেখাপড়ার? তোমাকে ত চাকরি করতে হবে না।"

যোগেশ ধীরে ধীরে আপনার হাত টানিয়া লইয়া কহিল, "লেখাপড়া ছাড়াও আমার আরও অনেক কাজ আছে। আমি দেশের জন্য প্রতিজ্ঞা করে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছি। আমার অনেক কাজ করবার আছে।

"না নেই," বলিতে বলিতে শোভা আবার যোগেশের হাত চাপিয়া ধরিল। "এতদিন একা ছিলে, যা খুসী করেছ। কিন্তু এখন তোমার জীবন আর তোমার একার নেই। ওর উপর আমারও এখন একটা অধিকার হয়েছে। ও নিয়ে এখন আর তুমি যা খুসী করতে পারবে না।"

যোগেশের মনে হইল যে শোভার প্রত্যেকটি কথা ঠিক যেন শৃঙ্খলের মত তাহার দেহের মধ্যে কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া যাইতেছে এবং ঐ বন্ধন হইতে তাহার মুক্তির আর কোন সম্ভাবনাই নাই। সে চেষ্টা করিয়াও শোভার কথার উত্তর দিতে পারিল না, কেবল নিঃশব্দে একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল। শোভার যে হাতখানি তাহাকে জড়াইয়া পড়িয়া রহিল উহার স্পর্শ দুঃসহ বোধ হইলেও উহা হইতে ঐ রাত্রে আপনাকে সে মুক্ত করিতে পারিল না।

কিন্তু মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সমস্ত রাত্রিই তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া রহিল এবং উহারই দুর্নিবার প্রেরণায় বিবাহের আনুষঙ্গিক অবশ্যকর্তব্য প্রক্রিয়াগুলি শেষ হইবার সংগে সংগেই শোভাকে গ্রামের বাড়ীতে ফেলিয়া রাখিয়া স্বয়ং সে কলিকাতায় চলিয়া গেল।

(৩)

যোগেশের বন্ধু অমল কলিকাতায় ছোট একখানি ফ্ল্যাট ভাড়া লইয়া সপরিবারে বাস করিত; কলিকাতায় ফিরিবার পরদিনই সন্ধ্যার পর যোগেশ তাহাদের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল।

অমলের স্ত্রী গৌরী স্বামীর বন্ধুকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া রহস্য করিয়া কহিল, "একা এলেন যে বড়? আমরা এখানে পথ চেয়ে বসে রয়েছি, বরবধুকে বরণ করে ঘরে তুলব, রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন দেখে চর্মচক্ষু সার্থক করব। তা আপনি এলেন কি না একা!"

যোগেশ হাসিয়া উত্তর দিল, "যুগল-মিলন কি অমনি দেখা যায়? তার জন্য অনেক সাধনা চাই। আপনাদের সে সাধনা আগে পূর্ণ হউক; চর্মচক্ষু তখন সার্থক হবে।"

"সে না হয় হবে," গৌরী কহিল, "কিন্তু আপাতত বউ কেমন হল বলুন দেখি।"

"সাক্ষাৎ লক্ষ্মী," যোগেশ উত্তর দিল, "একেবারে বৈকুণ্ঠ থেকে সপেচক নেবে এসেছেন।"

গৌরী কৌতুকোজ্জ্বল দুই চক্ষুর দৃষ্টি যোগেশের মুখের উপর বিন্যস্ত করিয়া কহিল, "আপনার অবস্থা দেখেই তা বুঝতে পাচ্ছি—দুদিনের বিরহেই যা শুকিয়ে উঠেছেন। তা আমাদের লক্ষ্মীঠাকরুণ এই কলকাতার বৈকুণ্ঠে আসবেন কবে?"

"তার এখনও দেরী আছে ঢের," যোগেশ উত্তর দিল।

"কেন?"

"লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বিবাদ আছে জানেন না? আপাতত এখানে দেবী সরস্বতীর রাজত্ব চলছে, কাজেই লক্ষ্মী দেবীর আসার কোন সম্ভাবনা নেই।"

অমল এতক্ষণ চুপ করিয়া উভয়ের এই রহস্যালাপ হাসিমুখে উপভোগ করিতেছিল, এইবার সে কহিল, "এবার দেবী সরস্বতীকে বিদায় দাও যোগেশ। এতদিন তার অনেক আরাধনা করেছ; এখন আমাদের মত লক্ষ্মী দেবীর চরণ পূজা শুরু করে দাও।"

যোগেশ গম্ভীর হইয়া উঠিল, উত্তর দিল, "আশা করি যে অতবড় দুর্ভাগ্য কোনদিনই আমার হবে না, তাকে ঠেকিয়ে আমি রাখতে পারবই।"

অমল সচকিত বিস্ময়ে বন্ধুর মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু সেখানে সুস্পষ্ট কিছু দেখিতে না পাইয়া প্রসংগটি পরিবর্তন করিবার উদ্দেশ্যে কহিল, "আমি বিয়েতে যাই নি বলে তুমি বোধ করি খুব চটে রয়েছ। কিন্তু কি করব ভাই! বড় সায়েব কিছুতেই ছুটি দিলে না।"

গৌরী সহসা অনুতপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এই যা! নূতন বউএর গন্ধ পেয়ে আর সব কিছুই ভুলে বসে আছি। তোমরা গল্প কর, আমি চা আনি।" বলিয়া ঝি'র উদ্দেশ্যে একবার হাঁক দিয়া তখনই সে বাহির হইয়া গেল।

অমল যোগেশের দিকে ঈষৎ সরিয়া কৌতুকের তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "তারপর? যিনি এলেন তিনি কেমন—ক্লিওপেট্রা ওফেলিয়া না রাজলক্ষ্মী?"

যোগেশ গভীর ঔদাসীন্যের কণ্ঠে উত্তর দিল, "কিছুই নন—কারণ কেউ আসেন নি। আমি আগে যেমন একা ছিলাম এখনও তাই আছি। এ কয়দিন যা ঘটল তা একটা দুঃস্বপ্ন—দুঃস্বপ্নের মতই পরশু রাত্রির অন্ধকারের সংগে সংগেই তা কেটে গেছে।"

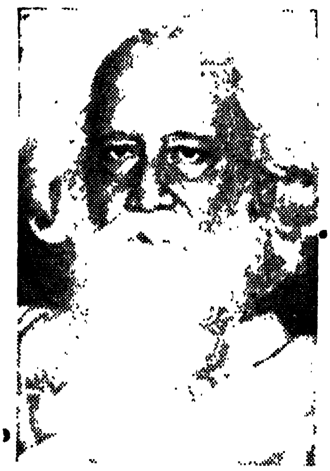
অমল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে চাহিল এবং

(শেষাংশ ২৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রবীন্দ্রনাথের মৌখিক ছড়া

(১)

তারিখ ১৭।১।৪১, সময় আসন্ন সন্ধ্যা। রবীন্দ্রনাথ বসে ছিলেন তাঁর শয়ন কক্ষের দক্ষিণের বারান্দায়। সেখান থেকে দেখা যায় পশ্চিমের আকাশ। সেই আকাশে রঙের লীলা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে দিনের শেষ আলোটুকু প্রায় মুছে যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ নীরব হয়ে যতটা ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তিতে দেখা সম্ভব তাই দেখছিলেন। তারপরেই ধীরে ধীরে মুখে মুখে বলে গেলেন—



নানা বর্ণে রচে গেনু সাহিত্যের ইন্দ্রধনুখানা
কালক্রমে লুপ্ত হবে আছে তাহা জানা।
কী তাহাতে ক্ষোভ,
হাতে যাহা মিলিবে না কেন তাহে লোভ।

এই যে সূর্যাস্ত আভা, যে দিবস হারায় তাহারে,
সেও তো আপনি ডোবে রাত্রির আঁধারে।

এ বিচ্ছেদ বেদনার ভাগী
অনিদ্রায় কোনখানে নাহি রহে জাগি,
আগে ভাগে তারি লাগি দুঃখ
কিছুই না এর চেয়ে ঢের বেশি সূক্ষ্ম।

(২)

পরের দিন সকালে চেয়ারে বসে ছিলেন কবি। তাঁকে প্রশ্ন করা হোলো, রাত্রে কেমন ঘুম হয়ে ছিল। তিনি হেসে জবাব দিলেন—

ঘুম ছিল না রাত্রে মাথায় ঘুরছিল এই ছড়া
মানব জীবন শুধু কেবল চাওয়া পাওয়ায় গড়া।
দিকে দিকে ব্যাপ্ত চাওয়ার অনন্ত সমুদ্র
মধ্যে পাওয়ার দ্বীপপুঞ্জ ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র।
বহে আকাঙ্ক্ষার বায়ু নাহি হয় ক্লান্ত,
এই তো মানব জীবনের ভূগোল বৃত্তান্ত।

(৩)

১৮।১।৪১ তারিখ। সময় মধ্যাহ্ন। কবি বসবার চেয়ার ছেড়ে সামনের হেলান দেওয়া বিশ্রাম-উপযোগী চেয়ারে বসবার প্রস্তাব করতেই, তার উপর প্রয়োজনীয় কুশন এবং বালিশ পাতবার জন্য আয়োজন করছি, এমন সময় তিনি তাঁর নাত্নীকে ডেকে সহাস্যে ছড়া কেটে বল্লেন,

"দিদিমণি তুমি যখন বিছানাটা পাতো
কোনোখানে একটুখানি শক্ত ঠেকে না তো।
গোঁয়ারগুলো যখন লাগায় হাত
পিত্তি জ্বলে ওঠে অকস্মাৎ।"

(৪)

দিদিমণির প্রতি দ্বিতীয় ছড়ার আর একটি উদাহরণ, তারিখ ২৭।১।৪১

"মুখে যদি লাগিয়ে দাও পাউডার
মুখের ভাষা হবে তবে লাউডার।
পাকা দাড়ির সঙ্গে মুখের এই যে হবে হারমনি
ফ্রান্সে যেমন মিলেছে আজ জারমনি।"

(৫)

জনৈক কবির উদ্দেশে। সাধারণত ইনি লম্বা কবিতা লিখতে ভালবাসেন। অনাবশ্যক দীর্ঘ কবিতার দোষের কথা উল্লেখ করে বল্লেন,—

"দুটো কথা বললে যদি মানেটা হয় সোজা
পাঁচটা কথা বল্লে তখন সেটাই হবে বোঝা।"

(৬)

শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র কর মহাশয়ের কাছে কবির সব লেখাই যত্নে জমা থাকে। তাই একদিন কর মহাশয়কে সামনে পেয়ে হেসে বললেন,

"লেখার যত আবর্জনা জেনে রেখো সকলে
সমস্ত রয় করমশায়ের দখলে।"

(৭)

তারিখ ৩।২।৪১। জনৈক বিবাহিত ব্যক্তি কবিকে সংবাদ দিলেন, এই যুদ্ধের বাজারে চিঠিপত্র যা বিদেশ থেকে এখানে আসে বা এখান থেকে যায়, সবই প্রায় সেন্সার করা হয়। কবি উত্তরে বল্লেন, সেন্সার করবার কারণ ঘটে বলেই সেন্সার করা হয়। কিন্তু তুমি তোমার প্রেয়সীকে লিখে পাঠাতে পারো—

"আজকাল প্রিয়ে
অতিশয় গোলমাল চিঠি ফিটি নিয়ে।
অতএব কল্পনা করি
উত্তর নিজের মনে গেঁথে নিয়ে থেকো ধৈর্য ধরি।
"সেনসার" পড়ে যদি হাসে
গোপনীয় কথাগুলি মনে ক'রে ভালো লাগে না সে।"

(৮)

স্নেহের নাত্নী তাঁর দৃষ্টির আড়াল হতেই বৃদ্ধ দাদামশায় স্নেহমিশ্রিত ঠাট্টায় বল্লেন,—

ওরে মোর দোস্ত
আজকে সকাল বেলা
মেজাজটা খোস্ তো ?
একটু সময় নিয়ে
কাছে তুই বোস্ তো ?
কেন তুই চলে যাস্
করি নাই রোস তো ?

(৯)

কবির কাছে খবর এলো তাঁর পরিচিত এক দম্পতীর মধ্যে কিঞ্চিৎ কলহ হয়েছে। খবর শুনেই কবি হাসতে হাসতে বললেন,—

স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া হ'লে
মধুরেণ সমাপয়েৎ

খাতায় তোমার লিখে দিলেম
বৃদ্ধ কবির এই যে বয়েৎ।

(১০)

কবি একদিন টের পেলেন, কেউ পাশের ঘর থেকে তাঁর এই সব া খাতায় টুকে নিয়ে কাগজে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দেয়। সেই ব্যক্তিকে ক্য করেই তিনি বললেন,—

পাশের ঘরেতে বসে
যবে খাই দই ভাত
কান খাড়া করে থাকি
যদি কভু দৈবাৎ
কবি মুখ হতে বাণী
খসে পড়ে আলসে
তখুনি টুকিয়া লই
নাই হোলো ভাল সে।
কাগজে বাহির করি
না মরিতে ঝাঁজটা
এত হুঁসিয়ার জেনো
এডিটরি কাজটা।

(১১)

রোগকাতর রবীন্দ্রনাথ তাঁর হাল্কা সরস হাস্যপরিহাসকে নিয়ে এই সব ছড়ায় যেন পুতুল গড়ে চলেছেন, কত ভাবের রঙ তাতে চড়ানো। তাঁর খেলার সামগ্রী তাঁর কাছে খুব দামী নাও হতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে তা অমূল্য। তাঁর এই সব রসসৃষ্টি কুড়িয়ে নিয়ে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরি বলে' কবি একদিন ঠাট্টা করে বললেন,—

তপ্ত পথের যাত্রী আছি
হাওদা পরে বেঁকে,
ফসল কিছু ছিট্‌কে পড়ে
চলতি বোঝার থেকে,
কারবারি লোক সুধাকান্ত
একটু যদি খবর পান তো
জাহির করেন দখল,
ছাপার কালির ছাপ মেরে নেন
উঞ্ছ জিনিস সকল।

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী

ভুলে

(২৪০ পৃষ্ঠার পর)

চাহিয়া চাহিয়া তাহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে বসিবার চৌকিখানি যোগেশের আরও একটু নিকটে সরাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি যোগেশ? বউ সত্যি পছন্দ হয় নি নাকি?"

যোগেশ বন্ধুর দৃষ্টি এড়াইয়া গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "তোমাকে ত আগেই বলেছিলাম!"

অমল ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, তারপর ঈষৎ ক্ষুন্নকণ্ঠে কহিল, "এতই যদি তোমার বিতৃষ্ণা তবে এ বিয়ে করলে কেন?"

যোগেশ সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "একে তুমি বিয়ে করা বল অমল? একজন লোককে শিকল দিয়ে বেঁধে তার ললাটের উপর পিস্তল তুলে তাকে দিয়ে দলিল লিখিয়ে নেওয়াও যা, আমাদের এই সনাতন হিন্দু সমাজের বিয়েও ঠিক তাই। আইনের চোখে এর দায়িত্ব যা'ই হ'ক না কেন, এর নৈতিক দায়িত্ব একেবারেই নেই।"

অমল শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল, "কিন্তু একটা দলিল লিখে দেওয়া আর বিয়ে করা ত এক কথা নয় যোগেশ! দলিল লিখে দেওয়ায় লোকসান যা'ই হ'ক না কেন, তার কোন এক জায়গায় দাড়ি টেনে দেওয়া যায়। কিন্তু বিয়ে করার জের টেনে চলতে হয় সারা জীবন।"

যোগেশ শুনিয়াই গেল, উত্তর দিল না। ক্ষণকাল পর অমলই পুনরায় কহিল, "একে ত তুমি অস্বীকার করতে পারবে না যোগেশ। নিজের জীবনের সঙ্গে আর একজনের জীবন তুমি অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে ফেলেছ। এ সম্বন্ধ দুই জনেরই মন ও দেহকে জড়িয়ে সম্বন্ধ। এ যদি নিছক মনেরই কারবার হত, হয়ত বা কল্পনার বিলাসের মধ্যে একটা মুক্তির সন্ধান করা যেত। কিন্তু রক্ত মাংসের দেহের অভাবকে ত অনশনে রাখতে পারব না। এ সম্বন্ধ স্বীকার না করলে সে ক্ষুধা মিটাবে কি দিয়ে শুনি।"

যোগেশ বন্ধুর দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, "এতদিন কি দিয়ে মিটিয়েছি তা জান না তুমি? তুমি যাকে দেহের ক্ষুধা [illegible] একটা প্রেরণামাত্র। তার প্রয়োগের জন্য সংসারের বিশাল কর্মক্ষেত্র আমার সামনে রয়েছে। ক'টি শিশুর মধ্যে যা প্রকাশ পেত, আমার সেই সৃজনীশক্তি দিয়ে বাইরে আমি সৌন্দর্যের ইন্দ্রজাল রচনা করব।"

অমল গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, "স্বার্থপর। কেবল নিজের কথাই তুমি ভাবছ। কিন্তু যে আর একজনকে নিজের জীবনের সঙ্গে তুমি জড়িয়েছ সে কি করবে?"

যোগেশ কহিল, "আমি যে পথে যাব সে পথ তার সামনেও খোলা রয়েছে। জগদ্দল পাথর চাপিয়ে সে পথ আমি বন্ধ করে দেব না।"

অমল মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "এইজন্যই ত তোমায় বলি স্বার্থপর। নিজের মাপে ছাড়া কারও কথা তুমি ভাবতেই পার না। তোমার মত সূক্ষ্ম আত্মপ্রকাশের শক্তি তোমার নেই আর একজনের যদি না থাকে?"

যোগেশ সচকিতে অমলের মুখের দিকে চাহিল। অমল পূর্বের মতই হাসিতে হাসিতে কহিল, "যত সোজা তুমি ভাবছ বন্ধু, এ সমস্যা তত সোজা নয়।"

যোগেশ সহসা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল তারপর তীক্ষ্ম অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল, "হয়তো নয়। কিন্তু একে সোজা করবার জন্য যে শক্তি ও সাহসের দরকার তা আমার আছে। আমার সেই আর একজনের আত্মপ্রকাশের প্রেরণা প্রকৃতির বাঁধা পথেই যদি প্রকাশ পেতে চায় আমি তাতেও বাধা দেব না। আমি নিজেকেই কেবল সরিয়ে নেব, এই এতবড় জগতের আর সব কিছুই তার সামনে খোলা থাকবে। এ থেকে প[illegible]প্ত আহরণ করবার সাহসের তার যদি অভাব না হয়, তবে আমারও হবে না, তা আজই তোমাকে বলে রাখছি।"

"কি বলে রাখছেন যোগেশবাবু? কোন ভয়ংকর কিছু নয় ত?" বাহিরে গৌরীর কৌতুকতীক্ষ্ম সরস কণ্ঠস্বর শোনা গেল এবং পরক্ষণেই সে যেঁতে চা ও প্রচুর খাবার লইয়া ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

(ক্রমশ)

পুস্তক পরিচয়

প্রভু জগদ্বন্ধু—ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ পরিমলবন্ধু দাস প্রণীত। প্রধান প্রাপ্তিস্থান—শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু হরিলীলামৃত কার্যালয়, ২৯নং রামকান্ত মিস্ত্রি লেন, কলিকাতা। শ্রীশ্রীহরিপুরুষ জগবন্ধু মহানাম সম্প্রদায় হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু জীবনী। গ্রন্থকার একজন সুলেখক। বর্তমান গ্রন্থ তাঁহার খ্যাতি বৃদ্ধি করিবে। প্রাঞ্জল এবং সুললিত ভাষায় তিনি মহাপুরুষ জগদ্বন্ধুর জীবনী বাঙলার পাঠকদিগকে উপহার দিয়াছেন। ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"বিজাতীয় ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে হিন্দু ধর্ম সম্যক্‌প্রকারে গ্লানিযুক্ত হয়; সেই অন্ধকার যুগে প্রভু জগদ্বন্ধু উজ্জ্বল আলোকবর্তিকারূপে দেখা দিয়াছিলেন। সমগ্র জীবন ভরিয়া তিনি সত্যনিষ্ঠা-সদাচার, ব্রহ্মচর্য-প্রেমের মূর্তিমান বিগ্রহরূপে কোন্ পন্থা অবলম্বনে ভারতবর্ষ লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে পারে, তাহা স্বয়ং আচরণ দ্বারা দেখাইয়াছেন।"

সে পথ, কোন্ পথ? ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ বলেন, "অস্পৃশ্যতা বর্জন, হিন্দু সমাজের উন্নয়ন ও শুদ্ধি প্রভৃতি আন্দোলনের বহু সহায়তা তিনি করিয়াছিলেন। ডোম, বুনো, বাগ্দী প্রভৃতি সমাজ-উপেক্ষিত, ঘৃণিত অস্পৃশ্যদের মধ্যে স্বয়ং তিনি বাস করিয়া তাহাদের উন্নয়ন সাধন করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ভাগবত ধর্মের ভাব-লক্ষণগুলি তাঁহার মধ্যে প্রকট হইয়া উঠে। তিনি নদীয়ার সেই গৌর-নিত্যানন্দের মত মানবের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া হরিনাম প্রচার আরম্ভ করেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু হিন্দু সমাজের সর্বস্তরের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা হিন্দুর সংহতিশক্তি উদ্বোধনের যে পন্থা অবলম্বন করেন, প্রভু জগদ্বন্ধু পরবর্তীকালে তাহাকে পুনরুদ্দীপ্ত করিয়া তোলেন।"

সমাজকে নূতন করিয়া গঠন করিবার একটা প্রচণ্ড সংকল্প প্রভু জগদ্বন্ধুর ছিল। আর্ত এবং পীড়িতের জন্য প্রাণের মধ্যে বৈপ্লবিক তাপ তিনি পোষণ করিতেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন,—"সমাজ রাখবো না, সমাজ রাখবো না, সমাজের বাঁধ ভেঙে দেব।" বাঙলার এই মহাপুরুষের জীবনতন্ত্রে বিশ্বের বেদনা ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছিল এবং সেই বেদনা দূর করিবার বৈপ্লবিক উদ্দীপনাময় এই জীবনী পাঠে চিত্ত উন্নত হয়। এমন মহাজনের জীবনী সকল সময়েই মধুর। প্রভু জগদ্বন্ধুর জীবনী পতিত, উপেক্ষিত এবং আর্তকে উন্নয়নের আকুলতা এবং উগ্র আবেগে মধুর হইতেও মধুর। আমরা আশা করি, এই সুলিখিত জীবনী সর্বত্র সমাদর লাভ করিবে। এই সব মহাপুরুষের জীবনের মুখ্য হইল ভাব; মারামারি, কাটাকাটি কিম্বা তৎসম্পর্কিত বিপর্যয় এমন জীবনীতে থাকে না। আলোচ্য জীবনী সংক্ষিপ্ত হইলেও ভাবকে পরিস্ফুট করিয়া শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি অংকণের কৌশল গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, এইখানেই তাঁহার কৃতিত্ব।

বঙ্গীয় মহাকোষ—২য় খণ্ড, ১৮শ সংখ্যা। প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গগত পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। কার্যালয় বঙ্গীয় মহাকোষ, ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৭০, মাণিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গের বিশিষ্ট মনীষিগণকে লইয়া গঠিত সম্পাদকমণ্ডলী কর্তৃক বঙ্গীয় মহাকোষ প্রকাশের কার্য দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। সর্বসমেত ২২ খণ্ডে ইহা সম্পূর্ণ হইবে। আলোচ্য খণ্ডে শ্রীযুত অজিত ঘোষ 'অনুরুধহর', শ্রীযুত সৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ 'অনুরুদ্ধ', শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী 'অনুলোম', ডক্টর শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সরকার 'অনুশাসন' সম্বন্ধে গভীর তথ্যপূর্ণ এবং মূল্যবান আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র কর্তৃক লিখিত শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর জীবনীও সুলিখিত। বঙ্গীয় মহাকোষের সম্পাদনা এইভাবে সম্পূর্ণ হইলে বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে একটি গৌরবের বিষয় হইবে।

কংস নদীর তীরে : শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার প্রণীত এবং চিত্রা পাবলিশিং কোং, ১৪।১, কলেজ রো, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুত সৌরীন্দ্র মজুমদার বাঙলা সাহিত্যে অপরিচিত নহেন। তাঁহার নিজস্ব রচনাভঙ্গী, স্বচ্ছ সরল ভাষা এবং সত্য জীবনোপলব্ধিকে মনোরম ভাষায় সুপ্রকাশিত করিবার সহজাত ক্ষমতা তাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থে একদল কংগ্রেসকর্মীর দেশের কাজ, কংগ্রেসের আদর্শ প্রচার, শ্রমিক ও মিলমালিক এবং কিষাণ ও জমিদারদের সংঘর্ষ এবং কংগ্রেসকর্মীদের প্রেম, বিরহ, ত্যাগ, সমাজ-জীবন প্রভৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সীমন্তী দেবীর নেতৃত্বে একদল কংগ্রেসকর্মী কংস নদীর তীরে আসিয়া কর্মক্ষেত্র রচনা করিল। স্থানীয় জমিদার রাজনারায়ণ বসু এবং মিলমালিকদের সঙ্গে কংগ্রেসকর্মী ও শ্রমিকদের বাধিল সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষ আরও তীব্রতর হইয়া উঠিল রাজনারায়ণবাবুর একমাত্র পুত্র সুমিত কংগ্রেসের পক্ষে যোগ দেওয়ায়। পিতার আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তি, নিষ্ঠুর আভিজাত্য, নীচস্বার্থ, দম্ভ ও কঠোরতা কোন কিছুই সুমিতকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারিল না। রাজনারায়ণবাবু পুত্রকে ত্যাজ্য করিলেন, সুমিত কপর্দকহীন হওয়া সত্ত্বেও কর্তব্যভ্রষ্ট হইল না। সুমিত কর্মশক্তি ও ত্যাগের বলে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার স্থান সীমন্তীর পার্শ্বে হইল। পাশে পাশে চলিতে চলিতে একদিন তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিল যে, তাহারা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে। এ ভালবাসা শুধু তাহাদের অন্তরে দিল কর্মপ্রেরণা; জীবনকে করিয়া তুলিল প্রাণবন্ত, কিন্তু নীড় রচনা করিবার কোন সুযোগ দিল না। তারপর একদিন নীতিগত মতানৈক্যে তাহাদের কর্মক্ষেত্র করিয়া দিল পৃথক। অন্তরে রহিল অন্তর এবং মধুর বিরহের মধ্যেই তাহাদের দেশপ্রেম, নির্মম ও দুর্বিনীত কর্তব্যবোধ এবং আন্তরিক দেশসেবা মহিমামণ্ডিত হইয়া উঠিল।

কংগ্রেসের বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মতবিরোধ, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আধ্যাত্মিক নানাপ্রকার সমস্যা ও প্রশ্নের যদিও এই পুস্তকে বিশদভাবে আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু গল্প বলার টেকনিক ও রসোত্তীর্ণ কাহিনীর গুণে উপন্যাসটি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্ব লাভের জন্য যে সকল বিভিন্ন মতবাদ ও কর্মপন্থার আলোচনা হইয়াছে, আমরা যদিও লেখকের সহিত সকল বিষয়ে একমত নহি, তবু একথা স্বীকার করিব যে, লেখকের অন্তর্দৃষ্টি সুগভীর।

প্রত্যেকটি চরিত্রই স্বতস্ফূর্ত ও জীবন্ত। কাবোর উপেক্ষিতা ফুলকোয়ারা চরিত্রটি আমাদের অন্তরে অধিক স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে। সীমন্ত ও সুমিত নায়ক-নায়িকা অপরূপ সৃষ্টি বলিয়া গণ্য হইবে। প্রচ্ছদপট অনুরঞ্জিত করিয়াছেন শিল্পী আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার সুনিপুণ তুলিকা পরশে গ্রন্থের ভাবধারা সুস্পষ্টভাবে প্রচ্ছদপটে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

সাহিত্য সংবাদ

রচনা প্রতিযোগিতা

তরুণ সাহিত্য বাসরের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে নিম্নলিখিত রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইয়াছে:—

(১) বাঙলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার জীবনী, (২) বাঙলার কৃষকের দুরবস্থা এবং তাহার প্রতিকারের উপায়, (৩) ছোট গল্প (বাস্তব ভাবধারায় লিখিত), (৪) সাহিত্যে সাম্যবাদ, (৫) বঙ্গসাহিত্যে নারীর দান, (৬) সুভাষচন্দ্রের নিরুদ্দেশে (কবিতা), (৭) বাঙলা সাহিত্যে যশোহরের দান। (১, ২, ৩, ৪) সর্বসাধারণের জন্য, (৫) কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য, (৬) স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য। (৭) কেবলমাত্র যশোহর জেলাবাসীদের জন্য। (১, ২, ৪, ৫) সুন্দর হস্তাক্ষরে ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পিঠে লিখিয়া ৮ পৃষ্ঠার মধ্যে। (৬) অধ্যক্ষ অথবা প্রধান শিক্ষকের সই চাই। (৪) একটি রৌপ্য কাপ ও অন্যান্য প্রত্যেক বিষয়ে একটি করিয়া রৌপ্য পদক। একজনে দুইটির বেশী প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন না। সম্পূর্ণ ঠিকানাসহ নিম্নঠিকানায় ৫ই এপ্রিলের (১৯৪১) মধ্যে লেখা পাঠাইতে হইবে। —মহম্মদ আবুল কাশেম, সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি, বনগ্রাম তরুণ সাহিত্য বাসর, বনগ্রাম, যশোহর।

এলাহাবাদে কমলা নেহরু হাসপাতাল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মহাত্মা গান্ধী



সদলবলে মহাত্মাজীর হাসপাতাল অভিমুখে যাত্রা



পূজা ও মঙ্গলানুষ্ঠানের পর মহাত্মাজী পণ্ডিতের ললাটে তিলক পরাইয়া দিতেছেন

আজ-কাল

সিন্ধুর রাজনীতি

সিন্ধু প্রদেশের শান্তি ও নিরাপত্তা যেমন স্থিতিহীন, তার মন্ত্রিমণ্ডলীর ভাগ্যও সেইরকম অনিশ্চিত। সেখানে মন্ত্রিসভার আবার পরিবর্তন হয়েছে। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু দল ও আল্লাবক্সের মুসলমান দল (ইউরোপীয়ানও কিছু আছে)—এই কয়দলের মেজাজ মন্ত্রিসভার ভাগ্য নির্ণয় করে; প্রধান টানাটানিটা চলে মুসলিম লীগ ও আল্লাবক্স দলের মধ্যে, আর কংগ্রেস ও হিন্দুদলের হাতে থাকে পাল্লা ভারি করবার ক্ষমতা। বিগত আল্লাবক্স মন্ত্রিসভার সময় বিরুদ্ধবাদী মুসলমান দলের প্ররোচনায় যে রক্তাক্ত হিন্দু-নিধন অনুষ্ঠান ঘটেছিল, তা সকলেরই স্মরণ আছে; তারা তখন সে মন্ত্রিসভাকে হিন্দুপক্ষপাতী মন্ত্রিসভা বলে' প্রচার করেছিল।

গত নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদ করাচীতে গিয়ে সর্বদল-সমর্থিত এক মন্ত্রিসভার ব্যবস্থা করে' সিন্ধুতে স্থিতি আনবার চেষ্টা করেন। তখন সমস্ত দলই তাঁর ব্যবস্থায় সম্মত হয়। প্রধান মন্ত্রী বন্দে আলি খাঁ, খাঁ বাহাদুর খুরো (লীগ) ও মিঃ জি এম সৈয়দ (লীগ) প্রতিশ্রুতি দেন যে, খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্স ও স্যার গোলাম হিদায়েতুল্লার জন্যে মন্ত্রিসভায় দুটি আসন ছেড়ে দেওয়া হবে; একটি আসন অবিলম্বে দেওয়া হবে এবং আর একটি আসন বন্দে আলি খাঁ ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পদত্যাগ করে' ছেড়ে দেবেন; তারপর প্রধান মন্ত্রী হবেন হয় আল্লাবক্স, নয় গোলাম হোসেন। প্রথম সর্তানুযায়ী মিঃ সৈয়দ পদত্যাগ করেন এবং আল্লাবক্স মন্ত্রী হন। কিন্তু তারপরই সব গোলমাল হয়ে যায়; কারণ করাচীতে জনাব জিন্না সাহেবের আবির্ভাব হয়। তাঁর সঙ্গে বন্দে আলি এবং লীগ মন্ত্রীদের সলা-পরামর্শ হয়; বন্দে আলি হঠাৎ লীগের সদস্য হয়ে পড়েন। আজাদ-ব্যবস্থা অনুযায়ী তিনি আর পদত্যাগ করতে চাইলেন না; তাঁর বন্ধুরা লীগের নামে নানা ফ্যাকড়া তুলতে লাগলেন। ফলে শেষ পর্যন্ত লীগ ছাড়া আর সব দল বন্দে আলি মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে গেল এবং মন্ত্রিসভার নামে অনাস্থা প্রস্তাব আনল। তবে অনাস্থা প্রস্তাব ওঠাবার আগের দিনই হিন্দু দলের দুজন মন্ত্রী এবং আল্লাবক্স পদত্যাগ করলেন। তখন বন্দে আলি খাঁ আইনসভায় সংখ্যাধিক্য অসম্ভব বুঝে সমগ্র মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ করলেন।

এখন আল্লাবক্স নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। তিনি প্রধান মন্ত্রী, স্যার গোলাম হোসেন শান্তি ও শৃঙ্খলা-সচিব: হিন্দুদলের দুজন সদস্যও মন্ত্রিপদ নিয়েছেন। তবে আশা করা যায়, সাম্প্রদায়িক নেতারা প্ররোচনা দিয়ে সিন্ধুতে আর একটা তাণ্ডবের চেষ্টা করবে। ইতাবসরে একতরফাভাবে হিন্দুদের খুন করার আন্দোলনটা তো বেশ জোরেই চলেছিল। বন্দে আলি ও মুসলীম লীগ নেতারা আপাতত সমস্ত দোষটাই কংগ্রেসের কাঁধে চাপাচ্ছেন।

বাঙলায় সেন্সাস

বাঙলায় সেন্সাস নিয়ে উত্তেজনা এখনো প্রবল রয়েছে। হিন্দুদের গালিগালাজ করে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক যেসব বিবৃতি দিয়েছেন তার প্রতিবাদে স্যার নৃপেন সরকারের সভাপতিত্বে কলকাতা টাউন হলে হিন্দুদের এক বিরাট সভা হয়। সভার কিছু আগে হক সাহেব স্যার নৃপেনের কাছে এক চিঠি লিখে জানান যে, তিনি সব হিন্দুদের গালাগালি দেন নি এবং তাঁর ইচ্ছা বর্তমান সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রশমনের জন্যে হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের এক সভা হয়। কিন্তু পরে তিনি এক বিবৃতিতে জানিয়ে দেন যে, তিনি তাঁর অভিযোগ সম্বন্ধে মোটেই নরম হন নি। যা হোক, গভর্নর গত ১০ই মার্চ সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে আইন-সভার সমস্ত দলের নেতাদের এক বৈঠক প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে আহ্বান করেন। বৈঠকের ফলাফল এখনো কিছু জানা যায় নি।

এদিকে হিন্দু অধ্যাপক, ব্যবহারজীবী প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রধান মন্ত্রী যে গালাগালি করেছিলেন, তাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে বাঙলার বিশিষ্ট অধ্যাপকেরা এক যুক্ত প্রতিবাদ করেছেন এবং আইন-জীবীদের পক্ষ থেকে একজন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হক সাহেবের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা রুজু করেছেন। ম্যাজিস্ট্রেট কেন মিঃ হককে অভিযুক্ত করা হবে না তার কারণ তাঁকে দেখাতে বলেছেন।

হক-মন্ত্রিমণ্ডলীর শাসন

জনসাধারণের আপত্তি সত্ত্বেও বঙ্গীয় বিক্রয় কর বিল আইন-সভায় পাস হয়ে গেছে। পাটচাষীদের যুক্তিসঙ্গত বিক্ষোভকে কর্তৃপক্ষ যে কি রকম ভয় পাচ্ছেন তা বোঝা যায় ত্রিপুরার ম্যাজিস্ট্রেটের এক অদ্ভুত আদেশ থেকে। ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য কৃষকপ্রজা দলের মিঃ শাহেদ আলি ব্যবস্থা পরিষদের গত চার বৎসরকালের কার্যকলাপের এবং জেলা বোর্ডের কাজকর্মের আলোচনার জন্যে ত্রিপুরার নানাস্থানে সভা করবার অনুমতি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চান। আইন-সভার সদস্যের পক্ষে এরকম সভা করার পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানান যে, পাট-নিয়ন্ত্রণ বা অন্যান্য যে সব বিল পাস হয়ে গেছে সে সম্বন্ধে কোনো বক্তৃতা করতে দেওয়া হবে না। এই ব্যাপার নিয়ে ব্যবস্থা-পরিষদে চেপে ধরায় গভর্নমেণ্ট তদন্ত করবেন বলে' কোনোরকমে মুলতুবী-প্রস্তাব থেকে রেহাই পেয়েছেন।

বাঙলা ব্যবস্থা-পরিষদে কংগ্রেস দল রাজবন্দীদের প্রথম শ্রেণী বা বিশেষ শ্রেণীর বন্দী হিসেবে রাখবার জন্যে এক প্রস্তাব আনেন। কিন্তু প্রস্তাবটি সরকার পক্ষের বিরোধিতায় অগ্রাহ্য হয়ে যায়। কংগ্রেস পক্ষ থেকে বলা হয় যে, গত ডিসেম্বর মাসে রাজবন্দীরা স্বরাষ্ট্র-সচিবের কতকগুলো প্রতিশ্রুতি পেয়ে অনশন ত্যাগ করে, অথচ সেসব প্রতিশ্রুতি পালন করা হয় নি। কিন্তু গভর্নমেণ্ট উত্তরে বলেন যে, তাঁরা কোনো প্রতিশ্রুতি দেন নি।

সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সম্মেলন

খাঁ আবদুল গফুর খাঁর সভাপতিত্বে লাহোরে এক সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সম্মেলন হয়েছে। এই সম্মেলন এক প্রস্তাবে পাকিস্থান পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা করেছে। আইন-সভায় ও সরকারী চাকরীতে সাম্প্রদায়িক ভিত্তি বিলোপের জন্যেও দাবী জানানো হয়েছে। পরিশেষে এক প্রস্তাবে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পাঠানদের দেশপ্রেমের প্রশংসা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক

বল্কানের অবস্থা

বল্কানে জার্মান অগ্রগতি নানা রকম জল্পনা কল্পনার সৃষ্টি করেছে। বুলগেরিয়ায় জার্মান সৈন্য গ্রীক ও তুর্কী সীমান্তে চলে গেছে। এখন তারা কি করবে? গ্রীসেই তাদের হস্তক্ষেপ আসন্ন মনে হয়। জার্মান সৈন্য থ্রেসের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এমন অসমর্থিত সংবাদও রটেছে। জার্মানীকে ঘাঁটি দেবার জন্যে এবং এক্সিসের পক্ষে আস্‌বার জন্যে হিটলার গ্রীসকে চরমপত্র দিয়েছেন এমনও শোনা যাচ্ছে। তবে গ্রীস এখনো লড়াই চালাবার সংকল্প ঘোষণা করছে। যুগোস্লাভিয়া জার্মানীর সঙ্গে একটা অনাক্রমণ-চুক্তি এবং সোভিয়েটের সঙ্গে একটা মৈত্রী ঘোষণা একসঙ্গে করবে বলে' শোনা যাচ্ছে। এর চেয়ে উৎকৃষ্টতর পন্থা তার আর কিই বা আছে?

তুরস্কে এখনই জার্মানী হাত দেবে বলে' মনে হয় না। দার্দানেল্‌স সম্পর্কে সোভিয়েটের সঙ্গে একটা ফয়সালা না করলে সেটা তার পক্ষে সম্ভবও নয়। অথচ তুরস্কের মধ্যে দিয়ে না গেলে স্থলপথে জার্মানীর কিছু করবার উপায় নেই। ভূমধ্যসাগরে ইংরেজকে, তথা ইংরেজের বিশ্বব্যাপী আধিপত্যকে বিপন্ন করতে হলে জার্মানীকে ইরাকের বৃটিশ তৈলখনি আক্রমণ করতে হবে এবং সুয়েজ চড়াও করতে হবে। তা করতে হ'লে তুরস্কের ভিতর দিয়ে এগুতে হয়। গ্রীস দখল জার্মানীর অনেকটা সুবিধে হয় বটে, কিন্তু ভূমধ্যসাগর অতিক্রমের প্রশ্ন থেকে যায়। অতএব তুরস্ক সম্পর্কিত কূটনীতিই বল্কানে এখন প্রধান হয়ে উঠবে।

ফরাসী আফ্রিকা

এদিকে বহু জার্মান সামরিক অফিসার ফরাসী মরক্কোয় চলে' গেছেন। যুদ্ধবিরতি চুক্তির তত্ত্বাবধান তাঁদের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য হলেও শোনা যাচ্ছে সেখানকার শাসন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনাও তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করবেন। এ খবরের কতখানি সত্যি আর কতখানি প্রচারকার্য বলা যায় না। কারণ উত্তর-আফ্রিকায় ফরাসী গভর্নমেণ্টের সর্বময় প্রতিনিধি জেনারেল ওয়েগাঁ ভিশিতে এসে মার্শাল পেত্যাঁ প্রভৃতির সঙ্গে গোপন আলাপ করেছেন এবং তারপর এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, সমস্ত বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে ফরাসী সাম্রাজ্যকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা হয়েছে। জেনারেল ওয়েগাঁর ভিশিতে আগমনে জার্মানী বিরক্ত হয়েছে বলে' সংবাদ পাওয়া গেছে। এ সব থেকে মনে হয়, জার্মানী ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় ঘাঁটি করবার জন্যে যে চেষ্টা করছে, পেত্যাঁ-গভর্নমেণ্ট তার বিরোধী।

ভূমধ্যসাগরীয় যুদ্ধ

আফ্রিকায় বৃটিশ অভিযান ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডেই সব চেয়ে বেশী সফল হয়েছে। সেখানে বৃটিশবাহিনী এক লক্ষ বর্গ মাইল জায়গা দখল করেছে। এরিত্রিয়ায় এখনো কেরেনের কাছেই লড়াই চলছে। আবিসিনিয়ায় হাবসী গরিলা-যোদ্ধারা একটা ইতালীয় ঘাঁটি দখল করেছে। গ্রীকদের স্থানে লড়াই আগের মতোই চলছে; তারা আক্রমণে "সাফল্য" লাভ করছে বটে, কিন্তু তাতে ফল যে কি হচ্ছে জানা যায় না। মাল্টার উপর বিমানহানা চলছে। লিবিয়ার বিশেষ কোনো খবর নেই, শুধু বৃটিশ বিমান মাঝে মাঝে ত্রিপোলি বন্দর আক্রমণ করছে।

আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ

স্পেনের সোজা পশ্চিমে আটলাণ্টিকে আজোরেস দ্বীপপুঞ্জের কাছে জার্মান সাবমেরিন এক বৃটিশ কনভয়ের ৭খানি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে।

এদিকে বৃটিশ নৌবহর মেরুবৃত্তের অন্তর্গত নরওয়ের লোফোটেন দ্বীপপুঞ্জে অতর্কিত হানা দিয়ে ১০টি জার্মান জাহাজ জলমগ্ন করেছে, মৎস্য তৈলের কারখানা নষ্ট করে দিয়েছে এবং দ্বীপ থেকে ২১৫ জন জার্মান ও ১০ জন কুইস্‌লিংপন্থী নরউইজানকে ধরে' এনেছে।

আট সপ্তাহ অনেকটা চুপচাপ থাকার পর জার্মান বিমানবহর গত শনিবার রাত্রে বৃটেনে প্রবল আক্রমণ চালায়। স্কটল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের পূর্ব অংশে আক্রমণ প্রধানত নিবদ্ধ থাকে। লণ্ডনের উপরই আক্রমণ সবচেয়ে বেশী জোর হয়; ফলে যথেষ্ট লোক হতাহত হয়। পক্ষান্তরে বৃটিশ বিমানবহর জার্মানীর সামরিক কেন্দ্র ও জার্মান অভিযান-বন্দরগুলির উপরও প্রবল আক্রমণ চালায়।

ইজারা ও ঋণ বিল

মার্কিন সেনেটে কিছু কিছু সংশোধনসহ ইজারা ও ঋণ বিল পাস হয়ে গেছে। এখন বিলটি আবার প্রতিনিধিসভায় অনুমোদনের জন্যে যাবে; তারপর প্রেসিডেণ্ট বিলে স্বাক্ষর করবেন। দুচার দিনের মধ্যে ব্যাপারটা সমাধা হবে বলে' শোনা যাচ্ছে। বিলটি সেনেটে পাস হওয়ার পর মার্কিন নৌ-সচিব কর্নেল নক্স বলেছেন যে, এবার আমেরিকা বৃটেনকে এমন সাহায্য করবে যে, হিটলারের জয়লাভ অসম্ভব হবে।

জাপান

জাপানের পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মাৎসুওকা সলা-পরামর্শের জন্যে বার্লিনে যাচ্ছেন; পথে তিনি মস্কোতে সোভিয়েট নায়কদের সঙ্গে আলাপ করবেন। এই আলোচনার ফল যুদ্ধের দিক থেকে নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ হবে।

থাই-ইন্দোচীন বিরোধ মীমাংসা সম্পর্কে যে প্রস্তাব জাপান দিয়েছিল তার প্রধান বিষয়গুলি সম্বন্ধে তিন পক্ষই একমত হয়েছে।

* * * * *

রুমেনিয়ার ভূতপূর্ব রাজা ক্যারোল স্পেনে গভর্নমেণ্টের নজরবন্দী অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন আগে তিনি ও মাদাম লুপেস্কু রক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে পর্তুগালে পালিয়েছেন। এখন তাঁর পক্ষে বৃটেনে যাওয়াই স্বাভাবিক।

* * * * *

জার্মান প্রচার-সচিব ডাঃ গোয়েবেলস এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছেন যে, জার্মানী এই বছরের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ করবে।

১০-৩-৪১ — ওয়াকিবহাল

রঙ্গজগৎ

উত্তরায় রাজনর্তকী

ওয়াদিয়া মুভিটোন

এ চিত্র কাহিনীশূন্য নহে বরং কাহিনীটি সরল, স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ। উপন্যাসের তুলনায় ইহাকে গল্প বলা চলে। এ গল্পে ঘটনাগ্রন্থি অনাবশ্যক জট পাকাইয়া তোলে না—অথচ নাটকীয় পরিস্থিতির প্রাচুর্যে গল্পটির মোড়গুলিতে কৌতূহল ব্যাহত হয় না; বরং এই ক্লান্তিহীন ব্যগ্রতার মধ্যে পাঠক, শ্রোতা বা দর্শক নিজেকে হারাইয়া বসে। একটি নর্তকীর পরিবেষ্টনী মন্থিত করিয়া গল্পটি ঘনীভূত হইয়াছে। নর্তকী এ রাজদরবারে নূতন আসিয়াছে; কিন্তু যেখান হইতে এই কাহিনীর সুরু সেখানে



'রাজনর্তকী' চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় সাধনা বোস

রাজার একমাত্র পুত্র ও স্বয়ং নর্তকী পরস্পরের প্রেমাসক্ত এবং হৃদয়দানও এক প্রকার হইয়া গিয়াছে। সেদিক হইতে কাহিনীর কৈশোরাবস্থা বহুপূর্বেই উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং সেজন্য এ নটী যে নূতন তাহা বার বার স্মরণ করাইয়া চিত্রনাট্যকার শ্রোতার মনে হানা দিয়াছেন। প্রথমাবধিই ইহাদের প্রেম গভীর ও নিখাদ। বস্তুত কাহিনীটিই প্রেমভক্তিমূলক কিন্তু পার্থিব প্রেমই সেখানে প্রাধান্য পাইয়াছে। ফলে এই প্রেমে বাস্তব প্রতিবন্ধক দাঁড়াইল রাজৈশ্বর্য। যুবরাজের অভিষেক হইবে, সে অভিষেকে আসিবেন স্বয়ং প্রভুপাদ কাশীশ্বর, সঙ্গে আনিবেন প্রভুর পদধূলি এবং ইহারই সুযোগে ত্রিপুরার কন্যাও যুবরাজের জন্য বাগদত্তা হইয়া যাইবেন—এই দুই রাজ্যের অপ্রীতিকর সম্পর্ক এইভাবেই মিটিয়া যাইবে মহারাজ জয়সিংহের ইহাই অভিপ্রায়। কিন্তু যুবরাজ নর্তকীকে লইয়া উন্মত্ত। প্রভুপাদ কাশীশ্বরকে অভ্যর্থনার জন্য যাইতে তাঁহার পা নড়ে না, রাসলীলায় গা ঢালিয়া দেন। কিন্তু প্রভুপাদ আসিয়াছেন এবং গুণমুগ্ধ কাশীশ্বর মধুচ্ছন্দার নৃত্য-বিলাসে রাসপ্রেম কুড়াইয়া পাইয়াছেন। নির্ভুল চিত্তে সেই প্রেমিকার ললাটে প্রভুর পদধূলি আঁকিয়া দিতে যাইতেই রাজ কণ্ঠস্বর জানাইয়া দিল সে নটী! কাশীশ্বর পার্থিব সংস্কার-বশত কাঁপিলেন, নিজেকে ধিক্কার দিলেন, কিন্তু ধ্যানে এই একটি মাত্র মূর্তিই বার বার ফুটিয়া উঠে কেন? প্রভুপাদের এ সংশয় কাটে না, রাজনর্তকীর আবেদন ও অভিযোগ কাঁটার মত ফুটিতে থাকে।

কিন্তু যুবরাজের অভিষেক ব্যবস্থা প্রস্তুত। প্রেমিকা নর্তকীও দেবতার পদে কল্যাণাঞ্জলি দিতে চাহে। কিন্তু সমাজের নিষেধ আছে। সামাজিক দেবতা যেখানে নাই, যেখানে দেবতা পাথর—সেখানেই নর্তকীর পূজা সারিতে হয়। যুবরাজ তাহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। বাগ্‌দানোৎসবেও এমনি বাধা, যুবরাজ নিজেই বাগ্‌দান করে—মধুচ্ছন্দা তাহার বাগ্‌দত্তা বধূ! কিন্তু সমাজ মানিলে প্রেম ও সিংহাসন একই সঙ্গে রাখা চলে না। তাই প্রেম বাঁচাইতে সিংহাসন ছাড়িতে হয়।

প্রভুপাদের ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া যুবরাজের বাগ্‌-দত্তা বধূ মুহূর্তের আত্মত্যাগী মোহে এই বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিতে স্বীকার করে। রাজনর্তকীর প্রত্যাখ্যানে যুবরাজ মধুচ্ছন্দার প্রেমকে ভুল বোঝে। কিন্তু প্রভুপাদের দ্বন্দ্ব ঘোচে না। তাঁহাকে নটীর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার প্রেম স্বীকার করিতে হয়। নটীর হাতেই প্রভুর চরণধূলি অর্পণ করেন। প্রত্যাখ্যাত যুব-রাজ জ্বলিতেছেন, স্বার্থলুব্ধ ব্যক্তিরা প্রজাদের জ্বালাইতেছে, রাজ-নর্তকী মধুচ্ছন্দা প্রেম ও ভক্তির দোলনায় দুলিতেছে। মানুষের এত স্বার্থত্যাগ সয় না—বিষজর্জরিত দেহের লুপ্ত দৃষ্টি লইয়া নর্তকী মৃত্যুর স্তব্ধ নৃত্যে পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দেয়।

নিঃসহায় মানুষের বাস্তববোধ ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার এই যে দ্বন্দ্ব এবং পরিশেষে মানুষের এই যে অনিবার্য পরাজয় নর্তকীর মৃত্যুতে (আত্মহত্যায়!) তাহা ভারী সুন্দর ফুটিয়াছে।

রাজনর্তকী নর্তকী-প্রধান চরিত্র এবং এ চরিত্রের কলুষ আমরা জানি না। নর্তকী শব্দের পেশাদারী ইঙ্গিত ছাড়া আলোচ্য রাজনর্তকীর সমগ্র পরিবেশ ও নর্তকীর সংযত গতি-ভঙ্গী শ্রদ্ধাকর্ষণ করে এবং ভীড়ের মধ্য হইতে মুগ্ধ বিস্মিত কাশীশ্বর যখন বাঙ্ময় হইয়া উঠেন তখন মনে হয় এই কথাটাই অপর সকলে বলিতে চাহিয়াছিল, কাশীশ্বর সেই অনুভূতিকে কেবলমাত্র বাণী দিয়াছেন। ইহার পরই মানুষের ব্যক্তিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব। সে দ্বন্দ্ব প্রভুপাদ কাশীশ্বরের, সে দ্বন্দ্ব রাজ-নর্তকীর।

এই দ্বন্দ্বকে যাঁহারা রূপ দিতে পারেন বা দিতে পারিয়া-ছেন তাঁহাদের অভিনয়ই সার্থক। সে সার্থকতা রাজনর্তকীর ভূমিকায় সাধনা বসু নিঃসন্দেহে অর্জন করিয়াছেন। প্রভু ও প্রভুপাদের প্রতি এই নর্তকীর শ্রদ্ধা বরাবরের বলিয়াই মনে হয়; কাজেই, তাহার মনে অকস্মাৎ কোন ধর্মবিপ্লব আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই বরং প্রভুপাদের আবির্ভাবে তাহাকে খুশীই মনে হইয়া-ছিল। আধ্যাত্মিক জীবনের এই ভিত্তিই পরবর্তী জীবনে তাহাকে ত্যাগের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল; প্ররোচনা পাইতেই তাহার উপলব্ধি হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনপথে পা বাড়াইলে বাস্তবজীবন মানুষের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে; তখন জীবন বা অস্তিত্বের মূল্য কমিয়া যায়; আধ্যাত্মিক আদর্শের [illegible]

বাস্তব জীবনের বলিদান হয়—দেহের অনাস্তিত্বই সেখানে সত্য হইয়া উঠে।

নটীর জীবনে এই এই বেদনা, এই ব্যথাবোধ তীব্র হইয়া উঠে তখন—যখন কেবলমাত্র নটী বলিয়াই প্রভুর চরণধূলি পাওয়ার অযোগ্যতা ঘোষিত হয়। সাধনা বসু এই প্রত্যাখ্যানের মুহূর্তে প্রশংসনীয় অভিনয় করিয়াছেন। মনের এই দ্রুত বিবর্তন মুখে ফুটাইয়া তোলা বড় সহজ নহে। কিন্তু তাহা সম্ভব করিয়াছেন—প্রত্যাখানের পর অপ্রতিভ লজ্জার ভাব, তাহাকে ছাপাইয়া প্রতিহিংসার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা, তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের দুর্ব্বল আবহাওয়া চাপিয়া বসিলে একেবারেই ভাঙিগয়া পড়া—পর পর এই কয়টি ভাব তিনি দুর্লভ নিপুণতায় ফুটাইয়াছেন। ভারতীয় চিত্রে এরূপ বিরল—দেবিকারাণী ছাড়া কাহারও কথা সহসা মনে পড়ে না। তাঁহার গতিতে কোথাও চাপল্য নাই, আড়ষ্টতাও নাই। কথনভঙ্গির সহিত দেহভঙ্গিমায় অনাবশ্যক ব্যঙ্গ নাই। যেখানে বাহবা পড়িয়াছে সেখানে বাহবা দিবার মতই হইয়াছে। সাধনা বসুর নৃত্যের খ্যাতি আছে এবং সে খ্যাতি অক্ষুন্নই আছে। অভিনয়ও অপূর্ব হইয়াছে। একবার কেবল এ অভিনয় নামিয়া গিয়াছে। বিবাহের আয়োজনে এই গৃহ ছাড়িবার উদ্যোগে। যুবরাজকে প্রত্যাখ্যান করার অভিনয় যেমন, প্রভুপাদের নিকট স্বার্থত্যাগের করুণ অভিনয়ও তেমন অনবদ্য। শেষ দৃশ্য পর্যন্ত তাহার অভিনয় সমপর্যায়ে ও সমগতিতে চলিয়াছে। এই দ্বন্দ্বময় জীবনের অবসান ফুটাইয়া তুলিতে সাধনা বসু বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। অনুরূপ কৃতিত্ব অহীন্দ্র চৌধুরী যদি পাইতেন আমরা খুশী হইতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অহীন্দ্রবাবুর মত অমন প্রতিভাশালী অভিনেতা সুযোগের অভাবেই হউক বা আর যে কোন কারণেই হউক দর্শকের মনে দাগ কাটিতে পারেন নাই। রাজনর্তকীর বিরুদ্ধ বিবেকের ভূমিকা তাঁহার। উভয়ই সমান গতি ও ছন্দে চলিলে এ চিত্র কেবলমাত্র এই দুইটি চরিত্রের জন্যই ঐতিহাসিক হইতে পারিত। তবুও বলিতে হয় পর্যায়ক্রমে তাঁহাকেই দ্বিতীয় স্থান দিতে হয়।

জ্যোতিঃপ্রকাশের চরিত্র চিত্রণ ও প্রকাশভঙ্গী তৃতীয় স্থান পাইলেও আমাদের ভাল লাগে নাই। চেহারা মানানসই মানি এবং ইহাও মানি যে জ্যোতিঃপ্রকাশ কোথাও অভিনয় চাপল্য—প্রকাশ করে নাই। কিন্তু অভিনয়দোষে চরিত্রটি কেবলমাত্র দুর্বিনীত, উদ্ধত ও মোহগ্রস্তই মনে হইয়াছে; আর কোন কোমল অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বরং প্রত্যাখ্যাত হইবার পর রাজনর্তকীর প্রতি তাহার কড়া কথা বলিবার ভঙ্গীটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

অপর সকলের অভিনয় আমাদের মতে অনুল্লেখযোগ্য। ইহার জন্য পরিচালক সম্পূর্ণ দায়ী। পরিচালক মূলসূত্রের দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়া পরিবেষ্টনীকে যেন ফুটাইতে চাহেন নাই। নগর সংকীর্তন অশ্রাব্য হইয়াছে এবং এখানে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে। গ্রাম, গ্রামের ভীড়, গ্রাম্য আবহাওয়া বা মনিপুরী আবহাওয়া একেবারেই উপেক্ষিত হইয়াছে। ভীড়ের চেহারা বিজাতীয়। এ কাজগুলি নেহাৎ দায়সারা হইয়াছে, যেন না করিলে নয়। পরিচালকের পক্ষে এরূপ লজ্জাকর পক্ষপাতিত্ব ও ঔদাসীন্য অথবা অক্ষমতা চিত্রকে বহুলাংশে দুর্ব্বল করিয়াছে। অনেক ক্লোজ আপে গতিমন্থরতা ধরা পড়িয়াছে এবং চিত্রগ্রহণও সে সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হইয়াছে। ভাঁড় (মহাকাল ও আচংফা) এবং সখী (প্রিয়া ও রিয়া) দুইজন যা ইচ্ছা তাই (যাচ্ছেতাই) অভিনয় করিয়া গিয়াছে। তবে ইহার মধ্যেও আচংফা কিছুটা উৎরাইয়াছে। হাস্যরসই কোথাও জমে নাই। অন্যথা উৎকৃষ্ট চিত্রটির এই দুর্বলতা পীড়াদায়ক। কাহারও গান ভাল হয় নাই। গানের দিক দিয়া এ চিত্র জনপ্রিয় হইবার কোন কারণ নাই। এ চিত্রের মেকাপ পরিষ্কার হইয়াছে—বিশেষ সাধনা বসুর মেকাপ প্রশংসারযোগ্য। শব্দগ্রহণে অসঙ্গতি আছে এবং ফটোগ্রাফির একটি দোষের উল্লেখ করিতে হয়। ছবি মাঝে মাঝে এমন অ্যাঙ্গল হইতে তোলা হইয়াছে যাহাতে চতুষ্কোণ ফোকাস স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং মনে হয় ফ্রেমে-আঁটা ছবি দেখিতেছি—সেখানে চিত্রের গতি ও কাহিনীর প্রবাহ হইতে হঠাৎ প্রেক্ষাগৃহে ফিরিয়া আসিতে হয়। বিলাতী ছবিতে এ ভুল থাকে না—ছবির ঘটনা সমস্ত পর্দায় মিলিয়া মিশিয়া যায়।

এ চিত্রের সহিত আধুনিক সমাজের সম্পর্ক নাই, তবুও ইহা বিদেশী ও বিজাতীয় নহে। এ চিত্রে বর্তমান সমস্যার আলোকপাত হয় নাই, অথচ ইহা সমাহৃত হইতে বাধ্য। কেননা, ইহাতে এমন একটি সূক্ষ্ম রসস্ফূর্তি আছে যাহা বাঙলা চিত্রে একেবারেই দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছিল। এ চিত্রের আয়ু দীর্ঘ সন্দেহ নাই।

ছায়ালোকের টুকিটাকি

বাহবা দেবকী বোস! যে রাঢ়ের চৈতন্য মহাপ্রভু বাঙলাকে নাচিয়েছিলেন; সে রাঢ়েরই যোগ্য লোক বটে তুমি। 'নর্তকী'তে তুমি শ্রীমতী দেশাইকে নাচালে। আর 'নর্তকী' নাচালো কোলকাতার মারোয়াড়ী গণেশদের।

'গেল রাজ্য গেল মান
কাঁদিছে মেড়ুয়া জান।

কোথাকার কোন্ আদ্দিকালের এক নামগোত্রহীন মন্দিরের 'দেবদাসী' নিয়ে কর্‌লে ছবি। সে ছবিতে কোনো শেঠজীর কেমন একটু চরিত্তির দেখে—এ'কালের মারোয়াড়ী শেঠরা দেখো কেমন বে-সামাল হ'য়ে পড়েছে। গোস্‌সায় গোত্তা খেয়ে তারা নাচের তালে তালে পড়চে আর 'ফাল্' মারচে।—সাবাস! সাবাস!

আর—সাবধান বাঙালী! সাবধান বাঙলার চলচ্চিত্র নির্মাতাদল! যাও, এক্ষুণি গিয়ে বাঙলার ডাল-ভাত-দাতা মারোয়াড়ী মহাপ্রভুদের পা জড়িয়ে ধরো। নয় তো উপায় নেই—সোনার বাঙলা মারোয়াড়ের মরুভূমি হয়ে যাবে। বাঙলার শক্তি সামর্থ আবু পাহাড়ের চাপে গুঁড়িয়ে যাবে। বাঙলার মস্তিষ্কে সম্বর হ্রদের নুন লেগে ঘুন ধরবে। সুজলাসুফলা বাঙলায়, গঙ্গার কূলে—বাঙালী পরিচালিত, বাঙলার অর্থে সমৃদ্ধ যত সিনেমা-সংক্রান্ত কোম্পানী আছে; সব মহাজন মারোয়াড়ীর মোটা ভুঁড়ির কৃপায় বঞ্চিত হয়ে টাকা বৃষ্টির অভাবে চোখে সর্ষেফুল দেখতে দেখতে পশ্চিমের আফিং ক্ষেত্রের উপর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একদম রাজপুতনার মরুভূমিতে পড়ে খাবি খাবে।—সাবধান!

আমার ভাইপো বদ্ধপাগল। সে বলে, দুনিয়ায় পাগল নয় কে? আমি পাগল। নিউ সিনেমা পাগল। তার হাউসে দেখানো হয় ছবি 'পাগল'। তার দর্শকরা পাগল। অভিনেতা অভিনেত্রীরা পাগলা চিড়িয়া। আর জাসু-পাগল হচ্ছে—পাগলের পরিচালক এবং কাহিনী রচয়িতা।

ভাইপোটি ভারী চিন্তায় পড়েছে। এত পাগলের স্থান কোথায় হবে! সারা ভারতে আর কটাই বা পাগলা গারদ আছে?

অবিশ্যি পাগলের কথা কেউ কানে নেয় না—

পাগলে কি না বলে
ছাগলে কি না খায়।

পদ্মা ও জ্যোতিঃপ্রকাশ পাপের পথে—

এ্যাঁ.........ওঃ! 'পাপের পথে' নামক একখানা ছবিতে অভিনয় করচে! পরিচালক প্রফুল্ল রায়। —তাই বলো!

আমি ভেবেছিলুম...........! ওটা! ....ওহো! কায়দা ক'রে বিজ্ঞাপন দেওয়া! —ভালো।

ফণী মজুমদার অচিরেই 'অপরাধ' ছবি তুলবেন— কোন্ এক অখ্যাত অজ্ঞাত লোকের লেখা! তাঁর এ অপরাধের কি তুলনা আছে? তিনি কেন মানতে চান না বাঙলার তথাকথিত সাহিত্যিকদের গল্পের দৌলতেই তাঁর যত প্রসিদ্ধি। পরিচালক ফণী মজুমদারকে বাজারে চেনালেন তাঁরা। এই যে বাঙলার নানা কাগজে ঠারেঠুরে গালি দিয়ে ধম্‌কিয়ে সম্‌ঝানো হচ্ছে যে, তথাকথিত হাম্‌বড়া সাহিত্যিকদের গল্প নাও, নয় তো পরিচালক হিসেবে 'পপাতো খাত্তামে' হবে। তবু কোন্ সাহসে তাঁর এত ধৃষ্টতা? পরিচালক ফণী মজুমদারের জানা উচিত ছিল, বাঙ্গালের গোয়ার্ত্তুমি, তথাকথিত সাহিত্যিকরা কলমের এক খোঁচাতেই ঠাণ্ডা করে দিতে পারেন। তাঁরা আফিং খেয়ে ঝিমোন না।

—দূরবীণ

খেলাধুলা

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

আন্তঃপ্রাদেশিক রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা শেষ হইয়াছে। গত বৎসরের বিজয়ী মহারাষ্ট্র দল পুনরায় এই বৎসরের বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছে। রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সূচনা হইতে বোম্বাই দলের পর মহারাষ্ট্র দল পর পর দুই বৎসর এই প্রতিযোগিতা বিজয়ী হইল। মহারাষ্ট্র দলের সাফল্য প্রশংসনীয় ও কৃতিত্বপূর্ণ। এই বৎসরের রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলায় মহারাষ্ট্র দলের খেলোয়াড়গণ যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন ইতিপূর্বে ভারতের কোন প্রাদেশিক দলের খেলোয়াড়গণের পক্ষে সেইরূপ করা সম্ভবপর হয় নাই। মহারাষ্ট্র দল এ খেলায় রণজি ক্রিকেট প্রইতিযোগিতায় ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে। মহারাষ্ট্র দলের এই অসাধারণ সাফল্যের মূলে প্রবীণ ক্রিকেট খেলোয়াড় অধ্যাপক দেওধরের দান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ৫০ বৎসরের প্রবীণ খেলোয়াড় অধ্যাপক দেওধর প্রতিযোগিতার সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত তরুণ খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত দলকে অতি বিচক্ষণতার সহিতই পরিচালিত করিয়াছেন। শত বাধা বিপত্তি উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও অধ্যাপক দেওধর কোন সময়েই বিচলিত হন নাই। প্রতিযোগিতার প্রথম খেলায় দুর্ধর্ষ বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে তাঁহার নিজস্ব ২৪৬ রাণ দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের প্রাণে যে অপূর্ব উৎসাহ দান করিয়াছিল তাহারই নিদর্শন পরবর্তী খেলাগুলিতে তাহারা দিয়াছে। কি ব্যাটিংয়ে, কি বোলিংয়ে, কি ফিল্ডিংয়ে সকল বিষয়েই তিনি দলের খেলোয়াড়দের সমানে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার বিচক্ষণ নির্ভুল পরিচালনা দলকে জয়যুক্ত করিয়াছে। প্রাদেশিক দল হিসাবে মহারাষ্ট্র দল শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই বৎসরের রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় মহারাষ্ট্র দলের খেলোয়াড়গণ যেরূপ উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে ভবিষ্যতে ভারতীয় টেস্ট দল গঠন করিতে হইলে ইহাদের মধ্যে অনেককে লইতে হইবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।



রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বিজয়ী মহারাষ্ট্র ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়গণ

খেলোয়াড়গণের কৃতিত্ব

মহারাষ্ট্র দলের ভি এস হাজারী ব্যাটিংয়ে অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। দলের পক্ষে ৬টি ইনিংসে খেলিয়া তিনি প্রতি ইনিংসে গড়পড়তায় ১৪১ রাণ করিয়াছেন। ইহার পরে তরুণ খেলোয়াড় এস ডবলিউ সোহনীর নাম। তাঁহার ব্যাটিং গড়-পড়তা ১৩১ হইয়াছে। অধ্যাপক দেওধর ইহার পরেই স্থানলাভ করিয়াছেন। ৫০ বৎসরের প্রবীণ খেলোয়াড়ের পক্ষে এইরূপ কৃতিত্ব প্রকৃতই প্রশংসনীয়। বোলিং বিষয়ে সারভাতির কৃতিত্ব অপূর্ব। অধ্যাপক দেওধরের মতে সোহনী এই বৎসরের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। বোলিংয়ে সোহনীর গড়পড়তা হইয়াছে ২১ এবং ব্যাটিংয়ে হইয়াছে ৪৮। ব্যাটিং ও বোলিং উভয় বিষয় সোহনী অপূর্ব সাফল্যলাভ করায় অধ্যাপক দেওধরকে উক্তরূপ উক্তি করিতে হইয়াছে।

ব্যাটিংয়ে মহারাষ্ট্র দলের কৃতিত্ব

ব্যাটিং বিষয়ে মহারাষ্ট্র দল যেরূপ অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে বর্তমানে যে কোন ভারতীয় দলের পক্ষে তাহা কল্পনাতীত। এই বৎসরে মহারাষ্ট্র দল পর পর ইনিংসের মোট রাণ সংখ্যার দুইবার নূতন রেকর্ড করেন। বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে ৬৭৫ রাণ করিয়া প্রথম রেকর্ড করে। তাহার পরেই উত্তর ভারত দলের বিরুদ্ধে ৭৯৮ রাণ করিয়া পূর্বের রেকর্ড ভঙ্গ করেন। এক ইনিংসে তিনজন খেলোয়াড় শতাধিক রাণ করিয়া পৃথিবীর রেকর্ডের সমান করিয়াছে। ইহা ছাড়া অধ্যাপক দেওধর পর পর তিনজন খেলোয়াড়ের সহযোগিতায় শতাধিক রাণ সংগ্রহ করিয়া পৃথিবীর নূতন রেকর্ড করিয়াছেন। পশ্চিম ভারত দলের বিরুদ্ধে সোহনী ও হাজারী একত্রে ৩৪২ রাণ করিবার পর নট আউট থাকিয়া যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন ভারতীয় কোন দুইজন খেলোয়াড়ের পক্ষে সেইরূপ করা সম্ভবপর হয় নাই। মহারাষ্ট্র দলের খেলোয়াড়গণ রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলায় ব্যাটিং, বোলিং বিষয়ে কিরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

মহারাষ্ট্র দলের পক্ষে কাহারা শতাধিক রাণ করিয়াছেনঃ—

(১) অধ্যাপক দেওধর ২৪৬ রাণ (বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে), ১৯৬ রাণ (উত্তর ভারত দলের বিরুদ্ধে)।

(২) এস ডবলিউ সোহনী ২১৮ রাণ নট আউট (পশ্চিম ভারত রাজ্য দলের বিরুদ্ধে), ১৩৪ রাণ (গুজরাট দলের বিরুদ্ধে), ১২০ রাণ (বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে), ১০৪ রাণ (মাদ্রাজ দলের বিরুদ্ধে)।

(৩) ভি এস হাজারী ১৬৪ রাণ নট আউট (পশ্চিম ভারত রাজ্য দলের বিরুদ্ধে), ১৩৭ রাণ (মাদ্রাজ দলের বিরুদ্ধে), ১১৭ রাণ (গুজরাট দলের বিরুদ্ধে)।

(৪) আর ডি ভাজেকার ১২০ রাণ (উত্তর ভারত দলের বিরুদ্ধে)।

(৫) কে এম যাদব ১১৫ রাণ (উত্তর ভারত দলের বিরুদ্ধে)।

ব্যাটিং গড়পড়তা

মহারাষ্ট্র দলের রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

খেলোয়াড়		ই	ন আ	রা	স ই	গড়ে
ভি হাজারী	...	৬	২	৫৬৫	১৬৪*	১৪১
এস সোহনী	...	৬	১	৬৫৫	২১৮*	১৩১
ভি দেওধর	...	৬	০	৫০৮	২৪৬	৮৪
সি সারভাতি	...	৪	১	১৪৬	৬৩	৪৮
উষাক আমেদ	...	২	০	৯২	৫৪	৪৬
কে যাদব	...	৫	১	১৭৬	১১৫	৪৪
আর ভাজেকার	...	৫	০	২০৮	১২০	৪১
পট্টবর্ধন	...	৩	১	৭৭	৫৬*	৩৮
আর নিম্বলকার	...	৫	০	১৭২	৬৬	৩৪
ওয়াই গোখেল	...	৪	০	১১০	৭৫	২৭
এম নাইডু	...	৩	০	২৩	২০	৭

ইহা ছাড়া এই দলে কে ভাণ্ডারকার, জাঠের রাজাসাহেব, বি মোহনী ও এস জি পাওয়ার খেলিয়াছেন।

বোলিং গড়পড়তা

মহারাষ্ট্র দলের রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বোলিংয়ের গড়পড়তা নিম্ন প্রদত্ত হইলঃ—

খেলোয়াড়		ও	মে	রা	উ	গড়ে
সারভাতি	...	২১৭	৪১	৫১০	২৪	২১
কে যাদব	...	৮৬	১৬	২২৩	৭	৩১
পট্টবর্ধন	...	৯১	৩০	১৮০	৫	৩৭
ভি হাজারী	...	১৮৮	৫৬	৪৯৫	১৩	৩৮
এস সোহনী	...	১৬৯	২৭	৪৫০	৯	৫০

ইহা ছাড়া উষাক আমেদ, বি মোহনী, সিন্ধি ও অধ্যাপক দেওধর বোলিং করিয়াছিলেন।

ফাইনাল খেলার বিবরণ

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার এই বৎসরের ফাইনালে মহারাষ্ট্র দলের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই খেলা চারিদিন ব্যাপী হয়। মাদ্রাজে এই খেলা হয়। মাদ্রাজ দল টসে জয়ী হইয়া প্রথম ব্যাটিং গ্রহণ করে। মাত্র ১৪৫ রাণ করিয়া মাদ্রাজ দল প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করে। এন ভেঙ্কটসন ও বি কৃষ্ণরাও ব্যতীত মাদ্রাজ দলের কোন খেলোয়াড় ব্যাটিংয়ে সুবিধা করিতে পারেন না। মহারাষ্ট্র দলের যাদব ২৩ রাণে ৪টি ও সারভাতি ২৬ রাণে ৩টি উইকেট পান। পরে মহারাষ্ট্র দল খেলা আরম্ভ করিয়া দিনের শেষে ৬ উইকেটে ১১৩ রাণ করে। মাদ্রাজ দলের রঙ্গচারী ও রামসিংহের বোলিং মহারাষ্ট্র দলের বিপর্যয় সৃষ্টি করে। অনেকেই মহারাষ্ট্র দলের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হন। কিন্তু অধ্যাপক দেওধর হতাশ হন না। ঐদিনের শেষে তিনি যে বিবৃতি প্রদান করেন তাহাতে তিনি বলেন, "খেলার বর্তমান পরিস্থিতি বেশ চাঞ্চল্যকর। তবে আমাদের জয়ের আশা যায় নাই। হাজারী ও সারভাতির খেলা অনেকখানি আশাপ্রদ।" তাঁহার কথা শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়। দ্বিতীয় দিনের খেলা আরম্ভ হইলে দেখা যায় হাজারী ও সারভাতি বেশ দৃঢ়তার সহিত খেলিতেছেন। মাদ্রাজ দলের শত চেষ্টাও মহারাষ্ট্র দলকে বিপর্যস্ত করিতে পারে না। ২৮৪ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ হয়। হাজারী ১৩৭ রাণ করেন। রঙ্গচারী ৭১ রাণে ৪টি উইকেট পান। মাদ্রাজ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিয়া দিনের শেষে ২ উইকেটে ১০৭ রাণ করে। দ্বিতীয় দিনের শেষে অধ্যাপক দেওধর বলেন, "আমরা খেলায় জয়ী হইব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" তৃতীয় দিনের খেলায় মাদ্রাজ দল ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। তাঁহারা দ্বিতীয় ইনিংস ৩৪৭ রাণে শেষ করেন। মহারাষ্ট্র দল ২০৯ রাণ পশ্চাতে পড়ে। সারভাতি ৮৩ রাণে ৬টি উইকেট পান। মহারাষ্ট্র দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে ও কেহ আউট না হইয়া দিনের শেষে ৫২ রাণ করে। অধ্যাপক দেওধর এইদিন বলেন, "আমাদের জয় সুনিশ্চিত।" চতুর্থ দিনে মহারাষ্ট্র দল ৪ উইকেটে ২১০ রাণ করিয়া খেলায় ৬ উকেটে বিজয়ী হয়। এস ডবলিউ সোহনী ১০৪ রাণ করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

খেলার ফলাফলঃ—

মাদ্রাজ দলঃ—১ম ইনিংসে ১৪৫ রাণ।

(ভেঙ্কটসন ৩১, কৃষ্ণরাও ২৯ নট আউট; যাদব ২৩ রাণে ৪টি, সারভাতি ২৬ রাণে ৩টি উইকেট পান)।

মাদ্রাজ দলঃ—২য় ইনিংসে ৩৪৭ রাণ।

(জনষ্টন ৪৯, রামসিং ৭১, নেলার ৫৪, গোপালন ৪৩, ল ৩৩, মাধব রাও ৩৪; সারভাতি ৮৩ রাণে ৬টি, হাজারী ৩৮ রাণে ২টি উইকেট পান)।

মহারাষ্ট্র দলঃ—১ম ইনিংসে ২৮৪ রাণ।

(হাজারী ১৩৭, সারভাতি ৩৩, সিন্ধি ২২ নট আউট; রামসিং ৫৭ রাণে ২টি, রঙ্গচারী ৭১ রাণে ৪টি, ভেঙ্কটসন ৬০ রাণে ৩টি উইকেট পান)।

মহারাষ্ট্র দলঃ—২য় ইনিংসে ৪ উইকেটে ২১০ রাণ।

(সোহনী ১০৪, দেওধর ৩২, ভাজেকার ২৬; রামসিং ৫৪ রাণে ৩টি, রঙ্গচারী ৩৩ রাণে ১টি উইকেট পান)।

মহারাষ্ট্র দল কিরূপে বিজয়ী হইয়াছেঃ—

(১) বোম্বাই দলকে প্রথম খেলায় ২৫ রাণে পরাজিত করে। এই খেলায় মহারাষ্ট্র দল ৬৭৫ রাণ করে ও বোম্বাই দল ৬৫০ রাণ করে।

(২) গুজরাট দলকে দ্বিতীয় খেলায় ১৮৩ রাণে পরাজিত করে। এই খেলায় মহারাষ্ট্র ৫১৮ রাণ ও গুজরাট ৩৩৫ রাণ করে।

(৩) পশ্চিম ভারত রাজ্য দলকে তৃতীয় খেলায় প্রথম ইনিংসের খেলায় পরাজিত করে। পশ্চিম ভারত রাজ্য দল ৪৫৯ রাণ করে। মহারাষ্ট্র তাহার প্রত্যুত্তরে ৩ উইকেটে ৪৬০ রাণ করে।

(৪) উত্তর ভারত দলকে চতুর্থ খেলায় ৩৫৬ রাণে পরাজিত করে। এই খেলায় মহারাষ্ট্র দল ৭৯৮ রাণ ও উত্তর ভারত দল ৪৪২ রাণ করে।

(৫) ফাইনাল খেলায় মাদ্রাজ দলকে ৬ উইকেটে পরাজিত করিয়াছে। এই খেলায় মাদ্রাজ দল ১৪৫ ও ৩৪৭ রাণ করে। মহারাষ্ট্র ২৮৪ ও ৪ উইকেটে ২১০ রাণ করে।

রণজি প্রতিযোগিতার পূর্ববর্তী বিজয়ীগণ

১৯৩৪-৩৫ সালে বোম্বাই দল।
১৯৩৫-৩৬ সালে বোম্বাই দল।
১৯৩৬-৩৭ সালে নবনগর দল।
১৯৩৭-৩৮ সালে হায়দরাবাদ দল।
১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙলা দল।
১৯৩৯-৪০ সালে মহারাষ্ট্র দল।

সমর বার্ত্তা

৫ মার্চ্চ—।

বেলগ্রেডের সংবাদ প্রকাশ, ট্রেন, লরী বাস ও বিমান ভর্ত্তি জার্ম্মান সৈন্য অবিরাম স্রোতে বুলগেরিয়ার মধ্য দিয়া গ্রীক সীমান্ত অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

বৃটেন বুলগেরিয়ার সহিত রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে।

ভিয়েনার জেনারেল আণ্টনেস্কুর ও মার্শাল গোয়েরিং-এর মধ্যে এক বৈঠক হয়।

টোকিওর সংবাদে প্রকাশ, জাপবাহিনী টংকিং উপসাগরস্থিত পাখই নামক স্থানটি দখল করিয়া লইয়াছে। ইন্দোচীনের সীমান্ত হইতে উহার দূরত্ব মাত্র ৭০ মাইল।

গতকল্য বৃটিশ বিমানবহর নরওয়ে উপকূলে লোফোটেন দ্বীপপুঞ্জের কার্ডিফের উপর হানা দিয়া জার্ম্মান প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর আক্রমণ চালায়।

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বৃটেনের ও মিত্রপক্ষের মোট ৬০৮৬৮ টন জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে; জাহাজগুলির মধ্যে ১৩টি বৃটিশ (মোট ৫৩৮৩৪ টন) এবং একটি মিত্রপক্ষীয় (৭০৩৪ টন)।

৬ মার্চ্চ—

সাংহাই-এর সংবাদে প্রকাশ যে, থাই-ফরাসী যুদ্ধবিরতি চুক্তির মেয়াদ অনির্দিষ্টকালের জন্য বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং এই চুক্তি বাতিল করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নোটিশ দেওয়ার পর তাহা করিতে হইবে।

আদ্রিয়াতিক সাগরে একটি গ্রীক সাবমেরিনের আক্রমণে একটি ইতালীয়ান জোগানদার জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে—একটি গ্রীক সরকারী ইস্তাহারে ইহা ঘোষিত হইয়াছে।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বুলগেরিয়াকে শত্রু অধিকৃত রাজ্য বলিয়া গণ্য করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বৃটিশ এয়ার ভাইস মার্শাল ব্রীজ যুদ্ধক্ষেত্রে থাকাকালীন বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন।

ইস্তাম্বুল-এর এক সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মান পদাতিক বাহিনী এখন গ্রীস সীমান্ত হইতে ১৫ মাইল দূরে রহিয়াছে।

মিঃ ইডেনের গ্রীস পরিদর্শন শেষে এক সরকারী ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বল্কান পরিস্থিতির সমস্ত বিষয়ে বৃটিশ ও গ্রীক গভর্ণমেণ্টের মধ্যে 'পূর্ণ মতৈক্য' হইয়াছে।

আবিসিনিয়ায় হাবসী সৈন্যেরা গরিলা যুদ্ধ চালাইয়া দুইটি স্থান দখল করিয়াছে।

টোকিওর সংবাদে প্রকাশ যে, দক্ষিণ চীনের উপকূলে নূতন জাপ সৈন্যের অবতরণ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহারা ইন্দোচীন সীমান্ত হইতে ৭০ মাইল দূরে টংকিং উপসাগরের তীরবর্তী পাখই নামক স্থান দখল করার পর দক্ষিণ চীনের উপকূলে ম্যাকাওএর দক্ষিণ দিকবর্ত্তী কাওয়াহৈ হইতে পাখই পর্য্যন্ত ২৫০ মাইল ব্যাপী ভূভাগে বিভিন্ন স্থান দখল করিয়াছে।

৭ মার্চ্চ—।

আফ্রিকার সমস্ত রণাঙ্গনে বৃটিশ বাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত আছে। এ পর্য্যন্ত আরও দশ সহস্রাধিক ইতালীয় সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে। বৃটিশ নৌবহর কিসমাউ বন্দরের উপর গোলাবর্ষণ করে। কিসমাউ ও মোগাদিসু অধিকৃত হওয়ার ফলে পূর্ব্ব আফ্রিকায় ইতালীয়ানদের দুইটি নৌঘাঁটি হস্তচ্যুত হইল। বৃটিশবাহিনী কর্তৃক কিসমাউ বন্দর অধিকারের সময় ইতালী ও জার্ম্মানির সাতটি জাহাজ খোয়া গিয়াছে।

জার্ম্মান সৈন্যেরা তুর্কী-বুলগেরিয়ান সীমান্ত পৌঁছিয়াছে।

বহির্জগতের সহিত বুলগেরিয়ার সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হইয়াছে।

বেলগ্রেডের সংবাদে প্রকাশ, গত মঙ্গলবার যুগোশ্লাভিয়ার রিজেণ্ট প্রিন্স পল যখন ফন রিবেনট্রপ ও কাউণ্ট সিয়ানোর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন নাকি তাঁহার নিকট ত্রিশক্তি চুক্তির একটা সংশোধিত সংস্করণ উপস্থিত করা হয়।

৮ই মার্চ্চ—।

ইতালীয় সরকারী ইস্তাহারে গ্রীসের সহিত যুদ্ধবিরতি গুজবের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। কিন্তু জার্ম্মান রেডিও অবিরত হুমকি দিতেছেন যে, গ্রীস যদি ইতালীর সহিত আপোষ না করে তাহা হইলে জার্ম্মানবাহিনী গ্রীস আক্রমণ করিবে। এথেন্সের সংবাদে প্রকাশ যে, যুদ্ধের অবস্থা গ্রীসেরই অনুকূল।

সোফিয়ার সংবাদে প্রকাশ যে, এক সপ্তাহ বা তাহার কম সময়ের মধ্যেই জার্ম্মানি গ্রীসের নিকট চরম পত্র দিবে বলিয়া সকলের ধারণা। জার্ম্মানবাহিনী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পূর্ব্ব মেসিডোনিয়া ও থ্রেস আক্রমণ করিতে পারে। গ্রীক সীমান্তে বর্ত্তমানে সাত ডিভিসন জার্ম্মান সৈন্য মোতায়েন হইতেছে।

হিটলার বুলগেরিয়ায় জার্ম্মান সৈন্যের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি করিতেছেন। জার্ম্মান সৈন্য দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে তুরস্ক ও মেসিডোনিয়া সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইতেছে। বুলগেরিয়ান সৈন্য পুলিশ কর্ম্মচারীরা পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করিতেছে।

৯ মার্চ্চ—।

গতকল্য রাত্রিতে লণ্ডনের উপর জার্ম্মান বিমানের প্রচণ্ড আক্রমণের পর অদ্য দিনমানে বৃটেনের উপর জার্ম্মান বিমানের কার্য্যকারিতা অতি সামান্য পরিলক্ষিত হয়। ভোর হইবার অব্যবহিত পরেই দক্ষিণ-পূর্ব্ব বৃটেনের কয়েক স্থানে বোমা বর্ষিত হয়। তাহাতে খুব সামান্যই ক্ষতি হইয়াছে এবং লোকজনও খুব কমই হতাহত হইয়াছে।

বৃটিশ নৌদপ্তরের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী গতকল্য এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, উত্তর আফ্রিকায় চূড়ান্ত সংগ্রাম হইবে না। চূড়ান্ত সংগ্রাম হইবে আটলাণ্টিকে এবং বৃটেনে।

ডাঃ গোয়েবেলস ঘোষণা করেন যে, এই বৎসরের মধ্যে জার্ম্মানি যুদ্ধ শেষ করিবে।

এথেন্সের এক সংবাদে প্রকাশ যে, মুসোলিনী সম্প্রতি আলবেনিয়ায় গিয়াছিলেন। প্রকাশ, আলবেনিয়া যুদ্ধে ইতিমধ্যে তিনজন বিশিষ্ট ফ্যাসিষ্ট নায়কের মৃত্যু হইয়াছে।

বল্কানের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। এক অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ, এথেন্সের জার্ম্মান রাষ্ট্রদূত গতকল্য গ্রীক প্রধান মন্ত্রীকে এক 'নোট' দেন। আর এক সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মানবাহিনী গ্রীসে প্রবেশ করিয়াছে। তবে এই সংবাদটির বার্লিনে বেসরকারীভাবে প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

এথেন্স রেডিও হইতে প্রচারিত গ্রীক সমর পরিষদের এক ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে যে, 'তুমুল সংঘর্ষের' পর গ্রীকগণ অদ্য কতকগুলি নূতন ঘাঁটি দখল করিয়াছে।

চুংকিং-এর সংবাদে প্রকাশ যে, জাতীয় গণপরিষদের নিকট এক রিপোর্টে মার্শাল চিয়াং-কাই-সেক চীনের কম্যুনিষ্ট দলের উপর দোষারোপ করিয়া বলেন যে, জাপানীদের বিরুদ্ধে চীনাদের পাল্টা আক্রমণ চালানোতে চীনা কম্যুনিষ্টগণ বিলম্ব ঘটাইয়াছে এবং সরকারী বাহিনীর পশ্চাৎদিকস্থ সৈন্যগণকে বিপন্ন করিতেছে।

মার্কিণ 'ইজারা ও ঋণদান বিল' সেনেটে ৬০—৩১ ভোটে পাস হইয়াছে।

১০ মার্চ্চ—।

আনকারা বেতারে প্রচারিত নিরপেক্ষ সংবাদে প্রকাশ, কোন কোন পর্য্যবেক্ষক মনে করেন যে, জার্ম্মানি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ম্যাসিডোনিয়া ও পশ্চিম থ্রেস আক্রমণ করিবে।

বৃটিশ সাবমেরিনের টর্পেডোর আঘাতে একটি ইতালীয় ক্রুজার নিমজ্জিত হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

৫ই মার্চ।—

গতকল্য বাঙলার লোকগণনার কার্য শেষ হইয়াছে। সরকারী কর্মচারিগণ ব্যতীত এই প্রদেশে লোকগণনার জন্য প্রায় দেড় লক্ষ গণনাকারী এবং প্রায় ২৫ হাজার সুপারভাইজার নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

জনসভা ও মিছিল সম্পর্কে বিধিনিষেধ জারী করিয়া বাঙলা গভর্নমেণ্ট এক নূতন আদেশ জারী করেন।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ বিলটি পাশ হয়।

নয়াদিল্লীতে সম্পাদক সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির বৈঠকে শেষ হয়। মিঃ কে শ্রীনিবাসন সভাপতিত্ব করেন।

৬ই মার্চ।—

সিন্ধু গভর্নমেণ্টের মন্ত্রী মিঃ নিচলদাস ভাজিরাণী, রায় সাহেব গোকুলদাস ও খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্স মন্ত্রিসভার সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। মুসলিম লীগ দলভুক্ত প্রধান মন্ত্রী বন্দে আলী খাঁ তালপুর, খাঁ বাহাদুর খুরো ও সেখ আবদুল মজিদ গভর্নরের নিকট তাঁহাদের পদত্যাগপত্র পেশ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস, কৃষক-প্রজা ও তপশীলী দলের সমবেত প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধতা উপেক্ষা করিয়া মন্ত্রিসভার সমর্থক কোয়ালিসন দল শ্বেতাঙ্গ দলের সহায়তায় বঙ্গীয় বিক্রয়-কর বিল ৭১—৩৩ ভোটে পাশ করিয়াছে। বিরুদ্ধ দলের পক্ষ হইতে সাতবার ভোট গণনা দাবী করা হয়। সামান্য পরিবর্তন সহকারে এবং কোন্ কোন্ দ্রব্য বিলের গণ্ডীর বাহিরে পড়িবে তাহার একটি তালিকাসহ যে আকারে বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে অনুমোদিত হয়, সেই আকারেই পরিষদে পাশ হইয়াছে। করের হার টাকায় এক পয়সা হিসাবে ধার্য হইয়াছে। বৎসরে আমদানী ও প্রস্তুত দ্রব্যের ক্ষেত্রে অন্যূন ১০ হাজার টাকা এবং অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে অন্যূন ৫০ হাজার টাকা খুচরা বিক্রয় হইলে এই কর দেয় হইবে।

বাঙলার হিন্দুগণের সম্পর্কে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হকের সাম্প্রতিক উক্তিতে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের নিমিত্ত অদ্য অপরাহ্নে কলিকাতা টাউন হলে কলিকাতার হিন্দু নাগরিকগণের এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হয়। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৭ই মার্চ।—

বাঙলার বিভিন্ন জেলের যাবতীয় রাজনীতিক বন্দীকে প্রথম শ্রেণীর কয়েদী বলিয়া গণ্য করা হউক অথবা প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ একটি বিভাগ উহাদের জন্য খোলা হউক—বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই মর্মের একটি প্রস্তাবের আলোচনা হয়। প্রস্তাবটি ৭৬—৪২ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কর্মপরিষদের পক্ষ হইতে যে দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহার সমর্থনে পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবক ব্যাঙ্কশাল কোর্টে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর গুপ্তের এজলাসে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা হস্তে উপস্থিত হইয়া "বিপ্লবী সুভাষ জিন্দাবাদ", "জাতীয় গভর্নমেণ্ট চাই", "করভার হ্রাস কর", "কর্মপরিষদের দশ দফা দাবী মানতে হবে" প্রভৃতি ধ্বনি করে এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ইস্তাহার বিতরণ করে। পুলিশ উক্ত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

লোকগণনা সম্পর্কে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হকের সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও একটি সাম্প্রতিক বিবৃতি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখার্জি (এডভোকেট) কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর গুপ্তের এজলাসে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ (মানহানি) ধারা অনুসারে একখানি দরখাস্ত দাখিল করিয়া মিঃ ফজলুল হকের বিরুদ্ধে সমন জারীর প্রার্থনা করেন। ম্যাজিস্ট্রেট এই সম্পর্কে আদেশ দান শনিবার পর্যন্ত স্থগিত রাখিয়াছেন।

৮ই মার্চ।—

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখার্জি (এডভোকেট) মানহানির অভিযোগে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হকের বিরুদ্ধে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর গুপ্তের এজলাসে যে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন, চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট তদনুযায়ী মিঃ ফজলুল হকের উপর এক নোটিশ জারী করিয়াছেন। ইহাতে মিঃ ফজলুল হককে স্বয়ং বা কোনও আইন ব্যবসায়ীর মারফৎ কেন তাঁহার উপর সমন জারী করা হইবে না, তাহার কারণ দেখাইতে বলা হইয়াছে।

সিন্ধুর নূতন প্রধান মন্ত্রী মিঃ আল্লাবক্স তাঁহার মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং মন্ত্রিগণ তাঁহাদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু সমাবর্তন অভিভাষণ প্রদান করেন। বাঙলার গভর্নর স্যার জন হারবার্ট প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার নীলরতন সরকারকে অনারারী ডি, এস, সি উপাধি প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে "কমলা স্বর্ণ-পদক" প্রদান করা হয়। শ্রীমতী বিভা মজুমদারকে "মোয়াট স্বর্ণপদক" প্রদান করা হয়। এ বৎসর মোট ৫০৩৪ জন পদক এবং উপাধি পাইয়াছেন। উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ১৫৭ জন মহিলা।

পাঞ্জাব পরিষদের কংগ্রেসী দলপতি সর্দার সম্পূরণ সিংকে মহাত্মা গান্ধী পুনরায় সত্যাগ্রহের অনুমতি দিয়াছেন।

৯ই মার্চ।—

বেলজিয়ামের অন্যতম ভূতপূর্ব মন্ত্রী এবং ভার্সাই সন্ধি-পত্রের অন্যতম স্বাক্ষরকারী মঃ পল্ হাইম্যানস পরলোকগমন করিয়াছেন।

লাহোরে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সম্মেলনে খাঁ আবদুল গফুর খাঁ হিন্দু মুসলিম ঐক্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সম্মেলনে পাকিস্থান পরিকল্পনার নিন্দা করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মহাত্মা গান্ধী পাঞ্জাবের ১৫০০ জন সত্যাগ্রহীর নামের একটি তালিকা অনুমোদন করিয়াছেন।

১০ই মার্চ।—

আজ বঙ্গীয় আইনসভার বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের এক ঘরোয়া বৈঠকে বাঙলার গভর্নর সভাপতিত্ব করেন। সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের অবনতির বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা চলে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বঙ্গীয় সরকারের বাজেটের 'সাধারণ শাসন' খাতে ১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর দাবী আলোচনা প্রসঙ্গে সরকার বিরোধী দল মন্ত্রিমণ্ডলের শাসন কার্যের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ উত্থাপন করেন।

ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র-কিশোর দত্ত গতকল্য তাঁহার ওয়াড়ীস্থিত বাসভবনে বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছেন।

কলিকাতার অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট খাঁ বাহাদুর ওয়ালী-উল-ইসলামের এজলাসে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে যে মামলা চলিতেছিল, অদ্য তাহার আর এক দফা শুনানী হয়। পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী পুলিশ শ্রীযুক্ত বসুর সম্পত্তির একটা বিস্তারিত তালিকা কোর্টে উপস্থিত করিয়া ঐ সব সম্পত্তি ক্রোকের জন্য এক আবেদন করে। ম্যাজিস্ট্রেট ঐ সম্পর্কে নির্দেশ দান ১২ই মার্চ পর্যন্ত স্থগিত রাখিয়াছেন।

বিচিত্র বার্তা

গোপন সংবাদ সংগ্রহের কাজে জার্মান গোয়েন্দাদের আশ্চর্য রকমের বুদ্ধি খেলাতে দেখা গেছে। সাধারণত বেশীর ভাগ দেশের গোয়েন্দারা বড় বড় লোকের আস্তানা থেকে গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করে। জার্মানদের সংবাদ যোগাড় করবার পন্থা কিন্তু ভিন্ন ধরণের। তারা সাধারণ লোকের মধ্যে ভিড়ে গিয়ে অনায়াসেই গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহ করে নিতে পারে। জার্মান গোয়েন্দাদের সংবাদ সংগ্রহের পদ্ধতি অন্য দেশের থেকে নানা বিষয়ে সম্পূর্ণ

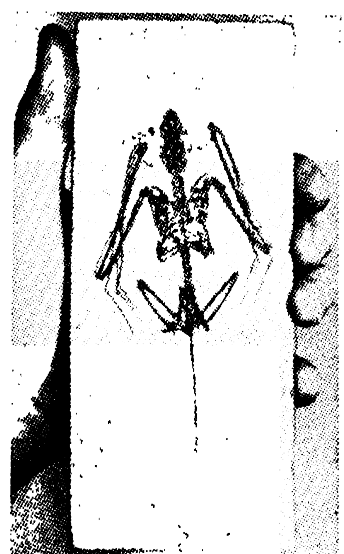


চক্ষুর মধ্যে গোয়েন্দা সংবাদ গোপন করছে

পৃথক এবং উন্নত তা অনেক বড় বড় দেশের গোয়েন্দা বিভাগ স্বীকার করে নিয়েছে। অবশ্য প্রকাশ্যভাবে নয়।

গোয়েন্দাদের শিক্ষা দেবার জন্যে জার্মানিতে বড় স্কুল রয়েছে। সেখানে তারা উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। একজন জার্মান গোয়েন্দার কথা বলছি। ভদ্রলোক একজন অতি সাধারণ লোক এবং তিনি অতি সাধারণ কাজের মধ্যে দিয়েই সংবাদ সংগ্রহ করে বেড়ান। কিভাবে তাঁর সংবাদ সংগ্রহ কাজ চলে তার সংবাদ ক্রমশই প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

কতক লোক সাধারণ লোকের চেয়ে বেশী বাচাল এবং এই শ্রেণীর বাচাল লোকই গোয়েন্দাদের শীকার—এদের মুখ থেকেই গোপনীয় তথ্য যোগাড় করা হয়। এই ধরণের বাচাল লোককে খাবার টেবলের সামনে আনা মোটেই কষ্টকর হয় না। গোয়েন্দা বিনয়ের সঙ্গে মৃদু হাস্যালাপে অতিথিকে পানীয় গ্লাস উপহার দেয়। যাতে ক'রে কোন সন্দেহ না জাগে সেইদিকে গোয়েন্দার দৃষ্টি প্রখর। পানীয়ের পরিমাণ অল্প। আলাপ আলোচনা চলছিল কেবলমাত্র ফুটবল খেলা নিয়ে। সুতরাং গোয়েন্দার উপর সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। সাধারণত খাবারের দোকান ঘরের টেবলে এই বিষয়ের আলোচনাই চলে। একজন মিস্ত্রী গোছের লোক যুদ্ধের সময়ের ফুটবল খেলায় কোন রকম আনন্দ খুঁজে পাচ্ছে না একথাটাই গোয়েন্দাকে বলছিল। খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড আগের মত নেই সুতরাং আকর্ষণও যথেষ্ট কমে গেছে। ফুটবল খেলার আকর্ষণ ক্রীড়ামোদী বা মিস্ত্রী লোকটির কাছে কিছু কম হলেও গোয়েন্দার কাছে যথেষ্ট প্রবল ছিল এবং এই ফুটবল খেলা দেখাটা মিস্ত্রী লোকটির কাছে একটা প্রবল আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও কারখানার কাজের চাপের জন্যে যাওয়া ঘটে উঠছে না। মিস্ত্রী বলে চলছিল কারখানায় আগের থেকে বেশী লোক ভর্তি করা সত্ত্বেও নিশ্বাস ফেলবার আর সময় নেই। ....বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে তার অবসাদ এসেছে। কারখানার ম্যানেজারটাও একটা বদমেজাজী লোক। তবে রক্ষে যে ক'দিন পরেই আর একজন নতুন ম্যানেজার



৬০,০০০,০০০ বছর আগের বাদুড়ের কঙ্কাল

আসছে—যুদ্ধের কাজ অনেক বেড়েছে একজন ম্যানেজারকে দিয়ে হবে না। রক্ষে যে লোকটা নাকি খুব ভাল। এমনি কথাবার্তার মধ্যে গোয়েন্দা কারখানার মজুর মিস্ত্রীদের রোজ কত, কত এ্যারোপ্লেন তৈরী হয়েছে তা জেনে নিল। গোয়েন্দার বিদ্রূপের প্রতিবাদ করে মিস্ত্রী এও বলে দিল যে, তাদের

কারখানার মিস্ত্রীরা একেবারে নিষ্কর্মা নয়, সকলেই বেশ নামকরা মিস্ত্রী—একটু নিম্নকণ্ঠেই তাদের মিস্ত্রীদের সংখ্যাটাও বলে দিলে। এতগুলি সংবাদ সংগ্রহ হয়েছিল ফুটবল খেলার আলোচনার মধ্য দিয়েই। আশপাশের খদ্দের বা দোকানের মালিকটা পাশে বসে গোয়েন্দাকে সন্দেহ করা দূরের কথা আলাপ আলোচনায় টুকরো টুকরো ফুটবলের সংবাদ জুড়ে দিয়ে



স্থূলকায় দেনিয়াল ল্যাম্বার্ট

বেশ জমিয়ে তুলছিল। কথাবার্তা ফুটবল খেলা নিয়েই আরম্ভ হয়েছিল আর শেষ হয়েছিল ঐ বিষয় নিয়েই।

হিটলারের গোয়েন্দারা খুব চমৎকার ইংরেজীতে কথাবার্তা বলে সংবাদ যোগাড় করে। তবে জার্মানির গোয়েন্দারা সকলেই যে জার্মান হবে এমন নয়। তারা ব্যাঙের ছাতার মতই হঠাৎ আবির্ভাব হয়ে দেশের চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ে।

* * * * * *

সমগ্র পৃথিবীতে ২,৯৭৬টি ভাষায় কথাবার্তা চলে। এই এতগুলি ভাষায় কথাবার্তা বলার দরুণই বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠে না।

* * * * * *

মিডল্যান্ড সিটির নিষ্প্রদীপ রজনীতে এক নূতন রকমে গাড়ী ঘোড়া নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যারা গাড়ী নিয়ন্ত্রণের কর্তা তাদের টুপীর উপর 'পুলিশ' একথাও লেখা থাকে। বৈদ্যুতিক আলোতে সেই লেখাটি সমুজ্জ্বল থাকায় অন্ধকার রজনীতে দূর থেকেও গাড়ী চালকেরা পুলিশের নির্দেশ চিহ্ন বেশ বুঝতে পারে, কোন অসুবিধার মধ্যে এসে বিপদে পড়তে হয় না। নগরের জনবহুল অঞ্চলগুলিতে পুলিশ এই টুপী মাথায় দিয়ে যানচালকদের রাত্রে যথেষ্ট সাহায্য করে। ছোট একশ্রেণীর ব্যাটারীর সংযোগে মাথার টুপির লেখাটি আলোকিত করা হয়, অনেকদিন পর্যন্ত ব্যাটারিটি আলো দান করে।

* * * * * *

পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে মোটা লোক ছিলেন ডেনিয়াল ল্যাম্বার্ট। তিনি ১৭৭০ সালে লিসেস্টারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩ বছর বয়সে তাঁর শরীরের ওজন বাড়ে ৩২ স্টোন। খেলা-ধূলায় বিশেষ মনোযোগ দিয়েও কিন্তু শরীরের চর্বি একটুও কমাতে পারেন নি। দিন দিন বেড়েই চলেছিলেন। শেষে ৩৯ বছর বয়সে ৫২¾ স্টোন ওজনে তিনি দেহরক্ষা করেন।

ল্যাম্বার্টের ওয়েস্ট কোটের কোমরের বেড় ছিল ১০২ ইঞ্চি। তাঁর কফিন তৈরী হয়েছিল ১১২ ফিট লোহার চাদর দিয়ে।

* * * * * *

সংলগ্ন বাদুড়ের ছবির কঙ্কালটি ৬০,০০০,০০০ বছর আগের। পৃথিবীতে স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাবের প্রারম্ভেই এই বাদুড়টির জন্ম হয়। কঙ্কালটিতে কোন রকম ক্ষতির চিহ্ন নেই। বাদুড়টির মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা কোন সঠিক মত প্রকাশ করিতে পারেন নি।

দেশ

৮ম বর্ষ । ৮ই চৈত্র, শনিবার, ১৩৪৭ সাল। Saturday, 22nd March, 1941. । ১৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বোম্বাইয়ের বৈঠকের ফল—

বোম্বাইয়ের বৈঠক হইয়া গেল এবং এই ধরণের বৈঠকে যেমন প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে, তাহাও হইয়াছে। সভাপতি স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু ব্রিটিশ জাতিকে অভিমান-মিশ্রিত অপ্রিয় উক্তিতে কিঞ্চিৎ আঘাতও করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ব্রিটিশ জাতির রাজনৈতিক দূরদর্শিতা তিরোহিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান করিতে হইলে, যেরূপ প্রশস্ত মন এবং সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির প্রয়োজন, ব্রিটিশ রাজনীতিকদের তাহা নাই। তিনি এই কথা বলিয়া ব্রিটিশ জাতিকে সতর্ক করিয়াও দিয়াছেন যে, জনসাধারণ ত্যক্ত-বিরক্ত হইবার পূর্বেই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের প্রতিশ্রুতি পূরণ করা উচিত। বোম্বাইয়ের এই বৈঠকে বড়লাটের শাসন-পরিষদ সম্প্রসারণ করিয়া সমরসচিব পদটি ভারতবাসীকে দিতে বলা হইয়াছে। বোম্বাইয়ের বৈঠকের উদ্যোক্তৃগণ অতি বুদ্ধিমত্তার মর্যাদা বজায় রাখিয়া বিনীতভাবে বলিয়াছেন,—"আমরা বেশী কিছু চাই না প্রভু। আমরা এতটা অবিবেচক নই যে, আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিব। দেশরক্ষা বিষয়ে দেশের লোকের কর্তৃত্ব, তাহাও চাহিতেছি না, সে কর্তৃত্ব বিলাতের কর্তাদেরই হাতে থাকিবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদকে নীতি নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব দিতে আমরা বলিতেছি ও শুধু সমর-সচিবের চাকুরী একজন ভারতবাসীকে দেওয়া হউক এবং মৌখিক এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হউক যে, যুদ্ধের শেষে ভারতবর্ষকে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের মত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হইবে। অতি ধীর, অতি মোলায়েম এই প্রস্তাব, কিন্তু ইহাতেও ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ রাজী হইবেন কি? আমাদের তাহা মনে হয় না, কারণ মোলায়েম বা মধুর পরামর্শের অপেক্ষায় তাঁহারা নাই। ভারতবাসীদিগকে প্রকৃত কোন অধিকার দেওয়ার মতলবেরই এক্ষেত্রে অভাব। বর্তমানে তাঁহারা সঙ্কটে পড়িয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্কটে ভারতবাসীদের সহযোগিতা এবং সহানুভূতি পাইতে হইলে, ভারতবাসীদিগকে যে রাজনীতিক অধিকার প্রদান না করিলে আশঙ্কার কারণ আছে, এ বিবেচনা তাঁহারা করেন না। সুতরাং বোম্বাইয়ের এই প্রস্তাবের জবাব ভারত-সচিবের নিকট হইতে কি আসিবে, আমরা না জানিয়াই এখন হইতে বলিয়া দিতে পারি। ভারতসচিব জবাব দিবেন এবং সে জবাবে বড়লাটের প্রস্তাবের মহিমার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা থাকিবে এবং পরোক্ষভাবে মোশ্লেম লীগের পিঠ চাপড়াইয়া মিলনের মন্ত্র আওড়াইয়া নিজেদের কর্তব্য তিনি এড়াইয়া যাইবেন। তিনি বলিবেন এই কথাই যে, আমরা তো স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য এক পায়ের উপর খাড়াই আছি, কিন্তু ভারতের একটা প্রয়োজনীয় সম্প্রদায় এই যে মোশ্লেম লীগ, উহাদের সঙ্গে মিটমাট করিয়া লও এবং সে কথা তিনি বলিবেন, এই বিশ্বাসে সুদৃঢ় হইয়াই যে মোশ্লেম লীগ তাঁহাদের দৌলতে যে মহিমা পাইয়াছে, সেই মহিমাতেই মিলন সম্ভব হইবে না, সুতরাং ব্রিটিশের কর্তৃত্ব এবং প্রভুত্ব ভারতের উপর অটুটই থাকিবে। বোম্বাইয়ের বৈঠকের প্রস্তাবের মূলে যুক্তি আছে, বুদ্ধি আছে, সে বিষয়ে ত্রুটি কোন দিক হইতেই নাই। কিন্তু রাজনীতিক আদর্শ বাস্তবের দিক হইতে সার্থক করিতে হইলে, অনুরোধ-উপরোধ বা ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া স্বপ্রতিষ্ঠ শক্তির যে জোর দরকার, জনমতের সেই জোর বোম্বাইয়ের প্রস্তাবে নাই এবং নাই যে উদ্যোক্তৃগণ নিজেরাই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই প্রস্তাবে যে কর্তারা রাজী হইবেন, এমন বিশ্বাস আমাদের হয় না।

নরেন্দ্রমণ্ডলে বড়লাট—

বোম্বাইয়ের নেতাদের বৈঠক এবং সিদ্ধান্তের পর বড়লাট নরেন্দ্রমণ্ডলের বক্তৃতায় ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবেন, অনেকে এইরূপ মনে করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কি আদর্শ লইয়া সংগ্রাম করিতেছেন,

বড়লাট তাহার উপর কিছু জোর দিয়া শুনাইয়াছেন যে, তাঁহারা সম্প্রতি যে সংগ্রামে লিপ্ত রহিয়াছেন, তাহার বিপুল গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিক্রিয়া সর্বত্র অনুভূত হইবে এবং ভারতেও কম কিছু হইবে না। তাঁহারা মানবসমাজের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছেন। তাঁহাদের সেই আদর্শ সর্বজনসম্মত এবং সর্বজনসমর্থিত। বলা বাহুল্য, ভারতের বর্তমান সমস্যার উপর আলোক সম্পাত হইতে পারে, এমন ধরা ছোঁয়ার মত কোন কথা এই বক্তৃতায় নাই। শুনিতেছি, নরেন্দ্রমণ্ডলের নরেন্দ্রবর্গ, ভারতের শাসনতান্ত্রিক প্রগতি, এমন কি, বড়লাটের শাসন-পরিষদের সম্প্রসারণেরও প্রতিকূল মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আশ্রয় তাঁহাদের বড় আশ্রয়। বড়লাট বোধ হয় সেই বিবেচনাতেই নরেন্দ্রমণ্ডলে এ প্রশ্নটি চাপা দিয়া নৃপতিবর্গ বর্তমান সংগ্রামে কিভাবে সাহায্য করিতেছেন, সেই কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং বোম্বাই বৈঠকের জবাব পাইবার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

বাঙলার ছাত্রসমাজ—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন হইয়া গেল। ভেদ বিভেদের যুগ পড়িয়াছে, এবং নেতৃত্বের ক্যাংলামি সকল দিকে, তাহা সত্ত্বেও বাঙলার ছাত্র সমাজ যে দেশের স্বার্থের প্রতি সজাগ এবং সংহত আছে, এই সম্মেলনেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় এই ঐক্য এবং সংহতির উপরই জোর দিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমি আশা করি, ছাত্রগণ নিজেদের সংগঠিত করিবার সময় একতার সর্বাধিক গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে ভুলিবে না। যদি তাঁহারা সুগঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে অপারগ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সমুদয় আদর্শবাদ, সকল উৎসাহ এবং দেশ ও জনসাধারণের সেবার জন্য তাহাদের অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। কার্যের সাফল্য কামনা করিলে সর্বাগ্রে দেখিতে হইবে যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা যেন অনৈক্যে পরিণত না হয়।" বাঙলার ছাত্রসমাজ বাঙলা দেশে নব জাতীয়তার উদ্বোধনের মূলে শক্তি যোগাইয়াছে। সকল দেশে তাহারাই সে শক্তি যোগাইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কিছুদিন হইল বাস্তব কর্মসাধনার বেদনার উগ্রতা ছাত্রসমাজের মধ্যেও শিথিল হইয়াছে এবং আদর্শ ফাঁকা বিলাসের কচায়ন বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রকৃত কাজের মধ্যে ছাত্রসমাজ তেমন মনে প্রাণে লাগিয়া যাইতে পারিতেছে না। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ও এই অবস্থার ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, অতীতের কার্যাবলী আলোচনা করিয়া আজ তোমরা নিজেদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর—স্বাধীনতাকে নিকটবর্তী করিতে তোমরা কি করিয়াছ! সর্বশ্রেণীর ভারতবাসীর মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বিকাশের নিমিত্ত এবং প্রগতির রথচক্রে ক্রমবর্ধমান দুর্বার গতিবেগ সঞ্চারের জন্যই বা তোমরা কি করিয়াছ? এই প্রশ্নগুলির সাহায্যে আত্মানুসন্ধান করিলে তোমাদের প্রতিষ্ঠানের শক্তি ও প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ নির্ণীত হইবে।" কাজের পথে অন্তরায় অবশ্যই আছে। গায়ে ফুঁ দিয়া কোন কাজই হয় না। দুঃখ কষ্টের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াই কাজ করিতে হয়; কিন্তু দুঃখকষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কাজ করাতেই মনুষ্যত্বের বিকাশ, জীবনের স্ফুরণের আনন্দ, ছাত্রসমাজ সেই আনন্দের আস্বাদনের জন্য আজ জাগিয়া উঠুক। প্রতিকূলতার বিভীষিকা যেন ছাত্রসমাজে ক্লীবত্বের বিড়ম্বনা আনিয়া না দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের দানের বৈশিষ্ট্য—

গত ১৩ই মার্চ রবিবার নৈহাটি বঙ্কিম পাঠাগারে বঙ্কিম স্মৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন, "কেহ কেহ এই দাবী করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে আমাদের দেশে জাতীয়তাবোধ একেবারেই ছিল না। জাতীয় যজ্ঞে বঙ্কিমচন্দ্রের অমর দানের কথা স্বীকার করিয়াও সত্যের খাতিরে একথা বলিতে হয় যে ঐ দাবী যুক্তিযুক্ত নহে। ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের কিছুকাল পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই ভারতবাসী বিশেষত বাঙালী জাতির মধ্যে জাতীয়তার উন্মেষ হইতে থাকে।" এ কথা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বা আদর্শ এক কথা, আর রসসৃষ্টির ভিতর দিয়া আদর্শকে সর্বজনীন করা অন্য কথা এবং এই রসসৃষ্টির পথে মনের স্বাভাবিক সংযোগ সাধন ব্যতীত কোন আদর্শই বাস্তব হইতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু বিধি দেন নাই, উপদেশ দেন নাই তিনি স্বদেশপ্রেম এবং জাতীয়তার পথে দিয়াছেন বাঙলার মনকে প্রত্যক্ষ আশ্রয় এবং এইটি যদি তিনি না দিতেন, তাহা হইলে দেশাত্মবোধ বাস্তব আকার ধারণ করিতে পারিত না; শুধু জনকয়েকের বিচারবুদ্ধির পরিচালনার মধ্যেই উহা নিবদ্ধ থাকিত। এইদিক হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রকে জাতীয়তার উদ্বোধক বলা যাইতে পারে। তাঁহার প্রতিভা বহুমুখী ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু রসসৃষ্টির পথে বাঙলার চিত্তকে স্বদেশপ্রেমের যে প্রেরণা তিনি দিয়া দিয়াছেন, তাঁহার সে দানের তুলনা নাই। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে নব্য বঙ্গের গঠনকর্তা একথা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে; কারণ রসের উদ্দীপনা ছাড়া শুধু সূত্রের বলে, সিদ্ধান্তের নির্দেশে কোন গঠন কার্য সম্ভব হয় না।

বাঙলায় শিল্প-উন্নয়ন—

বাঙলার শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মৌলবী তমিজুদ্দীন খান শিল্প-বিভাগের বাজেট উপস্থিত করিয়া যে সাফাই গাহিয়াছেন, তাহার অনেকখানিই ফাঁকা। এক্ষেত্রে সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি নাই, "দিও কিঞ্চিৎ না করো বঞ্চিৎ" এইরূপ একান্ত আন্তরিকতাহীন ধারা ধরিয়াই বাঙলা সরকার চলিতেছেন দেখা যাইতেছে। বাঙলার কুটির শিল্পের

মধ্যে তাঁতের ব্যবসার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাঙলা দেশে কাপড়ের কল কয়েকটি হইয়াছে, কিন্তু সুতা তৈয়ারীর কলের একান্তই অভাব, বেশী দামে বাঙলার বাহিরের সুতা কিনিয়া তবে তাঁতের কাজ চালাইতে হয়। প্রধানত এই কারণেই কলের প্রতিযোগিতায় টিকিয়া উঠিতে না পারিয়া বাঙলার প্রায় দুই লক্ষ তাঁতী অন্নকষ্টে দিন কাটাইতেছে। বাঙলা সরকার এদিকে কিছুই করেন নাই বা করিবার কোন প্রতিশ্রুতিও দেন নাই। বড় বড় শিল্পের কথা তুলিলেই বাঙলা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের দোষই দিয়া থাকেন; কিন্তু দেশের লোক ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। সমর-সম্ভার এবং সমরোপকরণ প্রস্তুতের জন্য বাঙলা সরকার কি করিতেছেন? নিজেদের এ বিষয়ে কোন হাত নাই, এইটুকু বলা ছাড়া অন্য কিছু তাঁহারা বলেন নাই। কেন্দ্রীয় সরকারকে এজন্য তাঁহারা চাপ দিতেছেন কি না শ্রীযুত শশাঙ্কশেখর সান্যাল ইহা জানিতে চাহেন; কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্য-সচিব ভরসা কিছুই দেন নাই। সুতরাং ব্লাক আউট হউক, আর না হউক, আত্মরক্ষার প্রকৃত ব্যবস্থা সম্বন্ধে বাঙলার লোকদিগকে অন্ধকারের রাজ্যেই বাস করিতে হইবে। বাণিজ্য-সচিব আমাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন,—"আমরা আমাদের কর্মনীতি অতি বিচক্ষণতার সহিত নির্দিষ্ট করিয়াছি এবং ভবিষ্যতে তাহার সুফল আমরা লাভ করিব। কর্মনীতি যে বিচক্ষণতার সঙ্গে নির্দিষ্ট হইয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু যে ভবিষ্যতে ফল লাভ করিব, সেই ভবিষ্যৎ কবে বর্তমানে পরিণত হইবে, অনাগত কবে হইবে আগত এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্টই সন্দেহ রহিয়াছে; কারণ জোটবাঁধা দল এবং শ্বেতাঙ্গ বণিকদলের স্বার্থ সেবা করিয়া মন্ত্রিগিরি বজায় রাখাই দেখা যাইতেছে বাঙলার মন্ত্রীদের বিচক্ষণতার একমাত্র নিরিখ।

মানুষ না খাইয়া মরে কি?

মানুষ না খাইয়া মরে না, অন্তত সরকারী অন্নকষ্ট বা দুর্ভিক্ষপীড়িত বলিয়া ঘোষিত অঞ্চলে তো নহেই, বাঙলার আইনসভায় এই কৌতুকপ্রদ বিষয়ের আলোচনায় বহুবার বিশেষরূপে সে সিদ্ধান্ত হইয়া যাইবার পরও দেখিতেছি বর্ধমান জেলার ৯নং ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর গ্রামের অধিবাসীরা সেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন। এক ব্যক্তির অনাহারে মৃত্যুর অভিযোগ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যায় এবং তিনি যথারীতি সার্কেল অফিসারের নিকট তদন্তের ভার দেন। সার্কেল অফিসারের তদন্তের সম্পর্কে গ্রামবাসীরা এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, তিনি তদন্তে আসিয়া আবেদনকারীদিগকে শ্রীঘরে পাঠাইবার ভয় দেখান। মৃত তজর সেখের ভ্রাতা যাহাতে অনশনে মৃত্যুর কথা তাহার সাক্ষ্যে না বলে, এরূপ চেষ্টাও নাকি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তদন্ত করিবার পূর্বেই তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, মাত্র পাঁচ ছয় দিন না খাইয়া একটি লোক মরিতে পারে না। মহাত্মা গান্ধী ও যতীন দাস প্রভৃতিও না খাইয়া বহুদিন বাঁচিয়াছেন। এই সার্কেল অফিসারের নামে এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, সাহায্যপ্রার্থীদিগকে তিনি যাহা খুসী অপমান করিয়া তাড়াইয়াছেন। অন্ধ কিংবা খঞ্জ হইলেও পরিত্রাণ নাই। অনেককেই তিনি ভিক্ষা করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিবার উপদেশ দেন। অসহায় স্ত্রীলোকদিগকে নাকি বলেন, বিবাহ দ্বারাই তাহারা অনায়াসে অন্ন সমস্যার সমাধান করিতে পারে। শালপাতা ও তেঁতুলের বীজ সিদ্ধ করিয়া লোকে খাইতেছে দেখিয়া তিনি মন্তব্য করেন, এগুলি নাকি অতি উপাদেয় খাদ্য। বাঙলা আইনসভায় মন্ত্রীদের বিভিন্ন উক্তি, তৎকালীন বঙ্গীয় শাসন পরিষদের সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়া এই সার্কেল অফিসারটি যদি অন্নকষ্টে মানুষ মরিতে পারে না, একথা শুনাইয়া দিতেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইত; কিন্তু তিনি সরকারী নোকরীর মহিমা বজায় রাখিবার প্রেরণায় পড়িয়া তাঁহার ঐসব মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও উপদেশের দ্বারা অন্নকষ্ট পীড়িত হতভাগ্য-দিগকে যেভাবে আশ্বাস দিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। আমাদের মনে হয়, এই সব অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, এমন সুযোগ্য কর্মচারীর সমাদরে কর্তৃপক্ষ উদাসীন থাকিবেন না। বর্ধমান জেলায় সফর করিতে গিয়া মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ এক জনসভায় বলিয়াছিলেন—"আর যাহাই হউক, বর্ধমান জেলার কেহ অনাহারে মরিবে না।" অনাহারে অবশ্যই কেহ মরে না—হয় ব্যায়রাম হইয়া মরে, না হয়, ফাঁসী দিয়া মরে অর্থাৎ অনাহারে মরা ছাড়া "আর যাহা কিছু একটা হইয়া মরে;" কিন্তু এই আর যাহা কিছু হইয়া মরার সঙ্গে অনাহারে জ্বালার সম্পর্ক যে কি তাহা অনুমান প্রত্যয়ের বিষয় নয়, প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয়। মোটা মাহিয়ানাওয়ালা রাজপুরুষদেয় যদি শালপাতা ও তেঁতুলের বীচির উপাদেয়তা আস্বাদন করিবার সুযোগ কিছু দিন হইত, তাহা হইলে এইসব মূল্যবান গবেষণা হইতে আমরা বঞ্চিত হইতাম।

সাম্প্রদায়িক প্রীতির পথ—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মিঃ নূর আহাম্মদ বাঙলা প্রদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উন্নতিসাধনের জন্য একটি উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য বাঙলা গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন। পাঞ্জাব সরকারের দেখাদেখিই বোধ হয় এই প্রস্তাব। প্রস্তাব খুবই ভাল সন্দেহ নাই। কিন্তু এসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, পাঞ্জাবে এই বিষয়ে অগ্রসর হইবার জন্য পরিকল্পনা করিবার প্রয়োজন থাকিলেও বাঙলা দেশে সে ঝঞ্ঝাট হক মন্ত্রিমণ্ডলের কৃপায় নাই। বাঙলা মন্ত্রিমণ্ডল সাম্প্রদায়িকতামূলক যে নীতি অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন এবং তাহার পরিণতিতে যে কয়টি আইন ও আইনের খসড়া প্রবর্তিত বা উপস্থাপিত হইয়াছে, সেইগুলি প্রত্যাহার করাই প্রথমে দরকার। পরে যদি পরিকল্পনার কোন প্রয়োজন হয়, তখন সে সম্বন্ধে বিবেচনা করা উচিত হইবে। সে পরিশ্রম স্বীকার না করিয়া সহজ কাজ যেটা তাহাই আগে

হউক। গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালার কোন মূল্য হয় না।

বাঙলা ভাষার প্রচার—

শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে সেদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে নিখিল ভারত বঙ্গীয় ভাষা-প্রচার সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যে সব বঙ্গ-ভাষাভাষী বাস করেন, মাতৃভাষার সাহায্যে তাঁহাদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য এবং অ-বাঙালীদিগকে বাঙলা ভাষা শিক্ষা করিতে উৎসাহ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে দুই বৎসর পূর্বে এই সমিতি গঠিত হয়। সমিতি এই দুই বৎসরে কিছু কিছু কাজ করিয়াছেন। তাঁহারা দিল্লী, আগ্রা এবং নাগপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীগুলিতে বাঙলা বই রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং অ-বাঙালীদের বাঙলা ভাষা শিখিবার পক্ষে সুবিধা করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সমিতির উদ্দেশ্য অতি ব্যাপক, ইহা সিদ্ধ করিতে হইলে অনেক টাকার দরকার। হিন্দী ভাষার তরফ হইতে হিন্দীর প্রচারকার্যের জন্য যেরূপ চেষ্টা হইতেছে, বাঙলা ভাষার জন্য তেমন চেষ্টা হইতেছে না, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। ভারতবর্ষের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও বাঙলা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নাই, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরীগুলিতে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙলা ভাষার চর্চা চালাইবার জন্য যেমন আয়োজন দরকার, তাহাও হইতেছে বলা যায় না। বাঙলা ভাষার সম্বন্ধে ভারত সরকারের উদাসীনতারই এ পর্যন্ত আমরা পরিচয় পাইয়াছি, আনুকূল্য তো নহেই। ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নির্ণায়ক কমিটি সম্বন্ধে হিন্দী বা উর্দুর ব্যবস্থা আছে; কিন্তু ভারতের প্রধান ভাষা যে বাঙলা, সেই বাঙলার স্থান নাই। বাঙলা দেশকে সকল রকমে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টাই যেন সকল দিক হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বাঙালী যদি নিজেদের মান-মর্যাদা লইয়া টিকিয়া থাকিতে চায়, তবে বঙ্গভাষার সম্প্র-সারণের উপর সকল দিক হইতে জোর দিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আর উদাসীন থাকিবার সময় নাই। বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমরা দেশবাসীদিগকে সর্বপ্রযত্নে বঙ্গ-ভাষা প্রচার সমিতির কার্যে সাহায্য করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিতেছি।

বাঙলায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি—

বিষ বিস্তারের ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। খুলনা জেলায় মোল্লারহাটে স্থানীয় মুসলমান ও নমঃশূদ্রদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ হইয়াছে। একটি নমঃশূদ্র গ্রাম সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। ১৬৭খানি গৃহ ভস্মসাৎ হইয়াছে। ভোলা রামকৃষ্ণ মিশনের সেক্রেটারীর প্রেরিত তারে জানা গেল, স্থানীয় হিন্দুদের হোলীর শোভাযাত্রা পণ্ড করিবার জন্য মুসলমানগণ একটি সদ্য জবাই করা বাছুর লইয়া সদর রাস্তাগুলি দিয়া মিছিল করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু নির্যাতন এবং হিন্দুর দোকানপাট লুঠ হইয়াছে। তারপর ঢাকায় শাঁখারী ও মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা হইয়াছে। আটজন লোক খুন হইয়াছে, জখমও কম হয় নাই। জানি এই সব খবরের সত্যাসত্যতা লইয়া বাদ প্রতিবাদ হইবে। এক পক্ষ দিবেন আর এক পক্ষের দোষ; কিন্তু সমস্যার সমাধান তাহাতে হয় না। অশান্তি যে ঘটিয়াছে, শান্তি যে বজায় থাকে নাই, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাহারা অত্যাচারিত ও নির্যাতীত হইয়াছে, কোন সাফাইতেই তাহারা সান্ত্বনা পাইবে না। কেন এমনটা ঘটিল? জবাবটা আমাদের মুখ দিয়া বাহির না হইয়া যাঁহারা রাজনীতির সম্পর্ক হইতে দূরে তাঁহাদের মুখেই শুনা ভাল। ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউট হলে সম্প্রতি ছাত্রদের একটি সংস্কৃতি সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনের শেষদিনের বৈঠকে বাঙলার এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রশ্নটি উঠিয়াছিল। সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক এইচ এস সুরাবর্দী। তিনি বলেন, কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনীতিক নেতা বিবৃতির পর বিবৃতি দেওয়ার ফলে বাঙলা দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যা এমন জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। অধ্যাপক সুরাবর্দী নিতান্ত ভাল মানুষ। তিনি নিজেকে দূরে রাখিয়া কথাটা বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটার সঙ্গে বিবৃতির বহরের যে সম্পর্ক একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু সকলের বিবৃতির মূল্য সমান নহে; কিংবা বিবৃতির ভাষার প্রভাব জনসাধারণের মনে সকলের সমান হয় না। অশিক্ষিত জনসাধারণ শাসনশক্তিকেই বড় করিয়া দেখে। এইজন্যই আমরা বলিব, সেন্সাস উপলক্ষে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী হিন্দুবিরোধী যেসব প্রচারকার্য করিয়াছেন তাহাতেই এই অশান্তির কারণ ঘটিয়াছে। সমাজের মুখ্যস্থানীয় ব্যক্তি-বিশেষ যদি অপর সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষবুদ্ধি জাগরিত করিবার আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং তাঁহারই হাতে যদি শাসনশক্তি থাকে, তাহা হইলে তাঁহার স্বসমাজভুক্ত ব্যক্তিদের মনে এ ধারণা সহজেই হইবে যে, ইহা শাসন কর্তৃপক্ষেরই ইঙ্গিত। সুতরাং মুল্লুকের মালিক তাহারাই, এই মনোবৃত্তির বলে তাহারা অসংযত ও উদ্দাম হইয়া পড়ে। বরিশালে, খুলনায় এবং ঢাকায় আমরা এই মনোবৃত্তিরই অনিবার্য যে পরিণতি তাহাই প্রকট দেখিতেছি। প্রতীকার ইহার কোথায়? প্রতীকার হইল, শাসন ব্যাপারে কর্তৃত্ব যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব মুক্ত হওয়া; সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থ না দেখিয়া দেশের সকলের স্বার্থকে সমান-ভাবে দেখা। এই দিক হইতে বাঙলার সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রতীকার, লাটবাড়ীর বৈঠকে সম্ভব হইবে বলিয়া আমাদের আশা নাই। সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের সঙ্কীর্ণ নীতিতে প্রশ্রয়প্রাপ্তদের দুর্বুদ্ধিকে রুদ্ধ করিবার মত সবলতা যদি এদেশের সমাজে জাগে তবে সেদিনই এ সকল সমস্যার সত্যকার সমাধান হইতে পারে।

পুরাতন বাঙলা গদ্যের নমুনা

শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত এম-এ

শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারিগণ ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকগণ দ্বারা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাঙলা গদ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইহার পূর্বে চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ ভিন্ন অন্য কোথাও বাঙলা গদ্যের প্রচলন খুবই বিরল ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত সুকুমার সেন তাঁহার "বাঙলা সাহিত্যে গদ্য" পুস্তকে ইহার কিছু কিছু নমুনা উদাহরণস্বরূপ দেখাইয়াছেন।

মহাপ্রভুর আবির্ভাব বাঙলা সাহিত্যে এক নূতন যুগ আনয়ন করিল। বাঙলা সাহিত্যের মরা গাঙ্গে জোয়ার আসিল, সে উন্মত্ত তরঙ্গ কোন বাধা মানিল না, দেখিতে দেখিতে দুই কুল প্লাবিত হইয়া গেল। বৈষ্ণব ধর্ম বাঙলা সাহিত্যকে কেবলমাত্র পদাবলী দ্বারা সমৃদ্ধ করে নাই, বাঙলা সাহিত্যে তাহার অন্যতম দান জীবনচরিত। মহাপ্রভুর জীবনকে অবলম্বন করিয়াই বাঙলা সাহিত্যের এই নূতন দিক উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। এই বৈষ্ণব ধর্মের অনুগ্রহেই আমরা জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস এবং বলরাম দাসের আবেগ ও অনুভূতির পাশেই লোচনদাস, বৃন্দাবন দাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের বোধ ও যুক্তিকে দেখি।

জীবনচরিতে বোধ ও যুক্তির প্রয়োজন হইলেও, তাহা ছন্দেই রচিত হইত। কিন্তু বৈষ্ণব বোধ ও যুক্তি এখানেই নিরস্ত হইল না। কথোপকথন বা প্রশ্নোত্তর ছলে তাঁহারা বৈষ্ণব সাধনতত্ত্ব প্রচার করিতে অগ্রসর হইলেন। ফলে বাঙলা গদ্যের আবির্ভাব হইল। এই সকল রচনা ষোড়শ শতাব্দীর কয়েকজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহান্তের নামে প্রচলিত। কিন্তু ষোড়শ কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর এইরূপ গদ্যে রচিত পুঁথি পাওয়া যায় না। সেই জন্যই ইহাদিগকে অতদূরে টানিয়া নেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয় বলিয়াই অনেকে মনে করেন। এইরূপ একখানি পুঁথির কতকাংশ সম্প্রতি আমার হস্তগত হইয়াছে। মূল পুঁথিখানি ছিল দুই পাতার। তাহার দ্বিতীয় পাতাটি মাত্র পাওয়া গিয়াছে। লিপিকারের নাম নাই। অন্যান্য কতকগুলি পুঁথির সঙ্গে এই পাতাটি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লেখক হিসাবে শ্রীরামগোপাল দেবশর্মন স্বাক্ষর দেখা যায়। সুতরাং এই পুঁথিখানিও তাহারই লেখা হওয়া সম্ভব। লিপি দৃষ্টেও ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। পুঁথি লিপির যে সময় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতেও এই পুঁথির লেখক অন্য কেহ নহেন বলিয়াই মনে হয়। পুঁথি শেষে আমরা দেখি—শকাব্দা ১৬৬৯। সন ১১৫৪ তারিখ ১৬ই ভাদ্র বেলা এক-প্রহরকালে গ্রন্থি সম্পূর্ণ। লেখক রাধাকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। এই খণ্ডিত অংশের সঙ্গেই নরোত্তম দাসের প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকার একখানি সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতেও দেখি তারিখ এইরূপ—শকাব্দা ১৬৬৯। সন ১১৫৪ সাল, রোজ সোমবার। স্বাক্ষর দীনহীন শ্রীরামগোপাল দেবশর্মণো। আর একখানি সম্পূর্ণ পুঁথি গোপীকৃষ্ণ দাসের "হরিনাম কবচ বা হরিনাম কবজ।" ইহারও লিপিকারক এই রামগোপাল দেবশর্মা এবং তারিখ এইরূপ—শকাব্দা ১৬৬৯। সন ১১৫৪। মাস ২৭শে ভাদ্র গ্রন্থ সমাপ্ত। 'হরিনাম কবজ' পুঁথির পিছনের পৃষ্ঠায় সমস্ত পুঁথিগুলির একটি তালিকা দেখা যায়। তালিকায় জিজ্ঞাসা-পত্রী নামে দুই পাতার একখানি পুঁথির উল্লেখ পাওয়া যায়। আমরা দেখিতেছি, এই পুঁথিখানিই উল্লিখিত জিজ্ঞাসাপত্রী। ইহার রচয়িতা হিসাবে রূপ গোস্বামীর নাম দেখা যাইতেছে। পাঠকের সুবিধার জন্য সমস্ত পাতাটিই এখানে তুলিয়া দেওয়া যাইতেছে।

নানা রাঙ্গেত্ত কুবিদ্যা॥ রাগে চ রঙ্গ দেবিকা॥ তানে মধুরতি দেবি। ইন্দ্ররেখা চত্তরক॥ পালিকা কুসুম সেবায় কু। কেসে চানঙ্গ মঞ্জরি॥ সুদেবি জনসেবা কু॥ সসি রেখা চত্তুকে॥ পালিকা ব্রজবতদভাবলয়া॥ করেন সাধন। ব্রজ সিদ্ধি দেহ পায়া। পায় ব্রজনন্দন।

ইতি মস্তু। ঠাকুরের স্থান কোথা॥ স্যাম দন্ড॥ ঠাকুরাণীর স্থান কোথা॥ রাধাকুন্ডে। গুরু গোসাঞীর স্থান কোথা॥ বিসাখা জিউর কুন্ডেতে॥ আপনার স্থান কোথা॥ কালিন্দি যমুনা। ইত্যাদি সমাপ্ত॥ ইতি রূপ গোসাঞীর বিরচিত জিজ্ঞাপত্রি গ্রন্থ সমাপ্ত॥ হরি ভকথে পরা জেবা॥ হরি নাম পরায়ণ দুরবুদ্ধি রাতেসাং॥ নিত্য নম মম॥ জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং॥ লিক্ষিক দোসক নাস্তি। ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনিনাশু মতিভ্রম॥ শকাব্দা ১৬৬৯ ইত্যাদি। (অবিকল নমুনা)

উল্লিখিত অংশে বানান যেরূপ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই রাখা হইয়াছে। কেবল যে সমস্ত জায়গায় লেখক অপ্রচলিত অক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন—যেমন কু, কৃষ্ণ, মু, র, ব, সু ইত্যাদি স্থলে পাঠের সুবিধার জন্য বর্তমান অক্ষর বসাইয়া দেওয়া হইল। এই পাঠোদ্ধারে এই সঙ্গে প্রাপ্ত অন্যান্য পুঁথি হইতেই সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

ইহার সমস্তই বৈষ্ণব সাধনতত্ত্বের কথা। এই সাধন-পদ্ধতির সঙ্গে যাহাদের পরিচয় নাই, তাহাদের নিকট ইহা দুর্বোধ্য। প্রথমাংশ ভাষার দিক দিয়াও বোধগম্য নহে। ইহার আভ্যন্তরিক অর্থ দূরে থাকুক, সাধারণ অর্থও আমরা বুঝিতে পারি না। হিন্দি, সংস্কৃত এবং বাঙলার এক অদ্ভুত খিচুড়ী বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় অংশ পরিষ্কার বাঙলা ভাষা। ইহার নিহিত অর্থ না বুঝিলেও সাধারণ অর্থ আমরা বুঝিতে পারি। এই অংশকেই আমরা বাঙলা গদ্যের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ধরিয়া নিতে পারি।

লেখকের কথায় যদি বিশ্বাস করা যায়, তিনি যেরূপ দেখিয়াছেন, তাহাই অনুলিপি করিয়াছেন। প্রথমাংশ দেখিয়া তাহাই মনে হইতেছে। কারণ এই অংশকে সময় ও স্থানোপ-যোগী করিবার কোন প্রচেষ্টা তিনি করেন নাই। রূপ গোস্বামীর সময় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। অনুপম, সনাতন ও রূপ তিন ভ্রাতা। সনাতন ও রূপ গোস্বামীর

সঙ্গে মহাপ্রভুর প্রথম সাক্ষাৎ হয় গৌড়েশ্বরের রাজকর্মচারী হিসাবে। পরে ইঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর আদেশে ইঁহারা তিনজনই পদব্রজে নীলাচল হইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন। কিন্তু পথে অনুপমের মৃত্যু হয়। সনাতন ও রূপ বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। সুতরাং এই পুঁথিখানি স্বয়ং রূপ গোস্বামীর রচিত হইলে, ইহার সময়—ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম-ভাগ বলিতে হইবে।

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩১৩ সন ৩য় সংখ্যায় (১৩শ খণ্ড) রঙ্গপুর মাহিগঞ্জ হইতে শ্রীহরগোপালদাস কুণ্ডু কয়েকখানি পুঁথির পরিচয় দিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৭০নং পরিচয়ের পুঁথির নাম 'জিজ্ঞাসাপ্রণালী'। এই 'জিজ্ঞাসা-প্রণালী'ও আমাদের এই পুঁথিরই অনুরূপ। ইহার মধ্যে কিন্তু একস্থানে আমরা জিজ্ঞাসাপত্র কথাটি পাইতেছি। পরিচয়টি এইরূপ—

আরম্ভ—/৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণজী।

জিজ্ঞাসাপত্র লিখিত প্রভুর পরিচয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পরিচয়। আশ্রয়ে শ্রীগুরুর। উপাসনা কি কৃষ্ণমন্ত্র। কয় অক্ষর ষড় অক্ষর। অবলম্বন কি—বৈসাগ্নি। আলাপনে কৃষ্ণকথা।

শেষ—প্রবেশ তিন। রাম কৃষ্ণ হরি। সাক্ষী আগম নিগম। পুরোহিত কৃষ্ণচন্দ্র। ঘটক কেশব ভারতী। নারদ সভাপতি। সনকাদি মুনি প্রমাণ। জ্ঞাতি দ্বাদশ গোপাল। চৌষট্টি মুনি মহন্ত কুলদেব নিত্যানন্দ। মান কর্ম প্রেম উপার্জন। সঞ্চিত বিশ্বাস। শ্রীগুরুর আজ্ঞা। নর্মদা অকিঞ্চন ভক্তি জিজ্ঞাসা-প্রণালী সমাপ্ত।

একখানি বড় তুলট কাগজের একদিকে লেখা অতি ক্ষুদ্র পুঁথি। লিপিকারের নাম, সন বা তারিখ নাই।

লিখনভঙ্গী ভিন্ন আমাদের পুঁথির সঙ্গে ইহার কোন মিল নাই। ইহা ভিন্ন সন তারিখ না থাকায়, ইহার সময় নির্ধারণও সম্ভব নয়। তবে আমাদের পুঁথির তুলনায় ইহাকে অত্যন্ত আধুনিক বলিয়াই মনে হয়।

পরিষদ-পত্রিকা সন ১৩০৪ ১ম সংখ্যার ৪০ পৃষ্ঠায় শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী নরোত্তমের দেহ কড়চ নামক পুঁথির একটি পরিচয় সংযুক্ত করিয়াছেন। পরিচয়কারক খেতুরীর নিকটবর্তী এক বৈরাগীর কুটির হইতে পুঁথিখানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

এই পুঁথিখানিও গদ্যে রচিত। প্রশ্নোত্তর ছলে বৈষ্ণব-সাধনতত্ত্ব প্রচারই ইহার উদ্দেশ্য।

পুঁথি এইরূপ—

তুমি কে। আমি জীব। তুমি কোন্ জীব। আমি অস্থি জীব। থাকেন কোথা। ভাণ্ডে। ভাণ্ড কিরূপে হইল। তত্ত্ববস্তু হইতে। তত্ত্ববস্তু কি। পঞ্চ আত্মা। একাদশেন্দ্র ছয় রিপু ইচ্ছা এই সকল রেকযোগে ভাণ্ড হৈল।

* * * *

(শেষাংশ)—মাধুর্য নিত্য প্রকট। অতয়েব মাধুর্য প্রধান প্রকট। রূপে নিত্য ও বিহার। অতএব মাধুর্য নাএক শিক্ষাগুরু॥ নরত্তম দাষে কহে ভাবি সেই গুরু। ইতি শ্রীমন নরত্তম ঠাকুর মহাশয় বিরচীত দেহ কড়চ। শুভমস্তু। শকাব্দা ১৬০৩।

নরোত্তম দাস খেতুরীর রাজা কৃষ্ণানন্দের পুত্র। গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিয়া লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার জন্ম। এই দেহ কড়চ নরোত্তমের স্বরচিত হইলে, ইহার উপর রূপ গোস্বামীর প্রভাব থাকা আশ্চর্য নয়। রূপ গোস্বামীর জিজ্ঞাসাপত্রীর অনুকরণেই হয়ত ইহা রচিত হইয়া থাকিবে। দীনেশবাবুর মতে ১৫৬৩ খৃঃ অব্দে রূপ গোস্বামী ইহলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে দীর্ঘকাল তিনি বৃন্দাবন অধিবাসী ছিলেন।

আলোচ্য খণ্ডিত পুঁথিখানি দেখিয়া ইহা যে রূপ গোস্বামী রচিত, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ হয় না। মহাপ্রভুর তিরোধান হইয়াছিল ১৫৩৩ খৃঃ অব্দে। ইহারও বহু পূর্ব হইতেই রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনবাসী। এই দীর্ঘ বৃন্দাবন বাস হেতু বাঙলা ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁহার না থাকাই সম্ভব। উপরন্তু, সাধারণ কথাবার্তার জন্য তাঁহাকে হিন্দি ভাষাই অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কাজেই রচনার মধ্যে এই বাঙলা ও হিন্দি অদ্ভুত সংমিশ্রণ থাকা রূপ গোস্বামী ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়।

গদ্যের প্রথম বিকাশের সময় এই প্রশ্নোত্তর রচনা শুধু আমাদের দেশে নয়, ইংরেজী সাহিত্যেও আমরা ইহা দেখি। ইংরেজী সাহিত্য Alcuin-এর সময় অনুমান ৭৩০ খৃঃ অব্দ হইতে ৮০৪ খৃঃ অব্দ। তখনও ইংরেজী গদ্যের সৃষ্টি হয় নাই। তবুও ইহার প্রথম প্রচেষ্টা এখানেই আমরা দেখি।

"Alcuin, writing prose, is an educationist who resumes all branches of knowledge in manuals. He treats grammar, rhetoric, dialectics and the rest in the form of dialogoues or catechisms, having questions and answers. Sometimes the conversation is between a young Saxon and the young Frank whom he teaches, sometimes between Alcuin and Charlemagne himself, sometimes between Alcuin and his pupil Pepin, emperor's son. Often the questions are very like riddles......."

"What is the body? The spirit's lodging.

"What is hair? The clothing of the head.

"What is beard? The distinction between the sexes, the mark of age. etc.

—A History of English Literature—Emile Legories and Louis Cazamian. (Page 13).

পৃথিবীর দুইপ্রান্তে দুই বিভিন্ন যুগের সাহিত্যে গদ্যের প্রথম আবির্ভাব প্রচেষ্টায় অদ্ভুত ঐক্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

কবিতা

ব্ল্যাক আউট

শ্রীপরেশনাথ সান্যাল

রূপজীবী নগরীর নৈশরূপে আজি
অকস্মাৎ স্তিমিত—মলিন।
পথের দুপাশে নাই প্রদীপের ভীড় ঃ
অর্গলিত গৃহতলে জ্বলিছে প্রদীপ
তাও অতি ক্ষীণ।
চারিদিকে স্তব্ধতা নিখুঁত,
ঊর্ধ্বাকাশে নক্ষত্রেরা হাসে নির্ণিমিখ।
সতর্কিত পদক্ষেপ
অতর্কিত আক্রমণভয়
সশঙ্ক পথিক।

দুবৃত্তের আনাগোনা পথের উপরে
নির্লজ্জ উল্লাস।
ট্র্যাফিকের আর্তনাদ অন্ধকার বিমন্থন করে,
সন্তর্পণে চলে ট্রাম বাস্।
স্পর্ধিত আগ্রহ আজ নেই মোটরের
তীক্ষ্ম দৃষ্টি অপহৃত হেড লাইটের।

আলোকের স্তম্ভগুলি পথের দুপাশে
ছন্ন ছাড়া দৃষ্টি মেলি আকাশের দিকে চেয়ে আছে।
মানুষেরো ছায়াগুলি এখানে ওখানে
নিরুদ্বেগ চিত্ততলে উদ্বেগের চিহ্ন টেনে আনে।

গ্রহদের আঙিনাতে নগ্ন নভোতলে
বাজের চোখের মতো
ধাবমান বিমানের তীক্ষ্ম আলো জ্বলে।

অন্ধকার পথ বটে—কেহ তবু নির্বিকার নয়।
আসন্ন মৃত্যুর ছায়া জনতার চোখে মুখে ভাসে
দীপ হীন শহরের স্নায়ুতে স্নায়ুতে
কিসের প্রতীক্ষা যেন। প্রতীক্ষা না ভয়?

মানুষেরো হাড়ে হাড়ে তীব্র শীত কাঁপে
বিশৃঙ্খল আতঙ্কের শীত
নিষ্প্রদীপ আয়োজন
নৈশ নগরীর বুকে মৃত্যুর ইঙ্গিত।

ফাল্গুন

শ্রীযদুগোপাল রায়

অনেক রাত্রি ধূমেলী অন্ধকার
ফাল্গুন এলো ফল্গু নদীর স্রোতে।
অতীত দিনের সনাতনী অঞ্জন,
আজও শোভা পায় অন্ধের আঁখিপাতে।
ফাল্গুন এলো প্রাসাদে সুবিধাবাদী,
ছিনিমিনি খেলা যৌবন কামাতুর।
ভাঁটার টানেতে নির্মম স্থবিরতা,
বস্তীর ভাটী উৎসব পরিপূর।

ফাল্গুন এলো ফল্গু নদীর স্রোতে,
বিলাসী মনের কল্পিত আলপনা।
ছিন্নকন্থা কম্পিত শীত ভয়ে,
পর্ণ কুটীরে উৎসব বুঝি মানা!
মধুকর হীন মধুমাস আজ এলো
গুঞ্জন নয়, অস্ফুট কোলাহল।
শৈবাল জমা সীমাহীন মহাহ্রদ,
ঢেউ-এর দোলায় স্রোতহীন চঞ্চল।



রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১০৬তম জন্মোৎসব উপলক্ষে বেলুড় মঠে জনসমাগম



এলাহাবাদ সেণ্ট্রাল জেলে মহাত্মা গান্ধী : আবুল কালাম আজাদ ও শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাতের পর বাহির হইয়া আসিতেছেন



এলাহাবাদে মহাত্মাজীকে সম্বর্দ্ধনা

ভুল

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

(৪)

অমলের কাছে যে কথাটা যোগেশ সেদিন অত জোর দিয়া বলিয়া আসিল উহা যে কেবলই কথার কথা নহে এবং উহা যে একটা ঝোঁকের মাথায় সে বলিয়া ফেলে নাই যেন তাহাই প্রমাণ করিবার জন্যই অতঃপর সে আদাজল খাইয়া লাগিয়া গেল। শোভার কথা মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টায় সে তাহার দেশের বাড়ীর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল এবং পাছে কর্মহীন অবসরের কোন অসতর্ক মুহূর্তের ফাঁক দিয়া শোভা বা তাহারই সম্পর্কিত তাহার নিজের জীবনের কোন চিন্তা তাহার মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানে কোন বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়া বসে এই আশঙ্কায় এম এ পরীক্ষায় প্রস্তুত হইবার মত অত বড় কঠিন কাজের উপরেও বাহিরের প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় অনেক কাজ সে স্বেচ্ছায় ঘাড়ে তুলিয়া লইল। যোগেশের রাজনৈতিক জীবনের বন্ধু ও সহকর্মীরা তাহার এই অদম্য কর্মানুরাগ লক্ষ্য করিয়া যতটা খুসী হইয়া উঠিল বিস্মিত হইল তদপেক্ষা ঢের বেশী। তাহার অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু সুরজিৎ একদিন রহস্য করিয়া বলিয়াই ফেলিল, "এ তোমার নব-গৃহীতা সহধর্মিণীর প্রভাব নাকি যোগেশ?"

যোগেশ গম্ভীর হইয়া উত্তর দিল, "প্রভাব নিশ্চয়ই তাঁর; তবে এ আকর্ষণ না বিকর্ষণ তাই যা ভাববার ও বুঝবার কথা।"

সুরজিৎ কথাটা তলাইয়া বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিল না, যোগেশকে যে কাজের মধ্যে পূর্বাপেক্ষা বেশী করিয়া পাওয়া যাইতেছে এই আনন্দে ঐ পরিবর্তনের প্রকৃত উৎসটির সন্ধান কার্য নিষ্প্রয়োজনবোধে অর্ধপথেই সে পরিত্যাগ করিয়া গেল।

বিবাহের মাস তিনেক পর যোগেশ শোভার হাতের বাঁকা চোড়া অক্ষরের কালিমাখা একখানা অতি সাধারণ চিঠি পাইয়াছিল, কিন্তু উহা যে শোভার নিকট হইতে আসিয়াছে সেইটুকু বুঝিয়াই না পড়িয়াই উহা সে ছিড়িয়া ফেলিয়াছিল। অতঃপর শোভাও আর চিঠি লিখে নাই, যোগেশের তরফ হইতেও শোভার সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান হয় নাই।

কেবল মনোমোহনবাবু পুত্রের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। ঐ অনুসন্ধানই পরীক্ষা শেষ হইয়া যাইবার পর প্রথমে অনুরোধ ও পরে আদেশ হইয়া যোগেশকে কলিকাতা হইতে দেশের দিকে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা নিতান্ত কম করিল না, কিন্তু প্রথম হইতেই কাজের অজুহাত দেখাইয়া সেই যে যোগশ গোঁ ধরিয়া বসিল, উহার আর পরিবর্তন হইল না।

কিন্তু মুস্কিল হইল এই যে অজুহাত হিসাবে 'কাজ' কথাটা যুক্তির আকারে পিতার অনুরোধ ও আদেশ দুইই সাময়িকভাবে খণ্ডন করিতে সমর্থ হইলেও করিবার মত কাজ অত সহজে জুটিল না।

দেশে অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্ব অনেক পূর্বেই শেষ হইয়া গিয়াছিল। তখন উহারই প্রতিক্রিয়ার যুগ চলিতেছে। ছাত্রেরা স্কুল কলেজে ও উকিলেরা আদালতে ফিরিয়া গিয়া গত দুই তিন বৎসর সময় ও অর্থের যে অপচয় হইয়াছিল তাহারই যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন এবং যাহারা একেবারেই নৌকা পোড়াইয়া দেশ উদ্ধার করিবার কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন তাহারা স্বয়ং ও অপরকে দিয়া চরকা চালাইয়া অসহযোগ আন্দোলনের নিভন্ত প্রদীপটিকে মিট মিট করিয়া জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। যোগেশ আপনাকে ইহাদের কাহারও পর্যায়ে ফেলিতে না পারিয়া প্রথম দিকে কেমন যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল।

এমন কি বিপ্লববাদী দলের যাহাদের কাছে যোগেশের দেশসেবা বিদ্যার হাতেখড়ি হইয়াছিল এবং যাহাদিগকে তখনও সে সর্বাপেক্ষা আপনার জন বলিয়া মনে করিত তাহাদের মতামত ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গেও আপনাকে সে ঠিক খাপ খাওয়াইতে পারিল না।

সুরজিৎকে একদিন সে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াই ফেলিল, "এই অন্ধকার কুঠরীতে বসে বোমার নামে পটকা তৈয়ার করা, একটা ভাঙ্গা পিস্তল সংগ্রহ করার জন্য কলাবাগানের বস্তিতে আর খিদিরপুরের ডকে আনাগোনা করা বা বড় জোর কোন বড় দরের সাহেবকে মেরে ফেলা—এদিয়ে নিজেকে হয়ত ভুলান যেতে পারে সুরজিৎ, কিন্তু দেশ উদ্ধার করা যায় না।"

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়া গেলে সুরজিৎ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কিসে দেশ উদ্ধার করা যেতে পারে? চরকা কেটে?"

যোগেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না তাতেও না।"

"তবে?"

যোগেশ ক্ষণকাল চুপ থাকিয়া কহিল, "দেখ সুরজিৎ, আমার মনে হয় যে আমাদের দলের সব চাইতে কম বয়সের ছোকরা থেকে উপরদিককার মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত সবাই আগাগোড়া পর্যন্ত ভুল করে বসে আছে। ভারতের ইংরাজ রাজত্ব তাসের ঘরের মত এমন হালকা ও ঠুনকো জিনিষ নয় যা ফু দিলেই উড়ে যাবে। আর স্বাধীনতাও রামধনুর মত অশরীরী অবাস্তব কোন ভাবমাত্র নয় যার বাস্তবরূপ জাতির চোখে ধরিয়ে না দিলেও বরাবর একটা স্বপনের ঘোরেই লক্ষ লক্ষ নরনারী নিরুদ্দেশের পথে তীর্থযাত্রা করতে থাকবে। আমাদের আদর্শ ও পথ দু'য়ের মধ্যেই এত গলদ এখনও রয়ে গেছে যে এভাবে চললে কেবল আওয়াজই হয়ত মাঝে মাঝে হবে, কিন্তু লক্ষ বছরেও আমরা স্বাধীনতায় গিয়ে পেঁাছতে পারব না।"

সুরজিৎ ক্ষণকাল যোগেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "তুমিই যে হাওয়া, স্বপ্ন ও রামধনুর চাইতে অধিকতর বাস্তব আর কিছুর সন্ধান দিচ্ছ তা মনে হচ্ছে না ত! অন্ততঃ যা তুমি বললে তা থেকে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।"

যোগেশ হাসিল না, গম্ভীর হইয়াই কহিল, "স্বরাজ যে হাওয়া নয়, কেবল মাঝে মাঝে এক আধদিন ভোট দিবার অধিকারও নয় সে কথাটা জনসাধারণকে বলতে হবে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে স্বরাজ মানে কেবল ইংরাজ রাজত্বের অবসানই নয়, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা, বেকারি ও অনশনেরও অবসান, আর অবসান বৈষম্যের। প্রাসাদের পার্শ্বে পর্ণকুটীরের অস্তিত্ব বজায় থাকতে দিয়ে সভ্যতার নামে যে কদর্যতা আজও আমরা বাঁচিয়ে রেখেছি তার সমূল উচ্ছেদসাধনই স্বরাজ প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা। এই হল গিয়ে আদর্শ।"

"আর পথ?" সুরজিৎ জিজ্ঞাসা করিল।

যোগেশ উত্তর দিল, "পথ চরকাও নয়, বোমাও নয়—একমাত্র পথ জনগণের জাগৃতি। বাসুকীর মত ইংরাজ রাজত্বকে যা ধারণ করে আছে তা মন্ত্রমুগ্ধ জনসাধারণের সম্পূর্ণ স্বীকৃতি। তাকে উল্টে দিতে হবে। শান্ত, সন্তুষ্ট জনগণকে দিয়ে বর্তমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাতে হবে। আমাদের কাজ করতে হবে অন্ধকারে লুকিয়ে নয়, প্রকাশ্য দিনের আলোকে জনসাধারণের মধ্যে।"

সুরজিৎ হাসিয়া কহিল, "অর্থাৎ রুশিয়ায় বলশেভিক দল যা করেছে তাই। না?"

"ঠিক তাই," যোগেশ দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, "নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

সুরজিৎ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। একটু পরে যোগেশই পুনরায় কহিল, "এ পথে না হলে কাজই হবে না। বোমা তৈয়ার করা বা চরকা কাটা যা কাজ তার ক্ষেত্র এত সংকীর্ণ আর প্রকাশ এত ক্ষুদ্র যে কোন প্রকৃত কর্মীই কেবল ঐটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। আমরা মানুষ—আমাদের সৃষ্টি করবার ক্ষমতা অসীম। আমাদের মধ্যে রয়েছে অদম্য সৃজনের প্রেরণা। তার পরিতৃপ্তি কি হতে পারে কেবল দু'গজ সুতো বা একটি বোমা সৃষ্টি করে? না দু'জন সরকারী কর্মচারীকে মেরে ফেলার মত কদর্য ধ্বংসের মধ্যে? আমাদের প্রতিভা, আমাদের সৃষ্টি করবার শক্তি প্রকাশ পাবে জনজাগৃতির সেই রূপের মধ্যে যা মহাসাগরের মত সফেন তরঙ্গ তুলে আকাশকে স্পর্শ করবার জন্য ছুটে যাবে।"

সুরজিৎ সংশয়ের স্বরে কহিল, "কিন্তু যোগেশ, তুমি যে কাজের কথা বলছ তা ত লুকিয়ে করা যাবে না; ও করতে গেলেই ধরা পড়তে হবে।"

"হলই বা!" যোগেশ সোৎসাহে কহিল, "কাজ তাতে আটকাবে না। এ কাজের যারা কর্মী তাদের এক একটি কাজ এক একটি কথা শত শত কর্মী সৃষ্টি করবে। আর সব চাইতে বড় কথা, তারা এই কাজের মধ্যে পাবে পরিপূর্ণ সার্থকতা।"

সেদিন আলোচনা ইহার বেশী অগ্রসর হইল না, কিন্তু এই ভাবেই যোগেশকে পাইয়া বসিল এবং নিজের দলের অনেকের সম্মতি না পাইলেও একরকম জোর করিয়াই সে শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

ইহার পর যোগেশের আর কাজের অভাব হইল না। মেসে তাহার সীট থাকিয়া গেলেও অতঃপর হাওড়ার পাটকলসমূহের কুলি-ব্যারাকই তাহার বাসস্থান হইয়া উঠিল এবং হাজার হাজার কুলি-মজুরদের অভাব-অভিযোগ লইয়া সে এমনই মাতিয়া উঠিল যে শোভা তো দূরের কথা, নিজের আহার নিদ্রাও সে একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেল। পাটকলের বড় বড় যে সমস্ত শ্বেতাঙ্গ মালিকেরা এতদিন নিরুদ্বেগে শ্রমিকের রক্ত শোষণ করিয়া আপনাদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করিতেছিল তাহাদেরই বিরুদ্ধে মজুরদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলিবার জন্য যোগেশের শ্রান্তিহীন চেষ্টার ফলে দেশে বিপ্লব আসন্ন হইয়া আসুক আর না আসুক, যোগেশের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি খুবই প্রখর হইয়া উঠিল এবং উহারই ফলে বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই একদিন রাজদ্রোহ ও শ্রেণীবিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগে তাহার দুই বৎসরের কারাদণ্ড হইয়া গেল।

(৫)

সংবাদ পাইয়া মনোমোহনবাবু অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তার পর উঠিয়া ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া শোভাকে উদ্দেশ করিয়া ডাকিলেন, "একবার এদিকে এস ত বৌমা।"

অসময়ে কর্তাকে বাড়ীর ভিতর আসিতে দেখিয়া শোভার বিস্ময়ের অবধি রহিল না, সে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "কি বাবা, এমন অসময়ে ভিতরে যে?"

"একটা বড় দুঃসংবাদ এসেছে মা, তাই তোমায় বলতে এলাম," বলিয়া মনোমোহনবাবু আসন গ্রহণ করিলেন।

শোভা শঙ্কমুখে নীরবে চাহিয়া রহিল, আশঙ্কায় তাহার মুখে বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

মনোমোহনবাবু যতটুকু জানিতে পারিয়াছিলেন তাহা সবিস্তারে পুত্রবধূকে শুনাইয়া দিয়া উপসংহারে কহিলেন, "একটা খবর পর্যন্ত আমায় সে জানায়নি যাতে আমি মোকদ্দমা লড়বার জন্য উকিল মোক্তারের ব্যবস্থা করতে পারি। এখন ত দুই বছর আর কিছুই করবার উপায় নেই।"

শোভা কোন প্রকার মন্তব্য না করিয়া ধীরে ধীরে গৃহের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

মনোমোহনবাবু অনেক দিন যাবৎই পুত্রবধূর নিকট আপনাকে অপরাধী মনে করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি সেকেলে লোক—মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাসী। বিবাহের মন্ত্র যে চক্ষুর নিমিষেই দুইটি পরস্পরের অপরিচিত হৃদয়কে একেবারে এক করিয়া দিতে পারে একথা তিনি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতেন, আর করিতেন স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যৌন আকর্ষণের অদম্য শক্তিতে। স্ত্রীর রূপ ও গুণ সম্বন্ধে পুরুষ বিবাহের পূর্বে যে অভিমতই প্রকাশ করুক না কেন, বিবাহ একবার হইয়া গেলে মন্ত্রশক্তি ও যৌন আকর্ষণের দুর্দম স্রোতের মুখে অসন্তুষ্ট পক্ষের অসন্তুষ্টি ও আপত্তি যে দুর্বল তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া যাইবে না তাহা তিনি মনে করিতে পারেন নাই এবং পারেন নাই বলিয়াই যোগেশের আপত্তিসত্ত্বেও তিনি শোভার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর যোগেশের বাক্য ও কার্যের ভিতর দিয়া তিনি নিজের আজন্মঅর্জিত বিশ্বাস ও লোকচরিত্রজ্ঞানকে ক্রমেই মিথ্যা প্রতিপন্ন হইতে দেখিয়া শেষের দিকে বেশ একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন। ইদানীং বর্দ্ধিত-যৌবনা বধূকে দেখিলে কেবলই তাঁহার মনে হইত যে জোর করিয়া যোগেশের সঙ্গে ইহার মিলন ঘটাইয়া দিয়া হয়ত কাজটা তিনি ভাল করেন নাই। শোভার দেহে উদ্ভিন্ন যৌবনের বর্দ্ধমান লক্ষণ এবং তাহার মুখের উপর সদাবর্তমান বিষাদের একখানি ছায়া লক্ষ্য করিয়া একটা অস্পষ্ট বেদনায় তাঁহার হৃদয় যেমন ব্যথিত হইয়া উঠিত তেমনই মাঝে মাঝে একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায়ও তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিত। শেষের দিকে দুই একবার এ কথাও তিনি ভাবিয়াছিলেন যে দেশের অতবড় রাজসংসার গৃহলক্ষ্মীর অভাবে উৎসন্ন যদি যায় তাহাও বরং স্বীকার করিয়া তিনি স্বয়ং শোভাকে যোগেশের কাছে রাখিয়া আসিবেন। কিন্তু এখন সে সম্ভাবনাও অন্ততঃ দুই বৎসরের জন্য বন্ধ হইয়া গেল দেখিয়া তাঁহার বিরক্তি ও অশান্তির আর অন্ত রহিল না।

একদিন শোভাকে কাছে ডাকিয়া সান্ত্বনার স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "দুঃখ করো না বৌমা। সতীর সাধনা ব্যর্থ হতেই পারে না। আজ দুঃখ তোমার যত কঠিনই হউক না কেন, ইহাই একদিন যোগেশকে তোমার কাছে টেনে আনবে।"

কিন্তু শোভা নতমুখে মৌন হইয়াই রহিল। দেখিয়া মনোমোহনবাবু কহিলেন, "কি মা, এ কথা বিশ্বাস হচ্ছে না?"

শোভা চক্ষু মুছিয়া গাঢ়স্বরে উত্তর দিল, "এ কথা অবিশ্বাস করি না। কিন্তু আমার জীবনের যে দিন যাচ্ছে তা ত আর আমার ফিরে আসবে না।"

উত্তরটি মনোমোহনবাবুর কানে ভাল লাগিল না, অথচ ইহার উত্তরে যে কথা তাহার মুখে আসিতেছিল তাহাও তিনি মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলেন না।

শোভাই ক্ষণকাল পর কহিল, "মেয়ের যারা আপনার জন, তারা

সব সময়েই বড় ঘর খুঁজেই থাকেন; কিন্তু আপনি এতে রাজী হলেন কেন? আপনার ছেলেকে আপনি ত অন্ততঃ ভালই জানেন; তাঁর অমতে আপনি আমাকে এঘরে আনলেন কেন?"

মনোমোহনবাবু ঈষৎ বিরক্ত ঈষৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন, "এ তুমি কি বলছ বৌমা? এ যে নির্বন্ধের কথা, একে কি কেউ ঠেকাতে পারে?"

শোভা সশব্দে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ছোট্ট করিয়া মন্তব্য করিল, "কি জানি।"

শাস্ত্রবাক্যে বধূর এই অনাস্থা বৃদ্ধকে পীড়া দিল, কিন্তু সদ্যোদ্ভিন্নযৌবনা বধূর বিষন্ন ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া তিনি সেদিন তাহাকে একটিও তিরস্কারের কথা বলিতে পারিলেন না।

কিন্তু অসন্তুষ্টির যে বহিঃপ্রকাশকে সেদিন তিনি সযত্নে গোপন করিয়া গেলেন উহাই মাস দুই পর এক ঘটনা উপলক্ষে বড় স্পষ্ট হইয়াই প্রকাশ হইয়া পড়িল।

কয়েক দিন যাবৎ মনোমোহনবাবু অসুখে পড়িয়াছিলেন। ভুগিয়া ভুগিয়া স্বতঃই তাহার মেজাজটি ভাল ছিল না, তাহার উপর সে দিন নির্দিষ্ট সময়ে পথ্য না পাইয়া তাহার বিরক্তি ও অসন্তুষ্টি চরমে গিয়া উপস্থিত হইল এবং উহাই আগ্নেয়গিরির প্রস্রবণের মত উৎসারিত হইয়া উঠিল তখন যখন নির্দিষ্ট সময়েরও আধঘণ্টাখানিক পর বধূর পরিবর্তে এ সংসারের পরগাছা আত্মীয়স্থানীয়া বৃদ্ধা জাহ্নবী দেবী এক বাটি দুধ-সাবু হাতে লইয়া রোগীর ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

মনোমোহনবাবু দুধ-সাবু ত খাইলেনই না বরং জাহ্নবী দেবীর নির্বন্ধাতিশয্যে বিরক্ত হইয়া বাটিশুদ্ধ সবটুকু দুধ-সাবু মুক্ত দ্বারপথে বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

জাহ্নবী দেবী ক্ষুব্ধ বিরক্তকণ্ঠে কহিলেন, "দেরী হয়েছে এই ত! তা দোষ তোমার বৌমার। তিনি সেই যে সকালে ওপাড়ার বিয়েবাড়ীতে গিয়েছেন এখন পর্যন্ত তার দেখাই নেই। কখন তোমাকে পথ্য দিতে হবে সে কথা আমাকেও তিনি বলে যাননি। আমি কি করে জানব কখন কি তোমার চাই?"

মনোমোহনবাবুর ক্রোধ দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে রূপান্তরিত হইল। তিনি কহিলেন, "বৌমা বিয়েতে গিয়েছেন? কৈ আমি ত কিছু জানি না!"

"আমরা জানবার কে যে আমাদের জানতে হবে?" কথাটা বলিবার সুযোগ পাইয়া জাহ্নবী দেবী যেন বাঁচিয়া গেলেন, "বৌমা কি আমাদের কাউকে তার অভিভাবক মনে করেন যে আমাদের জানিয়ে, আমাদের মত নিয়ে তিনি কোন কাজ করবেন?" একটু থামিয়া অঞ্চলপ্রান্তে চক্ষুর কোণ মুছিয়া ফেলিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে তিনি বলিয়া গেলেন, "যাই, তোমার দুধ-সাবু আবার তৈরী করে আনি। রাগ করলে নিজেরই কষ্ট হবে বই ত নয়।"

ইহারও ঘণ্টাখানিক পর মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া শোভা আসিয়া যখন তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিল তখন মনোমোহনবাবুর সর্বাঙ্গ ক্রোধে একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। বধূর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে করিতে তিনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, "তোমার স্বামী না জেলে ঘানি টানছেন বৌমা? তবু তোমার এই সাজ? ও সব গয়নার স্পর্শে তোমার গা জ্বলে যায় না?"

শোভা কোন উত্তর দিল না, নতমুখে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিবার পর নিঃশব্দেই সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

ইহার পর আবার যখন শোভা এ ঘরে আসিল তখন তাহার পরনে আটপৌরে একখানি শাড়ী ও প্রকোষ্ঠে কেবল লোহা ও শাঁখা ছাড়া আর কোন অলঙ্কারই ছিল না। দেখিয়া মনোমোহনবাবু সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শোভা মৃদুস্বরে কহিল, "আমার সব গয়না ও কাপড় চোপড় আমি পিসিমার হাতে তুলে দিয়েছি।"

"তার অর্থ?" মনোমোহনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

শোভা মুখ না তুলিয়া পূর্বের মতই মৃদুস্বরে কহিল, "আমার ভুল হয়েছিল বাবা। আমি গরীবের মেয়ে; আপনারা দয়া করে এ বাড়ীতে আমায় আশ্রয় দিয়েছেন। এই কথাটা কিছুতেই যে আমার ভুললে চলবে না তা এবার বুঝতে পেরেছি। অতঃপর এ ভুল আর হবে না। আমি দাসী, দাসীর মতই থাকব।"

"এসব তুমি কি বলছ বৌমা?" মনোমোহনবাবু মহাক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন এবং ঐ অত রাত্রেও তাহার অত কঠিন বাতের বেদনাকে উপেক্ষা করিয়া শয্যায় অর্দ্ধশায়িতভাবে বসিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত বধূকে এই কথাই তিনি বুঝাইবার প্রয়াস পাইলেন যে স্বামীকে পাইবার জন্য সীতা বা সতীর যে তপস্যার কথা হিন্দুর ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে উহার অন্তর্নিহিত দারিদ্র্য ও দুঃখ প্রাচুর্য বা অধিকার কোনটিরই অভাবের দ্যোতক নয়; উহা সর্বতোভাবেই স্বেচ্ছাগৃহীত এবং সেই জন্যই উহারই সৌন্দর্যের প্রশংসায় যুগযুগের, দেশ ও বিদেশের ঋষি ও কবিরা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন। শোভার ব্যবহারে হিন্দু নারীর ঐ অত বড় আদর্শ ক্ষুণ্ন হইতে দেখিয়াই যে বড় দুঃখে তিনি তাহাকে তিরস্কার করিয়াছেন এই কথাটা মনোমোহনবাবু বারবার করিয়া শোভাকে বলিলেন এবং এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে জানাইয়া দিলেন যে অধিকারের কথা যদি কোন দিন নিষ্পত্তি করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয় তবে সেদিন শোভার অধিকার যোগেশের অধিকারেরও ঊর্দ্ধেই হয়ত প্রতিষ্ঠিত হইবে; সন্তান হইয়াও পিতার নির্বাচিতা সতী স্ত্রীকে যে পুত্র অবহেলা করিয়া নিরন্তর পীড়া দিয়াছে তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে মনোমোহনবাবু পশ্চাৎপদ হইবেন না।

শোভা সকল কথা নীরবে কেবল শুনিয়াই গেল, উত্তরে সে কোন মন্তব্য করিল না।

কিন্তু এত উপদেশের ফল কি হইল তাহা প্রকাশ পাইল আরও মাস তিনেক পর।

সেদিনও গ্রামেরই এক আত্মীয়ের গৃহে কি একটা সামাজিক ক্রিয়া উপলক্ষে সপরিবারে মনোমোহনবাবুর নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। বধূর প্রতি নিজের সেই আর একদিনের আচরণের কথা স্মরণ করিয়াই বোধ করি ঐ দিন মনোমোহনবাবু স্বয়ং শোভাকে সর্ব অলঙ্কারে সাজাইয়া দিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

শোভা কিন্তু প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "কাজ নেই বাবা। থাক্।"

"সে কি হয় মা!" মনোমোহনবাবু স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "তুমি আমার গৃহলক্ষ্মী, এতবড় রাজসংসারের তুমি মহারাণী। ক্রিয়াকাণ্ডের বাড়ীতে তুমি ভিখারিণীর মত গেলে আমার কি মুখ থাকে মা?"

ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে সত্য সত্যই মহারাণীর মত সাজিয়া শোভা যখন বাহির হইয়া আসিল তখন তাহার দিকে চাহিয়া মনোমোহনবাবুর চোখে জল আসিল। গোপন অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া মনে মনে তিনি কহিলেন, ইহার জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দিবার অপরাধে পরকালে বিচার যদি হয় তবে সে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় একা যোগেশকেই দাঁড়াইতে হইবে না, হয়ত বা পুত্রের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইবার জন্য তাঁহারও ডাক পড়িবে।

ভাবনাটাকে মনোমোহনবাবু সহজে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন না, তাই নিমন্ত্রণের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া বধূকে সাদরে কাছে বসাইয়া তিনি সস্নেহকণ্ঠে কহিলেন, "আমি বুড়ো-মানুষ মা, রাগের মাথায় যদি কিছু বলি তার জন্য রাগ করে আমা-

দের তুমি অভিশাপ দিও না। তুমি সতী, তোমার দীর্ঘনিশ্বাসে এ বাড়ী ছাই হয়ে যেতে পারে। কিন্তু দুঃখ তোমার যত বড়ই হউক না কেন, তার জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবার আগে এ কথা তুমি একবার মনে করো যে এ বাড়ীর যা কিছু সবই তোমার।"

শোভা গাঢ়স্বরে কহিল, "তা মনে করে শান্তি পাই কোথায় বাবা? আমার স্বামীকেই যদি আমি না পাই তবে কি হবে আমার এই ধনৈশ্বর্য দিয়ে?"

মনোমোহনবাবু সান্ত্বনার স্বরে কহিলেন, "তোমার স্বামীকেও তুমি পাবে মা। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ ব্যর্থ হবে না।"

শোভা অঞ্চল প্রান্তে চক্ষু মুছিয়া কহিল, "আমি গরীবের মেয়ে—আপনার সংসারে এসে অতুল রাজৈশ্বর্য পেয়েছি। আমার রূপ নাই, গুণ নাই—অথচ আমার যিনি স্বামী তাঁর রূপগুণের তুলনা হয় না। তবু আমার মন ভরে কই? প্রায়ই আমার মনে হয়—আমার বিয়ে যদি আমারই মত গরীব নির্গুণ স্বামীর সঙ্গে হত ত তিনি আমায় হেলা করতেন না। তার সংসারের এক-বেলার শাকান্নও আমার মুখে এ সংসারের রাজভোগের চাইতে বেশী রুচত।"

শুনিয়া মনোমোহনবাবু শিহরিয়া উঠিলেন। কথা কয়টির ভিতর দিয়া বধূর মনের যে রূপটি প্রকাশিত হইয়া পড়িল উহা যে সীতার মনের মত মোটেই নয় তাহা উপলব্ধি করিয়া তিনি নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং এই চিন্তাস্রোত অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিলে শেষ পর্যন্ত উহা যে শোভাকে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইবে তাহা ভাবিয়া তাঁহার আশঙ্কা ও অস্বস্তির অন্ত রহিল না।

ক্রমাগত কয়েকদিন এই সম্বন্ধে ভাবিয়া ভাবিয়া মনোমোহন-বাবু অবশেষে জমিদারির কাজকর্ম এক রকম পরিত্যাগ করিয়াই শোভাকে সীতার মত সতী করিয়া গড়িয়া তুলিবার কাজে লাগিয়া গেলেন। বৃদ্ধ কুলপুরোহিত শোভার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইলেন এবং তিনি শোভার ভাষাজ্ঞানের অভাব এবং বর্ণজ্ঞানের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতিকে উপেক্ষা করিয়া প্রত্যহই রামায়ণ মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া বেদান্তসূত্রের গূঢ়তত্ত্ব পর্যন্ত অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে শোভার কানের মধ্যে ঢালিয়া যাইতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে গ্রামের সমস্ত স্ত্রীলোকের জন্য কীর্তন ও কথকতা প্রত্যহের অবশ্য কর্মসূচী বলিয়া নির্ধারিত হইল এবং মনোমোহনবাবু স্বয়ং কাছারি ছাড়িয়া গৃহদেবতার মন্দিরকেই নিজের বাসস্থান করিয়া লইয়া শোভাকে স্বীয় ধর্মচর্চার প্রধান সহকারিনী করিয়া লইলেন। রাজসংসারের সধবা বধূকে তপোবনের বিধবা ব্রতচারিণীর কঠোর তপস্যায় নিয়োগ করিয়া মনোমোহনবাবু মনে মনে এই সান্ত্বনা লাভ করিবার প্রয়াস পাইলেন যে এই কৃচ্ছ্রসাধনার আগুনে স্বামী পরিত্যক্তা পুত্রবধূর সকল কামনা কালক্রমে ভস্ম হইয়া যাইবে এবং তাহার ভিতরকার দেবী একদিন কষিত কাঞ্চনের মতই উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইবে।

শোভা মনোযোগ দিয়া রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের গল্প শুনিল, অপরিসীম নিষ্ঠার সঙ্গে হিন্দুশাস্ত্রের নির্দিষ্ট ব্রত-নিয়ম পালন করিয়া যাইতে লাগিল এবং প্রত্যহ শুনিয়া শুনিয়া বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীর অনেকগুলি গান এক রকম মুখস্থ করিয়া ফেলিল।

বৃদ্ধ কুলপুরোহিত একদিন গদ্ গদ্ কণ্ঠে মনোমোহনবাবুকে কহিলেন, "মা আমাদের কেবল সাক্ষাৎ লক্ষ্মীই নন, সরস্বতীও।" সন্ধ্যার পর রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে গলদশ্রুলোচনে আরতি দর্শনের পর মনোমোহনবাবু ঐ কথাটিই স্মরণ করিয়া বধূকে কহিলেন, "এ কয়মাস যা তুমি শিখে আসছ বৌমা, নশ্বর সংসারে কেবল তাই অবিনশ্বর সত্য। ওর ভিতর দিয়ে যা তুমি পাবে তা সকল পাওয়ার সেরা পাওয়া।"

শোভা কিন্তু কহিল, "আমার স্বামীকে যদি আমি না পাই বাবা, তবে ভগবানকে পেয়েও আমার শান্তি হবে না।"

মনোমোহনবাবু কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন, ঢোক গিলিয়া কহিলেন, "ও একই কথা মা। আমাদের শাস্ত্রে আছে স্বামীই স্ত্রীর ভগবান।"

শোভা কহিল, "হ্যাঁ, বাবা। আমিও তাই শিখছি। তাই কায়মনে ঠাকুরের কাছে রোজই প্রার্থনা করি—ঠাকুর আমার স্বামীকে তুমি আমায় দাও। আমার এ প্রার্থনা কি ঠাকুর শুনবেন না?"

মনোমোহনবাবু সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "শুনবেন বই কি। সতীর প্রার্থনা তাঁকে শুনতেই হবে।"

দিন কয়েক পর এমনই একটা প্রসঙ্গ উপলক্ষে শোভা মনো-মোহনবাবুকে কহিল, "আমার কেবলই আশঙ্কা হয় বাবা, যে আমার স্বামী বোধ করি কোনদিনই আমার মুখের দিকে মুখ তুলে চাইবেন না। আমি মূর্খ, আমি কুৎসিৎ—আমি তাঁর যোগ্য নই। কিন্তু তাই যদি হয় তবে কি নিয়ে আমি সংসারে বেঁচে থাকব?"

মনোমোহনবাবু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর দিলেন, "সে আমার সন্তান—এ কথা বলতে আমার মুখে বাধে। তবু এ কথা আজ আমি তোমাকে বলছি বৌমা যে, সে যদি তোমার প্রতি অবিচারই করে তবে তার ফল তাকে ভুগতে হবে।"

শোভা মৃদুস্বরে কহিল, "তাতে আমার কি সান্ত্বনা বাবা? আমার জ্বালা ত তাতে একটুও কমবে না।"

মনোমোহনবাবু কহিলেন, "তোমার এ সাধনা ব্যর্থ হবে না মা। কিন্তু তবু তোমায় আমি বলি, ভগবানে মনস্থির করবার চেষ্টা কর। একা তাঁকে পেলেই জগতের সব কিছু পাওয়া যায়।"

শোভা একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "কি জানি, আমি কিন্তু কেবল আমার স্বামীকেই চাই।"

মনোমোহনবাবু ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া পরে কহিলেন, "বেশ ত মা। তোমার চাওয়া যদি সত্যই হয়, তবে সে সশরীরে তোমার কাছে না এলেও তোমার পাওয়ার কোন ব্যাঘাত হবে না। চক্ষু মুদলেই তুমি নিজের মনের মধ্যে তার দেখা পাবে।"

"তা আমি এখনও পাই," শোভা উত্তর দিল, "কিন্তু সে পাওয়ায় আমি শান্তি পাই না। আমি মানুষ, আমি আমার স্বামীকেও মানুষের মতই পেতে চাই।"

মনোমোহনবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার নিজের অশান্ত যৌবনের কথা তাঁহার স্মরণ হইল। দেহের চাওয়া যে কত সত্য ও কত প্রবল তাহা তিনি নিজের মনে অস্বীকার করিতে পারিলেন না বলিয়াই বধূর মন্তব্যের কোন প্রতিবাদ করিতে পারি-লেন না। কেমন করিয়া যে এ সমস্যার মীমাংসা হইবে তাহাই ভাবিতে ভাবিতে প্রায় সমস্ত রাত্রি তাহার অনিদ্রায় কাটিল।

তাঁহার এই মানসিক অশান্তি শতগুণে বাড়িয়া গেল তখন যখন পূর্ণ কারাদণ্ড ভোগের পর মুক্তি পাইয়াও যোগেশ দেশে না আসিয়া কলিকাতায়ই রহিয়া গেল। কথাটা যখন বধূর নিকট হইতে আর গোপন রাখা সম্ভব হইল না, তখন একদিন উহা প্রকাশ করিয়া বলিতেই হইল। বর্ণনা শেষ করিয়া মনোমোহন-বাবু অসহায়ের মত কহিলেন, "বল ত মা, কি আমি এখন করি?"

শোভা নতমুখে মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "আমার ত কোনই জোর নেই বাবা। কিন্তু আপনার ত তিনি সন্তান—এ ব্যাপারে আপনারও কি কোন জোর চলবে না?"

মনোমোহনবাবু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পরে দৃঢ়স্বরে

কহিলেন, "চলবে মা—আমি চালাবই। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি নিজে কলকাতায় তার কাছে যাব।"

মনোমোহনবাবু করিলেনও তাহাই। সপ্তাহখানিকের মধ্যেই কলিকাতায় বাড়ীভাড়া লইয়া একজন পুরাতন দারোয়ান, বর্ষীয়সী দাসী কামিনীর মা ও শোভাকে সঙ্গে লইয়া তিনি স্বয়ং কলিকাতায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

(৬)

যোগেশের গণনায় একটা ভুল হইয়াছিল। শোভার প্রতি তাহার ব্যবহার এবং সেই সম্পর্কে পিতার অবাধ্য হওয়ার অপরাধে মনোমোহনবাবু তাহাকে শাস্তি দিতে পারেন, হয়ত বা রাগের মাথায় ত্যাজ্যপুত্রও করিতে পারেন এইরূপ সম্ভাবনা একাধিকবার তাহার মনে উঠিয়াছিল এবং উহার জন্য সে প্রস্তুতও হইয়াছিল। কিন্তু মনোমোহনবাবু শেষ পর্যন্ত যাহা করিয়া বসিলেন, শাস্তি যে সেই মূর্তিতে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, তাহা যোগেশ কল্পনা করিতে পারে নাই, উহার জন্য নিজে সে প্রস্তুতও হয় নাই। সুতরাং অবস্থার যখন উদ্ভব হইল তখন তজ্জন্য তাহার বিরক্তির অবধি না থাকিলেও উহা মাথা পাতিয়া স্বীকার করা ছাড়া সে আর কিছু করিতে পারিল না।

মনোমোহনবাবু স্বয়ং যোগেশের মেসে গিয়া সমস্ত সংবাদ জানাইয়া তখনই তাহাকে নূতন বাড়ীতে আসিবার আদেশ প্রদান করিলেন এবং পাছে তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত না হয়, সেই আশঙ্কায় তিনি নিজে ঐ মেসের বারান্দায় ঘণ্টা দুইকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া যোগেশকে তাহার সমস্ত আসবাবপত্র সহ নিজের গাড়ীতে বসাইয়া নূতন বাড়ীতে লইয়া আসিলেন।

বাড়ীতে পুত্রকে তিনি পরামর্শ দিবার মত করিয়া কহিলেন, "নারায়ণকে সাক্ষী রেখে যাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছ তার দায়িত্ব ত তোমাকে বহন করতেই হবে যোগেশ।"

যোগেশ নতমুখে মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "তাকে ত অকূলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় নি। আমাদের সংসারে তার ত কোন অভাবই থাকবার কথা নয়।"

"অভাবের কথা হচ্ছে না," মনোমোহনবাবু গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "বিবাহ মানে বিশেষভাবে বহন করা। তোমরা শিক্ষার গর্ব করে বেড়াও, এ দায়িত্ব বুঝবার মত বিদ্যার অভাব ত তোমার থাকার কথা নয়।"

যোগেশ চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে মনোমোহনবাবুই পুনরায় কহিলেন, "স্ত্রীর সঙ্গে তুমি থাকতে চাও না কেন, শুনি।"

যোগেশ ঢোক গিলিয়া শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিল, "এ জীবনে আমার রুচি নেই। আমি দেশের, দশের কাজ করব।"

মনোমোহনবাবু শান্তকণ্ঠে কহিলেন, "বেশ ত। তাই যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, আমরা কেউ তাতে বাধা দিতে চাই নে। সেজন্য সংসারে তোমাকে পরিত্যাগ করতে হবে কেন?"

উত্তরে যে কথা যোগেশের বলিবার ছিল তাহা সে সাহস করিয়া মুখে উচ্চারণ করিতে পারিল না। মনোমোহনবাবু নির্বাক পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া আদেশের গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, "ছেলেমানুষি যা হবার তা হয়ে গেছে। কিন্তু এইবার তাকে শেষ করে দিতে হবে। তুমি বিবাহিত, তুমি গৃহী। তুমি গৃহীর মত বাস করবে এই আমার আদেশ।"

বৎসর চারেক পূর্বে শোভাকে বিবাহ করিবার আদেশ মনোমোহনবাবুর কণ্ঠ হইতে যে স্বরে বাহির হইয়াছিল আজ শোভার সঙ্গে ঘর করিবার আদেশও সেই স্বরেই বাহির হইয়া আসিল। সেদিন যে কারণে যোগেশ পিতার আদেশ অমান্য করিতে পারে নাই, আজও সেই কারণেই সে উহার প্রতিবাদ করিতে পারিল না।

মনের মধ্যে অনেকখানি বিরক্তি বহন করিয়া সমস্ত দিন সে বাহিরের ঘরেই কাটাইয়া দিল এবং রাত্রে শোভাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিবার সংকল্প লইয়াই অনেক রাত্রে সে শয়নগৃহে প্রবেশ করিল।

শোভা যোগেশের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া তাহাকে প্রণাম করিল তারপর নিঃশব্দে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রায় চার বৎসর পর যোগেশ শোভার দিকে চাহিয়া দেখিল। অর্ধ অবগুণ্ঠিত মুখ স্পষ্ট দেখা গেল না, সুসংযত বস্ত্রের আবরণের ভিতর দিয়া তাহার দেহবিন্যাসও চোখে পড়িল না। কেবল দেখা গেল শঙ্খ ও বলয়সজ্জিত দুইখানি প্রকোষ্ঠ আর বোধ করি বা বক্ষ স্পন্দনেরই তালে তালে পরণের শাড়ীখানির মৃদু অস্পষ্ট কম্পন। যোগেশের নিজের বক্ষ স্পন্দনও অকস্মাৎ যেন দ্রুত হইয়া উঠিল।

শোভা দাঁড়াইয়াই রহিল দেখিয়া যোগেশ কহিল, "বস।"

শোভা ধীরে ধীরে গিয়া খাটের পায়ের কাছটিতে উপবেশন করিল। অলংকারের একটা অস্পষ্ট শিঞ্জন ধ্বনি ঘরের হাওয়ার উপর দিয়া যেন ঢেউ খেলাইয়া বহিয়া গেল।

আবার নিস্তব্ধতা—কেবল দুইজনের নিশ্বাসের শব্দ ভিন্ন ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ আর কোন শব্দ শোনা গেল না।

ঐ নিস্তব্ধতা সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন যোগেশ অসহিষ্ণুর মত বলিয়া উঠিল, "বসে রইলে যে? শোও।"

শোভা মৃদুস্বরে কহিল, "তোমার বিছানায় আমি শোব?"

যোগেশের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "এ প্রশ্নের কি কোন আবশ্যক আছে? যখন বাড়ী ছেড়ে কলকাতায় এসেছ তখনই ত এর মীমাংসা হয়ে গেছে।"

শোভা পূর্বের মতই মৃদুস্বরে কহিল, "তুমি গেলে না তাই আমাদেরই আসতে হল। ঠাঁই যদি না দিতে চাও ত তাড়িয়ে দিতেও পার।"

অসহ্য বিস্ময়ে যোগেশ শোভার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু এবারও অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া শোভার মুখ দেখা গেল না। একটু পরে যোগেশ কহিল, "তাড়িয়ে দেবার কোন কথা আমার তরফ থেকে হয় নি। তবু তোমার মনে যখন এ কথা উঠেছে তখন বুঝতে হবে যে আমি যে তোমাকে চাই না একথাটাও তুমি বুঝেছ।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শোনা গেল; তাহার পর শোভা কহিল, "বিয়ের পর চার বৎসরের মধ্যে একখানা চিঠি পর্যন্ত লিখলে না; তা থেকে এই সোজা কথাটাও কি বুঝতে পারব না!"

শোভার কণ্ঠস্বর বড় করুণ শুনাইল, যোগেশ তথাপি কহিল, "বুঝতেই যদি পেরেছ তবে এখানে এলে কেন?"

"আমার যে আর উপায় নেই!" শোভা উত্তর দিল।

যোগেশ চুপ করিয়া রহিল; ক্ষণকাল পরে শোভা কহিল, "তুমি আমায় চাও না, কিন্তু তুমি ছাড়া আমার আর গতি নেই। তুমি আমায় তাড়িয়ে দিতে চাও, মার, কাট, যা কর তবু আমি এখানেই মাটি খুঁড়ে পড়ে থাকব। তুমি ত আমারই; আমি তোমায় ছাড়ব না।"

বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া যোগেশ কহিল, "এ কথা তুমি কার কাছে শিখলে?"

শোভা উত্তর দিল, "কারও কাছে নয়। এ কথা কারও কাছে আমাদের শিখতে হয় না। আমরা হিন্দুর মেয়ে, জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গেই এ কথা আমরা জানতে পারি।"

অস্বস্তির একটা সুতীব্র অনুভূতি যোগেশকে যেন ঠেলিয়া তুলিয়া দিল এবং উহারই প্রেরণায় চঞ্চল হইয়া সে ঘরের মধ্যে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ পর চলিতে চলিতেই সে কহিল, "না শোভা, তোমাকে তাড়িয়ে আমি দেব

না! যদি অসহ্য হয় তবে নিজেকেই আমি এখান থেকে অপসারিত করব।"

উত্তরে শোভার অকম্পিত কণ্ঠস্বর তাহার কাণে আসিল, "না, তাও তুমি যেতে পাবে না, আমি তোমায় যেতে দেব না।"

যোগেশ সচকিতে ফিরিয়া চাহিতেই শোভার সঙ্গে তাহার চোখাচোখি হইয়া গেল। বোধ করি স্বামীর চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া বিস্মিতা শোভা অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া এতক্ষণ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল, কখন যে মাথার কাপড় পিঠের উপর পড়িয়া গিয়াছিল তাহা বোধ করি নিজেও সে জানিতে পারে নাই। তাই ফিরিয়া চাহিতেই উজ্জ্বল আলোকে শোভার সমগ্র মুখখানিই যোগেশের চোখে পড়িয়া গেল।

বৈশিষ্ট্যহীন, বৈচিত্র্যহীন, শ্যামবর্ণ গোলগাল একখানি অতি সাধারণ মুখ প্রথম দৃষ্টিতেই যোগেশের প্রত্যাশী চক্ষু দুইটিকে যেন পীড়া দিয়া দূরে ঠেলিয়া দিল। অথচ যোগেশ শিহরিয়া উঠিয়া তাহার যে দৃষ্টি সচকিতে ফিরাইয়া লইল তাহাই অকস্মাৎ যেন শোভার দেহের মধ্যে অনেকখানি বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করিয়া দিল। নিজের দেহের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে একটা সুতীব্র শিহরণ অনুভব করিয়া শোভা তৎক্ষণাৎ মাথার উপরে পুনরায় অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল।

যোগেশ কিন্তু ঘরের মধ্যে আর দাঁড়াইয়াও থাকিতে পারিল না; অন্তরে কি একটা প্রবল বিতৃষ্ণা ক্রমশ প্রবলতর হইয়া উঠিয়া তাহাকে যেন ঘাড় ধরিয়া ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল।

রাত্রি তখন অনেক—কলিকাতার পথও জনশূন্য হইয়া আসিয়াছে। গ্যাসের আলোর পাতলা চাদরের ফাঁক দিয়া সুপ্ত কলিকাতার সমগ্র রূপটি স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। কিন্তু এ রূপ যোগেশের চোখে পড়িল না। বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়া সে পথের দিকে চাহিয়া রহিল বটে, কিন্তু এইমাত্র ঘরের মধ্যে যে মুখখানি সে দেখিয়া আসিয়াছে উহাই তাহার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে কেবল অধিকারই নহে, অভিভূতও করিয়া রাখিল।

রাত্রির এই অনুকূল প্রতিবেশের মধ্যেও যে মুখখানি তাহার মনে বিন্দুমাত্রও মোহ জন্মাইতে পারিল না উহারই অধিকারিণী যে তাহারই স্ত্রী এবং অতঃপর ইহারই সঙ্গে যে তাহাকে মৃত্যু পর্যন্ত কাটাইতে হইবে, চেষ্টা করিয়াও সে অব্যাহতি পাইবে না, এই চিন্তা যেন অনবরত হাওয়া করিয়া তাহার মাথার ভিতরের আগুনকে প্রবল হইতে প্রবলতর করিয়া তুলিতে লাগিল।

কতক্ষণ যে এমনভাবে কাটিয়া গেল সে সম্বন্ধে তাহার খেয়ালই ছিল না, তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল শোভার কণ্ঠস্বরে। পিছন হইতে শোভা স্নিগ্ধ মৃদুস্বরে কহিল, "শোবে না?"

যোগেশ চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। শোভা মাথার উপর কাপড় তুলিয়া দিয়াছিল, কিন্তু এবার আর পূর্বের মত অবগুণ্ঠন দিয়া সমগ্র মুখ ঢাকে নাই। তবে পথের গ্যাসের অস্পষ্ট আলোকে সে মুখের প্রত্যেকটি রেখা স্পষ্ট হইয়া চোখে পড়িল না।

যোগেশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস সযত্নে গোপন করিয়া কহিল, "হ্যাঁ, চল।"

ঘরে ফিরিয়াই যোগেশ শয্যায় শুইয়া পড়িল। ক্ষণকাল একটু ইতস্তত করিয়া শোভা পূর্বের মতই মৃদুস্বরে কহিল, "যদি বল আমি না হয় অন্য ঘরে যাই!"

"না, তার দরকার নেই," বলিয়া যোগেশ পাশ ফিরিয়া শুইল।

আরও ক্ষণকাল ইতস্তত করিবার পর অবশেষে শোভা দ্বার বন্ধ করিয়া আলো নিভাইয়া শয্যায় আসিয়া যোগেশের পার্শ্বে শয়ন করিল।

শোভার চুলের গন্ধ যোগেশের নাসারন্ধ্র পথে তাহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তীব্র সুরার মত উহার প্রত্যেকটি অনুপরমাণুকে সতেজ করিয়া তুলিল।

ক্ষণকাল পর শোভার একখানি হাত যোগেশের দেহের উপর বিন্যস্ত হইল—সেই প্রথম রাত্রির মত। যোগেশের হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হইয়া উঠিল।

শোভা মৃদুস্বরে কহিল, "আমি এসেছি দেখে তুমি যে মোটেই খুসী হও নি তা আমি বুঝি। কিন্তু কি করবে?—এ যা সম্বন্ধ, একে ত তুমি ছিঁড়তে পারবে না।"

একটি দীর্ঘনিশ্বাস সযত্নে চাপিয়া যোগেশ মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "তা জানি।"

"তবে কেন আমায় অবহেলা করছ?" শোভা জিজ্ঞাসা করিল।

যোগেশ উত্তর দিল না।

একটু পরে শোভাই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কুৎসিত তাই?"

যোগেশ ঢোক গিলিয়া উত্তর দিল, "না।"

"তবে কি? আমার গুণ নেই, তাই?

"না।" যোগেশ পুনরায় ঢোক গিলিল।

"তবে?"

যোগেশ কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, একটু নড়িয়া চড়িয়া কহিল, "তোমাকে অবহেলা আমি করি নি। তবে এই সংসারীর জীবন আমার ভাল লাগে না।"

"কেন?"

"কেন, তা জানি না," যোগেশ মৃদুস্বরে কহিল, "তবে এটুকু জানি যে আমি দেশের দশের কাজ করতে চাই।"

শোভা যোগেশের একখানি হাত নিজের মুঠোর মধ্যে গ্রহণ করিয়া মৃদু অথচ সনির্বন্ধস্বরে কহিল, "দেখ, ঢের হয়েছে। ও সব এখন ছাড়। বিয়ে যেদিন করেছ সেই দিনই সংসারী হয়েছে। এখন তার দায়িত্ব অস্বীকার করলে চলবে কেন?"

শোভার সান্নিধ্য অনুভব করিয়া যোগেশের দেহের রক্ত যে অনুপাতে উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এখন আবার সেই অনুপাতেই যেন উহা শীতল হইয়া গেল। সে কোন উত্তর করিল না।

একটু অপেক্ষা করিয়া শোভা স্বামীর হাতের উপর আরও একটু বেশী চাপ দিয়া কহিল, "ও সব আর চলবে না, বুঝলে? আমি আর ওপথে তোমায় যেতে দেব না।"

যোগেশ পাশ ফিরিয়া শুইল, কোন উত্তর করিল না।

(ক্রমশ)

দুইটি সহজ প্রবৃত্তির কথা

শ্রীঅজিতকুমার দেব এম-এস-সি, এম-বি (ক্যাল), ডি পি এম (ইংল্যাণ্ড)

জীবজন্তু এবং মানুষের মধ্যে অনেকগুলি সহজ প্রবৃত্তি দেখা যায়। সহজ প্রবৃত্তির তাড়নাতেই প্রাণীজগৎ চালিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে দুইটিকে প্রধান বলিয়া ধরা যাইতে পারে—(১) ক্ষুধার প্রবৃত্তি বা খাইবার ইচ্ছা (Nutritive instinct) ইহার উদ্দেশ্য প্রাণীকে খাদ্য এবং পুষ্টির দ্বারা বাঁচাইয়া রাখা। (২) প্রজনন প্রবৃত্তি (Reproductive instinct) —ইহার উদ্দেশ্য জাতিকে বাঁচাইয়া রাখা।

ছেলে মানুষ করিবার সময় এই দুইটি সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। বাঁচিয়া থাকার জন্য কি কি খাদ্য গ্রহণ করিতে হয় ইহাই আমরা প্রথম আলোচনা করিব।

(ক) আমাদের শরীরের কোষগুলিকে (cells) বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এবং তাহাদিগের বৃদ্ধির জন্য এক প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিতে হয় ইহার নাম পলীয় (protein)। নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্যের ভিতর ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়—যথা মাংস, ডিম্ব, দুগ্ধ, সবজি, মটর, কলাই প্রভৃতি।

(খ) কাজ করিবার জন্য, শরীরের তাপ রক্ষার জন্য এবং কিছু শক্তি সঞ্চিত করিয়া রাখিবার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন; এই শক্তি শর্করা জাতীয় খাদ্য (Carbohydrate) হইতে পাওয়া যায়—যেমন শ্বেতসার (Starch) এবং চিনি। ইহা ছাড়া স্নেহ-দ্রব্য (fatty Substance) হইতেও শক্তি সংগৃহীত হয়। ফল এবং মধু হইতে আমরা চিনি পাই। ভাত, রুটি, আলু, সাগু-দানা এবং অনেক শাক-সবজি হইতে আমরা শ্বেতসার পাই। তৈল বা স্নেহজ দ্রব্য আমরা দুগ্ধ, মাখন, বাদাম, মাংসের চর্বি এবং উদ্ভিজ্জ তৈল হইতে পাই।

(গ) ইহা ছাড়া বাঁচিবার জন্য তুল্যপরিমাণে নানাবিধ লবণ, ভাইটামিন এবং জল গ্রহণ করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত খাদ্যের পরিমাণ (bulk) বৃদ্ধির জন্য ফল ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্য খাওয়া দরকার; শেষোক্ত খাদ্যগুলি খাইলে পরিত্যক্ত ও বাতিল দ্রব্য নিষ্কাশিত করিয়া দিবার সুবিধা হয়। স্বাস্থ্যকরভাবে জীবন-ধারণের জন্য যে লবণ এবং ভাইটামিনের দরকার হয় তাহা আমরা ফল এবং উদ্ভিদ হইতে পাইয়া থাকি।

সাধারণত আমরা যে সকল খাদ্য গ্রহণ করি তাহার ভিতর প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি অনুরূপ পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। তবে যখনই আমরা খেয়ালের বশে (fads) অথবা ভয়ের দরুণ এই খাদ্যদ্রব্য হইতে কোন অংশ বাদ দিই তখন কতকগুলি প্রয়োজনীয় সামগ্রীও ইহার সহিত বাদ পড়িয়া যাইতে পারে। জীবনধারণ করিতে হইলে নানাপ্রকার (Variety) খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা উচিত—সুতরাং বাদ দেওয়া দূরে থাক, বাজারে যে খাদ্য পাওয়া যাইবে অল্পাধিক পরিমাণে সমস্তগুলি খাইলে কোন দরকারী জিনিস বাদ যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই সম্পর্কে একটি সরল প্রথা মনে রাখিলে কাজ দিবে—সাধারণ লোকের যতখানি পলীয় (Protein) এবং স্নেহজ (fat) খাদ্য খাওয়া দরকার—তাহার দুইগুণ অধিক শ্বেতসার (Starch) তাহাকে খাইতে হইবে; অর্থাৎ যদি সে চারি ভাগ পলীয়, তিন ভাগ স্নেহজ খাদ্য খায় তাহা হইলে তাহাকে (৪+৩)×২ বা ১৪ ভাগ শ্বেতসার খাইতে হইবে। মোটামুটি মনে রাখা উচিত যে মাছ, মাংস, ডিম্ব অপেক্ষা ভাত, রুটি এবং আলু অধিক পরিমাণে খাওয়া দরকার; তাহা না করিয়া অনেক লোক অত্যধিক পরিমাণে মাংসাদি খাদ্য গ্রহণ করে। আমাদের দেশে অনেক লোক মাছ মাংস স্পর্শ করে না তাহার পরিবর্তে তাহারা রাশীকৃত ভাত খাইয়া ফেলে। উপরোক্ত দুই কারণেই খাদ্যের সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। সাধারণত পরিবারে বুদ্ধিমান লোক থাকিলে যেরূপ খাদ্য গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা হয় তাহা বৈজ্ঞানিক মতের অনুরূপ হইয়া থাকে। দিনের মধ্যে নিয়মিতভাবে তিনটি প্রধান খানা খাওয়া দরকার যাহার ভিতর অল্পাধিকতর সমস্ত জিনিসের সমন্বয় আছে এরূপ করিলে অনেকগুলি অসুখের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।

এইবার ছেলেদের খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। জন্মের পরবর্তী প্রথম ছয় মাস শিশুকে শর্করা জাতীয় কোন খাদ্য দেওয়া উচিত নয়, কারণ এই খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের জন্য যে নিঃসারণের (Secretion) প্রয়োজন তাহা তখন তৈয়ার হয় না; যতদিন না শিশুর দন্ত উদ্গত হয়, ততদিন এই ব্যবস্থা চলিবে। নয় মাস হইতে এক বৎসর বয়সের সময় শিশুকে স্তনদুগ্ধ ছাড়াইতে হইবে। ইহা ক্রমশ বন্ধ করিলে শিশুর কোন অসুখ হইবে না; মাতৃদুগ্ধ হইতে হঠাৎ গরুর দুধে পরি-বর্তন করা যুক্তিযুক্ত নহে। আমাদের দেশে অনেকে ৩—৪ বা ততোধিক বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুকে স্তন্যপান করিতে দেন —ইহাতে মাতার স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা থাকে এবং শিশুরও একটি কু-অভ্যাসের সৃষ্টি হয়।

শিশুর উচ্চতা বৃদ্ধি করিতে হইলে তাহাকে বরাবর আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ খাওয়াইতে হইবে। দিনের মধ্যে ন্যূনপক্ষে আধসের দুগ্ধ খাওয়া আবশ্যক। সহ্য করিতে পারিলে ইহার বেশী খাইলে ভাল হয়; প্রত্যেকের পক্ষে এক কোয়ার্ট অর্থাৎ তিন পোয়া দুগ্ধ সুষ্ঠু ব্যবস্থা।

শিশুকে জল খাওয়ান দরকার; তৃষ্ণাতুর হইয়া পড়িলে অনেক সময় শিশুর মেজাজ খিটখিটে হয়। কলের জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া পান করিলে কোন অসুখের ভয় থাকে না।

খাইবার সময় হাঙ্গামার সৃষ্টি করা আধুনিক শিশুদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়; মাতাপিতা অথবা নার্স শিশুর সম্মুখে খাদ্য সম্বন্ধে অত্যধিক উদ্বেগ বা অযথা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলে সে ঐরূপ আচরণ করে।

কয়েকটি খাদ্য গ্রহণ করিবার পর বমির ভাব দৃষ্ট হয়, অথবা আমবাত নির্গত হয়; আবার কোন কোন খাদ্য খাইয়া শিশুর নাক, মুখ, চোখ হইতে অনর্গল সর্দি ঝরিতে থাকে (Hay fever); এই সকল বিষয় নজর রাখা দরকার এবং শিশুর যদি কোন খাদ্যে বিতৃষ্ণা থাকে তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া সেই খাদ্য খাওয়ান সঙ্গত নয়।

ভুগিলে তাহাকে কোন ওষুধ দিবার পূর্বে কয়েকটি সাধারণ উপায় অবলম্বন করিলে কার্যসিদ্ধি হইতে পারে; চায়ের চামচের এক চামচ অলিভ অয়েল (Olive oil) অথবা খুব ছোট চামচের এক চামচ মধু খাওয়াইলে উপকার হয়। পেটের উপর দক্ষিণ হইতে বাম দিকে মৃদু মর্দন করিলেও সুফল পাওয়া যায়—এই সময় সরিষার তৈল অথবা Talcum powder ব্যবহার করিলে ঘর্ষণের সুবিধা হয়। Glycerine suppository হইতেও সমুচিত ফললাভ হয়।

কাঁচা শাক-সবজি (salad) ক্ষুদ্র শিশুকে দিবার উপযোগী নহে। এমনভাবে খাদ্যের আয়োজন করিতে হইবে যাহাতে কোন জিনিসের অভাব না হয়। নিরামিষ ভোজন এবং বিশেষ পথ্যে (Special diet) এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় বলিয়া এই-গুলিতে আপত্তি আছে।

শিশুর খাদ্যে যে ভাইটামিনের প্রয়োজন তাহা নিম্নবর্তী খাদ্য হইতে সংগ্রহ করা যায়—কমলালেবু বা টোমাটোর রস, কলা, আঙ্গুর, পেঁপে, আম, শাক-সব্জি, ডিম, দুধ, সর, মাখন এবং মাছ। শিশুর বয়স দুই বৎসরের কম হইলে তাহাকে এই সকল খাদ্যদ্রব্য দেওয়া যায়। এক বৎসর বয়সের সময় অল্প পরিমাণে উত্তমরূপে সিদ্ধ ভাত দেওয়া যাইতে পারে; তবে দুইবেলা ভাত খাওয়া অনুমোদন করা যায় না।

খাদ্যে অধিক মসলা ব্যবহার করা উচিত নয় বিশেষত যখন আমরা সেই খাদ্য শিশুকে দিই। কিন্তু আমরা বাঙালীরা প্রায়ই এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকি—এবং ইহা হইতে বিসদৃশ ফল উৎপন্ন হইলে তাহা নিষ্কামচিত্তে উপেক্ষা করি। আমরা সকলেই জানি যে নবজাত শিশুর পক্ষে মাতৃদুগ্ধ উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। শিশুর ছয় মাস বয়স পর্যন্ত প্রকৃতিদেবী তাহার এই খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই খাদ্যের উপর তাহার দেহের পুষ্টি এবং শরীর বৃদ্ধি নির্ভর করে—সুতরাং ইহা যাহাতে যথোপযুক্ত হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য; যিনি শিশুর দুগ্ধ সরবরাহ করিতেছেন তাঁহার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—কিন্তু আমরা এ বিষয় অবাঞ্ছনীয়ভাবে উদাসীন; আমরা পরিবারের অন্য ব্যক্তির পরিত্যক্ত এবং উচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্য শিশুর মাতার জন্য ব্যবস্থা করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে স্বকর্মে বাহির হইয়া পড়ি; এই খাদ্যের পরিমাণ এবং গুণ কিরূপ হইল তাহা বিবেচনা করাও প্রয়োজন মনে করি না—সেই মাতা যে শিশুকে পালন করিবেন—সেই শিশুই ভবিষ্যতে আবার দেশের আশা ভরসা হইবে। বাঙ্গালী জাতি অতি বুদ্ধিমান বলিয়া আমরা প্রায়ই গর্ব করিয়া থাকি, কিন্তু দুগ্ধের গুণ যে খাদ্যের গুণের উপর নির্ভর করে, ইহা আমরা কখনও বুঝিবার চেষ্টা করি না। অনেক সময় দেখা যায়, গরু ভাল দুধ দিবে বলিয়া তাহাকে আমরা অতি যত্নসহকারে খাওয়াইয়া থাকি—কিন্তু শিশুর ভাল দুধের জন্য মাতার খাদ্যের সুব্যবস্থা করিতে একেবারে ভুলিয়া যাই। বাঙ্গালী মাতার দুগ্ধ সেইজন্য অনেক সময় নিকৃষ্ট হয়; দুগ্ধ নিকৃষ্ট হইলে এবং পরিমাণ অল্প হইলে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা ছাড়া অন্য গতি নাই। কৃত্রিমভাবে দুধ খাওয়াইতে হইলে দুইটি জিনিস বিবেচনা করিতে হইবে—(১) মূল্য, (২) সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা।

আমরা জানি ছাগল দুগ্ধ অনেকটা মনুষ্য দুগ্ধের অনুরূপ এবং শিশুকে গরুর দুধ খাওয়াইতে হইলে তাহাতে সম-পরিমাণে জল এবং কিঞ্চিৎ চিনি ও মাখন মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবার প্রয়োজন হয়। কলিকাতার গরুর দুগ্ধ উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে প্রায়ই নিকৃষ্ট হয়—এইক্ষেত্রে দুগ্ধ ফুটাইয়া ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত; অনেকে বলিয়া থাকেন ইহার দ্বারা দুগ্ধের কোন কোন ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়—কিন্তু আমরা সেইগুলি অন্য খাদ্যদ্রব্য হইতে অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারি। শিশুকে প্রথম শর্করাজাতীয় (Carbohydrate) খাদ্য দিবার সময় উহা malted এবং dextrinised ভাবে দিলে শিশুর পক্ষে সুপাচ্য হয়।

ছেলেমেয়ে বড় হইলে তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে রুটি, মাখন ও দুগ্ধ খাইতে দেওয়া উচিত। দুগ্ধের মধ্যে যে স্নেহজ (fat) পদার্থ আছে যেমন সর এবং মাখন তাহা ছেলেদের বিশেষ উপযোগী। ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে সেই সকল ভাই-টামিন আছে যেগুলি শরীর গঠন এবং শরীর বৃদ্ধির জন্য দরকার হয়। প্রচুর পরিমাণে দুধ, মাখন খাইতে না দিলে ছেলেমেয়েরা হৃষ্টপুষ্ট হয় না। দুধের মধ্যে যে পলীয় (Protein) আছে তাহাও ছেলেদের উপযুক্ত এবং ইহা মাংস ও ডিম্ব অপেক্ষা ভাল কারণ ইহা Kidneyর কার্য বৃদ্ধি করে না। নিম্নলিখিত খাদ্যগুলি ছেলেদের খাইতে দিলে উপকার হয়—যথা রুটি, মাখন, দুগ্ধ, ফল, শাক-সব্জি প্রচুর পরিমাণে; মাংস এবং ডিম্ব মাঝে মাঝে খাইতে দিলে শিশুর যতটুকু দরকার তাহা তাহারা পাইবে। শিশুদিগকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যাহাতে তাহারা সাধারণ খাদ্য খাইতে অযথা ভয় না পায় বা খেয়াল মাফিক খাওয়া দাওয়া না করে। আমাদের দেশে খাদ্য সম্বন্ধে অধিকতর যত্নবান হইতে হইবে—যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ না করায় এবং খাদ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা না হওয়ায় এদেশের লোকের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং সেজন্য আজ বাঙলা সকল প্রকার ব্যারামের আড়ৎ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বলা বাহুল্য, ইহার সহিত আর্থিক অবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইবে যাহাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল, তাহারাও উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে যথাযোগ্য খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে না।

ছাত্রাবস্থায় ছেলেমেয়েদিগকে প্রতিদিন আধপোয়া মাছ অথবা মাংস কিংবা এক ছটাক মাছ ও দুই একটি ডিম্ব এবং আধসের দুধ খাইতে দিতে হইবে। নিম্নে একদিনের উপযোগী ভোজ্য সামগ্রীর তালিকা এবং তাহার মূল্য বিবৃত করা হইলঃ—

			তাপাঙ্ক (Calories)	আঃ	পঃ
দুগ্ধ তিন পোয়া অথবা	২৪	আউন্স	৪৪০ ,,	৩	
ভাত এক পোয়া অথবা	৮	,,	২৮০ ,,		২
আটার রুটি এক পোয়া অথবা	৮	,,	৪৫০ ,,		৩
ঘী এবং তৈল এক ছটাক অথবা	২	,,	৫৪০ ,,	২	
মাছ এক ছটাক অথবা	২	,,	৯০ ,,		২
মাংস দুই ছটাক অথবা	৪	,,	১৮০ ,,	১	
শাক-সব্জী দেড় পোয়া অথবা	১২	,,	১৫০ ,,		৩
ফল ...		...	৮০ ,,	১	
চিনি এক ছটাক অথবা	২	,,	২৪০ ,,		২
ডাল এক ছটাক অথবা	২	,,	১০০ ,,		২
		যোগফল	২৫৫০	১০	২

উপরে যে পরিমাণ খাদ্য বর্ণনা করা হইল উহা তিন চারি ক্ষেপে বিভক্ত করিয়া খাইতে হইবে। ফলগুলির নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ছাত্র এবং সাধারণ গৃহস্থ ইহাপেক্ষা সস্তা করিতে গেলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা আছে।

এইবার প্রজনন প্রবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। আমরা যেমন নিজেরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই—তেমনি আমরা চাই আমাদের জাতিকে (species) বাঁচাইয়া রাখিতে। এই শেষোক্ত কারণের জন্যই পুনরুৎপাদন প্রবৃত্তিটি এত প্রবল। ইহার তাড়নায় মানুষ জন্মদান করিয়া তাহাকে সযত্নে পালন করিয়া আবার মানুষ করিয়া তুলিতে চায়—এইরূপে সে অজ্ঞাতসারে একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া ফেলে। মানুষের অনেক সদ্‌গুণের বিকাশ হয় পুনরুৎপাদন ও সন্তান পালন এই দুইটি প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া। এই দুইটি প্রবৃত্তিকে একটি বলিয়াই ধরা যাইতে পারে এবং দুইটির সহিত ভালবাসার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। সেজন্য ভালবাসার ক্রমবিকাশ কিভাবে ঘটে—তাহার আলোচনা প্রয়োজন।

মনঃসমীক্ষণ দ্বারা মনোবিৎরা প্রমাণ করিয়াছেন যে ভালবাসা ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে থাকে; ইহার চারি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ অতিবাল্য হইতেই শিশুর অন্যান্য শিক্ষার মত ভালবাসারও শিক্ষা চলিতে থাকে। মনোরাজ্যে কোন জিনিসই হঠাৎ উৎপন্ন হয় না—সমস্ত জিনিসেরই কারণ আছে—সেই কারণ আমাদের জানা না থাকিলে তাহার অস্তিত্ব নাই বলিয়া আমরা তাহাকে অস্বীকার করিতে পারি না। এই ভালবাসার রাজ্যেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।

ক্ষুদ্র শিশু নিজের দেহটিকে অত্যন্ত ভালবাসে—ইহাকে স্বকাম বা narcissis বলা হয়। সে এইরূপে নিজেকে চিনিয়া লয় এবং দেখিতে পায় যে, তাহার শরীরের কতকাংশ হইতে প্রীতিকর অনুভূতি উৎপন্ন হয়; স্তন্যপান করিবার সময় ক্ষুধা নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশু ওষ্ঠদেশ হইতে অপরূপ সুখ ভোগ করে আর একটু বড় হইলে সে নগ্ন অবস্থায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়—ইহার মধ্যে অসভ্যতা কিছু নাই; ইহা তাহার ক্রমবিকাশের একটি স্তরমাত্র। এক কথায় শিশু নিজেকে প্রকৃত ভালবাসে। কিন্তু এইভাবে বেশীদিন কাটানো উচিত নয়—তাহাকে ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে, কোন অবস্থাকে জোর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে চলিবে না।

ইহার পরবর্তী অবস্থায় তাহার ভালবাসাটি আপনা হইতে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শিশুর বয়স যখন এক বৎসর মাত্র তখন সে তাহার গন্ডীর ভিতরে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অনুরক্ত হয়। এই অবস্থায় সে মাতা এবং পিতাকে ভালবাসে। ফ্রয়েড বলিয়াছেন যে, ক্ষুদ্র বালক তাহার মাতার প্রতি আসক্ত হয় (oedipus complex) ও বালিকা পিতাকে ভালবাসে। শিশুর সমস্ত ভালবাসা যে এইভাবে অর্পিত হয় তা নয়—তবে শিশুর স্বাভাবিকভাবে ক্রমবিকাশ হইলে তাহার ভালবাসার বেশীর ভাগ এইরূপে মাতাপিতা বা তাঁহাদের স্থলে অন্য কোন ব্যক্তি অধিরূঢ় হইলে তাঁহার উপর গিয়া পড়ে। তাঁহারা যদি এই সময় শিশুর প্রতি যথোচিত ভালবাসা এবং সহানুভূতি না দেখান তাহা হইলে ভালবাসার অবদমন হইয়া (repressed) সে স্বাভাবিক পথে অগ্রসর না হইয়া তাহার পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে এবং তখন শিশু পুনরায় নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাকিবে। আবার বেশী আদর বা প্রশ্রয় দিলেও ভালবাসার বেড়াজালে আটকাইয়া গিয়া আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিবে না। এই সকল আদুরে ছেলে সংসারক্ষেত্রে উপনীত হইয়া অকর্মণ্য হইয়া পড়ে ও নানা দুঃখকষ্ট এবং যন্ত্রণা ভোগ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভালবাসার এই যে গতি—যখন শিশুর ভালবাসা মাতাপিতা, ভাইবোন এবং ধাত্রীর উপর পড়ে—ইহাও তাহার ভালবাসার আর একটি স্তর এবং ইহারও প্রয়োজন আছে। আমরা যেমন একতালা হইতে দোতালায় লাফাইয়া উঠিতে পারি না—ইহার জন্য একটি সিঁড়ি বা মইর দরকার হয়, সেইরূপ শিশুর ভালবাসাও ধাপে ধাপে পূর্ণত্বের দিকে ছুটিয়া চলে। মনোরাজ্যে সমস্ত জিনিসই এইরূপে স্তরে স্তরে ঘটিয়া থাকে—আমরা বুঝিতে না পারিয়া মনে করি কোন একটা ব্যাপার হঠাৎ হইয়া গেল।

ইহার পরবর্তী অবস্থায় শিশু নিজে নগ্ন থাকিতে ভালবাসে এবং অন্যের নগ্নতা দেখিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করে। এই সময় সে কাম সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করে; তখন সে প্রশ্ন করিতে পারে 'ছোট ছেলে কোথা হইতে আসে'; তাহার এই প্রশ্নে প্রৌঢ়েরা অতি বিব্রত হইয়া পড়েন। অনেকে হাসিয়া, কেহবা ধমকাইয়া অন্য কথা পাড়িয়া শিশুর প্রশ্নটি চাপা দিবার চেষ্টা করেন। শিশু এ সমস্ত লক্ষ্য করে—তাহার দৃষ্টিশক্তি অতি তীক্ষ্ণ—তাহাকে ধোঁকা দেওয়া দুরূহ ব্যাপার। মনোরাজ্যে কোন বিষয়কে ছাই-চাপা দেওয়া যায় না। মিথ্যা রূপকথার গল্প রচনা করিয়া তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করা উচিত নয়; বয়োবৃদ্ধেরা এই পন্থা অবলম্বন করিলে শিশুরা ধূর্ত হইয়া উঠে ও অচিরে মিথ্যা ধরিয়া ফেলে। গুরুজনেরা সরলহৃদয় এবং অকপটভাবে উত্তর দিলে শিশুর অনুসন্ধিৎসা সহজেই তৃপ্ত হয় এবং সে তখন এ বিষয়ে অন্য

প্রশ্ন উত্থাপন করে না; এরূপ না করিলে অনেক দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

তাহার পর প্রায় চারি পাঁচ বৎসর বয়সে শিশু খেলার সাথীর অনুসন্ধান করে। সেই সময় বালক বালকের সহিত মিশিতে চায় এবং দল বাঁধিতে ভালবাসে; বালিকাও সেইরূপ বালিকার সংসর্গ পছন্দ করে। এইরূপে গৃহের বাহিরে দৃষ্টি পতিত হওয়ায় পরিবারের বন্ধন ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া আসে—ইহাও তাহার সুশিক্ষার একটি অংগ এবং ইহাতে কাহারও বাধা দেওয়া উচিত নয়। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, ছেলেমেয়েরা এই সময় মাতাপিতাকে ভালবাসে না। তাহারা তখন ভালবাসার কিয়দংশ বহির্জগতে বিতরণ করে—এইরূপেই তাহারা ক্রমশ সমাজকে ভালবাসিতে শিখে এবং স্বাধীন ও সক্ষমভাবে জীবনধারণ করিবার চেষ্টা দেখে।

শৈশব হইতে কৈশোর পর্যন্ত দীর্ঘকালব্যাপী প্রচ্ছন্নভাবে ভালবাসার আয়োজন চলিতে থাকে (latency period); এই সময় বালকবালিকা শৈশবের অনুসন্ধিৎসার কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয় এবং কামজ কোন প্রশ্ন যে কখনও তাহাদের মনে উদয় হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করে। তখন তাহাদের অন্যান্য বিষয়ে কৌতূহল দেখা যায়।

কিছুকাল শান্ত থাকিবার পর প্রবল ঝটিকার সূত্রপাত হয়। কৈশোরের সময় এই ঝড়ের উৎপত্তি। ঝড়ঝাপ্টা শান্ত হইলে দেখা যায় বালক যুবক হইয়াছে এবং বালিকা যুবতীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই সময় বালিকা নারীত্ব লাভ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; বালক তখন আর কাহারও শাসন মানিতে চায় না—সে পুরুষত্বের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রকৃতিদেবী এইভাবে স্বকর্ম সাধন করেন, ইঁহাকে বাধা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন—মানুষ বাধা দিয়া প্রকৃতির গঠন রোধ করিতে পারে না। তবে সে প্রকৃতির সৌন্দর্য যে বিকৃত করিতে পারে তাহা নিঃসন্দেহ। মানুষ অবুঝ হইয়া যে অনেক বিপর্যয় ঘটায় তাহার নমুনা ভূরিভূরি দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া যুবক তাহার সঙ্গী-সহচর ত্যাগ করিয়া তাহার জীবন-সাথীর সন্ধানে বাহির হয়। মিলনের দ্বারা উভয়ের জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং সার্থক হইয়া যায়। ইহাই স্বভাবসিদ্ধ জীবনের গতি। কিন্তু প্রায়ই ইহা স্বাভাবিকভাবে সুসম্পন্ন হয় না। জীবনীশক্তি অনেক সময় এই পথে অগ্রসর হইতে পারে না—কোন না কোন স্থানে কণ্টকে বাধা পড়িয়া যায়। পারিবারিক বন্ধন এবং আর্থিক অনটনের দরুণ মিলনের পথে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়। সভ্যতার ফলে সামাজিক বহুল পরিবর্তন ঘটিলেও মানুষের সনাতন সহজপ্রবৃত্তি চিরকাল একভাবেই রহিয়াছে—ইহার জন্যই সমাজ এবং সহজপ্রবৃত্তির মধ্যে ঘনঘন বিরোধ বাধিয়া যায় এবং এই বিরোধগুলি মানুষের সুখের পথকে অবরুদ্ধ করিয়া দিয়া নানাপ্রকার মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি করে।

ভালবাসার ক্রমবিকাশের স্তরগুলি একটি চিত্রের দ্বারা বর্ণনা করিলে বুঝিবার সুবিধা হইবে- ইহার চারি স্তর এই চিত্রে দেখান হইয়াছে।

(১) ক্ষুদ্রশিশু (এক বৎসর বয়সের নিম্নে) নিজেকে ভালবাসে।

(২) শিশু (এক বৎসরের উর্দ্ধে) মাতা এবং পিতার প্রতি আসক্ত হয়।

(৩) বালক-বালিকা (৪—৫ বৎসর বয়সে) খেলার সাথীর খোঁজ করে। ৩ হইতে ৪ পর্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে ভালবাসার ক্রমবিকাশ চলিতে থাকে।

(৪) কৈশোরে উপনীত হইয়া যুবক-যুবতী জীবনসাথীর অনুসন্ধান করিতে থাকে।

যে কোন স্তরে বাধা পাইয়া শিশু পশ্চাদ্‌বর্তী হইয়া যাইতে পারে অথবা আর অগ্রসর হইবার আগ্রহ না দেখাইয়া সেই স্তরেই সারাজীবন অতিবাহিত করে—এইরূপে নানাপ্রকার মনোব্যাধির সৃষ্টি হয়।



পান্থশালা

প্রদ্যোৎকুমার মিত্র

এক এক সময় মনটা হ'য়ে ওঠে সম্ভবাতীত ফাঁকা। আকাশের মত বিরাট ফাঁক দিয়ে ব'য়ে চলে চিন্তার যথেচ্ছ ধারা; কোন তা'র বাঁধন নাই। সামঞ্জস্যহীনতার দুর্জয় অভিযান।

ঘরের ছোট্ট ঘটনা থেকে খবরের কাগজ, সেখান থেকে স্পেন, চেম্বারলেন, জাপানী বোমা তারপর আবার হয়ত' নিছক সাহিত্যসভা অথবা জওহরলালের বিবৃতি।

রাত্রি একটা। ঠিক যে বারোটা' ষাট মিনিট, তা' নয়। এমনি সময়ের একটা মোটামুটি পরিমাণ। মালতী পাশে শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। চাঁদের নীলাভ রূপালী আলো টয়লেট্ ক'রে দিচ্ছে তা'র অসমদেহের কতকটা। তার মুখের ঘুমন্ত দীপ্তির সাথে চাঁদের ঐ আদুরে আলোর যেন অদ্ভুত একটা সামঞ্জস্য। তা'র নেতিয়ে পড়া সরু দেহ যেন শেলীর একটা কবিতা।

মালতী আমার স্ত্রী; ব্রীড়াময়ী বধূ। কথাটা কোথায় যেন প'ড়েছি। হাসিতে পাকস্থলী চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, সাঁ সাঁ ক'রে আরও কতকগুলো অদ্ভুত শব্দ বিঁধতে থাকে মনের ভেতর। মেয়েদের কত বিশেষণই ত' দিল কত লোক!

প্রত্যেক মেয়েই কেমন যেন আলাদা; সবার সাথেই সবার প্রভেদ। মালতী, একতলার বৌটী, রামহরিবাবুর মেয়ে কমলা, মিস্ ছায়া সেন, কারও সাথে তুলনা হয় কারো?

ছায়া সেনকে দেখলে কেন যেন ব'লতে ইচ্ছা হয়, 'ভলক্যানিক্ ইরাপ্সন।' কেন জানি না। অদ্ভুত মেয়ে। মেডিক্যাল স্কুলের মাস্টার আর ছাত্রগুলো কেন যে এতদিন লাগে নি' ও'র পেছনে! অমন আগুনের মাঝে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে নিজেদের ছাই ক'রে দিতে সাধ হয় না তাদের?

সখ্যতা যেন আমাদের সাথেই ওর বেশী। শীতের সকালে হয়ত' ছোট্ট ছাতটুকুর সামনে টেবিলের ওপর ধুম্রায়িত পেয়ালা রেখে লিখবার চেষ্টা ক'রছি দু'এক ছত্র, ও আসবে।

—'কি লিখছেন, গল্প?'

—'লিখি নি, লেখ্‌বার চেষ্টা ক'রছি।'

একটু হাসি ও টেনে আনবে ওর ঠোঁটে, চুপ ক'রে থাকবে প্রায় এক মিনিট।

—'আচ্ছা আপনার একটা উপন্যাসের নায়িকা করুন না আমাকে?' পর মুহূর্তেই খলখলিয়ে উঠে কথাটা হালকা ক'রে দিতে চাইবে, কিন্তু চোখ দু'টো ওর ব্যগ্র হ'য়ে থাকে উত্তরের আশায়।

আমিও একটু হাসি।

—'কি, কথা কইছেন না যে?'

—'আপনার জীবনের কিই বা জানি?'

—'কেন? আমাকে জানেন ত?' আমি শ্রীমতী ছায়া সেন, মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রী, আমার ছোট ভায়ের সাথে একই ক্লাসে প'ড়তে হয়—'

এর পর যে গাম্ভীর্য সে টেনে আনে মুখে, তা' যে অভিনয় নয়, ধরা প'ড়ে যায় আমার কাছে।

—'কিন্তু এই নিয়েই কি গল্প হয়?' কথাটা ব'লে ফেলি সকুণ্ঠে।

—'কেন? ওঃ বুঝেছি। বেশত' কল্পনা ক'রে নিন না একটা কিছু আমার বিষয়ে? অদ্ভুতত্বের সীমারেখা ছাড়িয়ে যাক্ না সেটা!'

চুপ ক'রে থাকি। ব'লবার কিই-বা আছে?

—'কি, চুপ্ ক'রে যে? করুন না একটা কল্পনা। যে চোখ দিয়ে ইচ্ছে দেখুন আমায়, যত খুশী পঙ্কিল ক'রে তুলুন আমার চরিত্র......'

হঠাৎ যেন থমকে যাই। নিজের চরিত্রকে কালো ক'রে দিতে কেন চায় ও? সেন্টিমেন্টের ওপর প্রায়ই ও এমনি অনেক কথা বলে ফেলে। সেদিনও—

মার্চের বিকেল সাড়ে পাঁচটা। বেরুবার আয়োজন ক'রছি আমি আর মালতী। ও এলো। শূন্য চেয়ারখানাকে উপেক্ষা ক'রে আমার পাশে নিমজ্জিত হ'য়ে গেল গদির ভেতর। উদার হয়ত নয় মালতী, ভুরু দুটো কুঁচকে ওঠে তার।

লক্ষ্য করে সেটা ছায়া।

—'কোথায় চ'লেছেন এই ভর সন্ধ্যেয়?'

—'সিনেমায়।' প্রায় ঝাঁঝিয়ে ওঠে মালতী।

—'ওঃ। কি রেগেছেন নাকি?'

চুপ্ ক'রে থাকে মালতী। ছায়ার দৈহিক উষ্ণতা থেকে সযত্নে রক্ষা করবার চেষ্টা করি নিজেকে। সবই বোধ হয় বুঝতে পারে ছায়া, সপ্রতিভতায় হালকা ক'রে দিতে চায় মনের গুমোট।

—'আজকালকার মেয়েদের বেহায়াপনায় আশ্চর্য হ'চ্ছেন, না মিসেস্ তরফদার?'

মৌনতার পরীক্ষা দেবে বুঝি মালতী।

একটু হয়ত' ক্ষুণ্ণ হয় ছায়া—'ভাবছেন, মেয়েটার স্বভাব কি আগ্‌লী। না?'

এমনি ধারা অনেক কিছু ও বলে। বাইশ বছরে মেয়ের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ক'রলে কারণও হয়ত' পাওয়া যাবে কিছু; কিন্তু তবু ওকে ভাল লাগে আমার। সজীবতা যেন মূর্ত হ'য়ে নেমেছে ওর মাঝে। হিংসায় ফুলে উঠ্‌বে হয়ত মালতী, তবু ওকে ভাল লাগে আমার। কারও সাথে তুলনা হয় ওর?

ওই ত' একতলার ঘরের বউটি। প্রতিনিয়ত জগতের সামনে সহনশীলতার পরীক্ষা দিয়ে চ'লেছে। মদ্যপ স্বামী। শুধু মদ্যপ ব'লেই ঘৃণা করি না তাকে, অমানুষ ব'লেও। তবু দম্ভের অন্ত নাই ওর তাকে নিয়ে। পাশবিক প্রহারের অসহ্য যন্ত্রণায় যখন ক'কিয়ে ওঠে, সহানুভূতি নিয়ে এগিয়ে যাও ওর কাছে, মুখের ওপর দড়াম ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দেবে। মেয়েরা যখন মুখর হ'য়ে ওঠে ওর স্বামীর অমানুষিকতা আর ওর সহনশীলতা নিয়ে, নীরব উপেক্ষায় স্তব্ধ ক'রে দেবে সবাইকে।

রামহরিবাবুর মেয়ে কমলা ভাব ক'রতে যায় ওর সাথে;

ওই তার স্বভাব। নতুন চোখ দিয়ে জগতের সব কিছু যাচাই ক'রে দেখতে চায় সে। অদম্য মেয়েলী কৌতূহল ঝলসে তুলেছে ওকে।

—'তোমার নাম কি ভাই?'

বউটি ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থাকে কমলার দিকে।

—'অবাক হয়ে গেলে যে? নাম জান না?'

—'আমার নাম অরুণা। তোমার?'

—'কমলা। তোমার স্বামী কি করেন?'

—'জানি না।'

—'জান না সে কি? স্বামী কি করেন তা'ও জান না? বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে কমলার।—'দেশে কে আছেন, শ্বশুর শাশুড়ী?'

—'কেউ না।'

—'কেউ না! মা-বাপ, ভাই-বোন?'

—'না ভাই, এক ঐ উনি ছাড়া জগতে কেউ আর নাই আমার।'

অতি সাদাসিধে জবাব দেয় অরুণা। সহানুভূতিতে টনটনিয়ে ওঠে কমলার নরম বুক।

এমনিধারা প্রায়ই আলাপ হয় ওদের ভেতর। কমলার এক তরফা প্রশ্ন, আর ওর শুধু জবাব। সেধে আলাপ করে না অরুণা কারও সাথেই; ওর অকৌতূহলী মনে সমাধি পেয়েছে ওর আপন সত্তা।

রাত ক'টা বাজে কে জানে? চাঁদের আলো লম্বা হয়ে গেছে অনেকটা; মালতীর বুক থেকে নেমে এগিয়ে গেছে কোমর পর্যন্ত। বসন্তের শিশিরে নাওয়া আলো, যেন বুলিয়ে দিচ্ছে সারা দেহে। মালতীকে ভারী ভাল লাগছে আজ; সাড়ে তিন বছর পরে আবার যেন নতুন করে দেখছি ওকে।

টুং টুং করে বিলাতী ঘড়িটায় দুটো বাজে। অরুণা হয়ত স্বামীর অপেক্ষায় জানলার ওপর বসে আছে এখনও, বসে বসে ঝিমুচ্ছে বোধ হয়। কমলা এখন স্বপ্ন দেখছে রাজপুত্রের। দোতলার ফ্ল্যাটে ছায়ার ঘরের সবুজ আলো জ্বলছে, মিটারের কাঁটা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে ইউনিটের পূর্ণতার দিকে। শুধু ওরা ভাই আর বোন থাকে কেন এ বাড়ি? হোস্টেলে সিট নেই? কিংবা মাথার ওপর কোন আত্মীয়?

একটা চাপা বুকফাটা আর্তনাদ ফেটে পড়ে একতলা থেকে, সাথে সাথে মদিরাসক্ত কণ্ঠের চীৎকার। বর্বরটা চালিয়েছে তার অমানুষিক নিষ্ঠুর অত্যাচার; আজ যেন তার সীমারেখা ছাড়িয়ে গেছে বহু যোজন। অরুণার চীৎকার যেন বুকের অন্তস্থল মন্থন করে ফিনকি দিয়ে পড়ছে বাড়িময়। জ্যেঠামশাই—এ বাড়ির বাড়িওয়ালা খড়ম পায়ে বেরিয়ে আসেন ঘরের থেকে। ধড়মড়িয়ে জেগে ওঠে মালতী।

—'ওঃ ব্রুট!' ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে আসে মালতীর।

—'তুমি ঘুমোও নি' এখনও?' বিস্ময়ের আলোড়ন তার সুরে।—'রাত কটা?'

—'দুটো।'

—'দু'- টো! ঘুমিয়ে পড়?' মালতী আবেগে তার শুভ্র কোমল হাতখানা লতিয়ে দেয় আমার বুকের ওপর। ব্রুটটার পাশে আমাকে কল্পনা করে তার সব সোহাগ উছলে ওঠে বুঝি!

ধীরে ধীরে সারা বাড়ি আবার অপরিমেয় নিস্তব্ধতায় তলিয়ে যায়। মদিরার অত্যুগ্রতায় বুঝি অবশ হয়ে আসে মাতালটা।

এরই মাঝে নিয়মিত দিন কেটে যায়। পৃথিবীর আহ্নিক গতির সাথে সাথে ক্ষীণ হয়ে আসে কালের পরমায়ু, নিঃশেষ হয়ে আসে বছরের দিনগুলো। প্রতি মুহূর্তে পরম বাস্তব বর্তমান তলিয়ে যাচ্ছে নিরন্ধ্র কালো অতীতের গহ্বরে। ছায়া সেনের শ্লীল সপ্রতিভতা, পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাটের বিলেতফেরৎ ডাক্তারের অদ্ভুতত্ব আর অরুণার উপেক্ষিত জীবনের দীর্ঘশ্বাসে শিক্ত হয়ে সময় এগিয়ে চলে কালের গুন টেনে।

রয়টারের মত কমলা সারা বাড়ির খবর নিয়ে ঘোরে। অরুণার স্বামী নাকি কোন এক মোটর কোম্পানীর মিস্ত্রী, পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাটের বিলেতফেরৎ ডাক্তারের নাম মৃগাঙ্ক গাঙ্গুলী, দেশে নাকি তাঁর স্ত্রী-পুত্র আছে; এমনি আরও অনেক কিছু।

কৌতূহলের অদম্যতায় উছলে উঠি না কোনও দিন; পারিপার্শ্বিকতায় সম্পূর্ণ নিরাসক্ত আমি। তবু অরুণার জীবনের স্তূপীকৃত ব্যর্থতা চঞ্চল করে তোলে আমার চিত্তকে, রাগে শক্ত হয়ে উঠি মাতালটার ওপর।

ওকে দেখিনি কোনও দিন। অদ্ভুতত্বের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে নিজেকে। কেমন দেখতে ওকে, অন্তর ওর কিসে গড়া? গৃহে প্রত্যাগমন ওর প্রাত্যহিক নয়, যেদিন আসে, পশুর নির্মমতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ প্রায়-বালিকার ওপর, জগতের কাছে ওকে করে দেয় করুণেয়, উপেক্ষিত। পাষণ্ড শুধু অত্যাচার করে আর ওর জীবনকে ব্যর্থতায় ভরিয়ে দিয়েই তৃপ্ত নয়, বাইরের পৃথিবীও ওর নির্লজ্জতার নিগড়ে দিয়েছে বন্ধ করে।

কিন্তু এই হয়ত ভাল। অপটিমিষ্ট আমি নই—তবু মনে হয়, এই ভাল। জগতের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে অরুণা যেন হয়ে উঠেছে মহিমময়ী। তার জীবনের নিঃসঙ্গতার দম্ভ, অবহেলার গৌরব আমার মনে জাগিয়ে তোলে মহান সম্ভ্রম। আমার নিরাসক্ত উদাসীন মন ভরিয়ে তুলেছে ওর চিন্তায়, এইখানেই যেন তার সার্থকতা।

জ্যেঠামশাই কেন যেন বিষিয়ে উঠেছেন অরুণার ওপর। কেন জানি না। ও হয়ত নিজের মর্যাদায় ম্লান করে দিয়েছে তাঁর সম্মানকে কিংবা ক্ষুণ্ণ করেছে তাঁর গার্জিয়ানতাকে। হয়ত সে ভুলে গিয়েছে, উনি এ বাড়ির সর্বময় কর্তা।

কদিন পরে হঠাৎ জ্যেঠামশাইর উষ্ণতা সীমা ডিঙিয়ে যায়। বিকট গোলমাল অর্থাৎ তাঁর একতরফা চীৎকারে বেরিয়ে আসি ঘর থেকে।

'তার এই উচ্ছৃঙ্খলতাকে তুমি প্রশ্রয় দিচ্ছ বৌমা! চোরের মত লুকিয়ে বাড়িতে ঢোকে আবার চোরের মতই বেরিয়ে যায়; যতক্ষণ থাকে, তাও মানুষ হয়ে থাকে না।'

প্রচণ্ড বক্তৃতার পর জ্যেঠামশাই দু সেকেণ্ড কি যেন শোনেন কান পেতে, তারপর আবার জ্বলে ওঠেন দ্বিগুণ তেজে।

—'আমার মুখের ওপর উত্তর করো না বৌমা! তোমায় আমি করুণা করি—'

করুণা! দর্পিতা অরুণার সকল সম্মান বুঝি সজাগ হয়ে ওঠে। কি একটা অস্ফুট উত্তর দেয়, ওপর থেকে বোঝা যায় না ভাল।

জ্যেঠামশাই ফেটে পড়েন একেবারে; কথার খেই হারিয়ে শুধু বিষ উজাড় করে দেন।—'জান, তোমাদের আমি চূড়ান্ত অপমান করতে পারি, তিন মাসের ভাড়া বাকী আমার? যে মেয়ে তার নিজের স্বামীকে বশে রাখতে পারে না—'

—'অন্নদাবাবু!'

জ্যেঠামশাই যেন হোঁচট খান। এগিয়ে আসে ডাক্তার মৃগাঙ্ক গাঙ্গুলী।

—'কত টাকা ভাড়া বাকী আপনার?'

—'কেন, আপনি দেবেন নাকি?'—শ্লেষ জড়ান জ্যেঠামশাইর সুরে।

'হ্যাঁ, আপাতত।' —কঠিন গলায় উত্তর দেয় মৃগাঙ্ক।

প্রবীণ ব্যবসায়ী জ্যেঠামশাই; তাঁর বুঝবার শক্তি আছে, এ অরুণা নয়। আশ্চর্য রকম পরিবর্তন হয় তাঁর সুরের।—'কিন্তু আপনার ত—'

—'কোন কথার দরকার নাই অন্নদাবাবু। আপনার ভদ্রতার মুখোস আজ খুলে গেছে; এখন আমার সঙ্গে এসে আপনার ভাড়ার টাকা বুঝে নিয়ে যান।'

মৃগাঙ্ক উঠে যায়; সাথে সাথে জ্যেঠামশাইও।

সারা বাড়িময় অপূর্ব চাঞ্চল্য। অরুণা যেন গুঁড়িয়ে গেছে মাটীর সাথে। 'ডাক্তারের এ অহেতুক মস্তক যন্ত্রণা কেন? সামান্য ব্যাপারে এত আগ্রহ! মেয়েটার দম্ভ কি আর সাধে?' এমনি অনেক গুঞ্জন শোনা গেল বাড়িময়। কমলার ডেঁপোমী ছাড়িয়ে যায় সহ্যের সীমা। কবে সে দেখেছে অরুণাকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে ডাক্তারের ঘরের দিকে; অনেক রাত্রে মাতালটা যখন বাড়ি ফেরে, ডাক্তার নাকি আগুন চোখে দাঁড়িয়ে থাকে বারান্দার ওপর,—এমনি অনেক কথা শুনা যায় তার কাছ থেকে।

অদ্ভুত ওই অরুণার স্বামী। পরের দিন সে এলো ওপরে, জ্যেঠামশাইর কাছে। জীবনে বোধ হয় এই প্রথমবারের জন্য দেখলাম তাকে। উঃ কি করে অরুণা সহ্য করে ওকে? ওর সম্পর্কে তার সম্মানই-বা কিসের? বেঁটে, কালো, সারা মুখে অত্যাচারের কলঙ্ক লিপ্ত হয়ে আছে। কুৎসীত রোগে বিশীর্ণ হয়ে গেছে তার শরীর, অমার্জিত মুখ আর অবিন্যস্ত চুলে নারকীয় দুর্গন্ধ।

লোকটা ওপরে আসে। জ্যেঠামশাইর পায়ের কোলে নির্লজ্জের মত প্রণাম করে। —'আপনি আমার পিতৃকল্প অন্নদাবাবু, আপনাকে প্রণাম করতে এলাম।'

জ্যেঠামশাই স্তম্ভিত হয়ে যান।

মাতালটা কেঁদে ফেলে বুঝি। বিনিয়ে বিনিয়ে সে যা বলে, কোন নরাধম তা মুখ দিয়ে প্রকাশ করতে পারে কিনা জানি না। 'অরুণার চরিত্রের ওপর ওর সন্দেহ বহুদিন থেকেই সেই দুঃখে রাত্রে বাড়ি ফেরে না; শুধু বুকের জ্বালা ঢাকবার জন্যে শেষ কপর্দক পর্যন্ত নিঃশেষ করে দেয় মদের পেছনে।'

ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রোহ করে ওঠে সারা অন্তর, তিক্ত হয়ে উঠে বিশ্বের প্রতি। হে দুর্বোধ্য বিধাতা, যদি তোমারই শক্তিতে বিশ্বের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে এই নারকীয় জীবের কাছে তোমার সে শক্তি ব্যর্থ হয় কেন?.........

নিরাসক্ত মনে ক্রমে সমাধি পায় সকল চাঞ্চল্য, সূর্যের একঘেয়ে উদয়াস্তের সাথে আবার সহজ হয়ে আসে সব কিছু।

অরুণার স্বামী শয্যাগত নিউমোনিয়ায় না টাইফয়েডে যেন। ওদের ঘরে মৃগাঙ্ক ডাক্তারের যাতায়াত হয়ে এসেছে নিয়মিত। অরুণার স্বামী মৃগাঙ্কর বিনা পয়সায় দেওয়া ওষুধ খেতে আপত্তি করে না মোটেও; সময় সময় তার কাছে টাকা ধার চাইতেও ওর লজ্জা করে না কিছু।

—'আমার জন্যে নয় ডাক্তারবাবু, ওই ছেলেমানুষের মুখের দিকে চেয়েই আপনার দয়া চাইছি।'

অরুণাকে দেখিয়ে ডাক্তারের দুর্বলতার সুযোগ নিতে চায় পশুটা। ডাক্তার শুধু একবার তাকায় অরুণার মুখের দিকে, প্রত্যাশা কিছু থাকে কিনা বুঝা যায় না ভাল। তারপর ব্যাগ খুলে হয়ত একখানা নোট হাতে দেয় বর্বরটার।

অরুণা যেন মরে যায়—মিশে যায় মাটীর সাথে।

সহনশীলতার এভারেস্টও ধ্বসে পড়ে একদিন, অরুণার মনের সকল বাঁধন যায় ছিঁড়ে। আঘাতে আঘাতে যখন তার গর্বিত হৃদয় হয়ে যায় চুরমার, সে পাগল হয়ে ওঠে, ছুটে যায় মৃগাঙ্কের ঘরে।

সন্ধ্যের খানিক আগে মৃগাঙ্ক কেন যেন ঘরের থেকে বেরোয় নি। প্রায় অন্ধকার ঘরে নিঃশেষ করে যাচ্ছে অজস্র সিগারেট। দমকা হাওয়ার মত অরুণা ঢুকল তাঁর ঘরে, ডাঃ চমকে উঠল হঠাৎ ধরাপড়া খুনীর মত।

—'আপনি এখানে—'

—'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, আপনি আমায় বাঁচান; আমার মান সম্মান সব কিছু।'

ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলে অরুণা। হাতের দুটো চুড়ী খুলে ডাক্তারের টেবিলের ওপর রেখে দেয়।

—'আপনার যা কিছু খরচ, হয়ত এর থেকেই উঠবে। আপনি আর যাবেন না আমাদের ঘরে, আর দয়া করবেন না আমায়—' ঘরের থেকে বেরিয়ে আসতে চায় সে।

ডাক্তারের যেন ঘুম ভাঙ্গে।

—'অরুণা!' বলিষ্ঠ কণ্ঠের আহ্বান। অরুণা থমকে দাঁড়ায়।

ডাক্তার খানিক সময় চুপ ক'রে থেকে বলেন,—'আমায় তুমি অপমান করতে এসেছ অরুণা?'

ব্যগ্রতা চুইয়ে পড়ে ডাক্তারের সুর বেয়ে। সে সুরের কাছে দর্পিতা অরুণাও বুঝি হার মেনে যায়। নিজের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে হারিয়ে ফেলে সব কিছু।

—'আমি জানি অরুণা তুমি কি ব'লবে। কিন্তু—' ডাক্তার একটুখানি থামেন; পিছন ফিরে চুড়ী দু'টো তুলে নেন হাতের ভেতর। তারপর খপ্ ক'রে একখানা হাত ধ'রে ফেলেন অরুণার।

হিম হ'য়ে আসে অরুণা। ডাক্তার যেন হিপ্‌নোটাইজড্ ক'রেছেন তাঁকে।

—'তুমি অমত করো না অরুণা। এ দু'টো তুমি ফিরিয়ে নাও।'

ধীরে ধীরে অরুণা হাত দু'টো বাড়ায়, সম্মোহিতের মত চুড়ি দু'টো ধরে, তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

ক'লকাতার ভাড়াটে বাড়ি; দিগদিগন্তের পথিক এসে এখানে নীড় বাঁধে দু'দিনের জন্যে আবার মিলিয়ে যায় কোথায় কে জানে! এরই মাঝে জমাট বেঁধে ওঠে কত বৈচিত্র্য, প্রতিদিন জন্ম নেয় উপন্যাসের অজস্র প্লট। এই চুণ-বালির খাঁচার ভেতরই ধরা দেয় নায়ক-নায়িকা, অরুণা, ডাক্তার, ছায়া সেন আর কমলা।

হঠাৎ একদিন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে সারা বাড়ি, যেন ভূমিকম্প হ'য়েছে মানুষগুলোর মাঝে। ছায়া আর তার ভাই নাকি ভাই-বোন নয়। ও সেন আর সে বোস্, সম্বন্ধ নেই কোন।

আকাশ যেন চুরমার হ'য়ে পড়ে মাথার ওপর, পায়ের তলা থেকে পৃথিবী পিছলে যায়। যা'র প্রাণশক্তির পূজো ক'রেছিলাম মনের সকল রস নিঃশেষ ক'রে, সঙ্গোপনে সকল অনুরাগ উজাড় ক'রে দিয়েছিলাম যা'র পায়ের ওপর, সে যেন উদ্ধত ফণা তুলে দংশন ক'রল আমাকে।

মালতী কয়েকবার চেয়েছিল আমাকে নাড়া দিতে, শ্লেষ ক'রতেও ছাড়েনি' দু'একবার। আমি নিস্তব্ধ, নিঃসাড়।

মালতী বুঝি ভয় পেয়ে যায়। সরু হাত দু'খানা লতিয়ে দেয় কাঁধের ওপর।

—'শুনছ?'

—'বল।'

—'বায়োস্কোপে যাবে? চল না এখুনি, এই ট্রিপেই।'

ওর আগ্রহের আধিক্য যেতে বাধ্য করে আমায়।

রাত সাতটা। ছবি সুরু হ'য়ে গেছে সব হাউসেই। আমি আর মালতী কার্জন পার্ক আর ইডেন গার্ডেনে কাটিয়ে দি' পুরো দু' ঘণ্টা। উদাস মন শান্ত হ'য়ে আসে গঙ্গার হাওয়ায় আর গ্যাসের নীলাভ আলোয়।

সাড়ে ন'টার অন্ধকারে গায়ে মায়া বুনে যায় প্রজেক্টার; বারোটায় হয় তার সমাপ্তি।

আমি আর মালতী চ'লেছি পাশাপাশি, বাড়ির পাশের সরু গলি বেয়ে; নিস্তব্ধ দু'জনেই। দু'ধারে উদ্ধত দেওয়াল মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আকাশের দিকে। তারই একটার গায়ে নীল আলো ছিট্‌কে প'ড়েছে ছায়া সেনের ঘরের। মালতী হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে যায়, অজ্ঞাতে আমার হাতটা আকর্ষণ করে যেন।

—'কি!'

তর্জনী দিয়ে সে দেখিয়ে দেয় যেখানে দেওয়ালের ওপর আলো প'ড়েছে ছায়ার ঘরের। সেখানেও বায়োস্কোপ বুঝি!

দু'টো ছায়া ধীরে ধীরে এক হ'য়ে যায় দু'সেকেণ্ডের জন্য তারপর স্পষ্ট হ'য়ে আসে ছায়ার এলো খোঁপা আর তার ভায়ের চশমা।

বিশ্বের সকল উত্তাপ হঠাৎ জমা হ'য়ে ওঠে মনের মাঝে। মালতীর হাত ধ'রে উঠে যাই ছায়ার ঘরের সামনে; উন্মাদের মত ঝাঁপিয়ে পড়ি দুয়ারের ওপর।

দরজা খোলে ছায়া সেন।—'একি; আপনারা এত রাত্তিরে!' বিস্ময় জড়ান তা'র সুরে।

—'হ্যাঁ আমরা, দরকার আছে।'

—'কিন্তু এত রাত্তিরে?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ এত রাত্তিরে।'—যেন মরিয়া হ'য়ে উঠি আমি —'আপনারা উঠে যাবেন; অন্তত তিন দিনের ভেতর, এই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ।'

'ও!' —খলখলিয়ে ওঠে ছায়া। অদ্ভুত ঔদ্ধত্য ওর!

কেমন যেন হক্‌চকিয়ে যাই আমি।

—'আমরা কালই উঠে যাচ্ছি; বৃথাই কষ্ট দিলুম আপনাকে! ধন্যবাদ।'

মুখের ওপর দড়াম ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দেয় ছায়া।

আকাশের তলে এই পৃথিবীতে এত গ্লানি আর ওপরে, পরের দিনও সূর্য ওঠে নতুন দীপ্তিতে তেমনিভাবে কিরণ ছিটিয়ে দেয় বিশ্বময়।

সকাল বেলা খবরের কাগজে দেশ বিদেশের সংবাদের মধ্যে মনকে ছেড়ে দিই, সামনে চায়ের পেয়ালা বাষ্প তুলছে আকাশের গায়ে। ছায়া সেন এলো আমার ঘরে, হালকা পায়ে চটির শব্দ তুলে। ধৃষ্টতায় ওর অবাক্ হয়ে যাই আমি।

—'আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি আমি মিঃ তরফদার। রাত্রে দুর্বল মুহূর্তে যে অসভ্য ব্যবহার ক'রেছি তা'র জন্যে সত্যিই লজ্জিত আমি।'

(শেষাংশ ২৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

টাইফাস

(বিদেশী গল্প)

গোপাল ভৌমিক

পিটার্সবার্গ থেকে মস্কো যাবার ডাকগাড়ীতে ধূমপানের কামরায় ক্রিমভ্ নামে একটি তরুণ লেফ্‌টেন্যান্ট ভ্রমণ কর্‌ছিল। তার বিপরীত দিকে ব'সেছিলেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোক; তাঁর গোঁফদাড়ি পরিষ্কার ক'রে কামানো, পোতাধ্যক্ষের মত তাঁর মুখ; তাঁকে দেখে একজন ধনী ফিন্‌ল্যান্ডবাসী কিংবা সুইডেনবাসী ব'লে মনে হ'চ্ছিল। তিনি সারা পথ পাইপ্ টানছিলেন আর ঘুরে' ফিরে' একটিমাত্র প্রসংগ নিয়ে আলাপ কর্‌ছিলেন।

"হাঃ! আপনি সামরিক কর্মচারী! আমার ভাইও সামরিক কর্মচারী, তবে সে নৌবিভাগে আছে। সে নৌবিভাগীয় সামরিক কর্মচারী এবং তার আস্তানা হ'চ্ছে ক্রেমস্টাডে। আপনি মস্কো যাচ্ছেন কেন?"

"সেখানে আমাদের সৈন্য-নিবেশ।"

"হাঃ! আপনি বিবাহিত?"

"না। আমি কাকীমা এবং আমার বোনের সঙ্গে বাস করি।"

"আমার ভাইও সামরিক কর্মচারী—তবে সে বিবাহিত। তার স্ত্রী এবং তিনটি ছেলেমেয়ে আছে। হাঃ!"

ফিনিশ্ ভদ্রলোকটি কি দেখে যেন বিস্মিত হচ্ছিলেন—নির্বোধের মত টানা হাসি হেসে বল্‌ছিলেন, "হাঃ!" এবং মাঝে মাঝেই পাইপের গোঁড়ায় ফুঁ দিচ্ছিলেন। অসুস্থ বোধ হওয়ায় ক্রিমভের উত্তর দেবার ইচ্ছা হচ্ছিল না—সেইজন্য সে তাঁকে সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা কর্‌ছিল। তাঁর শব্দমুখর পাইপ্‌টা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আসনের নীচে ফেলে দিলে এবং তাঁকে অন্য গাড়ীতে পাঠিয়ে দিলে যে ভাল হয় সে তাই ভাব্‌ছিল।

"ফিনিশ্‌রা আর গ্রীক্‌রা ভয়ানক লোক", সে ভাব্‌ছিল। "অনাবশ্যক, অকেজো বিরক্তিকর লোক এরা। তারা শুধু পৃথিবীর ভার বৃদ্ধিই করে। এদের প্রয়োজনীয়তা কি?"

ফিনিশ্ আর গ্রীকদের কথা ভেবে তার গা' বমি বমি কর্‌তে লাগ্‌ল। সে ফরাসী এবং ইতালীয়দের সঙ্গে এদের তুলনা কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ল কিন্তু ওদের চিন্তায় কেন যেন তার অর্গ্যানবাদক, নগ্ন নারীমূর্তি এবং তার কাকীমার ঘরের ড্রয়ারে টানানো বিদেশী তৈলচিত্রের কথা মনে প'ড়ে গেল।

তরুণ সামরিক কর্মচারীটির শরীর ভাল ছিল না। সমস্ত আসনটি সে একা দখল করে থাকা সত্ত্বেও তার মনে হচ্ছিল যে, হাত পা ছড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট জায়গা ছিল না; তার মুখে শুকনো চট্‌চটে ভাব—মাথাটা বোধ হচ্ছিল ভারী; তার চিন্তাগুলি ইতস্তত বিশৃঙ্খলভাবে ঘুরে' বেড়াচ্ছিল; চিন্তাগুলি শুধু যে মাথার মধ্যেই ঘুরে' বেড়াচ্ছিল তা' নয়—মাথার বাইরে আসনের মধ্যে এবং অন্ধকারে দণ্ডায়মান লোকদের মধ্যেও তারা ঘুরে' বেড়াচ্ছিল। মস্তিষ্কের এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে সে স্বপ্নের মত মানুষের গলার শব্দ, চাকার ঘর্ঘর শব্দ এবং দরজা বন্ধ ও খোলার শব্দ শুন্‌ছিল। খুব ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি হুইসিলের শব্দ আর প্ল্যাট্‌ফর্মে বিচরণশীল লোকের পদশব্দ ভেসে আস্‌ছিল। অজ্ঞাতসারে অতি তাড়াতাড়ি সময় কাট্‌ছিল—মনে হ'চ্ছিল যে, ট্রেনটা বুঝি প্রতি মিনিটেই এক একটি স্টেশনে থাম্‌ছিল কারণ মাঝে মাঝেই ট্রেনের কামরা থেকে শোনা যাচ্ছিল ধাতব গলার শব্দঃ

"ডাক প্রস্তুত?"

"হ্যাঁ, প্রস্তুত!"

তার মনে হচ্ছিল যে, চুল্লীর অগ্নিরক্ষক ঘন ঘন এসে থার্মোমিটার দেখ্‌ছিল, চলার সময় ট্রেনগুলি বুঝি কখনও থামে না, আর তাদের গাড়ীটা যেন সর্বদা সেতুর উপর দিয়েই ছুট্‌ছিল। গণ্ডগোল, হুইসিলের শব্দ, ফিনিশ ভদ্রলোকটি, তামাকের গন্ধ প্রভৃতি অপসয়মাণ আব্‌ছায়া মূর্তিগুলোর সঙ্গে মিশে' ক্রিমভের বুকে অসহ্য দুঃস্বপ্নের মত চেপেছিল। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় সে তার ভারী মাথাটা তুলে ছায়াঘেরা অস্পষ্ট বাতিটার দিকে তাকাল; তার জলখাবার ইচ্ছা হ'য়েছিল কিন্তু তার শুক্‌নো জিভ্ নড়্‌ছিল না এবং ফিনিশ্ ভদ্রলোকের প্রশ্নের জবাব দেবার মত সামর্থ্যও তার ছিল না। সে ভাল ক'রে শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা কর্‌ল—তাতেও সে কৃতকার্য হ'ল না; কয়েকবার ফিনিশ্ ভদ্রলোকটি ঘুমিয়ে পড়্‌লেন, আবার জেগে উঠে পাইপ্ ধরিয়ে "হঃ! হাঃ!" ক'রে তার সঙ্গে কথা বল্‌লেন—আবার ঘুমিয়ে পড়্‌লেন; লেফ্‌টেন্যান্ট তখনও তার আসনে পা' রাখ্‌বার জায়গা পাচ্ছিল না এবং সমস্তক্ষণ তার চোখের সামনে আশঙ্কাজনক ছায়ামূর্তিগুলো নড়াচড়া কর্‌ছিল।

স্পিরভ্ স্টেশনে সে জল খেতে নাম্‌ল। সে কয়েকজন লোককে একটা টেবিলে বসে দ্রুত খেতে দেখল।

"ওরা কি ক'রে খেতে পারে?" মাংসের রোস্টের গন্ধ এড়াবার চেষ্টা ক'রে এবং তাদের চর্বণশীল মুখের দিকে তাকিয়ে সে ভাব্‌ল কারণ এই দুটোই তার কাছে ভয়ঙ্কর বিরক্তিকর বোধ হ'চ্ছিল—সে অসুস্থ বোধ কর্‌ছিল।

একটি সুন্দরী মহিলা লাল টুপীপরা একজন সামরিক কর্মচারীর সঙ্গে কথা বল্‌ছিলেন—যখন তিনি হাসছিলেন তখন তাঁর ঝক্‌ঝকে শাদা সুন্দর দাঁত দেখা যাচ্ছিল; তাঁর হাসি, তাঁর দাঁত এমনকি ভদ্রমহিলা নিজেও ক্রিমভের মনে বিরক্তির উদ্রেক কর্‌লেন—হ্যাম্ এবং ভাজা কাট্‌লেট্ দেখে তার যেমন হ'য়েছিল। কি ক'রে লাল টুপীপরা সামরিক কর্মচারীটি ভদ্রমহিলার পাশে ব'সে তাঁর স্বাস্থ্যদীপ্ত সহাস্য মুখের দিকে তাকাচ্ছিল তা' সে ভেবে পেল না।

কিছু জল খেয়ে সে নিজের কামরায় ফিরে গেল। ফিনিশ্ ভদ্রলোক ব'সে ব'সে ধূমপান কর্‌ছিলেন। তাঁর পাইপ্ থেকে একটা ঘর্ঘর প্যাঁচ্ প্যাঁচ্ শব্দ হচ্ছিল যেমন বর্ষার দিনে সচ্ছিদ্র জুতোর মধ্যে জল ঢুক্‌লে শব্দ হয়।

"হাঃ!" তিনি সবিস্ময়ে বললেন, "এটা কোন স্টেশন?"

"আমি জানি না" ক্রিমভ্ বল্‌লে। সে শুয়ে' প'ড়ে

তামাকের গন্ধ যাতে মুখে না ঢোকে তার জন্য মুখ বন্ধ ক'রে রইল।

"আমরা ভার্ স্টেশনে কখন পৌঁছুবো?"

"আমি জানি না। আমি দুঃখিত, আমি......আমি কথা বল্‌তে পার্‌ছি না। আমি অসুস্থ বোধ কর্‌ছি......আমার ঠান্ডা লেগেছে।"

ফিনিশ্ ভদ্রলোক ঠক্ ক'রে জানালার গায়ে পাইপ্‌টা ঠুক্‌লেন—আবার তার নৌবিভাগীয় ভাইয়ের কথা বলা শুরু কর্‌লেন।

ক্লিমভ্ আর তাঁর কথায় কান দিল না, গভীর যন্ত্রণায় সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল তার আরামদায়ক নরম বিছানার কথা, ঠান্ডা জলের বোতলের কথা আর তার বোন কেটির কথা। কি ক'রে তাকে আদর কর্‌তে এবং উৎসাহিত কর্‌তে হয় কেটি তা' জানে। তার সৈনিক ভৃত্য প্যাভেল্ তার পায়ের ভারী আঁট-সাঁট বুট্ খুলে নেবে এবং তার টেবিলে জল দিয়ে যাবে—একথা মনে পড়ায় তার হাসিও পেল। তার মনে হ'ল যে, বিছানায় শুয়ে' কিছুটা জল খেলেই তার বুক থেকে দুঃস্বপ্নের বোঝা নেমে যাবে এবং সে পরিপূর্ণ সুস্থ নিদ্রাসুখ উপভোগ কর্‌তে পার্‌বে। "ডাক প্রস্তুত?" দূরে থেকে একটা বিরস গলার স্বর ভেসে এল।

"হ্যাঁ, প্রস্তুত।" দরজার কাছেই একটা লোক গম্ভীর উচ্চৈঃস্বরে বললে।

ট্রেন তখন স্পিরভ্ থেকে দুই তিন স্টেশন এগিয়েছিল। সময় দ্রুত চ'লেছিল—অনেকটা ঘোড়ার মত সলম্ফে চ'লেছিল, ঘণ্টা, হুইসিল্ আর থামার যেন শেষ ছিল না। হতাশ হ'য়ে ক্লিমভ্ কুশনের কোণায় মুখ গুঁজে' দু'হাতে মাথাটা চেপে ধ'রে আবার তার বোন কেটি এবং আর্দালি প্যাভেলের কথা ভাবা শুরু কর্‌ল। কিন্তু তার বোন এবং আর্দালি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিগুলোর সঙ্গে মিশে' ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। কুশন থেকে প্রতিহত তার নিঃশ্বাসে তার মুখ পুড়ে' যেতে লাগ্‌ল এবং জানালা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল তার পিঠে পড়্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সে স্থান পরিবর্তন কর্‌ল না। একটা ভারী জ্ঞান-ধ্বংসী নিশ্চলতা তাকে পেয়ে ব'সেছিল—তার অংগ প্রত্যংগ শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রেছিল।

অবশেষে যখন সে মাথা তুল্‌ল তখন দেখ্‌ল যে, গাড়ী আলোময়। আরোহিরা ওভারকোট পর্‌ছিল এবং এদিক্ ওদিকে নড়াচড়া কর্‌ছিল। গাড়ী থাম্‌ল। শাদা বহিরাবরণ পরা এবং ক্রমিক নম্বর লাগানো কুলিরা হস্তদস্ত ক'রে আরোহীদের মাল নামাতে লাগ্‌ল। ক্লিমভ্ কলের মত কোটটা প'রে গাড়ী থেকে নাব্‌ল—তার মনে হ'ল যে, সে নিজে হাঁটছিল না—হাঁটছিল আরেকজন কেউ অপরিচিত লোক। ক্লিমভের মনে হ'তে লাগ্‌ল যে, সারা রাত্রি ধ'রে যে-সব ছায়ামূর্তি তাকে ঘুমাতে দেয় নি' তারা এবং ট্রেনের উষ্ণতা ও তৃষ্ণাও যেন তার সঙ্গে সঙ্গেই চ'লেছিল। কলের মতই সে তার মালপত্র নামিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে বস্‌ল। গাড়োয়ান তাকে পোভারস্কো স্ট্রীটে নিয়ে যাবার জন্য এক রুবল্ পঁচিশ কোপেক্ চেয়ে বস্‌ল কিন্তু সে দরদস্তুর না ক'রে সুবোধ বালকের মত গাড়ীতে উঠে বস্‌ল। সংখ্যার তারতম্য বুঝবার শক্তি তার তখনও ছিল কিন্তু তার কাছে তখন অর্থের কোন মূল্যই ছিল না।

বাড়িতে গিয়ে তার কাকীমা এবং অষ্টাদশবর্ষ বয়স্কা তরুণী বোন কেটির সঙ্গে দেখা হ'ল। কেটি যখন তাকে অভ্যর্থনা কর্‌ল তখন তার হাতে ছিল খাতা আর পেন্সিল্—ক্লিমভের মনে পড়্‌ল যে, কেটি শিক্ষয়িত্রীর পরীক্ষার জন্য তৈরী হ'চ্ছিল। কেটির অভ্যর্থনা এবং প্রশ্নে সে কান দিল না—গরমে তার দম বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছিল; উদ্দেশ্যহীনভাবে এঘরে ওঘরে বেড়াতে বেড়াতে সে নিজের ঘরে এসে ঢুক্‌ল এবং উম্মুখ হয়ে বিছানার উপর পড়ে গেল। ট্রেনের সব ব্যাপার তার মনে ভীড় ক'রে এল—ফিনিশ্ ভদ্রলোকটি, লাল টুপী, শাদা দাঁতের অধিকারিণী ভদ্রমহিলাটি, মাংসের রোস্টের গন্ধ, ছায়া-ঘেরা বাতি—সব! সে সংজ্ঞা হারাল—তার কাছেই ভীত গলার সশব্দ চীৎকার সে শুন্‌তে পেল না।

যখন তার সংজ্ঞা ফিরে এল, সে দেখ্‌ল যে, সে বিছানায় শুয়ে আছে—জলের বোতলটা এবং প্যাভেলকেও দেখ্‌ল কিন্তু এতে তার কিছুমাত্র স্বস্তি বা আরাম বোধ হ'ল না। আগের মতই পায়ে এবং হাতে কেমন একটা কঠিন ভাব, জিভ্‌টা তালুতে লেগে ছিল আর ফিনিশ্ ভদ্রলোকের পাইপের ঘর্ঘর শব্দ তার কানে আস্‌ছিল।...বিছানার পাশে প্যাভেলের সুবিস্তৃত পিঠের পিছনে একজন কালো দাড়ি-ওয়ালা ডাক্তার কি যেন কর্‌ছিলেন।

"আচ্ছা, আচ্ছা বৎস!" তিনি ধীরে ধীরে বল্‌লেন। "চমৎকার......চমৎকার......ঠিক আছে......ঠিক আছে!"

ডাক্তার ক্লিমভকে 'বৎস' বলে সম্বোধন করছিলেন। তাঁর কথার মধ্যে বিকৃত উচ্চারণ ছিল। "হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ" তিনি বল্‌লেন। "ঠিক আছে......ঠিক আছে......হতাশ হ'য়ো না!"

ডাক্তারের দ্রুত অযত্নসুলভ কথা বল্‌বার ধরণ, তাঁর আহারপুষ্ট মুখ এবং তাঁর কৃপাপরবশ গলায় 'বৎস' সম্বোধনে ক্লিমভ্ চ'টে গেল।

"আপনি আমাকে বৎস বলেন কেন?" ক্লিমভ্ আর্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল। "কিসের এত আত্মীয়তা আপনার সঙ্গে?"

তার নিজের গলার স্বরে সে নিজেই ভয় পেল। এত শুক্‌নো দুর্বল আর ফাঁপা তার গলার শব্দ যে, সে নিজেই চিন্‌তে পার্‌ছিল না।

"চমৎকার, চমৎকার" ডাক্তার কিছুমাত্র রাগ না ক'রে আগের মতই ব'লে চল্‌লেন। "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার রাগ করা উচিত নয়।"

বাড়িতেও ট্রেনের মত তাড়াতাড়ি সময় কাটতে লাগল। ......তার শোবার ঘরের আলো মাঝে মাঝেই সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে পরিণত হ'চ্ছিল।......ডাক্তার কখনও বিছানার পাশ ছেড়ে নড়েন ব'লে মনে হ'ত না এবং তাঁর "হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ" সর্বদাই শোনা যেত। ঘরের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ অসংখ্য মুখ

দেখা যেতঃ প্যাভেল্, ফিনিশ্ ভদ্রলোক, ক্যাপ্টেন্ ইয়ারোশেভিচ্, সার্জেণ্ট ম্যাক্সিমেংকো, লাল টুপী, শাদা দাঁতের অধিকারিণী ভদ্রমহিলা, ডাক্তার! তারা সবাই কথা বল্‌ত, হাত নাড়্‌ত, ধূমপান কর্‌ত, খেত! একবার স্পষ্ট দিবালোকে ক্লিমভ্ তার বিছানার পাশে তাদের সৈন্যদলের পুরোহিত ফাদার্ আলেক্‌জ্যান্ডারকে দেখেছিল—তিনি ধর্মযাজকের পোষাক প'রে প্রার্থনার বই হাতে নিয়ে গম্ভীর-মুখে কি যেন আওড়াচ্ছিলেন—ক্লিমভ্ তাঁকে এত গম্ভীর কখনও দেখে নি'। ক্লিমভের মনে পড়্‌ল যে, ফাদার্ আলেক্‌জ্যান্ডার সমস্ত ক্যাথলিক কর্মচারীদেরই 'পোল্' বলতেন এবং ধর্মযাজককে হাসানার উদ্দেশ্যেই ক্লিমভ্ বল্‌লেঃ "ফাদার্, পোল্ ইয়ারোশেভিচ্ বনে পালিয়ে গেছে!"

কিন্তু তরলচিত্ত সদাহাস্যমুখর ফাদার্ আলেক্‌জ্যান্ডার হাসলেন না—তাঁকে আরও বেশী গম্ভীর বলে মনে হল এবং তিনি ক্লিমভের উপর ক্রসের চিহ্ন আঁকলেন। রাত্রিবেলা ঘরের মধ্যে দুটি ছায়ামূর্তি পরপর যাতায়াত কর্‌ত—এরা তার কাকীমা এবং বোন। তার বোনের ছায়ামূর্তি হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করত; সে পবিত্র মূর্তিকে প্রণাম করত এবং দেয়ালে তার ধূসর ছায়াও প্রণাম কর্‌ত, ফলে দুটি ছায়ামূর্তি এক সংগে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত। আর সর্বদা মাংসের রোস্টের গন্ধ এবং ফিনিশ্ ভদ্রলোকের পাইপের গন্ধ পাওয়া যেত কিন্তু একবার ক্লিমভ্ স্পষ্ট ধূপের গন্ধ পেয়েছিল। সে চীৎকার ক'রে বল্‌লেঃ "ধূপ! ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও!" কোন উত্তর নেই। সে শুধু ধর্মযাজকের নীচুগলায় মন্ত্র পড়ার শব্দ শুন্‌ল আর শুন্‌ল সিঁড়ির উপর কার যেন দৌড়ানোর শব্দ!

যখন ক্লিমভের বিকারের ঘোর কাট্‌ল, তখন ঘরে কেউ ছিল না। জানালার টানানো পর্দার ফাঁক দিয়ে সকাল বেলার সূর্যের আলো আস্‌ছিল—ক্ষীণ কম্পমান তরবারির মত তীক্ষ্ণ এক টুক্‌রো সূর্যকিরণ জলের বোতলের উপর খেলা কর্‌ছিল। সে রাস্তায় চাকার শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছিল—তার মানে এই যে, পথে আর বরফ ছিল না। লেফ্‌টেন্যাণ্ট সূর্য-কিরণের দিকে, পরিচিত আসবাবপত্রের দিকে এবং দরজার দিকে তাকাল—প্রথমে তার হাস্‌বার ইচ্ছা হ'ল। চাপা মধুর সুখের হাসিতে তার বুক এবং পেট কাঁপতে লাগল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার সমস্ত দেহ অসীম সুখবোধে পরিপূর্ণ—ঠিক যেমন প্রথম সৃষ্ট মানুষ জগতের দিকে তাকিয়ে অনুভব ক'রেছিল। লোকের সংগে চলাফেরা করা এবং কথা বলার জন্য ক্লিমভের আকুল আগ্রহ হ'ল। তার দেহ স্থির হ'য়ে প'ড়েছিল; সে শুধু হাত নাড়্‌তে পার্‌ছিল কিন্তু সে এটা লক্ষ্যই কর্‌ল না কারণ ছোট ছোট জিনিষের উপর তার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল। নিজের শ্বাস প্রশ্বাসে এবং হাসিতে সে নিজেই মুগ্ধ হচ্ছিল; জলের বোতল, ছাদ, সূর্য-কিরণ এবং পর্দার উপরে ফিতার অস্তিত্বে সে আনন্দ অনুভব কর্‌ছিল। সে যদিও তার সংকীর্ণ শোবার ঘরে আবদ্ধ তবু ঈশ্বরের সৃষ্ট জগৎ তার কাছে সুন্দর বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং বৃহৎ ব'লে মনে হ'চ্ছিল। যখন ডাক্তার এলেন, লেফ্‌টেন্যাণ্ট ভাব্‌ল যে, তাঁর ঔষধ কি সুন্দর, তিনি নিজে কত সুন্দর ও সহানুভূতিশীল এবং মোটের উপর মানুষ কত সুন্দর আর চমৎকার!

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ" ডাক্তার বল্‌লেন। "চমৎকার, চমৎকার! আবার আমরা ভাল হ'য়েছি। ঠিক তাই! ঠিক তাই!"

লেফ্‌টেন্যাণ্ট মনোযোগ দিয়ে শুনে' আনন্দে হেসে উঠ্‌ল। ফিনিশ্ ভদ্রলোকটি, শাদা দাঁতের ভদ্রমহিলাটি এবং ট্রেনের সব কথা তার মনে পড়ে' গেল; তার খাবার এবং ধূম-পান করার ইচ্ছা হ'ল।

"ডাক্তারবাবু" সে বল্‌ল, "ওদের এক খণ্ড রাইরুটি, নুন ও কিছু সার্ডিন মাছের ঝোল আন্‌তে বলুন......"

ডাক্তার আপত্তি জানালেন। প্যাভেল্ তার আদেশ পালন না ক'রে রুটি আন্‌তে যেতে অসম্মত হ'ল। লেফ্‌টেন্যাণ্ট এটা সহ্য কর্‌তে পার্‌ল না এবং বাধাপ্রাপ্ত শিশুর মত কাঁদিতে লাগ্‌ল।

"শি-শু!" ডাক্তার হাস্‌তে লাগ্‌লেন। "মা-মা! চুপ্ চুপ!"

ক্লিমভও হাসতে শুরু কর্‌ল এবং ডাক্তার চ'লে যাবার পর সে পরিপূর্ণ আরামে ঘুমিয়ে পড়্‌ল। পূর্বের আনন্দ এবং সুখের ভাব নিয়েই সে জেগে উঠ্‌ল। তার বিছানার পাশে কাকীমা বসেছিলেন।

"ওঃ, কাকীমা!" তার মনে অফুরন্ত সুখ। "আমার কি হ'য়েছে?"

"টাইফাস্।"

"তাই নাকি! আমি এখন ভাল হ'য়েছি, সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়েছি! কেটি কোথায়?"

"সে বাড়িতে নেই। সে হয়ত পরীক্ষার পরে কারও সাথে দেখা কর্‌তে গেছে।"

এই কথা বল্‌তে বল্‌তে বৃদ্ধা মহিলা হাতের মোজাটার উপর ঝুঁকে পড়লেন; তাঁর দেহ কাঁপতে থাক্‌ল; তিনি সহসা মুখ ফিরিয়ে কাঁদা শুরু করলেন। গভীর দুঃখে তিনি ডাক্তারের নিষেধ ভুলে' গিয়ে চীৎকার ক'রে কাঁদ্‌তে শুরু কর্‌লেনঃ "ওঃ কেটি, কেটি! আমাদের পরী আমাদের ছেড়ে চ'লে গেছে! সে চ'লে গেছে!"

তাঁর হাতের মোজা প'ড়ে গেল—নীচু হ'য়ে সেটা তুল্‌তে গিয়ে তাঁর মাথা থেকে টুপীটা পড়ে গেল। ক্লিমভ তাঁর ধূসর চুলের দিকে তাকিয়ে রইল—কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ল না, কেটির জন্য ভীত হ'য়ে প্রশ্ন কর্‌লঃ "কিন্তু কাকীমা, সে কোথায়?"

বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা ইতিপূর্বেই ক্লিমভ্‌কে ভুলে গেছলেন—তাঁর মনে ছিল শুধু তাঁর শোকের কথা। তিনি বল্‌লেনঃ "তোমার টাইফাস্ রোগ তার মধ্যে সংক্রামিত হওয়ায় সে মারা গেছে। গত পরশু তাকে সমাধিস্থ করা হ'য়েছে।" এই অতর্কিত ভয়ানক সংবাদ ক্লিমভের বুঝ্‌তে বাকী রইল না। কিন্তু এ সংবাদ ভয়ঙ্কর এবং বীভৎস হ'লেও আরোগ্যপ্রাপ্ত

লেফ্‌টেন্যাণ্টের মনে যে পাশব আনন্দ ছিল তাকে দমন কর্‌তে পার্‌ল না। সে কাঁদিল, হাসল এবং শীঘ্রই অভিযোগ কর্‌তে শুরু কর্‌ল যে, তাকে কিছুই খেতে দেয়া হয় না।

এর মাত্র এক সপ্তাহ পরে সে যখন প্যাভেলের উপর ভর দিয়ে ড্রেসিং গাউন প'রে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল, ধূসর বসন্তের আকাশ দেখ্‌তে পেল এবং শুন্‌তে পেল কয়েকটি পুরানো রেল লাইনে বহনকারী গাড়ীর ভয়ানক শব্দ, তখন তার হৃদয় ব্যথায় টনটন করা শুরু করল। সে কাঁদিতে শুরু কর্‌ল এবং নিজের কপালটা জানালার গায়ে ঠুক্‌ল। "আমি কত অসুখী!" সে অস্ফুট স্বরে বল্‌ল। "হায় ভগবান! আমি কত অসুখী!"

আনন্দের পরিবর্তে তার স্বভাবসিদ্ধ ক্লান্তি এবং অপূরণীয় ক্ষতি-বোধ তাকে ঘিরে ধর্‌ল।*

*[রুশলেখক শেখভের Typhus নামক গল্পের অনুবাদ]

পান্থশালা

(২৭৬ পৃষ্ঠার পর)

টেবিল থেকে পেয়ালা তু'লে চুমুক দি' একটা, কথা কই না কোন।

—'আচ্ছা মিঃ তরফদার, আপনার চোখে প্রেম কি সত্যিই হেয়? আর্ট হিসাবে তার কি দাম নাই মোটেও? ঐ শব্দটার অস্তিত্ব কি শুধু আপনাদের কল্পলোক আর নভেলের পৃষ্ঠার জন্য? উত্তর দিন; আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি খুব বেশী। যাবার বেলায় তাই আমার প্রশ্নের উত্তর পেতে চাই আপনার কাছ থেকে।'

আমার আর্টিষ্ট মন জেগে ওঠে বুঝি। নিজেকে আমার ছোট মনে হয় বড্ড বেশী। পরিষ্কার গলায় কথা ব'লে যায় ছায়া সেন।

—'জানি, আর্টের দোহাই পেড়ে গোপনতাকে প্রশ্রয় দেবার নিন্দা করবেন আপনি। কিন্তু বাস্তব যেখানে হয় লাঞ্ছিত, পরম সত্যের যেখানে দাম নাই কোন, সেখানে আপনি কি ক'রতে বলেন মিঃ তরফদার?

অদ্ভুত এই মেয়েটা; ইচ্ছা হয় ক্ষমা চাই তার কাছে। কিন্তু সে দুর্বলতা থেকে আমায় রক্ষা করে মালতী। হঠাৎ ঘরে ঢোকে সে শিকারী বাঘের মত। ছায়া সেন যেন ফিরে আসে তার নিজের মাঝে।

—'এই যে মিসেস্ তরফদার, যাবার বেলা দেখা ক'রতে এলাম আপনাদের সাথে। না, না, রাগ ক'রবেন না। একটু পরেই আমি মুছে যাব আপনাদের জীবন থেকে চিরদিনের মত।'

যেন করুণ হ'য়ে আসে ছায়ার গলা। যাবার বেলায় সে প্রতিশোধ নিয়ে যেতে চায় বুঝি সব অপমানের।

—'আমি জানতাম, আমাদের স্ক্যাণ্ডাল ছড়িয়ে গেছে বাড়িময়, তাই আপনাদের ছাড়বার ব্যবস্থা করেছি অনেক আগেই। কিন্তু কেন জানি না, আপনাদের ছেড়ে যেতে সত্যিই বড় কষ্ট হ'চ্ছে মনে।'

শেষের দিকে চোখ দু'টো তার সজল হ'য়ে আসে; ছায়া বুঝি তা'তে লজ্জা পেয়ে যায়।

—'আচ্ছা আসি মিঃ তরফদার। যদি পারেন আমায় ক্ষমা করবেন আপনি।'

যেন লাইন টেনে ঘরের থেকে বেরিয়ে যায় ছায়া; আমাদের জীবনে হ'ল তার সমাপ্তি।

এই দিনই দ্বিপ্রহরে মৃত্যু হয় অরুণার স্বামীর। অরুণা কাঁদে না এক ফোঁটাও, সচ্ছলভাবে সে শেষ ক'রে যায় একের পর এক সব কিছু। স্বামীর মুখে আগুন দেয়, নিজের হাতে শাঁখা ভাঙ্গে, শাড়ী ছেড়ে থান কাপড়খানা পরিয়ে দিতেও সাহায্য লাগে না কারও। অবাক্ হ'য়ে যায় সবাই। 'স্বামীকে হারিয়ে একটু দুঃখ হয় না মেয়েটার!'

স্বামীকে হারিয়ে?—মনের ভেতর গুমরে ওঠে কথাটা। যাকে পেলোই না কোন দিন, তা'কে হারাবার দুঃখ!

কিন্তু কি হবে এই মেয়েটার? পৃথিবীর সকল কপাট যা'র কাছে বন্ধ, তা'র আশ্রয় মিলবে কোথায়?

হয়ত' মিলবে মৃগাঙ্ক ডাক্তারের ঘরে, হয়ত' মিলবে না একেবারেই। কিংবা হয়ত—

হয়ত'—তারপর কি জানি না। হৃদয়ের সকল তার আজ বেসুরো হ'য়ে উঠেছে, ভাবতে পারছি না কিছুই। তবে জানি, ছায়ার মত অরুণাও একদিন ছেড়ে যাবে এ বাড়ি। এই পান্থশালায় আস্‌বে নতুন অতিথি। চূণ-বালির দেয়ালের গায়ে রেখে যাবে তাদের স্মৃতি, এ'কে দিয়ে যাবে তা'দের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস, প্রতিটি কলধ্বনী। তারপর তারাও একদিন প্রায় এমনি করেই বিদায় নেবে এখান থেকে।

সাঁওতাল

ভবানী পাঠক

জীবন যাদের উৎসব, আর উৎসবই জীবন, এই ধরনের মানুষ হ'ল সাঁওতালেরা। একজন সাঁওতালকে দেখে নাগরিক মানুষের মন স্বত অভিনন্দনে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে—প্রকৃতির দুলাল! পার্থক্যটা এইখানে। নাগরিক জীবনের বিড়ম্বনায় মানুষ যে জিনিসটা হারিয়ে বসেছে, সেইটা আজও অটুট হ'য়ে রয়েছে এই সাঁওতালদের সহজ জীবনধারায়।

সাঁওতালরা দরিদ্র অথচ সুখী। কিন্তু তাই ব'লে এ ধারণা করা উচিত নয় যে, দারিদ্র্য তাদের গায়ে বাজে না। কলকাতার রাস্তার ভিখিরীরাও দরিদ্র, ফুটপাথে বসে তারাও সাঁওতালদের মত গলা ছেড়ে গান গায়। কিন্তু ভিখিরীদের তো প্রকৃতির দুলাল ব'লে মনে হয় না। সুতরাং পার্থক্যটা অন্যখানে।

নিজের প্রকৃতির গুণেই সাঁওতালেরা দুলাল হ'তে পেরেছে। জঙ্গল, পাহাড় ও ঝর্নার কোন বিশেষ প্রসাদে এটা সম্ভব হয় নি। নাগরিক মানুষ নিজের প্রকৃতির মধ্যেই সহস্র রূঢ় ও জটিল মানসকূটের সৃষ্টি ক'রে নিজেকে বায়োলজির বিকৃত অপভ্রংশ ক'রে ছেড়েছে। সাঁওতালদের জীবনে সকল কর্মপ্রবাহের পেছনে আছে নিছক আনন্দ-সাধনার প্রেরণা। আনন্দের ক্ষেত্রে তাদের বাছ-বিচার, টাবু-বালাই খুবই কম। অপরদিকে নাগরিক মানুষ বেশীর ভাগ অবদমন ও সাদীয় মনোবৃত্তির আওতায় প'ড়ে সহজ স্বতঃপ্রাপ্ত আনন্দকে দুর্লভ ক'রে রেখেছে। পার্থক্যটা এইখানে। দোষ নগরের নয় বা গুণ পাহাড়-জঙ্গলের নয়। শহর বাজারে থেকেও সাঁওতালেরা তাদের সুস্থ জীবনের আনন্দ[illegible]ক ব্যতিব্যস্ত করে নি।

সাঁওতালদের যদি বন্য বলা হয়, তবে সে বন্যতাকেই সব চেয়ে বড় সম্পদ্ বলতে হবে। সহস্র নিষেধের প্রকোপে সঙ্কুচিত নাগরিক মানুষ যদি এই প্রাকৃতিক বন্যতাকে নূতন ক'রে তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তবে সমাজের শ্রী বোধ হয় সত্যই নূতনভাবে বিকাশ লাভ করবে।

বন্য, বর্বর ও আদিম প্রভৃতি কতগুলি কথা আছে, যাকে বুর্জোয়া সমাজবিজ্ঞানে বহু কদর্থ করা হয়েছে। এগুলি নিন্দোক্তি হিসাবেই ব্যবহার করা হয়। সাঁওতালদেরও বর্বর বলা না হোক, তাদের আদিম ও বন্য বলতে অনেকে কুণ্ঠিত হন না। সাঁওতালদের জীবনের যে normality, সেটা শহুরে সভ্য (?) মানুষের মধ্যে দুর্লভ। কাজেই টক-আঙুরের ওপর শেয়ালের ধিক্কারের মত সেই normality-কেই primitivity আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সাঁওতালদের primitive জীবনকেই আমরা বিচার ক'রে দেখব, সেটা রুচি, রস, শিল্পবোধ, সাবলীলতা ও সৌন্দর্যে অন্যের তুলনায় নিকৃষ্ট না অপকৃষ্ট।

নৃতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে সাঁওতালদের কৌলিন্য আরও বেশী ক'রে চোখে পড়ে। মানবসমাজের একটি বনিয়াদী ঘর এই সাঁওতালেরা। লক্ষ বৎসরের সূর্য-করের সেবায় পরিপুষ্ট কৃষ্ণকান্তি এই প্রবীণ মানবগোষ্ঠী। নৃতত্ত্বের আসরে তারা গ্রানিটের মত গুরুস্থানীয়।

মহুয়া ভরা শালের ছায়ায় বিশ্রম্ভালাপে রত সাঁওতাল দম্পতিকে আদর্শ যৌন জীবনের সুচারু শিল্পময় প্রতীক্ ব'লেই মনে হয়। পীড়ন ও প্রগল্ভতায় বিকৃত তথাকথিত সভ্যতর মানুষের দাম্পত্য, সে দৃশ্য দেখে হিংসায় আতুর হ'য়ে উঠবে।



সাঁওতাল যুবক যুবতী নৃত্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছে

ফটো : শ্রীসুধীন দত্ত

দৈহিক সৌন্দর্যের কথাই তোলা যাক্। অবশ্য নীল চোখ, কটা চামড়া বা পিংগল কেশ, যদি শারীর সৌন্দর্যের



সাঁওতাল শিশু ও তাহার খেলার সাথী ফটো : শ্রীসুধীন দত্ত

সনাতন মাপকাঠি হয়, তবে সাঁওতালরা হয়তো কুরূপ। কিন্তু যদি পরিপুষ্ট পেশীর সুছন্দায়িত সজ্জা, অংগ-প্রত্যংগের গঠন, symmetry ও কমনীয়তা—চলা-বলা, হাসি-স্ফূর্তির সজীবতা ও স্বাস্থ্যকে রূপের স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয়, তবে সাঁওতালরাই হয়তো কোন পরম আর্যের চেয়ে কম সুন্দর নয়।

Aesthetics-এর ক্ষেত্রে এসেও বিচার করা হোক্। সৌন্দর্যবোধে এই 'আদিম' মানবেরা কার চেয়ে কম। খালি পেটে সমস্ত দুপুর গাছের ছায়ায় ব'সে বাঁশি বাজাতে পারে, এতখানি সংগীতপ্রাণতা শহুরে মানুষের মধ্যে কতটুকু পাওয়া যায়। শিকার, বিবাহ, শস্যরোপণ, লড়াই, মৃতের সৎকার সব কিছুকেই এরা গানে গানে ভরে রেখেছে। সভ্যতাগর্বী অর্বাচীন মানুষেরা এতটা রসৈশ্বর্যের অধিকারী আজও হ'তে পারে নি।

পূর্ণিমায় পলাশের কুঞ্জে কুঞ্জে সাঁওতাল নরনারীর উদ্বেল নৃত্যে যে ছবি ফুটে ওঠে, তাকে উপভোগ্যতায় ছাড়িয়ে উঠতে পারে, এমন কোন নাচ তো চোখে পড়ে না। সভ্য মানুষের নৃত্যকলায় বুঝবার, উপভোগ করবার অনেক কিছু আছে সত্য, কিন্তু তার মধ্যে সার্কাসী কেরামতিই যেন বেশী। নৃত্যের প্রাণ যে অংগহার, তার সব চেয়ে বড় পরিস্ফূর্তি সাঁওতালী নৃত্যের অনাবিল ছন্দোমত্ততায় ফুটে উঠেছে। বলা বাহুল্য, সাঁওতালী নৃত্যের ঐ অনাড়ম্বরতার মধ্যে যতখানি আবেগ সৃষ্টি করা হয়, অন্য কোন নাচে তার এক-তৃতীয়াংশও হয় কি না সন্দেহ।

সেকালের কবিরা যুবতীর কবরীর স্তুতি ক'রে গেছেন। কালিদাসের আমলে কুরুবকের চূড়ায় কবরী গৌরব বৃদ্ধি করত। তার পরেও কবিরা মুগ্ধ হয়েছেন দেখে—'কানাড়া ছান্দে কবরী বান্ধে নব মল্লিকার মালে'। শুধু ভারতীয় বা বাঙালী সমাজ নয়, প্রায় সব সমাজেই কবরী ও ফুলের এই যুক্তবিন্যাসের আর্ট আজ লুপ্ত হয়েছে। সাঁওতালদের মেয়েদের কবরী রচনার রীতি সভ্যসমাজের যে কোন গর্বিত বেণীনিকে লজ্জা দেবে। পারিপাট্য ও কারুতার কথা ছেড়ে দিলে, সামান্য ঐ খোঁপার ফুল ব্যবহারের প্রথাটি বহু যুগের সাধনামার্জিত একটি রুচি।

সাঁওতালদের পরিচ্ছদ লক্ষ্য করার বিষয়। নর ও নারীর উভয়ের পরিচ্ছদের অনাড়ম্বরতা অথচ decorum কত সুদৃশ, তা আর্টিস্টের চোখেই ভাল ক'রে ধরা পড়ে। পোষাকের বাহুল্য দু'জাতের মানুষের মধ্যে দেখা যায়। এক অতি বর্বর মানুষ—শূয়োরের দাঁত, পালক, রোঁয়া ও পশু-চর্মের আভরণে ভারাক্রান্ত দেহ। আর আধুনিক সভ্য-সমাজের মানুষ। সাঁওতালরা এ বিষয়ে অনন্যসাধারণ। পরিচ্ছদের ব্যাপারে এরা পাশব উলংগতার চর্চা করে না। আবার আড়ম্বর ও আতিশয্যেরও কোন ধার ধারে না। এদের



সাঁওতাল যুবতী ফটো : শ্রীসুধীন দত্ত

পরিচ্ছদ-রুচি সত্যই প্রশংসনীয়। এদের পরিচ্ছদ পদ্ধতিতে অংগ-প্রত্যঙ্গের মহিমা চাপা না প'ড়ে বরং তা আরও বেশী আবেদনশীল হ'য়ে দেখা দেয়।

এদের সমাজব্যবস্থা থেকে এখনও তাদের সাবেকী tribal সমানাধিকার উচ্ছিন্ন হয় নি। কাজেই সমাজসুখ এরা যতটা উপলব্ধি করে, বৈষম্যে বিষাক্ত সভ্যসমাজে তার আস্বাদ পাবার সৌভাগ্য কারও নেই। নানা নূতন অর্থনীতিক



সাঁওতালী কবরীবিন্যাস পদ্ধতি

ফটো : শ্রীশম্ভু সাহা

বৈগুণ্যে এদের আজ পাহাড় বনের আশ্রয় ছেড়ে সমতলে নামতে হয়েছে, শহরে খনি মজুরের পেশা ধরতে হয়েছে। তার পর চলেছে ধর্মপ্রচারকদের অভিযান। বাপের কেলে 'বোঙ্গাকে' শিকেয় তুলে দলে দলে নূতন দেবতার কাছে দীক্ষা নিয়েছে। চাকুরী নামে একটা অভিনব উপার্জন-পন্থার পরিচয় পেয়েছে। কাজেই এদের primitive সমাজব্যবস্থার অটলতায় আজ আঘাত পড়েছে খুব জোরে।

এ সব সত্ত্বেও সাঁওতালেরা একটা গুণে আজ সাঁওতালত্ব হারাতে পারছে না। সেটা তাদের ঐ যুগ যুগ সাধনালব্ধ সম্পদ্ আনন্দ সাধনার প্রেরণা। উৎসবকে এরা ছাড়তে পারে না। পান, ভোজন, দাম্পত্য, শিকার, নৃত্য-সংগীত—সবের মধ্যে ষোল আনা আনন্দের খোরাক যুগিয়ে রেখেছে এরা।

রুচি সুন্দর হ'লে জীবন কত সুন্দর হয়, সাঁওতালদের জীবনে তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রয়েছে। এত যে মহুয়া মদের মাতামাতি, নৃত্যের উদ্দামতা ও গীত-বাদ্যের আনন্দমুখরতা, তবুও তাতে এদের প্রকৃতির মধ্যে কোন প্রগল্ভতা প্রবেশ করে নি। এদের সাহস, শক্তি ও বীর্য অলস হয়ে পড়ে নি। সুরুচি কত শক্তিপ্রবণ, তা সাঁওতাল চরিত্রের মধ্যেই ফুটে উঠেছে।

সামাজিক জীবনে বৈষম্যের অনাচার না থাকলে, সহস্র অভাব বিপত্তি সত্ত্বেও মানুষ কতখানি আনন্দের অধিকারী হ'তে পারে, সাঁওতালদের জীবনে এই সমাজবিজ্ঞানগত তথ্য ছড়িয়ে রয়েছে। জ্ঞানবিজ্ঞানও যদি বৈষম্যদোষে দুষ্ট থাকে, তবে সেটা মানুষের জীবনকে কোন মতেই শ্রীমণ্ডিত করতে পারে না। আধুনিক সভ্যতার ট্রাজেডি এইখানে। সহজ সংস্কৃতিবান্ এই সাঁওতাল জাতির সামাজিকতার ভেতর এই শিক্ষা আমরা গ্রহণ করতে পারি।

ছদ্মবেশী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৭

গাড়ি অদৃশ্য হইলে লাবণ্য সুলেখার কথা ভাবিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, সুলেখার বিবেচনা-শক্তি এবং পরিমাণ-জ্ঞান একটু কম। যতই হউক না কেন, গৌরহরি শেষ পর্যন্ত ড্রাইভার ভিন্ন অপর কিছুই ত' নহে—উহার সহিত অতটা কথাবার্তা কওয়া এবং মেলামেশা করা ঠিক সঙ্গত হইতেছে না।

দুই চার মিনিট লাবণ্য অলস চিন্তার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া দোতলায় চলিয়া গেল।

মিনিট পাঁচ সাত পরে মোটরের শব্দ পাইয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সে দেখিল গাড়িবারান্দার ভিতর একটা ট্যাক্সি প্রবেশ করিল, এবং অনতিবিলম্বে তথা হইতে নির্গত হইয়া গেট অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

ক্ষণকাল পরে প্রবেশ করিল প্রশান্ত।

প্রশান্তকে দেখিয়া সবিস্ময়ে লাবণ্য বলিল, "ট্যাক্সিতে তুমি এলে?"

প্রশান্ত বলিল, "এলাম বই-কি।"

"কেন, গাড়ি গেছল ত?"

"তা-ও ত গেছল। হাইকোর্ট ছেড়ে খানিকটা পথ আসার পর দেখলাম, আমাদের গাড়ি শোঁ ক'রে পাশ দিয়ে হাই-কোর্টের দিকে চ'লে গেল। মনে হ'ল গৌরের সঙ্গে আমার চোখোচোখিও হ'ল, কিন্তু গাড়ি থামালে না।"

লাবণ্য বলিল, "ট্যাক্সিতে তুমি যে থাকতে পার, সে ধারণাই তার ছিল না; তাই অন্যমনস্কভাবে তোমার সঙ্গে চোখোচোখি হ'লেও তোমাকে বুঝতে পারে নি।"

কৈফিয়ৎটার মধ্যে যুক্তি আছে বলিয়া প্রশান্ত সে বিষয়ে আর কোনো কথা বলিল না; জিজ্ঞাসা করিল, "গাড়িতে গৌরের পাশে কে ব'সে ছিল?"

লাবণ্য বলিল, "গৌরের পাশে ত কেউ ছিল না, পেছনের সীটে ছিল সুলেখা। তোমাকে নিয়ে আসবার জন্যে সে গিয়েছে।"

প্রশান্ত বলিল, "তা হ'লে সুলেখাই গৌরের পাশে ব'সে ছিল। পেছনের সীটে কেউ ছিল না।"

লাবণ্য বলিল, "তুমি ভুল করছ।"

প্রশান্ত বলিল, "না, এবার তুমিই ভুল করছ। সুলেখা এলে জিজ্ঞাসা কোরো; তখন বুঝতে পারবে কে ভুল করছে।"

সুলেখার সঙ্গতিবোধের বিষয়ে লাবণ্যর বিশ্বাস কিছু শিথিল হইয়াছিল বলিয়া সে জোর করিয়া তর্ক করিতে সাহস করিল না, চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু সুলেখার প্রত্যাগমনের দিকে একটু মনোযোগ রাখিল।

ঘণ্টাখানেক পরে হর্নের শব্দ শুনিয়া লাবণ্য বাহিরে আসিয়া দেখিল পিছনের সীটের মধ্যস্থলে সুলেখা বসিয়া আছে, তাহার দক্ষিণে ও বামে বসিয়া জয়ন্ত এবং দীপালি।

গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া সুলেখা নিকটে আসিলে লাবণ্য বলিল, "এত দেরী করলি যে?"

সহাস্যমুখে সুলেখা বলিল, "হাইকোর্টে গিয়ে শুনলাম একটু আগেই জামাইবাবু চলে এসেছেন। তখন অগত্যা খানিকটা ঘুরে দীপু আর জয়ন্তকে তাদের স্কুল থেকে নিয়ে চ'লে এলাম।"

কৈফিয়ৎটা লাবণ্যর মনঃপূত হইল না; বলিল, "ওরা ত নিজের নিজের বাসেই আসে। সকাল সকাল যদি ফিরতিস ত' এতক্ষণ চা-টা খেয়ে ওঁর সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারতিস।"

সুলেখা বলিল, "আজ আর এই ঠাণ্ডায় বেড়ানো নয় দিদি। আজ চা-টা খেয়ে জামাইবাবুকে নিয়ে ব'সে শুধু গল্প-গুজোব করা। এখন পর্যন্ত জামাইবাবুর সঙ্গে ভাল ক'রে কথাবার্তাই হয় নি।"

লাবণ্য বলিল, "বেশ ত', তাই করিস। উনি ত তোর জন্যে ব্যস্ত হ'য়েই রয়েছেন।" তারপর এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "হ্যাঁরে সুলেখা, হাইকোর্টে যাবার সময়ে তুই সামনের সীটে গৌরহরির পাশে ব'সে ছিলি?"

স্মিতমুখে সুলেখা বলিল, "কে বললে তোমাকে দিদি?"

লাবণ্য বলিল, "উনি বলছিলেন। তোরা যখন হাই-কোর্টের দিকে যাচ্ছিলি তখন উনি ট্যাক্সি ক'রে বাড়ি ফিরছিলেন,—সেই সময়ে দেখেছিলেন।"

প্রশান্তমুখে অবলীলার সহিত সুলেখা বলিল, "ঠিকই দেখেছিলেন। তখন আমি গৌরহরিবাবুর পাশেই ব'সে ছিলাম।"

লাবণ্য উত্তর শুনিয়া যত না বিস্মিত হইল, ততোধিক বিস্মিত হইল উত্তর দিবার বেপরোয়া ভঙ্গী দেখিয়া। বলিল, "তুই ত বাড়ি থেকে বেরুলি পেছনের সীটে বসে, তারপর সামনের সীটে গেলি কেমন ক'রে?"

তেমনি শান্ত সহজভাবে সুলেখা বলিল, "সে তোমার গৌরহরি ড্রাইভারের জ্বালায়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে প'ড়েই এমন পেছন ফিরে চেয়ে চেয়ে তার কার্তিক মামার কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল যে, আমার মনে হ'ল একটা অ্যাক্সি-

ডেন্ট না ক'রে কিছুতেই ছাড়বে না। তখন নিজেই গাড়ি থামিয়ে ওর পাশে গিয়ে বসলাম। কি করি বল দিদি?— অন্যায় করেছি কি?"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া অসন্তোষের ঢিমা সুরে লাবণ্য বলিল, "কার্ত্তিক মামার কথা ও ত' আজ সমস্ত দিন তোকে জিজ্ঞেস করেছে, তবু ওর এখনো এত কি কথা বাকি আছে যে, গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হবার ভয় হয়েছিল তোর?"

প্রশ্নের এই দুইরোখা গঠন হইতে সুলেখার বুঝিতে বাকি রহিল না যে, ছাঁদ ইহার প্রশ্নের হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রশ্ন নহে, পরন্তু অনুযোগ; এবং সে অনুযোগ যে গৌরহরির বিরুদ্ধেই শুধু নহে, হয় ত' তাহারই বিরুদ্ধে অধিক, তাহাও উপলব্ধি করিয়া সপুলকচিত্তে সে বলিল, "শুধু কি কার্ত্তিক মামার কথাই দিদি? কার্ত্তিক মামার কথার সঙ্গে আবার নতুন ক'রে যোগ দিয়েছে শ্রীমতী পুঁটির কথা।"

লাবণ্যর মনের মধ্যে সুলেখার প্রতি যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ক্রমশ জেরার আকার ধারণ করিতেছিল; বলিল, "পুঁটির সঙ্গে ত' ওর বিয়েই হয়েছে, তবে পুঁটির কথা তোকে জিজ্ঞাসা করবার কি দরকার পড়ল?"

মাথা নাড়িয়া সুলেখা বলিল, "পুঁটির সঙ্গে ত' ওর বিয়ে হয় নি দিদি, হ'য়ে যদি থাকে ত' অন্য কারো সঙ্গে হয়েছে। ওর পেটের কথা বার করবার জন্যে আমি তখন পুঁটির কথা তুলেছিলাম।"

লাবণ্য বলিল, "অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে থাকলে পুঁটির কথাই বা জিজ্ঞাসা করে কেন?"

"হয়ত' গৌরহরির মানসপট থেকে পুঁটুরাণী এখনো সম্পূর্ণভাবে মুছে যান নি।"

লাবণ্যর ভিতরে জেরা করিবার প্রবৃত্তি কিছুতেই বিরাম মানিতেছিল না; বলিল, "সেই খোঁড়া মেয়েটাকে ও ভুলতে পারছে না?"

স্মিতমুখে সুলেখা বলিল, "পুঁটি খোঁড়া ব'লে ত আর ফোগলাও নয় দিদি। তোমার গৌরহরি পুঁটির খোঁড়া পা যেমন ভুলতে পারছে না, তার সুন্দর মুখও হয়ত তেমনি ভুলতে পারছে না।"

ঈষৎ বিরক্তির সুরে লাবণ্য বলিল, "কি জানি বাপু, এ সব গোলমেলে কথা আমি ঠিক বুঝিনে। কিন্তু সে যাই হ'ক, পেছনের সীটে জায়গা থাকতে তুই আর সামনের সীটে গৌরের পাশে বসিস নে সুলেখা।"

লাবণ্যের নিষেধ-বাণী শুনিয়া কপট বিস্ময়ের সুরে সুলেখা বলিল, "কেন বল দেখি? কোনো দোষ আছে তা'তে?"

লাবণ্য বলিল, "আছে বই কি। দেখতে একটু দৃষ্টিকটু হয়।"

লাবণ্যকে কতকটা অসন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া মনে মনে খুসি হইয়া সুলেখা বলিল, "না, না, দিদি, দৃষ্টিকটু কেন হবে? কলকাতায় আমি কত মেম-সায়েবকে ড্রাইভারের পাশে ব'সে গাড়ি চ'ড়ে যেতে দেখেছি, অথচ পেছনের সীটে কেউ নেই।"

লাবণ্য বলিল, "তা হয়ত' দেখেছিস; কিন্তু এ কথা ভুলিসনে যে, এলাহাবাদ কলকাতা নয়; আর, তুই মেমসাহেব নোস্।"

সুলেখা বলিল, "এলাহাবাদ কলকাতা কি-না তা হয়ত জানি নে,—কিন্তু সায়েবের ছোট শ্যালী যে মেমসাহেবের এক কাঠি বাড়া তা ভাল রকমই জানি।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে লঘু ক্ষিপ্র পদে প্রস্থান করিল। পাঁচ সাত পা আগাইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আচ্ছা, দিদি, বি-এ'তে তোমার অনার্স ছিল,—না?"

লাবণ্য বলিল, "ছিল, তবে পরীক্ষা দেবার সময়ে ছেড়ে দিয়েছিলাম।"

"তা না-হয় দিয়েছিলে, কিন্তু অনার্স কোর্স পড়েছিলে ত?"

"হ্যাঁ, পড়েছিলাম বই কি। কিন্তু সে কথা তোর হঠাৎ মনে হ'ল কেন?"

লাবণ্যর এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া এক মুহূর্ত চিন্তা করিবার ভঙ্গি করিয়া সুলেখা বলিল, "আচ্ছা দিদি, ইংরিজি নিউমোনিয়া কথার প্রথম অক্ষর 'পি'র উচ্চারণ কেন হয় না বলতে পার?"

এই প্রশ্নের দ্বারা কৌশলের সহিত সুলেখা লাবণ্যর জন্য যে ফাঁদটি পাতিল, অবলীলাক্রমে তাহার মধ্যে জড়াইয়া পড়িতে লাবণ্যর এক মুহূর্তও বিলম্ব হইল না। নিউমো-নিয়ার এই 'পি' যে গৌরহরিরই নিউমোনিয়ার 'পি' তাহা সে নিঃসংশয়ে বুঝিল, এবং যে দুরন্ত 'পি' লইয়া প্রশান্ত দুই তিন দিন যাবৎ কাতর হইয়া দিনাতিপাত করিতেছে তাহা সুলেখার স্কন্ধের উপর চাপিয়া বসিয়াছে দেখিয়া তাহার মনের মধ্যে কৌতুকের অন্ত রহিল না। অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া সহজমুখে সে বলিল, "কি দরকার পড়ল সে কথার?"

সুলেখা বলিল, "এমনি জিজ্ঞাসা করছি।"

এ উত্তরটা কিন্তু লাবণ্যর ঠিক ভাল লাগিল না। গৌরের জন্য দরকার সে কথা ত' খুলিয়া বলিলেই হইত। কৌতুকের কথার মধ্যে এমন করিয়া লুকাচুরির আমদানি করিলে কৌতুক আর ঠিক কৌতুক থাকে না। বলিল, "আমি জানি নে সুলেখা, তোর জামাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করিস।"

(ক্রমশ)

সাহিত্য সংবাদ

আন্তঃবিদ্যালয় গল্প প্রতিযোগিতা

চৈতালী সঙ্ঘের সাহিত্য শাখা পরিচালিত এই প্রতিযোগিতায় যে কোনও বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা যোগদান করিতে পারিবে। শিশু-সাহিত্যের উপযোগী করিয়া অল্প কয়েক পৃষ্ঠায় গল্প লিখিতে হইবে। এই প্রতিযোগিতায় কোনও প্রবেশমূল্য লাগিবে না। প্রত্যেক গল্প কাগজের এক পৃষ্ঠায় বেশ পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে। প্রত্যেক গল্পের সহিত লেখক বা লেখিকার বয়স, অভিভাবকের সহি, প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর সহি থাকা চাই। সহি না থাকিলে লেখা গ্রাহ্য হইবে না। গল্পের সহিত বিদ্যালয়ের ঠিকানা থাকিবে। প্রথম এবং দ্বিতীয় পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ১৫ই এপ্রিল। সকল বিষয় সম্পাদকের নিকট জ্ঞাতব্য। ১৩নং কালী লেন, কালীঘাটে রচনা পাঠাইতে হইবে।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

"ভারতের সংস্কৃতি" বিষয়ে যাঁহার প্রবন্ধ সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে তাঁহাকে একটি রৌপ্য পদক প্রদান করা হইবে। যে কেহ—পুরুষ, নারী, বালক, যুবা বা বৃদ্ধ প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন। প্রবন্ধ ৩০শে চৈত্র ১৩৪৭ বাং পর্যন্ত নিম্নঠিকানায় পৌঁছান আবশ্যক।

প্রবন্ধ নিম্নঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে। (স্বাঃ) শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত, রিষিড়া সংস্কৃতি পরিষদ, পোঃ রিষিড়া, (হুগলী)।

প্রবন্ধ ও গল্প প্রতিযোগিতা

করিমগঞ্জ বিভাগীয় ছাত্র ফেডারেশন সুরমা উপত্যকার স্কুল-সমূহের ৭ম হইতে ১০ম মানের (Class VII to X) ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি প্রবন্ধ ও ৩য় মান হইতে ৬ষ্ঠ মানের (Class III to VI) ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি গল্প প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উভয় প্রতিযোগিতায়ই ১ম ও ২য় স্থান অধিকারীকে ভাল বই পুরস্কার দেওয়া হইবে। ৩১শে মার্চের মধ্যে প্রবন্ধ ও গল্প নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ১৩ই এপ্রিল প্রতিযোগিতার ফলাফল বাহির হইবে। প্রবন্ধের বিষয়—"স্বদেশের প্রতি কর্তব্য"। 'গল্প' লেখক ও লেখিকার ইচ্ছানুযায়ী। আশা করি সুরমা উপত্যকার স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণ এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রকাশ করিবেন। (স্বাঃ) শৈলেশ দাস, সম্পাদক, করিমগঞ্জ বিভাগীয় ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র ফেডারেশন অফিস, করিমগঞ্জ (শ্রীহট্ট)।

'যাত্রীদল' প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

'যাত্রীদলের' সাহিত্য বিভাগের সভাপতি শ্রীযুত সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পরিকল্পিত কার্যসূচী অনুযায়ী আগামী বৎসর (১৩৪৮) হইতে নিয়মিতভাবে প্রত্যেক বৎসর নগদ অর্থ পুরস্কার দিয়া কয়েকটি সাহিত্য বিষয়ক প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইবে স্থির হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনার পরীক্ষামূলক প্রতিযোগিতা হিসাবে 'যাত্রীদল' কর্তৃপক্ষ "আধুনিক বাঙলা কবিতার সমালোচনা" সম্বন্ধে একটি প্রতিযোগিতা ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ সমালোচককে "নবকুমার দত্ত স্মারক পুরস্কার (নগদ ১০৲ টাকা)" দেওয়া হইবে। পুরস্কার-প্রাপ্ত সমালোচনাটির প্রকাশসত্ত্ব উদ্যোক্তাদের থাকিবে এবং পাঁচজনের কম প্রতিযোগী হইলে প্রতিযোগিতা বাতিল করা হইবে। অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু, অধ্যাপক আবু সৈয়দ ও শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ বিচারকের কার্য করিবেন। প্রতিভাবান নবীন সাহিত্যিক ও লেখক সম্প্রদায়কে আর্থিক সাহায্যদানের এই পরিকল্পনাকে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে। সমালোচনাসমূহ আগামী ৩১শে মার্চের মধ্যে নিম্নঠিকানায় পৌঁছান প্রয়োজন। সম্পাদক, সাহিত্য বিভাগ, 'যাত্রীদল' ২৭নং গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (সাউথ), হাওড়া।

বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলন

আগামী ২৯শে ও ৩০শে মার্চ বৈকাল ৫ ঘটিকায় কলিকাতা ১।১, চালতাবাগান সেকেণ্ড লেনে, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মিলন মন্দিরে সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে বিগত বৎসরের মত এ বৎসরও বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। "আনন্দবাজার পত্রিকার" সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন। শ্রীযুক্ত রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ, বাহাদুর মূল সভাপতির আসন অলংকৃত করিবেন। দর্শন শাখায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, সাহিত্য শাখায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম-এ, বি-এল ও কাব্য শাখায় কবি শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী কবিরত্ন, বি-এ পৌরোহিত্য করিবেন।

আমরা জনসাধারণের সানুগ্রহ সহযোগিতা প্রার্থনা করি। বিভিন্ন শাখায় পাঠের উপযোগী প্রবন্ধাদি ও কবিতা অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের নিকট ২৭নং আটাপাড়া লেন, পোঃ কাশীপুর, কলিকাতা এই ঠিকানায় অবিলম্বে পাঠাইবার জন্য কবি ও সাহিত্যিকদের নিকট অনুরোধ জানাইতেছি। প্রবন্ধাদি ও কবিতা ২৮শে তারিখে নির্বাচিত হইবে। নির্বাচিত প্রবন্ধাদি ও কবিতা সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইবে। উপযুক্ত ডাক টিকিট দেওয়া থাকিলে লেখা ফেরৎ দেওয়া যাইতে পারে। স্বাঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, ভক্তি-ভারতী-ভাগীরথী, সভাপতি ও শ্রীকুঞ্জকিশোর দাস বি-এ, এম-আর-এস-এল (লণ্ডন), সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি।



অতিরিক্ত শিলাবৃষ্টি ও প্রবল ঘূর্ণিবাত্যার ফলে ত্রিপুরা জেলার কাছাইটের ধ্বংসাবশেষের দৃশ্য

বিচিত্র বার্তা

অপরাধের জন্য অপরাধীকে সাজা দেবার ব্যবস্থা নানা দেশে নানা রকম রয়েছে। গুরুতর অপরাধে কঠোর সাজার বিরুদ্ধে কারও অভিযোগ করবার নেই তবে যেখানে অপরাধের পরিমাণ অল্প সেখানে অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু এই কঠোর শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থাটাকে প্রাচীন যুগের লোক কর্তব্য বলে মেনে নিত। বর্তমানে বহু আন্দোলনের ফলে কিছু পরিমাণ এর হ্রাস পেয়েছে। যাদের উপর আইনের ভার থাকত তারা ভাল ভাবেই নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করত অপরাধীর উপর। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উদ্ভট আইনের কবলে পড়ে নির্দোষী লোক শাস্তি পেত। সমাজ ব্যবস্থা এমনইভাবে চলে এসেছিল যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে একমত হ'য়ে দাঁড়াতে লোকে সহজে সাহস পেত না, ধর্মভীরু মন অন্যায় শাস্তিটাকেও মেনে নিত, যেখানে বিদ্রোহ দেখা দিত সেখানে ধর্মের দোহাই দিয়ে অপরের ঘাড়ে বল প্রয়োগ করে শাস্তির বিধান রক্ষা করা হ'ত।

ইতিহাসের মধ্যে নানাবিধ শাস্তির ব্যবস্থার কথা জানতে পারা যায়। নিয়মিত পাঠপ্রস্তুত না করার জন্য অথবা অপরাধের জন্য আমাদের দেশে যেমন আজও স্কুলে বেত্রাঘাত চালু হয়েছে সেইরকম সেকালে অপরাধীকে অন্যায় কাজের জন্য অসংখ্য কশাঘাতে জর্জরিত করা হ'ত। সে কশাঘাতের প্রথা বর্তমানে একেবারে উচ্ছেদ হয়নি, তবে সে ভয়াবহ রূপ, বর্বরজনিত আচরণ নেই। সৈন্যদের অপরাধে কশাঘাতের ব্যবস্থা রোমানদের সময় থেকেই চলে আসছিল। শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য সে যুগে অতি নিষ্ঠুরভাবে দোষীকে কশাঘাত করা হ'ত, সৈন্যবিভাগের পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে খুব কদাচিৎ দয়া দাক্ষিণ্যের পরিচয় পাওয়া যেত। সেই সময়ের কশাঘাত প্রথা এমনই কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হ'ত যে, বেশীর ভাগ দোষী ব্যক্তিকেই কশাঘাতের ফলে মৃত্যুবরণ করতে হ'ত।

ইউরোপে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রভাবের মধ্যে শত শত বৎসর ধরে এই কশাঘাত প্রথাটাই সৈন্যদের শাস্তি দেওয়ার প্রধান ব্যবস্থা হিসাবে চলে এসেছে। সৈন্য বিভাগের প্রত্যেক "গার্ড হাউসে" কশাঘাতের বিভাগ থাকত আর অতি সামান্য অপরাধে শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে সৈন্যদের নিষ্ঠুরভাবে কশাঘাত করা হ'ত। বৃটিশ সৈন্য বিভাগে বহু শত বৎসর ধরে প্রায় সকল রকম অপরাধে কশাঘাত করাটাই একরকম প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৬৮৯ সালের মিউটিনি আইন অনুসারে এই কশাঘাত ব্যবস্থাটাকে শাস্তি দেওয়ার প্রধান অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং অষ্টম শতাব্দীতে কশাঘাত প্রথার উচ্ছেদ সাধনের জন্য কিছু পরিমাণ চেষ্টা চলেছিল। ১৮৩৭ সালে লণ্ডনের মেজর জেনারল চার্লস জে নেপিয়ার অপরাধী সৈন্যদের শাস্তির ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলেছেন যে, সে সময়ে দোষীকে বেশীর ভাগ সময়েই এক থেকে তিন শত "ক্যাট" অর্থাৎ বেত মারা হ'ত। অপরাধ বেশী হলে হাজার বেত্রাঘাতের ব্যবস্থাও দেওয়া হ'ত। যাদের উপর বেত্রাঘাত করবার হুকুম দেওয়া হ'ত তারা সর্বশেষ বেতের চিহ্নটিও পর্যন্ত দোষীর শরীরে না দিয়ে ক্ষান্ত হ'ত না। ফল হ'ত যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দোষীর মৃত্যু ঘটত, সর্ব শরীরের মাংসপেশী এক রক্তমাংসপিণ্ডে পরিণত হ'ত। শরীরের উপরের চামড়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে দেহ থেকে নেমে আসত। এই সমস্ত হৃদয়বিদারক দৃশ্য কোন দিনের জন্যও কর্মকর্তাদের মনে এতটুকু করুণা জাগাতে পারত না।

যাঁরা এই নিষ্ঠুর প্রথা উচ্ছেদ সাধনে প্রকাশ্যভাবে আন্দোলন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে স্যার ফ্রান্সিস বার্ডেটের নাম বিশেষভাবে করা যায়। পার্লামেণ্টে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনার ভয়াবহ ফলের উপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন।

কশাঘাতের অস্ত্রকে "ক্যাট" আখ্যা দেওয়া হয়েছিল এবং ইংলিশ কশাঘাত-অস্ত্রের নাম ছিল "Cat-O'-nine-tails." এই বেতের পৃথক নয়টি চর্মরজ্জু থাকত, প্রত্যেকটি লম্বায় দু' ফিটের বেশী প্রায় হ'ত না এবং এই রজ্জুর তিন যায়গায় শক্ত গেরো থাকত। এক আঘাতের ফলে অপরাধীর গায়ের চামড়া কেটে রক্তের বন্যা বয়ে যেত। কোন এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, যেভাবে বাজপাখী শিকারের দেহের হাড় থেকে পরম উৎসাহের সঙ্গে মাংসপিণ্ড পৃথক করে নিয়ে ভোজন কার্য চালায় ঠিক সেইভাবেই এই সব "ক্যাট" মানুষের দেহ থেকে মাংসপিণ্ড পৃথক করে দিয়ে আইনের সম্মান রক্ষা করে চলত। বেতের সমস্ত শরীরটা রক্তের দাগে এমন আকার নিত যে, অনেক সময় প্রত্যক্ষদর্শীরা সেটার দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিজের অনিশ্চিত ভাগ্যের কথা বেশী ভাবতে পারত না। যারা দোষীকে বেত দিয়ে আঘাত করবার জন্য নিযুক্ত হ'ত তারা এর জন্য পারিশ্রমিক পেত এবং বংশানুক্রমে তারা তাদের ছেলেদের মানুষের দেহ থেকে কৌশলে মাংসপিণ্ড পৃথক করবার সহজ কলাকৌশল শিক্ষা দিত। যারা একাজে বেশ হাত পাকাত তাদের হাতেই বেতমারার ভার দেওয়া হ'ত। খুব ছেলেবেলা থেকে গাছের দেহ থেকে বাকল পৃথক করাটাই ছিল এদের প্রধান শিক্ষা। প্রথমে বেত নিক্ষেপ করা হ'ত বামদিক থেকে তারপর ডানদিক এবং সর্বশেষে মাথার উপর দিক থেকে। বহুদিনের অভ্যাসের ফলে এরা খুব কম সময়ের মধ্যে গাছের মোটা ছালকে কৌশলে পৃথক করে দিত। বহু আঘাতের ফলে মোটা শক্ত গাছের ছাল চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত।

মানুষের চামড়ার উপর নির্মমভাবে আঘাত করতে এতটুকুও তাদের ইতস্ততের কারণ ঘটত না।

বহু এমন ঘটনা হয়েছে যে, দোষী নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের চরম অবস্থার কথা স্মরণ করে শাস্তিভোগের পূর্বেই আত্মহত্যা দ্বারা জীবন শেষ করেছে এবং এই ধরণের ঘটনা ঐ সময়ে বেশীর ভাগই ঘটত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দু'শত থেকে সহস্রাধিক বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা হামেশাই দেওয়া হ'ত। কশাঘাত সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত একমাত্র মৃত্যু ছাড়া কোন অপরাধীকেই অন্য কোন অবস্থায় মুক্তি দেওয়া হ'ত না। অপরাধীর ক্ষত স্থান খুব গভীর হ'লে অথবা অপরাধী অচৈতন্য হয়ে পড়লে হাসপাতালে পাঠানর সুব্যবস্থা থাকত এবং যে মুহূর্তে ক্ষতস্থান নিরাময় হ'ত তৎক্ষণাৎ তাকে জোর করে বিচারক্ষেত্রে টেনে এনে বাকি বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করা হ'ত। বর্তমানে বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা থাকলেও নিষ্ঠুরভাবে অপরাধীর প্রাণ হরণ করা হয় না এবং খুব কদাচিৎ এর ব্যবস্থা দেওয়া হয়। ১৮৮১ সালের আর্মি অ্যাক্ট অনুসারে অপরাধী সৈন্যদের বেত্রাঘাত করা সম্বন্ধে যথেষ্ট সংযত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে এবং সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক শাস্তির যথেষ্ট লাঘব হয়েছে।

* * * *

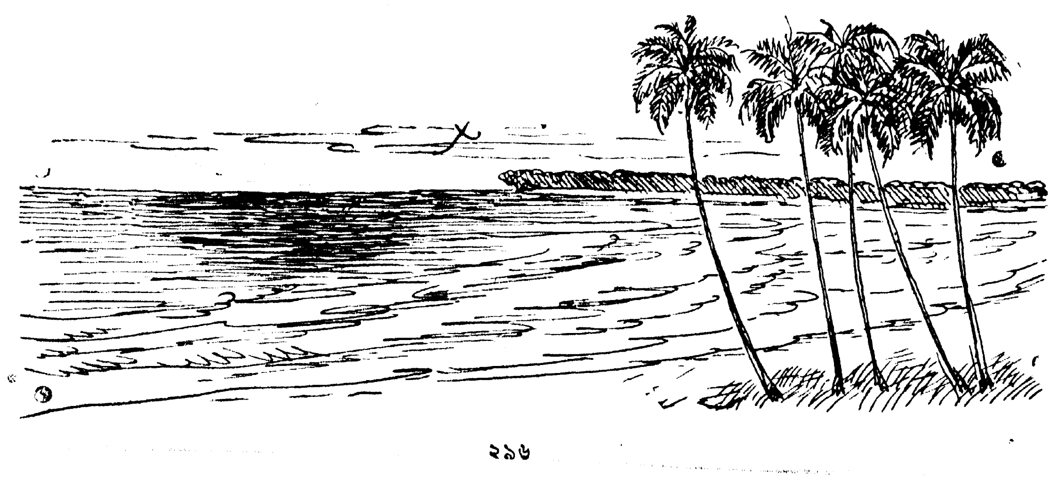
সাময়িক দৌর্বল্য হেতু ব্রিটিশেরা যুদ্ধের সময়ে নিজেদের নিয়ে কৌতুক করবার উৎসাহ পাচ্ছে না। ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধে "কমিক ম্যাগাজিন"গুলি অপর সকলের চেয়ে কৌতুকপ্রদ সংবাদ সরবরাহ করে পাঠকদের মনে বেশ রস জুগিয়েছিল এবং বর্তমানে কৌতুকপ্রদ সংবাদের একান্ত অভাব না হলেও একাধিক সাময়িক পত্রগুলি কার্টুন ছবি দিয়ে পাঠকদের সাময়িক দুর্বলতা দূর ক'রে উৎসাহ দিচ্ছে। বর্তমান যুদ্ধের দীর্ঘকাল সম্প্রসারণের ফলে কাগজের বাজার সব থেকে মন্দা হয়ে পড়েছে এবং এটা যে পুস্তক প্রকাশকদের পক্ষে মারাত্মক অবস্থা এটাই ছিল "পাঞ্চ" নামক বিলাতী পত্রিকার কার্টুন ছবির বিষয়বস্তু। চিত্রকর দেখিয়েছেন, একজন প্রকাশক এক বৃহৎ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লেখককে ফেরৎ দিয়ে বলছেন, বর্তমানে পাণ্ডুলিপির উপর আমাদের খুব বেশী আগ্রহ নেই তবে আমরা এই পাণ্ডুলিপির কাগজটার উপর সচ্ছন্দে আপনাকে একটা দর দিতে পারি।

* * * *

জামাইকা অধিবাসীদের বিবাহ উৎসবে কোন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করবার প্রথা আছে। বিবাহ উৎসবে তাঁর কাজ হ'ল নিমন্ত্রিতদের কাছে থেকে অর্থ সংগ্রহ করা। সাধারণত কোন রূপ-কথা শুনিয়ে প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তির কাছে অর্থের জন্য তিনি হাত পাতেন। সেখানকার প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেকই নিজেদের কাছে যে পরিমাণ অর্থ থাকে তা দান করে। এভাবে প্রত্যেকের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ হ'লে একটা সাদা বড় রুমালে তা বেঁধে বরবধূকে আনন্দধ্বনির মধ্যে উপহার দেওয়া হয়। একাজের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপহার দেওয়া হয় সুরাপূর্ণ একটি পাত্র।

* * * *

দক্ষিণ আফ্রিকার নেটিভ রাণীর কুড়িজন সখী থাকে। এই রাণীই হলেন ট্রান্সভালের বালোবেদু পার্বত্য জাতির সর্বময়ী কর্ত্রী। এই কুড়িজন সখী রাণীর সঙ্গে বাস করে; রাণীর অভাব অভিযোগ কোথায় তার তদারক করে; এককথায় বলতে কি এরাই রাণীর সঙ্গে সরকারীভাবে থাকবার ক্ষমতা পায়। রাণীর স্বামীর কিন্তু কোন সরকারী অধিকার থাকে না। অধিবাসীদের আইন অনুসারে তাকে বেনামে থাকতে হয়। তাকে এমনভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা হয় যে, রাণীর কে স্বামী এ গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহ করা একমাত্র তার মৃত্যুর পর ছাড়া সম্ভব হয় না। যেহেতু সে আইনত স্বামী নয় সেইহেতু সিংহাসনের দাবী করা তার সমস্ত ক্ষমতার বাইরে। রাণীর কুড়িজন সখীর স্বামীরাও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সেখানে এক অদ্ভুত প্রথা যে, রাণীর সঙ্গে ঐ কুড়িজন সখীর সরকারীভাবে বিয়ে দেওয়া হয়। এর কারণ এই যে, যদি কোন রাণীর মেয়ে না হয় অথবা মেয়ে না রেখে মারা যায় তাহলে ঐ কুড়িজন সখীর যে কোন একজন মেয়ে রাজ্যের সিংহাসন অধিকারের ক্ষমতা পাবে। এইভাবে সেখানে মেয়েদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে, পুরুষদের ক্ষমতাকে কোন দিনই তারা স্বীকার করে নেয়নি।



দেশ

৮ম বর্ষ] ১৫ই চৈত্র, শনিবার, ১৩৪৭ সাল। Saturday, 29th March, 1941 [২০শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভয় না ভরসা ?—

বাঙলায় নারী নির্যাতন ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে পুলিশ বাজেট সম্পর্কিত আলোচনায় স্বয়ং সেকথা স্বীকার করিয়াছেন। হক সাহেবের প্রদত্ত হিসাবে দেখা যায়, ১৯৩৮ সালে এই জঘন্য অপরাধের সম্পর্কে মামলার সংখ্যা ছিল ১০৭৫, ১৯৩৯ সালে ঐ সংখ্যা ছিল ১২২৩ এবং ১৯৪০ সালে নবেম্বর মাস পর্যন্ত মামলার সংখ্যা হইল ১১৯৯টি। এই সব মামলায় সাজা হয় কয়জনের, সে কাহিনী অধিকতর বিস্ময়কর; ১৯৩৮ সালে ১০৭৫টি মামলায় সাজা হয় মাত্র ২৭৩টি মামলায়, আর কয়েক বৎসরেরও সাজার হিসাব ঐ একই ধরণের। ১৯৩৮ সালের মামলাগুলিতে হিন্দু আসামীর সংখ্যা ছিল ৫৬৫ জন, আর মুসলমান আসামীর সংখ্যা ছিল ১২৭৬ জন। ১৯৩৯ সালে হিন্দু আসামীর সংখ্যা ছিল ১৬২ জন, আর মুসলমান আসামীর সংখ্যা ছিল ৩০৬ জন; কিন্তু ১৯৪০ সালে হিন্দু আসামীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৪৯ জনে; কিন্তু মুসলমান আসামীর সংখ্যা হঠাৎ বাড়িয়া একেবারে উঠিয়াছে ১৩০৬ জনে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী এই শ্রেণীর ঘৃণিত অপরাধে যাহারা অপরাধী, সেই সব পশুর তীব্র নিন্দা করিয়াছেন; কিন্তু আমরা কড়া ভাষায় সন্তুষ্ট নহি; কাজ কি হইতেছে, এই শ্রেণীর অপরাধকে উৎখাত করিবার জন্য? বাঙলার মোসলেম লীগের সিংহ-ব্যাঘ্রের শাসনে এই অপরাধ না কমিয়া ক্রমেই বাড়িতেছে কেন? বাঙলার প্রধান মন্ত্রী পুলিশের খরচা বাড়াইবার পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন। কিন্তু হক সাহেব নিজেই বলিতেছেন, "অস্বাভাবিক অবস্থাই বাঙলা দেশের স্বাভাবিক অবস্থা হইয়া উঠিতেছে।" নারী নির্যাতন সম্পর্কিত অপরাধ ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে। বাঙলার মন্ত্রীদের শাসনে প্রতি বৎসর পুলিশের ব্যয়ভার বাড়াইয়া বাড়াইয়া অবস্থার গতি যদি এইদিকেই হইয়া থাকে, তবে পুলিশের খরচা আরও বাড়াইলে ফল যে অন্যরূপ হইবে, এমন আশ্বাস জনসাধারণ কেমন করিয়া পাইবে? বাঙলার প্রধান মন্ত্রী তাঁহার বিবৃতিতে জনসাধারণের মনের সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই। অপরাধ না বাড়িয়া কমে নাই কেন, এ প্রশ্নের কোন জবাব, পুলিশ বিভাগকে পুষিতেছে যে সব করদাতা, তাঁহারা প্রধান মন্ত্রীর নিকট হইতে পায় নাই। কার্যত তাঁহারা দেখিতেছে যে, বৎসরের পর বৎসর পুলিশের ক্রমবর্ধমান বাজেটের সংগে সংগে নারী নির্যাতনের ন্যায় ঘৃণিত অপরাধ বাড়িয়াই যাইতেছে।

আগুনে বোমার আতঙ্ক—

কলিকাতা শহরে বোমা পড়িতে পারে, এ-সব কথা এতদিন পর্যন্ত তেমন গুরুত্ব সহকারে কেহই গ্রহণ করে নাই। কিন্তু কথার গুরুত্ব বাড়িয়াছে এবং গুরুত্ব বাজে হুজুগের দল বাড়ায় নাই, বাড়াইয়াছেন স্বয়ং বাঙলা সরকার। তাঁহারা এক ইস্তাহার জারী করিয়া বলিয়াছেন—"বিমান আক্রমণের সম্মুখীন হইবার জন্য এখনই প্রস্তুত হউন। কলিকাতা শহরে হাজার হাজার আগুনে বোমা পড়িতে পারে; শুধু তাহাই নহে, আপনার ঘরেও পড়িতে পারে। তবে বোমা দেখে ভয় পাবেন না।" ভরসাই বা কি? কর্তারা ভরসা দিয়া বলিতেছেন—'বোমার উপর জল ছিটাইবেন না, তাহলে তাহারা ফাটবেও না, আর আপনার কোন অনিষ্টও করবে না; আপনা আপনি জ্বলে নিভে যাবে। পড়বার এক মিনিট পরে ঐগুলো আর কোন অনিষ্ট করবে না; তখন উত্তাপ ছাড়া আর কিছুই থাকে না।' এই সংগে প্রত্যেক বাড়িতে কয়েক বাল্‌তি জল এবং কয়েক বাল্‌তি বালু যোগাড় করিয়া রাখিতে বলা হইয়াছে। বোমার আগুন দাহ্য পদার্থে লাগিয়া যদি আগুন ধরে, সেইখানে জল ঢালিয়া তাহা নিভাও এবং বোমাটাকে বালু চাপা দাও। সহজ এবং সরল ব্যবস্থা—ঝঞ্ঝাট ভোগ কিছুই নাই; কিন্তু তবুও লোকের মনে কিন্তু থাকিয়া যাইবে। বোমা তো মন্ত্রের বলে আসিয়া পড়িবে না, কিংবা দুই হাজার মাইল দূর হইতে হাওয়ায় আসিয়া পড়িবে

না। বোমা ফেলিতে হইলে, কলিকাতা শহরের উপর শত্রুর উড়োজাহাজকে আসিতে হইবে। শত্রুর উড়োজাহাজ যাহাতে কলিকাতার উপর না আসিতে পারে, কর্তৃপক্ষ সেজন্য কি করিতেছেন, এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্তাহারে সে কথা কিছুই বলা হয় নাই, ইহাই হইতেছে বিস্ময়ের বিষয়।

বাঙলা সরকারের সতর্কতা—

সরকার বিমান আক্রমণ হইতে কলিকাতার পৌরজনকে রক্ষা করিবার কি ব্যবস্থা করিতেছেন, দেশবাসী জানে না। দেখা যাইতেছে, বাঙলা সরকার কলিকাতার বিভিন্ন বণিক সভার নিকট এই মর্মে এক সার্কুলার জারী করিয়াছেন যে, যাহাতে কোন কারখানার ফটোগ্রাফ, নক্সা এবং কলকব্জার অবস্থানজ্ঞাপক কিছু শত্রুপক্ষের হাতে না পড়ে, সেজন্য তাঁহারা যেন সতর্ক থাকেন। বিমান আক্রমণের আশঙ্কার সময় এ বিষয়ে সাবধান হওয়া আমাদের মতে একান্তই আবশ্যক। ঐ ধরণের উপকরণ যদি শত্রুপক্ষের হাতে যায়, তাহা হইলে লক্ষ্য নির্ধারণে তাহাদের সুবিধা হইবে। ওদিকে নয়াদিল্লীর সংবাদে দেখা যাইতেছে যে, বিমান আক্রমণের ফলে আহত ব্যক্তিদের দেহে রক্ত সঞ্চালনের দ্বারা চিকিৎসা চালাইবার উদ্দেশ্যে কলিকাতার রেড ক্রস সমিতির ব্লাড ব্যাঙ্ক বা রক্তদাতা সমিতির কাজ সম্প্রসারিত করা হইতেছে। বর্তমানে রক্তদাতাগণ বিনামূল্যে রক্ত দিবেন, ইহার পর হইতে রক্তদাতা স্বেচ্ছাসেবকদিগকে সামান্য পরিমাণে ফী দেওয়া হইবে। এসব সত্ত্বেও দেশের লোকের রক্ষা ব্যবস্থা এখনও অন্ধকারেই রহিয়াছে। সত্যই যদি আতঙ্কের কারণ ঘটিয়া থাকে এবং সরকারী ব্যবস্থায় বুঝা যাইতেছে যে, তেমন কারণ যথেষ্টই হইয়াছে। জাপানের দিক হইতেই আসুক, আর জার্মানির দিক হইতেই আসুক, আক্রমণের আশঙ্কা যখন দেখা যাইতেছে, তখন রক্ষা ব্যবস্থা বিস্তৃতভাবে দেশের লোককে জানান দরকার। বাঙলা সরকার আগুনে বোমা প্রতিরোধ সম্পর্কে যে ইস্তাহার জারী করিয়াছেন, তাহাতে রক্ষা ব্যাপারটা যতটা লঘু মনে করিতেছেন, দেশের লোকে তাহা মনে করিতে পারিতেছে না।

নারীর জাগরণ—

গত রবিবার নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের দক্ষিণ কলিকাতা শাখার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্তা নির্ঝরিণী সরকার সভানেত্রীর অভিভাষণে বলেন,—"প্রত্যেক মানুষই মানুষ; সে নারী হউক বা পুরুষ হউক, সে নিজে স্বাধীন হউক বা পরাধীন হউক, তাহার মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আছেই, আর যতই চাপা পড়িয়া থাকুক না কেন, মাঝে মাঝে তাহা মাথা তুলিয়া উঠিতে চায়, আর ইহাতেই মানুষ যে মানুষ, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই পরাধীন জাতি এবং উচ্চশ্রেণীর পীড়নে নিপীড়িত জনগণের ভিতর জাগরণ সম্ভব হইয়াছে, ইতিহাসে আমরা ইহার পরিচয় পাই। স্বাধীনতার পথে অশেষ বাধা, কিন্তু সেই বাধাই স্বাধীনতাকে জাগাইয়া তোলে। স্বাধীনতার তখনই বিকাশ হয়, যখন আমরা বাধার সম্মুখীন হই। ভারতীয় নারী সমাজে তাঁহাদের বিকাশের পথে যে সকল বাধা পথ রোধ করিয়া আছে, তাহার ভিতর সর্বাপেক্ষা প্রবল বাধা তাঁহাদের নিজেদের উপর অবিশ্বাস, তাঁহাদের নিজের অক্ষমতা সম্বন্ধে বোধ এমন সংস্কারগত হইয়া পড়িয়াছে যে, কিছুতেই তাঁহারা সাহস করিয়া নিজে পা বাড়াইতে পারেন না। তাই সঙ্ঘবদ্ধভাবে উন্নতির প্রচেষ্টাকে আমরা প্রথমে অভিনন্দন করি। ইহার শুভ ফল কেবল নারীগণকে নয়, সমস্ত জাতিকেই দুর্বলতা হইতে সবলতার পথে চালিত করিবে।" মানুষ যেখানে মানুষের স্বাধীনতাকে বাধা দেয়, সেখানে সে লাভবান হইতে পারে না, পক্ষান্তরে নিজেই হয় বিড়ম্বিত। সে যাঁহাদের স্বাধীনতা হরণ করে, তাঁহারাই পরে তাহার পক্ষে বোঝা হইয়া দাঁড়ায় এবং যে প্রভুত্ব মোহে সে বিভ্রান্ত হইয়াছিল, সেই প্রভুত্ব হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাকে দাসের জীবনে বদ্ধ করে। এদেশের সমাজেরও হইয়াছে সেই অবস্থা। সমাজের অর্ধেক অংশ যে নারী, সেই নারীর স্বাধীনতাকে ভারতবর্ষ যেদিন ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, সেইদিন পরোক্ষভাবে পরাধীনতার নাগপাশ সে নিজের হাতেই গড়িয়াছে। নারীর দুর্বলতা ভারতের সমাজকে করিয়াছে দুর্বল। অন্ধ সংস্কারকে কাটাইয়া উঠা বড় কঠিন, যুক্তিবুদ্ধির পাকে পাকে জড়াইয়া তাহা স্বচ্ছ বিচারকে অভিভূত করিয়া ফেলে। নারীর স্বাধীনতা সম্বন্ধে সে অভিভব এদেশের সমাজের এখনও কাটে নাই। কিন্তু জাতিকে যদি বড় হইতে হয়, স্বাধীনতা অর্জন করিতে হয়, তবে সে অন্ধ কুসংস্কারকে অতিক্রম করিতে হইবে। অশিক্ষায় এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারে সমাজের নারী যদি প্রতি পদে ভূতের ভয়ে অভিভূত হইয়া থাকে, তবে নারীর নিকট হইতে শুধু অন্ধ ভক্তির অবদানে জাতি পুষ্ট হইতে পারিবে না, সেই ভূতের ভয় জাতির সন্তানদিগকেও পৌরুষহীন করিবে এবং পরাধীনতার লাঞ্ছনাকে করিবে সুনিশ্চিত। এদেশের নারীকে আজ জাগিতে হইবে এবং বিশ্বের চিন্তা-ধারার সংগে যুক্ত হইয়া নিজেদের বুঝিয়া চলিবার শক্তি তাহাদের অর্জন করিতে হইবে। শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সরকারের উক্তি সমর্থন করিয়া আমরাও বলি—'ইহার শুভ ফল কেবল নারীদিগকে নয়, সমস্ত জাতিকেই দুর্বলতা হইতে সবলতার পথে চালিত করিবে।"

ইউরোপে জাপ প্রধান মন্ত্রী—

জগৎজোড়া বড় একটা আন্তর্জাতিক আলোড়নের কালে জাপানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ মাৎসুওকা ইউরোপ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। তিনি প্রথমে মস্কো গিয়াছেন, তথা হইতে বার্লিন ইতালি প্রভৃতি দেশে যাইবেন। মিঃ মাৎসুওকার এই শফরের উদ্দেশ্য কি—তাঁহার নিজের মুখেই প্রকাশ। তিনি মস্কোতে গিয়া সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বলেন, ব্যক্তিগতভাবে আলাপ পরিচয়ের ভিতর দিয়া কখন কখন যুদ্ধ অথবা শান্তির সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে। জাপান আজ এই যুদ্ধ ও

শান্তির সমস্যার মধ্যে পড়িয়াছে। জাপানের প্রধান মন্ত্রী আগাগোড়াই বলিয়া আসিতেছেন যে, তাঁহারা জার্মানি ও ইতালির সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ এবং এই সন্ধির সর্তের সংগে জাপানের এশিয়া সম্পর্কিত স্বার্থের নিশ্চয় কোন সম্পর্ক আছে। নহিলে নিরর্থক কেহ কোন শক্তির সংগে সন্ধি করিতে যায় না এবং জাপানও যায় নাই। জাপানের এই এশিয়া সম্পর্কিত স্বার্থের সম্প্রসারণের অর্থই হইল, ইংরেজ এবং আমেরিকার বর্তমান স্বার্থের সংগে কতকটা সংঘাত। এই দিকে অগ্রসর হওয়া জাপানের পক্ষে কতটা সমীচীন হইবে, বার্লিন, রোম এবং মস্কোতে সে সম্বন্ধীয় বলাবল বুঝিবার জন্যই মিঃ মাৎসুওকা ইউরোপে গিয়াছেন। এ সত্য আজ আর লুকানো নাই যে, জাপান দক্ষিণ দিকে তাহার রাজ্যসীমা বাড়াইতে চায়। টংকিন উপসাগর হইতে শ্যাম উপসাগর পর্যন্ত জাপান তাহার গণ্ডী বাড়াইয়াছে এবং ফরাসী হিন্দুচীনকেও নিজের প্রভাবের মধ্যে লইতে চেষ্টায় আছে। তাহা ছাড়া, অর্থনীতির সুবিধার নামে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও সে চায় নিজদেরে প্রভুত্ব। জাপানী সংবাদপত্রসমূহ মালয় এবং ব্রহ্মদেশের অছিগিরি পর্যন্ত দাবী করিতেছে। এদিকে ইংরেজ এবং আমেরিকাও প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। সিংগাপুরের চারিদিকের সমুদ্র আজ মাইনের দ্বারা সুরক্ষিত; অস্ট্রেলিয়ার সৈন্য-সামন্ত প্রস্তুত, মালয় দ্বীপে ইংরেজ সেনাদল সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। আমেরিকাও এ সব বিষয়ে পিছনে নাই, সে প্রশান্ত মহাসাগরের জন্য নূতন নৌবহর গঠন করিতেছে, গুয়ামের দ্বীপে নৌবহরের ঘাঁটি দৃঢ় করা হইতেছে। আমেরিকা হইতে বিমানবীরগণ চীনে এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাইতেছে জাপানের ভবিষ্যৎ আক্রমণ এড়াইবার উদ্দেশে। পূর্ব এবং পশ্চিমের এই যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, এই সমস্যায় জাপানের সুবিধা হইবে কিসে, ইহা দেখিবার জন্যই মিঃ মাৎসুওকার এ শফর।

যুগোস্লাভিয়ার রাজনীতি—

যুগোস্লাভিয়াকেও অবশেষে জার্মানির দলে যোগদান করিতে হইল। যুগোস্লাভিয়া বল্কান শক্তিবর্গের মধ্যে একটি প্রধান শক্তি। রুশিয়া নাকি যুগোস্লাভিয়াকে ত্রিশক্তির সংগে যোগ দিতে নিষেধ করিয়াছিল এবং জানাইয়াছিল যে, তাহা হইলে যুদ্ধ বল্কানে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে; কিন্তু বুলগেরিয়ার ক্ষেত্রেও রুশিয়ার এইরূপ সতর্কবাণীর কথা শুনা গিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে রুশিয়ার এই সতর্কবাণী এবং ব্রিটিশের সদুপদেশ সত্ত্বেও যুগোস্লাভিয়াকে জার্মানির পক্ষে যোগ দিতে হইয়াছে। প্রথমে রুমেনিয়া এবং তৎপরে বুলগেরিয়া জার্মানি দখল করিয়া ফেলিবার পর যুগোস্লাভিয়ার পক্ষে অন্য উপায় আর ছিল না। গ্রীস, তুরস্ক, এই দুই শক্তির সংগে যুগোস্লাভিয়ার সন্ধি আছে বটে; কিন্তু গ্রীস আজ ইতালিয়দের সংগে যুদ্ধে জড়িত এবং মনে হয় যে, তুরস্ককে জার্মানেরা কিছুতেই ঘাটাইতে যাইবে না। যুগোস্লাভিয়ায় জার্মানির প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর গ্রীসের সীমান্ত দেশ জার্মানির পক্ষে উন্মুক্ত হইল। গ্রীস সীমান্তের দিকে জার্মান বাহিনীর অগ্রগতির সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। ইহা সত্ত্বেও মনে হয় যে, বল্কানের এই লড়াই আরও কিছু দিন ঢিমেতেতালা গতিতে চলিতে থাকিবে এবং জার্মানি আটলাণ্টিক মহাসাগরে উপদ্রব চালাইয়া আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে যাহাতে সমরোপকরণের সাহায্য না আসিতে পারে, সেই চেষ্টার উপরই জোর দিবে বেশী। মোটের উপর দেখা যাইতেছে, জার্মানি বল্কানে যে চক্র সৃষ্টি করিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে রুমেনিয়া, বুলগেরিয়া এবং যুগোস্লাভিয়া, এই তিনটি শক্তিই তাহার মধ্যে পড়িল এবং পড়িল যে নিজেদের ইচ্ছায় তাহাও নহে, জার্মান প্রভুত্বের প্রতিরোধ করিয়াও জার্মানির প্রভাব তাহারা এড়াইতে পারিল না। যুগোস্লাভিয়ার ত্রিশক্তিতে যোগদানের পরও রুশিয়ার নীতির কোন পরিবর্তন ঘটিবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। জার্মানি তুরস্কের উপর কি চাল চালে, ইহাই হইতেছে এখন সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পঞ্চাশ বৎসরের ফের?—

সরকারী তহবিলে যথেষ্ট অর্থ নাই, এইজন্য প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ সম্ভব হইতেছে না; এতদিন বাঙলার মন্ত্রীদের মুখে মামুলী যুক্তি শুনিতাম। কিন্তু সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রধান মন্ত্রী এক নূতন কথা শুনাইয়াছেন। তিনি বলেন, সমস্যা শুধু অর্থাভাবেরই নয়, যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষিত গুরুমহাশয়েরও অভাব। যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষাপ্রাপ্ত গুরু যখন জুটিতেছে না, তখন অশিক্ষিত গুরুদিগকে লইয়া প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারিত করিতে গেলে, শুধু টাকার অপচয়ই হইবে। বর্তমানে বৎসরে তিন হাজার শিক্ষাপ্রাপ্ত গুরু পাওয়া যায়, এই হিসাবে সমগ্র বাঙলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করিতে গেলে, ১,৪৮,০০০ গুরুর দরকার হইবে এবং এই গুরুর সংখ্যা পূর্ণ হইতে লাগিবে ৫০ বৎসর; সুতরাং আপাতত প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের বালাই হক সাহেবের এই এক উক্তি হইতেই চুকিয়া গিয়াছে।

প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতির ব্যর্থতা—

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক এবং অর্থসচিব মিঃ সুরাবর্দী পাকিস্থান দিবস বাঙলা দেশে প্রতিপালন স্থগিত রাখিবার বিবৃতি প্রচার করেন এবং বাঙলা সরকার একটি বিশেষ ইস্তাহারে ইঁহাদের সে সিদ্ধান্তের জন্য সন্তোষপ্রকাশ করেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও

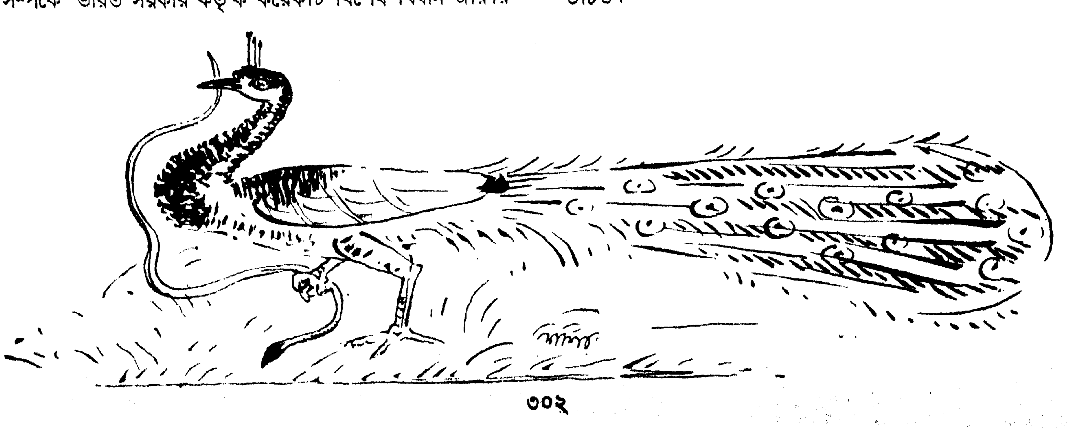
একজন অবাঙালী মুসলমানকে সভাপতি করিয়া কলিকাতায় পাকিস্থান দিবস প্রতিপালনের সভা হইয়াছে। বাঙলার লীগ-ওয়ালাদের পরিচালিত ইংরেজী দৈনিকে গর্বের সঙ্গে বলা হইয়াছে যে, কোয়াদে আজম জিন্না সাহেবের হুকুম অনুসারে কলিকাতায় এবং বাঙলার সর্বত্র পাকিস্থান দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে। মৌলবী ফজলুল হক এবং মিঃ সুরাবর্দীর কথার উপরে জিন্না সাহেবের কথাই বাঙলা মুল্লুকে মর্যাদা পাইয়াছে। বাঙলা সরকারের ইস্তাহারটি অবশ্য পারিভাষিকভাবে বিচার করিলে বিধান বা আইন নয়; সুতরাং পাকিস্থান দিবসের সভা হয়ত সে দিক হইতে বেআইনী হয় নাই, কিন্তু এই ইস্তাহারে স্পষ্ট ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, হক সাহেব এবং মিঃ সুরাবর্দী যদি বাঙলা দেশে পাকিস্থান দিবস স্থগিত না রাখিতেন, তাহা হইলে দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া বাঙলা সরকার, এস্থলে বলিতে হয়, বাঙলার গভর্নর, ঐ সম্পর্কে সভা সমিতি নিষেধ করিয়া বিধান জারী করিতেন। সাধারণ লোকের আইনের পারিভাষিক জ্ঞান নাই, তাহাদের মনে যদি এই ধারণা হয় যে, বাঙলা সরকার যাহা চাহেন, মুশ্লীম লীগের মন্ত্র দীক্ষা পাইলে তাহা অনায়াসে অমান্য করা যায়, লীগওয়ালারা যাহা খুসী করিতে পারে, তবে দেশের আইন ও শান্তিরক্ষার পক্ষে তাহা বিপজ্জনক হইবে। এই ব্যাপারের পর বাঙলার প্রধান মন্ত্রী এবং অর্থসচিব কি করেন দেখিবার বিষয়; কারণ বর্তমান অবস্থায় যে কাজ করা বাঙলাদেশের পক্ষে অনুচিত বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই কৃত হইয়াছে। তাঁহাদের কথাকে কোন মূল্য দেওয়া হয় নাই। তাঁহারা এই অবস্থাকে যদি স্বীকার করিয়াও লীগের সহিত সংশিলষ্ট থাকেন, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাদের আত্মমর্যাদাবোধ এবং স্বতন্ত্রচিত্ততা বলিতে কিছু নাই।

'হরিজনের' পুনঃপ্রকাশ—

আগামী ৩০শে মার্চ হইতে মহাত্মা গান্ধীর 'হরিজন', 'হরিজন বন্ধু' এবং 'হরিজন সেবক' এই তিনখানা সাপ্তাহিক পত্র পুনরায় প্রকাশিত হইবে। সত্যাগ্রহের সংবাদ প্রকাশ সম্পর্কে ভারত সরকার কর্তৃক কয়েকটি বিশেষ বিধান জারীর পর এই কয়েকখানা পত্রিকা মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছাক্রমে বন্ধ ছিল। সরকার মহাত্মা গান্ধীকে স্বাধীন মত প্রকাশে কতটা সুযোগ দিয়াছেন জানা যায় না; তবে রফা একটা কিছু হইয়াছে বুঝা যায় এবং মহাত্মা গান্ধী সম্ভবত 'হরিজনে'র প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা কয়েকখানার পুনঃপ্রকাশের কারণ উল্লেখ করিতে গিয়া সে সম্বন্ধে কিছু আলোকসম্পাত করিবেন। 'হরিজনে'র পুনঃপ্রকাশে দেশবাসী মাত্রেই আনন্দিত হইবেন। শুধু রাজনীতিক মতের দিক হইতে নয়, সাহিত্যের দিক হইতেও মহাত্মাজীর লেখার একটা বিশেষ মূল্য আছে। মহাত্মাজীর সঙ্গে যাঁহাদের রাজনীতিক মতের বিরোধ, তাঁহারাও একথা স্বীকার করিয়া থাকেন। গান্ধীজীর ন্যায় ক্রান্তিদর্শী মহামনীষীর মনন-সম্পদ হইতে জগৎ যদি বঞ্চিত থাকে, তাহা হইলে তাহার যে গুরুতর ক্ষতি ঘটে, একথা কে অস্বীকার করিবে? ভারতের এই সর্বজনমান্য নেতার বাণী বিশ্বজগতের কাছে পৌঁছিলে লাভ যে শুধু ভারতেরই হইবে তাহা নয়, বিশ্ববাসী লাভবান হইবে।

ভারতের জাতীয় ভাষা—

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দেব প্রয়াগ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে 'ভারতের জাতীয় ভাষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধটি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক দেব মহাশয় হিন্দী, উর্দু, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন ভাষার সহিত বাঙলা ভাষার তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া বাঙলা ভাষাই যে ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা হইবার সর্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন; হিন্দীর পক্ষপাতীরা এই সম্পর্কে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া আন্দোলন চালাইতেছেন এবং তাঁহাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন মহাত্মাজী নিজে। কংগ্রেসের জোর হিন্দীওয়ালারা পাইতেছে সমস্ত ভারত জুড়িয়া; কিন্তু বাঙলার পিছনে সে জোর নাই। বাঙালীর সেজন্য চেষ্টাও তেমন নাই। অধ্যাপক দেব লিখিয়াছেন—"এই বিষয়ে আমাদের আন্দোলন অবিশ্রান্তভাবে চালাইতে হইবে। হাজীরে না থাকার দোষে আমরা যেন সে মোকদ্দমা না হারাই।" বাঙালীদের তরফ হইতে আন্তরিকতার সঙ্গে এজন্য আন্দোলন হওয়া উচিত।



ভবিষ্যতের ভরসা

বাঙলার সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থান ছিল একদিন নবদ্বীপ। স্যার আশুতোষও নদীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব করিয়া গিয়াছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে মোটা থামওয়ালা একটা বড় বাড়ী অবশ্য বুঝায় না। বড় বড় মনীষীকে কেন্দ্র করিয়া নবদ্বীপে একদিন বিদ্যা বিতরণ চলিত এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিদ্যার্থিগণ আসিত এই নবদ্বীপে। কিন্তু এই যে নবদ্বীপ, বর্তমানে এখানে গেলে প্রথমেই লক্ষ্য হইবে সংস্কৃতির একান্ত অভাবকে। নবদ্বীপে যে কয়েকটি পাঠাগার আছে, তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল এ্যাংলো-সংস্কৃত পাঠাগারটি। এ পাঠাগারও নিতান্তই সাধারণ গোছের এবং মামুলী ধরণের প্রতিষ্ঠান। কয়েকখানা হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ আছে এই পাঠাগারে; কিন্তু যে বৈষ্ণব সংস্কৃতির জন্য নবদ্বীপ খ্যাতি লাভ করিয়াছে, সেই বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কিত পুঁথির এবং পুস্তকের এখানেও অভাব। [illegible]ায়, সংস্কৃতিকে প্রসারিত করিতে হইলে যেমন পুঁজির দরকার, তেমন পুঁজি এই পাঠাগারের নাই; সুতরাং তেমন প্রচেষ্টাও কিছু হইতেছে না। বাঙলা সরকার পাঠাগারের সংস্কৃত পুঁথি বিভাগের জন্য মাসিক দশ টাকা সাহায্য করিয়া থাকেন, আগে আরও বেশী কিছু সাহায্য করিতেন; কিন্তু কৃপাপরবশ হইয়া এখন তাহা অর্ধেকে নামাইয়াছেন। নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্য এই পাঠাগারে মাসে পঁচিশ টাকা মাত্র। নবদ্বীপ শহরের কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে; পথঘাট ভাল হইয়াছে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়াছে; অন্যদিকের এই সব উন্নতি সত্ত্বেও সংস্কৃতির দিকটা সমানভাবে উপেক্ষিতই রহিয়াছে এবং সেজন্য বিশেষ কোন আগ্রহ বা যত্ন যে কাহারও আছে, এমন মনে হয় না। গতানুগতিক জীবনের ধারাই বহিয়া চলিয়াছে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ কেন্দ্রের মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে কূপমণ্ডূকের জীবন। যে নবদ্বীপ মানুষকে ভালবাসিবার মন্ত্রের একদিন ছিল দীক্ষাদাতা তাহার এই অবস্থা দেখিলে কাহার মনে না দুঃখ হয়?

মানুষকে ভালবাসা তো দূরের কথা, মানুষকে না ভালবাসা এবং অপ্রেমই নবদ্বীপের জীবনকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। সে জীবনের চারিদিকে যেন অপরিসীম একটা কুণ্ঠা এবং অনুদারতা। আত্মীয়তার আশ্বস্তি সাধারণের পক্ষে এখানে পাওয়া কঠিন। অবশ্য, সাধকের জীবন অবলম্বন করিয়া এবং সেই সাধনার প্রভাবে একটা বিশিষ্ট ভাবকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা জীবনযাপন করিতেছেন, তাঁহাদের সে জীবনে একটা অনপেক্ষতা আছে এবং নবদ্বীপে তেমন লোক হয়ত আছেন; কিন্তু তাঁহারা দুই একজন। বাহির হইতে যাঁহারা নবদ্বীপে যান, তাঁহারা অন্ততপক্ষে ব্যবহারিক জীবনে সেই সব অনপেক্ষ সাধকের আপ্যায়ন লাভ করিবার অবসর পান না; তাহাদিগকে স্বার্থ এবং সংকীর্ণতা, এক কথায় অসংস্কৃতির স্পর্শই একান্তভাবে পাইয়া নবদ্বীপ হইতে ফিরিতে হয়।

তীর্থযাত্রীর আয় নবদ্বীপের কম আয় নহে। কিন্তু এই সব তীর্থযাত্রীর জন্য ভাল আশ্রয়স্থানও নবদ্বীপে নাই। দুইটি ছোট গোছের ধর্মশালা আছে, তাহাতে গরীবের বিশেষ কিছু সাহায্য হয় বলিয়া মনে হয় না। রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, নবদ্বীপ সেবক সমিতি এবং রাধারমণ সেবাশ্রম প্রভৃতি কয়েকটি সেবক সঙ্ঘ নবদ্বীপে আছে। রাধারমণ সেবাশ্রমের কাজ সুশৃঙ্খলিতভাবে হইয়া থাকে এবং নবদ্বীপের মধ্যে এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। স্বর্গীয় কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন মহাশয় সেবাশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এখনও এই সেবাশ্রম নবদ্বীপে সেবার ধারাকে প্রবাহিত রাখিয়াছে। অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠানে যেমনটি হওয়া দরকার, তেমন কাজ হইতেছে বলা যায় না। যদি তেমন কাজ হইত, তাহা হইলে বিগত দোলযাত্রার চন্দ্রগ্রহণের এত বড় একটা যোগের সময় তাহাদের কাজের পরিচয় আমরা পাইতাম। নবদ্বীপ সেবক সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণকে স্নানের ঘাটে আমরা কাজ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু অন্য কোন সেবা সমিতির স্বেচ্ছাসেবকদের গতিবিধি আমাদের নজরে পড়ে নাই।

সেবক সমিতির স্বেচ্ছাসেবকমণ্ডলীর তরুণেরা একদিন আমাদের ডাকিয়া নিজেদের আড্ডায় লইয়াছিলেন এবং আমাদের উপদেশ চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে আমাদের প্রাণের কথা বলিয়াছি, তাহা এই যে, মানুষের প্রতি অমর্যাদার যে আবহাওয়া বহিতেছে, সেই বিষাক্ত বায়ু তাঁহারা সত্যকার সবল সেবানিষ্ঠায় দূর করুন। গোঁজামিলে এ কাজ হয় না, প্রাণের আবেগ এ কাজে থাকা দরকার। স্বার্থ-সংকীর্ণতার পাক যুক্তি-বুদ্ধিকে জড়াইয়া না ধরে এমন মনের বল চাই এক্ষেত্রে। বহুদিন ধরিয়া স্বার্থের যে সব ঘাঁটি শক্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে আঘাত করিতে হইলে সাহসের দরকার। প্রধান অন্তরায় হইল এক্ষেত্রে ধর্মের গোঁড়ামির। এই গোঁড়ামি বিচারবুদ্ধির স্বচ্ছতা নষ্ট করিয়া ফেলে এবং সত্যকে সোজাসুজি স্বীকার করিতে দেয় না। বৃহত্তর স্বার্থের সম্ভাবনা সুনিশ্চিত বুঝিলেও মন ক্ষুদ্র স্বার্থের বেষ্টনীকে অনিবার্য বলিয়া বুঝে, ক্ষুদ্রকে ছাড়িয়া বড়কে ধরিতে সে হয় সংকুচিত।

ধর্মবিচার আর ধর্মবোধ ঠিক এক জিনিস নয়। ধর্মবিচারের অভাব আমাদের নাই। শাস্ত্রের যুক্তি ও সিদ্ধান্ত দিয়া তাহা বুঝাইবার মত লোক অনেকেই আছেন। এদেশের পথেঘাটে যত্রতত্র, এই ধর্মবিচারের অভাব তো দেখা যাইবেই না; বরং দেখা যাইবে বাড়াবাড়ি; কিন্তু বোধ আছে কয়জনের? বিচার জীবনে পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না, পরিবর্তন ঘটায় ধর্মবোধে। স্বার্থ এবং সংকীর্ণতার ঘুণ যদি একবার মনের উপর ধরে, তাহা হইলে বিচারের কথার খৈ মুখে দিয়া যতই ফুটুক না কেন, মনের উপর দাগ তাহাতে বসে না। এই যে মিথ্যাচার, এই মিথ্যাচার জাতিকে আজ আড়ষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। বাহিরের আচার-অনুষ্ঠান ভিতরের অভাবকে পূরণ করিতে পারিতেছে না, বরং ভিতরের স্বার্থের বুভুক্ষাকে পরিতৃপ্ত করিবার উপায় স্বরূপেই সেগুলি প্রযুক্ত হইতেছে, দাঁড়াইয়াছে দস্তুরমত ব্যবসাদারীতে।

এই যে সংকটজনক অবস্থা, এই অবস্থা হইতে দেশকে উদ্ধার করিতে পারে একমাত্র দেশের তরুণদল। কারণ, তাহাদের চিত্ত ক্ষুদ্র বিষয়-বিচারের সম্পর্ক হইতে মুক্ত আছে এবং সেজন্যই তাহারা সহজে এবং সোজাসুজি বড় আদর্শকে ধরিতে পারে। মুক্ত মনের সঙ্গে আদর্শের একান্ত এবং প্রত্যক্ষ এই যে যোগ, এখানে একটা আনন্দ আছে। মন এই আনন্দের স্পর্শ সেখানে পায় এবং পায় বলিয়াই জাগে মনস্বিতা। মনস্বিতাই অভয়ত্বের আশ্রয়।

মানুষের মনুষ্যত্বকে অবমাননা, গোঁড়ামিকে উপায় স্বরূপে অবলম্বন করিয়া সেই অমর্যাদা হইতে স্বার্থসিদ্ধির যে ব্যাপার বাঙালীর সমাজজীবনে আজিও চলিতেছে, তাহা দেখিয়া সত্যই চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠে। জানি, এই সব অনাচারকে বাধা দিতে গেলে ধর্মহানির ধুয়া উঠিবে। 'এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়' এ ধুয়া আগেও উঠিয়াছিল। কিন্তু দেশের স্বার্থ এবং জাতির স্বার্থের দিক হইতে ইহাকে চাপা দিবার উপায় আর নাই। বাঙলার তরুণেরা দেশের স্বার্থ এবং জাতির স্বার্থ এখনও বুঝে, বৃহৎ আদর্শের প্রেরণা আজও তাহাদের মনের গোড়া ধরিয়া নাড়া দেয়; মনের গোড়ায় তাহাদের ক্ষুদ্র স্বার্থের পাঁক বসে নাই, এই জন্যই তাহাদের দ্বারাই এ অবস্থার প্রতীকার হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

ব্যথা বুকে লাগে বলিয়াই এসব কথা বলিতে হয় এবং এসব কথা বলিতে গেলে যে কতকটা অপ্রিয় হইতে হয়, ইহাও আমাদের জানা আছে। 'অপ্রিয়স্যাপি পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা হি দুর্লভঃ',

আত্মীয়তার পরিবেশে পুষ্ট যে স্পষ্টতা তাহাকে ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারে খুব কম লোক। যাহারা স্বার্থের পুঁজি বাগাইয়া বসিয়াছে তাহাদের রায়ে সায় দিলে বাহবা সস্তায় পাওয়া যায়, ইহাও সত্য; কিন্তু সেক্ষেত্রে চিত্তের যে দৈন্য এবং গ্লানি তাহাকে চাপা দিয়া চলাও কঠিন। যদি এই কঠিনতাটুকু না থাকিত, তাহা হইলে মানুষের মনুষ্যত্ব বলিয়া কোন জিনিষ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর হইত। ধর্মবুদ্ধির ভিত্তি হইল এইখানেই। তরুণদের মধ্যে এই বুদ্ধি দৃপ্ত হইয়া উঠুক। মানুষের অমর্যাদাকে যেন তাহারা স্বীকার করিয়া না লয়। কাজে মানুষের মর্যাদাকে আঘাত করিয়া তাহাকে ঢাকা দিবার জন্য যে চাতুর্য চলিতেছে তাহাদের সরল এবং সবল চিত্ত যেন তাহাতে বিভ্রান্ত না হয়। অন্যায়কে তাহারা যেন সোজাসুজি অন্যায় বলিয়া বুঝে এবং তাহা যাহাতে দূর হয়, তাহারা সেইভাবে কাজ করিতে পারে।

মানুষের প্রতি অমর্যাদা, সেবার ভাবের অভাব, নবদ্বীপে কয়েকদিনে আমাদের চোখে স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। তীর্থযাত্রীদের আয় নবদ্বীপের মন্দিরগুলির প্রধান আয়। কিন্তু এই সব তীর্থ-যাত্রীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য মন্দিরগুলির কর্তৃপক্ষ কি করিয়াছেন আমরা জানি না। পক্ষান্তরে তাহাদের উপর উপেক্ষার ভাবই সকল দিকে। বাঙলাদেশের দূর অঞ্চল হইতে দলে দলে নরনারী মন্দিরগুলির দুয়ারে আসিয়া জড় হইয়াছে, এই সব সরল-চিত্ত নরনারীর শ্রদ্ধা এবং ভক্তির গভীরতা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু মন্দিরের কর্তাদের অন্তরে সে জিনিষ যে আছে, কাজে ইহা বুঝিবার উপায় নাই। যাঁহারা শিক্ষিতাভিমানী, তাঁহারা পর্যন্ত, ইহাদের সেবাকে উপেক্ষা করিতেছেন, ইহা আরও আশ্চর্য। মন্দিরে গিয়া এই সব যাত্রী যাহাতে একটু আদর-যত্ন পায় এবং তাহাদিগকে কোন অসুবিধায় পড়িতে না হয়, উৎসব বা পর্ব প্রভৃতিতে তরুণদের সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। সে সব ব্যাপারে কলিকাতায় স্বেচ্ছাসেবকগণ যেভাবে কাজ করিয়া থাকেন, নবদ্বীপে যে কয়েকটি সেবা প্রতিষ্ঠান আছে, তাঁহারা সেইভাবে কাজ করিতে পারেন।

ভেটের ব্যবস্থা নবদ্বীপে বড় একটা কলঙ্কের বিষয়। এই ব্যবস্থার সমর্থক লোকের অভাব নাই এবং ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলেই তাঁহারা উত্তেজিত হইয়া উঠেন। শাস্ত্রজ্ঞান ইহাদের কাহারও কম নয়। যে বৈষ্ণবধর্মকে ভাঙাইয়া তাঁহারা চলেন, সেই সেই বৈষ্ণবধর্মে বিগ্রহ সেবায় ভিন্নদৃষ্টি তীব্র ভাষায় নিন্দিত হইয়াছে। ভাগবতের দেবহূতি কপিল-কথাও তাঁহাদের অবিদিত নয়। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এবং একমাত্র যুক্তি এই যে, এই ভেটের ব্যবস্থা না হইলে সেবা চলে কি করিয়া? সেবার প্রবৃত্তি যেখানে উগ্র এবং অত্যন্ত সেখানে অবশ্য ব্যবহারিক বিধিবিধান এবং ন্যায়ান্যায়ের যুক্তিও টিকে না। সেবার দায়ে ভক্ত সব করে। দাক্ষিণাত্যের প্রেমোন্মাদ আলোয়ারগণের জীবনে এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কিন্তু তেমন সেবা, অকৈতব সে বস্তু, হেন প্রেম নৃলোকে না হয়। সেবার সে প্রেরণার মধ্যে ক্ষুদ্র স্বার্থের গন্ধ থাকিতে পারে না। সে সেবা কোথায়? সে সেবা, যাহার সেবা, তাঁহার সেবকের মহিমাও বাড়ায়। যাঁহারা সেবার দায়ে ভেটের যুক্তি দেখান, তাঁহারা যদি জাতিধর্মনির্বিশেষে সেবকের মর্যাদা বুঝিতেন এবং আদরযত্নে—সে মর্যাদার পরিচয় দিতেন, তাহা হইলেও দুঃখ করিবার কিছু থাকিত না।

তার পরের কথা এই যে, সেবা চালাইবার জন্যই যদি একান্ত প্রয়োজন হয়, তবে ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণ এই দুইয়ে পার্থক্য কেন? সকলের পক্ষেই দর্শনী সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। প্রকৃত যিনি ব্রাহ্মণ তিনি এই ভেদদৃষ্টির আবহাওয়ার মধ্যে মর্যাদা পান না। ব্রাহ্মণদেরও যেমন মর্যাদা আছে, বৈষ্ণবেরও তেমনই মর্যাদা আছে এবং সে মর্যাদা সামান্য নয়, বর্ণাশ্রমীরাও ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আমরা মানুষ হিসাবে মানুষের মর্যাদাকে স্বীকার করি, যাঁহারা তাহা করেন না, তাঁহাদের জন্যই উপরের কথা-গুলি বলিতে হইল। বাঙালীর জাতীয় জীবনে সংহতিশক্তি এমনই নানাদিক হইতে ছিন্ন হইতে বসিয়াছে; তাহার উপর বাহির হইতেও সেজন্য প্ররোচনা এবং পরিপোষকতা কম আসিতেছে না, এমন অবস্থায় বিশেষ শ্রেণীর প্রতি মর্যাদা জোর করিয়া আদায় করিবার চাপ সমাজের পক্ষে শুভকর হইতে পারে না এবং প্রত্যক্ষ-ভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে পীড়নেরই প্রতিক্রিয়া আসিবে সে চাপের প্রভাবে।

স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কৃষ্ণনগরে হিন্দুসভার সভাপতি স্বরূপে দেশবাসীর দৃষ্টি এই দেবমন্দিরগুলির দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, আমরাও নবদ্বীপের তরুণদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিতেছি। তাঁহারা নবদ্বীপকে এই কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করুন। বাধা তাঁহারা পাইবেন। জানি, স্বার্থের ঘাঁটি যাঁহারা বাঁধিয়া লইয়াছেন তাঁহারা আর্তনাদ উত্থাপন করিবেন, বলিবেন, আমার পাঁঠা আমি লেজে কাটিব, তোমাদের কি? কিন্তু তাঁহাদেরও বুঝা উচিত জনসাধারণকে লইয়াই তাঁহাদের কারবার। সমাজে এবং জনসাধারণের মধ্যে তাঁহাদের কার্যের প্রতিক্রিয়ার অনিষ্টকারিতাকে রুদ্ধ করিবার অধিকারও দেশের লোকের রহিয়াছে। নবদ্বীপ তাঁহাদের নিজেদের খাসতালুক নয়। নবদ্বীপ সমগ্র বাঙলাদেশের ধারক, বাহক এবং পোষক। সমগ্র বাঙলার অন্তরের সঙ্গে যোগ রহিয়াছে নবদ্বীপের। নবদ্বীপের সংস্কৃতি সমুন্নত থাকে এবং সমুন্নত হয়—সমগ্র বাঙালী জাতি ইহা মনেপ্রাণে চায়। এদিক হইতে দেশের নিকট, জাতির নিকট তাঁহাদের দায়িত্ব রহিয়াছে এবং কর্তব্য রহিয়াছে। তাঁহারা সে কর্তব্যকে আজ উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু কাল পারিবেন না। বাঙলার তরুণের দল জাগিয়া উঠিতেছে, তাহাদের চিত্তও কেবল প্রগতির সূত্রবাদ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে না, অচিরেই সমাজজীবনে মানুষের অধিকার এবং মানব-মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করিতে তাহারা জাগিয়া উঠিবে। ধর্মের নামে সঙ্কীর্ণতার গোঁড়ামি হইতে জাতিকে মুক্ত করিয়া সেবা ও প্রেমকে সত্য রূপ দিবে তরুণের দল।

অর্থপূর্ণ

শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন

কলকাতার উত্তরাঞ্চলে ভিড়ের মাঝখানে আমার পাশেই দাঁড়িয়ে সে দেখছিল একখানি সর্বজনীন দুর্গা-প্রতিমা। আমি দেখছিলাম তাকে।

মুখ চেনা। কোথায় দেখেছি? ভুল হবার কথা নয় তো। কী আশ্চর্য! মনের মধ্যে ডুব দিয়ে এক মুহূর্তে দেখে নিলাম সবাইকে—পিসি, মাসি, কাকি—যেখানে যে ছিল, দার্জিলিং, শিলং পাহাড়, পুরীর সমুদ্র-তীর—সারা ভ্রমান্ত খুঁজেও কোথায়ও পেলাম না এই নারীর অস্তিত্ব। কিন্তু ভুল আমার কিছুতেই হয় নি। অনেক, অনেকবার একে দেখেছি, কথা কয়েছি—এর সুখে সুখী হয়েছি, এর দুঃখে দুঃখ পেয়েছি। বড়ই চেনা মুখ। কিন্তু কিছুতেই ছাই মনে আসছে না। ইচ্ছে হচ্ছিল মাথাটা আমার ঠুকে দি দেয়ালে।

সেও দু'একবার আড় চোখে আমার বিহ্বল অবস্থা চেয়ে দেখেছিল। কি একভাবের অর্থপূর্ণ হাসি তার কালো ঘন চোখে দেখলাম। তার গাড়ির নম্বর অবশ্যই টুকে নিতে পারতুম, কিন্তু তখন একেবারেই খেয়াল হয়নি।

মনের মধ্যে সারাক্ষণ কাঁটার মত ঐ মুখ বিঁধে রইল।

রাতে শুয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম—"তুমি জন্মান্তর বিশ্বাস কর মিনু?"

—"কি যে তুমি বল, কে আর বিশ্বাস করে না জন্মান্তর!"

—"কেন কর?"

—"কেন? জানো না তোমাতে আর আমাতে জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ?"

ঠাকুর দেখতে যেয়ে আর যাকে দেখে এসেছি মিনুকে সব বললাম।

—"এর আগের জন্মে খুবই সম্ভব ইনি আমার যথার্থ আপনার কেউ ছিলেন। এ জন্মে আর মনে পড়ছে না।"

মিনু কোন জবাব দিলে না। চুপ করে রইল।

—"ভিড়ের মাঝখানে এমনি ধারা তোমাকে যদি একদিন চিনতে না পারি তাহলে কেমন হয় বল তো?"

মিনু নীরব।

—"তুমি কি ঘুমুলে?"

—"হুঁ।"

—"জেগে আছ, কথা বলছো না যে বড়?" মিনু একটু সরে গিয়ে পাশ ফিরলো।

বুঝতে পারলাম এত খোলাখুলি ওকে সব বলা ভাল হয় নি। কিন্তু বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম বই-কি।

ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম,—"রাগ করেছ?"

—"না।"

সে রাতে মিনুর সঙ্গে বড় একটা আর কথা হলো না। তার পরের দিনও সে কেমন যেন আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে লাগলো।

অফিসের কাপড় পরছিলাম, আয়নার ভেতর দেখলাম মিনু এসে দাঁড়ালো আমার পেছনে। হেসে ফেললাম।

মুখখানা খুবই গম্ভীর করে সে আমাকে আদেশ করলো,—"অফিস থেকে আর কোথায়ও যেও না, বাড়ি চলে এসো। তোমার সঙ্গে আজ একবার ঠাকুর দেখে আসবো।"

—"সে কি? এক হপ্তা আগে থেকেই যে তুমি আমাকে দিয়ে টিকিট কিনিয়ে এনেছো সিনেমার।"

মিনু খুব লজ্জা পেলো। বললো,—"ভুলেই গিয়ে-ছিলাম সিনেমার কথা আজকের।"

—"কাল রাত থেকে কেবলই ভুল হচ্ছে তোমার।"

—"মিছে কথা", বলে, ছুটে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সিনেমায় যেয়ে মিনু চোখের জল ফেলে আসে নি এমন দিন খুব কমই দেখেছি। বিশেষ করে আজকের বইটাতে ছিল অফুরন্ত ভক্তিরস।

এক রাণী—বয়স তাঁর অল্প,—পেলেন ঈশ্বরের প্রেরণা। ভগবৎ প্রেমে তিনি আত্মহারা হলেন। রাজার হলো সন্দেহ। তিনি করে বসলেন মস্ত ভুল। রাণী বেরিয়ে পড়লো পথে। ওদিকে রাণী গান গেয়ে গেয়ে পথ চলেছেন—এদিকে আমার স্ত্রীর সে কি কান্না!

আমার নিজের চোখও বিশেষ শুকনো ছিল না, তবু আস্তে করে বললাম,—"কাঁদবে, না ছবি দেখবে?"

কে শোনে কার কথা। মিনুর বিশ্বসংসার হারিয়ে গেছে তখন ছবির মধ্যে—রাণীর গানে।

দীর্ঘ পথের শেষে রাণী যেখানটায় এসে পেঁছালেন ভগবানের মন্দির-দ্বারে, সেখানটায় যেন চমকে উঠলাম। আপনিই মুখ থেকে বেরিয়ে এলো,—"পেয়েছি।"

—"অমন করে কেন উঠলে? কি পেয়েছ?"

আনন্দের আতিশয্যে মিনুর গাল টিপে দিলাম। বললাম, —"পেয়েছি গো পেয়েছি—পরে বলবো এখন।"

সিনেমা ভাঙলো অনেক রাতে। রাজপথ জনবিরল। পথের লোক পথেই শুয়ে পড়েছে। আমাদের গাড়ি চলেছে হু হু করে। মিনুর মন পরিপূর্ণ। এ অবস্থায় কথা বলা চলে না, তাই আমিও চুপ করেছিলাম। উদাসীর মত মিনু বললো,—"কি পেয়েছ বললে না আমায়?" —"কিপেয়েছি? পেয়েছি তাকে ঠাকুর দেখতে যেয়ে দেখেছিলাম যাকে।"

মিনু যেন একটু নড়ে চড়ে বসলো।

—"আজকের বইতে সে মেয়েটিই তো সেজেছে রাণী। ছবির পর্দায় এঁকে কতবার দেখেছি, কিন্তু সত্যিকারের মানুষটিকে এত কাছেথেকেও তখন চিনতে পারি নি। আমরা কি রকমের ভুল করে বসি দেখলে!"

মিনু আমার কাছে সরে এলো। আস্তে আস্তে সে তার মাথা রাখলো আমার কাঁধের ওপর। এক সময় সে বললো,— "আমাকে তুমি একটা কথা দেবে?—বল দেবে?"

—"বল কি কথা?......চুপ করে রইলে যে?......ছি! তুমি কাঁদছো?"

—"বল তুমি আর কখনো সিনেমায় যাবে না—"

মিনুকে চেপে ধরলাম বুকের মাঝখানে গভীর ভাবে। সে তার সব ক'টা আঙুল দিয়ে এলোমেলো করে দিতে লাগলো আমার মাথার সব চুল।

মিনুর চোখের জল তখন ধুয়ে গেছে—পথের আলোতে দেখতে পেলাম স্পষ্ট। তাকে যখন মুক্তি দিলাম তখন গাড়িটা বাড়ির একেবারে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

এর পরেও কিন্তু মিনুকে নিয়ে সিনেমায় গিয়েছি। সে আপত্তি করে নি।



আলীপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে কারামুক্তির পর মৌলবী আশরফুদ্দীন আহ্‌মদ চৌধুরীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।



বোম্বাইয়ে দল-নিরপেক্ষ নেতৃবৃন্দ সম্মেলন। মিঃ আণে, বীর সাভারকর, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, ডাঃ পরাঞ্জপে এবং মিঃ চন্দভারকরকে দেখা যাইতেছে।

চাকর

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এত বিষয় আছে ভাববার, কিন্তু সকল কাজ আর চিন্তা তলিয়ে গেছে এক মহাচিন্তায়। আজ চারদিন হ'ল চাকর চলে গেছে এবং এই চারদিন ধ'রে ক্রমাগত চাকর খুঁজে খুঁজে হায়রান হয়েছি।

বালিগঞ্জে এসে স্বামী-স্ত্রীতে ছোট একটি নীড় বেঁধেছিলাম, ভেবেছিলাম, উভয়ের জীবনে একটা নিরবচ্ছিন্ন শান্তির স্রোত প্রবাহিত হ'তে থাকবে, আর আমি আমার পড়াশুনা নিয়ে দিনগুলো নিশ্চিন্ত আরামে কাটিয়ে দেব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার নিরালা আভিজাত্য আর সুকুমার সাহিত্য চর্চা যে এরকম নিষ্ঠুর আঘাত পাবে, তা কখনও কল্পনা করতে পারি নি। যে গৃহিণী তাঁর অখণ্ড অ[illegible] আমার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের পিছনে নিযুক্ত করে থাকেন, এমনকি, এই সাত দিন আগে তাঁর মধ্যবয়সী স্বামীর অবাঞ্ছিত জন্মতিথি উপলক্ষে একটা সুন্দর উপহার কিনে বাজে খরচের জন্যে মন খারাপ করেন নি, তিনিও শেষকালে কঠিনস্বরে জানিয়ে দিয়েছেন—"আজ সন্ধ্যার মধ্যে চাকর ধ'রে না আনতে পারলে আমাকে অগত্যা অক্রূর দত্তের লেনে যেতে হবে।"

বলা বাহুল্য, ঐ বৈষ্ণবজনোচিত নিরীহ গলিতেই তাঁর পিতৃগৃহ। আমি একবার বিনীত সুরে বলেছিলাম যে, গত চারদিন ধ'রে আমি ত নিয়তই চেষ্টা করেছি, কেবল 'আনন্দবাজারে' নিরুদ্দেশ-কলমে বিজ্ঞাপনটাই দেওয়া হয় নি। নতুবা যে কোন সুস্থমস্তিষ্ক, শিক্ষিত ভদ্রলোকের পক্ষে স্ত্রীর কষ্ট লাঘবের জন্যে যা কিছু করণীয় সবই করেছি। গৃহিণী আরও কঠিন হ'য়ে বললেন, "সারাদিন ধ'রে ক'র কি এমন যে সামান্য একটা চাকরও খুঁজে আনতে পার না?"

একবার ইচ্ছা হ'ল বলি—"তোমারই-বা এমনকি বিশ্ব-পালয়নের দায়িত্ব! বাজার করে আর রাঁধে বামুন; ঠিকা ঝিতে বাসন মাজে। ছোটখাট কাজ বাহালের জন্যে সশরীরে আমি নিজেই বর্তমান। ঘরে ছেলেপুলেও নেই যে তার জন্যে হাঙ্গামা পোয়াতে হবে। সুতরাং চাকর আনতে যদি একটু দেরীই হয়, তাতে মাথায় বজ্রাঘাত পড়বার মত এমন কি হয়েছে?"

কিন্তু এগুলো হ'ল নেপথ্যে স্বগতোক্তি। মুখে বললাম—"সাত আট টাকার কমে কেউ থাকতে রাজী নয় যে! তুমি ত ছ' টাকার বেশী দেবে না।"

"কেন দেব শুনি? লোক ত মাত্র দুটি! কাজই-বা এমন কি, যে রোজগারের সমস্ত টাকা চাকরের শ্রীপাদপদ্মে ধ'রে দিতে হবে? বালিগঞ্জের রেট্ই খারাপ—যেমন জায়গা, তেমনি থাকার সুখ! শ্যামবাজার ছিল ভাল।" গৃহিনী রাগে গজ্ গজ্ করতে লাগলেন।

কথাটা কিছু পরিমাণে সত্যি। যতটা শোনা যায়, ততটা নয়। মধ্যবিত্ত লোক একটু আলো-বাতাসের লোভে এ-পাড়ায় আসে বটে, কিন্তু স্রেফ্ সার্ভেন্ট-প্রব্লেম শেষ পর্যন্ত তিষ্ঠুতে দেয় না। কলকাতায় চাকরের সমস্যা এত মারাত্মক নয়, মাইনেটাও কাজের অনুপাতে সরকারী পেন্সনের মত মোটা অংকের নয়। আর এখানে নিত্যই ঝি-চাকরের সন্ধানে ঘুরে বেড়াও। বালিগঞ্জ হ'ল ভৃত্য-শ্রেণীর ট্রেনিং গ্রাউন্ড। দু' দিন থেকে কাজ শিখতে না শিখতেই মিথ্যা অজুহাতে উধাও। আর সাত আট দিন পরে এসে আবার দুদিনের মাইনে দাবী! আশ্চর্য—যতো শয়তানের আড্ডা!

আজ রবিবার। ভেবেছিলাম, দুপুরে খেয়েদেয়ে কোথায় একটু "বিউটি-স্লীপ্" হবে, তা না এই রোদে চাকরের সন্ধানে পরিচিত, অর্ধপরিচিত, আর অপরিচিত লোকের সুপারিশ ক'রে বেড়াও।

সত্যি, এ ব্যবস্থা অত্যন্ত আপত্তিকর। চাকর চলে গেলে পুরুষকেই-বা সমস্ত কাজ ছেড়ে চাকর জোগাড় করতে হবে কেন? এই ত সেদিন অনিল বলছিল যে, তার স্ত্রীর জন্যে কোন চাকর টিঁকে থাকতে পারে না, নিত্যই পলায়ন আর সন্ধানের পালা চলেছে। কোন গৃহিণীর ভাঁড়ার-চুরি সম্বন্ধে বৈধ অথবা অবৈধ সন্দেহ, কেউ-বা খাটিয়ে নিতে চান, এক ঘণ্টাও বিশ্রাম অথবা আলস্যের প্রশ্রয় দিতে চান না। আর কেউ-বা সহবৎ-শিক্ষা প্রভৃতি খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামান। এবার থেকে নিয়ম করা উচিত যে, বাপের বাড়ি থেকে চাকর সাপ্লাই করা হবে।

একটু তন্দ্রা এসেছিল, কিন্তু ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। গৃহিণীর তীব্র হুকুমে আর মুখ-ভারে আমাদের এই ছোট্ট বাড়িটি থমথমে হয়েছিল,—যেন জার্মানির হুমকিতে মধ্য ইউরোপের সংকটাপন্ন পরিস্থিতি। ভাবলাম—যাই, অনিলের বাসায় গিয়ে ওর চাকরের শরণাপন্ন হওয়া যাক্। ওখানে অনেক মেদিনীপুর, বালেশ্বর জেলার ভিড়, একটা যা হয় ধ'রে নিয়ে আসা যাবে। যদি অনিলের স্ত্রী ইতিমধ্যে তাকে তাড়িয়ে না দিয়ে থাকে, তাহলে চাই কি আজ সন্ধ্যের মধ্যে একটা কিছু বন্দোবস্ত হ'বে বলে আশা করা যায়।

রাম চাকরটা সত্যিই ছিল ভাল। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও সচ্চরিত্র। নেশার মধ্যে এক বিড়ি, তাও আড়ালে খেত, বাসা নোংরা করত না। হপ্তায় দুবার সাবান-কাচা কাপড় ও ফরসা বেনিয়ান পড়ত, মেজাজটাও উগ্র ছিল না। চালাক, চতুর, চটপটে। বাজার করত ভাল। দামে বা ওজনে জিনিস মারত না; বলত, "বাবু, দস্তুরী ত পাই, আর বেশী লোভ করা ভাল নয়।" রাত্রে এত ভাল গা টিপত যে, ঘুম এসে যেত পনের মিনিটের মধ্যেই। তবুও গৃহিণী সামান্য একটু ভুলের জন্যে দিলেন তাকে বরখাস্ত করে।

আমি যদি একটু সাবধান করে দিতাম আগে থেকে, তাহলে এক-আধ সময়ে এখনও গোলমাল হ'য়ে যায়, তখন রাম অসাবধানতায় যে এ ভুল ক'রে বসবে, তার আর বিচিত্র কি?

এখানে একটা কথা বলে রাখি যে, মোটামুটি আমার

গৃহিণী লোক ভাল। মিতব্যয়ী হ'লেও কৃপণ নন; মেজাজ মাঝারি, অন্তত অকারণে খিট্ খিট্ করেন না। আধুনিকা হয়েও তিনি সংসারকে সিনেমার মত ভালবাসেন, ছোটখাট সাংসারিক ব্যাপারে আর চাকরী, অর্থোপার্জন প্রভৃতি বড় বড় ব্যাপারেও তাঁর আশ্চর্য মেধা আর অন্তর্দৃষ্টি। তবে হ্যাঁ, গোটাকয়েক দুর্বলতা তাঁর আছে। অন্তত একটা ত আছেই। সেটা হ'ল তাঁর সঞ্চয় প্রবৃত্তি। মানে, ফাউ-এর ওপর তাঁর অনুরাগ আছে, আসক্তি বললেও চলে।

ভাঁড়ারের কোনে তাঁর একটা ডিপার্টমেণ্ট স্টোর্স আছে। সেখানে দরকারী-অদরকারী নানা জিনিস তাঁর খাস তত্ত্বাবধানে বিরাজ করে। ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি, পুরানো খাতা ও খবরের কাগজের ক্রমবর্ধমান বাণ্ডিল, এবং সিগারেট টিনের সারবন্দী থাক্,—এ তিনটে জিনিসের ওপর তাঁর অসীম মমতা। ঠিক পতি-ভক্তির কারণে নয়, ওগুলোর সাহায্যে নাকি অনেক দরকারী জিনিস পাওয়া ও কেনা যায়। সেই কারণেই তিনি ওগুলো যত্ন ক'রে তুলে রাখেন।

আগে আগে আমায় উপদেশ দিতেন। বলতেন, 'প্লেয়ার্স', ক্যাভাণ্ডার সিগারেট কিনো। ওদের সংগে কুপন থাকে, তা দিয়ে অনেক জিনিস পাওয়া যায়।" পরে দেখলাম যে, নেশা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। সিগারেট থেকে চা, চা থকে দিশী বুজরুকি তেল আর ঔষধে কুপন-নেশা সংক্রামিত হচ্ছে। তাতে অবশ্য আমার আপত্তির কারণ ছিল না,—যেহেতু ব্যবহৃত জিনিসের বিনিময়ে যদি ফাউ কিছু আসে, মন্দ কি? কিন্তু দুপুর রোদে যদি কোন ভদ্রসন্তানকে লিপটন, অথবা প্লেয়ার্সের কুপন নিয়ে অফিস অঞ্চলে রিডেম্পশন্-মার্টে ঘুরে বেড়াতে হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আপত্তির ঘোরতর কারণ আছে। তারপর ধরুন--পুরানো কাগজ। জমানো মন্দ নয়, আজ-কাল কাগজের আবার যে রকম চাহিদা! কিন্তু ঐ সব কাগজেই আবার 'শব্দ-বন্ধনী' প্রতিযোগিতা আছে। গৃহিণী সেগুলো পড়েন, টাকা পাঠান, আর আমায় সমস্যা পূরণের জন্যে উত্যক্ত করেন। তার পর ছেঁড়া কাপড়ের সাহায্যেও নিত্য-ব্যবহার্য বাসন ইত্যাদি পাওয়া যায়। কিন্তু মুস্কিল এই যে, আমার জামা-কাপড় ছ' মাসেও ছেঁড়ে না। গৃহিণী অনুযোগ করেন, "বউবাজারে আমাদের বড়দি'র কপাল ভাল। নলিনী-বাবুর ফি মাসেই কেমন কোট-প্যাণ্ট, ধুতি-পাঞ্জাবী ছেঁড়ে।"

আমি কয়েকবার পেরেক ও আঙুলের সাহায্য নিয়েছিলাম, তাতেও গৃহিণী সন্তুষ্ট নন। কাজ বাড়ে, রিপু করতে হয়। যাতে আর ব্যবহার না করা যায়, এমনভাবে জামা-কাপড় ছেঁড়ার আর্ট আয়ত্ত করতে আজও পারি নি। সিগারেট সম্বন্ধে আমার জেদ্ কিন্তু ছাড়ি নি। গৃহিণীকে বুঝিয়েছিলাম, যে সব সিগারেটে কুপন বা প্রিমিয়মের প্রথা আছে, সে সব অখাদ্য।

তিনি বললেন, "কেন অনিলবাবু, বিভূতিবাবু সবাই ত খান!"

বললাম—"ঐ সব কুপনের দাম ধরে নেয় না, কোম্পানি থেকে? তুমি যে ভাব কুপন মুফতে দেয়, তা নয়। বিলিতি জোচ্চুরি তুমি বোঝ না। তাছাড়া, এখন যদি সিগারেট বদ্লাই, অনেক দিনের অভ্যাসের ফলে ফট্ ক'রে একটি গলার রোগ হবে।" কাজেই সিগারেট নিয়ে আর কিছু বলেন না।

কিন্তু কাল হ'ল ঐ ছেঁড়া কাপড়ের বস্তা আর পুরানো কাগজের বাণ্ডিল নিয়ে। রাম দু' দুবার বারণ সত্ত্বেও সেগুলো ঝেঁটিয়ে সাফ করেছে। প্রথমে আমাকে একচোট নিলেন, বললেন, "বাবুর আস্কারাতেই চাকরের আস্পর্ধা বৃদ্ধি হয়।"

আমি প্রতিবাদ করেছিলাম, "ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসতে আমি বলি নি। তবে ঘরদোর পরিষ্কার করতে বলেছিলাম, আর সে কথা তুমিও ত বল।"

তাতে কাজ হয় নি। রামের অন্ন গেল। আর আমাকেও সেই সংগে চাকর শিকারের নূতন কাজ নিতে হ'ল।

আজ চারদিন ধ'রে অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু সফল হইনি। রাত্রে ঘুম ভাল হচ্ছে না। গৃহিণীকে একটু-আধটু বাড়তি কাজ করতে হচ্ছে, ঘরে ঢুকেই তিনি হয় জানলা-দরজাগুলো জোরে ধাক্কা মেরে বন্ধ করেন, অথবা খোলেন। চাবিটাও অকারণে সশব্দে মাটিতে ফেলেন। আমার আবার বদ্অভ্যাস যে, খাবার পরে যে সুখতন্দ্রাদি আসে, তার আমেজ একবার চটে গেলে আর ঘুম আসতে চায় না। উঠি আর বসি, জল খাই, পান চিবুই, সিগারেট ধরাই। খুট-খাট শব্দ হয়, গৃহিণী বিরক্ত হ'য়ে বলেন, "সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর দু' দণ্ড যে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমব, তার জো নেই।" বিড় বিড় করে বলি, "বেশী ঘুমুলে ফিগ্যার খারাপ হ'য়ে যাবে।"

জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গৃহিণী একবার বললেন, "বেলের সরবৎটা খেয়ে গেলে হ'ত না?"

বললাম—"যে ঘোল খেতে যাচ্ছি, বেলের জায়গা হবে না।"

মোহন ভ্রূবিভঙ্গে হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করলেন, "নূতন তাত্ পড়েছে, ছাতাটা নিয়ো।"

গম্ভীর হ'য়ে উত্তর দিলাম—"ওটা আমার বিয়ের ছাতা, দু'বার হারিয়েও পেয়েছি। তিনবারের বার হারিয়ে যদি আবার ফিরে পাই, তাহলে নেভিল্ চেম্বারলেন হ'য়ে যাব। তখন তোমার চাকর খুঁজবে কে?" প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না ক'রেই পিছলে গেলাম।

অনিলের চাকর মহেশ হ'ল অল্-সাউথ-ক্যা[illegible]কোটা উড়িয়া য়ুনিয়নের সেক্রেটারী। স্থানীয় প্রতিপত্তি [illegible] তার অসীম, এমনকি, অনিলের স্ত্রীও তাকে সমীহ ক'রে [illegible]লেন। এক মাসের ওপর হয়ে গেল, তবু তিনি মহেশকে বিদায় করেন নি। তার হাতে বিস্তর লোক।

অনিলের বাড়ি যাওয়া মাত্রেই অনিল হাসিমুখে আমায় অভ্যর্থনা ক'রে বললে, "সেটেল্ড্! গোপালকে সিলেক্ট করেছি। অত্যন্ত ক্লেভার বয়। বিশ্বাসী—চোর-ছ্যাঁচো[illegible]ার নয়।

সব চেনে, আর এমন অনেক খবর রাখে যা তুই জানিস না। বৌদি খুব প্লীজ্‌ড হবে।”

মনের সুখে ছ'টা পর্যন্ত আড্ডা দিলাম। অজস্র সিগারেট, অনেক পেয়ালা চা এবং অফুরন্ত গল্প ক'রে ঠিক সাড়ে ছ'টায় গৃহিণীর অ্যাল্‌টিমেটম্‌-মাফিক সময়ে স-ভৃত্য হাজিরা দিলাম।

পরের দিন সকালে দেখলাম গোপাল ছেলেমানুষ ব'লেই হোক্‌ অথবা পাঁচ টাকা মাইনে চেয়েছে ব'লেই হোক্‌, গৃহিণীর সুনজরে পড়ে গেছে। চমৎকার ছেলেটা—চেহারাটা ভদ্রঘরের মতই, বেশ চালাক-চতুর। দুবার এক কথা বলতে হয় না। বাজার-টাজার ক'রে ভাল, সব জিনিসের দর জানে।

কিন্তু যে কারণে গৃহিণী তাকে সুনজরে দেখলেন তার কারণ আলাদা। গোপাল সঞ্চয়ী ছেলে। প্রথম দিন থেকে ঐ একটি গুণেই সে 'মা'র হৃদয় জয় করেছে। আজ এক মাস হ'ল আমার বাড়িতে কাজে লেগেছে। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই দু' তিন টাকা করে সে আমার স্ত্রীর কাছে গচ্ছিত রাখে। জিজ্ঞাসা করলে বলে,—“চুরির পয়সা নয় বাবু! আমার কিছু কিছু টাকা ধার দেওয়া আছে। হপ্তার শেষে সুদে-আসলে যা পাই, মার কাছে জমা রাখি।” এ ছাড়া, সে দুটি নতুন দোকান আবিষ্কার করেছে, যেখানে ঘি ও তেল কিনলে মাসের শেষে নাকি একটি করে কাঁচের 'জার' উপহার দেওয়া হয়, আর নিয়মিত চা কিনলে পাউন্ড পিছু তিনখানা ক'রে ক্যুপন দেয়। এ রকম দেড়শ' কুপনে চায়ের সেট্‌, আড়াইশ'তে প্রাইমাস্‌ স্টোভ।

ব্যস্‌। আমার স্ত্রী মনের সুখে আছেন। আমিও অনেকটা নিশ্চিন্ত আছি। গোপালের দৌলতে আমায় আজকাল কোন হাঙ্গামাই পোয়াতে হয় না। মধ্যে মধ্যে ছেলেটাকে এক-আধটা পয়সা দিই। সে সব জমিয়ে 'মা'র কাছে রেখে দেয়। সে নাকি বলেছে, পয়সা জমিয়ে জমিয়ে দক্ষিণ অঞ্চলে বাগান-জমি কিনবে, ব্যবসা করবে নারকোলের—অনেক লাভ। আমার স্ত্রী তাকে উৎসাহ দেন। আমার কাছে কিন্তু সে অন্য কথা বলে।

“পয়সার দরকার অনেক রকমের বাবু। আমাদের দেশে আবার মেয়ের বাপকে টাকা দিতে হয় কি না......”

একটু চমকে উঠে বললাম—“তুই বিয়ে করেছিস নাকি?”

“না এখনও হয়নি। তবে.........” সলজ্জ সংকোচে মনিবের কাছে সে মাথা হেঁট করলে।

“তবে কি?”

“গিরিবালার বাপ কড়া লোক। মেয়ে সোন্দর কি না—তাই দুশো টাকা চায়, নইলে একশোতেই কাজ হ'য়ে যায়...”

বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম—“তোদের দেশের মেয়ে ত? তা' বয়েস কত?”

“আজ্ঞে এগার। তবে বাড়ন্ত কি না......”

“তোর এরি মধ্যে কি বিয়ের বয়েস হয়েছে?”

“বাবু, আপনাদের মত দেরী বয়েসে বিয়ে করা আমাদের দেশে রেওয়াজ নেই। তা' মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে বাবু,—উনিশ-কুড়ি বছর হ'ল বৈকি......”

“দেখলে ত মনে হয় না।”

“আজ্ঞে না। মেদিনীপুরে আমাদের গাঁয়ের দিকটা বড় ম্যালেরিয়া। ছেলেবেলায় আবার সান্নিপাতিক-বিকার হয়েছিল কি না, তাই বাড় কমে গেছে।”

বললাম, “হুঁ! কলকাতায় এলে চাম্‌চিকেরও চেহারা বদ্‌লায়।”

সেদিন সন্ধ্যায় অনিল, বিভূতি আর আমি লেকে গিছলাম। গল্পে, গল্পে অনেক রাত হ'য়ে গেল। ফিরব ফিরব ভাবছি এমন সময়ে শুধু-গায়ে অল্পবয়সী একটি ছেলে এসে হাত পেতে বললে—“একটি পয়সা দিন্‌—বাবু।”

যেখানে আমরা বসেছিলাম, সেদিকটা অন্ধকার। আব্‌ছা আলোয় ছেলেটির শীর্ণ মুখ দেখে মায়া হ'ল। ভাবলাম, এই বেকার সমস্যার আলোচনা ক'রে এতক্ষণে হাতে হাতে তার নমুনা পেলাম। বিভূতি তাকে অনেক প্রশ্ন করলে। জানা গেল, ঘরে বিধবা মা, পিসী, দুটি অবিবাহিতা বোন, আর একটি নাবালক ভাই আছে। এতগুলি পোষ্য, সমস্ত দায়িত্ব তার একার। ব্রাহ্মণের ছেলে, পৈতে দেখালে। কিন্তু লেখাপড়া তেমন শেখেনি, তাই চাকরী মেলে না। অনিল বললে, “বামুনের কাজ কর না কেন?”

“দিন্‌ না বাবু ক'রে—আমি ত অনেক খুঁজেছি। একটু দয়া ক'রে গরীব ভিখিরীর উপকার করবেন......?”

ঠিকানা দিয়ে অনিল বললে,—“কাল সকালে আমার বাড়ি যেয়ো।”

ছেলেটি রাজী হ'ল। তার পর যাবার সময়ে আমার দিকে তাকিয়ে ভাঙা গলায় বললে, “দয়া হবে না বাবু? একটি পয়সা দিন্‌—সারাদিন খাওয়া হয় নি.........”

মনটা ভিজে ছিল, তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে একটা আনি বার করলাম। ছেলেটি এগিয়ে আসতেই তার মুখে একখানা চলন্ত মোটরের হেডলাইট পড়ল। বিস্মিত হ'য়ে দেখি—গোপাল!

রাত্রে বাড়ি এসে শুনলাম, স্ত্রী বলছেন, “এত রাত হ'য়ে গেল, গোপাল এখনও এল না! ছোঁড়া গাড়ি-ঘোড়া চাপা পড়ল না ত?”

গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, “সে কি রোজই বেরোয় না কি?”

গৃহিণী আমতা আমতা ক'রে বললেন,—“হ্যাঁ, তা' রোজই একরকম বৈকি। সন্ধ্যে থেকে ছট্‌ফট্‌ করে; বলে মা রেডিও শুনতে যাই। ফুটবল খেলা আর যুদ্ধের খবরে ওর ভয়ানক ঝোঁক কি না। আর তুমি ত ফের সেই রাত ন'টায়। তাই ঘণ্টা দুই ওকে ছুটি দেই। কিন্তু এত রাত তো সে কোনদিন করে না—”

(শেষাংশ ৩১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মধ্যমণ্ডল বা বুদ্ধ পর্যটন ভূমি

ভিক্ষু জ্ঞানশ্রী ঐগ্রায়ন

বুদ্ধদেব বর্ষার চার মাস—আষাঢ় পূর্ণিমা হইতে কার্তিক পূর্ণিমা অবধি—কোনও বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন এবং বাকি আট মাস তিনি স্থানে স্থানে পর্যটন করিতেন। ত্রিপিটকের প্রত্যেক সূত্রের প্রারম্ভেই সূত্র-দেশনার স্থান উল্লিখিত আছে, ইহাতে বুদ্ধদেব কোন্ কোন্ স্থানে পদার্পণ করেন বোঝা যায়—যেমন 'একং সময় ভগবা কুরূষু বিহরতি কম্মস্সদম্ম নাম কুরূনাম নিগমে' ইত্যাদি। সমস্ত ত্রিপিটক গবেষণা করিলে দেখা যায় যে, বুদ্ধদেব কখনও যমুনা নদী পার হন নাই। একবার তাঁকে 'মধুরা' (মথুরা) ও বেরঞ্জের মাঝামাঝি রাস্তায় চারিকা করিতে পাওয়া যায়। তিনি মথুরার দিক হইতে বেরঞ্জায় আসিতেছিলেন। কিন্তু বেরঞ্জা যমুনার পূর্বদিকের কোনও গ্রাম এবং মথুরায় কোনও সূত্রদেশনারও উল্লেখ নাই। কোথা হইতে বুদ্ধদেব বেরঞ্জায় আসিতেছিলেন বলা কঠিন। উত্তর পশ্চিমের কুরুদেশে 'কম্মাস্সদম্ম' নিগম (ছোট শহর) ও রাজধানী থুল্লকোট্‌ঠিতে তিনি পদার্পণ করেন। কিন্তু এই নগরদ্বয় আধুনিক মিরাট, মজফঃরপুর বা সাহারাণপুর জেলার কোথাও ছিল। যমুনা পার হইলে পথে ইন্দ্রপ্রস্থ নিশ্চয়ই পড়িত। পূর্ব সীমায় ভগবান কজঙ্গল নিগমে গিয়াছিলেন। কজঙ্গল অঙ্গদেশের পূর্ব প্রান্তে, তার পর গভীর অরণ্য ছিল। কোশি নদীর পশ্চিমে এবং গঙ্গার উত্তরভাগে অঙ্গরূপ নামক জনপদ ছিল, ইহা অঙ্গরাজ্যেরই অংশবিশেষ। বুদ্ধদেব অঙ্গরূপের পূর্ব সীমা অবধি পৌঁছিলেও, কখনও কোশি পার হন নাই। দক্ষিণে দশার্নদেশে (পশ্চিম বুন্দেলখণ্ড) যাওয়ারও কোন পরিচয় নাই। চেদি (পূর্ব বুন্দেলখণ্ড) দেশেরও বড় জোর বিন্ধ্য ও গঙ্গার মধ্যবর্তী প্রদেশেই গিয়াছিলেন। ভর্গদেশে (দক্ষিণ মির্জাপুর ও বেনারস জেলা) ভগবানের আগমনের ভুরি ভুরি উল্লেখ আছে। বিহারে ভগবানের পর্যটনভূমী হাজারীবাগ ও সাঁওতাল পরগণার কিছুদূরে অবধি গিয়াছিল। বুদ্ধ বিচরণভূমী পালি সাহিত্যে 'মধ্যমণ্ডল' নামে প্রসিদ্ধ।

বিনয়-পিটকে মধ্যমণ্ডলের সীমরেখা এইরূপ উল্লিখিত আছে, পূর্বদিকে কজঙ্গল নামক নিগম (বর্তমান কংকজোল—সাঁওতাল পরগণা), তারপর- গভীর শালবন। পূর্ব-দক্ষিণ সীমায় 'সল্লবতি' নদী (বর্তমান সিলোই—জেলা হাজারীবাগ ও বীরভূম), দক্ষিণে 'সেতকণ্ণিক' নিগম (ইহার স্থান এখনও নির্ধার্য হয় নাই), পশ্চিমে 'থূন' গ্রাম (জেলা কর্নাল)—বর্তমান থানেশ্বর) এবং উত্তরদিকে 'উগিরধ্বজ' পর্বত (হিমালয়ের অংশ)। মধ্যমণ্ডলের বহির্ভাগের দেশসমূহের নাম ছিল 'প্রত্যন্ত দেশ'। সর্বাস্তি বাদীদের 'আগমে' মথুরা ও পুণ্ড্রবর্ধন অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং সেখানে বুদ্ধদেবের পদার্পণেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু মূল পালি সাহিত্যে এরূপ কিছু পাওয়া যায় না।

সেই সময় উত্তর ভারতে রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র উভয়ই প্রচলিত ছিল। অবন্তি, সুরসেন, কুরু, কোশল, মগধ ইত্যাদি রাজতান্ত্রিক দেশ—গণতান্ত্রিক দেশ ছিল শাক্য, কোলীয়, মল্ল, বুলীয়, মৌর্য, লীচ্ছবী ইত্যাদি। এই সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া সুদূরগামি মহাপথ ছিল। এই মহাপথ দিয়াই সে সময় স্বার্থবাহি বণিকরা দেশান্তরে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। এক এক স্বার্থে (Caravan) পাঁচশ' অবধি গো-শকটের উল্লেখ আছে। সাকেতনগর (বর্তমান অযোধ্যা) হইতে এক পথ উত্তরে শ্রাবস্তী অবধি, এক পথ দক্ষিণে প্রতিষ্ঠান, কোশাম্বী হইয়া বিন্ধ্যপরে চলিয়া গিয়াছিল, এক পথ পূর্বে কাশী অবধি আসিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একদিকে গয়া রাজগৃহ, নালন্দা ও অন্যটি বৈশালী অবধি চলিয়া যায় এবং অন্য এক মহাপথ উত্তর-পশ্চিমে পঞ্চনদ পার হইয়া 'তক্ষশীলা' অভিমুখে গিয়াছিল। সাকেতের ন্যায় কান্যকুব্জ হইতেও নানান মহাপথ ননাদিকে বাহির হইয়াছিল। এক পথ উত্তরাভিমুখে বেরেঞ্জা, মথুরা, ইন্দ্রপ্রস্থ পার হইয়া থানেশ্বরের নিকট সাকেত হইতে বহির্গত পথের সংগে মিলিত হয়, এক পথ কৌশাম্বী স্পর্শ করিয়া বিন্ধ্যগিরি পার হইয়া দক্ষিণাপথাভিমুখে চলিয়া যায় এবং তৃতীয় পথ দক্ষিণ-পশ্চিমে উজ্জয়িনী ইত্যাদি স্পর্শ করিয়া পশ্চিম সমুদ্রোপকূলের বিখ্যাত 'সুপ্পারিয়া' বন্দর (বর্তমান সোপায়া) অবধি যায়। উত্তরের কপিলাবস্তু নগর হইতে একপথ শ্রাবস্তি অবধি এবং অন্য পথ বৈশালী স্পর্শ করিয়া রাজগৃহ অবধি যায়। ইহারই এক শাখা পাটলী গ্রামের নিকট বিভক্ত হইয়া ভদ্দিয়া (মুঙ্গের), চম্পা (ভাগলপুর) এবং কজঙ্গল পার হইয়া বোধ হয় পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ) অবধি গিয়াছিল। ইহা ছাড়া ছোট বড় অন্যান্য বহু পথের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাঁওতাল পরগণার জঙ্গলের মধ্য দিয়া উৎকল হইতে গয়া অবধি বোধ হয় কোনও পথ ছিল। ভগবানের সম্বোধিলাভের চতুর্থ সপ্তাহে তপস্সু ও ভল্লিক নামক দুইজন স্বার্থবাহ উৎকল হইতে উত্তর ভারতে যাত্রাকালীন গয়ার সন্নিকটে ভগবানের সন্দর্শন করে। হিমালয়ের পূর্বপ্রান্ত হইতে পার্বত্য বণিকরা বৈশালী ও মগধে বাণিজ্য করিতে আসিত এবং এই বণিকগণের নিকট হইতে প্রাপ্য শুল্ক লইয়া মগধ-রাজ অজাতশত্রু ও বৈশালীর বজ্জিগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। অঙ্গরূপের প্রধান নগর 'আপসের' নাগরিকগণ অতিশয় ধনবান ছিলেন এবং রাজপথের স্বার্থবাহি পথের উপরস্থিত না হইলে এরূপ দুই পার্শ্ব বিপণীতে পূর্ণ থাকিত। কোনও স্বার্থবাহি পথের উপরস্থিত না হইলে এরূপ সম্ভব নয়। এই সমস্ত পথের যে অংশ যে রাজ্যের মধ্যে পতিত, সেই রাজ্য সেই অংশের সংস্কারাদি ও দস্যুভয় নিবারণ করিত। পথের মাঝে মাঝে আবোসথগার (সরাই) ছিল—কোনওটি নিঃশুল্ক এবং কোনওটিতে কিছু শুল্ক দিতে হইত। স্বার্থবাহদের কোনও রাজ্য পার হইতে হইলে নির্ধারিত শুল্ক দিতে হইত এবং রাজকর্মচারীরা ন্যায্য শুল্কের অতিরিক্তও কখনও কখনও আদায় করিত। বিশাখার

অলংকারাদির উপর এইরূপ বেশী শুল্ক লওয়ায় তিনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের নিকট নালিশ করেন। অত্যাবশ্যকীয় রাজকার্যে রথবিনীত (ডাক) স্থাপনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। কোশল রাজ্যের উত্তরভাগ ঘন বনে আচ্ছন্ন ছিল। তাহার মধ্য দিয়াই সাকেত নগরী হইতে তক্ষশীলার পথ এবং এই পথেই গার্গ, মৈত্রেয়ানী পুত্র (অঙ্গুলীমাল) লুণ্ঠতরাজ করিতেন।

বুদ্ধোদয়ের কিছু পূর্বে সমস্ত জম্বুদ্বীপ শতভাগে বিভক্ত ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। দীর্ঘনিকায় অনুযায়ী রাজা রেণুর অমাত্য জ্যোতিপাল উত্তরে অতিপ্রস্থ এবং দক্ষিণে শকটের অগ্রভাগের ন্যায় সংকীর্ণ মহাদেশকে (ভারতবর্ষ) —রাজা রেণুর রাজত্ব মাঝখানে রাখিয়া সমান সাত ভাগে বিভক্ত করেন। (১) কলিঙ্গ—রাজধানী দন্তপুর; (২) অশ্বক (একেবারে দক্ষিণ হইতে হায়দরাবাদ অবধি)—রাজধানী পোতন; (৩) অবন্তিদেশ—(রাজধানী মাহিষ্মতী মহেশ্বর—ইন্দোর রাজ্য); (৪) সৌবীর (সিন্ধু)—রাজধানী বোরুক (রোরি); (৫) বিদেহ—রাজধানী মিথিলা; (৬) অঙ্গ—রাজধানী চম্পা; (৭) এই সব রাজ্যবর্গের মাঝামাঝি রাজা রেণুর রাজ্য। "সত্তভু, ব্রহ্মদত্ত, বেস্তভু, ভারতরেণু ও দুইজন ধৃতরাষ্ট্র সে যুগের এই সপ্ত ভারতী" (মহাগোবিন্দ-সূত্র দীর্ঘনিকায়)।

এই সপ্ত ভারতীর অন্যতম ব্রহ্মদত্ত যদি কাশীর ব্রহ্মদত্ত বংশ প্রতিষ্ঠাতা হন, তাহা হইলে সপ্ত ভারতীর ঐতিহাসিক সময় খ্রীঃ পূঃ অষ্টম হইতে নবমের মধ্যে পড়ে। কলিঙ্গ, অশ্বক, সৌবীর এই তিন দেশের পরিচয় ত্রিপিটকে পাওয়া যায় না, বাকি চার রাজ্যের পরিচয় আছে, কিন্তু ততদিনে ইহাদের মধ্যে নানা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছিল।

মধ্যমণ্ডলের মধ্যে বিস্তার ও প্রতিপত্তিতে কোশল রাজ্যই সর্বপ্রধান ছিল। মঝ্ঝিমনিকায়ে অঙ্গুলীমালসূত্রে দৃষ্ট হয় যে, এই রাজ্যের পূর্ব সীমান্তের উত্তরভাগে লিচ্ছবী গণতন্ত্র ও দক্ষিণভাগে মগধরাজ্য ইহার প্রতিবেশী ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। বৈশালীদিগের ভয়ে অনেক সময় কোশল-রাজকে সন্ত্রস্ত হইতে হইয়াছে। মগধরাজ অজাতশত্রুর সহিত কোশলরাজ প্রসেনজিতের যুদ্ধবিগ্রহের কথা স্পষ্টই উল্লেখ আছে। কোশল রাজ্যের উত্তরে তিনটি প্রজাতন্ত্র ছিল—শাক্য, কোলীয় ও মল্ল। ত্রিপিটকে নব মল্লের উল্লেখ আছে। সম্ভবত শাক্যদের তিনটি নিগম—'মেতলুপ, সামগাম, কপিলবস্তু; কোলীয়দের—'দেবদহ'; মল্লগণের—'পাবা, অনুপ্রিয়া, কুশী-নগর'; পিপ্পলি বনের মৌর্যদের ও অল্লকপ্পের বুলিয়দের নিগম লইয়াই গণতান্ত্রিক নয়টি নিগমকে 'নবমল্ল' বলা হইত।

ইহারা যদিও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীন ছিল, কিন্তু কোশলরাজের আধিপত্য স্বীকার করিত। কুশীনগরের বন্ধু মল্ল ও তাঁহার পর তাঁহার ভাগিনেয় 'দীর্ঘকারায়ন' সেনাপতি পদ পাওয়ায় একথা স্পষ্ট হয়। কোশলরাজ কোনও বিশেষ আয়োজন না করিয়াই একমাত্র সারথি লইয়া মেতলুপে ভগবানের সন্দর্শন করেন এবং বলেন—"ভগবানও ক্ষত্রিয়, আমিও ক্ষত্রিয়, ভগবানও আশী বৎসর বয়স্ক, আমিও তাই, ভগবানও কোশলক, আমিও কোশলক, এইজন্য আমার পক্ষে ভগবানের পরম সম্মান করা, বিচিত্র গৌরব করা উচিত।" (মঝ্ঝিমনিকায় ধর্মবৈতিয় সূত্র), কোলীয় বংশ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, ইঁহারা শাক্যসেনের জ্ঞাতি। পরিনির্বাণের পর অল্লকপ্পের বুলিয়রা শাক্যদের ন্যায় নিজেদের ভগবানের জ্ঞাতি পরিচয় দিয়া ভগবানের অস্থির ভাগ দাবী করে এবং সে দাবী গ্রাহ্যও হইয়াছিল।

দক্ষিণে কোশল রাজ্যের বিস্তৃতি কাশী হইয়া গঙ্গাতট অবধি গিয়াছিল। যতদূর মনে হয়, কোনও ক্ষত্রিয়কুলের নাম 'কাশী' ছিল। ইহাদের রাষ্ট্রতান্ত্রিক সন্তুষ্টির জন্য প্রসেন-জিতের ছোট ভাই 'কাশীরাজ' নাম লইয়া কাশীতে অবস্থান করিতেন। পশ্চিমে কোশল রাজ্যের বিস্তৃতির সীমারেখা ত্রিপিটকে পাওয়া যায় না। উত্তর পাঞ্চালে কোনও রাজ্যের বা রাজার উল্লেখ না থাকায় মনে হয় ইহাও কোশল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সম্ভবত কোশল ও তাহার অধীনস্থ জনপদ গঙ্গা, মহি (গণ্ডক) ও হিমালয়ের দ্বারা বেষ্টিত ছিল।

যদিও কোশল রাজ্যের তখনও যথেষ্ট প্রভাব ছিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ক্রমশই দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। উত্তরকালে সমস্ত কোশল রাজ্যই অজাতশত্রুর হাতে আসে। প্রসেন-জিতের একমাত্র কন্যা বজিরার সহিত অজাতশত্রুর বিবাহ হয়। প্রসেনজিতের পুত্র বিরুধক পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হন এবং সেই বৎসরই শাক্যদিগের সর্বনাশ করিয়া ফিরিবার সময় অচিরবতীর (রাপ্তী) হঠাৎ প্লাবনে সসৈন্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই ঘটনা পরিনির্বাণের এক বৎসর পূর্বে ঘটে। পরিনির্বাণের পর অজাতশত্রু, লিচ্ছবিগণ, শাক্যগণ, বুলিয়গণ, মৌর্যগণ ভগবানের অস্থি দাবী করে, কিন্তু কোশল হইতে কেহই আসে নাই। ইহাতে মনে হয়, বিরুধকের মৃত্যুর পরই কোশল রাজ্য অজাতশত্রুর কবলিত হয়।

মগধ রাজ্য মগধ, অঙ্গুত্তরাপ (ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেলার উত্তরভাগ) ও অঙ্গ (ভাগলপুর ও মুঙ্গেরের দক্ষিণভাগ) লইয়াছিল। অঙ্গুত্তরাপের নিগম আপনে বুদ্ধদেব কয়েকবার গিয়াছেন। মগধরাজ বিম্বিসারও মাঝে মাঝে পরিদর্শনে যাইতেন। একবার 'আপন'বাসি কৌনিয় জটিল মহাভিক্ষু-সংঘ সহিত ভগবানকে নিমন্ত্রণ করেন। 'শৈলব্রাহ্মণ' তাঁহার মহতী আয়োজন দেখিয়া প্রশ্ন করেন—"তোমার গৃহে কি বিবাহ অথবা কোনও মহাযজ্ঞ হইবে বা সমস্ত বলকায় (সেনা) সহিত মহারাজ বিম্বিসার পদার্পণ করিতেছেন" (মঝ্ঝিমনিকায় শেল সুত্রন্ত), অঙ্গুত্তরাপের দক্ষিণভাগে অঙ্গরাজ্য। ইঁহার রাজধানী চম্পা নগরীতে ভগবান বহুবারই গিয়াছেন। বিনয়-পিটকের 'মহাবগ্গে' 'চাম্পেয়-খন্দক' নামক এক অধ্যায়ই আছে। অঙ্গরাজ্যে কোনও নামমাত্র অঙ্গরাজ ছিলেন। বেটৈমুখ ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যহ পাঁচশ' কাহাপণ ভিক্ষা পাইতেন। আয়ুষ্মান উদয়নের পরামর্শে পাটলীপুত্রে সংঘের উপস্থানশালা (সভা-গৃহ) করাইয়া দেন। ইহা বুদ্ধ নির্বাণের পরে ঘটিয়াছিল।

(মঝ্ঝিমনিকায়—সুত্র)। এই অঙ্গরাজ মগধরাজের অধীন কোনও সামন্তরাজ ছিলেন। দীঘনিকায়ের জনবসভ-সুত্রে অঙ্গ-মগধ একত্রে উল্লিখিত আছে এবং ইহা একই জনপদের পরিচায়ক।

রাজা বিম্বিসারের জীবৎকালে মগধের বিশেষ কোনও উন্নতি দৃষ্ট হয় না। ইহার পর অজাতশত্রু রাজা হইলে মগধ ক্রমশই পরাক্রান্ত হইতে থাকে। যদিও বৌদ্ধ সাহিত্যে অজাতশত্রু কর্তৃক বিম্বিসারের হত্যার উল্লেখ আছে, কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতরা ইহা সত্য বলিয়া মনে করেন না। অজাতশত্রু কর্তৃক পিতৃহত্যা অসত্য হওয়াই সম্ভব। পৃথিবীর ইতিহাসে যে শ্রেষ্ঠ কূটনীতিজ্ঞ রাজমন্ত্রীর নাম পাওয়া যায়, অজাতশত্রুর মহামাত্য ব্রাহ্মণ বর্ষকার তাঁহাদের অন্যতম। শত্রুদের আপোষের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করা, নগর নির্মাণ, দুর্গপ্রাকারাদি নির্মাণ করিয়া নগরকে সুরক্ষিত করা, সমস্ত বর্ষকারই করিতেন। উত্তরকালে সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিয়া মগধের যে সুবিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার ভিত্তি ইনিই স্থাপন করেন। মৌর্য সাম্রাজ্য স্রষ্টা চাণক্য ইঁহারই পদাংকনুসরণ করেন। ত্রিপিটকে মাঝে মাঝে সুনীধ ও উপানন্দ নামক ইঁহার দুইজন সহকারী সেনাপতিরও নাম পাওয়া যায়।

গঙ্গার দক্ষিণকূলে পাটলীপুত্র মগধের উত্তর সীমাস্থিত এক সমৃদ্ধিশালী নিগম। গঙ্গার দক্ষিণতীরের অর্ধযোজন লিচ্ছবীদেরও করায়ত্ত ছিল। প্রতি বৎসর পার্বত্য বণিকরা হিমালয় হইতে বহু মূল্য সুগন্ধাদি লইয়া এইখানে আসিত। তাহারা আসিবামাত্র লিচ্ছবীরা সকলে একমত হইয়া আগে যাইয়া শুল্ক আদায় করিয়া লইত—অজাতশত্রু বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতেন। এইরূপ কয়েক বৎসর যাইবার পর অজাতশত্রু লিচ্ছবীদের উচ্ছেদ সাধনে মনস্থ করেন। লিচ্ছবীদিগের গণতন্ত্র অতিশয় পরাক্রমশালী ও একতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্মুখ যুদ্ধে ইহাদের পরাস্ত করা সম্ভব নহে জানিয়া অজাতশত্রু ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করিতে বর্ষকারকে পাঠান। বর্ষকার সেখানে গিয়া বলেন যে, অজাতশত্রু তাঁহাকে অন্যায়ভাবে বিতাড়িত করিয়াছেন এবং বিনিময়ে মহামাত্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। সেখানে অল্প সময়ের মধ্যেই পরস্পরে কলহের সৃষ্টি করিয়া অজাতশত্রুকে সংবাদ দেন এবং অজাতশত্রু সসৈন্যে যাইয়া অল্পায়াসেই লিচ্ছবীদের ধ্বংস করিয়া চলিয়া আসেন।

বুদ্ধদেব অন্তিম চারিকার সময় পাটলীপুত্রে পদার্পণ করেন। শুল্ক আদায়ের জন্য কখনও লিচ্ছবীরা, কখনও অজাতশত্রু সসৈন্যে আসিয়া পাটলী গ্রামবাসীদের গৃহ হইতে বহিষ্কার করিয়া, কখনও অর্ধমাস, কখনও পূর্ণমাস অবস্থান করিতেন। গ্রামবাসীরা পীড়িত হইয়া "এই আমাদের বাসস্থান হইবে" বলিয়া নগরের মাঝামাঝি এক মহাশালা নির্মিত করে। ভগবানের পদার্পণের দিনই তাহা সমাপ্ত হয়। এদিকে বর্ষকার সুনীধ সেনাপতিকে লইয়া নগরের চারিদিকে প্রাকার নির্মাণ করাইয়া সেনানিবাস স্থাপনা করিতেছিলেন। যে দ্বার দিয়া ভগবান নিষ্ক্রান্ত হন, বর্ষকার তাহার নাম রাখেন গোতম দ্বার এবং গঙ্গার যে ঘাটে ভগবান উপস্থিত, তাহার নাম রাখেন গোতমতীর্থ। উত্তরকালে এই পাটলী গ্রামই সুবিশাল মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানীর গৌরব পায়। শিশুনাগ বংশীয় কালাশোকের সময় রাজগৃহ হইতে রাজধানী পাটলীপুত্রে স্থানান্তরিত হয়।

যেমন উত্তরে লিচ্ছবীরা মগধ রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, সেইরূপ দক্ষিণে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্য ছিল অবন্তী। কোশল রাজ্যের সহিত মগধের যুদ্ধবিগ্রহ হইতে থাকিলেও মগধই বেশীর ভাগ জয়ী হইয়াছে, কিন্তু লিচ্ছবী ও অবন্তীর ভয়ে মগধকে সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। লিচ্ছবীদের সহজে পরাস্ত করার পরও মগধকে অবন্তীর আগমনের ভয় করিতে হইয়াছে। বুদ্ধ নির্বাণের কিছু পর একবার রাজগৃহে অবধি আক্রমণের সম্ভাবনা হয়। সে সময় স্থবির আনন্দ রাজগৃহেতেই। বর্ষকার অবন্তী কর্তৃক আক্রমণ ভয়ে উপানন্দ নামক এক সেনাপতিকে লইয়া রাজগৃহ সুরক্ষিত করিতেছিলেন (মঝ্ঝিমনিকায়—গোপক মোগল্লান সুত্র)। অবন্তী রাজ্যের সীমানা মগধ রাজ্যের কোথায় মিলিত ঠিক বলা যায় না। যদি বিন্ধ্যগিরির পূর্ব সীমায় কোথাও মিলিত, তাহা হইলেও এই দিক ঘন জঙ্গলে পূর্ণ থাকায় এইদিক হইতে হঠাৎ রাজগৃহ আক্রমণ সম্ভব নয়। যতদূর মনে হয় গঙ্গার উপত্যকা লইয়াই এই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যের বিরোধ উপস্থিত হয়। চেদী রাজ্যের (পূর্ব বুন্দেলখণ্ড) কিছু কিছু অংশ প্রদ্যোতের অধীন ছিল। বোধ হয়, জামাতা বৎসরাজ উদয়নের রাজ্যের ভিতর দিয়াই প্রদ্যোৎ রাজগৃহ অভিযানের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। রাজা উদয়নও বোধ হয় মগধের ভয়ে অবন্তীকে পথ ছাড়িয়া দিতে সম্মত ছিলেন। উদয়ন পুত্র প্রদ্যোৎ দৌহিত্র বোধি-রাজকুমার মগধের জন্য সুংসুমার গিরি (চুণার) সসৈন্যে অবস্থান করিতেন। বর্ষকারের কূটবুদ্ধিতে অবন্তী রাজের আক্রমণ সঙ্কল্পকার্যে পরিণত হয় নাই।

হিমালয়ের পাদদেশীয় লিচ্ছবী গণতন্ত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অতিশয় শক্তিশালী ছিল। লিচ্ছবীরাই বজ্জিকুল নামে খ্যাত। ইঁহাদের জন্য কোশল ও মগধকে অত্যন্ত সন্ত্রস্থ থাকিতে হইত। ইঁহাদের ভয়েই অজাতশত্রু পাটলী গ্রামে সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করিতে বাধ্য হন। শুল্ক আদায়ের জন্য মগধের অন্তর্গত পাটলী গ্রামে আসিয়া মাসাবধিকাল বাস করা—জোর করিয়া মগধের প্রাপ্য শুল্ক নিজেরা আদায় করিয়া লওয়া ইত্যাদি প্রভূত শক্তির পরিচয় দেয়। লিচ্ছবীদের নাগরিকতার নীতি অতিশয় প্রণালীবদ্ধ ছিল। ইঁহাদের সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধ আনন্দকে বলেন—"যতদিন লিচ্ছবীরা সমবেত হইয়া সন্নিপাত (বৈঠক) করিবে, সমবেত হইয়া উত্থান করিবে, সমবেত হইয়া করণীয় কার্য করিবে, যতদিন ইঁহারা অ-প্রজ্ঞপ্তকে (অন্যায়) প্রজ্ঞপ্ত বলিয়া প্রচার না করিবে, প্রজ্ঞপ্ত ত্যাগ না করিবে, যতদিন ইঁহারা বৃদ্ধদের সৎকার করিবে, কুলকামিনী ও কুমারীদের হরণ না করিবে, নগরের ভিতরের ও বাহিরের চৈত্যাদি পূজা করিবে, অর্হৎদিগের

পূজা করিবে, ততদিন তাহাঁরা অজেয় থাকিবে।" (দীঘ-নিকায়—মহাপরিনির্বাণসূত্র)। এই কথা শুনিয়া বর্ষকার ই'হাদের আপোষের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করিতে তৎপর হন। বুদ্ধনির্বাণের প্রায় তিন বৎসর পরে মগধরাজ কর্তৃক বৈশালী উৎসন্ন হয়।

ই'হাদের ন্যায়বিচারের প্রণালী সম্বন্ধে অষ্টকথায় পাওয়া যায়—বজ্জি রাজাদের নিকট 'এই চোর, এই অপরাধী' বলিয়া আনয়ন করিলে, তাঁহারা স্বয়ং বিচার না করিয়া অপরাধীকে বিনিশ্চয় মহামাত্যের হস্তে দিতেন। বিনিশ্চয় মহামাত্যের বিচারে যদি নির্দোষ সাব্যস্ত হইত, তিনি মুক্তি দিতেন, অন্যথায় ব্যবহারিকের হস্তে দিতেন, তিনিও নির্দোষ হইলে মুক্তি দিতেন, অন্যথায় সূত্রধরের হস্তে দিতেন, এই-রূপে সূত্রধর হইতে অষ্টকুলক, অষ্টকুলিক হইতে সেনাপতি, সেনাপতি হইতে উপরাজ, উপরাজ হইতে গণপতির (রাজা) হস্তে অপরাধীটি সমর্পিত হইত। গণপতির বিচারে নির্দোষ হইলে, ধৃত ব্যক্তি মুক্তি পাইত, নচেৎ 'প্রবেণী-পুস্তক' (Penal Code) মতে তাহার শাস্তি হইত।

ইহাদের সুসংবদ্ধ বিচারপ্রণালী ও নাগরিকদের অধিকার স্পষ্ট হয়। ইহাদের নাগরিকতার অনুকরণ মগধ ও কোশলেও হইত। রাজধানী বৈশালী অতিশয় সমৃদ্ধশালী নগরী। নগরে সর্বশুদ্ধ ছয়টি রমণীয় চৈত্যের (দেবস্থান) উল্লেখ আছে—চাপাল চৈত্য, উদয়ন চৈত্য, গোতমক চৈত্য, সপ্তাম্র-চৈত্য, সারন্দদ চৈত্য ও বহুপুত্রক চৈত্য (উদানর ৬।১); ইহাদের মধ্যে নগরের বাহিরে চতুর্দিগয়ে—পূর্বে বহুপুত্রক, দক্ষিণে গোতমক, পশ্চিমে সপ্তাম্র ও উত্তরে বহুপুত্রক চৈত্য অবস্থিত ছিল (দীঘনিকায়—পথিকসূত্র)। বাকী দুইটি চাপাল ও উদয়ন নগরের মধ্যেই ছিল। এই সব চৈত্য কোন দেবতার উদ্দেশে, তাহা বোঝা যায় না। দীঘনিকায়—মহাসময় সূত্রে বৈশালী নগর-বাসী নাগরাজদের উল্লেখ পাওয়া যায়। হয়ত এই সব চৈত্যাদি ঐ সব নাগরাজগণের উদ্দেশোই উৎসগীকৃত ছিল।

এত সত্ত্বেও বৈশালীর পতন অনিবার্য ছিল। প্রধান কারণ বজ্জিপতিদের আকাশস্পর্শী দম্ভ ও কূটনীতিজ্ঞ রাজমন্ত্রীর অভাব। তাঁহারা রাজা অজাতশত্রুর বলকায়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিতেন, কিন্তু মহামাত্য বর্ষকারের কূটবুদ্ধির কাছে পরাস্ত হন।

এইখানে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে, প্রবল লীচ্ছবী গণতন্ত্র সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য আজিও যথেষ্ট সংগ্রহীত হয় নাই—কিন্তু যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা গ্রন্থিত করিয়া লীচ্ছবী ইতিহাসের উপর যথেষ্ট আলোক-সম্পাত করা যায়। দুঃখের বিষয়, সে চেষ্টা আজও কোনও ঐতিহাসিক বিশদভাবে করেন নাই। আশা করি, নিকট ভবিষ্যতে এইরূপ কোনও প্রচেষ্টা হইবে।

বিস্তৃতি ও জাঁকজমকে বৎসরাজ্য কোশল হইতে বিশেষ ন্যূন ছিল না এবং কোশল রাজ্যের মতই অন্তঃসার-শূন্য ছিল। শুদ্ধ বৎসরাজ্যের অতিরিক্ত ভর্গ এবং চেদীর কিছু কিছু অংশ ও উত্তর পশ্চিমের দক্ষিণ পাঞ্চালও ইহার অধীন ছিল। ইহার পশ্চিমে দুইটি ছোট রাজ্যের উল্লেখ আছে—প্রথম সুরসেন রাজধানী মথুরা, দ্বিতীয় কুরু-রাজধানী থুল্লকোট্ঠিত। মথুরার রাজা মাথুর অবন্তিপুত্র প্রদ্যোতের দৌহিত্র। প্রদ্যোতের দ্বিতীয় কন্যার সহিত বৎসরাজ উদয়নের বিবাহ হয়। কারও কারও মতে সুরসেন বৎসরাজ্যের প্রভাবে অন্তর্গত ছিল, কিন্তু এরূপ মনে করিবার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না। অবন্তিরাজ প্রদ্যোৎ ক্রমশঃই নিজের প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন এবং সুরসেন যে তাঁর প্রভান্তর্গত ছিল, সেকথা সহজেই চোখে পড়ে। তার পূর্বে কি ছিল, বলা যায় না।

কুরুরাজ্যের বিস্তৃতি ঠিক বলা যায় না। মনে হয়, যমুনার দুই পারেই কিছু কিছু ছিল। বুদ্ধদেবের সময়ের রাজধানী থুল্লকোট্ঠিত মীরাট মুজঃফরপুর বা সাহারাণপুর জেলার কোথাও ছিল। সে সময়কার কৌরব্যরাজ অতিশয় বৃদ্ধ ও অনুকায়িক বায়ুরোগে পীড়িত ছিলেন। আয়ুষ্মান রাষ্ট্রপালের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেছেন—"আমি এই সমৃদ্ধ সমস্ত কুরুরাজ্যেরই স্বামী।" (মঝ্ঝিমনিকায়—রাষ্ট্রপাল সূত্র)। এই কৌরব্য কোনও কুরুবংশীয় নরপতি। কুরুবংশের প্রধান পুরুষ বৎসরাজ উদয়নের এই ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর কিছু প্রভাব থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু কৌরব্যরাজ অঙ্গ বা কাশীরাজের মত সামন্তরাজ মাত্র ছিলেন না বলিয়া মনে হয়। উত্তরকালে বৎসরাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া অবন্তির গ্রাসে পতিত হইলে কুরুরাজ্য মগধের হাতে আসে।

মগধের পক্ষ হইতে আক্রমণের ভয় বৎসরাজ্যের যথেষ্টই ছিল। মগধের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য কেবাঠি রাজ-কুমার সুংসমরে গিরিতে (চুণার) সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করিয়া সসৈন্যে অবস্থান করিতেন। রাজা প্রদ্যোতও বৎসের পক্ষ লইয়া মগধের উপর পাল্টা আক্রমণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। একবার রাজগৃহ অবধি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মগধ আক্রমণ প্রতিহত হইল বটে, কিন্তু বৎসরাজ্য ক্রমশই অবন্তি-গ্রাসে পড়িল। রাজা উদয়ন বুদ্ধদেবের সমবয়স্ক—পরিনির্বাণের পরও তিনি জীবিত ছিলেন (বিনয় পিটাব-চুল্লবর্গ) অর্থাৎ তখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ। মনে হয় ই'হাদের দ্বিতীয় পুরুষে একদিকে লীচ্ছবী ও কোশল মগধের হাতে আসে এবং অন্যদিকে সমস্ত অধীনস্থ রাজ্য-সমেত অবন্তীর করায়ত্ত হয়। তারপর এই দুই রাজ্যের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেন্দ্রীভূত হইয়া উঠে।

অবন্তিরাজ্যে ভগবান পদার্পণ করেন নাই। অবন্তি-রাজ্য মধ্যমণ্ডলের অন্তর্গত নয়—বিনয় পিটকে ইহাকে 'প্রত্যন্ত দেশ' বলা হইয়াছে। কোশল, মগধ বিশেষ করিয়া বৎসরাজ্যের সম্পর্কেই অবন্তিরাজ্যের কথা জানা যায়। রাজধানী উজ্জয়িনী (উজ্জেন)। মগধের পর যখন অবন্তি ভারতবর্ষে আপনার সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, তখন এই উজ্জয়িনীই সেই সাম্রাজ্যের রাজধানীর গৌরব পায়। রাজা প্রদ্যোৎ অতিশয় কোপনস্বভাব ছিলেন, এইজন্য তাঁহাকে

চণ্ড-প্রদ্যোৎ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রদ্যোৎ একবার শুনিতে পান মগধে 'বুদ্ধে'র আবির্ভাব হইয়াছে। বোধ হয় মগধের সহিত প্রতিযোগিতার জন্যই তিনি রাজপুরোহিত মহাকাত্যায়নকে যে কোনও প্রকারেই হোক অবন্তিরাজ্যে বুদ্ধের পদার্পণ সম্ভব করিতে অনুরোধ করেন। এমন কি মহাকাত্যায়ন ভগবানের নিকট ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করিতে চাহিলেও তাহাতে সম্মত হন। মহাকাত্যায়ন সপারিষদ আসিয়া রাজগৃহে ভগবানের নিকট ভিক্ষুব্রত লন। কিন্তু ভগবান অবন্তিরাজ্যে যান নাই, মহাকাত্যায়নকেই পুনঃপ্রেরণ করেন। মহাকাত্যায়ন উজ্জয়িনী পৌঁছিলে রাজা চণ্ড তাঁহার যথেষ্ট সৎকার করেন ও কাঞ্চন-বন উদ্যানে স্থবিরের জন্য বিহার নির্মাণ করাইয়া দেন। অঙ্গুত্তরনিকায়ে অষ্টকথায় স্থবির মহাকাত্যায়ন কর্তৃক রাজা প্রদ্যোতের বুদ্ধের অনুরক্ত হইবার কথা উল্লিখিত আছে, কিন্তু এ বিষয়ের যাথার্থ ঠিক বলা যায় না। অবন্তী দেশে ভিক্ষু কম থাকাতে এবং স্থানীয় বিশেষত্বের জন্য প্রত্যন্তবাসি ভিক্ষুদের জন্য ভিক্ষু বিনয়ে কিছু পরিশোধন করা হয় (মহাবর্গ)। পরিনির্বাণের পর মহাকাত্যায়ন মথুরায় বাস করিতেন এবং তাঁহার উপদেশ শুনিয়া মাথুর অবন্তি-পুত্র (প্রদ্যোতের দৌহিত্র সুরসেনের রাজা) বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘের শরণ গ্রহণ করেন।

বৎসরাজ্য অবন্তীর করায়ত্ত হইলে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অবন্তী ও মগধ এই দুই প্রভূত পরাক্রমশালী শক্তির মধ্যে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে। অবন্তীর কি ত্রুটির জন্য মগধ তাহাকে ডিঙাইয়া ভারতবর্ষে প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপনের সুযোগ পায়, সে ঐতিহাসিক তথ্য আজিও রহস্যাবৃত।

চাকর

(৩০৯ পৃষ্ঠার পর)

বিছানায় শুয়ে ভাবলাম—গোপাল আর এসেছে! এবার দেশে চিঠি লিখে একটা পাড়াগেঁয়ে ভূত আনাব, নইলে কলকাতার চাকর নিয়ে আর চলবে না। কিন্তু ইতিমধ্যে...? —কাল থেকে আবার চাকর খোঁজা সুরু।

পরের দিন সকাল বেলায় প্রাতর্ভ্রমণ সেরে বাড়ি ঢুকছি, এমন সময়ে দেখি গোপাল থলি হাতে বাজারে বেরুচ্ছে। আমাকে দেখে একবার থতমত খেয়ে দাঁড়াল, তার পর হঠাৎ পা দুটো জড়িয়ে কেঁদে ফেললে। বললে, "দোহাই বাবু! মাকে বলেবন না। আর কখনও হবে না এমন কাজ। কি করব বাবু, বোশেখ মাস এসে গেল মোটে দেড়শ' জমেছে... এই ক'টা টাকার জন্যে......"



ভুল

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

(৭)

শোভা কলিকাতায় আসিয়াছে এবং তাহাকে লইয়া যোগেশকে কলিকাতায় রীতিমত ঘরসংসার পাতিয়া বসিতে হইয়াছে, দিন তিনেক পর স্বয়ং যোগেশের নিকট এই সংবাদ পাইয়া অমল একেবারে লাফাইয়া উঠিল। সজোরে যোগেশের হাত দুইখানি ঝাঁকিয়া দিয়া সে কহিল, "এখনই আমাকে তার কাছে নিয়ে চল যোগেশ, পরিচয়টা আজই হয়ে যাক।"

যোগেশ আপনাকে বন্ধুর বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া একটু দূরে সরিয়া বসিল।

অমল হাসিমুখে কহিল, "পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না আসে তবে মহম্মদই পর্বতের কাছে যাবে,—এটা অনেক পুরাতন কথা। তোমার বেলায় কথাটা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল, নয়?"

যোগেশ উত্তর দিল না, কিন্তু অমল কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া বলিয়া চলিল, "তোমাকে বলেছিলাম না যোগেশ, একবার যখন এ বন্ধন তুমি গলায় পরেছ, একে এড়াতে পারবে না। বরং যতই একে এড়াতে চেষ্টা করবে ততই এ ফাঁস গলায় আরও জোরে আটকাবে। কাজেই উপদেশ গ্রহণ কর বন্ধু, বৃথা চেষ্টা ছাড়।"

"কি করব?" যোগেশ গম্ভীরমুখে জিজ্ঞাসা করিল।

"আমরা যা করছি," অমল উত্তর দিল, "বরং তার চাইতে আরও একটু বেশী; কেন না জীবিকার জন্য তোমাকে বাইরে ঘুরতে হবে না। সুতরাং সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা ও রাত্রিতে মহারাণীর দরবারে হাজিরা দাও, তাঁর হুকুম তামিল কর আর জীবমাত্রেরই যা প্রথম কর্ত্তব্য, অর্থাৎ নিজের জাতিকে বাঁচিয়ে রাখা, তাই প্রতিপালন কর।"

যোগেশ ব্যথিতকণ্ঠে কহিল, "সত্যই কি তোমাদের জীবন এমনই একটা একঘেয়ে, নির্জীব কদর্যতা? এর চাইতে মহৎ, এর চাইতে মধুর কিছুই কি তোমাদের জীবনে নেই?"

যোগেশের স্বর শুনিয়া অমল আর রহস্য করিতে পারিল না। একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "হয়ত আছে।"

"তবে?" যোগেশ সাগ্রহে কহিল, "সেটুকু বাদ দিয়ে কি করে আমার চলবে?"

অমল উত্তরে কহিল, "বাদ দিয়ে কেন? কিন্ত তার সন্ধান ত তুমি বাইরে থেকে পাবে না যোগেশ।—যাকে তুমি কদর্যতা বলছ তারই মধ্যে ডুবে যেতে পারলে তবেই এ মধুরতার স্বাদ পাবে। পাঁক না ঘাটলে পদ্ম তোলা যায় না, এ পুরাতন উপমা কি তোমার জানা নেই?"

"কিন্তু তোমাকে ত সব কথাই বলেছি," যোগেশ কহিল, "এ যে কেবলই পাঁক। এর কোনখানেই ত পদ্মের চিহ্নমাত্রও দেখা যায় না।"

অমল গম্ভীর হইয়া কহিল, "ভুল করো না যোগেশ। জীবনকে যদি উপভোগ করতে চাও তবে স্বপ্নের বিলাস তোমাকে ছাড়তে হবে। আকাশের চাঁদ মাটির পৃথিবীতে মাটির মানুষ হাতের তেলোতে পায় না, এ উপলব্ধি যদি তোমার না থাকে তবে উর্বশীকে বিয়ে করলেও তুমি সুখী হতে পারবে না।"

যোগেশ চুপ করিয়া রহিল। অমল একটু পরে পুনরায় কহিল, "এ আলোচনা এখন থাক, তার চাইতে চল, বৌদির সঙ্গে আমার পরিচয়টা আগে করিয়ে দাও। আমিই তালিম দিয়ে সব ঠিক করে দেব।"

যোগেশ উপদেশ শুনিয়া কি মনে করিল বলা যায় না, কিন্তু পরদিনই সে অমলকে শোভার কাছে লইয়া গেল।

অপরিচিত একজন যুবাপুরুষকে যোগেশের সঙ্গে সোজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বাহিরে মনোমোহনবাবু অসহ্য বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন, অন্তঃপুরে শোভা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়া আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া দিল।

নৈরাশ্য ও বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া যোগেশ শোভাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "ইনি আমার বন্ধু অমল, এর সামনে তোমার অত লজ্জা করবার কোন কারণ নেই।"

শোভা উত্তর দিল না, ঘোমটা খুলিল না, স্থাণু হইয়া বসিয়া বসিয়া সে কেবল ঘামিতে লাগিল।

অবস্থার এই দুঃসহ অস্বাভাবিকতাটুকুকে লঘু পরিহাসের হাওয়ায় উড়াইয়া দিবার উদ্দেশ্যে অমল শোভাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "ঘোমটা খুলুন বৌদি, মহাদেবের তপস্যা যিনি ভঙ্গ করলেন তাঁকে একবার দেখি।"

অথচ এমন সাদর সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরেও শোভার নত মুখখানি বরং আরও খানিকটা নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

যোগেশ অমলের মুখের দিকে চাহিয়া বিরক্তকণ্ঠে কহিল, "তোমার দেবীদর্শন ত হল অমল, এইবার চল।"

যোগেশের মন্তব্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই অমল শোভাকে উদ্দেশ করিয়াই কহিল, "আমার দুর্ভাগ্য, আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সুবিধা আজ হল না। কিন্তু আমি বৌদি নাছোড়বান্দা। আপনার সঙ্গে পরিচয় আমি করবই। আপনার মুখ দেখব, আপনার কথা শুনব, আপনার হাতের রান্না খাব; আর আমার দিক থেকে আমার এই লক্ষ্মীছাড়া ক্ষ্যাপা বন্ধুটিকে কি করে সংসারে বাঁধতে হবে সে বিদ্যা আপনাকে আমি শিখাব।"

তথাপি শোভা কথা কহিল না; উহাও উপেক্ষা করিয়া অমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে কহিল, "আজ তবে আসি বৌদি। আর একদিন আসব এবং সেদিন না খেয়ে যাব না তা আগে থেকেই বলে রাখছি।"

অমল চলিয়া গেলে মনোমোহনবাবু যোগেশকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, "কাজটা কি ভাল হল যোগেশ?"

"কি কাজটা?"

"এই ওঁকে বাড়ির ভিতর নিয়ে যাওয়া?"

ইঙ্গিতটুকু বুঝিয়া যোগেশ ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর কহিল, "অমল আমার বন্ধু; আমার স্ত্রীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মধ্যে দোষের কিছুই নেই।"

"দোষ আছে তা আমিও বলছি না," মনোমোহনবাবু উত্তর দিলেন, "তবু এ আচার আমাদের সংসারে নূতন। একে কি না আনলে চলে না?"

নতমুখে কিন্তু দৃঢ়স্বরে যোগেশ উত্তর দিল, "নূতন আমিও, তবু আমাকে সংসারে যায়গা দিতে হয়েছে। নূতন বলেই সব কিছু ঠেকিয়ে রাখা যায় না, রাখা উচিতও নয়।"

মনোমোহনবাবু অপ্রসন্নমুখে কহিলেন, "তোমার অভিরুচি। তবে আমার মনে হয় যে, আগুন নিয়ে খেলা না করাই ভাল।"

ইহারই প্রসঙ্গে রাত্রে শোভা জিজ্ঞাসা করিল, "ওঁর সঙ্গে কথা বলি নি বলে রাগ করেছ?"

"রাগ আর কি করব?" যোগেশ তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর দিল, "তবে অমন করে ওঁকে তুমি অপমান করবে তা আমি ভাবি নি। এ জানলে ওকে আমি নিমন্ত্রণ করে বাড়িতে আনতাম না।"

শোভা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আমি বুঝতে পারি নি। তুমি যদি চাও আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু তাতে তোমার দুঃখ ও লজ্জা আরও বাড়বে না ত?"

"কি বলছ?" কথাটা বুঝিতে না পারিয়া যোগেশ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল।

শোভা মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "ভাবছি যে আমার রূপগুণ ওঁর কাছে আরও প্রকাশ হয়ে পড়লে তোমার দুঃখ ও লজ্জা হয়ত বাড়বেই।"

যোগেশ চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণকাল পর শোভা তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া কাতরকণ্ঠে কহিল, "তুমি আমাকে যা আদেশ করবে আমি তাই করব। কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে তুমি আর দূরে ঠেলে দিও না। যখন সত্যি দূরে ছিলাম তখন তোমার যে অবহেলা আমি সইতে পেরেছি, আজ এত কাছে থেকেও সেই অবহেলা আমি আর সইতে পারি না।"

যোগেশ নিজের হাতখানি মুক্ত করিয়া লইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "তোমাকে আমি অবহেলা করছি না ত।"

শোভা কহিল, "অবহেলা আর কাকে বলে?" সারাদিনে তোমার দেখা পাই না, দেখা হলেও তুমি কথা বল না, এমন কি, রাত্রেও তুমি আমায় এড়িয়ে চল—এও যদি অবহেলা না হয় তবে অবহেলা আর কাকে বলবে?"

তথাপি যোগেশ চুপ করিয়া রহিল। দেখিয়া শোভা কহিল, "উত্তর দিচ্ছ না যে?"

যোগেশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "কি উত্তর দেব? আমাদের বিয়েটাই হয়েছে একটা মস্ত ভুল—আমার বাবার ভুল, তোমার জ্যেঠামশায়ের ভুল, হয়ত বা আমারও ভুল।"

শোভা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর কহিল, "না হয় তা স্বীকারই করলাম। কিন্তু সে ভুল যখন আর শোধরাবার উপায় নেই তখন কেন আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ?"

যোগেশ তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর দিল, "কষ্ট একা তোমারই নয়; আমারও কিছু কম কষ্ট হচ্ছে না।"

শোভা সহসা যোগেশের একখানি হাত দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া আবদারের সুমিষ্টকণ্ঠে কহিল, লক্ষ্মীটি, আর কষ্ট করো না। যা হবার তা ত হয়েই গেছে; এখন—"

শোভার বাক্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই যোগেশ নিজের হাত টানিয়া লইয়া কঠিনকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ভালবাসা জবরদস্তিতে হয় না শোভা। বেশী টানাটানি করলে দড়ি হয়ত একেবারেই ছিঁড়ে যাবে।"

শোভা কোন উত্তর দিল না, কিন্তু তাহার দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ যোগেশ স্পষ্ট শুনিতে পাইল। ক্ষণকাল পর শোভা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বন্ধু বিয়ে করেছেন?"

তন্দ্রাজড়িতকণ্ঠে যোগেশ উত্তর দিল, "হুঁ।"

শোভা কহিল, "তবে ওঁদের দুজনকেই একদিন নিমন্ত্রণ কর না কেন।"

যোগেশ ছোট্ট করিয়া কহিল, "আচ্ছা।"

(৮)

অতঃপর গৌরীকে লইয়া অমল যেদিন যোগেশের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল সেদিন শোভা এমনই সুনিপুণ কৃতিত্বের সঙ্গে আতিথেয়তার কর্তব্য পালন করিল যে উহাতে বিন্দুমাত্রও খুঁত ধরিবার উপায় রহিল না। কলিকাতায় আসিবার পর প্রায়-সমবয়সী এই যে মেয়েটির সঙ্গে তাহার প্রথম পরিচয় হইল সেই গৌরীকে সে সর্বান্তঃকরণেই গ্রহণ করিল এবং দুইটিতে ভাবও জমিয়া উঠিল গভীর। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই গৌরী স্বয়ং রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া শোভার ঘোর আপত্তিসত্ত্বেও ময়দার থালা ও লুচি বেলিবার বেলন ঝির হাত হইতে টানিয়া লইয়া স্বয়ং পিঁড়ি পাতিয়া লুচি গড়িতে বসিয়া গেল এবং উহার পর রান্নাঘরের খুঁটিনাটি শত রকমের কাজকর্মের ভিতর দিয়া দুইটি অপরিচিতা নারী কখন যে পরস্পর পরস্পরের বন্ধু হইয়া উঠিল উহা কেহই বুঝিতে পারিল না। গৌরীর কাছে শোভা তাহার নিজের মনের কপাট নিঃসংশয়ে খুলিয়া দিল।

অমলের সঙ্গে শোভা কথা খুব বেশী বলিল না, তথাপি নিজের আজন্ম-অর্জিত সংস্কার ও অভ্যাসকে দূরে ঠেলিয়া [illegible] অমলের সঙ্গে কথা বলিল, অমলের সকৌতুক নির্বন্ধাতিশয্যে তাহার সঙ্গে দেবর-বৌদি সম্বন্ধকে স্বীকার করিয়া লইয়া ঐ সম্বন্ধসুলভ পরিহাসের মধ্যে সহজভাবে যোগ দিবার প্রয়াস পাইল এবং সর্বোপরি সেবাও যত্নের আন্তরিকতায় অমলকে সে সত্যসত্যই তাক লাগাইয়া দিল।

তাই রাত্রে বিদায়ের প্রাক্কালে অমল যখন উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বৌদি, এতদিন লক্ষ্মীদেবীর কথা কেবল বইতেই পড়েছিলাম, আজ তাঁকে স্বচক্ষে দেখে ধন্য হলাম," তখন সে একটুও ছলনা বা অতিশয়োক্তি করিল না।

নিজের স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া সে কহিল, "দুখানা বই পড়বার গর্বে মাটিতে পা ফেলে চলতে চাও না; কিন্তু বই পড়েও কত নীচে যে তুমি পড়ে রয়েছ এবং আরও কত শিক্ষাই যে তোমার বাকি রয়েছে তা আজ আমার এই বৌদিটির কাছে শিখে নাও।"

গৌরী হাসিয়া কহিল, "সত্যি তাই। কিন্তু শিক্ষা ত একদিনে সম্পূর্ণ হবে না, বার বার পড়া নিতে হবে। তার জন্য প্রায়ই আমি এই ইস্কুলে হাজিরা দেব তা কিন্তু আজই তোমায় বলে যাচ্ছি শোভাদি।"

শোভা লজ্জায় মুখ লাল করিয়া বসিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না।

তথাপি তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া অমল কহিল, "বড় অহঙ্কার নিয়ে এসেছিলাম বৌদি যে, আমার এই বন্ধুটিকে বাঁধবার বিদ্যা আপনাকে আমরা শিখিয়ে যাব। কিন্তু সে অহঙ্কার আমার ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। কারণ দেখলাম যে যে শক্তি ভগবান স্বয়ং আপনাকে দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছেন তাকে এড়াতে পারে তেমন শক্তিমান আমার এই বন্ধুটি নয়। আজ হউক, কাল হউক, এই শক্তির কাছে মাথা তাকে নোয়াতেই হবে।"

যোগেশ অসহিষ্ণুর মত বলিয়া উঠিল, "নাও, নাও। এখন যাবে ত চল। আমার আবার একবার বেরুতেই হবে। মজদুর য়ুনিয়নের আপিসে জরুরি কাজ রয়েছে।"

"রাখ তোমার মজদুর য়ুনিয়ন," অমল কহিল, "ওসব এখন ছাড় যোগেশ। তোমার ঘরের মধ্যেই যে শীতল পানীয় রয়েছে তাকে উপেক্ষা করে মরীচিকার পিছনে আর ছুটো না—তা সে মরীচিকার যে রূপেই তোমাকে আকর্ষণ করুক।"

কিন্তু যোগেশ এ আলোচনা আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে দিল না। বন্ধুকে সে একরকম ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া নিজেও তাহাদের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল।

যোগেশ বিদায় লইয়া নিজের পথে প্রস্থান করিতেই গৌরী স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "আহা, দিদির বড় দুঃখ।"

"কিছু বুঝলে নাকি?" অমল সচকিতে জিজ্ঞাসা করিল।

"এ বুঝা তেমন শক্ত নয়," গৌরী উত্তর দিল, "কিন্তু বুঝে কি লাভ? এ দুঃখ ত তার কোনদিনই ঘুচবে না।"

"কেন, তুমি একটু তালিম দিয়ে দিতে পারবে না?" অমল জিজ্ঞাসা করিল, "এই ধর খানকয়েক বাছা বাছা বই পড়িয়ে আর ছবি দেখিয়ে?"

"তুমিও যেমন।" গৌরী স্বামীর মুখের উপর একটা সহাস্য কটাক্ষ হানিয়া কহিল, "তোমরা, পুরুষমানুষেরা, মুখেই এই সব গুণবিদ্যার কথা বল; কিন্তু আসলে তোমরা মেয়েদের রূপ ছাড়া আর কিছু চাও কি? শোভাদির দুর্ভাগ্য যে সেই জিনিষটিই তার নেই, আর হবারও নয়।"

অমল ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া কহিল, "তোমার সঙ্গে আমার মত মিলল না গৌরী, কারণ আমি পুরুষমানুষ। আমি জানি যে, তোমার ঐ আগুনের শিখার মত রূপ নিয়েও তুমি আমায় বেঁধে রাখতে পারতে না যদি রূপের চাইতেও ঢের বড় আর একটা কিছু তোমার মনের মধ্যে না থাকত।"

গৌরী লজ্জা পাইয়া মুখ নত করিল।

সেই মুখের দিকে চাহিয়া অমল স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "আকৃতি আর রূপ এক কথা নয় গৌরী। বর্ণের সঙ্গেও রূপের কোন সম্বন্ধ নেই। আসল যা রূপ তা মনের একটা বিশেষ জিনিষের প্রতিচ্ছবি। শোভাবৌদির মনের মধ্যে সেই জিনিষটি আছে কি না তাই খুঁজে দেখতে হবে, না থাকলে তাকে সৃষ্টি করবার চেষ্টা করতে হবে।"

গৌরী কিন্তু হাসিয়া উত্তর দিল, "চেষ্টা করে দেখতে পার। তবে ফল তাতে উলটোও হতে পারে।"

রাত্রে শোভাও তাহার স্বামীকে ঠিক এই কথাটাই তাহার নিজের মত করিয়া বলিল।

সমস্ত দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের দুরতিক্রম্য ক্লান্তিসত্ত্বেও শোভা শুইবার ঘরে স্বামীর জন্য জাগিয়া বসিয়াছিল। তাহার আশা ছিল যে, আতিথিসৎকারের কর্তব্য যথাশক্তি সম্পাদন করিয়া অমলের নিকট হইতে সে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করিয়াছে, ক্ষীণ হউক, প্রতিধ্বনির মত হউক, তেমনই প্রশংসার দুই চারিটি কথা স্বামীর মুখ হইতেও সে শুনিতে পাইবে। কিন্তু আসলে যখন তেমন কিছুই ঘটিল না এবং অনেক রাত্রে বাড়ীতে ফিরিয়া শোভাকে একটি সম্ভাষণ মাত্র না করিয়াই যোগেশ নিঃশব্দে শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল তখন শোভার দুই চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া সে ধরাগলায় কহিল, "আজও কি তোমার বন্ধু ও বন্ধুর স্ত্রীকে আমি অপমান করেছি?"

"না ত," বলিয়া যোগেশ চমকিয়া শোভার মুখের দিকে চাহিল।

স্বামীর দৃষ্টি এড়াইয়া শোভা কহিল, "মুখে ঐ কথা বলছ, কিন্তু মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছ নিশ্চয়। নইলে প্রশংসার একটা কথাও কি তোমার মুখ থেকে বেরুত না?"

যোগেশ পাশবালিশটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া উহারই মধ্যে মুখ লুকাইয়া মৃদুস্বরে কহিল, "না, অসন্তুষ্ট হই নি; তবে তোমাকে প্রশংসা করতে হবে তেমন কিছুও তুমি কর নি।"

শোভার মুখের উপর বেদনার ছায়া ঘন হইয়া উঠিল। স্বামীর দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া পরে সে মৃদু অথচ তপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমাকে তুমি যা খুসী বলতে পার। তবু তোমার সামনেই যে বাইরের একজন লোক আমার অত প্রশংসা করে গেলেন সে কথাও তুমি অস্বীকার করতে পার না।"

যোগেশ চকিতে একবার শোভার মুখের দিকে চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ পুনরায় উপাধানের মধ্যে মুখ লুকাইল। অতঃপর সে কহিল, "না অস্বীকার করি না, আর অমল যা বলেছে তা আমিও বলি—রান্নার প্রতিযোগিতায় অনেক ভাল ভাল ঠাকুরকেই তুমি হার মানাতে পার; আর নামকরা পরিচারিকাদের মধ্যেও তোমার জুড়ী হয়ত খুব বেশী পাওয়া যাবে না।"

শোভার দুই গণ্ড বাহিয়া বড় বড় দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সে অবরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আর কি চাও তুমি? বল—তোমাকে পাবার জন্য তাই আমি করব।"

যোগেশ মুখ তুলিল না, কিন্তু উত্তর দিল, "বৃথা চেষ্টা। আমি যা চাই তা তুমি নও। কোনদিন তুমি তা হতে পারবেও না।"

শোভার ওষ্ঠপ্রান্তে বিষাদের বড় করুণ এক টুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "তবু বলই না শুনি—দেখি যদি চেষ্টা করবার যোগ্যতাও আমার মধ্যে থাকে।"

যোগেশ ঈষৎ বিরক্তকণ্ঠে কহিল, "সে যোগ্যতাও তোমার নেই। থাকলে কিসের যে তোমার অভাব তাও বুঝতে পারতে। অন্তত আজ নিশ্চয়ই পারতে কারণ যার মধ্যে সে সব গুণ রয়েছে তেমন একটি মেয়েকে আজ সারাদিন খুব কাছে থেকেই তুমি দেখতে পেয়েছ।"

"গৌরীদি'র কথা বলছ?" শোভা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল।

যোগেশ উত্তর দিল না। ক্ষণকাল পর সশব্দে একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস মোচন করিয়া শোভা মৃদু অথচ করুণকণ্ঠে কহিল, "ঠিকই বলেছ। ও রূপ ত আমার নেই, আর কোনদিন হবেও না।"

শোভার কণ্ঠস্বরে অভিমান বা অভিযোগের কোনই আভাস প্রকাশ পাইল না, তথাপি ঐ কণ্ঠস্বরই যোগেশের মনের পিঠে যেন সজোরে এক ঘা চাবুক বসাইয়া দিল। মুখে প্রকাশ করিয়া না বলিলেও সে যে এক রূপহীনা নারীকে তাহার রূপহীনতার জন্যই আঘাত করিয়া বসিয়াছে এই কথা বুঝিয়া তাহার অনেক ছবির রূপে রঞ্জিত ও পুঁথির রসে সঞ্জীবিত সচেতন চিত্ত অকস্মাৎ লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া গেল এবং শোভার কাছে যতটা হউক আর না হউক, নিজের কাছে একটা সাফাই গাহিবার জন্যই তৎক্ষণাৎ সে নিজের কণ্ঠস্বরে অনেকখানি দৃঢ়তা ঢালিয়া দিয়া কহিল, "না, না; রূপের কথা মোটেই হচ্ছে না। কিন্তু রূপছাড়াও মানুষের আর যা যা থাকতে পারে আমি তারই কথা ভাবছিলাম।"

"আর কি?" শোভা কহিল, "গুণের কথা, লেখাপড়ার কথা, চাল-চলনের কথাও যদি বল—আমি স্বীকার করছি যে গৌরীদির তুলনায় আমি কিছুই নই। কিন্তু আমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে ওদের মত করবার জন্য তুমিও ত কোনদিন কিছু কর নি।"

অভিযোগ শুনিয়া যোগেশের সর্বাঙ্গে সহসা যেন আগুন ধরিয়া উঠিল। সে মুখ তুলিয়া কঠিনকণ্ঠে কহিল, "সে কাজটা করা উচিত ছিল তোমার বাবার, আমার নয়।"

কিন্তু কথা কয়টি নিজের কাণে যাইতেই উহাদের কদর্য ইতরতাও যেন বড় সুস্পষ্টভাবেই যোগেশের হৃদয়ঙ্গম হইয়া গেল। একটি অসহায়া নারীকে এমনইভাবে বার বার আঘাত করিবার লজ্জা ও গ্লানিতে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। সেই মেয়েটিরই সম্মুখে মুখ লুকাইয়াও কিছুতেই সে আর থাকিতে পারিল না এবং যাহাকে সে আঘাতের পর আঘাত করিয়া গেল তাহার দিকে আর না চাহিয়াই শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ সে প্রথমে গৃহ ও তৎপর বাড়ী ছাড়িয়াই বাহির হইয়া গেল।

নিজের শিক্ষা, সুরুচি ও শ্লীলতাবোধকে ইতরের মত বিসর্জন দিয়া একটি নিরপরাধা মেয়েকে সে পুনঃ পুনঃ অপমান করিয়াছে, আঘাত করিয়াছে, এমনই একটি অপরাধের অনুভূতি বুকের মধ্যে বহন করিয়া শহরের পথে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াই যোগেশ যখন নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিল তখন রাত্রি আর খুব বেশী ছিল না। তাহার তখনও মনে হইতেছিল যে,

আঘাত ও অপমানের বেদনায় শোভা হয়ত বা কোন একটা নিদারুণ কাণ্ডই করিয়া বসিয়াছে। তাই ভয়ে ভয়ে পা টিপিয়া টিপিয়া সে যখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শোভাকে শয্যায় নিদ্রিতা দেখিতে পাইল তখন একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল।

মুক্ত বাতায়নপথে ম্লান চন্দ্রের আলো শায়িতা শোভার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই মুখের দিকে চাহিয়া যোগেশ অনেকক্ষণ শয্যার পার্শ্বে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। যোগেশ ভাবিয়াছিল যে, আঘাত ও অপমানের বেদনায় ঐ মুখখানিও আজ বিচিত্র হইয়া উঠিবে। কিন্তু শোভার সুষুপ্ত মুখের উপর কোন ভাবের কোন একটি রেখাও তাহার চোখে পড়িল না।

একটি উদ্গত দীর্ঘনিশ্বাস সযত্নে চাপিয়া যোগেশ নিঃশব্দে শয্যার একপ্রান্তে শুইয়া পড়িল।

(৯)

পরদিনও শোভার ব্যবহারে কোন তারতম্য দেখা গেল না এবং তাহার পরেও না। অথচ যোগেশ সেই রাত্রির কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। শোভাকে অকারণে আঘাত করিবার স্মৃতি অপরাধের একটা অনুভূতিতে রূপান্তরিত হইয়া যেন একটা জগদ্দল পাথরের মত তাহার বুকের উপর চাপিয়া রহিল এবং যাহার বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ ও অভিমানের অন্ত নাই তাহারই কাছে নিজেকে অপরাধী ভাবিতে ভাবিতে তাহারই জন্য যোগেশের অন্তরে তাহার নিজের অজ্ঞাতে বিন্দু বিন্দু করিয়া অনুকম্পা জমা হইয়া উঠিতে লাগিল।

তাই দিনকয়েক পরে অমল ও গৌরী দুইজনেই যখন ধরিয়া বসিল যে শোভাকে বিদুষী না হউক, অন্তত চলনসই রকমের লেখাপড়া শিখাইবার জন্য রীতিমত একটা চেষ্টা করা হউক তখন যোগেশ 'না' বলিতে পারিল না।

আলোচনাটা উঠিল অমলের বাড়ীতে ও কথাটা তুলিল গৌরী আর তাহাও শোভারই সম্বন্ধে যোগেশের মুখের খুব কঠিন একটি মন্তব্যের প্রত্যুত্তরে।

সেই দিনের অভিযোগের আলোচনা সম্পর্কে অমলের মুখ হইতে শোভার হিন্দুনারীসুলভ অসংখ্য গুণাবলীর প্রশংসার প্রত্যুত্তরে যোগেশ বিরক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছিল, "এ সব মামুলি কথা সেকালের উপন্যাসে লেখা চলত অমল, কিন্তু একালে এ সব কথা গোপন পারিবারিক বৈঠকেও বলা চলে না। যে সব গুণের প্রশংসা তোমার মুখে আর ধরে না তা যে গুণ এবং সংসারে তার প্রয়োজনীয়তাও যে আছে যথেষ্ট তা আমি অস্বীকার করি না। তবে তুমিও এ কথা অস্বীকার করতে পারবে না অমল যে, তোমার পরিচারকাটি এই সব গুণে বৌদিকে হার মানিয়ে দেয় বলেই নির্গুণা বৌদিকে তালাক দিয়ে পরিচারিকাকে শয্যাসঙ্গিনী করবার জন্য তুমি পাগল হয়ে উঠ না।"

ইহারই উত্তরে গৌরী কহিল, "বেশ ত যোগেশবাবু, পুঁথি-মুখস্থ করা বিদ্যা, ধারকরা সাজসজ্জা ও অন্তঃসারশূন্য চাকচিক্যের উপরেই আপনার এত যদি ঝোঁক তবে শোভা বৌদিকে তাই বরং শিখিয়ে নিন না। বইতেই ত লেখা আছে যে, শিখবার সময় কারও কোন বয়সেই উত্তীর্ণ হয়ে যায় না।"

অমলও কহিল, "ঠিকই ত। উনি তোমার স্ত্রী। ওঁকে শেখাবার কর্তব্যও ত তোমারই। একালের শিক্ষা ওর নেই বলেই উনি যদি তোমার মনের মত না হয়ে থাকেন, তবে ওর শিক্ষার ব্যবস্থাই করে দাও না কেন?"

অমলের কথা কতকটা শোভার কথারই প্রতিধ্বনির মত শুনাইল। কিন্তু আজ আর যোগেশের মুখে সেই রাত্রির মত একটা কঠিন মন্তব্য ফুটিল না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া যোগেশ কহিল, "বোধ করি বাবার এতে মত হবে না।"

"এই শোন", অমল চটিয়া উঠিয়া কহিল, "এই কাপুরুষের যুক্তির আশ্রয় তুমি যদি নাও যোগেশ, তবে আমরা তোমাকে কিছুতেই ক্ষমা করব না। বাবার ভয়ে নিজের স্ত্রীকে আলোক দিবার কোন চেষ্টাই তুমি করবে না, অথচ আলোকপ্রাপ্তা নন বলেই তাকে তুমি পরিত্যাগ করবে, এ নির্লজ্জ কাপুরুষতা।"

গৌরী সায় দিয়া কহিল, "ঠিকই ত। এ কাপুরুষতা ক্ষমারও অযোগ্য।"

যোগেশ মুখে প্রতিবাদ করিল না। তাহার মনের মধ্যে যে সঙ্কোচ ও যে প্রতিবাদটুকু উঁকিঝুঁকি দিতে লাগিল তাহাও দিন দুই পরের এক ঘটনায় একেবারেই দূর হইয়া গেল।

সেদিন বোধ করি পূর্ণিমার কাছাকাছি কি একটা তিথি ছিল। খিদিরপুরে ডক-মজদুর য়ুনিয়নের আপিসে অনেক রাত্রি পর্যন্ত কাজ করিবার পর ফিরিবার পথে যোগেশ ময়দানের কাছে আসিয়াই ট্রাম গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। আকাশে প্রায় পূর্ণ-চন্দ্র বড় স্পষ্ট হইয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছিল; দূরের ও নিকটের অসংখ্য বিদ্যুতালোকের অস্বস্তিকর তীক্ষ্ণতা সত্ত্বেও ময়দানের চন্দ্রালোকটুকু যোগেশের চোখে বড়ই মধুর লাগিল। উহাই উপ-ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে সে পাকা রাস্তা ছাড়িয়া ময়দানের মধ্যে নামিয়া পড়িল এবং বেড়াইবার মত করিয়া পথ চলিয়া চলিয়া অবশেষে যখন সে বাড়ীতে ফিরিল তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে এবং মনোমোহনবাবু আহারাদি সারিয়া শয্যা আশ্রয় করিয়াছেন।

অন্যান্য রাত্রির মতই সে রাত্রেও শোভা নিজের হাতে পরিবেশন করিয়া স্বামীকে খাওয়াইল; কিন্তু তাহার দিকে চাহিয়া আজ যোগেশের মনে হইল যে শোভা ঠিক যেন সেই আগের শোভাই নাই, কেমন একটা নূতনত্ব তাহার প্রত্যেকটি অঙ্গ ও প্রত্যেকটি ভঙ্গী হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে।

স্পষ্টই বুঝা গেল যে, শোভা কেবল যে সযত্নে বেশবিন্যাশ করিয়াছে তাহাই নহে, তাহার সাজসজ্জার উপর আধুনিকতার একটা ছাপ যেন সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। শোভা বরাবরই সর্বাঙ্গে অলঙ্কার পরিধান করিত; আজ দেখা গেল যে অনাবশ্যক ভারী অলঙ্কার কয়খানি তাহার দেহ হইতে অপসারিত হইয়াছে, টানা খোপা এলো খোপায় রূপান্তরিত হইয়াছে এবং শাড়ি পরিবার ধরণটি পরিবর্ত্তন হওয়ার দরুণ তাহার দেহের বিন্যাস ও রেখাগুলি সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার ললাটের উজ্জ্বল সিন্দুর বিন্দু ও তাহার নীচে কাচপোকার টিপটির নীলাভ চাকচিক্য উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে ঝলমল করিয়া জ্বলিতেছিল। কি একটা এসেন্সের সুমিষ্ট গন্ধও যোগেশের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল।

এই সব লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত যোগেশ এক সময়ে খাওয়া ভুলিয়া শোভার দিকে চাহিয়া রহিল।

সলজ্জ স্মিতমুখ নত করিয়া শোভা কহিল, "ভারী লজ্জা করছে আমার—দিদি এইসব করে গেলেন।"

"কে দিদি? কি করে গেলেন?" যোগেশ মহাবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল।

"কে আবার! গৌরীদি", শোভা উত্তর দিল, "তিনি আর অমলবাবু আজ বৈকালে এসেছিলেন কি না।"

"ও", বলিয়া যোগেশ পুনরায় আহারে মনোসংযোগ করিল।

"তোমার জন্য অনেকক্ষণ বসে বসে এই কিছুক্ষণ আগে তাঁরা চলে গেলেন", শোভা কহিল।

যোগেশ কহিল, "হুঁ।"

শুইবার ঘরের পরিবর্তনও যোগেশের দৃষ্টি এড়াইল না। উজ্জ্বল সাদা আলোকটির পরিবর্তে একটি অল্প শক্তির নীল

বাল্‌ব্‌ হইতে মৃদু স্নিগ্ধ আলোক বিকীর্ণ হইতেছিল। সেই আলোকেও উপাধানের পার্শ্বে কয়েকছড়া বেলফুলের মালা যোগেশের চোখে পড়িল।

এ সবই গৌরীর কীর্তি তাহা যোগেশ বুঝিল, কি উদ্দেশ্যে যে এসব আয়োজন হইয়াছে তাহাও সে মনে মনে অনুমান করিয়া লইল; অথচ আশ্চর্য এই যে, অন্যান্য দিনের মত সে মনের মধ্যে তেমন একটা বিরক্তি বোধ করিল না।

শোভা কিন্তু সঙ্কুচিতকণ্ঠে কহিল, "এ সবও দিদিরই কাজ। আমার কিন্তু একটুও দোষ নেই।"

যোগেশ হাসিয়া ফেলিল, কহিল, "তোমার দোষ হয়েছে তা বলি নি ত।"

শোভা যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। সে সাগ্রহকণ্ঠে কহিল, "তবে রাগ কর নি তুমি?"

যোগেশ ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল, "না।"

"আঃ বাঁচলাম। যা ভয় হয়েছিল আমার!" শোভা একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল।

কিন্তু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিবার পর যোগেশ কহিল, "কিন্তু এ সব কেন শোভা? তুমি যা চাও তা আমি কোনদিনই তোমায় দিতে পারব না।"

শোভা স্বামীর খুব নিকটে সরিয়া আসিয়া মৃদু অথচ সনির্বন্ধকণ্ঠে কহিল, "আমি তোমার যোগ্য নই তা আমি জানি। কিন্তু আমার কথাও একটিবার তুমি ভেবে দেখ। তুমি ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই! তোমাকে না পেলে আমার জীবন যে একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

শোভা যোগেশের খুব কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার নিশ্বাস যোগেশ নিজের ললাটের উপর অনুভব করিতে লাগিল, শোভার দেহের সুবাস যোগেশের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে কেমন যেন একটা বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া তুলিল।

শোভা সহসা স্বামীর পায়ের কাছে নতজানু হইয়া বসিয়া দুই হাতে তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া সাগ্রহদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি আমার স্বামী, তুমি ছাড়া আমার যে আর গতি নেই!"

শোভার স্পর্শ যোগেশ তাহার দেহের সমস্ত অণু পরমাণু দিয়া অনুভব করিল; নীল মৃদু আলোকে শোভার বিহ্বল মুখখানি আজ যেন বড় মধুর হইয়াই যোগেশের চোখে ধরা পড়িল এবং দেখিতে দেখিতে তাহার দেহের প্রত্যেকটি রক্তবিন্দুতে অকস্মাৎ যেন আগুন ধরিয়া গেল। আজ সর্ব্বপ্রথমে যোগেশ তাহার নিজের উপরে সমস্ত কর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলিল এবং নিজের দুই বলিষ্ঠ বাহু দিয়া শোভাকে সজোরে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সে উন্মত্তের মত তাহার গণ্ড, ওষ্ঠ ও ললাটের উপর চুম্বন করিতে সুরু করিয়া দিল।

কিন্তু উত্তেজনার যখন অবসান হইয়া গেল তখন অবসাদ আসিয়া কেবল যোগেশের দেহটিকেই অধিকার করিয়া বসিল না, তাহার মনকেও যেন একটা ক্লেদাক্ত অনুভূতিতে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিল।

যে নারীকে সে ভালবাসে না তাহারই বাহুবন্ধনের মধ্যে সে যে এক দুর্দমনীয় প্রেরণায় আত্মহারা হইয়া স্বীয় কামনার পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া বসিয়াছে ইহাই পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া একটা দুর্নিবার লজ্জায় তাহার নিজের মাথাটা নিজের হাতে গুঁড়াইয়া ফেলিবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। যোগেশের মনে হইল যে তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদটি হেলায় হারাইয়া আজ সে একেবারেই নিস্ব হইয়া পড়িয়াছে—বাহিরে কাহারও কাছেই আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার মুখ তাহার নাই।

অথচ তাহার কণ্ঠলগ্না শোভার উষ্ণ স্পর্শ ও চুলের গন্ধ কেমন যেন একটা নিষ্ঠুর আঘাতে অনবরতই তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল যে, আজ সে যাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই এবং যে নারী পরিপূর্ণ অধিকারের জোরে ও উহারই নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় এখনও তাহার বক্ষ আশ্রয় করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে উহাকে অতঃপরও সে ঠেলিয়া ফেলিতে পারিবে না; অধিকন্তু তাহার নিজের ভিতরের যে পশু আজ মুখের বলগা এড়াইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছে, অতঃপর হয়ত বা সে এই সুনির্দিষ্ট নিরাপদ পথেই নিয়মিত পরিতৃপ্তির অনুসন্ধান করিবে। আজ যোগেশ সর্বপ্রথমে সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিল যে পাঁচ বৎসর পূর্বে স্বীয় অন্তরের দুর্বলতাবশত পিতার আদেশ অমান্য করিতে না পারিয়া যে দুর্ভেদ্য ব্যূহের মধ্যে সে প্রবেশ করিয়াছিল, উহারই মধ্যে আজও সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং ঐ ব্যূহ হইতে বাহির হইবার কোন পথ নাই এবং থাকিলেও সে পথ তাহার অজ্ঞাত।

একটা অন্তহীন হাহাকারের ভিতর দিয়া তাহার অন্তর বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে পাশবিকতার পঙ্ককুণ্ড হইতে উদ্ধার যদি তাহার না-ই থাকে তবে ঐ পাশবিকতাকে নিছক দেহের রাজ্য হইতে সামান্য ঊর্ধ্বেও কি তুলিবার উপায় নাই?

ঘুমাইবার ব্যর্থ চেষ্টায় সমস্ত রাত্রি একটা অর্ধসচেতন অবস্থার মধ্যে কাটাইয়া ভোরের দিকে যোগেশ যখন সম্পূর্ণ সচেতন হইয়া উঠিল তখনও শোভা তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া ঘুমাইতেছিল। ঊষার অস্পষ্ট আলোকে শোভার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া একটি উদ্গত দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করিয়া যোগেশ ডাকিল, "শোভা।"

অর্ধউন্মীলিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া শোভা উত্তর দিল, "কি?"

যোগেশ কহিল, "তোমাকে আমার মনের মত করবার জন্য আমি যদি তোমার সুশিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা করে দি', তুমি লেখাপড়া শিখবে তাহলে?"

শোভা ঈষৎ সংশয়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "পারব কি?"

যোগেশ কহিল, "একবার চেষ্টা করেই দেখ না কেন?"

শোভা স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা।"

(ক্রমশ)

মেক্সিকোর বর্ত্তমান অবস্থা

রেজাউল করীম এম এ, বি এল

ইউরোপীয় মহাসমরের রণদামামা ঘোর রবে বাজিয়া উঠিয়াছে। অন্য কোন দেশেরও যে কোনওরূপ সংবাদ থাকিতে পারে, তাহা আমরা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছি। যুদ্ধ! যুদ্ধ!—কেবল যুদ্ধেরই সংবাদ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে! যাহারা যুদ্ধ করিতেছে, আর যাহারা যুদ্ধে সাহায্য করিতেছে অথবা যুযুধান কোন পক্ষকে শাসাইতেছে, আমরা কেবল তাহাদেরই কথা ভাবিতেছি। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়া আজ আমাদের নিকট "সংবাদ।" হিটলার, মুসোলিনী, চার্চিল আজ আমাদের সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন। আমাদের চক্ষুর অগোচরে অন্যান্য দেশেও যে বিপ্লবের চক্র ধীরে ধীরে ঘুরিতেছে, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি না। আজ একটি অখ্যাত দেশের কথা বলিব, যেখানে ধীরে ধীরে বিপ্লবের



আজানা

চক্র ঘুরিতেছে। মহাসমর না হইলে হয়ত সেই দেশেই একটা ছোটখাট সমর হইয়া যাইত। কিন্তু মহাসমর আসিয়া সে দেশের সংবাদটাকে আজ পশ্চাতে ফেলিয়া দিয়াছে—যুক্তরাষ্ট্রের পার্শ্ববর্তী 'মেক্সিকোর' কথাই বলিতেছি।

আজ কয়েক বৎসর হইতেই মেক্সিকোতে বিপ্লবের ধারা বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। মেক্সিকো চিরবিপ্লবের আবাস-ভূমি। বর্তমান মেক্সিকো গণতন্ত্র আটাশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র। ইহার পরিধি ৭,৬৭,১৬৯ বর্গমাইল। ইহার জনসংখ্যা ১৮,৫১২,৮৩৭। ইহার একদিকে যুক্তরাষ্ট্র, মধ্য-আমেরিকা ও অন্যদিকে প্রশান্ত ও আটলাণ্টিক মহাসাগর। বহু বৎসর পূর্বে মেক্সিকো স্পেনের অধীনে ছিল। সেইজন্য এখানে স্পেনীয় ভাষা প্রচলিত। ইহার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৫৫ জনের মধ্যে প্রাচীন আমেরিকান ও স্পেনীয় রক্তের সংমিশ্রণ রহিয়াছে। শতকরা ১৪ জন অধিবাসী শ্বেত জাতির বংশসম্ভূত এবং অবশিষ্ট অধিবাসীর মধ্যে প্রাচীন রক্ত বিশুদ্ধভাবে রহিয়াছে। এই দেশ হইতে প্রাচীন সভ্যতা একরূপ লোপ পাইতে বসিয়াছে। সর্বত্র ইউরোপীয় সভ্যতা গৃহীত হইয়াছে। দেশের কিয়দংশ লোক এখনও প্রাচীন ভাষা ব্যবহার করে এবং প্রাচীন রীতিনীতি এখনও পরিত্যাগ করে নাই। আমেরিকা আবিষ্কারের কয়েক বৎসরের মধ্যে স্পেন রাজ মেক্সিকোতে স্পেনীয় প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। ১৫২১ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন স্পেন রাজশক্তি মেক্সিকোর আজটেক্ (Aztec) সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিয়া দেন এবং দেশটিকে স্পেনের অধীনে আনয়ন করেন। পরে সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির প্রভাবে সমগ্র দেশটিতে স্পেনের উপনিবেশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রায় তিনশত বৎসর পর্যন্ত মেক্সিকো স্পেনের অধীনে ছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মেক্সিকোর ধনরত্ন লুণ্ঠিত হইয়া স্পেনে নীত হইতে লাগিল। স্পেন অত্যাচার ও নিপীড়নের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। কিন্তু ১৮২১ সাল হইতে মেক্সিকোতে জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ইহার ফলে স্পেনের অবাধ প্রভুত্ব খর্ব হইতে থাকে। এই বৎসরই স্পেনের শেষ গভর্ণর পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং মেক্সিকো স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু স্বাধীন হইয়াও সে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতে পায় নাই। কারণ সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্কন্ধে নানা বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে দেশে অন্তর্বিপ্লব দেখা দিল। তদুপরি বাহির হইতেও বহু বিপদের ঝাপটা আসিয়া মেক্সিকোকে আলোড়িত করিয়া দিল। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির দিক হইতে মেক্সিকো একটা নূতন জাতি মাত্র। এই সবেমাত্র সে স্বাধীনতা পাইয়াছে। একটু শান্তি সুখ পাইলে মেক্সিকো সব বিপদ সামলাইতে পারিত। কিন্তু তাহা হইল না। বিপদের উপর বিপদ আসিয়া তাহার অস্তিত্বকে বিচলিত করিয়া দিল। কিন্তু মেক্সিকোর নেতাগণ কিছুতেই হাল ছাড়িলেন না। তাঁহারা সকল বিপদ অতিক্রম করিয়া মেক্সিকোকে নিরাপদ কূলে আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। আজ মেক্সিকোর রাজনৈতিক আদর্শ পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করিয়াছে। আজ সে কাহারও ভ্রূকুটিভঙ্গে বিচলিত নহে; বরং সাম্রাজ্যবাদীদের চোখরাঙানির প্রত্যুত্তর দিতে সে শিখিয়াছে। আজ তাহার শক্তি এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সে ইউরোপের মধ্যমশ্রেণীর যে কোন শক্তির সহিত পাল্লা দিতে পারে।

বেশীদিনের কথা নয়, মাত্র ১৯১৭ সালে মেক্সিকোর গঠনতন্ত্র রচিত হইয়াছে। এই নূতন গঠনতন্ত্র অনুসারে সমগ্র দেশে একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—২৮টি রাষ্ট্র লইয়া এই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। প্রত্যেক রাষ্ট্রকে পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র গভর্ণর, আইন পরিষদ ও বিচার বিভাগ রহিয়াছে। আইন পরিষদ গণভোট দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকে। এই আটাশটি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে যে ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্র গঠিত, তাহাও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়। ফেডারেল আইনসভার সমস্ত শক্তি একটি কংগ্রেসের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। এই কংগ্রেসের দুইটি শাখা আছেঃ—একটির নাম "চেম্বার অব ডেপুটিজ" (Chamber of Deputies)। ইহা দুই বৎসরের

জন্য নির্বাচিত হয়। অপরটির নাম "সিনেট।" সিনেট ৫৮১ জন সদস্য দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক রাষ্ট্র হইতে দুইজন করিয়া সদস্য সিনেটের জন্য নির্বাচিত হন। সভাপতি নির্বাচিত হন ছয় বৎসরের জন্য। সভাপতি পরবর্তী নির্বাচনে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। সভাপতি সাতজন সেক্রেটারী লইয়া তাঁহার মন্ত্রণা পরিষদ গঠন করেন। আজ প্রায় কুড়ি বৎসর হইল মেক্সিকোতে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কয়েক বৎসর ধরিয়া মেক্সিকো গভর্নমেন্ট জনসাধারণের কল্যাণের জন্য নানাবিধ আইন ও কর্মধারা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি কারণে সে সব কাজ এখনও গুছাইয়া তুলিতে পারেন নাই। প্রধান কারণ হইতেছে মেক্সিকোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী জাতিসমূহের অযথা হস্তক্ষেপ। ইহারা নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া মেক্সিকোর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতি হইতে দেয় নাই। এই কৌশলগুলি কি তাহাই এখন বর্ণনা করিব।

কাগজে কলমে মেক্সিকো আজ প্রায় একশত বৎসর হইতে আর স্পেনের উপনিবেশ নাই। কিন্তু কার্যত মেক্সিকোর উপর ইউরোপের বিভিন্ন জাতির নানা অধিকার রহিয়া গিয়াছে। অর্থনৈতিক দিক হইতে মেক্সিকো কিছুদিন পর্যন্ত উপনিবেশের মতই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। এই দেশের নানাপ্রকার ধাতু ও পেট্রোল জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছে। প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার ধাতু এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানে পেট্রোল এত বেশী পাওয়া যায় যে, সমগ্র জগতের দৃষ্টি ইহার উপর নিপতিত। এইসব মূল্যবান সম্পদের কারণে শতাব্দী পূর্বে ইংরেজ, ডাচ আমেরিকানগণ তাহাদের সাম্রাজ্যের রথে ইহাকে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ইহার একটুও নড়িবার চড়িবার উপায় নাই। সুতরাং স্পেনের কবল হইতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইয়াও অর্থনৈতিক ব্যাপারে মেক্সিকো তাহার নিজের দেশের সম্পদের অধিকারী হইতে পায় নাই। বিদেশীরাই ইহার উপর অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব চালাইয়া আসিতেছে। স্পেনের কবল হইতে মুক্তি পাইবামাত্র অন্যান্য দেশ অর্থনৈতিক দাসত্ব দ্বারা দেশকে দুর্বল করিতে লাগিল। তাহারা দেশের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিবার জন্য অধিকতর সুবিধা আদায় করিয়া লইতেছে। বর্তমান শতাব্দীর তিন দশকে মেক্সিকোর অধিকাংশ ক্ষেত্র, খনি ও জল বিদেশীদের দখলে আসিয়া পড়িয়াছে। মেক্সিকোর বিভিন্ন গভর্নমেন্ট দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য যে সব পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এইসব বিদেশী প্রভুত্ব তাহা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। নিজেদের অধিকার ও সুবিধাগুলিকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য বিদেশী শক্তিবর্গ সর্বদাই দেশের মধ্যে অন্তর্বিপ্লব ও অশান্তি জাগাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাহাদের অযথা হস্তক্ষেপের ফলেই দেশে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হয় নাই। অর্থনৈতিক দিক দিয়া দেশ স্বাধীন হইতে পারে নাই,—প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল থাকা সত্ত্বেও দেশ দারিদ্রের পঙ্কে নিমজ্জিত। আজিও ইহার শিল্প সেই আদিম অবস্থায় রহিয়াছে। বর্তমান প্রণালী অবলম্বন করিবার প্রত্যেক উদ্যমকে বিদেশী শক্তিবর্গ বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। এইরূপ অবস্থা কোন স্বাধীন দেশ বরদাস্ত করিতে পারে না। মেক্সিকো সরকারও পারিলেন না। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের জন্য মেক্সিকো সরকার নিজেরাই অগ্রণী হইয়া বিধি ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে দেশের জনসাধারণকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতেই বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক মনোভাব দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার ফলে



মিঃ কার্ডেনাস

রেলওয়ে ও কতকগুলি প্রধান প্রধান শিল্পের ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করিলেন। এই দুইটি কার্য দেশের অন্যান্য সম্পদকে "জাতীয় সম্পত্তি" বলিয়া গ্রহণ করিবার নীতির পরিপোষক হইল। আর ইহাকে কেন্দ্র করিয়া দেশের মধ্যে প্রবলভাবে আন্দোলন আরম্ভ হইল। একদল সমর্থক যেমন দাঁড়াইল, সেইরূপ একদল বিরুদ্ধবাদী হইয়া রাষ্ট্রশক্তিকে বাধা দিতে লাগিল। দেশের অধিকাংশ সম্পদ বিদেশীর দ্বারা অধিকৃত অথবা নিয়ন্ত্রিত হইত। সুতরাং এইগুলির পরিপূর্ণ জাতীয়তা সাধনই হইতেছে দেশের প্রকৃত কল্যাণ। আর এগুলিকে জাতীয় করিয়া লওয়ার মানেই হইতেছে এইগুলির উপর বিদেশীদের স্বত্ব স্বামীত্ব অস্বীকার করা এবং সেগুলিকে দেশের উন্নতিকল্পে বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া। এইজন্য এইসব বিদেশী বণিকগণ যে কোন যুগান্তকারী পরিবর্তনকে প্রাণপণে বাধা দিতে লাগিল এবং নানারূপ গোপন প্রচারণা দ্বারা দেশের মধ্যে গণ্ডগোল বাধাইতে সচেষ্ট হইল। দেশবাসীর মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগাইতে কসুর করিল না। এমন কি ১৯২৫ সালে তাহারা প্রেসিডেন্ট কালেসের বিরুদ্ধে আন্দোলন

করিয়া দেশের মধ্যে একটা জটিল আন্তর্জাতিক সংকট সৃষ্টি করিল। ইহাদের ষড়যন্ত্রের ফলে প্রেসিডেণ্ট দেশ উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, অর্থাভাবে তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কারণ তিনি উচিত সুদ দিয়াও কোথাও টাকা ধার পাইলেন না।

অবস্থা যখন এইরূপ সঙ্গীন হইয়া উঠিল, তখন মিঃ কারডেনাস (Cardenas) ১৯৩৪ সালে সভাপতি নির্বাচিত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মেক্সিকোর ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। কারডেনাস তাঁহার যোগ্যতা ও স্বদেশপ্রীতির কারণে দেশের 'আজানা' হইয়া পড়িলেন। আজানা যেমন স্পেনে নূতন যুগ আনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সভাপতিত্বকালে মেক্সিকোর অবস্থা গৃহযুদ্ধের পূর্বে স্পেনের মতই হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি কার্যদক্ষতা দেখাইয়া দেশের বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন। এই বৎসর জানুয়ারী মাসে তাঁহার কার্যকাল শেষ হইয়াছে। গঠনতন্ত্র অনুসারে তিনি পুনরায় সভাপতি হইতে পারেন না। তাই তাঁহার দলস্থ একজনকে সেই পদের জন্য নির্বাচন প্রার্থী করিলেন। যদিও কারডেনাস প্রকৃতপক্ষে সর্বক্ষমতার কেন্দ্র, তবুও দেশ হইতে সংকট এখনও কাটিয়া যায় নাই, বরং দিন দিন গভীর হইতে গভীরতর হইয়া পড়িতেছে। কারডেনাসের দল ক্ষমতা পাইয়া শান্তভাবে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে পরিবর্তন আনয়ন করিতে লাগিলেন। একটা ষষ্ঠবার্ষিক পরিকল্পনা রচিত হইল, তদনুসারে সমস্ত প্রধান শিল্পকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 'জাতীয় সম্পত্তি' করিয়া তুলিবার চেষ্টাও হইতেছে। এই দল "বাসব্যবস্থা" ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে। পূর্বে এই দুইটি প্রয়োজনীয় বিষয় অবহেলিত হইয়াছিল। রাশিয়ার আদর্শে দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর করিবার ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৮ সাল এই চারি বৎসরের মধ্যে তের হাজার নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আর এইসব বিদ্যালয়ের জন্য সমাজতান্ত্রিক আদর্শে 'কারিকুলাম' রচিত হইয়াছে। সংবাদপত্রের প্রচার দ্রুত বাড়িতেছে। পূর্বে ১৪ কোটিখানা সংবাদপত্র বিক্রয় হইত। এখন সেই স্থানে কুড়ি কোটিখানা সংবাদপত্র বিক্রয় হইতেছে। নাগরিক স্বাধীনতার ব্যাপারে কারডেনাসের দল নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার সময় মেক্সিকো যেমন পরিপূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা পাইয়াছে, পূর্বে সে কখনও সেরূপ পায় নাই। কৃষি সংক্রান্ত পরিবর্তন হইতেছে কারডেনাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ব্যাপারে তিনি প্রাচীন মেক্সিকোর সত্যিকারের গণতন্ত্র রীতি প্রবর্তন করিয়াছেন। "গ্রাম্য কম্যুন" প্রথা প্রবর্তন করিয়া মেক্সিকোর বেকার সমস্যার অনেকটা সমধান করা হইয়াছে। এই প্রথা অনুসারে দুই হাজার একরের অধিক স্টেটগুলি ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে এবং সেগুলি এই সব 'গ্রাম্য কম্যুনের' মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে জনসাধারণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল; কারণ এই পদ্ধতি অনুসারে ভূমিহীন ব্যক্তিগণও কিছু কিছু জমি পাইল। এইজন্য তাহারা রাষ্ট্রকে প্রাণপণে সাহায্য করিতেছে। কারডেনাসের সংস্কারের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে—"বাজেয়াপ্তকরণ"—তিনি কঠোর হস্তে বৈদেশিকদের প্রভুত্ব হইতে তেলের খনি অঞ্চলগুলি বাজেয়াপ্ত করিয়া ফেলিলেন। এইজন্য বিদেশী পুঁজিপতিদের সহিত তাঁহার কঠোর সংঘর্ষ বাঁধিল। কিন্তু তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। কারডেনাসের সমুদয় পলিসির সফলতা নির্ভর করে, তাঁহার বাজেয়াপ্তকরণ পলিসির সফলতার উপর। ১৯৩৮ সালে ব্রিটিশ, আমেরিকান ও ডাচ কোম্পানির সতেরটা তেলের খনি বাজেয়াপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। আর যায় কোথা? সংগে সংগে এই সব দেশ মেক্সিকোর বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। ব্রিটেন তাহার সহিত কূটনীতিক সম্বন্ধ ছেদন করিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশোধ লইবার ভয় দেখাইতে লাগিল। কিন্তু জনসাধারণ ইহাতে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহারা এই বাজেয়াপ্ত নীতিকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করিল। বিদেশীদের আক্রমণকে ভয় না করিয়া গভর্নমেণ্ট যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবর্তন আনয়ন করিলেন, তাহা দেশের পুঁজিপতিগণ সমর্থন করিল না। তাছাড়া এই পলিসি দেশকে যে একটা অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলিয়া দিল তাহা এখনও দূর হয় নাই। আন্তর্জাতিক বয়কটের ফলেও দেশের আর্থিক অবস্থা কঠোর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই অবস্থা বেশী দিন থাকিবে না। সকল দেশেই এইরূপ হয়—পরে সব ঠিক হইয়া যায়। ইহা মনে করা ঠিক হইবে না যে, আন্তর্জাতিক বয়কটই একমাত্র পন্থা, যাহার দ্বারা বিদেশী শক্তিগণ মেক্সিকোকে একেবারেই জব্দ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা আরও নানা পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। এই বাজেয়াপ্ত পলিসি ও কৃষি পলিসি দেশের মধ্যে একদল প্রতিক্রিয়াশীল লোক সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারা দখলচ্যুত জমিদার, মহাজন ও মধ্যস্বত্বভোগীগণ! ইউরোপীয়দের সংগে তাল রাখিয়া ইহারাও এতদিন ধরিয়া লুট করিয়া যাইত—এখন সব যাইতেছে দেখিয়া ইহারা জোট বাঁধিয়া এই সব সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল এবং ইউরোপীয় বণিকদের সহিত মিলিত হইয়া ইঁহারা দেশের কল্যাণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের উদ্যম কার্যকরী হইবার পূর্বে ইউরোপে সমর বাধিয়া গেল। সুতরাং কিছুদিনের জন্য মেক্সিকো সরকার অন্তর্দ্রোহ হইতে বাঁচিয়া গেলেন।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন—এই দুইটি শক্তি মেক্সিকোর বিরুদ্ধে সাক্ষাৎভাবে সংগ্রাম করিতে পারিত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ইংলণ্ড ত অন্যত্র যুদ্ধে লিপ্ত। আর আমেরিকা যুদ্ধের মহড়া করিতেছে। সুতরাং মেক্সিকোতে এই দুই সাম্রাজ্যবাদী জাতি আর বেশী কিছু করিতে

(শেষাংশ ৩৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ছদ্মবেশী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৮

সন্ধ্যার বৈঠকে কথাটা কিন্তু লাবণ্যই উত্থাপিত করিল। প্রশান্তর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিতমুখে সে বলিল, "শুনছ? নিউমোনিয়ার 'পি' ভূত তোমার কাঁধ থেকে এখন তোমার শালীর কাঁধে ভর করেছে।"

শুনিয়া সপুলক নেত্রে সুলেখার দিকে চাহিয়া প্রশান্ত বলিল, "সত্যি না-কি সুলেখা?"

কৃত্রিম বিস্ময়ের বিহ্বলতার সুরে সুলেখা বলিল, "আপনার কাঁধ থেকে আমার কাঁধে ভর করেছে? তার মানে?"

লাবণ্যের দিকে চাহিয়া প্রশান্ত বলিল, "তার মানে বুঝি সুলেখাকে এখনো বলনি?"

লাবণ্য বলিল, "না, এখনো নিউমোনিয়ার কথা ও শোনে নি।"

"আর বিজিগীষা?"

প্রশান্তর কথা শুনিয়া সুলেখা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "বিজিগীষার কথা শুনেছি জামাইবাবু। কিন্তু আপনার কাঁধ থেকে আমার কাঁধে ভর করেছে, তার মানে কি? আপনাকেও নিউমোনিয়ার 'পি'র কথা জিজ্ঞাসা করে না-কি?"

আর্ত কণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "শুধু করে না সুলেখা,—যখনি বাগে পায় তখনি করে।"

"গৌরহরি?"

"গৌরহরি।"

প্রশান্তর মুখমণ্ডলে একটা নিরুপায় কাতরতার ছায়া দেখিয়া সুলেখা পুনরায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল; বলিল, "দুঃসাহস ত' কম নয়! মনিবকে এইসব কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস করে?"

গভীর স্বরে প্রশান্ত বলিল, "মনিবের স্ত্রীকে আরও কঠিন কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস করে। মনিবকে নিউ-মোনিয়ার 'পি'র কথা জিজ্ঞাসা করে; আর মনিবের স্ত্রীকে থাইসিসের 'পি' আর 'এইচে'র কথা জিজ্ঞাসা করে।"

কথাটা বুঝিয়া দেখিবার অভিনয়ে এক মুহূর্ত নিঃশব্দে চিন্তা করিবার ভান করিয়া সহসা হাসিয়া উঠিয়া সুলেখা বলিল, "মনিবের স্ত্রীর কাঁধে ত তা হলে একেবারে যুগল ভূত ভর করেছে দেখছি!"

লাবণ্য বলিল, "মনিবের ভায়রাভাই এলে, আশা করি, সেই যুগল ভূত মনিবের স্ত্রীর কাঁধ থেকে মনিবের ভায়রা-ভায়ের কাঁধে ভর করবে।"

সুলেখা বলিল, "সে আশা কোরো না দিদি,—মনিবের ভায়রাভায়ের বিদ্যেবুদ্ধির ওপর গৌরহরির বিশেষ কিছু আস্থা নেই। থাইসিসের মতো কঠিন সমস্যার কথা একজন অপণ্ডিত লোককে জিজ্ঞেস করতে তার প্রবৃত্তি হবে না।"

সুলেখার কথা শুনিয়া বিস্মিত কণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "অবনীশকে সে অপণ্ডিত মনে করে?"

সুলেখা বলিল, "অন্তত পণ্ডিত মনে করে না। হাইকোর্ট যাবার সময়ে বলছিল, শাক-সব্জির ডাক্তার না হয়ে জামাইবাবুর মতো আইন প'ড়ে ব্যারিষ্টার হলে ঢের ভাল হত।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "দেখ ত' কি অন্যায়! ওর স্পর্ধা ত' বড় কম নয় যে, এইসব কথা বলে!"

লাবণ্যর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুলেখা বলিল, "বলছিল, তোমার সঙ্গেও না-কি একদিন ওই রকম কথাই হয়েছিল।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া লাবণ্য বলিল, "কি কথা হয়েছিল?"

শান্তভাবে সুলেখা বলিল, "ওই যা বললাম, শাক-সব্জির ডাক্তার না হয়ে জামাইবাবুর মতো ব্যারিষ্টার হলে ঢের ভাল হত।"

তীব্র কণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "আমি সেই কথা বলেছিলাম, বলছিল না-কি?"

সজোরে মাথা নাড়িয়া সুলেখা বলিল, "না, না, সে কথা ঠিক বলছিল না,—বরং তোমার সুখ্যাতিই করছিল।"

"সুখ্যাতি আবার কি করছিল?"

"বলছিল, মেমসায়েব আমাকে সাবধান ক'রে দিয়ে বললেন, খবরদার গৌর, সুলেখারা এলে কখনো ওদের কাছে এ-সব শাক-সব্জির ডাক্তার-টাক্তারের কথা বোলোনা।"

কথাটা একেবারেই প্রাঞ্জল নহে এবং শাক-সব্জির ডাক্তারের আলোচনায় লাবণ্য যে গৌরহরির সহিত একমত হয় নাই, তাহা ইহা হইতে নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় না। গৌরহরির বিরুদ্ধে লাবণ্যর অন্তর একেবারে তিক্ত হইয়া উঠিল। একবার মনে করিল সেদিনকার সমস্ত কথা আনুপূর্বিক খুলিয়া বলিয়া তাহার দিকটা পরিষ্কার করিয়া লয়। কিন্তু তাহারই বেতন-ভোগী একজন ড্রাইভারের বিরুদ্ধে সুলেখার নিকট সাফাই গাহিবার মধ্যে সে একটা খর্বতা অনুভব করিয়া নিরস্ত হইল। প্রশান্তকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ, তোমার এই গৌরহরি ড্রাইভার হয় একটি পাকা সয়তান, নয় একটি আস্ত পাগল। মোটের ওপর ও-রকম ভয়ানক লোককে বাড়িতে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। আজই তুমি ওকে বরখাস্ত কর।"

সুলেখা বলিল, "না দিদি, তা কোরো না। আমার এই কথার জন্যে যদি বেচারার চাকরি যায় তা হলে আমি কিন্তু ভারি দুঃখিত হব। যা করতে হয় আমরা চ'লে গেলে তারপর কোরো।"

লাবণ্য বলিল, "তোর কথা না-হয় আলাদা সুলেখা. কিন্তু অবনীশ এলে তাকে যদি ও এই রকম সব অন্যায় কথা বলে তা হলে সে কি মনে করবে বল দেখি?"

সুলেখা বলিল, "সে তুমি নিশ্চিন্ত থাক দিদি, তাঁকে গোরহরি কিছুই বলবে না। তাঁকে কিছু বলা ওর পক্ষে অসম্ভব। তাই কি কখনো সত্যিসত্যি বলতে পারে?"

"তোকে তা হলে কেমন ক'রে বলছে?"

মৃদু হাসিয়া সুলেখা বলিল, "আমাকেও কিন্তু কলকাতায় ঠিক এমন ক'রে বলত না। এখানে এসে ও একেবারে অন্য মূর্তি ধারণ করেছে। কলকাতার গোরহরি এলাহাবাদে এসে একেবারে যেন কেষ্টহরি হয়েছে।"

লাবণ্য বলিল, "শুধু কেষ্টহরি নয়, ধিনিকেষ্টহরি হয়েছে।"

প্রশান্ত বলিল, "তা নয় লাবণ্য, কলকাতার কে'চো এলাহাবাদে এসে কেউটে হয়েছে।"

সুলেখা বলিল, "ঠিক বলেছেন জামাইবাবু, তার মুখের দু'দিকে নিউমোনিয়া আর থাইসিসের দুটো বিষ দাঁত।"

লাবণ্য বলিল, "আসুন দাদা, তারপর বিষ-পাথর দিয়ে বিষ দাঁত উপড়ে ফেলে আবার তাকে কলকাতার কে'চো ক'রে দিচ্ছি।"

সুলেখা বলিল, "তা তোমার করতে হবে না দিদি। দাদা এলে কেউটে আপনি-আপনিই কে'চো হয়ে যাবে।"

লাবণ্য বলিল, "তখন ধিনিকেষ্টহরিও আবার গোরহরি হবে।"

ঠিক এই সময়ে বাহিরে বারান্দায় কাহারো গলা খে'কারির শব্দ শুনা গেল।

ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল, "আজ্ঞে স্যার, আমি গোরহরি।"

শুনিয়া লাবণ্যর দুই চক্ষু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছ?"

বিনয়স্নিগ্ধ স্বরে অবনীশ বলিল, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিচ্ছু করছিনে স্যার, এইমাত্র এসে-এসে দাঁড়িয়েছি।"

তিক্তকণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "এসে-এসে দাঁড়িয়েছ! তার মানে?"

তেমনি নম্র স্বরে অবনীশ বলিল, "তার মানে এসে-এসে দাঁড়িয়ে আপনাকে একটা প্রশ্ন করবার উপক্রম করছি।"

প্রশান্ত চিৎকার করিয়া উঠিল, "চুলোয় যাক তোমার প্রশ্ন করবার উপক্রম! 'এসে-এসে দাঁড়িয়েছি' বলছ কেন? দু'বার 'এসে' বলছ কেন? ভিতরে এসে বল।"

ভিতরে প্রবেশ করিয়া অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে স্যার, আপনি বললেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কি করছ,—দুবার 'দাঁড়িয়ে' বললেন, আমি তাই তার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে দুবার 'এসে' বলেছি।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশান্ত বলিল, "এখন থেকে তা হলে তুমি এই রকম ক'রে ছন্দ মিলিয়ে কথা কইবে না-কি?"

"যদি অনুগ্রহ ক'রে অনুমতি দেন তা হলে কইব।"

দৃঢ় কণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "না, কইবে না। গদ্যে কথা কইবে।"

"গদ্যেরও একটা ছন্দ আছে স্যার, তাকে গদ্যছন্দ বলে।"

"না, গদ্যছন্দেও কথা কইবে না; শুধু গদ্যে কইবে।"

"কাষ্ঠগদ্যে?"

"হ্যাঁ, কাষ্ঠগদ্যে।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া অবনীশ বলিল, "যে আজ্ঞে, তাই কইব। আপনি যখন মনিব, আপনারই মত বলবৎ হবে। এবার তা হলে প্রশ্নটা নিবেদন করি স্যার?"

বিরক্তি সহকারে প্রশান্ত বলিল, "কি তোমার প্রশ্ন?"

অবনীশ বলিল, "বি কে সেন আর তাঁর সহধর্মিণী এসেছেন। তাঁদের নিম্নতলার বৈঠকখানায় বসিয়েছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, তাঁরা উপরে আগমন করবেন, না আপনারা নিম্নে গমন করবেন।"

প্রশান্ত বলিল, "কি আশ্চর্য! তাঁদের এতক্ষণ বসিয়ে রেখে তুমি এইরকম ক'রে এখানে পাগলামী করছ!" তারপর কণ্ঠের স্বর ঈষৎ গভীর করিয়া লইয়া বলিল, "না, আমরা নিম্নে গমন করিব না, তাঁহারাই উপরে আগমন করিবেন। অতএব, তুমি সত্বর নিম্নে অবতরণ করিয়া তাঁহাদিগকে ঊর্ধে আরোহণ করাইয়া আন।"

"নির্ধন বলে বিদ্রূপ করবেন না স্যার।" বলিয়া অবনীশ দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

অবনীশের কথোপকথনের ভঙ্গী এবং ভাষার সৌষ্ঠব দেখিয়া লাবণ্য এবং সুলেখা এতক্ষণ মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়াছিল; অবনীশ প্রস্থান করিলে তাহারা মুখ খুলিয়া সশব্দে হাসিয়া বাঁচিল।

প্রশান্ত বলিল, "সেনেরা চ'লে গেলে গোরহরি সম্বন্ধে একটা যা-হয় পরামর্শ করতে হবে লাবণ্য। ও যে একটি পাগল সে বিষয়ে বোধ হয় আর বিশেষ কিছু সন্দেহ করবার নেই।"

লাবণ্য বলিল, "বেশি দিন থাকলে আমাদেরও পাগল ক'রে তুলবে।"

সুলেখা মনে মনে বলিল, "আমাকে ত' এরই মধ্যে পাগল ক'রে তুলেছে। এক এক সময়ে মনে হয়, দুত্তোর ছাই, দিই সব ফাঁস ক'রে!"

বাহিরে পদধ্বনি শুনিয়া প্রশান্ত বারান্দায় গিয়া অভ্যাগতদের আহ্বান করিল, "এস বিনয়, এস লতিকা।" অবনীশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ রুক্ষ স্বরে বলিল, "গোরহরি, তুমি এখন নীচে গিয়ে বোসো।"

মধ্যবর্তী দরজা দিয়া পার্শ্বের কক্ষে চলিয়া যাইবার জন্য সুলেখা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অঞ্চল ধরিয়া টানিয়া তাহাকে চেয়ারে বসাইয়া মৃদুস্বরে লাবণ্য বলিল, "যাসনে, আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। ভারি চমৎকার লোক এই সেনেরা।"

পর মুহূর্তেই বিনয় এবং লতিকা কক্ষে প্রবেশ করিয়া সহাস্যমুখে লাবণ্য ও সুলেখাকে নমস্কার করিল; তাহার পর সুলেখার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বিনয় লাবণ্যকে বলিল, "ইনি নিশ্চয়ই আপনার ভগ্নী শ্রীমতী সুলেখা মিত্র?"

লাবণ্য বলিল, "নিশ্চয়ই। কিন্তু এরই মধ্যে সে খবর পেলেন কেমন ক'রে ঠাকুরপো?"

প্রশান্ত বলিল, "হয়ত আজকের সকালের কাগজে আমার মাননীয়া শ্যালিকা মহাশয়ার শুভাগমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়ে থাকবে।"

বিনয় বলিল, "ঠিক বলেছেন দাদা,—একেবারে ঠিক তাই-ই। তবে আজ সকালের খবরের কাগজে নয়, আজ সকালের চিঠির কাগজে। পাটনা থেকে আজ অবনীশের চিঠি পেলাম যে, মিসেস্ মিত্র আজ আপনার এখানে আসছেন; আর দিন দু'তিন পরে সে নিজেও আসবে। আপনাদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তার কথা সে কিছুই জানে না, লিখেছে এখানে এসে তার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। কিন্তু লতিকা কিছুতেই সে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে না, আজই এসে পড়ল। শ্রীমতী সুলেখার সঙ্গে তার আলাপ করবার আগ্রহ অতিশয় প্রবল।"

সহাস্যমুখে লতিকা বলিল, "আর তোমার আগ্রহ?"

বিনয় বলিল, "তোমার চেয়ে আমার আগ্রহ কম প্রবল সে কথাও অবশ্য আমি কিছুতেই স্বীকার করব না।"

বিনয়ের কথা শুনিয়া সকলে উচ্চকণ্ঠে হাস্য করিয়া উঠিল।

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করিল, "অবনীশের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি বিনয়?"

বিনয় বলিল, "সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। অবনীশ আমার বাল্যবন্ধু বললেও অন্যায় হয় না।" বলিয়া পকেট হইতে একখানা খাম বাহির করিল। তাহার পর খামের ভিতর হইতে চিঠি বাহির করিয়া প্রশান্তর হাতে দিয়া বলিল, "অবনীশের এই চিঠি আজ পেয়েছি, প'ড়ে দেখলে তার লেখবার কায়দা দেখে খুসি হবেন।"

প্রশান্ত যদি বিনয়ের নিকট হইতে খামখানা লইয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিত, তাহা হইলে নিশ্চয় বুঝিতে পারিত যে, ঠিকানার অংশ টাইপ করা হইলেও টিকিটের উপরকার অস্পষ্ট ডাকচিহ্ন আর যেখানকারই হউক না কেন, পাটনার হইতে পারে না। খামের সহিত চিঠির যোগ আদি ও অকৃত্রিম নহে।

এলাহাবাদের কোনো সরকারী অফিসে বিনয় একজন উচ্চপদের কর্মচারী। তাহার বিলাত যাইবার মাস ছয়েক পরে প্রশান্ত ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসে। বিলাতের সেই অল্পদিনের একত্র অবস্থানকালে প্রশান্তর সহিত তাহার প্রথম পরিচয়। এলাহাবাদে বিনয় বদলি হইয়া আসিবার পর সেই সুদূর প্রবাসজাত দুর্বল পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছে। সন্ধ্যাকালে বিনয় প্রায়ই সস্ত্রীক প্রশান্তর গৃহে বেড়াইতে আসে। কাল সন্ধ্যাকালেও সে একা পদব্রজে প্রশান্তদের গৃহে বেড়াইতে আসিতেছিল এমন সময়ে ঘটনাক্রমে অবনীশের সহিত সাক্ষাৎ।

অবনীশ কিন্তু বিনয়ের পুরাতন বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যেরই একজন। কলিকাতায় এক কলেজের এক শ্রেণীতে তাহারা সহপাঠীত ছিলই, বিলাতেও কিছুকাল উভয়ে একত্রে অধ্যয়ন করিয়াছিল। কথায় কথায় অবনীশ জানিতে পারিল যে, বিনয় প্রশান্তদের সহিত বিশেষ পরিচিত এবং উপস্থিত তাহাদেরই গৃহে যাইতেছে। তখন নিরুপায় হইয়া সে তাহার কাছে তাহার চক্রান্তের কথা প্রকাশ করিয়া বলে এবং এ বিষয়ে তাহার সহযোগিতা ভিক্ষা করে। এমন একটা রসাল এবং কৌতুকপ্রদ চক্রান্তে যোগ দিতে বিনয় ক্ষণমাত্র ইতস্তত করে নাই। আজ সে অবনীশেরই ব্যবস্থাক্রমে এবং উপদেশমত অবনীশের প্রহসনে তাহার নিজ অংশের অভিনয় করিতে প্রশান্তদের গৃহে আসিয়াছে।

অনাবশ্যক বোধে বিনয় তাহার স্ত্রীকে এ চক্রান্তের কথা জানায় নাই। সুলেখাকে কিন্তু অবনীশ দ্বিপ্রহরে বিনয়ের বিষয়ে সমস্ত কথা জানাইয়া দিয়াছিল।

চিঠি শেষ করিয়া বিনয়ের হাতে ফিরাইয়া দিয়া প্রশান্ত বলিল, "চমৎকার চিঠি। ভারি সুন্দর স্টাইল। অবনীশ ত' দেখছি বাঙলা ভাষায় মহা পণ্ডিত ব্যক্তি।"

লাবণ্য বলিল, "তোমার গৌরহরির চেয়েও না-কি?"

প্রশান্ত বলিল, "সেটা অবনীশ এলে তাকে বিজিগীষার মানে আর দুর্বিষহ'র বানান জিজ্ঞাসা করার পর স্থির করা যাবে।"

প্রশান্তর কথা শুনিয়া লাবণ্য ও সুলেখা হাসিতে লাগিল।

কৌতূহলের ভঙ্গীতে বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "গৌরহরি কে দাদা?"

প্রশান্ত বলিল, "ঐ যে-ব্যক্তিটি এখনি তোমাদের অভ্যর্থনা ক'রে উপরে নিয়ে এলেন উনিই হচ্ছেন বাঙলাদেশের কলি-কাতা নবদ্বীপধামের গৌরহরি। শ্রীমতী সুলেখার মতে, যুক্ত-প্রদেশের এলাহাবাদ-বৃন্দাবনে আগমন ক'রে উনি কৃষ্ণহরির রূপ ধারণ করেছেন—এবং তস্যা অগ্রজা শ্রীমতী লাবণ্যর মতে উনি কেবলমাত্র কৃষ্ণহরির রূপেই ধারণ করেন নি, পরন্তু ধিনি-কৃষ্ণহরির রূপ ধারণ করেছেন, যেহেতু ওঁর চাল-বলন প্রভৃতি আচরণাদির মধ্যে সম্প্রতি একটু নৃত্যশীলতার লক্ষণ দেখা দিয়েছে।"

প্রশান্তর কথা শেষ হইলে একটা উচ্চ হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

সহাস্যমুখে বিনয় বলিল, "আজ এত সাধুভাষা দিয়ে কথা কচ্ছেন কেন দাদা?"

গম্ভীরমুখে প্রশান্ত বলিল, "সংক্রম-নিবন্ধন হেতু।"

চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া বিনয় বলিল, "ওরে, বাস্‌রে! এ যে সাধুভাষার চেয়েও বেশি সাধু হ'ল! ঠিক যেন ব্যাকরণের কঠিন সূত্র! একটুও বোঝা গেল না। কিন্তু গৌরহরিকে বাঙলাদেশ থেকে কেন আমদানি করেছেন দাদা?"

(শেষাংশ ৩৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হারম্যান গোয়েরিং

শ্রীসরোজকুমার ঘোষ

জার্মানির দু নম্বর ভাগ্যবিধাতা হারম্যান গোয়েরিং'এর জীবনের অপ্রকাশিত অধ্যায় সম্বন্ধে কিছু বলবার পূর্বে তাঁর দৈহিক পরিচয় দেওয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দেশের কাজের জন্য তিনি বহু উপাধি পেয়েছেন, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পদবীগুলিতে যে কোন একটি উচ্চারণ করলেই, তা গোয়েরিংকে বোঝাবে। পদবীগুলি এই—Iron man, Big Boy, Fat Boy, Human Clothes-Horse, World's Rolly Polly Number One.

গোয়েরিং প্রিয়দর্শন তবে একটু বেশী মোটা—বয়স ৪৬। জার্মানির অনেক কিছুর মত তাঁর দেহের ওজনও একটা গুপ্ত তথ্য। কিন্তু দেশে শত্রুর অভাব নেই—তারা বলে—তাঁর ওজন কমবেশী ২৪০ পাউন্ড। আবার ওই বিরাট দেহ সৈনিকের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে সত্যটি লুকিয়ে আছে, সে সম্বন্ধে অতি বড় শত্রুও স্বীকার করে—An upright soldier with the heart of a child.

"ন্যায়পরায়ণ সৈনিক"—কথাটা চাটুবাক্য নয় কারণ তিনি নিজেই সে কথা প্রমাণ করেছেন। গত মহাযুদ্ধে কাইজারের শ্রেষ্ঠ বৈমানিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম আর আধুনিক কালে সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে তিনি তাঁর অতিমানবরূপী "ফুহ্রার"কে সেবা করছেন তাঁর দক্ষিণ হস্তরূপে।

কিন্তু যাঁরা তাঁকে অন্তরঙ্গ ভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা তাঁর ওই "শিশু হৃদয়" চরিত্রের কথা শুনে অবজ্ঞার হাসি না হেসে থাকতে পারেন না। আসল কথা এই যে, নিষ্ঠুর প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করতে তিনি তাঁর "দেবতা" হিটলারের চেয়ে একটুও উদার হৃদয় নন। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের পর্যন্ত পশুর মত গুলী করে হত্যা করতে তাঁর পাষাণ হৃদয় একটুও কাঁপেনি। দেশে মাখনের অভাব হ'লে গোয়েরিং জার্মান গৃহিণীদের উপদেশ দেন—মাখনের চেয়ে বন্দুক বেশী প্রয়োজনীয়। আর তাঁরই নিজের ঘরে পাত্র উপচে মাখন মাটিতে পড়তে থাকে। তবু হিটলারের পর তাঁর মত প্রিয় নাজী নেতা আর কেউ নেই।

গোয়েরিং নাজী আন্দোলনে প্রথম জড়িত হন ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে এবং সেই সময়ই তিনি আন্দোলনের নায়ক তখনকার দিনে অজ্ঞাত-অখ্যাত এ্যাডলফ হিটলারের নায়কত্ব গ্রহণ করেন। বেশী দিনের কথা নয় এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি হিটলার সম্বন্ধে বলেছেন,—"প্রতিদিন আমি তাঁর সঙ্গে কাটাই আর এক একটি নূতন অভিজ্ঞতা আমার সঞ্চয় হয়। বহুদিনের কথা যেদিন আমি প্রথম তাঁকে দেখি এবং তাঁর বক্তৃতা শুনি, সেই দিন হ'তে আমি মনে প্রাণে তাঁরই—অন্ধভাবে তাঁর নির্দেশ আমি দেবতার নির্দেশের মতই পালন করে এসেছি। অনেক সম্মান এবং পদবী আমি পেয়েছি। কিন্তু



স্ত্রী ও কন্যা সহ গোয়েরিং

সে সব আমার গর্বের বস্তু নয়—আমার সবচেয়ে বড় গর্বের বস্তু এবং সমগ্র জার্মান জাতি তা জানে যে, আমি আমাদের নেতার একান্ত অনুগত ভক্ত।"

গোয়েরিং পর পর বহু শ্রমসাধ্য কাজ হাতে নিয়েছেন, যথা দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকল্পে চতুর্বার্ষিক প্ল্যানের কমিশনার, ফিল্ড মার্শাল, বিমান সচিব, সমগ্র বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষ, প্রুশিয়ার গভর্নর, গেস্টাপো (গোয়েন্দা বিভাগ) এবং ঝটিকাবাহিনীর স্থাপনকর্তা, রাইস্ট্যাগের প্রেসিডেন্ট প্রভৃতি এবং প্রত্যেকটি সুসম্পন্ন করেছেন।

বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপর আর একটি গুরুতর কার্যের ভার অর্পণ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে হিটলারের সই ব্যতীত রাইখের স্বার্থ রক্ষায় তিনি যে কোন হুকুম জারি করতে পারবেন। অর্থাৎ বর্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতিতে যে "ইনার কাউন্সিল" গঠিত হয়েছে গোয়েরিং হয়েছেন তার প্রেসিডেন্ট।

পোল্যান্ড অভিযানের দিন হিটলার রাইস্ট্যাগে ঘোষণা করেছেন—"If anything happens to me, I appoint Field Marshal Goering to be my successor." সমগ্র পৃথিবীকে শুনিয়ে হিটলারের এই আশীর্বাণী যাঁর উপর বর্ষিত হয়েছে তাঁর পরিচয় জগদ্বাসী কতটুকু পেয়েছে? সেই কথাই বলি—

বার্লিনের প্রায় বিশ মাইল দূরে ওয়ারডার (Warder) শহরের এক বড় রেস্তোঁরায় বেজায় ভিড়। বৎসরের প্রথম মদ সেইদিন পরিবেশিত হবে। আকণ্ঠ পান করে দেহটাকে রীতিমত চাঙ্গা করে নেবার জন্য হাজার হাজার লোকের সমাগম। সস্ত্রীক গোয়েরিংও সেখানে উপস্থিত। দ্রব্যগুণে [illegible]ন-সুলভ-চপলতা ফুটে উঠেছে তাঁর মুখে চোখে।

আবেশে অবশ হয়ে তখন তিনি স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছেন--হঠাৎ বেরসিকের মত একজন এসে তাঁর কাঁধে এক চড় দিয়ে বলে উঠল—"হ্যালো হারম্যান পুরানো বন্ধু! সেদিনের কথা নিশ্চয় মনে আছে—সেই যে একসঙ্গে লড়াই করেছিলাম... ...হাঁ লড়াই করেছিলাম পিতৃভূমির (fatherland) সম্মান রক্ষার জন্য।"......সর্বনাশ!......লোকটা মাতলামী করবার স্থান আর পাত্র পেল না! একটা স্তব্ধ ভাব...... অজানিত আশঙ্কায় সকলেই মুহ্যমান। লোকটা ভূতপূর্ব সৈনিক সেটা তার বুকে ঝোলান মেডেল দেখেই বোঝা গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য! গোয়েরিং একখানা চেয়ার লোকটার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—"হাঁ......ঠিক বলেছ পুরানো বন্ধু



মিউনিক চুক্তির পর : হিটলার, মুসোলিনি, মার্শাল গোয়েরিং এবং কাউন্ট সিয়ানো হিটলারের বাসস্থান হইতে বাহির হইতেছেন

আমরা পাশাপাশি লড়াই করেছিলাম। আজ এস আমরা পাশাপাশি বসে মদ খাই।" সামান্য এতটুকু ঘটনা। তবু এর গুরুত্ব বড় কম নয়। অন্য কোন নাজী নেতা হ'লে তাঁর ইঙ্গিতে গোয়েন্দা পুলিশ লোকটাকে টানতে টানতে কোন বন্দীশিবিরে নিয়ে হাজির করত। এই গুণের জন্যই গোয়েরিং ধনী দরিদ্র সকলেরই প্রিয়। শুধু ধনী দরিদ্র নয়—সেনা বিভাগেও তাঁর অপ্রতিহত প্রতিপত্তি। ওই গুণেই সকলে মুগ্ধ। পুরাতন সেনানীরা সকলেই গোয়েবেল্‌স্, হিমলার, রিবেনট্রপ, স্ট্রাইখার বা অন্যান্য নাজী নেতাদের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করে......"These fellows are upstarts, without any back ground." কিন্তু গোয়েরিং সম্বন্ধে বলে—"Er ist doch weningstens ein Herr.* (অন্তত তিন একজন ভদ্রলোক।)

শুধু ভদ্রলোক নয় ভদ্র বংশোদ্ভূতও বটে। কারণ ৪০০ বৎসর পূর্বেও যে তাঁর পূর্বপুরুষদের অস্তিত্ব ছিল এবং বংশানুক্রমে তাঁরা সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেকথা গোয়েরিং প্রমাণ করেছেন। তাঁর পিতা ছিলেন জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার প্রথম শাসন কর্তা।

ভবিষ্যৎ সৈনিক জীবনের আভাস তাঁর শিশু বয়সের কার্যকলাপে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। "খেলা বন্দুক" আর "টীনের তৈরী সেপাই" ছিল তাঁর প্রিয় খেলার জিনিস। একটু বড় হয়ে গ্রামের ছেলেদের নিয়ে তিনি এক "ফ্রী কোর" গঠন করেন এবং তিনি হন সেই দলের সেনাপতি। তাঁর সম্বন্ধে একটি কথা প্রচলিত আছে—একদিন "টীন সেপাই"-দের নিয়ে খেলা করতে করতে হঠাৎ তিনি দুখানা আয়না চেয়ে বসলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন—"আয়না দিয়ে আমি আমার সৈন্যদলকে তিনগুণ করে তুলব—আর তখনই হব আমি প্রকৃত সেনাপতি।" ছোট্ট এই ঘটনা হতেই তাঁর ভবিষ্যৎ সামরিক প্রতিভার উন্মেষ পরিলক্ষিত হয়। দুর্দান্ত ছাত্র হিসাবে গ্রাম্য স্কুলের "ব্ল্যাক বুক"এ বহুবার তাঁর নাম উঠেছে।

*He is at least a gentleman.

তারপর অনেক দিন পরের কথা। সামরিক বিদ্যালয় থেকে উপাধি প্রাপ্ত হওয়ার পর ১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ১১২নং প্রিন্স উইলহেলম্ পদাতিক বাহিনীর লেফ্টেনান্ট পদে বৃত হন। "শীঘ্রই আমরা একটা মহাযুদ্ধের সম্মুখীন হব"—তাঁর এই ভবিষ্যৎবাণী সত্য হয়েছিল। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ছ'মাস পরেই তিনি লৌহ ক্রশ (দ্বিতীয় শ্রেণীর) প্রাপ্ত হন। কিন্তু মানুষ মারা কারবার তাঁর বেশীদিন চলল না। ভীষণ বাতব্যাধিতে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন।

শত্রু হত্যার পাশবিক আনন্দে যখন তিনি উন্মাদ—তখন এই রোগ তাঁকে যে উন্মাদনা থেকে বঞ্চিত করেছিল পরবর্তী (নাজী) জীবনে নিজের দেশবাসীর রক্তে বোধ হয় সে আগুন কতকটা নির্বাপিত হয়েছে।

রোগ প্রশমিত হলে গোয়েরিংকে বিমান বিভাগে বদলী করা হল। ১৯১৭ সালে একখানা ব্রিটিশ বিমানের সঙ্গে যুদ্ধে উরুদেশে গুলী বিদ্ধ অবস্থায় তিনি প্লেন সমেত ভূপাতিত হন। মাসের পর মাস হাসপাতালে থাকবার পর সুস্থ অবস্থায় তাঁকে 'রিজার্ভ স্কোয়াড্রন'এ তলব করা হয়। কিন্তু সে আদেশ অগ্রাহ্য করে তিনি উপস্থিত হলেন 'ফ্রন্ট লাইনে'।

১৯১৮ সালে সাহসিকতার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার "Pour be Merite" তাঁর বুকে শোভা পেল। ওই বৎসর জার্মানীর সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক বৈমানিক ম্যানফ্রেড ফন রিকথোফেন (Manfred Von Richthofen) নিহত হন এবং গোয়েরিং তাঁর স্থানে বিখ্যাত ১নং স্কোয়াড্রনের ভার গ্রহণ করেন। তারপর এল জার্মানির ঘোর দুর্দিন। বিমানবাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে সমস্ত প্লেনগুলো বিজেতা মিত্রশক্তির হাতে তুলে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হল গোয়েরিংকে।

তিক্ত মন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আর শূন্য পকেট নিয়ে গোয়েরিং সুইডেনে পাড়ি দিলেন। কিছুদিন বেকার অবস্থায় ঘুরে বেড়াবার পর সেখানকার এক যাত্রীবাহী বিমান কোম্পানীতে পাইলটের চাকুরী পেলেন। বিখ্যাত সুইডিশ মেরুপর্যটক এরিক ভন রোশেন (Eric Von Rosen)কে তাঁর বাড়ি "রকেলষ্টাড ক্যাসল" (Rockelstad Castle)এ পৌঁছে দেবার ভার পড়ল গোয়েরিং-এর উপর। পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ভন রোশেন রাতটা থেকে যাবার জন্য তাঁকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। সেখানে তিনি তাঁর শ্যালিকা 'কারিন ভন ফক' (Karin Von Fock)এর সঙ্গে গোয়েরিং-এর পরিচয় করে দিলেন। প্রেমের দেবতা বোধ হয় অলক্ষ্যে ফুলশর নিয়ে বসে ছিলেন—তাই যাকে বলে—Love at first sight. ভোজন পর্ব সমাধা হলে সকলে তাঁকে ধরে বসলেন মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে। বিভিন্ন দুঃসাহসিক ঘটনা এবং শেষে যে ভীষণ দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে গোয়েরিং দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন সে কথাগুলো কারিনের সেণ্টিমেণ্টে ঘা দিলে। গোয়েরিংও যেন কিসের টানে অবসর পেলেই 'রকেলষ্টাড ক্যাসেল'এ এসে উপস্থিত হন। এমনই যাওয়া আর আসার মাঝে একদিন কারিনের নিকট বিবাহ প্রস্তাবও করে ফেললেন। কারিনও দিলেন সম্মতি। কিন্তু দুটি বাধা। প্রথম, কারিন একজন সুইডিস অফিসারের স্ত্রী। যদিও তাঁরা কয়েক বৎসর যাবত পৃথকভাবে বাস করছেন। কারিন বিবাহ বিচ্ছেদ করলেন। দ্বিতীয় বাধা শীঘ্র দূর হবার নয়। যুদ্ধের সময় উরুদেশে যে আঘাত গোয়েরিং পেয়েছিলেন—সে ক্ষত একেবারে নিরাময় হয়নি। ঔষধ সেবন ভিন্ন সামান্য ক্ষণও স্থির থাকতে পারেন না। অথচ তীব্র ঔষধের বিষক্রিয়া দিন দিন তার মানষিকতা পঙ্গু করে ফেলছে। কারিন নিজ ব্যয়ে তাঁকে এক 'নার্সিং হোমে'



হিটলার গোয়েরিংকে সম্বর্ধনা জানাইতেছেন

পাঠালেন। চিকিৎসার খরচ বহন করবার মত আর্থিক অবস্থা তাঁর নয়। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব আর দুশ্চিন্তার শেষ করে গোয়েরিং একদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। বিবাহের পর তাঁরা মিউনিক-এর নিকটে সংসার পেতে বসলেন।

১৯২২ সালের শরৎকালের কথা। গোয়েরিং তখন মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। হঠাৎ খেয়াল হল দেশের রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। ১৩ই অক্টোবর তারিখে সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে 'জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি'র এক সভায় গিয়ে হাজির হলেন। এই সর্বপ্রথম তাঁরা হিটলারের বক্তৃতা শুনলেন—শুনে একেবারে মোহিত হয়ে গেলেন। কারিনের সঙ্গে বহু আলোচনার পর তিনি পরদিনই হিটলারের খাতায় নাম লিখিয়ে দিলেন।

ক্ষুদ্র নাজীদল ধীরে ধীরে ক্ষমতা অর্জন করে বেশ পুষ্ট হয়ে উঠেছে। শক্তি পরীক্ষার সংকল্প নিয়ে—১৯২৩ সালের ৯ই নভেম্বর তারিখে তারা মিউনিকের মধ্য দিয়ে মার্চ করে চলল। পুলিশ চালাল গুলী। হিটলার হলেন বন্দী। আর গোয়েরিং পায়ে গুলীর আঘাত পেয়ে পথের ধুলোয় দিলেন গড়াগড়ি। বরাত ভাল তাই ধরা পড়লেন না। কারিন

কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে স্ট্রেচারে করে তাঁকে নিয়ে অস্ট্রো-জার্মান সীমান্তবর্তী পার্বত্য প্রদেশে আত্মগোপন করলেন। পরে তাঁকে অস্ট্রিয়ার 'ইনসব্রুক' হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন। পলাতক আসামী দেশে ফিরবার উপায় নেই। ১৯২৬ সালে তাঁকে ক্ষমা করে তাঁর উপর থেকে সমস্ত বিধি-নিষেধ তুলে নেওয়া হল। তিনি আবার দেশে ফিরলেন।

দেশে ফিরেও দিন কাটতে লাগল দুঃখ দুর্দশার মধ্য দিয়ে। কারিনের ভঙ্গুর স্বাস্থ্য এই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। ১৯৩০ সালে হৃদরোগ আর ফুসফুসের অসুখে শয্যাগত হয়ে এক আলপাইন স্বাস্থ্য নিবাসে আশ্রয় নিলেন।

১৯৩১ সালে গোয়েরিং স্ত্রীকে নিয়ে সুইডেন যাত্রা করলেন—শাশুড়ীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে। সেখানে গিয়ে কারিনের অসুখ আবার বেড়ে উঠল। এদিকে নাজী দলের শক্তি বৃদ্ধিতে ভীত হয়ে প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গ হিটলারের সঙ্গে একটা আপোষ আলোচনা করবার প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। হিটলার এই সাক্ষাৎকারে উপস্থিত থাকবার জন্য গোয়েরিংকে ডেকে পাঠালেন। কারিন তখন ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তবু দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য তিনি গোয়েরিংকে জার্মানীতে ফিরতে অনুরোধ করলেন। বার্লিনে ফিরে আসবার কয়েক দিনই পরেই তিনি কারিনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শোকযাত্রায় যোগদান করবার জন্য আবার সুইডেন যাত্রা করলেন।

পত্নীপ্রেমে গোয়েরিং প্রায় এ যুগের সাজাহান। (যদিও আবার বিবাহ করেছেন।) ১৯৩৩ সালে তিনি বার্লিনের প্রান্তে বসবাসের জন্য যে বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন—তার নাম দিয়েছেন—কারিন হল। ১৯৩৪ সালের জুন মাসে তিনি কারিনের মৃতদেহ স্বদেশে নিয়ে এসে কারিন হলের দৃষ্টি সীমার মধ্যে ভুকারসি (Wuckersee) হ্রদের তীরে সমাহিত করেছেন।

গোয়েরিং-এর উপর কারিনের প্রভাব ছিল অসামান্য। তাঁর দুর্ধর্ষ অশান্ত স্বভাব কারিনের আত্মিক শক্তির স্পর্শে কতকটা শান্ত হয়েছিল; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর গোয়েরিং-এর অন্তরের সুপ্ত দানব আবার জেগে উঠে বিশ্বত্রাস হয়ে উঠেছে।

গোয়েরিং-এর জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডী এই যে—যে প্রেমের স্মৃতি মনে চিরজাগরূক রাখবার জন্য তিনি কারিনের মৃতদেহ পর্যন্ত নিজের চোখের সম্মুখে এনে সমাহিত করেছিলেন—আজ ভুলেও ওই সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর আত্মার উদ্দেশ্যে একবার প্রার্থনা করার অবসর তাঁর নেই। অসীম প্রেমের সসীম পরিণতি। তাঁরই আদেশে নাজী উড়োজাহাজ অরক্ষিত শহরের উপর বোমা বর্ষণ করে স্ত্রীলোক শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করে......আর অসীম মমতাময়ী ওই নারীর নির্মুক্ত আত্মা হয়ত করুণ আর্তনাদে গুমরে মরে—স্বামীর কানে সে আর্তনাদ পৌঁছায় না। পৈশাচিক উল্লাসে গোয়েরিং আজ বধির।

প্রেমিক তুমি আমি সকলেই। 'উদ্ভ্রান্ত' প্রেমিকও দেখা গেছে। প্রেম মানুষের মনে বাসা বেঁধে বাস করে ততদিনই—যতদিন প্রেমিকা সজীব মূর্তি ধরে চোখের সুমুখে ঘুরে বেড়ায়। তারপর?......গোয়েরিংই তা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯৩২ সালের কথা। কোন সূত্রে অভিনেত্রী এম্মা সোনী-ম্যান-এর সঙ্গে হল পরিচয়। প্রথমে পরিচয়—পরে প্রেম—শেষে পরিণয়। ১৯৩৫ সালে যেদিন তিনি আর এম্মা গোলাপ ছড়ান পথ দিয়ে বার্লিন ক্যাথিড্রালে প্রবেশ করেন—সেদিনটি জার্মানিতে ছুটির দিন বলে ঘোষিত হয়েছিল।

তাঁদের একটি কন্যাও হয়েছে—বয়স তার এখন দেড় বছর। মুসোলিনীর আদরিণী কন্যা এডার নামেই গোয়েরিং কন্যার নামকরণ করেছেন।

অধিকাংশ মোটা লোকের মত গোয়েরিংও ঠাট্টা তামাসা উপভোগ করেন এবং প্রাণ খুলে হাসতেও পারেন। এই যুদ্ধের পূর্বে রাইন নদীর ধারে সিগফ্রীড লাইন পরিদর্শনের সময় গোয়েরিং একটা গল্প শুনেছিলেন। তা এই.........

রাইনের উভয় তীরে বসে একজন জার্মান আর একজন ফরাসী মাছ ধরছে। ফরাসীটি প্রতি মিনিটে একটি করে মাছ তুলছে আর জার্মানটি বসে বসে দেখছে। একটি মাছও টোপ ধরে না। বিরক্ত হয়ে সে ফরাসীটিকে জিজ্ঞাসা করলে—"হাঁ মহাশয়—আপনি এত ধরছেন—আর আমার একবারও খাচ্ছে না কেন?" ফরাসীটি উত্তর দিলে—"ব্যাপার কি জানেন মশায়—আমাদের তীরে মাছদের 'হাঁ' করবার স্বাধীনতা আমরা দিয়েছি তাই"। সামান্য এই গল্প শুনে গোয়েরিং যে অট্টহাস্য করেছিলেন—সেই হাসি আজ গল্পের গুরুত্ব অনেকখানি বাড়িয়ে তুলেছে।

প্রচার সচিব ডাঃ গোয়েবেলস সম্বন্ধে গোয়েরিং-এর একটু দুর্বলতা আছে। তিনি মোটেই গোয়েবেলসকে দেখতে পারেন না। তার কারণ গোয়েবলস-এর ইহুদী বিদ্বেষ নাকি স্বয়ং হিটলারের চেয়েও একটু বেশী। একটা ঘটনার উল্লেখ করি... কারিন হলকে সুসজ্জিত করবার জন্য টেণ্ডার চেয়ে পাঠান হয়। বহু টেণ্ডার উপস্থিত; কিন্তু শহরের শ্রেষ্ঠ যে কোম্পানী তারা কোন দর পাঠায়নি—কারণ তারা ইহুদী। গোয়েরিং একজন সহকারীকে নির্দেশ দিলেন কারণ অনু-সন্ধান করতে। শুনলেন—ইহুদী কোম্পানী বলে তাদের টেণ্ডার বিবেচিত হবে না—এই কারণেই তারা পাঠায়নি। শুনে গোয়েরিং রেগে আগুন। বললেন—"Tell them this is the air minstry—not the propaganda minstry."

আতিথেয়তার জন্য গোয়েরিং বিখ্যাত। তিনি একটু বেশী সৌখিন—তাই উপলক্ষ্য উপস্থিত হলে তিনি যে বিরাট আয়োজন আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করেন—দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীর পক্ষেও তা সম্ভব নয়। অথচ তিনি রেডিও মারফত দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান—খাওয়া পরা সম্বন্ধে মিতব্যয়ী হতে। ভাগ্য এবং স্বদেশ বিতাড়িত অবস্থায় সুইডেন বাসের কথা এক অলস মুহূর্তেও তাঁর স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে কিনা কে জানে! শান্তিময় সংসারের কল্পনা গোয়েরিং-এর কাছে শুধু কল্পনাই। তিনি সংসার

এবং সমাজ-জীবন ভালবাসেন—আর ভালবাসেন ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের—ঠিক নিজেরটির মত। বড়দিনের সময় শত শত দরিদ্র শিশুদের দেন তিনি বিরাট ভোজ—গরমের পোষাক—খেলনা আরও কত উপহার। অন্যান্য নাজী নেতাদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এইখানেই। শিশু মনে আবার যে জিনিসটি রেখাপাত করে- আজীবন তা আর মনে থেকে মুছবে না। তাই আজকালকার শিশুদের ভবিষ্যৎ যাতে ঠিক নাৎসী পদ্ধতিতে গড়ে ওঠে তারই ভার নিয়েছেন নেতারা—পিতা-মাতার কোল থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে। সংসার আর শিশু প্রীতিই গোয়েরিংকে দেশবাসীর কাছে প্রিয় করে তুলেছে—বিশেষ মায়েদের কাছে।.........কিন্তু মহাকালের যে তাণ্ডব নৃত্য আজ ইউরোপের বুকে সুরু হয়েছে—তাতে শুধু গোয়েরিং হিটলার কেন......নাৎসীবাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নয়। হারম্যান গোয়েরিং-এর অসংলগ্ন জীবন-নাটকের এইখানেই যবনিকা।

ছদ্মবেশী

(৩২৫ পৃষ্ঠার পর)

এ কথার উত্তর দিল লাবণ্য; বলিল, "গাড়ি চালাবার জন্যে। আজ কিন্তু কিছুক্ষণ থেকে গৌরহরি হঠাৎ সাধুভাষা ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে। তার ছোঁয়াচ ওঁকেও লেগেছে ব'লে উনিও সাধুভাষা দিয়ে কথা কইছেন।"

লতিকা ব্যগ্র হইয়া উঠিয়া বলিল, "ও দিদি, তোমার গৌরহরি তা হ'লে আমাদেরও সঙ্গে সাধুভাষায় কথা কচ্ছিল। তখন মনে হচ্ছিল, যেন কি রকম কি রকম লাগছে,—এখন বুঝতে পারছি সাধুভাষা।"

সহাস্যমুখে লাবণ্য বলিল, "তোমাদের আবার কি বলছিল লতিকা?"

লতিকা বলিল, "বলছিল, কি উদ্দেশ্যে আপনাদের শুভাগমন হয়েছে, কি আপনাদের পরিচয়, আপনারা নিম্নে একটু অবস্থান করবেন, না একেবারে দ্বিতলে আরোহণ করবেন,—এই ধরণের সব কথা। আমি মনে করলাম, তুমি বুঝি ওকে ঐ রকম ক'রে সভ্য কথা বলতে শিখিয়ে দিয়েছ।"

লতিকার কথা শুনিয়া লাবণ্য বলিল, "আমি ত' আর পাগল হইনি লতিকা যে, যে-সব কথা শুনে আমরা নিজেরা জ্বলে-পুড়ে মরছি সেই সব কথা অন্য লোককে বলতে শিখিয়ে দোব!"

লতিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশান্ত বলিল, "একটু আগেও তোমাকে সহধর্মিণী বলছিল লতিকা।"

প্রশান্তর কথা শুনিয়া লাবণ্য এবং সুলেখা উচ্ছ্বসিত রবে হাসিয়া উঠিল।

চকিতকণ্ঠে লতিকা বলিল, "ও মা! সে কি কথা!"

বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে বিনয় বলিল, "কার সহধর্মিণী বলছিল দাদা?"

প্রশান্ত বলিল, "না, না, তোমারই বলছিল;—তবে মিস্টার বি কে সেনের স্ত্রী না ব'লে মিস্টার বি কে সেনের সহধর্মিণী বলছিল।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিনয় বলিল, "মিস্টার বি কে সেনের বনিতা বলেনি এই আমাদের সৌভাগ্য! যাবার সময়ে তার জন্যে ওকে একটু ধন্যবাদ দিয়ে যেতে হবে।"

পুনরায় একটা হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

(ক্রমশ)

মেক্সিকোর বর্ত্তমান অবস্থা

(৩২২ পৃষ্ঠার পর)

পারিতেছে না। এদিকে মেক্সিকোর নূতন নির্বাচন আসন্ন। এই নির্বাচনে যদি প্রতিক্রিয়াশীল দল জয়লাভ করিতে পারে, তবেই বিদেশী বণিকগণ একটু সুবিধা করিয়া লইতে পারিবে। সেইজন্য তাহারা প্রতিক্রিয়াশীল দলকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছে। কিন্তু কোনওরূপ প্রচারণা ও প্রতারণা দ্বারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত আর সহজ ব্যাপার নহে। কারণ জনসাধারণ কারডেনাসের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিয়াছে। সুতরাং মেক্সিকোতে বিপ্লবের চক্র এখনও ঘুরিতেছে। কিন্তু ইউরোপীয় বণিকের দল ভিতরে ভিতরে গণ্ডগোল সৃষ্টি করিতে চাহিতেছে—কারণ তাহারা ঘোষণা করিয়াছে যে, গভর্নমেন্টের বাজেয়াপ্ত নীতিকে fait accompli বা বাস্তব ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিবে না। ব্রিটেন মেক্সিকো গভর্নমেন্টের সহযোগিতার হস্ত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। অবশ্য প্রকাশ্য সংগ্রাম আরম্ভ হয় নাই, তবে যে কোন মুহূর্তেই হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মেক্সিকোর প্রতিবেশিগণ আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত—কেবল সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করিতেছে। বর্তমান যুদ্ধের ফলাফলের উপর মেক্সিকোর ভাগ্য অনেকটা নির্ভর করে। প্যান-আমেরিকান বন্ধুত্ব ও মিতালির দিকে আমেরিকার অনেক রাষ্ট্রের ঝোঁক পড়িয়াছে। যদি ইহা সম্ভব হয় তাহা হইলে হয়ত মেক্সিকো বাঁচিয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু যদি তৎপরিবর্তে ইঙ্গ-আমেরিকান মিতালি হয় এবং ইঙ্গ-আমেরিকান ক্যাপিটালিজম্ ও সাম্রাজ্যবাদই জয়লাভ করে, তাহা হইলে মেক্সিকোর অবস্থা সংগীন হইবে। কিন্তু মেক্সিকোর জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীলগণ সেইরূপ অবস্থাতেও আত্ম-অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য কম আয়োজন করিতেছে না। বর্তমান সমর শেষ না হইলে মেক্সিকো সম্বন্ধে কোন কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

আজ-কাল

দাঙ্গা-হাঙ্গামা

গত ১৭ই মার্চ থেকে আরম্ভ করে' এ কয়দিন ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলেছে। এখন অবস্থা অনেকটা ভালো হ'য়ে এসেছে। দাঙ্গায় এ পর্যন্ত ২৮ জন নিহত হয়েছে, তার মধ্যে ২১ জন মুসলমান, ৬ জন হিন্দু আর একজনের পরিচয় অজ্ঞাত; আহত হয়েছে ৯৯ জন মুসলমান, ৫৫ হিন্দু, ২ জন খৃষ্টান, একজন সনাক্ত হয় নি। লুঠতরাজ ও অগ্নিকান্ড প্রথম কয়দিন বেশ চলেছিল। এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৭৭ জন মুসলমান ও ১৫৭ জন হিন্দুকে।

দাঙ্গার প্রারম্ভেই ঢাকার নবাব হবিবুল্লা, তারপর মিঃ ফজলুল হক ও শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযোগেশ গুপ্ত, শ্রীঅতুল সেন, পরে শ্রীশরৎচন্দ্র বসু কলকাতা থেকে ঢাকায় যান। তাঁরা সেখানে গিয়ে আলাপ-আলোচনা করে' শান্তি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন এবং পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে উভয় পক্ষকে সংযত করবার চেষ্টা করেন। বাঙলার ছাত্র ফেডারেশন এবং বাঙলা মুসলিম ছাত্র লীগের উদ্যোগে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের একটা সম্মিলিত মিশন শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং সম্প্রদায়-নির্বিশেষে দুর্গতদের সাহায্য দেবার জন্যে ঢাকায় গেছে। হাঙ্গামা এখনো কিছু কিছু চলছে।

বাঙলার অন্যান্য অনেক জেলাতেও গুজব ও প্রচারকার্যের ফলে সাম্প্রদায়িক মেজাজ বেশ চড়েছে। সেজন্য কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম, পাবনা, বরিশাল, নেত্রকোনা প্রভৃতি জায়গায় আগে থেকেই সতর্কতার বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। সংবাদপত্রে খবর ছাপা সম্বন্ধেও কড়াকড়ি করা হয়েছে।

বাঙলা সরকারের এক ইস্তাহারে বলা হয় যে, বর্তমান সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের সময় সভা ক'রে কোন একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের মতামত প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নয় এবং এই কারণে ২৩শে মার্চ যে 'পাকিস্তান দিবস' পালনের কথা ছিল, তা বাঙলার মুস্লিম লীগ বাতিল করে' দিয়েছেন। অথচ "আজাদ" কাগজ থেকে আমরা জানলাম, কলকাতা মুসলিম লীগের কর্তৃপক্ষ জিন্না সাহেবের কাছে তার করে' মত জানতে চাওয়ায় তিনি ফতোয়া দেন যে, সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারী না হওয়া পর্যন্ত যেন পাকিস্তান সভা বন্ধ না হয়; ফলে কলকাতার মহম্মদ আলী পার্কে পাকিস্তান দিবস উপলক্ষে এক "বিরাট" জনসভা হয়ে গেছে। এ সম্বন্ধে মুসলিম লীগপন্থী গভর্নমেণ্টের বক্তব্য কি?

বিমান হানায় আত্মরক্ষা—

সম্ভাব্য বিমান আক্রমণের সময় আমাদের এখানে জনসাধারণের কর্তব্য কি, সে সম্বন্ধে বাঙলা গভর্নমেণ্টের উদ্যোগে উপদেশ সম্বলিত এক ইস্তাহার বিতরণ করা হচ্ছে। তাতে বলা হয়েছে যে, কলকাতার উপর হাজার হাজার আগুনে বোমা পড়তে পারে; সেগুলোর উপর জল না ঢাললে তারা ফাটবে না। যাতে অন্য জিনিষে আগুন না লাগে, লাগলে কিভাবে বালতিভরা জল দিয়ে নিবিয়ে দিতে হবে এবং বোমাগুলোর স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরণ আপনা থেকে থেমে গেলে কিভাবে সেগুলো বালি ও কোদালের সাহায্যে চাপা দিতে হবে, সে সম্বন্ধে মূল্যবান উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শত্রুপক্ষ শুধু আগুনে বোমাই ফেলবে, অতি-বিস্ফোরক বোমা ফেলবে না, এমন কোনো প্রতিশ্রুতি আমরা তাদের কাছ থেকে পেয়েছি বলে' তো জানি না। অতি-বিস্ফোরক বোমা থেকে আমরা কি করে' আত্মরক্ষা করব, সে সম্বন্ধে গভর্নমেণ্ট নির্বাক। আমরা সহজ বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝি, বিমান আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার তিনটি উপায় প্রধান ও অত্যাবশ্যক—ভূগর্ভের আশ্রয়-ভবন, বিমানধ্বংসী কামান ও জঙ্গী বিমান। শেষের দুটো ব্যবস্থা আমাদের বিবেচনার বাইরে, কারণ আমাদের দেশের সামরিক ব্যাপারে আমাদের কোনো হাত নেই। কিন্তু ভূগর্ভের আশ্রয়-ভবন কোথায়? শুনলাম, টাকার অভাবে ও রকম 'শেল্টার' তৈরী করা এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু টাকার অভাব কই? লক্ষ লক্ষ টাকা তো আমাদের গভর্নমেণ্ট ও জনসাধারণ বিমান আক্রমণে বিপর্যস্ত বৃটিশ অধিবাসীদের জন্যে পাঠাচ্ছেন। অবশ্য নিষ্প্রদীপের ব্যবস্থা এখানে হয়েছে। কিন্তু শত্রুপক্ষ কি শুধু কৃষ্ণপক্ষের রাতেই হানা দেবে—দিনেও না, চাঁদের আলোতেও না?

আপোষবিরোধী দিবস

গত ১৯শে মার্চ বাঙলার নানা জায়গায় "আপোষবিরোধী" দিবস প্রতিপালিত হয়েছে। কলকাতায় সৈয়দ নৌশের আলীর সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা হয়। সভা রামগড় আপোষ-বিরোধী সম্মেলন এবং পলাশা কৃষক সভা সম্মেলনের কর্মসূচী সমর্থন করে এবং সুভাষচন্দ্রের নীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণের জন্যে সমস্ত বামপন্থী দলগুলিকে মিলিত হতে আবেদন জানায়।

ভারতীয় বণিক সংঘ

ভারতীয় বণিক সংঘ তাঁদের নয়াদিল্লীর অধিবেশনে কয়েকটা প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে এক প্রস্তাবে তাঁরা কেন্দ্রে জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রবর্তন করে' ভারতের বর্তমান অচল রাজনৈতিক অবস্থা দূর করবার জন্যে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের কাছে দাবী জানিয়েছেন। আর এক প্রস্তাবে তাঁরা দাবী করেছেন যে, মধ্য প্রাচ্যে সমরোপকরণ সরবরাহ উপলক্ষে ঈষ্টার্ন গ্রুপ কাউন্সিল অথবা রজার মিশনের প্রোগ্রাম অনুসারে ভারতীয় সম্পদ আহরণের ও প্রধান প্রধান শ্রমশিল্পের যে সব প্রতিষ্ঠান হবে তাদের মূলধন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা যেন ভারতীয়দের হাতে থাকে।

আন্তর্জাতিক

বল্কান

বল্কান সম্বন্ধে যা মনে করা গিয়েছিল, তাই ঘট্‌ছে। যুগোস্লাভিয়া ত্রিশক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। ভিয়েনায় এই চুক্তি হিটলারের উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয়েছে। তবে হাঙ্গারী, রুমেনিয়া, স্লোভাকিয়া ও বুলগেরিয়ার সঙ্গে এক্সিসের যে চুক্তি হয়েছে, যুগোস্লাভিয়ার বেলায় তার কিছু তারতম্য হয়েছে—জার্মানী প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে দিয়ে সৈন্য চালনার দাবী সে কখনও করবে না। চুক্তি স্বাক্ষরের আগে যুগোস্লাভ মন্ত্রিসভা থেকে তিনজন সার্ব মন্ত্রী জার্মান সর্ত গ্রহণের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন; তার মধ্যে একজন পরে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেন।

এখন বল্কানে বাকী রইল গ্রীস ও তুরস্ক। গ্রীসের উপর নাকি জার্মান চাপ ক্রমশ বাড়ছে। বুলগেরিয়ার ভিতর দিয়ে

জার্মান সৈন্য গ্রীক সীমান্তের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। কয়েক দিনের মধ্যে গ্রীসের কাছে জার্মান চরমপত্র যেতে পারে।

তুরস্কের প্রেসিডেণ্ট ইনেনুর সংগে হের হিটলারের বিশেষ পত্র বিনিময় হয়েছে। এতে সাধারণভাবে মৈত্রীর মনোভাবই ব্যক্ত করা হয়েছে বলে' মনে হয়। সেটাই স্বাভাবিক। গ্রীস সম্বন্ধে একটা হেস্তনেস্ত না করা পর্যন্ত তুরস্কের উপর জার্মানী হাত দেবে না। এক এক করে' গ্রাস করাই হচ্ছে নাৎসী কূটনীতির কায়দা। পক্ষান্তরে, সোভিয়েট ইউনিয়ন তুরস্ককে সরকারীভাবে আশ্বাস দিয়েছে যে, তুরস্ক আক্রান্ত হলে এবং যুদ্ধে নামতে বাধ্য হলে সোভিয়েট সেই সুযোগে তুরস্কে হস্তক্ষেপ করবে না। তুরস্কও জবাবে অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অনেকে অনুমান করছেন যে, তুরস্ক যাতে জার্মানীকে বাধা দেয় সেজন্যে খানিকটা পরোক্ষ উৎসাহ দেওয়া সোভিয়েটের এই মৈত্রী ঘোষণার উদ্দেশ্য। এমনও অনুমান করা যেতে পারে যে, বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে তুরস্কের ভিতর দিয়ে জার্মানী অভিযান করলে সোভিয়েটের সংগে তার কোন সংঘর্ষ বাধবে না, এই ইংগিত এই ঘোষণায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

আফ্রিকা ও আলবেনিয়া

আফ্রিকায় বৃটিশ অভিযান পূর্ণোদ্যমে চলছে। বার্বেরা ও হারগেইসা হস্তগত করে' বৃটিশ সৈন্য কয়েক দিনের মধ্যে সমগ্র বৃটিশ সোমালিল্যান্ড আবার দখল করে' নিয়েছে। আবিসিনিয়ায় তারা ইয়াভেলো, জিজিগা, নেগেলি প্রভৃতি দখল করে' আদ্দিস আবাবার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। লিবিয়ায় তোব্রুকের ১৫০ মাইল দক্ষিণে বৃটিশ সৈন্য জারাবুব দখল করেছে। তবে তাদের পশ্চিম দিকে আর অগ্রসর হওয়ার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নি। এদিকে সিসিলি থেকে বহু জার্মান সাঁজোয়া সৈন্য সাগর পার হয়ে লিবিয়ায় উপস্থিত হয়েছে। এদেরও কর্মতৎপরতার কোনও খবর আসে নি।

আলবেনিয়ায় ইতালীয়দের প্রবল পাল্টা আক্রমণ নাকি আবার ব্যর্থ হয়েছে এবং গ্রীকরা যথারীতি সাফল্যলাভ করছে। আগের সপ্তাহে ভালোনার অনতিদূরে তেপেলিনি শহরে অগ্রবর্তী গ্রীক সৈন্যদের প্রবেশের সংবাদ এসেছিল; কিন্তু পরে তেপেলিনি দখলের কোনও খবর পাওয়া যায় নি।

বৃটেন ও জার্মানীর যুদ্ধ

আফ্রিকায় ইতালীয় বাহিনীর কর্তা লিবিয়ার গভর্নর মার্শাল গ্রাৎসিয়ানি পদত্যাগ করেছেন। তাঁর জায়গায় নিযুক্ত হয়েছেন জেনারেল গারিবল্ডি। আলবেনিয়ায় ইতালীয়বাহিনীর কমাণ্ডার ইন চীফ্ জেনারেল কাভাল্লেরো অপসারিত হয়েছেন এবং তাঁর জায়গায় জেনারেল গেলোসো নিযুক্ত হয়েছেন বলে' শোনা যাচ্ছে।

এ সপ্তাহে বৃটেনে উপর্যুপরি প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চলে। প্রধানত লণ্ডন, উত্তর-পূর্ব ইংলণ্ড এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ইংলণ্ডেই জার্মানরা হানা দিতে থাকে। লণ্ডন, হাল, প্লিমাথ, গ্লাসগো, লিভারপুল ও লীড্স্ শহরের প্রভূত ক্ষতি হয় এবং অনেক লোক হতাহত হয়। প্লিমাথের ক্ষতিই সব চেয়ে বেশী। প্রচুর অগ্নি বোমা ও অতিবিস্ফোরক বোমার বর্ষণে সেখানে বহু-লোক হতাহত ও গৃহহীন হয়েছে।

বৃটিশ বিমানবহরও জার্মানী ও জার্মান অধিকৃত এলাকার উপর প্রবল আক্রমণ চালিয়েছে। তারা বার্লিন, কলোন, হানোভার, কীল, রটারডাম, লোরিয়াঁ, কিবের', শেরবুর্গ প্রভৃতি জায়গায় বোমা বর্ষণ করে। লোরিয়াঁর সাবমেরিন ঘাঁটির উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালানো হয়েছে। জার্মান জাহাজ, বজরা, ই-বোট এবং অন্যান্য রণতরীর ক্ষতি হয়েছে বলে' জানা যায়। টাস এজেন্সী খবর দিয়েছে যে, বার্লিন এলাকা ও পশ্চিম জার্মানী থেকে শিশুদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

আটলাণ্টিকে জার্মান ব্যাট্‌ল্ ক্রুজার "গ্নাইসেনাউ" এবং "শার্নহস্ট" নাকি বৃটিশ জাহাজ আক্রমণে ব্যাপৃত হয়েছে। জার্মান বেতারে একদিন বলা হয় যে, এক বৃটিশ নৌবহর দুইদিন ধরে' আট্‌লাণ্টিকে এক জার্মান নৌবহরকে অনুসরণ করে; আট্‌লাণ্টিকের আর এক জায়গাতেও দুই পক্ষের সাক্ষাৎ হয়। পরে এক মার্কিন কাগজ খবর দেয় যে, একটা বৃটিশ ক্রুজার জখম মেরা-মতের জন্যে আমেরিকার উপকূলের দিকে আসছে। কিন্তু এসম্বন্ধে বৃটেনের পক্ষ থেকে কোনো সংবাদ পাওয়া যায় নি।

আমেরিকা—সুদূরপ্রাচ্য

জাপ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ মাৎসুওকা মস্কোতে পেঁছে মঃ স্টালিন ও মঃ মলোটোভের সংগে আলাপ করার পর বার্লিন রওনা হয়ে গেছেন।

এক মার্কিন নৌবহর মৈত্রীর নিদর্শন হিসেবে অস্ট্রেলিয়া পরিদর্শনে এসেছে।

বৃটেনকে সাহায্যের জন্যে আমেরিকার ৭০০ কোটি ডলার ব্যয়বরাদ্দ আইনসভায় মঞ্জুর হয়েছে।

দক্ষিণ ও মধ্য চীনে এখন জাপানী ও চীনা সৈন্যদের মধ্যে বেশ লড়াই চলছে। কিয়াংসি, হুনান ও হুপে এই সংগ্রামের ক্ষেত্র। জাপানীরা কয়েকটা জায়গা দখল করে' নিয়েছে। চীনারাও বিভিন্ন স্থানে তাদের সাফল্যের সংবাদ দিচ্ছে।

২৫।৩।৪১ —ওয়াকিবহাল



রঙ্গজগৎ

চিত্রায়—বিজয়িনী। চিত্রবাণী লিমিটেড। কথা, কাহিনী ও পরিচালনা ঃ তুলসী লাহিড়ী। শ্রেষ্ঠাংশে চন্দ্রাবতী, রতীন বন্দ্যো, জহর গাঙ্গুলী, সন্তোষ সিংহ ইত্যাদি।

ধনপতি নায়ক। হরবিলাস। বন্ধুর বাড়িতে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে প্রণয় জন্মিল। প্রণয়ের পাত্রী একজন শিক্ষয়িত্রী। শকুন্তলা। শকুন্তলার মায়ের কি একটা সামাজিক দুর্নাম ছিল। প্রণয় যেখানে বিবাহে পরিণতি পাইতে চাহে সেখানে এই প্রশ্ন উঠিল। দাদুর পরামর্শে হরবিলাসকে খবরটা বুঝাইয়া বলিবার জন্য শকুন্তলার গমনপথে দুর্ঘটনা ঘটিল। শকুন্তলার ভাঙা পা জোড়া লাগিল বটে, কিন্তু আমরণ খোঁড়া হইয়া থাকিল।

হরবিলাস শকুন্তলার দিক হইতে সময় ও কথার খেলাপে বিস্মিত ও বিরক্ত হইল। মাতৃভক্তির অজুহাতে ক্ষোভে ও অভিমানে এক বিবাহ করিয়া বসিল। স্ত্রী তো নয়, পুরাপুরি একটি স্নব। তবু সন্তান জন্মাইতে বাধা থাকে না। হরবিলাসের গৃহে শান্তি নাই। স্ত্রী উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা অ্যাসার্ট করিতে যাইয়া হরবিলাসকে ক্যাড্ বানাইয়া ছাড়িয়াছে। এমনি দুঃখের দিনে শকুন্তলার সহিত সাক্ষাৎ। উভয়ের বোঝাপড়া হইল। হরবিলাসের প্রকাশ্য অনিয়মিত জীবনে গোপন নিয়মিত জীবন দেখা দিল। কিন্তু ব্যবসায় উপলক্ষে হরবিলাসকে যখন কলিকাতা ছাড়িতে হইল তখনই বোঝা গেল ইহাদের সামাজিক মিলনে বাধাটা কোথায়। হরবিলাস কিছুদিনের জন্য কাজের মধ্যে ডুবিয়া গেল। যেদিন উঠিল, সেদিন জানিল, শকুন্তলা তাহার ভগ্নপতীর সহিত কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে। বিভ্রান্ত হরবিলাস শকুন্তলা অনুসরণ করিয়া শুনিল, ভগ্নীপতি শকুন্তলার পাণিপ্রার্থী। হরবিলাস ভুল করিল না, শকুন্তলাকে লইয়া যাইতে চাহিল। শকুন্তলা দ্বিধা করিল না। হরবিলাস অর্থসঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে ততদিনে বুকেও কিছু রোগ সঞ্চয় করিয়াছে। এবার সামাজিক বাধাকে ফাঁকি দিতে হরবিলাস ও শকুন্তলা বর্ধমান যাওয়া স্থির করে। কিন্তু সেখানেই পিতা-পুত্রে সাক্ষাৎ। চলমান গাড়ী হইতেও অকস্মাৎ ফিরিতে হয়। চেপে যাওয়া হয় না। পুত্র পিতার এই "আশ্রিতা"কে ভর্ৎসনা করে। পিতার সহ্যের সীমা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবনান্ত ঘটে। পুত্র পিতার 'আশ্রিতা'কেই মা বলিয়া স্বীকার করে।

স্বতন্ত্র কাহিনী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। ঘটনা সমাবেশের শিথিলতা গল্পকে স্থানে স্থানে দুর্বল করিয়াছে। ঠাসা বুনানো ক্যান্ভাসের উপর দিয়া অনায়াসেই যাওয়া যায়, ফাঁক ফাঁক বুনুনির উপর দিয়া সাম্লাইতে সাম্লাইতেই প্রাণান্ত। গ্লাস ও টেবিলে জল ঢালিবার মত। গ্লাসের আকার আছে, টেবিলে জল শুধু ছড়াইয়াই যায়। স্রোতস্বিনীও নহে যে চিরপূর্ণ উৎস হইলে উপল হইতে উপলে নাচিয়া পথ কাটিয়া চলিবে। জীবনস্রোত হইতে তুলিয়া আনা এক ঘটী জল মাত্র। পরিবেশন কৌশল নাই। কাহিনী-



'বাংলার মেয়ে' চিত্রে লীলা হালদার। শনিবার হইতে 'রূপবাণী' চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হইতেছে

কারের মনে বিভিন্ন সমস্যা জাগিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাকে কঠিন প্রশ্নাকারে দাঁড় করাইতেও পারেন নাই বা সমাধানও করিতে পারেন নাই। কাহিনীকারকে সমাধান করিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই; কিন্তু প্রশ্নটা তো স্পষ্ট হওয়া চাই? মানুষের জীবনে প্রণয় আছে জানি, জানি কাম কামনাও আছে। আরও জানি, মানুষ কেহই স্বাভাবিক নহে, সুকৃতিতে (sublimation) বা দুষ্কৃতিতে (pérversion) মানুষকে কিছু-না-কিছু পা বাড়াইতেই হয়। কারণ সামাজিক বিধিনিষেধের উপাদানে প্রস্তুত লজ্জার লগুড়াঘাত দিয়া মানুষের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তিকে প্রতিনিয়ত নিবৃত্ত করিতে হয়। প্রণয়, বিবাহ, পুত্রোৎপাদন ইহারা যে একই জিনিসের ফলপ্রসব নয়,একান্ত পৃথক, যেখানে বিবাহ হইয়াছে সেখানে যে প্রণয় থাকিবে—এমন কোন আঙ্গিক বাধ্যকতা নাই বা পুত্রোৎপাদনটাই বিবাহে পারস্পরিক ভালবাসা নাও হইতে পারে, নিছক আকস্মিক

ক্ষুদ্র মুহূর্তের অসঙ্গতি মাত্র—সমগ্র কাহিনীতে ইহাই ছিল প্রতিপাদ্য। প্রেম যেখানে সেখানে—রেলে স্টীমারে গৃহে উপবনে উৎসবে দুর্ঘটনায়—সর্বত্রই ঘটিতে পারে; কিন্তু সামাজিক সম্মতি যেখানে পথরোধ করিয়া দাঁড়ায় সেখানেই লাগে সংঘাত। কাহিনীর প্রস্তাবনা সেই হিসাবে আকর্ষণ সৃষ্টি করে না। গল্পের পরিপুষ্টির জন্যই মায়ের দিক হইতে শকুন্তলার পথে বিঘ্ন। কাহিনীর মধ্যে শকুন্তলার দুর্ঘটনাটা চমৎকার মনস্তত্ত্ব মানিয়া চলিয়াছে। নৈরাশ্যে মানুষের আত্মহত্যা-প্রবণতা আসে। সেই আচ্ছন্নাবস্থায় মানুষের ভুল (যেমন চশমা ফেলিয়া যাওয়া) এবং ভুল হইতে দুর্ঘটনা (যেমন মোটরের ধাক্কা) হওয়াই স্বাভাবিক।

সংলাপ ও অভিব্যক্তি মিলাইয়াই সমগ্র অভিনয়। সংলাপ কাহিনীকারের, অভিব্যক্তি অভিনেতার। সংলাপের দোষে অভিনেতার অভিব্যক্তিতে যদি বাধা আসে তবে সে দোষ কাহিনীকারের। কিন্তু সেখানে অভিনেতার অভিব্যক্তি প্রয়াসটা ধরা পড়ে। দুঃখের বিষয় এখানে বিপরীত সমন্বয় ঘটিয়াছে। বর্তমান কাহিনীর সংলাপ উচ্চশ্রেণীর নহে। কতকগুলি ভালভাল প্রাচীন ও বহু প্রচলিত কথা অত্যন্ত আলগা, আকস্মিক ও সঙ্গতিহীন ঠেকিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারেঃ ত্যাগেই প্রেমের মর্যাদা বাড়ে বা অহংকারের মণিমালায় ফেলতে হবে পথের ধূলায় বা আমার কষ্টের কথা ভাব্‌ছি না, তোমায় এ কলংক স্পর্শ ক'র্‌বে এ আমি সইতে পারি না, ইত্যাদি ইত্যাদি। বর্তমান সংলাপ সংকলন মাত্র, সেজন্য কাহিনীকার মাঝে মাঝে প্রবাদ ও বড়লোকের আশ্রয় লইয়াছেন—তাঁহার মৌলিক চিন্তার পরিচয় ইহাতে নাই।

রতীন বন্দ্যো নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। প্রথম দিকে প্রেমিকের ভূমিকায় প্রেমাভিনয়ে তিনি তাঁহার চরিত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই, তজ্জন্য তাঁহার বেমানান চেহারাই দায়ী। শেষের দিকে প্রবীণ পিতার ভূমিকায় তিনি সুঅভিনয় করিয়াছেন, চেহারায় স্বাভাবিকতা বজায় ছিল। শেষের দিকে বিয়োগের ছায়াপাতে গল্পাংশ ও অভিনয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই আলোকে পূর্ববর্তী অন্ধকার আর চোখে পড়ে না।

এ চিত্রে চন্দ্রাবতীর মধ্যেই যা কিছু অভিনয়নৈপুণ্য স্বীকার করিতে হয়। তাঁহার সংযত ভঙ্গীটি আমাদের সব চাইতে বেশী আকর্ষণ করে এবং আমাদের ধারণা, এই শ্রেণীর চরিত্রে চন্দ্রাবতী অতুলনীয়। তুলসী লাহিড়ীর দাদুর অভিনয় উল্লেখযোগ্য—চেহারাটিও মানাইয়াছিল ভাল।

পরিচালনায় সুক্ষ্মদৃষ্টির অভাব অতি ছোটখাট ব্যাপারেও পরিস্ফুট। চিত্রসূচনায় পরিচয় লিপির প্যাড্‌টা সরাইতেই একখানা "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা"—সোনার জলে লেখা চামড়া বাঁধান বই। তাহারই উপর প্যাড্‌খানা স্থাপিত। না চাহিতেই চন্দ্রাবতীর হাতের টর্চ প্রস্তুত। ভিখারীর গানটি সুন্দর—কিন্তু ওকি বেহালা বাজনা? বেহালা না দিলেই বা কি হইত? হরবিলাস একবার ছাড়া প্রত্যেকবার একই সুট পরিয়া দেখা দিয়াছে। শকুন্তলার বাড়ির সম্মুখে ঝিএর মত এক নারী ও কর্মচারীর মত দুই পুরুষের "নাগরিক কথোপকথন" এতই অশোভন যে, চিত্রনাট্য সম্বন্ধে ধারণা বদলাইতে হয়! হরবিলাসের প্রথমা স্ত্রীর মুখে রংয়ের জন্যই হউক বা যে জন্যই হউক ঠোঁটের দুই কোণে যে বিশ্রী সাদা প্যাচ্‌ ওঠানামা করিয়াছে, পরিচালকের দৃষ্টি তাহা কি করিয়া এড়াইল? সংগীতের দিক হইতে কমলা ঝরিয়া এ চিত্রের সম্পদ বটে, কিন্তু বাঙলার সংগীত দুর্ভিক্ষে এ গান তৃপ্তি দেয় না।

বিস্তর ছাঁটকাটের প্রয়োজন। আশা করি, কর্তৃপক্ষ অন্তত এই অস্ত্রোপচারটুকু করিয়া চিত্রটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিবেন। স্টুডিও-স্বপন-কাহিনী অপেক্ষা এ কাহিনী ও প্রচেষ্টা অনেক সুস্থ ও আদরের বস্তু সন্দেহ নাই।

রঙমহলে 'রত্নদীপের' সাফল্য-রজনী

গত রবিবার, ২৩শে মার্চ রঙমহল রঙ্গমঞ্চে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রত্নদীপ' নাটকের ৫০তম সাফল্য রজনী উপলক্ষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। মাননীয় বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এতদুপলক্ষে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক মন্মথ বসু প্রভৃতি 'রত্নদীপ' নাটকের সফলতার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতি মহাশয় অভিনেতা ও অভিনেত্রী এবং পরিচালকবৃন্দকে মাল্যভূষিত করেন। অনুষ্ঠানের পর 'রত্নদীপ' অভিনয় দেখিয়া আমন্ত্রিত ব্যক্তি ও দর্শকদল প্রভূত আনন্দ লাভ করেন।

ছায়ালোকের টুকিটাকি

শুনতে পাওয়া গেল, শ্রীযুত মণি বর্মণ নিউ টকিজের এপারে আর নেই, ওপারে চলে গ্যাছেন—পরিচালক শ্রীযুত সুকুমার দাশগুপ্তকে ত্যাগ করে! সুলেখক মণিবাবু ছিলেন—পরিচালক মশায়ের কাণ্ডারী। 'এপার-ওপারে'র (গল্পের) কর্ণধার। ভাল চিত্র-নাট্যকার, ওপারে যে তিনি সরে পড়লেন, সে কি সাঁতরে? না—নাওটি বেয়ে?.........কাণ্ডারীহীন শ্রীযুত দাশগুপ্ত ছবিখানা টেনে নিয়ে ওপারে গিয়ে উঠতে পারবেন তো?

* * * *

যে শুভলগনে অশোক তরুর আশ্রয় নিয়েছিলেন, শ্রীমতী কানন-লতা—সে শুভলগনে—সে মধুর 'পরিচয়' কত মধুর—তার ছবিটি তুলবার জন্যেই বোধ হয় শ্রীযুক্ত নীতিন বসু গত রবিবাসরে ইউনিটসহ শ্রীমতীর বাড়িতে হানা দিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী কানন—একে নারী, তায় চতুরা! অতিথিদের তিনি ভূরিভোজনে ভুলিয়ে রেখে নিজে মধুর হাসির আড়ালে পাশ কাটালেন। নীতিনবাবু শুধু ছবি তুললেন—নিজের 'লগন ও পরিচয়ে'র।

* * * *

পরিচালক হেমচন্দ্র মশায় সারদা আইনে পড়বেন না তো? গত সোমবার নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর প্রাঙ্গণে যার বিয়ে তিনি দেওয়ালেন, সে যে এখনও শিশু! তার 'নামকরণ' আজও হয় নি!

* * * *

নেই তাই খাচ্ছো—থাকলে কোথায় পেতে?
কালিদাস পণ্ডিতে কন্ পথে যেতে যেতে!

অজয় পণ্ডিত কি কন্! কালিদাস পণ্ডিত নেই। তাই কি তিনি কবি রবীন্দ্রনাথের মতই এ যুগের আধুনিকাদের মাঝে মালবিকা চতুরিকাদের খোঁজ করছেন? হয়তো তাদের পেয়েওছেন। তবে হে কবি অজয়! কবি কালিদাস বেঁচে থাকলে এ যুগের মালবিকা চতুরিকারা তাঁর দিকেই ঝুঁকতেন। এ যুগের অবন্তী উজ্জয়িনী হা হতোস্মি হ'ত তোমার কাছে।

* * * *

ফিলম্ প্রডিউসারের উমা গাঙ্গুলী মশায়ের খবর কি? রূপচাঁদ মারোয়াড়ীর রূপেয়ার তাগাদায় দিশে হারিয়ে তিনি গুপ্তদের বাগান বাড়ির দীঘিটায় ডুবে মরলেন না তো? বড় আশা করেই না তিনি স্টুডিওটি ঐ দীঘির পাড়ে বানিয়েছিলেন!

—সুরবীণ

খেলাধুলা

কলিকাতার ফুটবল খেলা

কলিকাতার হকি খেলা শেষ হয় নাই। ফুটবল খেলা আরম্ভ হইতে এখনও এক মাসের উপর দেরী আছে। কিন্তু তথাপিও এই ফুটবল খেলা লইয়া সম্প্রতি কলিকাতার বিশিষ্ট ক্লাব-সমূহের পরিচালকগণকে বিশেষ ব্যস্ত থাকিতে দেখা গিয়াছে। তবে এই ব্যস্ততা কেবল দলগঠন ব্যাপার লইয়াই সীমাবদ্ধ ছিল। আই এফ এর নিয়মানুসারে ২৫শে মার্চ ফুটবল খেলোয়াড়দের ছাড়পত্র গ্রহণের শেষ দিন। এই ২৫শে মার্চ তারিখের মধ্যে খেলোয়াড়গণ এই বৎসর যে যে দলে খেলিবে, তাহার শেষ নিষ্পত্তি হইয়া যায়। এইজন্য বিভিন্ন দলের পরিচালকগণকে দলের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য বিভিন্ন দল হইতে খেলোয়াড়গণকে নিজ নিজ দলের পক্ষে ছাড়পত্র গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। আই এফ এর কার্যকরী সমিতি এই বৎসরে লীগ খেলায় উঠানামা স্থগিত রাখিয়াছেন। ইহাতে অনেকের ধারণা হইয়াছিল, অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর ছাড়পত্র গ্রহণের সংখ্যা কম হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া মোট ২০৬ জন খেলোয়াড় ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করিয়াছেন। গত বৎসর ১৬৭ জন খেলোয়াড় ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। ছাড়পত্র গ্রহণের স্পৃহা যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা তাহারই প্রমাণ। এই বৎসরে ফুটবল খেলার উৎসাহে মন্দা পড়িবে বলিয়া সাধারণের মনে ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহাও যে ঠিক নহে, ছাড়পত্র গ্রহণের হিড়িক হইতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। কলিকাতার ফুটবল মরসুম যে জমিবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

বিভিন্ন দলের শক্তি

ছাড়পত্র গ্রহণের তালিকা হইতে বিভিন্ন বিশিষ্ট দলের শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে অবান্তর বলিয়া মনে হয় না। বাঙলার জনপ্রিয় ফুটবল দল মোহনবাগান ক্লাব এই বৎসর ভাল ভাবেই দল গঠন করিয়াছে। এই বৎসর এই দলে নূতন সাতজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় যোগদান করিয়াছেন। নিম্নে ইঁহাদের নাম প্রদত্ত হইলঃ—

(১) এরিয়ান্স ক্লাবের এ ভৌমিক।
(২) গৌহাটী মহারাণা ক্লাবের ব্যাক এস সি দাস।
(৩) কালীঘাট ক্লাবের ফরোয়ার্ড এস জোসেফ।
(৪) ইষ্টবেঙ্গল দলের বিশিষ্ট গোলরক্ষক ডি সেন।
(৫) কালীঘাট ক্লাবের ব্যাক শিবদাস রায়।
(৬) এরিয়ান্স ক্লাবের ফরোয়ার্ড কে প্রসাদ।
(৭) কালীঘাট ক্লাবের বিশিষ্ট গোলরক্ষক ধীরাজ দাস।

মোহনবাগান দল এই বৎসর চারিজন বিশিষ্ট খেলোয়াড়ের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহাদের নাম যথাক্রমে ব্যাক পি চক্রবর্তী, গোলরক্ষক কে দত্ত, ফরোয়ার্ড নির্মল মুখার্জি ও ফরোয়ার্ড জিতেন ঘোষ।

এরিয়ান্স ক্লাব দল

গত বৎসরের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী এরিয়ান্স ক্লাব দলের শক্তি এই বৎসরে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই বৎসর এই দল দুইজন বিশিষ্ট খেলোয়াড় এ ভৌমিক ও কে প্রসাদকে হারাইয়াছেন। এই বৎসরে এই দলে যে সকল নূতন খেলোয়াড় যোগদান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

[illegible]

(১) গৌহাটী মাহারাণা ক্লাবের কমল ঘোষ
(২) গৌহাটী মহারাণা ক্লাবের সুশীল ঘোষ
(৩) ভবানীপুর ক্লাবের অজিত ঘোষ।
(৪) ভবানীপুর ক্লাবের আর নারায়ণ।
(৫) ভবানীপুর ক্লাবের ব্যাক জুম্মান।
(৬) ভবানীপুর ক্লাবের এস তালুকদার।
(৭) স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের এস মুস্তফা।
(৮) হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাবের এস মুখার্জি।
(৯) সুবার্বন ক্লাবের এস কে ব্যানার্জি।

কালীঘাট ক্লাব

কালীঘাট ক্লাবের কর্তৃপক্ষগণ অ-বাঙালী খেলোয়াড়গণকে দলভুক্ত করার প্রথা এই বৎসর একরূপ বাদ দিয়াছেন। বাঙালী খেলোড়গণকে লইয়া দলের শক্তিবৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা লক্ষ্য করিয়া বাঙলার ক্রীড়ামোদিগণ কালীঘাট ক্লাবের কর্তৃপক্ষগণকে ধন্যবাদ দিবেন বলিয়া মনে হয়। এই বৎসর তাঁহাদের দলের নিয়মিত খেলোয়াড়গণ জোসেফ, আপ্পারাও, রামালুকে দল হইতে বাদ দিয়াছেন। এমনকি, তাহাদের দলের স্থানীয় খেলোয়াড় কাইজার, শিবদাস, এফ সিং, এস ব্যানার্জি ও এস চক্রবর্তী প্রভৃতি দল ত্যাগ করিয়াছেন। তাহা হইলেও এই দলের শক্তি বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই বৎসর এই দলে নিম্নলিখিত নূতন খেলোয়াড়গণ খেলিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

(১) মোহনবাগান ক্লাবের ব্যাক পি চক্রবর্তী।
(২) গৌহাটী মহারাণা ক্লাবের জে চৌধুরী।
(৩) গৌহাটী মহারাণা ক্লাবের গোলরক্ষক বি বল।
(৪) ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের এস মজুমদার।
(৫) ভবানীপুর ক্লাবের এ সিংহ।
(৬) স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের ফরোয়ার্ড পি ব্যানার্জি।
(৭) জর্জ টেলিগ্রাফ ক্লাবের হাফ ব্যাক এ গাঙ্গুলী।
(৮) স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের সুশীল চ্যাটার্জি।
(৯) ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের গণেশ ঘোষ।

ইহা ছাড়া সুবার্বন ক্লাবের পাঁচজন খেলোয়াড় যোগদান করিয়াছেন।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের শক্তি গত কয়েক বৎসর যেরূপভাবে কমিয়া গিয়াছিল, এই বৎসর তাহা অপেক্ষা ভাল হইবে বলিয়া মনে হয়। পূর্বের সকল বিশিষ্ট খেলোয়াড়কে দলে রাখিবার দিকে ইঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ইহা ছাড়াও, এই বৎসর দলে নিম্নলিখিত নূতন খেলোয়াড় যোগদান করিয়াছেনঃ—

(১) মোহনবাগান ক্লাবের গোলরক্ষক কে দত্ত,
(২) ফরিদপুর ক্লাবের এ চন্দ,
(৩) ঢাকা উয়াড়ী ক্লাবের বি সেনগুপ্ত,
(৪) কালীঘাট ক্লাবের আপ্পা রাও,
(৫) কালীঘাট ক্লাবের রামালু,
(৬) মোহবাগান ক্লাবের জিতেন ঘোষ, ইহা ছাড়া এই দলের কর্তৃপক্ষগণ কতকগুলি উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড়কে জুনিয়ার ক্লাব হইতে লইয়াছেন।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব

কলিকাতা ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব পূর্বের সকল নামজাদা খেলোয়াড়কে দলে রাখিয়াছেন। একমাত্র এই দলের সুজাতালী ভবানীপুর ক্লাবে যোগদান করিয়াছেন। তাহা হইলেও এই দলের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে ই বি আরের ওসমান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সাজাহান যোগদান করায়। ইহা ছাড়া এই দলের বিশিষ্ট গোলরক্ষক ওসমান এই বৎসর নিয়মিতভাবে খেলিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভবানীপুর ক্লাব

প্রথম বিভাগীয় দলের মধ্যে ভবানীপুর ক্লাব দলের শক্তি এই বৎসর বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই দলের এস তালুকদার, অজিত বসু, আর নারায়ণ, জুম্মান, পরিতোষ দাস, বি মিত্র, জি সাহা, অতীন সিং, এস সিংহ প্রভৃতি খেলোয়াড়গণ দলত্যাগ করিয়া বিভিন্ন দলে যোগদান করিয়াছেন। তাহা হইলেও এই দলের কর্তৃপক্ষগণ দলের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য যত্নবান ছিলেন তাহার প্রমাণ নিম্নে প্রদত্ত নূতন খেলোয়াড়গণের তালিকা হইতেই প্রমাণিত হইবে।

(১) মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সুজাতালী,
(২) কালীঘাট ক্লাবের কাইজার,
(৩) কালীঘাট ক্লাবের এস ব্যানার্জি,
(৪) জর্জ টেলিগ্রাফ দলের ভুট্টা,
(৫) জর্জ টেলিগ্রাফ দলের বি মিত্র।

ইহা ছাড়া পূর্বের খেলোয়াড় এম দাস, এস দেবরায়, এন দেবরায়, সরোজ মুখার্জি প্রভৃতি খেলোয়াড়গণ পুনরায় ভবানীপুরে দলে যোগদান করিয়াছেন।

স্পোর্টিং ইউনিয়ান ক্লাব

স্পোর্টিং ইউনিয়ান দল এই বৎসর বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। এই বৎসর এই দল হইতে বেচ্চু, পি ব্যানার্জি, এফ মহম্মদ, জে চ্যাটার্জি, এস চ্যাটার্জি, এন দত্ত, এস মুস্তাফি, এস সিংহ, ইউ পাল প্রভৃতি খেলোয়াড়গণ ছাড়িয়া গিয়াছেন। এই দলের বিশিষ্ট খেলোয়াড় করুণা চ্যাটার্জি এই বৎসর কালীঘাট ক্লাবের পক্ষে খেলিবেন বলিয়া ছাড়পত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ দিনে তিনি তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়া ছাড়পত্র বাতিল করিয়া দিয়াছেন। তাহা হইলেও এই দলের কর্তৃপক্ষগণ দলের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য অন্যান্য দলের বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণকে দলভুক্ত করিতে পারেন নাই।

ক্রিকেট লীগ খেলার ব্যবস্থা

বেঙ্গল জিমখানার পরিচালকগণ সম্প্রতি এক সভায় ক্রিকেট লীগ খেলার ব্যবস্থা আগামী শীতকালে করিবেন বলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্যবস্থার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করেন শ্রীযুত আই ঘোষ। তিনি এই লীগ খেলা কিরূপে পরিচালিত হইতে পারে তাহার এক খসড়া জিমখানার সভায় পেশ করেন। জিমখানার সভা আইন প্রণয়ন সাব কমিটির হস্তে এই খসড়া আলোচনা করিবার জন্য প্রদান করেন। উক্ত আইন প্রণয়ন সাব-কমিটি তাঁহাদের মতামত কার্যকরী সমিতিতে প্রদান করিলে কার্যকরী সমিতি তাহা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিষয়ের শেষ সিদ্ধান্ত আগামী জিমখানার বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত হইবে। এই সময় এইরূপ একটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায় কোনরূপ আপত্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিভিন্ন ক্রিকেট দলের বার্ষিক ক্রিকেট খেলার তালিকা প্রস্তুত করিতে যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় তাহার জন্য লীগ তালিকা প্রস্তুত করিয়া জুলাই মাসের মধ্যে সকল ক্রিকেট দলের নিকট প্রেরণ করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। উক্ত লীগ খেলা কিভাবে পরিচালিত হইবে তাহার জন্য আইন প্রণয়ন সাব-কমিটি নিম্নলিখিত মতামত প্রদান করিয়াছেনঃ—

(১) লীগ খেলার প্রচলন করা হইবে।

(২) জিমখানার অন্তর্ভুক্ত সকল দলকেই এই খেলায় যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে।

(৩) হাওড়ার জন্য স্বতন্ত্র এক লীগ খেলার ব্যবস্থা করা হইবে। ঐ খেলায় কেবল হাওড়ার দলসমূহ যোগদান করিবে।

(৪) বাঙলার সকল জেলায় ক্রিকেট লীগ খেলার ব্যবস্থা যাহাতে হয় তাহার জন্য জেলার ক্রীড়া পরিচালকগণকে অনুরোধ করা হইবে।

(৫) জিমখানার অন্তর্ভুক্ত কলেজ দলসমূহকে এই লীগ খেলায় যোগদান করিতে দেওয়া হইবে না। ইহার পরিবর্তে বাঙলার সকল বিশিষ্ট ক্রিকেট দলকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলের সহিত দেড়দিনব্যাপী খেলায় যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে।

(৬) প্রথম বৎসরে লীগ খেলায় ২০টি দল গ্রহণ করা হইবে। এই ২০টি দলকে দুইটি বিভাগে বিভক্ত করা হইবে। প্রতি বিভাগের প্রথম পাঁচটি দলকে প্রথম শ্রেণীর দল বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(৭) লীগের সকল খেলা দেড়দিন ব্যাপী হইবে।

(৮) লীগ খেলায় যোগদানকারী সকল দলকে নিজ নিজ মাঠ জিমখানার পরিচালকগণ লীগ খেলার জন্য যদি চাহেন তবে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

নিয়মাবলী গঠন বেশ ভালই হইয়াছে। প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত কার্যকারী হইলে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইব।

বাঙলার সন্তরণ মরসুম

বাঙলার সন্তরণ মরসুম আগতপ্রায়। বিশিষ্ট সন্তরণ প্রতিষ্ঠানসমূহে এখন হইতেই বিশেষ তোড়জোড় আরম্ভ হইয়াছে। সকল প্রতিষ্ঠানই শিক্ষানবীশ বালক বালিকাদের সন্তরণ কৌশল বিশেষ যত্নসহকারে শিক্ষা দিবেন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এইরূপ তোড়জোড়, এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থার প্রচারপত্র প্রতি বৎসরই সন্তরণ মরসুমের পূর্বে পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং এই দিক দিয়া ইহার কোনই নূতনত্ব নাই। আমরা প্রকৃত সন্তুষ্ট হইব যদি এই শিক্ষার ব্যবস্থা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত হয়। কারণ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সন্তরণ কৌশল শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বাঙলার সন্তরণের স্ট্যান্ডার্ড উন্নততর করিতে হইলে এইরূপ ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। প্রতি বৎসর আমরা বিভিন্ন সন্তরণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণের এই-দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ জানাইয়াছি। আশা করি এই বৎসরে তাঁহারা এই বিষয় একটু মনোযোগ দিবেন।

সময় বার্ত্তা

১৯শে মার্চ।—

বৃটিশ বাহিনী জিজিগা দখল করিয়াছে। জিজিগা পূর্ব আবিসিনিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর।

সোমবার রাত্রিতে জার্মানির ব্রেমেন ও উইলহেলমসভ্যানের উপর বৃটিশ বিমানসমূহ প্রবলভাবে আক্রমণ চালায়। ঐ দুইটি স্থানের ডকের ও শিল্পকেন্দ্রের নানাস্থানে আগুন লাগে ও বিস্ফোরণ হয়।

গত ৯ই মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে জার্মানির আক্রমণে মোট ২৫খানি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে কুড়িখানা হইল বৃটেনের জাহাজ ও পাঁচখানি হইল বৃটেনের মিত্রশক্তির জাহাজ। ইহার পূর্ব সপ্তাহে বৃটেনের ১৯খানি জাহাজ জলমগ্ন হয়।

গতরাত্রিতে লণ্ডনে বিমান হানার সংকেতধ্বনি যত দীর্ঘ সময় স্থায়ী হইয়াছিল, এরূপ দীর্ঘস্থায়ী বিমান হানার সংকেত-ধ্বনি ইতিতপূর্বে আর করা হয় নাই। জার্মান বিমানসমূহ ইংলণ্ডের উপকূলবর্তী শহরগুলির উপর প্রবল আক্রমণ চালায়।

এরিত্রিয়ায় অসহ্য গরমের মধ্যে কেরেন রণাঙ্গনে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে।

২০শে মার্চ।—

আলবেনিয়ার রণাঙ্গনে প্রচণ্ড সংগ্রামের পর অগ্রগামী গ্রীক বাহিনী তেপেলিনীতে প্রবেশ করিয়াছে। তেপেলিনী ভ্যালোনার পথে অবস্থিত ইতালি অধিকৃত সর্বশেষ শহর। বহু ইতালীয় সৈন্য বন্দী ও প্রচুর রণসম্ভার গ্রীকদের হস্তগত হইয়াছে।

বৃটিশ নৌদপ্তরের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ সাবমেরিনসমূহ সমুদ্রবক্ষে ইতালীয় যোগপথসমূহের উপর সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালায়। বৃটিশ সাবমেরিনের আক্রমণে চারিটি ইতালীয়ান জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

লণ্ডনের উপর প্রবল বিমান আক্রমণ হয়। বিভিন্ন দিক হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে জার্মান বিমান মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আক্রমণ চালায়। এ বৎসরে লণ্ডনের উপর এরূপ প্রবল বিমান আক্রমণ আর হয় নাই। ব্যাপক অঞ্চলের উপর আক্রমণকারী বিমানের ঝাঁক হইতে হাজার হাজার অগ্নিপ্রজ্বালক বোমা বর্ষিত হয়। উহাতে কতিপয় ব্যক্তি হতাহত হইয়াছে।

২১শে মার্চ।—

বৃটিশ বাহিনী বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড ও আবিসিনিয়ার সীমান্তবর্তী হারগেইসা দখল করিয়াছে। অদ্য লণ্ডনের কর্তৃপক্ষীয় সামরিক মহলে যে বিবরণ পেশ করা হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, সম্প্রতি ইতালীয়ানরা আলবেনিয়ার গ্রীক ঘাঁটিসমূহের উপর যেসব প্রচণ্ড অথচ নিষ্ফল আক্রমণ চালায় তাহাতে ইতালীয়ানদের ২৫ হাজার সৈন্য হতাহত হয়।

বৃটিশ বিমান বিভাগের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, কেরেন-এর চতুর্দিকবর্তী ইতালীয়ান সৈন্য ও ঘাঁটিসমূহের উপর প্রবল আক্রমণ চালান হইতেছে। দুইদিন যাবৎ বৃটিশ ও দক্ষিণ আফ্রিকান বিমানবহর আক্রমণ চালায়।

মার্কিন সিনেট বরাদ্দ কমিটি বৃটেনকে সাত শত কোটি ডলার সাহায্যের বিলটিকে অনুমোদন করিয়াছেন।

যুগোশ্লাভিয়ায় এক নূতন রাজনৈতিক সঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছে। জার্মানির তথাকথিত আপোষ সর্ত লইয়া মন্ত্রিগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। তিনজন মন্ত্রী ইতিমধ্যেই পদত্যাগ করিয়াছেন। অপর একজন মন্ত্রীও পদত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই জার্মানির সর্ত মানিয়া লওয়ার বিরোধী।

২২শে মার্চ।—

বৃটিশ বাহিনী কর্তৃক জিরাবুব অধিকৃত হইয়াছে। জিরাবুবের ইতালীয় সৈন্যাবাসের অধ্যক্ষ এবং প্রায় ১৮০০ সৈন্য বন্দী হইয়াছে। তব্রুকের ১৫০ মাইল দক্ষিণে এবং মিশর সীমান্ত হইতে ৪০ মাইল দূরে লিবিয়ার মধ্যে জিরাবুব অবস্থিত।

আলেকজান্দ্রিয়া হইতে 'রয়টারে'র বিশেষ সংবাদদাতা জানান যে, ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌবহর যুদ্ধ সম্পর্কে অতি চমৎকার কার্য করিতেছে। অবরোধ কার্য দ্বারা ক্রমে ইতালীয়ানবহরকে একেবারে বাহির হইতে দিতেছে না। পূর্ব ও পশ্চিম ভূমধ্য-সাগরে বৃটিশ নৌবহর পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

গতরাত্রে উত্তর ফ্রান্সে জার্মান ইউ-বোট ঘাঁটি লোরিয়ার উপর বৃটিশ বিমানবহর আবার আক্রমণ চালায়। ইহা লইয়া পর পর তিন রাত্রি লোরিয়া আক্রমণ করা হইল।

২৩শে মার্চ।—

কায়রোর জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের এক ইস্তাহারে বৃটিশ বাহিনী কর্তৃক আবিসিনিয়ার অন্যতম প্রধান শহর নেগহেলি দখলের সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, আবিসিনিয়ার অন্যান্য রণাঙ্গনে সন্তোষজনকভাবে সংগ্রাম চলিতেছে।

জাপ পররাষ্ট্রসচিব মিঃ মাৎসুওকা মস্কো পেঁীছিয়াছেন বলিয়া জার্মান রেডিও ঘোষণা করিয়াছে। ত্রিশক্তি চুক্তিতে যে দেশগুলি যোগ দিয়াছে, তাহাদের কূটনৈতিক দূতেরা তাঁহার আগমনকালে স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

ঋণ ও ইজারা বিল অনুসারে আমেরিকা পঞ্চাশ কোটি ডলার ব্যয়ে বৃটেনের জন্য চারিশত বাণিজ্য জাহাজ নির্মাণ করিবে। এই সংবাদ আমেরিকার নৌ-কমিশনের জনৈক মুখপাত্র দিয়াছেন।

২৪শে মার্চ।—

বেলগ্রেডের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বিরাট জার্মান বাহিনী স্টুমা উপত্যকার মধ্য দিয়া গ্রীক সীমান্তের দিকে অতি দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

নিউইয়র্কের এক সংবাদে প্রকাশ, জার্মানি তাহার প্রধান নৌশক্তি আটলাণ্টিক মহাসাগরে সমাবেশ করিতেছে। জার্মান বেতারে প্রকাশ, আটলাণ্টিক মহাসাগরে দুইদিন যাবৎ বৃটিশ রণতরী জার্মান ব্যাটলশিপের সন্ধানে ফিরিতেছে।

নাইরোবীর সংবাদে প্রকাশ যে, সমগ্র বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড এক্ষণে বৃটিশের আয়ত্তে আসিয়াছে। কেরেন রণাঙ্গনে সাম্রাজ্য ও মিত্রশক্তি বাহিনীর অগ্রগতি রোধের জন্য ইতালীয়রা বেপরোয়া সংগ্রাম চালাইতেছে। সাম্রাজ্য ও মিত্রশক্তি বাহিনী ক্রমশ শহরের নিকটবর্তী হইতেছে।

২৫শে মার্চ।—

জার্মান নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, যুগোশ্লাভিয়া ত্রি-শক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছে। এতদ্দ্বারা পাঁচটি রাষ্ট্রের ত্রি-শক্তি চুক্তিতে যোগদান সম্পন্ন হইল। ভিয়েনায় চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

গত ২২শে মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে যুদ্ধের দরুণ বৃটেনের মোট ১০ কোটি ২৬ লক্ষ ৯১ হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে, অর্থাৎ দৈনিক ব্যয় হইয়াছে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ ৯১ হাজার পাউণ্ডের বেশী।

গত ১৬ই মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বৃটেনের মোট ২৩টি জাহাজ ধ্বংস হইয়াছে।

আনকারায় সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট তুর্কী গভর্নমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, তুরস্ক যদি আক্রান্ত হয় এবং দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধে নামিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে সে সোভিয়েটের সদিচ্ছা ও নিরপেক্ষতার উপর নির্ভর করিতে পারে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১৯শে মার্চ।—

ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গুরুতর আকার ধারণ করে। বাবুরবাজার ও নয়াসড়কে উচ্ছৃংখল দাঙ্গাকারীদের উপর গুলীবর্ষণ করা হয়। ফলে ৪ জন নিহত ও ৯ জন আহত হয়। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে লুঠতরাজ, গৃহদাহ, মারপিট চলিতে থাকে। অফিস, আদালত, ব্যাঙ্ক, স্কুল, কলেজ সমস্তই বন্ধ আছে। শহরে ১৪৪ ধারা ও সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। এ পর্যন্ত মোট ১৪ জন নিহত ও ৯১ জন আহত হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত গভর্নমেন্টের বাজেটের পুলিশ খাতে ২ কোটি ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর হয়। এই প্রসঙ্গে বিরোধী দলের পক্ষ হইতে কয়েকটি ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া গভর্নমেন্ট কর্তৃক পুলিশ বিভাগের জন্য ক্রম-বর্ধমান ব্যয়বরাদ্দের এবং পুলিশ বাহিনীর কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করা হয়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক জানান যে, ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত বাঙলায় ভারতরক্ষা আইনে মোট ১৫৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

২০শে মার্চ।—

ঢাকার দাঙ্গার অবস্থা সংকটজনক। লুঠতরাজ, গৃহদাহ, মারপিট বন্ধ হয় নাই। সেনাবাহিনী ও পুলিশ শহরে টহল দিতেছে। অদ্য লালবাগে পুলিশ গুলী চালাইয়াছিল। ফলে কয়েকজন আহত হইয়াছে। এ পর্যন্ত মোট ১৭ জন নিহত ও ১০২ জন আহত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বিমানযোগে ঢাকায় গমন করিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদে ফাইন্যান্স বিল আলোচনার প্রস্তাব ৪৬—২৮ ভোটে পাশ হইয়াছে। কংগ্রেস জাতীয় দল এবং মুসলিম লীগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙলা গভর্নমেন্টের বাজেটে 'সেচ' খাতে ৩২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা এবং "পূর্ত" খাতে ১ কোটি ৫৫ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দের দাবী মঞ্জুর হয়।

অন্ধ্র প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াকে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়।

২১শে মার্চ।—

কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিবেশনে ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট অলোচনা প্রসঙ্গে আনীত একটি ছাঁটাই প্রস্তাবের ফলে কর্পোরেশনের উচ্চপদস্থ কর্মচারিবৃন্দের বেতন সাময়িকভাবে হ্রাস করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এক বৎসর কারাদণ্ড ভোগের পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সুযোগ্য সম্পাদক মৌলবী আস্রফউদ্দিন আমেদ চৌধুরীর মুক্তিতে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিবার জন্য কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিরাট জনসভা হয়। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

ঢাকার দাঙ্গার অবস্থার বিশেষ কোনও উন্নতি হয় নাই। ইসলামপুর রোডে চৌকী দেওয়ার কাজে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় দক্ষিণ সদর মহকুমা হাকিম মিঃ পি নাগ ছোরার আঘাতে আহত হন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ঢাকায় রওনা হইয়া যান।

২২শে মার্চ।—

ঢাকার দাঙ্গার অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। প্রায় ১২ ঘণ্টাকাল শান্ত অবস্থায় অতিবাহিত হইবার পর সকাল ১০টার সময় কয়েকটি অঞ্চলে আবার মারপিট আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ঢাকার উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করেন। এ পর্যন্ত ২৩ জন নিহত ও ১৪২ জন আহত হইয়াছে।

খুলনা জিলার গঙ্গাছানার দাঙ্গার অবস্থা আয়ত্তে আসিয়াছে বলিয়া খবর আসিয়াছে। এ পর্যন্ত একজন স্ত্রীলোক-সহ চারিজন নমঃশূদ্রের মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙলা সরকারের বাজেটের 'বিচার বিভাগ' খাতে ৭১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা এবং 'প্রাদেশিক আবগারী' খাতে ২২ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর হয়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের এক বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত জে সি মুখার্জিকে আগামী ১লা এপ্রিল হইতে আরও দুই বৎসরের জন্য পুনর্নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত পুনরায় সমর্থন করিয়া এবং এই পুনর্নিয়োগে বাঙলা সরকার আপত্তি করায় তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিতে অনুরোধ জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২৩শে মার্চ।—

কলিকাতা ভবানীপুরস্থ আশুতোষ কলেজ হলে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের দক্ষিণ কলিকাতা শাখার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন বিশেষ উৎসাহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী সরকার সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ওঝার সভাপতিত্বে ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘের চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়।

ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী বাঙলা সরকার এই প্রদেশের বর্তমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে সংবাদ ও মন্তব্য প্রভৃতি প্রকাশ বিষয়ে কতকগুলি বিধিনিষেধ জারী করিয়াছেন।

ঢাকার অবস্থার সামান্য উন্নতি দেখা যায়। কিন্তু শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও ইতস্তত মারপিট ও ছুরিকাঘাত চলিতেছে। নারিন্দায় ৬০ বৎসর বয়স্ক একজন সরকারী পেন্সনভোগী ছুরিকাঘাতে নিহত হয়। অন্যান্য অঞ্চলে ছোটখাট সংঘর্ষের ফলে চারি ব্যক্তি জখম হয়; তন্মধ্যে একজন হাসপাতালে মারা গিয়াছে। এ পর্যন্ত মোট ২৬ জন নিহত ও ১৫০ জন আহত হইয়াছে। দাঙ্গা সম্পর্কে এ পর্যন্ত প্রায় ২৩০ ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছে।

২৪শে মার্চ।—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দাসের প্রশ্নের উত্তরে ঢাকার দাঙ্গা সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী প্রদত্ত এক বিবৃতিতে জানা যায় যে, এ পর্যন্ত ২৮ জন নিহত (২১ জন মুসলমান, ৬ জন হিন্দু, ১ জন সনাক্ত হয় নাই) এবং ১৫৭ জন আহত (৯৯ জন মুসলমান, ৫৫ জন হিন্দু, ৩ জন সনাক্ত হয় নাই) হইয়াছে। পুলিশ এই পর্যন্ত ২৩৪ জনকে দাঙ্গা সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তন্মধ্যে ১৫৭ জন হিন্দু ও ৭৭ জন মুসলমান। এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে প্রকাশ যে, ঢাকার অবস্থা ক্রমেই উন্নতির দিকে যাইতেছে।

২৫শে মার্চ।—

অদ্য সকালে ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে কতকগুলি গৃহে অগ্নি সংযোগ করা হয়। দাঙ্গা সম্পর্কে এ পর্যন্ত মোট ২৫০জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। দোকান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এখনও বন্ধ আছে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক পুনরায় ঢাকা গিয়াছেন।

সুন্দরবন প্রজাগণের অভাব ও অভিযোগের আলোচনার নিমিত্ত কলিকাতা বহুবাজার স্ট্রীটস্থ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে সুন্দরবনের প্রজাদের এবং তাঁহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কলিকাতার অধিবাসীদের এক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। খাঁ বাহাদুর এম এ মোমিন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সুন্দরবন কৃষকগণের অভাব অভিযোগ এবং তাহাদের প্রতিকারের নিমিত্ত কতকগুলি দাবী সম্পর্কিত প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়।

সরকারী কর্মচারীদের সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘ অনুমোদনের জন্য লীগ দলের পক্ষ হইতে মিঃ আবদুল্লা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে প্রস্তাব আনিয়াছিলেন, তাহা ৪৮—১৭ ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

বিচিত্র বার্তা

ভবিষ্যৎ জীবনে যাতে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিশেষ কোন অভাব না ঘটে সেইজন্য মানুষ প্রথম থেকেই মনের রুচি মত একটা বৃত্তি অবলম্বন করে নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবন তৈরী করবার চেষ্টা করে। এ চেষ্টায় মানুষ সাধনালব্ধ ফল পায় সত্য, কিন্তু বর্তমানে যে ব্যতিক্রম ঘটছে তা বেকার জীবনের বিস্তার দেখেই আমরা যথেষ্ট কেবল অনুমাণ নয় অনুভবও করছি। ব্যারিষ্টারী, ডাক্তারী, ওকালতী এ সমস্তের মধ্যে স্বাধীন বৃত্তির যেমন পরিচয় ছিল তেমনি ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একটা লোভনীয় আশা। কিন্তু বর্তমানে আশায় অবলম্বন না করে ছেলেরা যে কেবল বর্তমান বেকার জীবনের অনূঢ়া নামটা মোচনের জন্যেই এখনও কাতারে কাতারে পরীক্ষার ধাপ উত্তীর্ণ হ'য়ে এই সব স্বাধীন বৃত্তির দিকে চলেছে এটা বলে না দিলেও যথেষ্ট হবে।

আজকাল সকলের মুখেই শুনছি চাকুরীতে উন্নতি নেই, বাঙালীর ব্যবসা বুদ্ধি ত চিরকালই ঘোলাটে, একমাত্র যা উচ্চশিক্ষার মধ্যে সম্মানজনক স্বাধীন বৃত্তি ছিল তাতেও আবার লোকের ভীড় হওয়ায় সকলেই বড় বেকারে পড়েছে। হতাশার দীর্ঘনিশ্বাস, ব্যর্থ জীবনের অবসান, এ সমস্তই যেন একমাত্র জীবনের শেষ সম্বল। মনের মধ্যে আশার সঞ্চার করতে যেন এতটুকু রশ্মি রেখাও আমাদের নেই। কিন্তু এতখানি হতাশ হবার কারণ নেই, ইতিহাস আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করবে। সত্য সত্যই যদি আমরা জীবিকা উপার্জনের প্রথম বৃত্তি দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে না পারি তা হলে হতাশ হয়ে না পড়ে আমাদের দ্বিতীয় কর্মপদ্ধতির জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এবং এই Second-Stringই (দ্বিতীয় বৃত্তি) অদ্ভুতভাবে মানুষকে যশ এবং অর্থ উপার্জনে কি পরিমাণ সাহায্য করেছে তা পৃথিবী বিখ্যাত কয়েক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করলেই বুঝতে পারা যাবে।

এক সময়ে এক যুবক ডাক্তারী পাশ ক'রে জীবনে প্রচুর অর্থ এবং যশ লাভ করবার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এসে যুবক কোন রকম সাফল্যলাভ করতে পারল না। খুব কম রুগীই তার দ্বারস্থ হ'ত আর তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ডাক্তারের যথাযোগ্য পারিশ্রমিকও দিতে পারত না। নানা দিক থেকে অভাবের তাড়না এসে যুবক ডাক্তারকে হতাশ করে তুললে। প্রচুর অবসর সময়ে ডাক্তার সর্বক্ষণই ভাবত দ্বিতীয় বৃত্তির দ্বারা কিভাবে অর্থ উপার্জন করা যায়। একদিনের চিন্তামগ্ন অবসরে যুবক ডাক্তার গল্পের প্লট কাগজের উপর লিখে ফেললে। তার পর থেকে গল্প লেখাই অবসর সময়ের দ্বিতীয় বৃত্তি হয়ে উঠল এবং গল্প লেখাটাকে তিনি বেশ পছন্দ করতেন যদিও এই দ্বিতীয় বৃত্তিটা বিশেষ লাভজনক ছিল না। কিন্তু একদিন তিনি তাঁর নির্জন ঘরে বসে খাতার উপর এই নামটি লিখলেন, 'Study in Scarlet'। তারপর কয়েক বারের চেষ্টায় তিনি তাঁর গল্পের নায়কের নাম দিলেনঃ Sherlock Holmes। সাহিত্যে এই নায়কের চরিত্রটাই অন্যান্যদের মতই প্রভূত সম্মান লাভ করেছে। অকৃতকার্য ডাক্তার ডাক্তারী বৃত্তিতে খ্যাতি লাভ করতে পারেন নি তাঁর দ্বিতীয় বৃত্তি সাহিত্যতে প্রচুর যশ লাভ করেছেন। Conan Doyle-এর দ্বিতীয় বৃত্তি যখন এতখানি তাঁকে সম্মান দান করলে তখন আমরা কি এটাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখব না? ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যেও বহু খ্যাতনামা লেখক তাঁদের প্রথম বৃত্তিতে অকৃতকার্য হয়ে দ্বিতীয় বৃত্তি অর্থাৎ সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে খ্যাতি লাভ করেছেন। Gulliver ছিলেন বদমেজাজী একজন হতাশ clergyman...... পিকউইকের প্রথম বৃত্তি ছিল পার্লামেণ্টের রিপোর্ট সংগ্রহ করা......এ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড, অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষক... এমনি আরও অনেকে রয়েছেন যাঁদের নামের একটা বড় তালিকা তৈরী করা যায়।

এ ছাড়া দ্বিতীয় বৃত্তি হিসাবে জীবন বৃত্তান্ত লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন বসওয়েল। তিনি ছিলেন একজন অকৃতকার্য আইনজীবী। ঐতিহাসিক মেকলে মোটেই আইন ব্যবসাটাকে পছন্দ করতেন না। ইতিহাস লেখাটাই তাঁর দ্বিতীয় বৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দার্শনিক এমার্সন তাঁর প্রথম বৃত্তি স্কুল-মাস্টারি কাজটাকে ঘৃণা করতেন। তিনি ধর্মপ্রচারের কাজে মন দেন, দলের লোকের মতবাদের সঙ্গে নিজের একমত না হওয়ার জন্য একদিন বক্তৃতা মঞ্চ পরিত্যাগ করলেন। কবি সেক্সপিয়ার নিজেই একজন সেয়ার মার্কেটের দালাল ছিলেন। যদি না তিনি তাঁর প্রথম বৃত্তি পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় বৃত্তিকে গ্রহণ না করতেন তাহলে তিনি অজ্ঞাতই থেকে যেতেন। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও অনেকে আছেন যাঁরা প্রথম বৃত্তি পরিত্যাগ করে বিজ্ঞানকে দ্বিতীয় বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। নিউটন তাঁর মাকে কোন একটা ব্যবসায় সাহায্য করে প্রথম জীবন আরম্ভ করেন; কিন্তু তাঁর সাহায্য বিশেষ কিছু হয়নি। ডারউইন প্রথমে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন কিন্তু তিনি তার উপযুক্ত না হওয়ায় প্রথম সংকল্প পরিত্যাগ করেন। এর পর তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ না হওয়া পর্যন্ত ভিন্ন বৃত্তির জন্য শিক্ষা লাভ করেন। এলবার্ট আইনস্টন কয়েক বৎসর ধরে শিক্ষকতা করেন এবং বার্নেতে Examiner of Patents ছিলেন। আবিষ্কারকদের মধ্যেও অনেকের নাম পাওয়া যায় যাঁরা জীবনের প্রথম বৃত্তির উপর হতাশ হয়েছেন।

বাষ্পীয় এঞ্জিনের আবিষ্কারক ওয়াট ছিলেন একজন অঙ্কের যন্ত্রপাতি তৈরী করবার সামান্য মিস্ত্রী। অবশ্য বাষ্পীয় এঞ্জিনের প্রথম দিকটা নিউকোমেন নামে একজন

লোহ বিক্রেতার চেষ্টায় যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল। রেলের ইঞ্জিন আবিষ্কারক স্টিফেনসান ছিলেন একজন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। বাষ্পীয়পোত আবিষ্কারক ফুলটন একজন চিত্রকর ছিলেন। ল্যান্ডস্কেপ এবং পোরট্রেটে তাঁর ভাল হাত ছিল। টেলিগ্রাফের আবিষ্কারক মরস্‌ও একজন চিত্রকর ছিলেন। টেলিফোনের আবিষ্কারক গ্রেহাম বেল ছিলেন একজন শিক্ষক। এডিসন যদি রেলওয়ে টেলিগ্রাফির কাজেই পড়ে থাকতেন তা হলে বৈদ্যুতিক আলো, গ্রামোফোন, চলচ্চিত্র এবং আরও এমনি বহু বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কার হ'তে অনেকদিন লাগত। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় যদি সাইকেল মেরামতের কাজই চালাতেন তাহলে হয়ত এ্যারোপ্ল্যানের আবির্ভাব আমাদের কল্পনার মধ্যেই থেকে যেত।

সুতরাং কেউ যদি উপস্থিত কাজের মধ্যে কোন রকম উন্নতির আশা দেখতে না পান অথবা আর্থিক অভাবের মধ্যে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করেন তা হলেও একেবারে হতাশ হবেন না; আপনারা জীবিকাউপার্জনের প্রথম বৃত্তিতে সাফল্য লাভ না করলেও দ্বিতীয় বৃত্তি রয়েছে। এবং এই দ্বিতীয় বৃত্তিই জগতের বহুজনকে উন্নতি এবং যশের সর্বউচ্চ স্থান দিয়েছে। হয়ত আপনি দ্বিতীয় বৃত্তি অবলম্বন ক'রে বহুজনের মত খ্যাতি লাভ না করতে পারেন তবু বর্তমান সংকট অবস্থার মধ্যে থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করাটা কি কোন রকম যুক্তি সংগত মনে করেন না? এ বিষয়ে যাঁদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁরা বলেন, দ্বিতীয় বৃত্তি অবলম্বন করাটাই বর্তমান সংকট অবস্থা থেকে আত্মরক্ষা করা এবং জীবন ধারণের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ। আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে, অসুস্থ মনকে কিছুক্ষণের জন্য অবসর সময়ে স্থির রেখে কিরূপ দ্বিতীয় বৃত্তি আপনার রুচির সমতা রাখবে এ চিন্তা আমাদের করা উচিত। জীবনের এটা একটা সুযোগ, এ্যাডভেঞ্চার এবং একদিন না একদিন এই দ্বিতীয় বৃত্তির সাহায্যেই অনেকের মত আমরা বর্তমান অবস্থার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে আনন্দের মধ্যে আসতে পারব। পৃথিবীর বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, আবিষ্কারক, বৈজ্ঞানিক জীবনের প্রথম বৃত্তিতে অকৃতকার্য হয়ে দ্বিতীয় বৃত্তির অবলম্বনে অর্থ, যশ অর্জন করেছেন। তাঁদের ইতিহাস অতীত হলেও আমাদের ভবিষ্যতের সম্বল।

সাহিত্য সংবাদ

প্রভাতী সংঘ

প্রভাতী সংঘের উদ্যোগে একটি "ছোট গল্প" প্রতিযোগিতা হইবে। নির্বাচিত গল্পগুলির প্রত্যেকটির জন্য ৫, টাকা করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে। একজন একাধিক পুরস্কারও পাইতে পারেন। খুবই ভাল গল্পের জন্য দশ টাকা পর্যন্তও দেওয়া যাইতে পারে। গল্প ৭ই জৈষ্ঠের মধ্যে পাঠাইতে হইবে। শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার, সম্পাদক, বেহার হেরাল্ড ও প্রভাতী, পাটনা ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

দেশবন্ধু সমিতির তৃতীয় বাৎসরিক উৎসব

গল্প, প্রবন্ধ, আবৃত্তি ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা

১। গল্প প্রতিযোগিতা—(ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য)। ২। আবৃত্তি প্রতিযোগিতা—সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "আমরা"। ৩। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা—"বাঙালী জাতি ও তাহার সাহিত্য" (ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য)। ৪। বিতর্ক প্রতিযোগিতা—"ব্যবহারিক বিজ্ঞান মানব জাতির প্রতিকূল না সহায়ক।"

গল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় নাম পাঠাইবার শেষ তারিখ—২০শে এপ্রিল, ১৯৪১।

আবৃত্তি ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় নাম পাঠাইবার শেষ তারিখ—১০ই এপ্রিল, ১৯৪১।

গল্প ও প্রবন্ধটি যথাক্রমে কালিতে লেখা ফুলস্কেপ সাইজের ৩ ও ৫ পৃষ্ঠার অধিক হইবে না। নিম্নলিখিত স্থানে পাঠাইতে হইবে। সম্পাদক—দেশবন্ধু সমিতি, মুন্সীপুকুর, চন্দননগর।

স্নেহলতা গ্রন্থাগার প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

স্নেহলতা গ্রন্থাগারের পক্ষ হইতে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সকলেই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন। প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কারস্বরূপ যথাক্রমে একটি স্বর্ণখচিত রৌপ্য পদক এবং একটি রৌপ্য পদক দেওয়া হইবে। রচনার বিষয়—"মানব সভ্যতার উপর ধর্মের প্রভাব।" কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিয়া 'অধ্যক্ষ, স্নেহলতা গ্রন্থাগার; পোঃ ধপধপি, জেলা ২৪ পরগণা'—এই ঠিকানায় আগামী ৩০শে এপ্রিল, ১৯৪১ সালের মধ্যে পাঠাইতে হইবে। প্রবেশমূল্য অথবা প্রবন্ধের আকার সম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধ নাই।

কমলা ইন্‌স্টিটিউটের উদ্যোগে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

আগামী ইস্টারের ছুটিতে কমলা ইন্‌স্টিটিউটের উদ্যোগে একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হইবে। প্রতিযোগিগণ ইহাতে বিনা প্রবেশিকায় যোগদান করিতে পারিবেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ রচিত "দুঃসময়" (চয়নিকা) বা "শ্যামলী" (মহুয়া) এবং "কাগজের নৌকা" বা "ছুটির দিনে" (ছুটির পড়া) যথাক্রমে বড় ও ছোটদের বিভাগে আবৃত্তির বিষয় নির্ধারিত করা হইয়াছে। প্রতিযোগিগণের বয়স যথাক্রমে ২০ এবং ১৬'র অনুর্ধ হওয়া চাই। শ্রেষ্ঠ বিবেচিত প্রতিযোগিগণকে পুরস্কার প্রদান করা হইবে। ৭।১।১বি, আহিরীটোলা ১ম লেনে কার্যালয়ের সম্পাদকের নিকট যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ শীঘ্রই আবেদন করুন।

পুস্তক পরিচয়

পৃথিবী-পরিচয় ঃ—শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত। প্রকাশক—বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থনবিভাগ। মূল্য বারো আনা।

ইংরেজি না জানা লোকের পক্ষে আধুনিক জ্ঞান আহরণ এক অসম্ভব ব্যাপার। জ্ঞান-বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য প্রায় সমস্তই প্রকাশিত হয় বিদেশী ভাষায়; সে আবরণ ভেদ করে আমাদের দেশের জনসাধারণের কাছে আলো এসে পৌঁছুতে পায় না। অথচ এর একটা বিহিত দরকার। বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ সেই কাজেই হাত দিয়েছেন। আধুনিক জ্ঞান-ভাণ্ডারের নানা সম্পদ নিয়ে বাঙলা ভাষায় বই লেখাবার ব্যবস্থা বিশ্ব-ভারতীর উদ্যোগে হয়েছে। এজন্যে "লোকশিক্ষা সংসদ"ও গঠিত হয়েছে।

"পৃথিবী-পরিচয়" লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ। পৃথিবীর উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, বর্তমান প্রকৃতি এবং আদিম প্রাণী-বৃত্তান্ত এর বিষয়। ভূতত্ত্বের সঙ্গে স্বভাবতই প্রাসঙ্গিকভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞানের আলোচনা এসেছে। কিন্তু সমস্ত তত্ত্বকে লেখক এমন সহজবোধ্য করে বিবৃত করেছেন যে, বুঝতে কোথাও কষ্ট হয় না। বইটিতে প্রধান পাঁচটি অধ্যায় আছে—পৃথিবীর জন্মকথা, পৃথিবীর ক্রমবিকাশ, ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধনে প্রাকৃতিক শক্তির কাজ, বায়ুমণ্ডল, প্রাণের প্রকাশ ভূতত্ত্ব ও প্রাক্কালীন প্রাণীবৃত্তান্ত। উপসংহারে লেখক নক্ষত্র-জগতের সমগ্র প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

লেখকের ভাষা চমৎকার। বিজ্ঞানের আলোচনায় আমরা সাধারণ যে নীরসতা রচনায় সংক্রমিত হতে দেখি, এতে তার চিহ্ন নেই। বইতে অনেকগুলি ছবি আছে।

পরিচয়—চৈত্র, ১৩৪৭। অন্যান্য ধারাবাহিক প্রবন্ধ, উপন্যাস ব্যতীত আলোচ্য সংখ্যায় আছে শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস', হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'ভারতবর্ষ ও কার্ল মার্কস' এবং শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরীর গল্প 'বসন্ত অভিযান'। শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, শ্রীকৃষ্ণকুমার দত্ত ও শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের তিনটি কবিতা আছে। শ্রীঅতুল গুপ্ত, শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ ও শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা পুস্তক পরিচয়গুলি উল্লেখযোগ্য।

কৃষ্ণার্জুন-সংবাদ—প্রথম ষটক। শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সরস্বতী, বি এ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বিপ্র প্রেস, তেমাথা, চন্দননগর। মূল্য ছয় আনা।

গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। সরল এবং সহজ-ভাবে গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়কে যাঁহারা বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। কঠিন দার্শনিক বিষয় সহজ করিয়া বুঝাইবার কৃতিত্ব লেখকের আছে।

কৃষ্ণ গায়িকা—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র সুর প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীনির্মল-কুমার রায়। ৫৪।১, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

গ্রন্থকার নিজেই লিখিয়াছেন—"সে কৃষ্ণ গায়িকা। সে জানে যে, কুরূপাই হউক, আর দরিদ্রাই হউক, রসিক ভক্তসমাজে সে সমাদৃতা হইবেই, কারণ সে কৃষ্ণ গায়িকা।

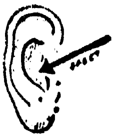
তথাপি সমালোচনা। বইখানা অনুবাদমূলক। রসরাজ্যের অন্তর্নিহিত এই সব নিগূঢ় তত্ত্বের অনুবাদও অনুভূতির গাঢ়তা ব্যতীত হয় না। "নাম শ্রবণে রাধা" গ্রন্থকার 'বিদগ্ধ মাধব' হইতে যে শ্লোকটির অনুবাদ করিয়াছেন, সেই অনুবাদের সহিত যদুনন্দন দাসের কৃত উক্ত শ্লোকের অনুবাদ মিলাইয়া পড়িলেই পার্থক্য ধরা পড়িবে।

তারা একদিন ভালোবেসেছিল (গল্পের বই)—শ্রীনবগোপাল দাস প্রণীত। প্রকাশক—সুরেশচন্দ্র দাস এম-এ, জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পারিসার্স লিমিটেড; ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা।

ডাক্তার নবগোপাল দাস আই-সি-এস অল্প সময়ের মধ্যেই বাঙলা-দেশের কথা-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার কয়েকখানি গল্পের বই বেশই সমাদর লাভ করিয়াছে। নবগোপালবাবুর এই নূতন বইখানা পাঠ করিয়াও আমরা সুখী হইয়াছি। বইখানিতে সাতটি গল্প আছে। নবগোপালবাবুর লেখার ভঙ্গীটি বড় সুন্দর এবং তাঁহার লেখার মধ্যে একটি সংযত সুষমা দেখিতে পাওয়া যায় বিশেষ একটি দৃষ্টিভঙ্গীতে রস ধারায় বিচ্ছুরিত। খোসা নয়, গল্পগুলি প্রাণধর্মে পুষ্ট এবং সরস। ছোট গল্পের পাঠকপাঠিকা-সমাজে তাঁহার লেখার সমাদর হইবে একথা আমরা স্বচ্ছন্দেই বলিতে পারি।

বধিরতা

বিজ্ঞানের নূতন আশ্চর্য্য আবিষ্কার



কাণ পাকা, কাণ কটকট করা, জ্বালা, কাণে শাঁ শাঁ সিটির মত শব্দ করা, চুলকান, কাণের নালিঘা ও কাণের পর্দ্দা খারাপ হওয়া, সর্দ্দি, জ্বর অথবা অতিরিক্ত কুইনাইন সেবনের ফলে আংশিক বা সম্পূর্ণ বধিরতা বা কাণে কালা প্রভৃতি রোগ আমাদের **বধিরতা হরণ** তৈল ব্যবহারে অত্যাশ্চর্য্য রূপে আরোগ্য হয়। লক্ষ লক্ষ রোগী এই মহৌষধ ব্যবহারে ব্যাধিমুক্ত হইয়া শ্রবণশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন। বিফলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ২৲।

আরোগ্য সদন, দুর্গাদেবী ষ্ট্রীট, (কুম্ভারবারা) বোম্বাই 4

গর্ভ

চিরতরে বন্ধ মাত্র ৭ দিন সেবনে সন্তান নিরোধ—মূল্য **৬৲, এক বছরের ২৸০, ছয় মাসের ১৷৷০,** নির্দ্দোষ ও নিয়মিত মাসিক ঋতু হয়।

ঋতু

বন্ধে ফ্লোমেন্স যে কোন কারণে ২।৩ মাসের বন্ধ ঋতু ৩।৪ দিন সেবনে নির্গত হয়—মূল্য ৬৷৷০। ঔষধ গ্যারাণ্টি পত্র সহ পাঠান হয়। ঠিকানাঃ—Dr. S. C. Bhaduri, Dampier, MUTTRA (U. P.)

হাঁপানী কাসি

শ্বাস অর্থাৎ হাঁপানি কাসির অব্যর্থ দৈবশক্তিসম্পন্ন মহৌষধ। **ইহা দুই** দিন মাত্র সেবনের পর শ্বাসের শান্তি এবং শীঘ্র নির্দ্দোষ আরোগ্য হয়। মৃতপ্রায় শ্বাসরোগীর ইহাই একমাত্র প্রাণদাতা। মূল্য ডাকব্যয় সহ ১৷৷০।

কবিরাজ শ্রীগোষ্ঠবিহারী গোস্বামী, পোঃ পুলশিটা, মেদিনীপুর।

গভঃ রেঃ, বিফলে ৫০০৲ পুরস্কার

৫০ বৎসরের পরীক্ষিত নির্দ্দোষ ঔষধ

ঋতু

সংকটে (যে কোন প্রকার) গর্ভবিপত্তিতে ২৪ ঘণ্টায় স্রাব নিশ্চিত, মূল্য—২৷৴০।

গর্ভ

রোধে নির্ঘাৎ ফল (ঋতু ঠিক রাখে), **স্থায়ী**—৪৷৷০, অস্থায়ী—১৷৷০। গ্যারাণ্টিড, নিয়মাবলী ফ্রি।

কবিরাজ এম কাব্যতীর্থ, জলপাইগুড়ি।

সিল্কি মস্‌লিন

দুগ্ধফেনিভ শুভ্র। অতি কোমল, সুন্দর ও **টেকসই।** ৯ গজ×৫৪″ ৬টি সার্টের পক্ষে যথেষ্ট; মূল্য ৬৲ টাকা। ডাক খরচা ফ্রী। অপছন্দে মূল্য ফেরৎ। **সর্ব্বত্র এজেণ্ট** আবশ্যক। অনুগ্রহপূর্ব্বক ইংরাজীতে চিঠিপত্র লিখুন।

জগন্নাথ চননরাম

লুধিয়ানা ডি ৬৭

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল

আপনাদের সমবেত সাহায্যের উপর
বিশেষভাবে নির্ভর করে

আপনি কি মাসিক মাত্র এক টাকা করিয়াও সাহায্য দান করিতে পারেন না?

অবিলম্বে এই সামান্য সাহায্য দান করিয়া বাঙলা দেশকে, বাঙালীকে রক্ষা করুন!

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানাঃ

ডাঃ কে এস রায়, সুপারিনটেনডেণ্ট,

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল

৬এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোড, কলিকাতা

ধাতুপীড়া

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, জীবনীশক্তি হীনতা ও স্বপ্নদোষাদি, **স্ত্রীকচার,** গণোরিয়া, মূত্রদোষ, স্ত্রীলোকের যাবতীয় পীড়ায় অকাল্ট হাউসের কৃতিত্ব চিরস্মরণীয় থাকিবে। কারণ ঐ সকল পীড়ায় অকাল্ট হাউসের বিশেষজ্ঞ ডাঃ **পি দত্ত,** বি-এ; এম-ডি, এইচ; পি এস ডি, (আমেরিকা) মহোদয়ের চিকিৎসা কখনও বিফল হয় না। সেই বিশ্ববিশ্রুত ডাঃ পি দত্ত কর্ত্তৃক সুপরীক্ষিত হইয়া চিকিৎসিত হইলে অচিরেই আরোগ্য-লাভ করিবেন। ভারতে ও ভারতের বহির্দ্দেশে সহস্র সহস্র রোগী তাঁহার আশ্চর্য্য চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়াছে—আপনিও হউন। আর বাজে চিকিৎসায় অর্থব্যয় করিবেন না। আজই পীড়ার বিস্তৃত বিবরণ লিখুন। অকাল্ট হাউস, ১১০-ডি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

টনসিল

যে কোনও প্রকার **দুরা-রোগ্য ও পুরাতন টনসিল** বিনা অপারেশনে **ডাঃ পি দত্তের** চিকিৎসাসাফল্যে সত্বর গ্যারাণ্টি দিয়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করা হয়। টনসিল অপারেশন করিবার প্রয়োজন নাই। প্রাতে ৮—১১টা ও বৈকাল ৪—৬টার মধ্যে রোগী নিয়া আসিবেন। **পরীক্ষার** চার্জ্জ লাগিবে না।

মফঃস্বলস্থ রোগিগণ পত্রে বিস্তারিত জানাইবেন। **ডাঃ পি দত্ত,** বি-এ, এম-ডি, এইচ, পি-এস-ডি (আমেরিকা), **ফোন : ক্যাল ৪১৭।**

অকাল্ট হাউস, ১১০-ডি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

দেশ

৮ম বর্ষ] ২২শে চৈত্র, শনিবার, ১৩৪৭ সাল। Saturday, 5th April, 1941 [২১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

জাতীয় সপ্তাহ—

আগামী ৬ই এপ্রিল হইতে জাতীয় সপ্তাহ আরম্ভ হইবে। ভারতের ইতিহাসে এই সপ্তাহের স্মৃতি বিলুপ্ত হইবার নয়, ভারতের স্বাধীনতাকামীদের অন্তরের অবদানে এই সপ্তাহ চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের রক্তমাখা স্মৃতি জাতি ভুলিতে পারিবে না; সেই স্মৃতি ভারতের পরাধীনতার বেদনা তাহার অন্তরে তীব্র করিয়া তুলিবে এবং স্বাধীনতার সাধনায় দিবে তীব্র উদ্দীপনা। জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে আজ উপলব্ধি করিতে হইবে এই সত্যকে যে, স্বাধীনতার সাধনার ক্ষেত্রে তাহাদের প্রত্যেকের কর্তব্য রহিয়াছে এবং সে কর্তব্য প্রতিপালন না করার কৃতঘ্নতার অপরাধ সামান্য নয়। জাতীয় সপ্তাহের পবিত্র তিথিতে ভারতের স্বাধীনতার বেদীমূলে যাঁহারা নিজেদের জীবন অর্ঘ্য দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের আদর্শে আমরা প্রত্যেকে যেন অনুপ্রাণিত হই এবং স্বার্থসংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া জাতির প্রতি নিজেদের কর্তব্য প্রতিপালনে পর্যাপ্ত শক্তি লাভ করিতে পারি। আমরা যেন বুঝি আজ যে যতদিন আমরা স্বাধীনতা অর্জন না করিতে পারিব এবং সেই আদর্শে ঐক্যবদ্ধ না হইতে শিখিব, ততদিন পর্যন্ত মানবীয় ন্যায় নীতির কোন যুক্তিই জাতি হিসাবে বাস্তব জগতের অবমাননা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। দুর্বলতার পাপ বড় পাপ, এই পাপে যে জাতি অভিভূত হইয়াছে, ভগবান স্বয়ং আসিয়াও সে জাতিকে রক্ষা করিতে পারেন না; অন্য ক্ষেত্রে যাহাই হউক, বাস্তব জীবনে সবল যে, ভগবান তাহারই সহায় এবং দুর্বলকে রক্ষা তিনি করেন না; পক্ষান্তরে সাজাই দিয়া থাকেন। দুর্বলতার কারণ নৈতিক অধোগতি ছাড়া অন্য কিছুই নয়; আত্ম-প্রবঞ্চনার জন্য যাহাই বলা হউক না কেন।

ক্ষমতার অপপ্রয়োগ—

ক্ষমতার অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে বৈধ প্রতিকারের ব্যবস্থা যে ক্ষেত্রে না থাকে, সে ক্ষেত্রে শাসকদের দ্বারা ক্ষমতার অপপ্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই সুনিশ্চিত হইয়া উঠে, কিন্তু বাঙলা দেশে, বিশেষভাবে বাঙলা দেশের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে সরকারী ক্ষমতার অপপ্রয়োগ যেমন দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে ভারতের অন্য কোন প্রদেশেই তেমন হয় নাই। সহযোগী 'বসুমতী'র উপর সম্প্রতি বাঙলা সরকার যে আদেশ জারী করিয়াছেন, তাহা একেবারেই চরমে গিয়া উঠিয়াছে। হক মন্ত্রিমণ্ডল অনেক কুকীর্তি অর্জন করিয়াছেন, কিন্তু 'বসুমতী' তিন সপ্তাহ কালের জন্য বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহারা ভারতে যে কীর্তি অর্জন করিলেন তাহা পরাধীন ভারতের ইতিহাসে লেখা থাকিবে। সহযোগী 'বসুমতী'র উপর এই যে উৎকট এবং অভূতপূর্ব দণ্ডনীতি প্রয়োগ, ইহার হেতু কি? আমরা অভিযুক্ত প্রবন্ধটি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াও তেমন কিছু কারণই দেখিতে পাইলাম না। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় ব্যবহার বিধিজ্ঞ ব্যক্তি, তিনিও কিছু দেখিতে পান নাই; কিন্তু মন্ত্রিদের সেজন্য ভাবনা কিছুই নাই। শরৎচন্দ্র নিজেও সেকথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, 'দুর্ভাগ্য এই যে, জরুরী আইনের বিধানে নির্যাতিত ব্যক্তিদের বিচারালয়ের সাহায্যপ্রার্থী হইবার পথ উক্ত আইনের দ্বারাই পূর্ব হইতেই রোধ করা হইয়াছে।' বাঙলা সরকার বসুমতীর বিরুদ্ধে দণ্ড প্রয়োগের যে হেতু দেখাইয়াছেন তাহা হইল বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয়গণের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষের ভাব প্রচার। বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলের আশ্রিত এবং বাঙলা সরকারের দানে পরিপুষ্ট দুইখানি পত্রিকার বিরুদ্ধে এই সম্বন্ধে পুনঃ পুন গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও তাঁহারা কিছু করেন নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সম্প্রতি একটি প্রশ্নের উত্তরে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী বলেন, "উহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবিধান করিতে গেলে আরও হাজারটার বিরুদ্ধে প্রতি-বিধান করিতে হয়।" হাজারের অজুহাত হইল সেক্ষেত্রে,

অথচ 'বসুমতী'র বেলা হইল না কেন, লোকের মনে এ প্রশ্ন স্বভাবতই উঠিবে। এ ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সত্য এই যে, মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধে যাহারা কথা বলিবে, দণ্ডের প্রয়োজনীয়তা মন্ত্রীদের দৃষ্টিতে তাহাদের পক্ষে সব সময়েই পরম; একাধিক বিরাগভাজন পত্রিকাকে রাজদ্বারে টানিয়া লইয়া গিয়া বিশেষ সুবিধা হয় নাই। মন্ত্রিমণ্ডলকেই কয়েকটি ক্ষেত্রে বেকুব বনিতে হইয়াছে; সুতরাং তাঁহারা আর সে পথে না গিয়া ভারতরক্ষা আইনের বিশেষ বিধানের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। ক্ষমতার এই ধরণের অপপ্রয়োগের ক্ষেত্র অবাধ এবং উন্মুক্ত; সুতরাং দেশব্যাপী এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যদি প্রতিবাদ না হয়, তাহা হইলে বাঙলা দেশের জাতীয়তাবাদী সকল সংবাদপত্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া উঠিবে। অবশ্য এখনও তাহাদের জীবন কোন সুখের জীবন নয়, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে সকলভাবেই সংকোচ সাধন করা হইয়াছে; কিন্তু অবস্থা যেদিকে গড়াইতেছে তাহাতে সমালোচনা করিবার অধিকারের ন্যায্যতা বলিতে কিছু থাকিবে না। সব সংবাদপত্রকে ক্রীতদাসের জীবন যাপন করিতে হইবে। তেমন জীবনধারণ করার চেয়ে না করাই ভাল। 'বসুমতী'র বিপদের পর ভারতের সংবাদপত্রসেবীদিগকে গুরুত্বের সঙ্গে তাঁহাদের এই জীবনমরণ সমস্যার সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে।

প্রেস এডভাইসরি কমিটির মূল্য—

সংবাদপত্র এবং গভর্নমেণ্টের সঙ্গে পরস্পর সহযোগিতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কিছুদিন হইল কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক প্রেস এডভাইসরী কমিটিসমূহ গঠিত হইয়াছে। কথা ছিল এই যে, গভর্নমেণ্ট সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পূর্বে প্রেস এডভাইসরী কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করিবেন। কিন্তু 'বসুমতী'র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে প্রেস এডভাইসরী কমিটির পরামর্শ গ্রাহ্য করেন নাই। প্রেস এডভাইসরী কমিটি নিজেরা উপযাচক হইয়া মধ্যস্থতা করিতে গিয়াছিল; কিন্তু বাঙলা সরকার সে সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। ব্যাপার যখন এরূপ তখন প্রেস এডভাইসরী কমিটির মূল্য কি? সংবাদপত্রের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের অন্তত বাহ্যভাবে এই যে প্রচেষ্টা ইহারও কোন সার্থকতা এমন ক্ষেত্রে থাকে না। বাঙলার সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘ 'বসুমতী'র বিরুদ্ধে প্রযুক্ত দণ্ডের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক অশান্তি সম্পর্কিত সংবাদ সরকারী প্রেস অফিসারকে দেখাইয়া লইতে হইবে, এই যে হুকুম জারী হইয়াছে তাহারও প্রতিবাদ করা হইয়াছে; কিন্তু শুধু এই প্রতিবাদে কোন ফল হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। এইভাবে ক্ষমতার অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী আন্দোলন জাগাইয়া তুলিতে হইবে। দৈন্যময় জীবন লইয়াও সংবাদপত্রগুলিকে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে উহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

আইনের অপপ্রয়োগের নজীর—

ভারতের স্বাধীনতার দাবীর সঙ্গে সমর প্রচেষ্টায় বাধা দানের সম্পর্ক কি? কংগ্রেস স্বাধীনতা চায়, সুতরাং কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দিতে বলা আর সমর প্রচেষ্টায় বাধাদান করিতে বলা কি এক এবং অপরাধজনক? নাগপুরের ম্যাজিস্ট্রেট এই সিদ্ধান্ত করেন যে নিশ্চয়ই অপরাধজনক এবং তিনি শ্রমিক নেতা শ্রীযুক্ত রুইকরকে ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়। আপীলে নাগপুরের সেসন জজ শ্রীযুক্ত রুইকরকে মুক্তি দিয়াছেন। তিনি স্পষ্টভাবেই তাঁহার রায়ে এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, "যুদ্ধের সময় জরুরী আইন জারী করার একটা মস্ত বিপদ এই যে, উহা অতি সহজেই জনগণের সাধারণ নাগরিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে।" ইহার যুক্তিপূর্ণ কারণও তিনি দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, "যেখানে একই লোকের হাতে শাসনের এবং বিচারের ক্ষমতা থাকিবে সেখানে বিচারের ভুল হওয়া স্বাভাবিক। ম্যাজিস্ট্রেট মনে করিতে পারেন যে আসামীকে শাস্তি দিতেই হইবে। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারশক্তি নষ্ট হইয়া যাওয়া অসম্ভব নয়।" শ্রীযুক্ত রুইকর যে ধরায় অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে আপীলের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু যে ক্ষেত্রে আপীলের ব্যবস্থা নাই সে ক্ষেত্রে শাস্তি দিতেই হইবে এমন সংস্কারবদ্ধ শাসকদের দ্বারা আইনের কিরূপ অপপ্রয়োগ ঘটিতে পারে সহজেই অনুমেয় এবং সেখানে প্রমাণের জন্য আইনের দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের মধ্যে যাইবারও প্রয়োজন হইবে না।

বাঙলা ভাষার স্থান—

বাঙলা ভাষার প্রতি ভারত সরকারের ঔদাসীন্যের অভিযোগ আমরা ইহার আগেও করিয়াছি। সম্প্রতি আর একটি নজীর পাওয়া গিয়াছে। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রস্তাব করা হয় যে, বাঙলা, উড়িয়া ও অসমীয়া ভাষায় সরকারী প্রচারপত্র মুদ্রিত হওয়া উচিত। ইহার প্রত্যুত্তরে স্বরাষ্ট্রসচিব স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল বলেন যে, কেবলমাত্র হিন্দী, উর্দু ও ইংরেজী ভাষাতেই সরকারী প্রচারপত্র মুদ্রিত হয়; কেননা, অন্যান্য ভাষাগুলি নিখিল ভারতীয় ভাষা নহে। সরকারী প্রচারপত্র মুদ্রণের এবং প্রচারের সুব্যবস্থার জন্য মাথাব্যথা আমাদের পক্ষে অবান্তর কিন্তু এই সিদ্ধান্তের ভিতর দিয়া ভারতের ভাষা সম্বন্ধে কর্তাদের জ্ঞান কিরূপ পরিপক্ক, তাহা ভাবিয়াই আমরা আশ্চর্য হইয়াছি। নিখিল ভারতীয় ভাষা কোনটি, বিতর্ক তুলিয়া লাভ নাই, নিখিল ভারতের লোকে বুঝে, ইহাই যদি স্বরাষ্ট্রসচিবের মতে নিখিল ভারতীয় ভাষার সংজ্ঞা হয়, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি, হিন্দী কিংবা উর্দু এই দুই ভাষা মাদ্রাজের লোকে বুঝে কি? মাদ্রাজের লোকেরা তো হিন্দী ভাষার উপদ্রব হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আইন ভঙ্গের আন্দোলন পর্যন্ত চালাইয়া জেলে গিয়াছিল। ভারতের

বেশী লোকে বুঝে, এমন ভাষাই যদি নিখিল ভারতীয় ভাষার মর্যাদা পায়, তাহা হইলে বাঙলা ভাষা সেই মর্যাদা পাইবে না কেন? কম পক্ষে ভারতের আট কোটি লোক এই বাঙলা ভাষায় কথা বলে, অর্থাৎ ভারতবর্ষে এই ভাষায় যত লোক কথা বলে, এত বেশী লোক অন্য কোন ভাষায় কথা বলে না। বাঙলা ভাষা সমগ্র জগতে ষষ্ঠ এবং সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দ্বিতীয় স্থানীয়। ইংরেজী রাজভাষা রাজপুরুষদের কাছে সে ভাষা যতদিন ভারতের শাসন ব্যাপারে ইংরেজ রাজপুরুষদের কর্তৃত্ব আছে, ততদিন পাইবেই; কিন্তু হিন্দী এবং উর্দু অযোগ্য হইয়াও যে মর্যাদা পাইবে, বাঙলা ভাষাকে সে মর্যাদা দেওয়া হইবে না, কর্তাদের এই মতিগতিতে বাঙালীর মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইবে।

মহতের পূজা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসব প্রতিপালনের আয়োজন হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে জন্মতিথি প্রতিপালন ভারতে এই প্রথম। মহামনীষী রবীন্দ্রনাথের পূজা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ নিজেরাই গৌরবান্বিত হইবেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জয়ন্তীর উদ্বোধন হইয়াছে গত ২৮শে মার্চ হইতে। কলিকাতার কমার্শিয়াল মিউজিয়মে এই উপলক্ষে একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। বিশিষ্ট মনীষিবর্গ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে মূল্যবান তথ্যপূর্ণ আলোচনা করিয়া দেশের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করিতেছেন। আগামী ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলিবে। বিশেষ আনন্দের বিষয়, বাঙলার প্রবীণ সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের জন্মতিথি প্রতিপালনের জন্য এবার উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা মহৎ, এই সব সাময়িক অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁহাদের মান মর্যাদা যে বাড়ে ইহা নয়, তাঁহারা নিজেদের কর্মসাধনার বলেই সমাজে স্থায়ীভাবে নিজেদের মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু মহতের এই পূজাতে লাভ আছে জাতির। জাতির মধ্যে ইহার ফলে মহৎ জীবনের আদর্শ এবং ভাবধারা ছড়াইয়া পড়ে। মহতের সেবার প্রবৃত্তি জাতির মধ্যে জাগিলে ইহাই বুঝা যায় যে, জাতির মধ্যে তাঁহাদের গুণরাজী উপলব্ধির ক্ষমতাও জন্মিয়াছে। মহৎ-পূজার এই সব অনুষ্ঠান এই দিক হইতে আমাদের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছে।

বিশ্বপ্রেমের মূল—

"ভগবানে প্রেম না হইলে বিশ্বপ্রেম লাভ হয় না"—আধুনিকতাবাদীরা সহজে কথাটা স্বীকার করিয়া লইতে চাহিবেন না। মহামহোপাধ্যায় পন্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনে তাঁহার সারগর্ভ অভিভাষণে এই কথাটা অতি সরল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার সে সুচিন্তিত বক্তৃতা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলেন তাহার মর্ম এই যে, বিশ্বপ্রেম করা উচিত বলিলেই কেহ বিশ্বপ্রেম করিতে পারে না। সেজন্য জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে বদলাইয়া ফেলিতে হয় এবং আত্মানুভূতিতেই জীবনের এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধিত হয়। সেই যে আত্মানুভূতি, স্বার্থ ছাড়িয়া একান্ত পরার্থপরতার পথেই সম্ভব হইতে পারে। এই পরার্থপরতাই প্রেম, সর্বত্র যদি ইষ্টদেবের মূর্তি হয়, তবেই প্রেম জন্মে। প্রত্যেক জীবদেহকে যদি আমরা ভগবানের মন্দির মনে করিতে পারি, তবেই মানব সেবায় আমাদের মতি হইতেও আমরা বিশ্বপ্রেম লাভ করিব। এই হইল তাঁহার উপদেশ; এখন ভগবানের মন্দিরের কথা শুনিলেই আধুনিকতাবাদীরা আপত্তি তুলিবেন। কিন্তু কথাটা হইতেছে এই যে, পরকে আপন করা চাই, এই আপন করার ব্যাপারটা শুধু কর্তব্যের নির্দেশে কুলায় না; কিংবা আইনের জোরেও এ জিনিষ হয় না। আপন করিবার মূলে যে উপলব্ধি সেখানে বিচার নাই। বিচারকে অতিক্রম করিয়া সকল মানুষের মধ্যে রসবস্তুর যে প্রাপ্তি, তাহাই ভগবানের তত্ত্ব। এই তত্ত্বের উপলব্ধি যেখানে জীবনে নাই সেখানে সেবা আনন্দের সূত্রে সত্য নহে, অনপেক্ষতা সেখানে নাই। দেশ কাল পাত্রের অপেক্ষা, মান যশ প্রভৃতি বাহিরের বস্তুর হিসাবই সেখানে মনকে দুর্বল করিয়া রাখে। সাম্যবাদ জীবনে সার্থক করিতে হইলে পরের মধ্যে প্রিয়ত্বের এই প্রত্যক্ষতার দিকে যাইতে হইবে, ইহাই হইল বৈষ্ণব দর্শনের কথা। ভারতের সাধনাকে গভীরভাবে না বুঝিয়া তাহাকে লঘু করিবার একটা অশ্রদ্ধা তরুণদের চিত্তে দেখা দিয়াছে। তাহাদিগকে এই সব বিষয়গুলি বিশেষ করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। তাহাদিগকে বুঝাইবার প্রয়োজন আছে এই সোজা সত্য যে, তাহারা যদি সত্যই সমাজ-বিপ্লব ঘটাইতে চায় সাম্যের দিক হইতে, তবে ভারতের সংস্কৃতির পথেই তাহাদিগকে যাইতে হইবে, নতুবা এদেশের মর্মকে তাহারা স্পর্শ করিতে পারিবে না।

লোকগণনার ফল—

আদমসুমারীর ফলাফল পাকাপাকিভাবে এখনও ঘোষণা হয় নাই। শুনিতেছি, গতবারের গণনার চেয়ে এবারকার গণনায় শতকরা ২০ জন লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলিকাতার লোকসংখ্যা শতকরা ৮৫ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। নোয়াখালীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার নাকি সবচেয়ে বেশী এবং যশোহরে সবচেয়ে কম। এই হার যদি সত্যই হয়, তাহাতেও আমরা বিস্মিত হইব না। কলিকাতার লোকসংখ্যা যে বাড়িয়াছে এবং বাড়িতেছে, ইহা সকলে চোখের উপরই দেখিতেছেন। কৃত্রিম কারসাজী খাটাইয়া কোন সম্প্রদায় এই বৃদ্ধিটা দেখাইয়াছে, কলিকাতার সম্বন্ধে এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। বাঙলা দেশের অন্যান্য স্থানের সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। এ বৎসর আদমসুমারীতে কেহ

যাহাতে বাদ না পড়ে, সেজন্য যতটা দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে, অন্যবারে তেমন হয় নাই। বাঙলা দেশের হিন্দুসমাজের বড় একটা অংশ, যাঁহারা কংগ্রেসের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁহারা তো গতবারের আদমসুমারী বর্জনই করিয়াছিলেন। এই যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, ইহা কোন সম্প্রদায়ের কতটা—পাকা হিসাব না পাওয়া পর্যন্ত তাহা বুঝা যাইতেছে না; ইতিমধ্যে যাঁহারা লোকসংখ্যা কৃত্রিমভাবে বাড়ানো হইয়াছে বলিয়া আর্তনাদ তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমরা আশ্বস্ত হইতে বলি।

বীরভূমে দুর্ভিক্ষ—

বীরভূম জেলার সর্বত্র দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। কিন্তু জেলার ১৭৩টি ইউনিয়নের মধ্যে মাত্র ৪৩টি ইউনিয়নে সরকারীভাবে "অন্নাভাব" ঘোষণা করা হইয়াছে। বীরভূমের একজন বিশিষ্ট সংবাদদাতা জানাইতেছেন, "যে কয়টি ইউনিয়নে অন্নাভাব ঘোষণা করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আরও বহু স্থানে বহু পরিবার অর্ধাহারে ও অনাহারে দিন কাটাইতেছে। গ্রামের মধ্যে সঙ্গতিসম্পন্ন লোকের গৃহে ভাতের ফেন বা ভুক্তাবশিষ্ট ফেলিবার সময় ক্ষুধাকাতর বহু লোক তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য ভিড় করিয়া কলহ করিতেছে। মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারভুক্ত বহু দুর্গত ব্যক্তি লজ্জায় ভিক্ষা করিতে পারিতেছেন না, দোকানে গিয়া প্রকাশ্যভাবে ব্যবহার্য তৈজসপত্রাদিও বিক্রয় করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা গোপনে মাঠে বা গ্রাম হইতে দূরে রাস্তার ধারে বসিয়া অতি অল্পমূল্যে ঘটি, বাটি, থালা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া দিতেছেন। অনাহারকাতর চাষী মজুর শ্রেণীর লোক মধ্যবিত্ত পরিবারের রন্ধনগৃহ হইতে রাত্রে চুরি করিয়া ভাত খাইয়া পলাইতেছে।" দেশের এই অবস্থা; এদিকে লণ্ডনের মেয়রের ফণ্ডে বাঙলা সরকার হইতে লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব মঞ্জুর করা হইয়াছে। আইন অনুসারে উহা দেওয়া যায় কি না, এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা-পরিষদে তর্ক উঠিয়াছিল। আইনের বিধানে ভারতের স্বার্থের উদ্দেশ্যে দেওয়া যায় এরূপ নির্দেশ আছে। বাঙলার প্রধান মন্ত্রীর যুক্তি এই যে, ভারতের স্বার্থের অর্থে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মান যশ ইহাও বুঝিতে হইবে। মান বাড়ুক, যশ বাড়ুক, খুবই ভাল; কিন্তু প্রাণ বাঁচিলে তো মান এবং যশ! বিপন্ন বীরভূমবাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সরকার কি করিতেছেন, মাত্র ৪৩টি ইউনিয়নে অন্নাভাব ঘোষণা করিয়াই তাহারা খালাস; কিন্তু দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে সমস্ত জেলা জুড়িয়া, দেশের মান বাড়াইবার জন্য ব্যস্ত হইবার আগে নিরন্নের কষ্ট দূর করার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করিলে তবে মানায়।

দোকান কর্মচারী আইন—

গত ১লা এপ্রিল মঙ্গলবার হইতে বঙ্গীয় দোকান কর্মচারী আইন কলিকাতা এবং হাওড়া, শহরতলীতে প্রবর্তিত হইয়াছে। এই আইনে দোকানের কর্মচারীদের সুবিধা দেওয়া হইয়াছে অনেক। তাঁহারা সপ্তাহে দেড় দিন এবং বৎসরে চৌদ্দ দিন পুরা বেতনে ছুটি পাইবেন; ইহা ছাড়া বৎসরে দশ দিন তাঁহারা খুচরা ছুটি পাইবেন। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে পূর্ববর্তী মাসের বেতন পরবর্তী মাসের দশ দিনের মধ্যে মিটাইয়া দিতে হইবে। দোকানের কর্মচারী-দিগকে কোন দিনই দশ ঘণ্টার বেশী অথবা সপ্তাহে ৫৬ ঘণ্টার অধিক খাটানো চলিবে না। সাত ঘণ্টা এক লাগোয়া কাজ করিলে এক ঘণ্টা এবং প্রতি ৫ ঘণ্টা কাজে আধ ঘণ্টা করিয়া বিশ্রাম দিতে হইবে। কাজ ও বিশ্রামের সময় যোগ করিয়া কখনই বার ঘণ্টার অধিক হইতে পারিবে না। এই বিধান প্রবর্তিত হইবার পর কলিকাতা শহরে রাত্রি আটটার সময় দোকান বন্ধ হইতেছে, খরিদ্দার জমা হইয়া থাকিলে সাড়ে আটটা পর্যন্ত দোকান খোলা রাখা যাইবে। কলিকাতা শহরে রাত্রি দশটা পর্যন্ত দোকানের কেনা বেচা চলে, গরমের দিনে তো বিশেষভাবেই। আইনের দ্বারা দোকানের কর্মচারী-দের অনেক অভিযোগ দূর হইয়াছে, তবে আমাদের মনে হয় যে, কলিকাতা শহরে অন্তত দোকান বন্ধ করিবার সময়টি আরও একটু পিছাইয়া দিলে ভাল হয়।

হারারের পতন—

হারার আবিসিনিয়ার দ্বিতীয় শহর। আবিসিনিয়ার যুবরাজকে ডিউক অব হারার বলা হইয়া থাকে। ইহার পরবর্তী খবরে দেখা যাইতেছে যে, ইতালীয়রা আবিসিনিয়ার তৃতীয় শহর দিরেদাওয়া পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। মনে হইতেছে, ব্রিটিশ বাহিনী এইবার আদ্দিস-আবাবা-জিবুতী লাইনের নিকটবর্তী হইয়াছে। ইহার ফলে আদ্দিস আবাবারও পতন ঘটিবে। ইংরেজ সেনা যেভাবে অগ্রসর হইতেছে যদি এইভাবে তাহাদের অগ্রগতি চলে এবং ইতালী আবিসিনিয়ার বাহির হইতে সেনা সাহায্য না পায়, তাহা হইলে আবিসিনিয়া পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিবে, এমন আশা করিবার কারণ দেখা দিয়াছে। লিবিয়ার উপকূলভাগে জার্মান সেনা গিয়াছে এরূপ জানা গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা সামান্য বলিয়াই মনে হয়। ইতালী যদি অধিকতর সাহায্য জার্মানীর নিকট হইতে আফ্রিকার উপকূলে না পায়, তাহা হইলে আফ্রিকার উপকূলভাগে রোম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার যে স্বপ্ন মুসোলিনী দেখিয়াছিলেন এবং আবিসিনিয়া দখল করিয়া যে দেমাক তিনি ফলাইয়াছিলেন, তাহা বিচূর্ণ হইবে। আবিসিনিয়ার এই সংগ্রামের পরিণতি ভারতবাসীরা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করিবে। আবিসিনিয়া পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিবে, ভারতবাসীরা ইহাই চায়।

ছদ্মবেশী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৯

ক্ষণকাল পরস্পরের মধ্যে নানা বিষয়ে অসম্বদ্ধ আলাপ-আলোচনার পর সহসা এক সময়ে বিনয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লতিকা বলিল, "তুমি কিন্তু বেশ লোক!"

এ কথার উত্তরে বিনয় কিছু বলিবার পূর্বে গম্ভীর মুখে প্রশান্ত বলিল, "সে কথা আমরাও স্বীকার করি লতিকা। তবে এ-রকম অসঙ্কোচ স্বামী-প্রশংসা ইতরজনের অগোচরে হলে বোধ হয় আর একটু শোভন হয়।"

প্রশান্তর এই পরিহাস বাক্য শুনিয়া সকলে উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল।

আরক্ত মুখে লতিকা বলিল, "আমি কিন্তু সত্যি-সত্যিই প্রশংসা করছিনে দাদা।"

বিনয় বলিল, "অর্থাৎ, 'তুমি বেশ লোক' মানে উনি বলতে চাচ্ছেন 'তুমি বেশ লোক নও'।"

প্রশান্ত বলিল, "অলঙ্কার শাস্ত্রে একে বলে ব্যাজোক্তি; অর্থাৎ, স্তুতির ছলে নিন্দা। এর বিপরীত হচ্চে নিন্দার ছলে স্তুতি, আমার সঙ্গে বাক্যালাপের সময়ে যার ব্যবহার লাবণ্য সদাসর্বদা ক'রে থাকেন।"

পুনরায় একটা হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

লাবণ্য বলিল, "আমি কিন্তু কখনো ব্যাজোক্তি করিনে। ব্যাজোক্তিকে আমি বাজে উক্তি ব'লে মনে করি।"

প্রশান্ত বলিল, "এখন তা হলে বোঝা গেল, আমার সঙ্গে বাক্যালাপের সময়ে লাবণ্য সদাসর্বদা আমার যে নিন্দে ক'রে থাকেন তার কোনোটাই স্তুতি নয়।"

পুনরায় সকলে হাসিয়া উঠিল।

লতিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশান্ত বলিল, "কিন্তু সে যাই হোক লতিকা, বিনয় আমাদের সামনে কি এমন অপরাধ করলে যার জন্যে তুমি তার নিন্দে করতে উদ্যত হয়েছ তা' ত কিছুই বুঝতে পারছিনে। এ নিন্দের দ্বারা তোমাদের কোনো পূর্ব ব্যাপারের জের টানছ না ত'?"

ব্যস্ত হইয়া সলজ্জ মুখে লতিকা বলিল, "না, না, কোনো পূর্ব ব্যাপারের জের টানা নয়, উনি এখানেই অপরাধ করেছেন। আচ্ছা, বলুন দেখি দাদা, দেখবার আগ্রহ যাঁর সকলের চেয়ে বেশি, তাঁর হাতে একবার না দিয়ে আপনার হাত থেকে অবনীশবাবুর চিঠিখানা নিয়ে পকেটে পুরে কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে উনি ব'সে আছেন!"

লতিকার কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি চিঠিখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া বিনয় বলিল, "ওহো, একেবারে ভুলে গেছি! মনে করিয়ে দেবার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি লতিকা।" তৎপরে সুলেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিত মুখে বলিল, "এই বিলম্বের জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন সুলেখা দেবী। আজ আপনার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনে আপনাকে আমি অবনীশের লেখা এই চিঠিখানি শুধু পড়তে দিতেই চাইনে, উপহার দিতে চাই। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, আপনার সংগ্রহ-ভাণ্ডারে এটি একটি মূল্যবান বস্তু হয়ে থাকবে।"

সলজ্জস্মিত মুখে সুলেখা বলিল, "আপনি যে চিঠিখানা আমাকে দিতে চাচ্ছেন সে জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু বন্ধুকে লেখা চিঠি বন্ধুর কাছে থাকলেই ত' ভাল হয়।"

বিনয় বলিল, "এ চিঠি বন্ধুকে লেখা বেশি, না বন্ধুর বন্ধুপত্নীকে লেখা বেশি, তা আপনি চিঠিখানা প'ড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। আন্দাজ দেবার জন্যে মাত্র একটা জায়গা থেকে সামান্য একটু প'ড়ে শোনাচ্ছি।" বলিয়া বিনয় পড়িতে লাগিল, "সুলেখা সর্বদা আমার চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়, অথচ তাকে স্পর্শের মধ্যে পাইনে। রাত্রে প্রিয়াহীন নিঃসঙ্গ বিরহ-শয্যায় যখন নিদ্রাহীন হয়ে প'ড়ে থাকি, তখন সে প্রাণে-প্রাণে কথা কয়, কিন্তু কানে-কানে কয় না। এই পাওয়া-না-পাওয়ার মাঝামাঝি অবস্থাটা ভারি অদ্ভুত! এর খানিকটা দুঃখ দিয়ে গড়া, খানিকটা সুখ দিয়ে; এর এক দিকে আলোর খেলা, অন্য দিকে ছায়ার! আর দু-তিন দিন পরে আমার এই সুলেখাময় সুলেখাহীন জীবন-যাপন শেষ হবে; কিন্তু আজকের এই বিচিত্র বিরহানন্দের অনুভূতিকে সেদিনকার পরিপূর্ণ মিলনের অনুভূতি পরাভূত করতে সক্ষম হবে কি-না তা এখন ঠিক বলতে পারিনে।"

চিঠিটা মুড়িয়া সুলেখার হাতে দিয়া বিনয় বলিল, "এর স্বত্ব-বিচার না হয় পরে হবে, আপাতত আপনার অধিকারেই থাক। আচ্ছা বলুন ত', যেটুকু প'ড়ে শোনালাম চমৎকার নয় কি?"

এ কথার উত্তর দিল লাবণ্য; বলিল, "চমৎকার! এমন চিঠি তোমার দাদা যদি আমাকে লিখতেন ঠাকুরপো, তা হলে আমার সংগ্রহ-ভাণ্ডারের পয়লা নম্বর কোঠায় তাকে স্থান দিতাম।"

লাবণ্যর কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল।

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীর মুখে প্রশান্ত বলিল, "কিন্তু সে কোঠা ত' জড় সংসারের কাঠের কিম্বা স্টীলের কোঠা লাবণ্য; অন্তরের মণিকোঠা ত' নয়?" বলিয়া তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু নেত্রে লাবণ্যর দিকে চাহিয়া রহিল।

কি উদ্দেশ্যে প্রশান্ত একথা বলিতেছে ঠিক বুঝিতে না পারিয়া সহাস্যমুখে লাবণ্য বলিল, "না, না, অন্তরের মণি-কোঠা ত' নিশ্চয়ই নয়।"

সহসা মুখ অনেকখানি প্রফুল্ল করিয়া প্রশান্ত বলিল, "তা যদি নয়, তা হলে শুধু অবনীশের কাগজে লেখা বস্তুময় চিঠির কথা ভেবে আক্ষেপ না ক'রে, হৃদয়ের আবেগে লেখা আমার যে-সব নিরক্ষর লিপি তোমার অন্তরের মণিকোঠায় সঞ্চিত আছে তার কথাও ভাবছ না কেন? বহির্জগতের

বস্তুময় চিঠির চেয়ে অন্তর্জগতের চিত্তময় লিপি শ্রেষ্ঠতর বস্তু, এ তুমি ত' নিশ্চয় স্বীকার কর ?"

লাবণ্য বলিল, "সে কথা স্বীকার করলেও তোমার বিশেষ কিছু সুবিধে হবে না,—কারণ, আমার অন্তরের মণিকোঠায় তোমার চিত্তময় লিপির নামগন্ধও নেই, একেবারে বায়ুময় শূন্যতায় ভরা!"

প্রশান্ত বলিল, "যা বলছ তা আশ্চর্য নয় লাবণ্য। আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে একটি ক'রে যন্ত্র আছে, যার নাম, ধর, মনোযন্ত্র। এই মনোযন্ত্রের রিসিভার খুব সূক্ষ্মশক্তি-সম্পন্ন না হলে গভীর অনুভূতির কথা তাতে ধরা পড়ে না। আমার মনোযন্ত্রের ট্র্যান্সমিটারে কোনো দোষ নেই, আমি নিয়মিতভাবে তোমাকে চিত্তময় লিপি ছেড়ে এসেছি; তোমার রিসিভারে গলৎ আছে ব'লে তা ধরা পড়েনি। সেই জন্যে তোমার মণিকোঠা শূন্যতায় ভরা। অবনীশের মনোযন্ত্রের রিসিভার যে একেবারে দুরুস্ত অবস্থায় আছে তার প্রমাণ পাচ্ছ ওর চিঠিতে। ও যে লিখছে, সুলেখা তার চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়, ও অবশ্য হ'ল সাইকো-টেলিভিশনের কথা,—ওর রিসিভিং অ্যাপারেটাস্ আলাদা। কিন্তু ও যে লিখছে, সুলেখা প্রাণে-প্রাণে কথা কয় যদিও কানে কানে কয় না এই হচ্ছে অন্তর লোকের চিত্তময় লিপির কথা। এই অবাঙ্ময় নিরক্ষর লিপি অতিশয় সূক্ষ্ম জিনিস; সুলেখার হাতে অবনীশের লেখা ঐ যে বাঙ্ময় কাগজের চিঠি, ও স্থূল।"

প্রশান্তর মনোযন্ত্র এবং চিত্তময় লিপি সম্বন্ধে গবেষণাত্মক আলোচনা শুনিয়া সুলেখা ও লতিকা দুইজনে পুলকিত হইয়া হাসিয়া অস্থির হইয়াছিল।

লাবণ্য মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "আমি কিন্তু অবাঙ্ময়ের চেয়ে বাঙ্ময় ঢের বেশি পছন্দ করি।"

বিস্ময়াহতভাবে ক্ষণকাল লাবণ্যর দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া প্রশান্ত বলিল, "কিন্তু লাবণ্য, ভাষা দুরকমের আছে, মূক আর মুখর,—তা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। আর, হৃদয়ের মূক ভাষার কাছে অধরের মুখর ভাষা যে চিরকাল পরাজিত হয়ে এসেছে, তা কবিরা এক বাক্যে স্বীকার ক'রে গেছেন। এ বিষয়ে তুমি কি বল বিনয়?" বলিয়া প্রশান্ত বিনয়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

বিনয় বলিল, "ও বিষয়ে আমি কিছুই বলিনে দাদা; আমি শুধু বলি, বাঙলা ভাষার ওপর আপনার দখল অবনীশের চেয়ে একটুও কম নয়। বাঙ্ময় অবাঙ্ময় মণিকোঠা চিত্তময়,—এ সকলের সব কথার মানেও আমরা জানিনে, আর আপনি অনর্গল এই সব কথা ব'লে যাচ্ছেন! অবনীশ এলে আপনাদের দুই ভায়রাভাইয়ে খুব জমবে দেখছি!"

লাবণ্য বলিল, "শুধু দুই ভায়রাভাইয়েই নয় ঠাকুরপো,—তিন গোরহরি ড্রাইভারে। তিনি যে-রকম সাধু-বাঙলায় পণ্ডিত, আর অনধিকার-চর্চায় পটু, তিনি এ'দের দুজনকে ছেড়ে কথা কইবেন, তা মনে হয় না।"

ঠিক এই সময়ে বাহিরে পুনরায় গলা-খেঁকারির শব্দ হইল।

শুনিয়া লাবণ্যর মুখ এতটুকু হইয়া গেল; নিম্নকণ্ঠে বলিল, "গোরহরি নিশ্চয়!"

নিম্নস্বরে বলিলেও অবনীশের তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তিতে সে কথা নিস্কৃতি পায় নাই; সে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ মেম-সায়েব, আমি গোরহরিই বটি।"

লতিকা এবং সুলেখার প্রতি অর্থপূর্ণ ভ্রুভঙ্গী করিয়া লাবণ্য অবনীশকে সম্বোধন করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "কি বলছ?"

"আজ্ঞে, ব্রজভূষণ এসেছে।"

সকৌতূহলে লাবণ্য বলিল, "ব্রজভূষণ এসেছে? ব্রজ-ভূষণ আবার কে?"

"আজ্ঞে, সে[illegible]সায়েবের পরিচারক।"

দুর্বোধ্য রহস্যের বিহ্বলতায় মুহূর্তকাল নিঃশব্দে কাটিল; তাহার পর উচ্ছ্বসিত হাস্যে ফাটিয়া পড়িয়া বিনয় বলিল, "ও! বুঝতে পেরেছি। ব্রজভূষণ মানে ব্রিজভূখণ, আর পরিচারক মানে চাকর। অর্থাৎ, আমাদের চাকর ব্রিজ-ভূখণ এসেছে।"

শুনিয়া তিনটি স্ত্রীলোক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

গভীর স্বরে প্রশান্ত ডাকিল, "গোরহরি!"

অবনীশ বলিল, "স্যার?"

"ভেতরে এস।"

পর্দা ঠেলিয়া অবনীশ কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল।

প্রশান্ত বলিল, "ব্রিজভূখণকে তুমি ব্রজভূষণ বলছ কেন?"

অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে স্যার, ব্রিজভূখণ উচ্চারণটা অশুদ্ধ, ব্রজভূষণ শুদ্ধ। এ দেশে এসে দেখছি উচ্চারণের ভারি গোলমাল। তাই যতটা পারি ঠিক ক'রে দেবার চেষ্টায় আছি। ব্রিজভূখণকে ব্রজভূষণ উচ্চারণ মুখস্থ করিয়ে এসেছি।"

আবার একটা রুদ্ধ হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

প্রশান্ত বলিল, "বেশ করেছ। কিন্তু তোমাদের বাঙলা দেশে প ক'য়ে মূর্ধন্য 'ষ'য়ে দীর্ঘ ঈকারের কি উচ্চারণ হয়? পক্ষী না, পক্খী?"

অবনীশ বলিল, "আকাশে যে ওড়ে স্যার?"

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশান্ত বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আকাশে যে ওড়ে!"

অবনীশ বলিল, "পক্খী হয়।"

"আর, 'ব'য়ে ঋফলা 'ক'য়ে মূর্ধন্য 'ষ'য়ের কি উচ্চারণ হয়?"

অতিশয় নিরীহ ব্যক্তির মতো মুখ কাঁচুমাচু করিয়া অবনীশ বলিল, "যার ডালে পক্ষী বাসা বাঁধে স্যার?"

একটা অট্টহাস্যে সমস্ত কক্ষ সচকিত হইয়া উঠিল।

প্রশান্ত চিৎকার করিয়া উঠিয়া বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, যার ডালে পক্ষী বাসা বাঁধে।"

তেমনি কাঁচুমাচু মুখ করিয়া অবনীশ বলিল, "কাইন্ড্লী

তাড়না করবেন না স্যার,—তাড়না করলে আমার সমস্ত গুলিয়ে যায়। আমাদের বাঙলা দেশে 'ব'য়ে খফলা 'ক'য়ে মূর্ধন্য 'ষ'য়ের উচ্চারণ বুক্‌খ হয়।"

"এ দুটো কথার শুদ্ধ উচ্চারণ কি ? পক্‌খী, বুক্‌খ ? না, পক্‌ষী, বৃক্ষ?"

"আজ্ঞে শুদ্ধ উচ্চারণ পক্‌ষী, বৃক্‌ষ।"

"তা হলে ?"

"তা হলে আমাদের বাঙলা দেশেও উচ্চারণের গোল রয়েছে স্যার।"

"এখন বুঝেছ ত ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, জলের মত।"

পুনরায় একটা হাস্যধ্বনিতে ঘর ভরিয়া উঠিল।

লতিকা বলিল, "কিন্তু ব্রিজভূষণ কেন এলো না সে কথা ত' এখনো শোনা হল না। বসুধা আবার বাড়িতে একা রয়েছে!"

লতিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অবনীশ বলিল, আজ্ঞে, নিবেদন করি সেন-মেমসায়েব। ব্রিজভূষণের একজন দূরসম্পর্কিত মাতুল অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তাকে তার দাহকার্যে যোগ দিতে যেতে হচ্ছে। সেই হেতু সে অদ্য রজনীর মত অবসর ভিক্ষা করছে।"

অবনীশের সাধু ভাষার কথা শুনিয়া রুদ্ধহাস্যে লতিকার মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। উত্তর দিল বিনয়; বলিল, "আচ্ছা, অদ্য রজনীর মত তাঁকে অবসর প্রদান করা হল, কিন্তু কল্য প্রভাতে সূর্যোদয়ের সহিত ব্রজভূষণও যেন ব্রজে আসিয়া উদয় হন।"

অবনীশ বলিল, "তা হ'লে এই উপদেশই তার নিকট বিজ্ঞাপিত করি স্যার?"

বিনয় বলিল, "হ্যাঁ,—এই উপদেশ বিজ্ঞাপিত কর।"

প্রস্থানোদ্যত অবনীশকে ডাকিয়া প্রশান্ত বলিল, "শোনো গৌরহরি, ব্রিজভূষণকে কথা ব'লে তুমি ফিরে এস। তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

চিন্তিত মুখে অবনীশ বলিল, "কি কথা স্যার ? কোনো অশুভ কথা নয় ত?"

প্রশান্ত বলিল, "শুভ কি অশুভ তা জানিনে, শুনবে যখন, তখন বুঝে দেখো।"

"যে আজ্ঞে, তাই দেখব।" বলিয়া অবনীশ প্রস্থান করিল।

বিনয় বলিল, "এ রকম funny chap কেমন ক'রে পেলেন দাদা? এ ত দেখছি আপনাদের একটা permanent source of entertainment হ'ল।"

চিন্তিত মুখে প্রশান্ত বলিল, "তা' ত হ'ল। কিন্তু যেভাবে পেয়েছি, তাতে এই permanent source of entertainment-এর হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়া কিছু কঠিন হয়েছে। লাবণ্যর দাদা খুব বড় রকম সার্টিফিকেট দিয়ে একে কলকাতা থেকে পাঠিয়েছেন, সুতরাং তাঁকে একবার জানিয়ে একে ছাড়িয়ে দিলে তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হতে পারেন। তিন চার দিন পরে তিনি আমার এখানে আসছেন। মনে করছি তিনি এলে তাঁর সঙ্গে একটু কথা ক'য়ে নিয়ে তারপর গৌরচন্দ্রকে বিদায় করব।"

বিনয় বলিল, "আমার মনে হয়, তিনি এলেও আপনি বিদেয় করতে পারবেন না। তিনি যখন এত দূরে একে পাঠিয়েছেন তখন সব দিক দিয়ে উপযুক্ত মনে ক'রেই পাঠিয়েছেন।"

প্রশান্ত বলিল, "আসল কাজ গাড়ি চালানোতে সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু অতিশয় বাচাল, আর তার্কিক। তা ছাড়া, কথাবার্তার মধ্যে একটু যেন পাগলামী আছে মনে হয়। আজ বিকেল থেকে হঠাৎ কি খেয়াল হয়েছে, শক্ত শক্ত লম্বা লম্বা বাঙলা কথার বাণ দিয়ে আমাদের জর্জরিত ক'রে তুলেছে! তোমরা নিজেরাও ত' স্বচক্ষে তা দেখচ।"

লাবণ্য বলিল, "আমার ভয় হয় ঠাকুরপো, অবনীশ এলে পাছে তার সঙ্গে এই রকম পাগলামী ক'রে তাকে চটিয়ে দেয়।"

লাবণ্যর কথা শুনিয়া বিনয় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল; বলিল, "আপনি যদি অবনীশকে জানতেন বউদি, তা হলে এ ভয় আপনার কখনই হ'ত না। তার sense of humour এত বেশি যে, আমার মনে হয় সে এলে গৌরহরির রগড়টা আরও জ'মে উঠবে। তা ছাড়া, অবনীশ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হবার আগে গৌরহরি বদলে যেতেও পারে। কলকাতা থেকে এত দূর দেশে এসে এখানকার নতুন আবহাওয়ায় হকচকিয়ে গিয়ে প্রথমটা সে হয়ত' তার আসল স্বরূপটি হারিয়েছে।"

প্রশান্ত বলিল, "অসম্ভব নয়। সুলেখাও বলে, এখানে এসে গৌর একেবারে কৃষ্ণ হয়েছে; অর্থাৎ, প্রায় ষোল আনা বদ্‌লেছে।"

সুলেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কৌতূহলের ভঙ্গীর সহিত বিনয় বলিল, "তা হ'লে ত' আপনি কলকাতায় গৌরহরিকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন মিসেস মিত্র?"

সদ্যপরিচিত বিনয়ের নিকট হইতে এই প্রশ্ন শুনিয়া সুলেখার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। রাত্রের কৃত্রিম আলোকের আবছায়ায় অবশ্য কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না।

অভিনয়ের ধরাবাঁধা পাঠের মধ্যে ব্যক্তিগত আবেগ-উত্তেজনার স্থান নাই; সুতরাং জোর করিয়া নিজেকে নিজের বিহ্বলতা হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া সুলেখাকে বলিতে হইল, "হ্যাঁ, অল্প একটু জানতাম।"

কথাটাকে যথোচিতভাবে সম্পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে লাবণ্য বলিল, "দাদার ড্রাইভার কার্ত্তিকের ভাগ্নে গৌরহরি। সুলেখার বিয়ের সময়ে ও আমাদের বাড়িতে কাজকর্ম করেছিল। সেই সময়ে সুলেখা গৌরহরিকে দেখে।"

সুলেখার দিকে চাহিয়া বিনয় বলিল, "তখন কি গৌরহরির এ মূর্তি ছিল না?"

ঈষৎ আরক্ত মুখে মৃদুকণ্ঠে সুলেখা বলিল, "না, তা ছিল না।"

প্রশান্ত বলিল, "নবদ্বীপের দেশে থেকে বৃন্দাবনের দেশে এসে ওর স্বভাব বিগড়েছে।"

বিনয় বলিল, "কিন্তু আমাদের এ বৃন্দাবনের দেশে রাধিকা কোথায় দাদা? রাধাবিহীন বৃন্দাবনকে ত' বৃন্দাবনই বলা চলে না। এলাহাবাদে আপনাদের কৃষ্ণহরির কোনো শ্রীরাধিকাও আছেন না কি?"

প্রশান্ত বলিল, "আছেন বলে ত জানা নেই, তবে অজ্ঞাতসারে যদি থাকেন ত' বলতে পারি নে। কিন্তু নেই ব'লেই মনে হয়; কারণ, নন্দালয় পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণহরিকে কোনো বৃষভানুর বাড়ির দিকে যেতে দেখা যায় নি।"

সহাস্যমুখে বিনয় জিজ্ঞাসা করিল, "নন্দ ঘোষ কে দাদা? —আপনি?"

প্রশান্ত বলিল, "তা বই আর কে বল।"

"আর বউদিদি মা-যশোদা?"

প্রশান্ত বলিল, "কাজেই। তবে তাঁকে মা যশোদা না ব'লে ম্যাদাম যশোদা বললেই ঠিক হয়, কারণ গোরহরি ওঁকে মেমসাহেব বলে ডাকে।"

প্রশান্তর কথায় সকলে হাসিয়া উঠিল।

বিনয় বলিল, "সবই ত' একরকম ঠিক হ'ল, শুধু বৃষভানুনন্দিনীর সন্ধান পাওয়া গেল না।"

প্রশান্ত বলিল, "একান্তই যদি বৃষভানুনন্দিনী থাকেন ত' বাঙলাদেশে আছেন।"

এ কথার উত্তর দিল লাবণ্য; বলিল, "বাঙলাদেশে আছেই ত'। আজই ত' গোরহরি বলছিল, অল্প দিন হ'ল তার বিয়ে হয়েছে।"

লাবণ্যর কথা শুনিয়া উৎসাহভরে বিনয় বলিল, "তবে আর গোরহরির অপরাধ কোথায় দাদা? এ ত' স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে বিরহ-বেদনার কথা। বিরহী যক্ষ যদি রামগিরি পর্বত থেকে অলকায় নিজ প্রিয়ার কাছে খবর পাঠাবার জন্যে চেতন-অচেতনের জ্ঞান হারিয়ে অচেতন মেঘকে দৌত্যে নিযুক্ত করতে পারে, তাহ'লে সুদূর কলকাতায় সদ্য-বিবাহিতা নববধূকে ফেলে এসে বিরহক্লিষ্ট গোরহরি যদি কথায়-বার্তায়, চাল-চলনে আপনাদের কাছে একটু পাগলামি ক'রে থাকে, তাতে এমন কি অপরাধ হয়েছে বলুন? তাহ'লে ত' অবনীশের পক্ষে আরও গুরুতর অপরাধ হয়েছে বলতে হবে,—কারণ এলাহাবাদ থেকে কলকাতার দূরত্বের চেয়ে পাটনার দূরত্ব অনেক কম।"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে চিন্তা করিয়া প্রশান্ত বলিল, "তোমার কথার শেষ অংশের যুক্তি ঠিক বুঝতে পারলাম না বিনয়। এলাহাবাদ থেকে কলকাতার দূরত্বের চেয়ে পাটনার দূরত্ব কম ব'লে অবনীশের কোন্ অপরাধ গুরুতর হবে?"

বিনয় বলিল, "পাগলামির অপরাধ। সুলেখা দেবীর হাতে ঐ যে অবনীশের চিঠি রয়েছে ও পাগলামি নয় ত' কি বলুন? পাটনা থেকে এলাহাবাদের কথা মনে ক'রে অবনীশ যদি ঐরকম প্রলাপ বকতে পারে, তাহ'লে এলাহাবাদ থেকে কলকাতার কথা মনে ভেবে গোরহরি আরও বেশি পাগলামি করবার দাবী করতে পারে না কি? বিরহ ত' দূরত্বের direct ratio অনুযায়ী হওয়া উচিত? আর অবনীশ যে এই চিঠির দ্বারা আমার মারফৎ মিসেস মিত্রের উপর দৌত্য করেছে, তা স্বীকার করতেই হবে।"

প্রশান্ত বলিল, "না, সে কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই।" (ক্রমশ)



অসামাজিক

(গল্প)

শ্রীগঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

সিদ্ধেশ্বরী মেটারনিটি হোম। তাহার লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কমলা মিত্র, কলিকাতার এম-বি।

তাহাকে সুন্দরী বলা চলে না। গায়ের রং খুব ফরসা নয়। ছিপছিপে সুশ্রী চেহারা। প্রখর বুদ্ধিব্যঞ্জক বড় বড় চোখ দুইটায় ছিল অপরূপ এক দীপ্তি।

মেডিক্যাল কলেজে পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় মাঘ মাসের এক হিমশীতল রাত্রে এলাহাবাদে কমলার বিবাহ হইয়াছিল। সে আজ প্রায় চার বৎসরের কথা। তাহার স্বামী সুধীর মিত্রের সহিত বিবাহের পূর্ব হইতেই তাহার ঘনিষ্ঠতা; সে ছিল কমলার সহপাঠী ও তাহার মাসতুতো বোন কণিকার দেবর। কণিকার বাড়ি যাতায়াত করিতে করিতে উভয়ের প্রতি উভয়ের মনে দুর্বলতার সঞ্চার হইয়াছিল।

প্রথম যৌবনের সেই সুখময় দিনগুলির কথা মনে পড়িলেই, আজ কমলার অন্তর ব্যথায় আড়ষ্ট হইয়া ওঠে। একদিন বিবাহের পূর্বে সুধীর স্টেথোস্কোপ দিয়া পরস্পরের বুক পরীক্ষা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। বলিয়াছিল, "ভালোবাসার দেউল আমাদের প্রেমারুণ কাব্যিক হৃদয়টাকে এক্সপ্লোর করি, এস।"

কমলা লজ্জায় রাজী হয় নাই।

কমলার পিতা এলাহাবাদে সরকারী চাকরি করিয়া বেশ দু'পয়সা করিয়াছিলেন এবং সেখানে তিনচারখানি বাড়িও করিয়াছিলেন। একমাত্র সন্তান কমলাকে তাহারই মনোনীত পাত্রের হস্তে সম্প্রদান করিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, শেষ বয়সের দিনগুলি নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে কাটাইয়া দিবেন। কিন্তু বয়স খুব বেশী না হইলেও, তাহার পর আর পুরা একটা বৎসরও বাঁচিয়া থাকেন নাই। গৃহিণী বহু পূর্বেই গত হইয়াছিলেন। সংসারে তিনি রাখিয়া গেলেন কন্যা-জামাতা ও তাহাদের হাতে দিয়া গেলেন এলাহাবাদের বাড়িগুলি ও চেকবইয়ের সংগে বেশ মোটা একটা ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স।

বিবাহের পর প্রায় দুই বৎসর তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে সুখেই কাটাইয়াছিল। শ্যামবাজারে থাকিত একখানি ছোট বাড়ি ভাড়া করিয়া। পাশ করার পর তাহারা স্থির করিয়াছিল, কলিকাতায় একটি নার্সিং-হোম খুলিবে এবং উভয়ে হইবে তাহার কর্ণধার। ব্যবস্থা সব পাকা হইয়া গিয়াছিল। এমনকি বাড়ি লিজ লইবার টাকাও আগাম দেওয়া হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ঘটনাস্রোত এমন আবর্ত রচিয়া বহিতে সুরু করিল যে, তাহার জীবনটাই একেবারে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বিপর্যস্ত হইয়া গেল।

পাশের বাড়ির সুরুচিই হইল সেই বিপর্যয়ের মূল। স্বামী-স্ত্রীর দিবালোকের মত সহজ ভালোবাসার উপর সে-ই আসিয়া অকস্মাৎ ছায়াপাত করিল। সে তখন বি-এ পাশ করিয়া বি-টি পড়িতেছে।

এদিকে সুধীর সুরুচির সহিত খুব মেলামেশা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। কমলা প্রথমে চুপ করিয়া দেখিল, কথা কহিল না। মেয়েটি রোজ সন্ধ্যায় তাহাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিত। 'দিদি', 'দিদি' বলিয়াই আসিত বটে, কিন্তু কমলা স্পষ্টই বুঝিল, তাহার আকর্ষণ থাকিত ভিন্ন কেন্দ্রে। সে আরও লক্ষ্য করিল, তাহারা উভয়ে উভয়ের সহিত কথা কহিতে ভালোবাসে। অন্যদিকে চাহিতে গিয়া বারে বারেই চারি চক্ষু এক হইয়া যাইত; ক্ষণে ক্ষণে উভয়ের মুখে, বিদ্যুৎ স্ফুরণের মত হাসি ফুটিয়া উঠিত। তাহারই অর্গানে বসিয়া মেয়েটা চোখ-মুখ নাড়িয়া, গা দোলাইয়া প্রেমের কত উদ্দাম ও অসংযত ভাষার গান তাহারই স্বামীর উদ্দেশ্যে বর্ষণ করিয়া যাইত। তাহার বিলাতী ধরণে বাঁধা এলো-খোঁপায় এবং ছাপানো সিল্কের জামা-কাপড়ে নানা রংয়ের যে উচ্ছৃংখল সমাবেশ থাকিত, তাহাতে কমলা একদিনের জন্যও সুরুচির পরিচয় পায় নাই।

কোনও কোনও নারীর মতে পুরুষ জাতটাই হইল দাগী চোরের জাত। চুরি করিয়া কোনও দিনই তাহাদের আশা মেটে না। একটু অসতর্ক হইলেই অমনি চুরি করিবে। মেয়েরা নিজেদের আধিপত্যের এতটুকু অসম্মান দেখিতে পারে না। ভালোবাসা যেখানে যত গভীর, সংশয় ও শঙ্কাও সেখানে তেমনি প্রবল।

কমলা মনে মনে প্রমাদ গণিল, কিন্তু মুখে কিছু বলিল না। স্বামীর ভালোবাসায় সন্দেহ প্রকাশ করিবার কথা মনে হইলেই, সে অন্তরে অন্তরে লজ্জানুভব করিত।

দিন কাটিতে লাগিল এবং ব্যাপারটিও ক্রমে এমনই স্পষ্ট আকার ধারণ করিল যে, কমলা স্থির থাকিতে পারিল না। একদিন রাত্রে স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া অনেক দুঃখে, অনেক চোখের জলে সে তাহার অনুযোগ জ্ঞাপন করিল। বলিল—"আর বুঝি আমাকে তোমার ভাল লাগছে না?"

ইহার পর অনেক কথা হইল, অনেক তর্ক হইল। কমলার কণ্ঠে যে পরিমাণে দুঃখ এবং অনুযোগের সুর ফুটিল, সুধীরের কণ্ঠে তাহার দ্বিগুণ ফুটিল উষ্মা। শেষে ব্যাপারটা এতদূর গড়াইয়া পড়িল যে, সুধীর তাহাকে জন্মের মত ছাড়িয়া নাগপুরে চলিয়া গেল। অগত্যা কমলাকে এই মেটারনিটি হোমে চাকরি লইয়া অধুনা একা দিন যাপন করিতে হইতেছে।

তাহার উপর এক বৎসরের হইয়া সেদিন তাহার খুকীটিও তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে। কমলা বিছানার উপর পড়িয়া পড়িয়া ভাবে, হয়তো বা ইহা ভালই হইয়াছে; সে একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া বাঁচিয়াছে।

(২)

মাঘ মাসের রাত্রি। কনকনে শীত, তবু কমলা উঠিয়া পাখাটা খুলিয়া দিল। সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় নাই, শুইবার পরই মাথাটা কেমন গরম হইয়া গিয়াছিল। সে পাশ ফিরিয়া

ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শুনিল ঘড়িতে টং-টং করিয়া তিনটা বাজিতেছে।

সজোরে কলিং বেলটাও আবার সেই মুহূর্তে বাজিয়া উঠিল। তাহার কোয়ার্টারের নীচের তলাতেই মেটারনিটি হোম। প্রায় একশত প্রসূতির শয্যা। কমলা উঠিয়া তাড়াতাড়ি ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়াইয়া লইল। নিশ্চয়ই কিছু একটা জরুরী দরকার পড়িয়াছে, হয়তো বা খুব শক্ত একটা কেসই আসিয়া থাকিবে।

বারান্দায় আসিতেই দেখিল লীলা দাঁড়াইয়া। লীলা সেংরাত্রের ভারপ্রাপ্তা ডাক্তার। কমলাকে দেখিয়া সে কহিল—"দু'নম্বর ক্যাবিনের বেবিটা মারা গেছে।"

কমলার বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল—"মারা গেছে? তৃপ্তি কি করছে?"

তৃপ্তি মৃত শিশুটির মা। লীলা বলিল—"মরা মেয়েটাকে কোলে ক'রে ব'সে খুব হাসছে।"

"হাসছে?"

"হ্যাঁ। মাথাটা বোধ হয় একেবারে খারাপ হ'য়ে গেছে। ঐ শোন না।"

দুইজনে স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল দোতলার ক্যাবিনটার দিক হইতে হি-হি করিয়া একটা একটানা বীভৎস হাসির স্রোত ভাসিয়া আসিতেছে।

"আচ্ছা, তুমি যাও, আমি এখনি আসছি—" বলিয়া লীলাকে নীচে পাঠাইয়া দিয়া কমলা ভিতরে আসিয়া একটা জানালা খুলিয়া সেখানে দাঁড়াইল। শীতল বাতাস হু-হু করিয়া তাহার চোখে মুখে আসিয়া যেন আছড়াইয়া পড়িল। বাহিরে বাড়ির নীচেই গঙ্গা। যতদূর দেখা যায়, নদীবক্ষ শেষ রাত্রের ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। ওপারের চটকলের সার বাঁধা আলোগুলি জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। সম্মুখে নদীর উপরে প্রকাণ্ড একখানি দেশী নৌকা। তাহার মধ্যেও একটা ছোট আলো কুয়াশায় ক্ষীণ হইয়া আছে।

নীচে দোতলায় কিসের একটা শব্দ হইল। কমলার মনে হইল আবার সেই মেয়েটা বুঝি হাসিতেছে। তাহার মনটা কেমন ছম্-ছম্ করিতে লাগিল। জানালার সম্মুখ হইতে সরিয়া আসিয়া সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল এবং একটি চেয়ারের উপর অলসভাবে বসিয়া পড়িল।

বিশেষ তাড়াতাড়ি নাই; শিশু মরিয়া গিয়াছে। এখন শোকাতুরা জননীর কোল হইতে কোনও-মতে মৃত শিশুটিকে ছিনাইয়া লইতে হইবে এবং তাহাকে সান্ত্বনা দিতে হইবে। ইহাই এখন তাহার কাজ।

আজ অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গেল তাহার নিজের খুকীটার কথা। বুকের উপর তাহার সেই ছোট ছোট দুইটি হাতের অতি সুমধুর স্পর্শ, তাহার ছোট্ট কচি মুখের সেই ভুবন-ভোলা চুমা। দুই চক্ষে জল ছুটিয়া আসিতে চায়, বুকের মাঝে হু-হু করিতে থাকে। মনে হয়, এমন করিয়া সকলে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেলে একা সে বাঁচিবেই বা কি করিয়া! মনে হইতেই প্রাণটা তাহার হাহাকার করিয়া ওঠে।

তৃপ্তি কমলার একজন বিশেষ বন্ধুর আত্মীয়া। তাহারই অনুরোধে কমলা তাহাকে ক্যাবিনে ভরতি করিয়া লইয়াছিল। বিবাহের পর কয়েক মাসের মধ্যেই মেয়েটি বিধবা হইয়াছিল। যে সন্তানটি তাহার এইমাত্র মরিয়া গেল, সে তাহার অবৈধ প্রণয়ের ফল। কথা ছিল, কিছুদিন পরে শিশুটিকে কনভেণ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠানে দান করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু মরিয়া মেয়েটা নিজেই সে বিড়ম্বনার হাত হইতে সকলকে মুক্তি দিয়া গেল।

এ কী! অকস্মাৎ সব আলোগুলি নিভিয়া গেল কেন? শুইবার ঘরের পাখাটা চলিতেছিল, সেটাও বন্ধ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া কমলা বারান্দায় আসিল। বিকাল হইতেই মেঘ করিয়াছিল, এখন গুঁড়া গুঁড়া বৃষ্টি পড়িতে শুরু হইয়াছে। দোতলা ও নীচের তলা সমস্ত অন্ধকার। সম্মুখে গেটের উপর যে আলোটা জ্বলিতেছিল, তাহাও নিভিয়া গিয়াছে।

শুনিতে পাইল নীচেও বেশ গোলমাল হইতেছে। কিন্তু সমস্ত গোলমাল ছাপাইয়া শোনা যাইতেছিল তৃপ্তির বিকট অট্টহাস্য। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয় পাইয়া সমস্ত প্রসূতিরাও আর্তনাদ করিয়া উঠিল। কমলা বারান্দার রেলিংটা ধরিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে সিঁড়ির দিকে আগাইয়া যাইতে ছিল, কিন্তু মনে হইল অন্ধকারে পিছন হইতে কে যেন তাহার পা দুইটাকে আকর্ষণ করিতেছে, কিছুতেই যেন তাহাকে অগ্রসর হইতে দিবে না।

সে একবার দারোয়ানের নাম ধরিয়া ডাকিল, কিন্তু নীচের গোলমালে তাহার কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল, দারোয়ানের কানে পৌঁছাইল না।। পর মুহূর্তে সব আলোগুলি এক সঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। কমলা কম্পিত পদে নীচে নামিয়া গেল।

ওয়ার্ডের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল লীলা ব্যস্ত-পদে ওয়ার্ডময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভীত ও ত্রস্ত প্রসূতিদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। মুখে চোখে তাহার উৎকণ্ঠার চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কমলা তাহাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া তৃপ্তির সন্ধানে চলিল।

তৃপ্তি তখন তাহার ক্যাবিনের সম্মুখে মৃত শিশুটিকে কোলে লইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। কমলা তাহার কাছে গিয়া কোল হইতে শিশুটিকে তুলিয়া লইল। আশ্চর্য, প্রসূতি বাধা দিল না। অবসন্নভাবে মেঝের উপর শুইয়া পড়িল। লীলাকে তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিতে বলিয়া কমলা শিশুর মৃতদেহ বুকে করিয়া একেবারে 'মরচুয়ারিতে' গিয়া উঠিল। মেথর দুইটা আলো নিভিয়া যাওয়ায় ভীত হইয়াই বোধ হয় পলায়ন করিয়াছে। দারোয়ান কমলার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল, আগাইয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে সেই সুন্দর প্রাণহীন দেহটার প্রতি চাহিয়া রহিল। কি সুন্দর! কিন্তু, কই, কমলার তো হাসি পাইতেছে না। সমস্ত হৃদয় যেন চোখের জলে ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছে। রামসিংকে

বারান্দার দিকে পা বাড়াইল। ততক্ষণে লীলা ও সুব্রত বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কমলার এই আকস্মিক প্রত্যাবর্তনে তাহারা এতই বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাকে একটা নমস্কার করিতেও তাহারা ভুলিয়া গেল। এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল "একি, এরি মধ্যে?"

কমলা হাত তুলিয়া উভয়কে নমস্কার করিয়া ক্লান্ত স্বরে কহিল, "এখন থাক্। আগে আমায় একটু বিশ্রাম নিতে দিন। ভারী ক্লান্ত আমি।"

সে উপরের সিঁড়ির কাছে যাইয়া একটু দাঁড়াইল। তাহার মনে হইতেছিল সে উঠিতে পারিবে না। তাহার শিথিল গতিভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া সুব্রত লীলাকে ইঙ্গিতে কমলার সাহায্যে যাইতে বলি। লীলা আগাইয়া গিয়া কমলাকে ধরিয়া ফেলিল। বলিল, "চলো, তোমায় ওপরে পোঁছে দিয়ে আসি।"

কমলা নীরবে আপনার দেহভার লীলার বাহুর মাঝে ছাড়িয়া দিল। উপরে আসিয়া বসিবার ঘরের একটা সোফায় সে অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িল। লীলা ভিতরের ব্যাপার সব জানিলেও কিছুই বুঝিতে পারিল না যে, কমলা কেনই বা গেল আর কি জন্যই বা ফিরিয়া আসিল।

রামসিং চাপরাসীদের সাহায্যে মালপত্র সব উপরে রাখিয়া চলিয়া যাইতেছিল। লীলা তাহাকে ডাকিয়া খানিক দুধ আনিতে পাঠাইয়া দিল। এবং কমলার শয়নকক্ষে যাইয়া বিছানা পাতিয়া ঘরটি ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া কমলার কাছে আসিয়া কহিল, "শোবে যদি, বিছানায় গিয়ে শোবে চলো। আমি সব ঠিক করে এসেছি।"

তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আবার বলিল, "ক'দিন স্নান করোনি বলো তো? মাথাটা যেন চুলের ঝুড়ি হয়ে উঠেছে।"

ম্লান হাসিয়া কমলা কহিল, "হ্যাঁ, ওসবের সঙ্গে আজ চার-পাঁচদিন কোনও সম্বন্ধ নেই। সুবিধাও হয়নি আর বিশেষ ইচ্ছেও হয়নি। এক কাপ চা খেতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে। ঝিটা কোথায় গেল?"

লীলা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "কি জানি সে হতভাগী কোথায় থাকে। তুমি নেই, তার তো স্বরাজ। দাঁড়াও স্টোভ ধরিয়ে আমিই করে দিচ্ছি।"

সে রাত্রে লীলা আর বাড়ি গেল না। কমলার কাছেই রহিল। রাত্রে শুইবার পর কমলা এক এক করিয়া সব কথা তাহাকে বলিল এবং অনেক চোখের জল ফেলিল। তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে লীলা কহিল, "আমি যদি হতাম, তা হলে কিন্তু ঐ স্বামীকে টেক্কা দিয়ে আবার বিয়ে করতাম। আর বিয়ের আগে একখানা নিমন্ত্রণ পত্রও পাঠাতাম।"

কমলা উত্তর দিল না। বহুক্ষণ উভয়ে নীরবে পড়িয়া রহিল। লীলা ভাবিল হয়তো এ কয়দিনের শ্রান্তিতে ক্লান্ত হইয়া কমলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শেষে এক সময়ে নিজে ঘুমাইয়া পড়িল। কমলা কিন্তু জাগিয়াই ছিল। লীলার কথাটা বার বার তাহার মনে পড়িতেছিল। আর তাহার হাসি পাইতেছিল। ভাবিতেছিল—কি যে বলে মেয়েটা, একটু ভাবিয়া বলে না। পুরুষ যাহা করিতে পারে স্ত্রীলোকের যে তাহা করা সম্ভব নয়, সে খেয়ালই তাহার নাই।

আবার তাহার অন্তরও মাঝে মাঝে ঐ কথাতেই সায় দিয়া বসে। সত্যই তো, সুধীর নিজের দিকেই তাকাইয়াছে, তাহার সুখ দুঃখের প্রতি তাকায় নাই। তাহার জীবনটাকে, এক কথায় ঊষর মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছে। কোনও দিন যে আবার তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইবে, সে পথও আর রাখে নাই। তবে সেই বা কেন সেই অপদার্থ স্বামীর কথা ভাবিয়া ভাবিয়া নিজের দেহ মন নষ্ট করিতেছে! সেও তো গত জীবনের দুঃখময় পৃষ্ঠাগুলি চাপা দিয়া আবার নূতন অধ্যায় শুরু করিলেই পারে!

কমলা মন হইতে সব দুঃখ বেদনা ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়া আবার প্রতিষ্ঠানের কাজে মন দিল। পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী করিয়া সে আপনাকে কর্মরত রাখিতে লাগিল, পাছে কোনও চিন্তা আবার তাহাকে পাইয়া বসে।

কমলা ও সুধীরের ভিতরে যে ব্যাপার চলিতেছিল, তাহা সুব্রতর এতদিন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু একদিন কথায় কথায় লীলা তাহাকে সব বলিয়া ফেলিল। শুনিয়া সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কমলার অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া ব্যথায় দুঃখে সে অত্যন্ত ম্রিয়মান হইয়া পড়িল। এবং সুধীরের উপর ঘৃণায় ও রাগে তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। ভাবিল, এইসব অত্যাচার কি কোনদিনই এই মানব সমাজ হইতে দূর হইবে না!

আবার মনে হয়, সেই শান্ত শিষ্ট সুধীর, যাহার মুখে কথা কেউ প্রায় শুনিতেই পাইত না, তাহার এতদূর অধঃপতন কি করিয়াই বা সম্ভব। সহসা একটা কথা তাহার অন্তরে বিদ্যুৎস্ফুরণের মত ঝিলিক দিয়া যায়—যদি সুধীর কমলার স্বামী না হইয়া সুব্রত তাহার স্বামী হইত, তাহা হইলে কি সে এতখানি ব্যথা কমলাকে দিতে পারিত? তাড়াতাড়ি সে মনের লাগাম টানিয়া ধরে। ছি, এসব কি ভাবিতেছে সে পাগলের মত!

ইহার পর হইতে সুব্রত কমলার প্রতি পূর্বাপেক্ষা একটু অধিক মনোযোগী হইয়া পড়িল। তাহাকে যখন-তখনই কমলার সহিত দেখা যাইতে লাগিল। কখনও হয়তো দেখা যায় তাহার পাশে পাশে ওয়ার্ডের ভিতর দিয়া গল্প করিতে করিতে চলিতেছে, আবার কখনও বা তাহার অফিস ঘরে বসিয়া আছে। তাহা ছাড়া সন্ধ্যাবেলা প্রত্যহ মোটরে করিয়া কমলাকে লইয়া বেড়াইতে যাওয়া তো আছেই। বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া কমলার বাসাতেই বসিয়া নানাপ্রকার গল্প, আলোচনা করিতে করিতে আবার অনেকখানি সময় কাটিয়া যায়। অর্থাৎ তাহার বাড়ি ফিরিতে আজকাল বেশ রাত্রি

হইয়া যায়। কোনও কোনও দিন কমলার অনুরোধে পড়িয়া রাত্রের খাওয়াও তাহাকে সেখানেই সারিয়া লইতে হয়।

কাজের ব্যস্ততায় কমলার সারা দিনটা বেশ কাটিয়া যায়, কিন্তু রাত্রিটা আর কাটিতে চায় না। যতক্ষণ সুব্রত থাকে ততক্ষণ বেশ থাকে। মনে মনে সে সুব্রতর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছে। সে চলিয়া গেলে এক এক দিন কি সে বিচিত্র ব্যথায় সে শয্যার উপর লুটাইয়া পড়ে, তাহার কারণ সে ভাল বুঝিতে পারে না। মনে হয়, আজ যদি তাহার সেই খুকীটা বাঁচিয়া থাকিত। সকলের রাত্রিগুলি সুখনিদ্রায় কাটে আর তাহারই রাত্রি কি শুধু অচল!

সুব্রত একদিন সহসা আবিষ্কার করিল যে, তাহার মন কিছুদিন একটু বিশেষ রকম রাস ঢিলা পাইয়া এতদূরে আগাইয়া গিয়াছে যে তাহার আর ফিরিবার উপায় নাই। দারুণ দুশ্চিন্তায় সে মুসড়াইয়া পড়িল, মুখে চোখে গভীর চিন্তার রেখা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

দিন কয়েক পরে কমলার বাসায় যাইতেই কমলা তাহার প্রতি চাহিয়াই আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, "এ কী চেহারা হয়েছে আপনার? অসুখ করেছে বুঝি?"

সুব্রত আসিয়াছিল কমলার নিকট বিদায় লইতে। কারণ সে স্থির করিয়াছিল যে, সে চাকরিতে ইস্তাফা দিয়া সেই রাত্রেই এ স্থান ত্যাগ করিবে। নিজের ও কমলার সম্মান বাঁচাইবার জন্য পথ সে আর খুঁজিয়া পায় নাই। কমলার কথায় সে চকিত হইয়া উঠিল। জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিয়া কহিল, "কেন বলুন তো? অসুখ তো আমার কিছুই হয় নি, দিব্যি তো আছি।"

কমলা সত্যই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল, কহিল, "আপনি লুকোচ্ছেন, নিশ্চয়ই আপনার শরীর ভালো নেই।"

একটু থামিয়া, স্বরে অপর্যাপ্ত আন্তরিকতা ঢালিয়া বলিল, "আমায় বলতে কি কিছু বাধা আছে? আমার আপনি এত করেন, কই, তার জন্যে তো কোনদিনই আমি এতটুকু সংকুচিত হই না। আর আপনার কি হ'ল না হ'ল সেটুকু জানবার অধিকারও কি আমার নেই? বেশ যা হ'ক!"

শেষের দিকে তাহার স্বর ভারী হইয়া আসিল। কমলার আন্তরিকতায় সুব্রত মুগ্ধ হইয়া গেল। চোখ তুলিতেই দেখিল কমলা বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাহারই প্রতি চাহিয়া আছে। সে মুখ নত করিয়া কহিল, "কি বলব বলুন, সত্যিই আমার তেমন কিছু হয় নি। আপনি—"

বাধা দিয়া কমলা কহিল, "থাক, আপনাকে কিছু জিজ্ঞেসা করলেই তো হাজার রকম ফ্যাকড়া বার ক'রে বসেন। চিনতে তো আপনাকে আর বাকি নেই?"

সুব্রত চঞ্চল হইয়া উঠিল। একটু নীরব থাকিয়া কথার মোড় ঘুরাইবার চেষ্টায় কহিল, "আচ্ছা এক কাপ চায়ের বন্দোবস্ত তো আগে ক'রে দিন, তারপর রাগ করবেন।"

ক্ষণেক থামিয়া আবার কহিল, "আজও আপনি এত ছেলেমানুষ, আশ্চর্য।"

কমলা কৃত্রিম ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, "বলেছে আপনাকে! কেন, কি ছেলেমানুষিটা দেখলেন, শুনি।" বলিয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল। এবং দাসীর হাতে চায়ের সরঞ্জাম দিয়া ও নিজে এক প্লেট খাবার লইয়া মিনিট কতক পরেই ফিরিয়া আসিল। সামনের তেপায়া টেবিলটার উপর প্লেটটি রাখিয়া কহিল, "ততক্ষণ এগুলো খেয়ে ফেলুন, চা দিচ্ছি।"

এ অনুরোধ এড়াইবার সাধ্য সুব্রতর ছিল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে বাক্যব্যয় না করিয়া খাবারগুলির সদ্‌গতি করিতে লাগিয়া গেল। কমলা চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। সুব্রত কয়দিন না আসায় তাহার অনুপস্থিতিতে সে স্পষ্টই অনুভব করিতেছিল যে, তাহার অন্তরে কতখানি স্থান না এই শান্ত নিরীহ লোকটি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সুব্রতর মুখের প্রতি চাহিলেই তাহার মনপ্রাণ বেদানার্ত হইয়া ওঠে, মনে হয় যেন কি এক অব্যক্ত ব্যথার ভারে লোকটি দিন দিন জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু বহু প্রকার আকার ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিয়াও সে তাহার মুখ হইতে নিজের বিষয়ে একটি কথাও বাহির করিতে পারে নাই।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে সুব্রত একবার কমলার প্রতি চাহিল। বহুবার দেখা ঘরের আসবাবপত্র ও দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবিগুলির প্রতি বার কয়েক চোখ বুলাইল। তাহার পর একটু কাশিয়া, চায়ে লম্বা গোছের একটি চুমুক দিয়া কহিল, "দেখুন, আপনি অনেকবারই অনেক রকমে আমার নিজের বিষয়ে অনেক কিছুই জানতে চেয়েছেন, কিন্তু আমি প্রতিবারই সেসব কথা এড়িয়ে গেছি। কেন, আজ তা খুলে বলবার আগে আপনার কাছে আমি প্রথমেই চাইছি। অভয়; তা না পেলে আমি অগ্রসর হ'তে পারব না।"

বলিয়া সে চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়া কাপটি নামাইয়া রাখিল। কমলা একটু বিস্মিত হইল, কহিল, আমি অভয় না দিলে আপনি বলতে পারবেন না, সে এমন কি কথা! যাক্, তা হ'ক, আপনি বলুন—দিচ্ছি আপনাকে অভয়।"

"কিন্তু পরে এর জন্যে অনুতাপ করবেন না তো? বলিয়া সুব্রত হাসিল। কহিল, "আপনার মনে আছে কি না জানি নে—যখন আপনারা মেডিক্যাল কলেজে এলেন, তখন আমার দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী। তারপর যত দিন কলেজে ছিলাম, তার মাঝে আপনাদের সঙ্গে যা কথাবার্তা হয়েছিল তা এতই অল্প যে চেষ্টা করলে হয়তো আজও আমি মনে করতে পারি না। কিন্তু তারই মাঝে কখন যে আমার মন বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েছিল তার কিছুই আমি সময়ে জানতে পারিনি। যখন জানলাম তখন সামনে আমার শেষ পরীক্ষা আর আপনি তখন বিবাহিতা। সুতরাং নিজেকে বিশ্বাস করতে না পেরে পরীক্ষা দিয়েই সরে পড়লাম—যদি মনকে বাগ মানাতে পারি।"

একটু থামিয়া সুব্রত কমলার প্রতি চাহিল। সে তাহারই

(শেষাংশ ৩৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সুয়েজের কথা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন, এম এস-সি

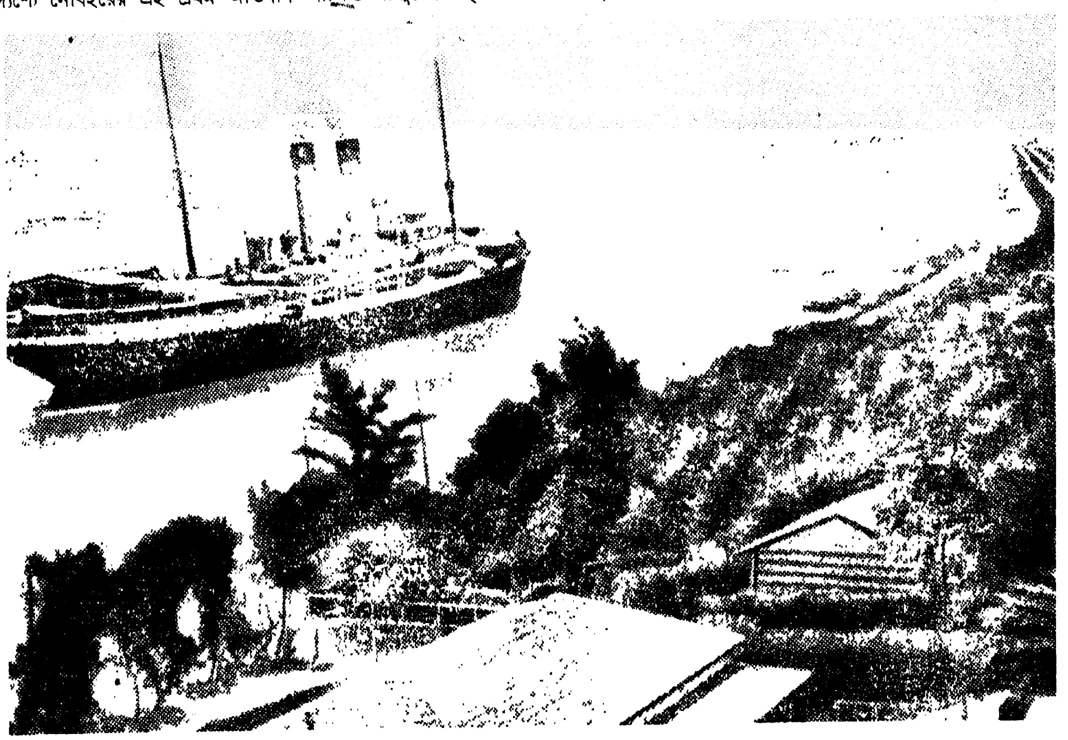
আঠারশ উনসত্তর খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাস। তখনও প্রভাত সূর্য ভূমধ্যসাগরের উপর জমাট বাঁধা কুয়াসার শুভ্রতা সরাইয়া তাহার দিগন্তবিস্তারী নীলিমাকে বিশ্বের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয় নাই। পোর্ট সৈয়দ বন্দরে কতকগুলি বজারা নঙ্গর ফেলিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। ধীরে ধীরে কুয়াসা দূর হইল। সহস্র রশ্মির যাদুস্পর্শে ভূমধ্যসাগরের নীলজলে নিত্যকার মত সেদিনও ইন্দ্রজাল রচনার কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না। সহসা তীরস্থ সহস্র লোকের তুমুল হর্ষধ্বনি ভেদ করিয়া বিউগিলের সংকেত ধ্বনিত হইলে বজরার শ্রেণী ছাড়িয়া দিল।

নব-নির্মিত খাল পথে ভূমধ্য সাগর হইতে লোহিতসাগরোদ্দেশ্যে নৌবহরের এই প্রথম অভিযান আজিও মানুষের স্মৃতিপথে জাগিয়া রহিয়াছে। বলাবাহুল্য সুয়েজ খালে প্রথম পাল উড়াইবার বহু প্রত্যাশিত গৌরব ফার্ডিনান্ডের (Count Ferdinand de Lesseps) কল্যাণে সেইদিন ফরাসী জাতির ভাগেই জুটিয়াছিল।

সে যাহা হউক, এ সবই আজ অতি পুরাতন কথা। ফার্ডিনান্ডের বজরা সুয়েজ খালে প্রথম পাল উড়াইবার পর আজ সত্তর বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ভাস্কো ডি গামার পর সেইদিন পূর্ব ও পশ্চিমকে আর একটু নিবিড়ভাবে বাঁধিবার যে নূতন আয়োজন হইয়াছিল আজ তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। আজ সুয়েজ খাল শুধু ভৌগোলিক বিশেষত্বের মধ্য দিয়াই নিজেকে জাহির করিয়া বসিয়া নাই। প্রায় সমস্ত পৃথিবীর বিশেষ করিয়া ইউরোপ ও এসিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য ও তাহার সহিত এই দুই দেশের রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান নিয়ন্তা হিসাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা ছাড়া ইউরোপে যুদ্ধের কথা উঠিলে আজ সুয়েজের দিকে আমাদের চক্ষু না পড়িয়া পারে না। ঐতিহাসিক গৌরব ভৌগোলিক সংস্থান ও আন্তর্জাতিক স্বার্থের দিক দিয়া সুয়েজ আজ যে বিশেষত্ব অর্জন করিয়াছে তাহার তুলনা খুব অল্পই মিলিবে।

সে একদিন ছিল যখন পাশাপাশি বাস করিয়াও ইউরোপ ও এসিয়া পরস্পরকে চিনিত না। যে যাহার নিজের দেশের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে পরম নিশ্চিন্তে বসিয়া ভাবিত—ঐ ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে বুঝি পৃথিবীর আর বিস্তৃতি নাই। কিন্তু মুস্কিল হইল, সকল দেশেই সকল সময়ই এমন কয়েকটি লোক থাকে যাহারা সকলের ঠিক উল্টাটি ভাবে এবং করে—সবাই যাহা করিতে নিষেধ করে। যে যুগের কথা বলিতেছিলাম সে যুগেও চেষ্টা করিলে এই ধরণের কতকগুলি লোককে খুঁজিয়া বাহির করিতে বেগ পাইতে হয় না। এই ধরণের কতকগুলি লক্ষ্মীছাড়া বেপরোয়া লোকের পাল্লায় পড়িয়া সেই ভৌগোলিক অজ্ঞতার যুগেও ইউরোপের জাতিরা সুদূর প্রাচ্যের অনেক তথ্যই জানিতে পারিয়াছিলেন। বহুদিন অজ্ঞাতবাসের পর হঠাৎ একদিন পুঁটলি পোটলা সমেত আত্মপ্রকাশ করিয়া মার্কো পোলো যখন গোষ্ঠীবর্গের মাঝে চীন, জাপান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্যদেশের নানা রকমের আজগুবি গল্প ফাঁদিয়া বসিত এবং উহার বিপুল ঐশ্বর্যের ছিটে-ফোঁটা নিদর্শন-স্বরূপ নানারকমের মণিমুক্তা হীরা জহরৎ পুঁটলি হইতে বাহির করিয়া দেখাইত তখন অতি বড় অবিশ্বাসীর পক্ষেও কথাটা নিতান্ত হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া আর যাহাই হউক সহজ হইত না।

তখনকার দিনের ইউরোপের জাতিসমূহ মনে করিত, পাতাল-পুরীর বন্দিনী রাজকন্যার মত পৃথিবীর সুবর্ণ লক্ষ্মী সুদূর প্রাচ্যের রহস্যময় রাজপুরীর কোথাও না কোথাও লুকাইয়া



সুয়েজ খালের দৃশ্য।

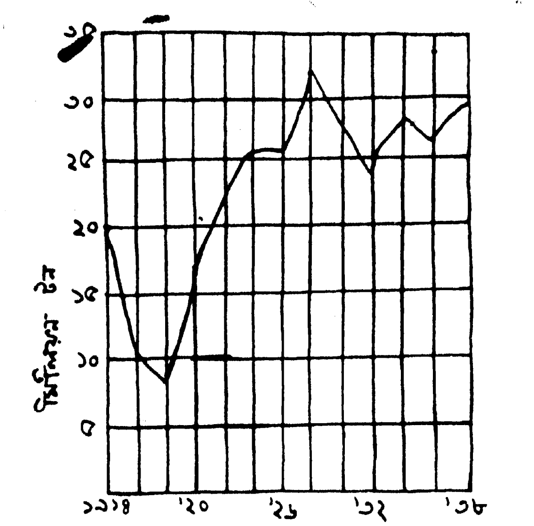
রহিয়াছে। তাহাকে উদ্ধার করা রাজকন্যার চেয়ে কোন অংশে কম দুরূহ ছিল না। সুবিস্তীর্ণ শক্তিশালী অটোম্যান সাম্রাজ্য এসিয়া ও ইউরোপের ঠিক সন্ধিস্থলে বসিয়া একদিকে প্রাচ্যের বিপুল ঐশ্বর্য ও অপরদিকে পশ্চিমের লুব্ধ দৃষ্টির প্রতি সদা-জাগ্রত প্রহরীর মত নজর রাখিয়া চলিয়াছে। সরাসরি তাহাকে ফাঁকি দিবার উপায় ছিল না।

অবশেষে একদিন সমুদ্রপথে প্রাচ্যের গুপ্ত পথের সন্ধান মিলিয়া গেল। স্থলপথে মানুষের স্বাধীনতা চিরদিনই ক্ষুন্ন হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ অবস্থা একটু জটিল হইলেও এই সেদিনও সমুদ্রপথে মানুষের অবাধ স্বাধীনতাকে কেহ প্রশ্ন করে নাই। মুক্তিকামী কোণঠাসা জাতিদের সমুদ্র চিরদিনই হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছে। এবং এই আহবানে যাহারা প্রাণ খুলিয়া সাড়া দিয়াছিল মহাজাতি সম্মেলনে তাহাদের আসন আজ কোথায় তাহা আমরা জানি।

আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিয়া প্রাচ্যের সহিত যোগ স্থাপিত হইবার পর ইউরোপের অর্থনৈতিক ইতিহাসে যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও এই পথের অসুবিধা ছিল অনেক। গোড়ার দিকে বাণিজ্যিক প্রগতির চাপে এই সকল অসুবিধা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইলেও ক্রমশই উহাদিগকে অস্বীকার করা কঠিন হইয়া পড়িল। ক্রমে বাণিজ্যের ঊর্ধগতি মন্দীভূত হইয়া আসিলে ঐ পথের নানারূপ অসুবিধা যে দিন দিনই বড় হইয়া দেখা দিবে ইহা সহজেই অনুমেয়। ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়া প্রাচ্যের সহিত যোগাযোগের পরিকল্পনা ইহার পূর্বে কাহারও মাথায় যে আসে নাই তাহা নহে। কিন্তু যোজকের মধ্য দিয়া খাল কাটিয়া সমস্যার সুন্দর ও সরল সমাধান ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কাহারও মাথায় আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তথাপি এই যোগ স্থাপনের চেষ্টা অন্তত জোড়াতালি দিবার মতন করিয়াও যে আদৌ একেবারে হয় নাই তাহা নহে। কোনরূপে ভূমধ্যসাগর হইতে লোহিত সাগরে গিয়া একবার পড়িতে পারিলে ব্যাপারটি যে বেশ পরিষ্কার হইয়া যায় এই সহজ বুদ্ধিটুকু বহুকাল পূর্বেই ইউরোপীয় বণিকদিগের মাথায় খেলিয়াছিল। ভূমধ্যসাগর হইতে সরাসরি নীল নদের মধ্যে ঢুকিয়া পরে সুবিধামত একজায়গায় আফ্রিকার বাকী সংকীর্ণ স্থলপথটুকু অতিক্রম করিয়া আবার লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্য করিবার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। অতীতে নাকি খাল কাটিয়া স্থানে স্থানে লোহিতসাগর ও নীল-নদকে জুড়িয়া দিবার চেষ্টাও হইয়াছিল। পরবর্তী সময়ে কাইরো হইতে সুয়েজ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ সেই পুরাতন সমস্যার সমাধান চেষ্টার আর এক নূতন নিদর্শন হিসাবে ধরা যাইতে পারে।

সে যাহা হউক ফার্ডিনাণ্ডের কল্পনা কার্যে পরিণত হইবার পথে যে সব বাধা বিপত্তির উদ্ভব হইয়াছিল তাহা সাজাইয়া লিখিলে এক বিরাট ইতিহাস হইয়া যাইবে। শতাব্দীর ধর্মান্ধতা প্রথম হইতেই বাধ সাধিয়াছিল। এতবড় দুই সমুদ্রকে জুড়িয়া দেওয়া আল্হার অভিপ্রেত হইলে তাহা কোন কালে হইয়া যাইত। সুলতানের রাজ্যে এইরূপ সাংঘাতিক ধর্মবিরুদ্ধ কার্যের সংকল্পকে যে কিরূপ বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। যাহা হউক শেষ পর্যন্ত সুলতানের মত হইয়াছিল। কিন্তু এই বিরাট রাজসূয় যজ্ঞের সম্পূর্ণ আয়োজন ভার কে গ্রহণ করিবে? একলা এক রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা অসম্ভব। তাই ফরাসী গভর্নমেণ্টকে এই ব্যাপারে রাজী করাইয়াই ফার্ডি-নাণ্ডের কার্য শেষ হয় নাই; ইংরেজ সরকারের দরবারে তাঁহাকে হাঁটাহাঁটি করিতে হইয়াছিল অনেক। রক্ষণশীল ইংরেজ রাজ-নীতিবিদ্গণের মনে সুদূর ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনার রঙ্ ধরাইতে তাঁহাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। তবে ফার্ডিনাণ্ডের বরাত ছিল ভাল। গোড়া হইতেই ডিজ্রেইলী সুয়েজের পথে ইংরেজ জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন। এবং তাহারই চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এই বিরাট যজ্ঞের এক প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল।

সুয়েজ খালের কথা বলিতে গিয়া আমাদের স্বভাবতই পানামা খালের কথা মনে পড়ে। তবে এই কথা ঠিক, ইঞ্জি-নীয়ারিংএর দিক দিয়া পানামার মত সুয়েজের গৌরব করিবার কিছুই নাই। পানামায় এক বিরাট পাহাড়কে ডিনামাইটের সাহায্যে উড়াইয়া দিয়া তবে খাল কাটিতে হইয়াছিল। সেই স্থলে



সুয়েজে যান চলাচল।

সুয়েজ ছিল কাদা আর মাটী কাটিয়া ঝুড়ি ভরিয়া সেইগুলিকে দূরে আর এক জায়গায় জড় করিবার বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে কাজ। পঁচিশ হাজার শ্রমিককে দিনের পর দিন এই মাটী কাটার কাজ অসীম ধৈর্যে করিয়া যাইতে হইয়াছিল। তাহা ছাড়া পানামার পীত জ্বর ও ম্যালেরিয়ার বিভীষিকা আজও আমরা ভুলিতে পারি নাই। সুয়েজে অসুবিধার মধ্যে পানীয় জলই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। সেই অসুবিধা দূর করিতে খাল কাটিয়া নীলনদ হইতে জল আনিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। ইহাতে নাকি দিনে দুই হাজার পাউণ্ড করিয়া খরচ হইত।

এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে মিশর গভর্নমেণ্ট ইংরেজ ও ফরাসী গভর্নমেণ্টকে সুয়েজ লীজ্স্বরূপ দিয়াছে। এই লীজের মিয়াদ শতবর্ষ কাল; এবং এই লীজের মিয়াদ ফুরাইতে এখন আর ত্রিশ বৎসর বাকি। সুয়েজের শেয়ার মূলত ইংরেজ ও ফরাসী গভর্নমেণ্টের মধ্যেই ভাগ করা আছে। ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে পরিচালনার ভার ফরাসী গভর্নমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত। তবে সামরিক ব্যবস্থার দিক দিয়া সুয়েজ রক্ষার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের হাতেই আসিয়া পড়িয়াছে।

খাল কাটা হইল বটে। কিন্তু পৃথিবীর ব্যবসা ও

বাণিজ্যের উপর ইহার প্রভাব সঙ্গে সঙ্গেই পরিস্ফুট হয় নাই। প্রাচীন প্রচলিত পন্থার প্রতি মানুষের সনাতন অনুরাগ সব কিছু নূতনকে চিরকাল সন্দেহের চোখে দেখিয়া আসিয়াছে। নূতন ব্যবস্থার অনিশ্চিত ও অপরিচিত সুবিধা অপেক্ষা পুরাতন ব্যবস্থার পরিচিত অসুবিধার উপর নির্ভর করা সহজ। মানুষ চিরকাল পাল খাটাইয়া দাঁড় টানিয়া সমুদ্রে ভাসিয়াছে। তাই বাষ্প শক্তিতে পোত চালাইবার নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াও সে অনাবশ্যক পাল ও দাঁড়গুলিকে ফেলিয়া দিতে পারে নাই। এই ক্ষেত্রেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সুয়েজ খাল প্রস্তুত হইবার পরেও বহুদিন ধরিয়া উত্তমাশা অন্তরীপের পথের প্রাধান্য অপ্রতিহত ছিল। মাঝে মাঝে দুই একখানা বাণিজ্য পোত অল্প-স্বল্প পণ্য সম্ভার বহন করিয়া সুয়েজের পথে চলা ফেরা করিতে লাগিল। এইরূপে সুয়েজের পথে যান চলাচল আরম্ভ হইবার পর তাহা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। আজ সুয়েজের পথে বৎসরে বহু কোটি টন ওজনের বাণিজ্য সম্ভার পূর্ব ও পশ্চিমের হাটে বেচা-কেনা হইতেছে। গত মহাযুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থায় ইহার পরিমাণ কিছু কমিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পর হইতে সুয়েজের পথে বাণিজ্যের ঊর্ধগতি ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। চিত্রে গ্রাফের সাহায্যে এই জিনিসটি দেখান হইয়াছে। মাঝে মাঝে এই গতির যে হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে তাহা রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক বহুবিধ কারণের সহিত সংশ্লিষ্ট। ব্যবসায় বাণিজ্য ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিক দিয়া ১৯৩৪ সালকে স্বাভাবিক বৎসর বলা চলিতে পারে। ঐ বৎসরে পারস্য, ভারতবর্ষ, সিঙ্গা-পুর, সুদূর প্রাচ্য প্রভৃতি স্থানসমূহের সহিত বাণিজ্য করিতে গিয়া সুয়েজের পথে যথাক্রমে পঞ্চাশ, সত্তর, ত্রিশ ও আশী লক্ষ টন ওজনের মাল সরবরাহ করিতে হইয়াছে। ইহা হইতেই সুয়েজের প্রাধান্য আমরা অনেকখানি বুঝিতে পারিব।

পৃথিবীর বিশেষ করিয়া ইউরোপ ও এসিয়ার ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াই সুয়েজের কার্য শেষ হয় নাই। সামরিক সংকটকালে সুয়েজের প্রাধান্য আজ আর ব্যবস্থার ভার বৃটেনের হাতে থাকায় ইতালীর দুর্ভাবনার অন্ত বিস্তর জড়িত থাকিলেও বৃটেনের ও ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলির বিশেষ করিয়া ইতালীর স্বার্থের সহিত সুয়েজের রক্ষণাবেক্ষণ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। সুয়েজ রক্ষার সামরিক ববস্থার ভার বৃটেনের হাতে থাকায় ইতালীর দুর্ভাবনার অন্ত নাই। ভূমধ্যসাগরের দুই ছিদ্র পথে বৃটেনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৌবহরের ছিপি আটকাইয়া দিয়া প্রয়োজনের সময় ইতালীকে বিপদে ফেলা কঠিন নহে। গত ইতালী আবিসিনিয়ার যুদ্ধে অনেকেই আশা করিয়াছিল বৃটেন সুয়েজের পথ বন্ধ করিয়া আবিসিনিয়াকে ঐ যাত্রা হয়ত বাঁচাইয়া দিবে। মুসোলিনী এই ভয় যে করেন নাই তাহা নহে। সেই সময় সুয়েজের কিছু শেয়ার ক্রয় করিবার অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া তিনি এই ভয় সুস্পষ্ট করিয়াছিলেন। তবে ইহা সত্য যে এই কয়েক বৎসরে বিমান বহরের অপ্রত্যাশিত উন্নতিতে অন্যতম সামরিক ঘাঁটি হিসাবে সুয়েজের প্রতিপত্তি অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে। বলা বাহুল্য এইবারকার যুদ্ধে সুয়েজের কার্যকারিতা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুয়েজের প্রাধান্য স্বীকৃত হইলেও একথা ভুলিলে চলিবে না যে সুয়েজের প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব নাই। শতাব্দী ধরিয়া উত্তমাশা অন্তরীপের পথে পরি-চালিত বাণিজ্যের এক বড় রকম অংশ সুয়েজের পথে আকৃষ্ট হইলেও সেই পুরাতন পথ এখনও সুয়েজের অন্যতম প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ভারতবর্ষের এবং পারস্যোপসাগরস্থিত বাণিজ্য-প্রধান বন্দরগুলির সহিত পশ্চিম ইউরোপের বাণিজ্যিক যোগাযোগ সংরক্ষণে সুয়েজের সুবিধা অবিসম্বাদিত সন্দেহ নাই। কারণ উত্তমাশা অন্তরীপ না ঘুরিয়া সুয়েজের পথে ভারতবর্ষে যাইলে প্রায় ৪,৫০০ মাইল পথ সংক্ষেপ হইয়া যায়। ইহা বড় কম কথা নহে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বেলায় অন্তরীপের পথের পরিবর্তে সুয়েজের পথ ধরিলে মাত্র হাজার মাইল বা চারদিনের সমুদ্র-পথ বাঁচিয়া যায়। এই পথটুকু বাঁচাইতে গিয়া সুয়েজে যে অতিরিক্ত মাশুল (Canal toll) দিতে হয় তাহা মোটেই যুক্তিযুক্ত নহে। সেই জন্য অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডগামী অধিকাংশ জাহাজ এখনও উত্তমাশা অন্তরীপের পথে যাতায়াত করে। গত মহাযুদ্ধের পর দক্ষিণ আফ্রিকার নাতালস্থিত কয়লার খনিগুলির উন্নতি সাধিত হইলে ঐখান হইতে খুব সস্তায় কয়লা পাওয়া যাইতে থাকে। ইহার ফলে অন্তরীপের পথের প্রাধান্য কিছু বাড়িয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত স্থলপথে রেলপথের ক্রমোন্নতি সুয়েজের প্রাধান্য কিয়ৎপরিমাণে সংকুচিত করিয়াছে। এই সম্পর্কে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত বার্লিন-বোগদাদ রেলপথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য ইহা মধ্য-ইউরোপের বাণিজ্যকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। তারপর বিমানপথের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ত আছেই। ইতিমধ্যেই মধ্য ও সুদূর প্রাচ্যে ডাকবহনের কার্যে বিমানপথ অসম্ভব প্রাধান্যলাভ করিয়াছে।

সুয়েজের আর একটি বিশেষ অসুবিধা হইল ইহার মাশুলের অত্যাধিক্য। এমন কি পারস্যোপসাগরের বন্দর হইতে বাণিজ্যপোত সুয়েজের সুবিধা প্রত্যাখ্যান করিয়া অপেক্ষাকৃত কম খরচে অন্তরীপের পথে মাঝে মাঝে যাতায়াত করিয়া থাকে। মাশুলের এই অন্যায় আধিক্যহেতু ভারত মহাসাগরে ইউরোপীয় বাণিজ্যকে সম্প্রতি জাপানের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের সহিত আঁটিয়া উঠিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছে। বিভিন্ন জাহাজ কোম্পানী হইতে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠিয়াছে অনেক এবং মাশুলের হার কমাইবার জন্য কেনাল কোম্পানীর নিকট বহুবার অনুরোধ জানান হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই।

সুয়েজের পরিস্থিতি সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে দুই একটি কথা আলোচিত হইল। এই সম্বন্ধে জানিবার এবং লিখিবার অনেক কিছুই আছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা সম্ভবপর নহে। সে যাহা হউক, কল্পনাবিলাসী, দূরদর্শী ফার্ডিনাণ্ড দ্য লেসেপের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সে স্বপ্ন শুধু ফার্ডিনাণ্ডের নহে, তাহা সমগ্র ইউরোপের শতাব্দীর স্বপ্ন! প্রাচ্যের বন্দিনী রাজলক্ষ্মী পশ্চিমের বীরদের কল্যাণে ছাড়া পাইয়া আজ ইউরোপের প্রাঙ্গণে খেলিয়া বেড়াইতেছে। আজ ভাঙ্গা বাড়িতে অভুক্ত প্রতিবেশীদিগের প্রতি চাহিয়া মনে হইতেছে সেই প্রাচীন বনিয়াদের সব কথাই বুঝি ভুল।

জুলি

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

(১০)

প্রস্তাব শুনিয়া মনোমোহনবাবু বজ্রাহতের মত পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পর তাহার মুখ হইতে বাহির হইল, "তোমার অভিরুচি।"

কথা দুইটি শুনাইল তাহার সম্মতির মত; কিন্তু যোগেশ জানিল যে অসম্মতি উহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিয়া অপর কেহই প্রকাশ করিতে পারিত না আর একা অন্তর্যামীই জানিলেন যে কত ভাঁড় বেদনার অশ্রু অন্তরের উত্তাপে বাষ্প হইয়া ঐ কথা দুইটির সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাসের রূপে বাহির হইয়া আসিল।

কিন্তু আঘাত তাঁহার যত কঠিন এবং বাধা দিবার প্রবৃত্তি যত প্রবলই হউক না কেন, শোভার মুখের দিকে চাহিয়া উহার কোনটাই তিনি প্রকাশ করিতে পারিলেন না। শোভা যখন স্বামীর প্রস্তাব সম্পর্কে সম্মতি বা অসম্মতি কিছুই প্রকাশ না করিয়া মৃদু করুণকণ্ঠে কেবল কহিল, "দেখি, এ করে আমার স্বামীকে আমি যদি পাই।" তখন আর মনোমোহনবাবুর আপত্তি করিবার উপায় রহিল না। নিজের মনে তিনি এই বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবার প্রয়াস পাইলেন যে, স্বামীকে পাইবার জন্য সতীর সাধনার অনেক রূপই ত পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাকেও না হয় সেই সাধনারই নূতনতম রূপ বলিয়া তিনি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবার প্রয়াস পাইবেন।

যোগেশ আয়োজন করিল ষোড়শোপচারে এবং পাছে এ সংসারের কোন দাবী শোভার সাধনপথে কোন বিঘ্ন উৎপাদন করে এই আশঙ্কায় সংসারে প্রচুর সংখ্যক দাসদাসী নিযুক্ত করিয়া সংসারের দায়িত্ব হইতে শোভাকে সে সর্ব্বতোভাবেই মুক্ত করিয়া দিল।

শোভা বিহ্বল হইয়া কহিল, "বল কি তুমি! তোমার খাওয়া দাওয়া সেবা শুশ্রূষার ভার দাসী চাকরের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি থাকব লেখাপড়া, গান আর সেলাই নিয়ে?"

যোগেশ উত্তর দিল, "শরীর ছাড়াও আমার একটা মন আছে। সেই মনটাই যদি নিরন্তর উপবাসী থাকে, কি হবে আমার দেহকে খাইয়ে?"

খরচের বহর দেখিয়া মনোমোহনবাবু শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু যে কারণে প্রথমে তিনি আপত্তি করিতে পারেন নাই, সেই কারণেই শেষ পর্য্যন্তও তাহার আপত্তি করিবার সাহস হইল না।

যে অমল ও গৌরী এই ভাবটি প্রথমে যোগেশের মাথায় ঢুকাইয়া দিয়াছিল তাহারাও ব্যাপার দেখিয়া রীতিমত বিস্মিত হইয়া উঠিল।

অমল একদিন বলিয়াই ফেলিল, "তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি যোগেশ। যা তুমি ধরবে একেবারে তার চরমে তোমার যাওয়া চাই।"

যোগেশ গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "তার মানে এই যে কাউকেই আমি ভুলাতে চাই না—বাইরের লোককেও নয়, নিজেকেও নয়। আমি কাজে হাত দিই অন্তরের অদম্য প্রেরণায়। তাই তাতে খুঁত থাকে না, থাকলে আমি তা সইতেও পারি না।"

গৌরী কিন্তু সকৌতুকে কহিল, "কিন্তু আপনার অন্তরের প্রেরণা যে বেচারীর ঘাড়ে চাপছে সে এর ভার সইতে পারবে ত?"

যোগেশ কহিল, "পারা উচিত; না যদি পারে সেটা হবে তার অক্ষমতা—আমার ত্রুটি নয়।"

গৌরী হাসিয়াই কহিল, "আমার কিন্তু বড্ড ভয় হচ্ছে যোগেশবাবু, দিদির কাছে গিয়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা দু'দিন পরে হয়ত বা আমারও থাকবে না।"

কথাটা ফলিয়া গেল প্রায় অক্ষরে অক্ষরে। শিক্ষার কথা যখন প্রথম উঠে তখন শোভা সংশয় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল যে, হয়ত বা এই বয়সে সে কিছুই শিখিতে পারিবে না। কিন্তু বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতেই নিজের শিখিবার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা দেখাইয়া সকলকে সে তাক লাগাইয়া দিল।

শোভা পড়িয়া পড়িয়া অনেক পুঁথিই মলিন করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, কিন্তু যে পাঠ সে হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিল তাহা পুঁথি হইতে নহে, জীবন হইতে। সে শাড়ি চিনিল শত শত রকমের, শাড়ি পরিতে শিখিল অন্ততঃ পঁচিশ রকমে। বর্ণজ্ঞান তাহার যতই অগ্রসর হউক না কেন বর্ণ সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান সাতটিকে ছাড়াইয়া ধাপে ধাপে অনেক উপরে উঠিয়া গেল। কাগজের উপর রঙ দিয়া রূপ-সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য যতটুকুই সে অর্জন করুক না কেন, ক্রীম, পাউডার ও লিপষ্টিকের সাহায্যে নিজের মুখখানিকে বিচিত্র করিবার কৃতিত্বে খুব তাড়াতাড়ি সে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিল এবং নিজের জন্য একটি সেমিজ বা সায়া কাটিয়া সেলাই করিতে নিজে সে যতই গলদ্‌ঘর্ম হইয়া উঠুক না কেন, তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য জ্যাকেট, ব্লাউজ বা ওভারকোট করাইবার কালে খুঁত ধরিয়া ধরিয়া কলিকাতার সর্বোত্তম দরজীকেও সে নাজেহাল করিবার কৃতিত্ব অর্জন করিল। সুর ও তাল জ্ঞান সম্বন্ধে তাহার সঙ্গীতের শিক্ষক যে অভিমতই পোষণ করুন না কেন, চলচ্চিত্রের চলতি গান-গুলির প্রায় সব কয়টাই সে মুখস্ত করিয়া ফেলিল এবং পর্দার উপরে ছবি ও রঙ্গমঞ্চের উপর অভিনয় দেখিয়া দেখিয়া বসিবার ও শুইবার ঘরের আদবকায়দায় শীঘ্রই সে রীতিমত কেতাদুরস্ত হইয়া উঠিল। যে লজ্জাশীলা পল্লীবালা একদিন শত অনুরোধেও কেবল অপরিচিত পরপুরুষ বলিয়াই স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধুর সম্মুখেও বাহির হইতে চায় নাই সেই শোভাই অনবগুণ্ঠিত বদনে ও অকুণ্ঠিত সাহসে কলিকাতার জনবহুল রাজপথে বিচরণ করিবার কৃতিত্ব অর্জন করিয়া ফেলিল।

প্রাণের দায়ে রোগী যেমন করিয়া দিনের পর দিন তিক্ত-ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়া যায়, মনোমোহনবাবুও তেমনই করিয়াই শোভার এই সমস্ত পরিবর্তন সহিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু শেষে তাঁহারও অসহ্য হইয়া উঠিল।

সেদিন বৈকালের নির্দিষ্ট সময়ে শোভা স্কুল হইতে বাড়িতে ফিরিয়া আসিল না এবং সন্ধ্যার অনেক পর পর্যন্তও না। সন্ধ্যার পর যে শিক্ষক শোভাকে পড়াইতে আসেন তিনি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অবশেষে ফিরিয়া গেলেন। বাহিরের ঘরে মনোমোহন-বাবুর মুখ ক্রমশ গম্ভীর হইয়া উঠিতে লাগিল।

অবশেষে শোভা যখন ফিরিয়া আসিল তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। সে ফিরিয়া আসিল একা।

মনোমোহনবাবু বাহিরের ঘরেই বসিয়াছিলেন, তিনি গম্ভীর-স্বরে কহিলেন, "একবার শোন ত মা।"

শোভা নিঃসঙ্কোচে শ্বশুরের সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

"এত রাত হল যে?" মনোমোহনবাবু ক্ষণকাল একটু ইতস্তত করিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন।

শোভা উত্তর দিল, "বোর্ডিং-এর কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে বায়স্কোপে গিয়েছিলাম। তারা বাসে ফিরে গেল; আমি ঐ মোড়ে

নেমে এটুকু পথ পায়ে হে'টেই এসেছি।"

"একা?" মনোমোহনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

"হ্যাঁ, কিন্তু তাতে হয়েছে কি?" শোভা দ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল।

"না, কিছু হয়নি", বলিয়া মনোমোহনবাবু মুখ ফিরাইয়া লইলেন। শোভাও আর কোন কথা না কহিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

সেই রাত্রেই যোগেশ বাড়িতে ফিরিয়া আসিলে মনোমোহনবাবু তাহার কাছে ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া উপসংহারে কহিলেন, "আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। এই বয়সে তোমার উপর আমি আর হুকুম চালাতে চাই না। তবে একটা কথা তোমায় বলি। আমার মনে হয় যে বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে।"

যোগেশ উত্তর না দিয়া নতমুখে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু রাত্রে শয্যায় শুইয়া সে শোভাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "বাবা বলছিলেন যে বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে।"

শোভা ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর কহিল, "বাবা যা বলবার তা আমাকেও বলেছেন। কিন্তু তুমি কি বলছ তা আমি শুনতে পারি কি?"

যোগেশ শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল, "আমি কিছুই বলছি না। তবে আমার মনে হয় যে, বিজলীর আলো তোমার চোখ ধাঁধিয়েই দিচ্ছে, তোমায় পথ দেখাচ্ছে না।"

শোভা আবার ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, তারপর ঈষৎ তপ্ত, ঈষৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল, "যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা—এ খুব পুরনো কথা। শুভদৃষ্টির সময়েই যখন তোমার সুনজর আমার উপর পড়ে নি তখন আজ যে আমার মধ্যে কোন ভাল তুমি দেখবে সে আশা আমি করি না।"

যোগেশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "ঈশ্বর যদি থাকেন তবে তিনি জানেন যে তোমার মধ্যে একটু ভাল কিছু দেখবার কত প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমি আমার এই বুকের মধ্যে বয়ে বেড়াচ্ছি।"

শোভা কোন উত্তর করিল না। সেই রাত্রে উভয়ের মধ্যে আর কোন কথাও হইল না। কিন্তু পরদিন স্বামীকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া শোভা সুস্পষ্ট গম্ভীরস্বরে কহিল, "দেখ, বাবার আর এখানে থাকবার দরকার নেই। ওঁকে এখন দেশে ফিরে যেতে বল।"

অসহ্য বিস্ময়ে যোগেশ শোভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মুখে তৎক্ষণাৎ কোন কথা ফুটিল না।

শোভা কিন্তু বলিয়াই চলিল, "উনি সেকেলে মানুষ, এ বাড়ির চাল চলনের সঙ্গে নিজেকে উনি ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছেন না। মাঝে থেকে ওঁর কেবল কষ্টই হচ্ছে। কাজ কি ওঁকে এই কষ্ট দিয়ে? তার চাইতে ওঁকে দেশে ফিরে যেতে বল।"

যোগেশ আরও ক্ষণকাল শোভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর দ্রূকুঞ্চিত করিয়া ব্যঙ্গের তীক্ষ্মকণ্ঠে কহিল, "তোমার শিক্ষা যে খুবই দ্রুতবেগে অগ্রসর হচ্ছে এতদিন পর তার একটা প্রমাণ পাওয়া গেল।"

শোভা কি বুঝিল, ঠিক বলা যায় না। ক্ষণকাল বিহ্বলের মত যোগেশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে সে নিজের পূর্ব কথারই সূত্র ধরিয়া কহিল, "এখানে উনি থাকলে ওঁরও অশান্তি, আমাদেরও অশান্তি। তাই বলছি যে, সময় থাকতে ওঁকে দেশে যেতে বল, না হয় কোন তীর্থে।"

যোগেশ আরও ক্ষণকাল শোভার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কোন উত্তর না দিয়াই বাহির হইয়া গেল।

(১১)

কথাটা শুনিতে পাইলে মনোমোহনবাবু কি করিতেন বলা যায় না, কিন্তু উহা তাঁহার কাণে উঠিবার পূর্বেই তিনি সকল কর্তব্যের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া এ জগৎ হইতেই মহাপ্রস্থান করিলেন।

ব্যাপারটি ঘটিল আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতরূপে। উপরোক্ত ঘটনার মাসখানিক পর একদিন তিনি কালিঘাটে কালীদর্শন করিতে গিয়া জলে ভিজিয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন তাঁহার সামান্য একটু সর্দি বোধ হইল, তাহার পরদিন ঐ সর্দি জ্বরে গিয়া দাঁড়াইল এবং তিন দিন পর ডাক্তার ঐ জ্বরকেই নিউমোনিয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হইল না, কিন্তু রোগের গতি উত্তরোত্তর মন্দের দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল এবং দিন পনর পর এ সংসারের সমস্ত দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া তিনি পরলোকের পথে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইল অজ্ঞানে; সুতরাং পুত্র, পুত্রবধূ ও নিজের সংসার ও সম্পত্তি সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত মনে মনে কি যে তিনি ভাবিয়া স্থির করিয়া গেলেন তাহা যোগেশ বা শোভা কাহারও জানিবার সুবিধা হইল না।

কিন্তু পিতা কিছু বলিয়া না গেলেও যোগেশ মনে মনে একটা ব্যবস্থা স্থির করিয়া ফেলিল এবং পিতার শেষকৃত্য যথাবিধি সম্পন্ন হইয়া গেলে একদিন সে শোভাকে কাছে ডাকিয়া লইয়া কহিল, "আমি মেসে ফিরে যাব স্থির করেছি। তুমি এইবার দেশে যাও।"

শোভা স্তব্ধ বিস্ময়ে ক্ষণকাল স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অভিভূতের মত কহিল, "আমি দেশে ফিরে যাব? কেন?"

একবার ঢোক গিলিয়া যোগেশ উত্তর দিল, "ভেবে দেখলাম যে তাই সব চাইতে ভাল। দেশে ফিরে গেলে তুমি তোমার মনের এই শোচনীয় হ্যাংলামির গ্লানি থেকে মুক্তি পাবে আর আমিও নিছকই পাশবিকতার পঙ্ককুণ্ড থেকে উদ্ধার পাব। আমাদের দুজনেরই ভিতরের যা মনুষ্যত্ব তারই মর্যাদা রক্ষার জন্য পৃথক হওয়াই আমাদের কর্তব্য।"

শোভা আরও ক্ষণকাল নির্নিমেষদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর বিশেষ এক ভঙ্গীতে মাথা ঝাঁকিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, "তোমার কথা আমি বুঝি না, বুঝতে চাইও না। তবে আমার কথা এই যে, আমি দেশে যাব না, তোমার কাছেই থাকব। তুমি আমার স্বামী, তোমার সঙ্গে থাকবার অধিকার আমার আছে। এ অধিকার থেকে কিছুতেই আমাকে তুমি বঞ্চিত করতে পারবে না।"

কেবল স্বামীর কাছে নিজের অধিকারের দাবী পেশ করিয়াই শোভা যে নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় বসিয়া রহিল তাহা নহে, ঐ দাবী যাহাতে রীতিমত শক্ত হয় সেই জন্য যোগেশের উপর যাহার অধিকার অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়া সে মনে মনে স্থির করিয়া লইয়াছিল তাহারই দাবীর সংযোগে নিজের দাবীকে দৃঢ়তর করিবার জন্য উপযুক্ত চেষ্টা করিতেও সে বাকি রাখিল না। অমল ও গৌরীকে দিয়া যোগেশের উপর চাপ দেওয়াইবার উদ্দেশে পরদিনই শোভা একাকিনীই অমলের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল।

গৌরী ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল, অমল সবিস্ময়ে কহিল, "একি বৌদি? আমাকে ডেকে না পাঠিয়ে স্বয়ং আমার বাড়িতে যে? আর তাও একা? যোগেশ কোথায়? ব্যাপার কি বলুন ত।"

শোভা ঈষৎ একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "আমার বিপদ ভারি, গরজ বেশী। কাজেই নিজেকেই আসতে হল। ডেকে পাঠিয়ে আপনাদের যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করবার তর সইল না।"

গৌরী শোভার হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের কাছে বসাইয়া উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে দিদি? যোগেশবাবু ভাল আছেন ত? বাড়ির আর সবাই?"

শোভা সব কথাই খুলিয়া বলিল, উপসংহারে কহিল, "হয়ত

এখনও আমার শিখবার অনেক কিছু বাকি রয়েছে। কিন্তু মাঝখানে শিক্ষা একেবারে বন্ধ করে দেওয়াই ত তার সমাধান নয়।"

গৌরী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "এ কিন্তু সত্যি যোগেশবাবুর ভারি অন্যায়। দেশের খালি বাড়িতে গিয়ে দিদি একা কি করে থাকবেন?"

অমল গম্ভীর মুখে অন্যদিকে চাহিয়া অন্যমনস্কের মত কহিল, "সত্যি অন্যায়।"

শোভা সনির্বন্ধকণ্ঠে কহিল, "আপনারা ওঁকে বুঝিয়ে বলুন। আপনাদের কথা হয়ত তিনি ঠেলতে পারবেন না।"

শোভাকে ভাল করিয়া সান্ত্বনা দিয়া অমল স্বয়ং তাহাকে তাহাদের বাড়িতে পেঁাছাইয়া দিল।

অমল বাড়িতে ফিরিয়া আসিলে গৌরীর সঙ্গে এই বিষয়ে তাহার অনেক আলোচনা হইল। অমল কহিল, "মনের বাঁধন যেখানে নেই সেখানে বাইরে বাঁধবার চেষ্টা বৃথা। আমার মনে হয় যে যোগেশকে অনুরোধ করলে কোন লাভ হবে না।"

"কিন্তু মনের বাঁধন হবে না কেন, শুনি", গৌরী উত্তর দিল। "তোমার বন্ধু যা চেয়েছিলেন তা ত হচ্ছে। দিদি ত কম শিখেন নি, আর শিখছেনও খুব তাড়াতাড়ি।"

"কি শিখছেন?" অমল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল।

সহসা গৌরীর চাপা হাসি বিদ্যুৎ হইয়া তাহার দুই চক্ষুর কোণে ঝলসিয়া উঠিল। সে ছদ্ম গাম্ভীর্যের অস্বাভাবিক স্বরে কহিল, "শিখছেন না? সেই প্রথম দিনের কথা মনে নেই তোমার? তুমিই ত এসে আমায় বললে যে, সে দিন যোগেশবাবুর শত অনুরোধেও দিদি নাকি তোমার সামনে মুখের ঘোমটা খোলেন নি। সেই তিনিই এবার তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য একা এতটা পথ এসেছেন, লজ্জা বা সংকোচ কিছুই তাঁর গতিকে রোধ করতে পারেনি। একে শিক্ষা, একে উন্নতি বলবে না?"

অমল হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "তা বটে।"

গৌরী হাসিল না। কিন্তু স্বামীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া পূর্বের মতই কহিল, "এ যে উন্নতি তা তুমি অন্তত অস্বীকার করতে পারবে না। আর আমি জানি যে যোগেশবাবুর কাছে গিয়ে তুমি উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে সার্টিফিকেট দিবে।"

"কেন বলত?" অমল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল।

"বাঃ রে!" গৌরী কুটিল কটাক্ষে স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল, "এত লোক থাকতে তিনি তোমার কাছে ছুটে এসেছেন যাতে তার কলকাতায় থাকবার সুবিধা হয় তার ব্যবস্থা করে দিতে। এতে তোমার বুকের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠে নি?"

অমল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল, "ও, সেই কথা! তা ঈর্ষায় তোমার বুক জ্বলে যাচ্ছে বুঝি?"

হাসিমুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া গৌরী কহিল, "যাচ্ছে বই কি।"

অমল ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, তারপর গম্ভীরস্বরে কহিল, "সব দিক দিয়েই এ আমার মহাসমস্যা। আচ্ছা বলত গৌরী, কি আমার কর্তব্য?"

গৌরী সচকিতে স্বামীর মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিল, কতকটা অনুতপ্তর মত কহিল, "ওমা, এতেই তুমি সমস্যায় পড়ে গেলে?"

অমল অপ্রস্তুতের মত মুখ নত করিল। গৌরী সহজভাবে কহিল, "তোমার কর্তব্য খুব সহজ। যোগেশবাবুকে তুমি গিয়ে বলবে যে, তার পাগলামি আর চলবে না। একটি মেয়ের সারাটা জীবন ব্যর্থ করে দিবার অধিকার তাঁর নেই। দিদিকে তিনি ত্যাগ করতে পারবেন না। সহজ মানুষের মতই তাঁকে ঘর করতে হবে।"

অমল যোগেশের সঙ্গে দেখা করিয়া এই কথাটাই খুব জোর দিয়া বলিল। যোগেশ কিন্তু প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "এ হতে পারে না অমল। যার ভিত্তিই কাঁচা তার উপর স্থায়ী ইমারৎ গড়ে উঠতে পারে না।"

অমল উত্তর দিল, "দার্শনিকতা ছাড় যোগেশ। জীবনটা হাওয়া নয়, চাঁদের আলোও নয়। এ একটা বাস্তব জিনিষ। মাটির মানুষ মাটির পৃথিবীতে বাস করবে। দিনরাত দর্শন-শাস্ত্রের বুকনী আওড়ালে চলবে কেন?"

যোগেশ কহিল, "তোমার অভিযোগ অমূলক। শোভার সঙ্গে আমার কারবার ভাব জগতের নয় বলেই একত্র আমাদের থাকা চলে না। যে দুইজনের মধ্যে কোন জায়গাতেই মিল নেই, তারা বন্ধু হয়ত বা হতে পারে, কিন্তু স্বামী স্ত্রী নয়।"

"মিল নেই এই কথাটা গোড়াতেই যদি ধরে নেওয়া যায় তবে আর মিল কখনও হয় না, হতে পারেও না।" অমল ক্ষুন্নকণ্ঠে কহিল।

যোগেশ বিষন্নকণ্ঠে উত্তর দিল, "তোমার এ অভিযোগও অমূলক। আমাদের দুজনের মাঝেকার দূরত্ব ক্রমে বেড়েই চলছে এই আমাদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা।"

"তার কারণ?"

"কারণ বুঝতে পারছ না?" যোগেশ ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল; "একজন কেবলই মন, আর একজন বোধ করি কেবলই দেহ। দুজনেই চরম, দুজনেই হয়ত অস্বাভাবিক। এদের মিল কখনও হতে পারে না।"

"এসব তোমার কবিত্ব", অমল বিরক্তকণ্ঠে কহিল, "দেহ ছাড়া মন টিকতে পারে না, আর দেহ থাকলেই তাতে মন থাকে। অনুপাতের কম বেশী হয়ত হয়, তবু দুয়ের মধ্যে যতটুকুর সামঞ্জস্য পাওয়া যায় তার পরিমাণ যত কমই হউক না কেন, সংসারে বাস করতে গেলে তারই উপর মিলনের সৌধ খাড়া করতে হয়।"

যোগেশ কোন উত্তর করিল না, একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

ক্ষণকাল পর অমলই পুনরায় কহিল, "শোন যোগেশ, যুক্তি বা তর্ক দিয়ে এ সমস্যার মীমাংসা হয় না। এ জীবনের সমস্যা, এর সমাধান হতে পারে এক জীবনযাপনের ভিতর দিয়ে। তোমাকেও সেই পথেই এর সমাধানের চেষ্টা করতে হবে—পালালে চলবে না।"

ইহারও উত্তরে সম্মতি বা প্রতিবাদ কিছুই না জানাইয়া যোগেশ চুপ করিয়াই বসিয়া রহিল।

(১২)

অমলের যুক্তির কতখানি যে যোগেশ হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিল বলা যায় না, তবে বাহিরে দেখা গেল যে, কলিকাতার বাড়ি যেমন ছিল তেমনই রহিল এবং শোভাও ঐ বাড়ীতেই থাকিয়া গেল।

কেবল থাকিয়াই গেল না, থাকার সরল রেখার কোন জায়গাতেই ভবিষ্যতে যাহাতে ছেদ না পড়ে তাহারই উদ্দেশ্যে যোগেশের কাছে আপনাকে অপরিহার্য করিয়া তুলিবার জন্য সে রীতিমত তৎপর হইয়া উঠিল।

স্বামীকে সে স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিল যে সে আর পড়িবে না।

শুনিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিবার পর যোগেশ মৃদুস্বরে কহিল, "আমার মনে হয় যে লেখাপড়া না ছাড়াই তোমার উচিত। আর কিছুর জন্য না হউক, সময় কাটাবার জন্যও এর প্রয়োজন আছে।"

শোভা উত্তর দিল, "না নেই। যার স্বামী আছে তার কাজের অভাব হতে পারে না। তোমাকে ছেড়ে দেবী সরস্বতীর আরাধনা

যদি আমি করি তাতে দেবীকেও আমি পাব না, তোমাকেও হয়ত হারাব।"

যোগেশ সচকিত বিস্ময়ে একবার শোভার মুখের দিকে চাহিয়া পরক্ষণেই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল এবং অন্যদিকে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে কহিল, "এটা তোমার ভুল। আমার সেবা করবার জন্য তুমি অবসর সৃষ্টি করতে পার, কিন্তু তোমার সেবা নিবার অবসর আমার হবে না। আমার কাজ অনেক এবং তা ঘরের বাইরে।"

শোভা কহিল, "তোমার কাজ নয়, অকাজ। তার জন্য নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিনরাত তুমি পথে পথে ঘুরে বেড়াতে পাবে না।"

যোগেশ ঈষৎ বিরক্তকণ্ঠে কহিল, "আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াই না, যাদের কেবল পথই আছে ঘর নেই, তাদের প্রতি আমার যা কর্তব্য তাই পালন করি।"

শোভা স্বামীর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়াছিল, এইবার তাহার দুই চক্ষুর কোণে অশ্রুর সূক্ষ্ম কয়েকটি রেখা চিকচিক করিয়া উঠিল। সে গাঢ়স্বরে কহিল, "জগতে আর সকলের প্রতিই তোমার কর্তব্য আছে, কেবল আমারই প্রতি বুঝি তোমার কোন কর্তব্য নেই?"

যোগেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "আছে বই কি। সে কর্তব্য আমি পালন করছিও। তবে ভালবাসা আর এক জিনিষ—তা কর্তব্যবুদ্ধি থেকে আসে না।"

চক্ষু মুছিয়া শোভা কহিল, "আমার অদৃষ্ট! তবু শেষ পর্যন্ত-একে আমি দেখব, আর আমার যা কর্তব্য তাও আমি পালন করব।"

অথচ এই কর্তব্য পালনের নাম করিয়াই যোগেশের উপর শোভা এমনই কড়া শাসনের প্রবর্তন করিয়া বসিল যে, উহার চাপে যোগেশ রীতিমত হাপাইয়া উঠিল।

সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন যোগেশ বলিয়াই ফেলিল, "তোমার এত যত্ন আমার সইবে না শোভা। ছেলেবেলায় মা হারিয়েছি, বাবাও কোনদিন আমাকে যত্নও করেন নি, শাসনও করেন নি। আমি বেড়ে উঠেছি আমার নিজের মনে। নাওয়া, খাওয়া, শোয়া সম্বন্ধে আমার নিজের সুবিধা ছাড়া আর কিছুর কোন শাসন কোনদিন আমি মানি নি। আজ তোমার এত সব কড়া বাধা নিষেধ আমি মানতে পারব না।"

সত্য কথাটা সে অমলের কাছে ভাঙিয়া বলিল। কহিল, "প্রতিদানে কিছুই যাকে দিতে পারি না, তারই হাত থেকে অনবরত গ্রহণ করবার গ্লানি দুর্গন্ধি ক্লেদের মত আমার মন ও দেহের পরতে পরতে আটকে যাচ্ছে।"

"কি মুস্কিল!" অমল হতাশকণ্ঠে কহিল, "তোমার বিবেক যদি এত সূক্ষ্মই হয় তবে কিছু তাকে দিলেই ত সব ল্যাঠা চুকে যায়।"

যোগেশ ঘাড় নাড়িয়া গম্ভীরস্বরে কহিল, "তা হয় না অমল। আমি শোভাকে ভালবাসি না।"

অমল সহসা সম্মুখের দিকে ঈষৎ ঝুকিয়া পড়িয়া তীক্ষ্ম-দৃষ্টিতে যোগেশের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা যোগেশ, তোমার এই কথাটাই যে অসত্য হতে পারে তা কোনদিন তুমি ভেবে দেখেছ? ভেবে দেখেছ যে হয়ত বৌদিকে তুমি মনে মনে খুবই ভালবাস?"

যোগেশ নির্বাক বিস্ময়ে ক্ষণকাল অমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "চমৎকার! তোমার কল্পনাশক্তি আছে দেখতে পাচ্ছি।"

অমল হাসিল না, গম্ভীরস্বরে কহিল, "কল্পনা নয়। আমার কথাই যে খুব সম্ভব সত্য হয়ত একদিন তা তুমি বুঝতে পারবে।"

যোগেশ উত্তর দিল না, উপেক্ষার ভঙ্গীতে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চাহিয়া থাকিয়া অমলই পুনরায় কহিল, "দেখ যোগেশ, অলস মস্তিষ্ক সম্বন্ধে একটা যে পুরাতন প্রবাদ আছে তার সবটুকু না হলেও অনেকখানিই সত্য। তোমার বর্তমানের এই বেকার অবস্থা তোমার শারীরিক বা মানসিক কোন স্বাস্থ্যেরই অনুকূল নয়। তুমি যা হয় একটা কাজ খুঁজে নাও।"

যোগেশ সচকিতে ফিরিয়া চাহিয়া সাগ্রহকণ্ঠে কহিল, "ঠিক বলেছ অমল। কিন্তু কি কাজ করি বলত! রাজনীতি- বড়ই পানসে, বড়ই একঘেঁয়ে মনে হচ্ছে।"

"রাজনীতি ছাড়," অমল কহিল, "একটা সৎপরামর্শ দিতে চাই, নেবে?"

যোগেশ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে চাহিল। অমল কহিল, "তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র। এবার একটা ডক্টরেটের জন্য চেষ্টা কর না কেন!"

যোগেশের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে মৃদুস্বরে কহিল, "তোমার উপদেশ ভাল। আমি এ বিষয়ে ভেবে দেখব।"

দিনকয়েক পর একদিন রাত্রে আহারাদির পর যোগেশ নিজের বসিবার ঘরে বিশ্রাম করিতে বসিয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্য গ্রন্থাবলীর একখণ্ড পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া উহারই মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল। বাহিরে রাত্রি যে গভীর হইয়া উঠিতেছিল সে সম্বন্ধে তাহার কোন খেয়াল ছিল না এবং শুইবার ঘরে আর একজন যে একাকিনী তাহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া বসিয়া হয়ত ক্লান্ত না হয় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে সে কথাও সে ভুলিয়া গিয়াছিল। একটির পর একটি করিয়া অনেকগুলি কবিতা শেষ করিয়া উহারই রসোপলব্ধির প্রেরণায় অন্যমনস্কভাবে বাহিরের দিকে চাহিতে গিয়া সে সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল যে চৌকাঠে দুইখানি হাত রাখিয়া মুক্ত-দ্বারের ঠিক মাঝখানে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া শোভা একদৃষ্টে তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

যোগেশ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এ কি শোভা!"

শোভা অপ্রস্তুতের মত চৌকাঠ ছাড়িয়া দিয়া এক কোণে সংকুচিত হইয়া দাঁড়াইল। লজ্জিতকণ্ঠে কহিল, "অনেক রাত হয়েছে কি না, তাই একবার—"

দেওয়ালের বড় ঘড়িটির দিকে চাহিয়া যোগেশ দেখিল সত্যই রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে। সে ঈষৎ অনুতপ্তকণ্ঠে কহিল, "তাই ত, বড্ড দেরী হয়ে গেছে—পড়তে পড়তে কিছু খেয়ালই ছিল না। তা যাও তুমি, আমি আসছি।"

কিন্তু শোভা গেল না, যেখানে ছিল সেখানেই নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আধ আলো ও আধ ছায়ার আবরণের ভিতর শোভার ক্লান্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া যোগেশের বুকের মধ্যে কেমন যেন করিয়া উঠিল। সে স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "ভিতরে আসবে শোভা, এস।"

আবছায়া আলোকেও যোগেশের চোখে পড়িল যে শোভার মুখখানি দেখিতে দেখিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ধীর পদ-সঞ্চারে স্বামীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

যোগেশ পূর্বের মতই স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "বস।"

শোভা বসিলে সে মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছিলে ব'লত? আমার উপর খুব রাগ করছিলে বুঝি?

সলজ্জদৃষ্টিতে একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়াই শোভা দৃষ্টি নামাইয়া লইল, অভিমানের অথচ লঘুস্বরে কহিল, "রাগ করবার মত জোর যদি আমার থাকত তবে রাগ করতাম নিশ্চয়ই।

তা নেই বলেই কেবল দুঃখই করছিলাম। কিন্তু ওসব কথা থাক্। রাত অনেক হয়েছে, এখন শুতে চল।"

যোগেশ কহিল, "আমি নিরুপায়। তবে একথাও সত্য যে তোমার জন্য আমার দুঃখ হয়।"

"থাক্, আর দুঃখ করতে হবে না," বলিয়া শোভা চট্ করিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া যোগেশের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। কেদারার দুইখানি হাতার উপর দুই হাত রাখিয়া কণ্ঠস্বরে বেশ একটু আবদার ঢালিয়া দিয়া সে কহিল, "লক্ষ্মীটি, আর রাত জেগো না, অসুখ করবে।"
অসুখ করবে।"

যোগেশ ঘাড় ফিরাইয়া শোভার মুখ দেখিবার চেষ্টা করিল কিন্তু মুখ ভাল দেখা গেল না। ক্ষণকাল একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে কহিল, "একটা কবিতা পড়ি, শুনবে?"

শোভাও একটু ইতস্তত করিবার পরে উত্তর দিল, "ও কি আমি বুঝব?"

যোগেশ কহিল, "তুমি শোন, না বুঝলেও ভাল লাগবে।"

যোগেশ হাতের পুঁথিখানি খুলিল। বাহির হইল "বলাকা" কবিতা। যোগেশ সুর করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা—।' পড়িতে পড়িতে তাহার প্রাণের আনন্দ কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, মৃদু সসংকোচ কণ্ঠস্বর দেখিতে দেখিতে তারায় গিয়া উঠিল। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া কবিতাটির রসোপলব্ধি করিতে করিতে যোগেশ যখন উহা শেষ করিল তখন আনন্দে তাহার মুখ ও চোখ দুইটি দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ঘাড় ফিরাইয়া পুনরায় শোভার মুখ দেখিবার চেষ্টা করিয়া যোগেশ প্রত্যাশার কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন লাগল শোভা?"

"ছাই।" শোভা উত্তর দিল।

যোগেশের মুখের উপর কে যেন অকস্মাৎ এক ঘা চাবুক বসাইয়া দিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ নত করিল, কোন কথা কহিল না।

শোভা কেদারার হাতা ছাড়িয়া দুই বাহু দিয়া যোগেশের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "আর দেরী করো না গো, চল!

যোগেশ ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, "এই দেহটাই কি চিরদিন তোমার সর্ব্বস্ব হয়ে থাকবে? ওর উপরে কোনদিনই কি তুমি উঠতে পারবে না?"

শোভার গণ্ড যোগেশের মস্তক স্পর্শ করিল। শোভা পুনরায় কহিল, "চল।"

যোগেশ সশব্দে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল "চল"।

(ক্রমশ)

অসামাজিক

(৩৫৮ পৃষ্ঠার পর)

প্রতি চাহিয়াছিল। চোখাচোখি হইতেই কমলা লজ্জিত হইয়া মুখ নামাইয়া লইল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সুশ্রী মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার প্রতি সুব্রত মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া আবার বলিয়া চলিল, "বলা যায় না, হয়তো যদি আমাদের দেখা আর না হ'ত তাহ'লে হয়তো বা ভুলেই যেতাম। কিন্তু সেই জন্ম থেকেই ভগবান এ অভাগার পিছনে লেগেছেন। না হলে এই মেটারনিটি হোমের চাকরিই বা জুটবে কেন, আর আপনিই বা হবেন কেন এর লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। সবই পরীক্ষা আর কি! কিন্তু পরীক্ষায় আমি হেরে গেলাম। আপনার অসুখটা হওয়ার আগে পর্য্যন্ত তেমন কিছুই বুঝতে পারিনি, কিন্তু সেই যে আপনার দেখা-শোনা করতে শুরু করলাম, সেই সুযোগে আমার মনও আবার সিঁধকাঠি হাতে নিলে। তারপর দিনে দিনে অবস্থা আমার হ'য়ে উঠেছে শোচনীয়। এখন মনে হ'চ্ছে যে আপনার অভাবে আমার বাঁচাই অসম্ভব। তাই বলে তো আমি আপনার অপমান করতে পারি না। এসব কথার পর কাল আর আমি আপনাকে মুখও দেখাতে পারব না। এ দৃশ্যের যবনিকা-এখানেই পড়ুক। আপনি যা'তে এ না মনে করতে পারেন যে, আপনার সহায়হীনতার সুযোগ নিয়ে আমি আপনার প্রতি অত্যাচার করতে উদ্যত হয়েছি, তাই আজ রাত্রেই আমি এখান থেকে চ'লে যা'চ্ছি।"

সুব্রত তাহার বক্তব্য শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কমলা তখন দুই হাতের মধ্যে মাথাটা রাখিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। কেন, তাহা ঠিক বোঝা গেল না। একবার সেদিকে চাহিয়া সে কহিল, "আপনার মনে হয়তো যথেষ্টই ব্যথা দিলাম, কিন্তু আপনারই কথার ওপর নির্ভর ক'রে অনুরোধ করব—পারেন তো ক্ষমা করবেন। আচ্ছা, নমস্কার।"

বাষ্পজড়িতস্বরে শেষের কথা কয়টি বলিয়া সে দ্রুত পায়ে সিঁড়ির দিকে আগাইয়া গেল।

পরমুহূর্ত্তে কমলা তীব্র বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। চোখ মুখ তাহার ক্রন্দনক্লিষ্ট। তখনও সিঁড়িতে সুব্রতর পায়ের শব্দ মিলাইয়া যায় নাই। ছুটিয়া সিঁড়ির মুখে যাইয়া ব্যাকুলস্বরে কহিল, "শুনুন, দাঁড়ান, যাবেন না"—বলিতে বলিতে ছুটিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। সুব্রত তাহার আকুলস্বর শুনিয়া সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। কমলা একেবারে তাহার উপরে আসিয়া পড়িল। বহু কষ্টে সে টাল সামলাইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। দুর্ব্বল হৃদয়ে কমলা সে বেগ সহিতে পারিল না, জ্ঞান হারাইয়া সুব্রতর বুকের উপরেই এলাইয়া পড়িল।

দুই হাতে তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ লইয়া সুব্রত উপরে উঠিয়া আসিল। সোফার উপর তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া গ্লাসের জল তাহার মুখে চোখে ছিটাইয়া দিল এবং মাথার উপর ফ্যান চলিতে থাকিলেও, টেবিলের উপর হইতে ব্যস্ত-ভাবে খবরের কাগজখানা টানিয়া লইয়া কমলার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল।

বৈষ্ণব সাহিত্য

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

আপনারা আমাকে এই বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি-পদে বরণ করিয়া যে দায়িত্বের ভার আমার দুর্বল স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহাতে আমি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইতেছি। কারণ এইরূপ ধরণের সম্মেলন আমি যতদূর জানি—বঙ্গদেশে সম্পূর্ণ নূতন। বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের এই প্রাথমিক অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করিবার কোনও অধিকারই আমার নাই। তবে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবমাত্রেরই একমাত্র শরণ্য শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু; তিনি নিজেই এই সভার অধিনায়কতা করিবেন, ইহাই আমার ও আপনাদের আন্তরিক প্রার্থনা হউক। যিনি একদিন বৈষ্ণব সাহিত্য ও সংগীতের মধ্য দিয়া বাঙলা দেশের মরুসদৃশ মনোভূমিতে প্রেমের মন্দাকিনী বহাইয়াছিলেন, বাঙলা পদাবলীকে যিনি তপোবনের সামগণের পদবীতে উন্নীত করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই আমরা আজ স্মরণ করি, বন্দনা করি, তাঁহারই চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি।

নমোনমস্তেস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥

বৈষ্ণব সাহিত্য বলিতে কি বুঝি? প্রথমত সাহিত্য শব্দকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলে ধর্ম, দর্শন, কাব্য, ইতিহাস প্রভৃতি সমস্তই সাহিত্যের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে। 'বৈষ্ণব' কথাটির অর্থও খুব সুস্পষ্ট নহে। এই কথাটির নিরুক্তির গহনে প্রবেশ না করিলেও, আমার মনে হয় ইহা বঙ্গদেশে একটি বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমি তাহার সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে বোধ হয় তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বিষ্ণুরস্য দেবতা—পাণিনির এই অর্থ গ্রহণ করিলে বৈষ্ণব শব্দকে সঙ্কুচিত করা হয়। আমরা বৈষ্ণব কবিতায় অবশ্য সাধারণত শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা দেখিতে পাই। কিন্তু শাঙ্কর ভাষ্যে বা শঙ্কর-দিগ্বিজয়ে কোথায়ও কৃষ্ণোপাসনার কথা নাই। কিন্তু একটি মজার কথা এই যে, শঙ্করের জন্মভূমি কালাডীতে একটি পুরাতন কৃষ্ণ মন্দির আছে এবং প্রবাদ এই যে, সেই কৃষ্ণ-বিগ্রহ আদি শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত। রাধাকৃষ্ণোপাসনাকে বৈষ্ণব ধর্মের মর্মস্থল বলিয়া গ্রহণ করিলেও বৈষ্ণব শব্দের অর্থ-সঙ্কোচ হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাব্য ও কবিতা বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, এ সম্বন্ধে মতভেদ নাই। কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ শ্রীচৈতন্য-তত্ত্বকে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বেরই রূপান্তর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু রামায়ণ, রামরসায়ন প্রভৃতি কাব্যও যে বৈষ্ণব সাহিত্যেরই অন্তর্গত, ইহা অনেক সময়ে আমরা ভুলিয়া যাই। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অনেক সময়ে ভক্তি-প্রধান সাহিত্যকেই আমরা বৈষ্ণব সাহিত্য বলিয়া অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হই না। রামপ্রসাদের অমল ভক্তি-প্রবাহ পরিপ্লুত সংগীত কি বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিব? না, এগুলিকে তাহার বহির্ভূত বলিয়া গণনা করিব?

বাঙলার বৈষ্ণব সাহিত্য কতদিনের? এই সাহিত্যের মধ্যে কি একই ধারা প্রবাহিত হইয়াছে অথবা যুগে যুগে ইহার গতি পরিবর্তিত হইয়া তত্ত্বের গুরুত্ব ও সৌষ্ঠব বর্ধিত করিয়াছে? যাঁহারা মনে করেন যে, অনাদিকাল হইতে তত্ত্বসমূহ একইভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাঁহাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টি সংস্কারের দ্বারা বিকৃত হইয়াছে বলিতে হইবে। জয়দেব যখন তাঁহার গীত-গোবিন্দ গাহিয়াছিলেন, তখন শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয় নাই। তিনি যে সুরে গান গাহিয়াছিলেন, সে সুর হয়ত শ্রীচৈতন্যের পূর্ব যুগেই সম্ভব হইয়াছিল। মূর্তিমান শৃঙ্গার রসরূপে শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদন শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী যুগে আর সম্ভব হয় নাই। চণ্ডীদাসের পূর্বরাগে বা আক্ষেপানুরাগে প্রেমের যে রূপটি দেখিতে পাই, তাহা কি শ্রীচৈতন্যকে প্রেরণা দিয়াছিল অথবা শ্রীচৈতন্যই এই সকল পদের উপাদান যোগাইয়াছিলেন?

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়॥

ইহা চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের একটি প্রসিদ্ধ পদ। কিন্তু যখন দেখিতে পাই যে, শ্রীরূপ গোস্বামী এই একই ভাবের সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তখন আমাদের মনের সন্দেহ স্বভাবতই দোলায়িত হইয়া উঠে। শ্লোকটি এই—

ত্বমুদবসিতান্নিষ্ক্রামন্তী পুনঃ প্রবিশন্ত্যসৌ
ঝটিতি ঘটিকামধ্যে বারান্ শতং ব্রজসীমনি
অগণিত গুরুত্রাসাশ্বাসান্ বিমুচ্য বিমুচ্য কিং
ক্ষিপসি বহুশো নীপারণ্যে কিশোরি দৃশোর্দ্বয়ম্॥

উজ্জ্বলনীলমণি

অর্থাৎ হে কিশোরি! তুমি কেন ঘটিকার মধ্যে শতবার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্রজসীমায় গমন করত তথা হইতে পুনরা-গমন করিতেছ? কেনই বা অগণিত গুরুতর ত্রাসহেতু নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কদম্ব কাননের দিকে দৃষ্টিদ্বয় নিক্ষেপ করিতেছ?

দুইজন কবির মধ্যে সাদৃশ্য দেখিলে একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত, এইরূপ অনুমান সচরাচর সিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু কে কাহার দ্বারা প্রভাবিত তাহা বলা যায় কিরূপে? রূপ গোস্বামী পূর্বরাগ প্রকরণে লালসার উদাহরণ স্বরূপ এই শ্লোকটি দিয়াছেন। এমন হইতে পারে যে, বাঙালী কবি চণ্ডীদাসের সংগীতটি তিনি সংস্কৃত আকারে রূপান্তরিত করিয়া অলঙ্কারের উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। বাঙলা কবিতাটি সংস্কৃতের অপেক্ষা অধিকতর লালিত্যপূর্ণ, ইহা হইতে এরূপ অনুমান অসংগত নয় যে, রূপ গোস্বামী চণ্ডীদাসের ভাব গ্রহণ করিয়া শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের প্রসিদ্ধ অমর কবিতা 'কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' দেখিয়াও কেহ কেহ মনে করেন যে, শ্রীরূপ গোস্বামীর 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে' এই শ্লোকটির ছায়া পড়িয়াছে ঐ গীতে। যদি বস্তুত তাহা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কনে করিতে হয় যে, অনুকরণ আসলের অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে। আমি শ্রীরূপ গোস্বামীর অলোকসামান্য প্রতিভার মর্যাদা লঙ্ঘন করিতেছি না। 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী' অপূর্ব; 'সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম' স্বর্গীয়। এইরূপ ভাবে যদি আমরা দুইটি শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে সাদৃশ্য দেখি, তাহা হইলে কোন কবি পূর্ববর্তী এবং কোন কবি পরবর্তী ইহা বলিতে যাওয়া অত্যন্ত দুঃসাহসের কার্য নহে কি?

বিদ্যাপতির কবিতা প্রেমের কবিতা—ইহাতে রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ অল্পই আছে, এমন একটা সমালোচনা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একবার করিয়াছিলেন। বস্তুত এই সমালোচনার মূলে কতখানি সত্য আছে, তাহা বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখা উচিত। জয়দেবের আদিরসাত্মক কাব্যে এবং বিদ্যাপতি প্রেম কবিতায় বৈষ্ণব ভাব তাদৃশ নাই, এরূপ সুলভ সমালোচনা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জয়দেব যে শুধু আদিরস লইয়াই মাতিয়া ছিলেন না, তিনি যে অপূর্ব কৌশলে অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত শৃঙ্গার রসের মধ্য দিয়া ভক্তিরসেরও প্রবাহ বহাইয়াছিলেন, এ সংবাদ না রাখিলে চলিবে কেন? শাস্ত্রী মহাশয় যখন বলিলেন যে, বিদ্যাপতি বৈষ্ণব ছিলেন না, তিনি

রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, যেহেতু প্রেমের গান গাহিতে গেলেই লোকে রাধাকৃষ্ণের গান গায়, তখন বলিতে হয় যে, তিনি বিদ্যাপতির কবিতার প্রতি সুবিচার করেন নাই। বিদ্যাপতির কবিতায় ভক্তির কথা ত আছেই, তা ছাড়া এমন কথা আছে, যাহা অন্য কোনও বৈষ্ণব কবির মধ্যে নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্ভুজ বলিয়া বর্ণনা করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। প্রথম মিলনে শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত সর্বতোভাবে একাত্মতা উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন—

একে গহ চিকুর দোসরে গহ গীম।
তেসরে চিবুক চউঠে কুচসীম॥

এক হস্তে কেশরাশি, দ্বিতীয় হস্তে গ্রীবা, তৃতীয় হস্তে চিবুক ও চতুর্থ হস্তে কুচসীমা গ্রহণ করিলেন।

অনুভব ঐসন মদন ভুজঙ্গম
হৃদয় হমর গেল ডসিয়া
নন্দ নন্দন তুয় শরণ ন ত্যাগব
বলু জগ হোয় দুরজসিয়া॥

অথবা

তোহর সরিস এক তোহ মাধব
মন হোইছ অনুমানে।
সজ্জন জন সেঁ নেহ কঠিন থিক
কবি বিদ্যাপতি ভানে॥

অথবা

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।—

ইত্যাদি

বিদ্যাপতি হইতে আরও অনেক পদ উদ্ধার করিতে পারা যায়, যাহা হইতে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, তিনি সত্যই একজন মহাজন কবি।

মহাজন কথাটি বৈষ্ণব কবিদের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত দেখিতে পাই। সুতরাং মহাজনের কোনও ব্যাপক অর্থ থাকিলেও, ভক্ত বৈষ্ণব পদকর্তা অর্থে ইহা আমাদের বাঙলা সাহিত্যে প্রায় রূঢ়ী হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব হইলেই মহাজন পদবাচ্য হয়েন না; কবিও নয়। সকল বৈষ্ণব কবিকেও মহাজন সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস প্রভৃতি পদকর্তাকে যখন মহাজনের গৌরব প্রদান করা হয়, তখন আমরা নিশ্চয়ই ইহা মনে করিয়া থাকি যে, যে অর্থে মহাপ্রভুর পরবর্তী বৈষ্ণব মহাজন কবিরা পদকর্তা, সেই অর্থে বিদ্যাপতি চন্ডীদাসও মহাজন। কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা এমন মনে করি না যে, চৈতন্য পূর্ববর্তী ভাবধারায় পুষ্ট চন্ডীদাস বিদ্যাপতি ও গুণরাজ খাঁ প্রভৃতি এবং পরবর্তী মহাজনদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে কোনও পার্থক্যই নাই। হইতে পারে যে, পূর্ববর্তী মহাজনদিগের ভাবধারা পরবর্তীগণ সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন; তাহা হইলেও ইহা কখনও প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না যে, পরবর্তী যুগ পূর্বেকার যুগের হুবহু অনুকরণ। সুতরাং বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক যে, পূর্ববর্তী মহাজনগণের ভাবধারা হইতে পরবর্তী কবিদিগের পরিণতি কিভাবে সংসাধিত হইয়াছিল। এ ভাবের আলোচনা যে হয় নাই, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। আমরা এতদিন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি এবং যেখানেই সামঞ্জস্য পাইয়াছি, সেখানেই গম্ভীরভাবে ঐতিহাসিক সাজিয়া পৌর্বাপর্য স্থির করিতে লাগিয়া গিয়াছি। বলাবাহুল্য, ইহা ইতিহাস ত হয়ই নাই, লাভ হইয়াছে শুধু বিড়ম্বনা।

এইমাত্র বলিয়াছি যে, চন্ডীদাস-বিদ্যাপতি হইতে আমরা যে কবিতা পাইয়াছি, তাহার নাম পদাবলী। এই শব্দটিও জয়দেব হইতে যোগরূঢ় হইয়াছে। জয়দেব গীতগোবিন্দে কি অর্থে পদাবলী শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা জানি না। গীত-গোবিন্দের সবই গীত নয় এবং সমস্তটাই পদাবলী নহে, যদিও তিনি তাঁহার সমগ্র গ্রন্থখানিকে অথবা তদন্তর্গত সমস্ত কবিতাকেই হয়ত পদাবলী বলিয়াছিলেন। আমরা পদ বলিতে পয়ার বা ত্রিপদী বুঝি না, আমরা বুঝি সেই সকল বৈষ্ণব কবিতা, যাহা গান করা যায়। এই হিসাবে মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা পদাবলী নহে। বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাই একটি আকস্মিক, অবান্তর এবং আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, ইহার সবগুলি কবিতাই গীত। এই গীতের মধ্যেই বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছন্দগুলি মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই ফলে বৈষ্ণব কবিতার মত শ্রুতিমধুর, লালিত্যপূর্ণ কবিতা পৃথিবীতে আর কোথায়ও নাই। সে কি এক যুগ গিয়াছে, যখন সংগীতে প্রাণ মাতিয়া উঠিত এবং কবিতা রচিত হইত সুরে। সুর আগে কি কথা আগে জুটিত, ইহাও এক পরম রহস্য। আমার মনে হয় যুগপৎ ভাব ও ভাষা এবং সুর ও ছন্দ বৈষ্ণব কবিদের হৃদয়ের কুঞ্জদ্বারে আসিয়া দেখা দিত। তাঁহারা নির্জনে বসিয়া সুরের সূক্ষ্ম চীনাংশুকের উপর শলমা-চুমকি বসাইয়া যাইতেন।

অঙ্গদ বলয়া হারমণিকুণ্ডল
চরণে নূপুর কটি কিঙ্কিনী কলনা।
অভরণ বরণ কিরণে অঙ্গ ঢর ঢর
কালিন্দী জলে যৈছে চাঁদ কি চলনা॥

শ্রীকৃষ্ণের দেহে স্বর্ণের নানা অলঙ্কার ঝিকমিক করিতেছে, মনে হইতেছে যমুনার নীল জলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে যেন চাঁদ ভাসিয়া যাইতেছে। এ ছন্দের অনুকরণ আজও হইয়াছে কি না সন্দেহ।

বৈষ্ণব কবিতার যুগ অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। মহাজনের পদরেণুপূত বঙ্গভূমিতে শ্রেষ্ঠ কবির আবির্ভাব সম্ভব, কিন্তু মহাজনদের পুনরাগমন আর সম্ভব নহে। সে স্বপ্নও নাই, সে প্রাণও নাই, সে সুরও নাই। যেদিন বাতাস গীতি গন্ধে ভরা ছিল, প্রাণ প্রেমের পরশে সরস হইয়াছিল, পল্লীতে পল্লীতে কীর্তনের রোল উঠিয়াছিল, সংসারের শত জ্বালা যেদিন ভক্তির প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছিল, আধিব্যাধিযম-যন্ত্রণা যেদিন নগর সংকীর্তনের উদ্দন্ড নৃত্যে দূরাতিদূরে প্রয়াণ করিত, সেইদিন বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে এক যুগান্তর ঘটিয়াছিল, আর তেমন হয় না।*

---

*বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের মূলে সভাপতির অভিভাষণ।

গোড়াকার ত্রুটি *

আজ বাঙলা দেশে বড়ই দুর্দিন দেখা দিয়াছে। বাঙলার সম্মুখে সুস্পষ্ট কোন আদর্শ নাই। সমগ্র বাঙালী জাতি যেন স্রোতের সেহলার মত ভাসিয়া চলিয়াছে। এমন কোন রসবস্তুর আকর্ষণ এ জাতি পাইতেছে না, যাহা তাহাকে বৃহতের মধ্যে নিষ্ঠিত করিতে পারে। ভেদ-বিভেদ এবং স্বার্থ-সংকীর্ণতার তপ্ত, তীব্র এবং তীক্ষ্ম আঘাতে জাতীয় জীবন ছিন্নভিন্ন হইতে বসিয়াছে। সংকীর্ণ, শুষ্ক এবং নীরস দৈন্যময় জীবনের এই বিড়ম্বনা হইতে উদ্ধার পাইবার পথ কি? আমরা এইটুকু বুঝিয়াছি যে, সাহিত্যই এই সংকটে বাঙালী জাতিকে একমাত্র রক্ষা করিতে পারে। যদি বাঙালীর কিছু গর্ব করিবার থাকে,— আছে তাহার এই সাহিত্য। সাহিত্যই বাঙালীর সমাজদেহে সঞ্জীবন-রস সঞ্চার করিয়া আজ ভেদ-বিভেদ এবং সকল সংকীর্ণতার সংকট হইতে তাহাকে সত্যকার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ।

সাহিত্যের ধর্ম কি, স্বরূপ কি, সাহিত্য সাধনার পথ কি, এ সম্বন্ধে আমাদের বেদবিদ্ ঋষিগণ এই কথা বলিয়াছেন যে, যজ্ঞ হইতেই সাহিত্যের উদ্ভব হইয়া থাকে। যজ্ঞের পথই সাহিত্যের পথ এবং যজ্ঞ হইলেন বিষ্ণু; সুতরাং সাহিত্যিকতার অর্থই যে বৈষ্ণবতা সামান্য একটু ব্যাপকভাবে শব্দটিকে গ্রহণ করিলেই একথা বলা যায়। বাঙালী জাতির সাহিত্যিকতার মূল খুঁজিলেও পাওয়া যাইবে তাহার এই বৈষ্ণবতাকে।

গৌড়মণ্ডল ভূমি, এ ভূমি পুণ্যভূমি। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই পুণ্যভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া ঘরে ঘরে হরিনাম বিতরণ করিয়াছেন। গৌরচন্দ্রের এই যে উদয়—করুণা-কিরণ-প্রকাশে মহাপ্রভুর এই যে প্রকট লীলা, ইহা তো যেখানে সেখানে হয় না! গৌড়ভূমি এজন্য তপস্যা করিয়াছিল অনেক। রস মাধুর্যময় প্রেমের বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল বাঙালী প্রেমের প্রয়োজনকে একান্তরূপে উপলব্ধি করিয়াছিল বলিয়াই; বহুযুগ ধরিয়া বিচিত্র ছন্দে বাঙলার সংস্কৃতির ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল সেজন্য আকুতি। 'বৈষ্ণব চিনিতে নারে বেদের শকতি'— বাঙলার সেই বৈষ্ণবমণ্ডলের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য হয়ত ঐতিহাসিকদের এখনও হয় নাই। মহাপ্রভুর আবির্ভাব একান্ত আকস্মিকভাবে এখানে হয় নাই; বাঙলার সংস্কৃতি বৈষ্ণবভাবে প্রভাবিত বলিয়াই মহাভাবের শতদল এখানে বিকশিত হইয়াছিল এবং তাহার অপূর্ব সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাঙালীর সমাজে সর্বতোভাবে ঘটাইয়াছিল রসের একটা উজ্জীবন।

উত্তর ও দক্ষিণ, দুই দিককার বৈষ্ণব ভাবধারার সংযোগ ঘটিয়াছিল ভাগীরথীরই তটভূমি উপগাঙ্গ প্রদেশ এই বাঙলাতে। একদিন বাঙলার এই প্রাণ-পরিচয় করিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু। তিনি বাঙলার সংস্কৃতিরমূলে এই বৈষ্ণব রস-সংসৃতি কেমন করিয়া অখণ্ড ভারতের একাত্মতার সূত্রে বহিতেছে সেইটি ধরাইয়া দিলেন। বাঙালী জাতি আপনাকে পাইল; পাইল তাহার আত্মাকে মহাপ্রভুর এই প্রেম লীলায়। আত্মাকে পাওয়াতেই অভয়ত্ব এবং আনন্দ; জীবনের উৎস আছে সেইখানে। সাহিত্যেরও উদ্ভব হয় সেই নিরপেক্ষ এবং একান্ত আনন্দের উৎসমূল হইতেই।

প্রকৃত সাহিত্যের সাধনা করিতে হইলে বাঙালীকে তাহার সেই সংস্কৃতির মূলশক্তি বৈষ্ণবতার দিকে যাইতে হইবে। পরানুকরণের পথে নহে, আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া তাহাকে আগাইতে হইবে। সাহিত্যের প্রকৃত শক্তি হইল ভাব। পরের অনুকরণ করার ক্ষেত্রে ভাব নাই, আছে দৈন্য। দৈন্যময় জীবন যেখানে যোগ সেখানে নাই। আপনাকে একেবারে উন্মুক্ত করিবার সামর্থ্য এবং স্বাচ্ছন্দ্য নাই সেখানে। সাহিত্যের সার্থকতা নিজকে গুটাইয়া রাখাতে নয়, ব্যাপ্তি-রসাশ্রয়ে নিজকে নিমগ্ন করাতেই সাহিত্যের সার্থকতা। এই সাহিত্য বৈষ্ণবী শক্তি-সমন্বিত এবং অনন্তবীর্য, সকলকে সে আপ্যায়ন করিয়া অবীর্য হইতে উদ্ধার করে।

বৈষ্ণব-পদাবলীর যুগের মধ্যেই বৈষ্ণব-সাহিত্যের যুগ নিবন্ধ নহে। বাঙলার প্রকৃত সাহিত্য বৈষ্ণব সংস্কৃতিকে আশ্রয় করিয়াই রসপুষ্টিতে প্রবাহিত হইয়াছে। বহিরঙ্গের ভাষাগত প্রতীয়মান বিভিন্নতার তলদেশ দিয়া এই সাহিত্যের মনোগতি অবিচ্ছিন্নভাবে বহিতেছে একের দিকে এবং এক এই বৈষ্ণবতার রস-প্রেরণাতেই। ভেদ-বিভেদকে অতিক্রম করিয়া বৃহতের সেবার আদর্শের মধ্যেই পাইয়াছে সে অনুধ্যান। যাঁহাদের সাধনায় বাঙলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে তাঁহাদের সকলকেই এই অনুধ্যানের রাজ্যে যাইতে হইয়াছে, মনকে প্রত্যক্ষ রস বিগ্রহের সঙ্গে যুক্ত করিতে হইয়াছে। মানুষের মধ্যে তাঁহারা দেখিয়াছেন নর-নারায়ণকে উপাধি এবং ঐশ্বর্যগত বিভেদকে অতিক্রম করিয়া।

দুঃখের বিষয়, আপনাকে বহুর মধ্যে মিলাইবার যে ছন্দ বা সুর বাঙলা সাহিত্যে তাহা দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। সে ক্ষেত্রে স্পষ্ট হইয়া পড়িতেছে একটা গণ্ডীঘেঁষা পাণ্ডিত্যাভিমানের আড়ষ্টতা। জন-সাহিত্য, গণ-সংস্কৃতি প্রভৃতির নামেই আবার এসব অনেক ক্ষেত্র হইতেছে। সাহিত্যের সঙ্গে গণ-চিত্তের সংযোগ ঘটিতেছে না। ত্রুটি হইতেছে কোথায়? বৈষ্ণবতার অভাবজনিতই এ ত্রুটি; অন্য ভাষায়, যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি পরকে আপন করিয়া দেখে এবং সেই দর্শনের ফলে অনুকৃতির আড়ম্বর ছাড়াইয়া অহংকারকে ভুলাইয়া আত্মনিবেদন একান্ত করিয়া তুলে, অভাব ঘটিতেছে তাহারই। অনুকৃতির এই মোহ সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে আসিয়া পড়া সত্ত্বেও বাঙলার আধুনিক গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে দৈন্যটা এতটা দুঃসহ হইয়া উঠে নাই যতটা হইয়াছে কবিতার ক্ষেত্রে। গদ্য সাহিত্যের লেখকদের মধ্যে বাঙলা দেশে এমন কয়েকজন লেখককে দেখা যাইতেছে যাঁহাদের সাধনায় বাঙলা দেশ সত্যই গর্ব অনুভব করিতে পারে। ইঁহারা জন্ম, ঐশ্বর্য এবং শ্রুত ও শ্রীর আবরণকে উন্মুক্ত করিয়া সহজ মানুষের মর্যাদাকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। ইঁহাদের অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা আছে; এবং আছে সত্যোপলব্ধি, এজন্যই ইঁহাদের সাধনা বাঙলা সাহিত্যের গতিবেগকে বাড়াইয়া দিয়াছে। প্রবৃত্তিকে ইঁহারা প্রণোদিত করিতেছেন সমবেদনা এবং সহানুভূতিকে উদ্দীপ্ত করিয়া ও পরকে আপনার করিবার প্রেরণা এবং সেজন্য একটা স্পৃহা ইঁহারা জাগাইতেছেন, ইহাও স্বীকার করিতেই হয়। এই সাধনায় নিষ্ঠা ও গভীরতা যদি আরও বাড়ে তবে বৈষ্ণবতার রসে সাহিত্য-সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। বঙ্গ-বাণীর মন্দিরে জাগিবেন সর্বভূতে যিনি রহিয়াছেন তিনি আপনার মাধুর্য-মহিমায় এবং জাতি আবার পাইবে তাহার আত্মাকে। সৃষ্টি হইবে তখন সেই সাহিত্যের যে সাহিত্যে প্রেমের দৃষ্টি প্রগাঢ়; এবং লীলার তখন স্ফুরণ হইবে; আলোচনা পাইবে প্রত্যক্ষতার অবলম্বন। অবিতর্কতার অমোঘ বল। কিন্তু বাঙলা দেশে কবির বীণায় সুর আর তেমন করিয়া বাজে না, ঝংকার উঠে না; অতি আধুনিক বাঙলা কবিতার যে রাজ্য সেখানে আত্মানুভূতি একেবারেই নাই। ছন্দ নাই সুতরাং সংযোগও নাই, এবং সংযোগ যেখানে নাই সেখানে ভাব আছে ইহাও বা কেমন করিয়া বলিব? বড় বড় পণ্ডিতের পক্ষেও আধুনিক কবিতার কথার অর্থ উপলব্ধি করা যখন কঠিন হয়, তখন সাধারণে

কি বুঝিবে, পাইবে তাঁহাতে কি রস, এবং দেশে দীন-নারায়ণের সেবা না হয় যে বস্তুতে, সে বস্তুর বেসাতিতে সাহিত্যের সত্যকার পুষ্টি কখনই ঘটিতে পারে না। কৃত্রিম আন্তরিকতাহীন এই যে উপচার বাণীর বেদীমূলে ইহা গ্রাহ্য হয় না। সাহিত্যিক দেশের এবং সমাজের কল্যাণকামী আপনারা সুধিজন, সাহিত্যে প্রকৃত বৈষ্ণবতার সম্প্রসারণ করিয়া এই সংকট হইতে বাঙালী জাতিকে রক্ষা করুন।

এতো গেল সৃষ্টিমূলক যে সাহিত্য সেই রাজ্যের কথা। সাহিত্যকতার আবহাওয়ায় সৃষ্টি করিতে হইলে বৈষ্ণব দর্শনের অনুশীলনের দিকে আপনাদের দৃষ্টি যাহাতে আকৃষ্ট হয়, সেজন্য কিছু নিবেদন করা দরকার। বাহ্য অনুষ্ঠানের আড়ম্বর সমাজ দেহে একান্ত হইয়া পড়িয়াছে; অন্তর্দৃষ্টির অভাব চারিদিকে। বৈষ্ণবতার সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে মনন; মনন যদি শুদ্ধ হয় এবং সুনিশ্চিত হয় তাহা হইলে সৃষ্টি হয় সজীব ও সুন্দর এবং সার্থক। মননকে গভীর করিলে তবে ব্যাপ্তির মধ্যে আনন্দসত্তাকে উপলব্ধি করা যায় এবং চিন্তা শক্তির স্ফুরণ ঘটে।

বৈষ্ণবতার নামে চলিতেছে অবৈষ্ণবতা, বাহিরের নিতান্ত লোকদেখান কতকগুলি অনুষ্ঠান, বড় জোর সাময়িক নিতান্ত দুর্বল ভাবাবেগ বৈষ্ণবতা বলিয়া গণ্য হইতে বসিয়াছে। প্রমাদ, আলস্য এবং কর্মবিমুখ কূপমণ্ডুকত্ব বৈষ্ণবতার উদার আদর্শকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে বসিয়াছে। সর্বভূতে শ্রীবিষ্ণু আছেন, বৈষ্ণব দর্শনের এই উপলব্ধির যে সর্বভৌমিকতা তাহার স্থলে আসিয়া জুটিতেছে সাম্প্রদায়িকতা, ঘৃণা এবং ভেদদৃষ্টি। সেবাই বৈষ্ণব ধর্মের শেষ কথা;—সেবা সাধকরূপেন সিদ্ধিরূপেন চাত্রহি। সাধক রূপে এবং সিদ্ধ রূপেও এই বিশ্ব জগতের সেবা করিতে হইবে। বৈষ্ণব জগতকে উপেক্ষা করিতে চায় না, সত্য-ভাবে পাইতে চায়, পাইতে চায় আপনার করিয়া এবং সে করিতে চায় আত্মনিবেদন। জন্ম সার্থক কর করি পর উপকার—এ বাণী মহা-প্রভুরই বাণী; কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের নামে এই বাণী হইতেছে উপে-ক্ষিত। দেশের সেবা, জাতির সেবা, সমাজের সেবা বৈষ্ণবের পক্ষে যেন এ সব কিছু কর্তব্য নয়, এমন একটা ধারণা প্রসার লাভ করিয়াছে। মানুষের সেবা যেখানে নাই, সেখানে বৈষ্ণবতা নাই, মানুষের সেবাই বড়—পরমাধনং তদ্ধি পুরুষস্যাখিলাত্মনঃ, ইহাই ভাগবতের বাণী। কিন্তু ব্যাখ্যা ইহার অনেক রকম বড় বড় কথাতে হইতেছে। অন্য কর্ম ছাড়িয়া হরিনাম করিলেই সব হয়। হয়ত বুঝি, কে তাহা অস্বীকার করিবে; কিন্তু নামের ভিতর একান্ত আশ্রয় পাইতেছে কয়জনে? একান্ত আশ্রয় পাইলেও মুক্ত হইলেও ইচ্ছাপূর্বক দেহধারণ করিয়া সর্বভূতস্থ ভগবান বাসুদেবের সেবাই যে বৈষ্ণব চাহেন, এ সত্যকে সুবিধা মত এড়াইয়া চলিতে চাই বৈরাগ্যের দোহাই দিয়া। নামের মধ্যে যে সম্বল পায় কৃত্য তাহার থাকে না, এক বিষয়ে বলা যায়, ইহা না বুঝি এমন নয়; কিন্তু কৃত্য তো এড়াইতে পারিতেছি না, কর্ম করিতেছি সেবা বাদে অন্য সবদিকে। সেবার প্রয়োজন পড়িলেই সংকীর্ণতা বা ভীরুতা বশত আসে যে সংকোচ তাহাকেই জড়াইয়া ধরিতেছি এবং বৈষ্ণবোচিত মহাপ্রাণতার মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করিতেছি মিথ্যাচারে। অন্তর সাধনার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরেও আবশ্যক সেবামূলক ধৃতি এবং উৎসাহ সমন্বিত অনলস কর্মসাধনার। সে বস্তুর অভাব ঘটিয়াছে সমাজে, স্বার্থের ঘুণ জীর্ণ করিতেছে সমাজ জীবন। কামাদেব কালিনূনাং, কামপ্রবৃত্তি যেখানে ভেদ-বিরোধ সেখানে দেখা দিবেই। প্রকৃত বৈষ্ণবতার অভাবে প্রাণধর্ম হইতে জাতি বঞ্চিত হইতে বসিয়াছে। ক্ষীণপ্রাণ সমাজদেহে রাজনীতির কোন ইন-জেকশনই কাজে আসিতেছে না—দুই দিনের উদ্দীপনার আগুন, দুই দিনের জন্য দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেও নিভিয়া যাইতেছে; নেতাইয়া পড়িতেছে সকল উদ্যম। মহাবল যে প্রেম, অভাব তাহার এবং প্রেমই বৈষ্ণবধর্মের সারতত্ত্ব সুতরাং এই অবস্থার প্রতীকার করিতে হইলে বৈষ্ণব দর্শনের অনুশীলন-প্রবৃত্তি জাগাইয়া তোলা আবশ্যক; এবং সেই আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াই সম্মেলনের উদ্যোক্তৃগণ সাহিত্য এবং তৎ-সংশ্লিষ্ট কাব্যশাখার সঙ্গে বৈষ্ণব দর্শনের আলোচনার জন্যও একটি শাখার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন। বাঙলা দেশে বৈষ্ণব দর্শনের অনুশীলন যে উপযুক্তভাবে হইতেছে না, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ কোন উদ্যম এ পর্যন্ত প্রদর্শন করেন নাই। অবশ্য এতদিনে এদিকে কিছু হইয়াছে, কিন্তু তাহা যে উপযুক্ত নয় একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। গোড়ীয় বৈষ্ণব মহাজন এবং উপদেষ্টাগণের পুস্তকাদির আলোচনা এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বলিতে গেলে একেবারেই হয় না। হইবে বলিলে আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না, হওয়া দেখিতে চাই; কারণ জাতির এ প্রয়োজনকে গৌণ মনে করিতে পারিতেছি না। এ সম্বন্ধে স্যার আশুতোষের অনেক আশা অন্তরে ছিল আমরা জানি; কর্মপ্রণালীও তিনি কিছু কিছু দিয়া গিয়াছেন। আমরা তাহা কার্যে পরিণত দেখিতে চাই। প্রচারের অভাবে বাঙলার সেই সব অপূর্ব সম্পদ অতীতের অন্ধকারে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। বৈষ্ণব গ্রন্থগুলি দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। বাঙালীর নিজের ঘরে এত বড় জিনিস রহিয়াছে অথচ বাঙালী তাহা জানে না, বুঝে না। কত বড় এ দুঃখের কথা! আমরা পাশ্চাত্য দার্শনিকদের পূজায় বিভোর হইয়া আছি; আপত্তি তাহাতে নাই; কিন্তু ঘরের সম্পদের ওজন যে বুঝিতেছি না, বেদনা এইখানেই। আপনাকে যে হারাইয়াছে, সে হারায় সকলই। সে পরিণত হয় পশুতে। এই অধোগতি আপনাদিগকে রুদ্ধ করিতে হইবে। আপনাদের প্রচেষ্টায় বৈষ্ণব দার্শনিকতার উদ্বোধন বাঙলা দেশে আবার হউক, এই একান্ত কামনা অন্তরে লইয়া আজ কৃতাঞ্জলীপুটে আপনাদের কাছে অগ্রসর হইয়াছি। বাঙলা দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রেও ভেদনীতি ঢুকাইবার চেষ্টা হইতেছে। এ আক্রমণ বাঙালীর সংস্কৃতির উপর। আমরা এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারি না। অনিষ্টকর প্রচেষ্টাকে রুদ্ধ করিতে হইবে। বৈষ্ণব ভেদ-বিভেদ স্বীকার করে না। সে চায় সকলকে ভালবাসিতে। ছেলেদের অন্তরে এই অসাম্প্রদায়িক উদার আদর্শের সম্প্রসারণ করিয়া বাঙলার বিশিষ্ট সংস্কৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকাদিতে বৈষ্ণবতামূলক লেখা, বৈষ্ণব সাধকদের জীবনী এইগুলি যাহাতে বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করে, সেদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে।

আদর্শ কঠোর এবং অন্তরায় সামান্য নহে। সে পক্ষে আমাদের দুর্বলতা অসামান্য এবং সেই দুর্বলতা আমাদিগকে অভিভূত করিতেছে; তবু আমরা হতাশ হই নাই। কারণ, আমাদের বিশ্বাস আছে এই যে, পরানুকরণ স্পৃহা সাময়িকভাবে যতই বড় হইয়া উঠুক না কেন, বাঙালী তাহার স্বভাবকে এবং স্বভাবানুবন্ধী যে বৈষ্ণব সংস্কৃতি তাহাকে পরিহার করিতে পারিবে না। বাঙলা দেশ আবার জাগিবে এবং তাহার প্রেমের অবদানে জগতকে সমৃদ্ধ করিবে। আপনাদের উপদেশের আলোক এবং অনুভবজনিত যে বিশিষ্ট জ্ঞান তাহার উদ্দীপনায় অবিদ্যা এবং অজ্ঞানতা দূরীভূত হউক, বঙ্গ-ভারতীর সাধন-ভজন মার্জিত হউক, এই প্রার্থনা নিবেদন করিয়া ভদ্রমহোদয়গণ, অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে পুনর্বার অভিনন্দিত করিতেছি।

* বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বরূপে 'দেশ' সম্পাদকের অভিভাষণ।

পদধ্বনি

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্তব্ধ ও নির্জন প্রকাণ্ড বাড়িটাকে মোটেই আজকাল আর ভয় করে না, অসীমা দেবী সরাসরি লাইব্রেরী ঘরটায় ঢুকে গেলেন। টেবিলটার ওপর কতগুলি বই ছড়ানো রয়েছে, একপাশে খাতা, কলম আর পেন্সিল। কিন্তু ঘরে কেউ-ই নেই। হাতের ব্যাগটা টেবিলে রেখে 'কলিং বেল'টা টিপে দিলেন। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল, কিন্তু বিজলী নয়—এলো একটা চাকর।

—একটু বসতে বললেন আপনাকে, দিদিমণি চা খেয়ে এক্ষুণি আস্‌ছেন।"

"আচ্ছা।"

অসীমাদেবী বস্‌লেন। ঢং ঢং ক'রে ছ'টা বেজে গেল। বিজলীর বইগুলি টেবিলে ছড়ানো রয়েছে, একখানা বই তুলে নিলেন তিনি। চিরপরিচিত ভুগোলখানা,—স্কুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমন কি প্রাইভেট্‌ ট্যুইশানীতে এসেও বইখানা ওঁকে নিস্তার দেয় না,—শিক্ষয়িত্রী জীবনে প্রবেশ ক'রে সারা পৃথিবীর খবর ওঁকে কণ্ঠস্থ রাখ্‌তে হয়, কল্‌কাতার এক ক্ষুদ্র হোস্টেলে আশ্রয় নিয়ে। পাতা ওলটাতে লাগলেন তিনি। বোস্টন—আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মস্ত বড়ো বন্দর বোস্টন,—কল্‌কাতা থেকেই উনি বেশ কল্পনা ক'রে নিতে পারেন সমস্ত শহরটাকে;—পথের দু'ধারে মস্ত বড়ো বড়ো সব বাড়িগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, এ'পাশে বাস্‌—ও'পাশে ট্রাম—এ'ধারে ট্যাক্সি—ও'ধারে মাল বোঝাই প্রকাণ্ড লরীগুলো,—যানে ও জনে সমস্ত রাস্তাগুলো ভর্তি হ'য়ে গেছে। বোস্টন—বোস্টন,—সত্যি কথা, সুধীর না আছে এইখানেই! অসীমাদেবীর মনে পড়ে যায়, এই বিরাট জনারণ্যের মাঝখান দিয়েই হয়ত সুধীর আজো পথ হাঁট্‌ছে। সত্যি, কতো বৎসর হ'য়ে গেল সুধীর বোস্টন চ'লে গেছে,—আজও তার কোনও খবর নেই—একেবারে নিখোঁজ। সে আজ প্রায় দশ বছর, না, না, অতো নয়, তবে আট বছর ত খুবই,—সাত বছর হ'লো ত চিঠি আসাই বন্ধ হ'য়ে গেছে। আশ্চর্য, দীর্ঘ আট বছর কেটে গেল, অথচ মনে হয় যেন —এই ত সেদিন। অসীমাদেবীর বেশ মনে আছে সুধীরকে see-off কর্‌তে তিনি হাওড়া স্টেশনে এসেছেন, বোম্বে মেল তখন ছ[illegible]ড় ছাড়ে,—সুধীর নিরালা ওঁর একটা হাত নিজের হাতে [illegible] বলেছিলো, "তুমি প্রতীক্ষা কোরো, সীমা, আমি আবার [illegible]রে আস্‌বো তোমার কাছে।"......সেকথা মনে করলে [illegible]ও ঠোঁটে হাসি ফুটে ওঠে,—আরও কতদিন এম্‌নি-ভাবে প্র[illegible]ক্ষা করতে হবে?—সময় কি এখনও হয় নি?...... ছোট এ[illegible] নিশ্বাস ফেলে অসীমাদেবী বইটা ওলটাতে লাগ্‌লে[illegible] বিজলী এখনও প'ড়্‌তে এলো না, অন্যমনস্ক হ'য়ে [illegible]ইটা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। হঠাৎ বইটা থেকে কী একটা [illegible]ড়ল। কী এটা?—ভাঁজ করা একখানা কাগজ —মনে [illegible] যেন কার চিঠি। কাগজখানা পুনর্বার ঠিক ক'রেই রে[illegible]ছিলেন, হঠাৎ কী মনে ক'রে খুলে ফেল্‌লেন সেখানা। [illegible]র লেখা তাঁর ছাত্রী বিজলীর। কিন্তু চিঠি নয়—মনে হ[illegible] যেন ডায়রীর একটা পাতা। পৃষ্ঠার ওপরে নম্বর রয়েছে—তিন। কেমন কৌতূহল হ'লো, পৃষ্ঠাটা তিনি পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন।—

"ওর চিঠি পেলাম আজ সকালে। অদ্ভুত সে' চিঠি। লিখেছে, আজ সন্ধ্যায় নূতন লেক্‌টার দক্ষিণে রেল লাইনের কাছে যেখানে কতোগুলি তাল আর নারকেল গাছ সোজা উঠে গেছে, সেখানে সে অপেক্ষা কর্‌বে,—আমার সঙ্গে নাকি তার দেখা হওয়া চাই-ই,—কী যেন একটা দরকারী কথা আছে। মনে মনে হাসি, দরকারী কথাটা যে কী, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। যাই হোক, ওর কথাটা আজ রাখ্‌তে হবে। সন্ধ্যায় আজ আর পড়বো না, মাথা ধরার ছুতো ক'রে ছুটি নেব।"......

অসীমাদেবী আর পড়্‌লেন না, কাগজটা ভাঁজ ক'রে বইটার ভেতরে রেখে দিলেন। লুকিয়ে লুকিয়ে ঐটুকু মেয়েটার তাহ'লে এই সব হচ্ছে। অবশ্য এইজন্য মেয়েটাকে দোষ দেওয়া চলে না, এটা হচ্ছে বয়সের স্বভাব। আর ওর ত এখন তবু ষোলো,—অসীমাদেবীর তাঁর নিজের চৌদ্দ বৎসরটাকে মনে পড়্‌ল। তখন তিনি একেবারেই ছেলে-মানুষ, আর সুধীর ত তখন কুড়িতেও পা দেয় নি। ছুটির দিন,—দুপুর বেলায় বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। এক-টুকরো কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে পা টিপে টিপে অসীমা ছাদে এলো। পাশের বাড়ির ছাদটাও তখন খালি নেই,—ওদিকে মুখ ফিরিয়ে সুধীর দাঁড়িয়ে আছে। ঠুং ঠাং ঠুং ঠাং চুড়ির আওয়াজ হ'লো, কিন্তু সুধীর তা-ও শুন্‌তে পেলো না। কী করা যায়, চেঁচিয়ে ত আর ডাকা যায় না, কেউ হয়ত শুনে ফেল্‌বে, ছোট একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ছাদে ফেলে দেওয়া হ'লো। এবার সুধীর অবশ্য টের পেলো। কিন্তু কী করা যায়, কথাবার্তা ত আর চালানো যাবে না তখন, —কার্নিসে ভর দিলেই ত নীচের জানালা থেকে কেউ দেখে ফেল্‌তে পারে। কাগজের টুক্‌রোটায় হয়ত অসীমা লিখে দিলো,—'লেকের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে নারকেল গাছতলায় দেখা কোরো সুধীরদা—একটা দরকার আছে।' তারপরে লেখা কাগজটা একটা ছোট ঢিলে বেশ ক'রে মুড়ে সুধীরের উদ্দেশে ওর ছাদে ফেলে দিলো।......সে' সব কথা মনে এনে অসীমা-দেবীর আজও হাসি পায়,—কী ছেলেমানুষীর দিনই না গেছে তখন!

কিন্তু বিজলী মেয়েটা যেন কেমন বোকা। একটা খোলা —আল্‌গা কাগজে কি কেউ ডায়রী লেখে? আর লিখ্‌লেও সেটা কি কেউ এম্‌নিভাবে যেখানে সেখানে ফেলে রাখে?—আর বিশেষত এই সব লেখা? অসীমাদেবী নয় নেহাৎ করুণা ক'রেই এটা উপেক্ষা ক'রে গেলেন, কিন্তু অভিভাবক-দের কারুর হাতে যদি এ' সব পড়্‌ত? তখন কী দশা হ'তো বিজলীর?......অসীমাদেবী ঠোঁটের পাশে একটু হাসি টেনে আনেন, তিনি কিন্তু এই বয়সে মোটেই অসতর্ক ছিলেন না, —সুধীরের সঙ্গে ওঁর পত্রালাপের খবরটা কি কেউ কোনদিন ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পেরেছে?—কখনই না।........যাই হোক্‌, বিজলী মেয়েটা মোটেই চালাক নয় এ' বিষয়ে। ওকে একবার

এদিকে সতর্ক হ'তে ব'লে দেবেন না কি তিনি? পাগল, তা-ও কি হয়,—শিক্ষয়িত্রী হ'য়ে ছাত্রীকে তিনি এসব বিষয়ে কি আবার বলতে পারেন? শুধু তা-ই নয়, তিনি যে এ বিষয়ে কিছু জানতে পেরেছেন, এটাও বিজলীকে বিন্দুমাত্র জান্‌তে দেওয়া তাঁর উচিত নয়;—কেন না, তিনি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বেশ ভালোভাবেই জানেন, এ' অবস্থাটা মানুষকে বিশেষ শঙ্কিত করে তোলে—বিশেষত মেয়েদের। অসীমাদেবীর বেশ মনে আছে, লেকে যখন তিনি সুধীরের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, তখন সঙ্গে থাকত্ সেই হিন্দুস্থানী চাকর ঝণ্টুটা;—ঝণ্টু এ' সব কিছুই বুঝ্‌ত না বা বাড়িতেও ঘুণাক্ষরে কিছু বল্‌তো না, তথাপি তাঁর দারুণ ভয় করতো সর্বক্ষণ—এই বুঝি চাকরটা কিছু ব'লে ফেলে—কিছু ব'লে ফেলে। সত্যি কথা বল্‌তে কি, সুধীর যখন নিরালা দেখে আবেগে ওঁর হাত চেপে ধর্‌ত, তিনি তখন দস্তুর মত শঙ্কিত হয়ে হাত ছাড়িয়ে নিতেন।.........আজ সে' সব কথা মনে পড়্‌লে অসীমাদেবীর হাসি পায়,—সত্যি, কী ছেলেমানুষীর দিনই না গেছে তখন!

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ বেজে উঠেছে, বিজলী আস্‌ছে বুঝি এতক্ষণে। অসীমাদেবীর হাসি পায়, মেয়েটা এসে ওঁকে যে কী বল্‌বে তা ওঁর বেশ জানা আছে,—ষোলো বছর ওঁরও ত কেটে গেছে একদিন! মেয়েটার মুখ নিশ্চয়ই একটু শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাবে। অসীমাদেবী বেশ কল্পনা ক'রে নিতে পারেন, মৃদু পায়ে সে ঘরে ঢুক্‌বে, তারপর একটু ইতস্তত ক'রে বল্‌বে, "সীমাদি, আজ একটু ছুটি দিন না—বড্ড মাথা ধরেছে।" আর অসীমাদেবী উত্তরে কী বল্‌বেন? বল্‌বেন, "তা' হোক্, একটু প'ড়ে নাও—পরীক্ষা সামনে,"—এই বল্‌বেন? না, না, অতটা নির্মম তিনি কিছুতেই হবেন না। এ' অবস্থায় মনটা যে কী রকম আকুল হ'য়ে থাকে, তা' তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই বেশ জানা আছে। না, না, ওসব কিছুই নয়, মেয়েটাকে তিনি সত্যসত্যই ছুটি দিয়ে দেবেন।

বিজলী ঘরে ঢুকল্। অসীমাদেবী ঠিকই ভেবেছিলেন,—মেয়ের মুখখানি দস্তুরমত শুক্‌নো দেখাচ্ছে। ঠোঁটে একটু হাসি ফুট্‌ল তাঁর, ঠিকই ধরেছেন তিনি, এ'সব বিষয়ে তাঁর ধারণা কখনো ভুল হয় না। মেয়েটা টেবিলের ওপাশে যথাস্থানে এসে বস্‌ল। এইবার—এইবার আরম্ভ কর্‌বে সে। প্রথমে একটু ইতস্তত কর্‌বে, আর সেটা স্বাভাবিকও,—তারপরে ধীরে কুণ্ঠিত কণ্ঠে চাইবে ছুটি। কিন্তু, আশ্চর্য, মেয়েটা ওসব কিছুই বল্‌ছে না,—দিব্যি বইখানা খুলে বসেছে! ওদিকে সন্ধ্যা হ'য়ে এলো,—ছুটি যখন নিতে হবেই তখন এতো ইতস্তত কেন বাপু? সত্যি, মেয়েটা মোটেই চালাক নয়, রীতিমত বোকা। যাই হোক্ শিক্ষয়িত্রীর গাম্ভীর্য তিনি অটল রেখে যাবেন,—ও যখন ছুটি চাইবে তখন ওকে মোটেই বুঝ্‌তে দেওয়া হবে না যে তিনি এ' বিষয়ে কণামাত্র জান্‌তে পেরেছেন।

"বই খোলো, পড়া দেখাও।"

ছাত্রী পড়া দেখালে। ভূগোল পড়া। কী আশ্চর্য, পড়াও ঠিক বেছে বেছে আমেরিকার যুক্তরাজ্য, আর বোস্টনও আজকে-কার পড়ার অন্তর্ভুক্ত! বোস্টন!

"আচ্ছা বলো ত, বিজু, হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটি কোথায়?"

"হার্ভার্ড য়ুনিয়ার্সিটি!"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ, নাম শোনো নি?"

"না ত!"

"আশ্চর্য! খোলো বই, দেখিয়ে দিচ্ছি।"

সত্যি, ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে মেয়েটা, অথচ 'হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটি'—অতো বড়ো একটা বিশ্ববিদ্যালয়, তার নামটি পর্যন্ত সে জানে না! অথচ, এই 'হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটি' অসীমাদেবীর মনে হয় যেন কতো পরিচিত! সুধীরের প্রত্যেক চিঠিতেই তিনি পেয়েছেন এই শিক্ষায়তনের কতো পরিচয়! সুধীর এখানেই পড়্‌ছে;—আজ দীর্ঘ আট বৎসর কেটে গেল,—সে তবু পড়্‌ছে আর পড়্‌ছেই! সেই সুধীর,—আশ্চর্য, আজ হঠাৎ এতো সুধীরকে মনে পড়্‌ছে কেন?

কিন্তু সে যাক্। এদিকে বিজলী বই পড়্‌ছে। কী অদ্ভুত মেয়েটা,—মনটা ত লেকে যাবার জন্য উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে, অথচ মুখ ফুটে ছুটিটাও চাইতে পার্‌ছে না। নাঃ, মেয়েটা ভারী বোকা। অবশ্য ওর সঙ্কোচটাও তিনি বুঝ্‌তে পার্‌ছেন, কিন্তু তা' হ'লেও মুখ ফুটে ছুটি চাইলে এমন কিছু দোষ হ'তো না। সত্যি, মেয়েটার অবস্থা দেখে হাসিও পায় আবার দুঃখও হয়।

অবশেষে অসীমাদেবীই উঠে দাঁড়ালেন। কী করা যায়, যে ভীরু মেয়ে,—নিজে ত আর ছুটি চাইতে পারলো না,—অতএব ওঁকেই ছলনার আশ্রয় নিতে হ'লো। মেয়েটার অবস্থা দেখে সত্যই করুণা জাগে।

"দেখো বিজু, মাথাটা আজ বড্ড ধরেছে, পড়াতে পারছি না,—আজ তোমায় ছুটি দিলুম, বুঝ্‌লে?"

মেয়েটির মুখ অম্‌নি প্রফুল্ল হ'য়ে উঠেছে। হ'বেই হবে, অসীমাদেবীর এ' সব বিষয়ে রীতিমত অভিজ্ঞতা আছে।

"আর শোনো, পড়াশুনো এখন ভালো না লাগ্‌লে বরং লেকে গিয়ে একটু বেড়িয়ে এসো না। মনটাও বেশ স্নিগ্ধ থাক্‌বে।"

কথাটা বলেই অসীমাদেবী মনে মনে একটু ... স্তুত হ'লেন। মেয়েটা যেন আবার ঘুণাক্ষরেও টের না প... তিনি ঐসব বিষয়ে বিন্দুমাত্র জান্‌তে পেরেছেন! ... ও' নিজেই সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠ্‌বে,—এ' সব অভি... ...সীমা-দেবীর যথেষ্টই আছে।

ওঁর কথায় বিজলী ছোট্ট উত্তর দিলে, ... দশের শুধু 'আচ্ছা'! নাঃ, মেয়েটা যেন ... পনায় ...থচ, অসীমাদেবীর বেশ মনে আছে, অনুরূপ ... সাধন-... তিনি কেমন চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌তেন;—কণ্ঠস্বরে—দ... একটা উল্লাস হিল্লোলিত হ'য়ে উঠ্‌ত!......ওঃ, ... নই যে গেছে অতীতে! সেই সব মাঝে মাঝে ... আর

নিজের এই একাকী কুমারী জীবনের কথা স্মরণ ক'রে অসীমাদেবী আজও কেমন উন্মনা হ'য়ে পড়েন!

দীর্ঘ পথটার ওপারে সন্ধ্যা নাম্‌ছে—অপূর্ব স্নিগ্ধ সন্ধ্যা! অসীমাদেবীর মনে হ'লো, তিনি যদি এখন কোনও নিরালা যায়গায় গিয়ে বস্‌তে পারতেন! নিরালা যায়গা,—যেখানে আছে পরিপূর্ণ শান্তি আর পরিপূর্ণ বিশ্রাম। আর কোনও কাজ নয়, শুধু চুপ ক'রে চেয়ে থাকা—সন্ধ্যা আকাশটার পানে,—পরিপূর্ণ ক'রে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া নির্জনতার মধ্যে!—মন থেকে সমস্ত গুরুভার নেমে গেছে তখন, চোখের সামনে ভাস্‌ছে তখন শুধু সুধীর—আর কেউ-ই নয়—আর কিছুই নয়!

কিন্তু কী আশ্চর্য, সুধীরকে আজ হঠাৎ এতো মনে পড়্‌ছে কেন?.........অসীমাদেবী পথ চল্‌তে লাগ্‌লেন। সাম্‌নেই মোড়। মোড়ে ডান দিকে ঘুর্‌লেই নতুন লেক্। যাবেন না কি একবার তিনি লেকে? না, না,—হাতে আজ অনেক কাজ। থার্ড ক্লাসের ভূগোলের Questionটা এখনও করাই হ'লো না, কালকে আবার submit কর্‌বার শেষ তারিখ,—আজ সেটা ক'রে ফেলা চাই-ই। থার্ড ক্লাসের ভূগোল—কোশ্চেন,—কী কী প্রশ্ন দেওয়া যায়?—'নিম্নলিখিত স্থানগুলির সম্বন্ধে যাহা জান, লিখ',—এ' প্রশ্নটা ত থাক্‌বে compulsory. এই প্রশ্নেই থাক্‌বে—বোস্টন। নিশ্চয়ই, U. S. A.র বিখ্যাত নগর বোস্টন,—এটা আর প্রশ্নে থাক্‌বে না? কিন্তু ছাত্রীরা কতটুকু লিখবে? সত্যি, বোস্টন সম্বন্ধে ওদের জ্ঞান কত সীমাবদ্ধ! ওরা অনেকে হয়ত হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটির নামটাই শোনে নি। হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটি,—দর্শনশাস্ত্রের বিখ্যাত অধ্যাপক মিস্টার...মিস্টার,...আঃ, মনেই পড়ছে না এখন তাঁর নামটা,—তিনি এখানেই অধ্যাপনা করেন। সুধীরের প্রত্যেকটি চিঠিতেই থাকত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধে কতো কথা, ঐ অধ্যাপকটির সম্বন্ধে কতো কথা!...... অসীমাদেবীর বেশ মনে পড়ে,—সুধীর একবার লিখেছিলো,—হোস্টেলের লাইব্রেরীতে ব'সে Browningএর "The Statue and the Bust" পড়্‌তে পড়্‌তে সে একদিন অন্যমনস্ক হ'য়ে কী ভাব্‌ছিল, এমন সময় সেই অধ্যাপকমশাই ওর কাঁধে হাত দিয়ে ঠাট্টা ক'রে নাকি বলেছিলেন, "কী হে নব্য প্রেমিক, কী ভাব্‌ছ?" এই কথা উল্লেখ ক'রে সারা চিঠিটা ভ'রে সুধীরের সে কি উচ্ছ্বাস! সত্যি, সুধীর,......—কিন্তু কী আশ্চর্য, ঘুরে-ফিরে সুধীরের কথাই হঠাৎ আজ ওঁর এতো মনে পড়্‌ছে কেন?

অসীমাদেবী পথ চল্‌তে লাগলেন। কিন্তু এ-কী এ যে তিনি একেবারে লেকের ধারে এসে পড়েছেন! ক্লান্ত পা দুটো কখন অজ্ঞাতসারেই লেকের দিকে চল্‌তে আরম্ভ ক'রে দিয়েছিলো, তিনি মোটেই টের পান নি। তা' এক রকম ভালই হ'লো, খানিকক্ষণ লেকে ব'সে থাক্‌লে মন্দ হয় না। একেবারে জলের ধারে গিয়ে বস্‌বেন তিনি,—যেমন একদিন সুধীর আর তিনি বস্‌তেন।

ঐ যে সেই রেল লাইনের ধারের নারকেল গাছগুলো। ওঃ, কতদিন যে তিনি আসেন নি এখানে! ঐখানে ঐ নারকেল গাছগুলোর তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুধীর তাঁর জন্য অপেক্ষা কর্‌ত, তারপর তিনি এলে দুজনে লেকের একেবারে ধারে গিয়ে বস্‌তেন। কী দিনই না গেছে তখন!

ভালো কথা, বিজলীও না আস্‌বে এখন ওখানে,—কে তার জন্য না অপেক্ষা ক'রে থাক্‌বে ওখানে?.........অসীমাদেবীর ঠোঁটে একটু হাসি ফুটে ওঠে, সত্যি, অবিকল ওঁদের মত! সুধীরও অম্‌নি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কর্‌ত, আর তিনিও বিজলীর মত ছুটে ছুটে ওখানে আস্‌তেন! সুধীর ছিল—একটু চঞ্চল একটু ছেলেমানুষ—একটু দুষ্টু প্রকৃতির,—আর বিজলীর জন্য যে অপেক্ষা কর্‌ছে, সে কেমন—কে জানে? একবার লুকিয়ে তিনি দেখে আস্‌বেন নাকি প্রতীক্ষমান ছেলেটাকে? ছেলেটা ত তাঁকে চেনে না, আর বিজলী ত এখনও এসে পেঁছয় নি নিশ্চয়ই। তা' একবার ছেলেটাকে দেখে আস্‌লে মন্দ হয় না। অসীমাদেবী নারকেল গাছগুলোর দিকে পা বাড়ালেন।

নারকেল গাছতলায় সত্য সত্যই কে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। কে ছেলেটি?—কেমন যেন চেনা-চেনা লাগ্‌ছে না?......অসীমাদেবী আরও এগিয়ে এলেন,—আরে এযে সৌম্যেন,—তাঁদের স্কুলের টীচার মিসেস্ সোমের ছেলে সৌম্যেন!

"সৌম্যেন, তুমি যে এখানে?"

অসীমাদেবী ঠিকই ধরেছেন, তা নইলে তাঁর ঐ সামান্য প্রশ্নে ছেলেটা অমন থতমত খেয়ে ওঠে কেন? তা' হ'লে সৌম্যেনই হ'লো বিজলীর......সৌম্যেন ততক্ষণে কতকটা সাম্‌লেছে, একটু ইতস্তত করার পর সে উত্তর দিলো, "এই—মানে—মানে, এক বন্ধুর জন্য অপেক্ষা কর্‌ছি আর কি।"

অসীমাদেবীর হাসি পেলো, ছেলেগুলো একটু অপ্রস্তুত হ'লেই কেমন থতমত খেয়ে যায়, আর 'মানে—মানে' কর্‌তে থাকে। ওঁর বেশ মনে আছে, ওঁকে নিরালা পেয়েও সুধীরের পর্যন্ত ওই থতমত ভাবটা কম্‌ত না, আর কেবলই কথার মাঝে—'মানে—আর মানে'র ভূমিকা!......সেই 'মানে' কি এখনও ফুরোয় নি সুধীরের?

অসীমাদেবী সৌম্যেনকে ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলেন। সাম্‌নে একটা খালি বেঞ্চ। এখানে একটু বস্‌বেন নাকি তিনি? বস্‌লে মন্দ হয় না, পা'টাও ধ'রে গেছে, কিন্তু ওরা আবার ওঁকে দেখ্‌তে পাবে না ত? 'ওরা' মানে, সৌম্যেন আর বিজলী। বিজলী এক্ষুনি আস্‌বে, নিশ্চয়ই আস্‌বে,—তারপরে সে যদি অসীমাদেবীকে দেখ্‌তে পায়?—নিশ্চয়ই তাহ'লে লজ্জা পাবে, একে ত যে লাজুক আর ভীতু মেয়েটা।......তা' হ'ক্, অসীমাদেবী বেঞ্চে বস্‌লেন, বিজলী এলে উনি ওদিকে তাকাবেন না, মুখ ফিরিয়ে থাক্‌বেন।

সন্ধ্যা আরও ঘন হ'য়ে এলো, লেকের জলে নেমে এসেছে স্নিগ্ধ শান্তি! অসীমাদেবী একটু মুখ ফেরালেন, সৌম্যেন ঠায় ওখানে দাঁড়িয়ে আছে,—আর, ঐ ত বিজলীও এসে

পড়েছে,—সঙ্গে ছোট্ট ভাইটা,—পেছনে চাকর। গাছগুলোর কাছে এসে বিজলী থাম্‌লে, ঐ যে পায়ের জুতোটা ঠিক ক'রে নিচ্ছে,—অবশ্য ওটা হ'লো ভূমিকা,—অসীমাদেবী বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছেন। সৌম্যেনও চেয়ে আছে বিজলীর দিকে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, মেয়েটা একা একাই এগিয়ে আস্‌ছে, সৌম্যেনটাও চুপ্‌ ক'রে সেইভাবেই এক স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। কী লাজুক ওরা! কিন্তু অসীমাদেবীকে ওরা আবার দেখে ফেলেছে নাকি? তা-ই হবে, দেখেই ফেলেছে বুঝি, তাই এতো সঙ্কোচ আর লজ্জা। মেয়েটা নিশ্চয়ই ওকে দেখ্‌তে পেয়েছে, ঐ ত সে এগিয়ে আস্‌ছে ওঁরই দিকে। অসীমাদেবী উঠে দাঁড়ালেন।

"কী মজা, সীমাদি, আপনিও এখানে?"—বিজলী ব'লে উঠ্‌ল।

"হ্যাঁ, এই এলাম একটু বেড়াতে বেড়াতে। কিন্তু ছেলেটির সংগে আলাপ করলে না তুমি?"

"কোন্‌ ছেলেটি?"

কোন্‌ ছেলেটি! বটে! বিজলী ত তাহ'লে নেহাৎ বোকা নয় একেবারে,—এই ত বেশ ছলনা করতে শিখেছে এরি মধ্যে,—যেন সৌম্যেনকে সে মোটেই চেনে না!

"এসো বিজু, আলাপ করিয়ে দিই।"

"কার সংগে?"

"এসোই না।"

কী আর করা যায়, নিজের হাতে যখন এরা এমন সন্ধ্যাটাকে মাটি ক'রে দিতে যাচ্ছে, তখন ওঁকেই ওদের ভয়টা ভাঙিয়ে দিতে হবে। সত্যি, এত ভয়ের কী আছে বাপু? দুজনে সাক্ষাৎকার হ'ল, এবার এসে লেকের ধারে ব'স, গল্প-সল্প কর,—এতে এত সঙ্কোচেরই বা আছে কী!

অসীমাদেবী নারকেল গাছগুলোর দিকে এগিয়ে গেলেন।

"সৌম্যেন, শোনো।"

অসীমাদেবীর আহ্বানে সৌম্যেন এগিয়ে এলো।

"তোমাদের আলাপ করিয়ে দেই। এ হচ্ছে শ্রীমান্‌ সৌম্যেন সোম, আর এ হচ্ছে আমার ছাত্রী কুমারী বিজলী ব্যানার্জী।"

কী আশ্চর্য, ছেলেটাও তেমনি লাজুক, মুখ ফুটে বল্‌তেও পারছে না যে, 'এ'কে আমি চিনি।' কিন্তু ঐ যে ওদের চোখেমুখে একটা সলজ্জ আভা ফুটে উঠ্‌ছে, ওটা অসীমাদেবীর চোখ এড়িয়ে কোথায় লুকোবে ওরা?

"নমস্কার।"

"নমস্কার,"—সৌম্যেন একটু ইতস্তত ক'রে বললে, "দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আপনি কি গল্প-টল্প লেখেন? 'আকাশ-প্রদীপ'এ আপনার গল্প পড়েছি ব'লে যেন মনে হচ্ছে!"

"হ্যাঁ, একটু আধটু লিখি মাঝে মাঝে।"

"তাই নাকি! তুমি আবার গল্পও লেখো নাকি বিজু?"—অসীমাদেবী ব'লে উঠলেন।

কিন্তু সৌম্যেনটা কি চালাক ছেলে! স্পষ্ট ক'রে বিজুকে বল্‌লে না যে, 'তোমায় চিনি', কিন্তু ঘুরিয়ে আবার বলা হলো, আপনু'র গল্প আমি পড়েছি!"

একেবারে অবিকল সুধীরের মত। অবশ্য ঠিক এই কথাটিই নয়, কিন্তু সুধীরের কথা বলার ধরণও ছিল ঠিক এইরকম।

"আসবে না কি, সৌম্যেন, আমাদের সংগে।"

"আজ নয়, আজ আমায় ক্ষমা করুন, সীমাদি।"

নাঃ, সৌম্যেনও ত মোটেই সাহসী নয়। আর, অসীমাদেবী কি বেশীক্ষণ থাক্‌তেন তোমাদের সংগে?—এখখুনি চ'লে যেতেন,—তারপর তোমরা দুজনে লেকের ধারে ধারে একাধিপত্য রাজত্ব ক'রে যাও,—অরসিকের মত কেউই আর বাধা দিতে আস্‌বে না। সত্যি, সৌম্যেন-বিজলী দুজনেই যেমন ভীরু, আবার তেম্‌নি লাজুক।

খানিকটা এগিয়ে যাবার পর অসীমাদেবী বিজলীকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "সৌম্যেনকে তুমি আগে থাক্‌তেই চিন্‌তে, না, বিজু?"

"না ত!"

কী অদ্ভুত এই মেয়েটা, এখনও ওঁর কাছ থেকে ঢাক্‌বার চেষ্টা করছে!

একেবারেই চিন্‌তে না ওকে?

কী আশ্চর্য, তাহ'লে বিজলীর সেই ডায়রীর তিন নম্বরের খোলা পৃষ্ঠাটা!

অসীমাদেবী একবার পিছন ফিরে সেই নারকেলগাছগুলোর তলায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। সৌম্যেনের অপেক্ষিত বন্ধুটি এসেছে, ওরই সমবয়সী একটি ছেলে;—তার সংগে সৌম্যেন ওদিক্‌কার পথে চ'লে গেল!

এর মানে? তাহ'লে কি তিনি কিছু ভুল করলেন নাকি? অসীমাদেবী ঘুরে দাঁড়ালেন। কী দুর্বোধ্য ব্যাপার! হঠাৎ ওঁর মনে একটা সন্দেহ দোলা দিয়ে গেল।

"আচ্ছা, বিজু, তুমি গল্প লেখো, না?"

"হ্যাঁ লিখি একটু আধটু। এই ত আজ আপনি আসবার আগে একটা লিখ্‌ছিলাম।"

"ও! তাহ'লে......।"

অসীমাদেবী কথাটা শেষ ক'রতে পারলেন না, গলাটা কে যেন চেপে ধরেছে;—তিনি থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

"আচ্ছা, তুমি এখন আরও একটু বেড়াবে বোধ হয়,—আমার বড্ড মাথা কামড়াচ্ছে, আমি চল্‌লুম, বুঝলে? মনে কিছু ক'র না।"

ব'লেই উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে অসীমাদেবী দ্রুতপদে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে চল্‌লেন। একবার পেছন পানেও তাকালেন না তিনি,—সমস্ত লেক্‌টাকেই তখন তাঁর ভয়ানক অসহ্য লাগ্‌ছে—ভয়ানক অসহ্য লাগ্‌ছে!

হাতে অনেক কাজ। থার্ড ক্লাসের ভূগোলের কোশ্চেন আজ শেষ করতেই হবে। থার্ড ক্লাসের ভূগোল-কোশ্চেন,—বোস্টনের প্রশ্ন তিনি দেবেন না, কিছুতেই দেবেন না,—সারা ভূগোলটার মধ্যে বোস্টন ছাড়া অনেক বিখ্যাত—অনেক বৃহৎ—অনেক সমৃদ্ধ নগর আছে!......অসীমাদেবী দ্রুত-পদক্ষেপে পথটা পার হ'তে লাগলেন—দীর্ঘ আর কালো সেই পিচের পথ!

রঙ্গজগৎ

মিনার্ভায়—'মালা'

প্রযোজক—'বিজয়শঙ্কর' ভাট। পরিচালক—মহেন্দ্র ঠাকুর, পি জয়রাজ। কাহিনী ও সংলাপ—ডি এন সাধোক। সংগীত পরিচালক—নাউশাদ আলী। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন—রোজ, জয়ন্ত, জয়রাজ, এন নাজির প্রভৃতি।

মালা পল্লী গ্রামের এক সরলা বালিকা, দরিদ্রের মেয়ে অথচ সুন্দরী। কলেজে পড়া ছেলে মোহনের সহিত তার গোপনে প্রণয় চলিতেছে। মোহনের সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু শিবরাজ মোহনের হইয়া একদিন প্রেম-পত্র লিখিয়া দিল, কিন্তু প্রিন্সিপ্যালের নিকট ধরা পড়ায় শিবরাজ কলেজ হইতে বিতাড়িত হইল। মোহন নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া শান্তি পাইতেছিল না, সে-ও কলেজ ছাড়িয়া দিল এবং শিবরাজের সহিত আইন পড়িতে লাগিল। মোহনের পিতা ছিলেন একজন ঠিকাদার; বিপত্নীক সুতরাং দুশ্চরিত্র। মালাকে তারি অধীনে কুলি রমণীর কাজ করিতে হইত, ঠিকাদারের চোখ এড়াইল না। অর্থের বিনিময়ে মালাকে বিবাহ করিয়া যে রাত্রে গৃহে লইয়া আসিল সেই রাত্রেই মোহনের সহিত মালার সাক্ষাৎ হইল, বিস্মিত মোহন ক্ষোভে দুঃখে সেই অন্ধকার দুর্যোগময় রাত্রে পথে বাহির হইয়া পড়িল, মালাও তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইল, কিন্তু সে পথ হারাইয়া আশ্রয় লইল শিবরাজের গৃহে যাহাকে সে পূর্বে চিনিত না। পরদিন প্রত্যুষে শিবরাজের গৃহত্যাগ করিয়া মালা কাশীতে অবলা আশ্রমে আশ্রয় লইল, কিছুদিন পর মালা সন্তানসম্ভবা হইয়া পড়িলে অবলা আশ্রম হইতে তাহাকে চলিয়া আসিতে হয় এবং শিবরাজের কাছে আশ্রয় লইবে বলিয়া তাহার বাড়ির দুয়ার হইতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়, কারণ সেখানে বিবাহের আয়োজন চলিতেছিল। গোপনে মালার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। লোকলজ্জা সমাজ নিপীড়নের ভয়ে নিজ হস্তে মালা সে সন্তানকে হত্যা করিল, কিন্তু পুলিশের হাতে ধরা পড়িল।

আদালতের দৃশ্য। হাকিম স্বয়ং শিবরাজ মালার অবৈধ সন্তানের যিনি পিতা আসামী পক্ষের উকিল মোহন, যিনি মালার প্রণয়ী, শিবরাজের পরম বন্ধু। বিচারে মালার ছয়মাস কারাদণ্ড হইল। অনুতপ্ত শিবরাজ কারাগারে মালার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রতিশ্রুতি দিল যে, ছয়মাস পর সে তাহাকে বিবাহ করিবে এবং ছয়মাস পরে মালার সহিত শিবরাজের বিবাহ দৃশ্যে ছবি শেষ হইয়াছে।

দীর্ঘ কাহিনী। অবান্তর ঘটনার ভিড়ে মূল কাহিনীর স্বাভাবিক গতি পদে পদে বাধা পাইয়াছে। ছবির প্রথম দিকে বেশ কিছুক্ষণ কে নায়ক তাহা লইয়া সমস্যায় পড়িতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত সে সমস্যা দূর হয় না। মোহন ও শিবরাজ দুজনের কেহই আপন চরিত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই পরিচালকের দোষে। নায়িকার ভূমিকায় রোজ প্রশংসনীয় অভিনয়, না করিলেও নিন্দনীয় নহে। খড়ের গাদার উপর প্রসব বেদনা-কাতর মালার দৃশ্যটি দৃষ্টিকটু ত বটেই রুচিবিরোধীও। এ ধরণের দৃশ্য এখনও পরিচালকরা দিতে সংকোচ বোধ করেন না দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ছবিতে গান কয়েকটি আছে, কিন্তু কোনটাই মনে রাখিবার মতো নহে। ছবির বহির্দৃশ্যগুলি সুন্দর, আলোকচিত্র গ্রহণ প্রশংসনীয়।



প্রভাত পিকচার্সের ভি সান্তারাম পরিচালিত 'পড়োশী' চিত্রে শ্রীমতী আনিস্।

রূপবাণীতে—'বাঙলার মেয়ে'।

বলিতে বাধা নাই, বাংলা চিত্রজগতে সহসা এরূপ সু-অভিনীত ও সু-পরিচালিত চিত্র দেখি নাই। অভিনয় ও চিত্র চিত্তকে দোলা দেয়, বাংলা চিত্র দেখিয়া একথা আমরা ভুলিতে বসিয়াছিলাম এবং বার বার বাংলার চিত্রশিল্প সম্পর্কে নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়াছি। তাই আজ বলিতে বাধা নাই, বাংলা চিত্র

তালিকায় 'বাঙলার মেয়ে' বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করিতে বাধ্য। অথচ কী-ই বা কাহিনী। মামুলী ও অতি প্রচলিত। কিন্তু বাংলার ও বাঙালীর বাস্তব জীবনে বৈচিত্র্যই বা এমন কি আছে? হইতে পারে এই 'ব্যাক্ টু ভিলেজ' ও 'ব্যাক্ টু ওল্ড এজ্' চীৎকার বর্তমান অগ্রগতির দৃষ্টিতে বিপুল বাধা ও হৃত সর্বস্বের প্রতি-ক্রিয়া। কিন্তু ইহা বাংলার স্টুডিয়ো-চিত্র নহে, জোর করিয়া একটা নাটকীয় কল্পনাকে বাঙলার বস্তু বলিয়া চালাইবার আর্থিক অহংকার নাই বা অনভিজ্ঞ বিজাতীয় পরিচালকের কামনার রূপ ইহাতে প্রতিফলিত হয় নাই। ইহাই বাংলার ইতিহাস। পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন আসিল তখন আমরা তাহাকে বাধা দিতে পারি নাই। সে মীমাংসা পলাশীর মাঠে হইয়া গিয়াছে। বিদেশী শক্তি কেবলই হাতিয়ার লইয়া আসে নাই, বণিকবৃত্তির সূক্ষ্ম বুদ্ধিও লইয়া আসিয়াছে; বিদেশী মানুষ কেবলই দম্ভ লইয়া আসে নাই, মানুষিক সংস্কৃতি তাহার অন্তর উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিল। কালক্রমে আর্থিক সঙ্গতির সহিত বিলাতী মগজ যেদিন অকাতরে অবিশ্রান্ত পুষ্ট ও সুস্থ সাহিত্য সৃষ্টি করিতে লাগিল এবং তাহার প্লাবন যখন বাংলার অরুদ্ধ দুয়ারে হানা দিল তাহাকে রোধ করা পরাজিত বাংলার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িল। এ বন্যার মুখে ব্রাহ্মণ্যসমাজ তৈজসপত্র বাঁচাইবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের সত্যতা পারলৌকিক অদৃষ্টবাদকে উপহাস করিল, বাংলার উপবীত, বাংলার সান্ধ্য জপ ও 'সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং' বাংলার কৃষি-জীবন, আত্মতুষ্ট গ্রাম্য-জীবন ও চিন্তাধারাপ সহসা 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে পোহালে শর্বরী'— কালাপানির ওপারে অস্পৃশ্য জাহাজে চড়িয়া অগম্য দেশের অলব্ধ শিক্ষার জন্য পিতাপুত্রে সংঘর্ষ দেখা দিল। পিতার বৃত্তি যজমানী, গার্হস্থ্য ও দামোদরের ঊর্ধ্বে নহে, পুত্র ভিন্ন শিক্ষা পাইয়াছে, সংস্কৃত পুঁথিতে তাহার দীক্ষা হয় নাই। পিতার অমতে পুত্র বিলাত যায়—পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক স্ফীতিতে পিতা পুত্রকে ত্যাজ্য করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ বধূ বাংলার মেয়ে হইয়াও এক কিম্ভূতকিমাকার জীব হইয়া উঠে—she is a race by herself! কনিষ্ঠ ভ্রাতার বহির্মুখী মন গৃহের সতীলক্ষ্মী বধূকে ছাড়িয়া নৃত্যগীতপটিয়সী শিক্ষিতা তরুণীর পায়ে লুটাইয়া পড়ে। অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার লোভে বধূ ও বৃদ্ধ পিতা বিস্মৃতির আড়ালে যায়। কিন্তু একথা একদিন প্রকাশ পায়। যেদিন পায়, সেদিন পিতা মরিয়াছেন, বধূ মরিয়াছেন, পিতার একমাত্র কন্যা মরিয়া বাঁচিয়াছেন, বাংলার হা অন্নের চিত্র কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

কিন্তু এ আমাদের ভাল লাগে নাই। সমস্যা পূরণের জন্য পর পর অন্তরায়গুলি মারিয়া ফেলানর এ কি দুর্বলতা! কন্যাটির (ভবানীর) চিত্র আঁকিয়াছেন, আমরা বাঙালী গৃহস্থ ঘরের দিকে তাকাইয়া এরূপ চরিত্রকে অবান্তর বলিতে পারি না। কিন্তু তিনদিন না খাইয়াই মানুষ মরে? সুরেশও এমন কিছু টান মারে নাই যাহাতে ভবানীর মৃত্যু হইতে পারে। তিনদিন অনাহারে মানুষ দুর্বল হয় কিন্তু পূর্বে হইতে ভীষণ কোন রোগ না থাকিলে এত দুর্বল হয় না যে মরে। সেদিক হইতে ভবানীর মেকাপেও কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে। ভবানীর মরিবার অব্যবহিত পূর্বে ও পরে সুরেশের উম্মত্ততা অত্যন্ত আকস্মিক ও চরিত্রের সহিত মিলাইয়া লইতে কষ্ট হয়। এ জায়গার পুষ্টির গতিটি অত্যন্ত দ্রুত হইয়াছে। ইহার পর পিতার মৃত্যু। পিতার সহিত প্রাচীনতার মৃত্যু। এ মৃত্যুর প্রয়োজন ছিল। নতুবা গল্পের উপসংহার অন্যরূপে করিতে হয়। তাই পিতা মরিলেন। কিন্তু প্রথমা স্ত্রী দেবীকেও যে মরিতে হয়। নতুবা সতীন লইয়া ঘর করা—বিশেষ প্রাচীনায় ও নবীনায়......

গ্রন্থকর্ত্রীর আর একটি দুর্বলতা কেবল আর্টের দিক দিয়া নহে, নিছক বাস্তবতার দিক দিয়াও অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়াছে। প্রত্যেক চরিত্রকেই শেষাশেষি ভাল করিয়া তোলার একটা হাস্যকর প্রচেষ্টা। ভবানীর ক্ষেত্রে সুরেশ। পিতার বিরুদ্ধগামী জ্যেষ্ঠ পুত্র জিতেন, গৃহস্থ বধূ দেবীর অনুসরণে উচ্চশিক্ষিতা নটী তরুণী লীলা। পরমাশ্চর্য, জিতেনের ক্ষেত্রে—মায়া!! আজন্ম শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার—চরিত্র সৃষ্টিকালে গ্রন্থকর্ত্রী যখন উপেক্ষা করেন তখন সেগুলি অ-চরিত্র হইয়া পড়ে। জোর করিয়া আত্ম-সমর্পণ করাইবার পূর্বে পর্যন্ত মায়া (জিতেনের স্ত্রী) একটি অপূর্ব সৃষ্টি—যেমন স্বাভাবিক সৃষ্টি দেবী। সত্যেনের চরিত্র বলিয়া কিছু নাই। সে ছিল পিতার। ঠিক এই কারণেই লীলার চরিত্র কোথাও ফুটে নাই এবং ঠিক সেই কারণেই সুরেশের চরিত্র গড়িয়া উঠিতে উঠিতে ভাঙিগয়া পড়িয়াছে। জিতেনের চরিত্র ফুটাইতে কথার জাল বুনিতে হইয়াছে বেশী। আগাগোড়া সামঞ্জস্যের জন্য বলিতেছি না (কেননা সামঞ্জস্যই চরিত্র নহে) পিতা, বধূ—ইহারাই সমগ্র কাহিনীর দুইটি চরিত্র—মায়ার কপাল অল্পের জন্য ভাঙিয়াছে।

মায়ার অভিনয়ও অপূর্ব হইয়াছে। অভিনেত্রীদের মধ্যে এরূপ অভিনয়-প্রতিভা অত্যন্ত বিরল। মায়া ও দেবীকে পাশাপাশি তুলিয়া দেখিতে ইচ্ছা যায়। পদ্মাকে এরূপ চরিত্রে মানায় জানিতাম, পদ্মার মুখ ও ভঙ্গীতে কেমন একটা স্বাভাবিক গার্হস্থ্য ছাপ আছে যাহার সহিত তাহার সংযত অভিনয় সংমিশ্রিত হইয়া সমগ্র চরিত্রটি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মুহূর্তের জন্য নাট্যমঞ্চ ভুলিয়া যাইতে হয়। চরিত্র-অসঙ্গতির জন্য শীলার অভিনয় ভাল হয় নাই, তবে তাহার স্বচ্ছন্দ চলনটি আমাদের তাহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত করিয়াছে। কিন্তু বিবাহ রাত্রে শীলা নাচিতে জানে বলিয়াই নাচিতে হইবে এমন কি কথা? সিনেমার উপর অপেরার এই লজ্জাকর প্রভাব সাহিত্যের উপর ব্যবসায়ীর প্রভাবের মতই অস্বাস্থ্যকর। ভবানীর ভূমিকা চরিত্রোচিত হইয়াছে। পিতার চরিত্র স্ফুরণে তিনকড়ি চক্রবর্তীর অভিনয় বার বার করিয়া বলিতে হয়। কেবল সুন্দর নয় অননুকরণীয়। ব্যথাবোধ, সংযম, স্নেহ, ব্রাহ্মণ্যসংস্কার, আদর্শ, কাঠিন্য ও বহু বিপরীত প্রবৃত্তির সমাবেশ ফুটাইয়া তোলা তিনকড়ি চক্রবর্তীর মত প্রতিভাশালী অভিনেতার পক্ষেই সম্ভব। জিতেনের ভূমিকায় নরেশ মিত্রের অভিনয় বেশীর ভাগ জায়গাতেই ভাল হইয়াছে, সিরিও কমিক অংশগুলি সুন্দর হইয়াছে, কিন্তু অতি সিরিয়াসনেসের জায়গাগুলিতে তাঁহার কণ্ঠে প্যাসানের অভাব হেতু ভাল অভিনয় হয় নাই। আমাদের সাধারণত সন্তোষ সিংহের অভিনয় ভাল লাগে না, কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জির ভূমিকায় তাঁহার অভিনয়কে প্রশংসা করিতে হয়। ধীরাজের অভিনয় ক্রমশঃই উন্নত হইতেছে, কিন্তু "মুডি" মুহূর্তে তাহার বসিয়া থাকার ভঙ্গীটি একঘেয়ে হইয়া গিয়াছে এবং বিচলিত চিত্তের অভিনয় নিতান্তই মেলোড্রামাটিক অভিনয় হইয়া পড়ে। ঐ "মুডি"-ভাবের "নিউ থিয়েটারী" অনুকরণ ধীরাজের চোখের ডিফেক্টকে স্পষ্ট করিয়া তোলে মাত্র। সুরেশের মা'র অভিনয় অনবদ্য হইয়াছে।

কিন্তু আমরা বলিতে চাই যে, বালীগঞ্জ ও বাঙলার গ্রাম্যচিত্র ছাড়া ইহার মধ্যবর্তী স্তরগুলি কি চিরকালই উপেক্ষিত হইয়া আসিবে? হয় সুট, ডিনার, মদ—না হয়, পানাপুকুর আর ম্যালেরিয়া এ ছাড়া কি বাঙলার আর কোন দিক নাই?

খেলাধূলা

বঙ্গীয় কুস্তি প্রতিযোগিতা

সিমলা ব্যায়াম সমিতি পরিচালিত বঙ্গীয় কুস্তি প্রতিযোগিতা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এই বৎসরের প্রতিযোগিতায় অধিক সংখ্যক মল্লবীর যোগদান করেন। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুভূত হয়। মল্লযুদ্ধ বিষয়ে বাঙালী বালক ও যুবকগণের উৎসাহ যে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে এই প্রতিযোগিতায় তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী হইবার জন্যও যে, তাহাদের চেষ্টা আছে তাহারও নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সিমলা ব্যায়াম সমিতির পরিচালকগণ যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন অদূর ভবিষ্যতে তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া আশা হইতেছে। গোবরস জিমন্যাসিয়ামের মল্লবীরগণ দলগত চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন। নিম্নে প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—



বঙ্গীয় কুস্তি প্রতিযোগিতায় ঘোষেজ কলেজের সুশীল ঘোষ ও সিমলা ব্যায়াম সমিতির কৃষ্ণ ব্যানার্জ্জির মল্লযুদ্ধের একটি দৃশ্য।

৭ স্টোন বিভাগ

বিজয়ীঃ—বলাই দে (আহিরীটোল্যা তরুণ সঙ্ঘ)।

৮ স্টোন বিভাগ

বিজয়ীঃ—চণ্ডীদাস (জোড়াবাগান ব্যায়াম সমিতি)।

৯ স্টোন বিভাগ

বিজয়ীঃ—নারায়ণ দত্ত (জোড়াবাগান ব্যায়াম সমিতি)।

১০ স্টোন বিভাগ

বিজয়ীঃ—সুশীল ঘোষ (ঘোসেজ কলেজ অব ফিজিক্যাল এডু)।

১১ স্টোন বিভাগ

বিজয়ীঃ—দাশরথী পাল (গোবরস্ জিম্‌ন্যাসিয়াম)।

১২ স্টোন বিভাগ

বিজয়ীঃ—ভবানী ঘোষ (গোবরস্ জিম্‌ন্যাসিয়াম)।

গুরুভার বিভাগ

বিজয়ীঃ—মাণিক গুহ (গোবরস্ জিম্‌ন্যাসিয়াম)।

বিভিন্ন বিভাগে উন্নততর নৈপুণ্য প্রকাশের জন্য নিম্নলিখিত মল্লবীরগণকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইয়াছেঃ— ৭ স্টোন বিভাগের সুখলাল কুণ্ডু, ৮ স্টোন বিভাগের রাম দে, ৯ স্টোন বিভাগের রজনী চ্যাটার্জ্জি, ১০ স্টোন বিভাগে জহর গুহ, ১২ স্টোন বিভাগে অনাদি ঘোষ।

কলিকাতা হকি লীগ

কলিকাতা হকি লীগ প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগের সকল খেলা প্রায় হইয়া আসিয়াছে। লীগের সূচনায় এই খেলা বিষয় ক্রীড়ামোদিগণের মধ্যে যেরূপ নৈরাশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল বর্ত্তমানে তাহা আর নাই। বিভিন্ন বিভাগে কোন দল চ্যাম্পিয়ান হইবে ইহা দেখিবার জন্য অনেকেই প্রায় উদগ্রীব হইয়া পড়িয়াছে। তবে এইকথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরের প্রতিযোগিতার ফলাফল ক্রীড়ামোদিগণকে সেইরূপভাবে চঞ্চল করিতেছে না। বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন লীগ প্রতিযোগিতার উঠা নামা বন্ধ করিয়া দেওয়ায় এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

প্রথম বিভাগে পুলিস দল লীগ তালিকার শীর্ষ স্থানে বর্ত্তমান আছে। শেষ পর্য্যন্ত এই দল চ্যাম্পিয়ান হইবে। রেঞ্জার্স দল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও পুলিশ দলকে পশ্চাতে ফেলিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। পুলিশ দল প্রথম বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হইবে ইহা একরূপ নিশ্চিত।

দ্বিতীয় বিভাগে কালীঘাট দল ৩০ পয়েন্ট পাইয়া চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে সেণ্ট টমাস স্কুল দল ২৮ পয়েন্ট পাইয়া। কালীঘাট দলের এই সাফল্য প্রশংসনীয়।

তৃতীয় বিভাগের 'এ' গ্রুপে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল ও ক্যালকাটা

জিমখানা দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে। কোন দল শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ান হইবে বলা কঠিন।

তৃতীয় বিভাগের 'বি' গ্রুপে শ্যামবাজার ইউনাইটেড দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ওরিয়েণ্ট্যাল গ্যাস কোম্পানী দল চ্যাম্পিয়ানসিপের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেও শেষ পর্যন্ত সাফল্যলাভ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

বেটন হকি কাপ প্রতিযোগিতা

আগামী ১৪ এপ্রিল তারিখ হইতে কলিকাতার মাঠে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ হকি বেটন কাপ প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হইবে। প্রতি বৎসর এই প্রতিযোগিতায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট দল যোগদান করে। বিভিন্ন দলের উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য স্থানীয় ক্রীড়ামোদিগণকে বিশেষভাবে আনন্দ দান করে। বিশ্ববিজয়ী ভারতীয় হকি দলে ভবিষ্যতে কোন্ কোন্ খেলোয়াড় স্থান পাইবেন তাহা এই প্রতিযোগিতা অবলোকন করিয়াই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই বৎসরের অনুষ্ঠানে সেইরূপ উৎসাহোদ্দীপক ও দর্শনযোগ্য কিছু থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অনেক বিশিষ্ট দলের যোগদান না করিবার সম্ভাবনাই বেশী। এই পর্যন্ত যে কয়েকটি দল যোগদান করিয়াছে তাহার মধ্যে ভগবন্ত ক্লাব, ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স লক্ষ্ণৌ এম পি এ প্রভৃতি দলের নাম উল্লেখযোগ্য। এখনও যোগদানের শেষ দিন অতিবাহিত হয় নাই। আমরা আশা করি বেটন হকি প্রতিযোগিতা পরিচালকগণ ভারতের সকল বিশিষ্ট দল যাহাতে যোগদান করে তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

বাঙলায় নববর্ষ উৎসব

বাঙলায় নববর্ষ উৎসবের দিন আগতপ্রায়। পহেলা বৈশাখ এই উৎসব পালিত হইয়া থাকে। হাওড়া ও কলিকাতার বিভিন্ন পার্কে দলে দলে বালক বালিকা, যুবক-যুবতীগণ একত্র হইয়া এই উৎসব পালন করেন। এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনী। ১৯৩১ সালে সর্বপ্রথম হাওড়ায় কয়েকজন ব্যায়াম পরিচালকের প্রচেষ্টায় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পর ধীরে ধীরে হাওড়ার সকল ক্লাব ও ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান এই উৎসবে যোগদান করিয়া বিরাট সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনী করিবার ব্যবস্থা করেন। এই প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠান সুপরিচালিত করিবার জন্য হাওড়ার সকল ক্লাব ও সমিতির প্রতিনিধিগণকে লইয়া হাওড়া ফেডারেশন অব এসোসিয়েশন গঠিত হয়। এই হাওড়া ফেডারেশন ১৯৩৬ সাল হইতে এই বিষয় কার্য করিতে আরম্ভ করে। ১৯৩৭ সালে এই ফেডারেশনের অনুষ্ঠান কলিকাতার কতিপয় উৎসাহী ব্যায়ামবীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার ফলে ১৯৩৭ সালে দক্ষিণ কলিকাতা ও উত্তর কলিকাতায় হাওড়ার অনুকরণে উৎসব হয়। ১৯৩৭ সালের বিভিন্ন স্থানের পরিচালকগণ এই উৎসবটিকে নিখিল বঙ্গীয় করিবার উদ্দেশ্যে একটি নিখিল বঙ্গ ফেডারেশন অব এসোসিয়েশন এণ্ড ক্লাবস নামে সমিতি গঠন করেন। ১৯৩৮ সালে উক্ত নিখিল বঙ্গ ফেডারেশন অব এসোসিয়েশনস্ বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে এই উৎসব কিরূপে পালিত হইতে পারে তাহার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। ইহার পর হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠান বাঙলার বিভিন্নস্থানের প্রতিষ্ঠানসমূহকে নববর্ষ উৎসব পালন করিতে সাহায্য করিয়া আসিতেছে। হাওড়া, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যে উৎসব হয় তাহা এই নিখিল বঙ্গ ফেডারেশন অব এসোসিয়েশনের সভ্যগণই পরিচালনা করেন। এই সকল পরিচালকগণ সকলেই এক একজন বিশিষ্ট ব্যায়ামব্রতী। ইঁহারা বাঙলার সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যয়াম চর্চার স্পৃহা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ উৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই বৎসরে এই উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা, হাওড়া, চন্দননগর ও দমদমায় বিশেষ তোড়জোড় চলিয়াছে। কলেজ ও স্কুলের ছাত্রগণও দলে দলে বিভিন্ন স্থানে যোগদান করিতেছেন। বিভিন্ন স্থানের অনুষ্ঠানে পূর্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক সংখ্যক বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী যোগদান করিবেন। বিভিন্ন স্থানের অনুষ্ঠানই যে দর্শনযোগ্য হইবে ইহা বলাই বাহুল্য।

সম্মিলিত ব্যায়ামের উদ্দেশ্য

সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনী কেবল যে ব্যায়ামের উৎসাহ বৃদ্ধি করে তাহা নহে, ইহাতে একতা, সঙ্ঘবদ্ধতার স্পৃহাও বৃদ্ধি পায়। জাতির ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে এই সকল গুণাবলীর যে প্রয়োজন আছে ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। নববর্ষ অনুষ্ঠান পরিচালকগণ এই বিষয় এক নূতন আদর্শ জাতির সম্মুখে ধরিয়াছেন। জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতিকামী সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বিশেষের ইহাদিগকে সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য। দীর্ঘ দশ বৎসর বহুবাধা ও অর্থ অনটনের মধ্য দিয়া নববর্ষ উৎসবের পরিচালকগণ ইহার অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছেন। দেশবাসী ইহাদের মহৎ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া সাহায্য করিলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব।

বাঙলায় সন্তরণ পরিচালনা

বাঙলায় সন্তরণ মরসুম আরম্ভ হইয়াছে। বিভিন্ন সন্তরণ প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন উৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত করিয়াছেন। দলে দলে সন্তরণ উৎসাহীগণ এই সকল প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতেছেন। কলিকাতার বিভিন্ন পুষ্করিণীতে সন্তরণকারী ও সন্তরণকারিণীদের ভীড় ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এখনও উদ্বোধন উৎসব করেন নাই। দুই এক দিনের মধ্যেই তাঁহাদের উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সন্তরণ শিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার কোনই নিদর্শন এই পর্যন্ত আমরা পাইলাম না। প্রতি বৎসর এই সকল প্রতিষ্ঠান কয়েকজন সন্তরণ শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া যেভাবে নিশ্চিন্ত থাকেন, অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা করেন না, এইবারেও তাহার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। সন্তরণ কৌশলের উন্নতির জন্য মাটির উপরে ব্যায়াম করিবার যে সকল প্রথা আছে তাহা কোন প্রতিষ্ঠানেই পরিচালিত হইতেছে না। এইরূপ ব্যবস্থা যে তাঁহারা করিবেন তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। সন্তরণকারীদের উন্নতি মাটির ব্যায়াম ব্যবস্থার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। বিভিন্ন সন্তরণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণকে ইহা উপলব্ধি করিতে আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করি।

কবিতা

চিত্রার্পিত

অরুণ মিত্র

জ্বলন্ত মশাল-মুখ বিঁধিয়াছে বীতসূর্য
অপরাহ্ণ-সীমা
আলোর ঝলক লাগে—কর্কশ হাতের শিরা,
মণিবন্ধটুকু,
পাঁজরের ওঠানামা, দক্ষিণ ঊরুতে টান,
তির্যক ভুরুর
ভগ্ন রেখা—চিত্রময় শূন্যতল। রাজধানী
ভুলিয়াছে স্মৃতি।

এখন যে বিরামের সুরভি সময় ছিল
নিত্য নিয়মিত,
এখন যে উষ্ণ স্নায়ু মধ্যাহ্নের স্তূপ ঠেলে
পুরাণো অভ্যাসে
বাতাসে জুড়ানো যেত। অস্তাচলে বাঁশরীর
সুরে বাজিবার—
দ্বারপ্রান্তে ছুটি পেয়ে বাজিবার দিন যত,
কাল্পনিক তারা।

খোঁজে চোখ দ্বারে দ্বারে করধৃত অগ্নিশিখা—
বিগলিত নভ,
সমস্ত নখের সারি ফুটিয়াছে দূরান্তের
তারকারা যেন—
উল্লসিত চোখ খোঁজে, যে চোখে ত্রাসের বাসা
তাহারও সন্ধান।
চকিত আলোকে ঝলে পাঁজরের ওঠানামা,
মণিবন্ধটুকু।

বণিক

বিমলচন্দ্র ঘোষ

সোনার স্বপন দেখি রাশি রাশি বিশুদ্ধ সোনার,
গহন সুড়ঙ্গ পথে, ভূগর্ভের কালো অন্ধকারে,
লোলুপ রসনা মেলি' পান করি তীব্র হলাহল
অগ্নিবর্ণ গলিত সোনার। স্বপ্নের আকাশ জুড়ে
কোটি কোটি স্বর্ণকীট পক্ষধর নক্ষত্রের মত
উড়ে চলে অফুরন্ত আদি অন্তহীন। বসে থাকি—
রাজকীয় আদর্শের দম্ভের ময়ূর সিংহাসনে;
কোটি কোটি শ্রমরিক্ত দুর্ভাগার কঙ্কাল-মর্মরে
সমাধি রচনা করি তাজমহল প্রেমের বিলাস,
মানবিক প্রেম নয়, আত্মঘাতী অহংবাদী প্রেম
আভিজাত্যে জগতের অন্যতম মসৃণ বিস্ময়।
নরমেধযজ্ঞভূমে রুধিরাক্ত পৃথিবীতে বসি'
রত্নাকর স্বর্ণসিন্ধু নিঃশেষে আকণ্ঠ করি পান—
দানবিক অট্টহাস্যে। বেড়ে যায় তৃপ্তিহীন তৃষা;
স্বপ্ন দেখি জ্যোতির্ময় রাশি রাশি বিশুদ্ধ সোনার,
কোটি কোটি স্বর্ণকীট পক্ষধর নক্ষত্রের মত
জীবন আচ্ছন্ন করে; নির্মম কামনা-খড়্গ হানি'
পৃথিবীর রক্তবহ নাড়ী ছিঁড়ে সমাজ সংসার
হেলায় নিক্ষেপ করি তপ্ততোয়া বৈতরণী তলে
পৈশাচিক মহোল্লাসে। হিরণ্ময় পাষাণ আত্মার
আজন্ম পূজারী আমি মদোন্মত্ত বণিক দুর্বার।

বিচিত্র বার্তা

সময় এখন কত? এ প্রশ্ন কেউ আমাদের জিজ্ঞাসা করলে অথবা আমাদের মনে উদয় হ'লেই আমরা পকেট থেকে ঘড়ি ধার করি। না হয় হাতঘড়ির উপর নজর দিই। অনেক সময় আমাদের মনে প্রশ্ন উঠে, ঘড়ি আমাদের বন্ধনে আবদ্ধ করছে, না আমরা তাকে করেছি। ঘড়ি কি আমাদের কৃতদাস না যথেচ্ছচারী শাসনকর্তা! প্রাচীনকালে সূর্যই আমাদের একমাত্র ঘটিকাযন্ত্র ছিল। এই সূর্যঘড়িতে সময়কে প্রাতঃকাল, দ্বিপ্রহর, সন্ধ্যা এবং রাত্রি এই চারভাগে ভাগ করা ছিল।

সর্বপ্রথম সঠিক মনোবিজ্ঞানীয় এবং সামাজিকভাবে সময়কে এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়—(১) যেসব লোক ঘড়ি ব্যবহার করে এবং (২) যারা করে না।

প্রথমে ঘড়ির স্থান নিরূপণ করা হয়েছিল গির্জার উচ্চ গম্বুজে। এই ঘড়ির সময়ই জনসাধারণকে এবং সাম্প্রদায়িক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ক'রত। তারপর দেওয়াল-ঘড়ির চলন সুরু হ'ল গৃহস্থের বাড়িতে। এর পর স্বর্ণনির্মিত আধারের মধ্যে যে ঘড়ি তৈয়ারী হ'ল তা সময়ের প্রয়োজন ছাড়া সর্বদাই আবৃত থাকত। বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা সৌখীন সুদৃশ্য হাতঘড়ি পেয়েছি। আমরা নাড়ীর দ্রুত এবং মৃদু স্পন্দন ঠিক করি একটি ছোট মজবুত কলকব্জা সংযোজিত হাতঘড়ির একটানা স্পন্দনের সঙ্গে। আমাদের এত বড় শরীরযন্ত্রের কোন্ কলকব্জায় কতখানি অবসাদ এসেছে, তাহার একটা বেশ আভাস পাই আমাদের নাড়ীযন্ত্রের স্পন্দনের মৃদু বা দ্রুতবেগ পরীক্ষা ক'রে। এ পরীক্ষায় অপকৌশল চলে না। আমাদের সূক্ষ্ম সময় জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা বেশী। সেইজন্যই বৈজ্ঞানিকেরা বহু সময়ের গবেষণায় সময়কে আজ বহুভাগে বিভক্ত করেছেন। শব্দ এবং আলোকরশ্মির অস্তিত্ব আমরা কত সময়ের মধ্যে পেয়ে থাকি, সেটা আজ শক্তিশালী ঘড়ি নির্মাণের ফলে জান্‌তে পেরেছি। সময়ের এতখানি জ্ঞান আমাদের বেড়েছে যে, আমরা মুমূর্ষু মানুষকে পরীক্ষা ক'রে তার জীবন আর কত মিনিট বা সেকেণ্ড পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে বল্‌তে পারি। সময় এখন কত? ঘণ্টা, মিনিট বা সেকেণ্ড—সময়ের এই যে ভাগ, এটাকে অবজ্ঞা করলে জীবনধারণের পক্ষে আমাদের কতখানি কষ্টকর এবং অসুবিধাজনক, তা আমরা অনুভব করতে পারি।

যাহা হউক, ঘড়ির সময় কোন ব্যক্তিগত সময়ের কিন্তু অনুরূপ নয়। সেখানে কালের দীর্ঘতা যেমন বাড়ে, আবার তেমনি হ্রাস পায়। কোন কোন দিন অসীম, আবার কোন মাস, সপ্তাহ দ্রুতবেগে যেন অতীত হয়। অনেক সময় কয়েক বৎসরের সময়ও অতি দ্রুতবেগে অদৃশ্য হয়, কিন্তু কয়েক মিনিট সময়কে যেন অনন্তকাল বলে মনে হয়। সুতরাং সেখানে এমন একটা জীবন্ত সময় রয়েছে, যেটা জাতি, বয়স এবং মানুষের প্রকৃতির অনুপাতে দীর্ঘ অথবা ধীরগামী হয়। ঘড়ি যেভাবেই সময় নির্ণয় করুক না কেন, কতক লোক জীবনধারণ করে, যাদের জীবনধারার গতি দ্রুত অথবা স্থির।

Leconte de Nouy সম্প্রতি সময় এবং জীবনের উপর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। ব্যক্তিবিশেষের ক্ষত-স্থান নিরাময় হ'তে সময়ের যে তারতম্য দেখা যায়, সে সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে জনসাধারণের নিকট তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেছেন। গতির সঙ্গে প্রত্যেক লোকের বয়সের একটা প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রয়েছে। সে বয়সটা সরকারী বা কাল ক্রমাগত নয়—সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞানীয়। পঞ্চাশ বছর বয়সের লোকের ক্ষতস্থান নিরাময় হ'তে যে সময় লাগে, তার থেকে চতুর্গুণ দ্রুত সময়ের মধ্যেই দশ বছর ছেলের ক্ষতস্থান নিরাময় হ'য়ে যায়। ছেলেবেলায় শরীরের হাড় খুব কম সময়ে জোড়া লাগে এবং ছিন্ন টিসুগুলি অতি দ্রুত সময়ে নূতন আকার নেয়। মাত্র এক বৎসরের মধ্যে মানব শিশুর যে দৈহিক পরিবর্তন ঘটে, তাতে যারা এক বছর পূর্বে দেখেছে, তাদের আশ্চর্য হতে হয়। পঞ্চাশ এবং একান্ন বৎসর বয়সের মধ্যে কদাচিৎ কোন পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্তু এক বৎসরের শিশুর বেলায় সময়ের পরিবর্তন দমকা বাতাসের মতই হয়।

* * * *

জন্তু, পাখী এবং মাছের গতিবেগ

	ঘণ্টায়		
চিতাবাঘ	”	৬০	মাইল
জিরাফ	”	৩৫	”
সালমন	”	২৫	”
পাইক	”	১৫	”
ঈগল	”	১১০	”
বাজপাখী (আকাশ থেকে শিকারের উপর যখন কোণাকুণিভাবে উড়িয়া আসে)	”	৮০	”
বাজপাখী (সাধারণ উড্ডীয়মান অবস্থায়)	”	৬৫	”
ডাক (হংসজাতীয় জলচর পক্ষী)	”	৪৪-৫৯	”
স্টারলিং (শুকজাতীয় পক্ষীবিশেষ)	”	৩৮-৪৯	”
গৃহপালিত পায়রা	”	৩০-৩৬	”
পেলিক্যান	”	২৬	”
লার্ক	”	২৩-২৮	”
হাতী	”	২৫	”

কোন্ কোন্ জন্তু ও পাখী কত বৎসর পর্যন্ত বাঁচে

	বৎসর		বৎসর
কচ্ছপ	৩৮০	গণ্ডার	৪০
শকুণী	১১৮	বানর	৪০
ঈগল	১০৪	ময়ূর	৪০
হস্তী	১০০	ঘুঘু	৪০
রাজহাঁস	৭০	মুরগী	৩৪
পেঁচা	৬৬	ভালুক	৩৩

* * * *

নস্যির নেশা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। একটি বিলাতী মাসিক পত্রিকায় ওদেশে কি পরিমাণ নস্যির কাট্‌তি বেড়ে চলেছে, তার হিসাব দেওয়া হ'য়েছে। কৃষিবিষয়ক একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে লেখক বলেছেন,—নস্যি ব্যবসায়ী এবং কৃষকদের চিন্তার কারণ নেই। ১৮৮০ সালে ৪০ লক্ষ পাউন্ড নস্যি বিক্রী হ'য়েছিল। ১৯২৯ সালের হিসাবে দেখা যাচ্ছে ৪১০ লক্ষ পাউন্ড নস্যির কাট্‌তি হ'য়েছে। ঐ সময় থেকে নস্যির চাহিদা কম্‌তে আরম্ভ ক'রে ৩১০ লক্ষ পাউন্ডে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৩৯ সালের হিসাবে দেখা গেছে ৩৮০ পাউন্ড।

* * * *

সাপের কাছ থেকে সাত ফুট দূরত্বে থাকা নিরাপদ। একখানি বিলাতী মাসিক পত্রিকায় একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক এরূপ মত প্রকাশ ক'রেছেন। প্রবন্ধে তিনি আরও বলেছেন যে, সচল বস্তুর উপর সাপের দৃষ্টি খুব দ্রুতবেগে আকর্ষণ করে। সুতরাং কম দূরত্বের মধ্যে যদি সাপের আবির্ভাব বুঝতে পারেন, তাহ'লে পলায়নের চেষ্টা করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ না ক'রে স্থিরভাবে অপেক্ষা করাই নাকি তাঁর মতে যুক্তিসংগত।



দক্ষিণ আলবেনিয়ার পার্বত্য গ্রাম প্রেমেতি—এই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি গ্রীকেরা দখল করিয়াছে এবং এখানে বহু ইতালীয় সৈন্য বন্দী করিয়াছে ও প্রচুর সমরোপকরণ হস্তগত করিয়াছে।

পুস্তক পরিচয়

ব্যবসা ও বাণিজ্য—মাসিক পত্রিকা, ফাল্গুন সংখ্যা। সম্পাদিকা, শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু। কার্যালয়—৯।৩নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য পাঁচ টাকা ছয় আনা।

কলিকাতার পৌরজনগণ সেদিন একটি জনসভায় সমবেত হইয়া দেশপ্রেমিক শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শচীন্দ্রপ্রসাদের প্রতিষ্ঠিত 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' নামক মাসিক পত্রিকাখানির কথা আমাদের মনে উঠিতেছে। বাঙলাদেশের ব্যবসা ও বাণিজ্যের উন্নতির উদ্দেশ্যে শচীন্দ্রপ্রসাদ এই পত্রখানার প্রবর্তন করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অসামান্য কৃতিত্ব সহকারে এই পত্রিকার সম্পাদনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, তাঁহার পরলোকগমনের পর তাঁহার সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু এই পত্রিকার সম্পাদনের ভার নিজের হাতে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা বসুর এ বিষয়ে অবিসংবাদিত যোগ্যতা রহিয়াছে। তাঁহার পরিচালিত 'সুপ্রভাত'-এর স্মৃতি বাঙালী এখনও ভুলে নাই। যে জীবন্ত উদ্দীপনা তাঁহার 'শিখের বলিদান' এবং 'সুপ্রভাতে' লেখার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা আমরা জানি। আমরা আশা করি, দেশবাসী এই নবীন কর্তব্য প্রতিপালনে শ্রীযুক্তা বসুকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবেন। 'ব্যবসা ও বাণিজ্যের' ফাল্গুন সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। শচীন্দ্রপ্রসাদের জীবনী এবং দেশসেবায় তাঁহার অসামান্য অবদানের আলোচনামূলক কতকগুলি প্রবন্ধে এই সংখ্যার গৌরব বর্ধিত হইয়াছে, তাহা ছাড়া কতকগুলি ভাল ভাল প্রবন্ধও রহিয়াছে। আমরা এই পত্রিকার বহুল প্রচার কামনা করি।

প্রেম ও পৃথিবীঃ—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র সোম, ২০৩নং কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

রামপদবাবু একজন শক্তিশালী লেখক। তাঁহার নিজের কথা বলিবার আছে এবং বলিবার মত করিয়া বলিবার ক্ষমতাও তাঁহার আছে। তাঁহার বেদনা গভীর এবং গভীর বলিয়াই তিনি যে সুরে কথা বলেন, তাহার মূর্চ্ছনা হয় ব্যাপক। তিনি আন্তরিকভাবে জাতীয়তা-বাদী, দেশের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় মমত্ববুদ্ধি আছে, সে মমত্ববোধ মর্যাদাতে দৃঢ়। কিন্তু সে মর্যাদাবোধ তাঁহাকে অন্ধ করে না। দেশের রীতিনীতি এবং সংস্কারের মধ্যে মনুষ্যত্বের অবমাননার স্পর্শ যেখানে তিনি অনুভব করেন, সেখানে তাঁহার চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং ঝলকে ঝলকে অগ্নিময় জ্বালা বিস্তার করে। পরিবর্তন তিনি চাহেন, কিন্তু আপনাকে বিপর্যস্ত করিয়া অন্ধপরাণুকরণে বিপর্যয়ের পক্ষপাতী তিনি নহেন, তিনি চাহেন বিশুদ্ধি। আত্মমর্যাদা তাঁহার উগ্র এবং তীক্ষ্ন। সমাজের যে সব রীতি-নীতি অন্ধ বিশ্বাসের ছোপে চলিয়া যাইতেছে, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি সেগুলির অন্তর্নিহিত নিষ্ঠুরতাকে উন্মুক্ত করে, তাঁহার লেখায় সেগুলির বিরুদ্ধে মনকে মোচড় দেয়।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে কয়েকটি তরুণ-তরুণীর অন্তরের দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে আখ্যানভাগের ভিতর দিয়া সূক্ষ্ম কারিগরীর সঙ্গে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। আধুনিক তরুণ-তরুণীর মনের গহন কোণে ঢুকিয়া লেখক অনেক গুপ্ত তত্ত্বকে ব্যক্ত করিয়াছেন। গূঢ়তার প্রকাশই রস-সৃষ্টির মূল কথা। রসের স্বরূপই হইল স্বাত্মরহঃ প্রকাশং।। অর্থাৎ নিজের মনের কোণে যে জিনিষ লুকান ছিল তাহার সঙ্গে পরিচয়ে। রামপদবাবু আধুনিক তরুণ-তরুণীর মনের কোণে কোণে যে বেদনা গোপন থাকে সেগুলি ভাষায় রূপ দিয়াছেন, তাই তাঁহার রসসৃষ্টি সার্থক হইয়াছে।

তপন বড় ঘরের ছেলে, তাহার বিবাহ উপলক্ষে উৎসব আড়ম্বরের ভিতর দিয়া আলোচ্য উপন্যাসের আরম্ভ হইয়াছে। তপনের বিবাহ হইবার কথা ছিল ছায়ার সঙ্গে। ছায়া তপনের মেজ বৌদিদি সুলতার ছোট বোন; কিন্তু সে বিবাহ হইল না, কেন হইল না—উপন্যাসের নরনারীর চরিত্রগুলি এই বেদনাময় ব্যর্থতাকে কেন্দ্র করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তপনের বাপ মা রীতি-নীতি এবং সংস্কারে সেকেলে ধরণের লোক; কিন্তু বাহিরে আধুনিকতার ভড়ং তাঁহারা চাহেন। সংস্কার অতিক্রম করা যায় না, মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে, এক্ষেত্রেও সংকীর্ণতা মনকে অভিভূত করিয়া তপনের প্রণয়িনী ছায়ার সঙ্গে তপনের বিবাহে ঘটাইল অন্তরায়। তপনের পিতামাতা চড়া হারে বরপণ হাঁকিলেন, ছায়ার পিতা বিবাহের তিন বৎসর পূর্বেই বৈবাহিকের চাহিদা মত দশ হাজার টাকা আগাম দিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ ভদ্রলোক [illegible] তিনি ছিলেন ক্যাশিয়ার এতদিনে দেখা গেল হঠাৎ পঁচিশ হাজার টাকা তহবিলে কম। বিপন্ন ভদ্রলোক তপনের পিতার নিকট আসিয়া যে টাকা পণ বাবদ আগাম দিয়াছিলেন, তাহা ফিরাইয়া চাহিলেন; কিন্তু টাকার পরিবর্তে মিলিল উপেক্ষা। তিনি আত্মহত্যা করিয়া অপমান এড়াইলেন; তপনের মেজ বৌদিদিও মর্যাদাশীল পিতার অপমানের দারুণ আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া করিল আত্মহত্যা। এই ব্যাপারের প্রতিক্রিয়াতে তপনের সঙ্গে ছায়ার বিচ্ছেদ; কিন্তু সে বিচ্ছেদের মধ্যেও মমত্ব-মর্যাদার একটা ত্যাগময় পরম মাধুর্যের ছাপ চিত্তের উপর স্থায়ী হইয়া পড়ে। ছায়ার সঙ্গে বিবাহ হয় তরুণের, যে তরুণের অগভীর দেহসর্বস্ব প্রেমের অভিনয় তপনের চিত্তে করিয়াছিল যুগপৎ ঘৃণ্য এবং ঈর্ষার উদ্রেক। ছায়া নিজেও সে তরুণের ভালবাসার অন্তঃসারতা উপলব্ধি করিয়া পিতৃহীন অবস্থায় ঘোর বিপদের দিনে লোকলজ্জাকে উপেক্ষা করিয়া তপনের লইয়াছিল আশ্রয়।

সুবৃহৎ উপন্যাসখানির ইহাই হইল অপেক্ষাকৃত যেটি বাহিরের দিক, সেখানে বিভিন্ন ছন্দে, বিচিত্র সুরে ভাষার ব্যাপক বিস্তার; কিন্তু ইহার ভাবরাজ্যের আলোক উদ্ভাসিত হইতেছে বাঙলার একটি ক্ষুদ্র পল্লীর অন্তরে, গোলপাতায় ঢাকা ছায়া ঘেরা একটি কুটীর প্রাঙ্গণে। তপনের বন্ধু সুবোধের সেখানে বাড়ী। নারীত্ব সেখানে পরিপূর্ণ মহিমায় প্রস্ফুটিত, মাতৃরূপে, ভগ্নী স্বরূপে, সখীরূপে এবং পত্নীরূপে। সেখানেও দুইটি তরুণ-তরুণী—পুলকেশ আর আভা। পুলকেশের অন্তরে অগ্নিময় স্বদেশ প্রেম। সেই আকর্ষণে সে আকুল হইয়া ফিরিতেছে এবং ভবিষ্যতের সম্বন্ধে সে ভ্রূক্ষেপহীন। 'ঘরের মঙ্গল স্পর্শ নহে তোর তরে', রুদ্র দেবতার এই আহ্বানে সে দিল সাড়া। আভার অভিভাবকরা উভয়ের অন্তর জানিয়াও পুলকেশের সঙ্গে তাঁহারা বিবাহ দিতে পারিলেন না, পুলকেশের পিতাও নিজের ইচ্ছা সত্ত্বেও এই দিক করিলেন সংকোচ। বৃষ্টি বাদলাভরা এক দুর্যোগময়ী রজনীতে আঁধার কুটীরে পুলকেশের সঙ্গে আভার হইল মিলন। আভা দুঃখ দৈন্যকে বরণ করিয়া নারীত্বকে মর্যাদা দিল; পুলকেশ নিজের বাহুর রুধিরধারায় তাহার সীমন্ত সিন্দুর আঁকিয়া দিল। রাত্রির অন্ধকার না কাটিতেই সে তাহার দুর্যোগময় জীবনের পথে ঝাঁপ দিল। ফিরিবে কি না কে জানে? আভা বলিল,—"তিনি বাধাবন্ধহীন দুর্গম, তবু তাঁকে বাঁধিবার রজ্জু আমিই প্রার্থনা করিলাম, না হইলে তাঁকে হারাবার ভয় ছিল। লোকচক্ষে আমি অপরাধী, কিন্তু মনের উপর জোর নাই। বহুদিন পূর্ব হইতে স্বামীরূপে যাঁকে কল্পনা করিয়াছি, তাঁর কাছে লজ্জা আমার ছিল না। তাই অকুণ্ঠচিত্তে সেই রাত্রিতে ভিক্ষা করিতে পারিলাম। তিনিও প্রসন্ন মনে দিলেন। আপনার জানালা দিয়া যদি দৃষ্টিকে তীক্ষ্ন করিয়া এ ঘরে পাঠাইতে পারিতেন ও অকালে প্রভাতের আলো ফুটিয়া উঠিত ত দেখিতেন, তাঁর দেওয়া পরম ঐশ্বর্য আমার সীমন্ত সেদিন কেমন রাঙ্গাইয়া দিয়াছিল।"

রামপদবাবুর অঙ্কিত চরিত্রগুলি এই আলোকে জীবন্ত হইয়াছে। ত্যাগের পরম প্রতিষ্ঠা তিনি করিয়াছেন এবং তরুণ চিত্তের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঊর্ধে দেখাইয়াছেন সেই প্রেমের মহিমাময় দিব্যলোককে। তরুণ চিত্তের প্রতি স্পন্দনের গোপন পরিচয় দিয়াছেন তিনি এবং সেই গূঢ়তায় চরিত্রগুলি পাইয়াছে সুস্পষ্ট রূপ। এই উপন্যাস বাঙলার রস-সাহিত্য স্থায়ীভাবে সমৃদ্ধ করিবে।

গ্রাণাডার শেষ বীরঃ—এস ওয়াজেদ আলী, বি-এ (ক্যাণ্টব), বার-এট-ল, প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, কলিকাতা। ফেলো কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রণীত। প্রকাশক, মসনুদ্দীন হোসেন বি-এ, নূরে লাইব্রেরী পাবলিশার। ১২।১, সারেঙ্গ লেন, তালতলা, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য বারো আনা।

ইসলামের আলোকসম্পাতে মুর জাতির অভ্যুদয় ঘটে এবং এই মুর জাতির দ্বারা ইসলামের সংস্কৃতি ইউরোপ খণ্ডে সম্প্রসারিত হয়। মুরদের এই অভ্যুত্থান ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সিমন ওকলী মুর জাতির এই জাগরণকে অভূতপূর্ব ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মিঃ এস ওয়াজেদ আলী সুলেখক স্বরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত 'গ্রাণাডার শেষ বীর' কিশোরদের জন্য লিখিত। সরল এবং সহজ ভাষায় বইখানি বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এই ধরণের ঐতিহাসিক আগ্রহো-দ্দীপক বই ছেলে মেয়েদের মধ্যে বহুল প্রচারিত হইলে ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অনেক নূতন জিনিষ জানিবার ও শিখিবার ইচ্ছা তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধি পাইবে। কয়েকখানা সুদৃশ্য চিত্র সঙ্গে থাকায় পুস্তকখানা সমধিক আকর্ষণীয় হইয়াছে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

দেশ

৮ম বর্ষ] ২৯শে চৈত্র, শনিবার, ১৩৪৭ সাল। Saturday, 12th April, 1941. [২২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙলায় নববর্ষ—

বর্ষচক্র ঘুরিয়া গেল, ১৩৪৭ স্থানে এক অঙ্ক বাড়িয়া হইল আটচল্লিশ। ঘড়ি ঘণ্টা পল গণিয়াই মানুষের জীবন, আশাতেই মানুষ বাঁচে, তাই কালের এই পরিণাম দানের পালার মধ্যে তাহাকে থাকিতে হয়। নূতন চাহে সে। বিপরিবর্তশীল প্রকৃতিতে নূতন নিয়তই আসে; কিন্তু সকলের কাছে প্রত্যক্ষ হয় না, এজন্য স্পষ্ট ছেদ কাটিয়া মানুষ নূতনের রস আস্বাদন করিতে চায়। কিন্তু চাহিলেই সব জিনিষ পাওয়া যায় না। সেজন্য কর্মসাধনার প্রয়োজন। ব্যক্তির জীবনে যাহা সত্য, জাতির জীবনেও তাহাই সত্য। যে বৎসর অতীত হইল, তাহাকে আমরা ভুলিয়া যাইতে ব্যগ্র হইয়াছি, কারণ, বাঙালীর জীবন সুখে কাটে নাই সে বৎসর। কিন্তু সম্মুখে নূতনের মধ্যে সুখের বা আনন্দের সম্ভাবনা কিছু দেখিতেছি না বরং দুর্যোগের ঘনান্ধকার যেন চারিদিকে ঘনাইয়া আসিতেছে। পুরাতনের বিদায় এবং নূতন বৎসরের সন্ধিক্ষণে শুনিতেছি আর্ত এবং বিপন্নের হাহাকার, অন্নহীন, গৃহহীন নির্যাতিতের ক্রন্দনধ্বনি কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। বারিবিন্দুবিহীন বাঙলায় তপ্ত আকাশ উত্তপ্ততর করিয়া আগুনের হলকা উঠিতেছে, তাহার ধূঁয়া পাকাইয়া পাকাইয়া ছুটিয়া দৃষ্টিকে রুদ্ধ করিতেছে। নববর্ষ আজ আমাদের কাছে বহন করিয়া আনিয়াছে ইহার মধ্যেও একটি মহতী বাণী। সে বাণী হইল এই যে, জাগিয়া উঠ, মানুষ হও। মিথ্যাচারে ডুবিয়া থাকিও না,—"অতীব গুণসম্পন্নো ন জাতু বিনয়ান্বিতঃ, সুসূক্ষ্মমপি ভূতানামুপমর্দ্দমুপেক্ষতে।" অতি গুণসম্পন্ন যে, বিনয়ান্বিত যে, লোকের প্রতি সুসূক্ষ্ম অর্থাৎ একটু অত্যাচারও সে উপেক্ষা করিতে পারে না। নববর্ষের মুখে মহাভারতের কবির এই বাণী যেন আমাদের জীবনে নূতন শক্তি আনিয়া দেয়। আমরা যেন এই মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ত্যাগময় কর্ম প্রেরণায় নববর্ষকে অভিনন্দিত করিতে পারি। রুদ্র-দেবতার পরম প্রসাদ কাল-বৈশাখীর বজ্রনাদে আমাদিগকে সর্বপ্রকার প্রমাদ হইতে মুক্ত

মন্ত্রিমণ্ডলের দায়িত্বজ্ঞান—

বাঙলার বিভিন্ন স্থান হইতে, বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গ হইতে যেসব সংবাদ আমরা পাইতেছি, তাহাতে আমাদের উদ্বেগ বাড়িয়া চলিয়াছে। সরকারী বিধানে সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু সংবাদের সত্যতা অস্বীকৃত হইতেছে না। সিন্ধু প্রদেশে মাইনরিটি সমস্যার যে পরিণতি আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার সহিত তুলনা করিয়া আমরা বহুবার বাঙলা সরকারকে সতর্ক করিয়া দিয়াছি। কিন্তু তাহার ফল কি হইয়াছে? বাঙলা সরকার মাইনরিটির স্বার্থ সংরক্ষণ সম্পর্কে যথা কর্তব্য প্রতিপালন করেন নাই, করিলে লাটবাড়িতে শান্তি বৈঠকের প্রয়োজন হইত না। লাটবাড়িতে শান্তি বৈঠক হইল; কি তার সিদ্ধান্ত হইবে আমরা জানি না; কিন্তু আমরা গভর্নমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিতেছি মাইনরিটির স্বার্থ সংরক্ষণে যাহা করা উচিত ছিল তাঁহারা তাহা করিতেছেন কি? মাইনরিটির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ভারতীয় শাসনতন্ত্রে বিশেষ ব্যবস্থা গভর্নরের হাতে রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে যেসব সংবাদ আমরা পাইতেছি, সেগুলির আলোচনা করিয়া গভর্নমেণ্টের নীতি-নির্ণয়ের অধিকার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে; কিন্তু তাহাতেই সমস্যা মিটিবে কি? আজ বিপদের কাল মেঘে দেশ আচ্ছন্ন; কিন্তু বুক ফাটিলেও মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিবার উপায় নাই। তথাপি কর্তব্যের খাতিরে এই কথাই বলিব যে, মাইনরিটির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সুনিশ্চিত ব্যবস্থা অবলম্বনে কালবিলম্ব করিবার অবসর আর নাই। বাঙলার বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর যে কেরামতি তাহা খুবই বুঝা গেল। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের অনুকূল মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই; কারণ প্রকৃত জনমতের প্রভাব এ মন্ত্রিমণ্ডলকে স্পর্শ করে না, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের কৃপায় জোটবাঁধাদলের দ্বারা তাঁহারা সংরক্ষিত। এই মন্ত্রিমণ্ডল নিরপেক্ষভাবে এবং পদাধিকারের উপযুক্তভাবে সর্বশ্রেণীর প্রতি কর্তব্য প্রতিপালন করিবে, এ আশায় বসিয়া থাকা এখন বিড়ম্বনা মাত্র। এ অবস্থায় কর্তব্য কি, আমরা পূর্বেই সে

দেশ

নাই। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের উপর যে শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত তাহা দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না। সূক্ষ্ম নীতি বা তত্ত্ব লইয়া মানস-বিলাসের চেয়ে আজ প্রয়োজন যে বিপদ আসিয়া পড়িয়াছে তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া। শাসনবিধি অনুসারে গভর্নরের উচিত, শাসনতন্ত্র স্থগিত করিয়া স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করা। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত এবং প্রকৃত দায়িত্বমূলক শাসন এই দুইটি পরস্পর বিরোধী বস্তু, বাঙলার মাটিতে সে বস্তু বিষময় ফলই উৎপন্ন করিবে, একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। প্রকৃত স্বদেশপ্রেম এবং সব সম্প্রদায়ের সেবার উদার আদর্শ বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলে যেদিন ফুটিয়া উঠিবার অবসর পাইবে, আমরা সেইদিনের অপেক্ষায় থাকিব। আবার বলি, এ শাসনতন্ত্র স্থগিত করা হউক; নতুবা বাঙলার ঘোর অনিষ্ট ঘটিবে।

সংগ্রামেই শক্তির স্ফুরণ—

গত ২৩শে চৈত্র রবিবার বালী সরস্বতী পাঠাগারের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে যে সাহিত্য সম্মেলন হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় বলেন—"পাশ্চাত্য হাওয়া আসিয়া আমাদের সাহিত্য ও সমাজ জীবনকে বিষাক্ত করিয়াছে বলিয়া অনেকে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন; কিন্তু উদ্বেগের কারণ আছে বলিয়া আমি মনে করি না। আমি মনে করি, পাশ্চাত্যের ভাব-প্রবাহের সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের সাহিত্য শক্তিশালী হইয়াছে। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে ভয় পাওয়ার কিছু নাই। হয়ত প্রথম প্রথম আমাদের আচরণ ও চালচলন কতকটা বিকৃত হইয়াছে; কিন্তু আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিপন্ন হইয়াছে একথা বলা সঙ্গত নহে। দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে। বহু শতাব্দী ধরিয়া আমরা অনেক সংগ্রাম করিয়াছি। জগৎকে আমরা অনেক জিনিষ দিয়াছি ও জগতের নিকট হইতে অনেক জিনিষ গ্রহণ করিয়াছি। এই দেওয়া নেওয়ার শক্তি যদি আমরা দেখাইতে পারি, তাহা হইলে আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারিব।" সরকার মহাশয় একজন প্রবীণ সাহিত্যিক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি। তাঁহার উক্তি আমরা সর্বতোভাবে সমর্থন করি। আমরাও বলি, দ্বন্দ্বকে উপলব্ধি করিয়া তাহার সমাধানে শক্তির যে ক্ষেত্রে স্ফুরণ হয়, সেইখানে জাতি হয় জীবন্ত। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে গিয়া বাঙলা দেশে এই জীবনের জাগরণ হইয়াছে। বাঙালী পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা অভিভূত হয় নাই কোন দিন। এদেশের সাহিত্যিক এবং এদেশের সাধকগণ, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিতরের প্রাণবস্তুর দ্বারা জাতীয় সংস্কৃতিকে পুষ্ট করিয়াছেন। অপরের জিনিষ আত্মসাৎ করিয়া নিজের বৈশিষ্ট্যকে বিকাশ করিয়া তোলাই ত বাঙালী জাতির একটি প্রধান ক্ষমতা। সঙ্ঘর্ষে আমরা ভীত হইব না, বরং সঙ্ঘর্ষের ভিতর দিয়া প্রাণময় জীবনকেই বরণ করিয়া লইব। পশুর ন্যায় অন্ধের মত যাহারা পরের অনুসরণ করে, সমগ্রভাবে বাঙালী জাতির সঙ্গে তাহাদের যোগ কোন দিন ঘটে নাই এবং ঘটিবেও না। বাঙলার প্রাণশক্তি তাহাদিগকে স্রোতের শেহলার মত ভাসাইয়া লইয়া যাইবে; সুতরাং তাহাদের জন্য

আশা না নৈরাশ্য—

সহকারী ভারত সচিব সেদিনও বৃটিশ পার্লামেন্টে যে কথা বলিয়াছেন, তাহার পরে সপ্রু-লিনলিথগো সাক্ষাৎকারে ফল যে বিশেষ কিছু ফলিবে, আমরা মনে করি না। শুভ সাক্ষাৎকার হইয়া গেল—এমন সাক্ষাৎ আরও বহু হইয়াছে। কিন্তু কর্তারা কার্যত এক পা বাড়াইতেও প্রস্তুত নহেন। এমন অবস্থায় ডাক্তার মুঞ্জের ন্যায় একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি যে ভারতের অচল সমস্যার আসন্ন সমাধানের সম্ভাবনায় কেন যে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, আমরা ভাবিয়া পাই না। হিন্দু মহাসভা এবং মোস্লেম লীগের সুরে সুর মিলাইয়া শাসন পরিষদের সম্প্রসারণের ভিতর দিয়া দেশের লোকের প্রতিনিধিত্বের অধিকতর সুবিধা গ্রহণ করিবার জন্য ডাক্তার মুঞ্জে কংগ্রেসকে পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। হিন্দু মহাসভার সঙ্গে অবশ্য কংগ্রেসের মতের কার্যত বিরোধ নাই; কিন্তু জিন্না সাহেবের সঙ্গে হইবে কেমন করিয়া? সেদিনও জিন্না সাহেব কানপুরের বক্তৃতায় পাকিস্থানী প্রস্তাবের উপর জোর দিয়াছেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছেন যে, মুসলমানেরা ঐ দাবী কিছুতেই ছাড়িবে না। আপোষ-মীমাংসা, ঐক্য এসব মন্দ আমরা বলি না; কিন্তু বৃহত্তর স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করিয়া কোন আপোষ-মীমাংসার মূল্য থাকে না এবং আদর্শকে স্ফুটতর না করিয়া আপোষের অকেজো কথা আওড়ানোতে দ্বিধার সৃষ্টি হয়—জনমত বৃহত্তর প্রেরণা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। বড়লাটের সহিত মডারেট নেতাদের দেখা-সাক্ষাতে ভারতের সমস্যা সমাধানের যে বিশেষ সুরাহা হইবে, আমাদের এমন বিশ্বাস নাই। ভারতবাসীরা চায় দেশের শাসনকার্য পরিচালনে নিজেদের কর্তৃত্ব—চাকুরী নয় সে চাকুরীর মহিমা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে যেমনই হউক না কেন। রাষ্ট্রীয় শাসন কর্তৃত্ব দেশের লোকের হাতে তাহাতে আসে না—গোলামই বাড়ে, গোলামীর গরিমা মানবত্বের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণই করিয়া থাকে। সম্প্রতি বড়লাটের রিফর্ম কমিশনারের পদে মিঃ এইচ ভি হডসনের নিয়োগ হইতেই মডারেটদের জ্ঞানচক্ষু বোধ হয় উন্মীলিত হইয়াছে। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, শাসন-পরিষদের সম্প্রসারণ করিয়া রক্ষা সচিবের পদে বসিবে ভারতবাসী। সে আশা কত বৃথা, ইহাতেই বুঝা গেল। রক্ষা সচিবের পদ তো দূরের কথা, বড়লাটের একজন উপদেষ্টার পদও ভারতবাসীকে দিয়া কর্তারা বিশ্বাস পান না; সেই সব বিভাগীয় কাজে যে সব ভারতবাসী হাত পাকাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া সেই পদ দেওয়া হইল ইংরেজকে। ভারতের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান ভারতবাসীদের আছে, একথা মুখে বলিলেও ভারতবাসীদের পরামর্শকে যে কর্তারা কত তুচ্ছ করেন, ইহাই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতি—

খিদিরপুরের মাইকেল লাইব্রেরীর পরিচালকগণ মাইকেল মধুসূদনের স্মৃতিরক্ষার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। মাইকেল কিছুদিনের জন্য খিদিরপুরে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারই

মাইকেল লাইব্রেরীর কর্মকর্তৃগণ এইদিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে অনেকদিন হইতে যত্নপরায়ণ ছিলেন, আমরা ইহা জানি; এতদিনে তাঁহাদের প্রচেষ্টা কার্যে পরিণত হইবার আশা দেখা দিয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশন এজন্য ৫ কাঠা জমি দান করিয়াছেন। এখন প্রয়োজন অর্থের। বাড়ি তৈয়ার করিতে অন্তত কুড়ি হাজার টাকার প্রয়োজন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাক্ষরিত একখানা আবেদন এজন্য প্রকাশিত হইয়াছে। মাইকেল যাহা বাঙালীকে দিয়া গিয়াছেন, সে দানের তুলনা নাই। তিনি বাঙলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন, ইহা তো সকলেই জানেন, তাহা ছাড়া তিনি আর একটা জিনিষ দিয়াছেন যাহা দুর্লভ, তাহা হইল এই মেরুমজ্জাহীন জাতির মধ্যে প্রকৃত প্রাণবান মনুষ্যত্বের প্রেরণা। ভাষার বহিরঙ্গের পরিবর্তন অবশ্য কালক্রমে অনেক হইবে, কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদ রস বিগ্রহস্বরূপে বাঙলার সমাজদেহে জাগাইবে বীর্য এবং শৌর্যের উদ্দীপনা। বাঙলার সাহিত্যানুরাগী এবং স্বদেশপ্রেমিকদের দানে মাইকেলের স্মৃতিরক্ষার এই প্রচেষ্টা অবিলম্বে সাফল্যমণ্ডিত হইবে আমরা ইহাই আশা করি।

এথিওপিয়ার উদ্ধার—

আবিসিনিয়ার জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী একজন সুশিক্ষিতা মহিলা। স্বদেশপ্রেমের ভাব তাঁহার অন্তরে আছে। আদ্দিসআবাবায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাহিনী প্রবেশ করিবার পর তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, আবিসিনিয়ার স্বাধীনতার আজ পুনরুদ্ধার হইল। কিছুদিন পূর্বে পার্লামেণ্টে এই প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল, উত্তরে সরকার পক্ষ হইতে জানান হয় যে, আবিসিনিয়ায় রাজ্য বিস্তারের কোন আকাঙ্ক্ষা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নাই। অবশ্য রাজনীতিকদের উক্তির দ্যোতনা এবং ব্যঞ্জনা বুঝিয়া উঠা আমাদের মত সাধারণ বুদ্ধির লোকের পক্ষে সম্ভব নহে। তবে ইহা ঠিক যে, আবিসিনিয়ার সম্রাট যদি পুনরায় স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হন, তবে ভারতবাসীরা সবচেয়ে বেশী খুশী হইবে। সুশাসনের দ্বারা স্বাধীনতার অভাব মিটে না, দাসত্বের আগুন দহিয়া দহিয়া জ্বলে। সে জ্বালা হইতে হাবসীরা যদি আজ রক্ষা পায়, দাসত্বের বেদনায় জর্জরিত ভারতবাসী পরকে সুখী দেখিয়াও সুখ পাইবে। কিন্তু সবচেয়ে সুখের বিষয় হইত, ভারতবাসীরা যদি নিজেরা আবিসিনিয়ানকে বন্ধন মুক্ত করিতে পারিত। হারার জয়ের সম্পর্কে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সেদিন একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবে ভারতীয় সৈন্যদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশের কর্তৃত্বে পরিচালিত, ব্রিটিশ সামরিক কর্মচারীদের পরিচালনাধীনে নিয়ন্ত্রিত সেনাদলের ভারতীয়ত্ব কতখানি ইহাই হইতেছে প্রশ্ন। সৈন্যবিভাগ পুরাপুরি ভারতীয় করণের দাবী এখনও স্বীকৃত হয় নাই। যদি তাহা হইত, তবে এজন্য মনে প্রাণে গৌরব বোধ হইত। বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলী যাহাই মনে করুন, দেশের স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে এই প্রশ্নটি জাগিবে। ভারতবাসীরা চায় সমর বিভাগে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য মর্যাদা।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি—

গত ২২শে চৈত্র কলিকাতার মুসলিম ইন্‌ষ্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির রজত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধন করেন বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক। সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এই অনুষ্ঠানের কাজী নজরুল ইসলাম। হিন্দু সাহিত্য, মুসলমান সাহিত্য, সাহিত্যকে এই-ভাবে বিভাগ করার অর্থ আমাদের কাছে কিছু হয় না; কারণ সাহিত্যিকের উপজীব্য হইল ভাব এবং রস এবং সে ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক কোন ভেদ থাকে না। সভাপতি নজরুল ইসলামের বক্তৃতা হইতেই ইহা বুঝা যাইবে। তিনি বলেন, "যাঁহার ইচ্ছায় আজ দেহের মাঝে দেহাতীতের নিত্য-মধুর রূপ দর্শন করেছি—তিনি যদি আমার সর্ব অস্তিত্ব গ্রহণ করে আমার আনন্দময়ী প্রেমময়ী শক্তিকে ফিরিয়ে দেন, আবার যদি তাঁর চরণে রাসনৃত্যের ছন্দ জাগে—তা হ'লে আমি এই বিদ্বেষ-জর্জরিত কুৎসিৎ সাম্প্রদায়িকতা-ভেদজ্ঞান-কলুষিত অসুন্দর অসুর-নিপীড়িত পৃথিবীকে সুন্দর করে যাব।" কবির আশা অনেক বড়। নিত্য মধুর রূপ দর্শন অবশ্য আনন্দময়ী বা প্রেমময়ী শক্তির স্পর্শ ভিন্ন হয় না এবং যেখানে রূপ নিত্য মধুর, সেখানে চরণে রাস নৃত্যের ছন্দও জাগে এবং সে বস্তু যেখানে জাগে, সেখানে অহং-সর্বস্ব অস্তিত্বও মাধুর্যবলে গৃহীত হয়। এই যে অবিতর্ক এবং অসম্মূঢ় রস-বিগ্রহের সঙ্গে যোগ—এখানে সাধনার পরম প্রতিষ্ঠা। এ রাজ্যে যিনি পৌঁছিতে পারেন তিনি পৃথিবীকে সুন্দর করিবার শক্তি রাখেন স্বীকার করিতে রাজী আছি। এতটা হউক আর না হউক, কবি নজরুল যদি যে সব অসুরেরা বাঙলা দেশকে কুৎসিৎ করিতেছে, তাহাদিগকে শান্ত করিতে পারেন, যাহারা ভেদ বিভেদকে ভাঙ্গাইয়া নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধ করিতেছে, তাহাদিগকে ফিরাইতে পারেন, তবেই আমরা তাঁহার জয়গান করিব। মুসলমান সাহিত্য সমিতির সাধনা এই আদর্শের সাধনায় উদ্দীপ্ত হউক, আমরা ইহাই কামনা করি। কর্তার রায়ে সায় যোগাইয়া নিজের স্বার্থ গোছান প্রকৃত সাহিত্যিকের ধর্ম নয়—সাহিত্যিক বুঝেন সত্যকে এবং অভ্রান্তভাবে তিনি করেন সত্যের প্রতিষ্ঠা—নাহি কারো সঙ্গে বিরোধ, নাহি কারো উপরোধ, এই মর্যাদায় তিনি থাকেন অধিষ্ঠিত।

যুদ্ধের নূতন গতি—

জার্মানি কর্তৃক যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণে অপ্রত্যাশিত কিছু নাই। যুগোশ্লাভিয়া ত্রিশক্তি চুক্তিতে বদ্ধ না হইলে জার্মানি যে যুগোশ্লাভ রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতাকে মান্য করিবে না, যুদ্ধের অতীত ইতিহাসেই সে পরিচয় যথেষ্ট রহিয়াছে। জার্মানির স্থল সৈন্য এখনও প্রতাপশালী, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীও সে কথা বারংবার বলিয়াছেন; সুতরাং যুগোশ্লাভিয়া নিজের শক্তিতে জার্মানবাহিনীর অগ্রগতি প্রতিহত করিতে

পারিবে না; গ্রীসের পক্ষেও জার্মানির মত প্রবল শক্তিকে—ইতালিকে সে যেভাবে বাধা দিয়াছিল, সেভাবে বাধা দেওয়া সম্পূর্ণই কঠিন হইবে। গ্রীস এবং যুগোশ্লাভিয়াকে রক্ষা করিবার জন্য ইংরেজ পক্ষকেই আগাইয়া যাইতে হইবে। ইংরেজ সৈন্য গ্রীসের দিকে যাইতেছে। যুদ্ধের এই নূতন পরিস্থিতি হইতে এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে, যুদ্ধের কেন্দ্র ভূমধ্যসাগরের তীরভাগে বিস্তৃত হইল। জার্মানির শক্তি দুই ভাগ হইয়া পড়িল এবং ইহার ফলে ইংলণ্ড আক্রমণে সে আর জোর দিতে পারিবে না। যুদ্ধের কেন্দ্র পশ্চিম দিক হইতে এইভাবে পূর্বদিকে আসিয়া পড়াতে, ভারতবর্ষের সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক আরও নিকট হইল। ইংরেজের রণ-তৎপরতার এখন প্রধান ঘাঁটি হইবে ভারতবর্ষ। অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকায় সেনাদল থাকাতেও একথা বিশেষভাবে বলা চলে। রুশিয়ার মতিগতি এতাবৎকাল দুর্জ্ঞেয় ছিল; এখন যে পরিস্থিতি দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সে দুর্জ্ঞেয়তা কাটিয়া রুশিয়ার নীতি সুস্পষ্ট হইয়া পড়িবে, অনেকে এরূপ মনে করিতেছেন। জার্মানি যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার একদিন আগে তাড়াতাড়ি যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে রুশিয়ার অনাক্রমণমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়াতে কেহ কেহ এইরূপ কথা বলিতেছেন। বাস্তবিক পক্ষে, যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে রুশিয়ার এই চুক্তি করিবার উদ্দেশ্য কি হইতে পারে? জার্মানির সঙ্গে সন্ধি না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পর যুগোশ্লাভিয়ার গভর্নমেণ্ট রুশিয়ার সঙ্গে তাড়াতাড়ি এই চুক্তিতে আবদ্ধ যে হইলেন, রুশিয়ার নিকট জার্মানির আক্রমণের বিরুদ্ধতা করিবার মত সাহায্য পাইবার আশাই সে ক্ষেত্রে তাঁহাদের রহিয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। যদি রুশিয়া সত্যই তুরস্ক এবং যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীসের পক্ষে নামে তবে ইংরেজের নীতি এক্ষেত্রে সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু স্টালিনকে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া বড়ই কঠিন। রুশিয়া জার্মানিকে যেমন সন্দেহের চোখে দেখে, ইংরেজকেও বোধ হয় দেখে সেইরূপ সন্দেহের দৃষ্টিতে; সূক্ষ্ম চক্রে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার দিকে মুখ্যত তাহার দৃষ্টি রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার আবরণে সেই নীতি রুশিয়া কোন দিক দিয়া কিভাবে চালিত করিবে, ইহা ভবিতব্যই বলিতে পারে।

ভারত সেবায় এণ্ডরুজ—

মহামতি এণ্ডরুজের স্মৃতি রক্ষার জন্য ৫ লক্ষ টাকা প্রার্থনা করিয়া মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি নেতৃবর্গ দেশবাসীর নিকট একখানি আবেদনপত্র প্রচার করিয়াছেন। ভারত সেবায় মহামতি এণ্ডরুজ তাঁহার জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্রবাসী ভারতবাসীদের অভাব-অভিযোগের প্রতীকারের জন্য তিনি যে দীর্ঘকালব্যাপী সাধনা করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের বর্ণগত বৈষম্য তাঁহাকে সদা ব্যথিত করিত এবং তিনি মর্মে মর্মে এই সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীরা যতদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা অর্জন করিতে না পারিবে, ততদিন পর্যন্ত সাম্যের কোন আদর্শই গ্রেট ব্রিটেন এবং ভারতবর্ষের ভিতরকার এই বর্ণগত বৈষম্য কিছুতেই দূর করিতে পারিবে না। মহামতি এণ্ডরুজ মনে প্রাণে ভারতের রাষ্ট্রনীতিক মুক্তি কামনা করিতেন এবং তাঁহার স্বদেশবাসী ইংরেজদিগকে নিজের মতের যৌক্তিকতা তিনি জীবনের দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন। এমন নিঃস্বার্থ মানব-সেবকের স্মৃতি কোনদিন বিমলিন হয় না। ভারতবাসীদের কর্তব্য তাঁহার স্মৃতিকে সর্বতোভাবে আদর্শস্বরূপে জাগ্রত রাখা।

যক্ষ্মা রোগীর শুশ্রূষা—

হাসপাতাল হইতে ছুটি পাইবার পরও যক্ষ্মা রোগীর ভয় কাটে না; পরে যথাবিধি সতর্কতা অবলম্বনের অভাবে পুনরাক্রমণ দেখা যায়। এই পরবর্তী অবস্থার জন্য যথাযথ ব্যবস্থাই যক্ষ্মা চিকিৎসার একটি প্রধান অঙ্গ। কিন্তু এদেশে যক্ষ্মা রোগীদের তেমন শুশ্রূষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা খুবই কম আছে। হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যনিবাস হইতে বাহির হইবার পর তাহাদের সম্বন্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ কোনরূপ যত্ন লওয়া হয় না। বাঙলা দেশে যাদবপুরের যক্ষ্মা হাসপাতালে দেশের একটা কাজ হইতেছে। বাঙলা দেশে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা কম নয়। ইহাদের সংখ্যা বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে। যাদবপুরের হাসপাতাল দেশের এই মারাত্মক রোগে আক্রান্তদের শুশ্রূষার একটি প্রধান কেন্দ্র-স্থলে পরিণত হইয়াছে। শত শত রোগী এই হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছে। এই হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি চিকিৎসিত রোগীদের যথাযথ জীবন পরিচালনের উপযোগী একটি কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়াছেন। শেঠ যমুনালাল বাজাজ কিছুদিন হইল হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে ফুলেশ্বরের কাছে ৪০ বিঘা জমি দান করিয়াছেন; জমি লইয়া কর্তৃপক্ষ কাজ আরম্ভ করিবেন স্থির করিয়াছেন। এই জমির উপর ছোট ছোট ঘর করিতে হইবে এবং বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতি ও ভাল জলসরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কর্তৃপক্ষ মনে করিয়াছেন যে, এখানে তাঁহারা একটি কারখানা স্থাপন করিবেন। সেই কারখানায় চিকিৎসিত ব্যক্তিরা অল্প পরিশ্রমের এমন কিছু কিছু কাজ করিতে পারিবে যাহাতে তাহাদের আর্থিক সুবিধা হয়। এই কর্মপ্রণালী কার্যে পরিণত করিতে হইলে আপাতত অন্তত ২৫ হাজার টাকা হাতে পাওয়া দরকার। বাঙলা দেশের জনসাধারণ যাদব-পুরের প্রতিষ্ঠানটিকে এতদিন পর্যন্ত যথেষ্টরূপে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, আমরা আশা করি এই মহৎ প্রচেষ্টা যাহাতে সার্থক হয়, সেজন্য তাহাদের সাহায্যের অভাব হইবে না। ২৫ হাজার টাকা খুব বেশী টাকা নয়, বিপন্ন এবং পীড়িতের জীবন রক্ষার প্রয়োজনে বাঙলা দেশ হইতে অল্প সময়ের মধ্যেই এ টাকা উঠিবে, এমন আশা আমরা করিতে পারি।

জাতীয় চিকিৎসার স্বরূপ

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন গ্রহণ করুন। যে গুরুদায়িত্ব প্রতিপালনের ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে, তাহাতে যোগ্যতা আমার কিছু নাই। কিন্তু গুণাংশ্চ ফল্গুন্ বহুলীকরিষ্যবো মহত্তমাঃ; মহৎদের স্বভাবই হইল এই যে, যেখানে গুণ নাই সেখানেই তাঁহারা গুণ দেখিতে পান; বিশেষত শ্রীখণ্ড, বাঙলার পুণ্যভূমি, এই ভূমির প্রতি রেণু বৈষ্ণবের পদস্পর্শে পবিত্র এবং অমানীকে মান দেওয়াই বৈষ্ণবের স্বভাব। সবই বুঝিতেছি, বুঝিয়াও নিজের দুর্বলতা আমাকে অভিভূত করিতেছে এবং পূজ্যপাদ রূপ গোস্বামী মহারাজের সেই কথাই স্মরণ হইতেছে—'ক্বেয়ং গুণবতী সভা বতো মুদ্ধরূপঃ ক্বাহং—তস্মাৎ মমাদ্য শরণং শরণং-গতানাং দত্তোৎসবস্য করুণা করুণার্ণবস্য।

প্রণিপাত, কোটি প্রণিপাত মহাসম্মেলনের কর্মকর্তাদিগকে; সেই স্মরণের সম্পদ আজ আমাকে তাঁহারা দিলেন। শ্রীমৎ নরহরি ঠাকুর, বাঙলা দেশের যিনি মাথার মণি, তাঁহারই পুণ্যপীঠ ভূমি এই শ্রীখণ্ড, এখানে স্মরণ নাই কোথায়? গাছে লতায় পাতায়, ধরণীর ধূলি বিন্দুতে সবই যে স্মৃতি—বিলাস যুগল স্মৃতি সার! মাধুরীমধিবৃন্দাবন-কুঞ্জ-কন্দরং—বৃন্দাবনের কুঞ্জ কন্দরের গুপ্ত মাধুরী এখানে সর্বত্র মাখানো রহিয়াছে। গোকুল-লীলা-নির্মল-সুধাসিন্ধুখবিন্দুরাজি এখানকার বাতাসে সঞ্চারিত হইতেছে। রাধা-মাধবিকা-মধু-মধুরিমা এখানে বৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু আমার দুর্দৈব সে আস্বাদনে আমি বঞ্চিত। আপনারা আমাকে কৃপা করুন, তবে যদি কিছু অনুভব হয়; এই ভরসায় আকুল হইয়াই এখানে আসিয়াছি। আপনারা বৈদ্য, দ্বিজেসু বৈদ্যো বরেণ্যঃ, ভবরোগে আমি ক্লিষ্ট, আপনারা ভগবানের নাম আমাকে মধুর করিয়া দিন। এই পতিত জীবনে জাগাইয়া দিন নরহরি ঠাকুর মহারাজের একবিন্দু কৃপা, মুকুন্দানন্দের পাদরজের এক বিন্দু মধুর আস্বাদ দিন এই পাপজিহ্বায়—ভবোষধাৎ। কৃপা যখন করিয়াছেন, কৃতার্থ করুন।

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা বেদবিৎ এবং বিধানজ্ঞ। আমি বেদ এবং বিধির কিছুই জানি না, সুতরাং কি বলিব আপনা-দিগকে। ভগবানের নাম উচ্চারণে সকল ব্যাধির ক্ষয় হয়—জানেন একথা আপনারা। বেদই ব্রহ্ম, আপনারা আয়ুর্বেদাচার্য, সুতরাং আপনারা সকলেই যে ব্রহ্মবাদী। যাঁহারা ব্রহ্মবাদী যজ্ঞ, দান এবং ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়াই তাঁহারা কাজ করেন এবং তখনই সে সব কাজ বিধানোক্ত হয়—ভগবান গীতাতে স্বয়ং এই নির্দেশ করিয়াছেন। শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যে কাজ সে কাজ কখনই সার্থক হইতে পারে না, ইহা তো আপনারা সকলেই জানেন। ভগবানের নামোচ্চারণ রূপ ভেষজের দ্বারা চিকিৎসাই যে বিধানোক্ত চিকিৎসা—ইহাই ঋষিদের নির্দেশ এবং ঋষি বাক্য অভ্রান্ত। সত্যদ্রষ্টা তাঁহারা, দেশ কাল পাত্রের দ্বারা সে সত্যের ব্যত্যয় ঘটে না।

জানি, আধুনিক বিজ্ঞানবাদী যাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা এ সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিবেন, কারণ আধুনিক বিজ্ঞান পুরাপুরি আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই বিজ্ঞান মানুষকে বাঁচাইবার ভেষজতত্ত্ব যেমন নির্ণয় করে তেমনিই বোমা ও বিষ বাষ্প আবিষ্কারেও সমানভাবে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানকে অস্বীকার করিতে চাহি না; করা যায়ও না, এক্ষেত্রেও সাধনা রহিয়াছে এবং সত্যও আছে; কিন্তু চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ কিভাবে হইতে পারে—ইহাই হইতেছে কথা। আধুনিক বিজ্ঞানের কাজ যেখানে মানুষ মারা সে ক্ষেত্রের বিচার এখানে নয়। আপনারা ব্রহ্মবাদী, আপনাদের কাজ হইল যজ্ঞ ও দান; সেবাই আপনাদের ধর্ম। আপনাদের সেই ক্রিয়ার সাফল্য নির্ভর করে নাম উচ্চারণের উপর—ইহাই নিবেদন করিতে চাহিতেছি এবং কার্যের সাফল্য কারণকে আশ্রয় করিয়া যে পথে হয় সুনিশ্চিত, সেই পথই যে বৈজ্ঞানিক পথ, এ বিষয়ে সংশয় কি?

'সত্ত্বমাত্মাশরীরঞ্চত্রয়মেতৎ ত্রিদণ্ডবৎ' মহর্ষি চরকের বাণী। মন, আত্মা এবং শরীর—এই তিনকে লইয়াই মানুষ, মানুষ। সে জড়বস্তু পিণ্ড নয়; সুতরাং তাহার চিকিৎসাও শুধু বিশ্লেষণাত্মক সিদ্ধান্তের দ্বারা সম্ভব হইতে পারে না। জড় শরীরের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক আছে ইহা সত্য, কিন্তু জড়কে লইয়া নাড়াচাড়া করিলেই মানুষের অবস্থার সম্যক জ্ঞান সম্ভব হয় না। গোটা-ভাবে তাহাকে জানিয়া বুঝিয়া যদি তাহাকে চিকিৎসা করা যায়, তবে সেইখানেই হয় তাহার সত্যকার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা, নহিলে শুধু হাতের আন্দাজ বা অনুমানের ব্যাপার। অনুমান তো জ্ঞান নয়, জ্ঞান হইল প্রত্যক্ষতা। সমগ্র সংশয়ের নিরসন করিয়া সত্যের সঙ্গে সেখানে অখণ্ড এবং একান্ত ভাবে যোগ। এইখানেই চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার ক্ষেত্রে নামোচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা আসিয়া পড়ে। জড় বিকারের প্রতীকারের ক্ষেত্রে নামোচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাই বিষ্ণুপুরাণ লিখিয়াছেন—"ভৈষজ্যং ভগবৎ-প্রাপ্তিরেকান্তাত্যান্তিকী মতাঃ তস্মাৎ তৎ-প্রাপ্তয়ে যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ পণ্ডিতৈঃ নরৈঃ।"

কথাটা একটু ভাঙিয়া বলিতে চেষ্টা করিব। আধুনিক বিজ্ঞানকে ছোট করিবার ইচ্ছা আমার নাই। আমার বক্তব্য হইল এই যে, বিজ্ঞানের যে সিদ্ধান্ত তাহার সঙ্গে ত্রিদণ্ডের সকল অংশের সঙ্গে পরিচয় যাহাতে হয় এমন দৃষ্টি বৈজ্ঞানিককে চিকিৎসা ক্ষেত্রে লইতে হইবে, তবে সে চিকিৎসা হয় প্রকৃত চিকিৎসা।

মানব জীবন সম্বন্ধে এই যে একান্ত এবং প্রত্যক্ ও অখণ্ড দর্শন—ভিতর ও বাহির সকল দেখা, এমন দেখা দেখিতে পারিলে তবে বোধ হয় রোগ নির্ণয় সত্য হয় এবং চিকিৎসা হয় বিনিশ্চিত। নামোচ্চারণের ফলে এই দর্শন লাভ করা যায়।

নামোচ্চারণের ফল কি? এ সম্বন্ধে ঋষি বাক্য এই যে, 'নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়'। 'কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের এই তো প্রভাব, যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব'। কৃষ্ণপদে প্রেমের অর্থ—সকল গণ্ডী ভাঙ্গে যে প্রেম, তেমন প্রেম। দেশ কাল-পাত্রের ব্যবধান দূর করে যে প্রেম, সেই প্রেম—সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত প্রেম। স্বচ্ছ সে প্রেম স্বরূপকে প্রকাশ করে; আর কৃষ্ণে ভাব উৎপন্ন হওয়ার অর্থ, সেই ভাব যে ভাব সকল অভাবকে দূর করে, সকল ভেদকে করে লোপ। এই শ্রীখণ্ডের পুণ্য ভূমিতে কৃপাপ্রাপ্ত সিদ্ধপুরুষ লোচনদাস ঠাকুরের কথা—'ভাব বিনু নাহি সঙ্গ'। ভাব ভিন্ন সংগ হয় না, অর্থাৎ একান্ত ভিতরের ব্যাপার ধরা যায় না। সব জিনিস এই উন্মুক্তভাবে দেখাই বিদ্যা এবং কৃতবিদ্য তিনি যিনি তেমনভাবে দেখিতে পারেন। নিদান নির্ণয়তত্ত্ব এই হিসাবে প্রধানত জড় বিশ্লেষণাত্মক নয়, মুখ্যত ভাবগম্য। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ টমসন সেই কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—

> Only in a mystic mood we can catch the true relation of the world to ourselves, not to be hinted at any scientific analysis of the content.

শুধু ভাবের সাহায্যেই অন্যের অবস্থার সঙ্গে আমাদের সত্যকার পরিচয় হইতে পারে, জড়ের বিশ্লেষণের দ্বারা কোন-

ক্রমেই হইতে পারে না। মহাভারতের ঋষি একটি শ্লোকে এই নিদানতত্ত্বের সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

সর্ব্বার্থানাং ব্যাকরণাৎ
বৈয়াকরণ উচ্যতে
তন্মূলতো ব্যাকরণং
ব্যাকরোতীতিতত্তথা।
প্রত্যক্ষদর্শী লোকানাং
সর্ব্বদর্শী ভবেন্নরঃ'
সত্যে বৈ ব্রাহ্মণস্তিষ্ঠং
স্তদ্বিদ্বান্ সর্ব্ববিৎ ভবেৎ।'

মূল ধরিয়া জানাই হইল আসল জানা—প্রত্যক্ষ জানা। ব্রহ্ম হইলেন সকল বস্তুর মূল, সেই মূলের সঙ্গে যোগ হইলে সকল তত্ত্ব সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে। সেই স্তর প্রত্যক্ষ দর্শনের স্তর, সেই দর্শনের সাহায্যে ব্রাহ্মণ সত্যের সঙ্গে যুক্ত হইয়া সব জানিতে পারেন।

নাম সাধনার ফল কি? আমি কেমন করিয়া বলিব? আমার দুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ;' পূর্বেই ঋষিবাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছি, নামের ফলে প্রেম হয়, অর্থাৎ ব্যাপিনী চেতনার সঙ্গে হয় চিত্তের সংযোগ। পরের বেদনা নিজের করিয়া বুঝা যায়, পরের কষ্টের কারণ প্রত্যক্ষভাবে বুঝি, চিকিৎসার বৈজ্ঞানিকতা এইখানেই।

আমি নিজে নাম সাধনাকে আধ্যাত্মিকতার মূল বলিয়া মনে করি এবং নামোচ্চারণ বা অন্য কথায় নাম সংকীর্তনকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া বুঝি। আপনারা সকলেই সুপণ্ডিত। আশা করি, ব্যাপক অর্থে এবং গভীরতার দিক হইতে আমার কথাকে আপনারা গ্রহণ করিবেন। আমার কথা মোটামুটি হইল এই যে, চিকিৎসাকে সার্থক করিতে হইলে সে ক্ষেত্রে আবশ্যক আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সংযোগ; এই জন্যই আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র পরম অধ্যাত্মশাস্ত্র, অপৌরুষেয় বেদ এবং এ দেশের যাঁহারা আয়ুর্বেদের সাধনা করেন, তাঁহারা বেদবিৎ, তাঁহারা ব্রহ্মবাদী, তাঁহারা সত্ত্বশীল, অনুকম্পাপরায়ণ, প্রেমিক পুরুষ এবং দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন।

অসম্ভব নয়, এ কথাও কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, দ্রব্যেরই নিজের একটা মূল্য আছে, আধ্যাত্মিকতার কথা অবান্তর মাত্র। তাহার উত্তর এই যে, দ্রব্যের মূল্য আছে সত্য, কিন্তু সেই মূল্য পরিচয় হয় তপস্যায়। ঋষিদের দিব্যদৃষ্টিতে ভেষজের আবিষ্কার, এসব কথা যদি ছাড়িয়াও দেওয়া যায়, তথাপি তপস্যাকে এড়ান যায় না। ভেষজতত্ত্বের এই যে সব সন্ধান, শুধু কৌতূহল প্রবৃত্তি মিটাইবার বশে ইহা সম্ভব হয় নাই, হইয়াছে বেদের বিষ্ণুসূক্তে যে কথা বলা হইয়াছে, সেই বিশ্বজন্য বিষ্ণুভক্তির প্রেরণায়,—'তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ'। দীর্ঘ সাধনা, দুশ্চর ও দুষ্কর সাধনা রহিয়াছে ইহার মূলে। আত্মানুভূতি এবং প্রেমের বলেই ইহা শুধু সম্ভব। সুতরাং আধ্যাত্মিক সাধনা বা নামোচ্চারণের কথাই সে ক্ষেত্রেও আসিয়া পড়ে। নামোচ্চারণ হইতে যে ভেষজ, একান্ত নামোচ্চারণ-সাপেক্ষ যে ভেষজ, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহাকে নামোচ্চারণ-ভেষজ বলিলে 'তন্মূলতো ব্যাকরণাৎ' এই দিক হইতে ব্যাকরণের দোষ বোধ হয় ঘটে না। সুতরাং ভেষজ দ্রব্য-বিনির্ণয়ে ফলোপধায়কতাও যে আধ্যাত্মিকতার উপর নির্ভর করে, একথা অস্বীকার করা যায় না।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা আধ্যাত্মিকতার উপরে এমন জোর দেয় না। সেখানে চিকিৎসক পণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু যে শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে এমন সাধনাঙ্গ নাই, যাহার প্রভাবে তাঁহাকে আধ্যাত্মিক হইতেই হইবে। বোধ হয় এই সত্যই উপলব্ধি করিয়া প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত আর আর ম্যারেট লিখিয়াছেন—

"On the other hand, as an anthropologist I can go back to the beginnings of the medicine man, and when I compare him with his modern representatives an almost tempted to exclaim—How are the mighty fallen."

সামান্য জ্ঞান ছাড়া বিশিষ্ট জ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে স্বীকার করি, কিন্তু মুখ্যত জড় বিশ্লেষণধর্মী সেই জ্ঞান যেন আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত এ দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানকে অভিদ্রুত না করে। আমরা যেন এ সত্য বিস্মৃত না হই যে, মনের স্বাস্থ্য দেহের স্বাস্থ্যের পক্ষে কম প্রয়োজনীয় নয়; শরীর এবং মন এই দুইয়ের যাহাতে সমন্বয়ে চিকিৎসা হয় এবং সমন্বয় ঘটে, তজ্জন্য বেদবিধিকে বলবৎ রাখিতে হইবে। তাহা ছাড়া আরও একটি বড় কর্তব্য রহিয়াছে, আপনারা আয়ুর্বেদাচার্য, আপনাদের সেদিক হইতেও আমার নিবেদন আপনাদিগকে এই সুযোগ জানাইয়া রাখিতেছি। রোগ হইলে চিকিৎসা করার চেয়ে, রোগ যাহাতে না হয়, ইহা করা ভাল। ইংরেজীতে এমন একটা কথা আছে, আপনারা সকলেই জানেন। অধ্যাপনা এবং উপদেষ্টার কাজও আপনাদের উপর অপেক্ষা করিতেছে। শাস্ত্রজ্ঞান সম্প্রসারণের ভার রহিয়াছে আপনাদের উপর। বাঙলার সংস্কৃতিতে সে দিক হইতে আপনাদের দান অসামান্য। সমাজে যাহাতে নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন নরনারী গড়িয়া উঠে, সংস্কৃতির প্রভাবে হয় প্রকৃত সত্ত্ব-সংশুদ্ধি আপনাদের তাহা করিতে হইবে এবং ইহাও একটা বড় দিক।

বঙ্গের আয়ুর্বেদাচার্যগণ, আয়ুর্বেদের যদি উন্নতি সত্যই করিতে চাহেন, প্রাণের টান থাকে যদি আপনাদের সেজন্য, তাহা হইলে নিখিল ভারতের আয়ুর্বেদ সাধনার সঙ্গে যুক্ত হইয়া আপনাদিগকে চলিতে হইবে। দেশের শাসনতন্ত্র আসন্ন পরিবর্তনের মুখে। এই দিককার রাজনীতির গুরুত্ব আপনারা ভুলিবেন না। স্মরণ রাখিবেন, কালিদাসের কথা "যাচ্ঞামোঘা বরং অধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।" শুধু ভিক্ষায় কিছু হইবে না। পিছনে জোর চাই। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তে বাঙলার সংস্কৃতি বিপন্ন হইতে বসিয়াছে, কিন্তু আপনারা যদি নিখিল ভারতের ভিত্তিতে আয়ুর্বেদকে দাঁড় করান, নিখিল ভারতের রাজনীতিক প্রভাবে আপনারা প্রভাবান্বিত হইবেন। হিন্দু সংস্কৃতির কোন অঙ্গ যদি বাঙালীকে দৃঢ় করিতে হয়, ধরিতে হইবে নিখিল ভারতের সূত্রকে। বিপদের মধ্যে বিধাতারই বোধ হয় ইহা একটা দান—অখণ্ড ভারতের হিন্দুকে সংঘবদ্ধ করিবার জন্যই যেন ঈশ্বরের এই অমোঘ ইঙ্গিত। নাম, যশ, কিংবা ক্ষুদ্র স্বার্থের দায়ে আয়ুর্বেদের এই বৃহত্তর স্বার্থ যেন কোন দিন ক্ষুণ্ণ না হয়। এই বিষয়ে আপনারা যদি অবহিত না হইয়া ভেদমূলক কোন পথে যান, তাহা হইলে আয়ুর্বেদের পক্ষে, শুধু তাহাই নহে, আপনাদের স্বার্থের পক্ষেও তাহা আত্মঘাতী হইবে। ব্যক্তিগত নাম, যশ, প্রতিপত্তির আকর্ষণকে তুচ্ছ না করিতে পারিলে শুধু চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য সিদ্ধ হয় না। প্রতিষ্ঠার মোহ এড়ান বড় কঠিন, প্রতিষ্ঠা বলিতে এক্ষেত্রে যাহাকে আমরা নামের ক্যাংলামি বুঝি, তাহাই বলিতেছি। অনেক সময় এই দৈন্য ধরা পড়ে না এবং ইহা বৃহৎ আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করে। ঠাকুর বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন,—'প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত, যে না চায় তার হয় 'বিধাতৃ-প্রদত্ত', অর্থাৎ নিজের অহঙ্কারকে প্রেমের স্পর্শে যদি ভাঙিয়া ফেলা যায়, তথন সকলের মধ্যে মর্যাদা আপনা হইতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে যে দৈন্য তাহা কাহারও সঙ্গে প্রাণের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করিতে

দেয় না। নিজেদের মহিমা এবং সেই সঙ্গে আয়ুর্বেদের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিবার বাসনা যদি আমাদের থাকে, তাহা হইলে বৃহতের অনুভাবনার সূত্র ধরিয়াই আগাইতে হইবে। বাঙলার আয়ুর্বেদ-সাধনার আলোক ছড়াইয়া দিতে হইবে ভারতের সর্বত্র। নিখিল ভারত আয়ুর্বেদ মহামণ্ডল আজ আপনাদের নিকট হইতে ইহাই আশা করিতেছেন; তাঁহারা ব্যাপক কর্মপন্থার জন্য তাকাইয়া আছেন এই বাঙলারই দিকে। জাতীয়তার জন্মভূমি এই বাঙলা, এইখান হইতে জাতীয় চিকিৎসার জ্যোতি বিকীর্ণ হউক। নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে আপনারা সুগঠিত কর্মপন্থা লইয়া অগ্রসর হউন। নিখিল ভারতীয় আয়ুর্বেদ সংস্কৃতিতে বাঙালীর অবদান তুচ্ছ নয়। মহামণ্ডলের অধিকাংশ সভাপতি যোগাইয়াছে এই বাঙলাদেশই। বাঙালী কোনদিন প্রাদেশিকতাকে বড় করিয়া দেখে নাই; তাহার সংস্কৃতির রস সর্ব ভারতকে পুষ্ট করিয়াছে। গঙ্গাধরের ভাষ্য যেমন নিখিল ভারতের গর্ব করিবার বস্তু, সেইরূপ "প্রাত্যক্ষ শারীর বিজ্ঞান"ও নিখিল ভারতীয় আয়ুর্বেদ সংস্কৃতিতে বাঙলার মনীষার স্থায়ী অবদান। ভারতের জাতীয়তার ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদ সংস্কৃতির পথে এই যে রসপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে, আজ তাহাকে অধিকতর শক্তিশালী করিতে হইবে, এই কর্তব্য কেবল আয়ুর্বেদের দিক হইতে কর্তব্য নয়, জাতীয়তার দিক হইতেও কর্তব্য এবং আরও একটু আগাইয়া বলিব, ভারতের স্বাধীনতার দিক হইতেও এই কর্তব্য। রাজনীতিক এই দিকটাই আমার মনে বিশেষভাবে জাগিতেছে। বাঙলার সংস্কৃতি বিভিন্নভাবে ভারতের জাতীয়তাবোধকে উদ্বুদ্ধ করুক, জাতির মুক্তিকামী মাত্রই ইহা কামনা করিবেন। নিখিল ভারতের আয়ুর্বেদ-সংস্কৃতির ধারক-বাহক আপনারা, একথা বিস্মৃত হইবেন না। আয়ুর্বেদ সংস্কৃতির জন্য পরাধীনতার এই অন্ধকার যুগেও ভারতের গর্ব করিবার যদি কিছু থাকে, প্রধানত এই বাঙলাকে লইয়াই। জ্ঞানগরিমায় যিনি গঙ্গাধর সদৃশ, সেই গঙ্গাধরের আবির্ভাব হইয়াছিল এই বাঙলাতেই। যে বিদ্যাহীন অভাজন আজ আপনাদের নিকট তাহার এই দীন নিবেদন লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কৈশোর এবং প্রথম যৌবন কাটিয়াছিল যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমায়, সেই গঙ্গাধরেরই অঙ্গনতলে। দ্বিতীয় গঙ্গাধরকে দেখে নাই বাঙলা; তথাপি বাঙলার আয়ুর্বেদ বিদ্যা আজও বিমলিন হয় নাই। ঋষিকল্প দ্বারিক, বিজয়রত্ন, শ্যামাদাস, হারাণচন্দ্র, যামিনীমোহন বেদ-বিদ্যায় বাঙলার মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। এই বাঙলাতে আজও বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়, বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ ভবন, গোবিন্দসুন্দরী আয়ুর্বেদ কলেজ যেভাবে আয়ুর্বেদ বিদ্যার বিস্তার করিতেছে, ভারতে অন্যত্র তাহার তুলনা নাই। গর্বের সঙ্গে একথা বলিবই যে, আয়ুর্বেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন এই বাঙলারই আয়ুর্বেদাচার্যগণ এবং তাঁহাদেরই সাধনায় আয়ুর্বেদের আজ পুনরভ্যুদয়ের যুগ দেখা দিয়াছে। বৈদেশিক প্রভাব সম্পর্কিত অন্তরায় আছে, ভুলিতে পারি না সে সত্যকে, কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, আপনারা যদি সাধনায় নিষ্ঠিত থাকেন, ঋষি বাক্যে যদি থাকেন শ্রদ্ধাযুক্ত, তবে আয়ুর্বেদের আলোক পুনরায় সমগ্র ভারতকে উজ্জ্বল করিবে, শুধু তাহাই নহে, বিশ্ব জগৎকে করিবে তাহা উদ্ভাসিত। দেহ এবং মনের উপর বৈষম্য-জনিত ব্যাধি হইতে জগৎ পাইবে মুক্তি, লাভ করিবে ভারতের আধ্যাত্মিকতার পরম আপ্যায়ন—আয়ু, বল এবং প্রীতি হইবে বিবর্ধিত।

ভদ্রমহোদয়গণ, আধি-ব্যাধির অন্ত নাই, এ দেশে সকলের উপর অতি ঘোর দারিদ্র্য এ দেশকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। সহায় সম্বল আপনারা, পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রসার হইতেছে সত্য; কিন্তু তাহাতে ভরসা বড় বাড়িতেছে না। সে চিকিৎসা বহু ব্যয়-সাধ্য; ফলোপধায়কতার বিচার না হয় নাই করিলাম; কিন্তু আপনাদের উদ্দেশ্য তো শুধু অর্থ নয়, হইতেও পারে না; বেদ-বিহিত আয়ুর্বেদের সাধনা পরমার্থপ্রবণ করিবেই জীবনকে, দ্বিজত্ব আসিয়া বর্তাইবেই এই শাস্ত্রের অনুশীলনকারীদের অন্তরে। অর্থের বিবেচনাকে একান্ত করিয়া আয়ুর্বেদের সাধক আর্ত এবং বিপন্নের বেদনাকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। কারণ নামের এমনই মহিমা, সর্বমন্ত্র সার নাম ইহ শাস্ত্র মর্ম,—শাস্ত্রনিষ্ঠিত যে সাধনা, সে সাধনা নামের মহিমা অন্তরে জাগাইবেই এবং এই নামের প্রভাবের মধ্যে যিনি পড়েন, চেষ্টা করিলেও স্বার্থবিচারের দ্বারা তিনি নিজকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন না। নামই ব্রহ্মার অন্তঃকরণে স্ফুরিত হইয়া বেদকে সৃষ্টি করিয়াছিল। ঋষিদের যিনি ঋষভ তিনি এই নামরূপী; শব্দব্রহ্মময় বেণু মুখাম্বুজে বাজাইয়া তিনি বেদবিদ্যার বিস্তার করেন। সরস্বতীকে ছন্দায়িত করেন তিনি এবং তাহাতেই সকল চেষ্টা হেতুমৎ হয়, বিনিশ্চিত হয়। এই শব্দব্রহ্ম 'প্রাণেন্দ্রিয় মনোময়', সর্বাংশে ইহা প্রভাব বিস্তার করে, কারণ 'ময়োপবৃংহিতং ভূম্না ব্রহ্মনানন্তশক্তিনা', ভূমার অনন্ত শক্তির দ্বারা উহা উপ-বৃংহিত। এই শক্তির বিচ্ছুরণে অন্তর ও বাহির উভয় আশ্রয়ের হয় সংশোধন এবং এইভাবে অন্তর ও বাহির উভয় আশ্রয়ের সংশোধন যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহারাই জীবের ব্যাধির আত্যন্তিক নিরাকরণ করিতে সমর্থ। এই সত্য ঘোষণা করিয়া ভাগবত বলিলেন,—'তব কীর্তি-তীর্থয়োরন্তর্বহিস্নান-বিধূত-পাপ্মানাম্ ভূতেম্বনুক্রোশঃ সুসত্ত্বশীলিনঃ। আয়ুর্বেদের জয়ের অর্থ সেই নামেরই জয়; এই নামের মহিমায় আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধিসঞ্জাত প্রত্যক্ষানুভূতি যে চিকিৎসার মধ্যে নাই, উচ্চাবচ দ্রব্যের ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন প্রতীকার সেখানে মানুষের পক্ষে পরম মঙ্গলকর হইতে পারে না। সকল মঙ্গলের মঙ্গল সেই নামের মহিমা কীর্তন সহকারে আপনাদের আদেশ শিরোধার্য করিয়া আমি এই মহাসম্মেলনের উদ্বোধন করিতেছি। 'জয়তু জগন্মঙ্গলং হরের্নাম। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ কলৌ নাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব গতিরন্যথা।

শ্রীখণ্ডে নিখিল বঙ্গীয় আয়ুর্বেদ মহাসম্মেলনের উদ্বোধনে 'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতা।

কবিতা

শকুন্তলা

শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল

কণ্ব মুনির পর্ণকুটীর-দ্বারে
শকুন্তলা সে ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস,
বিরহব্যথার মেঘ-ঘন আঁধিয়ারে
ঠাসাঠাসি ভরা হৃদয়ের অবকাশ।

ব্যথার আঁধার ঘনায় হৃদয়তলে
আশার নয়নে ভবিষ্যতের আলো,
ক্রূর অভিশাপ দুর্বাসা-মুখে জ্বলে
চোখে ফোটে শুধু নিরাশার কাল কালো।

শকুন্তলার বুকভাঙা হাহাকার
পর্ণকুটীরে অথবা পথের 'পরে,
বাতাসের বুকে জমায় ব্যথার ভার,
আজো দুর্বাসা-মুখ হ'তে বিষ ঝরে।

রাজার পৌর প্রেমের জটিল ফাঁদে
বনবালিকারা আজো হয় নাজেহাল,
অথবা শুধুই খিদের জ্বালায় কাঁদে
আজো সে কাঁদিছে, কাঁদিবে কি চিরকাল!

কাঁদে তবু সেই অশ্রুর মসী দিয়া
কাব্য লেখে না আধুনিক কালিদাস,
শতেক-গ্রন্থিজটিল কান্না নিয়া
ব্যর্থ ব্যথায় ফেলে সে দীর্ঘশ্বাস।

প্রফুল্ল-জয়ন্তী

শ্রীঅমল সেন

সূর্য যথা ওঠে নিতি পল্লী-নীড়ে নগর প্রান্তরে
বিপুল প্রাণের স্রোতে মত্ত ধরা টলমল করে—
হে আচার্য! তুমি সূর্য, তব দীপ্ত নির্মল ভাস্বর
প্রাণের কিরণরেখা সর্বস্থানে সবার উপর।
কাব্যের পিপাসু তুমি, রসবেত্তা, তুমি বৈজ্ঞানিক,
কর্মী তুমি, গণনেতা, তুমি চির অক্লান্ত পথিক!
যাত্রা তব দুঃখপথে—ভারতের নগরে নগরে
শ্মশান পল্লীর বুকে, অন্নহীন কাঙালের ঘরে
তুমি দিলে নব বার্তা, নব আলো, নব স্বাস্থ্যবল,
কর্মের নবীন বাণী, উচ্চাশার রক্তিম অনল।
অস্পৃশ্য উঠিল জাগি যুগান্তের মোহনিদ্রা ছাড়ি,
বঙ্গ পেলো নব দৃষ্টি হে ভ[illegible] প্রভায় তোমারি।
লুপ্ত যশ আহরিলে, দৃপ্ত হ'লে আত্মপ্রতিষ্ঠায়।
পল্লীরে বেসেছ ভালো হে আচার্য! প্রাণের মতন,
মাতৃক্রোড়ে ঝেঁপে এলে, নিয়ে এলে অমূল্য রতন।
আর্ত ব্যথাতুর, রোগী, অন্নহীন বুভুক্ষু মানব
প্রণতি জানায় তোমা!—আজ তারা হারায়েছে সব,
সব গেছে, সব গেল, শুধু অশ্রুমাখান পরাণ
বাকী আছে,—তাই আজ দীন বঙ্গ অর্ঘ্য করে দান।
দধীচি দিলেন অস্থি, সে দান তো এক লহমার,
হে নব-যুগ দধীচি! তুমি দিলে সর্বস্ব তোমার।
চাহিলে না নিজ সুখ, হেরিলে না আপনার পানে,
নব বঙ্গ হবে সৃষ্ট হে দধীচি! তব অস্থিদানে।
স্বদেশের পূজামন্ত্র তব কণ্ঠে মোরা শুনিলাম,

ভুল

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

(১৩)

এমনই করিয়াই যোগেশ ও শোভার মাঝখানের ব্যবধান বাড়িয়াই চলিল। নিজের বসবাসের জন্য যোগেশ আকাশে যে প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছিল উহারই একটি গৃহে শোভাকে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইবার পর যোগেশ কলিকাতার বাড়ির একটি ঘরের মধ্যেই আপনাকে একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলিল এবং ডক্টরেটের থিসিস প্রস্তুত করিবার নূতন একটা উদ্যমের মধ্যে এমনইভাবে নিজেকে সে ডুবাইয়া দিল যে তাহার সন্ধান পাওয়াই শোভার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। শোভার আক্রোশ ও অভিমানের আর অন্ত থাকিল না এবং উহারই বিষে উভয়ের সম্বন্ধের অবশিষ্টাংশটুকুও ক্রমাগতই বিষাইয়া উঠিতে লাগিল।

একদিন গভীর রাত্রি পর্যন্ত শয়ন ঘরে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিয়া করিয়া অবশেষে ক্রোধ ও অভিমান আর চাপিয়া রাখিতে না পারিয়াই শোভা যোগেশের পড়িবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং উদ্গত অশ্রু প্রাণপণ চেষ্টায় দমন করিয়া বিকৃতকণ্ঠে কহিল, "রাত কত হয়েছে সে সম্বন্ধে তোমার কোন খেয়াল আছে?"

যোগেশ সচকিতে ফিরিয়া শোভার মুখের দিকে চাহিল, তারপর বই বন্ধ করিয়া ঈষৎ অনুতপ্তকণ্ঠে কহিল, "খেয়াল সত্যি ছিল না শোভা, বড্ড রাত হয়ে গেছে। তুমি যাও, আমি এখনই আসছি।"

কিন্তু শোভা গেল না, সে পূর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "বই নিয়েই যদি রাতদিন থাকবে তবে আমায় ঘরে এনেছিলে কেন?"

যোগেশ নিষ্পলকদৃষ্টিতে ক্ষণকাল শোভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "এইজন্যই লেখাপড়া ছাড়তে তোমায় আমি বারণ করেছিলাম শোভা—যা হোক একটা কাজ নিয়ে থাকতে পারতে।"

শোভা কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, "কাজের আমার দরকার নেই। কিন্তু আমাকে ঘরে এনে এত অবহেলা কেন তুমি আমায় করছ? আমাকে এত কষ্ট দিবার কি অধিকার তোমার আছে?"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া যোগেশ কহিল, "অধিকারের কথা তুলো না শোভা। তবে তোমাকে কষ্ট আমি দিতে চাই না। তোমাকে বিয়ে করেছি বলেই তোমার উপর কোন জোরও আমি খাটাতে চাই না। যাতে তুমি সুখ পাও, শান্তি পাও, তাই তুমি করতে পার।"

শোভা উত্তর দিল, "আমার সুখ শান্তি সব তুমি। আমি তোমাকে চাই, এ আমার অধিকার। ঐ অধিকার থেকে কিছুতেই আমাকে তুমি বঞ্চিত করতে পারবে না।"

যোগেশের ওষ্ঠপ্রান্তে পাতলা একটুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে ঈষৎ ব্যঙ্গের কণ্ঠে কহিল, "এটা অধিকারের কথা শোভা, ভালবাসার নয়। তোমাদের সীতা বা সাবিত্রী বোধ করি ঠিক এইরকম কথা বলতেন না।"

শোভা জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, "সীতা সাবিত্রীর কথা আমাকে আর শুনাতে হবে না। সে সব আমি জানি। তাঁদের স্বামীরাও তোমার মত ছিলেন না;" বলিয়াই সে জোরে জোরে পা ফেলিয়া শুইবার ঘরে চলিয়া গেল।

অতঃপর দুইজনের মধ্যে আবার যখন কথাবার্তা শুরু হইল, তখন প্রথমেই শোভা কহিল, "এই লেখাপড়া তোমাকে ছাড়তে হবে। এটা আমার কথা; আর এ বাড়িতে আমার কথারও একটা দাম আছে।"

কথাটা তৎক্ষণাৎ যোগেশ ভাল বুঝিতে পারিল না, বুঝিল পরদিন। সন্ধ্যার পর বাড়িতে ফিরিয়া নিজের পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া সে গভীর বিস্ময়ে দেখিতে পাইল যে তাহার বই-এর আলমারি দুইটি ও লিখিবার টেবিলখানি কাহার যেন সুনিপুণ হস্তের সযত্ন স্পর্শে একেবারে পরিষ্কার হইয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে এবং উহাতে লিখিবার উপকরণ বা পড়িবার বইএর কোন চিহ্নই কোথাও নাই। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়া গেলে সে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল এবং ছুটিয়া শোভার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি শোভা? ওঘরে আমার একখানা বইও দেখতে পাচ্ছি না যে?"

শোভা পরম ঔদাসীন্যের সঙ্গে উত্তর দিল, "কি জানি। হয়ত চুরি হয়ে গেছে।"

যোগেশ অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, "বল কি? কখন চুরি হল। তুমি ছিলে কোথায়? কি আশ্চর্য"—

এইবার শোভা হাসিয়া ফেলিল, কহিল, "না গো না চুরি হয় নি। আমি নিজেই সব সরিয়ে দিয়েছি।"

"সরিয়ে দিয়েছ?" যোগেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "কোথায়? কই, এঘরেও ত দেখতে পাচ্ছি না!"

শোভা মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "তোমার খাতা ও কাগজগুলি আমি ফেলে দিয়েছি বাইরের ডাস্টবিনে, আর বইগুলি সব পুরাতন পুস্তকের দোকানে বেচে দিয়েছি। দাম মন্দ পাওয়া যায় নি।"

যোগেশ বজ্রাহতের মত নির্বাক হইয়া ক্ষণকাল শোভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "এ কাজ কেন করলে শোভা?"

শোভা উত্তর দিল, "ঐ বই আর খাতাগুলো ছিল আমার সতীন। তাই তাদের দূর করে দিয়েছি।"

যোগেশ আবার অনেকক্ষণ নির্নিমেষদৃষ্টিতে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর সশব্দে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "ভুল করলে শোভা—একটা মস্ত ভুল।"

শোভা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না, ভুল করি নি—ওরা সত্যি আমার সতীন ছিল। ওদের জন্যই তোমাকে আমি পাই নি। গত ছ' মাস বই নিয়েই রাত দিন কাটিয়েছ, একদিন আমাকে বায়স্কোপে নিয়ে যাও নি, বেড়াতে নিয়ে যাও নি, আমার কাছে বসে দুদণ্ড গল্প পর্যন্ত কর নি। সে আমি আর হতে দিব না। কালই আমাকে নিয়ে তোমায় বায়স্কোপ যেতে হবে।"

শেষের কথা কয়টি যোগেশ যেন শুনিতেই পাইল না। সে পুনরায় একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "বই গিয়েছে তাতে আমার দুঃখ নেই; আবার ওসব আমি কিনতে পারব, রাখবার জায়গাও আমার জুটবে। আমার লেখা যা নষ্ট হল তাও হয়ত আমি আবার লিখতে পারব। কিন্তু তুমি বড্ড ভুল করলে শোভা—আমাকে দূরেই সরিয়ে দিলে, কাছে টানতে পারলে না।" বলিয়া সে আর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বায়স্কোপে যাওয়ার কথাটা শোভা যে রহস্য করিয়াই বলে নাই তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল পরদিনই। অপরাহ্ণে জলযোগ সারিয়া যোগেশ যখন বাহিরে যাইবার জন্য কাপড় পরিতেছিল, তখন শোভা

কহিল, "এখন বাইরে যাচ্ছ যে? আজ বায়স্কোপে যেতে হবে তা মনে নেই বুঝি?"

যোগেশ সবিস্ময়ে শোভার মুখের দিকে চাহিল।

শোভা বলিয়া চলিল, "রূপবাণীতে একটা নূতন ছবি আজ খুলছে। শুনেছি যে খুব ভাল ছবি।"

যোগেশ বিরক্তকণ্ঠে কহিল, "আমার আজ বায়স্কোপে যাবার সুবিধা হবে না।"

"সে কি কথা!" শোভা উত্তর দিল, "আমি টিকেট কিনিয়ে রেখেছি যে।"

কিছুমাত্র বিব্রত না হইয়া যোগেশ কহিল, "আমার মত নিয়ে যখন কিন নি, তখন কিনে ফেলাটা আমাকে বাধ্য করবার মত তেমন জোরালো যুক্তি নেই। তোমার ইচ্ছা হয় তুমি যাও, আমি যাব না।"

শোভা স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, " 'না' বললে চলবে না; তোমাকে যেতেই হবে।"

যোগেশ বিরক্তকণ্ঠে কহিল, "বাজে বকো না শোভা। আমার যাওয়া হবে না।"

"কেন যাওয়া হবে না, শুনি?" শোভা দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল।

যোগেশ চকিতে একবার শোভার মুখের দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। শান্তকণ্ঠেই সে উত্তর দিল, "আমার ইচ্ছে নেই।"

স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া শোভা কহিল, "আমার সংগে আজ তোমাকে যেতেই হবে, নইলে এই দোরগোড়ায় তোমার পায়ের কাছে আজ আমি মাথা খুঁড়ে মরব।"

বাহির হইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে যোগেশ দ্বারের কাছাকাছি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে বিব্রতের মত কহিল, "তুমি করছ কি শোভা? চেচামেচি করে লোক জমাতে পার, কিন্তু আমাকে বায়স্কোপে নিয়ে যেতে পারবে না।"

শোভা উচ্চকণ্ঠে কহিল, "না, তোমাকে যেতেই হবে।"

এবার যোগেশও উচ্চকণ্ঠে কহিল, "না আমি যাব না।"

বাহিরে দ্বারের কড়া ঠিক এই সময়েই সশব্দে নড়িয়া উঠিল এবং সংগে সংগেই অমলের কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "ও বৌদি, ও যোগেশ—এই দিনের বেলাতেই দোর বন্ধ করে তোমাদের প্রেমালাপ শুরু হয়েছে নাকি?"

যোগেশ ও শোভা দুইজনেই চমকিয়া উঠিল। যোগেশ মৃদুস্বরে কহিল, "অমল এসেছে, দোর খুলে দাও।"

অঞ্চলপ্রান্তে চক্ষু মুছিয়া শোভা দ্বার খুলিয়া দিয়া কোণের দিকে সরিয়া গেল। অমল ঘরে আসিয়া প্রথমে যোগেশ ও পরে শোভার দিকে চাহিল, তারপর আবার যোগেশের দিকে চাহিয়া কহিল, "প্রেমালাপ মনে হচ্ছে না ত, দুজনেরই যে রণবেশ। ব্যাপার কি যোগেশ? ব্যাপার কি বৌদি?"

যোগেশ সংক্ষেপে উত্তর দিল, "ওঁকে জিজ্ঞাসা কর।"

অমল জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে শোভার মুখের দিকে চাহিল; শোভা একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "দেখুন দেখি অমলবাবু, আমি টিকেট কিনিয়েছি দুইজনে বায়স্কোপে যাবার জন্য, অথচ উনি বলছেন যে উনি যাবেন না।"

"ভারি অন্যায় ত।" বলিয়া অমল যোগেশের মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু চাহিয়া দূরে থাকুক, পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াও সে যোগেশের নিকট হইতে কোন সদুত্তর পাইল না। তাহার জিজ্ঞাসার উত্তরে শোভা যাহা বলিল, তাহাতেও অমলের সন্দেহভঞ্জন হইল না, আর বোধ করি বা অমলের সম্মুখে শোভার অভিযোগ ও নির্বন্ধাতিশয্যে বিরক্ত হইয়াই যোগেশ একটু পরেই ঘর ছাড়িয়াই বাহির হইয়া গেল।

অমলও তাহাকে অনুসরণ করিয়া বাহিরে আসিল, কহিল, "কেন জিদ করছ যোগেশ? উনি যখন বলছেন, ওঁর মন রাখবার জন্য যাও-ই না হয় একবার।"

যোগেশ ততক্ষণে বাহিরের দ্বারের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সে অমলের মুখের উপর দুই চোখের জ্বলন্তদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "বেশী টানাটানি করো না অমল—দড়ি তাহলে একেবারেই ছিঁড়ে যাবে। অভিনয় করতে করতে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। একে আর বাড়াতে ব'লো না, আমি বাড়াতে পারব না।" বলিয়াই সে আর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

অমল হতবুদ্ধির মত অনেকক্ষণ নীরবে সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। এই অসময়ে এ বাড়িতে আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে মনে নিজেকে সে বেশ একটু তিরস্কার করিল। এই ব্যাপারের পর আবার সে শোভার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষই যে বিব্রত বোধ করিবে, তাহা সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল। তথাপি শোভাকে একেবারে কিছু না বলিয়া চলিয়া যাইবার বাসনাকে কিছুতেই সে প্রশ্রয় দিতে পারিল না এবং সেইজন্যই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্ষণকাল পর পুনরায় সে শোভার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

একখানা চৌকির উপর গম্ভীরভাবে বসিয়া শোভা মুক্ত-বাতায়ন-পথে বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল, অমলের পদশব্দে সে সুপ্তোত্থিতের মত তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া, গায়ের বসন সংযত করিয়া মুখখানি হাসিবার মত করিয়া সে কহিল, "বসুন অমলবাবু। আমি ভেবেছিলাম যে আপনিও বোধ করি আপনার বন্ধুর সংগে চলে গেছেন।"

যোগেশের ব্যবহারে অমল নিজেকেই অপরাধী মনে করিতেছিল। সে হঠাৎ কোন উত্তর ভাবিয়া পাইল না।

একটু পরে শোভাই পুনরায় কহিল, "কি সুখে আমি আছি, আজ ত নিজের চোখেই দেখলেন অমলবাবু। অথচ বলুন ত, কি আমার অপরাধ যার জন্য এত কষ্ট, এত অপমান, এত লাঞ্ছনা আমাকে সইতে হচ্ছে?"

অমল অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, তথাপি সে মৃদুস্বরে কহিল, "যোগেশ বরাবরই খামখেয়ালী লোক। কিন্তু আপনি ধৈর্য হারাবেন না বৌদি। তাহলে সবই নষ্ট হবে।"

শোভা ঈষৎ একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "ধৈর্য ধরে থাকা ছাড়া আমার আর উপায়ই বা কি আছে!"

অমল চুপ করিয়া রহিল। শোভাই ক্ষণকাল পর পুনরায় কহিল, "আজকের ছবিখানি শুনেছি খুব ভাল। তাই টিকেট কিনিয়েছিলাম।"

অমল ঝোঁকের মাথায় বলিয়া ফেলিল, "টিকেট যখন কেনা হয়ে গেছে তখন আপনি একাই যান না কেন!"

শোভা অমলের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, অমলের কথা শুনিয়া তাহার বিষণ্ণ মুখ সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কহিল, "আপনিও চলুন না অমলবাবু, একা যেতে আমার ইচ্ছে হয় না।"

প্রস্তাবটির আকস্মিকতায় অমল হঠাৎ অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। সে সংকুচিতভাবে কহিল, "না না—আমার—মানে,—আপনি একাই যান।"

অমলের বিব্রত ভাবটি শোভা যেন লক্ষ্যই করিল না, সে কণ্ঠস্বরে খানিকটা আবদার ও খানিকটা মিনতি ঢালিয়া দিয়া কহিল, "চলুন না অমলবাবু। এই ছবিখানির জন্য আমি অনেকদিন যাবৎ পথ চেয়ে আছি।"

অমলের সঙ্কোচ ও বিব্রতভাব আরও বাড়িয়া গেল। সে যে শোভার স্বামীর বন্ধু বই আর কেউ নয় এবং সেই সম্পর্কে একাকিনী শোভাকে লইয়া বায়স্কোপ দেখিতে যাওয়ার মধ্যে যে একটা শালীনতার অভাব আছে, এই অনুভূতির চাইতেও বেশী করিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল এই আকস্মিক প্রস্তাবের পশ্চাৎপট সম্বন্ধে তাহার নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান। স্বামীর জন্য শোভা যে টিকেটখানি কিনিয়া রাখিয়াছিল এবং যাহা ব্যবহার করিতে তাহার স্বামী অস্বীকার করিয়াছে সেই টিকেট লইয়া ঐ শোভারই সঙ্গে বায়স্কোপে যাইবার কথা ভাবিতেও তাহার অন্তর লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল এবং শোভা যে নিজের মুখে কেমন করিয়া এমন একটা প্রস্তাব করিয়া বসিল, তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। অথচ এইরূপ যে কয়টি কারণে শোভার প্রস্তাব সে গ্রহণ করিতে পারে না, তাহা শোভাকে বুঝাইবার জন্য লজ্জায় নিজের মুখে সে উচ্চারণও করিতে পারিল না। অধোমুখে সে চুপ করিয়াই বসিয়া রহিল।

কিন্তু শোভার নির্বন্ধাতিশয্য একটুও কমিল না। সে আরও বেশী জিদ করিয়া কহিল, "চলুন না অমলবাবু—এটা ত তেমন শক্ত কাজ নয়। আর কোনদিন এমন অনুরোধ আপনাকে আমি করি-ও নি।"

অমল অধিকতর বিব্রত হইয়া উত্তর দিল, "শক্ত কাজের কথা নয় বৌদি,—মানে, আমার নিজের একটু অন্য কাজ আছে।"

শোভা অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল, "কাজ নয়, ইচ্ছার অভাব।"

অমল উত্তর খুঁজিয়া পাইল না এবং সেই জন্যই পাছে এই সম্বন্ধে আলোচনা অনেকক্ষণ ও অনেকদূর অগ্রসর হইয়া চলিলে অসাবধানে তাহার আসল আপত্তিটি শোভার কাছে প্রকাশ হইয়া তাহার চেতন চিত্তে কোন রেখাপাত করিয়া বসে এই আশঙ্কায় অগত্যা সে সম্মত হইয়া গেল।

উজ্জ্বল সহাস্যমুখে শোভা কহিল, "বাঁচালেন অমলবাবু। আপনি রাজী না হলে আজকের দুঃখ আমি রাখবার ঠাঁই পেতাম না।

ট্যাকসি চড়িয়া শোভা ও অমল একত্র বায়স্কোপ দেখিতে গেল।

(১৪)

অমল যখন বাড়িতে ফিরিল তখন রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। সাড়া পাইয়া গৌরী রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি গো! কোথায় ছিলে তুমি এত রাত পর্যন্ত? আপিস থেকে আজ খাবার খেতে পর্যন্ত বাড়ী আসনি—আমি ভাবছিলাম—"

"—বুঝি বা মোটর চাপা পড়ে মরেই গিয়েছি," অমল হাসিমুখে কহিল।

"ছিঃ," গৌরী জিভ কাটিয়া বলিয়া উঠিল, "কি যে বল তুমি। কিন্তু ভাবনা আমার হয়েছিল সত্যি খুব বেশী।"

অমল গৌরীর কাছাকাছি সরিয়া আসিয়া কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি তাহার মুখের উপর বিন্যস্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবছিলে বল না একবার! কি আশঙ্কা হচ্ছিল? —তোমার খোকাটি পথ হারিয়ে গেছে, না তোমার প্রিয়কে আর কেউ ভুলিয়ে নিয়ে গেছে?"

গৌরী হাসিয়া ফেলিল, কুটিল কটাক্ষে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "ভাবছিলামই ত। তোমাদের যা স্বভাব—সর্বদা চোখে চোখে না রাখলে তোমাদের কি রাখা যায়?"

অমল দুই বাহু দিয়া সাদরে গৌরীকে জড়াইয়া ধরিয়া সস্নেহ কোমলকণ্ঠে কহিল, "যায় গো যায়। চুম্বক পাথর লোহাকে ধরে রাখে না, বরং দূরে সরিয়ে দিলেও লোহা নিজেই চুম্বকের কাছে ছুটে আসে।"

গৌরী মুহূর্তকাল স্বামীর বক্ষলগ্ন থাকিয়া পরক্ষণেই আপনাকে জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইল। উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এই যা, তোমার জলখাবারের কথাই জিজ্ঞেস করা হয় নি যে। এত রাত হয়ে গেছে, মুখ হাত ধুয়ে আগে চা খাও। তারপর আর সব কথা।"

অমল কহিল, "চা জলখাবার, এ সব আমার হয়ে গেছে। হাতমুখ ধুয়ে এখন একেবারে খেতেই বসব। খেতে খেতে তোমায় একটা গল্পও বলব চমৎকার।"

খাইতে বসিয়া অমল কহিল, "শুনে হয়ত খুব আশ্চর্য হবে গৌরী যে আজ আমি শোভা বৌদি'র সঙ্গে বায়স্কোপ দেখতে গিয়েছিলাম।"

গৌরী খাওয়া ভুলিয়া বিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, কহিল, "সত্যই আশ্চর্য হচ্ছি। যোগেশবাবু শোভাদি'কে নিয়ে গেলেন বায়স্কোপে?"

অমল মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, যোগেশ নিয়ে যায় নি। আমি একাই বৌদিকে নিয়ে বায়স্কোপে গিয়েছিলাম।"

গৌরীর মুখে তৎক্ষণাৎ বাক্যস্ফূর্তি হইল না, সে নির্বাকবিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সমালোচনা না করিয়া অমল সেদিনের সমস্ত কথাই গৌরীকে খুলিয়া বলিল, গৌরীও কোন প্রকার মন্তব্য না করিয়া নীরবে শুনিয়া গেল।

উপসংহারে অমল কহিল, "ফিরিবার পথে বৌদি অনেক দুঃখ করলেন, বললেন, বড়ই একা একা মনে হয় অমলবাবু, বাড়িতে ঝি চাকর ছাড়া কথা বলবারও আর দ্বিতীয় লোক নেই। মনের কথা মুখ ফুটে বলতে পর্যন্ত পারি না।"

গৌরী চুপ করিয়াই রহিল, কোন মন্তব্য করিল না।

ক্ষণকাল পর অমল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি মনে হয় গৌরী যে বৌদি'র প্রস্তাবে রাজী হয়ে আমি অন্যায় করেছি?"

গৌরী একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর দিল, "তোমার কথা আমি মোটেই ভাবছি না। আমি ভাবছি কেবল শোভাদি'র কথা। আহা, বেচারীর সত্যি ভারী দুঃখ।"

অমল চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণকাল পর গৌরীই পুনরায় কহিল, "দেখ, যোগেশবাবুকে একবার তুমি ভাল করে বুঝিয়ে বল যে যারা কালো, যারা মূর্খ, তাদেরও প্রাণ আছে, সে প্রাণে আশা আকাঙ্ক্ষা আছে এবং তা পরিতৃপ্তি চায়।"

অমল গৌরীর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া বিষণ্ণ গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "যোগেশকে না হয় বলব, কিন্তু তাদের সঙ্গে আর বেশী মেলামেশা করা কি আমার উচিত হবে গৌরী?"

"উচিত হবে না? কেন?" গৌরী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল।

অমল ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "ভয় পাও না তুমি? যদি হারিয়ে যাই?"

এবার গৌরীও হাসিয়া ফেলিল, কহিল, "না, হারিয়ে যাবে না; কারণ নোঙর শক্ত আছে।" কিন্তু পরক্ষণেই সে গম্ভীর হইয়া কহিল, "তোমার জন্য আমার ভাবনা নেই। আমার ভাবনা সব ঐ হতভাগিনীর জন্য। সেই জন্যই যোগেশবাবুকে অনুরোধ করতে তোমায় এত বলছি।"

অথচ স্ত্রীর ঐ অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়াই অমল যোগেশের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বসিল।

অমল সহজভাবেই কথাটার অবতারণা করিল, কহিল, "কর্মহীন নিঃসঙ্গ জীবন নিয়ে বৌদি হাঁপিয়ে উঠেছেন।"

যোগেশ কহিল, "আমি সব বুঝি অমল। বোধ

করি ওঁর দুঃখ, আমার চাইতে বেশী কেউ বোঝে না। কিন্তু কি করব? ভালবাসা যেখানে নেই, সেখানে ভালবাসার অভিনয় করতে যাব তেমন নির্লজ্জও আমি নই। কাজেই অসহায়ের মত চুপ করেই আমি থাকি, নিজেকেও দূরেই সরিয়ে রাখতে হয়।"

অমল কহিল, "তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা, কারণ তোমার মস্তিষ্ক স্থির ধারণায় পূর্ণ। তবু বলছি, একজনকে ভাল না বাসলে তার সঙ্গে কি সাধারণ বন্ধুত্বের সম্পর্কও রাখা যায় না?"

যোগেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না—সেই একজন যদি সামাজিক সম্বন্ধে স্ত্রী বা স্বামী হয়। এরূপ সম্বন্ধে ভালবাসা যদি উভয়কে সংযুক্ত না করে তবে উভয়ের মাঝখানে ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠে অভিমানের দুরতিক্রম্য দেয়াল; অভিযোগের ঘনায়মান বিষে মাঝের বাতাস হয় ভারী ও বিষাক্ত।"

অমল তিক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এ তোমার নিছক কবিত্ব। তা ছাড়া এতে যা আছে তা সংকীর্ণ স্বার্থপরতা। ওঁর কথা তুমি মোটে ভাবছই না। মানুষের সাহচর্য, আমোদ প্রমোদ—এ সবের প্রয়োজন কি ওঁর নেই?"

"আছে বই কি!" বলিয়া যোগেশ চিন্তিত গম্ভীরমুখে ক্ষণকাল বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর সহসা ফিরিয়া উৎফুল্লদৃষ্টিতে অমলের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আচ্ছা অমল, আমার যা সংকোচ, আমার যা অভিমান, আমার যা অভিযোগ, তা তোমার থাকবার কথা নয়। অতিরিক্ত তোমার প্রাণে ওঁর জন্য দরদ আছে। সুতরাং তুমিই তোমার বৌদিকে মাঝে মাঝে একটু সাহচর্য দাও না কেন? এই ধর—"

"থাম," অমল বাধা দিয়া বিরক্তকণ্ঠে কহিল, "তুমি বলতে চাইছ কি সেটা স্পষ্ট করেই বলে ফেল না।"

যোগেশ বিস্মিত দৃষ্টিতে অমলের মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "না হে না। তুমি একবারে ভুল বুঝেছ। আমার কথার মধ্যে কোন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত নেই। আমি জানি তুমি বিজ্ঞ লোক; নিরাপত্তার জন্য 'কিপ টু দি লেফ্‌ট্‌' যে খুব ভাল নিয়ম তা তুমি মান, ওকে অমান্য করবার সাধ্য তোমার নেই।"

অমল লজ্জা পাইয়া মুখ নত করিল। ক্ষণকাল পরে যোগেশই পুনরায় কহিল, "না অমল, আমি কোন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত করি নি, রহস্যও করিনি। তোমার সাহচর্য শোভা আরও একটু বেশী করে পা'ক এ আমি সত্যি চাই।"

অমল বিরক্ত হইয়া কহিল, "তোমার উদ্দেশ্য সাধু হতে পারে, কিন্তু এ তোমার আগুন নিয়ে খেলা। উনি ঘরের মধ্যে যে পরিতৃপ্তি পান নি, বাইরে থেকে তাই আহরণ করবার জন্য এ তোমার তাকে উৎসাহ দেওয়া।"

যোগেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "তাই যদি হয় তবে তাতে আঁৎকে উঠবার কি আছে অমল? আমার স্বামীত্বের অধিকার কোনদিনই আমি শোভার উপর খাটাতে চাই নি। তার জীবন আর কারও সঙ্গে সার্থক হয়েছে দেখলে আমি বরং খুসীই হব।"

অমলের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, তাহার দুই চক্ষু দিয়া সহসা ঘৃণা যেন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। সে কহিল, "সত্যি বলছি যোগেশ, তুমি পাপিষ্ঠ, মহাপাপিষ্ঠ।"

যোগেশের ভ্রূযুগলও কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "কেন? বৈদিক মন্ত্রকে আমি ব্রহ্মার মুখের বাণী মনে করি না, তাই? যে মেয়েকে আমি ভালবাসি না তাকে দিয়ে আমার রক্ত-মাংসের ক্ষুধা মিটাতে আমার অন্তর ঘৃণায়, লজ্জায় সংকুচিত হয়ে উঠে, তাই? বিবাহিতা স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্যকে আমি শ্রদ্ধা করতে চাই, তার ব্যক্তিত্বকে পূর্ণবিকাশের স্বাধীনতা দিতে চাই, সেই জন্য আমি পাপিষ্ঠ?"

যোগেশের উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া অমল কেমন যেন হতভম্ব হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তাহার মুখে উত্তর ফুটিল না। ওদিকে যোগেশ উত্তেজনায় আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "তোমার কাছ থেকে এ বিশেষণ আমি প্রত্যাশা করিনি অমল, কারণ তুমি অন্তত জান যে কত বড় আগ্নেয়গিরি এই বুকের ভিতর আমি বয়ে বেড়াচ্ছি, কি নিষ্ঠুরভাবেই এই সুদীর্ঘকাল নিজেকে আমি উপবাসী রেখেছি—শুধু আর একজন যাতে ব্যথা না পায় তারই জন্য। তবু তুমি বলছ যে আমি পাপিষ্ঠ? বেশ, পাপিষ্ঠের কাছে আর মহত্ত্বের প্রত্যাশা করো না।" বলিতে বলিতে তখনই সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

অপরাহ্নের কলিকাতার প্রশস্ত রাজপথে বিচিত্র জনতা তখন বাঁধভাঙা জলস্রোতের মত কল্লোল তুলিয়া অবিরাম বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। অথচ সকল ধ্বনিকে ডুবাইয়া আজ কেবল একটি মাত্র ধ্বনি যোগেশের কর্ণকুহরে বার বার আঘাত করিতে লাগিল—সে পাপিষ্ঠ, মহাপাপিষ্ঠ।

রাজপথের অসংখ্য দৃশ্য বায়স্কোপের ছবির মত তাহার সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। দিনের কাজ শেষ করিবার পর ক্লান্তমুখে প্রফুল্লতার দীপ্তি ফুটাইয়া আপিসের গরীব কর্মচারীরা সোৎসাহে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছিল—কাহারও হাতে মাছ, কাহারও হাতে তরকারী আবার কাহারও-বা হাতে পরণের বা প্রসাধনের কোন একটা সামগ্রী। একটি যুবক ও যুবতী—বোধ হয় স্বামী-স্ত্রী—অশান্ত যৌবনের সর্বতোমুখী বুভুক্ষার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তির স্নিগ্ধ সন্তোষে দুইজনেরই মুখ উদ্ভাসিত,—আনন্দ যেন অন্তরের পাত্রে আর ঠাঁই না পাইয়াই লাবণ্য হইয়া উভয়ের প্রতি অঙ্গ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে—উভয়ে গল্প করিতে করিতে যোগেশকে পাশ কাটাইয়া গেল। একটি সরকারী বাগানে প্রজাপতির মত ফুটফুটে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে মাথায় চুল, গায়ে জামা ও ত্বকের বর্ণে ইন্দ্রধনু ফুটাইয়া তুলিয়া মহা উল্লাসে খেলা করিতেছিল; তাহাদের সুমিষ্ট কোলাহল যোগেশের কর্ণে প্রবেশ করিল। বিশেষ করিয়া কোন দৃশ্য যে সে চাহিয়া দেখিল তাহা নহে, কাণ পাতিয়া কোন কথাও সে শুনিল না। অথচ রাজপথের প্রত্যেকটি দৃশ্য ও প্রত্যেকটি শব্দই যেন আজ তুলনা করিয়া তাহার নিজের জীবনের ব্যর্থতাই বড় সুস্পষ্টরূপে তাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিল আর তাহার কাণের কাছে অনবরত বাজিয়া বাজিয়া উঠিতে লাগিল অমলের সেই তিরস্কার—সে পাপিষ্ঠ, মহাপাপিষ্ঠ।

যোগেশ যতই ঐদিনের ঘটনা স্মরণ করিতে লাগিল ততই জগতের সকলের বিরুদ্ধে কেমন একটা তীব্র অভিমান, একটা নিষ্ফল আক্রোশ তাহার বুকের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল আর বাষ্পীয়পোতের অভ্যন্তরস্থ বাষ্প যেমন করিয়া পোতখানিকে ঠেলিয়া লইয়া যায় তেমনই করিয়াই যোগেশের ক্ষুব্ধ অন্তরের নির্মম বেদনা অনবরত তাহাকে সম্মুখের দিকে ঠেলিতে লাগিল।

লক্ষ্যহীনের মত অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতে চলিতে বাধা পাইয়া অবশেষে যেখানে সে থমকিয়া দাঁড়াইল উহা একটি অপ্রসস্ত স্বল্পালোকিত গলির মুখ—সেখানে ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে, ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়া সহজ নহে।

গলির মোড়ে একটি দেশী মদের দোকান। বোধ করি একটু পরেই সে রাত্রির মত বন্ধ হইয়া যাইবে বলিয়াই অনেকগুলি ক্রেতা উহার দ্বারে ভিড় জমাইয়া তুলিয়াছিল। ভিতরে বসিয়া যাহারা

(শেষাংশ ৪০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুনশ্চ

শ্রীআশীষ গুপ্ত

ভাই অনাদি,

মনীষার কথা পুনরায় বলার প্রয়োজন হ'য়েছে এবং আজকাল ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে মনীষার কথা বল্‌তে গেলেই তোমার কথা মনে পড়ে এবং মনীষার বিষয়ে কিছু বলার প্রয়োজন হওয়া মানেই তোমাকে মনীষার সম্বন্ধে latest সংবাদ জ্ঞাপন করা,—কাজেই তোমার কাছে চিঠি লিখ্‌ছি।

আমার মনোজগতে তুমি আর মনীষা হরিহরাত্মা হ'য়ে উঠেছ। এটা তোমায় নিন্দাচ্ছলে বলিনি, অতএব অসন্তুষ্ট হ'য়ো না যেন। তোমার সঙ্গে উপস্থিত কোন পরিহাসের মতলব নেই, কাজেই আমার চিন্তাধারায় তুমি আর মনীষা ব্র্যাকেটেড্ হ'য়েছ একথার অর্থ এই যে, মনীষার কথা তোমাকে লিখ্‌লে তুমি অন্য সকলের চেয়ে সহজে তা বুঝবে।

মনীষাকে আবার ফিরে পেয়েছি অনাদি। কিন্তু এ ফিরে পাওয়া হ'ল পথের মাঝে গাড়ীচাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে যে পরমাত্মীয়ের, মর্গে গিয়ে তাকে ফিরে পাওয়ার মত!—আজ যখন তোমাকে চিঠি লিখ্‌ছি, তখন আমার চোখে জল, আমার লেখনী মন্থর—আজ আমি আমার সাতাশ বছরের জীবন থেকে নিমেষে তেইশ বছরে পিছিয়ে গেলাম যেন। স্বপ্ন দেখ্‌ছি অনাদি, দিবা স্বপ্ন, কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীর স্বপ্নের মত যা নিশ্চয়ই নিষ্ফল।

মনীষাদের কুচবিহারের বাড়ীতে আমি তখন অতিথি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠ্‌লেই মনীষা এসে বলে, "কোকো খাবে অজয়দা, না ওভালটিন, না চা?"

উত্তর দিই, "চা-খোর মানুষকে রোজ ওই অনাবশ্যক প্রশ্ন করে কেন আর লজ্জা দাও মনীষা?"

মনীষা আবার বলে, "পোচ্ খাবে না অম্‌লেট?"

এবার খুসী হ'য়ে উঠি, "এ প্রশ্ন অবশ্য আগেরটার চেয়ে প্রয়োজনীয়,—পোচই নিয়ে এসো, রুটি-মাখনের ওপর পোচ্‌টা এনো মনীষা,—রুটিটাকে খুব পাত্‌লা করে কেটো কিন্তু—"

মনীষা চলে যায়,—তার গমনপথের পানে আমি নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। মনীষার দিকে চেয়ে আমার আর প্রসন্নতার অন্ত থাকে না,—সন্দেহ থাকে না যে, পৃথিবীতে জীবনধারণ ক'রতে হলে এমনিতর একটি অপূর্ব মেয়ে চোখের সম্মুখে থাকা অত্যাবশ্যক। ওকে দেখলে বেঁচে থাকার অর্থ দাঁড়িয়ে যায় সম্পূর্ণ অন্যরকম। জীবনের অবসর মুহূর্তগুলি কল্পনার ঠাসবুনুনিতে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে,—নিজেকে বহু দিক দিয়ে বড় করে তুলি—মাটির পানে চাই, আকাশের পানে চাই, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম যে দিকেই চাই না কেন, কেবলই মনে হ'তে থাকে পৃথিবী রমণীয়, জীবন সুন্দর এবং আমি বেঁচে আছি।

পরিতৃপ্তির ঔজ্জ্বল্যে ভাবলাম, আমার বান্ধবী মনীষা, আমার মানসী মনীষা—যে পথে সে বিচরণ করে ফুল ফোটে না সে পথে, জানি তার চরণাঘাতে বীণার ধ্বনি অবশ্য বাজে না, কিন্তু যে মনীষার রূপে লঘু মেঘাবৃত পূর্ণিমা রজনীর মোহ, যার চোখে বর্ষাকাশের বহু সম্ভাবনার বিচিত্র মায়া, সে মনীষার চলার পথে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হ'তে পারত বৈকি। তার চরণাঘাতে বীণার ধ্বনি শুনতে পাওয়াও ত এমন কিছু অসম্ভব নয়।

অনাদি, তোমাকে আমি চার বছর পিছনে টেনে নিয়ে গিয়েছি, সেটা ভুলো না যেন। আমার সম্বন্ধে আজ তোমাকে কিছুক্ষণের জন্য ধৈর্য ধারণ করতে হবে, যে "আমি"র সঙ্গে তোমার পরিচয়, তাকে তুমি সামান্য সময়ের জন্যও বিস্মৃত হতে চেষ্টা ক'রো। তোমার ঘরের দেয়ালে যদি আজ ক্রীম রংয়ের ডিস্‌টেম্পার করা থাক্‌ত, শ্লোবের ভিতরকার আলোটার রং যদি হ'ত অলিভ্ গ্রীন, দরজা জানালার রেশমী পর্দার ভাঁজে ভাঁজে যদি বিচ্ছুরিত হতে পারত সেই কচি কলাপাতি রংয়ের আলো,—বুককেসের উপরকার ফুলদানীটার মধ্যে থাক্‌ত যদি রজনীগন্ধার গুচ্ছ, অনেক দূর থেকে যদি অর্গানের সুরের সঙ্গে ভেসে আসত তোমার মানসীর মধুকণ্ঠের গানের সুর, "সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ, তোমারে করি গো নমস্কার",—তাহ'লে আজ তোমার পক্ষে আমার এ উচ্ছ্বাসকে অনুসরণ করা সহজ হ'ত!

কিন্তু ইতিমধ্যে মনীষা চা ও পোচ্ নিয়ে ফিরে এল।

"অজয়দা, তুমি নাকি কালই কল্‌কাতায় ফিরে যেতে চাও?"

"হাঁ—"

"কেন শুনি?" বলে' মনীষা এক মুহূর্ত আমার মুখের পানে তাকিয়ে থেকে কৌতুকের হাসি হেসে আবার বল্‌ল, "ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে দেখ, তোমার কুচবিহার ছাড়বার তারিখকে red letter day করে রেখেছি,—আসবার সময় কিছুটা স্বাধীনতা তবু তোমার ছিল, কিন্তু যাবার তারিখ স্থির করব আমি।"

চেয়ে দেখ্‌লাম, ক্যালেণ্ডারের পনের দিন পরের রবিবারে লাল পেন্‌সিল দিয়ে বড় করে দাগ দেওয়া র'য়েছে। সন্ত্রস্ত-ভাবে বল্‌লাম, "কিন্তু মনু, আমার কাজকর্ম—

পুরুষালি অধীরতায় মনীষা হাত নেড়ে প্রতিবাদ বন্ধ করে' দেওয়ার ভঙ্গীতে বলল, "কাজকর্ম be dashed! তুমি যে পনেরো দিনের আগে যেতে পারছ না, সেটা final."

বুঝলাম এ বিষয়ে আর আলোচনা নিষ্ফল, যে মকদ্দমার বিচার একতরফা নিষ্পত্তি হ'য়েছে, তার আর re-opened হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। মনীষা স্মিতমুখে বল্‌ল, "ওই red letter dayও কিন্তু বদ্‌লে যেতে পারে আরও সামনের দিকে। man proposes, but woman disposes! ঈশ্বরের occupation gone, অজয়দা!"

বলে' আকাশে বাতাসে অপূর্ব কুহকের সঞ্চার করে মনীষা অন্তর্হিত হ'ল। বসে বসে ভাবতে লাগলাম, ঠিক সময়ে কলকাতায় না ফেরার জন্য কাজের ক্ষতি হবে প্রচুর, কিন্তু মনীষা যখন একবার "না" বলেছে, তখন তাকে "হ্যাঁ"

করান শুধু শক্ত নয়, অসম্ভব—অতএব থাক্‌তেই হবে। কিন্তু যথাসময়ে কল্‌কাতায় না ফেরার জন্য ক্ষতির সম্ভাবনায় মনে মনে উদ্বেগ অনুভব না করে কেন যে নিবিড় আনন্দে চিত্ত পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল, তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কেবলই এই কথা মনে হ'তে লাগল, জীবনের সকল ক্ষতি-গুলোই যদি এমনই রমণীয় হ'ত!

কুচবিহার অবস্থানের বাকী দিনগুলো কেটে গেল মুক্তপক্ষ দেবদূতের মত,—মাটিতে আর পা পড়ল না যেন। আবেশে উল্লাসে আরও পঁচিশটা দিন যেন এক মুহূর্তের মধ্যে অতিক্রান্ত হ'ল। মানুষের সাহচর্যে যে এত মাধুর্য থাক্‌তে পারে, সেকথা এমন করে প্রথম জানলাম এই কুচবিহারে গিয়ে। সামান্য একটি কথা, একটুখানি আপাত-তুচ্ছ মৃদু হাসি, এক নিমেষের কপট ক্রোধের ভ্রূভঙ্গী এদের সম্বল করে' কত যে চল্‌ল আমার মনে মনে গুটিপোকার মত রেশমের জাল বোনা!

কিন্তু এ হ'ল চার বছর পূর্বের কথা এবং এমন করে' যদি এ কাহিনী বল্‌তে আরম্ভ করি, তাহ'লে একে সমাপ্ত করাই দায় হবে। যে স্বপ্ন নিষ্ফল, চোখ চাইলেই যে স্বপ্নের নিছক স্বপ্নত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না, তার জন্যই আমাদের মনের তীক্ষ্ণতম বেদনা—সেই বেদনা যখন সহসা মুখর হয়, তখন তাকে সংযত করবার প্রয়াস সুকঠিন প্রয়াস—কিন্তু তবুও কুচবিহার প্রসঙ্গ আর বাড়াব না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এক একবার মনে হয়, চার বছর, মাত্র চার বছর, অথচ কি বীভৎস পরিবর্তন এই সামান্য চার বছরের মধ্যে! যে কাল নিরবধি, যে কাল নিত্যপ্রবহমান, সেই মহাকালের সামান্য চারটি বছর মাত্র কেটেছে অথচ ক্ষতির পরিমাণ দেখে মনে হয়, সে ক্ষতি যেন যুগযুগান্ত প্রসারিত। হায়রে এত অল্প সময়ে এত বড় লোকসানও মানুষের হয়!

চার বছর পূর্বেকার মনীষার কথা যখন লিখছি তখন মনে হচ্ছে যেন চলে গিয়েছি প্রাগৈতিহাসিক যুগে, যে যুগের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সাবধানে পা ফেলে ফেলে চলতে হয়! আমার কাছে পুরাতনী মনীষার কথা আজ প্রত্নতত্ত্বের কথা বলেই মনে হচ্ছে!

কিন্তু অনাদি, এবার এগিয়ে এসে গতপরশ্ব তারিখে পৌঁছোতে হবে। পরশুদিন হঠাৎ মনীষার চিঠি এল। বলা বাহুল্য, এটা অপ্রত্যাশিত,—অতএব চিঠিটা খুলবার পূর্বে কৌতূহলের পরিমাণ ছিল কিছুটা বেশী। মনীষা লিখেছে,

"অজয়দা, তুমি কি চাও যে, আমার কৃত অন্যায়ের জন্য আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি? তাতেই কি আমার অপরাধের গ্লানি ঘুচবে অজয়দা?—কিন্তু তোমাকে ত আমি জানি,—তুমি নিজে মহৎ, সংসারে বহু মানুষের চেয়েই তুমি বৃহত্তর, তাই অপরের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে তুমি অতি সচেতন নও। সে বিষয়ে তোমার স্পর্শাতুরতা নেই। তোমার চরিত্রের এই অসামান্যতার উল্লেখ করছি ব'লে একথা যেন মনে ক'র না যে, আমার অপরাধকে লঘু করে তুলবার চেষ্টা করছি।

আমি ভাল ক'রেই জানি অজয়দা, যে কোন প্রায়শ্চিত্তই আমার পক্ষে যথেষ্ট নয়, যা তোমার কাছে পেয়েছি এবং প্রতিদানে যা তোমাকে দিয়েছি। এই দুইয়ের যখন হিসাব-নিকাশ করতে বসি, তখন ক্ষোভে দুঃখে আমি আর আত্মসংবরণ করতে পারিনে। কিন্তু আজও আমি বিশ্বাস করি, আমার সহস্র অপরাধ সত্ত্বেও আমার জন্য তোমার তিতিক্ষা, আমার জন্য তোমার স্নেহ।

প্রসঙ্গত আজ তোমাকে এই কথাটুকুই বল্‌ব,—কিন্তু আমার অপরাধের সাফাই গাইছি বলে মনে ক'র না যেন, অজয়দা—যে এ পৃথিবীতে মানুষের বাইরের আচরণ সব সময় তার মানসিক চিন্তাধারার দর্পণ নয়, তাই অনেক সময় আমাদের মনে মুখে দুই হ'তে হয়—সর্বান্তঃকরণে যা কামনা করি, বাইরে ভাণ করতে হয় তার প্রতি ঔদাসিন্যের,—হৃদয়ে যিনি দেবতা, বাইরে সর্বজনসমক্ষে পরিহাসের সামগ্রী ক'রে তুলি তাঁকে। জানি, এ রকম ব্যবহার অশ্রদ্ধেয়, এ ছলনা গ্লানিকর, কিন্তু এরই নাম যখন জীবন, তখন একে ত তুমি একেবারে অস্বীকার করতে পার না, অজয়দা!

তোমাকে যে আমি খুব একটা নূতন কথা বল্‌লাম তা নয়, কিন্তু এর মধ্যে আমার অধুনাতম আচরণের প্রকৃত অর্থের যে ইঙ্গিত আছে, তা তুমি সহজেই বুঝবে।

কিন্তু অজয়দা, কিছুতে তৃপ্তি পাচ্ছি না,—কেবল মনে হচ্ছে, যদি তুমি ভুল বুঝে থাক, দুঃখ পেয়ে থাক, অসন্তুষ্ট হ'য়ে থাক, তাহ'লে কেমন ক'রে তোমাকে আমি প্রসন্ন করব, কেমন করে আমার কৃত অপরাধের জন্য দু'হাত পেতে শাস্তি গ্রহণ করব তোমার কাছে?—অল্প লিখে টুক্‌রো করে লিখে মন উঠ্‌ছে না কিছুতেই, অনেক কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে তোমার কাছে, আগের দিনের মত, আমার সেই প্রজাপতির মত রঙীন দিনগুলির মত, যখন এমন ক'রে ভুল বোঝাবুঝির পালা ছিল না, মনে মুখে দুই হবার ছিল না বিড়ম্বনা।

কুচবিহারের দিনগুলির কথা মনে পড়ছে অজয়দা—যক্ষের ধনের মত সেই কটি দিনকে আগ্‌লে আছি,—আজও যে একেবারে দেউলে হ'য়ে যাই নি, আজও যে তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে পারছি, তা কেবল সেই বত্রিশটি দিনের দৌলতে। কত দুঃখে দুর্দশায়, কত বেদনায় অসম্মানে নানা পরিবেশের মধ্যেও যে সে স্মৃতিটুকুকে রক্ষা করে এসেছি আমার সর্বস্ব-ধনের মত, সেকথা যদি তুমি জান্‌তে অজয়দা, তাহ'লে আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারতাম যে, পরবর্তীকালের আমার কোন আচরণেই তুমি কোনদিন আমার প্রতি বিরূপ হবে না,—আমাকে তুমি ভুল বুঝ্‌বে না কখনও।

কিন্তু এমন ক'রে লিখে শান্তি পাচ্ছি না একেবারেই। সব কথা তোমাকে খুলে বলবার জন্য আমার মনে ব্যাকুলতা। তোমাকে আমি জানাতে চাই, বোঝাতে চাই কার্যকারণের সম্বন্ধ। তোমার প্রতি অসদাচরণের অনুশোচনায় আমার অন্তর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, অনুমতি দেবে অজয়দা আমাকে তোমার সঙ্গে দেখা করবার? নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করে তোমার কাছে বিশ্লেষণের দেবে আমাকে সুযোগ? নিজেই চলে' যেতাম তোমার কাছে এর

অনেক আগে,—কিন্তু কোথায় যেন মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে থাক, যদি তুমি কথা না কও! তাহ'লে এই শেষ খড়ের টুক্‌রোটিতেই উটের পিঠ ভাঙ্গবে। অনেক আমার সয়েছে, কিন্তু তোমার স্নেহহীনতা আমার সইবে না। অথচ তোমার প্রীতি সম্বন্ধে আমার মনে অখণ্ড বিশ্বাস, জানি যে তার মত ভারসহ বস্তু সংসারে অল্পই আছে। কিন্তু তবু যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে ভয় পাই, ঔদাসীন্যের সম্ভাবনা কল্পনা ক'রে চিত্ত যে আমার হাহাকার করতে থাকে, তার কারণ নিজের দীন আচরণের দরুণ দুর্বল হ'য়ে পড়েছি, ছোট হ'য়ে গিয়েছি নিজের কাছেই।—করজোড়ে মিনতি করছি অজয়দা, তুমি আমাকে একবার অনুমতি দাও তোমার কাছে যাবার, তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে explain করবার। চোখে হয়ত আমার জল থাক্‌বে, কণ্ঠস্বর হয়ত হবে বেদনা-উচ্ছ্বসিত, কিন্তু তবুও স্বীকারোক্তিতে আমার অসত্য স্পর্শ করবে না, থাক্‌বে না আমার ত্রুটি স্বীকারে ত্রুটিক্ষালনের প্রয়াস।

আর একটা কথা অজয়দা,—আজ আমার স্বামী ও আমি অতিশয় বিপদগ্রস্ত এবং এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য উঁচু দিকে ঈশ্বরের পানে চাইবার চেষ্টা করিনে, কিন্তু তোমার কাছে ছুটে আসি। মাঝখানকার আমার গ্লানিকর আচরণ বাদ দিলে এতে যে কত আনন্দ ছিল অজয়দা!

আমাদের বিপদটা এসেছে হরিহরের দিক থেকে এবং হরিহর তোমাকে বাঘের মত ভয় করে। সেদিন যে চৌরঙ্গীর মোড়ে তোমাকে না-চেনার ভাণ করেছিলাম, তার কারণটা এবার তুমি বুঝবে হয়ত। যে হরিহরকে প্রসন্ন করবার প্রয়োজন ছিল আমাদের, সেই হরিহর ছিল সেদিন আমাদের সঙ্গী এবং তার সঙ্গে তোমার বিরোধ, অতএব আমার কৃত সেদিনকার দুষ্কার্যের হেতুটা এইবার তোমার কাছে জলের মত সোজা হবে।

আমি ছোট, আমি সামান্য, কিন্তু লক্ষ যোজন দূরের সূর্যালোক গিরি গহবরেও প্রবেশ করে, অতএব আমি নগণ্য বলেই তোমার পানে তাকিয়ে থাক্‌বার অধিকার থেকে বঞ্চিত হব না কিছুতেই। আমার অপরাধ করা এবং তোমার পক্ষে তার জন্য ত্রুটি গ্রহণ না করা এমনতর একটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলে' আমি মনে করি যে, আলোবাতাসের জন্য যেমন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিনে, মিনতি করিনে, অথচ দিবারাত্র সেই অযাচিত দানের বিপুল ঐশ্বর্যে নিমগ্ন হ'য়ে থাকি, তেমনিতর আমার বিপদে তোমার আশ্রয়লাভ করা, নির্বিঘ্নতার জন্য তোমার মুখপানে চাওয়া একান্ত স্বতঃসিদ্ধ বলে বোধ করি। অতএব বিপদের জন্য ভাবছিনে অজয়দা, জানি যে তোমার কানে যখন এ সংবাদ একবার পৌঁছে দিতে পেরেছি, তখন সমস্যা আমার মিটেছে। কিন্তু তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের দুর্লভ সুযোগের জন্য আজ আমি নতজানু হ'য়ে প্রার্থনা কর্‌ছি, আমার অনুতপ্ত কণ্ঠের সে আবেদন কি আজ বিফল হবে? —ইতি

মনু।

অনাদি, মনীষার চিঠি তোমাকে শোনালাম, আমার উত্তরটাও এবার তোমাকে শোনাচ্ছি। আমি ওকে লিখেছি,—

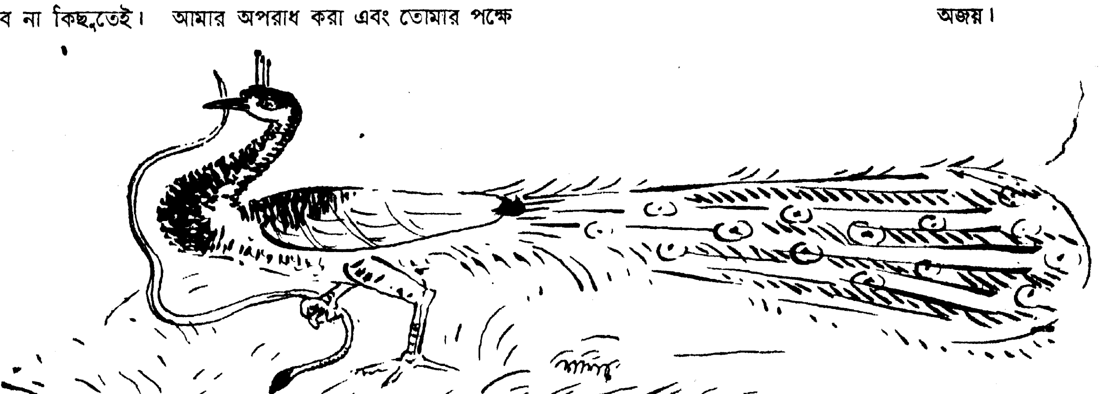
মনীষা,

তোমার চিঠি পেয়েছি। কি যে তোমার বিপদ, তা তুমি খুলে লেখনি, কিন্তু যত গুরুতর এবং যেমন ধরণেরই তা হ'ক না কেন, আমি তোমাদের সাহায্য করব।

আমার সঙ্গে তুমি দেখা ক'রতে না চাইলেই ভাল হয়, কারণ তোমার স্বামীকে আমার এখানে পাঠালেই আমি তাঁর কাছ থেকে সব শুনে যথোচিত ব্যবস্থা করব। কিন্তু এই সাহায্যের বিনিময়ে তোমার কাছ থেকেও আমার কিছু প্রার্থনা আছে,—অনুগ্রহ ক'রে ভবিষ্যতে তুমি আর আমাকে কোনদিন চিঠি লিখ্‌বে না। কুচবিহারের যে দিনগুলির কথা তুমি তোমার চিঠিতে উল্লেখ করেছ, আমিও সেই কয়েকটি দিনের নাম ক'রেই তোমাকে এই অনুরোধ জ্ঞাপন করছি!

তুমি লিখেছ, তোমার বিপদ গুরুতর এবং আমার সাহায্য অত্যাবশ্যক। কিন্তু এই হচ্ছে আমার সাহায্যের সর্ত। অতএব আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার এই সামান্য অনুরোধ উপেক্ষিত হবে না। —ইতি

অজয়।



সেকালের ঢাকা শহর

শ্রীসজলনয়না দেবী

১২৮২ সালে ঢাকা সূত্রাপুরে আমার মাতামহ ৺হারাণচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাড়িতে আমার জন্ম হয়। বাড়িতে ছোট ছেলে ছিল না, সুতরাং আমি হওয়াতে বাড়ির সকলেই অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছিলেন।

আমার পিত্রালয়ে বহু পরিবার। সেকালে গৃহস্থ পরিবারের মেয়েরা সংসারের কাজ কর্ম করিতেন। আমার মাকে সংসারের অনেক পরিশ্রমের কাজ করতে হ'ত। তাতে শরীর অত্যন্ত খারাপ হত, শেষে যখন আর খাট্‌বার অবস্থা থাকত না, তখন দাদামশায় জ্যেঠামশায়দের অনেক বলে কয়ে মাকে ঢাকায় নিয়ে যেতেন, সেখানে কয়েক মাস থেকে শরীরের ভাল কিছু উন্নতি হলে আবার ফিরিয়ে আনতেন। সুতরাং আমি ছোটবেলায় ঢাকায় অনেকবার গিয়েছি। পঞ্চাশ কিম্বা বাহান্ন বছর পূর্বে ঢাকা শহরের যে স্মৃতি মনে অস্পষ্ট হয়ে জেগে রয়েছে তাই আজ লিখ্‌ছি।

তখন ঢাকার রাস্তায় ফুটপাথ ছিল না, গ্যাসের আলো ছিল না, কেরোসিনের আলো অবশ্য ছিল, বাড়িতে জলের কল ছিল না—সব বাড়িতে পাতকূয়া ছিল।

সব রকম জিনিসই খুব সস্তা ছিল, আমি তখন ছোট সুতরাং কিসের কত দাম তা অবশ্য জানতাম না, তবে খুব যে সস্তা • তা জানতাম। সোনা ষোল টাকা ভরি ছিল শুনেছি, রূপে ছিল এক টাকা ভরি। খাবার জিনিসের খুব বাহুল্য ছিল। পাত ক্ষীর (কলাপাতার উপর খোয়া চাপড়া করে দিয়ে তার উপর আর একটি পাতা চাপা দেওয়া) সানি ক্ষীর (হাঁড়ির ভিতর নালী ক্ষীর) ছাপার মাখন (খাঁটি মাখনের ছাপ দেওয়া) ইত্যাদি সমস্ত দিন ফেরিওয়ালারা বিক্রী করত। মাছও খুব সস্তা ছিল, খুব ছোট ছোট এক রকম মাছ পেতাম খুব আস্বাদী; তার নাম সোনা খড়কে। সব রকম ফল, বিশেষত কমলা লেবু, আনারস, পেয়ারা, মাখ্‌না (দেখতে উপরে গোল ভিতরে পদ্মচাকার মত ছোট ছোট ফল) এই সকল অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত।

ঢাকার মোরব্বা অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল। শ্রীহট্ট থেকে মোরব্বা আমদানী হতো। কমলা লেবু, নারেঙ্গা লেবু, আমলকী, হরিতকী, শতমূলে এই সব মোরব্বা ছিল আমাদের অত্যন্ত প্রিয়। ঢাকায় এতদিন ছিলাম, কিন্তু গরিব ভিখারী একদিনও দেখি নি। সমস্ত শহরের বেশীর ভাগ লোকই সামান্য ক্রিয়াকর্মে আড়ম্বরটা খুব পছন্দ করত। বিবাহ ব্যাপারের ত কথাই নেই, বিবাহের উৎসব দশ দিন পর্যন্ত হবে আর গাড়ি বোঝাই লোক (এক গাড়িতে দশ বারজন পর্যন্ত) কেবলই নিমন্ত্রণ খেতে যাবে। কুটুম্বর না হল ইষ্ট। বিয়ের সময় কনে নিজে "ফুল কোটা" নিয়ে বরকে বরণ করবে। ('ফুল কোটা' এক রকম ক্রিয়া, ফুল নিয়ে বরের সম্মুখে নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করা; তা দেখ্‌তে বেশ সুন্দর)। তারপর তত্ত্ব পাঠানো। আজকালের মত থালায় করে সন্দেশ পাঠানো নয়, সমস্ত জিনিস বাঁকে করে আন্দাজ ত্রিশজন লোক নিয়ে যাবে, সঙ্গে বাজনা বাজতে বাজতে যাবে, সে এক বিরাট দৃশ্য।

আমার মাতামহ ফৌজদারীর সেরেস্তাদার ছিলেন। মাইনে পেতেন দু'শো টাকা। বড়লোক অবশ্য নন, কিন্তু উদার চরিত্র, সদালাপী, ধার্মিক, পরোপকারী ছিলেন। ঢাকার প্রায় সমস্ত বড়লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল। তখন ঢাকার নবাব ছিলেন আবদুল গনি, তাঁকে সচরাচর লোকে গনি মিঞা বল্‌ত। আমার মাতামহ তাঁর বাড়িতেও মাঝে মাঝে যেতেন।

মামার বাড়িতে লোকজন কম ছিল। দাদামশায়, দিদিমা, বড়মামা ৺আশুতোষ সরকার (তখন ল কলেজে পড়তেন), মেজমামা ৺শ্রীশচন্দ্র সরকার (পরে কলিকাতায় ডাক্তারি পড়তেন)। ছোটমামা নরেন্দ্রনাথ সরকার (স্কুলে পড়তেন)। ছোটমামার মুখে শুনেছি, একদিন তিনি স্কুলে পড়ছেন এমন সময় খবর এলো তাঁর একটি ভাগ্নি হয়েছে। খবর শুনেই তিনি দোয়াত কলম নিয়ে বাড়ির দিকে দৌড়লেন, কাপড়ে কালি লেগে একাকার হয়ে গেল, তাঁর সেদিকে হুঁস নেই। পাড়ার লোকেরা মামাদের বল্‌লে, "তোমাদের ভাগ্নি হয়েছে আমাদের খাওয়াও।" তখনই কমলা লেবু, সন্দেশ এনে সকলকে খাওয়ান হল।

সে সময় ঢাকায়, সনাতন, রূপ, রঘু তিন ভাই খুব বড়লোক ছিলেন, তাঁরা দাদামশায়কে খুব মান্য করতেন। রূপবাবুর স্ত্রী দিদিমাকে মা বলতেন। দিদিমার দুই বোন অল্প বয়সে বিধবা হয়ে সর্বত্যাগী হয়েছিলেন। দিদিমাও তাঁদের জন্য সর্বত্যাগী হয়েছিলেন, কেবল এয়োস্ত্রীর চিহ্নস্বরূপ মোটা লালপেড়ে কাপড় আর হাতে দুই গাছা বালা ছাড়া তিনি আর কোন গহনা পরতেন না। বড়লোকের বাড়ি নিমন্ত্রণ, তাও সেই বেশেই যেতেন, কিন্তু তাঁকে কেউ অনাদর কর্‌ত না। ঢাকার মেয়েদের আবার তেমনি সাজ বাহারের ধুম ছিল, কি রাশিকৃত গহনা যে পর্‌ত তা বলে শেষ কর্‌তে পারি না। সব আমার মনে নেই, তবে যা মনে আছে বল্‌ছি। মাথায় ফুল চিরুণী, কানে কানবালা, চৌদানী, মাকড়ী, গলায় হাঁসুলী আরও চার পাঁচটি কি ঠিক মনে নেই। উপর হাতে তাবিজ, যশম, অনন্ত, বাজু। নীচের হাতে পিন খাড়ু, চুড়ি, যবদানা, মর্‌দানা, নারিকেল ফুল, পঁইছে, বালা ইত্যাদি। কোমরে গোট, চন্দ্রহার। পায়ে গুজরী, পঞ্চম, পাঁছর বাঁকমল, চরণপদ্ম। গায়ের কোন যায়গায় ফাঁক থাক্‌ত না।

রঘুবাবুর মেয়ের ছেলের ষষ্ঠী পূজার সময় আমরা আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। ষষ্ঠী পূজায় এত ঘটা কখনও দেখিনি। ষষ্ঠী পূজার নাম হল থুয়োনি। বাই নাচ, সাহেব বিবির নাচ, ইংরেজী বাজনা এসব ত হলোই আর কতলোক যে এসে খেয়ে গেল, তার সীমা সংখ্যা নেই। ছেলের বাপের বাড়ি থেকে দোল্‌না খাট, বেনারসী মশারি সোনার একটা গামলা ক'রে সোনার খেল্‌না প্রভৃতি এসেছিল। তারপর গহনা পোষাক ত আছেই।

রূপবাবুর ছেলের বিয়ের সময়েও আমরা গিয়েছিলাম। কনের বাড়ি আমাদের বাড়িরই কাছে ছিল। দিনেরবেলা

আলো, সাজানো হাতী, ঘোড়া, শোলার পাহাড়, সং ইত্যাদির সঙ্গে বর চতুর্দোলা চ'ড়ে এলো। তখন সেই সব বাজীতে আগুন দেওয়া হল। রূপবাবুর ছেলের নাম ছিল রাধাবল্লভ। মেয়ের নাম নরেশ। তার সঙ্গে আমার মাসীমার খুব ভাব ছিল, মাসীমার সঙ্গে সেখানে আরও একবার গিয়েছি।

ঢাকায় বিয়ের আর একটা বিশেষত্ব—বাড়িতে যখন বিয়ে হবে মেয়েরা সমস্ত দিন চীৎকার ক'রে গান গাইবে। আবার তাদের ভাষা এমন যে আমি কিছুই বুঝতে পারতাম না, শুনতেও বিশেষ ভাল লাগত না। তবে রূপবাবুরা অনেকটা মার্জিত রুচিসম্পন্ন হয়েছিল। তাদের কথা পরিষ্কার আর গহনার ভিতর যেগুলো নিতান্ত সেকেলে সেগুলো বাদ পড়েছিল।

ঢাকায় মেয়েদের আব্রু খুব বেশী ছিল। তখন মোটর, বাস ইত্যাদি হয় নি। যারা খুব বড়লোক তাদের বাড়িতে হাতী থাক্ত, হাতীর উপর হাওদা দিয়ে সকলে চড়্ত। সাধারণ লোকে ঘোড়া-গাড়ি ভাড়া করেই যাওয়া-আসা কর্ত। মেয়েরা যখন কোথাও যাবে বাড়ির ভিতর থেকে গাড়ি পর্যন্ত, দুদিকে দুখানা কাপড় কিম্বা চাদর দিয়ে আড়াল ক'রে রাখত যাতে বাহিরের লোক না দেখে ফেলে। গরীব মুসলমানের মেয়েরা বোরখা পরে রাস্তায় বেরুত। ব্রাহ্ম সমাজের ভিতরেও মেয়েরা চিকের আড়ালে থাক্তেন।

বিধবাদের অত্যন্ত শুচিবাই ছিল, ভাঁড়ার কিম্বা ঠাকুর ঘরে চুণকাম করবার দরকার হলে নিজেরাই কর্ত মুসলমান রাজমিস্ত্রী যেতে দিত না।

ঢাকায় বৈষ্ণব ধর্মের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। কার্তিক মাসে নিয়ম সেবার সময় ভাগবত পাঠ, কীর্তন প্রভৃতি বাড়ি বাড়ি হ'ত। রাস্তায় যখন কীর্তনের দল চলে যেত, তখন দু' পাশের বাড়ি থেকে খই বাতাসা প্রভৃতি ছড়ানো হোত। কীর্তনের পর সকলে সেই পথের ধুলায় গড়াগড়ি দিত, এমন কি খুব বড়লোকেরাও পথের ধুলায় গড়াগড়ি দিতেন।

হরির লুটের খুব ধুম ছিল। হরির লুটে বাতাসা, কদ্মা ও এলাচদানার লুট দেওয়া হ'ত। কোন কিছু বিষয় উপলক্ষ্য করেই হরির লুট মানা হ'ত। একজন বড়লোক (রূপবাবু কি রঘুবাবু তা মনে নেই) হরির লুট মেনেছিলেন, পাঁচশো টাকার। পাঁচশো টাকার লুট মেনে ভাবলেন, এত টাকার বাতাসা এলাচদানা কি হ'বে? এই চিন্তা তাঁর মনে হ'বামাত্র ভয় হ'ল এবং নিজের দুই কান মলে বললেন, "অপরাধ হ'য়েছে, জরিমানা পঞ্চাশ দিব।" সুতরাং তিনি পাঁচশো পঞ্চাশ টাকার হরির লুট দিলেন।

তখন ঢাকার বাসিন্দা প্রায় সকলেই সাহা ছিলেন। কায়স্থ ছিলেন আমার দাদামশায়, তাঁর জ্ঞাতি দুই ভাই আর আমার পিসেমশায় মতিলাল বক্সি। পিসিমার ছেলে তড়িৎকান্তি বক্সি আমারই বয়সী ছিলেন। আর আমার বড়মামার শ্বশুর বাড়ি ফুল বাড়িয়ায় (শহরের শেষে) ছিল। তাঁদের একটু ইতিহাস আছে। গোপাললোচন মিত্রের পূর্বপুরুষ সিপাহী বিদ্রোহের সময় কতকগুলি ইংরেজকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সেই জন্য গভর্নমেণ্ট থেকে বংশপরাম্পরায় রায় বাহাদুর উপাধি, আর জায়গা জমিদারী অনেক দিয়েছিলেন। তাঁদের খুব প্রকাণ্ড বাড়ি—বড়লোকের বাড়ির মত সব ছিল, একটা ঘরে কেবল ঝাড় লণ্ঠনই বোঝাই ছিল, রূপোর বাঁট দেওয়া বেনারসী ছাতা ইত্যাদি সমস্ত ছিল। গোপালবাবুর ভাইঝির সঙ্গে বড়মামার বিবাহ হয়। অল্প বয়সে বিয়ে হলে লেখা পড়া প্রায়ই হয় না, আমার বড়মামার কিন্তু এণ্ট্রান্স পাস করেই ষোল বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, তারপরে আরও চারটি পাশ করে উকীল, পরে মুন্সেফ, পরে জজ হয়েছিলেন। গোপালবাবুর নিজের কোন সন্তানাদি হয় নি, তাঁর এক শ্যালকের মেয়েকে পোষ্য কন্যা নিয়েছিলেন, তাকে কিছু বিষয় দিয়েছিলেন, কলিকাতায় কালী মিত্রের এক নাতীর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিলেন। আর সমস্ত বিষয়, বাড়ি বড়মামিমার ভায়েদের দিয়েছিলেন। শোভাবাজারের রাজা নীলকৃষ্ণের সঙ্গেও উহাদের কি একটা কুটুম্বিতা ছিল ঠিক মনেই। গোপালবাবুর বাড়িই তাঁর মা বোন দূর সম্পর্কে মাসী, পিসী ইত্যাদি, বড়মামিমার মা এইরূপ অনেক বিধবা প্রতিপালিত হতেন। বড়মামিমার তিন ভাই আর এক মাস্তুতো ভাই ছিলেন। বড়মামিমার ভায়েরা অল্প বয়সে অভিভাবক শূন্য হয়ে অগাধ টাকা হাতে পেয়ে, চরিত্র ঠিক রাখ্তে পার্লেন না। মদ ও বারবনিতার পিছনে সমস্তই শেষ কর্লেন। বড় ভায়ের একমাত্র মেয়ে অল্প বয়সে বিধবা হয়ে মারা গেল। মেজ ভাইয়ের দুই ছেলে দুই মেয়ে, মেয়েদের বিয়ে দিয়ে তারা শ্বশুর বাড়ি আছে। ছেলেরা বাপের চরিত্র দেখে দুঃখে ঘৃণায় কেউ বিয়ে করে নি।

আমার মাতামহের সূত্রাপুরে তিনটি ছোট ছোট বাড়ি ছিল, পরে তিনি পেন্সন নিয়ে বাঙলা ১২৯২ কিম্বা ৯৩ সালে কুমারখালী গ্রামে নিজের বাড়িতে আসেন। বাড়িগুলি ভাড়া দেওয়া ছিল, তারপর বিক্রয় করা হয়েছে, আর ঢাকার সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নাই। কিন্তু ছোটবেলায় যখন ঢাকায় থাকিতাম দিনগুলি খুব সুখে শান্তিতে কেটেছে সেকথা এনখও মনে পড়ে।

আশামুকুল

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার চৌধুরী

'লেখাপড়া সকলের হয় না' সামন্ত সান্ত্বনার সুরে বললোঃ তুমি দুঃখ করো না দিদি, রঞ্জন আমার ছেলের মতন। কেষ্ট আর রঞ্জন কি তফাৎ? আমি ওকে নিয়ে গিয়ে মানুষ করবো।

বিন্দু চোখের জল মুছে বললোঃ লেখাপড়া সকলের হয় না জানি, কিন্তু তাঁর যে বড় আশা ছিল সামন্ত, ছেলে অন্তত একটা পাসও করে।

সামন্ত বোনকে প্রবোধ দিলঃ চেষ্টার ত কসুর করনি, হ'ল না ত আর কি করবে?

করবার আর কি আছে? বিন্দু বললো ঃ বাটি ঘটী বাঁধা দিয়েও এবার পরীক্ষার টাকা জোগাড় করেছিলাম। একটু চুপ করে থেকে বিন্দু আবার বল্‌লোঃ দুঃখীর ভগবান কালাই হয় সামন্ত। দুঃখ করেই বা কি হবে? ওর অভিভাবক বলতে এখন তুমিই। যা ভাল বোঝ কর।

সামন্ত বললোঃ সেই ভাল দিদি, বছর তিনেক আমার কাছে থাকুক ক্ষেত খামারের কাজগুলো পাকা করে শিখে ফেলুক তার পর বাপের যে দু' পাঁচ বিঘে জমি আছে তাই নাড়াচাড়া করে যদি চালায় আর সেই সঙ্গে ধান চালের কারবারটাও করে ত দেখো তোমার রঞ্জনের পয়সা খায় কে?

ভবিষ্যৎ সুখের আশায় বিন্দু খুব সুখী হতে পারলো না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললোঃ আমার আর বেশী দিন নেই সামন্ত। হাতের নোয়া খুলে আর সুখের আশাও করি না। রঞ্জন যদি কোন দিন দু'পয়সা আনতে শেখে তবেই নইলে মরেও আমার শান্তি নেই।

সামন্ত এবার বললো ঃ তা হ'লে ওকে নিয়ে যাওয়াই সব দিক থেকে ভাল। কিন্তু রঞ্জনকে ছেড়ে থাকতে পারবে ত দিদি। আধ বেলা ছেলেকে না দেখলে ত তুমি পাগল হ'য়ে যাও।

বিন্দু ম্লান হাস্‌লো; বললোঃ সব সহ্য হয় সামন্ত—শত দুঃখেও আশা নিয়ে মানুষ বাঁচে—রঞ্জন তোর কাছে থেকে মানুষ হবে এই আশাতে আমার ছেলে ছেড়ে থাকার কষ্ট খুব সইবে। আর তা ছাড়া আমার কাছ ছেড়ে তোর কাছে থাকবে—নিরাপদেই থাকবে ভাই। আর দূর ত এমন কিছু নয়?

সামন্ত বললোঃ সে ত বটেই। তিন কোশ রাস্তা—এমন আর কি? মাসে দু'বার এলেই ত—বাকীটা সামন্ত শেষ করবার আর প্রয়োজন বোধ করলো না।

বিন্দু বললোঃ বস ভাই সন্ধ্যেটা দিয়ে আসি।

ইতিমধ্যে রঞ্জন ফিরলোঃ দাওয়ায় মামাকে একলা দেখে বললো, কি মামা? যাচ্ছ ত আজ? যত শীগ্‌গির পার চল বাপু। পড়াশুনো আর আমার ভাল লাগে না। আঠারো বছরের মরদ—লোকে মাইনর কেলাসে বসতে দেখলে ঠাট্টা করে না?

সামন্ত বুঝলো ভাগনের দুঃখ কোথায়; বললোঃ কে তোকে বসতে বলেচে শুনি? চল আমার ওখানে, ক্ষেত খামারের কাজ শেখ; আর কেষ্টাকে একটু হিসেবটা শিখিয়ে নিলেই তোদের দু'ভাইকে একটা ব্যবসায় লাগিয়ে দেব।

রঞ্জন মামার কথা শুনে হেসে উঠলোঃ ওই অঙ্কের জন্যেই ত থার্ড মাস্টারের জেদে এবার প্রমোশন পেলাম না। আমি শেখাবো অঙ্ক? বরঞ্চ কিছু কুস্তি টুস্তি কিম্বা লাঠি সড়কি খেলা যদি সে শিখতে চায় ত দেখো ছ'মাসে কেষ্টাকে ওস্তাদ করে দেবো।

সামন্ত ভাগ্নের কথা শুনে হাসলো। বললো ঃ মন্দই বা কি? চাষার ঘরে ওসবেরও ত দরকার রে। রঞ্জন, তোর লেখা-পড়া হ'ল না বলে তোর মার আফ্‌শোষের সীমা নেই—কিন্তু আমার বাবা এতটুকু দুঃখ নেই ওতে।

রঞ্জন বললোঃ মার ইচ্ছে আর বাবার সাধ আমাকে দিয়ে পূর্ণ হ'ল না বলে আমারই কি কম কষ্ট মামা! কিন্তু কি করবো বল? করবো—জান ত বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ।

রাত্রে খেতে বসে রঞ্জন মা'কে বললো ঃ মা পড়াশুনো আমার হ'ল না বলে তোমার যে কষ্ট তা বুঝি—কিন্তু কি করবে বল? মাথা যার নেই ও দিকে—

ছেলের কথায় বিন্দু চোখ মুছে বললোঃ না বাবা। তুই দুঃখ করিস্‌নে—তোর উপর আমার এতটুকু অনুযোগ নেই।

পুত্র এবার মাকে সান্ত্বনা দিলঃ ব্যবসাই আমি করবো মা। দেখো ব্যবসা করে আমি মানুষ হব।

কথায় কথায় বিন্দু বললোঃ মামীর কাছে থাকবি মা'র আদরেই থাকবি। আমি থাকবো না—দেখিস মারামারি কিম্বা নদীতে ঝাঁপাঝাঁপি করে আর মামীকে জ্বালাস নি বাবা। অসুখ বিশুখ করলে—

সামন্ত এবার প্রতিবাদ করলোঃ কি বলচো দিদি—ছেলে-পিলের কি আর অসুখ করে না? আর কেষ্টা ত বছরে ছ'মাস করে ভুগতেই আছে। রঞ্জনও ত ছেলে।

রঞ্জন এবার অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে বললোঃ তোমার কোন ভয় নেই মামা। আমি এইসা একসাসাইজ ওকে শেখাব দেখো অসুখ বিশুখের কোন বালাইই ওর থাকবে না।

রঞ্জনের কথা যে খাঁটি সত্য তা তার চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। ভাগ্‌নের দিকে তাকিয়ে সামন্ত তৃপ্তির হাসি হাসলো। মুখে বললোঃ তাই করিস রে।

ভোর রাত্রে রঞ্জন মামার বাড়ি যাবে। একমাত্র সন্তানকে ছেড়ে থাকতে বিন্দুর প্রাণ ফেটে যাবে। স্বামী মারা যাবার পর এই সতের বছর ছেলেকে সে চোখের আড়াল করেনি—। বিন্দু নিজেকে প্রবোধ দিল, ভগবান! ছেলে আমার মানুষ হোক্‌ তার বাপের নাম রাখুক আমার সব কিছু সহ্য হবে।

যাবার সময় ছেলের মুখ চুম্বন করে বিন্দু শুধু বললো বাবা, বয়স তোর হল আঠার কিন্তু মনে তুই এখনও শিশু। তোর বাপের নাম ছিল গাঁ জোড়া; তার মত হতেই চেষ্টা করিস।

মাকে প্রণাম করে রঞ্জন আর তাকাল না—সোজা গাড়ীর ছই-এর মধ্যে এসে ঢুকলো। কি জানি মার চোখে চোখ রাখলে—তার চোখও শুখ্‌নো থাকবে না।

ভেতর থেকে রঞ্জন হাঁকলো, মামা! রাত আর নেই, এবার গরু জো'ত।

মামার বাড়ি এসে রঞ্জন কেষ্টাদের নিয়ে বেশ একটা দল পাকিয়ে তুললো। কাজের মধ্যে গরুবাছুর দেখা ক্ষেত খামারের কাজ আর হাটবার হাটবার চালের গাড়ী নিয়ে গিয়ে গঞ্জের আড়তে তুলে দেওয়া। মাস কয়েকের মধ্যেই রঞ্জন মিশুকে আর খাটিয়ে বলে নাম করে ফেল্‌লো।

হাটের কাজ রঞ্জন বেলা দু'টোর মধ্যেই শেষ করে' ফেলতো। মহাজনদের কাছ থেকে পাওনা টাকা আদায় করতে বেলা চারটে বাজতো।

সামন্ত উৎফুল্ল হয়ে স্ত্রীকে বলতোঃ হ্যাঁ রঞ্জন আমার হিসেবী বটে—হবে না? দেখিস্‌ দিদির পুণ্যে রঞ্জন আমাদের পাকা ব্যবসায়ী হবে। তোর ছেলেকে বলি,—কেষ্টা দিন থাকতে শিখে নে কেমন করে ব্যবসা করতে হয়। আজকালকার ছেলে—হারাম-জাদারা কি আর বললে কথা শোনে?

রঞ্জনের শত্রু নেই। মামীর আদরেও সে বেড়ে উঠচে। মামীও মাঝে মাঝে দুঃখু করে বলেঃ আমাদের ভাগ্য নইলে রঞ্জনের পাশে থেকে আর কেষ্টা কিছু শিখতে পারে না?

সন্ধ্যের আগেই হাতের সব কাজ শেষ করে রঞ্জন মাঠের বাড়িতে বন্ধুবান্ধব নিয়ে হাজির হোত। ছোট একটা আখড়া সে ইতিমধ্যেই তৈরী করেচে।

পাড়ায় গুণ্ডামী করে বেড়ায়—তার থেকে এ ঢের ভাল; একটা কিছু নিয়ে পড়ে থাকা। সামন্ত নিশ্চিন্ত। দু' একমাস অন্তর রঞ্জন বাড়ি যায়। মার কাছে দু'দিন থাকে আবার ফিরে আসে।

উপযুক্ত ছেলেকে বড় হয়ে উঠতে দেখে বিন্দুর বুকখানা মাঝে মাঝে দশ হাত হয়ে ওঠে। তার পরই কোথা থেকে রাজ্যের কুচিন্তা এসে জড় হয়। ভাবতে ভাবতে বিন্দু শিউরে ওঠে,—ভগবান তা হলে আমি বাঁচবো কি করে? বাড়ন্ত ছেলেকে কোলের কাছে বসিয়ে বিন্দু মাঝে মাঝে বলেঃ রঞ্জন দেখিস্ বাবা! জানি মামা, তবুও ত ভীন্ গাঁ। লোকে যেন না বলেঃ বিন্দুর ছেলে অমুক'—

রঞ্জন মার কোলে মাথা রেখে হেসে উত্তর দেয়ঃ তুমি পাগল হয়েচ মা? ওদের এমনি করে নিয়েচি যে দু'দিন বাড়ি এলে ওদের গাঁয় হৈ হৈ পড়ে যায়। দেখবে? তিন দিনের দিন না গেলে ওরা কি করে।

বিন্দু জানে কথাটা কত বড় সত্যি? এখানকার লোকেরাও হাটে আড়ৎদারদের কাছ থেকে রঞ্জনের সুখ্যাতিও শোনে। কিন্তু তবুও মার মন ত। বিন্দু বলেঃ তবুও বড় ভয় করে বাবা গঞ্জের কাছাকাছি গাঁ, লোকজন সব ত ভাল নয়, দেখে শুনে মিশিস্।

এইবার দুঃখীর ভগবান হয়ত মুখ তুলে চাইবেন—রঞ্জন যদি মানুষ হয়। বিন্দু বহু বছর পর আজ আবার বৈঠকখানার তালা খুললো। স্বামীর সব কিছু অভিজ্ঞানই যথাযথ রয়েচে। বিন্দু একটা কিছু স্বামীর মৃত্যুর পর এদিক ওদিক করে নি,—ছেলে বড় হোক্।

সামন্ত মাঝে মাঝে বোনের বাড়ি আসে। বলে দিদি তোমার ছেলে যা হিসেবী বছর না ঘুরতেই সব শিখে ফেলেচে। দেখলে ত পড়া শুনো হ'ল না বলে কি আর ছেলে সে খারাপ? গুরুজনদের ভক্তি করা, লোকের বিপদে আপদে প্রাণ ঢেলে দেওয়া এই সবই ত মানুষের কাজ। দেখো রঞ্জন তোমার মুঠো মুঠো টাকা উপায় করবে একদিন।

ভায়ের কথায় বিন্দুর মনে মাঝে মাঝে সুখের দিন চমক দিয়ে যায়। বিদ্যুৎ চমকাবার পর মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবী কালো অন্ধকারে আতঙ্ক জাগায়, সে আতঙ্কও বিন্দুর মনকে ছুয়ে যায়। মনে মনে সে ভাবে হায় রে আমার আবার কপাল তার গুণে আবার ছেলে মানুষ হবে। দু'দিন যে শান্তিতে ঘর করতে পেল না তাঁর আবার সুখ আর তারই স্বপ্নে সে বাঁচতে চায়।

এর পর ক'মাস কেটে গেল।

স্বচ্ছল এবং সাবলীল জীবনযাত্রার মধ্যে কোথা থেকে যেন একটা কালো মেঘের আভাষ দেখা গেল। রক্তামাশয়ে সামন্ত মাসখানেক বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলো না। সময়ে না পাওয়া যায় কেষ্টাকে না দেখা মেলে রঞ্জনের।

সামন্ত বিছানায় শুয়ে শুয়েই একদিন কেষ্টাকে ধরে বেধরক মার দিল। বললোঃ হারামজাদা ছেলে একবারও টিকি দেখবার যো নেই! ঘরে শুয়ে বাপ মরছে আর ছেলে আমার নেচে বেড়াচ্ছে। হতভাগা, বাপকে একবার দেখতে পারো না। বুড়ো মলে খুব সুখ, নয়?

কেষ্টা কেঁদে উত্তর দেয়ঃ আমি কি করবো? সারাদিন কাজে কাজে ঘুরে বেড়ালে সময় পাব কোথা?

এই একমাস বিছানায় পড়ে থেকে সামন্ত খিটখিটে হয়ে উঠেচে। ছেলেকে ভেংচি কেটে বলেঃ উঃ কাজের আটা দেখে মরি! সকাল সন্ধ্যে কি করিস রে হারামজাদা? সামন্ত রোগা শরীরে তেড়ে আসে।

বাপের বিছানার পাশে কেষ্টা গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, বলেঃ সকালে ছানি কাটা, গরু ছেড়ে দেওয়া, দুপুরে ধান মাপাই, সন্ধ্যেয় বারি ধানের তদারক করা, সময় করবো কখন বল?

সামন্ত চমকে ওঠে—কেন? রঞ্জন কি বাড়ি গেছে না কি?

কেষ্টা এবার রাগের মাথায় বলে ওঠে ঃ হুঃ বাড়ি যাবে না হাতি। হরি বোষ্টমের আড্ডায় গিয়ে দ্যাখোগে চব্বিশ ঘণ্টা বসে 'ভরতের পাঠ মুখস্ত করচে!

সামন্তর ভুরু কুঁচকে গেলঃ শুধুলো ঃ আড়তে চালের গাড়ী যায় না?

কেষ্টা সমানে উত্তর করেঃ তা আর যাবে না কেন? গাড়ী বোঝাই করে দিলে আর পেঁছে দিতে কতক্ষণ?

সমস্ত ব্যাপারটা সামন্তের কাছে গোলমাল ঠেকলো। হরি ঠাকুরের আড্ডা! সামন্ত দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলোঃ গাঁ থেকে চা'ল কেটে না ওঠালে আর শান্তি নেই। জাত হারিয়ে বোষ্টম—মেয়ে নিয়ে গাঁ মজাচ্ছে! দাঁড়াও রঞ্জন আসুক।

সামন্ত উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে। গৌরী স্বামীকে দেখে হতভম্ব হয়ে বলেঃ ওমা ওকি করচো গো? ও কেষ্টা, কেষ্টা দৌড়ে আয় রে তোর বাপ বুঝি ভিরমি যায়।

'ভিরমি' সামন্ত গেল না। অসহ্য অবসাদে চৌকিতে সামন্ত চুপ করে শুয়ে থাকে। বলেঃ ওদের আর ডাকিস্ নে বৌ। তুই শুধু এক কলকে তামাক সেজে আমার কাছে এসে বোস্। আমার কিছু হয়নি। আজ স্ত্রীই সামন্তর কাছে সব থেকে বড় অবলম্বন।

নিদারুণ দুশ্চিন্তায় সামন্তর মাথা ঝিম ঝিম করতে থাকে। স্ত্রীর একখানা হাত নিজের কপালে চেপে ধরে বলেঃ আমি না হয় আজ একমাস বিছানায় পড়ে কিন্তু তুই কি চোখের মাথা খেয়ে ছিলি বৌ। ছেলেটা বাড়িতে থাকে কি না—কিছুই কি তোর নজরে পড়ে না?

আমি কি অত বুঝি? স্ত্রী উত্তর করলোঃ আজ অমুক কেলাব কাল তমুক কেলাব, ওমুক গাঁ তমুক গাঁ, আজ কাজ আছে কাল হাটেই শুয়ে থাকবো—এ সবের আমি কি বুঝি বল?

সামন্ত বললো ঃ রাতেও তা হলে সে বাড়ি আসে না?

স্ত্রী চুপ করে রইল!

সামন্ত বললোঃ একদিনও ত এসব বলিস্ নি বৌ।

তামাক খেতে খেতে সামন্ত গভীর দুঃখে বললোঃ রঞ্জনটা শেষে গিয়ে জুটলো কি না হরি বোষ্টমের অড্ডায়।

গৌরী বললোঃ এবার নাকি খুব ধুমধাম করে গাঁয়ে যাত্রা হবে?

সামন্ত আগুন হয়ে উঠলো, দুবার কেশে নিয়ে বললোঃ ছাই হবে! আমার মাথা আর মুণ্ডু হবে! যত হারামজাদার দল জুটে গাঁখানাকে উচ্ছন্নে দিলে গো!

কিছুক্ষণ দু'জনে চুপ চাপ থাকার পর সামন্ত ধীরে ধীরে বৌকে ডাকলোঃ বৌ!

কি বল?

আলোটা জেলে আন্ বৌ।

গৌরী আলো জেলে ঘরে সন্ধ্যে দিল।

রাত্রি দু' প্রহর কেটে গেলে সামন্ত বৌকে বললো ঃ দ্যাখতো বৌ রঞ্জন বুঝি বাড়ি এলো। কেষ্টাকে ডাক রে দরজা খুলে দিক।

কাকস্য পরিবেদনা—চোখ রগড়াতে রগতাকে কেষ্টা বললোঃ বাবার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। দরজা বন্ধ করে কেষ্টা আবার বিছানায় আশ্রয় নিল।

সারা রাত সামন্তর চোখে ঘুম নেই। বার বার মনে হয়েচে

রঞ্জনের মত ছেলে শেষে আট্কা পড়লো কি না হরিবোষ্টমের আড্ডাতে। হরি বোষ্টমের আড্ডার নাম শুনে সামন্তের সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো। হরি বোষ্টমের আড্ডা সে ত তার মেয়ের আঁচল ধরে ঘুরে বেড়ান।

সকাল হতেই সামন্ত খোঁজ করলো রঞ্জন ফিরেচে কি না? শুনলো রঞ্জন ফিরেচে ভোর বেলা—এখন বেহুস হয়ে ঘুমুচ্চে। কেষ্টা বাপকে শুধুলোঃ ডাকবো দাদাকে।

অঘোরে রঞ্জন ঘুমুচ্চে শুনে হয়ত সামন্তের দয়া হ'ল, বললঃ না থাক, উঠলে ডাকিস।

দশটার আগে রঞ্জনের ঘুম ভাঙলো না। সকাল বেলা গোবিন্দ দাস এল সামন্তর সঙ্গে দেখা করতে। এমন গোবিন্দ প্রায়ই আসে। আজ রঞ্জনকে বেলা পর্যন্ত দাওয়াতে ঘুমুতে দেখে শুনিয়ে গেলঃ ভাগ্নে তোমার হ'ল কি মেসো? জান না কিছু? আজ তিন দিন থেকে অষ্ট প্রহর যে হরি বোষ্টমের ঘরে মদ আর তাড়ি চলছে! আবার শুনলাম রঞ্জন নাকি তার মেয়ে কুসুমকে হাটের মুরারী পোদ্দারের দোকান থেকে এক জোড়া শাঁখা গড়িয়ে দিয়েচে! বলেছিলাম মেসো, জোয়ান ছেলের হাতে কাঁচা টাকা ছেড়ে দিয়েচ। জাল গুটাবার সময় হাল্কা না ঠেকলে বাঁচি।

সামন্ত ঘরে এসে বসলো। জানালা দিয়ে দেখা গেল রঞ্জন ঘুম চোখে উঠে পকেটে বিড়ি খুঁজচে। সামন্ত ডাকলঃ রঞ্জন!

রঞ্জন কাছে এসে দাঁড়ালোঃ চোখ দুটো তার জবা ফুলের মত লাল।

সামন্ত শুধুলোঃ কুস্তির আখড়া তুলে দিলি?

রঞ্জন চমকে উঠলোঃ তোমায় কে বললে মামা? তুলে ত দিইনি।

সামন্ত বললোঃ দিন পনের ত সেখানে যাস নি—তোর তৈরী ক্লাব, তোর না যাওয়া মানে ত ক্লাব উঠে যাওয়া।

সামন্তর কথা শুনে রঞ্জন অপ্রতিভ হ'ল। বললোঃ আমার না হয় কাজের চাপ তা বলে ক্লাব উঠে যাবে?

সামন্ত বললোঃ কাজই বা তুই এ ক'দিন এমন কি করেছিস? না গরু দেখা—না ধানের তদারক করা—ভারী তোর কাজ হচ্চে।

শেষের কথায় বিরক্তির ঝাঁজ ছিল তাই রঞ্জন ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বললোঃ কাজ হচ্চে না তো গেল হাটে অতগুলো টাকা চাল বিক্রি করে আনলাম কি করে? অমনি ত আর কেউ টাকা দেয় না।

কি টাকা দিয়েছিস তুই? সামন্ত ফেটে পড়লো। বললোঃ যা দর পেয়েছিলি হাটে আমায় তার থেকে দু'আনা কম বলেচিস্। এই তিরিশ প'য়ত্রিশ টাকা করলি কি? রাত করে রোজ বাড়ি আসিস্। আজ দু'রাত্রি বাড়ি আসিস্ নি। চোখ দুটো ত জবাফুলের মত লাল ক'রেচিস—কবে থেকে মদ গাঁজা ধরলি শুনি? হারামজাদার সব গুণ হয়েচে—। সামন্তর স্বর এবার যত দূর পারলো উঠলোঃ ক'টাকা দিয়ে সেই বোষ্টম মাগীকে শাঁখা গড়িয়ে দিয়েচিস্ হতভাগা? এই তুই মানুষ হচ্চিস্? ভুত কোথাকার! আমার বাড়ি বসে এ সব বেল্লিকিপণা চলবে না বলে দিচ্চি। ভেবেচিস্ এ ক'দিন রোগে মরচি বলে একেবারে মরেচি নয়?

মাথা নীচু করে রঞ্জন সরে যাচ্ছিল। সামন্ত ডেকে বললোঃ যাচ্চিস্ কোথায় শুনি? নে জামা কাপড় বেঁধে নে। যা তুই আজই বাড়ি চলে যা—ঢের তুই মানুষ হয়েচিস। সামন্ত হাঁপাতে লাগলো।

রঞ্জন সামনে থেকে সরে গেলে সামন্ত কাগজ কলম নিয়ে ওই রুগ্ন শরীরেই বোনকে চিঠি লিখতে বসলো। সামন্ত রঞ্জনের কথা আনুপূর্বিক বিবৃতি করে—শেষে লিখলোঃ দিদি রঞ্জনের এখন তোমার চোখে চোখে থাকাই উচিত। আর যাই হোক দুনিয়াতে একমাত্র তোমাকেই সে ভক্তি করে ভালবাসে। তোমার পায়ের গোড়ায় বসে এই দোষটুকু কাটিয়ে উঠে সে যদি মানুষ হয় তাই তোমার কাছে তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সন্ধ্যের কাছাকাছি সে পেঁছে যাবে।

সামন্ত লোক মারফৎ চিঠিখানি পাঠিয়ে দিল।

চিঠি পেয়ে বিন্দু অবাক। সেই ছোট শিশু রঞ্জন—সামন্ত সব ঠিক লিখেছে ত? চোখ ভরে তার জল এল। চিঠি পড়তে পড়তে বার বার তার চোখ ঝাপসা হয়ে আস্চে। মাথা ঝিমঝিম করে উঠলোঃ বিন্দু চোখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলোঃ উঃ, ভগবান শেষে এই করলে? আমি যে বড় আশা করে ওকে মানুষ করতে চেয়েছিলাম ঠাকুর।

সারা বিকেল ধরে বিন্দুর চোখে জল থামলো না। সজল চোখের ঘোমটাটে দৃষ্টি কখন আবিষ্কার করলো আকাশে আর আলো নেই। অন্ধকার হয়ে এসেচে। বিন্দু ভাবলোঃ সামন্ত লিখেচে সন্ধ্যের মধ্যেই রঞ্জন এসে পেঁছিবে। কিন্তু কই? এখনও ত সে এল না। আবার বোষ্টম বাড়িতে মদ খেয়ে মেয়েটার কাছে পড়ে নেই ত? স্মরণ করতেও বিন্দু শিউরে উঠলো। মাগো! চিঠি পেয়ে বিন্দুর যেন সব শক্তি কমে গেছে। একটি বেলার মধ্যেই কি সে বার্ধক্যের শেষ সীমায় এসে পেঁছলোঃ তার অদম্য শক্তি গেল কোথা? মরে মরেও বিন্দু ছেলের জন্য খাবার তৈরী করলো। কি জানি তিন ক্রোশ পথ হেঁটে রঞ্জন আসচে—আহা বাছার হয়ত কত ক্ষিদেই না পেয়েচে।

ক্রমে রাত্রি বাড়তে লাগলো। পড়াগাঁয়ে রাত দশটা—সব নিশুতি হয়ে গেছে। একবার ঘর আর একবার বার করে বিন্দু অস্থির হয়ে উঠলো। কি জানি পথে কিছু বিপদ ঘটলো না ত বাছার। সোবার ঘরে খাবার ঢাকা দিয়ে পাশে বিন্দু পা ছড়িয়ে বসলো। কি জানি এই বুঝি রঞ্জন আসে।

অস্থির মন নিয়ে বিন্দু ঠায় বসে—মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসচে আর দুঃস্বপ্নের আঘাতে বিন্দু চমকে চমকে উঠচে। হায় হায় সামন্ত কেন নিজে গাড়ী করে তাকে দিয়ে গেল না? পরক্ষণেই বিন্দু নিজেকে সান্ত্বনা দিলঃ না পথ সোজা—ভয়ের কি-ই বা আছে, রঞ্জন এলো বলে। বিন্দু তবুও সান্ত্বনা পেল না, কি জানি—যে অভিমানী ছেলে! নানান চিন্তায় বিন্দু বিভ্রান্ত হয়ে উঠলো।

তারপর তন্দ্রার ঘোরে কতক্ষণ যে কেটে গেছে তার ঠিক নেই। খুট করে একটা শব্দ হইতেই বিন্দুর ঘুম ভেঙে গেল।

ধড়মড়িয়ে উঠে সাড়া দিলঃ যাই বাবা যাই।

কি জানি যদি এক ডাকে সাড়া না পেয়ে রঞ্জন অভিমান করে চলে যায়! বিন্দু উঠি ত পড়ি করে ছুটলো সদরের দিকে, মাঝ-পথে অকারণ আবার সাড়া দিল—যাই বাবা—যাই।

কালিধরা লণ্ঠনের অল্প আলোয় সামনের সব অন্ধকার দূর হয় না—বিন্দু অসম্ভব উত্তেজনায় দোরের খিল খুলে ফেললো—আয় বাবা আয় বলে লণ্ঠনটা বাইরে ধরতেই দেখতে পেলোঃ রাস্তার কুকুর একটা বড় হাড় নিয়ে দরজার পাশে শুয়ে কামড়াচ্চে আর বার বার হাড়টা মুখ থেকে পিছলে বেরিয়ে এসে দরজায় ধাক্কা দিচ্চে ঠক্ ঠক্......

দেখেই বিন্দু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললো। হাত থেকে লণ্ঠনটা পড়ে গিয়ে নিভে গেল। পূব আকাশে তখন রং ধরতে সুরু করেচে।

ছদ্মবেশী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১০

বারান্দায় গলা খেঁকারির শব্দ শোনা গেল।

প্রশান্ত উচ্চৈস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "গৌরহরি?"

বারান্দা হইতে উত্তর আসিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, সে-ই বটে।"

"ভেতরে এস।"

পর্দা ঠেলিয়া অবনীশ ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঈষৎ কঠোর স্বরে প্রশান্ত বলিল, "এত দেরি ক'রে এলে কেন?"

"আজ্ঞে স্যার, খানিকটা আগেই এসেছি। তখন কিন্তু সাঙ্কেতিক শব্দ করিনি।"

উত্তেজিত হইয়া প্রশান্ত বলিল, "কেন? কেন করনি?"

মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া কাঁচুমাচু মুখে অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে, তখন আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হ'তে সমীহ বোধ করছিলাম। তখন আপনারা বৃষভানুনন্দিনীর বিষয়ে কথাবার্তা কচ্ছিলেন।"

উত্তর শুনিয়া অবরুদ্ধ হাস্যের তাড়নায় সকলের দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। দন্ত দিয়া অধর চাপিয়া কোনো প্রকারে গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া প্রশান্ত বলিল, "শোন গৌরহরি, তুমি একটি পাগল!"

নিরীহ ভাবে অবনীশ বলিল, "কেন স্যার?—এখন ত আর নই?"

অবনীশের কথা শুনিয়া ভয়চকিত নেত্রে লাবণ্য বলিয়া উঠিল, "ও মা, কি সর্বনেশে কথা! এখন ত' আর নও,—তা হ'লে কখনো ছিলে না কি?"

অবনীশ বলিল, "লোকে রঙ্গ ক'রে বলত মেমসায়েব, কিন্তু আমি ত' তা স্বীকার করতাম না।"

তেমনি ভীত কণ্ঠে লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "কতদিন আগে লোকে বলত?"

ঘাড় নীচু করিয়া দুই হাত ধীরে ধীরে রগড়াইতে রগড়াইতে লজ্জিত স্বরে অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে, সে কথা বলতে কিছু সমীহ বোধ করছি মেমসায়েব।"

প্রশান্ত গর্জন করিয়া উঠিল, "ন্যাকামি রাখ! শীগ্‌গির বল কত দিন আগে।"

প্রশান্তর দিকে যুক্তকর প্রসারিত করিয়া নম্রকণ্ঠে অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে স্যার, আমারই বিয়ের আগে। কিন্তু বিয়ের পর থেকে সকলেই ত' বলে, সে-সব লক্ষণ আর নেই।"

এবার আর কোনো প্রকারেই নিবারণ করা গেল না,—একটা সযত্নরুদ্ধ অস্ফুট হাস্যধ্বনি তিনটি অসংযত নারীকণ্ঠ ভেদ করিয়া নির্গত হইল।

আরও উচ্চৈস্বরে প্রশান্ত গর্জন করিয়া উঠিল, "ভুল বলে তারা! সম্পূর্ণ আছে তোমার পাগলামীর লক্ষণ!"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবনীশ বলিল, "কি লক্ষণ আছে প্রকাশ ক'রে বলুন স্যার, তা হ'লে সংশোধন করবার চেষ্টা পাই।"

প্রশান্ত বলিল, "প্রথম লক্ষণ, তোমার ছন্দ মিলিয়ে কথা কওয়া।"

ঘাড় নীচু করিয়া নিতান্ত ভালমানুষের মতো অবনীশ বলিল, "এ বিষয়ে আমার নিবেদন স্যার, ছন্দ মিলিয়ে কথা কওয়ার বিষয় কোথাও কোনো নিষেধ নেই।"

প্রশান্ত বলিল, "একজন সবজজ হঠাৎ একদিন মাথা খারাপ হ'য়ে কবিতায় মকদ্দমার রায় লিখেছিল। হাইকোর্ট তার জন্যে কৈফিয়ৎ তলব করলে ঠিক তোমারি মত সে বলেছিল যে, কবিতায় রায় লেখার বিরুদ্ধে কোথাও কোনো নিষেধ নেই।"

তেমনি ঘাড় নীচু করিয়া নম্রকণ্ঠে অবনীশ বলিল, "ঠিকই বলেছিল স্যার।"

"তার উত্তরে হাইকোর্ট কি বলেছিল জান?"

"আজ্ঞে জানিনে; প্রকাশ ক'রে বলুন, শুনি।"

"বলেছিল, কবিতায় রায় লেখার বিরুদ্ধে যেমন কোথাও কোনো নিষেধ নেই, তেমনি কবিতায় রায় লিখলে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার বিরুদ্ধেও কোথাও কোনো নিষেধ নেই।"

প্রশান্তর কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "সর্বনাশ! ছন্দ মিলিয়ে কথা কওয়া আজ থেকে একেবারে বন্ধ! এছাড়া আর কোনো লক্ষণ যদি আপনার মনোযোগ আকৃষ্ট ক'রে থাকে তা হ'লে কৃপা ক'রে ব্যক্ত করুন স্যার।"

প্রশান্ত বলিল, "আর একটা লক্ষণ ত' তোমার মুখ দিয়ে এখনও হুড় হুড় ক'রে বার হচ্ছে। আজ বিকেল থেকে হঠাৎ সাধুভাষায় কথা কইতে আরম্ভ করেছ কেন, তা বলতে পার? মনোযোগ, আকৃষ্ট, কৃপা ক'রে, ব্যক্ত,—এসব বড় বড় শক্ত শক্ত কথা ব্যবহার করছ কিসের জন্যে?"

ব্যগ্র কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "আপনাকে খুসি করবার জন্যে স্যার!"

এবার কথা কহিল লাবণ্য; বলিল, "শোন কথা! তখন থেকে ত' একেবারে উত্যক্ত ক'রে মেরেছ, আর বলছ কি-না, আপনাকে খুসি করবার জন্যে স্যার!"

প্রশান্ত বলিল, "তোমার এই সব পাগলামির রাবিশে আমি খুসি হব এটা মনে করাও তোমার পাগলামি!"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে প্রশান্তর দিকে চাহিয়া থাকিয়া

অবনীশ বলিল, "দেখুন দেখি, আপনার কথা শুনেই না আমাকে এমনভাবে অপদস্থ হ'তে হ'ল! আপনিই ত' আজ দুপুর বেলা আমাকে বললেন যে, সাহেব আমার বাঙলার জ্ঞানে খুব খুসি আছেন। সেই কথা শুনেই না আমি উৎসাহিত হ'য়ে তখন থেকে সাধুভাষা ব্যবহার করছি!"

অবনীশের কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া লতিকা বলিল, "ও মা! আমি আবার আজ দুপুর বেলা কখন্ এ-সব কথা আপনাকে বললাম। আপনাকে ত' জীবনে প্রথম দেখলাম এখনি এই ঘরের মধ্যে সকলের সঙ্গে ব'সে।"

লতিকার বাম পার্শ্বে উপবিষ্টা লাবণ্যর প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া অবনীশ বলিল, "আপনাকে বলছিনে সেন-মেমসায়েব, মিত্র-মেমসায়েবকে বলছি।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া লাবণ্য বলিল, "মিত্র মেমসায়েবকে বলছ ত আমার দিকে তাকিয়ে বলছ কেন?"

লাবণ্যর বাম পার্শ্বে দৃষ্টি বাঁকাইয়া দিয়া অবনীশ বলিল, "আপনাকে বলছিনে মেমসায়েব, এখন আমি সেন মেমসায়েবকে বলছি। আপনার মনে হচ্ছে যেন আপনার দিকে তাকিয়েই বলছি, কিন্তু আদতে বলছি সেন মেমসায়েবের দিকে তাকিয়ে।"

সবিস্ময়ে লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "তার মানে?"

"তার মানে, আমি একটু ট্যারা—বাঁ-পেশে ট্যারা।"

অবনীশের কথা শুনিয়া কৌতুকের তাড়নায় সুলেখা এবং বিনয়ের হাসি চাপিয়া রাখা কঠিন হইল, কিন্তু বাকি তিনজনের কাহারও ক্রোধে, কাহারও বা বিরক্তিতে মেজাজ উষ্ণ হইয়া উঠিল।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "তুমি টেরা?"

"আমি টেরা। বাঁ-পেশে টেরা।"

"টেরা যদি, তা হ'লে এ ক'দিন আমাদের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে কথা কচ্ছিলে কেমন ক'রে?"

জিভ কাটিয়া কুণ্ঠামিশ্রিত স্বরে অবনীশ বলিল, "কোনদিনই তা করিনি মেমসায়েব! আপনারা হলেন মনিব, —আপনাদের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে কখনো কথা কইতে পারি কি? যখনি আপনাদের মনে হয়েছে, আপনাদের দিকে তাকিয়ে কথা কচ্ছি, তখনি জানবেন আদতে অন্য দিকে তাকিয়ে কথা কয়েছি, চোখ টেরা হওয়ার দরুণ আপনাদের মনে হয়েছে আপনাদের দিকে তাকিয়ে কথা কচ্ছি। আর, যখনি আপনাদের মনে হয়েছে অন্যদিকে তাকিয়ে কথা কচ্ছি, তখনি জানবেন সহজ সোজা চোখে অন্য দিকে তাকিয়েই কথা কয়েছি। টেরা মানুষরাও ত' সব সময়েই টেরা হয় না মেমসায়েব।"

শেষোক্ত তথ্য যে সত্য তাহা লাবণ্যরও জানা ছিল। সুতরাং এ কথার পর জোরের সহিত আর কি বলিতে পারে সহসা ভাবিয়া না পাইয়া নিরুপায় হইয়া সে বিমূঢ়ভাবে প্রশান্তর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

অবনীশ নিজেকে টেরা বলিয়া ব্যক্ত করার পর প্রশান্ত আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া চঞ্চলভাবে ইতস্তত পদচারণ করিতেছিল; সহসা অবনীশের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া সে বলিল, "লুক হিয়ার্ গৌরহরি, তুমি টেরা কি টেরা নও তা আমি বলতে পারিনে, কিন্তু তুমি অতিশয় গোলযুগে মানুষ। আবার এই একটা নতুন কথার সৃষ্টি ক'রে তোমার ব্যাপারটা আরও অনেক বেশি জটিল ক'রে তুললে। তুমি যে কি-কি, আর কি-কি নও—বোধহয় পাকাপাকি ভাবে তার একটা ফিরিস্তি ক'রে ফেলা দরকার। তা নইলে কোন্ দিন হয়ত' ব'লে বসবে তুমি খোঁড়া, কোন দিন বলবে খোঁনা, কোন দিন বা বলবে তোৎলা।"

একটা উচ্চহাস্যে সমস্ত কক্ষ ভরিয়া উঠিল।

বিস্ময়চকিত কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "এতদিন সহজভাবে কথা ক'য়ে হঠাৎ একদিন তোৎলা হব স্যার?"

প্রশান্ত বলিল, "এতদিন সোজাসুজি চেয়ে দেখে যে মানুষ হঠাৎ একদিন টেরা হ'তে পারে, তার পক্ষে হঠাৎ একদিন তোৎলা হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়।"

মৃদুস্বরে অবনীশ বলিল, "তাই ব'লে ত একটা মাত্রা আছে স্যার!"

"সে মাত্রা তোমার আছে, কি নেই,—তার আলোচনা কাল না-হয় করা যাবে। আজ আপাতত তুমি বিশ্রাম নাওগে,— আমরাও নিই। তোমাকে নিয়ে আজ আমি একেবারে হালাক্কান হ'য়ে গেছি। তুমি এখন দয়া ক'রে যেতে পার।"

লাবণ্যর মনের মধ্যে প্রতিনিয়ত যে-সকল আশঙ্কা শিকড় গাড়িয়া স্থায়ীভাবে বাস করে, মোটরকার দুর্ঘটনার আশঙ্কা বোধকরি তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা সজাগ এবং সচেতন। গমনোদ্যত অবনীশকে ব্যগ্রকণ্ঠে ডাকিয়া সে বলিল, "শোন গৌরহরি, একটা কথা শুনে যাও।"

নিকটে ফিরিয়া আসিয়া অবনীশ লাবণ্যর দক্ষিণ পার্শ্বে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইল।

অবনীশের দৃষ্টির গতিপথ লক্ষ্য করিয়া সকৌতুহলে লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "আমার দিকেই তাকিয়ে আছ ত?"

মাথা নাড়িয়া অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে, না মেমসায়েব,— পাশের দিকে তাকিয়ে আছি।"

"পাশের দিকে তাকিয়ে আছ?"—এক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া লইয়া লাবণ্য বলিল, "এখন তা হ'লে তোমার সোজা চোখ?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ, সোজা চোখ।"

"বাঁ-পেশে টেরা চোখ এরই মধ্যে সোজা হ'য়ে গেল?"

নিমেষের জন্য প্রশান্তকে দেখিয়া লইয়া মৃদু কণ্ঠে অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে মেমসায়েব, সায়েবের কাছে যে-রকম তাড়া খেয়েছি তাতে বাঁ-পেশে টেরা চোখ ডান-পেশে টেরা না হ'য়ে গিয়ে সোজা হয়েচে এই আমার ভাগ্যি বলতে হবে!"

একটা রুদ্ধ হাস্যে, শুধু অপর সকলেরই নহে, লাবণ্য এবং প্রশান্তরও মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল।

মুখ গম্ভীর করিয়া লইয়া লাবণ্য বলিল, "মরুক গে ও-সব বাজে কথা। তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, গাড়ি যখন চালাও তখন কোন্ দিকে চেয়ে চালাও?"

অবনীশ বলিল, "আজ্ঞে মেমসায়েব, পথের দিকে চেয়েই

চালাই,—তবে টেরা চোখে যখন চালাই তখন দেখলে মনে হয় ফুটপাথের দিকে চেয়ে চালাচ্ছি।"

"ডান ফুটপাথের দিকে?"

"ডান ফুটপাথের দিকে।"

"তা'তে অ্যাক্সিডেণ্ট হবার ভয় থাকে না?"

মাথা নাড়িয়া অবনীশ বলিল, "একেবারেই না। সোজা চোখে যদিও বা অ্যাক্সিডেণ্ট হবার ভয় থাকে, টেরা চোখে একেবারেই থাকে না। টেরা মানুষরা যখন খুব বেশি মনোযোগী হয়, তখনই টেরা হয়।"

এ সত্যও লাবণ্যর অবিদিত ছিল না।—এক মুহূর্ত নীরবে কি চিন্তা করিয়া বলিল, "যা তোমার ধর্মে হয় তাই কোরো বাপু, শুধু অ্যাক্সিডেণ্ট-ট্যাক্সিডেণ্ট কোরো না।" তারপর গমনোদ্যত অবনীশকে পুনরায় সম্বোধন করিয়া বলিল, "শোন গৌরহরি, যখন চালাবে টেরা চোখেই না-হয় চালিয়ো।"

লাবণ্যর কথায় একটা হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

অবনীশ প্রস্থান করিলে বিনয় বলিল, "গাড়িতে দাদা থাকলে টেরা চোখ সোজা হবার ভয় থাকবে কিন্তু বউদি।"

লাবণ্য হাসি মুখে বলিল, "ঠিক বলেছ ঠাকুর পো, গাড়ি চালাবার সময়ে ওঁকে কিছুতে গৌরহরিকে তাড়া দিতে দেওয়া হবে না।"

পুনরায় একটা হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

লতিকা উঠিয়া পড়িয়া লাবণ্যর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, চললাম দিদি। প্রহসন ত' যথেষ্ট হ'ল, রাতও অনেক হয়েছে। বাড়িতে বসুধা একা রয়েছে,—ছেলেমানুষ ভয় পেতে পারে।"

বসুধা বিনয়ের দূরসম্পর্কীয়া মামাত ভগ্নী। পিতৃ-মাতৃহীনা বলিয়া নিকটতর উপচিকীর্ষু অভিভাবকের অভাবে গত পাঁচ বৎসর যাবৎ বিনয়ের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে। কলিকাতায় হোস্টেলে থাকিয়া সে আই এস-সি পড়ে, টেস্ট পরীক্ষা দিয়া এলাহাবাদে বিনয়ের নিকট আসিয়া আসল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

যাইবার সময়ে লতিকা পরদিন সুলেখাকে লইয়া তাহাদের বাড়ি বেড়াইতে যাইবার জন্য লাবণ্যকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া গেল। সুলেখাকে বলিল, "আজ ত' অভিনয় দেখতেই সমস্ত সময়টা কেটে গেল, আপনার সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ হ'ল না। কাল আপনি নিশ্চয় যাবেন। শুধু আমিই নয়, আমার ননদ বসুধাও আপনার জন্যে আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করবে। আপনার কাছে তার একটা বিশেষ অনুরোধ আছে।"

সকৌতূহলে সুলেখা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কাছে?—কি অনুরোধ বলুন ত?"

এ কথার উত্তর দিল বিনয়; বলিল, "বসুধার ধারণা বট্যানিতে সে একটু কাঁচা। আমার মুখে অবনীশের কথা শুনে তাকে দিয়ে এক-আধ দিন বিনা-পয়সার মাস্টারি করিয়ে নেবার ফন্দিতে আছে। বোধ হয় সেই বিষয়ে অবনীশের কাছে সুপারিশের জন্যে আপনাকে অনুরোধ করবে।"

বিনয়ের কথা শুনিয়া লজ্জিত মুখে সুলেখা বলিল, "এ জন্যে আমার সুপারিশের একটুও দরকার নেই মিস্টার সেন,—দাদার বন্ধুর ওপর আপনার ভগ্নীর নিজের দাবীই যথেষ্ট বেশি।"

বিনয় কিছু বলিবার পূর্বে প্রশান্ত বলিল, "যথেষ্ট বেশি তা'তে সন্দেহ নেই। কিন্তু সুলেখা, বসুধা তার স্বাভাবিক স্ত্রীবুদ্ধির প্রভাবে এ কথাও অনুমান করে যে, অবনীশের ওপর অবনীশের বন্ধুর বোনের চেয়ে অবনীশের স্ত্রীর দাবী যথেষ্ট বেশির চেয়েও আরও খানিকটা বেশি। তাই সে স্বকার্যসাধনের জন্যে একেবারে চরম উপায়টি অবলম্বন করতে চায়। ধর, কোনো দিন যদি বসুধার আমার কাছ থেকে আইন সংক্রান্ত কোনো সাহায্য নেবার দরকার হয়, তা হ'লে তার পক্ষে নিশ্চয় সমীচীন হবে একেবারে তোমার দিদিকে দিয়ে আমার কাছে সুপারিশ করানো; অর্থাৎ, আমার বিষয়ে চরম পন্থা অবলম্বন করা।"

প্রশান্তর কথা শুনিয়া বিনয় প্রভৃতি উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল।

স্মিতমুখে ভ্রূভঙ্গীর সহিত লাবণ্য বলিল, "শোন কথা! আমি হলাম ওঁর চরম পন্থা!"

বিনয় বলিল, "কিন্তু সে বিষয়ে কি আপনার সন্দেহ আছে বউদিদি?"

লাবণ্য বলিল, "প্রত্যয় ত' নেই।"

গম্ভীর মুখে প্রশান্ত বলিল, "কিন্তু লাবণ্য, এই প্রত্যয়হীনতাই হচ্ছে যে-কোনো অসামান্য বৃহত্ত্বের অচ্ছেদ্য অঙ্গ। যে ব্যক্তি সামান্য এতটুকু শক্তি অর্জন করেছে তার সবটুকু নিয়েই সর্বদা সে সজাগ। আর, যে ব্যক্তি বাস্তবিকই চরম শক্তির অধিকারী, তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে তোমারই মত উত্তর দেবে—প্রত্যয় ত' নেই। এই প্রত্যয়হীনতা হচ্ছে বিনয়েরই রকম-ফের। শাস্ত্রে সেই জন্যে বলেছে, বিদ্যা দদাতি বিনয়ং। তুমি যে বলছ, প্রত্যয় নেই,—এ তোমার বিনয় ভিন্ন আর কিছু নয়।"

এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বিনয় বলিল, "কি বউদিদি? এবার আপনার কি বলবার আছে বলুন।"

এক মুহূর্ত কি চিন্তা করিয়া সহাস্য মুখে লাবণ্য বলিল, "আমি বলতে চাই ঠাকুর পো, উনি যে-সব কথা বলেন তার সবগুলোই যদি সত্য হ'ত তা হ'লে আমার আর আক্ষেপ করবার কিছু থাকত না।"

প্রশান্ত বলিল, "কিন্তু তোমাকে ত' কখনো আক্ষেপ করতে দেখাও যায় না লাবণ্য। তা ছাড়া, সত্য মিথ্যার প্রভেদ নির্ণয় করতে যাওয়ার মত ভুল আর নেই। আমাদের জীবনে কি যে সত্য, আর কি অসত্য, তা স্থির ক'রে বলা অত্যন্ত কঠিন। তোমার পক্ষে যে ব্যাপার সত্য, আমার

(শেষাংশ ৪১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ক্যালিফর্নিয়া ভ্রমণ

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

ক্যালিফর্নিয়া আমেরিকার নন্দনকানন। নিউইয়র্ক-এ যখন তাপমান যন্ত্রে পারা শূন্যের নীচে চুয়ান্ন ডিগ্রী নেমে আসে, তখন লসএঞ্জেলে তাপমান যন্ত্রে আবহাওয়ার পরিমাপ আশী ডিগ্রী উপরে চড়ে যায়। আবার নিউইয়র্কে যখন গরমে লোক অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তখন প্রশান্ত মহাসাগরের ঝড়ো হাওয়া এসে ক্যালিফর্নিয়াকে শীতল ক'রে দেয়। আমেরিকাবাসীর কাছে ক্যালিফর্নিয়ার আদর সেইজন্যেই।

এই নন্দনকাননের রাষ্ট্রকেন্দ্রের ইণ্টারন্যাশন্যাল হোটেলে মোহিতবাবু আমাকে রেখে গেলেন। সেদিনটি আমার আরামেই কেটেছিল। কিন্তু মনে শান্তি ছিল না। মন চাইছিল শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যেতে। পথে যে সকল গ্রাম দেখে এসেছি, তেমন গ্রাম শুধু গ্রীসেই দেখা যায়, অন্যত্র দেখা যায় না। কিন্তু ইচ্ছা করলেই গ্রামে ফিরে যাওয়া চলে না, শহরও দেখতে হয়। এদিকে ফ্রিস্কো নগরের দুটি সেতু সাগরের উপর করা হয়েছে। একটি ফ্রিস্কো হতে ট্রেজার আয়লেণ্ড হয়ে ওকলেণ্ড অন্যটি সানফ্রান্সিসকো বৃজ। একটি দেখা হয়েছে অন্যটি দেখা হয় নি। তারপর এমন অনেক দ্রষ্টব্য স্থান আছে যা দেখা দরকার।

রাত্রি নটার পূর্বেই খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে আছি, আর ভাবছি কি করে একটার পর অন্যটি দেখা যায়। এমন সময় দরজায় কে যেন টোকা দিল। সেদিন আমার পকেটে আমাদের দেশের অন্তত দেড় হাজার টাকা ছিল। দরজা না খুলেই আগন্তুক ব্যক্তিকে দাঁড়াতে বললাম। দাঁড়াতে বলার অর্থ হচ্ছে কাপড় বদলাবার সময় চাওয়া। আমেরিকার লোক ততক্ষণ অপেক্ষা করতে রাজী। আমার কাপড় পরাই ছিল, শুধু নোটগুলি গুঁজে রেখে দরজা খুলতে হবে। নোটগুলি ভাল করে লুকিয়ে রেখে দরজা খুলে দিলাম।

আমার সামনে একজন আমেরিকান যুবক। তার পরিষ্কার জমকালো পোষাক। রুমাল হতে সেন্টের গন্ধ বের হয়ে আসছে। চুলগুলি পরিপাটিরূপে আঁচড়ানো। ঠোঁট দুখানা দেখলেই মনে হয়, তার মাঝে নরডিক রক্ত। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি চাই মশাই?" যুবকটি বললে, "একটু বসতে চাই, তারপর কথা হবে।" তাকে আমি বললাম, "তাতে দোষ কি, আসুন বসুন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় একটা সিগারেটও দিতে পারব না। এই আজই সকালে এক ভদ্রলোক একটি ডলার দিয়েছিলেন খাওয়া খেয়ে ঘরের ভাড়া দিয়ে এমন একটিও পয়সা নেই যে আপনাকে একটু আপ্যায়িত করব।" যুবক হেসে বললেন, "তা আমি বেশ ভাল করেই জানি, আমি ডাকাত নই, ভয় পাবেন না। ভয় কিসের, যার কিছু নেই, তার কোন ভয়ও নেই। বেঁচে থাকাটাই যা কণ্টকর। অনেক সময় আত্মহত্যার ইচ্ছা হয়, কিন্তু পিস্তল এবং একটি মাত্র বুলেটের পয়সাও হাতে থাকে না বলেই ত [illegible] "পাশের ঘরে যে ভদ্রলোক আছেন, তিনি কাল সকালেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং আপনাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করবেন। আপনাকে অন্য কোন ভাবে সাহায্য করতে পারি কি না বলুন?" আমি দেখলাম এই সুযোগ, ফস করে বলে বসলাম, "যদি আগামীকাল আমার জন্য একটি Light House keeping room বের করে দিতে পারেন ত বাধিত হব।" যুবকটি বললেন, "সেজন্যই ত এসেছিলাম, কালই বিকালে হবে, তিনটার সময় আসব, আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন।" এই বলেই যুবকটি বিদায় নিলেন।

এই যুবক কে? কি করে আমার আসার সংবাদ পেল? সে কি বৃটিশের গোয়েন্দা? এখানে আবার একটা গদর পার্টি আছে, বোধ হয় বৃটিশেরই গোয়েন্দা হবে, নতুবা গায়ে পড়ে এত সাহায্য করবার আগ্রহ কেন? যা হোক আবার ভাল করে কাপড় প'ড়ে হোটেল ম্যানেজারকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তার কাছে কেউ আমার সংবাদ নিয়েছে কি না। হোটেল ম্যানেজার বললেন, "হ্যা নিয়েছে। লোকটির উপর বক্তৃতা বন্দোবস্ত করবার ভার। তাদের পেশাই হলো, কোন বিদেশী এলে তাদের বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা এবং একটা কিছু টাকা সেজন্য তারা পেয়ে থাকে।" যুবককে ম্যানেজারই আমার আসার সংবাদ দিয়েছেন এবং সে রোজই হোটেলে এসে থাকে। কথাটা শুনে মনের আতঙ্ক দূর হলো, ফের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়লাম।

সানফ্রান্সিসকোকে স্থানীয় লোক ফ্রিস্কো বলে থাকে। অতএব আমিও এই নগরের এত বড় লম্বা নাম বারবার উচ্চারণ না ক'রে ফ্রিস্কোই বলব। ভারতীয় যত লস্কর পালিয়ে যায় আমেরিকায় বসবাস করবার জন্য, তাদের অধিকাংশই নিউইয়র্ক নয় ফ্রিস্কো হতেই পালায়। যারা ফ্রিস্কো হতে পালায়, তারা ফ্রিস্কো শব্দটা আগেই শিখে নেয়। পুলিশে ধরলে যখন "ফ্রিস্কোতেই আমার বাড়ি" বলে, তখন ছাড়তে বাধ্য হয়। অন্যান্য কারণও আছে সেই সঙ্গে।

ফ্রিস্কোর পূর্বাকাশে যখন সূর্যের সোনালী আলো দেখা দেয়, তখন মনে হয়, এদেশটা পূর্বদেশ। পশ্চিমে রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগর, সাগরতীর হ'তে একটু দূরেই ভয়ানক গভীর বলে সমুদ্রের জল প্রায়ই নীরব নিস্তব্ধ। আবার যখন তাতে উত্তাল তরঙ্গমালা ঢেউ খেলে, তখন সংগিনধারী সেপাই সর্বসাধারণকে সমুদ্রতীর হ'তে তাড়িয়ে দেয়। যারা মরতে চায়, তারাই পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে জলে ঝাপ দেয়, আর ফিরে আসে না। বাস্তবিক ফ্রিস্কো যেমন সুন্দর তেমনি ভয়াবহ।

রাত্রে তাড়াতাড়ি ক'রে ঘুমিয়েছিলাম বলেই ভোরে ঘুম হতে উঠতে পেরেছিলাম। ঘরেই গরম ও ঠাণ্ডা জল আসছে। ঘরের টেবিল চেয়ার এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ঝকঝক করছে, যেন এইমাত্র পরিষ্কার ক'রে কেউ রেখে গেছে।

এরকম আসবাবপত্রপূর্ণ ঘরের ভাড়া আমাদের দেশে অন্তত দৈনিক দশ টাকা হবে। অথচ আমেরিকার মত দেশে সেই ঘরের ভাড়া প্রত্যেক চব্বিশ ঘণ্টার জন্য মাত্র আমাদের দেশের এক টাকা।

এই ধরণের ঘর সমেত বৃহৎ অট্টালিকাকেই ইউরোপ এবং আমেরিকার হোটেল বলে। হোটেলে খাবারের কোন বন্দোবস্ত নেই। তবে কোন কোন হোটেলের সঙ্গে রেস্তোরাঁ থাকে। সেই রেস্তোরাঁর মালিক হয় অন্য লোক। আমার হোটেলের সঙ্গে কোনও রেস্তোরাঁ ছিল না বলেই আমাকে দশ ফিট মাত্র হে'টে গিয়ে খেয়ে আসতে হলো।

এ অঞ্চলে প্রায় হোটেলই গ্রীকদের দ্বারা পরিচালিত। গ্রীক রেস্তোরাঁয় নানারকমের খাবার পাওয়া যায়, যার কতকটা ভারতীয় প্রথা মতেও তৈরী হয়ে থাকে। সকালে মামুলী পরেজ এবং কাফি খেয়েই একখানা সংবাদপত্র কিনে ঘরে চলে এলাম।

ভারতবর্ষের লোকের চিন্তাধারা অন্য দেশের লোকের সঙ্গে অনেক সময় মেলে না। এই যে দশ ফিট হে'টে এসেছি, তাতেই আমি পরিশ্রান্ত মনে করেছিলাম। কিন্তু ভারতের লোকরা বলে পর্যটকের আবার কষ্ট কি, তার শীতগ্রীষ্ম বলে কিছু নেই। ইউরোপ এবং আমেরিকানরা কিন্তু তা বলে না। পাশের ঘরের লোকটি যখন এসে আমার দরজায় করাঘাত করল, তখন বেলা নটা। এত দেরীতে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায় ভদ্রলোকটি বললেন, "এত পরিশ্রমের পর এত শীঘ্র যে আপনার ঘুম ভাঙবে, তা ধারণাও করতে পারি নি।"

আমাদের আলাপ পরিচয় সুরু হলো। আগন্তুক আমাকে কোন সংবাদপত্র অফিসে যেতে নিষেধ করলেন। তিনি সেজন্য ব্রোকারী করবেন বললেন। কাজেও তাই হলো। তিনখানা সংবাদপত্রের রিপোর্টার এসে আমার ভ্রমণ কথার চুম্বক লিখে নিয়ে প্রত্যেকে চল্লিশ ডলার করে দিয়ে গেলেন। ব্রোকার মোট পঞ্চাশ ডলার আমার কাছ হতে চেয়ে নিলেন। আমি ব্রোকারকে বললাম, "এই যথেষ্ট এখন আমাকে যেতে দিন, আমি একটু বেড়াব।" ব্রোকার আমাকে সাইকেল নিয়ে যেতে নিষেধ করল এবং সাধারণ পোষাক পরে যেতে বলল। তারই কথা মত আমি নগর ভ্রমণে বের হয়ে পড়লাম। সাধারণ পোষাক পরে বের হ'লে আমাকে পুরো একটি নিগ্রো বলেই মনে হয়। কিন্তু হ্যাট নিয়ে বের হলাম না। কারণ হ্যাট মাথায় দিয়ে বের হলে রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করা আমার পক্ষে মুস্কিল হবে।

সর্বপ্রথমই মারকেট স্ট্রীট ধ'রে ওকল্যান্ডের দিকে রওনা হলাম। সেখানে কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র আছেন, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাই আমার ইচ্ছা। ওকল্যাণ্ড যাবার পথে ট্রেজার আয়ল্যান্ড পড়ে, কিন্তু ট্রাম সেখানে থামে না। সোজা যায় ওকল্যান্ডে। ওকল্যান্ড গিয়ে ট্রাম বদলী ক'রে বার্কলির দিকে রওনা হলাম। দুদিকে পথের দৃশ্য বড়ই সুন্দর। কিন্তু বার্কলিতে গিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না, তাঁরা কাজে চলে গেছেন। আমেরিকায় প্রত্যেক ভারতীয় ছাত্র নানারূপ কাজ করে জীবিকা অর্জন করেন।

ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়াতে ফের ফ্রিস্কোতে ফিরে এলাম। ফিরে আসবার সময় লক্ষ্য করে দেখলাম Oakland হতে San Franscisco পর্যন্ত সমগ্র লাইনটাই একটি "এলিভেটর"। বিজ্ঞান আমেরিকার কত উন্নতি সাধন করেছে, এই "এলিভেটর"টি দেখলেই বোঝা যায়। হাওড়ার পুল প্রস্তুত হতে কত বৎসর আরও লাগবে, অনেকে হয়ত ধারণাও করতে পারে না, কিন্তু এই পুলটি যদি আমেরিকায় আমেরিকানরা করত, তবে ছয়টি মাসও লাগত না।

তিনটার পূর্বেই হোটেলে ফিরে এসে মিঃ এটকিনসনকে নিয়ে Light house keeping-এর সন্ধানে বের হলাম। সন্ধ্যার পূর্বেই একটি ঘর পেয়ে গেলাম। আমার শরীরের রং দেখে অন্তত দশটি ভগবান বিশ্বাসী বাড়ি হ'তে তাড়িত হয়েছিলাম। কিন্তু এই বাড়ির মালিক এবং তার স্ত্রী উভয়ে ভগবান ব'লে কিছুই মানেন না এবং সেজন্যই "কালার বার"ও গ্রাহ্য করেন না। বাড়িটি থার্ড স্ট্রীট এবং হাওয়ার্ড স্ট্রীটের মোড় হতে সামান্য দূরে।

ঘরখানাতে একটি Soft bed (মোলায়েম বিছানা), দুটি টেবিল, একটি আলমারী, রান্নার বাসন রাখবার একটি সিন্দুক, আবর্জনা ফেলবার একটি ঝুড়ি রয়েছে। ঘর এতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে, যে কোন লোক এই ধরণের ঘর পছন্দ করে। কিন্তু সকলের ভাগ্যে এরকম ঘরে থাকবার সুযোগ হয় না। বাড়িওয়ালী কোন ভাড়াটিয়াকে শনিবার ছাড়া অন্য কোন দিন মাতাল হয়ে প্রবেশ করতে দেখলেই তাড়িয়ে দেন। বাড়িওয়ালী আমাকে বললেন, আমার স্বভাব-চরিত্রের উপর এই বাড়িতে থাকা নির্ভর করে। মনে মনে ভাবলাম যারা ভগবানকে বিশ্বাস করে না, তারা স্বভাব-চরিত্রের উপর এত জোর কেন দেয়? ঘর ঠিক করেই হোটেলে ফিরে গিয়ে আমার সাইকেল ও পিঠ-ঝোলা নিয়ে আসলাম। মিঃ এটকিনসনকে বলেছিলাম, আমাকে ক্রমাগত দুদিন বিশ্রাম করতে হবে, তারপর লেকচার দিতে বের হব। এ দুদিন সময় পেলেই যুদ্ধের চিত্র এবং রাশিয়ান ফিলিম দেখব।

আমাদের দেশে প্রেক্ষাগৃহগুলিতে টিকিটের শ্রেণী আছে। আমেরিকায় তা নেই। আমেরিকায় প্রেক্ষাগৃহে কি রকম ফিলিম দেখান হয় এবং কি প্রকার সিটের ব্যবস্থা আছে, সেই অনুযায়ী টিকিটের দাম হয়ে থাকে। ফ্রিস্কোতে সবচেয়ে ভাল যে প্রেক্ষাগৃহ আছে, সেখানে পঞ্চাশ সেণ্ট প্রত্যেক সিটের জন্য নেওয়া হয়। সেখানে উঁচুদরের ফিলিম দেখানো হয়। যাদের আর্টের জ্ঞান নেই, তারা সেখানে মোটেই যায় না। রাশিয়ান ফিলিমগুলি এই ধরণের প্রেক্ষাগৃহেই সাধারণত দেখানো হয়ে থাকে। হলিউড রাশিয়ান আর্টিস্টদের কাছে হার মেনেছে বললে দোষ হয় না। তারপরই হলো পঁচিশ সেণ্টের প্রেক্ষাগৃহ। এই প্রেক্ষাগৃহগুলিতে যুদ্ধের ফিলিম হ'তে সুরু ক'রে কাউ বয়দের ফিলিম পর্যন্ত দেখানো হয়। পনর সেণ্টের প্রেক্ষাগৃহে পুরাতন ফিলিম দেখানো হয়।

প‍ঁচিশ সেণ্ট অনেক সময়ই এক টাকা হতে কম। ধরে নেওয়া যাক চার টাকায় এক ডলার। প‍ঁচিশ সেণ্ট দিয়ে যে সকল প্রেক্ষাগৃহে ফিলিম দেখা যায়, কলকাতার মেট্রোর তাদের সঙ্গে কোনও মতেই তুলনা হতে পারে না। যদিও কলকাতার রিজার্ভ সিটের দাম কত হয় তা আমি বলতে পারব না, কারণ কখনও মেট্রোর রিজার্ভ সিটে বসতে যাই নি। সাধারণত তেত্রিশ সেণ্টে এক টাকা হয়। আমেরিকার অনুপাতে আমাদের দেশের সিনেমার টিকেট কিনতে আমরা বেশী পয়সা খরচ করে থাকি। দ্বিতীয় কথা হলো, যদি কোন ফিলিম দ্বিতীয়বার দেখতে হয়, তবে আমরা পুনরায় টিকিট কিনতে বাধ্য হই। আমেরিকায় সেরূপ করতে হয় না। প্রেক্ষাগৃহ খোলা হয় প্রাতে দশটার সময় এবং একই ফিলিম রাত্র বারটা পর্যন্ত ক্রমাগত চলতে থাকে। প্রেক্ষাগৃহে স্বতন্ত্র বিশ্রামগৃহ থাকায়, অনেকেই ফিলিমটি একবার দেখে এসে চোখকে একটু বিশ্রাম দেয়, তারপর ফের গিয়ে বসে দ্বিতীয়-বার দেখবার জন্য। যদি একজন লোক ক্রমাগত একই ফিলিম প্রাতে দশটা হতে রাত্র বারটা পর্যন্ত দেখে, তাকে বের করে দিবার কারো অধিকার নেই। এক্ষেত্রে ফিলিম দেখার দাম কত হলো, মনে মনে হিসাব করে দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

ছদ্মবেশী

(৪১৩ পৃষ্ঠার পর)

পক্ষে হয়ত তা সত্য নয়; আবার, তোমার পক্ষে আজ যে-ব্যাপার সত্য, কাল হয়ত তোমারই পক্ষে তা সত্য নয়। সেই জন্যে, 'ভাল কথার মিছেও ভাল' মনে ক'রে খুসি থাকা সুবুদ্ধির পরিচয়। জীবন-দর্শনের এ হ'ল একটা মস্ত বড় কথা।"

লাবণ্য বলিল, "জীবন-দর্শনের মস্ত বড় কথা এখন থাক,—ওদিকে লতিকা বোধ হয় এতক্ষণ গাড়িতে গিয়ে উঠল।" ব'লে লাবণ্য প্রস্থানোদ্যত হইল।

প্রশান্ত বলিল, "লতিকা এগিয়ে গেলে কি হবে? লতিকার পাদপ যে এখানে খাড়া রয়েছে।"

সে কথা কর্ণে না তুলিয়া লাবণ্য ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিনয় বলিল, "আজকালকার লতিকারা পাদপে বাঁধা থাকে না দাদা।"

প্রশান্ত বলিল, "তোমার লতিকা তেমন নয়।" বলিয়া দ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

ক্ষণকাল পরে বিনয় ও লতিকাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া প্রশান্ত, লাবণ্য ও সুলেখা ভোজন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

(ক্রমশ)



পুস্তক পরিচয়

কুমারী অনীতা ও অরুণ—শ্রীঅন্নদামোহন বাগচী। প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

কৃপানাথের কীর্তি, যে নদী মরুপথে হারাল ধারা, অভিসপ্ত যৌবন, প্রগতির পরিণাম, তপোভঙ্গ, কুমারী অনীতা ও অরুণ। এই ছয়টি ছোট গল্পের সমষ্টি। লেখকের ভাষা ভাল, ভঙ্গীটি বেশ। অভাব মৌলিকত্বের। এজন্য ইঙ্গিত এতটা সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে গূঢ়তার অভাবে গল্পের রস গাঢ় হইয়া জমে নাই। স্রষ্টা মনের স্বচ্ছন্দ খেলা লেখার মধ্যে পাওয়া যায় না। লেখক মনে হইল সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে নবীন, সাধনা করিলে তিনি ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে পারিবেন।

দুটি গল্প:—রমাপতি বসু, ৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা হইতে ব্রজবিহারী বর্মন কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

আলোচ্য পুস্তিকায় ম্যাক্সিম গর্কির 'ওয়েটিং ফর এ ফেরী' ও 'টুয়েণ্টিসিক্স মেন এণ্ড এ গার্ল' নামক দুটি সুবিখ্যাত গল্পের বাঙলা অনুবাদ স্থান পাইয়াছে। ম্যাক্সিম গর্কি বিশ্ববিখ্যাত সাম্যবাদী সাহিত্যিক। তাঁহার বহু উপন্যাস ও গল্প পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং অশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। বাঙলা ভাষায় এই অনুবাদ পুস্তিকাটিও পাঠক মহলে সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। রমাপতিবাবু স্বচ্ছ সরল ভাষায় এবং অবিকৃত-ভাবে গল্প দুটির অনুবাদ করিয়াছেন।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩।১, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।

'আজকাল সভ্যসমাজে সংবাদপত্র নিত্য ব্যবহার্য জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলা দেশে সর্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। তাহার ফলে জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নব জাগরণ সুরু হয়, সংবাদপত্র প্রকাশ ইহার একটি দিক। বাঙলা দেশের, তথা ভারতবর্ষের প্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র ইংরেজী। উহা ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী তারিখে হিকি সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত হয়। যিনি এই সংবাদপত্র প্রকাশ করেন, তাঁহার নাম গঙ্গা-কিশোর ভট্টাচার্য্য। তিনিই প্রথম বাঙালী সাংবাদিকের গৌরবময় পদের অধিকারী'—ব্রজেন্দ্রবাবু পুস্তকের মুখবন্ধে এই যে কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন, ইহাতেই পুস্তকের গুরুত্ব বর্ধিত হইয়াছে।

শ্রীরামপুরের বহরা গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান গঙ্গাকিশোর শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের ছাপাখানার কম্পোজিটর ছিলেন। গঙ্গা-কিশোর কলিকাতায় আসিয়া বাঙলা বই ছাপিবার কাজ সুরু করেন। পরে তিনি নিজে একটি ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছাপাখানা হইতে 'বাঙলা গেজেট' নামে সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।

এই 'বাঙলা গেজেট'ই বাঙলার প্রথম সংবাদপত্র না সমাচার দর্পণেরই সেক্ষেত্রে দাবী অগ্রগণ্য, এ বিষয়ে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই। আমাদের মনে হয়, সমাচার দর্পণের দাবীই যতদূর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে দৃঢ়। তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হয় যে, গঙ্গাকিশোরের 'বাঙলা গেজেট' বাঙালী প্রবর্তিত প্রথম বাঙলা সংবাদপত্র। তিনি বাঙালী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা এবং পুস্তক প্রকাশক। এমন জীবনী সকল বাঙালীরই পড়া উচিত। ব্রজেন্দ্রবাবু এই জীবনী প্রকাশ করিয়া দেশের এবং সমাজের একটা বড় উপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার এই সব মৌলিক অবদান মহা মূল্যবান্।

সাহিত্য সংবাদ

বর্ধমান জেলা ছাত্র ফেডারেশনের বিজ্ঞপ্তি—

এতদ্দ্বারা বর্ধমান জেলার স্কুল ও কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীদের জানান যাইতেছে যে, গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও বর্ধমান জেলা ছাত্র ফেডারেশনের প্রচেষ্টায় একটি রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে। নিম্নলিখিত রচনা তিনটি নির্ধারিত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য দেওয়া হইল। যাঁহারা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহা-দিগকে একটি করিয়া রৌপ্যপদকে পুরস্কৃত করা হইবে। বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা গঠিত একটি রচনা কমিটির দ্বারা প্রতিযোগিতার রচনা-সমূহ পরিদর্শিত হইবে। ১৯৪১ সালের ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে বর্ধমান জেলা ছাত্র ফেডারেশনের কৃষ্টি সম্পাদকের নামে জেলা অফিসে নির্দিষ্ট রচনাগুলি পাঠাইতে হইবে।

১। শিক্ষক ও ছাত্রদের কিরূপ সম্বন্ধ হওয়া উচিত। (স্কুলের ছাত্রদের জন্য)।

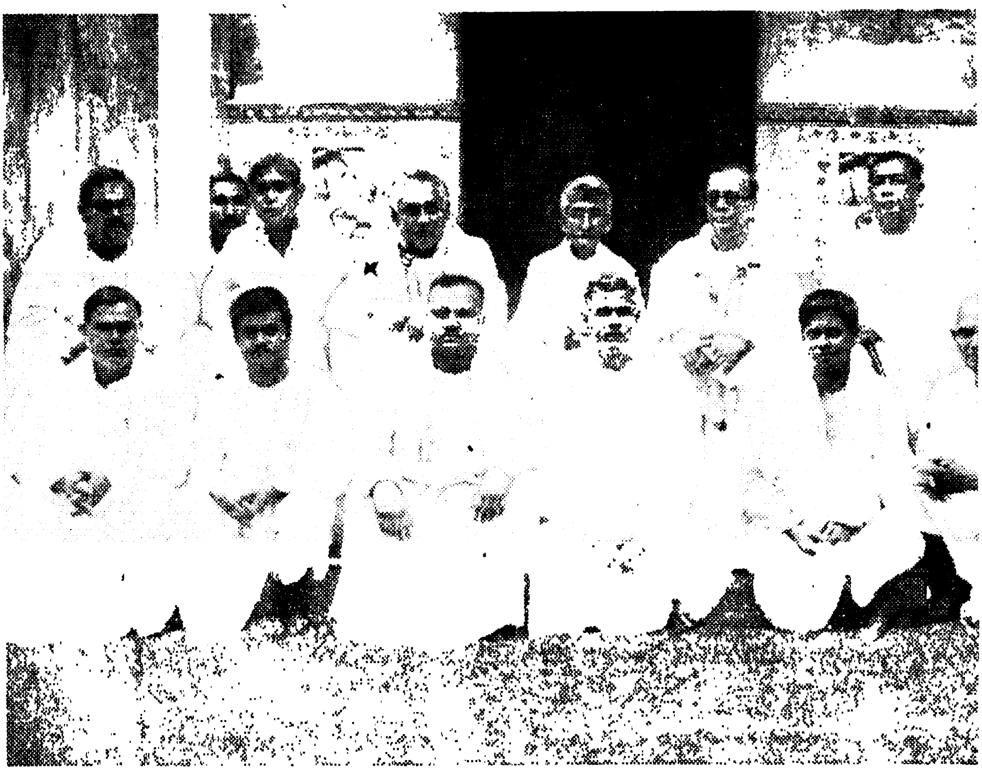
২। পণপ্রথা। (স্কুলের ছাত্রীদের জন্য)।

৩। কো-এডুকেশন। (কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য)। (স্বাঃ) প্রভাতকুসুম ঘোষ, কৃষ্টি সম্পাদক, বর্ধমান জেলা ছাত্র ফেডারেশন, স্যার বি সি রোড, বর্ধমান।





জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুত রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব শ্রদ্ধানন্দ পার্কে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতেছেন



বৈষ্ণব সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন—

বামদিক হইতে—(১) কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী (সভাপতি, কাব্য শাখা); (২) 'দেশ' সম্পাদক শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র সেন (সভাপতি, অভ্যর্থনা সমিতি; (৩) শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার (উদ্বোধনকর্তা); (৪) শ্রীযুত মৃণালকান্তি ঘোষ (সভাপতি, রূপ-সনাতন স্মৃতি সমিতি); (৫) রায় বাহাদুর শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র (মূল সভাপতি); (৬) শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত (সম্পাদক, বিবেকানন্দ মিশন)।

দ্বিতীয় পংক্তি—বামদিক হইতে—(১) শ্রীযুত কুঞ্জকিশোর দাস (সম্পাদক, সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী); (২) শ্রীযুত রসিকলাল সুর (সম্পাদক, রূপ-সনাতন স্মৃতি সমিতি); (৩) শ্রীযুত রাধারমণ দাস (প্রচারকর্তা, সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী); (৪) ডক্টর নৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী; (৫) পণ্ডিত শ্রীনিরঞ্জন দাস; (৬) শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ বসু (সভাপতি, সাহিত্য শাখা); (৭) শ্রীযুত মনিমোহন মল্লিক (সহকারী সম্পাদক, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলন)।

আজ-কাল

সাম্প্রদায়িকতার তাণ্ডব

ঢাকা শহরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা মাঝে একটু ঝিমিয়ে পড়ে' আবার রুখে উঠেছে এবং সবচেয়ে আতঙ্কের কথা, এই বিরোধের আগুন গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। ৪০টি গ্রাম ইতিমধ্যে এই ধ্বংসযজ্ঞের আহুতি হ'য়েছে। বিভিন্ন গ্রামে ভিটেমাটি ছেড়ে নয় হাজারের উপর হিন্দু পালিয়ে গিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে। জনতার ধ্বংসলীলার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ পায় নি।

ঢাকার নবনিযুক্ত এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ হ্যাচ-বার্নওয়েল নারায়ণগঞ্জের গ্রামে জনতার লাঠির আঘাতে আহত হন। বাঙলা পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ গর্ডন ও অন্যান্য কর্মচারীরা এখন উপদ্রুত অঞ্চলের উপর বিমানে টহল দিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে' বেড়াচ্ছেন। প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক এক বিবৃতিতে দুই পক্ষকে নিরস্ত হ'তে বলেছেন। গভর্নর প্রাসাদে উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের শান্তি-বৈঠকে গভর্নমেণ্ট দাঙ্গা দমনের সংকল্প প্রকাশ করেছেন।

গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গার উৎপত্তি, প্রসার ও সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা সম্পর্কে মঙ্গলবারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসের এক মুলতুবী প্রস্তাবের ভিত্তিতে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ঢাকা শহরে এখনো খুন-জখম চলছে। স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ রয়েছে; কারণ জনসাধারণ তাদের ধনপ্রাণ নিরাপদ বোধ করছে না। নিহতদের সংখ্যা প্রায় চল্লিশে পেঁছেছে।

সপ্রু-বড়লাট

বোম্বাইয়ে তথাকথিত 'নেতৃসম্মেলন' যুদ্ধের পর ডোমিনিয়ন স্টেটাস পাওয়ার প্রতিশ্রুতি চেয়ে এবং এখন বড়লাটের শাসন-পরিষদ্ সম্প্রসারণের দাবী জানিয়ে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন, তা যাতে ফলপ্রসূ হয় সেজন্যে স্যারতেজবাহাদুর সপ্রু বড়লাটের কাছে নিবেদন জানাতে যান। তিনি একদিন বড়লাটের অতিথি হয়ে থেকে দীর্ঘ সময় আলাপ-আলোচনা করেন। এ'দের আসল দাবীটা হচ্ছে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যদি বড়লাটের পরিষদে বর্তমানে নাও আসতে চায়, তবুও অন্যান্য বিশিষ্ট ভারতীয়দের নিয়ে যেন শাসন-পরিষদ্ বড় করা হয়। বড়লাট সাহেব যে সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর প্রস্তাব শুনেছেন, এতে স্যার তেজ-বাহাদুর আপাতত বিগলিত হয়েছেন।

আন্তর্জাতিক

বল্কানে অভিযান

জার্মানী যুগপৎ যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীস আক্রমণ করেছে। যুগোস্লাভিয়াকে হাত করে গ্রীসের উপর আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনায় ব্যর্থকাম হ'য়ে নাৎসীরা এই উপায় অবলম্বন করেছে। আক্রমণের প্রাক্কালে হিটলার এক ঘোষণায় যুগোস্লাভ গভর্নমেণ্টকে গাল দিয়ে বলেছেন যে, জার্মানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নষ্ট করবার জন্যে এবং বল্কান থেকে ইংরেজকে তাড়াবার জন্যে এই যুদ্ধ আরম্ভ করা হ'ল। গ্রীসের কাছে বিজ্ঞপ্তিতে জার্মানী বলে যে, বৃটিশ বাহিনী গ্রীসে এসে ঘাঁটি করায় জার্মানী গ্রীস চড়াও করবে। পরে এক বৃটিশ ইস্তাহারে বলা হয় যে, জার্মান বাহিনী যখন বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করে, তখন বল্কানে জার্মান অভিযান আসন্ন বুঝে গ্রীসে বৃটিশ সৈন্য পাঠানো হয়।

এ রকম ক্ষেত্রে এ সব যুক্তিতর্কের কথা বাদ দিতে হবে। আসল কথা, সমস্ত বল্কানকে জার্মানীর গ্রাস করা প্রয়োজন, সে ছলে বলে কৌশলে যেমনভাবে হোক। জার্মানী যুগোস্লাভিয়া আক্রমণ করবে জানার পর সোভিয়েট যুগোস্লাভ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে একটা মৈত্রী ও অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। এক নৈতিক সমর্থন ছাড়া সোভিয়েটের পক্ষে এই চুক্তির আর কোন তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না, অন্তত বাইরে যে সব সর্ত প্রকাশ পেয়েছে, তা থেকে মনে হয় না। যেখানে ইংরেজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জার্মানী লড়ছে, সেখানে সোভিয়েট নিশ্চয়ই কোন পক্ষে যোগ দেবে না।

যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানী বেলগ্রেড শহরে বিমান আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে বহু লোক হতাহত হয় এবং বহির্জগতের সঙ্গে বেলগ্রেডের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। যুগোস্লাভ গভর্নমেণ্ট বেলগ্রেড ছেড়ে আরো দক্ষিণের দুটি শহরে চলে' গেছেন। জার্মান বাহিনীর এখন প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বুলগেরিয়া থেকে সার্বিয়ার মধ্যে ঢুকে যুগোস্লাভ বাহিনীকে উত্তর ও দক্ষিণে দ্বিধা বিভক্ত করে দেওয়া এবং বুলগেরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে গ্রীসের স্ট্রুমা নদী ধরে ভার্দার উপত্যকায় নেমে গিয়ে গ্রীক ও যুগোস্লাভ বাহিনীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা। এ পর্যন্ত যা খবর এসেছে, তাতে দেখা যায়, জার্মানদের এই উদ্দেশ্য ইতিমধ্যেই সাফল্যের দিকে কিছু এগিয়ে গেছে। তাদের প্রচণ্ড আক্রমণ সংখ্যাল্প গ্রীক ও যুগোস্লাভ সৈন্যেরা প্রাণপণে প্রতিরোধ করছে বটে, কিন্তু সব জায়গায় তারা সামলাতে পারছে না। পশ্চিম থ্রেস থেকে গ্রীক সৈন্যেরা সরে এসেছে; ম্যাসিডোনিয়ায় জার্মান প্যারাশুট-সৈন্য নামছে; দুটো গ্রীক দুর্গ জার্মানরা দখল করেছে। এতো গেল দক্ষিণ দিকের ব্যাপার, যেখানে দেশ অত্যন্ত দুর্গম। যুগোস্লাভিয়ার উত্তর দিক অতটা দুর্গম নয়; সেখানে জার্মানরা আক্রমণ চালাতে থাকলে যুগোস্লাভরা কতক্ষণ যে ঠেকাতে পারবে কে' জানে। অস্ট্রিয়া, হাঙ্গারী ও রুমেনিয়া থেকে জার্মান সৈন্যদল উত্তর যুগোস্লাভিয়ার দিকে যাচ্ছে। তবে একমাত্র ভরসা বৃটিশ, অস্ট্রেলিয়ান ও নিউজিল্যাণ্ড বাহিনী এবং তারা রাখতে পারলে আমেরিকার প্রতিশ্রুত সাহায্য।

এখনো বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে জার্মানদের সে রকম সংঘর্ষ হয় নি। তবে বৃটিশ বিমানবহর সোফিয়ায় এবং গ্রীসের স্ট্রুমা উপত্যকায় জার্মান সৈন্য ও সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর প্রবল আক্রমণ করেছে।

এদিকে ইতালী জার্মানীর সঙ্গে সঙ্গে যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে

যুদ্ধ ঘোষণা করায় . যুগোস্লাভ বাহিনী আলবেনিয়া ও উত্তর ইতালী আক্রমণ করেছে। যুগোস্লাভ সৈন্যেরা ফিউমে (ইতালী) ও স্কুটারি (আলবেনিয়া) এবং জারা দখল করেছে বলে সংবাদ এসেছে।

তুরস্ক এ যুদ্ধে জড়াবে না বলে মনে হচ্ছে। জড়ালেও অন্য বল্কান দেশের সংগে একত্রে সে জার্মান সৈন্যের সংগে লড়তে পারবে না; কারণ পশ্চিম থ্রেসে জার্মান সৈন্য প্রবেশ করায় গ্রীসের সংগে তুরস্কের সংস্পর্শ ইতিমধ্যেই ছিন্ন হয়েছে বা হবার উপক্রম করেছে।

আফ্রিকায় অভিযান

বল্কান অভিযানের প্রাক্কালে উত্তর আফ্রিকার লিবিয়ায় জার্মান ও ইতালীয় সাঁজোয়া সৈন্য বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করে। তাদের প্রবল চাপের মুখে বৃটিশ সৈন্য অন্যতম প্রধান বন্দর ও সামরিক ঘাঁটি বেনগাজী ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তার পর খবর এসেছে যে, ইংরেজরা বেনগাজীর পূবে দার্না বন্দর থেকেও সরে এসেছে।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বল্কান ও লিবিয়ার অভিযান একই সামরিক পরিকল্পনার অংগ। পূর্ব ভূমধ্যসাগরের উত্তর ও দক্ষিণ দুই তীরে এই দুই অভিযান যেন দুই বাহু এবং এদের বেড় সুয়েজকে নিয়ে। এই সংগ্রামই যে বর্তমান মহাসমরের প্রধান সংগ্রাম হয়ে দাঁড়াবে, তাতে সন্দেহ নেই। জার্মানীর এই প্রাথমিক সাফল্যকে বৃটেন আমেরিকার সমর্থনে নস্যাৎ করবার জন্য নিশ্চয়ই পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করবে।

পূর্ব আফ্রিকায় কিন্তু বৃটিশ সাফল্য অক্ষুণ্ণ আছে। ইতালীয়রা আবিসিনিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবা ছেড়ে দিয়েছে এবং বৃটিশ সৈন্য ঐ শহর দখল করেছে। এখন পূর্ব আফ্রিকায় প্রধান জায়গা মাত্র একটি ইতালীর হাতে থাকল— এরিত্রিয়ার মাসাওয়া বন্দর। ইংরেজরা এই বন্দর সমর্পণের দাবী জানিয়েছিল; কিন্তু ইতালীয়রা রাজী হয় নি।

বিমান আক্রমণ

কিছুদিন বৃটেনে জার্মান বিমান হানা খুবই কমে গিয়েছিল। কিন্তু আবার তার তীব্রতা বেড়েছে। বল্কান যুদ্ধারম্ভের পর গত সোমবার রাত্রে বৃটেনে বহু স্থানে ব্যাপক বিমান আক্রমণ হয়। উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডেও সেদিন প্রথম বোমা পড়ে। মাঝে ব্রিস্টলের উপরও একদিন প্রচণ্ড আক্রমণ হয়।

এই সংগে বৃটিশ বিমানবহরও জার্মান সামরিক কেন্দ্র ও ও অভিযান বন্দরগুলোর উপর আক্রমণ চালাতে থাকে।

মস্কোতে মাৎসুওকা

যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীসের উপর জার্মানী হানা দেবার ঠিক আগেই জাপানী পররাষ্ট্রসচিব মিঃ মাৎসুওকা বার্লিন থেকে রওনা হয়ে মস্কোতে গেছেন। তিনি সেখানে এখনও আছেন এবং সোভিয়েট নেতাদের সংগে আলোচনা করছেন। সম্ভবত দক্ষিণ দিকে জাপ অভিযানের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে তিনি সোভিয়েটের সংগে একটা অনাক্রমণ চুক্তির কথাবার্তা বলছেন।

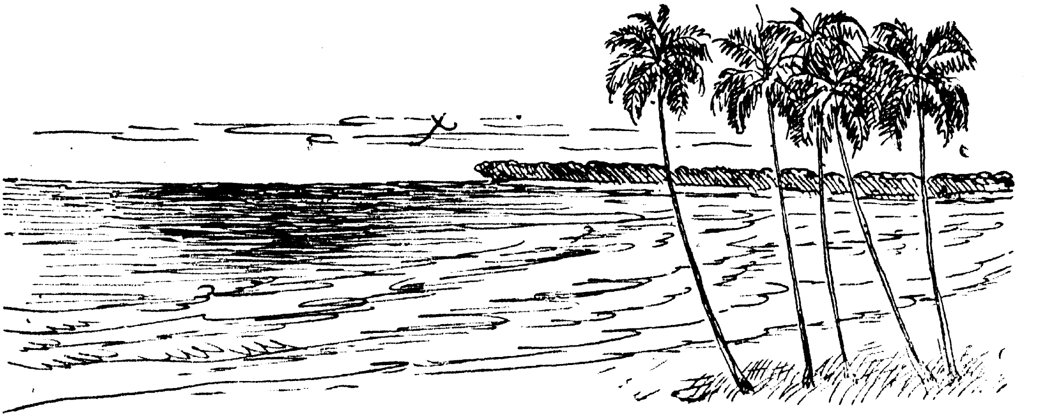
ইরাকে পরিবর্তন

জার্মান অভিযানের সংগে একত্রিত করে দেখলে এ সপ্তাহের আর একটা খবর বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সে হচ্ছে সমরনায়কদের সহযোগিতায় ইরাকের ভূতপূর্ব মন্ত্রী রশিদ আলির ক্ষমতা অধিকার। বৃটিশ নেতারা রশিদ আলিকে পছন্দ করেন না। যদিও তিনি ইংগ-ইরাক চুক্তি অক্ষুণ্ণ রাখবেন বলে ঘোষণা করেছেন, তবু তাঁদের সন্দেহ যে, এই ব্যাপারের পেছনে জার্মানীর হাত আছে।

* * * * * *

হাংগারীর প্রধান মন্ত্রী কাউণ্ট তেলেকি আত্মহত্যা করেছেন। অনেকে বলছেন, ব্যক্তিগত নয়, রাষ্ট্রিক কারণই তাঁর আত্মহত্যার মূলে।

৮।৪।৪১ —ওয়াকিবহাল।



রঙ্গজগৎ

বৎসরের শ্রেষ্ঠ চিত্র

বাঙলার বিশিষ্ট দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রসমূহের প্রতিনিধি-বর্গ লইয়া গঠিত বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংঘ ১৯৪০ সালে কলিকাতায় প্রদর্শিত ভারতীয় ও বৈদেশিক চিত্রসমূহের জনপ্রিয়তা নির্ণয়ের জন্য ব্যালট ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভোট গ্রহণের ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

বিদেশী

(১)	গন্ উইথ দি উইণ্ড	...	২০৪ পঃ—এম জি এম
(২)	অল দিস এণ্ড হেভেন টু		১২৮ পঃ—ওয়ার্নার ব্রাদার্স
(৩)	মিঃ স্মিথ গোজ্ টু ওয়াশিংটন	...	১১৮ পঃ—কলম্বিয়া
(৪)	রেবেকা	...	১১৩ পঃ—ইউনাইটেড আর্টিস্ট

ভারতীয়

(১)	ওম্যান	...	২১৩ পঃ—ন্যাশন্যাল স্টুডিও
(২)	ডাক্তার	...	১৫৯ পঃ—নিউ থিয়েটার্স
(৩)	বন্ধন	...	১৪২ পঃ—বম্বে টকিজ
(৪)	জিন্দগী	...	১৩৯ পঃ—নিউ থিয়েটার্স
(৫)	কঙ্কণ	...	১১৬ পঃ—বম্বে টকিজ
(৬)	সন্ত জ্ঞানেশ্বর	...	৯২ পঃ—প্রভাত পিকচার্স
(৭)	পরাজয়	...	৬৫ পঃ—নিউ থিয়েটার্স
(৮)	ভরসা	...	৪৯ পঃ—মিনার্ভা মুভিটোন
(৯)	শুকতারা	...	৪২ পঃ—ফিল্ম প্রডিউসার্স
(১০)	ঠিকাদার	...	৩৩ পঃ—ভারতলক্ষ্মী
	কয়েদী		৩৩ পঃ—ফিল্ম কর্পোরেশন

শ্রেষ্ঠ অভিনয়—(ক) বাঙলা চিত্র—অভিনেতা—'ডাক্তার' অহীন্দ্র চৌধুরী। অভিনেত্রী—'শুকতারা' চিত্রে শ্রীমতী চন্দ্রাবতী। (খ) হিন্দি প্রভৃতি—অভিনেতা—'ভরসায়'—চন্দ্রমোহন। অভিনেত্রী—'ওম্যানে' সর্দার আখ্‌তার।

শ্রেষ্ঠ পরিচালনা—(১) ফণী মজুমদার, (ডাক্তার), (২) মেহবুব (ওম্যান)।

শ্রেষ্ঠ চিত্র কাহিনী—বাঙলা—'ডাক্তার', হিন্দি—'ওম্যান'।

১৯৪০ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্র

বাঙলা—নিউ থিয়েটার্সের 'ডাক্তার' ও হিন্দি—ন্যাশনাল ষ্টুডিওর 'ওম্যান'।

ফার্ষ্ট এম্পায়ারে নৃত্যগীতাভিনয়

গত বুধবার ফার্স্ট এম্পায়ারে শ্রীমতী ঠাকুর ও 'নৃত্যকলালয়ে'র ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক 'সুন্দর' নামে একটি গীতিনৃত্যাভিনয় হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী দেবী ও মণিপুরী নৃত্যশিল্পী রাজকুমার প্রিয়গোপাল সিংএর একক ও দ্বৈত নৃত্যগুলি আঙ্গিক ও ছন্দ-বৈচিত্র্যের দিক দিয়া বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। সমবেত নৃত্যে শান্তি সিং, রেখা মজুমদার, বেলা মজুমদার, দীপালি ঠাকুর, প্রভা হোরা, শোভা প্রধান প্রভৃতি 'নৃত্যকলালয়ে'র ছাত্রীবৃন্দ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীঅনাদি দস্তিদারের পরিচালনায় ছেলেমেয়েদের মিলিত-কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নূতন ও পুরাতন বসন্তের গান শ্রুতিমধুর হইয়াছিল। গানের নির্বাচন প্রশংসনীয়, কথা ও সুরের বৈশিষ্ট্যে প্রত্যেকটি গানই উল্লেখযোগ্য। এক শান্তিনিকেতনের দল ছাড়া এই ধরণের কোরাস সংগীত কলকাতায় সচরাচর শোনা যায় না। নৃত্যের সহিত অর্কেষ্ট্রা পরিচালনা করিয়াছিলেন শ্রীদক্ষিণামোহন ঠাকুর। যন্ত্রের সুর-ঝংকারে প্রত্যেকটি নৃত্যই প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীদক্ষিণামোহন ঠাকুর 'তড়িৎ-বীণা' বাজাইয়া শ্রোতাদের মুগ্ধ করিয়াছেন, এই যন্ত্রটি তাঁহার নূতন আবিষ্কার।

এই অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ নৃত্যনাট্য 'বাসবদত্তা'। রবীন্দ্রনাথের 'অভিসার' কবিতার ভাবাবলম্বনে নৃত্যনাট্যটি রচিত এবং রাজনটী বাসবদত্তার ভূমিকায় শ্রীমতী দেবীর নৃত্যাভিনয় উচ্চাঙ্গের হইয়াছে। 'অভিসার' কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবটি শ্রীমতী দেবীর নৃত্যাভিনয়ে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। আধ ঘণ্টাব্যাপী এই নৃত্যনাট্য দর্শকদের স্তব্ধবিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে।

ছায়ালোকের টুকিটাকি

'কোন ফাগুনের শুক্ল নিশায়
যৌবনেরি নবীন নেশায়
চকিতে কার দেখা পেতেম
রাজার চিত্রশালে।
ছল করে তার বাঁধত আঁচল
সহকারের ডালে।
আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে—'

তবে সে কালের মালবিকার জালে রুই কাৎলার মতো বন্দী হতেম। তবু রবীন্দ্রনাথ বন্দী হন নি, কোথাও একটু লোকসানের ভয় তাঁর ছিল। হয়তো বা এমনো হ'তে পারে যে, তিনি জানতেন, তাদের পাওয়া যখন যাবেই না, তখন না পাওয়ার বাহাদুরীটাই করা যাক্।

'এখন যাঁরা বর্তমানে
আছেন মর্ত্যলোকে,
মন্দ তারা লাগ্‌ত না কেউ
কালিদাসের চোখে।
পরেন বটে জুতো মোজা
চলেন বটে সোজা সোজা
বলেন বটে কথাবার্তা
অন্য দেশীর চালে।
তবু দে'খো সেই কটাক্ষ
আঁখির কোনে দিচ্ছে সাক্ষ্য,
যেমনটি ঠিক দেখা যেত
কালিদাসের কালে।'

তাই—

'মরবোনা ভাই নিপুনিকা
চতুরিকার শোকে
তাঁরা সবাই অন্য নামে
আছেন মর্ত্যলোকে॥'

ভালো লজিক! কালিদাসকে হারিয়ে দিয়ে কবি খুব নেচে বেড়াচ্ছেন। হাজার হোক্, একে বাঙালী, তায় বামুন, তার উপর কবিগুরু।

* * * *

স্বভাবভীরু কবি রবীন্দ্রনাথের এই খেলো লজিককে নাকচ ক'রে স্বভাববীর কবি অজয় কবি কালিদাসকে তাঁর মালবিকা-চতুরিকাসহ স্বীয় চিত্রনাট্যে বন্দী করবেন। দীনেশ দাস ছবিখানা তুলবেন পরিচালক হিসেবে।

কিন্তু সেজন্য রবিঠাকুর যদি ভেবে বসেন, নিমাই পণ্ডিতের চিত্রনাট্যকার অজয় পণ্ডিত, কালিদাস পণ্ডিতের কাহিনী রচনা করবেন; তবে তা অত্যন্ত অন্যায় হবে। রবীন্দ্রনাথ যেন ভবিষ্যতে আর কখনও না লেখেন—

সৃষ্টি করা সম্ভব হবে? বাঙলার প্রডিউসারদের যে কোন মোতি-মহলে কি অত মোতি আছে? অর্থ ও সময় যে একটা বড় সমস্যা। রূপসী পাওয়া বিভ্রাটটা না হয় ধরলুমই না—'তোমরা সবাই সুন্দর!'

* * * * * *

বাজারে গুজব রটেছে যে, 'পাপের পথের' নূতন নামকরণ যিনি করতে পারবেন, তিনি ইনাম পাবেন পঞ্চাশ টাকা! ইনামটা দেবেন কারা? ছবির কর্তৃপক্ষ? অথবা অভিনেতা ও অভিনেত্রী-



নিউ থিয়েটার্সের হিন্দী চিত্র 'নর্ত্তকী'র নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী লীলা দেশাই। শনিবার, ১২ই এপ্রিল হইতে নিউ সিনেমায় প্রদর্শিত হইবে। ছবিটি পরিচালনা করিয়াছেন শ্রীদেবকীকুমার বসু।

'হায়রে কবে কেটে গেছে
কালিদাসের কাল—
পণ্ডিতেরা বিচার করে
লয়ে তারিখ শাল।'

অজয় পণ্ডিত ওরফে কবি অজয়। কবি কালিদাসের মর্যাদা তিনি আলবৎ দিতে পারবেন।

* * * * * *

তবে কল্পনায় অনেক কিছুই দেখা যায়, ভালও লাগে, মোহও আনে। কালিদাসের কালের মঞ্জুলিকা-মঞ্জরিণীর সাথে চৈত্র-জ্যোৎস্না রাতে—আহা! কিন্তু! প্রেক্ষাগৃহের রূপালী পর্দার গায়ে, 'আমার কালের বিনোদিনী'দের দিয়ে কি সেই মায়াজাল

গণ, যাঁরা রূপোর খাতিরে ও রূপালী পর্দার উপরে প্রকাশ্যে 'পাপের পথে' নামতে রাজী হচ্ছেন না?

* * * * * *

মর্জিনা তোফা নাচ দেখিয়ে অভিনেত্রী পদ পেয়েছিল, তার পরে আবার তৈলকূপে পড়ে গিয়ে হ'ল কুঙ্কুম। পথে পথে তাকে নেচে বেড়াতে হয়েছে। কিন্তু কোন্ এক দেশে ছিল—King Capatua, আর এদেশে ছিলেন মণিপুরের রাজা। পথের 'কুঙ্কুম' রাজনর্তকী হ'য়ে দেখা দিলো। এবার নিউ থিয়েটার্সে আবার তার কোনো নূতন অবস্থা দেখবো। Up and Down-এর পর্যায় অনুসারে এবার তার পদোন্নতির না পদাবনতির পালা?

দূরবীণ—

খেলাধুলা

কলিকাতা কর্পোরেশন প্রাথমিক স্কুল স্পোর্টস

কলিকাতা কর্পোরেশন আন্তঃপ্রাথমিক স্কুল স্পোর্টস বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অসময়ে স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে প্রায় চারি সহস্র বালক ও বালিকা যোগদান করে। প্রতিযোগিতার সকল বিভাগেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুভূত হয়। এই অনুষ্ঠান শেষ করিতে এক সপ্তাহের উপর সময় লাগে। প্রতিযোগিতার এক একটি বিষয় শত শত বালক ও বালিকা যোগদান করায় প্রত্যেক বিষয়ের জন্য বহু সংখ্যক হিট বা প্রাথমিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই সকল হিট বা প্রাথমিক প্রতিযোগিতা দ্রুত শেষ করিবার জন্য চারিটি বিভাগীয় বা জোন স্পোর্টসের



কলিকাতা কর্পোরেশন স্কুল স্পোর্টস। বালিকা বিভাগের দলগত চ্যাম্পিয়ান কর্ণফিল্ড স্কুলের ছাত্রীগণ।

ব্যবস্থা করিতে হয়। এই সকল বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় নিকটবর্তী স্কুলের ছাত্র ছাত্রীগণ যোগদান করে। বিভিন্ন বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় সাফল্যমণ্ডিত ছাত্র ছাত্রীগণকে লইয়া ফাইনাল বা শেষ মীমাংসার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই শেষ মীমাংসার প্রতিযোগিতায় দুই শতের অধিক বালক ও বালিকা যোগদান করে। এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ও কারিনীদের শীল্ড, কাপ প্রভৃতি উপহার দেওয়া হয়। বালক ও বালিকা উভয়ের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহার উপর বালক ও বালিকাদের বয়স ও উচ্চতা অনুযায়ী তিনটি বিভাগীয় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। বালক ও বালিকা উভয় বিভাগেই ব্যক্তিগত ও দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। বালিকাদের বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে জয়নন্দী মিস্ত্রি লেনের ছাত্রী কুমারী রোশেনারা খাতুন ও দলগত চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে কর্ণফিল্ড রোড স্কুলের ছাত্রীগণ। বালকদের বিভাগে কেহ ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয় নাই। তবে দলগত চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে মির্জাপুর স্ট্রীট স্কুলের ছাত্রগণ।

প্রতিযোগিতার বিষয় নির্বাচন

প্রতিযোগিতার বিষয় নির্বাচন সম্পর্কে এইটুকু বলা চলে যে, পরিচালকগণ মামুলী বিষয়গুলি বাদ দিয়া নূতন নূতন বিষয় প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। বালিকা বিভাগের পরিচ্ছদ পরিচর্যা প্রতিযোগিতাটি সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হইয়াছিল। একটি ছোট বালিকাকে চুল বাঁধিয়া, ফ্রক ও জুতা পরাইয়া দ্রুত লইয়া যাওয়ার মধ্যে যে কতখানি আনন্দ ও উৎসাহ অন্তর্নিহিত আছে, এই প্রতিযোগিতা অবলোকন করিয়া দর্শকগণ তাহা সকলেই অনুভব করিয়াছেন। ইহার পরেই বালিকাদের স্কিপিং রিলে উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ স্পোর্টসে স্কিপিং দৌড় হইয়া থাকে, কিন্তু এইরূপ রিলে প্রতিযোগিতা ইতিপূর্বে কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। একটি স্কিপিং দড়ি পর পর বালিকাদের মধ্যে হস্তান্তরিত হইবার মধ্যে বেশ একটুখানি উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহা ছাড়া বালকদের খরগোস দৌড়, বালিকাদের এক পায়ে দৌড়, বালকদের ৩০০ গজ পতাকা রিলে বেশ দর্শন-যোগ্য হইয়াছিল। আমরা আশা করি পরিচালকগণ এই বৎসরে প্রতিযোগিতার বিষয় নির্বাচনে যেরূপ অভিনবত্ব দেখাইয়াছেন আগামী বৎসরে ইহার ব্যতিক্রম করিবেন না।

প্রতিযোগিতা পরিচালনা

কর্পোরেশন আন্তঃপ্রাথমিক স্কুল স্পোর্টস পরিচালনা করেন সত্যানন্দ মেমোরিয়াল স্পোর্টস কমিটির সভ্যগণ। এই কমিটি পরলোকগত কর্পোরেশন প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষা সচিব ডাঃ সত্যানন্দ রায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে গঠিত হইয়াছে। এই কমিটি মাত্র ৫।৬ মাস হইল গঠিত হইয়াছে। এত অল্প সময়ের গঠিত কমিটির সভ্যগণ বিরাট স্পোর্টসের পরিচালনা যেভাবে করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয়। এই কমিটির সভ্যগণ সকলেই কলিকাতা কর্পোরেশন প্রাথমিক স্কুল বিভাগের কর্ম্মচারী অথবা শিক্ষক। সুযোগ ও সুবিধা পাইলে ইহাদের দ্বারা ছাত্র ছাত্রীদের উন্নতিকর অনেক কিছুই যে সম্ভব ইহা এই স্পোর্টস অনুষ্ঠান হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষগণকে ইহা উপলব্ধি করিয়া ইহাদের সকল কার্যে সাহায্য করিতে আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করি।

স্পোর্টস অনুষ্ঠানে অসুবিধা

সত্যানন্দ মেমোরিয়াল স্পোর্টস কমিটিকে কর্পোরেশন আন্তঃ-প্রাথমিক স্কুল স্পোর্টস অনুষ্ঠান করিতে অনেক বাধা ও অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কর্পোরেশনের সকল কাউন্সিলারদের সাহায্য ইহারা পান নাই। বহু হাটাহাটি, আবেদন নিবেদনের পর কতিপয় কাউন্সিলারের সাহায্যে কর্পোরেশন হইতে ইহারা মাত্র ২০০, টাকা স্পোর্টসের জন্য পাইয়াছিলেন। এই সামান্য টাকা ৪ হাজার ছাত্রছাত্রী যে স্পোর্টসে যোগদান করিয়াছিল তাহার পক্ষে কিছুই নহে, ইহা বলিলে কোনরূপ অন্যায় হইবে না। কর্পো-রেশনের কতিপয় ব্যায়াম উৎসাহী কাউন্সিলার, কর্মচারী, পরলোক-গত ডাঃ সত্যানন্দ রায় মহাশয়ের আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবগণের সাহায্য ব্যতীত ইঁহারা এই অনুষ্ঠান কোনরূপেই সম্পন্ন করিতে পারিতেন না। শোনা যায় এই সকলের সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও সত্যানন্দ মেমোরিয়াল স্পোর্টস কমিটিকে অনুষ্ঠানের জন্য দেনা-গ্রস্থ হইতে হইয়াছে। কিরূপে এই দেনা শোধ হইবে ইহা তাঁহারা এখনও স্থির করিতে পারেন নাই। কলিকাতা কর্পোরেশন যাহার বার্ষিক আয় কয়েক কোটি টাকা, তাহার সুনামের জন্য তাহার

পরিচালিত ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রীর উৎসাহের ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যে মহৎ কার্য অনুষ্ঠিত হইল এবং যাহারা সেই অনুষ্ঠান সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করিল তাহারা আজ দেনাগ্রস্থ, ইহা প্রকৃতই লজ্জার ও পরিতাপের বিষয়।

অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা

অনেকেই, বিশেষ করিয়া কর্পোরেশনের কাউন্সিলারগণ, সত্যানন্দ মেমোরিয়াল স্পোর্টস কমিটির পরিচালকগণের বর্তমান অবস্থা শুনিয়া বলিতে পারেন "এইরূপ অনুষ্ঠান না করিলেই পারিতেন।" ইহার উত্তরে আমরা বলিব এইরূপ অনুষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং সত্যানন্দ মেমোরিয়াল স্পোর্টস কমিটি শত বাধা শত বিঘ্ন সত্ত্বেও এই অনুষ্ঠান শেষ পর্যন্ত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা কলিকাতার করদাতাগণের, বিশেষ করিয়া ৪০ হাজার দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। প্রতি বৎসর সত্যানন্দ মেমোরিয়াল স্পোর্টস কমিটি এইরূপ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করুন ইহাই সকলে কামনা করেন।

জাতীয় জীবন নূতনভাবে যাঁহারা গঠনে ব্যস্ত তাঁহারা সকলেই জানেন পুস্তক পাঠের সহিত ব্যায়াম চর্চা করা ছাড়া পূর্ণ মানুষ তৈয়ারী করা যায় না। মানসিক ও শারীরিক উন্নতি মানুষের পূর্ণতা আনে। মানসিক উন্নতি হয় পুস্তক পাঠের দ্বারা আর শারীরিক উন্নতি হয় ব্যায়াম চর্চার দ্বারা। এইজন্যেই পৃথিবীর সকল স্বাধীন ও শক্তিশালী জাতির শিক্ষা প্রণালী বিশেষভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই পুস্তক পাঠের সহিত সমানভাবে ব্যায়াম চর্চার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ভারতবর্ষের শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত লোকেরা এই বিষয় কোন জ্ঞান রাখিতেন না। সম্প্রতি অর্থাৎ ৮।৯ বৎসর হইল তাঁহাদিগকে এই বিষয় দৃষ্টি দিতে দেখা যাইতেছে। ইহাদের প্রচেষ্টার ফলেই প্রত্যেক স্কুল ও কলেজে ব্যায়াম চর্চা, খেলাধূলা ও স্পোর্টসের উৎসাহ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে বাঙলা দেশে এমন একটি স্কুল বা কলেজ নাই যাহাতে স্পোর্টসের বা খেলাধূলার বিশেষ উৎসাহ বর্তমান নাই। অতি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে কলিকাতা কর্পোরেশন প্রাথমিক স্কুল বিভাগ এই বিষয় বিশেষ নিরুৎসাহী। স্বীকার করি ছাত্র ছাত্রীগণকে ব্যায়াম চর্চা বা খেলাধূলার বিভিন্ন কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য ট্রেনিং স্কুলে স্কুলের শিক্ষকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এমন কি প্রতি বৎসর এই ট্রেনিং স্কুলে বহু সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী এই বিষয় কিছু জ্ঞানলাভ করেন। কিন্তু তাঁহারা ছাত্র ছাত্রীগণকে শিক্ষা দেন কি না অথবা ছাত্র ছাত্রীগণ তাঁহাদের শিক্ষার সাহায্যে কতখানি উন্নতি করিয়াছেন তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কোনই ব্যবস্থা নাই। এই পরীক্ষার জন্যই প্রয়োজন আন্তঃ স্কুল স্পোর্টস বা ব্যায়াম প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা। সত্যানন্দ মেমোরিয়াল স্পোর্টস কমিটির সভ্যগণ এই অভাব দূর করিবার জন্যই অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা কোনরূপ অন্যায় করেন নাই। বরঞ্চ তাঁহারা এক মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড়গণের আচরণ

বিহার লন টেনিস এসোসিশেনের পরিচালিত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া কোনরূপ না জানাইয়া প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করায় বিহার লন টেনিস এসোসিয়েশন ভারতের বিশিষ্ট টেনিস খেলোয়াড় গউস মহম্মদ, ইফতিকার আমেদ, যুধিষ্ঠির সিং, সোহনলাল প্রভৃতির বিরুদ্ধে নিখিল ভারত টেনিস সঙ্ঘের নিকট অভিযোগ করেন। এই অভিযোগে বলা হয় যে, উক্ত খেলোয়াড়গণের আচরণ কোনরূপে সমর্থনযোগ্য নহে। তাঁহাদের শাস্তিস্বরূপ এই বৎসরের জন্য কোন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে দেওয়া হইবে না। নিখিল ভারত টেনিস সঙ্ঘ বিহার এসোসিয়েশনের অভিযোগক্রমে উক্ত খেলোয়াড়গণকে পরবর্তী প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে দেন না এবং অভিযোগের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করেন। এই অনুসন্ধান কমিটি তাঁহাদের কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। উক্ত খেলোয়াড়গণের অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত খেলোয়াড়গণ প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন যে, বিহার লন টেনিস এসোসিয়েশন কতকগুলি বাহিরের খেলোয়াড়ের থাকিবার ব্যবস্থা তাঁহাদের অপেক্ষা ভাল করায় তাঁহারা প্রতিবাদ স্বরূপ এইরূপ হঠাৎ প্রতিযোগিতা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। অনুসন্ধান কমিটি এই উক্তির সত্যতা বিষয় বিশেষ তদন্ত করিয়াছেন। এখনও পর্যন্ত তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করেন নাই। তবে যতদূর জানা যায় তাহাতে উক্ত খেলোয়াড়দের উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নহে। বিহার লন টেনিস এসোসিয়েশন ইচ্ছা করিয়া বিভিন্ন খেলোয়াড়দের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করেন নাই। দুই একজন খেলোয়াড়দের থাকার ব্যবস্থায় বৈষম্য দেখা গিয়াছিল, তাহা ঐ সকল খেলোয়াড়দের বন্ধুদের জন্য। বিহার লন টেনিস এসোসিয়েশন বাহিরের সকল খেলোয়াড়দের জন্য একইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অনুসন্ধান কমিটি তাঁহাদের তদন্তের ফলাফল সমস্তই নিখিল ভারত লন টেনিস সঙ্ঘের নিকট জানাইয়া দিয়াছেন। নিখিল ভারত লন টেনিস এসোসিয়েশন সেই সকল বিবেচনা করিয়া চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিবার পূর্বে খেলোয়াড়গণের আচরণ সম্পর্কে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক এসোসিয়েশনের মতামত গ্রহণ করিতেছেন। এই পর্যন্ত মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি প্রদেশের এসোসিয়েশনের অভিমত টেনিস সঙ্ঘের হস্তগত হইয়াছে। ঐ সকল এসোসিয়েশন সকলেই একবাক্যে খেলোয়াড়গণের আচরণের নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে উক্ত খেলোয়াড়গণের নিখিল ভারত টেনিস সঙ্ঘ, বিহার লন টেনিস এসোসিয়েশন, এমন কি শ্রীযুত পি আর দাশের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। এই সকল মতামতের ফলাফল শীঘ্রই জানিতে পারা যাইবে। ভারতের বিশিষ্ট খেলোয়াড় বলিয়া উক্ত খেলোয়াড়গণ রেহাই পাইবেন বলিয়া মনে হয় না। খেলা বন্ধ আছে, ইহার উপর ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইলে খেলোয়াড়গণ বিশেষ শিক্ষা পাইবেন এবং ভবিষ্যতে এইরূপ আচরণ আর করিবেন না।

সমর বার্তা

২রা এপ্রিল।—

গতকল্য বৃটিশ বাহিনী এরিত্রিয়ার রাজধানী আসমারা অধিকার করিয়াছে।

ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ সাবমেরিনের আক্রমণে একটি ইতালীয়ান ইউবোট ও একটি ইতালীয়ান তৈলবাহী জাহাজ 'লরা করাডো' (৩৬৪৫ টন) জলমগ্ন হইয়াছে।

আমেরিকার বন্দরগুলিতে ধৃত এক্সিস জাহাজগুলি ছাড়িয়া দিবার জন্য জার্মানি ও ইতালি যে দাবী জানাইয়াছে, মার্কিন গভর্নমেণ্ট তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

রোমে এক ভোজসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে জাপ পররাষ্ট্রসচিব মিঃ মাৎসুওকা বলেন যে, জাপান ও ইতালি প্রাচীন বন্ধুত্বের বন্ধনে পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ। এই বন্ধুত্ব চিরকাল অবিচলিত থাকিবে।

বৃটেনের দেশরক্ষা বাহিনী পরিচালক জেনারেল স্যার এলেন ব্রুক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "জার্মানি কর্তৃক বৃটেন আক্রমণের আশঙ্কা দূর হয় নাই। যদি আক্রমণ হয়ই তবে কেবল পদাতিক বাহিনীই আক্রমণ চালাইবে না, সাঁজোয়া বাহিনীও আক্রমণ চালাইবে। এই বাহিনীর গতিরোধ করা সহজসাধ্য হইবে না।"

৩রা এপ্রিল।—

জার্মন ও ইতালীয় বাহিনী পূর্ব লিবিয়ার বন্দর বেনগাজী পুনরধিকার করে। বৃটিশ সৈন্যেরা বেনগাজীর প্রায় ৮০ মাইল দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছে। প্রতিপক্ষের সাঁজোয়া বাহিনী বৃটিশ সৈন্যগণকে অনুসরণ করে।

বেলগ্রেডের সংবাদে প্রকাশ, যুগোশ্লাভিয়া ও জার্মানির মধ্যে যুদ্ধ নিবারণের জন্য মুসোলিনীর শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

মার্কিন গভর্নমেণ্ট স্থানীয় ইতালীয়ান দূতাবাসের নৌবিষয়ের উপদেষ্টা এডমিরাল এলবার্টো লাইসকে অবিলম্বে ওয়াশিংটন ত্যাগের নির্দেশ দিবার দাবী জানাইয়া ইতালীয়ান রাষ্ট্রদূতের নিকট এক নোট প্রেরণ করিয়াছেন। এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, এডমিরাল লাইস আমেরিকার বন্দরস্থিত ইতালীয়ান জাহাজসমূহের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

বৃটিশ বিমানবহরের আক্রমণে আরও দুইটি ইতালীয়ান ডেস্ট্রয়ার জলমগ্ন হইয়াছে। উভয় ডেস্ট্রয়ারই সম্প্রতি মাসাওয়া ত্যাগ করিয়াছিল।

৪ঠা এপ্রিল।—

বেলগ্রেডকে উন্মুক্ত শহর বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। বেলগ্রেড ছাড়া জাগ্রেব ও লুবলানা নামক অন্য দুইটি যুগোশ্লাভ শহরকে উন্মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। যুগোশ্লাভিয়ার সহকারী প্রধান মন্ত্রী ডাঃ ম্যাচেক যুগোস্লাভ সেনাদলকে সর্বতোভাবে প্রস্তুত থাকিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন।

৫ই এপ্রিল।—

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাহিনী আবিসিনিয়ার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ আদোয়া শহর দখল করিয়াছে।

জার্মানি ও যুগোস্লাভিয়ার কূটনীতিক সম্পর্ক কার্যত ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডনের একটি অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঋণ ও ইজারা দান পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৫ হাজার বিমান, পাঁচ হাজার ট্যাঙ্ক এবং ৩৩০টি বাণিজ্য জাহাজ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৬ই এপ্রিল।—

জার্মন বাহিনী যুগোশ্লাভিয়া ও গ্রীস আক্রমণ করিয়াছে। থ্রেস ও পূর্ব মেসিডোনিয়ার সীমান্তে অবস্থিত গ্রীক বাহিনীর উপর জার্মন বাহিনী আক্রমণ চালায়। জার্মন বোমারু বিমানসমূহ যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড ও অন্যান্য স্থানের উপর ব্যাপক বিমান আক্রমণ চালায়। জার্মনরা এই দাবী করিতেছে যে, যুগোশ্লাভিয়ার উপর প্রথম বিমান আক্রমণের সময় আকাশযুদ্ধে প্রতিপক্ষীয় ২৪টি বিমানকে গুলীবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করা হয়। ভূমির উপর ৩৯টি বিমান ধ্বংস হয়। জার্মন বোমারু বিমানের আক্রমণে বেলগ্রেডের বহু স্থানে অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। বেলগ্রেডের সহিত বহির্জগতের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়াছে।

যুগোশ্লাভিয়া অভিযান সম্পর্কে জার্মানির ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, 'শান্তি ও শৃঙ্খলা' পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জার্মন বাহিনী যুগোশ্লাভিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। এথেন্সস্থিত জার্মন রাষ্ট্রদূত অদ্য প্রাতে গ্রীক প্রধান মন্ত্রী মঃ করিজিসের নিকট এক নোট অর্পণ করেন। নোটে বলা হয় যে, বৃটিশ বাহিনীকে গ্রীক এলাকা হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য জার্মন বাহিনী গ্রীসে প্রবেশ করিয়াছে। উত্তরে মঃ করিজিস জানান যে, গ্রীস জার্মন আক্রমণে বাধা দিবে।

ইতালি জার্মানির সহযোগিতায় যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বৃটিশ রাজকীয় বাহিনী আবিসিনিয়ার রাজধানী আদ্দিসআবাবায় প্রবেশ করিয়াছে।

যুগোশ্লাভিয়া ও রুশিয়ার মধ্যে এক মৈত্রী ও অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

৭ই এপ্রিল।—

বিনা প্রতিরোধে আবিসিনিয়ার রাজধানী আদ্দিসআবাবার পতন হইয়াছে।

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ যে, জার্মন বাহিনী গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়া উভয় দেশের সীমান্তে ২০—২৫ মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। বেলগ্রেডের উপর বিমান আক্রমণের ফলে যুগোশ্লাভিয়ার পূর্তসচিব মঃ কুলোভেটস নিহত হইয়াছেন।

বৃটিশ, অস্ট্রেলিয়ান ও নিউজীল্যাণ্ড সৈন্যদের এক বাহিনী ইতিপূর্বেই গ্রীসে অবতরণ করিয়াছে। উপরন্তু বৃটিশ বিমানবহরের শক্তিও যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

রোমে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইতালি ও জার্মানি রাত্রি ৮টা হইতে ভোর ৭টা পর্যন্ত বহির্জগতের সহিত কোন সংযোগ রক্ষা করিবে না।

এথেন্সে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জার্মন বিমান গ্রীসে শহর ও গ্রামের উপর ব্যাপকভাবে হানা দেয়।

৮ই এপ্রিল।—

যুগোশ্লাভ গভর্নমেণ্ট বেলগ্রেড হইতে অজ্ঞাতস্থানে গমন করিয়াছেন। প্রকাশ, গত দুইদিন বেলগ্রেডে বিমান হানায় শত শত লোক নিহত হইয়াছে।

লস এঞ্জেলসের সংবাদে প্রকাশ যে, স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুতে দশ লক্ষাধিক লোক ম্যাসিডোনিয়া ও থ্রেস ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

উত্তর আলবেনিয়ায় যুগোশ্লাভ বাহিনী ইতালীয় বাহিনীর উপর দারুণ চাপ দিতেছে। উহারা স্কুটারী ও জারা দখল করিয়াছে।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, বিপক্ষ পক্ষের গুরুতর চাপে সার্বিয়ার যুগোশ্লাভ বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতেছে। গ্রীকেরা শত্রুপক্ষকে প্রতিপদে বাধা দিতেছে।

গতকল্য রাত্রে লণ্ডন হইতে স্কটল্যাণ্ড পর্যন্ত ব্যাপক বিমান আক্রমণ হয়। আক্রমণের ব্যাপকতার তুলনায় বেশি লোক হতাহত হয় নাই।

ইতালীয়েরা লিবিয়ার দর্নায় পৌঁছিয়াছে বলিয়া দাবী

বৈজ্ঞানিকগণ

সাপ্তাহিক সংবাদ

২রা এপ্রিল।—

"দৈনিক বসুমতী"র উপর বাঙলা সরকারের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে অদ্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিরোধী দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এক মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। দুই ঘণ্টাকাল তুমুল বিতর্কের পর উক্ত মুলতুবী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডনকে এলাহাবাদে ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়।

ঢাকায় মৌলবীবাজারে চারিজনকে ছুরিকাঘাত করা হয়। উহাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক কেরাণী ও অপর এক ব্যক্তি হাসপাতালে মারা যায়। ঢাকা দাঙ্গায় এ পর্যন্ত মোট ৩৪ জনের মৃত্যু হইল।

বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় কলিকাতা কর্পোরেশন কলিকাতা শহরে যে দুই হাজার পাঁচশত নলকূপ বসাইবার পরিকল্পনা করিয়াছেন; ভারত সরকার উহার সমগ্র ব্যয়ভার ১৬,০০,০০০৲ টাকা বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

৩রা এপ্রিল।—

নারায়ণগঞ্জ মহকুমার রায়পুর থানার কয়েকটি গ্রামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। কতকগুলি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠন করা হয়। ঢাকার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ হ্যাচবার্ণওয়েল ঘটনাস্থলে গমন করিলে দাঙ্গাকারীদের হস্তে গুরুতরভাবে আহত হন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লকের বিশিষ্ট সদস্যা শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবীকে আপত্তিকর ইস্তাহার প্রকাশ করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহার উপর ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত হাজতবাসের আদেশ হয়।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার চ্যাটার্জির উপর কলিকাতা ও শহরতলীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারী করা হয়।

কলিকাতা হাইকোর্ট শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী এম এল এ'র মামলার আপীল ডিসমিস করিয়া দিয়াছেন।

হাঙ্গারীর প্রধান মন্ত্রী কাউণ্ট তেলেকী আত্মহত্যা করিয়াছেন।

বিখ্যাত ইংরেজ লেখিকা মিসেস ভার্জিনিয়া উল্ফ উজ নদীতে জলমগ্ন হইয়া মারা গিয়াছেন বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

৪ঠা এপ্রিল।—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ২৪টি বেসরকারী বিল উত্থাপিত হয়। তন্মধ্যে ১৫টি বিল জনমত সংগ্রহার্থ প্রচার করা হয়। কংগ্রেসী দলের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস হিন্দুদের বিবাহে পণপ্রথা নিয়ন্ত্রণকল্পে একটি বিল উপস্থিত করেন। গভর্নমেন্টের প্রস্তাবক্রমে উহা জনমত সংগ্রহার্থ পুনরায় প্রচারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চট্টগ্রাম হইতে ১৫০ জন সশস্ত্র পুলিশ ঢাকায় প্রেরণ করা হইয়াছে।

নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত খানাপাড়ায় দাঙ্গার ফলে বহু ব্যক্তি তাহাদের বাড়ি অগ্নিতে ভস্মীভূত হওয়ায় গৃহহীন হইয়াছে। এই সব গৃহহীন ব্যক্তিদের কয়েকজন নারায়ণগঞ্জ গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। মৈর্শণ্ডি হইতে ইতস্তত আক্রমণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ইরাকে আকস্মিকভাবে নূতন শাসকমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইরাকের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী রসিদ আলির নেতৃত্বে একদল মন্ত্রী বাগদাদে শাসনক্ষমতা অধিকার কর[illegible]

[illegible]হাঙ্গারীর রিজেণ্ট এডমিরাল হর্থি [illegible]।

মন্ত্রীরূপে মনোনীত করিয়াছেন। মঃ বার্দোসি ঐ পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

৫ই এপ্রিল।—

কিশোরগঞ্জের সংবাদে প্রকাশ, রায়পুরা থানার অন্তর্গত গ্রামসমূহে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় নরসিংদি ও বৈদ্যবাজারের (ঢাকা জেলা) বাজারসমূহ পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভৈরববাজারের দিকে দাঙ্গা প্রসারলাভ করিতেছে, এই সংবাদ পাইয়া ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ ভৈরব যাত্রা করিয়াছেন। ঢাকা জেলার গ্রামসমূহ হইতে বহু হিন্দু আশ্রয়প্রার্থী আগরতলায় গিয়া পৌঁছিয়াছে।

৬ই এপ্রিল।—

ঢাকার দাঙ্গায় দুই ব্যক্তি নিহত ও তিনজন আহত হয়।

নারায়ণগঞ্জ মহকুমার রায়পুরা এবং শিবপুর থানার অঞ্চলে একদল পুলিশ দাঙ্গাকারিগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। ফলে তিনজন কনেষ্টবল আহত হয়।

ঢাকার গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গা সম্পর্কে এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ঢাকা জিলার নরসিংদি, রায়পুরা এবং শিবপুর থানাগুলির পরিস্থিতি বিশেষ উদ্বেগের সঞ্চার করিয়াছে। পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল বিমানযোগে ঢাকায় গমন করেন এবং উপদ্রুত অঞ্চলগুলি পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি জানাইয়াছেন যে, দুইখানি বড় গ্রাম এবং কয়েকটি পাড়া ভস্মীভূত হইয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুযায়ী কলিকাতা ও বিভিন্ন স্থানে জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিবসের অনুষ্ঠান হয়।

৭ই এপ্রিল।—

ঢাকায় ইতস্তত আক্রমণের ফলে ছোরার আঘাতে দুইজন নিহত হইয়াছে। এই লইয়া ঢাকা শহরের দাঙ্গায় এ পর্যন্ত মোট ৩৯ জন নিহত হইল। দাঙ্গা সম্পর্কে এ পর্যন্ত ৪৮১ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ঢাকা জেলার রায়পুরা থানার দাঙ্গাবিধ্বস্ত পল্লীসমূহ হইতে এ পর্যন্ত নয় হাজার নিরাশ্রয় ব্যক্তি আগরতলায় পৌঁছিয়াছে এবং অনুমান সাতশত লোক কুমিল্লায় পৌঁছিয়াছে। আগরতলায় সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সরকারী গৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং আশ্রয়প্রার্থীদিগকে স্থান দিবার জন্য ত্রিপুরা দরবার কতিপয় অস্থায়ী আবাস নির্মাণ করিতেছেন।

দিল্লীতে সপ্রু-বড়লাট সাক্ষাৎকার হয়।

৮ই এপ্রিল।—

ঢাকার দাঙ্গায় মোট আটজন হতাহত হয়। তন্মধ্যে তিনজনের মৃত্যু হইয়াছে। ঢাকায় পিটুনী পুলিশ রাখা হইবে বলিয়া গভর্নমেন্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। লৌহজঙ্গ (ঢাকা) হইতে প্রাপ্ত একটি প্রাইভেট টেলিগ্রামে জানা গিয়াছে যে, ভাগ্যকুলে একটি পাটের গুদামে আগুন লাগাইয়া উহা সম্পূর্ণরূপে ভস্মসাৎ করা হইয়াছে। উক্ত অঞ্চলের টেলিগ্রাফ তারও কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ঢাকা জেলায় নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত রায়পুরা ও শিবপুর থানায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার্থ বাঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত এক মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। দুই ঘণ্টা বিতর্কের পর মুলতুবী প্রস্তাব আলোচনামাত্রে পর্যবসিত হয়।

৮ই এপ্রিল।—

বাঙলার ভূতপূর্ব মন্ত্রী মৌলবী নৌসের আলী, পরিষদ সদস্য মৌলবী আবদল ওয়াহেদ বোকাইনগরী ও অপর একজন প্রজানেতা মিঃ উয়ালিউর রহমানকে বসিরহাটে আপত্তিকর বক্তৃতাদানের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

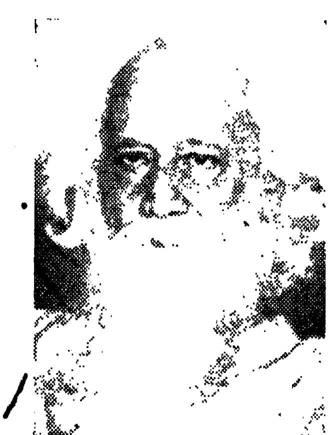
দেশ

৮ম বর্ষ] ৬ই বৈশাখ, শনিবার, ১৩৪৮ সাল। Saturday, 19th April, 1941. [২৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কবির বাণী—

নববর্ষের প্রারম্ভে কবিগুরুর পদাম্বুজ আমরা বন্দনা করিতেছি। গত ১৪ই এপ্রিল, সোমবার শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে তিনি যে অভিভাষণ দিয়াছেন, বিদেশী শাসনের মোহ ভাঙ্গিয়া জাতিকে আত্মচৈতন্যে উদ্বুদ্ধ করিবার মহামন্ত্রস্বরূপে সেই বীর্যময়ী এবং বেদনাময়ী বাণী চিরদিন স্মরণীয় হইয়া



থাকিবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরেজী সাহিত্য এবং সেই সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইংরেজ চরিত্রের উদারতা ও সততা কেমন করিয়া তাঁহার চিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ তাহা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে সে বিশ্বাস তাঁহার ক্ষুণ্ণ হয়। কবি বলিয়াছেন—'সে গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তারপর থেকে ছেদ্ আরম্ভ হোলো কঠিন দুঃখে। প্রত্যহ দেখতে পেলুম, সভ্যতাকে যাঁরা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিত-রূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তাঁরা তাকে কী অনায়াসে লংঘন করতে পারে।'

কঠিন বাস্তবের আঘাতে কবির সম্মুখে উন্মুক্ত হইল পরে ইংরেজ শাসনের স্বরূপ। কবি দেখিলেন,—'এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে;' কিন্তু এদেশের অবস্থা কি?' 'সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হোলো তা হৃদয়বিদারক। অন্ন, বস্ত্র, পানীয়, শিক্ষা, আরোগ্য মানুষের শরীর, মনে যা কিছু অত্যাবশ্যক, তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসনচালিত কোনো দেশেই ঘটে নি।' কিন্তু কেবল ইহাই সব নহে। কবি নিরতিশয় দুঃখভরে বলিয়াছেন—"সভ্য-শাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে, সে কেবল অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়, সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদের সমাজকেই একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে. সে যদি ভারত শাসন-যন্ত্রের ঊর্ধ্বস্তরে কোনো এক গোপন-কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হোত, তাহ'লে কখনই ভারত ইতিহাসের এত বড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না।"

দেড় শত বৎসরের অধিককাল ইংরেজ শাসনের ফলে দেশের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, কবির কণ্ঠেই শুনুন। তিনি বলিতেছেন—"ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে?"

এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব; আসুক, সেইদিনই

আসুক, যেদিন অন্তত আমরা নিজেদের দেশের সমস্যা নিজেরা সমাধান করিবার অনপেক্ষ অধিকার পাইব। পরম উদার ইংরেজ শাসকদের উদারতার অন্ত নাই। চেষ্টা তাঁহারা দেড় শতাধিক বৎসর ধরিয়া কম করিলেন না। আমরা আর তাঁহাদিগকে কষ্ট দিতে চাই না আমাদের জন্য। কবির বাণী সেই দিনেও আমাদিগের বুকে ভরসা জোগাইবে। কবি বলিয়াছেন—'দেখে এসেছি, পারস্য দেশ, একদিন দুই য়ুরোপীয় জাতির জাঁতার চাপে পিষ্ট হচ্ছিল, তখন সেই নির্মম আক্রমণের য়ুরোপীয় দংষ্ট্রাঘাত থেকে আপনাকে মুক্ত ক'রে কেমন ক'রে এই নবজাগ্রত জাতি আত্মশক্তির পূর্ণতা-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। তার সৌভাগ্যের প্রধান কারণ এই যে, সে য়ুরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল থেকে মুক্ত হ'তে পেরেছিল'। 'আমাদের প্রতিবেশী আফগানিস্থানের মধ্যে শিক্ষা এবং সমাজ নীতির সেই সর্বজনীন উৎকর্ষ যদিচ এখনো ঘটে নি, কিন্তু তার সম্ভাবনা অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তার একমাত্র কারণ, সভ্যতাগর্বিত কোনো য়ুরোপীয় জাতি তাকে আজও অভিভূত করতে পারে নি। এরা দেখতে দেখতে চারদিকে উন্নতির পথে মুক্তির হলে অগ্রসর হো'তে চলল।"

ভারত যদি স্বাধীনতা পায়, তাহা হইলে লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনা হইতে মুক্ত হইয়া সেও নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। কবির মত আমরাও আশা করে আছি, 'পরিত্রাণ কর্তার জন্মদিন আসছে, আমাদের এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই।' সেই আশা অন্তরে একান্ত করিয়া বলিব, হে সভ্যতাগর্বী ইউরোপ, আমাদিগকে তোমাদের বিভ্রমময় ধাত্রীত্বের বাহুপাশ হইতে মুক্তি দাও, আমরা সেই দেবতার উদ্বোধন করি, অনন্ত দুঃখ এবং দৈন্যকে অর্ঘ্যোপচার দিয়া। তোমাদিগকে প্রণাম, শতবার প্রণাম যে, এই অর্ঘ্যোপচার আমাদিগকে দিয়াছ। তোমাদের কাজ শেষ হইয়াছে, আর কেন?

ছাত্রসমাজের বিদ্রোহের ভাব—

নিখিল বঙ্গ কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীযুত বিমলচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দেশের ছাত্র আন্দোলন সম্বন্ধে একটি কথা বলেন, যেটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, রাজনীতিক্ষেত্রে ছেলেদের যোগদানের মধ্যে একটা উদারতার ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ডাক্তার ঘোষ মহাশয় ছাত্রদের রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদানের মধ্যে তাহাদের মনের যে উদারতার পরিচয় পাইয়াছেন, দুঃখের বিষয় তাহাই অনেকে আশঙ্কাগ্রস্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন এবং সেই বিদ্রোহ দমনে বজ্র উদ্যত করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। ডাক্তার ঘোষ এ সম্বন্ধে বলেন, ছেলেদের মধ্যে এই যে বিদ্রোহের ভাব, ইহা সব সময় নিন্দনীয় নয়। যদি উপযুক্তভাবে ইহা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে ইহার সাহায্যে দেশের উন্নতি হইতে পারে। 'বিদ্রোহ দীর্ঘজীবী হউক' ছেলেদের এই ধ্বনিতে ইহাই বুঝায় যে, বর্তমানে যে সব বিধি ব্যবস্থা শোষনমূলক, তাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতেছে এবং পোষণ-নীতি স্থায়ী করিবার চেষ্টায় আছে যে সব প্রতিষ্ঠান, তাহারা সেগুলির প্রতিবাদী। ছেলেদের এই স্বাধীন চিন্তাকে পিষ্ট করিবার জন্য এদেশে কথায় কথায় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপিত হইয়া থাকে এবং ছেলেদের জন্য হক না হক দণ্ডের ব্যবস্থা হয়। ডাক্তার ঘোষের মতে এইসব দণ্ডবিধান করিবার ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং অধ্যাপকদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, দণ্ড যেন পীড়নমূলক না হয়। তিনি বলেন, ইউরোপের ছেলেরা ভারতবর্ষের ছেলেদের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে অধিক সুবিধা এবং স্বাধীনতা পাইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আমাদের কথা আমরা অনেকবারই বলিয়াছি, ছাত্রেরা শিক্ষা পাইবার জন্যই বিদ্যালয় যায়, তাহাদের ভিতরে মনুষ্যত্ব যাহাতে বিকাশ লাভ করে, এমন কার্যে যোগদানে তাহাদের শিক্ষার সার্থকতাই সূচিত হইয়া থাকে। রাজনীতি কথা শুনিয়াই আঁৎকাইয়া উঠিবার কারণ নাই; দেশবাসীর দুঃখকষ্টের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক রহিয়াছে, সুতরাং দেশের লোকের দুঃখেকষ্টে যে উদার মনোবৃত্তি প্রকৃত শিক্ষার ফলে গঠিত হয়, রাজনীতির সহিত তাহার স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকিবেই। এদেশ পরাধীন, এই দেশেই ছেলেদের বেলায় এইসব প্রশ্ন উঠে। দেশের তরুণচিত্তকে রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিবার যে চেষ্টা দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে সংকীর্ণ সংস্কারান্ধ চিত্তের দৈন্যই তাহাতে সূচিত হইয়া থাকে।

শ্রীহট্ট ও বাঙলা—

সাম্রাজ্যবাদীদের রাজনীতিক চাতুরী বাঙালীর উপর যতটা আসিয়া পড়িয়াছে, ভারতের অন্য কোন প্রদেশেই তেমন হয় নাই। একদিকে শ্রীহট্ট ও কাছাড় এবং অন্যদিকে বিহারের সঙ্গে বাঙলার কতকটা জুড়িয়া দেওয়াই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুরমা উপত্যকা হিন্দু সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে শ্রীযুত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, শ্রীহট্ট অখণ্ড বঙ্গভূমির অচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভাষায়, ধর্মে, সমাজশৃঙ্খলায়, আচারে ব্যবহারে এবং সভ্যতা ও কৃষ্টির অন্তরাল শ্রীহট্ট এবং বাঙলা দেশ স্মরণাতীতকাল হইতে নিবিড় যোগসূত্রে বদ্ধ আছে। মধ্যযুগের বাঙলা দেশ ও শ্রীহট্টের সংস্কৃতিগত ও জাতিগত সাম্যের একটি গৌরবময় যোগসূত্র হইতেছে শ্রীচৈতন্যের আলোকসামান্য প্রতিভা। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাঙালী জাতি তার বিশিষ্টতা লাভ করিল। আপামর সাধারণকে যিনি কোল দিয়া তাহাদিগকে তাহাদের মনুষ্যত্বের অধিকার সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতৃপুরুষের বাসভূমির গৌরব শ্রীহট্ট চিরকাল দাবী করিবে। ভাষা জাতীয়তার প্রধান সূত্র। এই ভাষার দাবীতে শ্রীহট্টের বাঙলার সহিত মিলিত হইবার অধিকার ন্যায় বিচারের দরবারে অস্বীকৃত হইতে পারে না।

বঙ্গভূমি এই ভাষার দাবীতে এক এবং অখণ্ড। রাজনৈতিক চাতুরী এখন আসামের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদিগকে দাবাইয়া রাখিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আওতায় রাখিয়াছে। আসাম প্রদেশে বঙ্গভাষা ও বাঙালীর প্রতি অবিচার আমরা কিছুতেই সহ্য করিব না। আমরা ভারতবর্ষ নূতন করিয়া ভাষাগত প্রদেশে বিভক্ত হউক, শ্রীহট্ট যাহাতে বঙ্গমাতার ক্রোড়ে আবার ফিরিয়া আসিতে পারে, তাহার দাবী কখনই ছাড়িব না।' বিদেশীর দাগকাটা কৃত্রিম ভৌগোলিক ব্যবধানের জন্য আমরা ভয় করি না; বাঙালী যদি তাহার মাতৃভাষার সেবায় নিষ্ঠিত থাকে এবং সেই সূত্রে প্রাণের সম্পর্ক সুদৃঢ় করিতে পারে, তাহা হইলে রাজনীতিক চাতুরীর বজ্র আটুনী ফস্কা গেরোতে পরিণত হইতে বেশী দিন লাগিবে না।

বিপন্নকে রক্ষা—

নববর্ষের প্রারম্ভে দাঙ্গাহাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিপন্ন নরনারীর বেদনাই আজ বড় হইয়া উঠিয়াছে। বিপন্ন নরনারীর সাহায্য কার্যে বাঙলার ছাত্র সম্প্রদায় উদ্যোগী হইয়াছেন এবং বাঙলার কয়েকজন বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং শিক্ষক এই বিষয়ে তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতেছেন, ইহা সুখের বিষয়। বিপন্ন নরনারীকে সাহায্য করিবার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যে আবেদন প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে দেশবাসীর উপযুক্ত সাড়া মিলিবে বলিয়াই আমরা মনে করি। এই দারুণ দুর্দিনে যাহারা নিরাশ্রয় এবং সর্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহাদের দুঃখকষ্টে কাহার প্রাণ না বিগলিত হইবে! ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় এবং কুমিল্লায় যাহারা আপাতত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের অন্নবস্ত্র যোগাইতে হইবে এবং রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সাহায্য কার্যের বাবদ দৈনিক দেড় হাজার টাকা খরচ করিতে হইতেছে। সুতরাং অনেক টাকার দরকার। আমরা দেশবাসীর সকল সম্প্রদায়ের নিকট এই আবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা মুক্তহস্তে বিপন্ন নরনারীর সাহায্যে আজ অগ্রসর হউন। মানুষের সেবার চেয়ে বড় ধর্ম আর কিছু নাই। মনে রাখিবেন, আজ বিপন্নের ভিতর দিয়া ভগবানেরই আহ্বান আসিতেছে।

বিহারে বাঙালীদের সমস্যা—

সম্প্রতি মজঃফরপুরে বিহার বাঙালী সংঘের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ সেন যে সব কথা বলিয়াছেন, সমগ্র বাঙালী সমাজের পক্ষে তাহাতে অনুধাবন করিবার অনেক বিষয় রহিয়াছে। তিনি বলেন, "আজ বাঙলার ও বাঙলার বাহিরে প্রায় সর্বত্রই বাঙালীর আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ যেন সংকুচিত হয়ে আসছে। রাজা রামমোহনের সময় থেকে বর্তমান রবীন্দ্রনাথের যুগ পর্যন্ত বাঙালীর যে সংস্কৃতি ও যে প্রতিষ্ঠা গড়ে উঠেছিল, নানাদিক থেকে তার উপর আক্রমণের সূচনা দেখা দিয়েছে। বাঙালীকে সর্বপ্রকারে পংগু করে দেশের সমস্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান থেকে সরিয়ে রাখার জন্য একটা অশোভন অপচেষ্টার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। অতিশয় বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বাঙালীর সাহিত্য, বাঙালীর সংস্কৃতি, বাঙালীর কর্মপ্রচেষ্ঠা, বাঙালীর ত্যাগ, বাঙালীর দুঃখবরণ দ্বারা অর্জিত সামাজিক এবং রাষ্ট্রীক আবেষ্টনীর মধ্যে নিজেদের স্থান গ্রহণের সুযোগ লাভ করেছেন যাঁরা, তাঁরাই এখন সেই বাঙালীকে অপসারিত করবার মন্ত্রণা করছেন। প্রাদেশিকতার আবরণ ভেদ করার জন্য বাঙালীরা যা করেছে বা করতে প্রস্তুত আছে, তার মর্ম গ্রহণ করতে কেহই রাজী নন। প্রথমেই মনে হয়, আমাদের আচার্য জগদীশচন্দ্রের দানের কথা। তিনি যে একটি লক্ষ টাকা রাজেন্দ্রবাবুর হাতে দিয়ে গেলেন, সে ত শুনেছি আন্ত-প্রাদেশিক মৈত্রী স্থাপনের জন্যই, রাজেন্দ্রবাবু তার জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন জানি না, অথচ জানার কৌতুহলও দমন করতে পারছি না। আন্ত-প্রাদেশিক মৈত্রীর জন্য বাঙালী হাত বার ক'রেই রয়েছে। কিন্তু ঐ প্রসারিত হস্তের দিকে আর কোন দিক থেকে একটি আঙুলও অগ্রসর হচ্ছে না। আবার বলা হয় যে আমরা নাকি স্বজাতি বাৎসল্যে অন্ধ। নিন্দা যেখানে মুখ্য, যুক্তি সেখানে অন্তর্হিত; এই ধরুন, কাটিহার-কলিকাতাগামী ট্রেনগুলি বোঝাই হয়ে কত লক্ষ বেকার অ-বাঙালী যে বাঙলা দেশে গিয়ে অর্থোপার্জন করে আসছে এবং এসে স্থানীয় প্রভুদের সুখ-সমৃদ্ধির সুবিধা করে দিচ্ছে, তা বলতে গেলে মিষ্টি শোনাবে না। কিন্তু এখানকার কোনও একটি সরকারী অফিসে সামান্য একটি কেরানীর পদের জন্য প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালে বাঙালী যুবকের লাঞ্ছনার অবধি থাকে না।" বাঙালী প্রাদেশিকতা চায় না, অখণ্ড ভারতের জাতীয়তার বোধই বাঙালীর সংস্কৃতিতে বিধৃত, শ্রীযুত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ মহাশয়ও সে কথা বলিয়াছেন; ভারতের অতীত ইতিহাস তাহার প্রমাণ, তাহার প্রমাণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের সকল প্রাদেশিক ভাষাকে স্বীকৃতি। যাঁহারা বাঙলা ভাষা এবং বাঙালীর সংস্কৃতিকে দাবাইয়া রাখিতে চাহেন, তাঁহারা ভারতের জতীয়তারই যে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন, এই সত্যটি সোজাসুজি তাহাদের পক্ষে স্বীকার করিবার সময় আসিয়াছে।

বাঙলার জনস্বাস্থ্য সমস্যা—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক লাইসেন্সিয়েট চিকিৎসক সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র রায়। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলেন—'বর্তমান আদমসুমারীতে বাঙলা দেশের লোকসংখ্যা ছয় কোটিরও অধিক হইয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থানুযায়ী বাঙলার প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া হেল্‌থ অফিসার, প্রত্যেক থানায় একজন করিয়া স্বাস্থ্য পরিদর্শক, একজন হেল্‌থ এসিষ্ট্যান্ট ও একজন টীকাদার আছেন। ইঁহাদিগকে ১৭০ খানি গ্রামের প্রায় ৬০ হাজার লোকের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহার উপর কোন মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইলে, পল্লীবাসীর অবস্থা

কিরূপে শোচনীয় হইয়া উঠে, ইহা সহজেই অনুমেয়।' বাঙলা দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্যের বিধানের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কতটা, এই বিষয়ে কিছু না বলাই বোধ হয় ভাল, কারণ এ দেশের লোকে পোকামাকড়ের মত মরে এবং বাধ্য হইয়াই মরে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মরে অতি সহজ প্রতিষেধযোগ্য ব্যাধিতে; এজন্য মরণকে দোষ দেওয়া যায় না। গ্রীষ্মের এই প্রচণ্ড উত্তাপে বাঙলার পল্লী অঞ্চলসমূহে পানীয় জলের সুব্যবস্থা অতি কম জায়গাতেই আছে, দেখিয়া শুনিয়া লোকে যদি কাদা জল খায়, তাহা হইলে ব্যারামের দোষ কি? কিন্তু উপায় নাই, শিক্ষার অভাব তো আছেই; কিন্তু শিক্ষার অভাবই যে এসব ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যহানির কারণ, তাহা নয়। স্বাস্থ্যহানি হইবে, ইহা জানিয়া শুনিয়াও অনেক ক্ষেত্রে দেশের লোককে অনন্যোপায় হইয়া তেমন কাজ করিতে হয়—কিন্তু সরকারের চিরন্তন কৈফিয়ৎ আছে—টাকার অভাব; সুতরাং জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা যে এদেশে হইবে না, ইহাই বোধ হয় বিধিলিপি।

হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা—

মিঃ এম ইউনাস বিহারের কংগ্রেসী গভর্নমেণ্টের কিছুদিন মন্ত্রী ছিলেন। তিনি মেল-মিলাপ সম্মেলনের সভাপতিরূপে হাজারীবাগে সম্প্রতি যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে পাকিস্থানওয়ালাদের চক্ষুতে জ্ঞানাঞ্জন শলাকার কাজ করিবে। তিনি বলেন, হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্যই ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথে বাধা, এরূপ কথা আজকাল একটা ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই বিশাল দেশের জনসাধারণের উপর বৈদেশিক আধিপত্য যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনের পথে অন্তরায়, এই কথাই কি অধিক সত্য নহে? যতদিন বৈদেশিক আধিপত্য থাকিবে, ততদিন হিন্দু-মুসলমানের ভিতর বিরোধ সৃষ্টির কারণের অভাব হইবে না। সমস্যা তো এইখানে। মিঃ ইউনাস খুব জোরের সঙ্গেই বলিয়াছেন যে, ভারতে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ বলিয়া প্রকৃতপক্ষে কিছুই নাই। আসল ব্যাপার হইল এই যে, কতকগুলি লোক নিজেদের নেতাগিরি বজায় রাখিবার জন্য নিজেদের সম্প্রদায়ের জনসাধারণের অজ্ঞতাকে ভাঙ্গাইয়া খাইবার ব্যবস্থা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ইঁহারা যদি কোথায়ও পাত্তা না পায়, তবে কোন সমস্যাই থাকে না। ইহাদের পাপ-ব্যবসার স্বরূপ আর কতদিন কারসাজীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিবে, বিড়ম্বিত এবং বঞ্চিত জনসাধারণ কি বাস্তবের আঘাতে জাগিবে না?

রুষ-জাপান সন্ধি—

জাপানের পররাষ্ট্রসচিব মিঃ মাৎসুওকার মস্কো, বার্লিন এবং ইতালি পরিভ্রমণের ফলস্বরূপে রুষ-জাপান চুক্তি দেখা দিয়াছে। চুক্তির সর্ত হইল এই যে, চুক্তিবদ্ধ দুই শক্তির কোন শক্তি যদি এক বা ততোধিক তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সামরিকভাবে আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে চুক্তিবদ্ধ দুই শক্তির অপর শক্তি সেই সংগ্রামে নিরপেক্ষ থাকিবে। নূতনত্ব বিশেষ কিছুই নাই। রুষিয়া বর্তমান যুদ্ধে নিরপেক্ষ আছেই, বিশেষত্বের মধ্যে সুস্পষ্ট এই যে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরভাগে কিংবা এসিয়ার পূর্বাংশে জাপান যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে রুষিয়া সেই যুদ্ধে যোগ দিবে না। আন্তর্জাতিক রাজনীতির দিক হইতে ইহার স্পষ্টতর অর্থ এই যে, ইংরেজ এবং আমেরিকার সঙ্গে জাপানের যদি লড়াই বাধে, তাহা হইলে রুষিয়া ইংরেজ বা আমেরিকার পক্ষে যোগ দিবে না। জাপানের প্রধান মন্ত্রী বারংবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, জার্মানি ও ইতালির সঙ্গে তাঁহাদের মৈত্রী একেবারে পাকাপাকি। হিটলার এবং মুসোলিনীর সঙ্গে তিনি পরামর্শ করিয়া এই চুক্তি নিষ্পন্ন করাতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব এসিয়ায় নূতন বিধান প্রবর্তনের পরিকল্পনা লইয়া জাপান এখনও ঘুরিতেছে। দক্ষিণ দিকে এই পরিকল্পনা প্রসারিত করিতে গেলে রুষিয়া যাহাতে বিরুদ্ধ পক্ষে যোগ দিয়া তাহাকে বিপন্ন না করিতে পারে, এই দিকটা সে পরিষ্কার করিয়া লইল। রুষিয়ার দিক হইতে এই চুক্তির গূঢ়ার্থ এই যে, পূর্ব এসিয়ায় লড়াই প্রসারিত হওয়াতে আপত্তি তাহার কিছুই নাই। ইংরেজ এবং আমেরিকার নীতি হইল পূর্ব এসিয়ার অবস্থা যেমন আছে তেমন রাখা, আর জাপানের নীতি হইল পূর্ব এসিয়ায় নিজের অধিকার সম্প্রসারণ করা, রুষিয়া এই দুই দলের কোন দলেই নহে; দুই দলের সম্পর্কেই সে নিরপেক্ষ থাকিবে। নিজের স্বার্থকে নিরাপদ রাখাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার স্বার্থকে ক্ষুন্ন না করিয়া যদি কোন শক্তি তাহার সঙ্গে নিরপেক্ষতার সহিত কার্য করিতে চায়, সে রাজী আছে। সে শুধু নিজের সীমান্ত হইতে লড়াই দূরে রাখিবে এবং যুদ্ধের ভিতর দিয়া কৌশলক্রমে নিজের সুবিধা যতটা পারে করিয়া লইবে এবং সে ইহা জানে যে, সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীদিগকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়া তাহার নিরাপত্তাই সুনিশ্চিত করিবে। জাপানের সঙ্গে রুষিয়ার নিরপেক্ষতার এই চুক্তি পরোক্ষভাবে প্রশান্ত মহাসাগরতটে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্ঘাতের পথই মুক্ত করিয়া দিতেছে।

হিন্দুর নববর্ষ—

কালীঘাট নববর্ষের উৎসব সভায় ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন,—"কেন হিন্দু সমাজ শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে? কেন সমাজের এক অংগে আঘাত করিলে অন্য অংগে সাড়া জাগে না? বাঙলার হিন্দু সমাজের মধ্যে এমন বিপ্লবের ভাব আনিতে হইবে, যাহাতে সমাজের শ্রেণীবিভাগ উঠিয়া যায়।" আমরা সমাজে তেমন বিপ্লবেরই জয়গান করিবার অপেক্ষায় আছি। বাঙলার কবি, বাঙলার সাহিত্যিক সমাজে সেই বিপ্লবের উদ্বোধন করুন, তাঁহাদের বেদনাময়ী গীতির ঝংকারে সমাজের সকল বিভাগের ব্যবধান চূর্ণ হইয়া যাউক।

পল্লীতে সেবাকার্য্য

গোবরডাঙ্গার পূর্ব সম্পদ্ এখন আর কিছু নাই। বিদেশীর প্রতিযোগিতায় বাঙলার পল্লীশিল্পগুলি ধ্বংস হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার সর্বত্র পল্লীসমূহের যে অবস্থা হইয়াছে, গোবরডাঙ্গারও আজ সেই দূরবস্থা। বড় বড় বাড়িগুলির ইট খসিয়া পড়িতেছে, যাহার কিছু সংস্থান আছে, তিনিই ম্যালেরিয়ার ভয়ে শহরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। একান্ত নিরুপায় যাঁহারা, তাঁহারাই পল্লীর বুকে এখনও পড়িয়া আছেন। যশোহর জেলার কোটচাঁদপুর এবং ২৪ পরগণার গোবরডাঙ্গা একদিন চিনির কারখানার জন্য বিখ্যাত ছিল, সে খ্যাতি পুরাতন পাঠ্য পুস্তক ভুগোলের পাতায় এখনও পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু বাস্তব হইতে তাহা বিলীন হইয়া গিয়াছে। জাভা চিনির প্রতিযোগিতায় পড়িয়া কারখানাপদ্ধতিতে পরিচালিত এই সব স্থানের খেজুরের চিনির কারখানা টিকিতে পারে নাই। আধুনিক উন্নত ধরনের যন্ত্রবিজ্ঞান পরিচালিত পদ্ধতিতে এই শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টাও আর হয় নাই। সহস্র সহস্র লোক এই চিনির কারবারের সম্পর্কে জীবিকা অর্জন করিত, এখন তাহারা বেকার হইয়া পড়িয়াছে। অতীতের কথা স্মরণ করিয়া বর্তমান গোবরডাঙ্গার দুর্দশা দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠে। এক গোবরডাঙ্গা কেন, সমগ্র বাঙলারই আজ এই অবস্থা।

স্বামী কেশবানন্দ মহাভারতীর নাম অনেকেই জানেন না। যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমায় এই সাধক এবং স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসীর এক সময় কর্মকেন্দ্র ছিল। যশোহরের নীল-বিদ্রোহের অন্যতম নেতা ছিলেন স্বামী কেশবানন্দ। এই অকুতোভয়, নির্ভীক এবং অনলস সন্ন্যাসীর শেষ জীবনের কর্মতৎপরতার সঙ্গে কিছু পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। পল্লীর অন্তরে থাকিয়া নিভৃত সেবাকার্যে তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। ইঁহার কর্মতৎপরতা সমাজসংস্কারকে কেন্দ্র করিয়া বহু মুখে প্রবাহিত হইয়াছিল। যেখানে পীড়িতের শুশ্রূষার প্রয়োজন হইত, ছুটিয়া যাইতেন স্বামী কেশবানন্দ, বিপন্নকে রক্ষা করিবার জন্য এই দীর্ঘদেহ সন্ন্যাসীর ভুজদন্ড নিত্য প্রসারিত থাকিত। অস্পৃশ্যতা বর্জনের আন্দোলনে তৎপরতা তাঁহার দেখিয়াছি এবং দেখিয়াছি সেজন্য সমাজের সর্ববিধ অত্যাচার মাথা পাতিয়া লইতে, বিধবা-বিবাহের প্রচারে ব্রতী দেখিয়াছি তাঁহাকে, নারী রক্ষার জন্য সংঘ গঠনে তাঁহাকে দেখিয়াছি উৎসাহান্বিত সর্বদা। বাঙলার স্বদেশী আন্দোলন প্রবলতা লাভ করিয়াছিল এইজন্য যে, সে আন্দোলন শুধু শহরের রাজনীতিক চর্চার মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না, চরিত্রবলসম্পন্ন, ত্যাগনিষ্ঠ কর্মীবৃন্দের সাধনাকে আশ্রয় করিয়া সে আন্দোলন বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে সম্প্রসারিত হইয়াছিল এবং সেইখানেই ছিল তাঁহার শক্তি। যশোহর জেলায় এই আন্দোলনকে ত্যাগের অগ্নিময় সাধনায় উদ্দীপ্ত রাখিয়াছিলেন যে কর্মীবৃন্দ, স্বামী কেশবানন্দ ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম অগ্রণী। গোবরডাঙ্গার অন্তর্গত খাটুরা বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় স্বামী কেশবানন্দেরই আদর্শে, তাঁহারই অন্যতম শিষ্যের উদ্যোগে। এই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে স্বামীজীর স্মৃতিপূজায় যোগদানে আমরা আহূত হইয়াছিলাম; দেখিলাম, গোবরডাঙ্গার প্রাচীন সম্পদ্ গিয়াছে, কিন্তু সংস্কৃতি আজও বিলুপ্ত হয় নাই। মাইকেলের কথায় বলিতে হয়—'সুবর্ণ দেউটী যথা তুলসীর মূলে,' এই ছোট বালিকা বিদ্যালয়টিকে কেন্দ্র করিয়া মাতৃপূজার যে দেউটী জ্বলিতেছে, তাহার আলোকে চিত্ত উদ্দীপিত হইয়া উঠে। শ্রীযুত কুমুদবিহারী রায় মহাশয়কে এই বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে। কর্মী পুরুষের মধ্যে তিনি একজন আদর্শ ব্যক্তি। তাঁহার ধ্যান, জ্ঞান কুমারীদের পূজা। দুইটি অজ্ঞাতকুলশীলা অনাথিনী বালিকাকে ইনি রাস্তার ধার হইতে কুড়াইয়া লইয়া কন্যার অধিক আদরে প্রতিপালন করিতেছেন। এই মাতৃসেবায় তাঁহার শ্রদ্ধা অনবদ্য। মানব জীবনের এইখানেই পরমার্থতা—নারীকে মাতৃভাবে দেখা—সকল বিদ্যার ইহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, সকল ধর্মসাধনা পর্যবসিত হয় এই মাতৃপূজাতেই। ধর্মজীবন মাতৃপ্রেমে একান্তভাবে আপ্যায়িত জীবন ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

গোবরডাঙ্গার অধিবাসীকে এই কথাই নিবেদন করিয়া আসিয়াছি, গোবরডাঙ্গা অঞ্চলের কয়েকটি বৈষ্ণব সভার সদস্যাদিগকেও সেই নিবেদন জানাইয়াছি। বলিয়াছি, সাম্প্রদায়িকতা তাহাদেরই আছে প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনের স্পর্শ যাহারা পায় নাই। প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন, সে জীবন মাতৃসেবকেরই জীবন, উচ্চতর শক্তির কৃপাস্পর্শে পরম আপ্যায়নে ব্যক্তি-অহঙ্কার সেখানে গলিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। সেবা ছাড়া জীবনে তখন অন্য কিছুই থাকে না—সা চ প্রশাসনাৎ অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ। সেই শক্তিই তখন চালায় এবং ভেদদৃষ্টিকে ভুলাইয়া দেয়। সকলের আপ্যায়নকারিণী এই যে শক্তি এই শক্তির স্পর্শ যখন জীবনে পাওয়া যায় তখনই মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হয় এবং সকল অবীর্যকে অতিক্রম করে। সকল বড় কাজ করে তেমন মানুষ; শুধু বিধান মানুষকে বড় বেশী দূর লইতে পারে না, তাহার উপরে একটি শক্তি আছে, যে শক্তির স্বরূপ হইল প্রেম, যে শক্তির ধর্ম হইল সেবা। বিধানের সার্থকতা সেখানেই যেখানে জাগে এই সেবার ভাব, কারণ সেবার ভাবকে আশ্রয় না করিলে সে মহাভাবের আপ্যায়ন লাভ করা যায় না। অহঙ্কারের গণ্ডী, স্বার্থের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কর্মী বা সাধক যেখানে উদার এই আপ্যায়নকারিণী শক্তির রাজ্যে প্রবেশ করেন, তাঁহার তখনকার উপলব্ধির কথা নানা ভাবে, নানা ছন্দে অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু যে রাজ্যের সকল ব্যক্তি অব্যক্তের গূঢ়তায়, সেখানকার কথা কেহ প্রকাশ করিতে পারে না—অব্যক্তই সেখানে ব্যক্তি, গূঢ়তাই সেখানে রস। যে রাজ্যে ভেদ নাই, শুধু আছে ভাব, সেখানে ভাষা মূক। যতদিন পর্যন্ত অহঙ্কারের রাজ্যের মধ্যে নড়াচড়া, গণ্ডীর মধ্যে ঘোরাফেরা ততদিন ইর্যন্তেই ভেদ। সে রাজ্যে উপরে আনন্দ চিন্ময় রসের খেলা, প্রেমের রাজত্ব। সেখানে সকলেই এক; পৃথকভাবকে তখন আত্মার ঐক্যের মধ্যেই হয় অনুদর্শন এবং সর্বত্র তাহারই বিস্তারের উপলব্ধিতে সেবাকে সত্য করিয়া পাওয়া। এই সার্বভৌম দর্শনই বৈষ্ণবের ধর্ম। সংকীর্ণ সার্থ ছাড়িয়া

সেবার ছোপ জীবনে যাহাতে ধরে তাহাই হইল এ ধর্মের সাধনাঙ্গ। সাধনাঙ্গকে উপেক্ষা করিলে উপরে উঠা যায় না, সেখানে ধর্মের নামে হয় দুর্বলের ভাববিলাসিতা। ধর্ম জীবন দুর্বলের জীবন নয়, প্রেমের মহাবলে সে জীবন প্রতিষ্ঠিত। আচার-অনুষ্ঠান চাই এ জন্য, কিন্তু এমন আচার-অনুষ্ঠান হওয়া চাই, যাহাতে মনে সেবার একটা ছাপ স্পষ্ট হইয়া পড়ে। আচার-অনুষ্ঠান একান্ত গতানুগতিক করিয়া ফেলিলে এই দাগ পড়ে না; যিনি যে স্তরে আছেন, সেই স্তরের মধ্যে মনের উপর সেবার স্পর্শ সুস্পষ্টভাবে পড়িবার মত সাধনাঙ্গ তাহাকে অবলম্বন করিতে হয়।

অপরাহ্ণ ৫।। ঘটিকার সময় গোবরডাঙ্গা বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সেবা সমিতির বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। সেবার অভাব এ দেশে সর্বত্র। গোবরডাঙ্গার এই সেবা সমিতি বিশিষ্ট সেবাব্রতীদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ইহারা শরীর চর্চা, শিক্ষার বিস্তার এবং দরিদ্রকে সাহায্যের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। গোবরডাঙ্গা মিউনিসিপ্যালিটি বহু প্রাচীন মিউনিসিপ্যালিটি। মিউনিসিপ্যালিটি ইঁহাদিগকে কিছু কিছু সাহায্য করিতেছেন, কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা বিত্তসম্পন্ন। বিদেশে থাকিলেও ইঁহারা এই সেবা সমিতিকে অর্থ সাহায্য করিয়া দেশের সেবা করিতে পারেন, তাঁহাদের এ দিকে দৃষ্টি থাকিবে, এমন আশা করা অসমীচীন নহে। শিশু পাঠশালার যিনি অধ্যক্ষ তিনি তাঁহার বক্তৃতায় দুঃখ করিয়া বলিলেন, ৭টি পাঠশালার জন্য সরকারী অর্থ সাহায্য মঞ্জুর হইয়াছে মাত্র ৮ টাকা, কিন্তু একটি মক্তবের জন্য মঞ্জুর হইয়াছে ৩৫ টাকা। কিন্তু দুঃখ করিয়া লাভ নাই; নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করিতে হইবে। সেবা সমিতি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, ইহা আশার কথা। আমরা যুবকদিগকে বলিলাম, সভ্যতার আদর্শ এই সেবারই আদর্শ। মানুষের মনে বিষয়ের ঘুণ যদি একবার ধরে তাহা হইলে বড় কাজ করিয়া উঠা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। সেবার পথে প্রচণ্ড শক্তির স্ফুরণ দেখিয়া সে কাঁপিয়া উঠে, পরিবর্তনে সে ভীত হইয়া গতানুগতিকতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায়। দেশের আশা এবং ভরসার স্থল হইল তরুণেরা। তাহারাই বৃহৎ আদর্শের প্রেরণাকে অতি বুদ্ধিবিচারের মারপ্যাঁচে মর্যাদাহীন না করিয়া প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করিতে পারে। জীর্ণ কুসংস্কারের যুগাগত গ্লানিকে সেবাশক্তির সাবলীল প্রবাহে তাহারাই ধৌত করিয়া সমাজে সঞ্জীবিত করিতে সমর্থ। শুধু তর্ক নহে, বিচার নহে, দেশ আজ চাহিতেছে মানবসেবার উগ্র বেদনা যাহাদের বুকে বাজে এমন তরুণ দলকে। দেশ আজ চাহিতেছে তরুণ অন্তরের সেই অগ্নিময় প্রেরণা সঙ্কীর্ণতার সকল আবর্জনাকে দগ্ধ করিয়া যাহা জ্বলিয়া উঠে। নীতি আওড়াইলেই বড় কাজ হয় না, পরের বেদনা প্রাণে প্রাণে অনুভব করা আবশ্যক। অনুভূতি জীবনের সঙ্গে জড়িত বস্তু, এটা সিদ্ধান্ত নয়। এ দেশের লোকের দুঃখকষ্টের সঙ্গে, তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুবকেরা যদি নিজদিগকে মিশাইয়া দিতে পারে, তবে দৃঢ় অনুভূতির বশে নীতিকে তাহারা সমাজ জীবনে বিবর্তিত করিতে সমর্থ হইবে। বিদেশীর নকল করা থিওরীর ব্যাখ্যার প্রয়োজনের চেয়ে এই প্রয়োজন বড়। দেশের জলবায়ুর সঙ্গে প্রাণের নিবিড় সংযোগ ব্যতীত প্রগতি সাহিত্যের কোন সার্থকতা নাই। প্রকৃতপক্ষে সে সাহিত্য, সাহিত্য পদবাচ্যই হইতে পারে না। উপদেশের তত প্রয়োজন নাই, যত প্রয়োজন প্রাণের এক বিন্দু ভালবাসার। মানবমর্যাদার প্রতিষ্ঠা উপদেশ বুঝে না, সেখানে বড় হয় আত্মনিবেদন। এই আত্মনিবেদনের প্রবৃত্তি অন্তরে জাগায় যে অবিতর্ক অনুভূতি, তাহাই ধর্ম। এ দেশের যুবকেরা তথাকথিত ধর্ম না মানুন ক্ষতি নাই, এ দেশের নরনারীকে যদি ইঁহারা এমন দৃষ্টিতে দেখিতে শিখেন, যে দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ স্বার্থ বিচারকে বিস্মৃত করিয়া মানবসেবার বৃহত্তর প্রেরণায় তাঁহাদিগকে অনুপ্রাণিত করে, সেবার মধ্যে যদি তাঁহারা পান অনপেক্ষ আনন্দসত্তার একান্ত উপলব্ধি, তবেই আমরা তাঁহাদিগকে ধার্মিক বলিয়া অভিনন্দিত করিব। এ দেশের সত্যকার আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে তাঁহাদের আর কোন বিরোধ থাকিবে না এবং যাহারা বাহ্যিক অনুষ্ঠানের মেকীর কারবার করে, তাহারাও আর শত যুক্তি আওড়াইয়াও যুবকদের অগ্রগতি রুদ্ধ করিতে পারিবে না। ছিচ্‌কাঁদুনে বুজরুকের দল তখন সরিয়া পড়িবে, সমগ্র দেশ পরাইয়া দিবে নবীনের গলায় বিজয়ী বীরের বরমাল্য। এ দেশের লোককে যতই আপনারা কুসংস্কারান্ধ মনে করুন না কেন, মানুষের প্রাণধর্ম তাহাদের মধ্যে অনাবিলই রহিয়াছে। এ দেশ পাইতেছে না তাহার মনের মানুষকে। মনের মানুষদের আহ্বান যখনই পাইবে, জাগিয়া উঠিবে এ দেশের জনসাধারণ। সর্বভূতে যিনি রহিয়াছেন, তিনি কাহারও অশ্রদ্ধার দান গ্রহণ করেন না; সর্বভূতস্থ সেই দেবতার পূজা হইতেছে না, ইহাই এদেশের যত দৈন্য এবং যত অবীর্যের কারণ। যুবকেরা তাহাদের তাজা প্রাণের অর্ঘ্যের উপচারে এ দেবতার সেবা সমৃদ্ধভাবে করিতে পারে। দেবতা আপন মহিমায় জাগিবেন সেই পূজাতেই। গোবরডাঙ্গা সেবা সমিতি এই দেবসেবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। স্থানীয় যুবকেরাই এই কার্যে অগ্রণী, ইহা বিশেষভাবে আশার কথা। বাঙলার গ্রামে গ্রামে যুবকদের দ্বারা গঠিত এইরূপে সেবাসমিতির কাজ আরম্ভ হওয়া উচিত। ইঁহারা শরীরচর্চাকে নিজেদের কর্মতালিকায় গ্রহণ করিয়াছেন, এটি বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। সেবা সমিতির সম্পাদক তাঁহার কার্যবিবরণীতে ঠিক কথাই বলিয়াছেন। দুর্বল যে, যে শারীরিক স্বাস্থ্যহীন, সেবাকার্য তাহার দ্বারা সম্ভব হয় না। আমরাও বলি, সাহস দরকার, দরকার বলের। শারীরিক বলকে নিন্দা করা এদেশের কাহারও কাহারও পক্ষে অধ্যাত্মবিলাসস্বরূপে দেখা দিয়াছে। কিন্তু নৈতিক জীবন শারীরিক বলকে কখনই উপেক্ষা করে না। শারীরিক বল-

মাত্রেই পশু বল, এমন মনে করা ভুল। যে শারীরিক বল অপরকে পীড়ন করে তাহা পশু বল হইতে পারে; পক্ষান্তরে যে শারীরিক বল আর্তকে রক্ষা করে, অত্যাচারীকে শাসন করে, তাহা ধর্ম বল। নম্র হইতে হইলে, বিনয়ী হইতে হইলে আমাদের ধারণা এমনই হইয়া গিয়াছে যে, আমরা মোমের পুতুলের মত পদার্থ বিশেষকে বুঝি, কিন্তু এদেশের ধর্মশাস্ত্র তাহা বলে না; পক্ষান্তরে এই কথাই বলে যে, যে বিনয়ী হয়, সে পরের উপর সামান্য অত্যাচারকেও উপেক্ষা করিতে পারে না; কারণ বিনয়ী অর্থে পরের প্রতি মর্যাদা-বুদ্ধিই বুঝায়। পরের প্রতি মর্যাদা এবং শ্রদ্ধা বুদ্ধি যাহার আছে, সে পরের উপর অত্যাচারও সহ্য করিবে না, ইহা স্বাভাবিক। বিশ্বপ্রেমের বড় বড় কথা মুখে আওড়াইয়া নিজে আমরা যেন অপ্রেমকেই একান্ত না করি, ভীরুতাকেই বৈষ্ণবতা বলিয়া না বুঝি। সত্যই ধর্ম—মিথ্যাচার ধর্ম নয়। খাঁটি জিনিষ খুবই ভাল, কিন্তু মেকী জিনিষ খাঁটি বলিয়া চালাইতে গেলে জীবনে জুটে শুধু বিড়ম্বনা। ধর্মবলকে লাভ করিতে হইলে শারীরিক বলকে নিন্দা করা দরকার হয় না, ধর্মসাধনায় শারীরিক বলকে নিয়োগের যুক্তিমত্তা বুঝানই হয় দরকার। সেবাকার্য সত্য করিতে হইলে বাঙলার যুবকদের বর্তমানে শরীরচর্চার দিকে মন দেওয়া সকলের আগে উচিত।

যেখানে ভেদ সৃষ্টি থাকে না প্রেমের দৃষ্টিতে উপাধি একেবারে বিলীন হইয়া যায়, দেশ কাল পাত্রের ব্যবধান বিলুপ্ত হইয়া সর্বত্র এক পরম আনন্দময় আত্মসত্তার উপলব্ধি হয়, সাধনার এমন একটা স্তর আছে। এই স্তরে জীবনের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনকে খাপ খাওয়াইয়া চলা কঠিন ব্যাপার, কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, সেই স্তরে উঠিলে নিজেকে ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার এই যে প্রশ্ন, এই প্রশ্নই থাকে না। বিরোধের কারণ, বেখাপ্পা হইবার সমস্যা ততদিন, যতদিন নিজের অহঙ্কার বুদ্ধি সূক্ষ্মভাবেও থাকে, এই অহঙ্কার প্রেমের স্পর্শে যেখানে একান্তভাবে বিলোপ হইয়া যায়, সেখানে সকলের সঙ্গে হয় সমন্বয়। সেখানে শত্রুতে মিত্রতে কোন ভেদ নাই। এ রাজ্য শুদ্ধ সাত্ত্বিকতার স্তর; কিন্তু আমাদের প্রধান ভুল হইতেছে এই যে, তামসিকতাকে সাত্ত্বিকতা বলিয়া ভুল করি; কিংবা প্রমাদ, আলস্য, কিংবা ভীরুতাকে সাত্ত্বিকতা বলিয়া বুঝাইয়া মিথ্যা-চারে লিপ্ত হই। এ দেশের তথাকথিত ধর্মজীবনে ইহাই হইল বড় বিড়ম্বনা। এই যে মিথ্যাচার ইহা ধর্ম নহে, ইহা অধর্ম এবং ধর্মের জন্য জাতির পতন ঘটে নাই, ঘটিয়াছে ধর্মের নামে মিথ্যাচারের এই অধর্মে। সর্বভূতে অখণ্ড আত্মোপলব্ধিতে অহঙ্কার যেখানে বিলুপ্ত হয় নাই, অহঙ্কৃত কর্মের দ্বারাই যখন জীবন হইতেছে নিয়ন্ত্রিত—অন্যকথায় কাজ যখন আমাদিগকেই করিতে হইতেছে—উচ্চতর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে হইতেছে না, ততদিন ধর্মজীবনে অগ্রসর হইবার প্রকৃত মনুষ্যত্বের দিকে আগাইয়া যাইবার উপায় হইল সেবার বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিজের কর্ম প্রচেষ্টাকে নিযুক্ত করা। ধর্মজীবন কৃত্রিমতাকে স্বীকার করে না, কোন রকম ফাঁকির কারবার একেবারেই নাই সেখানে। সেখানকার ফাঁকি আপনাকেই আসিয়া আঘাত করে, পরের অনিষ্টের চেয়ে নিজের অনিষ্ট করে বেশী। ধর্মের নামে এই মহতী বিনষ্টি এ দেশের সমাজদেহকে অভিভূত করিতেছে। আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে শুদ্ধ সত্ত্বের অবতার বলিয়া জাহির করিতে চেষ্টা করিতেছি এবং সেই ছলেই নিজের সংকীর্ণ স্বার্থকেই পুষ্ট করিয়া সমাজকে জীর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছি। এই মিথ্যাচারের গ্লানি যেন যুবকদিগকে স্পর্শ না করে। শুদ্ধ স্বত্ত্বময় আধ্যাত্মিক যে জীবন, সে জীবনে দুই দিনেই কেহ উঠিতে পারে না। এ দেশ যে ঘোরতর তামসিকতার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে তেমন আবহাওয়ার মধ্যে তো নহেই। উপাধিকে অতিক্রম করিয়া সর্বভূতে যে আত্মদর্শন যুবকদের সকলের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। সেই সব বড় বড় কথায় বিভ্রান্ত না হইয়া তাহারা দেশের লোককে সেবা করিতে শিখুক, এদেশের লোককে অত্যাচার ও নির্যাতন হইতে রক্ষা করিতে অগ্রসর হউক নিজেদের বাহুবীর্যে—দেশ ইহাই চায়। দেশব্যাপী দুঃখে কষ্টে দেশের লোকের জন্য যাহাদের প্রাণ কাঁদে না, বিশ্বের ভাবনা, আন্তর্জাতিকতার বড় বড় কথা তাহাদের মুখে শোভা পায় না। বিশ্বের ভাবনা ভাবিবার জন্য লোক আছে, বিশ্বের লোক বসিয়া নাই; কিন্তু বিশ্বের ভাবনার নামে অকর্মণ্যতা এবং ভীরুতাকে বুকে লইয়া বসিয়া আছি আমরাই, ফলে বিশ্ব জগতে আমাদের স্থান নাই। বিশ্বের মানব সমাজে স্থান পায় যাহারা মানুষ তাহারাই। বিশ্বের লোক আমাদিগকে আজ যে মানুষ বলিয়া গণ্য করিতেছে না, ইহার কারণ ইহা নহে যে, আমরা বড় বিশ্বপ্রেমিক হইয়াছি। ইহার কারণ হইল এই যে প্রেমের রাজ্যের সঙ্গে কোন পরিচয়ই আমাদের নাই। আমরা নিজের ঘরের অপ্রেমকে একান্ত করিয়া লইয়াছি। যদি অপ্রেম আমাদের একান্ত না হইত, তাহা হইলে বিশ্বের বরাত দিয়া ঘরের বেদনাকে, এ দেশের নরনারীর নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশার জ্বালাকে আমরা চাপা দিয়া চলিতে পারিতাম না। সে জ্বালা ফুটিয়া বাহির হইত, এ দেশের সকল কর্মপ্রচেষ্টার ভিতর দিয়া, মানব-সেবার শতমুখী ধারায় এবং সে প্রবাহে এ দেশের সকল দৈন্য দুর্বলতার গ্লানি বিধৌত হইয়া যাইত। অভিশপ্ত এই বঙ্গভূমিতে যুবকগণ সেই ভাগীরথী ধারাকে বহাইয়া আনুক, পতিত এ জাতির উদ্ধার হইবে এবং দেশ সেবার সেই পথেই হইবে বিশ্বমানবের সেবা। পরের জন্য সত্যকার বেদনা জাগুক দেশের যুবকদের অন্তরে, তবে সে বেদনা তাহাদের প্রতিবেশকেই আগে স্পর্শ করিবে। দেশের নরনারীর সেবার মধ্যেই তাহাদের কর্ম পাইবে প্রকৃত ধর্মের রূপ।

কবিতা

চিঠি

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

পেয়েছি তোমার চিঠি উত্তর চেয়েছ কবিতায়,
লেখনী বিষণ্ণ ম্লান কবিতার অমর্যাদা শুনে
ছন্দোবন্ধ প্রেম কি সম্ভব? জীবনের নিত্যতায়
কে পারে কহিতে কথা প্রতিটি অক্ষর গুনে গুনে?

সংসারের পদশব্দ অঙ্কশাস্ত্রে গোনা নাহি যায়,
কবি নয় মৎসজীবী ধীবরের জাল বুনে বুনে
ধরিবে সফরী-প্রেম সরোবরে প্রভাতে সন্ধ্যায়;
তুমি তো ছেড়েছ অস্ত্র যত ছিল মিনতির তূণে,
ভাগ্যিস্ অভ্যাস ছিল তাই দিনু সনেটে উত্তর,
নহিলে ভাঙাতে মান দেখা হ'লে খাটা'তে বিস্তর।

তোমার প্রেমের চিঠি, পদ্যে লেখা সেইতো কবিতা
ছন্দ নেই গন্ধ আছে, নিঃশ্বাসের সুরভি মাখানো
ছোট ছোট হস্তাক্ষরে রূপের মাধুরী অনিন্দিতা
একখানি ছোট চিঠি প্রণয়ের জোয়ার জাগানো।

আমরা

—গোপাল ভৌমিক

আমরা দেখিনি' কভু
রঙে রঙে উজ্জ্বল প্রভাত ঃ
পাতায় পাতায় ফুল—
বনে বনে অজস্র প্রপাত।

আমরা এসেছি যবে
চোখে চোখে ছিল না বিস্ময় ঃ
ধরণীর শ্যাম রূপে—
দেখি নাই সুদৃঢ় প্রত্যয়।

আমাদের প্রেম নয়—
নৈর্ব্যক্তিক জাপানী ফানুস ঃ
কামনা বাসনা-ভরা
আমরা যে রক্তের মানুষ।

আলোকের শিশু নই
পুষ্পরথে আমরা আসি নি' ঃ
সরল প্রেমের মোহে—
নির্বোধের হাসিও হাসি নি'।

আমরা আঁধার-শিশু—
অবিশ্বাস জীবনের মূলে ঃ
জীবন কঠিন বড়—
দীর্ঘপথ ভরা শুধু ভুলে।

জরতী ধরার বুকে—
মূর্তিমান আমরা সন্দেহ ঃ
দিল না ত সুধারস—
হতভাগ্য আমাদের কেহ।

তবু জানি একদিন—
জাগিবে ধূসর-বহ্নি-কণা ঃ
সচকিত দশ দিকে
মেলে দেবে লক্ষ কোটি ফণা

ধূসর চিতার ছাই—
পিরামিড্ পাহাড়ের স্তূপ ঃ
গলিত সোণার করে—
পাবে তারা রবি-শস্য রূপ!

ছদ্মবেশী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১০

পরদিন প্রাতে চা-পানের পর লাবণ্য ও সুলেখাকে লইয়া প্রশান্ত গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের দিকে খানিকটা বেড়াইয়া আসিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়ে গোরখপুর হইতে একজন উকিল মক্কেলসহ আসিয়া উপস্থিত হইল। জরুরী কার্য; পরদিবসই গোরখপুরে ডিস্ট্রিক্ট জজের নিকট আপীল দায়ের না করিলে তাঁবাদি হইবে।

কাজের বহর দেখিয়া আসিয়া প্রশান্ত বলিল, "ও কাজকে পেছিয়ে দেওয়াও চলবে না; আর, আরম্ভ করলে বেলা ১২টার আগে ও থেকে রেহাই নেই। সুতরাং আমাকে বাদ দিয়ে তোমরা তোমাদের এ বেলার প্রোগ্রাম ঠিক কর।" সুলেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি সুলেখা। শুনেছি, সস্ত্রীক ধর্ম আচরণ করলে পুণ্য একটু বেশি হয়; মনে করছিলাম, স্ত্রীর সঙ্গে আজ আবার যখন স্ত্রীর সহোদরা যুক্ত রয়েছেন, তখন সকাল বেলা সঙ্গমের দিকে খানিকটা বেড়িয়ে এলে সেই পুণ্যে আরও খানিকটা বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু, শ্রেয়র পথে বিঘ্ন অনেক; আজকের তারিখে পুণ্যের খাতায় শূন্যে পড়ল।"

সহাস্যমুখে সুলেখা বলিল, "কিন্তু, জামাইবাবু, ব্যাঙ্কের খাতায় বেশ মোটা অঙ্কের একটা জমাও পড়ল।"

প্রশান্ত বলিল, "সেই জমাকে সাধু ব্যক্তিরা অনর্থ বলেছেন। আর সেই অনর্থ যখন পুণ্যের পরিবর্তে অর্জিত হয়, তখন তা' হয় পাপ। তবে, এক কাজ করলে মন্দ হয় না; খুব লম্বা লম্বা দৌড়ে পেট্রোল পুড়িয়ে ঐ পাপের ধনে প্রায়শ্চিত্ত করা যেতে পারে। টাকাটা ব্যাঙ্কে না পাঠিয়ে তোমার দিদির হাতে জমা ক'রে দেবো। তিনি পেট্রোল পুড়িয়ে ক্রমে ক্রমে নিঃশেষে ওটাকে শেষ করবেন।"

সমস্যার সমাধান হইয়া গেল,—এ সিদ্ধান্ত সুলেখা এবং লাবণ্য উভয়েরই মনঃপুত হইল।

লাবণ্য বলিল, "এ বেলা তা হ'লে আমরা দুজনে সেনেদের বাড়ি সেরে আসি, ওবেলা থেকে প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করলেই হবে।"

প্রশান্ত বলিল, "তথাস্তু। অতি উত্তম প্রস্তাব।"

লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "কে গাড়ি চালাবে? গৌরহরি, না মোসাহেব।"

প্রশান্ত বলিল, "গৌরহরি। মোসাহেব সোজা চোখে যা চালায়, গৌরহরি [illegible] চোখে তার চেয়ে অনেক ভাল চালাবে।"

এ কথায় সুলেখার মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। স্বতোচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতার প্রেরণায় সে বলিল, "কিন্তু জামাইবাবু, ও-বেলার জন্যে আপনি কোনো কাজ বাকি রাখবেন না। ও-বেলা সকাল সকাল চা খেয়ে কন্‌কনে ঠাণ্ডায় একেবারে সোজা পঁচিশ মাইল দৌড় দিতে হবে।"

সুলেখার কথা শুনিয়া কপট গাম্ভীর্যের সহিত প্রশা বলিল, "তা না-হয় দেওয়াই যাবে।—কিন্তু শুধু নি কথাটাই ভেবোনা সুলেখা, তোমার দিদির নিস্তেজ দেহ ম কন্‌কনে ঠাণ্ডায় সোজা পঁচিশ মাইলের দৌড় ভাল লাগ কি-না, সে কথাটাও ভেবে দেখো।"

মৃদু হাস্যের সহিত লাবণ্য বলিল, "কেন? ওর দিদি দেহ মন এত নিস্তেজ হ'ল কেন, শুনি?"

তেমনি গাম্ভীর্যের সহিত প্রশান্ত বলিল, "এ জন্যে তুমি লজ্জিত হ'য়োনা লাবণ্য,—স্বামী কাছে থাকলে সমস্ত সুশীলা মেয়েদেরই দেহ আর মন ঠাণ্ডা থাকে; তার ওপর, পঁচিশ মাইলের কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া ভাল না লাগলে দোষ দেওয়া যায় না।"

ভ্রূভঙ্গী সহকারে লাবণ্য বলিল, "শুনেছিস সুলেখা?—এক ঢিলে দুই পাখী মারা হ'ল!"

"একটি বউ-কথা-কও পাখী, আর একটি শালিক পাখী।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে প্রশান্ত প্রস্থান করিল।

সুলেখার দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে লাবণ্য বলিল, "তুই শালিক পাখী।"

সুলেখা সহাস্যমুখে কহিল, "আর তুমি বউ-কথা-কও।"

এ কথার প্রতিবাদ করিবার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া লাবণ্য হাসিতে লাগিল।

মিনিট দশেক পরে একজন বেয়ারার মুখে সংবাদ পাইয়া অবনীশ গাড়ি লইয়া গাড়িবারান্দায় উপস্থিত হইল। লাবণ্য ও সুলেখা গাড়িতে উঠিয়া বসিলে কোথা হইতে দীপালি ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "মাসিমা, আমি যাব।"

"নিশ্চয় যাবে।" বলিয়া সুলেখা দ্বার খুলিয়া দীপালির হাত ধরিয়া নিজের পাশে বসাইয়া লইল।

বিনয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া গাড়ি হইতে নামিয়া লাবণ্য বলিল, "গৌরহরি, ঐ শিমুলগাছের তলায় গাড়ি রেখে তুমি অপেক্ষা কর। এখানে আমাদের ঘণ্টাখানেক দেরি হবে।"

"যে আজ্ঞে মেমসায়েব।" বলিয়া অবনীশ গাড়ি লইয়া গাড়িবারান্দা হইতে বাহির হইয়া গেল।

সম্মুখেই একজন বেয়ারা দাঁড়াইয়াছিল, নত হইয়া লাবণ্য এবং সুলেখাকে অভিবাদন করিল।

লাবণ্য বলিল, "সায়েব কোথায় এতোয়ারী?"

এতোয়ারী বলিল, "হুজুর, সাহাব তো কোই দশ মিণ্ট্ হুয়া বাহর নিকল গ'য়ে।"

"মা-জী?"

"মা-জী তো হ্যাঁয় হুজুর। খানা কমরেমে চা পী রহী হ্যাঁয়। আপলোক ভিতর বৈঠিয়ে, হম খবর দেতাহুঁ।"

"না, তোমার খবর দিতে হবে না, আমরা খানা-কামরাতেই যাচ্ছি।" বলিয়া সুলেখা এবং দীপালির সহিত ভিতরে প্রবেশ করিয়া লাবণ্য লতিকাদের খাইবার ঘরে উপস্থিত হইল।

লাবণ্যদের দেখিয়া লতিকা উৎফুল্লমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি সৌভাগ্য আমার দিদি! সকাল বেলাই পায়ের ধুলো দিলে!" তারপর সুলেখার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার বামস্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, "আপনি আসাতে ত যে খুসি হয়েছি! চলুন, ঘরে গিয়ে বসবেন চলুন।"

লাবণ্য বলিল, "তুমি চা খাওয়া সেরে নাও লতিকা,—আমরা ততক্ষণ এইখানেই বসছি। কিন্তু এত বেলায় চা খাচ্ছ কেন আজ?"

সহাস্যমুখে লতিকা বলিল, "এটা দ্বিতীয় পর্ব দিদি। সকাল থেকে মাথাটা কেমন ধ'রে রয়েছে ব'লে এখন শুধু কড়া ক'রে এক পেয়ালা চা খাচ্ছিলাম। তোমাদের একটু চা দিক দিদি?"

লাবণ্য মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, না, আমরা এখনই চা খেয়ে আসছি—আমাদের চা দিতে হবে না। তুমি চা-টা খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে।"

বাকি চাটুকু তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া লতিকা লাবণ্যদের লইয়া রৌদ্রের ধারে বারান্দায় গিয়া বসিল। লতিকার নির্দেশক্রমে একজন আয়া আসিয়া দীপালিকে কিছু কেক ও বিস্কুট দিয়া গেল।

কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ এক সময়ে লতিকা প্রশ্ন করিল, "তোমার গৌরহরি ড্রাইভারের কি খবর দিদি? আজ সে-ই গাড়ি চালিয়ে এসেছে না-কি?"

লাবণ্য বলিল, "হ্যাঁ, সে-ই চালিয়ে এসেছে। আজ সকাল থেকে তার একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। প্রায় মৌনাবলম্বন করেছে। ইঙ্গিতে সম্ভব হ'লে কথায় উত্তর দিচ্ছে না, একটি কথায় সম্ভব হ'লে দুটি কথা ব্যবহার করছে না।"

মৃদুস্মিত মুখে সুলেখা বলিল, "আজ থেকে বোধ হয় অভিমানের পালা আরম্ভ হ'ল।"

লাবণ্য বলিল, "বোধ হয়।"

লতিকা জিজ্ঞাসা করিল, "সাধু ভাষা বন্ধ হয়েছে?"

লাবণ্য বলিল, "ভাষার ব্যবহার এত অল্প যে, তা সাধু, না অসাধু—বোঝবার উপায় নেই।"

অবনীশের কথা হইতে ক্রমশ অন্য প্রসঙ্গে কথোপকথন প্রবেশ করিল।

ক্ষণকাল পরে সুলেখা বসুধার কথা জিজ্ঞাসা করিল।

ব্যস্ত হইয়া লতিকা বলিল, "ওমা, দেখছ! তার কথা একেবারে ভুলে রয়েছি, অথচ সে আপনাকে দেখবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে আছে। সে তার পড়ার ঘরে ব'সে পড়ছে। রসুন, ডেকে আনছি।" বলিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া গমনোদ্যত হইল।

লতিকাকে বাধা দিয়া সুলেখা বলিল, "আপনি যাবেন না, আমাকে তার ঘরটা দেখিয়ে দিন, আমি নিজেই যাচ্ছি।"

সহাস্যমুখে লতিকা বলিল, "তাকে একটু আশ্চর্য ক'রে দেবার মতলব বুঝি?—আচ্ছা আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি।"

একটা ঘরের ভিতর দিয়া অপরদিকের বারান্দায় পড়িয়া দূর হইতে সুলেখাকে একটা ঘর দেখাইয়া দিয়া লতিকা বলিল, "বাঁ-হাতি দ্বিতীয় ঘরটায় ঢুকলেই বসুধাকে দেখতে পাবেন।"

(ক্রমশ)

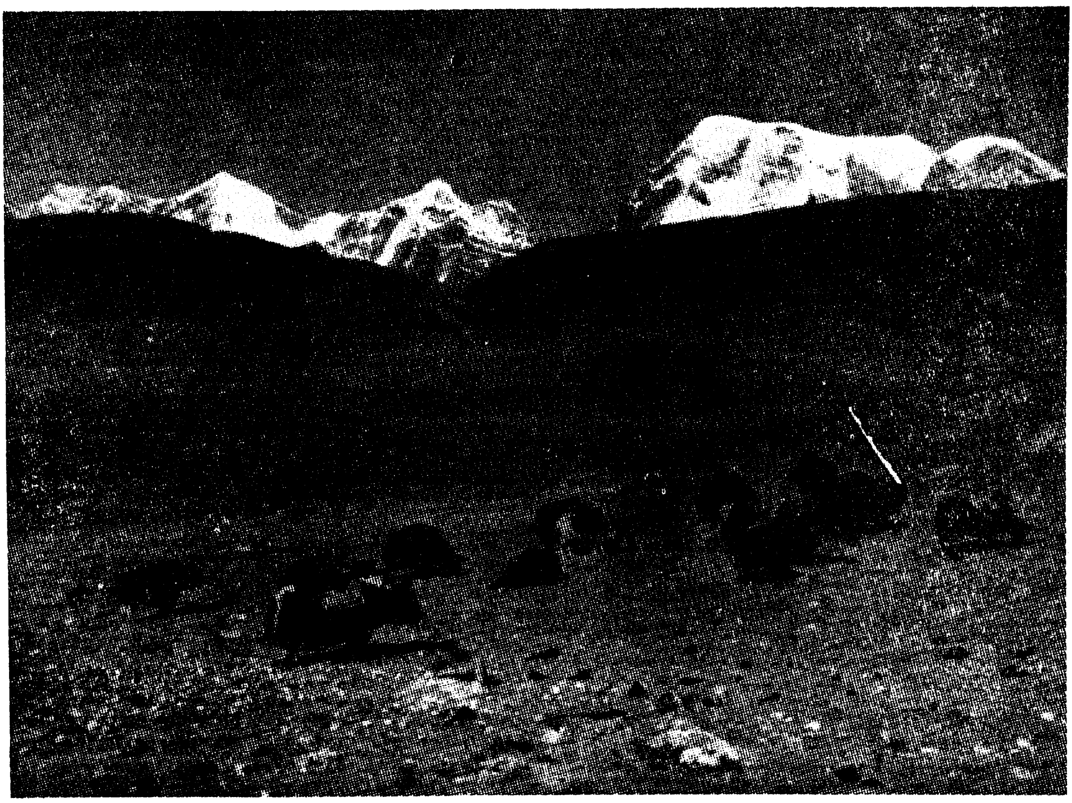


গ্যাণ্টক ভ্রমণ

অধ্যাপক শ্রীঅনিলকৃষ্ণ সরকার

পূজার ছুটিটার অধিকাংশ দিন সেবার আমার রংপুতে কেটে গেল। মাঝে ৪।৫ দিন গ্যাণ্টকে যাতায়াতে অতিবাহিত হয়। রংপুর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে বোধ হয় দেড় হাজার ফুটের বেশী হবে না। রংপু নির্ঝরিণীর দক্ষিণ পারে ব্রিটিশ এলাকা বা কালিমপঙ মহকুমা; উত্তরপারে সিকিম রাজ্য। রংপু নির্ঝরিণীর মূল ধারাগুলি জলাপালা গিরিসঙ্কটের নিকট হ'তে উৎপন্ন। একটি ধারা তেমি মো হ্রদ থেকে নিঃসৃত।

রংপু বাজার দার্জিলিং হতে প্রায় ৩৫ মাইল উত্তর-পূর্বে স্থিত। আর শিলিগুড়ি প্রায় ৪৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।



গিয়াগংগ উপত্যকা

উত্তর-পূর্বদিকে তিব্বত সীমান্তস্থিত জলাপালা গিরিসঙ্কটের দূরত্ব রংপু থেকে প্রায় ৫০ মাইল।

রংপু নির্ঝরিণীটি এখানকার বাজার থেকে প্রায় 'সিকি মাইল দূরে তিস্তার বাম তীরে এসে মিলিত হয়েছে। নির্ঝরিণীর এপারে ব্রিটিশ পুলিশের একটা ছোট চৌকি আছে। আর ঝুলান পুল পার হয়ে ওপারে বাজার। সিকিম বা চুম্বি (Chumbi) উপত্যকায় প্রবেশেচ্ছু ইউরোপীয়দের পাশ বা ছাড়-পত্রের দরকার হয় এবং এখানে এসে সেটা দেখাতে হয়। কিন্তু ভারতীয়দের লাগে না।

রংপু নদীর ওপারে চারিদিকে পাহাড় ঘেরা একটা বড় প্রাঙ্গণ বা "খোলা" আছে। তার চারিপাশে দোকান। মাঝখানে হাট বসে। এখানেই ডাক ও তার আফিস, ডাকবাংলো এবং সিকিম পুলিশের থানা অবস্থিত। বাজারে মারোয়াড়ী দোকান কয়েকখানা আছে। তখন এক পার্শী ব্যবসায়ীর এক কাঠের মোকামও ছিল। চা, ফল, সবজী, দর্জী ইত্যাদির দোকান নেপালীদেরই বেশী। ভুটিয়াদের সরাইও দু'একটি আছে। আর পাকিয়াং পাহাড়ের জায়গীরদার খুসীনারায়ণবাবুর একটি কাছারিও আছে। আমি এখানে ছিলাম পূর্তবিভাগের এক কর্মচারীর বাসায়, তিনি আমার বাল্যবন্ধু।

গ্যাণ্টকে ধর্মশালা বা হোটেল নেই। ডাকবাংলোয় আশ্রয় নিয়ে ভ্রমণ করতে হ'লে দৈনিক খরচ পড়ে প্রায় দশ টাকা। সে যাত্রা বাঙালী বন্ধুবান্ধবদের আতিথ্য সম্বল করেই ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। অথচ ইচ্ছা থাকলেও তাঁরা সুস্থিরভাবে আতিথেয়তা পালন করতে পারেন না। কারণ বাঙালীর রাজনৈতিক দুর্নাম আছে।

নিরীহ পর্যটক আমি—পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা দেখে বেড়ানো আমার খেয়াল। ঘন পল্লবিত তরুবীথিকার মাঝে সুবৃহৎ বনস্পতির শ্যামল ছায়ায় কখনো একলা, কখনো বা দুই বন্ধুতে পাদচারণায় সময় কেটে যেত। কখনো বা রংপুর খোলা বা প্রশস্ত গর্ভস্থ শিলাহত ফোয়ারাগুলির আশপাশ দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াতাম। কয়েকদিন ফোয়ারাবহুল এই 'খোলা'র শীতলজলে স্নান করবার পর ভারি কম্প দিয়ে জ্বর এল। এইরূপ জ্বরকে বলে "টেরাই ফিভার" (Terai fever) যাকে এতদঞ্চলের সবাই ভীষণ ভয় করে। চার পাঁচদিন পরে জ্বর ছেড়ে গেল। সেই সময় খুসীনারায়ণবাবু নদীর জলে ডিনা-

মাইট ফাটিয়ে অনেক মাছ ধরলেন। আমাদের পথের জন্য তিনি সেই মাছের একপ্রকার অল্প ঝোলবিশিষ্ট 'ঝাল' প্রস্তুত ক'রে পাঠিয়ে দিলেন।

অধ্যবসায়ে কি না হয়! বিপজ্জনক উদ্দেশ্যবিহীন এক নিরীহ পর্যটকের ন্যায় আমার হাবভাব, এ ধারণা সিকিম ও দার্জিলিংএর পুলিশ মহলের হয়েছিল। রংপুস্থিত সিকিম পুলিশের দারোগা একজন সিকিমীয় ভুটিয়া। আমার প্রতি তাদের ভয় ক্রমশ কমে গেল। কারণ মাঝে মাঝে কোন কোন ইউরোপীয় তাদের ধোঁকা দিয়ে বিনা ছাড়পত্রে তিব্বতে প্রবেশ করেছে। এজন্যে উপরওয়ালার কাছে তাদের জবাবদিহি হ'তে হয়। একদিন সিকিমীয় দারোগা নিজ হতে অভিনন্দন জানিয়ে আমার সংগে একটু আলাপ করলেন, বুঝলাম, তাঁরা আমার সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত।

আমাদের কুটিরের পাশে এক দরিদ্র নেপালী ব্রাহ্মণের জীবনযাপন প্রণালী দেখে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম। সে দুপুরে ভুট্টার খুদ বা চাউলের ভাত সিদ্ধ করত। আর প্রচুর লংকাযোগে ঢেঁকি বা স্কোয়াশের শাক অথবা স্কোয়াশের এক 'তিউন' (তরকারী) রান্না করত। দুবেলা এরূপ আহার ও আর একবার ভুট্টার খইসহ চা খেয়ে তার অধিকাংশ দিন কাটত। পরিধানে ছিল তার এক ছিন্ন ও মলিন সুরুয়াল (পাজামা), আর গায়ে একটা নেপালী কোর্তা। এ দুটিই নেপাল পাহাড়ে বোনা খদ্দরের তৈরী। তার বেতন মাসে সাত টাকা। ঐভাবে চালিয়ে সে বৎসরে ৩০৲।৪০৲ টাকা জমাবে। তারপর দু'তিন বৎসর বাদে নেপালে ফিরে যাবে। নেপালে গিয়ে সেই জমানো টাকায় জমি কিনবে, বিবাহ করবে, সংসার পাতবে। হে'টেই সে সিকিম এসেছে, হে'টেই সে নেপালে ফিরে যাবে।

রংপুতে আমার অবস্থানকালেই পূর্ণপুষ্ট সবুজ রংয়ের কমলা চারিধারের পাহাড় থেকে নামতে আরম্ভ করল। নবেম্বর থেকে পুরা মরশুম হবে। দক্ষিণ সিকিমের নামচী অঞ্চল খুব উর্বরা ও জনবহুল। জাঞ্জিটর, মেল্লী ও সিংতামের অদূরস্থিত রাসবের পুলগুলি পার হয়ে নামচীর কমলা, বড় এলাচ ও মাখন দার্জিলিং জেলায় আমদানী হয়। মুসলমান বেপারিগণ সিংতাম অবধি গিয়ে দুপাশের পাহাড়গুলিতে স্থিত কমলা-বাগানগুলির ফল ইজারা নেয়। তাদের প্রাণপণ উদ্যম ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা এই ব্যবসায়ে সফলতা এনে দেয়। শুনেছি, দু'একজন বাঙালী ব্যাপারী এ ব্যবসায়ে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিস্তা-ব্রীজের ওপারে তাঁরা আর অগ্রসর হতে পারেন নি।

রংপু থেকে গ্যাংটক ২৪ মাইল উত্তরে। এই পথের পাশে রংপু থেকে প্রায় এক মাইল দূরে একটি বড় তামার খনি আছে। তারি তিন চার মাইলের মধ্যে পাকিয়াং, পছিখানা প্রভৃতি স্থানে আরও কয়েকটি তামার খনি আছে। টাটার লোহখনির আবিষ্কারক পরলোকগত পি এন বোস মহাশয় এই সব অঞ্চলের ধাতব ও খনি সম্পদের অনুসন্ধান করেছিলেন। রংপু খনি বর্তমানে বার্ন কোম্পানীর ইজারাভুক্ত। সস্তা বিজলীশক্তির অভাবে এইসব খনির খনন কার্য ১৯১২ খৃষ্টাব্দ হ'তে বন্ধ। নাথু গিরিসংকটের নিকটস্থ লাগিয়াপ লো হতে ইলেকট্রিসিটি এনে কাজ চালাবার কথা একবার উঠেছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত তা কাজে লাগানো হয় নি।

বার্ন কোম্পানী ইজারা নেবার আগে রংপু খনিতে নেপালীরা প্রাচীন প্রথামত তামা নিষ্কাষণ করত। তারা খাদ-পূর্ণ তাম্র-প্রস্তরগুলি প্রথমে হাতুড়ি ও ঢেঁকির সাহায্যে গুঁড়ো ক'রে নিত। তারপর ঐ গুঁড়োর সংগে গোবর মাখিয়ে গুল তৈরী করত। গুলগুলি হাপরে পোড়াতো। পোড়ানো গুলের ছাই জলে ধুয়ে বের করে দিত। তারপর অবশিষ্ট কঠিন ধাতু ও খাদভস্ম আবার গোবরের সংগে মাখিয়ে গুল তৈরী করত এবং পোড়াতো। এভাবে দু'তিনবার পোড়ানোর পর তামা নিষ্কাষিত হ'ত। এই প্রক্রিয়ার কথা কোন বইয়ে পাওয়া যায় না। রংপু'র প্রাচীন অধিবাসীদের নিকট এই প্রক্রিয়ার কথা জানতে পেরেছিলাম।

একদিন আমার যাওয়ার জন্য গ্যাংটক থেকে ঘোড়া এল। গ্যাংটকের তদানীন্তন পশু চিকিৎসা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখার্জি। তিনিই আমার অভিপ্রায় জেনে আমাকে গ্যাংটক ভ্রমণে আমন্ত্রণ করেছিলেন। পরদিন সকাল-বেলায় আহারাদির পর অশ্বারোহণে গ্যাংটক যাত্রা করলাম।

রাস্তার দুপাশে ২।১টি রুদ্রাক্ষ ফলের গাছ দেখা গেল। মাইলখানেক যাবার পর রাস্তাটি তিস্তার পূর্ব বা বামতীরে উপনীত হল। শিলিগুড়ি হ'তে গ্যাংটক অবধি রাস্তাটি বর্তমানে গো-শকট ও মোটর যাবার উপযোগী। শিলিগুড়ি হ'তে গ্যাংটকের দূরত্ব ৭২ মাইল, আর রংপু থেকে ২৪ মাইল।

তিস্তার সম্পূর্ণ খাড়া পাড়ের উপর দিয়ে প্রথম কয়েক মাইল যেতে আমার বুক দুরু দুরু করতে লাগল। রাস্তার পাশ দিয়ে গভীর খাদ নেমে গেছে, মধ্যে তিস্তার প্রচণ্ড গর্জন; শিলাহত উৎক্ষিপ্ত জলকণায় জলস্রোত প্রায় আবৃত—আমি সেই খাড়া পর্বতের পথে তিনশ' ফুট উপর দিয়ে অশ্বারোহণে চলেছি। যা হোক্, বহুদিনের অনভ্যাসের পর কেবল সাহসে ভর করে সেরূপ দুই তিন মাইল রাস্তা নিরাপদে অতিক্রম করলাম। অতঃপর উপত্যকা প্রশস্ততর হল। এ অঞ্চলের পাহাড়ের চারিদিকে ডালাকাটা ক্ষেত্রে (terrace) প্রচুর ধান্যের আবাদ হয়; ঠিক আসামের কোহিমা অঞ্চলের ন্যায়।

পথে তিব্বতের সিগাসিওকাম্পাজঙ হতে আগত অনেক মেষপাল দেখলাম; সেগুলি দার্জিলিংয়ের বাজারে বিক্রয়ের জন্য যাচ্ছে। অশ্বতরারূঢ় ভুটিয়া মালিক বা চালক কুকুর সংগে পালগুলির আগে বা পিছনে চলেছে।

পাঁচ ছয় মাইল যাবার পর একটি কাঠের ক্যান্টিলিভার পুল দ্বারা তিস্তার উপনদী সিংতাম নির্ঝরিণী পার হলাম। তারপর সিংতামবাজার; রংপু থেকে ছোট। বাজারে ছোট একটি পোস্টাপিস আছে। এখান থেকে তিস্তার তীর ছেড়ে দিতে হ'ল। গ্যাংটকের পথ আগেই ছাড়িয়ে এসেছি। তিস্তা খাদ প্রায় সোজা উত্তরে প্রসারিত। সিংতাম থেকে কয়েক মাইল উত্তরে রাসবের নিকট তিস্তার ওপর দিয়ে একটি ঝুলান পুল আছে। সেই পুল পার হলে নামচী ও তারপর দার্জিলিং যাওয়া যায়। এই নামচী অঞ্চলে ভাল সিংকোনার আবাদ হতে পারে। রাসব থেকে তিস্তার দক্ষিণ তীর বহে একটি প্রায় অব্যবহৃত পথ আছে। এই পথে ১৫ মাইল উপরে একটি বেতের প্রাচীন ঝুলান পথ তিস্তা পারাপার করেছে। তার লোমহর্ষণ বর্ণনা ওয়াডেল ও ম্যাকগভর্ন সাহেব করেছেন। তিস্তার উত্তর ধারা লাচেনের উপরও এরূপ বাঁশ ও বেতের ঝুলান পুল ব্যবহৃত হয়।

সিংতাম থেকে আমরা রোঙনি নির্ঝরিণীর দক্ষিণ তীর বহে প্রশস্ত উপত্যকার মধ্য দিয়ে চল্‌তে লাগলাম। অপরাহ্ণে সামদঙ নামক একটি সুন্দর ডাকবাংলো অতিক্রম করলাম।

এইভাবে ষোল মাইল যাবার পর রাণীখোলা নামক নির্ঝরের উপরিস্থিত ক্ষুদ্র এক সেতু পার হলাম। তার উপরেই চড়াই আরম্ভ। গ্যাংটক গিরিস্কন্ধের উপরে উঠতে হবে। তৎপূর্বেই রাস্তা অল্প অল্প করে উপরে উঠছিল। মাঝে মাঝে দিগন্তে স্থিত প্রাচীরবৎ তুষারাবৃত গিরিশ্রেণীগুলি উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল।

এক স্থানে দেখলাম, মাত্র ১০।১২ মাইল দূরে এক গিরিশিখরে শুভ্র লবণের মত অল্প অল্প তুষার ছিটান আছে। ইতিপূর্বে এত নিকট হ'তে আর কখনও তুষার দেখি নাই। তখন কি এক অনির্বচনীয় ভাবের স্পন্দনে বুকের ভিতরটা উৎফুল্ল হচ্ছিল। ভাবছিলাম, আমার আজিকার মত বিরল বাঙালী এরূপ ভাগ্যবান হয়ে থাকে। হাজার বৎসর আগে পদ্মসম্ভব দীপঙ্কর প্রভৃতি বাঙলা থেকে সংস্কৃতি ও ধর্ম নিয়ে গিয়ে এ অঞ্চলে প্রচার করেছিল। তারপর হাজার বৎসর ধরে বাঙালী এই অঞ্চলে আত্মপ্রসারণের ও রক্তমিশ্রণের চেষ্টা করে নি, যদি করত তা হলে নেপাল, সিকিম, তিব্বত ও ভুটানে আজ বাঙলা সংস্কৃতি ও ভাষার বিজয় বৈজয়ন্তী উড়ত; বাঙলা ভাষাই ভারতে রাষ্ট্রভাষা হ'ত। এখন থেকেও কি বাঙালী এই ভুলের সংশোধনে ব্রতী হবে না?

এখন বয়েলগাড়ীর ট্রেক ছেড়ে দিয়ে ৪।৫ মাইল অশ্বচারী পথ ধরে ক্রমাগত গ্যাংটক গিরিস্কন্ধে আরোহণ করতে লাগলাম। অর্ধপথেই তুষারচুম্বিত শীতল হাওয়া গায়ে লাগল। তাহাতে সারাদিনের অশ্বারোহণজনিত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গিরিস্কন্ধের বা দাঁড়ার উপর উঠে আধ মাইল যাবার পর শ্রীযুক্ত মুখার্জির বাংলোতে উপস্থিত হলাম। তিনি সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। দার্জিলিং অপেক্ষাও এখানে শীত বেশী। গরম জলে তৎক্ষণাৎ হাতমুখ ধুয়ে চা-পান হল।

বাংলোর প্রাঙ্গণ হতে পশ্চিমে নিম্নে উপত্যকা, আর উপরে কাঞ্চনজঙ্ঘা। সিনিয়লচুম, লামা আন্দেন, চোমিয়োমো, ডঙ্খিয়া প্রভৃতি শৃঙ্গ যেন অতি নিকটে দণ্ডায়মান বোধ হল। কারণ বাতাস এখানে এত পাতলা ও শুষ্ক যে, দূরের বস্তু খুব নিকটে বলে প্রতীয়মান হয়। ক্রমে ফুটফুটে জ্যোৎস্না নেমে এল। চন্দ্রের গোলক আকাশে উজ্জ্বলতর হয়ে ভাসতে লাগল। চন্দ্রের আলোতে বরফের আভা যেন একটু ম্লান হয়ে গেল।

বাইরে প্রচণ্ড শীত, জানালা দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিলাম। অচিরেই শীত জব্দ করবার মত আহার্য অর্থাৎ প্রচুর লুচি ও মাংস আনা হলো।

পরদিন সকালে শহর দেখতে বের হলাম। গ্যাংটকের উচ্চতা দার্জিলিংয়ের সমান (৫,৮০০ ফুট) এবং দার্জিলিং হতে ৬৫ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। শিলিগুড়ি এখান থেকে ৭২ মাইল দক্ষিণে; আর নাথু ও জলাপালা গিরিসংকট সরলরেখায় ১৫।১৬ মাইল দূরে।

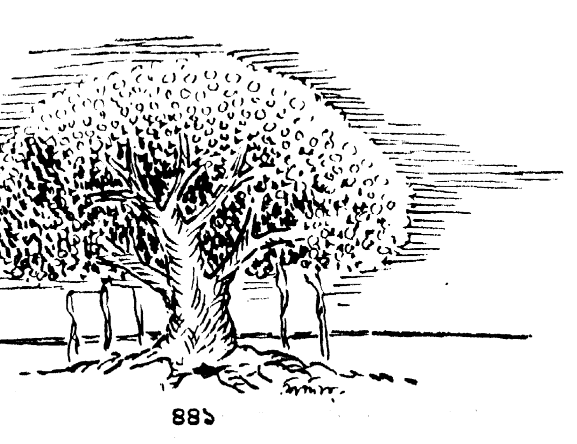
গ্যাংটক সিকিমের রাজধানী, এক প্রশস্ত দাঁড়ার উপর স্থাপিত। এবং তদোচিৎ সব কিছুই এখানে পাওয়া যায়। একে একে রাজবাড়ি, গুর্খা সেনানিবাস, ডাকবাংলো, রেসিডেন্টের বাড়ি, বৌদ্ধবিহার প্রভৃতি দেখলাম। সম্প্রতি এখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এক হাইস্কুল স্থাপিত হয়েছে। তাতে দুজন বাঙালী শিক্ষক আছেন।

শহরের অধিবাসীদের মধ্যে অর্ধেক সিকিমী ও তিব্বতী ভুটিয়া। ছয় আনা নেপালী, বাকী দু'আনা মারোয়াড়ী, বিহারী, পেশোয়ারী প্রভৃতি।

সাপ্তাহিক হাট দেখলাম। সস্তা বিদেশী সৌখীন দ্রব্য মেয়েরা খুব ব্যবহার করে। তাদের দেখলে মনে হয়, পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রথম ধাক্কাটা এরা সামলাতে পারে নি। আরামসেবী উচ্ছৃঙ্খল বিদেশবাসীর সংস্পর্শে এরা এসেছে; তার জন্যে অনেকের ধারণা ঐ শহরবাসীদের মধ্যে শতকরা নব্বইজনের শরীরে উপদংশ বিষ বর্তমান।

গ্যাংটক শহর থেকে ৪।৫ মাইল উত্তরে 'পেন লঙলা' নামক এক গিরিসংকট বর্তমান। তৃতীয় দিনে সেখানে বেড়াতে গেলাম। এ স্থান বোধ হল পূর্ব তিব্বত সীমান্ত থেকে সরলরেখায় ৪।৫ মাইল মাত্র দূরে। সেদিকে ও উত্তর ও পশ্চিমে বরফের পাহাড়—আর আমার খাড়া পাদনিম্নে তিস্তার উপনদী ডিকসু। ডিকসুর পরপারে এক মালভূমির খাড়া পাড় উঠেছে: তার উপরে তিস্তার মূল ধারা লাচেন, লাচুঙ প্রভৃতি দক্ষিণ-গামিনী ভাবে প্রবাহিত। ঐ অঞ্চল আপেল বাগান ও কম্বলের জন্য সুপরিচিত। ঐ মালভূমির উত্তরাংশে গিয়া লুঙ (১৫৭৫০ ফুট) অধিত্যকা চড়াই উৎরাই পথে প্রায় ৭৩ মাইল দূরে; সরলরেখায় ৪০ মাইল। তার পূর্বে কাঞ্চন ঝাউ ২২৭০০ ফুট) ও আর পশ্চিমে চোমিয়োমো (২২৪৩০ ফুট)। তারপর সিবুলা পাশ অতিক্রম ক'রে তিব্বতের কাম্পাজঙ্গ ও সিগাস্তি প্রদেশ। পূর্বে চোল পর্বতমালা আর পশ্চিমে সিনিয়লচুম, কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি। এ সব দেখে প্রত্যাবর্তন করলাম। গ্যাংটক ডাকবাংলোর নিকট এসে একবার চাঙগু (১২৬০০ ফুট) ও নাথুলাগামী পথের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিলাম। ভাবলাম, ভাগ্যে থাকে ত আর এক যাত্রা এ পথে যাব।

তার পরেরদিন ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রংপু প্রত্যাবর্তন করলাম। আর কয়েকদিন পরে নেমে বাঙলার সবুজ সমতল মাঠের রাজ্যে ফিরে এলাম।



ভুল

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

(১৫)

যোগেশ চাহিয়া দেখিল, সুরজিৎ, এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুদ্দীপ্তির মতই তাহার মনে পড়িয়া গেল তাহার নিজের অতীত জীবনের অনেক স্মরণীয় ঘটনা। ইহারই সঙ্গে সে যে একত্র কতদিন দেশ উদ্ধারের কত স্বপ্ন দেখিয়াছে, বিপ্লবের চিত্র মনের পটে কল্পনার রঙে আঁকিয়া উপভোগ করিয়াছে এবং শেষের দিকে কাজ সম্পর্কে ইহার সঙ্গে মতান্তর হইলেও মনান্তর যে এক মুহূর্তের জন্যও হয় নাই, এ সব কথা স্মরণ করিয়া তাহার চিত্ত আবেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও তাহার মনে পড়িল যে, বিগত প্রায় বৎসরখানিক কাল এই সুরজিতের সঙ্গে একবারও তাহার দেখা হয় নাই। এহেন বন্ধু ও সহকর্মীকে বহুদিন পর এমন অপ্রত্যাশিতভাবে লাভ করিয়া যোগেশ উচ্ছ্বসিত আবেগে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "সুরজিৎ! তুমি! কোথায় ছিলে এতদিন?"

"ঐ যে কথায় বলে ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে", সুরজিৎ হাসিয়া উত্তর দিল। "অক্ষরে অক্ষরে না মিললেও আমার গত দুবছরের জীবন সম্বন্ধে এ বর্ণনা খাটে। কিন্তু—" সুরজিৎ সন্ত্রস্তভাবে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, "এখানে দাঁড়িয়ে কথা হবে না, যোগেশ। একটু দূরেই একটা বস্তিতে একটি অস্থায়ী আস্তানা আমার আছে। নাক যদি না সিঁটকাও এবং সময় যদি থাকে তবে আমার সঙ্গে একবার সেখানে এলে দু'দণ্ড কথা ব'লতে পারি।"

"বস্তিতে?" যোগেশ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল।

সুরজিৎ পুনরায় সন্ত্রস্তভাবে চারিদিকে চাহিয়া পূর্বাপেক্ষা গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "তোমার কৌতূহল এখানে দাঁড়িয়ে মিটাতে গেলে আমার যা ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে, তোমার সমস্ত ঐশ্বর্য উজাড় করে ঢেলে দিলেও তার পূরণ তুমি করতে পারবে না। কাজেই কৌতূহল যদি সত্যি তোমার থাকে তবে মামনুসর"; বলিয়া যোগেশের হাতের উপর আর একবার চাপ দিয়াই হাত ছাড়িয়া দিয়া সুরজিৎ দ্রুতপদে পথ চলিতে আরম্ভ করিল।

যোগেশ কিছু না বুঝিলেও মন্ত্রমুগ্ধের মতই সুরজিতের অনুসরণ করিল এবং সমস্ত ব্যাপারটির একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ভাবিয়া ঠিক করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় গলদঘর্ম হইতে হইতে অবশেষে বাধ্য হইয়াই যেখানে তাহাকে থামিতে হইল উহা যে কলিকাতার কোন অঞ্চল তাহা সে কিছুতেই ঠাহর করিতে পারিল না, কেবল ইহাই সে বুঝিল যে, এই অঞ্চলে ইতিপূর্বে কস্মিনকালেও সে আসে নাই।

খোলার ছাদ ও মাটির দেয়ালের বাতায়নহীন ঘরের আসবাব-লেশহীন মেঝেতে অর্ধছিন্ন একখানি মাদুরের উপর বসিয়া কেরোসিনের ডিবির ধূম্রাচ্ছন্ন ম্লান আলোকে সুরজিতের মুখের দিকে নিষ্পলকদৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার মুখ হইতে যোগেশ আসন্ন বিপ্লবের উদ্যোগ আয়োজনের যে রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিল উহা উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক। শুনিতে শুনিতে একাধিকবার যোগেশের দেহে কাঁটা দিয়াও উঠিল, কিন্তু কাহিনী শেষ হইয়া গেলে সে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিষণ্ণকণ্ঠে কহিল, "এই ক'জন লোক আর এই সামান্য অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এই এত বড় ভারতবর্ষে বিপ্লব প্রচেষ্টা সার্থক হবে, এ কথা এখনও তুমি বিশ্বাস কর সুরজিৎ?"

"নিশ্চয় করি", সুরজিৎ দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, "না করলে অনশনে অর্ধাশনে পুলিশের ভয়ে কুকুরের মত পালিয়ে পালিয়ে এই বিপ্লবের আয়োজনেই নিজের সমস্ত শক্তি ও সময় ঢেলে দিতাম না। কিন্তু তুমি? তুমি বিশ্বাস কর না কি?"

যোগেশ ঘাড় নাড়িয়া মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "না।"

"কিন্তু একদিন ত করতে?"

"করতাম, কিন্তু এখন আর করি না, কারণ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে; তাছাড়া মস্তিষ্কেরও হয়েছে পরিণতি—"

"কারণ, মস্তিষ্ককে চিবিয়ে খাবার জন্য গৃহে রয়েছেন গৃহলক্ষ্মী", সুরজিৎ ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল।

যোগেশের মুখমণ্ডল সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল। সে সবেগে মাথা নাড়িয়া আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না, না, সুরজিৎ—"

"মিথ্যাবাদী ব্রতত্যাগী", সুরজিৎ বাধা দিয়া অধিকতর তীক্ষ্ণস্বরে বলিয়া উঠিল, "নারীর রূপ ও যৌবনের পায়ে জীবনের যথাসর্বস্ব বিকিয়ে দিয়েছ,—তার জন্য আমার অভিযোগ নেই। কিন্তু উত্তম জ্ঞানীর মুখোস প'রে কর্মীর প্রাণপণ কর্মপ্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করতে শিখেছ কতদিন থেকে? নিজে যদি কোন কাজ করতে, তবে হয়ত বা অপরকে বিদ্রূপ ও তিরস্কার করবার অধিকার তোমার জন্মাত। কিন্তু কর্মক্ষেত্র থেকে তুমি পালিয়ে গেছ, যোগেশ। আগে গণ-আন্দোলনের কথা প্রায়ই তোমার মুখে শুনতাম—কিন্তু কৈ? এই ত দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে—তার সঙ্গেও কৈ, তোমার ত কোন যোগ দেখছি না? তুমি বড়লোকের ছেলে—পিতার মৃত্যুর পর অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়েছ। তোমার ঘরে যুবতী স্ত্রী—বাইরেও অবিবাহিতা স্ত্রী আছে কি না কে জানে! তাদের নিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে জীবনকে উপভোগ করছ। বেশ কথা। কিন্তু আমাদিগকে বিদ্রূপ কর তুমি কোন্ সাহসে, কোন্ অধিকারের জোরে, শুনি?"

সুরজিতের প্রত্যেকটি বাক্য যেন চাবুক হইয়া যোগেশের মুখের উপর বার বার আঘাত করিতে লাগিল এবং ঐ আঘাতের বেদনায় তাহার মুখমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়া উঠিল। অথচ সুরজিতের বিশ্লেষণের কারণের দিকটা সর্বৈব মিথ্যা হইলেও তাহার মূল অভিযোগটি অস্বীকার করিতে পারিল না বলিয়াই যোগেশ কোন অংশেরই প্রতিবাদ করিতে পারিল না। বরং এই তিরস্কারের উপলক্ষেই আজ সে পুনরায় উপলব্ধি করিল যে, কোন দিক দিয়াই নিজের জীবনকে সে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে নাই; ব্যর্থতার যে আগুন তাহার গার্হস্থ্য জীবনকে পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিয়াছে, উহারই তীব্র উত্তাপে তাহার জীবনের সাধনার দিকটাও যেন ঝলসিয়া শুখাইয়া গিয়াছে।

যোগেশ বিবর্ণমুখে চুপ করিয়াই বসিয়া রহিল এবং সুরজিতও উত্তেজনার মুখে অনেকক্ষণ অনর্গল বকিতে বকিতে অবশেষে যোগেশের বিবর্ণ মুখভাব লক্ষ্য করিয়াই যেন একটা কথার মাঝখানেই হঠাৎ থামিয়া গেল। যোগেশ মুখ তুলিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "থামলে যে?"

সুরজিৎ খপ করিয়া যোগেশের একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া সলজ্জকণ্ঠে কহিল, "মাপ কর ভাই, বড্ড অশোভন উত্তেজনা প্রকাশ পেয়ে গেছে। তুমি বিবাহিত, বিবাহিত জীবনের যে একটা স্বতন্ত্র কর্তব্য আছে তা আমাদের মত লক্ষ্মীছাড়াদের সব সময়ে মনেই থাকে না।"

যোগেশ আবার একটু হাসিয়া কহিল, "তোমার অনেক কথাই

ভুল, তবু তুমি অনুতপ্ত হয়ো না, কারণ তোমার মূলে অভিযোগটি সত্য। তোমার তিরস্কারের অনেকখানিই আমার ন্যায্য পাওনা।"

"তবু ভাল," সুরজিৎ কহিল, "তবে আশা করতে পারি কি যে, আমাদের যোগেশকে আবার আমরা আমাদের দলেই পাব?"

যোগেশ অন্যদিকে চাহিয়া উত্তর দিল, "তোমাদের দলে অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতাকামীদের দলে পাবে নিশ্চয়ই, তবে ঠিক তোমাদের পার্শ্বে হয়ত পাবে না, কারণ আমার বিশ্বাস স্বতন্ত্র।"

সুরজিৎ যেন একটা ধাক্কা সামলাইয়া লইল, একটু থামিয়া কহিল, "কিন্তু কিছু টাকা? তা দিতে পারবে কি? আমাদের দু'টি ছেলের সন্ধানে ফাঁসির দড়ি নিরন্তর ছুটছে। তাদের বাঁচাতে গেলে অনেক টাকা চাই—কিছু অবিলম্বেই। সহজে যদি না পাই, তার জন্য ডাকাতি করতে হবে।"

যোগেশ চিন্তিত গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কত টাকা?"

"অন্তত পাঁচশো", সুরজিৎ প্রত্যাশার কণ্ঠে উত্তর দিল।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া যোগেশ কহিল, "ডাকাতি ক'রো না সুরজিৎ, টাকা আমি দেব।"

কথাটা যোগেশ সেই রাত্রেই শোভার কাছে উল্লেখ করিল।

ইদানীং টাকাকড়ি সমস্তই শোভার কাছে থাকিত, চেকের পাতায় নির্দেশমত সই করা ছাড়া যোগেশ নিজে আর কিছুই করিত না। তাই টাকাটা শোভার কাছেই তাহাকে চাহিতে হইল।

"এত টাকা নিয়ে কি করবে তুমি?" শোভা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল।

যোগেশ মোটামুটি সকল কথাই শোভাকে খুলিয়া বলিল এবং একথাও বলিতে বাকি রাখিল না যে, পাঁচশত টাকা অবিলম্বে সংগ্রহ না হইলে কেবল যে দুইটি লোককে ফাঁসির দড়ি হইতে বাঁচান যাইবে না তাহাই নহে, এই টাকার জন্য ডাকাতি করিতে বাধ্য হইয়া অপর অনেকেও হয়ত নিজেদের জন্য কালাপানির পথ প্রশস্ত করিতে বাধ্য হইবে।

কাহিনী শুনিয়া শোভা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর অভিভূতের মত কহিল, "আবার তুমি ওদের দলে ভিড়তে আরম্ভ করেছ?"

যোগেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না, কারণ ওদের পথ আমার পথ নয়। কিন্তু আমি ওদের দলের না হলেও ওদের উদ্দেশ্য ও আমার উদ্দেশ্য এক। ওদের আমি শ্রদ্ধা করি, ওদের প্রাণ যে অমূল্য তা আমি মানি। সে প্রাণ বাঁচাবার জন্য পাঁচশো টাকা আমি দেব।"

"পাঁচশো টাকা কেন, এজন্য পাঁচ পয়সাও তুমি পাবে না," শোভা প্রতিবাদের দৃঢ়স্বরে কহিল, "যে টাকা এখন আছে তার সব টাকাই এ মাসেই আমাদের দরকার।"

"এত টাকা এ মাসেই দরকার হবে?" যোগেশ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল।

"হ্যাঁ, হবে," শোভা উত্তর দিল, "আমার একছড়া নূতন নেকলেশ এ মাসেই চাই। তার জন্য বরং আরও কিছু টাকা পাঠাতে সরকারমশায়কে আমি চিঠি দিয়েছি।"

টাকা না দিবার যুক্তি অবশেষে যে এই আকারে শোভার মুখ হইতে বাহির হইবে তাহা যোগেশ কল্পনা করে নাই। সে স্তব্ধ বিস্ময়ে অনেকক্ষণ নির্বাক হইয়া শোভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "তোমার নেকলেশ এ মাসে না গড়ালেই কি নয় শোভা? আমার এ কাজটা জরুরি, টাকাটা দু'একদিনের মধ্যেই দরকার। হাতে যা টাকা আছে তাই দিয়ে এ কাজটা এখন চালিয়ে নিলে পরে আমি তোমাকে নেকলেশের টাকা সংগ্রহ করে দিতে পারি।"

শোভা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না, আমার নেকলেশ এ মাসে না হ'লে চলবেই না," বলিয়াই এ আলোচনার উপর নির্মমহস্তে যবনিকা টানিয়া দিয়া শোভা অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

দেখিয়া শুনিয়া শোভার বিরুদ্ধে যোগেশের অন্তর আবার বিষাইয়া উঠিল। টাকার জন্য মুখ ফুটিয়া শোভাকে পুনরায় সে অনুরোধ করিতে পারিল না; স্বেচ্ছায় যে টাকা দিল না, নিজের অক্ষুণ্ণ অধিকারের জোরে তাহারই নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া লইবার প্রবৃত্তিও তাহার হইল না। ক্ষোভে, দুঃখে, ঘৃণায় সমস্ত রাত্রি সে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিল না এবং যখনই তাহার একটু তন্দ্রার মত আসিল তখনই সুরজিতের বর্ণিত সেই দুইটি তরুণের অবশ্যম্ভাবী ফাঁসির ভয়ংকর চিত্র স্বপ্ন হইয়া তাহার তন্দ্রা ভাঙিয়া দিতে লাগিল। এমনই অসহ্য যন্ত্রণায় রাত্রি কাটাইয়া ভোরে উঠিয়াই দেশ হইতে টাকা সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে কাহাকেও কিছু না বলিয়া যোগেশ কলিকাতা ছাড়িয়া গেল।

দ্বিপ্রহরে যথাসময়ে যোগেশ খাইতে আসিল না, বৈকালে জলযোগের সময়েও না এবং অবশেষে সন্ধ্যাও যখন কাটিয়া গেল তখন শোভার উদ্বেগের আর অবধি রহিল না। বাড়ির দারোয়ানকে সে স্বামীর অনুসন্ধান করিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরী, ক্লাব, অমলের বাড়ি এবং এইরূপ আরও যে কয়টি স্থানে যোগেশের যাতায়াত আছে বলিয়া জানা ছিল তাহার সর্বত্রই অনুসন্ধান করিয়া অনেক রাত্রে দারোয়ান ফিরিয়া আসিয়া যখন সংবাদ দিল যে, যোগেশের সন্ধান কোথাও মিলিল না, তখন শোভার উদ্বেগ আশংকায় পরিণত হইল। অথচ যোগেশের সন্ধান করিবার জন্য একাকিনী এত রাত্রে কি যে সে করিতে পারে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া সে নিজেই যে কেবল বিব্রত হইয়া উঠিল তাহা নহে, বাড়ির সকলকেও সে বিব্রত করিয়া তুলিল। সম্ভব অসম্ভব নানাপ্রকার কল্পনা করিয়া সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া ভোরে উঠিয়াই শোভা অমলকে ডাকিয়া আনিবার জন্য দারোয়ানকে তাহার বাড়িতে পাঠাইয়া দিল।

অমল আসিল হাসিমুখে রহস্য করিয়া কহিল, "আপনার সবে ধন নীলমণিটি ত নিতান্ত খোকা নন বৌদি যে এই কলকাতার পথে হারিয়ে যাবেন? এত ব্যস্ত হবার কোন কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না।"

শোভা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, "আপনি ত সব কথা জানেন না অমলবাবু।"

এই শোকসন্তপ্তা ভয়াতুরা নারীর সম্মুখে অমল আর রহস্যের ছলেও প্রগল্ভতা প্রকাশ করিবার সাহস পাইল না। গম্ভীর হইয়া কহিল, "সব কথা আগে আমায় খুলে বলুন, শুনি।"

শোভাও সমস্ত কথাই খুলিয়া বলিল, কিছুই গোপন করিল না। শুনিয়া অমলও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, কিন্তু কোন পরামর্শই সে দিতে পারিল না এবং উদ্বেগ ও আশংকায় শোভার বুক ফাটিয়া যাইবার মত হইলেও বাড়িতেই সে শয্যা আশ্রয় করিয়া পড়িয়া রহিল।

তাই তৃতীয়দিন সকালেই যোগেশ যখন ফিরিয়া আসিল এবং সুস্থ শরীরেই আসিল তখন শোভার আনন্দের আর অবধি রহিল না। সে ছুটিয়া গিয়া স্বামীর দুইখানি হাত জড়াইয়া ধরিয়া সাশ্রুলোচনে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কোথায় ছিলে তুমি এ কয়দিন? একটা খবরও কি দিতে নেই?"

যোগেশের বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন আলোড়িত হইয়া উঠিল, সে কহিল, "তোমার খুব ভাবনা হয়েছিল নাকি?"

"ভাবনা হয় না!" শোভা সজল চক্ষে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিল।

যোগেশ তাড়াতাড়ি নিজের হাত টানিয়া লইল, কিছু একটা কাজের অছিলায় আলমারির দিকে সরিয়া গিয়া একটি উদ্গত দীর্ঘনিশ্বাস সযত্নে চাপিয়া সে মৃদুস্বরে কহিল, "এ কথা এখন থাক। তোমার সঙ্গে এবার আমার অনেক কথা আছে, সে সব কথা একসঙ্গে পরে হবে।"

সেই রাত্রে আহারাদির পর শয়নঘরে চৌকির উপর বসিয়া যোগেশ শোভার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু অথচ গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "দেশে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে, সে সংবাদ জান শোভা?"

প্রশ্ন শুনিয়া শোভার মুখের প্রত্যাশা দেখিতে দেখিতে বিরক্তিতে পরিণত হইল। সে গ্রীবা বাঁকাইয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "এই কথা বলবার জন্য তুমি সেই সকাল থেকে পাঁয়তাড়া সুরু করেছ?"

যোগেশ ঢোক গিলিয়া উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

শোভা বিরক্তকণ্ঠে কহিল, "এ কথা আমি শুনতে চাই না।"

যোগেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর যেন চেষ্টা করিয়া শক্তি সংগ্রহ করিয়া সে পূর্বাপেক্ষা গম্ভীর স্বরে কহিল, "তুমি না চাইলেও আমাকে আজই বলতে হবে, কারণ হয়ত তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা।"

শোভা বজ্রাহতের মত স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া তৎক্ষণাৎ বাঙ্নিঃসরণ হইল না।

যোগেশ বলিয়া চলিল, "জাতির আজ জয়যাত্রা সুরু হয়েছে। মুক্তির মহাসাগরের উদ্দেশ্যে এই ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর বুকের উচ্ছ্বাস তরঙ্গ তুলে আজ ছুটে চলেছে এ যুগের ভগীরথ কৌপীনধারী বৈরাগীর শঙ্খধ্বনি অনুসরণ করে। সে শঙ্খ আমাকেও ডাকছে,—আমারও বুকের মধ্যে ফেনিয়ে উঠছে অবরুদ্ধ বেদনার কল্লোল, মুক্তিপ্রয়াসের অশান্ত উদ্বেলতা। তার তালে আমার দেহ যদি আজ সাড়া না দেয়, ওর গতির স্রোতে এই রক্ত-মাংসের পিণ্ডকে যদি ঢেলে দিতে না পারি তবে বন্ধদ্বার বয়লারের মত এ কাঠামোখানিই হয়ত ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

শোভা বিহ্বলের মত কহিল, "কি বলছ তুমি?"

জলের গ্লাসটি হাতে তুলিয়া লইয়া উহার সবটুকু জল এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিয়া যোগেশ কহিল, "বুঝতে পারছ না? আমি যাব। ঘরের শান্ত, অলস, পরম আরামের জীবন আমার জন্য সৃষ্ট হয়নি। আমার ঘর গড়ে উঠেছে পথে, আমার জন্য ভোগের আনন্দ অপেক্ষা করছে সব বিলিয়ে দেওয়া ত্যাগের মধ্যে। আমার আসল স্থান তোমার পার্শ্বে নয় শোভা, যারা সর্বস্ব পণ ক'রে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, আমার স্থান তাদের পার্শ্বে। আমি আজ সেই তাদের পার্শ্বেই গিয়ে দাঁড়াব, তাদের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়ব।"

শোভা সহসা ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, "তুমি বলছ কি? আমাকে ফেলে তুমি আবার ঐ লক্ষ্মীছাড়াদের দলে গিয়ে মিশবে?

যোগেশ দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, "হ্যাঁ। এ জীবন আর নয় শোভা—এতে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। আমার জীবনকে সব দিক দিয়েই আমি ব্যর্থ হ'তে দেব না। যার মধ্যে এক ফোঁটা সুধারও সন্ধান আমি পাই নি, যাকে মন্থন ক'রে ক্রমাগত হলাহলই আমার জুটেছে, তারই পঙ্কিল কদর্যতার মধ্যে শূকরের জীবন আর আমি যাপন করতে পারব না। আমি যাব।"

শোভা সহসা সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া যোগেশের একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, "না, তুমি যেতে পাবে না, আমায় ছেড়ে তোমাকে আমি যেতে দেব না।"

শোভার মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া যোগেশ বিষণ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "সেই জন্যই আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে যেতে হবে। আদর্শের ঐক্যের ভিতর দিয়ে যে পুরুষ ও নারীর হৃদয় এক হয় নি, তাদের সম্বন্ধ আইনের চোখে যাই হউক না কেন, সত্যের চোখে মিথ্যা। এ মিথ্যা আর আমি সইতে পারছি না, আমি যাব।"

"আর আমি?" শোভা বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করিল।

"তুমি!" যোগেশ যেন একটা ধাক্কা সামলাইয়া লইল। একটু থামিয়া অন্যদিকে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে সে কহিল, "তোমার জন্য সব পথই খোলা রইল শোভা। যে পথে তোমার ইচ্ছা, সেই পথেই তুমি যেয়ো।"

শোভার মুখে কথা ফুটিল না, একটু পরে যোগেশই পুনরায় কহিল, "তোমার উপর আমার কোন দাবীও আর রইল না শোভা। তুমি মুক্ত।"

শোভা কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, "না, আমি মুক্তি চাই না, আমি তোমাকে চাই।" বলিতে বলিতে আবার সে যোগেশের একখানি হাত চাপিয়া ধরিল।

যোগেশ হাত টানিয়া লইয়া একটু দূরে সরিয়া গেল, কহিল, "না, চাও না। তুমি চাও আমার এই দেহটিকে। কিন্তু দেহ ছাড়াও আমার একটা মন আছে, আর তুমি বোধ করি কেবলই দেহ। আমাদের মাঝের ব্যবধান দূর হ'ল না, আর হবার সম্ভাবনাও নেই। যেখানে অন্তরের মিলনের অভাব, সেখানে দেহের মিলন পাপ। এ পাপ আমি বহন করতে পারব না।"

শোভার মুখের ভাব সহসা কঠিন হইয়া উঠিল, সে ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "সাধুপুরুষ! এতদিন তোমার পাপ মনে হয় নি?"

যোগেশের মুখের উপর অকস্মাৎ কে যেন এক ঘা চাবুক বসাইয়া দিল। রক্তহীন বিবর্ণমুখে ক্ষণকাল শোভার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সে কহিল, "এতদিন পাপই করেছি শোভা। কিন্তু একবার পাপ করেছি বলেই আজীবন পাপই ক'রে যাব, সে প্রস্তাবে আমার অন্তর সায় দেয় না। তাই আমি দূরে চলে যাচ্ছি।"

দেয়ালের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল।

(১৬)

সে রাত্রে যোগেশের কথা শুনিয়া শোভা দুঃখ পাইয়াছিল, শঙ্কিতও হইয়াছিল; তথাপি যোগেশ যে সত্যসত্যই তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে, এ কথা কিছুতেই সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। সকল দুঃখ, সকল আশঙ্কার নীচে ফল্গুধারার মত এই আশা শোভার মনের এক কোণ বহিয়া বহিয়া চলিতেছিল যে, যোগেশের মনের উত্তেজনা প্রকৃতির নিয়মেই যথাসময়ে শেষ হইয়া যাইবে এবং সন্তুষ্ট হইয়া হউক, অসন্তুষ্ট হইয়া হউক, এতদিনের মতই ভবিষ্যতেও সে বাড়িতেই থাকিয়া যাইবে।

কিন্তু যোগেশ এবার তাহার গণনাকে ওলটপালট করিয়া দিয়া সপ্তাহখানিক পরেই একেবারেই নিরুদ্দেশ হইয়া গেল এবং কোথায় গেল, কি করিতে গেল, সে সম্বন্ধে শোভা বা অমলকে কোন কথাই বলিয়া গেল না। কেবল তাহাদের সরকার মহাশয়কে একখানা চিঠি লিখিয়া এই নির্দেশ সে দিয়া গেল যে, তাহার অনুপস্থিতিতে প্রয়োজনমত অমলের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াই তিনি যেন এস্টেটের কার্য পরিচালনা করেন। নিজের জন্য সে কোন অর্থ সঙ্গে লইয়া গেল না, তাহাকে নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে টাকা-পয়সা পাঠাইবার জন্য কোন নির্দেশ বা কোন ঠিকানাও সে রাখিয়া গেল না।

সমস্ত শুনিয়া অমল বিষণ্ণ গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "এ রকম যে হবে, তা আমিও ভাবি নি।"

শোভা দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দিয়া স্বীয় ললাট স্পর্শ করিয়া সংক্ষেপে কহিল, "আমার অদৃষ্ট।"

অমল ক্ষণকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর কহিল, "তাহ'লে বৌদি, এখন বোধ হয় আপনার দেশের বাড়িতেই ফিরে যাওয়া উচিত।"

"দেশের বাড়িতে?" শোভা সবিস্ময়ে অমলের মুখের দিকে চাহিল।

"তাই উচিত নয় কি?" অমল উত্তরে কতকটা যেন প্রশ্ন করিয়া বসিল।

শোভা মুখ ফিরাইয়া ক্ষণকাল মুক্ত বাতায়নপথে বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ফিরিয়া দুই বিস্ফারিত চক্ষুর অশ্রুসজল স্থিরদৃষ্টি অমলের মুখের উপর বিন্যস্ত করিয়া করুণকণ্ঠে কহিল, "সেই বনবাদাড়ের দেশে গিয়ে কি ক'রে আমি থাকব? আর সেখানে আমার কেই বা আছে?"

ঐ সজল কাতর দৃষ্টির সম্মুখে অমল বেশ একটু বিব্রত হইয়া উঠিল; তথাপি পলকের মধ্যেই সমস্ত অবস্থাটি মনে মনে আর একবার আলোচনা করিয়া লইয়া সে সিদ্ধান্তের দৃঢ়স্বরে কহিল, "বন হোক, মরুভূমি হোক—তবু উহাই যে আপনার বাড়ি বৌদি। স্বামী সঙ্গে না থাকলেও নারী যেখানে একাকিনীও কেবল নিঃশঙ্ক নির্ভাবনায়ই নয়, সহধর্মিনীর পরম গৌরবে বাস করতে পারে, সে স্থান যে আপনার জন্য বৈকুণ্ঠপুর। অন্যত্র একাকিনী থাকা ত আপনার সঙ্গত হবে না বৌদি।"

শোভা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না অমলবাবু, এতদিন পর ঐ বনবাদাড়ের দেশে আর আমি যেতে পারব না।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া অমল ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, "আপনার অভিরুচি। কিন্তু বৌদি, এই কলকাতায় আপনি যদি থাকেন, তবে এখানে কে আপনার দেখাশুনা করবে?"

"আপনি করবেন না?" শোভা অমলের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া সনির্বন্ধকণ্ঠে কহিল।

লজ্জায়, সঙ্কোচে অমলের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। সে দৃষ্টি নত করিয়া মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদার্থক কি যে কয়েকটি কথা উচ্চারণ করিল, তাহা সে নিজেও বুঝিল না, শোভাও বোধ করি ভাল শুনিতে পাইল না। অথচ শোভার একাকিনী কলিকাতা থাকার অযৌক্তিকতা ও তাহার চাইতেও বেশী অশোভনতা সম্বন্ধে যে কথা অনবরত তাহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতেছিল, সঙ্কোচ কাটাইয়া উহা যথেষ্ট স্পষ্ট করিয়াই শোভাকে বলা সত্ত্বেও সে যখন উহা না বুঝিয়া উত্তরে তাহারই বিরুদ্ধে একটা মর্মান্তিক অভিযোগ করিয়া বসিল, তখন ঐ অভিযোগ সে যেমন অস্বীকার না করিয়া পারিল না, তেমনই তাহার দিকের মূল কথাটিও সে লজ্জা ও সঙ্কোচে, আর বেশী করিয়া ব্যাখ্যাও করিতে পারিল না। সাধ্যমত শোভার যত্ন ও তত্ত্বাবধান করিতে কিছুতেই যে সে ত্রুটি করিবে না এবং যাহা সে করিবে, তাহা যে যোগেশের প্রতি তাহার পবিত্র কর্তব্য মনে করিয়াই করিবে, এই প্রতিশ্রুতি শোভাকে প্রদান করিয়া, কোনও প্রকারে ভদ্রতা বজায় রাখিয়া সেদিনের মত সে বিদায় গ্রহণ করিল।

কলিকাতার বাড়িতে শোভা এক রকম শয্যা আশ্রয় করিয়াই পড়িয়া রহিল। দিনের পর রাত্রি ও রাত্রির পর দিন কোথা দিয়া কেমন করিয়া যে কাটিয়া যাইতে লাগিল, সে সম্বন্ধে তাহার যেন কোন খেয়ালই রহিল না। নির্জন, নিঃসঙ্গ জীবন তাহার কাছে খুব নূতন নহে, স্বামী গৃহে থাকিতেও তাহার সান্নিধ্য পাইলেও সাহচর্য কোনদিনই সে পায় নাই; তথাপি এবারকার স্বামীহীন গৃহের এই নিদারুণ নিঃসঙ্গতা তাহাকে দুঃসহ পীড়া দিতে লাগিল এবং এই অনুভূতির ধারা বাহিয়া স্বীয় অতীত জীবনের চিত্রের দিকে যতই তাহার দৃষ্টি সম্প্রসারিত হইতে লাগিল, ততই উহার নিদারুণ ব্যর্থতার বেদনাও সে যেন পূর্বের চাইতেও বেশী করিয়া অনুভব করিতে লাগিল। হিন্দু নারী সে, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, বিবাহের পরেও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ঘরেই সে হিন্দু নারীর আদর্শে শিক্ষিতা হইয়াছে; স্বামী পাইবার পূর্বেই স্বামীকে সে ভালবাসিতে, ভক্তি করিতে শিখিয়াছে; স্বামী লাভ করিয়া তাহাকে সে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছে এবং এতদিন সেই স্বামীকে পাইবার জন্যই সে নিদ্রায় জাগরণে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, ভগবানের কাছে অনবরত প্রার্থনা করিয়াছে। তৎসত্ত্বেও স্বামীকে না পাইবার নিদারুণ বেদনা কেন যে তাহাকেই এত ভোগ করিতে হইল এবং অবশেষে তাহার স্বামী তাহাকে একেবারেই ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, ইহা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না এবং পারিল না বলিয়াই একটা অশান্ত, অক্ষম আক্রোশ তীক্ষ্ণদন্ত কীটের মত তাহার বেদনা-বিদগ্ধ হৃদয় যেন কুটি কুটি করিয়া কাটিয়া ফিরিতে লাগিল।

এ জন্মে কাহার কি যে সর্বনাশ সে করিয়াছে, তাহা সে স্মরণ করিতে পারিল না। পারিল না বলিয়াই প্রায়ই তাহার মনে হইতে লাগিল যে, পূর্ব জন্মে কাহার যেন ভরাডুবি করিয়া তাহার অভিশাপ মস্তকে বহন করিয়া এবার সে ধরাধামে আসিয়াছিল। তাই বুঝি এই প্রথম যৌবনেই তাহার নারীজীবন এমন শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

এই ব্যর্থ জীবন, এই নিঃসঙ্গ অস্তিত্ব, এই নিদারুণ বেদনা কেমন করিয়া যে সে আমরণ বহন করিবে, তাহা ভাবিয়া শোভা আকুল হইয়া উঠিল। অথচ কাঁদিয়া যে বুকের ভার লাঘব করিবে, তাহাও সে পারিল না। চক্ষু দিয়া তাহার এক ফোঁটা জলও বাহির হইল না; কেবল তাহার বুকের ভিতরটাই মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করিতে লাগিল।

সেদিন অপরাহ্ণে স্বপ্নকণ্টকিত তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া উঠিবার পর মুখ হাত ধুইবার জন্য শোভা নিয়মমত স্নানের ঘরে গেল না, ঠাকুরকে জলখাবার বা রাত্রির রন্ধন সম্বন্ধে কোন নির্দেশও প্রদান করিল না। অলস দেহটিকে কোনও প্রকারে পথের দিকের সরু বারান্দায় টানিয়া লইয়া গিয়া সেখানেই শোভা ছোট একখানি টুলের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সেদিন সকাল হইতেই আকাশে মেঘ জমিয়াছিল, মাঝে মাঝে দুই-এক পশলা বৃষ্টিও হইতেছিল। বোধ করি বা প্রকৃতির বিষণ্ণতাই ছোঁয়াচে রোগের মত তাহার রুগ্ন অন্তঃকরণকে পুনরাক্রমণ করিয়া তাহাকে অন্যান্য দিনের চাইতেও বেশী বিষণ্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। এখনও অন্তরের সেই বিষণ্ণতা ভারী শৃঙ্খলের মত তাহার দেহখানিকেও যেন অচল করিয়া বসিবার টুলখানির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিল। নিষ্পলক চক্ষুর লক্ষ্যহীন উদাস দৃষ্টি নীচের রাজপথের উপর বিন্যস্ত করিয়া সে স্থাণুর মত বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পর তাহার পশ্চাতে বৃদ্ধা ঝি কামিনীর মা'র কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল, "ও বৌমা, তুমি হেথায় বসে রয়েছ?—আর আমি সাড়া বাড়ি খুঁজে মরছি!"

কামিনীর মা এ সংসারের বহু পুরাতন পরিচারিকা। তাহার নিজের কন্যা কামিনীর চাইতেও ঢের বেশী যত্ন করিয়া যোগেশকে সে শৈশব হইতেই লালনপালন করিয়াছিল। তাই পরিচারিকা হইলেও এ সংসারে তাহার কর্তৃত্ব নিতান্ত অল্প ছিল না। আজ যেন সেই কর্তৃত্ব খাটাইয়াই সে শোভার নিরুত্তর মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় কহিল, "ওঠ বৌমা, এই ভরসন্ধ্যায় অমনভাবে বসে থাকতে নেই।"

শোভা ক্লান্তকণ্ঠে কহিল, "কিছুই ভাল লাগছে না ঝি-মা, বড়ই একলা মনে হচ্ছে।"

কামিনীর মা শোভার নিকটে সরিয়া আসিয়া তাহার মাথায়

হাত দিয়া সস্নেহ কোমলকণ্ঠে কহিল, "তা কি আর বুঝি না মা! তাই ত রাতদিন তোমায় বলছি, চল মা, আমরা দেশে ফিরে যাই।"

শোভা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না ঝি-মা, দেশে আমি আর যাব না। বাঁচি, মরি—এখানেই পড়ে থাকব।"

কামিনীর মা কতকটা বিরক্তকণ্ঠে কহিল, "নিজেও জ্বলবে, আমাদেরও জ্বালাবে। তা কর, কিন্তু এই ভরসন্ধ্যায় চোখের জল ফেলে গেরস্তের ঘরে অমঙ্গল ডেকে এনো না। এখন উঠ, মুখ-হাত ধুয়ে একটু জলটল খাও।"

স্নানের ঘরে যাইবার পথে সহসা ফিরিয়া কামিনীর মা'র মুখের দিকে চাহিয়া শোভা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা ঝি-মা, সেই দিনের পর অমলবাবু আর একদিনও আমাদের বাড়িতে আসেন নি, না?"

কামিনীর মা মনে মনে গত কয়েক দিনের ঘটনাগুলি একবার স্মরণ করিয়া লইয়া উত্তর দিল, "না আসেন নি। সংসারী মানুষ, বোধ করি-বা সময় করতে পারেন নি।"

শোভা কিন্তু ব্যাপারটিকে অমন সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না। বরং অনুকূল প্রতিবেশের মধ্যে নিজের নিঃসঙ্গতাবোধ যতই তাহার তীব্র হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই অমল যে প্রতিশ্রুতি দিয়াও এ কয়দিনের মধ্যে একবারও তাহার খোঁজ লইতে আসে নাই, তাহা স্মরণ করিয়া কেমন যেন একটা ক্ষুব্ধ বেদনায় তাহার বুকের ভিতরটা টন টন করিতে লাগিল।

পরদিন ভোরে উঠিয়াই শোভা সর্বপ্রথমে অমলকে একখানি চিঠি লিখিয়া খামে বন্ধ করিয়া দারোয়ানের হাতে উহা অমলের বাড়িতে পাঠাইয়া দিল।

প্রাতঃরাশ শেষ করিয়া অমল তখন বাহিরের ঘরে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল, শোভার চিঠি খুলিয়া পড়িয়া কোন উত্তর না দিয়াই দারোয়ানকে সে বিদায় করিয়া দিল এবং অতঃপর ঐ পঠিত চিঠি পুনরায় পাঠ করিয়া উহাই হাতে লইয়া ঐ আসনের উপরেই সে স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

তাহার ধ্যান ভাঙ্গিল গৌরীর কণ্ঠস্বরে, "মশায়ের আজ স্নানাহার নেই বুঝি? আজ বুঝি আপিস পালাবার মতলব আছে?"

অমল সুপ্তোত্থিতের মত ধরমর করিয়া সোজা হইয়া বসিল, প্রথমে গৌরীর মুখের দিকে, পরে দেয়ালের ঘড়ির দিকে এবং ফিরিয়া পুনরায় গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া সে কতকটা অপরাধীর মত সঙ্কুচিতকণ্ঠে কহিল, "বড্ড দেরী হয়ে গেছে দেখছি।"

গৌরী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "কি ভাবছিলে বল দেখি।"

"ভাবছিলাম?" অমল কতকটা যেন আপন মনেই কহিল, "বৌদি একখানা চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন, ওদের বাড়িতে যাবার জন্য।"

"তাতে এত ভাবনার কি আছে গো?" গৌরীর কণ্ঠে খানিকটা বিস্ময় ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার দুই চোখে অদম্য কৌতূহল ঝলকিয়া উঠিল। সে স্বামীর কাঁধের উপর দিয়া তাহার কোলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সাগ্রহকণ্ঠে কহিল, "কি চিঠি লিখেছেন শোভাদি, দেখি।"

হাতের চিঠিখানি নাড়িতে নাড়িতে গ্রীবা বাঁকাইয়া গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া অমল কহিল, "দেখবে তুমি? আচ্ছা বেশ, দেখ।"

গৌরী এক নিশ্বাসে চিঠিখানি পড়িয়া ফেলিল। সংক্ষিপ্ত চিঠি, পড়িতে বেশী সময় লাগিল না। কাঁচা হাতের বাঁকাচোরা অক্ষরে শোভা অমলকে একবার যাইতে লিখিয়াছে। গৌরী বুঝিতে পারিল না, এই চিঠি পড়িয়া কেন তাহার স্বামী সহসা এত চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। সে সন্দিগ্ধস্বরে কহিল, "তোমাকে একবার যেতে লিখেছেন, তাতে এত ভাবনার কি আছে গো?

"কিছুই নেই? তুমি অভয় দিচ্ছ?" অমল হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিতে গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া সকৌতুককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল।

গৌরী বিব্রত হইয়া আবার চিঠিখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিল। এইবার তাহার চোখে পড়িল যে মূল চিঠিতে যেমন, উপরের সম্বোধনেও তেমনই অনেক কাটাকুটি আছে। শোভা প্রথমে লিখিয়াছিল কেবল "প্রিয়", উহা কাটিয়া নীচে লিখিয়াছিল "শ্রীচরণকমলেষু", শেষ পর্যন্ত উহাও কাটিয়া লিখিয়াছে কেবল "অমলবাবু" এবং উহার পরে দিয়াছে একটি ড্যাস। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ইহাই পরীক্ষা করিতে করিতে গৌরীর ওষ্ঠপ্রান্তে কুটিল হাসির সূক্ষ্ম একটি রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তাতে হয়েছে কি? চিঠি ত তিনি বেশী লেখেন না—কাকে কি সম্বোধন করতে হয়, তা হয়ত তিনি জানেনই না। এই কাটাকুটির ভিতর দিয়ে তার অজ্ঞতাই ফুটে উঠেছে—তোমার প্রতি তার প্রেম নয়। বুঝলে বোকারাম?—প্রেম নয়।" বলিয়া গৌরী স্বামীর কপোলের উপর আঙ্গুলের মৃদু একটু চাপ দিল।

অমলও হাসিল, কহিল, "আমিও জানি যে এ প্রেম নয়। তবে আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা অতি সাধারণ ত্রুটিবিচ্যুতির মধ্যেও গোপন মনের অনেক কালো কামনার প্রকাশ দেখতে পান কি না, তাই যা ভাবনা।"

একটু থামিয়া সে গম্ভীর হইয়া কহিল, "কিন্তু করা যায় কি বল দেখি। ওঁকে দেশে যাবার পরামর্শ দিলাম, উনি রাজী হলেন না। অথচ এখানে থাকলে উনি বার বার নানা কাজের জন্য আমাকে কেবল ডাকবেনই। এ ঝঞ্ঝাট আমি এড়াব কি করে?"

গৌরী উত্তরে একটা পাল্টা প্রশ্ন করিল, "ঝঞ্ঝাট এড়াতে তুমি চাইছই বা কেন?"

অমল গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "কারণ এর শেষ যে কোথায় তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

ক্ষণকাল কি চিন্তা করিয়া গৌরী কহিল, "শোভাদি' তোমার বন্ধুর স্ত্রী। বন্ধু নিরুদ্দেশ। তার স্ত্রীর দায়িত্ব ঝঞ্ঝাট যদি হয়ও, তুমি তা এড়াতে পারবে না। তিনি যখন তোমায় ডেকেছেন তখন যেতে তোমাকে হবেই,—চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। এতদিন যে আমরা যাই নি সেটা আমাদেরই অন্যায় হয়েছে। তবে আমি বলি, তুমি এক কাজ কর। কাশীতে শোভাদি'র যে কাকা না জ্যাঠামশায় আছেন, তাঁকে একবার খবর দাও। তিনি এলে সমস্ত ব্যাপারটারই হয়ত একটা সুরাহা হবে।"

স্ত্রীর পরামর্শ অমল আকাশের চাঁদের মতই সাগ্রহে লুফিয়া লইল এবং হরিহর বাঁড়ুয্যেও অমলের পত্র পাইয়া কাশী হইতে হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু পিতৃব্যের নির্বন্ধাতিশয্যেও শোভা বৈষ্ণবপুরে শ্বশুরের ঘরে যাইয়া জমিদারী করিতে রাজী হইল না, কাশীতে জ্যেষ্ঠতাতের সঙ্গে থাকিয়া বাবা বিশ্বনাথের পূজা ও অন্যান্য ধর্মাচরণে মনোযোগ দিবার উপদেশও সে দৃঢ়তার সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করিল। সকল যুক্তি, সকল অনুরোধ ও সকল আদেশের প্রত্যুত্তরে বার বার সে একই উত্তর দিল, "আমি যাব না।"

অমলের উপস্থিতি যেন বিস্মৃত হইয়াই উত্তেজিত বৃদ্ধ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি যুবতী স্ত্রী; এই কলকাতা শহরে তুমি একা থাকলে কে তোমার তত্ত্বাবধান করবে?"

কিছুমাত্র ইতস্তত না করিয়া শোভা উত্তর দিল, "কেন, অমলবাবু?"

(শেষাংশ ৪৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

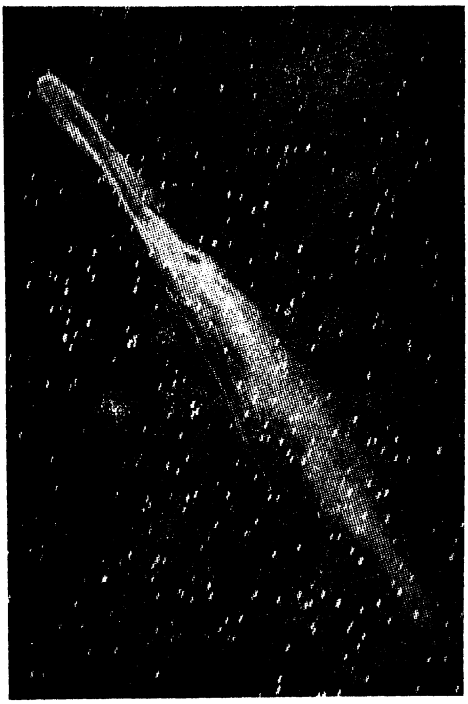
গগনচারী অতিথি

ভাস্করাচার্য

ধূমকেতু!

লোকে বলে ধূমকেতুর মত আকস্মিক। আকস্মিক, তাই অস্বাভাবিক—নিয়মের ব্যতিক্রম। তাই ধূমকেতু কেবল আকস্মিক নয় অমঙ্গল—সভ্যতার প্রথমপাদে শিশুমন একথাই শিখেছিল।

কিন্তু উত্তরকালে শিশুর অনেক কথাই যায় পাল্টে। তেম্‌নি এ ধারণাও পাল্টাল। ধূমকেতু আকস্মিকও নয়, অমঙ্গলও নয়—ধূমকেতু গগনচারী অতিথি মাত্র।



"মোর হাউস" ধূমকেতু। ১৯০৮ সালের নভেম্বর মাসে আলোকচিত্র গৃহীত হইয়াছে

আকাশের তারা গুণে যে সব কবি-বৈজ্ঞানিক বিশ্বরহস্য-উদ্‌ঘাটন করেন, তাঁদের কাছে এই আকস্মিক আবির্ভাব অঙ্কের খাতায় তলিয়ে যায়; তাঁরা এম্‌নি অনেক বিস্ময় দিবারাত্র দেখ্‌ছেন। বিশ্ব সম্প্রসারণশীল কি না এই নিয়ে তাঁরা গবেষণা করেন এবং তারা যে সূর্যের চাইতেও ঢের ঢের বড় ও তেজী এসব তত্ত্ব তাঁদের কাছে সহজ হ'য়ে গেছে এবং তাঁরা অনায়াসে হিসেব ক'রে ব'লে দিতে পারেন—অমুক তারার আলো পৃথিবীতে পৌঁছোতে এত বছর লেগেছে, বল্‌তে পারেন অমুক তারাটা এগোচ্ছে না পিছোচ্ছে৷ সাধারণ লোকের চোখে অন্ধকার রাতে নির্মেঘ আকাশে চুম্‌কির মত অজস্র তারা, শুক্লপক্ষে চাঁদ আর দিনে সূর্য এছাড়া আর কিছুই পড়ে না; কিন্তু এই শাদা মোটা চোখে কেউ কেউ আর একটা জিনিষও নাকি দেখেছে সেটা ধূমকেতু। ধূমকেতু প্রত্যক্ষ করার চাইতে ধূমকেতুর গল্পই সংসারে বেশী, প্রবাদ ততোধিক।

ধূমকেতুর আকস্মিক আবির্ভাব আদৌ সম্ভব কি না আর সে সম্ভাবনা বৈজ্ঞানিকের হিসাবকে উপেক্ষা ক কি না আমাদের মোটামুটি সেইটে জান্‌লেই ধূমকেতুর গতি, তার গতিপথ এবং সেই গতি ও গতিপথ কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, সবার আগে এই কথাটা জানা দরকার। তা জান্‌লেই আমরা বুঝতে পার্‌ব, এমন একটা আকস্মিক আবির্ভাব সম্ভব কি না বা ধূমকেতুর পথবিচ্যুতির সম্ভাবনা আছে কি না। যার পথ আছে তারই পথবিচ্যুতির সম্ভাবনা থাকে। ধূমকেতুর এমন কোন পথ আছে কি? তার জবাব হবে, আছে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় তার নাম কক্ষ। ধূমকেতুর কক্ষ দুই রকম, অন্তত —প্রধানত দুই রকম। উপবৃত্তাকার (elliptical) ও অধিবৃত্তাকার (parabolic)। সাধারণত বড় ধূমকেতুর কক্ষগুলো উপবৃত্তাকার। যার কক্ষ উপবৃত্তাকার তাকে ঘুরে ফিরে আস্‌তেই হয় এবং তেমন কোন ধূমকেতু যদি এই সৌরজগতের কোন গ্রহের পরিবারভুক্ত হয় তবে আমাদের পক্ষে তাদের দর্শনলাভও একেবারে আকস্মিক হবে না। একেবারে আকস্মিক বল্‌লাম তার কারণ, দেখা গেছে দু এক বছরের এদিক হ'তে পারে। আমাদের সময়ের মাপকাঠিতে তাদের আনাগোনার এই যে ব্যতিক্রম তার কারণ প্রথমত ধূমকেতু ক্রমক্ষীয়মান, দ্বিতীয়ত তার ওপর বিভিন্ন গ্রহের বা অন্য কোন গগনচারীর প্রভাব। এই প্রভাবের ফলে ধূমকেতুর কক্ষের আকার পরিবর্তিত হ'তে পারে। ধূমকেতুর ভর (mass) অতি অল্প। কাজেই এ যখন কোন একটি ধূমকেতুর দিকে এগোতে থাকে তখন তার কক্ষ পরিবর্তিত হ'তে পারে; যে ধূমকেতুর কক্ষ ছিল উপবৃত্তাকার তা অধিবৃত্তাকার হ'তে পারে এবং যা অধিবৃত্তাকার ছিল তা উপবৃত্তাকার হ'তে পারে। সাধারণত গ্রহ, বিশেষ করে বড় গ্রহগুলোই ধূমকেতুর কক্ষাকৃতি পরিবর্তিত করে। ২৩৯টি ধূমকেতুর মধ্যে ১২২টির কক্ষ উপবৃত্তাকার, ৯১টির অধিবৃত্তাকার, ৯৬টির কক্ষ পরাবৃত্তাকার (hyperbolic)। সাধারণত অধিবৃত্তাকার ধূমকেতুর পুনরাবির্ভাব হয় না। কিন্তু গ্রহের ফলে কক্ষাকৃতি বদ্‌লালে তার প্রকৃতিও বদ্‌লাবে। ধূমকেতুর আবির্ভাবে স্থায়ী কিছু নেই। গতিই তাদের একমাত্র পরিচয়। কিন্তু তাও হিসেব করা মুস্কিল। কেননা গ্রহের সংস্পর্শে এসে তার ভেতর এমন একটা বিপ্লবী পরিবর্তন ঘট্‌তে পারে যাতে তাকে চেনাই দায় হ'য়ে উঠ্‌বে হয় তো ধূমকেতুর পুচ্ছের অভাব ঘটেছে, হয়তো আরও উজ্জ্বল হ'য়েছে নয়তো ম্লান হয়েছে। কাজেই, দেখেই যে বল্‌বেন, এই যে মশাই, অনেকদিন পর দেখা এ অহঙ্কার চল্‌বে না। আর ধূমকেতু তার সমগ্র কক্ষের একটা সামান্য অংশে মাত্র দেখা যায় এবং তখনই দেখা যায় যখন ধূমকেতুটি উপবৃত্ত ও অধিবৃত্তের সেই প্রান্ত অতিক্রম করতে থাকে, যে প্রান্তটি সূর্যকে ঘুরে গেছে।

পর্যাবৃত্তিক (periodic) ধূমকেতুর প্রত্যাবর্তন বল্‌তে গিয়ে এটা ধরে নেয়া হয় যে, গ্রহ ও সূর্যের মাধ্যমিক আকর্ষণ ছাড়া এর ওপর আর কোন শক্তিই সক্রিয় নয়। অপরপক্ষে ধূমকেতুর পুচ্ছ পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখা গেছে যে, সূর্যের বিকর্ষণাত্মক শক্তি তাদের তাড়িয়ে বেড়ায়, অনেকক্ষেত্রে এ শক্তি মাধ্যমিক আকর্ষণের চাইতেও বেশী।

এই পুচ্ছ সমগ্র ধূমকেতুর একাংশ মাত্র। ধূমকেতু মোট তিন অংশে বিভক্তঃ মাথা, নিউক্লিয়াস্ ও পুচ্ছ। প্রথমে মাথাটিই দেখা যায়, কেন না মাথার দিকটাই সূর্যের দিকে এগোতে থাকে। দেখ্তে অনেকটা ঝাপ্সা তারার মত। এর মাত্রা ব্যাসের পরিমাপে ১০,০০০ থেকে ১,০০০,০০০, মাইল পর্যন্ত হয়। অনেক ধূমকেতুর এত বড় মাথা যে, সূর্যের চাইতেও অনেক বড়। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে যে ধূমকেতুটি দেখা গিয়েছিল তার ব্যাস ছিল ১,২০০,০০০ মাইল। ধূমকেতু সূর্যের দিকে যখন এগোয় তখন তার মাথাটা সঙ্কুচিত হয়।

নিউক্লিয়াস হ'চ্ছে মাথার মধ্যকার ঘনীভূত ঔজ্জ্বল্যের ভর। এ পর্যন্ত সব চাইতে বড় নিউক্লিয়াস দেখা গেছে ১৮৪৫এর ধূমকেতুর মাথায়। নিউক্লিয়াসের আলো প্রায়ই সূর্যের প্রতিফলিত আলো।

ধূমকেতুর পুচ্ছটিই সব চাইতে বিস্ময়কর অংশ। একটা পালক যেন সারা আকাশ ঝেঁটিয়ে বেড়াচ্ছে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে যে ধূমকেতুটি দেখা গিয়েছিল তার দৈর্ঘ্য ১০০,০০০,০০০ মাইল এবং সীমান্তের বিস্তার ১০,০০০,০০০ মাইল। এর আয়তন সূর্যের চাইতে শত সহস্র গুণ বেশী হয়। তুলনায় এর ভর বা ওজন সামান্য। এই পুচ্ছ এত পাৎলা যে অত্যন্ত ম্লান তারার আলোও নিষ্প্রভ করে না বা কোন গ্রহ যদি এর ভেতর দিয়ে যায় তবুও গ্রহের কিছু হয় না। ধূমকেতু যখন সূর্যের দিকে এগোতে থাকে তখন মাথার পেছনে চলে পুচ্ছ কিন্তু ধূমকেতু যখন পালিয়ে যেতে থাকে পুচ্ছকেই মাথা অনুসরণ করে। সাধারণ বিশ্বাস যে, পুচ্ছটি একটি ফাঁপা কোণ, তার মধ্যে শক্ত কণা আছে, সম্ভবত খুব ছোট ছোট কণা। প্রত্যেকটা কণার চারদিকে গ্যাসের আবরণ। এই কণাগুলো নিউক্লিয়াস থেকে বিচ্ছুরিত হয় এবং সূর্যের কোন একটা বিকর্ষণাত্মক শক্তি এদের এমন আচরণ করায়। এছাড়া মাধ্যমিক আকর্ষণ তো আছেই। যে বস্তুগুলো এভাবে বিচ্ছুরিত হয় সেগুলো ক্রমশ ধূমকেতু থেকে বিচ্যুত হয় এবং এর ফলে ক্রমশ ধূমকেতুটিও বিলুপ্ত হয়। পুচ্ছে যে সব বস্তু আছে সেগুলো মাথার বস্তুর চাইতে অনেক মিহি। মাথার গুলো ড্যালা ড্যালা। এজন্য মাধ্যাকর্ষণের তুলনায় বিকর্ষণাত্মক শক্তি নগণ্য। পুচ্ছকে যে বিকর্ষণাত্মক শক্তি তাড়িয়ে বেড়ায় তার প্রকৃতি সম্পর্কে দুটো ইঙ্গিত করা যেতে পারেঃ রশ্মির চাপ ও বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ।

পুচ্ছকে তাড়িয়ে দেবার ব্যাপারে অন্যান্য শক্তিও যে ক্রিয়াশীল তার আরও প্রমাণ আছে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় পুচ্ছটা হচ্ছে একটা পাখার মত মাথা থেকে বিচ্ছুরিত কতগুলো রশ্মিজাল। এর বাইরের অংশ সূর্যের লাইন থেকে বেশ একটা কোণ রচনা করে। যে শক্তি ঐ রশ্মিজালকে বহির্মুখী করে তার স্থান নিশ্চয়ই মাথায় এবং বৈদ্যুতিক বিকর্ষণই এ বোঝ্বার পক্ষে সব চাইতে সম্ভবপর সমাধান ব'লে মনে হয়।

মনে হতে পারে, বেশীর ভাগ পদার্থ মাথাটাকে সূর্যের দিকে রাখে; কিন্তু সৌর বিকর্ষণাত্মক ক্রিয়ায় শিগ্‌গিরই পেছনদিকে বেঁকে যায়। ঠিক ঝরণার জলের মত; জলের চাপে ওপর দিকে ওঠে বটে কিন্তু মাধ্যাকর্ষণে নীচে গড়িয়ে পড়ে।

পুচ্ছের পদার্থ বিচ্ছুরণ অবিরাম নয়, থেকে থেকে ঘটে। মোরহাউস ও হ্যালি ধূমকেতুর ফোটো তোলা হয়েছিল। তাতে দেখা গেছে খসে-পড়া পুচ্ছ ও নূতন পুচ্ছের মাঝখানে অনেকটা ফাঁক।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী জোহানেস্‌বার্গে একটি ধূমকেতু দেখা যায়। কিন্তু হ্যালির ধূমকেতুর আগে ধূমকেতু সম্বন্ধে সুশৃঙ্খল কোন নিয়ম বোঝা যায় নি। হ্যালি ধূমকেতু হ্যালি সাহেবের নামে এবং সে ধূমকেতুর আবির্ভাব ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে। হ্যালি সাহেব এই সিদ্ধান্ত করেন যে, ধূমকেতু পর্যায়ক্রমে ফিরে আসে। সময়ের সামান্য তারতম্য ঘটে বটে কিন্তু মোটামুটি পর্যায়টা বোঝা যায়। সাধারণত তারা পচাত্তর বা ছিয়াত্তর বছর পর পর আসে। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে যেটা দেখা গিয়েছিল সেটাই ১৫৩১, ১৪৫৬, ১৩০১, ১১৪৫, ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ঘুরে ফিরে গেছে। হ্যালি সাহেব ১৩৩৬ থেকে সুরু করে ২৪টি ধূমকেতুর খবর নিয়েছিলেন। এই হিসাবের ওপর নির্ভর করে অ্যালেক্সিস ক্লড ক্ল্যারিয়্যাণ্ট ১৭৫৯এর ১৩ই এপ্রিল ধূমকেতুর আবির্ভাবের দিন ঠিক করেন। তখনও নেপচুন ও ইউরেনাস গ্রহ আবিষ্কৃত হয় নি। ধূমকেতু ঐ বছরের ১৩ই মার্চ সূর্যের সব চাইতে কাছে আসে। পর্যায়ক্রমে কুড়িটি ধূমকেতু যাতায়াত ক'রতে লক্ষ্য করা গেছে।

ধূমকেতু সৌর জগতেরই অংশ। তাদের সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে। ধূমকেতু সৌর জগতের অংশ হ'লে একথাও বলা চলে যে, তাদের উৎপত্তির উৎসটাও এক। আর যে ধূমকেতুগুলো একই কক্ষে বিচরণ করে, বুঝতে হবে তারা একই ধূমকেতু থেকে একাধিক হয়েছে।

পিকারিংয়ের মতে জুপিটার পরিবারে ৩৪টি ধূমকেতু আছে। সেগুলো তিন বছর থেকে আট বছর পরপর ফিরে আসে। শনিচক্রে আছে দু'টি। তের বছর পরপর তারা ফিরে আসে। ইউরেনাসের আছে দু'টি। হ্যালি ধূমকেতুসহ নেপচুনের আছে দুটি। ইউকের ধূমকেতুটির পর্যাবৃত্তিক সময় সবচাইতে কম—সোয়া তিন বছর মাত্র। দীর্ঘতম পর্যায় দশ লক্ষ বছর। সৌর জগতে মোট ১২০,০০০ ধূমকেতু আছে।

ধূমকেতুকে প্রাচীনকালে অমঙ্গলের লক্ষণ বল্‌ত বটে কিন্তু তাই থেকেই আমরা ধূমকেতুর ইতিহাস খুঁজে পাই। চীনদেশের উপাখ্যানে ধূমকেতুর উল্লেখ খুবই পাওয়া যায়। রোমান দার্শনিক সেনেকা বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে এমন কেউ জন্মাবেন যিনি এদের প্রকৃতির কথা আমাদের জানাতে পারবেন। অ্যারিষ্টটলের ধূমকেতু সম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণা ছিল। তাঁর ধারণা ছিল যে, ধূমকেতু পৃথিবীরই কোন উদ্ভূতি—বায়ুস্তরে গিয়ে জ্বলে উঠ্‌ত মাত্র।

টাইকো ব্রেহে প্রমাণ করেন যে, ধূমকেতুরা চাঁদের চাইতেও অনেক দূরে অতএব এরা নিশ্চয় গগনচারী। তিনি বলেন,

(শেষাংশ ৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মানচিত্র

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

মেয়েটির ফিট হইয়াছে। দুই বছরের মেয়ে। দু'দিনের জ্বর। আজই ফিট। কোথায়ও কিছু নাই। বেশ ভাল মেয়ে, পিসিমা কোলে করিয়া বেড়াইতেছেন, হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন জল আন জল, বাছা আমার নীল হয়ে গেল—

জল আসিল। পাখা আসিল। খালি হাতে আরও অনেকে আসিল পাশের বাড়ির বৌটি পর্যন্ত। সাধারণত ইহাদের মুখ দেখাদেখি নাই। পাশের বাড়ি কিনা! ছেলেমেয়ে লইয়া ঝগড়া লাগিয়াই আছে, দারিদ্র্যের মত। ঝগড়া অবশ্য বেশি সময় ছেলেমেয়েদের ভিতর থাকে না। বাড়ির বৌরা, বৌয়ের শাশুড়ীরা কোমরে কাপড় জড়াইয়া আসিয়া দাঁড়ায়। দুই পক্ষের কথা কাটাকাটি চলে কিছুক্ষণ। গোলমালে কেহই কিছু শুনিতে পায় না বোধ হয়। পাইলে অনেক আগেই কানে হাত দিয়া সরিয়া পড়িত। এক কথায় কুরুক্ষেত্রের খণ্ড পর্ব অভিনীত হইয়া যায়। কোলাহল থামিয়া আসে যখন, দেখা যায় তার বহু আগেই হয়ত এ বাড়ির তিন বৎসরের মেয়ে রাণু আর ও বাড়ির চার বছরের ছেলে খোকন, যাহাদের লইয়া এই প্রলয় কাণ্ড, তাহারা ঘরের নিরালা একটি কোণে গলাগলি ধরিয়া ঘুমাইয়া আছে। সামান্য ছেলেদের কলহ লইয়া ব্যাপার এতদূর গড়াইয়াছে, বিশ্বাস করা যায় না। চৈত্র সন্ধ্যায় যে আগুন সমস্ত গ্রামখানার মুখে কালি ঘসিয়া দিয়া গেল, কাহারও বাড়ির আবর্জনা পোড়াইতে গিয়া তাহার উৎপত্তি, বলিয়া না দিলে একথা কার মনে হইবে? ঝগড়া ত আছেই। তাই বলিয়া বিপদআপদের সময় সে কথা মনে করিয়া রাখিলে চলে না। বৌটি তাই কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তোমরা সরো ভাই একটু, গায়ে হাওয়া লাগতে দাও ওর —দুই হাতে ঠেলিয়া ভিড় সরাইয়া দিল বৌটি। এ-পাড়ায় বৌ হইয়া আসিয়াছে সে, একথা সব সময় মনে রাখিলে চলে না, কবে কোন দিন কি লইয়া কাহার সাথে ঝগড়া হইয়াছিল, দীর্ঘদিন পরে তাহার সাথে দেখা হইলে সেকথা মনে রাখিতে নাই যেমন।

জল আসিল। পাখাও আসিল। হাওয়া করিতে করিতে পিসিমা ঘামিয়া উঠিলেন। ওদিকে কান্নাকাটি সুরু হইয়া গেল। দু'ঘণ্টায় যাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল না, আবার সে ভাল হইয়া যাইবে, তোমাদের কেউ নয় তাই তোমরা বলিতেছ, যে মা সে একথায় বুক বাঁধিতে পারে নাকি কখনও।

বাহিরের ঘরে ভীষণ গোলমাল হইতেছে। সুরেনবাবু অপ্রত্যাশিতভাবে জিতিয়া গেলেন। পিসিমা আরও অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বাড়িতে ডাকাত পড়ুক, সব হেজে মজে যাক, তোমরা দাবা আগলে বসে থাক। প্রাণ গেলে প্রাণ পাওয়া যাবে, কিন্তু খেলার সময় আর আসবে না।

সব কথা সুরেনবাবুর কানে যায় নাই। ডাকাত পড়ার কথাটা সম্ভবত শুনিয়াছিলেন। আকাশের দিকে তাকাইয়া বুঝিলেন বেলা এগারোটার বেশি নয়। সুতরাং ডাকাত পড়ার উপযুক্ত সময় নয় এটা। মৃদু হাসিয়া কাগজটি বিছাইলেন তাই। অর্থাৎ আর এক হাত হইয়া যাক।

পিসিমা এইবার একটু বাড়াবাড়ি করিলেন। টান মারিয়া গুটিগুলি ছিটকাইয়া দিলেন। কচি মেয়েটা শেষ হয়ে গেল, তা একটুও যদি হুঁস থাকে,—নিজে একটা অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন, তাই পিসিমার গলা অনেক নরম হইয়া আসিয়াছে।

সুরেনবাবু বিশেষ কিছু বদলাইলেন না। তিনি যেন জানিতেন। বৃদ্ধ বয়সের সন্তান, মুখে এইভাবে চুনকালি দিতেই আসিয়াছে সে। না হইলে সে-দিনের মেয়ে, আজই তার ফিট। তাঁর বড় ছেলেরাও ত আছে। তাদের কোন দিন এ সব হয় নাই। এমনিই হয়। বর্ষার স্রোত পলিমাটি দিয়া উর্বর করে দেশকে, অসময়ে বান আসিয়া দেশকে ডোবাইতে পারে শুধু। অসময়ের সন্তান সুরেনবাবুর। তাহাকে ডোবাইতে আসিয়াছে। সুরেনবাবু বাহির হইয়া গেলেন।

পিসিমা গুটি কয়টি খুঁজিতে লাগিলেন। মেয়ের ফিট কিছু চিরকাল থাকিবে না। কিন্তু গুটি যদি কম পাওয়া যায়, টাকা দিয়া আবার কিনিয়া আনিতে হইবে হয়ত। সংসারে আয়ের পথ একটি, কিন্তু খরচের পথ একশো। বিধবা হইয়া ভাইয়ের সংসারে আসিয়াছেন পিসিমা। আয়ের পথ বাড়াইতে না পারুন, ব্যয়ের পথ কমাইবার চেষ্টা করিবেন বৈকি তিনি!

ফিটও আছে ফিটও নাই। ও-বাড়ির দিদিমা ত এসব কম দেখেন নাই। কিন্তু একদিনের মধ্যে একবারও জ্ঞান ফিরিয়া আসিল না, এ কোন দেশী ফিট? বাধ্য হইয়া তিনি শেষ চেষ্টা করিলেন ধারালো কাঁচি দিয়া মেয়েটির কানের সামান্য অংশ কাটিয়া দেওয়া হইল। এমনিতেই মরিত মেয়েটি, এখন যদি বা বাঁচে।

হাজার হইলেও অভিজ্ঞতা আছে দিদিমার। মেয়েটি চোখ মেলিয়া তাকাইল। মাকে চিনিল, বাবাকেও। দিদিমা আগাইয়া আসিলেন, আমাকে চিনতে পারিস খুকি, আমাকে। খুকি চোখ বুজিল। তাহাকে চিনিতে পারিবে না। গেল চব্বিশ ঘণ্টায় সে যখন সব কিছু ভুলিয়া ছিল, দিদিমার লোলুপ চেহারা তখনও সে ভুলিতে পারে নাই বোধ হয়। যাই হোক জ্ঞান ফিরিয়া আসিল মেয়েটির।

ভিড় কমিয়া গেল। বরফ গলিয়া যায় যেমন। চব্বিশ ঘণ্টা পরে আজ যাহারা প্রথম আসিয়াছিল, আসিয়াই ফিরিয়া যাইতে হইল বলিয়া তাহারা সুখী হইতে পারিল না।

পিসিমা সুরেনবাবুকে বলিলেন, বাইরের ঘরে যাও দাদা, বিছানার উপর ছক বিছিয়ে রেখে এসেছি।

জ্ঞান ফিরিল মেয়েটির, কিন্তু জ্বর আসিল। ডাক্তার বলিলেন, টাইফয়েড, সময় নেবে। মা বলিলেন, টাইফয়েড সাথে করে আনছে বলেই ফিট্‌টা অতক্ষণ ছিল ঠাকুরঝি। পিসিমা বলিলেন, আচ্ছা মেয়ে বাবা, কি ভয়টাই দেখিয়েছিলি।

একুশ দিন পরে ডাক্তার জানাইলেন—আর ভয় নেই। সেবা শুশ্রূষা করুন, আস্তে আস্তে ভাল হয়ে উঠবে এইবার। পিসিমা বুক দিয়া করিলেন। ভাইয়ের ছেলে আর নিজের ছেলেতে তফাৎ নেই কোনো, বিশেষ করিয়া ভাইয়ের সংসারেই থাকিতে হইবে যখন। মেয়েটির প্রাণের হানি ঘটিল না, কিন্তু বুদ্ধির হানি ঘটিল।

* * * *

সেদিন আপিস থেকে সকাল সকাল বাড়ি ফিরিল প্রকাশ। দরজা খুলিয়া লজ্জায় পড়িল সান্ত্বনা। বলা কওয়া নেই, এইভাবে আসতে হয় নাকি?

সেই যে সেদিন সাপ্তাহিকে তোমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখেছিলাম না সান্ত্বনা, সম্পাদক আজকে তার জন্যে ছ'টা টাকা দিলেন। তাই তোমার জন্যে একটা দুল কিনে আনলাম। বিয়ের পর তোমাকে ত কিছুই দিতে পারি নি,—নিজের হাতে সান্ত্বনার একটি কানে দুল পরাইয়া দিল প্রকাশ।

বাঃ, ভারি সুন্দর ত?

সুন্দর হবে বৈকি। সোনার উপর মীনা করা জিনিষ অমন সুন্দরই হয়।

তাই নাকি? কই আরেকটা?

আরেকটা দিয়ে কি হবে, একটা কানেই পরবে তো তুমি! ও।

আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজের মুখটাকে বার বার দেখিল সান্ত্বনা। এককানে দুল পরিয়াছে, এটা যে ভালো দেখায় না, একথা সেও বুঝিল বোধ হয়। তাই যতবার আয়নার দিকে তাকাইল, প্রত্যেক বারই খালি কানটি হাত দিয়া আড়াল করিয়া রাখিল সে।

পাশের ঘরে চেয়ারে বসিয়া সিগারেট ধরাইল প্রকাশ। আয়নার সামনে সান্ত্বনাকে এইভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া নূতন একটি গল্পের আইডিয়া তাহার মনে আসিয়াছে। আগের চাইতে এটা জমিবে ভাল। আইডিয়াটা আরও করুণ। বাঙলা দেশে করুণ রস ছাড়া আর কিছু নাকি জমে না।

এ গল্পের টাকাটা পাইয়া সান্ত্বনাকে আর একটা দুল কিনিয়া দিতে হইবে। সান্ত্বনার কানের সামান্য অংশ কাটা, কিন্তু তাহাতে দুল পরিবার কোন অসুবিধা হয় না।

গগনচারী অতিথি

(৪৪৮ পৃষ্ঠার পর)

ধূমকেতুর চলাচল উপবৃত্ত ও অধিবৃত্ত দিয়েই বোঝান যায় এবং এরা সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। নিউটনও এই নীতিরই প্রয়োগ করেছিলেন এবং হ্যালি সাহেবের সহযোগিতা পেয়েছিলেন।

ধূমকেতুর জন্মবৃত্তান্ত মনে জাগে। একথা স্বীকার করা ভাল যে, এ সম্বন্ধে সন্তোষজনক কোন সিদ্ধান্ত করা যায় নি। সূর্যের পদার্থ টগ্‌বগ করছে এবং এদের উৎক্ষেপণ গতি যদি সেকেণ্ডে ৩৮৩ মাইল হয় তবে তা আবার সূর্যেই ফিরে আসবে। কিন্তু কোন গ্রহের বিপর্যয় দরুণ সূর্য তার উপরিভাগের খানিকটা হারিয়ে বস্‌তে পারে। সেই হারানো পদার্থসমষ্টি সূর্যেরই চারদিকে দীর্ঘ উপবৃত্তাকারে ঘুরে মরবে। কিন্তু এমন অসংখ্য ধূমকেতু আছে যেগুলোর কক্ষ সূর্য থেকে দশ কোটি মাইলের সীমার মধ্যেও নেই। তাদেরকে তো বলা চলে না যে তাদের উৎপত্তি সূর্য থেকেই।

১৩৯টি ধূমকেতুর স্পন্দন প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ গ্রহগুলোর স্পন্দন যেদিকে এদেরও সেদিকে; আর ১৫৭টি ধূমকেতুর স্পন্দন পশ্চাদ্বর্তী।

স্বল্প পর্যাবৃত্তিক ধূমকেতু এককালে দীর্ঘ পর্যাবৃত্তিক ধূমকেতু ছিল কিন্তু এক বৃহৎ গ্রহের সংস্পর্শে এর এমন বিপর্যয় ঘটে গেছে যে, এর পর্যাবৃত্তিককাল স্বল্পস্থায়ী হ'য়ে পড়েছে।

ধূমকেতু থেকে অবিরাম উল্কাবৃষ্টি হয়। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুস্তরে না আসা পর্যন্ত আমরা তাদের অস্তিত্ব টের পাই না। যেগুলো আসে কেবল সেগুলোই চোখে পড়ে।

ধূমকেতুর ভর আমাদের পৃথিবীর ভরের ১০০,০০০ অংশের এক অংশ। কিন্তু যার বল্‌তে গেলে কোন ওজনই নেই তার এত দ্রুত গতি কি করে হয়? হাল্‌কা পদার্থের শ্লথ গতিই তো হওয়া উচিত।

কিন্তু তা হয় না।

তার কারণ, একথা আমাদের ভুল্‌লে চল্‌বে না যে, আন্তঃগ্রহের মাঝখানে কোন প্রতিরোধী বাহন নাই। দুমুখ আট্‌কানো একটি লম্বা নল থেকে হাওয়া বের করে নিয়ে তাতে একটি পালক ও গুলী ছেড়ে দিলে দুটোই সমান গতিতে নীচে পড়ে যাবে। বাধা না থাকায় কুয়াসার মত "পদার্থহীন" ধূমকেতু কঠিন পৃথিবীর মতই দ্রুত ও স্বচ্ছন্দ গতিতে ঘুরে বেড়াতে পারে।

ডাক

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

সাদা মার্বেলের বিশাল ফটক। ফটকের ওপারে পাথরের কুঁচি ছড়ানো পরিচ্ছন্ন পথ, ফুলের বাগান। বাগানের যেখানে শেষ, সেখান থেকে আরম্ভ গাড়ি-বারান্ডা। দু'দিকে সিঁড়ি উঠে গেছে ঘোড়ার ক্ষুরের মতো বাঁকা। ফটকে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে দরজা জানলার ফ্যাসান-দুরস্ত কাজ, বারান্ডা আর ব্যালকনির উগ্র আধুনিক ডিজাইন। একতলা, দুতলা। তিনতলায় এসে চোখ স্থির হয়ে যায়। মাঝখানে একটা জ্যামিতিক কোণ সৃষ্টি করে কার্নিস দুটো অদ্ভুত-ভাবে ঘুরে গেছে। জানলার কোনটা বন্ধ, কোনটা খোলা। খোলা জানলার পথে মাঝে মাঝে যেটুকু চোখে পড়ে, তা খাট বা ড্রেসিং-টেবল্ বা আলমারী বা বিচিত্র বিলাসী আসবাবের যে কোনো একটার ভগ্নাংশ হ'তে পারে, আসল কথা মেহগিনীর চক্চকে পালিশটুকুই চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তারপর চারতলা। অতদূর দৃষ্টি যায় না। চোখ ঝাপ্সা হয়ে আসে। অট্টালিকার এই আকাশভেদী বিস্ফারের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝিম্ঝিম্ করে।

মোটের ওপর এটা হ'ল সমৃদ্ধির সংক্ষিপ্ত পটভূমিকা, বৈভবের বহিরাবরণ। পাড়ার লোক কেউ বলে রাজবাড়ি, 'বড়বাড়ি' ও কারো মুখে শোনা যায়। ঘরোয়া কথায় ওরাই আবার বলে বাবুরবাড়ি।

বাবুদের চেনা যায়? এইমাত্র যিনি ফটক পার হ'য়ে ভেতরে ঢুক্‌ছেন? কোঁচানো সূক্ষ্ম শান্তিপুরী, মসৃণ সিল্ক, সোনার বোতাম, সাদা চাঁছা ঘাড়, আয়নার মতো চক্চকে জুতোর পালিশ?

আরো একজন। ওপাশে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বাগানের তদারক করেন, পাইচারী করেন কখনো মন্থর পায়ে। হুকুম তামিল করতে গিয়ে মালী গলদ্ঘর্ম হয়। বাবুদের চেনা যায় বৈকি।• এমন ফর্সা ধব্ধবে গায়ের রং, উজ্জ্বল মসৃণ চামড়া এ পাড়ার রামা শ্যামার নেই। পর্যন্ত ছোট ছেলেটির। কতো বয়েস! মনে হয় বাবুদেরই কারো ছোট সংস্করণ। সেই ফর্সা রং, সিল্কের জামা, ভেলবেটের জুতো, পরিপাটি টেরি, পান খেয়ে কচি ঠোঁট দুটো লাল। যেন কোনদিন একটু ধুলো একটু নোংরা গায়ে লাগেনি। অথচ পাড়ার আর পাঁচটি সমবয়সী ছেলে ভূতের মতো গায়ে ধুলোবালি মেখে রাস্তায় হুটোপুটি খায় হল্লা করে। ছোটলোকের কান্ড। ফটকে দাঁড়িয়ে ছেলেটি চেয়ে থাকে। ঠিক হাসে না। নাকের দুদিকে চামড়া একটু কুঁচকে ওঠে। কতোক্ষণ পর ধীরে ধীরে হয়তো বাড়ির ভেতর চলে যায়। বাগান তদারক করতে বাবুটিও আর দাঁড়িয়ে নেই। বেলা এগারটা। রোদ চড়ে গেছে। রোদে দাঁড়ান এ-বাড়ির কারোর অভ্যেস নেই। সারা বাড়ি স্তব্ধ। রেডিও চলেছে কোন ঘরে মিহি মাজা গলায়। বাড়ি জুড়ে পরিতৃপ্তির অখন্ড প্রশান্তি।

কিন্তু একটা জিনিষ চোখে ঠেকে। অত বড় বাড়ির মহিলা এ সময়ে রিক্সা ক'রে এভাবে বেরোন কেন। তাই তো দেখা যায়। আর ফটক পার হ'য়ে রিক্সাটা রাস্তায় নামতে চোখে পড়ে বিমর্ষ ক্লান্ত মুখ। চোখে পড়ে বার্ধক্যের জীর্ণতা, সর্বাঙ্গে বৈধব্যের ধূসর বিশ্রান্তি। রিক্সায় যখন বসে থাকেন হাঁটুর ওপর হাত দুটো নিশ্চল, তন্ময় হ'য়ে কী ভাবেন কেবল। গলির মোড় ঘুরে রিক্সা অদৃশ্য হয়। ঠুং ঠুং শব্দটা করুণতরো হ'য়ে দূরে মিশিয়ে যায়। অথচ একটু লক্ষ্য করলেই চোখে পড়ে বাড়ির বাঁ ধারে প্রকান্ড গ্যারেজ জুড়ে দু' দুটো আনকোরা ফরাসী গাড়ি, একটা ফিটন। দুবেলা সহিস আচ্ছা ক'রে ঘোড়ার ঘাড় গর্দান রগ্ড়ে দেয়, এওতো চোখে পড়ে। যে-কোন একটা গাড়ি নিয়ে তিনি বেরোলেই পারেন? এই গরম রোদ্দুর।

দুপুরে তন্দ্রার পর বাড়ি জেগে ওঠে বিকালে। বাড়ি কথা কয়। সবাই এখন মুখর। অতিমাত্রায় ব্যস্ত। এইমাত্র বাবুদের কে জাঁকালো সাজপোষাক করে' বেরিয়ে যান। পাঁচ মিনিট পার হয় না। ফটকে এসে দাঁড়ায় ব্রাউন রংয়ের বিশাল বুইক। তিনটি মেয়ে সঙ্গে প্রৌঢ় ভদ্রলোক। কারা এ'রা। বাড়ির ছিপ্ছিপে ফর্সা মেয়েটি সকলের আগে ছুটে এসে সবাইকে অভিনন্দন করে' ভেতরে নিয়ে যায়। বাদামী রোদ মাখানো হাসি, একরাশ জ্বলন্ত রিবন। পাথরের নুড়ি বিছানো পথের ওপর পাঁচ জোড়া জুতোর ক্ষীণ খস্খস শব্দ। হাত ধরাধরি করে' সবাই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যায়। তিনতলার কোণার ঘরে চলেছে পিয়ানো। দোতলাটা হাসি আর কথায় কাঁপছে। এমন সময় সেই রিক্সা, সেই স্থির ধূসর বিষণ্ণতা। গাড়ি থেকে নেমে নিঃশব্দে কেমন করে বাড়ির কোথায় যে মিলিয়ে যান, বোঝা যায় না। কেউ তাঁর দিকে তাকালো না, তিনিও কারো দিকে না। সবাইর থেকে স্বতন্ত্র।

একদিন দুদিন, না রোজ। প্রাত্যহিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না। কোথায় যাওয়া হয়? প্রাসাদোপম অট্টালিকার ছায়াচ্ছন্ন বিশাল পরিমন্ডল তাঁকে ধরে রাখতে পারে না? গ্রীষ্মের এই খর রৌদ্রে না বেরোলে নয়?

কৌতুহলী মন নিয়ে, ধরা যাক, রিক্সাটাকে কেউ একদিন অনুসরণ করে। গলির মোড় পার হ'য়ে বড় রাস্তা, আবার গলি, সাঁ করে রিক্সা এক সময়ে বাঁ দিকে মোচড় দেয়। বাজার। বাজারের সামনে ওটা দাঁড়ালো যে বড়? না, স্থানুর মতো স্থির হ'য়ে এতোক্ষণ যিনি বসেছিলেন, তাঁর হুকুমেই রিক্সা দাঁড়িয়েছে। তিনি ধীরে ধীরে গাড়ি থেকে নামেন। ফুলের দোকান থেকে একতোড়া ফুল আর ফলের দোকান থেকে একগুচ্ছ আঙুর নিয়ে যখন ফিরে আসেন, তখন শুকনো মুখ ঘামে গরমে আরো সিঁটিয়ে গেছে। রিক্সা চললো ঠুং ঠুং শব্দ ক'রে। আবার দুটো গলি,• বড় রাস্তার ভিড়ে গতি মন্থর হ'য়ে আসে। বোঝা গেল গন্তব্য এসে গেছে। কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়া। রিক্সা স্থির হ'য়ে

দাঁড়ায়। হাসপাতালের প্রকান্ড কম্পাউন্ড অতিক্রম করে' ভীরু ভারাক্রান্ত পায়ে তিনি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠেন। হাতে ফুলের তোড়া, আঙুর।

সমস্যার কিছুটা সমাধান হয় কি?

বোঝা যায় না, ভালো বোঝা গেল না।

কে রোগী এখানে, কার অসুখ!

প্রায় সারাদিন কাটে। তারপর রোদ যখন মিলিয়ে যায়, হাসপাতালের শূন্যে নির্জন কম্পাউন্ড জুড়ে ঘন দীর্ঘ ছায়া নামে—ধীরে ধীরে তিনি বেরিয়ে আসেন।

হয়তো রোগীর সামনে কাঁদতে নেই, কাঁদা ভালো নয়, তাই রিক্সায় ওঠবার সময় দেখা গেল তাঁর সর্বাঙ্গ কান্নার ধমকে থর্‌থর্‌ কাঁপছে।

যদি সেই মুহূর্তে গিয়ে কেউ বাড়ির সামনে দাঁড়ায়, আলো জ্বালা জানলাগুলোর দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে যাবে। নিচে হলঘরে চেয়ারগুলোতে দামী পোষাকপরা অনেক মানুষ। সন্ধ্যার উৎসব বড়বাড়ির দস্তুর! তেমনি উচ্চকিত হাসি, অফুরন্ত কথা। ওপর-নিচ একশোবার ছুটো-ছুটি। পিয়ানো যদি থেমে যায়, সুরু হয় সেতারের মিঠা আলাপন। সোডা আর বরফ ভর্ত্তি হ'য়ে এইমাত্র গাড়ি এসে গেছে। না, এবাড়ির কোনো মানুষ হাসপাতালের নিঃসঙ্গ শয্যায় শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করছে, কে বলবে।

বাইরে থেকে যে-কোনো লোকের তাই ভাবা স্বাভাবিক ছিল, যদি না রিক্সাটা সেদিন ফটকে ঢোকবার মুখে বাবুর সামনে পড়ে যেতো। কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ছিল বৈকি, বাবু দু'পা এগিয়েও এসেছিলেন।

'এ বয়সে রোজ তোমার বেরোনোটা ঠিক না'। 'আর গিয়ে কি হবে'—বাবুর পাশে দাঁড়িয়ে রূপসী বধূর ভ্রূরেখা বঙ্কিম হ'য়ে ওঠে। 'ও সব রোগ কখনো সারে না'।

'না, সারে না'। দুর্বল নিস্তেজ হাতে দেয়ালের একটা কোণ ধরে মহিলাটি কোনমতে দাঁড়িয়ে পড়েন, 'তবু আমায় যেতে হবে'।

'তাই বলে ছোটলোকের মতো রিক্স করে' বেরোবেন নাকি'! উদ্ধত শাসনের সুরে বধূ গর্জন করে উঠলোঃ 'এতে এ বাড়ীর সম্মান বাড়ে, না আপনার? মনের রাগ চেপে রাখতে না পেরেই কি তাড়াতাড়ি বাগানের একটা গোলাপ ছিঁড়ে নিয়ে বধূ কুটিকুটি করে' ছিঁড়ে ফেলে, পাপড়ি-গুলো দেয় চারদিকে উড়িয়ে ছড়িয়ে। অবিশ্যি রাগ করবার সময়ও থাকে না। ফটকে সেই ব্রাউন রংয়ের গাড়ি। ওরা এসে গেছে। তিন জন। আঁচল ফুলিয়ে বেণী দুলিয়ে হাসতে হাসতে গাড়ি থেকে নামে। হাসি আর অভ্যর্থনা নিয়ে ছুটে যায়। বাবু দাঁড়িয়ে থাকেন না।

যেন এই ভালো। দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে থেকে একজন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেনঃ আমার দিকে তোমরা তাকিও না, আমায় মুক্তি দাও।

তার পরদিন আবার যখন কসাইয়ের ছুরির মতো দুরন্ত ধারালো রোদ ওঠে, গরম হাওয়া বয়, আর খস্‌খস্‌ দিয়ে মোড়া চারতলা বাড়ির ঘরে ঘরে নামে তন্দ্রার নীল ছায়া, তখন আস্তে আস্তে ফটক পার হ'য়ে তিনি নিঃশব্দে রাস্তায় নেমে আসেন।

* * * * *

মোড়ের সেই মুদীর দোকানে কথা হয়। 'কার অসুখ?' 'ছোটবাবুর। শিবের অসাধ্যি ব্যামো বাবা।' 'গিন্নিমা অদ্দুর হেঁটে যাবেন?' 'তাইতো দেখছি ভায়া, কালে কালে আরো কত দেখব, হুঁকোটা দাও।'............

ভুল

(৪৪৬ পৃষ্ঠার পর)

হরিহর বাঁড়ুয্যে মহাবিস্ময়ে অমলের মুখের দিকে চাহিলেন, অমল পালাইবার পথ না পাইয়া মুখ লাল করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া ঘামিতে আরম্ভ করিয়া দিল। কেবল শোভার মুখেই কোন ভাবান্তর প্রকাশ পাইল না।

আঘাতের প্রথম ধাক্কাটি সামলাইয়া লইয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ কহিলেন, "তুমি জমিদারের গৃহিণী হয়েছ মা, তোমার উপর আর আমার জোর খাটে না। কলকাতা থাকাই যদি তোমার সংকল্প হয়, তবে থাক। তবে তোমাকে দেখবার জন্য আমি আরও একটি লোকের ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। অতীশকে তোমার মনে আছে ত?—সেই রামতনু ঘোষের ছোট ছেলে অতীশ? সে এই সবে কলকাতা এসেছে কলেজে পড়তে। সে ছেলেমানুষ, তুমিও তার উপর একটু নজর রেখো।"

অমল তখনও নতমস্তকে নিঃশব্দে বসিয়াছিল, হঠাৎ তাহার উপর দৃষ্টি পড়িতেই যেন তাহার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়া বৃদ্ধ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "কি বলেন অমলবাবু? হাজার হোক ও মেয়ে—একেবারে একা কলকাতায় থাকা ভাল দেখায় না! অতীশ ছেলেমানুষ, আমাদের দেশের লোক, গ্রামসম্পর্কে একরকম আত্মীয়। সে এখানে আসা যাওয়া করলে আমি নিশ্চিন্ত থাকব।"

অমল নতমুখ আরও নত করিয়া কহিল, "তা বই কি, তা বই কি।"

শোভা কৌতূহলে দুই চক্ষু উজ্জ্বল করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সেই অতীশ? কত বড় হয়েছে সে এখন? মা গো,—তাকে দেখি নি, সে যে একযুগেরও বেশী।"

হরিহর বাড়ুয্যে কহিলেন, "কি করে আর দেখবে? তাদের সবাইকে নিয়ে তার বাবা চলে গেলেন এলাহাবাদে চাকরি করতে। সে আজ প্রায় বছর পনরর কথা। অতীশের বয়স এখন—এই ধর বিশ-বাইশ। পরীক্ষা পাশ করতে পারে নি, তবে দিব্যি ছেলে—দেখতে যেন কার্তিক।"

ইহাকেই শোভার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সমর্পণ করিয়া দিনসাতেক পর হরিহর বাঁড়ুয্যে পুনরায় কাশীতে ফিরিয়া গেলেন।

ক্রমশ

উত্তর বঙ্গের বিবাহের গান

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ এম-এ

সেকালের বাঙলায় বিবাহ উপলক্ষে মেয়েরা সংগীত ও নৃত্যের চর্চা করিতেন। পূর্ববঙ্গের ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় বহু স্থানে এখনও মেয়েরা বিবাহের গান গাহিয়া থাকেন। উত্তরবঙ্গের রাজসাহী, মালদহ, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলেও বিবাহোৎসবে সংগীত আলোচিত হইত। এতদঞ্চলের বিবাহের গান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বর যাত্রার গান

বিবাহের 'বরযাত্রা' একটি প্রধান অংগ। বরকে অভিনব পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত করা হইল। মেয়েরা ছায়ামণ্ডপে বিচিত্র সৌন্দর্যে আলিপনা আঁকিলেন, বরের আসনের জন্য পিঁড়িতেও আলিপনা অংকিত হইল। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই অভিনব সজ্জায় বরযাত্রী সাজিয়া আসিয়াছেন। বর ছায়ামণ্ডপের পার্শ্বে পিঁড়িতে বসিল। ঢোল, কাঁসি, শানাই বাজিয়া উঠিল। পুরোহিত মংগলশংখ বাজাইলেন। নারীগণের হুলুধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। চারিদিকেই অভূতপূর্ব আনন্দের সুর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। মেয়েরা হাসিমুখে মধুর সুরে গাহিতে লাগিলেন—

বর সাজে, বর সাজে—
আগ্‌নাত্‌ শোভা করে তুলসী বৃন্দাবন।
ছেলে বর বিয়াতে সেজাছে চাঁদবরণ॥
পিতার নগর হৈতে শ্বশুরের নগর যায়।
যত মেয়ে সব চন্দন ছিঁটায়॥
মায়ের নগর হৈতে শাশুড়ীর নগর যায়।
যত বামুনের মেয়ে আশীর্বাদ ছিঁটায়॥
ফকির কাঙ্গাল লয় রে লক্ষ সদাগর।
কড়ির বদলে দিব আমি কাঁঠাল॥

[শব্দার্থ ঃ—আগ্‌নাত্‌=আঙিনাতে।]

চাঁদবরণ ছেলে-বর পিতৃগৃহ হইতে ভাবী শ্বশুরের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। পথের দুই পার্শ্ব হইতে পুর-মহিলারা বরের মঙ্গলার্থে চন্দন ছিঁটাইতেছেন, ব্রাহ্মণ মহিলারা আশীর্বাদ করিতেছেন। বর ফকির, কাঙ্গাল, লক্ষ সদাগর সংগে লইয়াছে। অর্থাভাবে বরযাত্রিগণের আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি হইবে না, কারণ বরের গৃহে প্রচুর আম-কাঁঠাল রহিয়াছে।

সপ্তপরীক্ষণের গান—

বরের চারিদিকে কন্যার সাত পাক অর্থাৎ সপ্তপরীক্ষণ হইয়া গেলে, নব দম্পতীর মিলন সুসম্পন্ন হয়। সপ্ত-পরীক্ষণের কালে মেয়েরা যে সংগীতটি গাহিতেন, তাহাতে বিবাহের সপ্তপরীক্ষণ চিত্রটি কেমন সুন্দরভাবে ফুটিয়াছে, দেখুন—

কন্যা ধীরে বৈস রে—
বরের মুকুট হৈল সুবর্ণের পঞ্চফুল।
মধুর আশায় ভোমরা হয় ব্যাকুল॥
ধর‍্যা তোল, ধর‍্যা তোল লক্ষ্মীর সিংহাসন।
দুই মুখে চারি আঁখিতে হৈবে দরশন॥
ধুতুরার পাঁচ প্রদীপ সম্মুখে জ্বালাও।
মুঠি মুঠি ছোড় ফুল, ও কন্যা, বরের বদন চাও॥
এক পাক দুই পাক হৈল রে।
তিন পাকের কালে লক্ষ্মী সুমুখে তাকায় রে॥
তুমি কি জান হে কন্যা বিয়ার ব্যাপার।
সাত পাকের বেলা কন্যা কর নমস্কার॥

আশীর্বাদ-গীতি—

সপ্তপরীক্ষণের পর নব দম্পতী ছায়ামণ্ডপে বসিলে, আশীর্বাদ করিবার পালা। পুরোহিত ও গুরুদেবের আশীর্বাদ দানের পরই নরসুন্দরকে (নাপিত) আশীর্বাদ করিতে হয়। নরসুন্দরের আশীর্বাদ দানের পর গুরু-জনেরা আশীর্বাদ করিয়া থাকেন। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে নর-সুন্দরের আশীর্বাদ সাধারণত 'গৌরবচন' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রাজসাহী জেলায় সংগৃহীত নরসুন্দরের দুইটি 'গৌর বচন' এখানে উদ্ধৃত হইল—

(১)

দ্বিপদ চোপদ গুপ্তপদ চৌজিহং সপ্তনয়ন।
সেই দেবতা করুক তোমাদের কল্যাণ॥

শব্দার্থ ঃ—দ্বিপদ=শিব। চোপদ=বৃষ। গুপ্তপদ= সর্প। চৌজিহং = শিবের জিহ্বা ১+ষাঁড়ের ১+সর্পের ২= ৪ জিহ্বা। সপ্তনয়ন = শিবের নয়ন ৩ + ষাঁড়ের নয়ন ২ + সর্পের নয়ন ২ = ৭ নয়ন।] অর্থাৎ বৃষবাহন নাগচূড় তোমাদের মঙ্গল করুন।

(২)

আশীর্বাদ করি কিছু কর অবধান।
নন্দের গৃহে গরু চরায় করুক কল্যাণ॥
শিবের গৃহিণী মা হউক সদয়।
শাশুড়ীর পদে যেন দৃঢ় ভক্তি রয়॥
কুবের জিনিয়া হও ধনের প্রধান।
অঞ্জনা পুত্র সমান হও বলবান্‌॥

['গৌরবচনের' অর্থ শিবের বচন। গৌর ও গৌরীর মিলনে তাঁহাদের জীবন যেমন আনন্দময় হইয়াছে, সেইরূপ নব দম্পতীর মিলনও মঙ্গলজনক হউক, ইহাই নব দম্পতীর মঙ্গলার্থে কামনা করা হয়। 'শূন্য পুরাণ' ও 'শিবায়ন' কাব্যে বর্ণিত শিব ও গৌরীর কাহিনীগুলি বাঙলা দেশে এতই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, পরবর্তীকালে শিবঠাকুর বাঙালীদের সর্বপ্রকার উৎসবের প্রত্যেক অংগেই অন্যতম মঙ্গল দেবতা-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহারই ফলে বিবাহোৎসবেও

মঙ্গল দেবতারূপে শিবঠাকুর একটি বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করিয়াছেন।]

নব দম্পতীকে আশীর্বাদ করিবার উদ্দেশ্যে মেয়েরা সমবেতকণ্ঠে যে সব মঙ্গলগীতি গাহিয়া থাকেন, তাহাদের দুইটি এখানে উদ্ধৃত হইল—

(১)

জিনিয়া মেঘবরে দীপ্ত করে
কিবা শোভা তায়।
ভুবনমোহন শোভা শিখীপুচ্ছ চূড় বাঁকা
গুঞ্জে তাহারি উপরি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু দয়াময়।
ত্রিভঙ্গের ভঙ্গিমারূপী
শ্যাম নটবর হরি।
নাশ করুক ভব ভয়
অরি করুক পরাজয়।
সুখে রাজ্য কর রাজছত্রধারী॥

(২)

যে জন নন্দের গৃহে
মা বলে যশোদার তরে।
তার চরণ পঙ্কজ মাঝে
তোমাদের সোনার নূপুর বাজে॥
মোরা সব নারী বরে
সদাই আশীর্বাদ করি—
দুর্গা তোমাদের করুক জয়।
যা কন্যা যা কন্যা বরদা ভব॥

বাসর ঘরের গান—

বিবাহের পর নব দম্পতীর বাসর ঘরে আগমন হইল। বাসর ঘরে মেয়েদের একাধিপত্য—সেখানে পুরুষদের প্রবেশাধিকার নাই। নব দম্পতীর মনে আনন্দ দান করিবার উদ্দেশ্যে মেয়েরা পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করিতেন। এই ধরণের দুইটি সংগীত এখানে উদ্ধৃত হইল—

(১)

এই ত মিতা মোর ঘর—
আগ্না তোমার ঘর।
বৈশাখে দিব দান
মিতা, রূপের বাহার॥

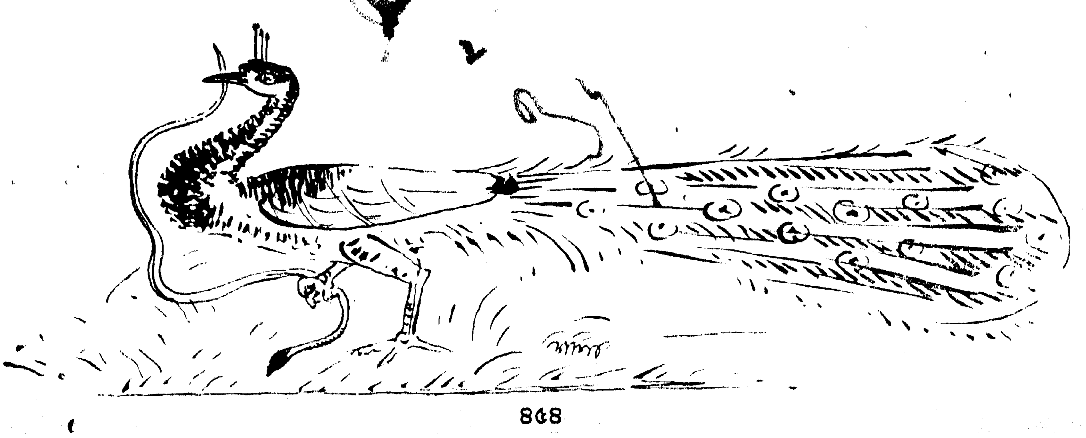
(২)

ওগো মিতা—
মোদের বাঁশীর কঞ্চির বাঙ্লা ঘর,
ছোট দুয়ার।
তাতে আট্কায় মিতার শির
দাঁড়ায় মিতা লজ্জায়॥

এই জাতীয় গ্রাম্য গীতিগুলি শুধু সংগীত হিসাবেই আমাদের আদরের বস্তু নহে, এইগুলির ভিতর প্রাচীন বাঙলার সামাজিক জীবনের অনেক চিত্রই সংরক্ষিত আছে। এই গ্রাম্য গীতির মধ্যে যেমন জাতির ভাষার ইতিহাস লুক্কায়িত আছে, সেইরূপ আমাদের জাতীয় চরিত্র ও ভাবধারার গভীর সন্নিবেশও রহিয়াছে। এই দিক দিয়াই এই গ্রাম্য গীতগুলির আদর বোধ হয় যথেষ্ট বেশী। এই পল্লী সংগীতগুলি বনফুলের মত স্বভাবসুলভ ও সুন্দর। বনফুলের মতই শিক্ষিত ভদ্র সমাজের অনাদরে এগুলি শুকাইয়া বিনষ্ট হয়। আমরা শিক্ষিত সমাজ এই বনফুল দেখি না, কুড়াই না, ইহাদের নীরব সুরভি গ্রহণ করি না। গণ-মঙ্গলের জন্য আনন্দ ও শিক্ষা বিস্তার করিয়া এই সব বনফুল নিত্য বিলীন হইয়া যাইতেছে।

পল্লীকে ভালবাসিতে হইলে, তাহাকে সম্পূর্ণভাবেই ভালবাসিতে হইবে। পল্লীর সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, নৃত্য, সব সম্পদকেই জাগাইয়া তুলিতে হইবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে হয়—

"গ্রামের যে একটা বিশেষ সাহিত্য ও গীতিকাব্য উদ্ভূত হয়েছে তার চিরন্তন মূল্য আছে। এই যে পল্লী-সাহিত্য প্রভৃতি, এগুলি মূল থেকে, আমাদের দেশ থেকে শুকিয়ে গিয়েছে। এগুলিতে আজ পোকা লেগেছে। এইখানে মানুষকে বাঁচাতে চাই। পল্লীতে খণ্ডভাবে উপকার চলে না, তাকে সমগ্রভাবে জাগাতে হবে, তবে সে নিতে পারবে। তার চিত্তকে সমগ্রভাবে উদ্বোধিত করতে হবে।"



নিস্তরঙ্গ নীল সমুদ্র

(গল্প)

শ্রীজগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য

সন্ধ্যেটা সেদিন করুণ এবং ব্যথাহত। সামনের দীর্ঘ প্রান্তরে সবুজের সমারোহ, কলাই আর মটরশুঁটির ক্ষেত। তার মধ্য দিয়ে একটা আঁকাবাঁকা পায়ে হাঁটা পথ নদীতীর থেকে গ্রামান্তরের পায়ে এলিয়ে পড়েছে। অন্ধকার হয়ে এসেছে, পথের উপর এখন আর কেউ নাই, পরিত্যক্ত পৃথিবীর সে এক অসহায় রূপ, ওধারে দূরের গ্রাম থেকে একটু আধটু শব্দকণা হঠাৎ আকস্মিকভাবে প্রান্তরে এসে ঠিক্‌রে পড়ে। আকাশ মেঘমুক্ত, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত সেখানেও কেউ নাই, শুধু দক্ষিণের আকাশে গ্রামের তরুশ্রেণীর উপর দিয়ে দিবাবসানে একখন্ড মেঘ দেহ এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। দুখানা গ্রামের মধ্য দিয়ে ওধারে ধলেশ্বরীর বাঁক। এখান থেকে কেবলমাত্র ওটুকুই দেখা যায়। নদীতে এখন আর তরঙ্গ নাই। নীল শ্লেটের নদী, তার উপর দিয়ে খড় বোঝাই নৌকাগুলি সারি সারি এগিয়ে চল্‌ছে। এ পৃথিবীর কাছে যেন তাহারা অপরিচিত, এমনই দৃঢ় নির্বিকারতা, অপরিচয়তা এবং অসহায়তা।

মাঠের আঁকাবাঁকা পথের উপর দিয়ে লাঠিতে ভর ক'রে একজন বৃদ্ধ পশ্চিমের গ্রামের দিকে এগিয়ে চলছে—তার আগে আগে চঞ্চল পা ফেলে একটি বছর আটেক বয়সের মেয়ে এগিয়ে চল্‌ছে। এত বড় আকাশ সে দেখে নাই—তৃণাঙ্কুরের সাথে আজ তার প্রথম পরিচয় হ'ল। এমন অদ্ভুত নীরবতা, স্তব্ধতার সঙ্গীত আর কোনদিন কোথাও সে দেখে নাই। পৃথিবীর আর একটি পাতা। লক্ষ্মী এতদিন পৃথিবীর যে পাতা পড়ে এসেছে, তাতে কেবল সারি সারি কুলীবস্তি, বড় সাহেব, ডাক্তারবাবু প্রতিদিন এক, একই রকম। কিন্তু একটি দিন মাত্র, পাতাটা উল্টে গেল, চা-বাগান আর ডাক্তারবাবুকে দেখা যায় না এখানে, শুধু দীর্ঘ প্রান্তর, নদীস্রোত, আঁকাবাঁকা পথ, শব্দবঞ্চিত পৃথিবী। দেখা যাক্, আর একটা পাতা উল্টে দেখে—
লক্ষ্মী হাতের ছোট্ট পুঁটুলিটাকে আঁকড়ে ধরে আবার তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল্‌ল।

দীর্ঘ দশ বছর পর অমৃতচরণ আবার দেশে ফিরছে। আজ অনেক কথাই মনে হয়, আবার অনেক কথাই মনে হয় না। তবু মনে হয়, আকাশের সাথে যে পরিচয় হয়েছিল একদা, তার উপর বেশী ধুলিবালি আজও পড়ে নাই। এ আকাশকে অমৃতচরণ চিনে, দূরের হিজলের গাছ, আঁকাবাঁকা পথ, দক্ষিণ দিকের গ্রামের অন্ধকার ঝোপ, সন্ধ্যার আকাশে দিগন্তের ধারে এক আধটা পাখির চকিত ঝটপটানি, সমস্ত নিয়ে পৃথিবীর যে সমগ্র রূপ, তা তার কাছে নূতন কিছু নয়। তার দিকে তাকিয়ে কোন কাব্য করবার প্রয়োজন অমৃতচরণের নাই। পিতা আর সন্তান, একের কাছে পৃথিবীর সকল সম্ভাবনা সমাপ্ত; অপরের কাছে পৃথিবী বর্ণ আর ঔজ্জ্বল্যে উন্মেষিত। বাবা আসছেন পেছনে মাথার উপর প্রকান্ড একটা পুঁটলি নিয়ে, মেয়েটি চল্‌ছে আগে আগে এগিয়ে। এই পথ একটু সময় পরে গ্রামের অন্ধকার আমবাগানের মধ্যে লুকিয়ে পড়বে। দুদিকের ঝোপঝাড়, বাঁড়ুয্যে-বাড়ির পুকুরঘাট, মুখুয্যেদের পূজামন্দির, দক্ষিণে আর বামে রেখে একটু সময় এসে আকাশের নীচে দাঁড়াবে। একটু সংকীর্ণ শস্যক্ষেতের মধ্য দিয়ে এই রেখাটি নম্রভাবে এগিয়ে গিয়ে যেখানে অসম অসহায়তায় ঢলে পড়বে,, সেখানেই একদিন অমৃতচরণের বাড়ি ছিল।

তারা দুজন এগিয়ে চল্‌ল। ওদিকে কখন যে পশ্চিমের আকাশের আলোরেখা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হ'য়ে অবশেষে অন্ধকারে মিলে গেল, দুজনের কেউ তা জানল না। তবু দীর্ঘ প্রান্তর পার হ'য়ে আমবাগানের অন্ধকারে পা ফেলতে গিয়ে লক্ষ্মী আপনা থেকেই একবার পেছনের দিকে তাকাল। সেখানে নিস্তরঙ্গ, নীল সমুদ্র—।

আবার বাল্যের পরিচিত পল্লীজীবন আরম্ভ হ'ল অমৃতর। কিন্তু তার বাহিরেরটুকুই শুধু পল্লী—ভেতরের দিকে এ জীবনে আর আসামের চায়ের বাগানের জীবনে কোন পার্থক্যই নাই। একটা জীবনে আজ অমৃতচরণ বড় অসহায়ভাবে একাকী—সেখানে সান্ত্বনা দেবার আর তার কেউ নাই। আজ এক মাস হ'ল সরস্বতী কুলত্যাগ করে গেছে। জীবন ত্যাগ করে গেলে অমৃতচরণ কোন দুঃখ করত না যদিও। জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে একটা ব্যবধান, সে ব্যবধানের মধ্যে দিয়ে পরিচিত মানুষেরা অপরিচিত হয়ে যায়—বর্ণের ঔজ্জ্বল্য মুছে গিয়ে বর্ণহীন নির্বিকারতা দেখা যায়। পৃথিবীতে যারা বেঁচে থাকে, তাদের পক্ষে এই নির্বিকারতাই প্রয়োজন, ঔজ্জ্বল্যের পশ্চাতে এই ধূসর নিষ্প্রাণতা। অমৃতচরণ এক এক সময় চেষ্টা ক'রে সরস্বতীকে বিস্মৃত হ'তে। তাকে ভুলতে হবেই,—ভুলে গেছে যারা, তাদের কথা ভুল্‌তে না পারলে মানুষ বাঁচবে কি করে? তথাপি সন্ধ্যাকালে তুলসীমঞ্চে বাতি দিতে গিয়ে অমৃতচরণের হাতখানা অসহায়ভাবে কেঁপে ওঠে—দীপ্ত দীপশিখার পটভূমিকায় আপন কন্যার কল্যাণীরূপ যেন সন্ধ্যার আঁধার এবং জীবনের পাপকে আড়াল ক'রে জ্যোতির্ম্ময়ী হয়ে ফুটে উঠে।

—কি বাবা, বাতিটি এখুনি নিবিয়ে দিলে? লক্ষ্মী কৌতূহলী হয়ে জান্‌তে যায়।

—কী হবে আর তুলসীমঞ্চে বাতি দিয়ে?

এর পর লক্ষ্মীর আর কিছু বল্‌বার থাকে না।

ঘরে এসে বাবা সান্‌কিতে ভরে মেয়েকে ভাত দিলেন। লক্ষ্মী তা টেনে নিয়ে বল্‌লেঃ এসো বাবা, আমায় খাইয়ে দেবে তুমি—

অমৃতচরণ সান্‌কিখানা মেয়ের দিকে আর একটু ঠেলে দিয়ে বল্‌লেঃ শরীরটা বড় ভাল লাগছে না রে মা, নিজ হাতেই তুমি খাও আজ, আমি খাইয়ে দোবো আর একদিন—।

এর পর আর তাদের কোন কথা হ'ল না। লক্ষ্মী খেয়ে উঠে নিঃশব্দে মুখ ধুয়ে এল। বাবা আগে থেকেই এসে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আস্তে প্রদীপের শিখাটিকে আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে আজ সে আবার বনের দিকে তাকাল। বড় করুণ এবং অসহায়। বাইরে নিখুঁত এবং পরিপূর্ণ আঁধার—বাতিটা নিবিয়ে দিতেই সে আঁধার যেন কোলাহল ক'রে ছুটে এসে এ তৃণকুটিরখানাকে গ্রাস করে বস্‌ল। লক্ষ্মীর বার বার মনে হল দিদির কথা। হতভাগ্য দিদি, আজ কোথায়? এতদিন, এতদিন হয়ে গেল, তবু কেন এলেন না দিদি? বাবা বলেন, দিদি মরে নাই—দিদি আছে কোথাও কোন্ শহরে। কোন্ দিকে সে শহর? কিন্তু দিদিকে তার দরকার, এ মুহূর্তেই দরকার। হঠাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল ঃ দিদি!

অমৃতচরণ হঠাৎ ঘুম থেকে আঁৎকে উঠে হাত ঝাড়িয়ে

মেয়েকে পেল। আস্তে বুকের কাছে টেনে নিয়ে জান্তে চাইল, কি রে মা, স্বপ্ন দেখেছিস কিছু?

পরদিন অমৃতচরণের কি খেয়াল হ'ল। কোথা থেকে কাগজ কলম যোগাড় করে নিয়ে ঘরের দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে বস্‌ল সে। মেয়ে এসে বাবার কোল ঘেঁসে বসলো। বাবা বল্‌লেন আদর ক'রেঃ এবার যাও মা, একটুখানি যাও, চিঠিখানা শেষ করে ফেলি। অন্যদিন হ'লে লক্ষ্মী হয়ত জিদ করত। হয়ত বলত ঃ না বাবা, একটুখানি আমি এখানে বস্‌বই। কিন্তু আজ সে আস্তে এবং নীরবে উঠে গেল। অমৃতচরণ একবার লিখতে যায়, কিন্তু হঠাৎ আবার উন্মনা হ'য়ে বাইরে তাকায়, চিঠি তার এগোয় না। ঘরের ভেতরে লক্ষ্মী অধৈর্য হ'য়ে বসে মুহূর্ত গুনছে। কিন্তু হঠাৎ একী হ'ল। অমৃতচরণ উঠে দাঁড়াল। যে ক' পাতা লিখেছিল, সমস্তকে ছিঁড়ে ছুঁড়ে আকাশের দিকে ছিটকে দিল। কলমটাকে ভেঙে দিলে দুখণ্ড করে, দুখণ্ডকে করলে চারখণ্ড, তারপর মুখে পুরে দিয়ে চিবিয়ে ফেল্‌লে। লক্ষ্মীকে ডেকে বল্‌লে তীক্ষ্ণকণ্ঠে, এদিকে আয় লক্ষ্মী, মাদুরটা তুলে রাখ্‌ এখ্‌খুনি, ভাত রেঁধেছিস?

লক্ষ্মী সামনে এসে দাঁড়াল যদিও, কিন্তু বাবার দিকে তাকিয়ে কোন কথা বলবার সাহস তার হ'ল না।

বাবা অহেতুক ক্ষেপে উঠে বললেনঃ কেন, দুটো ভাত ফুটিয়ে নিতে কি হাত দুখানা অবশ হ'য়ে আসে?

মেয়ে কিছু জবাব দিল না। মাদুরখানা গুটিয়ে নিয়ে সে যে ঘরে ঢুক্‌ল, আর বেরোল না। ঘরের দিকে তাকিয়ে বাবা স্থির এবং নিশ্চিতকণ্ঠে বিদ্রূপ ক'রে বললেনঃ কি হবে আর ভাত রাঁধা শিখে? ঘরকন্নার দিকে মন দিয়ে? ঘর থেকে বেরিয়ে বাজারে বস্‌বে যারা, ঘরের মায়া করে তাদের হবে কি?

ব'লে আর বিন্দুমাত্র দেরী না ক'রে অমৃতচরণ পথে গিয়ে নামল। একটা দুর্দমনীয় ঘূর্ণিবাতাস যেন ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। লক্ষ্মী তাকিয়ে আর দেখতে পেল না তাকে।

এবার অঝোরে কান্না আরম্ভ হ'ল লক্ষ্মীর। কাঁদল সে পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে, কেঁদে যখন সে বাইরে এসে দাঁড়াল, আকাশে তখন দুপুর। কিন্তু তথাপি ঝোপ ঝাড়ের মধ্য দিয়ে যতদূর সম্ভব দৃষ্টিকে পাঠিয়ে দিয়ে লক্ষ্মী দেখতে পেল, আর কিছু নয়, শুধু এক নিস্তরঙ্গ নীল সমুদ্র—।

আবার ঘরে ফিরে এসে সে কাঁদতে আরম্ভ করল। দিদি কোথায়? মনে হল তার, দিদিকে একবার লিখলে হয় না? দুপুরের রোদে পিওন আঙিনার পাশ দিয়ে ত্রস্ত পা ফেলে চলে যাচ্ছে দেখে, লক্ষ্মী তার সামনে গিয়ে উপস্থিত হল। পিওন একবার চোখ তুলে তাকাতেই সে চোখ নাবিয়ে ঘরে ফিরে এল। কোন কথা বল্‌ল না। সন্ধ্যার একটু আগে অমৃতচরণ বাজার থেকে বহু শাকসব্জি আর খাবার ঝুঁড়িতে ভরে আঙিনার উপর ধপ করে ফেলে রেখে হাঁক দিলে ঃ লক্ষ্মী, কোথায় গেলিরে? লক্ষ্মী বাবার সামনে এসে নীরবে দাঁড়াল। তার দিকে তাকিয়ে অমৃতচরণ প্রথমে কিছু বলতে পারল না। তথাপি এই কালো মেঘকে সরিয়ে দেবার জন্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে আগ্রহভরে বললে; দেখ মা, কত কিছু আনলাম, তোর জন্য—।

—এত কিছু আনলে কেন বাবা?

আস্তে আস্তে এক একটা পাপড়ি জেগে উঠেছে, এবার হয়ত সমস্তটাই জেগে উঠবে, এ আশায় অমৃতচরণ বললেঃ কাল না বলেছিলি মা, খাবি আমার সঙ্গে, আয় না খাইয়ে দি আজ।

লক্ষ্মী নীরবে বসে বাবার সাথে খাচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে অমৃতচরণের সরস্বতীর কথাই মনে হয়। এমনই অসহায় ছিল সে। এমনই ছোট টুকটুকে। তারপর ক্রমে ক্রমে চোখে এল তার বর্ণ, মুখে এল তার ভাষা। সরস্বতী তাকাল পৃথিবীর দিকে—পৃথিবীও হয়ত মুখ তুলে তাকিয়েছিল একবার। তার পরেকার কথা অমৃতচরণ আর ভাবতে পারে না। সরস্বতী একদিন হঠাৎ কুলত্যাগ করে চলে গেল। এক ইতিহাস আর এক ইতিহাসের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। তারপর, নিঃসঙ্গ পা ফেলে পেছনে চলে যায়।

......হয়ত সরস্বতী একদিন বড় হত। হয়ত একদিন সংসার.........জীবন.........সন্তান সন্ততি—।

বাবার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মী হঠাৎ প্রশ্ন করে বস্‌লঃ কার কাছে চিঠি লিখছিলে বাবা?

অমৃতচরণ মুহূর্তে পাষাণ হয়ে উঠল। এক মুহূর্ত পরে পাষাণের মুখে ভাষা এল। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বল্‌লেঃ যার কাছে লিখছিলাম, কোনদিন খেতে বসে তার নাম করতে নাই। পাষাণ মূর্তির দিকে একবার তাকিয়ে মানব সন্তানের মুখে আর কথা ফুটল না। কিন্তু কিছু সময় পর বাবার কোলের কাছে শুয়ে আবার সে কথা বলতে যাবে, অমৃতচরণ তাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে বললেঃ কোনদিন দিদির মত হোস না লক্ষ্মী, কোনদিন দিদির কথা মনে করিস না।

তারপর একটি মুহূর্তের মাত্র নিঃশব্দতা। কিন্তু মনে হল, এর মধ্যে যেন কত যুগ যুগান্তকাল পার হয়ে গেছে। সে কাল-স্রোতের এপারে দাঁড়িয়ে ওপারের দিকে লক্ষ্য করে লক্ষ্মী অসহায় ক্ষীণকণ্ঠে বললেঃ না বাবা, কোনদিন আমি দিদির মত হতে যাব না। একটু সময় কোলে কাছে শুয়ে থেকে লক্ষ্মী হাঁপিয়ে উঠল। অমৃতচরণের গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। আস্তে, বোধ হয় ভয় পেয়েই সে সরে এল। কিন্তু একটু সময় পরেই নিঃসঙ্গ, নিঃশব্দ রাত্রির আড়ালে বসে তার স্নেহার্ত হৃদয় আপনাকে একবার চিনে নিল। ছোট্ট, নরম, কচি হাতখানা, বাবার কপালে রাখল। কিন্তু ডাকবার সাহস হল না তাকে। আবার একটু পরে তেমনই নিঃশব্দ পা ফেলে লক্ষ্মী বাতি জ্বালাল। তাকাল বাবার দিকে। মুমূর্ষু দীপালোকে বড় অসহায় বলে মনে হল বাবাকে।

দিন যায়। গ্রামেরই একখানা কুটীরে যে জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব চলছে, গ্রামের আর কেউ তা' জানলে না। এর মধ্যে আকাশের বর্ণ হয়ত ধূসর হয়ে উঠেছে। তারপর আঙিনায় আজ দিনান্তে দীর্ঘ ছায়া পড়ল। ঝোপঝাড়ের উপর দিয়ে বিকালের সূর্য নির্বিকার ঔদাসীন্যে অস্ত যাচ্ছে। ভোরবেলা থেকে অমৃতচরণ কোন কথা কয় না। এরপর হয়ত দীপ নিভে যাবে। আকাশে দীর্ঘশ্বাস, কুটীরে দীর্ঘশ্বাস সমস্তটা মিলিয়ে কেমন যেন এক করুণ এবং ভয়াবহ ইতিহাস। মেঝের উপর বাবার কোল ঘেঁসে আজও সে ঘুমিয়ে পড়ল কখন, জানবার উপায় রইল না। কিন্তু মধ্যরাতে আবার সে ধড়ফড় করে জেগে উঠে বসল। সরস্বতী স্বপ্নে তাকে বলছে, আবার এলাম রে লক্ষ্মী, কতদিন তোদের দেখি নাই। লক্ষ্মী অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলতে যাবে, না, তোমার সাথে আড়ি, আমার কোন কথা বলতে চাই না, এত কষ্টও দিতে পার? লক্ষ্মীর ঘুম ভেঙে গেল; কিন্তু পরিপূর্ণ সে নিদ্রার অসাড়তায় সে আকস্মিকভাবেই আর্তনাদ করে উঠল ঃ দিদি দূরে এসেছে বাবা।

নিজের লুপ্তপ্রায় সকল শক্তিকে এক করে নিয়ে অমৃতচরণ চোখ দুটোকে বিস্ফারিত করে ধরলঃ কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। এক স্বপ্নের জগতে যেন একটা স্বপ্ন ছায়া ফেলে চলে গেল। পরদিন ভোরবেলা লক্ষ্মী বাবার মুখের কাছে মুখখানা এনে বললেঃ দিদিকে একবার চিঠি লিখে দেখলে হয় না, বাবা? পৃথিবীর সাথে

দ্দিনের পরিচয়ে লক্ষ্মী কেবল একথাটাই জানত, যেখানেই যত-দ্রেই কেউ থাকুক না কেন, পিওন চিঠি পেণছে দিয়ে আসতে পারে। এ তার কাছে এক অপ্র্ব এবং অদ্ভুত রহস্য। কিন্তু তাই তাকে আজ আবার দ্র্নিবার আকর্ষণে ডাকছে। অম্তচরণের কিছ্ জবাব না পেয়ে লক্ষ্মী উঠে এল ঘরের দাওয়ায় মাদ্র বিছিয়ে বসল খ্ব ঘটা করে, দোয়াতে ন্তন করে কালী নিল, তারপর কলম বাগিয়ে বসল। কিন্তু, কি লিখবে সে? দ্র্ভেদ্য, অস্পষ্ট, এবং অজ্ঞতার জগৎ। লক্ষ্মী সেখানে অসহায় বেদনায় মাথা খ্ড়ছে। সামান্য দ্টি চারটি অক্ষর সে দিদির কোলে বসে পড়েছিল। লেখার জগতের সংগে একদা তা দিয়েই তার পরিচয়। বাইরের আকাশের দিকে সে তাকাল—কিন্তু কোথাও কেউ নাই, কে তাকে বলে দেবে। নীল আকাশের শ্ভ্র মেঘপ্ঞ্জ কোন্ অপরিচিত প্থিবী থেকে পাখা ছড়িয়ে আসে, মাটির জগতের সাথে শ্ধ্ এক ম্হ্র্ত ম্খোম্খি হয়, তারপর আবার কোথায় কোন পথে চলে যায়। প্থিবীর চোখের জলের দিকে তাকাবার অবসর তার নাই।

লক্ষ্মী এবার তাকাল প্থিবীর দিকে। দীর্ঘ প্রান্তরের মধ্যে সম্ন্নত হিজলের ছায়ায় হাট-ফেরতা লোকেরা শরীর এলিয়ে দিয়ে বসে কত কথা কইছে। এতদ্রে থেকে লক্ষ্মী তাদের কথা কিছ্ই ব্ঝল না।

কিন্তু তথাপি সে নিরাশ হল না। আবার কলম বাগিয়ে বসল।

এদিকে ঘরের মাঝ থেকে আগ্রহাকুল দ্টি চোখ দিয়ে অম্ত-চরণ এ প্থিবীর যাহা কিছ্ নিঃশেষে শ্ষে নিচ্ছে। লক্ষ্মীর চুলগ্লো এলোমেলো হয়ে এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়েছে—হাতে, চোখে ম্খে লাগিয়েছে কালি, আকাশের দিকে ম্খ করে বসে সে লিখছে, শ্ধ্ই কি চিঠি? না, একখানা কাব্য? লক্ষ্মী, না, শ্ধ্ই লক্ষ্মী নয়, একটি ফুল, অরণ্যের সমগ্রতার একটু ইংগিত, জীবনের স্পন্দনকাহিনী। অসহায়ভাবে সে ফুলের দিকে অম্ত-চরণ হাত বাড়াল। কিন্তু পেল না। আকাশের ফুল, দ্ষ্টি তার আকাশের দিকে। এ প্থিবী থেকে বিদায় নেবার সময় অম্ত-চরণ ফুলের ধ্যান আর ভাঙাতে পেল না।

কিন্তু অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ পর লক্ষ্মী লিখতে পারল, 'দিদি'। এ শ্ধ্ই কি শব্দ, না, একটা সমগ্র জগৎ? লক্ষ্মীর সামনে একটা সমগ্র জগতের দোর খ্লে গেল। না, বাবাকে তার দেখাতেই হবে এ দ্টি শব্দ। তার অক্ষরের প্থিবী, প্থিবীর অক্ষর, লক্ষ্মী তার বাবাকে দেখাবেই। হঠাৎ সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল—কাগজখানা হাতে নিয়ে ছ্টে ঘরে এসে চীৎকার করে উঠল দেখো, দেখো বাবা, কি লিখেছি আমি—। তারপর নিঃশব্দ এবং নিস্তব্ধ প্থিবীতে লক্ষ্মী এবার নেমে এল ধীরে। হাতের উপর থেকে কাগজখানা পড়ে গেল খসে, দ্ফোঁটা চোখের জল নেমে এল হয়ত।

নিশ্চল পিতার ব্কের উপর গ্চ্ছ গ্চ্ছ চুল ছড়িয়ে দিয়ে অসহায় লক্ষ্মী ঘ্মিয়ে পড়ল। কিন্তু একটু সময় পর আবার ধড়ফড় করে উঠে চীৎকার করে বাইরের আঙিনায় এসে দাঁড়াল সে। দিদি, এলে তুমি তা হলে? কিন্তু কোথাও কেউ নাই। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর, নিঃসংগ প্থিবী। লক্ষ্মী তাকাল বাইরের দিকে। সেখানে নিস্তব্ধ নীল সম্দ্র। পাষাণ মহিমা।

পুস্তক পরিচয়

মাটির প্থিবী—আব্ল ফজল, আলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাকা। দাম দেড় টাকা।

এ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্য বলিতে আমরা যাহা ব্ঝি তাহা প্রধানত হিন্দ্ সাহিত্য। এ দোষ হিন্দ্দের নহে, ম্সলমানদেরও নহে। সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার ফলে পলাশী য্দ্ধে হিন্দ্ বণিক সম্প্রদায় ও বিদেশী ব্র্জোয়াদের যে সংযোগ ঘটে তাহাতেই বাঙলাদেশে হিন্দ্ জমিদার প্রাধান্য ও তদ্দ্রুণ হিন্দ্ চিন্তাধারার সহিত বিদেশী চিন্তাধারার আন্তঃক্রিয়া ঘটে। খৃষ্টান মিশনারীর আক্রমণটা ছিল হিন্দ্ পৌত্তলিকতার উপর, তাহারই প্রত্যুত্তরস্বর্প রামমোহনকে আশ্রয় করিয়া কেবল যে অপৌত্তলিক বেদান্তের মহিমা প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা নহে, বাঙলা গদ্যভাষারও স্ষ্টি হইয়াছিল। সেই হইতে জমিদারী ঐশ্বর্যের রাজলিপ্সা এযাবৎ বাঙলা সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হইয়া আছে। বাঙালী ম্সলমানেরা সিরাজদ্দোলা ও মিরকাসিমের অন্করণে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে বিন্দ্মাত্র আত্মসাৎ করিতে পারে নাই। কাজেই হিন্দ্দের ক্ষেত্রে যে সংশ্লেষণ হইয়াছে বাঙালী ম্সলমানের সংস্কৃতি এক হইয়াও কেবলমাত্র ধর্মান্তর কারণে তাহাতে বাধা জন্মিয়াছে। আজ তাই, তাহাদের মধ্যে ভিন্ন সংস্কৃতি নহে, ভিন্ন মনোব্ত্তি গড়িয়া উঠিতেছে। সে মনোব্ত্তি সম্প্র্ণ ধর্মাশ্রয়ী; কাজেই নবতর কোন প্রশ্ন বা মান্ষের চলার পথে আর কোন জিজ্ঞাসা করিবার উপায় নাই। এই নির্পায় অবস্থায় স্ষ্টিপ্রতিভা বিকাশ সম্ভব নহে, হয়ও নাই।

কিন্তু আব্ল ফজলের গল্প পড়িয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। অকস্মাৎ এমন একটা সংস্কারবিম্ক্ত মনের পরিচয় পাইয়া খ্শীতে মন ভরিয়া উঠে। বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আব্ল ফজল বিশেষ পরিচিত নহেন। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বাঙলা সাহিত্য তাঁহাকে বাদ দিয়া অসম্প্র্ণ। আব্ল ফজল খ্ব পাকা লেখক নহেন। তাঁহার লেখায় অজস্র কাঁচা গাঁথ্নি আছে। কিন্তু ম্সলমান সমাজের এমন স্স্পষ্ট ও সহজবোধ্য চিত্র বড় চোখে পড়ে না। কেবল চিত্র হইলে একথা বলা চলিত না, তিনি সেই চিত্রাংকনকে রসোত্তীর্ণ করিয়াছেন। আব্ল ফজলের 'মাটির প্থিবী' বাঙলা সাহিত্যে অনাদ্ত হইবার বস্তু নয়।

ভারতবর্ষ—বৈশাখ, পঞ্চম সংখ্যা, বিংশ বর্ষ। সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্র-নাথ ম্খোপাধ্যায়, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। বার্ষিক ম্ল্য ৬।৵০ আনা।

বৈশাখ মাসের ভারতবর্ষ চিত্র এবং প্রবন্ধ সম্পদে সম্দ্ধ হইয়াছে। 'বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক দ্ষ্টিভঙ্গী'—অধ্যাপক বিশ্বপতি চোধ্রীর লেখাটি স্চিন্তিত। এই ধরণের লেখায় বিশ্বপতিবাব্র হাত পাকা। অধ্যাপক শ্রীয্ত বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের 'গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতী', শ্রীয্ত হরেকৃষ্ণ ম্খোপাধ্যায়ের 'চণ্ডীদাস-নান্ন্র' উল্লেখযোগ্য রচনা। গল্পের মধ্যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অন্ধের বৌ', শ্রীআশালতা সিংহের 'সাধনার ফল', জগদীশ গ্প্তের 'গণনীয় নন্দকিশোর' স্ন্দর লেখা। তারাশঙ্করের 'গণ দেবতা' এবং বনফুলের 'জংগম' এবং রাধিকারঞ্জনের 'কলঙ্কিনীর খাল' ধারাবাহিকর্পে চলিতেছে। সম্পাদন-কৃতিত্ব ভারতবর্ষে স্পরিস্ফুট।

বংগীয় মহাকোষ—প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গগত পণ্ডিত অম্ল্যচরণ বিদ্যা-ভূষণ। কার্যালয়—ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট; ১৭০নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২য় খণ্ড, ১৯শ সংখ্যা।

মহাকোষের বর্তমান সংখ্যায় 'অন্শাসিতা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'অনেকান্তবাদ' পর্যন্ত আলোচনা আছে। 'অন্স্টুপ' ছন্দের সম্বন্ধে শ্রীয্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার মহাশয় যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা স্চিন্তিত এবং বহ্ তথ্যপ্র্ণ; অনেকান্তবাদ দর্শন জগতে জৈনদের একটি বিশিষ্ট দান, এই সম্বন্ধে বহ্ তথ্যপ্র্ণ আলোচনা চলিতেছে। বাঙলার মনীষিসমাজে মহাকোষের আদর সর্বত্র হইবে। এবং যেভাবে ইহার কাজ চলিতেছে তাহাতে এই স্ব্হৎ গ্রন্থ সম্প্র্ণ হইলে বাঙলার পক্ষে এই গ্রন্থ গর্বের বিষয় হইবে।

সভ্যতার সঙ্কট

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজ আমার ৮০ বৎসর বয়স পূর্ণ হোলো, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতম দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে, আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে, সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।

বৃহৎ মানব-বিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজ জাতির ইতিহাসে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্ঘাটিত হোলো একটি মহৎ সাহিত্যের উচ্চ শিখর থেকে ভারতের এই আগন্তুকের চরিত্র পরিচয়। তখন আমাদের বিদ্যালাভের পথ্য পরিবেশনে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য ছিল না। এখনকার যে বিদ্যা জ্ঞানের নানা কেন্দ্র থেকে বিশ্বপ্রকৃতির পরিচয় ও তার শক্তির রহস্য নতুন নতুন করে দেখাচ্ছে তার অধিকাংশ ছিল তখন নেপথ্যে অগোচরে। প্রকৃতিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ছিল অল্পই। তখন ইংরেজী ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজী সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষা প্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে, নিয়তই আলোচনা চলত সেক্সপিয়ারের নাটক নিয়ে, বায়রণের কাব্য নিয়ে এবং তখনকার পলিটিক্সে সর্বমানবের বিজয় ঘোষণায়। তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে, এক সময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা এক সময় অত্যাচার-প্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলণ্ডে। যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংলণ্ডে। মানব-মৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ চরিত্রে, তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেম। তখনো সাম্রাজ্য-মদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয়নি।

আমার যখন বয়স অল্প ছিল ইংলণ্ডে গিয়েছিলেম। সেই সময় জন্ ব্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেণ্টে এবং তার বাহিরে কোনো কোনো সভায় যে বক্তৃতা শুনেছিলেম, তাতে শুনেছি চিরকালের ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাপ্তি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম ক'রে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে আমার আজ পর্যন্ত মনে আছে এবং আজকের এই শ্রীভ্রষ্ট দিনেও আমার পূর্ব স্মৃতিকে রক্ষা করছে। এই পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের শ্লাঘার বিষয় ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে এইটুকু প্রশংসার বিষয় ছিল যে, আমাদের আবহমানকালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে একটি মহৎ রূপ সেদিন দেখেছি তা বিদেশীয়কে আশ্রয় করে প্রকাশ পেলেও তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল ও কুণ্ঠা আমাদের মধ্যে ছিল না। কারণ মানুষের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোনো জাতির মধ্যে বদ্ধ হোতে পারে না, তা কৃপণের অবরুদ্ধ ভাণ্ডারের সম্পদ নয়। তাই ইংরেজের যে সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টিলাভ করেছিল, আজ পর্যন্ত তার বিজয় শঙ্খ আমার মনে মন্দ্রিত হয়েছে।

"সিভিলিজেশন", যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জমা করেছি তার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়। এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, মনু তাকে বলেছেন—সদাচার। অর্থাৎ তা কতগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন। এই নিয়মগুলির সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যে ধারণা ছিল, সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোল খণ্ডের মধ্যে বদ্ধ। সরস্বতী ও দৃশদবতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল, সেই দেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে এসেছে, তাকেই বলে সদাচার। অর্থাৎ এই আচারের ভিত্তি প্রথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা যত অবিচারই থাক। এই কারণে প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচার-ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে চিত্তের স্বাধীনতা নির্বিচারে অপহরণ করেছিল। সদাচারের যে আদর্শ একদা মনু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন, সেই আদর্শ ক্রমশ লোকাচারকে আশ্রয় করলে। আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম, তখন ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। রাজনারায়ণবাবু কর্তৃক বর্ণিত তখনকার কালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যবহারের বিবরণ পড়লে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলাম। আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন, কী ধর্মমতে কী লোক-ব্যবহারে ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম এবং সেই সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিল। এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তারপর থেকে ছেদ আরম্ভ হোলো কঠিন দুঃখে। প্রত্যহ দেখতে পেলুম সভ্যতাকে যারা চরিত্র উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।

নিভৃতে সাহিত্যের রস সম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হোলো তা হৃদয়বিদারক। অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য মানুষের শরীর মনের যা কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসন-চালিত কোনো দেশেই ঘটেনি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলেম, তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব আদর্শের এত বড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারিনি; অবশেষে দেখছি একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহু কোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য উগ্র হয়ে উঠল।

যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে, তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত, অথচ চক্ষের সামনে দেখলুম জাপান দেখতে দেখতে সর্বতোভাবে কী রকম সম্পদবান হয়ে উঠল। সেই জাপানের সমৃদ্ধি আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি। দেখেছি সেখানে স্বজাতির মধ্যে তার সভ্য শাসনের রূপ আর দেখেছি রাশিয়ায় মস্কাও নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের, আরোগ্যবিস্তারের কী অসামান্য অকৃপণ অধ্যবসায়। সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্য ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতা জাতি বিচার করেনি, শ্রেণী বিচার করেনি, বিশুদ্ধ মানব সম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে। তার দ্রুত এবং আশ্চর্য পরিণতি দেখে একইকালে ঈর্ষা এবং আনন্দ অনুভব করেছি। মস্কাও শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল; দেখেছিলেম সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র অধিকারের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না, তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা। দেখে এসেছি, পারস্য দেশ একদিন দুই য়ুরোপীয় জাতির জাঁতার চাপে পিষ্ট হচ্ছিল তখন সেই নির্মম আক্রমণের য়ুরোপীয় দংষ্ট্রাঘাত থেকে আপনাকে মুক্ত ক'রে কেমন ক'রে এই নবজাগ্রত জাতি আত্মশক্তির পূর্ণতা সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। তার সৌভাগ্যের প্রধান কারণ এই যে, সে য়ুরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল থেকে মুক্ত হোতে পেরেছিল। সর্বান্তঃকরণে আজ আমি এই পারস্যের কল্যাণ কামনা করি। আমাদের প্রতিবেশী আফগানিস্থানের মধ্যে

শিক্ষা এবং সমাজনীতির সেই সার্বজনীন উৎকর্ষ যদিচ এখনো ঘটেনি কিন্তু তার সম্ভাবনা অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তার একমাত্র কারণ সভ্যতাগর্বিত কোনো য়ুরোপীয় জাতি তাকে আজো অভিভূত করতে পারেনি। এরা দেখতে দেখতে চারদিকে উন্নতির পথে, মুক্তির পথে অগ্রসর হোতে চলল।

ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দল-পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে। চৈনিকদের মতন এত বড়ো প্রাচীন সভ্য জাতিকে, ইংরেজ স্বজাতির স্বার্থ-সাধনের জন্য বলপূর্বক আফিম বিষে জর্জরিত ক'রে দিলে এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসাৎ করলে। এই অতীতের কথা যখন ক্রমশ ভুলে এসেছি তখন দেখলুম উত্তর চীনকে জাপান গলাধঃকরণ করতে প্রবৃত্ত; ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতি-প্রবীণেরা কী অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সেই দস্যুবৃত্তিকে তুচ্ছ ব'লে গণ্য করেছিল। পরে এক সময় স্পেনের প্রজাতন্ত্র-গভর্মেণ্টের তলায় ইংলণ্ড কী রকম কৌশলে ছিদ্র করে দিলে, তাও দেখলাম এই দূরে থেকে। সেই সময়েই এও দেখেছি একদল ইংরেজ সেই বিপদগ্রস্ত স্পেনের জন্য আত্ম-সমর্পণ করেছিলেন। যদিও ইংরেজের এই ঔদার্য প্রাচ্য চীনের সংকটে যথোচিত জাগ্রত হয়নি তবু য়ুরোপীয় জাতির প্রজাস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যখন তাদের কোনো বীরকে প্রাণপাত করতে দেখলুম তখন আবার একবার মনে পড়ল ইংরেজকে একদা মানবহিতৈষীরূপে দেখেছি এবং কী বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তি করেছি। সেই সময়কার জার্মেনীর সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনের ইতিহাস আজ মনে আনতেই ইচ্ছে করে না। কেবল এই কথাই ভাবি সাম্রাজ্য স্বার্থ-লোলুপতা এত বড়ো জাতির চরিত্রে কেমন করে ক্রমশ লজ্জাকর বিকারে কুৎসিত হয়ে উঠেছিল। মনে হোলো একদিন যাকে দেখেছিলুম তরুণ যুবক সুস্থ সবল, মানবের আনুকূল্যে সর্বদাই অসাধ্য অধ্যবসায়ে প্রস্তুত আর একদিন দেখা গেল তারি মজ্জার ভিতর থেকে মারী গোপনে পরিস্ফুট হয়ে কী করে ক্রমশ তার দেহকে জর্জর করে তুলেছে। য়ুরোপীয় জাতির স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি বিশ্বাসক্রমে কী ক'রে হারানো গেল তারি এই শোচনীয় ইতিহাস আজ আমাকে জানাতে হোলো। সভ্য-শাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়, সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে সে যদি ভারত শাসনযন্ত্রের ঊর্ধ্বস্তরে কোনো এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হোত তা হলে কখনই ভারত ইতিহাসের এত বড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না। ভারতবাসী যে বুদ্ধি সামর্থে কোনো অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্য দেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই, ইংরেজ শাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্ত্য জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত। এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি এ'কে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি, সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্ত্য জাতির সভ্যতা অভি-মানের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি। অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সবচেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে তার কৃপণতা। এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। অথচ আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহদাশয় ইংরেজের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে। এই মহত্ত্ব আমি অন্য কোনো জাতির কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাই নি। এ'রা আমার বিশ্বাসকে ইংরেজ জাতির প্রতি আজো বেঁধে রেখেছেন। দৃষ্টান্তস্থলে এণ্ড্রুজের নাম করতে পারি, তাঁর মধ্যে যথার্থ ইংরেজকে যথার্থ খৃষ্টানকে যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। আজ মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষণীতে স্বার্থসম্পর্কহীন তাঁর নির্ভীক মহত্ত্ব আরও জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর কাছে আমার এবং আমাদের সমস্ত জাতির কৃতজ্ঞতার নানা কারণ আছে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একটি কারণে আমি তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। তরুণ বয়সে ইংরেজী সাহিত্যের পরিবেশের মধ্যে যে ইংরেজ জাতিকে আমি নির্মল শ্রদ্ধা একদা সম্পূর্ণ চিত্তে নিবেদন করেছিলেম আমার শেষ বয়সে তিনি তারই জীর্ণতা ও কলঙ্কমোচনে সহায়তা করে গেলেন। তাঁর স্মৃতির সঙ্গে এই জাতির মর্মগত মাহাত্ম্য আমার মনে ধ্রুব হয়ে থাকবে। আমি এ'দের নিকটতম বন্ধু ব'লে গণ্য করেছি এবং সমস্ত মানবজাতির বন্ধু ব'লে মান্য করি। এ'দের পরিচয় আমার জীবনে একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে সঞ্চিত হয়ে রইল। আমার মনে হয়েছে ইংরেজের মহত্ত্বকে এ'রা সকল প্রকার নৌকাডুবি থেকে উদ্ধার করতে পারবেন। এ'দের যদি না দেখতুম এবং না জানতুম তাহলে পাশ্চাত্ত্য জাতির সম্বন্ধে আমার নৈরাশ্য কোথাও প্রতিবাদ পেত না।

এমন সময় দেখা গেল সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কী রকম নখদন্ত বিকাশ ক'রে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানব পীড়নের মহামারী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে' আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে। আমাদের হতভাগ্য নিঃসহায় নীরন্ধ্র অকিঞ্চনতার মধ্যে আমরা কি তার কোনো আভাস পাই নি। আজ শক্তির সঙ্গে শক্তির দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলল অর্থাৎ পশুর সঙ্গে পশুর, মানুষের সঙ্গে মানুষের নয়।

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষে করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম ব'লে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ ব'লে যাব প্রবল প্রতাপ-শালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারি প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে,

"অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥" *

* বাঙ্গলার শুভ নববর্ষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বাণী।

দেশ বিদেশে নববর্ষ—



নববর্ষের উৎসবসাজে সজ্জিত দিনেমার বালক-বালিকা



নববর্ষে নৃত্যরতা সার্বিয়ার জিপসী নারী

রঙ্গজগৎ

নিউ সিনেমায় নর্তকী

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডের নূতন হিন্দী চিত্র। পরিচালনা—শ্রীদেবকীকুমার বসু। সঙ্গীত—শ্রীপঙ্কজ মল্লিক। শ্রেষ্ঠাংশে—লীলা দেশাই, নাজাম, জগদীশ শেঠী, পঙ্কজ মল্লিক ইত্যাদি।

চম্পা নগরীর মঠের ভেতর নারীর প্রবেশাধিকার নেই। যে দেশবিখ্যাত রূপসী নটী রূপকুমারীর হাস্যলাস্যের ইন্দ্রজালে দেশের সেরা সেরা ধনপতিরা মুগ্ধ ও কৃতার্থ, সেই রূপকুমারী মঠ দেখতে এসে দুয়ার থেকে ফিরে গেল। এ অপমানের প্রতিশোধ নিল সে। ধনপতিদের অনুরোধে রাজা মঠের প্রধান পুরোহিত জ্ঞানানন্দকে আদেশ দিলেন—নর্তকী মঠের ভেতর যেতে পারবে। রূপকুমারী সগর্বে মঠে প্রবেশ করে দেখে মঠ জনশূন্য। পুরোহিতের নির্দেশে ব্রহ্মচারীরা স্ব স্ব ঘরে দুয়ার রুদ্ধ ক'রেছে। কিশোর নামে এক ব্রহ্মচারী লঘু অপরাধে পুরোহিতের সুকঠোর প্রায়শ্চিত্তের আদেশ পালন কর্তে না পেরে চলে যাচ্ছিল। রূপকুমারী দিল তাকে আশ্রয়। পুরোহিতের ভর্ৎসনা, পুরোহিতের প্রধান শিষ্য সত্যসুন্দরের অনুরোধ কিশোরকে ফেরাতে পারল না।

রূপকুমারীর দৃষ্টি পড়লো সত্যসুন্দরে উপর। রূপকুমারী ছলাকলায় ব্রহ্মচারী সত্যসুন্দরকে মঠছাড়া করে ছাড়ল। এর পর ঘটনাচক্রে সত্যসুন্দরকে মঠে ফিরে যেতে হলো আবার। রূপকুমারী তার ভুলকরা ভালবাসার বোঝা ও বেদনা নিয়ে চম্পানগর ছেড়ে চলে গেল।

এই হলো আখ্যায়িকা। আখ্যায়িকাটি যেমন উদ্ভট, চরিত্রগুলি ততোধিক। এই রকম দুর্বল আখ্যায়িকা ও বিরক্তিকর মাত্রাহীন সংলাপের আশ্রয়ে শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের হাতেও অভিনয় জমে উঠতে পারে না। মঠের জ্ঞানানন্দ ও আর একজন স্বামীজী (ইনি কোত্থেকে যে এলেন, বোঝা যায় না) দুই-ই অদ্ভুত সৃষ্টি। দর্শকের রুচিবোধ অপমান করবার দিক দিয়ে এই ছবিখানি বেশ সার্থক হয়ে উঠেছে। এমন কি সবচেয়ে সস্তা কেরামতী, যা, অর্থাৎ কেঁদে কেঁদে দর্শকদের চোখ খুঁচিয়ে খানিকটা কাঁদিয়ে দেওয়া, এ ছবিটিতে ততটুকু সাফল্যও হয় নি। অলমতি বিস্তরেণ।

প্রধান ও সাধারণ সব ভূমিকাতেই অভিনয় মোটের ওপর যতটা সম্ভব ভাল হয়েছে। কবিজীর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিকের গানে অভিনয়ত্ব না থাকলেও, তা তৃপ্তিপ্রদ হয়েছে। ফোটোগ্রাফিই সকলের চেয়ে বেশী প্রশংসনীয় হয়েছে।

নিউ থিয়েটার্স

নিউ থিয়েটার্সের কথাচিত্র 'পরিচয়' খুব সম্ভবত আগামী ২৫শে এপ্রিল চিত্রায় মুক্তিলাভ করিবে। এই ছবিখানির হিন্দী সংস্করণ বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলে মুক্তিলাভ করিয়া সবিশেষ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

স্বামী, স্ত্রী এবং বন্ধু এই তিনজনকে কেন্দ্র করিয়া যে, বিষম অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল, 'পরিচয়' তাহারই কথা। কানন, সায়গল, রতীন প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পিগণ এই চিত্রে অভিনয় করিয়াছেন। নীতিন বসু চিত্রখানির পরিচালক। রবীন্দ্রনাথের সাতখানি বিখ্যাত গান এই চিত্রের বিশেষ সম্পদ। রাইচাঁদ বড়াল চিত্রখানির সংগীত পরিচালক।

মিনার্ভা সিনেমা—'অনুরাধা'

শরকো প্রডাকসন্সের হিন্দী সামাজিক চিত্র 'অনুরাধা' এই শনিবারে মিনার্ভা সিনেমায় মুক্তিলাভ করিবে। শ্রেষ্ঠাংশে মায়া ব্যানার্জি অভিনয় করিয়াছেন। ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন মোহন সিং।

শ্রী—'রাসপূর্ণিমা'

ইন্দ্র মুভিটোনের বাঙলা সামাজিক চিত্র 'রাসপূর্ণিমা' এই শনিবারে এখানে মুক্তিলাভ করিবে। এক উপেক্ষিতা পল্লীবধূর কর্তব্যপরায়ণতার কাহিনী এই চিত্রে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বিভিন্ন ভূমিকায়—চন্দ্রাবতী, অশোক রায়, ভুজঙ্গ রায়, অপর্ণা, বোকেন চট্টো, অহি সান্যাল প্রভৃতি অভিনয় করিয়াছেন। শ্রীযুত নিরঞ্জন পাল স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে এই ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় নববর্ষ ঃ



বাঙলা নববর্ষ উৎসবে সামরিক বাদ্যসহকারে জাতীয় পতাকা অভিবাদন।



বাঙলা নববর্ষ উৎসবে ব্যান্ড বাদ্য সহযোগে বালিকাদের কুচকাওয়াজ

খেলাধুলা

বাঙলার নববর্ষ উৎসব

বাঙলার নববর্ষ উৎসব গত সোমবার প্রাতে ও অপরাহ্নে কলিকাতা ও উপকণ্ঠের বিভিন্ন স্থানে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্থানে সহস্র সহস্র তরুণ তরুণী, বালক বালিকা সামরিক ব্যাণ্ড বাদ্য সহকারে জাতীয় পতাকা অভিবাদন ও সম্মিলিতভাবে নানাবিধ ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন করিয়াছে। হাওড়া ময়দানে, উত্তর কলিকাতায় দেশবন্ধু পার্কে, দক্ষিণ কলিকাতায় লেক ময়দানে ও মধ্য কলিকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যেভাবে উৎসব পালিত হইয়াছে তাহা প্রকৃতই আনন্দদায়ক ও উৎসাহ বর্ধক। বাঙালীর ভবিষ্যৎ তরুণ তরুণী, বালক বালিকা সঙ্ঘবদ্ধতা, নিয়মানুবর্তিতার দিকে যে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, এই সকল অনুষ্ঠান তাহার প্রকৃত পরিচয় দিয়াছে। একের নির্দেশে সহস্র সহস্র বালক বালিকার একত্রে পাদক্ষেপ, একত্রে হস্তপদ চালনা একতার অপূর্ব আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। দারিদ্র্য অনাহারক্লিষ্ট নির্জীব বাঙালীর প্রাণে এই অনুষ্ঠান এক অনির্বচনীয় আনন্দ ও প্রেরণা দান করিয়াছে। বাঙালী জাতির অস্তিত্ব লোপ পাইবে বলিয়া যাঁহারা আশঙ্কা করিতেন তাঁহারাও আশা ও ভরসা লাভ করিয়াছেন যে, শীঘ্রই বাঙালী তাহার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবে। বাঙালীর বর্তমান শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী একতার অভাব ও স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা, বাঙলার সর্বসাধারণ বর্তমানে ইহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে। নববর্ষ-অনুষ্ঠান-পরিচালকগণ বাঙালী জাতির প্রাণে এই উপলব্ধি আনিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ সফলতা লাভ না করিলেও আংশিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। নববর্ষ অনুষ্ঠান দ্বারা বাঙালী জাতি দ্রুত নিয়মানুবর্তিতা ও কর্মক্ষমতা লাভ করিবে ইহা বর্তমানে অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। এই জন্যই যে নববর্ষ অনুষ্ঠান এতদিন হাওড়া ও কলিকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাহা সারা বাঙলার মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই বৎসরে সেইজন্য হাওড়া ও কলিকাতা ব্যতীত চুঁচুড়া, রিসড়া, চন্দননগর, কোন্নগর প্রভৃতি স্থানেও উহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সকল স্থানের অনুষ্ঠানে বালক বালিকা, যুবক যুবতীগণের উৎসাহ দেখিয়া মনে হইয়াছে আগামী বৎসরে বাঙলার সকল বড় শহর ও গ্রামে ইহা অনুষ্ঠিত হইবে। হয়ত আমাদের এই ধারণা ভ্রান্ত কিন্তু তাহা হইলেও এই বৎসরে যতগুলি স্থানে নববর্ষ উৎসব হইয়াছে আগামী বৎসরে তাহার অপেক্ষা অধিক সংখ্যক স্থানে যে এইরূপ অনুষ্ঠান হইবে সে বিষয়ে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই। নববর্ষ অনুষ্ঠানের ইতিহাস আলোচনা করিয়াই আমরা এইরূপ উক্তি করিতে সাহসী হইতেছি।

নববর্ষ অনুষ্ঠানের ইতিহাস

১৯৩১ সালে ১লা বৈশাখ দিবসে হাওড়ার শিবপুর অঞ্চলের কতিপয় ব্যায়াম উৎসাহী যুবক এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। তাহাদের মনে হয় পৃথিবীর বিভিন্ন স্বাধীন জাতি ১লা জানুয়ারী দিবসে যখন উৎসবের ব্যবস্থা করিয়া থাকে তখন বাঙলা দেশে ১লা বৈশাখ দিবসে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলে কি অন্যায় হইবে? কিন্তু দুঃখের বিষয় যে প্রবর্তকগণ পর পর তিন বৎসর ১লা বৈশাখ দিবসে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও হাওড়ার সকল ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করে না। মাত্র ৩০।৪০জন বালক লইয়া এইরূপ উৎসবের ব্যবস্থা করিতে হয়। হঠাৎ ১৯৩৪ সালে তাহাদের মনে হয় এই অনুষ্ঠান প্রকাশ্য কোন স্থানে করিলে হয়ত বা তাহারা হাওড়ার জনসাধারণের সকলের সাহায্য লাভ করিবে। ফল কি হয় দেখিবার জন্য ১৯৩৪ সালে হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চলের ৪।৫টি ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ১৫০ শত বালক লইয়া হাওড়া ময়দানে নববর্ষ উৎসবের ব্যবস্থা করে। এই উৎসব দেখিবার জন্য বাঙলার প্রায় সকল সংবাদ পরিচালক ও ব্যায়াম উৎসাহীকে তাঁহারা নিমন্ত্রণ করে। এই অনুষ্ঠানে ১৫০ বালক এত নিখুঁতভাবে একের নির্দেশে ব্যায়ামের বিভিন্ন কৌশল প্রদর্শন করে যে, দর্শকগণ ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ সকলে মুগ্ধ হন।



দক্ষিণ কলিকাতা নববর্ষ উৎসবে বালিকাগণের "মার্চ পাস্টের" একটি দৃশ্য

উপস্থিত সংবাদপত্রসেবিগণ এতই প্রীত হন যে তাঁহারা ঐ অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সংবাদ প্রকাশ করেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সংবাদ হাওড়ার সকল ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানের

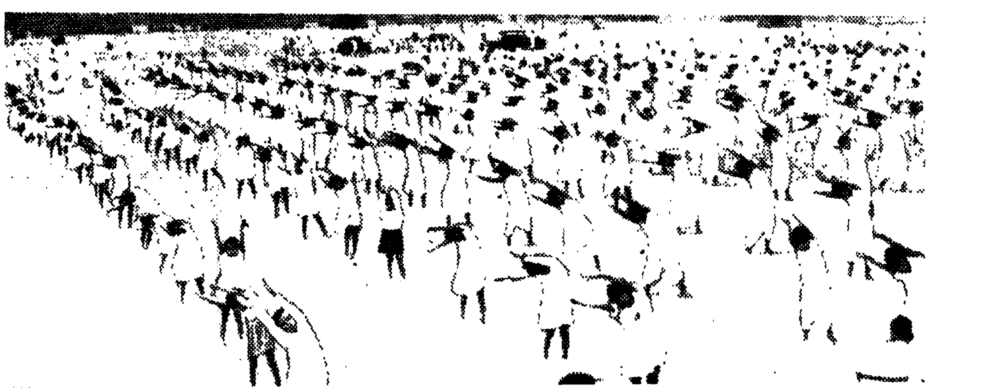
দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সকলেই এইরূপ অনুষ্ঠানের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। পরিচালকগণ তখন সকল ক্লাবের প্রতিনিধি লইয়া একটি ফেডারেশন গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উৎসাহী ক্লাবসমূহের পরিচালকগণ এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। ১৯৩৫ সালে হাওড়া ফেডারেশন অফ এসোসিয়েশন গঠিত হয় ও হাওড়ার প্রায় সকল ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান এই ফেডারেশনে যোগদান করে। ১৯৩৬ সালে ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির ব্যবস্থা কতিপয় ক্লাব সমর্থন করিতে না পারিয়া ফেডাশেন হইতে বাহির হইয়া স্বতন্ত্র এক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। এইজন্য ১৯৩৬ সালে একই সময়ে হাওড়া ময়দানে পাশাপাশি মাঠে দুইটি অনুষ্ঠান হয়। এই দুইটি অনুষ্ঠানের সংবাদ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কোন এক বিশিষ্ট সংবাদপত্রসেবীর প্রচেষ্টায় ১৯৩৬ সালের শেষভাগে এই দুইটি দল একত্র হইয়া কার্য করিবার সংকল্প গ্রহণ করে। হাওড়া ফেডারেশন অফ এসোসিয়েশন পুনরায় দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর হইতে এই ফেডারেশন অফ এসোসিয়েশনই হাওড়ার এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করিতেছে। ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সালের হাওড়ার এই নববর্ষ উৎসব কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যায়াম উৎসাহীদের অনুপ্রাণিত করে। তাহারা এইরূপ উৎসবের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হয়। ফলে ১৯৩৭ সালে উত্তর কলিকাতা ও দক্ষিণ কলিকাতায় এই উৎসব পালিত হয়। ১৯৩৮ সালে মধ্য কলিকাতাতেও এই উৎসব হয়। ইহার পর হইতে এই সকল স্থানে নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। কলিকাতার ও হাওড়ার অনুষ্ঠান বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যায়াম উৎসাহীদের নববর্ষ উৎসব করিতে উৎসাহ দান করিয়াছে এবং তাহার জন্যই বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যায়াম উৎসাহীগণ এইরূপ অনুষ্ঠান করিতেছেন। হিন্দু মহাসভা, যুবসংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহও এইদিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। এই উৎসবটি শীঘ্রই যে জাতীয় উৎসবে পরিণত হইবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

নিখিল বঙ্গ লাঠি প্রতিযোগিতা

বাঙলার বিখ্যাত লাঠি পরিচালক শ্রীযুত পুলিনবিহারী দাসের পরিচালনায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্যায়াম সমিতিতে সম্প্রতি এক নিখিল বঙ্গ লাঠি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় বাঙলার বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক উৎসাহী লাঠিয়াল যোগদান করেন। বড়লাঠি ও ছোটলাঠি, এই দুইটি বিভাগের প্রতিযোগিতা হয়। উভয় বিভাগে বহু সংখ্যক লাঠিয়াল যোগদান না করিলেও প্রত্যেক বিভাগেই প্রতিদ্বন্দ্বী লাঠিয়ালদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা অনুভূত হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতা শেষ হইতে তিনদিন সময় লাগে। শ্রীযুত পুলিনবিহারী দাস নিজে একজন বিচারকের কার্য করেন। প্রথম অনুষ্ঠান হিসাবে এই প্রতিযোগিতায় বাঙালী তরুণ লাঠিয়ালগণ যেরূপ উৎসাহ, উদ্দীপনা ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ও শ্রীযুত পুলিনবিহারী দাস বাঙলার যুবক যুবতী ও বালক বালিকার মধ্যে যে লাঠি খেলার প্রচলন করিয়াছিলেন তাহা যে ব্যর্থ হয় নাই তাহা এই প্রতিযোগিতা হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রতিযোগিতার সময় গণ্ডগোল

এই নিখিল বঙ্গ লাঠি প্রতিযোগিতার প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের সময় যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, তাহা যদিও খুবই দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় তথাপি তাহা উল্লেখ না করাও যুক্তিসংগত হইবে না। কারণ এই ঘটনার উপর প্রতিযোগিতার ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। আমরা জানি এই গণ্ডগোল বা মারামারির জন্য পরিচালকগণ সম্পূর্ণ দায়ী নহে, অখেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি সম্পন্ন কয়েকজন লাঠিয়াল ও দর্শক ইহার ইন্ধন যোগাইয়াছে। কিন্তু তথাপিও, এই কথা বলিতে আমরা কোনরূপ দ্বিধা বোধ করিতেছি না যে পরিচালকগণের ত্রুটিও ইহার প্রশ্রয় দিয়েছে। সমিতির সভ্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে বর্তমান থাকিতে সমিতির পরিচালককে বিচারক করা কোনরূপেই যুক্তিসংগত হয় নাই। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত পুলিন দাসের ন্যায় লাঠি জ্ঞান রাখে এইরূপ লোক বাঙলাদেশে বর্তমানে আর কেহ নাই ইহা সকলে স্বীকার করে এবং আমরাও করি। তিনি যে পক্ষপাতদুষ্ট লোক নহেন, এই বিষয়েও আমাদের কোন সন্দেহ নাই। তাহার নির্দেশ যে নির্ভুল হয় সে বিষয়ে আমাদের বিশ্বাস আছে। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে, মানুষ মাত্রেই স্বার্থের দাস। এই ক্ষেত্রে গণ্ডগোলকারীদের স্বার্থে আঘাত লাগার ফলেই তাহারা উত্তেজিত হইয়াছে। শ্রীযুত দাস মহাশয়ের নির্দেশ এইজন্যই তাহাদের ত্রুটিপূর্ণ মনে হইয়াছে এবং তাহারা সহ্য করিতে না পারিয়া গণ্ডগোল ও মারামারি করিয়াছে। এইরূপ মারামারি যে কেবল বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতির অনুষ্ঠানে প্রথম হইল তাহা নহে, পৃথিবীর বহু দেশের ব্যায়াম প্রতিযোগিতার সময় হইয়াছে, যখনই একটি ক্লাবের পরিচালক নিজ দলের প্রতিদ্বন্দ্বী বর্তমান থাকিতে বিচারকের কার্য করিয়াছেন। এইরূপ ঘটনা ঘটে বলিয়া বর্তমানে এইরূপ একটি প্রতিযোগিতা দেখা যায় না সেখানে নিজ ক্লাবের সভ্য বর্তমান থাকিতে পরিচালক নিজ বিচারকের কার্য করিয়াছে। আমরা আশা করি বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতির পরিচালকগণ এইরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা পুনরায় যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন।



দক্ষিণ কলিকাতা নববর্ষ উৎসবে বালক বালিকাগণের সম্মিলিত ব্যায়াম প্রদর্শনীর একটি দৃশ্য

বিচিত্র বার্তা

ঘাস কোন কোন জন্তুর প্রধান খাদ্য। গরুর কাছ থেকে প্রচুর দুধ পেতে হলে আমরা সতেজ খাসের ব্যবস্থা দিই। ঘাস যে বলকারক এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বহুদিনের। ছোটবেলায় যাঁরা পড়েছেন কিভাবে, বৃদ্ধ রাজা Nabuchadnezzar হাত পা দিয়ে মাঠ হেঁটে সবুজ ঘাস খেতেন, তাঁরা নিশ্চয় হেসেছেন আর বৃদ্ধ রাজা সত্যিকারের জন্তু না হলেও যে বুদ্ধিতে জন্তুরই মত ছিলেন এটা ছেলেবেলাতেই সকলের বিশ্বাস জন্মেছিল। কিন্তু বর্তমানকালের বৈজ্ঞানিক



চিকিৎসাশাস্ত্রে নবযুগ : কয়েকজন অধ্যবসায়ী গবেষকগণের প্রচেষ্টায় সম্প্রতি চিকিৎসাশাস্ত্রে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। শিশুদের পক্ষাঘাত রোগ নিরাময়ের জন্য যে ওষুধ আবিষ্কারের কল্পনা তাঁরা করছেন, তারই একটি পরীক্ষা চিত্রের বাঁদরটির উপরে করা হচ্ছে। বাঁদরটির শরীরে বীজ সঞ্চারণ করা হচ্ছে।

যুগে বৈজ্ঞানিকেরা বৃদ্ধ রাজার ঘাস খাওয়াটাকে পাগলামী বলে হেসে উড়িয়ে দেন না বরং রাজার এই অদ্ভুত খেয়ালের মধ্যে কতখানি যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল তা দেখে আশ্চর্য হন। তাঁদের কাছে খাস খাওয়াটা মোটেই হাস্যস্পদ ব্যাপার নয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাঁরা ঘাসকে চূর্ণ করেছেন। এই ঘাসের পাউডার মধ্যে উপযুক্ত খাদ্যপ্রাণ আছে। তাঁদের মতে এই ঘাস খেতে খুব সুস্বাদু, শরীরের পক্ষে বলকারক, অসুস্থ দুর্বল দেহের উপযুক্ত ওষুধ। বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত 'Dehydrated alfalfa' পশু এবং মানুষের বলকারক খাদ্য হিসাবে অনেকদিন থেকেই সুনাম রেখে আসছে। বর্তমানে এর প্রয়োজনীয়তা কেবল খাদ্য হিসাবেই নেই। যুদ্ধে আহত সহস্র সহস্র সৈন্যকে ওষুধ হিসাবে এর ব্যবস্থা দেওয়া হয়। এতে ভিটামিন K দিয়ে আহত সৈন্যেরা অল্প সময়ের মধ্যে শরীরে

শক্তি লাভ করে। বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন, আমরা যেভাবে সবুজ শাকসব্জী খাই ঠিক সেইভাবেই ঘাস খাওয়া যেতে পারা যায়। এবং খাওয়া উচিত। ঘাসের মধ্যে প্রায় সকল শ্রেণীর ভিটামিন পাওয়া যায়। শাকসব্জী এবং ফলের থেকে প্রায় আঠাশ গুণ বেশী ভিটামিন প্রতি এক পাউন্ড ঘাসে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, গাজরের থেকে তেইশ গুণ বেশী 'এ' ভিটামিন, সবুজ পাতাবিশিষ্ট সব্জী থেকে ন'গুণ বেশী 'বি' ভিটামিন এবং বিলেতী বেগুণের থেকে ১৪ গুণ বেশী 'সি' ভিটামিন ঘাসের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে, 'Alfalfa', ঘাসের মত দেখতে হলেও এবং সাধারণ লোকে এদের ঘাস বললেও, এদের কিন্তু ঘাস না বলে নিঃসন্দেহে সব্জী বলা যায়। এর মধ্যে প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে আছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে এক পাউন্ড এই জাতীয় ঘাসে ১৮৯০০০ ইউনিট ভিটামিন 'এ' বিদ্যমান এবং এই ভিটামিন একজন সাধারণ মানুষের পূর্ণ পাঁচ সপ্তাহের পক্ষে যথেষ্ট। ক্যানেডা এবং আমেরিকার তিন প্রকার ঘাসকে খাওয়ার উপযুক্ত করে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এই ব্যবসায়ে লাভ প্রচুর। বৃহৎ জমিতে দামী সার দিয়ে কয়েক জাতীয় ঘাস

ঘাস থেকে প্রস্তুত 'Dehydrated Alfalfa Meal' আজ সর্বত্রই সমাদৃত হয়েছে। বৎসরে প্রায় ২,৫০০ টন এই খাদ্য বিদেশে রপ্তানি হয়। যে সময়ে তাজা সবুজ ঘাসের অভাব থাকে সে সময়ে এই খাদ্যের প্রয়োজন বেশী বাড়ে। ব্যবসায়ীরা গরুকে এই খাদ্য দিয়ে প্রচুর সুস্বাদু দুধ উৎপন্ন করে।

ইউরোপের বিখ্যাত রসায়নাগারগুলিতে বৈজ্ঞানিকগণ ঘাসকে নানাভাবে গবেষণা করেছেন। গবেষণার পর তাঁরা ঘাসকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে খাদ্যে পরিণত করেছেন তাঁদের মতে তা তাজা ঘাসের মতনই সকল প্রকার ভিটামিন এবং অন্যান্য বলকারক খাদ্য-শক্তিধারণ করে।

ঘাসের উপকারিতা সম্বন্ধে আমাদের উপযুক্ত জ্ঞানের বহু পূর্বেই নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুদের মধ্যে খাদ্য হিসাবে এর প্রচলন ছিল। বৈজ্ঞানিকগণ বলেছেন, প্রধান খাদ্য হিসাবে ঘাসের প্রয়োজনীয়তা অনেক জন্তুর থাকলেও এমন অনেক জন্তু দেখা গেছে যারা আমীষভোজী, তারা যখনই শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে এসেছে তখনই ঘাসের জঙ্গলে ছুটে এসে ওষুধ হিসাবে তা খেয়েছে। তাঁদের মতে এর যথেষ্ট ফল আছে। তাঁরা বলেছেন, মানুষ বহু শতাব্দীর গবেষণায় যে বস্তুর সন্ধান পেয়েছে নিম্ন শ্রেণীর জীব জন্তুরা অতি সহজ-ভাবেই মানুষের আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই তাদের জীবনধারণের কাজে নানাভাবে তাদের লাগিয়েছে।

* * * *

আজকাল কলের পুতুল, মোটর গাড়ী এমনি আরও অনেক খেলার আসবাব কেবল ছোট ছেলে কেন বড়দেরও পর্যন্ত তাক লাগিয়ে দেয়। পৃথিবীর প্রথম কলের কুকুর দর্শকদের একেবারে অবাক করেছে। কলের কুকুরটির নাম স্পার্কো। সম্প্রতি নিউ ইয়র্কের কোন একটি প্রদর্শনীতে স্পার্কো এক বৃহৎ জনসমুদ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। জনতাকে দেখে স্পার্কো আনন্দে বারবার লেজ নেড়ে উঠল, সামনে তাড়া দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আবার হঠাৎ ভয় পেয়ে লেজ পেটের তলায় লুকিয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে। জনতার মধ্যে একটা তুমুল হাস্যধ্বনি জেগে উঠল। ঘনঘন করতালির আহ্বানে স্পার্কো আবার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব হ'ল। এবার তার মূর্তি অন্যরকম। শত্রুর আবির্ভাব বুঝতে পেরে সে দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার জুড়ে দিয়েছে; বিশ্রামের জন্য বারকয়েক একটা চেয়ারে বসল তারপর কার অনুপস্থিতি অনুভব করে বিরহ ব্যথায় করুণসুরে আর্তনাদ আরম্ভ করে দিল। জনতাও হাল্কা হতে লাগল। অভিনয়ে কেবল কলের পুতুল স্পার্কো একটা জিনিষ দেখায় নি সেটা—পাত্র থেকে জলপান এবং ভোজন। যাঁরা মাথা ঘামিয়ে এতখানি করেছেন শেষটুকু বাকি রেখে দর্শকদের হতাশ করবেন না।



চিকিৎসাশাস্ত্রে নবযুগ : Influenza রোগের প্রতিষেধক ওষুধ আবিষ্কারকল্পে বৈজ্ঞানিকগণ হতভাগ্য মুরগীর বাচ্চাদের উপর পরীক্ষা করছেন।

দেশ

৮ম বর্ষ]   ১৩ই বৈশাখ, শনিবার, ১৩৪৮ সাল। Saturday, 26th April, 1941.   [২৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতবাসী ও ইংরেজ—

ডাক্তার ফস্ ওয়েস্টকট ভারতবর্ষের বড় পাদরী। তিনি সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন—'আমরা এমন একটা অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, যখন ভারতবাসী ও ইংরেজদের ভিতরকার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক পরস্পরের মতিগতির সম্বন্ধে ভুল বুঝিবার দরুণ বিপন্ন হইতে বসিয়াছে। এমন অবস্থায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমান অংশীদার হিসাবে ইংলণ্ড ও ভারত এই উভয় দেশের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক দৃঢ় করিবার পথেই যে ভারতবাসীরা বিশেষ লাভবান হইবে, এই কথাটা তাহাদিগকে খোলাখুলি এবং হৃদ্যতার সঙ্গে বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করা উচিত।' মাননীয় ডাক্তার ফস্ যে উপদেশ দিয়াছেন, আমরা ভারতবাসীরা এই উপদেশ অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি এবং সেই উপদেশের প্রতি এককালে এদেশের লোকের যে শ্রদ্ধাও ছিল, রবীন্দ্রনাথ সেদিনও সে কথা বলিয়াছেন। কিন্তু খোলাখুলি কথা যদি বলি, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, সে শ্রদ্ধা আর নাই। স্বদেশী আন্দোলনের যুগের চিন্তার ধারার মধ্যে আমরা যাহারা জন্মিয়াছি, তাহাদের মনে সেই শ্রদ্ধাবুদ্ধি কোনদিনই ছিল না এবং ইহাও সত্য যে, পরবর্তী যুগে সেই শ্রদ্ধাবুদ্ধির অভাব বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে কমে নাই, বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"একদিন যাকে দেখেছিলুম তরুণ যুবক, সুস্থ সবল, মানবের আনুকূল্যে সর্বদাই অসাধ্য অধ্যবসায়ে প্রস্তুত, আর একদিন দেখা গেল তাঁর মজ্জার ভিতর থেকে মারী গোপনে পরিস্ফুট হয়ে কী করে ক্রমশ তার দেহকে জর্জর করে তুলেছে।" সুতরাং ইংরেজের মতিগতির সম্বন্ধে ভারতবাসীরা ভুল বুঝার ফলে এই সমস্যা দাঁড়াইয়াছে, এমন কথা যাঁহারা বলেন, বলেন অনেকেই, তাঁহারা ঠিক কথা বলেন না। পক্ষান্তরে ইংরেজের মতিগতি ভারতবাসীরা যতই বুঝিতেছে ততই ভারতবর্ষের সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিতেছে। আজ যদি ভারতের সমস্যার সত্যই সমাধান করিতে হয়, তাহা হইলে ফাঁকা বোলচালে কুলাইবে না; ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজ যে মাতব্বরীর মতিগতি লইয়া চলিতেছে, তাহার পরিবর্তন করিতে হইবে এবং এই সত্যকে তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, স্থূলদৃষ্টিতে মাতব্বরীরূপে যে ভাবটা ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহার মূলে স্বার্থগত সংস্কার রহিয়াছে। ভারতবাসীরা নিজেদের স্বার্থবুদ্ধিতে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। কার্যত ভারতের স্বার্থের সহিত নিজেদের স্বার্থের যতটা সামঞ্জস্য হয়, ইংরেজ যদি তাহাতেই নিজের সমধিক স্বার্থ বুঝে, তবেই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে; কিন্তু সে লক্ষণ কিছুই দেখা যাইতেছে না। ইংরেজ প্রভুরা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিজেদের সাম্রাজ্যবাদীসুলভ স্বার্থকেই বড় বলিয়া বুঝিতেছেন, কাজেই চুলমাত্রও সে ভুলের যেখানে ব্যতিক্রম নাই, সেখানে শুধু কথায় কি হইবে?

দায়ী কাহারা?

'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' পত্রের পক্ষ হইতে গান্ধীজীকে সত্যাগ্রহ স্থগিত করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। গান্ধীজী সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। কেন পারেন নাই, খোলাখুলিই তিনি সে কথাটা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "যতই অবাঞ্ছিত হউক, আমি এ কথাটা না বলিয়া পারিতেছি না, ইহাই আমার সুদৃঢ় অভিমত যে, ব্রিটেন যদি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আন্তরিক হইত, তাহা হইলে কংগ্রেস সংগ্রাম প্রত্যাহার করুক, আর নাই করুক, সমস্ত কিছুরই সন্তোষজনক সমাধান হইয়া যাইত। কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞরা ভুল পথই বাছিয়া লইয়াছেন এবং ভারতের স্বাধীনতার পথে কৃত্রিম প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই অধ্যায় সম্পর্কে আমার আলোচনা করিবার ইচ্ছাও নাই।"

পুনা প্রস্তাবে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি মহাত্মা গান্ধীর অভিমতের বিরুদ্ধতাকে স্বীকার করিয়া লইয়াও ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে আগাইয়া গিয়াছিল; কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ উপেক্ষা ভরে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং এখনও তাহারা নিজেরা যে ভুল করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন; তাঁহাদের মতে তাহারা সকল ভ্রমের অতীত, ভুল করে শুধু ভারতবাসীরা। তাঁহারাই ভারতবাসীদের ঈশ্বর-নির্দিষ্ট উপদেষ্টা—তাঁহাদের উপদেশ ভারতবাসীরা যে ক্ষেত্রে মানিয়া লইবে না, সে ক্ষেত্রেই তাহাদের দুর্মতি এবং দুর্গতি যত-কিছু। এই অতি ভ্রান্ত অহমিকা বুদ্ধিই সমস্যার মূলে রহিয়াছে এবং ইহার জন্য ভারতবাসীরা দায়ী নয়, দায়ী ইংরেজ রাজনীতির কর্ণধারেরাই।

বড়াইর কথা—

ভারত সম্বন্ধে ইংরেজের মতিগতি কি, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের শ্বেতাঙ্গ সদস্য স্যার ফ্রেডরিক জেমস্ নীলগিরি অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গ সভার সভাপতিরূপে এক বক্তৃতাতে সে কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের ভারতের ইংরেজদের মূল মন্ত্র হইবে, প্রথমত যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া, দ্বিতীয়ত, যতদিন পর্যন্ত ভারতবাসীদের মধ্যে ঐক্যের কোন রকম পরিচয় না পাওয়া যাইবে, সে পর্যন্ত ভারতবাসীদের কাছে কোন প্রতিশ্রুতি না দেওয়া; তৃতীয়ত, আমরা ভারতবাসীদের মধ্যে ঐক্যের জন্য প্রতীক্ষা করিব এবং যদি সম্ভব হয়, সেজন্য চেষ্টাও করিব। যতদিন পর্যন্ত তেমন ঐক্যের প্রতিষ্ঠা না হইবে, ততদিন পর্যন্ত এদেশে কোন রকম জাতীয় গভর্নমেণ্ট সম্ভব হইবে না এবং বৈদেশিক প্রভুত্বই চলিতে থাকিবে। স্যার ফ্রেডারিকের কথায় গোল কিছু নাই, কায়দা যে এইখানেই ইহা আমরা ভাল রকমেই জানি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঐক্য নাই কোথায়? দেশের স্বাধীনতার জন্য, দেশের সকল ব্যাপার নিয়ন্ত্রণে দেশবাসীর কর্তৃত্বের যে দাবী, এ সম্বন্ধে ভারতবাসীর কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই অনৈক্যই বরং নাই। ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যের ঘরোয়া ব্যাপার ছাড়া, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, অন্য কিছু নয়। সে ভারতবাসীরা বুঝিবে, ইংরেজ ভারতবাসীদের স্বাধীনতা দিতে রাজী কি না, ইংরেজ এবং ভারতবাসীদের ভিতরকার বুঝা পড়া হইল ইহাই লইয়া। আসল যে প্রশ্ন, সেই প্রশ্ন এড়াইয়া অবান্তর রকমে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের অজুহাতটা দেখান ভারতবাসীদের চিত্তে বিক্ষোভই সৃষ্টি করে, এই সব মাতব্বর পুরুষেরা পরিষ্কার এই কথাটা বুঝুন। তাঁহাদিগকে আমরা স্মরণ করাইয়া দিতেছি এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি। তিনি বলিয়াছেন,—"আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্য আমাদের সমাজকেই একান্ত দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠছে সে যদি ভারত শাসনযন্ত্রের ঊর্ধ্ব স্তরে কোনো এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়ের দ্বারা পোষিত না হোত তা হলে কখনই ভারত ইতিহাসের এত বড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না।' শাসনতন্ত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকাইয়া অনৈক্যকেই যাহারা কার্যত স্থায়ী রূপ দিয়াছে এবং এখনও সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থের দোহাই দিয়া কার্যত সাম্প্রদায়িকতাবাদীদেরই পিঠ চাপড়াইতেছে—তাহারা ভারত-বাসীদের মধ্যে ঐক্যের চেষ্টা কতটা করিবে, সেই কথা নেহাৎ বোকা যে তাহারও আর বুঝিতে বাকী নাই এবং ইহাও বুঝিতে বাকী নাই যে, ভারতে ইংরেজ প্রভুত্বকে পাকা করাই ইহাদের আসল মতলব।

সাম্প্রদায়িকতার মূল কোথায়—

ছাত্রদের সংস্কৃতি সভায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটি প্রেসিডেণ্ট গত ১৯শে এপ্রিল যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূল কোথায়, সে কথাটা বেশ পরিষ্কার হইয়াছে। তাঁহার মতে আর্থিক সঙ্কটটা উগ্র হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যাটা এতটা বড় হইয়া উঠিয়াছে। এ কথা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার জন্য বস্তুত পক্ষে ভোগে যে জনসাধারণ, সাম্প্রদায়িকতাকে বড় করিয়া দেখাতে লাভ তাহাদের কিছুই নাই। বাঙলার বিপুল জনসাধারণের স্বার্থ সাম্প্রদায়িকতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—হিন্দু এবং মুসলমান জনসাধারণের স্বার্থ একই অর্থনীতিক ভিত্তির উপর রহিয়াছে। সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাটা তাহাদের সমস্যা নয়, জনকয়েক স্বার্থপর লোক নিজেদের মোটা মাহিয়ানার চাকুরী, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি এইগুলির লোভে মাতিয়া উঠিয়াছে এবং নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাটা নিতান্তই কৃত্রিমভাবে জনসাধারণের উপর চাপাইতেছে এবং নিরক্ষর জনসাধারণের অজ্ঞতাকে ভাঙ্গাইয়া নিজেদের মতলব বাগাইয়া লইতেছে। খান বাহাদুর ছাত্র সমাজকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, এইসব স্বার্থপর লোকগুলো যাহাতে কোন জায়গায় পাত্তা না পায় এবং যে বাড়ীতে যায়, সেখান হইতেই বিতাড়িত হয়, তোমাদের সে কাজ করিতে হইবে। তাঁহার উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়া আমরা ছাত্রদিগকে বলি, সকল সঙ্কীর্ণতার উপরে উঠিয়া দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে তাঁহারা দেখুন, বিরুদ্ধ সমালোচনা, সংস্কারবদ্ধ চিত্তের কুযুক্তি এবং ফলাফলের ভয় তাঁহাদের বিচারবুদ্ধিকে যেন কলুষিত না করে।

অযৌক্তিক এবং অনিষ্টকর বিধান

বাঙলা সরকার বাঙলায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি সম্বন্ধে সংবাদ, মন্তব্য প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া যে কঠোর বিধান জারী করিয়াছেন, বোম্বাইয়ের সাংবাদিকগণ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এইরূপ অযৌক্তিক এবং উৎকট বিধানের প্রতিবাদ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রতি মর্যাদা-বুদ্ধি যাঁহাদের আছে, তাঁহারা করিবেনই, শুধু তাহাই

নহে, মানবতার দিক হইতেও ইহা প্রতিবাদ না করিয়া থাকা যায় না। বাঙলাদেশ বর্তমানে যে সঙ্কটে পতিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সরকার নীতির দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করিবার অধিকার সংবাদপত্রের থাকা উচিত; ইহাতে সংবাদ-পত্রগুলির দায়িত্বই যে শুধু প্রতিপালিত হয়, এমন নয়, গভর্নমেণ্টও তাঁহাদের দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পারেন এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বিধিব্যবস্থার যৌক্তিকতা এবং ফলোপধায়কতা নির্ধারণে তাঁহাদের সুবিধা হয়। বাঙলার প্রধান মন্ত্রী কলিকাতাবাসীদিগকে নানারূপ গুজবে বিশ্বাস না করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু সংবাদপত্রসমূহে ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ এবং তৎসম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনার ফলে যে প্রত্যয়ের সৃষ্টি জন-সাধারণের মনে হয়, গুজবের অনিষ্টকারিতা তাহাতেই নষ্ট হইয়া থাকে। গুজবের মূল্য নষ্ট হয় এই পথেই। কিন্তু বাঙলা সরকার ভিন্ন পথ ভাল বুঝিয়াছেন। দেশবাসীর মনে সন্দেহ এবং সংশয় বৃদ্ধিরই সে পথ। আর কত কাল এই অযৌক্তিক এবং অনিষ্টকর বিধান বলবৎ থাকিবে; ভারতরক্ষা বিধানের দোহাই দিয়া ভারতরক্ষার সম্পর্ক-বিহীন আইনের এই অপ-প্রয়োগের নীতি বাঙলার মন্ত্রি-মণ্ডল কতদিন চালাইতে থাকিবেন, আমরা সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর—

মিঃ জিন্না কিছুদিন হইতে এইরূপ প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন যে, তাঁহার পাকিস্থানী পরিকল্পনার মূল-নীতি মানিয়া লইতে ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদের আপত্তি নাই। ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ অকাট্য যুক্তি সহকারে তাঁহার এই উক্তি খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি একটি বিবৃতিতে বলেন, মিঃ জিন্না যদি খুঁটিনাটির ভিতর না গিয়া সোজা প্রশ্নের সোজা জবাব চাহেন, তাহা হইলে সে জবাব তিনি কংগ্রেসের নিকট হইতে অনেকবারই পাইয়াছেন। তাহা হইতেছে এই যে, কংগ্রেস কোন দিনই ভারতবর্ষকে বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন করার যুক্তি সমর্থন করিতে পারে না। ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইহাও দেখাইয়া দিয়াছেন যে, পাকিস্থানী পরিকল্পনা যদি কার্যে পরিণত করাও যায়, তাহা হইলেও হিন্দু এবং মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যা বিভিন্ন প্রদেশে যেমন আছে, তেমনই থাকিবে। জিন্না সাহেবের পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতবর্ষকে হিন্দুস্থান, পাকিস্থান এবং তাঁহার শেষ চাল দ্রাবিড়ীস্থানে বিভক্ত করিলে, সংহতি শক্তির অভাবে, ভারত-বর্ষ অনন্তকালের জন্য গোলামস্থান হইয়াই থাকিবে। সেই পরম পবিত্র ধামই জিন্না সাহেব এবং তাঁহার চেলার দলের কাম্য, সেখানে তাঁহারা বিদেশী প্রভুদের পদলেহন করিয়া স্বচ্ছন্দে এবং সস্তায় নেতাগিরি চালাইতে পারিবেন।

বাঙলার জাতীয়তা ও রামপ্রসাদ—

গত রবিবার ২৪ পরগণার অন্তর্গত 'ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান' প্রাচীন কুমারহট্ট বা হালিশহরে রামপ্রসাদের স্মৃতি-উৎসব নিষ্পন্ন হইয়াছে। তরুণেরাই ছিলেন এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা, ইহা সুখের বিষয়। তরুণচিত্তের উপর রামপ্রসাদের এই প্রভাবকে আমরা অভিনন্দন করিতেছি; কারণটা এই যে, বাঙলার জাতীয়তাবাদের সঙ্গে রামপ্রসাদের অনুভূতি এবং সাধনার একটা নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। বঙ্গের জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্র 'বন্দেমাতরমে'র রসরূপ বাঙালী যে অন্তরে পাইয়াছিল, আমরা বলিব, তাহার মূলে ছিল গুরুরূপে রামপ্রসাদেরই শক্তি। মন্ত্রের মধ্যে অর্থের প্রতিপত্তি হয় রসকে আশ্রয় করিয়া। 'বন্দে মাতরমে'র মধ্যে সেই রসবিগ্রহ ফুটাইয়া তুলিতে রামপ্রসাদের মাতৃ-অনুধ্যানই অনেকখানি সাহায্য করিয়াছিল। মহেন্দ্রের মাতৃদর্শনের পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা মায়ের যে রূপ দেখাইলেন, রামপ্রসাদের মনোময়ী মায়ের মাধুর্য তাহাতে রহিয়াছে। এখানে আদর্শই শুধু নাই, নাই কেবল কর্তব্যেরই প্রেরণা; এখানে রহিয়াছে একান্ত আত্মীয়তার রসাশ্রিত অনুধ্যান; এখানে আছে আত্মশক্তির উপলব্ধি, অন্য কথায় রহিয়াছে প্রেমের মহাবল। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের প্রভাব ছিল এইখানে। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের ভিতর দিয়া বঙ্গের জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার সেই কৃষ্ণ-চরিত্রের কৃষ্ণের মধ্যে বাঙালী রস-বিগ্রহের রূপ পায় নাই; বড় জোর পাইয়াছিল একজন মহাপুরুষকে একজন অতিমানুষকে, কিন্তু সে বিচার বা সিদ্ধান্ত মনকে প্রভাবিত করিয়া অনেক দূর আগাইয়া লইতে পারে না। "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে বাঙালী দেশমাতৃকার স্নেহের যে আপ্যায়ন লাভ করিল, যে রসরূপ বা লীলারূপ অন্তরে একান্ত করিয়া পাইল এবং পাইয়া ভাবের আশ্রয়ে অভয়ত্ব লাভ করিল, তাহার মূলে ছিল রামপ্রসাদেরই সাধনা। "শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত মোরা অভয়া চরণে নম্র শীর—ওঠ বীর," এই যে বীরত্ব, বাঙালীর মনে ইহা জাগাইতে মহাকৌল রামপ্রসাদের সাধনা অমোঘভাবে ক্রিয়া করিয়াছে, একান্ত বিচারবাদীকেও একথা স্বীকার করিতেই হইবে। মহাকবি তিনিই, যিনি জীবনে দেন এমন রস-বিগ্রহের আশ্রয়; সংসার এবং সমাজকে যিনি সেই রস-বিগ্রহের আপ্যায়ন দিয়া ত্যাগের অবদান সূত্রে অমৃতত্বের সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। রামপ্রসাদের সাধনার এই দিকটা একান্ত করিয়া বুঝিবার ও দেখিবার প্রয়োজনীয়তা এখনও জাতির যথেষ্ট রহিয়াছে; কারণ এ জাতির অসহায়ত্ব এখনও অনেক বেশী, ত্যাগের আনন্দ এখনও এখানে অপরিস্ফুট। সর্বঘটে যে জননী বিরাজ করেন রামপ্রসাদের আরাধ্যা সেই জননী জাতির হৃদয়ে জাগিয়া উঠুন।

ভারতের স্বাধীনতা দাবী—

গ্রেট ব্রিটেনের প্রায় একশত রাজনৈতিক ও শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের দুইশত জনপ্রতিনিধি গ্লাসগো শহরে সমবেত হইয়া ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করিয়াছেন। ইঁহারা একটি প্রস্তাবে জানাইয়াছেন যে, সামাজিক ও রাষ্ট্র-নৈতিক স্বাধীনতা সম্পর্কে ভারতবাসীদের সহিত স্কটল্যান্ডের অধিবাসীরাও একমত। এই সব সংবাদে এখন আমরা হর্ষ বা বিষাদের অতীত দার্শনিক অবস্থায় পৌঁছিয়াছি; কারণ অতীতে এমন প্রস্তাব অনেক হইয়াছে; কিন্তু কর্তাদের মতামত তাহার দ্বারা কিছুমাত্র প্রভাবিত হয় নাই; পক্ষান্তরে, আজ যাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টে বিশেষভাবে মন্ত্রিমণ্ডলে তাঁহাদের মধ্যে কোনদিন কাহারও যদি প্রভাব হয়, তাহা হইলে তিনিই আবার ভারতবাসীদের স্বাধীনতার বিরুদ্ধতা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। সংবাদপত্রে আর একটি সংবাদে দেখা গেল, ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমার ভারতবাসীদিগকে যে বর্তমান সময়ে ইংরেজের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত, ইহা ইংরেজদিগকে বুঝাইবার জন্য মার্কিন প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজেভেল্টকে অনুরোধ করিয়া এক তার করিয়াছেন, আমরা ইহারও কোন বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া মনে করি না। বর্তমানের বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি বড় বড় কথার মূল্য কিছুই নাই। ভারতবাসীদের স্বাধীনতা নির্ভর করিতেছে নিজেদের সাধনার উপর, পরের ঔদার্যপুষ্ট ভিক্ষার দান-স্বরূপে কোন জাতি কোনদিন স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই।

ভাবী নেতা গঠনের কাজ—

স্যার মরিস গয়ার দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের বার্ষিক সভায় বক্তৃতাকালে সেদিন বলিয়াছেন—'বর্তমানে খুবই সঙ্কটকাল যাইতেছে, কিন্তু এই সঙ্কটকালেও একটি বিভাগের ব্যয় ছাঁটাই করা অর্থনীতির দিক হইতেও বিশেষ অনিষ্টকর হইবে, এই বিভাগ বলিতে আমি শিক্ষা বিভাগের কথাই বলিতেছি। সভ্যতাকে রক্ষা করাই যদি যুদ্ধের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাজের ক্ষতি ঘটিলে সেই সভ্যতারই কোন মূল্য থাকিবে না; কারণ ভবিষ্যতে যাঁহারা নেতৃত্ব করিবেন তাঁহাদিগকে গড়িয়া তোলা হইল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ব্রত। আমরা স্যার মরিসের উক্তি ষোলআনা সমর্থন করি; আমরাও বলি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য অর্থ ব্যয় হ্রাস করা তো উচিত নহেই, বরং বাড়ানই দরকার; কিন্তু সেই সঙ্গে বিদ্যালয়গুলিতে যাহাতে ভবিষ্যতের প্রকৃত নেতাদের গড়িবার কাজ চলে, ক্রীতদাস বা গোলাম গড়িবার কারসাজী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভিতর দিয়া চলিতে না পারে, সেদিকে একটু বেশী লক্ষ্য রাখা দরকার। মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার বিলের ভিতর দিয়া বাঙলায় যে বিপদের আতঙ্ক দেখা দিয়াছে, স্যার মরিসের বক্তৃতায় আমাদের মনে তাহাই বড় হইয়া উঠিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া ভবিষ্যতের নেতা গঠনের কাজটা ব্যাহত করিবার জন্য আমলাতন্ত্র এই বাঙলাদেশে কৌশল খাটাইতে কসুর কিছু করেন নাই, বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর নিজেদের ক্ষমতা চালাইয়া সংস্কৃতিকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন; বাঙলার ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব আজ বিপন্ন। বাঙলার শিক্ষা এবং সভ্যতা আজ বিপন্ন।

ভারতসচিবের বিবৃতি—

বাঙলা, আসাম, পাঞ্জাব এবং সিন্ধু ভারতের এই চারিটি প্রদেশ ছাড়া অন্য সাতটি প্রদেশে গভর্নরদের শাসন চলিতেছে, এই সাতটি প্রদেশে উক্ত শাসন আরও এক বৎসরের জন্য বলবৎ রাখিবার মঞ্জুরী চাহিয়া ভারতসচিব মিঃ এমেরী ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লম্বা একটা বিবৃতি দিয়াছেন, কিন্তু সে বিবৃতির মূল কিছু না থাকিলেও হুল যথেষ্টই আছে। এমেরী সাহেব তাঁহার মামুলী যুক্তি আওড়াইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, নূতন শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনার পথ ভারতবাসীদের জন্য খোলাই আছে। তাঁহারা সেজন্য প্রস্তুতই আছেন। এখন শাসনতন্ত্রের কার্যত পরিবর্তন সম্ভব নহে, তবে আলোচনা চালাইতে বাধা নাই। ভারতে নূতন শাসন-তন্ত্রের সর্ত থাকিবে এই যে, ভারতের জাতীয় জীবনের প্রধান প্রধান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ঐক্যের দ্বারা শাসনতন্ত্র নির্ণীত হইবে। অধিকাংশের মত শাসনতন্ত্রের প্রাণশক্তি হইবে না, যে কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধতা, মতানৈক্য শাসনতন্ত্র নাকচ করিবার অজুহাত হইতে পারিবে। ভারতসচিব শুধু এই কথাতেই সাম্প্রদায়িকতাবাদীদিগকে প্রশ্রয় দেন নাই; অন্যায়ভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যও তিনি করিয়াছেন। তিনি উপদেষ্টার অভিনয় করিয়া বলিয়াছেন, মন্ত্রিত্ব ছাড়িবার মূলে কংগ্রেসের কর্তাদের উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহাদের এ কথাটা বুঝাই উচিত যে, নিজেদের দলগত সর্বময় প্রভুত্বের চেয়ে গণতান্ত্রিকতার পক্ষে বড় বিপদ অন্য কিছু নাই এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের এই দলগত সর্বময় প্রভুত্বের জন্য মুসলমানেরা এবং সামন্ত নৃপতিরা বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ব্রিটিশ কর্তারা আগাগোড়াই কংগ্রেসকে একটা বিশেষ সম্প্রদায় বা দল বিশেষের প্রতিষ্ঠানরূপে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইহা ইহাদের দরকার আমরা জানি, কিন্তু সমগ্র ভারতের জনমতকে যদি তাঁহাদিগকে কোন-দিন মান্য করিতে হয়, কংগ্রেসকে মানিয়া লইতেই হইবে। ভেদনীতির কারসাজীতে ভারত আর বেশীদিন বিড়ম্বিত হইতে প্রস্তুত নয়, ইহা তাঁহারা জানিয়া রাখুন। ভারত-সচিবের বক্তৃতায় বুঝা যাইতেছে যে, এই সত্যটি তাঁহারা এখনও জানেন নাই; ব্রিটিশ কর্তারা যাহাতে জানার মত করিয়া ইহা জানেন, ভারতবাসীদের পক্ষ হইতে তাহাই করিতে হইবে এবং এই সে সময়।

ভুল

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

(১৭)

সুগঠিত দেহ ও অজাতশ্মশ্রু মুখমণ্ডলে উদ্ভিন্ন যৌবনের লাবণ্য লইয়া যে যুবকটি শোভার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তাহার সুঠাম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চোখের সোনার চশমা, ব্যাকব্রাস করা মাথার চুল ও তপ্তকাঞ্চনের মত বর্ণ দেখিয়া শোভার মনে হইল যে ইহাকে কার্তিকের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহার জ্যাঠামহাশয় বিন্দুমাত্রও অতিশয়োক্তি করেন নাই।

এই প্রিয়দর্শন যুবকটি প্রথম যখন এ বাড়ীতে আসিয়া শোভাকে মেজদি' সম্বোধন করিয়া নত হইয়া তাহার পায়ের ধূলি মাথায় তুলিয়া লইল তখন বহুদিনের বিস্মৃত অসংখ্য কাহিনী ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ মহাসাগরের মত অকস্মাৎ যেন শোভার বুকের ভিতর অশান্ত কল্লোলে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। সে নত হইয়া আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে অতীশের চিবুক স্পর্শ করিয়াই তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে সম্মুখের আসনে বসাইয়া দিয়া কহিল, "এস ভাই এস; কতদিন পর তোমায় দেখলাম —যেন একযুগ।"

"এক যুগের বেশী—ঠিক চৌদ্দ বছর পার হয়ে গেছে," অতীশ ঈষৎ সলজ্জ, কিন্তু হাস্যোজ্জল দৃষ্টিতে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর দিল।

অতীতের অনেক স্মৃতিই বায়স্কোপের ছবির মত শোভার মনের পটের উপর ফুটিয়া উঠিতেছিল, সে কতকটা স্বপ্নাবিষ্টের মত বলিয়া চলিল, "যখন তোমায় আমি দেখেছিলাম তখন তুমি খুব ছোট। আমার বয়স যখন প্রায় পাঁচ তখন তোমার জন্ম। কোলে করার নামে তোমাকে টানা হেঁচড়াও আমি কম করি নি। তারপর চলতে শিখে তুমি আমার সঙ্গে খেলতে আসতে আমার পুতুলের ঘরে—" শোভার চক্ষু দুইটি সহসা কৌতুকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে কহিল, "দুষ্টামি করার জন্য, আমার খেলাঘর ভেঙ্গে দেবার জন্য কতদিন তুমি আমার হাতে মার খেয়েছ তা মনে আছে তোমার?"

অতীশ হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, "না নেই! দেশের, গাঁয়ের কোন কথাই আমার মনে নেই—খুব ছেলে বেলাতেই গ্রাম ছেড়ে আমি এলাহাবাদ চলে গিয়েছিলাম কি না!"

শোভা অতীশের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, এবার সহসা সে শব্দ করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল, "সেই পাঁচ বছরের পিলের রোগী টিংটিঙে অতীশ—সেই তুমি আজ এই রকম হয়েছ! জ্যাঠামশায় ব'লে না দিলে তোমায় আমি চিনতেই পারতাম না—হয়ত বা তোমাকে দেখে আমি ঘোমটাই টেনে বসতাম।"

অতীশ সলজ্জ হাসিমুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "কত বছর পর দেখা—চিনতে পারার ত কথা নয় মেজদি'!"

প্রথম দিনেই কথা আরও অনেক হইল। অনেক দিন পর প্রাণ খুলিয়া কথা বলিবার মত প্রায় সমবয়সী একজন সাথী পাইয়া শোভা যেন বাঁচিয়া গেল। অনেক দিন পর ঐ দিন স্বয়ং সে রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া নিজের হাতে নানাপ্রকার খাবার প্রস্তুত করিল এবং স্বয়ং পরিবেশন করিয়া অতীশকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া অনেক কথাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর আদায় করিয়া লইল। অতীশ মেসে থাকে এবং মেসের খাওয়া তাহার মুখে তেমন রোচে না, এই কথা অতীশের মুখে হইতে শুনিবামাত্রই শোভা সাগ্রহকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কলকাতায় আমি থাকতে তুমি মেসে কেন থাকবে অতীশ? তুমি আমার [illegible] উঠে এস না কেন? এখানে জায়গারও অভাব নেই।"

অতীশ এমন একটি প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত ছিল না, সে বিহ্বলের মত কহিল, "তা হলে মন্দ হত না, কিন্তু—"

"কিন্তু কেন?" শোভা প্রশ্ন করিল।

অতীশ সবেগে মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, "না না; তা হতে পারে না মেজদি'। আমার বাবা বড় অহঙ্কারী, এ প্রস্তাবে কিছুতেই তিনি রাজী হবেন না।"

শোভা ক্ষুণ্ণ হইল, কহিল, "তাহলে আর কি বলব। তবে থাক আর না থাক, এখানে আসতে হবে তোমাকে রোজই। একা বাড়ীতে আমার দেখা শুনো করবার সব ভারই জ্যাঠামশায় তোমাকে দিয়ে গেছেন তা মনে যেন থাকে।"

অতীশ স্বীকার করিয়া সেদিনের মত বিদায় লইল, প্রতিশ্রুতি সে যে পালন করিল না তাহাও ঠিক বলা যায় না; কিন্তু শোভা যেমনটি প্রত্যাশা করিয়াছিল ঠিক তেমনটি বোধ করি হইল না। তাই মাসখানিক পর অমল একদিন এ বাড়িতে আসিলে শোভা অনুযোগের ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে কহিল, "বেশ লোক ত আপনি অমলবাবু! কতদিন পর আজ এলেন, বলুন ত?"

অমল সলজ্জকণ্ঠে কহিল, "সময় পাই না বৌদি'—নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে"—

শোভা বাধা দিয়া কহিল, "কিন্তু গৌরীদি'? তিনিও কি সময় পান না?"

"আমি আসি না বলেই তিনিও আসতে পারেন না," অমল কৈফিয়ৎ প্রদান করিল।

"কিন্তু আপনিই বা আসেন না কেন?" শোভা কহিল, "সত্যি বলুন দেখি, এই এক মাসের মধ্যে একদিনও কি আপনার সময় হয় নি?"

অমল অপ্রতিভের মত দুই একবার মাথা চুলকাইয়া বোধ করি প্রসঙ্গটি পরিবর্ত্তন করিবার উদ্দেশ্যেই কহিল, "আমার আসার কি তেমন দরকার ছিল বৌদি'? আপনার নিয়মিত তত্ত্বাবধান করার জন্য এখন ত অতীশবাবুই আছেন।"

"দরকারের কথা যদি বলেন," শোভা উত্তর দিল, "তা ছিল অনেক। এর মধ্যে দেশ থেকে সরকার মশাই এসেছিলেন দু'বার —কত জটিল বিষয়ে তিনি আমার মত চাইলেন। আপনি নিয়মিত এখানে এলে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে নির্দ্দেশ দিতে পারতাম। কিন্তু আপনি এলেন না; কাজেই তাকেই বললাম যা ভাল বোঝেন তাই করবার জন্য। কি জানি, আমার মত বোকা মেয়েমানুষ মনিব পেয়ে কত কিছুই তিনি ঠকিয়ে নেবেন!"

"কিন্তু অতীশবাবু?" অমল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল।

"আমার অদৃষ্টে সবাই সমান," শোভা ঈষৎ একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "অতীশও আসে কালে-ভদ্রে—তার খেয়াল মত। তাতে কি আর আমার কাজ চলে?"

অমল কোন সদুত্তর ভাবিয়া পাইল না; ক্ষণকাল অপ্রতিভের মত বসিয়া থাকিয়া প্রয়োজন হইলেই তাহাকে সংবাদ দিবার অনুরোধ করিয়া সে বিদায় গ্রহণ করিল।

দিন দুই পর অতীশ আসিলেও শোভা ঐ একই অনুযোগ করিল। কহিল, "তুমি ত বেশ আমার দেখাশুনা করছ অতীশ? এবার এলে সাতদিন পর।"

অতীশ কুণ্ঠিত কণ্ঠে উত্তর দিল, "রবিবার ছাড়া ত' আমি আসতে পারি না মেজদি'। অন্যান্য দিন আমার কলেজ আছে যে।"

"তোমার কলেজ [illegible]

শোভা কুটিল কটাক্ষে অতীশের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল।

সলজ্জ দৃষ্টি নত করিয়া অতীশ কহিল, "বৈকালে আমি বেড়াতে যাই যে মেজদি'।"

"বেড়াতে যাও? কোথায়?" শোভা জিজ্ঞাসা করিল।

অতীশ অন্য দিকে চাহিয়া কতকটা তাচ্ছিল্যের স্বরে উত্তর দিল, "কোনদিন পার্কে, কোনদিন খেলার মাঠে, কোনদিন—" বাক্যটি সে সম্পূর্ণ করিল না, হঠাৎ ঢোক গিলিয়া সে নীরব হইল।

অতীশ যে কোন একটা কথা গোপন করিল তাহা শোভা বুঝিতে পারিল, সে যে প্রশ্ন শুনিয়া বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে তাহাও তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না। কিন্তু কলিকাতায় সদ্য আগত এই তরুণ কলেজের ছাত্রটির দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কি যে এমন ঘটনা থাকিতে পারে যাহা সে সহজভাবে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না, তাহা শোভা ভাবিয়া পাইল না এবং সেই জন্যই উহা জানিবার জন্য তাহার আগ্রহও অতিমাত্রায় প্রবল হইয়া উঠিল। সে অতীশের মুখের দিকে তীক্ষ্দৃষ্টিতে চাহিয়া কতকটা আবদার, কতকটা জিদ করিয়া কহিল, "আর কোথায় যাও, বল না, শুনি।"

"বিশেষ কোথাও নয়," অতীশ উত্তর দিল এবং বলিয়াই সে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া রহিল।

"অবিশেষ কোন জায়গায় যাও সেই কথাটাই বল না, শুনি," শোভা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বিদ্রূপের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল।

অতীশ আর একবার শোভার মুখের দিকে চাহিল, তারপর সলজ্জ হাসিমুখ নত করিয়া কহিল, "মাঝে মাঝে আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে যাই।"

এই উক্তিটির উপরেই শোভা অতীশকে যে জেরা করিল বোধ হয় অনেক প্রবীণ উকীলও তাহা পারিত না এবং ঐ সমস্ত প্রশ্নবাণে ক্ষতবিক্ষত হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অতীশ স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে, তাহার বন্ধুর বাড়িতে কেবল যে তাহার বন্ধুর দুইটি শিশু ভাই বোন ও বৃদ্ধ মাতা পিতা আছেন তাহাই নহে, তাহার বন্ধুর একটি তরুণী ভগ্নীও সেই বাড়ীতেই বাস করেন। অতীশ আরও স্বীকার করিল যে, ঐ মেয়েটি কলেজে পড়ে, গান গাহিতে ও পিয়ানো বাজাইতে জানে এবং সে অবিবাহিতা।

শোভা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তাই বল! সেই জন্য এখানে আসবার সময় তোমার হয় না?"

"যাও, তুমি ভারি দুষ্টু মেজদি'," অতীশ লজ্জায় মুখ লাল করিয়া কহিল এবং বোধ করি ঐ লজ্জা গোপন করিবার জন্যই সে শোভার নির্বন্ধাতিশয্য উপেক্ষা করিয়া সেদিন চা না খাইয়াই উঠিয়া গেল।

কিন্তু অতীশ চলিয়া গেলেও তাহার সেই লজ্জিত হাসিমুখ শোভার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়াই রহিল এবং উহাই উপলক্ষ করিয়া কত ভাবনাই যে তাহার মনের মধ্যে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল তাহার হিসাব সে নিজেও করিতে পারিল না। অতীশের 'বন্ধুর' যে ভগ্নীটিকে কোনদিনই সে দেখে নাই তাহারই বর্ণ, অবয়ব ও আকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া লইতেও তাহার বাধিল না এবং ঐ মেয়েটি অতীশকে শুনাইবার জন্য পিয়ানোয় কোন সুরটি বাজাইয়া কোন গান গায় এবং তাহার সম্মুখে কোন ভঙ্গীতে বসিয়া কি কথা বলে তাহাও সে মনে মনে কল্পনা করিবার প্রয়াস পাইল।' ঐ মেয়েটির উল্লেখমাত্রেই সলজ্জ আনন্দে আজ অতীশের মুখখানি যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, মেয়েটির উপস্থিতিতে অতীশের মুখ যে তদপেক্ষাও বেশী উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, মেয়েটির সঙ্গে হাসিয়া, গল্প করিয়া অতীশ যে প্রতি সন্ধ্যায়ই অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করে যে সম্বন্ধে শোভার মনে কোনই সংশয় রহিল না এবং ইহারই সূত্র ধরিয়া তাহার চিন্তা আবার এক অভিনব পথে অগ্রসর হইয়া চলিল।

তাহার নিজের কথা তাহার মনে হইল, যোগেশের কথাও তাহার স্মরণ হইল। যে আনন্দের স্নিগ্ধ দীপ্তি ক্ষণকাল পূর্ব্বে অতীশের মুখের উপর সে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছে উহার ক্ষীণ আভাষমাত্রও যে কোনদিনই সে যোগেশের মুখে দেখিতে পায় নাই, অতীশের বন্ধুর ভগ্নীর মত কোনদিনই যে সে যোগেশকে গান গাহিয়া শুনাইতে পারে নাই, যোগেশের সম্মুখে বসিয়া গল্প করিতে পায় নাই, এই অনুভূতি আজ প্রত্যেকটি চিন্তার উপসংহারেই শোভার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল এবং অতীশের আনন্দের পরিমাণ যতই সে মনে মনে অনুমান করিবার চেষ্টা করিল ততই কি জানি কেন একটা নিদারুণ বেদনায় তাহার নিজের বুকের ভিতরটা টন টন করিতে লাগিল। অথচ তাহার মনের মধ্যে সুখ ও দুঃখের যে দুইটি অনুভূতি প্রায় সমান্তরালে ছুটিয়া চলিতে লাগিল উহার কোনটিকেই সে বন্ধ করিতে পারিল না এবং দিন যাইতে থাকিলেও উভয় অনুভূতির কোনটিই অপেক্ষাকৃত সহনীয় হইয়া উঠিল না।

তাই সপ্তাহ শেষে আবার যেদিন অতীশ এ বাড়ীতে আসিল সেদিন শোভা যে মেয়েটিকে কোনদিনই দেখে নাই তাহারই প্রসঙ্গ সর্ব্বপ্রথমে উত্থাপন করিয়া বসিল। "মিস সেন কেমন আছেন অতীশ?" সে জিজ্ঞাসা করিল।

"ভারি দুষ্টু তুমি, মেজদি'," অতীশ সেই আর একদিনের মত মুখ লাল করিয়া উত্তর দিল।

শোভা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা ভাই, তাকে একদিন না দেখলে তোমার যে বুক ফেটে যায় তা আমি বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু তাঁর? তিনিও কি একদিন তোমায় না দেখলে কেঁদে সারা হন?"

"যাও, কি যে বাজে বকছ তুমি!" বলিয়া অতীশ অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

শোভা কিন্তু হাসিমুখেই বলিয়া চলিল, "তুমি কি মিস সেনকে বিয়ে করবে অতীশ? কিন্তু সে কি করে হবে? তুমি কায়স্থ, আর তারা হলেন গিয়ে বৈদ্য।"

ফিক্ করিয়া হাসিয়া অতীশ কহিল, "তাতে আটকাবে না মেজদি'। আজকাল অসবর্ণ বিবাহ অনেক হয়।"

"মিস সেনকে তুমি বিয়ে করবেই তাহলে?" শোভা জিজ্ঞাসা করিল।

অতীশ হাসিমুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া তাচ্ছিল্যের স্বরে জবাব দিল, "বিয়েই আমি করব না—তার আবার—"

অতীশের ঐ সলজ্জ সহাস্য মুখ থাকিয়া থাকিয়া শোভার মনে পড়িতে লাগিল এবং প্রতিবারই সঙ্গে সঙ্গেই যোগেশের বিষন্ন গম্ভীর মুখচ্ছবি মনে করিয়া বেদনায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। নির্জ্জন গৃহের নিঃসঙ্গ জীবনে অনবরত আর একজনের তুলনায় নিজের জীবনের ব্যর্থতার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া মাঝে মাঝে শোভার মনে হইতে লাগিল যে, আত্মহত্যা করিয়াই সে সকল যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে।

তাহার নিজের নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনার অনুভূতিই আর একদিন অতীশের কাছে অতীশেরই বিরুদ্ধে অভিযোগের আকারে বাহির হইয়া পড়িল। "এবার এলে বার দিন পর," সে কহিল, "এর মধ্যে একটা রবিবারও কেটে গেছে। মিস সেনের দরবার থেকে এখন বুঝি রবিবারেও আর ছুটি পাও না?"

সেই আর একদিনের মত হাসিয়া ফেলিয়া সলজ্জ কণ্ঠে অতীশ কহিল, "রবিবারে ওঁরা বোটানিক্যাল গার্ডেনে পিকনিক

করতে গিয়েছিলেন,—আমায় নিতান্তই টেনে নিয়ে গেলেন।"

সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে শোভা কহিল, "শোন অতীশ; যা হবার তা হয়ে গেছে। কিন্তু আর এ সব চলবে না। মিস সেনের কাছে যাতায়াত তোমাকে ছাড়তে হবে।"

অতীশ সবিস্ময়ে শোভার মুখের দিকে চাহিল; সেই মুখের উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শোভা কঠিন কণ্ঠে কহিল, "এই কলকাতা সহরে তুমি যাতে বিগড়ে না যাও তা দেখবার দায়িত্ব জ্যাঠামশায় আমার উপরে দিয়ে গেছেন। আমি তোমাকে বলছি যে ওখানে যাওয়া আসা তোমার আর চলবে না। আমার কথা যদি তুমি না মান তবে চিঠি লিখে সব কথা তোমার বাবাকে আমি জানিয়ে দেব।"

অতীশ বিস্মিত হইল, বিরক্ত হইল তাহার চাইতে ঢের বেশী। অথচ যে গুরুদণ্ডের কথা শোভা অকম্পিত কণ্ঠে তাহাকে শুনাইয়া দিল প্রতিবাদ করিয়া উহা ডাকিয়া আনিবার সাহসও সে সঞ্চয় করিতে পারিল না। ক্ষুব্ধ অভিযোগের কণ্ঠে ছোট্ট করিয়া সে কেবল কহিল, "আমি কোন অন্যায় করি না মেজদি'।"

শোভা গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "ন্যায় অন্যায়ের কথা হচ্ছে না অতীশ, এটা সতর্কতার কথা। ওখানে তুমি আর যেতে পারবে না, এই আমার আদেশ। কাল থেকে কলেজের পর সোজা তুমি আমার বাড়ীতে আসবে।"

নিঃসম্পর্কীয়া মেজদি'র এই জবরদস্তি অসহ্য মনে করিলেও অতীশ সাহস করিয়া উহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিল না এবং মিস সেনের বাড়ীতে যাতায়াত কার্য্যতঃ সে একেবারে বন্ধ করুক আর না করুক অতঃপর সে প্রতি সন্ধ্যায়ই শোভার বাড়ীতে হাজিরা দিতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু শোভা বুঝিতে পারিল যে, অতীশ যাহা করিতেছে তাহা মোটেই খুশী হইয়া করিতেছে না। তাই মাসখানেক পর ইহারই উল্লেখ করিয়া অতীশকে সে বলিয়াই ফেলিল, "তোমার উপর আমি বড্ড জুলুম করছি, না অতীশ?"

"না ত," বলিয়া অতীশ শোভার মুখের দিকে চাহিল।

শোভা মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, "আমি বুঝি অতীশ। কিন্তু এ কথাও ত আমি ভুলতে পারি না যে তুমি ছেলেমানুষ, প্রলোভনের মধ্যে তোমার যাওয়া উচিত নয়; তোমায় যেতে দেওয়া আমারও উচিত নয়।"

অতীশ নত মুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

"তা ছাড়া,—" শোভা আরও কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ ঝি আসিয়া পড়াতে তৎক্ষণাৎ উহা আর বলা হইল না।

কামিনীর মা জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর জিজ্ঞেস করছে, দাদাবাবুর খাবার সে তৈরী করবে, না তুমি যাবে রান্নাঘরে।"

একটু ইতস্তত করিয়া শোভা কহিল, "আজ ওকেই খাবার করতে বল ঝি মা।"

ঝি চলিয়া গেলে অতীশ শোভার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তা ছাড়া আর কি বলছিলে মেজদি'?"

"তা ছাড়া," বলিয়া শোভা পূর্ণ দৃষ্টিতে অতীশের মুখের দিকে চাহিল, একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমার কথাও একটু ভেবো অতীশ। এই খালি বাড়ীতে একা একা কি কষ্টে যে আমার দিন কাটে তা কি তুমি বুঝতে পার না?" শেষের দিকে শোভার কণ্ঠস্বর ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল।

অতীশ অনুতপ্তের মত কহিল, "আমি খুব বুঝি মেজদি'। তাই এখন ত রোজই আমি আসছি।"

"আসছ বটে," শোভা উত্তর দিল, "কিন্তু তোমার মুখ দেখলে মনে হয় যে আসাটা তুমি সহ্য কর জ্বরের রোগী যেমন কুইনাইন মিক্শ্চার খাওয়া সহ্য করে।"

লজ্জিত হইয়া অতীশ প্রতিবাদার্থক কি একটা কথা বলিল, ভাল বোঝা গেল না।

একটু থামিয়া শোভাই পুনরায় কহিল, "আমার যা কষ্ট অতীশ, আর কেউ হলে বোধ করি সইতে না পেরে এতদিন আত্মহত্যাই করত। কিন্তু কি যে আমার পোড়া মন—এর আশা কিছুতেই আর যায় না।"

শোভার জীবনের ইতিহাস অতীশ কিছু কিছু শুনিয়াছিল, কিন্তু ভাল করিয়া কিছুই সে জানিত না, ভাল করিয়া সমগ্র ইতিহাস সে বোঝেও নাই। তাই আজ শোভাকে নিজের সম্বন্ধে কথা কহিতে শুনিয়া অতীশের কৌতূহল সহসা অতিমাত্রায় সজাগ হইয়া উঠিল। সে সম্মুখের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া বসিয়া সাগ্রহ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা মেজদি' এ বিবাহে কি তুমি সুখী হও নি?"

শোভা উত্তর দিল না, কেবল তর্জনী দিয়া ললাট স্পর্শ করিয়া অতীশকে বুঝাইয়া দিল যে যাহা ঘটিয়াছে তাহা তাহার অদৃষ্টের দোষেই ঘটিয়াছে।

ঘৃণা, উষ্মা ও বিরক্তিতে কণ্ঠস্বর কঠিন করিয়া অতীশ কহিল, "অথচ এ থেকে তোমার মুক্তিও নেই। এই জন্যই হিন্দু সমাজকে আমি দু' চক্ষে দেখতে পারি না। আর কোন সমাজে এমনটি কিছুতেই হতে পারত না।"

শোভা চুপ করিয়াই রহিল। ক্ষণকাল পর অতীশই পুনরায় কহিল, "আচ্ছা মেজদি' যোগেশবাবু শুনেছি অনেক লেখাপড়া করেছেন, কিন্তু তোমার প্রতি তিনি এমন বর্ব্বরোচিত ব্যবহার কেন করছেন তা আমাকে তুমি বুঝিয়ে বলতে পার?"

শোভা প্রতিবাদের ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "অমন কথা বলো না অতীশ; তিনি দেবতা, তাঁর গুণের সীমা পরিসীমা নেই। আমি কষ্ট পাচ্ছি আমার অদৃষ্টের দোষে।"

"অদৃষ্ট না হাতী", অতীশ উত্তপ্ত হইয়া কহিল। আরও অনেক কথাই সে হয়ত কহিত, কিন্তু ঠাকুর ঠিক এই সময়েই চা ও জলখাবার লইয়া এ ঘরে আসিয়া পড়াতে কথাটা আর বলা হইল না।

খাবার রাখিয়া ঠাকুর চলিয়া গেল, চায়ের ট্রে'খানি নিজের দিকে টানিয়া লইয়া শোভা অতীশের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি খাও, আমি চা ঢেলে দিচ্ছি।"

অতীশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "খেতে বলছ, খাচ্ছি; কিন্তু যা আমি আজ তোমার মুখ থেকে শুনলাম মেজদি', তারপর খেতে আর মোটেই সাধ যায় না। তোমার খাবার যেমনই হউক, আমার মুখ বিস্বাদ হয়ে গেছে।"

শোভা উত্তর দিল না, নতমুখে চা ঢালিয়া দুধ ও চিনি মিশাইয়া বাটিটি অতীশের সম্মুখে আগাইয়া দিল। অতীশ নীরবেই খাওয়া শেষ করিল এবং চায়ের পাত্রটিও নিঃশব্দেই নিঃশেষ করিয়া মুখ মুছিয়া অনেকক্ষণ পর শোভার মুখের দিকে চাহিল।

শোভা মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, "কি? এইবার ছুটি চাই বুঝি?"

অতীশ কিন্তু হাসিল না, শোভার প্রশ্নের উত্তরও সে দিল না। বিষণ্ণ গম্ভীরকণ্ঠে সে কহিল, "আজ খেতে খেতে বারবার এই প্রশ্নই আমার মনে উঠছিল মেজদি' যে এই বাড়িতে এমনি অনিশ্চিত প্রত্যাশায় অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কেমন করে একলা তুমি অপেক্ষা করবে!" বলিয়া বোধ করি বা উত্তরের প্রত্যাশাতেই সে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শোভা ঈষৎ একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "অপেক্ষা যে করতেই হবে ভাই, আর করবও।" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া

সে অন্যদিকে চাহিয়া বিষণ্ণকণ্ঠে কহিল, "কেবল—"। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, বাক্যটি সে সম্পূর্ণ করিল না।

অতীশ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কেবল কি মেজদি'? বলই না, কি বলছিলে?"

একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শোভা কহিল, "একলা বাড়িতে বিনা কাজের জীবন বড্ড একঘেয়ে মনে হয় ভাই। মাঝে মাঝে ভাবি যে ঠাকুর চাকর তুলে দিয়ে সংসারের কাজ নিজের হাতে করতে শুরু করে' দি'।"

অতীশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, তারপর সহসা একটা মহাসমস্যার মীমাংসা হইয়া গেলে যেমন হয় তেমনই উৎফুল্ল হইয়া সে কহিল, "আচ্ছা মেজদি', শুনেছি যে এই কলকাতায় এসে তুমি লেখাপড়া আরম্ভ করেছিলে, পরে ছেড়ে দিয়েছ। এখন আবার তাই শুরু করলে হয় না? ঘরকন্নার কাজের চাইতে তাতে সময় কাটবে ভাল।"

প্রস্তাব শুনিয়া শোভা ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, বোধ করি-বা মনে মনে উহাই বিবেচনা করিয়া দেখিয়া অবশেষে সে গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "না ভাই, এ বয়সে বাইরের লোকের কাছে আর লেখাপড়া শিখতে পারব না। তবে তুমি যদি এক আধটুকু দেখিয়ে দিতে রাজী হও, তবে ঘরেই আর একবার চেষ্টা করতে পারি।"

"তা মন্দ কি মেজদি'?" অতীশ উৎফুল্লকণ্ঠেই কহিল, "এখানে রোজই ত আমি আসছি; বাজে গল্প না করে' ঐ সময় না হয় লেখাপড়ার চর্চাই করা যাবে।"

কথাটা উঠিয়াছিল প্রসঙ্গত, কিন্তু উহাই সেই রাত্রেই পাকা হইল এবং ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী পরদিন হইতে কাজও আরম্ভ হইয়া গেল।

(১৮)

বৎসর দুই পূর্বে শোভার যে পুঁথিগুলি আলমারিতে বন্ধ হইয়াছিল উহাই এতদিন পর আবার বাহির হইয়া আসিল; বাজার হইতেও আসিল অনেক তকতকে বাঁধানো খাতা ও লিখিবার নানাবিধ উপকরণ। যোগেশের যে লাইব্রেরী ঘর হইতে সমস্ত পুঁথিপত্র একদিন শোভা নিজের হাতে পুরাতন পুস্তকের দোকানে পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং এতদিন যে ঘর সর্বদাই প্রায় তালা বন্ধ থাকিত উহাই পুনরায় শোভার হুকুমে পরিষ্কৃত ও সংস্কৃত হইয়া পড়িবার ঘরের পূর্ণ মর্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ঐ ঘরে যোগেশেরই পরিত্যক্ত আসনে বসিয়া শোভা অতীশের নিকট হইতে নিয়মিত পাঠ গ্রহণ করিতে শুরু করিয়া দিল।

আয়োজনের ত্রুটি রহিল না, ঘড়ি ধরিয়া পড়াও চলিতে লাগিল; কিন্তু ফল কোনপক্ষেরই আশানুরূপ হইল না। মাস তিনেক পর অতীশ নিজেই একদিন ধৈর্য হারাইয়া বলিয়া ফেলিল, "না মেজদি', তোমার কিছু হবে না।"

শোভা কিছুমাত্র অপ্রতিভ হইল না, বরং স্মিতহাস্যে মুখখানিকে উদ্ভাসিত করিয়া কহিল, "ঠিকই বলেছ ভাই। বুড়ো বয়সে এ সব আমার আর হবে না।"

অতীশ বিরক্ত কণ্ঠে কহিল, "বুড়ো তুমি এখনও হও নি মেজদি', আর বুদ্ধিও যে তোমার নেই তা নয়। তোমার লেখাপড়া হয় না কারণ এতে তোমার মন নেই।" একটু থামিয়া সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "আচ্ছা, তোমার মন কোথায় থাকে বল ত!"

শোভা হাসিমুখে সুর করিয়া গাহিয়া উঠিল, "দূরে কোথায় দূরে দূরে, মন বেড়ায় মোর ঘুরে ঘুরে;"—তারপর গান বন্ধ করিয়া কহিল, "ঠিকই বলেছ ভাই, লেখাপড়ায় মন আর বসে না। কিন্তু এ আলোচনা এখন থাক, আর এ অঙ্কটাও আজ আর কষবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। তার চাইতে দেখে আসি তোমার পুডিং কতদূর হল।"

পুডিং এবং তাহার পর আরও এক কাপ চা শেষ করিয়া অতীশ কহিল, "আচ্ছা মেজদি', তোমার কি কিছুই শিখতে সাধ যায় না?"

ক্ষণকাল একটু ইতস্তত করিয়া শোভা উত্তর দিল, "একেবারে 'না' বলতে পারি না, অতীশ। কিছুদিন থেকে সাধ হচ্ছে যে আমি পিয়ানো বাজাতে শিখব।"

"পিয়ানো!" অতীশ মহাবিস্ময়ে কহিল।

"হ্যাঁ, পিয়ানো," শোভা উত্তর দিল "কিন্তু এতে অত আশ্চর্য হচ্ছ যে?" একটু থামিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে সে কহিল, "চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? মিস্ সেনের মত বাজাতে না পারি, একটুও কি পারব না?"

লজ্জায় মুখ লাল করিয়া অতীশ কহিল, "যাও!" কিন্তু পরক্ষণেই সে গম্ভীর হইয়া কহিল, "ঠাট্টা নয় মেজদি'। আমি ভাবছিলাম যে লেখাপড়ায় যখন তোমার মন নেই তখন সন্ধ্যেটা অনর্থক"—

"আমার কাছে নষ্ট না করে মিস সেনের কাছেই কাটাবে, না?" শোভা অতীশের মুখের কথা লুফিয়া লইয়া কহিল।

অতীশ হতাশভাবে কহিল, "না, তোমার সঙ্গে পারবার যো নেই।"

শোভা গম্ভীর হইয়া কহিল, "ঠাট্টা নয় অতীশ, পিয়ানো আমি শিখবই। তবে তা ছাড়া আমার আরও একটা ইচ্ছা আছে। দিন রাত ঘরের মধ্যে থেকে থেকে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি,—মাঝে মাঝে আমি এক আধবার বাইরে বেড়াতে যেতে চাই।"

"বেশ ত!" অতীশ সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিল।

সম্মুখের টেবেলের উপর সকালের খবরের কাগজখানা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, উহারই একটি পৃষ্ঠা হাতে তুলিয়া লইয়া শোভা কহিল, "কাল ম্যাটিনী শো দেখতে সিনেমায় যাবে অতীশ? বহুদিন আমার ছবি দেখা হয় নি। সেই একবার গিয়েছিলাম অমলবাবুর সঙ্গে, মনে হয় যেন এক যুগ আগে।"

"আমি তোমার সঙ্গে যাব?" অতীশ কতকটা বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করিল।

"কেন, ভয় করে নাকি?" শোভা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "জানতে পারলে মিস্ সেন রাগ করবেন, তাই?"

মুখ লাল করিয়া অতীশ কি একটা প্রতিবাদের কথা বলিতে যাইতেছিল, শোভা হাসিয়া, রহস্য করিয়া, রাগ করিয়া এমনই একটা কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল যে অতীশ আর কোন কথাই বলিতে পারিল না এবং বিদায় লইবার পূর্বে শোভার কাছে তাহাকে স্বীকার করিয়া যাইতে হইল যে একটা প্রয়োজনীয় কাজ অবহেলা করিয়াও পরদিন সে শোভার সঙ্গে সিনেমায় যাইবে।

ম্যাটিনী শো'তে আদি, করুণ, বীর, হাস্য প্রভৃতি বহু রস মিশ্রিত একখানি বাঙলা ছবি দেখা শেষ করিয়া অতীশ ও শোভা সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাহিরে আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল যে, বাহিরে বর্ষা নামিয়াছে, তাহারা ভিতরে বসিয়া জানিতেও পারে নাই। তখনও ধারাবর্ষণ ক্ষান্ত হয় নাই, খুব জোরে না হইলেও, বৃষ্টি তখনও পড়িতেছিল। শোভা চাহিয়া দেখিল, পথের যতটুকু দেখা যায় তাহার মধ্যেও স্থানে স্থানে জল জমিয়া রহিয়াছে। সে অতীশের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "হেটে যাবে অতীশ? আমার কিন্তু সাধ হচ্ছে যে এ পথটুকু জলে ভিজেই যাই,—ঐ ছবিতে যেমন দেখলাম।"

"তুমি কি ক্ষেপেছ, মেজদি'?" অতীশ গভীর বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল। কিন্তু শোভার মুখের ভাব দেখিয়া পরক্ষণেই সে হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "না মেজদি', কবিত্ব করতে হয় তুমি একা কর।

এই সন্ধ্যে বেলায় জলে ভিজে নিউমোনিয়া ডেকে আনব তেমন কবি আমি নই।"

কিন্তু জলে দুইজনকেই ভিজিতে হইল, ট্যাক্সি করিয়া আসা সত্ত্বেও। সস্তাদামের ক্যানভাসের আবরণের মর্যাদা বৃষ্টি ধারাগুলি রক্ষা করিল না এবং উহা ভেদ করিয়া যতটুকু জল ভিতরে প্রবেশ করিল উহা ভিতরের আরোহী দুইটিকে ঠিক স্নান করাইয়া দিল না বলিয়াই উভয়ের পক্ষেই স্নান কার্যটিকে অপরিহার্য করিয়া তুলিল।

পরস্পরের সিক্ত কেশ ও সিক্ত বেশের উচ্ছৃঙ্খল সমালোচনার অট্টহাস্যে সমস্ত বাড়িখানিকে মুখরিত করিয়া শোভা ও অতীশ সম্মুখের ঘরে প্রবেশ করিয়াই বিস্ময়ে একেবারে নির্বাক হইয়া গেল। উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে যাহাদের সঙ্গে তাহাদের চোখাচোখি হইল তাহারা অমল ও গৌরী? দুইজনেই একখানি সোফার উপরে বসিয়াছিল, অতীশ ও শোভা ঘরে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই উভয়েই যুগপৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

কথা বলিল প্রথমে গৌরী। সে হাত তুলিয়া শোভাকে নমস্কার করিয়া হাসিমুখে কহিল, "আজ রবিবারের ছুটি, তাই ওঁকে বললাম, চল,—একবার শোভাদি'র সঙ্গে দেখা করে আসি। এখানে এসে শুনলাম যে আপনারা বাইরে গিয়েছেন। ফিরে যাব কিনা ভাবছি,—এমন সময় এল জল। তাই বসে আছি।"

"ভাগ্যিস জল এসেছিল," বলিতে বলিতে শোভা সাগ্রহে গৌরীর হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিল। "এতক্ষণ আমি ভাবছিলাম যে জল এসেছে কেবল আমাদের ভিজাবার জন্য; এখন দেখছি, এ এসেছিল আপনাদিগকে এখানে বেঁধে রাখবার জন্য। বাঁধা না পড়লে বোধ করি বা আপনারা চলেই যেতেন।"

অমল হাসিমুখে কহিল, "কখ্খনো না বউদি', উনি চলে গেলেও আমি রাত দশটা পর্যন্ত এখানে আপনার প্রতীক্ষা করতাম।"

দুই চক্ষুর বিদ্যুদ্বর্ষী কটাক্ষ অমলের মুখের উপর বিন্যস্ত করিয়া শোভা কহিল, "আপনার কথা আর বলবেন না অমলবাবু। আপনাকে কিছু আমি বলিও নি। আমি যদি দিনের পর দিন আপনার পথ চেয়ে থেকেও আপনার দেখা না পেয়ে থাকি, আপনি একদিন না হয় আমার দেখা না পেয়ে ফিরে যেতেন; তাতে আপনার উপযুক্ত সাজাই হত। আমি ভাবছিলাম কেবল গৌরীদি'র কথা।" ফিরিয়া সে গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া কৈফিয়তের সুরে কহিল, "আমরা গিয়েছিলাম সিনেমা দেখতে —কতদিন যাই নি, আজ কেমন সাধ হল। আপনারা আসবেন জানলে কখনই যেতাম না।" পরক্ষণেই সে গৌরীর হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "কিন্তু আর না দিদি। বৃষ্টি আর পাঞ্জাবী ড্রাইভারটা মিলে আমাদের আর ভদ্রসমাজে দাঁড়াবার অবস্থা রাখে নি। একটু বসুন, আমি চট করে চান করে কাপড় ছেড়ে আসি। এস অতীশ।" বলিয়া সে পাশের দ্বার দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল, অতীশ নিরুত্তরে তাহার অনুসরণ করিল।

উভয়ে চলিয়া গেলে গৌরী স্বামীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ইনিই বুঝি অতীশবাবু?"

অমল অন্যদিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল, "হাঁ।"

স্নানান্তে অতিথি সৎকারের জন্য শোভা যত্নের কোন ত্রুটি করিল না। সে নিজের হাতে খাবার প্রস্তুত করিয়া গৌরী ও অমলকে একত্র বসাইয়া স্বয়ং পরিবেশন করিয়া পুনঃ পুনঃ জিদ করিয়া পেট ভরিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইল।

বিদায়কালে শোভা গৌরীর হাত দুইটি ধরিয়া সানির্বন্ধকণ্ঠে কহিল, "আবার আসবেন ত?"

"আসব বই কি!" গৌরী হাসিয়া উত্তর দিল, "কিন্তু আপনাকেও আসতে হবে আমাদের বাড়িতে—নিমন্ত্রণ রইল, মনে থাকে যেন।"

সেই রাত্রে শোভা ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিল না। ঘণ্টা কয়েক পূর্বে সিনেমার পরদার উপর যে ছবিখানি সে দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহার স্মৃতিতে উহারই নানা দৃশ্য ও নানা ঘটনার সঙ্গে অতীশ, গৌরী, অমল এবং বিশেষ করিয়া কোথা হইতে যেন যোগেশ আসিয়া মিলিত হইয়া তাহার নিজের চিত্তকে বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল। এ বাড়ি হইতে বিদায় লইয়া যাইবার সময় অমল ও গৌরী যেমনভাবে হাসিমুখে পাশাপাশি হাঁটিয়া বাহির হইয়া গেল, ছবির নায়ক নায়িকাকেও শোভা সুদীর্ঘ বিরহ ও তৎসংশ্লিষ্ট নানাবিধ বিপদ ও কষ্টের অবসানে পরস্পরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হইয়া অনেকটা সেই রকমেই দাম্পত্য জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে দেখিয়া আসিয়াছিল। উহাদেরই স্মৃতি গভীর রাত্রে তাহার নিজের নিঃসঙ্গতার অনুভূতিকে ক্রমেই যেন তীব্র হইতে তীব্রতর করিয়া তুলিতে লাগিল। একটা অতৃপ্ত বুভুক্ষা, একটা অশান্ত উন্মাদনায় প্রায় সমস্ত রাত্রিই সে শয্যায় ছটফট করিয়া কাটাইল। বায়স্কোপের ছবিতে নায়কের অভিনয়ে যে লোকটি অমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিল, সুডৌল সুন্দর মুখখানি, অমল, যোগেশ ও অতীশের সঙ্গে একত্র হইয়া যতই তাহার মনের মধ্যে ভিড় জমাইয়া তুলিতে লাগিল ততই শোভা এই ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিতে লাগিল যে, সত্য সত্যই তাহার বুকের শূন্যতাকে পূর্ণ করিবার জন্য এ সংসারে তাহার একান্ত নিজস্ব কেহই নাই—যে ছিল তাহাকে সে পায় নাই, আপাতত তাহাকে পাইবার উপায় নাই এবং ভবিষ্যতে যে পাওয়া যাইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। এই উপলক্ষে আজ আবার অনেক দিন পর তাহার নিজের প্রতি যোগেশের নিষ্ঠুরতার কথা পুনঃ পুনঃ তাহার মনে পড়িতে লাগিল, অথচ সেই যোগেশের জন্যই কাঁদিয়া কাঁদিয়া কোন এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িবার পর সকালে যখন সে জাগিয়া উঠিল, তখন গভীর বিস্ময়ে সে অনুভব করিল যে তাহার মনের চিত্রপটে এইমাত্র যে মিলিয়া গেল সে যোগেশ নহে, অতীশ এবং তাহার সঙ্গে তাহারই হাত ধরিয়া হাসিমুখে যে বাহির হইয়া গেল সে বায়স্কোপের ছবির সেই নায়িকাটি।

শোভার মুখের দিকে চাহিয়া কামিনীর মা উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ বৌমা, তোমার কি কোন অসুখ করেছে?"

"না ত!" শোভার কণ্ঠে প্রতিবাদ বাজিয়া উঠিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গত রাত্রির কথা স্মরণ হওয়াতে সে ঈষৎ লজ্জিতকণ্ঠে কহিল, "এখনও স্নান করি নি ঝি মা; তাছাড়া, কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি আমার।" বলিয়াই সে দ্রুতপদে স্নানের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ঐদিন অপরাহ্নে শোভার আহ্বানে শোভার শুইবার ঘরে প্রবেশ করিয়া কামিনীর মা বিস্ময়ে একেবারে নির্বাক হইয়া গেল। সে দেখিল যে শোভা তাহার শিয়রের কাছে একখানা উঁচু টেবিল পাতিয়া উহারই কেন্দ্রস্থলে যোগেশের একখানি মাঝারি সাইজের আলোকচিত্র স্থাপন করিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই বোধ করি বা বাজার হইতেই কয়েক ছড়া মালা ও প্রচুর ফুল আনাইয়া ছবিখানিকে সে পরিপাটি করিয়া সাজাইয়াছে। শোভা উপাধানগুলি খাটের পায়ের দিকে গড়াইয়া দিয়া খাটের উপর ছবিখানির ঠিক সম্মুখে বসিয়া আছে;—তাহার মাথায় কাপড় নাই, সুদীর্ঘ সিক্ত কেশরাশি মুখের অর্ধেক ঢাকিয়া ঘাড়ের উপর দিয়া পিঠের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে।

কামিনীর মাকে দেখিয়া শোভা সানন্দ সলজ্জকণ্ঠে কহিল, "বাক্স খুলতে গিয়ে আজ এই ছবিখানি চোখে পড়ল। ভাবলাম,

এর স্থান ত বাক্সের মধ্যে কাপড় জামার নীচে নয়, এর স্থান এখানে।"

কামিনীর মা'র দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, সে গাঢ়স্বরে কহিল, "ঠিকই করেছ মা। এই ত চাটুজ্যে ঘরের বৌ'এর উপযুক্ত কাজ!"

লজ্জিত মুখ নত করিয়া শোভা কহিল, "ভাবছি যে আজ থেকে নিয়মিত পুজো করব।"

কামিনীর মা শোভার মাথায় হাত দিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে উত্তর দিল, "তাই করো মা। এর বাড়া দেবতা স্ত্রীলোকের আর নেই। একে পুজো করলে তোমার মন শান্ত হবে মা, আমি ঠিক বলছি।"

সন্ধ্যার পর অতীশ আসিলে উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে বিভিন্ন বর্ণের স্তূপীকৃত ফুলের মধ্যে যোগেশের আলোক চিত্রখানি বড় সুন্দর, বড় উজ্জ্বল হইয়াই তাহার চোখে পড়িল। তৎক্ষণাৎ তাহার বাঙ্‌নিঃসরণ হইল না, সে অভিভূতের মত চিত্রখানির দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার মুখের দিকে স্মিতমুখে চাহিয়া শোভা কহিল, "ছবিখানি হঠাৎ পাওয়া গেল, আমিও বেঁচে গেলাম। এখন থেকে রোজ এ'র পুজো করব।"

ব্যাপারটির অর্থ যখন অতীশের কাছে আর অস্পষ্ট রহিল না, তখন তাহার ওষ্ঠ প্রান্তে পাতলা একটি হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে ঈষৎ শ্লেষের কণ্ঠে কহিল, "তা করবে না? যে তোমাকে দুই পায়ে নির্মমভাবে পিষে ফেলে চলে গেল তার ছবি পুজো না করলে কি আর তোমার হিন্দুয়ানীর জয়ধ্বজা উড়বে! ধন্য মেয়ে তোমরা মেজদি', একটা পাথরও যা সইতে পারে না তোমরা তাও সও।"

শোভা হাসিয়া কহিল, "হিন্দুর ঘরে যখন ভগবান জন্ম দিয়েছেন, তখন এ জন্মটা সইতেই হবে ভাই। আসচে বারে যদি খৃস্টান বা মুসলমানের ঘরে জন্ম নিই তখন তাদের মতই ব্যবহার করব।"

"সত্যি বলত মেজদি'?" অতীশ জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার মনে কি রাগ হয় না'?"

"খুব হয়," শোভা মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, "তাই সব সময়েই মনে মনে বলি—'মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন তোমারে করিব রাধা'।" শোভা সুর করিয়া গাহিয়া উঠিল।

অতীশ বিরক্তকণ্ঠে কহিল, "তার মানে কিছুই হয় না। শেকলকে অটুট রেখে তোমরা বড় জোর অভিমানের নেকামি করতে চাও। পশ্চিমের মেয়েরা কি করে, জান মেজদি? স্বামীর কাছ থেকে আঘাত পেলে তারা প্রতিঘাত করতে জানে। বিয়ের মন্ত্রকে তারা শেকল হতে দেয় না।"

শোভা অতীশের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, ক্ষণকাল সে চাহিয়াই রহিল; তার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "কি জানি! তবে আমি ত আর সে দেশের মেয়ে নই, আমি হিন্দু।"

অতীশ বিরক্তমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বেশ। আমি তবে আসি মেজদি' ; তুমি তোমার পুজো কর।"

শোভা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অতীশের মুখের দিকে চাহিল এবং পরক্ষণেই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "বাব্বা, তোমার এত রাগ! না ভাই, রাগ করে তুমিও আমায় ফেলে যেয়ো না। চল, এখন পড়তে যাই।"

অতীশ মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "বলেছি ত, লেখাপড়া তোমার হবে না। আমি যাই।"

শোভা খপ করিয়া তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "ঠিকই বলেছ, লেখাপড়া আমার হবে না। তার চাইতে চল রান্নাঘরে। আমি লুচি বেলে ভাজব, তুমি চৌকাঠের ওপর বসে গল্প করবে এবং তারপর এখান থেকে রাত্রের খাওয়া খেয়ে তবে তুমি মেসে যেতে পাবে।" বলিয়া শোভা অতীশকে একরকম টানিয়াই রান্নাঘরে লইয়া গেল।

পরদিন অতীশ আসিল না এবং তাহার পর দিনও না। দেখিয়া তৃতীয় দিন শোভা চাকর পাঠাইয়া অতীশকে ডাকিয়া আনিল।

অতীশকে দেখিয়াই বিন্দুমাত্র ভূমিকা না করিয়া শোভা কহিল, "বন্ধ ঘরের মধ্যে দিন রাত থেকে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি অতীশ। ভেবেছি আজ একবার ইডেন গার্ডেনের দিকে বেড়াতে যাব। তুমি চল আমার সঙ্গে।"

অতীশ স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল শোভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল, "এই জন্য তুমি ডেকে পাঠিয়েছ মেজদি'? আমি ভাবলাম বুঝি পড়বার জন্য।"

"ফিরে এসে শরীর মন যদি ভাল বোধ করি তখন পড়ব", শোভা উত্তর দিল। "আপাততঃ চল বেড়াতে।"

অতীশ একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "কিন্তু আমার যাবার দরকার আছে কি মেজদি'? তুমি ত ঝিকে নিয়েও যেতে পার।"

শোভা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "তোমার যাবার দরকার নেই এ তুমি কি বলছ অতীশ? জ্যাঠামশায় তোমাকে আমার অভিভাবক রেখে গেছেন। অভিভাবকের কর্ত্তব্য তুমি পালন করবে না?" বলিতে বলিতে কৌতুকের হাসিতে শোভার চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শোভা অতীশকে একরকম টানিয়াই লইয়া গেল এবং শোভারই নির্দেশমত সে তাহার সঙ্গে চৌরঙ্গীর বাগান, ইডেন-গার্ডেন এবং গড়ের মাঠের খানিকটা পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে উভয়ে যখন গঙ্গার ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে এবং ভাগীরথীর উভয় তীরেই পথে ও প্রাসাদে রাশি রাশি আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ক্ষণকাল নিঃশব্দে গঙ্গার দিকে চাহিয়া থাকিয়া শোভা সহসা ফিরিয়া অতীশের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "একটা ডিঙ্গি নৌকা ভাড়া নিয়ে গঙ্গায় খানিকটা বেড়াবে অতীশ?"

অতীশ গভীর বিস্ময়ে শোভার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু অন্ধকারে সে মুখ সে ভাল দেখিতে পাইল না। সে সংশয়ের কণ্ঠে কহিল, "সত্যি বলছ, মেজদি'?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া শোভা উত্তর দিল, "আমার খুব সাধ হচ্ছে। তবে আজ থাক অতীশ; আর একদিন বেলা থাকতে চেষ্টা করা যাবে।"

অতীশ আর একবার অন্ধকারের ভিতর দিয়া শোভার মুখ দেখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া অবশেষে ছোট্ট করিয়া কহিল, "আচ্ছা।"

ফিরিবার পথে অতীশ কহিল, "আমি ভেবেই পাচ্ছি না মেজদি' যে এই জীবন তুমি কি করে কাটাবে। এর চেয়ে বিধবা হওয়াও বুঝি তোমায় ভাল ছিল।"

শোভা জিভ কাটিয়া কহিল, "ছিঃ অতীশ; অমন কথা বলতে নেই। বরং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর তার লক্ষ বছর পরমায়ু হোক।"

অতীশ উত্তপ্তকণ্ঠে কহিল, "তা পারব না মেজদি'। তোমার সঙ্গে যোগেশবাবু যে ব্যবহার করেছেন তাতে তাঁর প্রতি এক ফোঁটা অনুকম্পাও আমার নেই। আমি ভাবি কেবল তোমার

(শেষাংশ ৪৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জগলুল পাশা

রেজাউল করিম এম-এ, বি-এল

সা আদ জগলুল পাশা ছিলেন মিশরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। যুগপ্রবর্তক মনীষী জামালউদ্দীন আফগানি মিশরের চতুর্দিকে জাতীয়তা ও নবজাগরণের যে ভাবধারা ছড়াইয়াছিলেন, জগলুল ছিলেন তাহারই পতাকাবাহী সেনাপতি। জামালউদ্দিন আফগানির একজন মন্ত্রশিষ্য মুফ্‌তী আবদুহু জাতীয়তার আদর্শ ও ভাব প্রচার করিয়া মিশরে নবযুগের প্রবর্তন করেন, তাঁহারই দ্বিতীয় মন্ত্রশিষ্য জগলুল সেই ভাবধারাকে বাস্তব রূপ দিয়াছিলেন। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ যেভাবে মিশরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরিয়াছিল তাহাতে এইসব ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ যথাসময়ে আবির্ভূত না হইলে হয়ত মিশর আজিও জাগিতে পারিত না। এই তিনজনের আমরণ সাধনা মিশরকে অভূতপূর্বভাবে জাগাইয়া



জগলুল পাশা

তুলিল। আজ মিশর কিছুকিছু স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়াছে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পাইয়াছে। কিন্তু জগলুলের পূর্বে এসব কিছুই ছিল না। মিশর ছিল সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের করতলগত। জগলুল মর্মে মর্মে বুঝিয়াছিলেন যে, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব দূর করিতে না পারিলে মিশরের উন্নতি হইবে না। তাই তিনি মিশরকে স্বাধীন করিবার সংকল্প গ্রহণ করিলেন। সাম্রাজ্যবাদ তাঁহাকে বহু বাধা দিয়াছিল, স্বদেশ হইতে তাঁহাকে নির্বাসিত করিয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই মিশরের জাগরণকে তাহারা ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। জগলুল সমস্ত অত্যাচার, বাধা ও বিপত্তি অতিক্রম করিয়া মিশরকে সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

মিশরের সর্বপ্রধান নেতা, মিশরের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মহাত্মা জগলুল পাশার জীবনী গৌরব গরিমায় বিভূষিত। প্রায় নব্বই বৎসর পূর্বে বিয়ানা নামক নগরে জগলুল এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মিশরের বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষানিকেতন আল আজহারে বিদ্যাধ্যয়ন করেন এবং পরম নিষ্ঠার সহিত তথাকার পাঠসমাপ্ত করেন। পাঠাভ্যাসকালে মিশরের বিখ্যাত চিন্তানায়ক মুফতী মহম্মদ আবদুহুর সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। এবং তাহারই মধ্যবর্তিতায় বিচক্ষণ মনীষী বিপ্লবী নেতা জামালউদ্দিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উভয়েই জামালুদ্দিনের প্রভাবাধীনে আসিয়া জাতীয়তা বিষয়ে অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। জামালুদ্দিন সাহেব তাঁহার নূতন আদর্শের দ্বারা সমগ্র প্রাচ্যদেশকে উদ্বোধিত করিবার জন্য প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রত্যেক অঞ্চলে বিপ্লবের ভাবধারা বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিপ্লবাত্মক বক্তৃতার জন্য প্রত্যেক দেশের রাজপুরুষগণ তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন এবং সুযোগ মত তাঁহাকে ধরিবার জন্য তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি মিশরে পদার্পণ করিয়া আব্দুহু ও জগলুলের মত শিষ্যপ্রাপ্ত হইলেন এবং এই তিনজনের প্রভাবে মিশরে বিপ্লবের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। এই সময় আরবী পাশা তদানিন্তন মিশর সরকারের ইংরাজ তোষণনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পতাকা উত্তোলন করেন। জামালুদ্দিন, আব্দুহু ও জগলুল পাশা এই বিদ্রোহ সৃষ্টি করিতে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। এমন কি এই বিদ্রোহের প্রধান নেতৃত্ব ইঁহাদেরই উপর অর্পিত হইয়াছিল। ইঁহারা পরিশেষে ধৃত ও দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে জগলুল পাশা আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন এবং ইহাতে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার বাগ্মিতা ও প্রতিভার খ্যাতি দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া গেল। এমন কি সরকারও তাঁহার গুণগরিমার কথা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। ১৮৯৩ সালে স্থানীয় আপিল কোর্টের পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইলেন। ইহার তিন বৎসর পরে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী মুস্তাফা পাশা ফাহ্‌মির বিদুষী কন্যার পানিগ্রহণ করিলেন। আরও দশ বৎসর পরে মিশরের ব্রিটিশ পরামর্শদাতা লর্ড ক্রোমারের প্রস্তাব অনুসারে জগলুল শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। এবং ১৯১০ সালে বিচার বিভাগের মন্ত্রীর দায়িত্বপূর্ণ পদলাভ করিলেন। এই পদে থাকাকালীন তিনি সুয়েজ খাল সংক্রান্ত কতকগুলি জরুরি প্রস্তাব জেনারেল এসেম্বলিতে উত্থাপিত করিলেন। কিন্তু এইসব প্রস্তাবে মিশরের স্বার্থ এত বেশী করিয়া দেখান হইয়াছিল যে, ব্রিটিশ সরকার তাহা অনুমোদন করিতে দেন নাই। ইহার পর হইতে তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন যে, বর্তমান গভর্নমেণ্ট দ্বারা মিশরের স্বার্থ রক্ষিত হইতে পারে না। গভর্নমেণ্টের বিভিন্ন প্রস্তাব সমালোচনা করিয়া তিনি যেরূপ তেজস্বিতা ও স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে মিশরের খেদিভ আব্বাস হিলমি তাঁহার উপর ভয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। খেদিভ লর্ড ক্রোমারের নিকট জগলুলের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উত্থাপন করিলেন। তিনি উগ্রপন্থী, বিপ্লববাদী, ইংরেজ বিদ্বেষী, মিশরের নিরাপত্তা তাঁহার দ্বারা রক্ষিত হইতে পারে না; এই ধরণের বহু অভিযোগ ক্রোমারের কর্ণে পৌঁছিল। ইহাতে লর্ড ক্রোমার তাঁহাকে পদত্যাগ

করিতে বাধ্য করিলেন। জগলুল পদত্যাগ করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে হইল না। ১৯১৩ সালে মিশরে ব্যবস্থা পরিষদ গঠিত হইলে তিনি নির্বাচনপ্রার্থী হইলেন। সরকার তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার উপর লোকের এতদূর ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল যে, সরকারের বাধা সত্ত্বেও তিনি একরূপ বিনা বাধায় নির্বাচিত হইয়া গেলেন। এবং পরিষদের ভাইস প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে ইউরোপের মহাসমর বাধিয়া গেল। এই যুদ্ধকালে তিনি বিশেষ কিছু করেন নাই। কিন্তু যুদ্ধ স্থগিত হইবার সময় তিনি আবার মিশরের মুক্তির জন্য আসরে অবতীর্ণ হইলেন। ব্রিটেনে মিশরের প্রশ্নটা ন্যায়-ভাবে যাহাতে আলোচিত হয় তাহার জন্য মিশর সরকার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং এমন লোকের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, যিনি দৃঢ়ভাবে মিশরের দাবী ব্রিটেশ দরবারে পেশ করিতে পারেন। তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার সহকর্মিগণ এক-বাক্যে জগলুল পাশাকে এই কার্যের জন্য সর্বপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া তাঁহার হস্তে মিশরের কথা বলিবার ভার অর্পণ করিলেন। তিনি সানন্দে এই ভার গ্রহণ করেন এবং আপনার সাধ্যমত মিশরের দাবী ব্রিটিশ দরবারে উত্থাপিত করিলেন। অবশ্য ইহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার বুঝিলেন, এ লোক সহজ লোক নহে, ইহার চক্ষে ধূলি দেওয়া কঠিন ব্যাপার। ইতিমধ্যে যুদ্ধ স্থগিত হইয়া গেল। এবং ইহার অল্পদিন পরই জগলুল পাশা তাঁহার কয়েকজন বিশ্বস্ত সহকর্মীর সহিত তৎকালীন হাই কমিশনার সার রেজিনাল্ড উইনগেটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিশরের স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করিলেন। মিশরের উপর ইংলন্ডের 'প্রোটে ক্টারেট' উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। মিশর স্বাধীনই ছিল, ব্রিটেন অন্যায়ভাবে তাহার স্বাধীনতা খর্ব করিয়াছে। সুতরাং এই নষ্ট স্বাধীনতা উদ্ধার করিবার জন্য ব্রিটেনের জনসাধারণের দরবারে আবেদন করিবার জন্য তিনি ইংলন্ড যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

ব্রিটিশ সরকার পূর্ব হইতেই এইরূপ বিপ্লবী লোককে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন জগলুলকে ইংলণ্ডে যাইবার অনুমতি দিলে তিনি সর্বত্র তুমুল আন্দোলন চালাইতে থাকিবেন। তখন হয়ত মিশরের উপর ব্রিটেনের কর্তৃত্ব চলিয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহারা কিছুতেই জগলুলকে ইংলন্ড যাইবার অনুমতিপত্র দিলেন না। ইহাতে জগলুলের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। তাঁহার সহকর্মী আদলী পাশা, রাশিয়া পাশা প্রভৃতিকে লইয়া জগলুল দেশময় তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। এবং এই সময় তিনি 'ওয়াফদ' নামে একটি দল গঠন করিলেন। এবং তিনি ঘোষণা করিলেন এই দল সমগ্র মিশরের প্রতিনিধি-মূলক প্রতিষ্ঠান। দেশের লোকও এই দলের নেতৃত্ব স্বীকার করিল। এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ইহাতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে লাগিল। দেশের সর্বশ্রেণীর লোকের সহানুভূতি ও সাহচর্য পাইয়া এই 'ওয়াফদ' দল একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিল। জগলুলকে বাধা দিবার জন্য কর্তৃপক্ষ কোনও রূপ চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু জগলুলের অকৃত্রিম স্বদেশ প্রেম, তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ ও প্রাণপণ অধ্যবসায়ের ফলে এই দলের কার্য দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। তিনি অতীব দক্ষতার সহিত স্বদেশের মুক্তি আন্দোলন পরিচালন করিতে লাগিলেন। কর্তৃপক্ষ এই আন্দোলনের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে, যদি এই আন্দোলন বিনা বাধায় দ্রুতভাবে চলিতে থাকে, তাহা হইলে মিশরের সমস্ত শাসন পদ্ধতি উল্টাইয়া যাইবে। এই ভয়ে তাঁহারা জগলুলকে ও তাঁহার তিনজন সহকর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া মালটায় নির্বাসিত করিলেন। কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। তাঁহার নির্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মিশরবাসী উন্মত্ত হইয়া উঠিল। তাঁহারা প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিল। এই সময় নেতৃবিহীন অবস্থায় তাহারা যেরূপ কৃতিত্বের সহিত আন্দোলন চালাইয়াছিল তাহাতে ব্রিটিশ সরকার বিস্মিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা বাধ্য হইয়া জগলুলকে মুক্তি দিলেন। এমনকি ইংলণ্ড যাইবার অনুমতিও প্রদান করিলেন। অনুমতি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইউরোপ অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি যখন প্যারিসে সেই সময় মিশরের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করিবার জন্য লর্ড মিলনার একটি কমিশনের নেতৃত্বে প্রেরিত হইলেন। জগলুল প্যারিস হইতে এই কমিশন বয়কট করিবার জন্য আদেশ প্রচার করিলেন। তাহাদের প্রিয় নেতার আদেশ দেশ-বাসী শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিল। তাহারা কেহই ইহাতে যোগ দেয় নাই বা কোনওরূপ সাহায্য করেন নাই। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিত "আমরা জানি না, জগলুলের নিকট যাও।" তাঁহার কথাই আমাদের কথা। তিনি ছাড়া আমরা অন্য কাহাকে জানি না। কারখানার শ্রমিক ও মজুর, মাঠের কৃষক, গৃহী, অধ্যাপক, ডাক্তার, ব্যবহারজীবী এমনকি স্কুল কলেজের ছাত্র সকলেরই মুখে এক কথা "জগলুলের নিকট যাও।" সুতরাং এই কমিশন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়া গেল। এইভাবে জাতির সম্মিলিত শক্তি মিলনার কমিশনকে ব্যর্থ করিয়া দিল। ব্যর্থ হইয়া মিলনার সাহেব ইংলণ্ড প্রত্যাবর্তন করিলেন। তৎপরে জগলুল ইংলণ্ডে মিলনারের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। মিলনার তাঁহার নিকট তদন্তের সমস্ত বিবরণ প্রদান করেন। এবং তিনি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট যেসব সর্ত ও সুপারিশ পেশ করিবেন তাহাও তাঁহার হস্তে প্রদান করেন। জগলুল এই সর্তাবলী দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কারণ তিনি ও তাঁহার সহকর্মিগণ যাহা চাহিতেছিলেন মিলনার সাহেব প্রায় সেই সব দাবী স্বীকার করিবার জন্য ইংলণ্ডকে সুপারিশ করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এইগুলির সব স্বীকার করিতে রাজি হয় নাই। সুতরাং মিশরের কোন সমস্যার মীমাংসা হইল না।

অতঃপর ১৯২১ সালে জগলুল মিশরে প্রত্যাবর্তন করিবার অনুমতি পাইলেন। স্বদেশে উপস্থিত হইয়া তিনি

মহাড়ম্বরের সহিত অভ্যর্থিত হইলেন। এরূপ রাজোচিত সম্মান খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। সেই সময় আদলি পাশা মিশরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের সহিত তাঁহার যেসব কথাবার্তা হইয়াছিল, তদনুসারে আদলি পাশা তাঁহাকে মন্ত্রীত্বে যোগদান করিতে অনুরোধ করিলেন। তদুত্তরে জগলুল বলিলেন, যদি মন্ত্রণা সভার নেতৃত্ব তাঁহাকে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি তাহাতে যোগদান করিতে পারেন। তাঁহার এই দাবী অগ্রাহ্য হইবে তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি অবিলম্বে একটি বিরোধী দল গঠন করিলেন। এই দল এরূপ ক্ষিপ্রগতিতে ও সাফল্যের সহিত কার্য করিতে লাগিল যে, ব্রিটিশ সরকার ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা পুনরায় তাঁহাকে মালটায় নির্বাসিত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে নবগঠিত শাসন পরিষদ প্রবর্তন হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হইয়া গেল। এই নূতন পার্লামেণ্টের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে মিশরে প্রবেশ করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। তাঁহার দলস্থ লোকগণ দেশময় প্রচার করিতে লাগিল নির্বাচনে তাঁহারই দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হইল। সুতরাং ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি মিশরের প্রধান মন্ত্রিত্বে বরিত হইলেন। এক্ষণে ব্রিটিশের সঙ্গে কথা কহিবার সমস্ত দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হইল। ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াই তিনি মিশর ও সুদানের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করিয়া একটি প্রোগ্রাম প্রস্তুত করিলেন; এবং সেই প্রোগ্রাম গ্রহণ করিতে ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে বিলাতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য ব্রিটেন তাঁহার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া দিল। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইংরেজ আমাকে প্রতারণা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। আমি কোনও সর্তের ও সুবিধার বিনিময়ে মিশরের স্বাধীনতা নষ্ট হইতে দিব না।" ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

জগলুলের মত নেতা ও অক্লান্তকর্মী বীর খুব কম দেশেই পাওয়া যায়। তিনি হৃষ্টপুষ্ট অতিকায় ছিলেন না। কয়েক বৎসর হইতে তিনি শারীরিক অসুস্থতা ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও মানসিক তেজে ও আদর্শের দৃঢ়তায় তিনি অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন। তাঁহার শারীরিক শক্তির অভাব তাঁহার ঐকান্তিকতা, অধ্যবসায় ও মানসিক দৃঢ়তার দ্বারা উপযুক্তরূপে পূরিত হইয়াছিল। তাঁহার অদম্য সাহস তাঁহাকে সর্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে সাহায্য করিয়াছিল। যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার যেরূপ উৎসাহ ও উত্তেজনা ছিল মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহা অব্যাহত ছিল। তিনি দেখিতে আদর্শ 'ফেলাহিনের মত (কৃষকের মত) ছিলেন—লম্বা, ক্ষীণ, ধীর ও চতুর। তাঁহার চেহারার সঙ্গে লিয়ান বৈশিষ্ট্য ছিল। জগলুল পাশার চরিত্রে নানা গুণের সমাবেশ ছিল। কখনও অসীম সাহসী ও স্পষ্টভাষী—কখন কখন অদ্ভুতরূপে সঙ্কোচ ও ইতস্তত ভাব। কখন শঙ্কান্বিত আবার কখন ব্যাঘ্রের মত গর্জনকারী। কখন আপন সদ্ব্যবহারে জনসাধারণকে বিমোহিত করিতেন, আবার কখন রাগ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তর্ক করিবার সময় সুচতুর তার্কিক, প্রমাণ প্রয়োগ করিবার সময় গভীর জ্ঞানশালী ও বাগ্মী। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিলে সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী বিমোহিত হইয়া যাইত। ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডির গুণের একত্র সমাবেশ তাঁহাতে ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর মিশরের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। মিশরবাসী আজ মর্মে মর্মে তাহার অভাব অনুভব করিতেছে। আজি জীবিত থাকিয়া যদি তিনি মিশরের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিতেন তাহা হইলে মিশরের অবস্থা অন্যরূপ হইয়া যাইত।

ভুল

(৪৮৪ পৃষ্ঠার পর)

জন্য—তোমার সামনে যে সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ রয়েছে তা যে কি করে কাটাবে সে কথা মনে হলে আমি পাগল হয়ে যাই।"

শোভা চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণকাল পর অতীশই জিজ্ঞাসার মত করিয়া পুনরায় কহিল, "আচ্ছা মেজদি' তুমি পিয়ানো শিখবে বলেছিলে, তার কি হল? আমি বলি যে তাই বরং শিখতে আরম্ভ কর। সময় ভাল কাটবে।"

"ঠিক কথা বলেছ," শোভা সাগ্রহকণ্ঠে কহিল, "কিন্তু শিখতে পারব কি?"

"চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?" অতীশ উত্তর দিল, "তুমি যন্ত্র একটা আগে কেন। আমি শিখাবার শিক্ষক এনে দেব।"

"সত্যি?" শোভা জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে বল ত? মিস সেনকে নয়ত?" শোভা মুখ টিপিয়া হাসিল।

"যাও" অতীশ মুখ লাল করিয়া উত্তর দিল।

গাড়ী শোভার বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। প্রথমে অতীশ নামিল এবং তাহার পশ্চাতে নামিল শোভা এবং পরক্ষণেই দুইজনেই নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল। দ্বার খুলিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইল অমল।

হাত তুলিয়া শোভাকে নমস্কার করিয়া অমল কহিল, "এসেছিলাম আপনাদের একটা মোকদ্দমা সম্পর্কে আপনাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে। আপনাদের সরকারমশায় এ কাজটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে গেছেন।"

"তা কাজ না করেই চলে যাচ্ছেন যে বড়?" শোভা প্রতিনমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

অমল কি একটা কৈফিয়ৎ দিতে যাইতেছিল, শোভা বাধা দিয়া কহিল, "না অমলবাবু, কৈফিয়ৎ আমি চাই না; আর কাজও আজ হবে না, কারণ আমার শরীরটা মোটেই ভাল নেই। সেই জন্যই গিয়েছিলাম গঙ্গার ধারে একটু বেড়াতে। কিন্তু কাজ না হলেও আপনাকে এখনই আমি ছেড়ে দিচ্ছি না। চলুন ভিতরে, চা খেয়ে তবে যাবেন।"

কিন্তু অমল চা খাইবার জন্য অপেক্ষা করিল না। একটা জরুরী কাজের অজুহাত দিয়া পরদিনই পুনরায় আসিবে বলিয়া দ্বারপ্রান্ত হইতেই সে রাত্রে সে বিদায় গ্রহণ করিল।

উপরে উঠিবার পথে অতীশ তাহার পূর্ব কথারই সূত্র ধরিয়া কহিল, "পিয়ানোটা তাড়াতাড়ি কেনবার ব্যবস্থা কর মেজদি' এ মাস থেকেই যাতে—

(ক্রমশ)

দস্তানা

সুশীল রায়

গত উনিশ-শ' চল্লিশ সালের তেসরা জুলাই বিকাল বেলা বৈঠকখানায় বসিয়া ডিটেকটিভ্ উপন্যাস পড়িতেছিলাম। গোলা-গুলীর কাজ এতটুকু নাই, কেবল রাসায়নিক পদ্ধতিতে হত্যার অপরূপ কাহিনী। এমন সময় আমার ভাইপো খেলনা-বন্দুক আনিয়া আমার কপাল লক্ষ্য করিয়া বলিল—'গুড়ুম!' শব্দ শুনিয়া চমকাইয়া উঠিলাম। বন্দুকের মুখ হইতে কর্ক ছুটিয়া বাহির হইয়াই সুতার টানে ঝুলিয়া পড়িল। অসিত নিজের বাহাদুরীতে হাসিয়াই খুন! আমাকে সে চমকাইয়া দিয়াছে—ইহা কম বাহাদুরীর বিষয় নয়।

যদিও গোয়েন্দা বিভাগের বেড়াজাল নিক্ষেপ এবং খুনী আসামী নন্দলালের পলায়ন-তৎপর পদক্ষেপ আমার মস্তিষ্কে নিখুঁৎ রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছে, তথাপি বিপন্না নায়িকা মণিমালাকে ভুলিতে বাধ্য হইলাম। ডিটেকটিভ্ বই বন্ধ করিয়া দেরাজে চালান করিলাম এবং এক ধাপে উনিশ-শ' চৌত্রিশ শালের ডিসেম্বর মাসের ঘটনায় গিয়া পড়িলাম।

মাধুরী কিছুক্ষণ আগে আমাকে গোয়েন্দার কবল হইতে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিল। কারণ সে তাহার নায়ককে লইয়া সিনেমা দেখিতে যাইবে মতলব করিয়াছিল; কিন্তু সফল হয় নাই। আমার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া নন্দলালের মতো অসিত নিঃশব্দে পলায়ন করিয়াছে। অন্দরে তাহার মুখে ভয়ের আভাস পাইয়া মাধুরী এদিকে ব্যাপার দেখিতে আসিয়াছিল হয়ত। সে আসিয়াছে—টের পাই নাই। বলিল, 'হলো তো শেষ? মণিমালাকে শেষ-বেশ খুঁজে পেলে তো?'

চোখ বন্ধ ছিল; বলিলাম, 'হুঁ!'

মাধুরী আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'শেষে নন্দর কি হলো? ভালোবেসেও এমন ল্যাঠা, তাই-না? নন্দ আহাম্মক কম নয়, সোজা রাস্তা নিলেই হতো! কি বলো?'

বলিলাম, 'আমার হাত-মোজাটা বের' ক'রে দাও তো!'

মাধুরী আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'সে আবার কি?'

'দস্তানা।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু এই প্রচণ্ড গরমে দস্তানা!'

বৌদি মাধুরী ও আমি তিনজনে মিলিয়া অনেকগুলি বাক্স হাট্কাইলাম। দু'এক জোড়া নূতন পুরানো দস্তানা মিলিল বটে কিন্তু আমি যেটি চাহিতেছি, তাহা পাওয়া যাইতেছে না। দস্তানাটির বর্ণনা শুনিয়া মাধুরী বলিল, আমার আবার অমন দস্তানা কোনদিন ছিল, তাহা সে নাকি জন্মেও শোনে নাই, চোখেও দেখে নাই। কথাটি সত্য। মাধুরীর জন্ম হইয়াছে তিন বৎসর হইল, চোখও ফুটিয়াছে সেইদিন। কিন্তু দস্তানাটি তাহার আগের এবং তাহার জন্মের অর্থাৎ আমার বিবাহের পরে তাহা আর ব্যবহার করি নাই। ব্যবহার ইতিপূর্বে না করিলেও, আজ উহা দরকার। বৌদি ও মাধুরীকে অনেকক্ষণ ঘামাইবার পর এবং অসিতকে দুষ্টামির জন্য ধমকাইবার পর বৌদির প্রকাণ্ড ট্রাঙ্কটির ভিতর হইতে আমার দস্তানাটি উদ্ধার করা গেলো।

মাধুরী বলিল, 'বললাম আমার বাক্সে নাই।'

বৌদি বলিলেন, 'তুমি যার মালিক, তাঁর জিনিষ আমার বাক্সে, কী ক'রে জানবো ভাই।'

আমি বলিলাম, 'তর্কে লাভ নাই। ওঁর জন্মের আগে এ-জিনিস তোমার বাক্সে ঢুকেছিল বৌদি।'

'বিশ বচ্ছর আগে? তখন আমি কোথায়?' বৌদি ফ্যাকাশে হইয়া গেলেন।

বলিলাম, 'বিশ কেন, তিন বছর। মেয়েদের জন্ম পূর্ণ হয় বিয়ের সঙ্গে।'

বৌদি হাসিলেন। মাধুরী বলিল, 'শুনে জন্ম সার্থক হলো। অগাধ পাণ্ডিত্য।'

দস্তানা লইয়া আমি বৈঠকখানায় চলিলাম। আরাম কেদারায় আরাম করিয়া বসিয়া দস্তানাটি হাতে পরিলাম। উলের মোটা দস্তানা, হাতে দিলে বেশ আরাম পাওয়া যায়। দস্তানা হাতে দিয়াই সিগারেট খাইতে হইত—যে প্রচণ্ড শীত তখন! দু'টি আঙুল পুড়িয়া ফুটা হইয়া গিয়াছিল। বেগুনী উল দিয়া আঙুলে দুইটি মেরামত করা আছে। হাতের কাজ বেশ পরিপাটি।

বসিয়া বসিয়া হাত মুঠো করিতেছি, আর খুলিতেছি। মাধুরী কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরে আসিল, বলিল, 'যে শীতই পড়েছে—লেপ নামাই, কি বলো!'

তাহার বিদ্রূপে কর্ণপাত করলাম না, বলিলাম, 'পারো, এমন বুনতে?'

সূক্ষ্ম পরীক্ষার পর মাধুরী বলিল, 'সাংঘাতিক কিছু নয়। তবে সময় নেই—আবার দস্তানা বোনার ফরমাস করো না বাপু!'

'ভয় নেই। বুনতে হবে না। বুনতে বলছিনে—আমারই ভয় আছে। স্লিপওভার বুনেই হাতের কাজের নমুনা দেখিয়ে দিয়েছ। বলছি, বুননটা কেমন?'

মাধুরী বলিল, 'কার?'

হাসিলাম। মাধুরী গম্ভীর হইয়া গেল।

দস্তানা পরিয়া আমি নির্বিকারভাবে হাত মুঠা করিতেছি আর খুলিতেছি। উল বেশ নরম, আরাম লাগিতেছে। বলিলাম, এটা হাতে তৈরী নয়, কেনা। তবে হাতের কাজ এই বেগুনী উল-টুকু। রংটা ক্যাট্ ক্যাট্ করছে বটে, কিন্তু উপায় ছিল না—মানানসই উল সে-অঞ্চলে ছিল না।'

মাধুরী বলিল, 'তাই ত জিজ্ঞাসা করছি—অঞ্চলটা কোথায়?'

অঙ্গুলী দিয়া তাহাকেই নির্দেশ করিলাম, 'আপাতত এখানে—ওরি আড়ালে। তবে, তুমি যে-অঞ্চল জিজ্ঞাসা করছ, সেটা পাহাড়।'

সকাল হইতে বেলা বারটা পর্যন্ত সূচীভেদ্য কুয়াসা। এক ফুট দূরের মানুষ পর্যন্ত দেখা যায় না। মাঝে একটু রৌদ্র ঝিলমিল করিয়া উঠিয়াই থামিয়া যায়। বৈকালে ঝিরঝির বৃষ্টি। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে অন্ধকার রাত্রে যাইতে হইত হীল্কার্ট রোড হইতে বর্ধমান রোডে উঠিয়া। হাতে পাঁচ-সেলের সুদীর্ঘ টর্চ। পরনে প্যাণ্ট, কোট, আলস্টার, মাথায় গরম কাপড়ের ক্যাপ, হাতে দস্তানা। লম্বা টর্চটি বাঁ-হাতে, ডান হাতের আঙুলের ফাঁকে শস্তা সিগারেট। শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে খাইতে যাইতাম। যেখানে যাইতাম সেখানে কয়েকটি পরিবার উপর নীচে ও পাশাপাশি থাকে। উপরে সার্কল অফিসার, পাশে হোটেলওয়ালা, নীচে একটি পাহাড়ী পরিবার। এরা ছাড়াও আরো কয়েকটি পরিবার অবশ্য ছিল, কিন্তু তাহাদের আমি চিনি না। বর্ধমান রোড হইতে খানিকটা খাড়াভাবে উপরে উঠিতে হইত, বড় বড় পাথরের টুকরা দিয়া সিঁড়ির মত করা রাস্তা। পথটি খুব সংকীর্ণ, এবং পাথরের খণ্ড জমাট করিয়া আটকানো নয়—অতএব এই খানে টর্চ ব্যবহার করিতে হইত। জুতার ঠক ঠক শব্দ করিয়া উঠিতাম, টর্চ ঘুরাইয়া চারিদিক দেখিয়া তার পর রাস্তা দেখিতাম। আমার পায়ের শব্দ আমাকেই চমকাইয়া দিত, দেখিতাম নীচের তলা হইতে কে-যেন চট করিয়া হোটেলওয়ালার বারান্দা পার হইয়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া পড়িত। প্রত্যহই লক্ষ্য করি, কিন্তু এ-বিষয় কিছু ভাবি নাই। মনে করিয়াছিলাম, হয়ত দেকেনবাবুর স্ত্রী নীচে পাহাড়ীদের ঘরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন—বাঙালী হইলেও উঁনি পাহাড়ী, পাহাড়েই লালিত ও পালিত। আমি

আসিতেছি বুঝিয়া আমাকে খাবার দিবার জন্য হয়ত গৃহে ফিরিলেন।

পাহাড়ে গিয়া প্রথমে উঠিয়াছিলাম হোটেলে। কিন্তু হোটেলওয়ালা বেশিদিন সেখানে টিকিতে দিলেন না। হোটেলে ছিলাম দু'টি মাত্র প্রাণী—আমি ও গ্রামোফোন ডিলার রাজুবাবু। শীত পড়ায় অন্যান্য সকলে পাহাড় হইতে পালাইয়াছে— হোটেল তাই খালি। মাত্র দু'জন লোকের কাছ থেকে যে-টাকা পাওয়ার কথা, তাহাতে হোটেলের খরচ পোষায় না—অসুবিধায় পড়িলাম আমরা দু'জন। অখাদ্য খাদ্য খাইয়া এবং সময়মত গরম জলের অভাব বোধ করিয়া আমরা বাঙালী মেসএ চলিলাম। হোটেলে দৈনিক দুই টাকার তুলনায় মেস অনেক ভাল। কিন্তু মাঝপথে জনৈক বিপন্ন ভদ্রলোকের সংগে আলাপ হওয়ায় সব প্ল্যান গোলমাল হইয়া গেল।

দেবেনবাবু লোকটি অমায়িক বিনয়ী সাদাসিধে এবং অকর্মণ্য। রাজেনবাবু পাহাড়ে আছেন অনেকদিন, পাহাড় সম্বন্ধে তিনি আমার চেয়ে অভিজ্ঞ, অতএব অত্যধিক চালাক। দেবেনবাবুর সংগে পরিচয়ও তাঁর পুরানো। দেবেনবাবুকে তিনি বিশেষ আমল দেন নাই। ভদ্রলোকটির দুরবস্থার জন্য তিনি চিন্তিত নন। দেবেনবাবুর বয়স বছর পঁচিশ ছাব্বিশ, ছোট সংসার—একটি মেয়ে ও স্ত্রী। বছর দুই হইল বিবাহ করিয়াছেন প্রেমে পড়িয়া। তাঁর চরিত্রের মধ্যে এ একটি দোষ, দ্বিতীয় দোষ অবশ্য কুঁড়েমি বা কাজে গাফিলতি। তাঁর এই দোষের জন্যেই নাকি রাজুবাবু তাঁর ওপর খাপ্পা, নহিলে এতদিন তিনি দেবেনবাবুর অবস্থা ফিরাইয়া দিতে পারিতেন নাকি।

পরে জানিয়াছি—দেবেনবাবু অলস নন, দীর্ঘসূত্রে। চেষ্টাবান্ নিশ্চয়ই, তবে অপারগ। খেয়ালের মাথায় বিবাহ করিয়া এখন পস্তাইতেছেন। তাঁর অনুশোচনার সুর অবশ্য কখনই করুণ নয়—হাসির সাহায্যে হাল্কা করা; মনে হইত, তাঁহার ভাগ্যের এ বুঝি-বা বাজে স্তুতি।

দেবেনবাবুর ওখানেই আমার ও রাজুবাবুর প্রাত্যহিক আহার ও জলযোগের ব্যবস্থা হইল। ইহাতে আমাদের যুক্তি এই যে, পকেটকে বুঝিতে না দিয়া পরোপকার করার ইহাই সহজ পথ। হোটেলে দু'জনের পক্ষে যা খরচ পড়ে, সেই খরচে বাসায় চারজনের এমন-কি পাঁচজনের স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইবে।

অতএব দিনের মধ্যে বারকয়েক আমাদের দেবেনবাবুর বাসায় যাতায়াত করিতে হয়—দেবেনবাবু বাসায় থাকুন বা না থাকুন। রাত্রি কাটাইবার জন্য একটি ঘর ভাড়া করা ছিল। সকালে উঠিয়াই আপিস আরম্ভ, ঘরের সংগে দেখা হইত আবার সেই গভীর রাত্রে। কেহ কেহ বলিতেন, ঘরে একটা মিটার বসাইলে যতটুকু ব্যবহার করি সেই অনুপাতে ভাড়া উঠিবে—পুরো ভাড়ার হাত হইতে তাহা হইলে আমরা রেহাই পাইব।

মাঝখানে মাধুরী বলিল,—'কিন্তু দস্তানা!'

দস্তানার কথা বলিতে বলিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এখনও দস্তানায় পেঁছাইতে পারি নাই। এইবার পেঁছিব। মাধুরীকে ধৈর্য ধরিতে বলিলাম।

পূর্বেই বলিয়াছি, দেবেনবাবুর নিচের তলায় থাকিত একটি পাহাড়ী পরিবার, উপরে থাকিতেন সার্কেল অফিসার। উপরতলা দিয়া আপাতত আমাদের দরকার নাই—আমরা পাহাড়ে আছি, পাহাড়ী পরিবারের কথাই বলিব।

প্রত্যহ রাত্রে খাইতে বসিয়া একটি অপরিচিত মেয়েকে অদূরে ঘরের একটি কোণে বসিয়া বসিয়া কি-যেন বুনিতে দেখিতাম। পরে জানিয়াছি, মেয়েটি স্থানীয় এম ই স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, নীচের পাহাড়ীদের বড় মেয়ে এবং দেবেনবাবুর স্ত্রীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। প্রত্যহই তাহাকে একই স্থানে একইভাবে দেখিতাম। মাঝে মাঝে সে হয়ত আমাদের দিকে তাকাইত, মাথা নিচু করিয়া খাইতে খাইতে যদি কখনো মাথা তুলিতাম, দেখিতাম সে মনোযোগের সংগে বুনিয়া চলিয়াছে। দৈবাৎ কখনো আচমকা মাথা তুলিয়া দেখিয়া ফেলিতাম, সে আমাদের দিকে চাহিয়া ছিল, তাড়াতাড়ি মাথা নত করিয়া উলের গুটি ও দুটি কাঁটা লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। আবার, কোনদিন যদি আমরা অনিয়মিত হইয়া কিছু আগেই সেখানে গিয়া উপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে বড় বিশ্রী লাগিত। ঘরে দেবেন-বাবুর স্ত্রী ও ঘুমন্ত শিশুটি ছাড়া আর কাহাকেও পাইতাম না। কিন্তু, কিছুক্ষণ বাদেই মানসিক আবহাওয়া হঠাৎ বদল হইয়া যাইত। দরজার কব্জায় মৃদু আর্তসুর বাজাইয়া সসংকোচ পদক্ষেপে কে যেন ঘরে ঢুকিত। পদক্ষেপটাই নজর করিতাম, মুখ দেখিবার মত মনে সাহস পাইতাম না। হঠাৎ শরীরেও একটা জড়তার ভাব অনুভব করিতাম, এতক্ষণ হাত-পা যত সহজে নাড়িতে পারিতেছিলাম, যেদিকে খুসি ঘাড় ফিরাইতে পারিতেছিলাম, সব ক'টি স্ক্রুতে তখন যেন মরিচা ধরিয়া যাইত। চশমার কাচ সহসা এত অপরিষ্কার হইয়া যাইত যে চশমা খুলিয়া কাচ দুটি বারবারই রুমাল দিয়া ঘসিতে হইত। কখনো-বা হাত হইতে দস্তানা খুলিয়া দুই হাত ঘসিয়া ঘসিয়া গরম করিয়া রাজেনবাবুর দিকে চাহিয়া নিখুঁৎ পাহাড়ী ভংগীতে বলিতাম, 'বহুৎ জারো ছ।' রাজেনবাবু বলিতেন, 'শীতের ইন্‌টেনসিটি সত্যিই এবার বড় বেশী।' আপাদমস্তক র‍্যাপারে মুড়ি দিয়া জড়োসড়ো হইয়া বসিয়া দেবেনবাবু দুলিতেন আর বলিতেন, 'হুঁ হুঁ।' দেবেনবাবুর স্ত্রী আজন্ম পাহাড়েই কাটাইতেছেন, পাহাড়ী ভাষায় তিনি ওস্তাদ। আমার মুখ হইতে পাহাড়ী শব্দ বাহির হইবার পর পিছনে অস্ফুট হাসির শব্দ শুনিতে পাইতাম। পাহাড়ে আমি নবাগত, সেইজন্যই হয়ত আমার মুখে এই ভাষা শুনিয়া সকলের হাসি পাইত। হাসিতে উৎসাহিত হইয়া পুনরায় পাহাড়ী কথা বলিবার জন্য মনে মনে তৈয়ারী হইতাম। খাইতে বসিয়া তরকারী ঝাল হইয়াছে কি হয় নাই মুখে দিয়া বুঝিবার আগেই বলিতাম, 'আপুই, তিউন কোস্তো পিরো ভয়ো!' ঘরে হাসির রোল উঠিত। সে-হাসিতে বিচলিত না হইয়া সহজভাবে আমি খাইতে থাকিতাম।

এমন সময় বৌদি একবার ঘরে উঁকি দিয়া দরজা টানিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। মাধুরী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তারপর?'

জানিতাম, সেখানে সময়ের আগে গিয়া পেঁছিলে বড় বিশ্রী লাগিবার কথা,—তবুও বিকাল হইবার পর হইতেই খুব ক্ষুধার্ত হইয়া পড়িতাম। সকলেই বলিত, পাহাড়ী আবহাওয়ায় তাহা হইলে আমার স্বাস্থ্যোন্নতি হইতেছে। ক্ষুধা বৃদ্ধি নাকি স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এ-কথার কোনো জবাব আমি দিতাম না। আমার সংগে সংগে দেবেনবাবুর বা রাজুবাবুর স্বাস্থ্য নিশ্চয় সমানভাবে ভাল হইতেছিল না, তাঁহারা বাসায় যাইতে বড় গরিমসি করিতেন। অতএব আমিও তাঁহাদের সংগে বসিয়া বসিয়া বাজে গল্প করিতাম ও সস্তা সিগারেট টানিতাম। মাঝে মাঝে হয়ত হাতঘড়ির দিকে চুরি করিয়া তাকাইতাম। মজলিস ছাড়িয়া উঠিতে উঠিতে প্রত্যহের মত রাত্রি আটটা হইত।

শীত প্রধান জায়গা। ইতিমধ্যে দোকান প্রায় সব বন্ধ হইয়া যায়। সিগারেটের দোকান খোলা না পাইলে দুশ্চিন্তায় পড়িতাম। বগলে পাঁচ সেলের টর্চ চাপিয়া ধরিয়া দস্তানা সুদ্ধ হাত আলস্টারের পকেটে ঢুকাইয়া পীচের রাস্তায় সশব্দে হাঁটিয়া চলিয়াছি। গুড়ুং এণ্ড কোং নামক ঘড়ির দোকানে তখনো বেপরোয়া আলো জ্বলিতেছে। দোকানটি নাকি আমাদের পাহাড়ী মেয়েটির বাবার। খুব কায়দার উপর ঘাড় কাৎ করিয়া দোকানটির দিকে চাহিতে চাহিতে চলিয়া যাইতাম। রাজেনবাবু সংগে সংগে

হাঁটিতেছেন, দেবেনবাবু বেচারা শীতে জড়োসড়ো হইয়া পিছাইয়া পড়িতেন।

দেবেনবাবুর ঘরে গিয়া যথারীতি টেবিলের উপর মাথার টুপি নামাইয়া, টর্চ রাখিয়া চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িতাম। রাজেনবাবু একটু বেশি লাজুক, তিনি সব সময় আমার আড়ালে বসিতে চেষ্টা করিতেন, ঘরের মেয়েটি যেন তাঁহাকেই নিশানা করিয়া বসিয়া আছে—সুযোগ পাইলেই তীর ছুঁড়িবে। দস্তানাসুদ্ধ হাত দিয়া দুই কান ঘসিয়া গরম করার চেষ্টা করিতাম, মুখের উপর হাত চাপা দিয়া বসিতাম—নাকের ডগা হিম হইয়া গিয়াছে। রাজেনবাবুর দিকে তাকাইয়া বলিতাম, 'কী শীত!' রাজেনবাবু চাপা গলায় বলিতেন 'বহুৎ জারো ছ।' এমন সময় দেবেনবাবু দরজার কব্জায় মৃদু আর্তসুর তুলিয়া হুঃ হুঃ শব্দে ঘরে ঢুকিতেন, বলিতেন, 'আজ আগে চা চাই। শুনছো—চা।' আমরা মনে মনে সন্তুষ্ট হইতাম বটে, কিন্তু মনোভাব প্রকাশ করিতাম না। দেবেনবাবু বিছানায় তাঁর কন্যার কাছে গিয়া বসিতেন। শয়ন ঘর এই একটিই। পাশেই রান্নাঘর, তার পাশে স্নানঘর। দেবেনবাবু বিছানার উপর বসিবামাত্র মেয়েটি উঠিয়া রান্না ঘরে চলিয়া যায়। চৌকীর একটি কোণ দখল করিয়া সে রোজ বসিয়া আসিতেছে। দেবেনবাবুর উপর খুব বিরক্ত হইতাম। এবারও মনোভাব প্রকাশ না করিয়া কিছু পরে বলিতাম, 'খুব শীত ধ'রেছে বুঝি? লেপের মধ্যে পা চালাচ্ছেন। এদিকে আসুন, এই নিন কাঠের চেয়ারটাই।—টিনেরটায় না হয় আমি বসছি; কনকনে ঠাণ্ডা আমার লাগবে না, আমার চামড়া বেশ পুরু। আসুন আসুন!' দেবেনবাবু বড় অনুগত, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতেও উঠিয়া আসিতেন, বলিতেন, 'মোটা মোটা হাজার গণ্ডা জামা গায়ে দিয়ে চামড়া পুরুর গর্ব আমরাও করতে পারি, মশাই। টিনের চেয়ারে বসলে পাৎলা এই কাপড় ভেদ ক'রে ঠাণ্ডা একেবারে হাড্ডিতে গিয়ে লাগবে যে। মনে রাখবেন, আমার গায়ের চামড়া গণ্ডারের চেয়ে কম পুরু নয়।' শেষের কথাটি তাঁর নিজের ভাগ্যকে উদ্দেশ করিয়া বলা। আমাদের উপর তাঁর আর্থিক নির্ভরতার জন্য ইহা কাতরোক্তি।

পরদিন সকালে দেবেনবাবুর সঙ্গে প্রথম দেখা হইতেই তিনি উল্লসিত হইয়া বলিলেন, 'সুসংবাদ আছে রায় মশায়। পাহাড়ী মেয়েটি আপনাকে একটি দস্তানা দেবে। নিজের হাতে বুনে।'

বলিলাম, 'হেতু?'

'আমার বৌ-র কাছে বলি-বলি ক'রে কাল ব'লে গেছে-যে আপনার নাকি মাত্র একজোড়া দস্তানা, আর একজোড়া ও নিজে হাতে বুনে আপনাকে উপহার দেবে।'

বলিলাম, 'এ উপহাস নাকি বলুন তো! দস্তানা আবার ক'জোড়া থাকে। তবু তো আমার দু'জোড়া ছিলো, কাপড়ের দস্তানা জোড়া রাজেনবাবুকে হাতে দিতে দিয়েছি ওঁর একেবারে নেই ব'লে, আর উলের জোড়া আমি হাতে দিচ্ছি।'

দেবেনবাবুর সঙ্গে এ-ভাবে কথা বলিলাম বটে, কিন্তু মনে মনে হৃষ্ট হইয়া উঠিলাম এবং আরও একজোড়া দস্তানার চাহিদা তীব্রভাবে বোধ করিতে লাগিলাম। রাজেনবাবুকে খুব গোপনে এই সুসংবাদটি দেওয়া মাত্র তিনি অকারণ গম্ভীর হইয়া গেলেন। তারপর মেয়েটির উল্লেখ এমন তাচ্ছিল্যের সুরে করিতে আরম্ভ করিলেন যে মনে মনে খুব বিরক্ত হইয়া উঠিতাম। রাজেনবাবুর এই ব্যবহার ও তার সঙ্গে দস্তানার সুসংবাদ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নিকট করিলাম ও কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিয়া দিলাম। ফল কিন্তু বিপরীত হইল। কয়েকদিন বাদে বুঝিলাম, সংবাদটি সে-অঞ্চলের সকলেই জানে। কি করিয়া এত প্রচার হইল বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে বুঝিলাম, রাজেনবাবু কেবল লাজুক নন্ তিনি সামান্য হিংসুকও বটে। তিনি সংবাদটি প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন, তার উপর যে রং দিয়াছেন তাহা আসল রং নয়। ঘড়ির দোকানে দাঁড়াইয়া তিনি নাকি চা বাগানের ডাক্তারবাবুর সঙ্গে এ বিষয় লইয়া আলোচনাও করিয়াছেন। ক্রমশ, ঘটনাটি জটিল হইয়া দাঁড়াইল। আমার চেয়েও দেবেনবাবু যেন বেশি বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। কথাটি নাকি ঘুরিয়া ফিরিয়া মেয়েটির কানেও পৌঁছিয়াছে।

মনে মনে খুব অনুশোচনা বোধ করিতে লাগিলাম। সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এমন একটি দুর্ঘটনার ইতিহাস সাজানো যাইতে পারে, তাহা আমার জানা ছিল না। এক একবার রাজেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইত, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারিতাম না। রাস্তায় সার্কেল অফিসারের সঙ্গে দেখা হইতেই তিনি দাঁড়াইয়া গল্প আরম্ভ করিলেন, অবশেষে দস্তানার গল্পে আসিয়া থামিলেন। এতদিন তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছে, কোনো কথাই বলেন নাই, বিশেষ আলাপ ছিল না বলিয়াই। আজ আলাপ গাঢ় হইয়া গেল। এইভাবে অপরিচিত অনেকের সঙ্গে পরিচিতও হইয়া গেলাম।

মাধুরী বলিল, 'যাক্ গে। দস্তানা তো পেলে!'

বলিলাম, 'অনুতাপ তো ওইখানেই। কোথায় আর পেলাম বলো! তা না হ'লে সে কথা আবার বলি!'

মাধুরী বলিল, 'দিলো না! কেন?'

'আর দেয়? না দিয়েই যে অবস্থা। দেবেনবাবুর বাসায় পর্যন্ত আসা বন্ধ ক'রে দিলো। কিন্তু আমি দেবেনবাবুকে দিয়ে তাঁর স্ত্রীর মারফৎ একদিন আমার দস্তানা জোড়া তার কাছে পাঠিয়ে দিই। মনে মনে আমার মতলব ছিল অন্য। ভেবেছিলাম, এতে হয়ত আর এক জোড়া দস্তানাও এর সঙ্গে পাঠিয়ে দেবে। আমার পাওনা দস্তানা না হ'লে আমার যেন কিছুতে চলছিলো না। আর এক জোড়া না পাঠিয়ে আমার জোড়ার কেবল এই সিগারেটে পোড়া ডান হাতের দুটি আঙুল এই বেগুনী উল দিয়ে রিপু ক'রে সে পাঠিয়ে দিয়েছে, আর ব'লে দিয়েছে আমি যেন এ-কথা এবার আবার কাউকে না বলি—খুব সাবধান! সাবধান আমি আগে থেকেই হ'য়ে গিয়েছিলাম। এর পর দেবেনবাবুর বাসা ছেড়ে দিয়ে রাজেনবাবুর ঘর ছেড়ে দিয়ে পাহাড় ত্যাগ করার আগের সপ্তাহ খানেক ছিলাম মাড়োয়ারী মেস্-এ।'

মাধুরী বলিল, 'মেয়েটি কেমন?'

মাধুরীর দিকে তাকাইয়া বলিলাম, 'আর ব'লে লাভ কি—ভালোই।'

'নাম?'

একটু ভাবিয়া বলিলাম, 'ললনা গুরুং।'

এমন সময় অসিত পুনরায় খেলনা বন্দুক লইয়া ঘরে আসিল, এবার দূর হইতেই আমার কপাল লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'গুড়ুম্।'

মাধুরী আমার দিকে তাকাইতে পারিল না, কর্কটা তাহার চোখে লাগিয়াছে।

ভার্জিনিয়া উল্‌ফ

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী

বর্তমান যুগে ইংলণ্ডের যে কয়জন মহিলা সাহিত্যিক সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। বিখ্যাত আর্ট সমালোচক ক্লাইভ বেল তাঁহাকে ডস্টয়েভ্স্কি এবং জোসেফ কনরাডের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রশংসা অতিশয়োক্তি সন্দেহ নাই; হয়ত তিনি নিজেও আজ তাঁহার আত্মীয়া এবং একই গোষ্ঠির সাহিত্যিক ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ সম্বন্ধে এত বড় কথা বলিবেন না। কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দিলেও এ যুগের অতি আধুনিকতার বিরোধী নির্মম সমালোচক ভার্জিনিয়া উলফকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিবেন না।

আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে ভার্জিনিয়া উল্‌ফের স্থান নির্দেশ করিতে হইলে বার্টর‍্যাণ্ড রাসেল, রজার ফ্রাই, ক্লাইভ



ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্

বেল এবং লিটন স্ট্রাচি এই কয়জন সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করিতে হয়। মতামতের দিক হইতে ভার্জিনিয়া উলফ ইঁহাদের সমগোষ্ঠি। জনৈক সমালোচক ইঁহাদিগকে 'ব্লুম্‌সবেরি স্কুলে'র সাহিত্যিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ব্লুমসবেরি লণ্ডনের একটি জায়গার নাম, নিউ অক্সফোর্ড স্ট্রীটের উত্তরে এবং টোটেনহাম কোর্ট রোড ও গ্রেস ইন রোডের মধ্যে অবস্থিত। এই অঞ্চলে বৃটিশ মিউজিয়াম। এখানে একটি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাস আছে যাঁহারা নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধি সম্বন্ধে অতিরিক্ত মাত্রায় সজাগ; কেবল তাহাই নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক হইতে তাঁহারা শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করেন।

ব্লুমসবেরির পরিচয় দিতে গিয়া ফ্রাঙ্ক সুইনারটন একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। দুইটি বালক বালিকার মধ্যে কোন বিষয় লইয়া তর্ক হইতেছিল। দুইজনের পিতাই সাহিত্যিক। বালকটি বলিয়াছিল, "তোমার বাবা তোমার সম্বন্ধে তো বই লেখেন না!" বালিকাটি উত্তর দিয়াছিল, "না; কিন্তু আমি দুর্বল নই।" অর্থাৎ পিতার সাহায্যে বালিকাটি পরিচিত হইবে না, নিজের খ্যাতি অর্জন করিবার ক্ষমতা তাহার আছে। ব্লুমসবেরির মহিলা সাহিত্যিকের কথা আলোচনা করিবার সময় উক্ত বালিকাটির ছবি আমাদের মনে ভাসিয়া উঠে।

গত যুদ্ধের সময় বার্টরাণ্ড রাসেল প্রমুখ মনীষীগণের অনেকেই যুদ্ধবিরোধী ছিলেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যুদ্ধ করিয়া কোন লাভ হয় না। যখন দেশের অধিকাংশ লোক এক পথে চলিতেছে তখন উল্টা পথে চলা বিশেষ বিপদজনক। বার্টরাণ্ড রাসেলকে উল্টা পথে চলিবার অপরাধে শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। রজার ফ্রাই, ক্লাইভ বেল ইত্যাদিও উল্টা পথের যাত্রী; অর্থাৎ বাঁধাধরা পথে তাঁহারা চলিতে শেখেন নাই, তাঁহারা নিজেদের জন্য একটি স্বতন্ত্র পথ রচনা করিয়াছেন। এক কথায় তাঁহাদিগকে উগ্র স্বাতন্ত্র্যবাদী বলা চলে। ভার্জিনিয়া উল্‌ফের ভিতরেও এমনি একটি আপোষবিহীন স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়।

গত যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের বহু সংবাদপত্রে এই কথাটি প্রায়ই নজরে পড়িত—"The Women are splendid." ইংলণ্ডে সে সময়ে মেয়েরা যেভাবে পুরুষদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া হয়ত কেহ এই কথাটি বলিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মেয়েরা কোন কোন বিষয়ে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দাবী করিতে পারেন, গত যুদ্ধের সময় ইহার বহু দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। দেশের জন্য মেয়েরাও যে কঠিন পরিশ্রম করিতে পারেন এবং আত্মত্যাগ ও আদর্শনিষ্ঠার দিক হইতে তাঁহারাও যে পুরুষের অপেক্ষা কোন অংশে কম নহেন, গত যুদ্ধের দিকে চাহিলে তাহা প্রমাণিত হয়। ফলে মেয়েরা নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে অকস্মাৎ বিশেষ সজাগ হইয়া উঠেন। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। এই আত্ম-সচেতন মেয়েরা ঘর-সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া পুরুষের সঙ্গে নানা আন্দোলনে যোগ দিতে থাকেন। সাহিত্যের সেবায় বহু শিক্ষিতা মহিলা আত্মনিয়োগ করেন। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ এই মহিলা সাহিত্যিকদের আদর্শ এবং 'ব্লুমসবেরি স্কুলের' একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক।

ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ স্যার লেসলি স্টিফেনের কন্যা। স্যার লেসলি স্টিফেন 'Dictionary of National Biography' সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও অন্যান্য অনেক বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত জর্জ মেরিডিথের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। কাজেই ছেলেবেলা হইতে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ সাহিত্যের আবহাওয়ায় বিকাশ লাভের সুযোগ পান। অসুস্থতার জন্য ভার্জিনিয়া উল্‌ফের বিদ্যালয়ে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই, বাড়িতে তিনি বিদ্যালাভ করেন। পড়াশুনার প্রতি তাঁহার প্রকৃত অনুরাগ ছিল, তিনি কত বিষয়ের খবর রাখিতেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এযুগের সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে যত অভিযোগই আনা যাক্ না কেন, এমন কথা কেহ বলিতে পারিবেন না যে তাঁহাদের বিদ্যা নাই।

১৯১২ সনে ভার্জিনিয়া উল্‌ফের বিবাহ হয়। তাঁহার স্বামী লিওনার্ড উল্‌ফ্ কেম্ব্রিজের ছাত্র ছিলেন এবং

কিছুকাল সিংহলে সিভিল সার্ভিসে কাজ করিয়াছিলেন। লিওনার্ড উল্‌ফ্‌ নিজেও একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। ১৯১৫ সনে যখন ইউরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিরাট যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময় ভার্জিনিয়া উল্‌ফের প্রথম উপন্যাস 'The Voyage out' প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসখানি পড়িয়া ক্লাইভ বেল বলিয়াছিলেন, "Great writers, like Dostoevsky, Joseph Conrad, and Virginia Woolf."

উপন্যাসখানির মধ্যে ঘটনার বৈচিত্র্য নাই, ঘটনা একেবারে নাই বলিলেও চলে। বইখানির আগাগোড়া নায়কনায়িকার কথাবার্তায় পরিপূর্ণ। ইহার একটি কারণ আছে। ভার্জিনিয়া উল্‌ফের বিশ্বাস এবং আমরাও অবিশ্বাস করিতে পারি না যে, মানুষ যখন কথা বলে, তখন তাহার মন একটি মাত্র বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকে না; সে হয়ত একটি কথা ভাবে ও বলে, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আর একটি কথা ভাবে অথচ যাহা বলে না। একটু মনযোগ দিলেই পরস্পরের সহিত কথাবর্তার সময় আমরা ইহা লক্ষ্য করিতে পারি। এইভাবে আমাদের মনে একই সঙ্গে কত বিষয়ের যে উদয় হয় তাহার ঠিক নাই; তাহাদের একটির সঙ্গে আর একটির সম্বন্ধ প্রায়ই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জাগ্রত অবস্থায় মানুষের মনে অতি দ্রুত যে পটপরিবর্তন চলিতে থাকে, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ তাঁহারই ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এদিক দিয়া জেমস্‌ জয়েস্‌ পথ প্রদর্শক। তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত বই 'Ulysses'-এ এইরূপ জাগ্রত মনের প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তন এবং মনের মধ্যে একটি বিষয় হইতে আর একটি আপাতদৃষ্টিতে অসম্পর্কিত বিষয়ের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ 'Ulysses' হইতে কয়েকটি লাইন নিম্নে উদ্ধৃত করিলামঃ—

"Evening hours, gils in grey gauze. Night hours then black with daggers and eyemasks. Poetical idea pink, then golden, then grey, then black. Still true to life also. Day, then the night."

১৯১৯ সনে ভার্জিনিয়া উল্‌ফের দ্বিতীয় উপন্যাস 'Night and Day' প্রকাশিত হয়। এই দুইখানি বই প্রায় এক ধরণের। 'Jacob's Room' (১৯২২) উপন্যাসখানিতে একটি পরিবর্তন দেখা যায়, 'Mrs. Dalloway' (১৯২৫) এবং 'To the lighthouse' (১৯২৭) উপন্যাস দুইখানিতে এই পরিবর্তন আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ঘটনা বর্ণনার কোন প্রয়াস না করিয়া ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ এবার সম্পূর্ণভাবে নানা রঙের স্মৃতির খেলা এবং মনের মধ্যে নানা বিচিত্র খেয়ালের যাওয়া আসার ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক উপন্যাসে ভার্জিনিয়া উল্‌ফের দান এইখানে। তিনি পাঠককে বাহিরের চিরপরিচিত জগৎ হইতে মানব মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মধ্যে টানিয়া লইয়া যান। এখানে সবই অদ্ভুত, সবই কল্পনাতীত। অসংখ্য স্মৃতি ও খেয়ালের অসম্বদ্ধতার চমক যেন কিছুতেই কাটিতে চায় না। তাঁহার উপন্যাসগুলিকে ইম্‌প্রেশনিস্টদের ছবির সহিত তুলনা করা যায়।

মনের এই বিচিত্র অসম্বদ্ধতার ছবি ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ নানাভাবে আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় 'Orlando' (১৯২৮) এবং 'The Waves' (১৯৩১) উপন্যাস দুইখানিতে।

অরনল্ড বেনেট্‌ এযুগের সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের উপন্যাসে চরিত্রাঙ্কন আদৌ নাই। তাঁহার মতে চরিত্রাঙ্কনই উপন্যাসের প্রধান জিনিস। তিনি বলিয়াছিলেন, অতিরিক্ত মাত্রায় খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়া তাঁহারা চরিত্রাঙ্কনের কথা একেবারে ভুলিয়া যান। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ তাঁহার স্বভাবসুলভ তীব্র ভাষায় এই অভিযোগের উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি আরনল্ড বেনেট্‌, গলস্‌ওয়ার্দি, ওয়েলস্‌ প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের বিরুদ্ধে এই বলিয়া উল্টা অভিযোগ আনিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের উপন্যাস প্রায় প্রাণহীন, কাজেই সেগুলি এযুগে অচল। তাঁহার ধারণা পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে মানুষের মনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাহার সন্ধান দেওয়াই ঔপন্যাসিকের কাজ। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে এই প্রতিক্রিয়ার উপযুক্ত ছবি আঁকা সম্ভব নয়। তাহার কারণ, মন বাঁধা ধরা পথে কখনও চলে না; মনের গতি এলোমেলো, প্রতি মুহূর্তে সেখানে আলোছায়ার কত যে নৃত্য চলিতেছে তাহার হিসাব নাই। সুতরাং ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ ও তাঁহার সমগোষ্ঠির ঔপন্যাসিকদের প্রচেষ্টা অনেকটা আলেয়ার পিছনে ছুটাছুটির মত মনে হয়। কিন্তু তবুও তাহাতে নূতনত্ব ও সজীবতা আছে।

ভার্জিনিয়া উল্‌ফের কোন উপন্যাসে পূর্ণাবয়ব চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তাহার কারণ খুব সহজ। নিজের চরিত্র কেহ আঁকিতে বসিলে সে এমন কতকগুলি বিষয় লিখিবে যাহা তাহার কাছে আপন চরিত্রের প্রধানতম উপাদান বলিয়া বোধ হয়। এই বিষয়গুলির একটির সহিত আর একটির হয়ত কোন যোগ থাকে না এবং আর দশজনের দৃষ্টিপথেও এগুলি ধরা পড়ে না। ভার্জিনিয়া উল্‌ফের উপন্যাসের চরিত্রগুলি এইরূপ পরস্পর সম্বন্ধবিহীন ভাবের সমষ্টি।

ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ উপন্যাস ছাড়াও কয়েকখানি প্রবন্ধের বই রচনা করিয়াছেন: তাহাদের মধ্যে 'Monday and Tuesday' (১৯২৩), 'Common Reader' (১৯২৫), 'A Room of One's Own' (১৯২৯) বইগুলির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার উপন্যাস সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত আছে। প্রকৃতপক্ষে সেগুলি ভবিষ্যতে আদৃত হইবে কিনা, সে সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা চলে না। কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে সকলে একমত, তাঁহার প্রবন্ধের বইগুলি ইংরেজী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। প্রকাশভঙ্গি, ভাষার মাধুর্য এবং বৈদগ্ধ্য

(শেষাংশ ৪১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বন্ধন

শ্রীশান্তি দেবী

রাত্রির নীরবতায় ঘরের আবহাওয়া যেন প্রেতায়িত হইয়া উঠিয়াছে। রাস্তায় ট্রাফিকের শব্দ কমিয়া আসিয়াছে। বহুক্ষণ পর পর এক-আধখানি মোটরের আওয়াজ পাওয়া যাইতেছে, রিক্সার টুং টুং আওয়াজ যেন করুণ শুনাইতেছে। চিত্রা আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। লঘু পায়ে রাস্তার ধারের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। মাঝে মাঝে দুই একটা লোক চলিয়া যাইতেছে; তাহাদের চলমান ছায়া আর পায়ের শব্দ চিত্রা গণিয়া গণিয়া দেখিতেছে আর শুনিতেছে। দূরের ছায়া যখন সম্মুখ দিয়া রূপ লইয়া পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া যায় তখন চিত্রা হতাশ হইয়া আবার দূরেই দৃষ্টি ছড়াইয়া দেয়। কৃষ্ণ-পক্ষের পান্ডুর চাঁদকে ঘিরিয়া আকাশের তারাগুলি হীরার টুকরার মত জ্বলিতেছে। চিত্রা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখে, আকাশের এই সমাহিত রূপ চিত্রার ভাল লাগে, কিন্তু আজ তার অস্থির মন, মন কিছুতেই যেন স্থির হইতেছে না।

সেই যে অমলিন সকালে বাহির হইয়াছে এখনও ফিরিয়া আসে নাই। হয়ত সে নিরাপদেই আছে কোথাও, তবু চিত্রার ভীরু মন শঙ্কিত হইয়া ওঠে। সেদিন আর নাই—যেদিন চিত্রা অমলিনের হৃদয় সমস্তটাই জুড়িয়া রাখিত, তবুও ত সেদিনের স্মৃতিগুলি না ভাবিয়া পারে না চিত্রা। তারপর কয়লার খনিতে ফাটল ধরার মত কোথায় যে একটা ফাটল ধরিয়া গেল যাহা চিত্রা আজও আবিষ্কার করিতে পারিল না। চিত্রার ভয় হয়, যদি তাহার এই চিড়খাওয়া জীবন নিঃশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়ে! না, তাহা হইলে চিত্রা আর পারিবে না। অমলিন যেখানেই থাক, যেন ভাল থাকে, সে যদি বাড়িতে আসিয়া স্বস্তি না পায় তবে তার বাড়ি আসিয়াও কাজ নাই।

আস্তে আস্তে কড়া নাড়িবার শব্দ হইল। চিত্রা কান পাতিয়া দাঁড়ায়। এ কড়া নাড়িবার ভঙ্গী তাহার সুপরিচিত। চাকরটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, চিত্রা পায়ে পায়ে নামিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দেয়।

অমলিন চিত্রার সামনে পড়িয়া একটু বিব্রত বোধ করিল। "এখনও ঘুমোওনি তুমি? বাস্তবিক বড় দেরী হয়ে গেছে, না?"

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে চিত্রা খানিকটা ব্যগ্রতার সুরে বলে, "চলো, খাবার সব জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে, স্টোভ জেবলে গরম ক'রে দেব'খন, চলো!"

অমলিন ঢোক গিলিয়া বলে, "তুমিও খাওনি ত? আমি কিন্তু খেয়ে এসেছি।"

"খেয়ে এসেছ? কোথায়?" ঘুরিয়া চিত্রা জিজ্ঞাসা করে।

"বলছি চলো ঘরে" অমলিন বলে; দুজনে আসিয়া ঘরে দাঁড়ায়।

"কোথায় খেলে?" চিত্রা আবার জিজ্ঞাসা করে।

"মণিকা এসেছে অনেক দিন পর, ভাবলাম একবার দেখা করে আসি; কিন্তু ও ঠিক তেমনি আছে কিছুতেই ছাড়লো না, স্বামীটিও তেমনি। অগত্যা খেতে হলো। তারপর এত পর্যন্ত বকবক করে তবে রেহাই পেলাম। জুটেছে বেশ যেমন দেবা তেমনি দেবী, এত বাজেও বকতে পারে!" অমলিনের কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বাস উঁকি মারিয়া যায়।

চিত্রা চুপ করিয়া থাকে। বিছানায় বসিয়া পড়িয়া অমলিন বলে, "তুমি খেয়ে এসো।"

"আমি খেয়েছি। রাত হয়েছে বরং শুয়ে পড়।" চিত্রার স্বর নির্লিপ্ত হইয়া ওঠে।

অমলিন শুইয়া পড়ে। আলো নিভাইয়া চিত্রাও শুইয়া পড়ে। খানিকক্ষণ একটা অসহ্য নিস্তব্ধতায় দুজনের মধ্যের ব্যবধান যেন ভারী হইয়া ওঠে।

কিছুক্ষণ পর অমলিন আস্তে আস্তে ডাকে, "মণি, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ নাকি? সত্যি বলছি আমি ইচ্ছে করে রাত করিনি।"

সহসা বহুদিন আগের পরিচিত সুর শুনিয়া চিত্রা স্তব্ধ হইয়া যায়। যে ঘনিষ্ঠ সম্বোধন তাহার স্মৃতিতে প্রায় স্মৃতিই হইয়া গিয়াছিল তাহা আজ রূপ নিল কেমন করিয়া?

চিত্রার কোন উত্তর না পাইয়া অমলিন তাহার পাশে সরিয়া আসিল, "সত্যি চিত্রা আমি ভারী অন্যায় করে ফেলি না?"

চিত্রার সমস্ত অভিমান চোখের ওপর বাষ্প হইয়া জমিয়া ওঠে। বলিতে চায় অনেক কথা, কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায়।

অমলিন আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া আসে। চিত্রার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া নেয়, গলার স্বর আরও গভীর করিয়া বলে, "সত্যি চিত্রা তোমাকে বড় কষ্ট দি না?"

চিত্রা আর পারে না, অমলিনের দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। সঞ্চিত বেদনার মেঘ যখন গলিয়া গলিয়া তরল হইয়া আসে, তখন ধীরে ধীরে বলে, "কষ্ট আর কি, দোষ কার তাই বা কে জানে?"

"না, না, ওটা তোমার অভিমানের কথা। দোষ আমার কতখানি তা বুঝি, কিন্তু প্রতিকার করতে পারি না, ইচ্ছে করে নয় অনিচ্ছেতেই।" অমলিন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

চিত্রার মনে একটি ক্ষীণ আন্দোলন উপস্থিত হয়। এমন কি কর্তব্য যাহার অমলিন প্রতিকার করিতে পারে না। স্ত্রীর প্রতি যদি স্বামীর ভালবাসা থাকে আর যদি সে স্ত্রীও স্বামীকে ভালবাসে তবে আবার এ প্রতিকারের কথা ওঠে কোথা হইতে? এখানে কি জোর করিয়া কিছু করিবার আছে?

অমলিন নিবিড় আলিঙ্গনে চিত্রাকে জড়াইয়া বলে, "চিত্রা তুমি আমাকে তোমার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করো না তাহলে আমার আর কিছুই থাকবে না।"

"কি যে বলো।" চিত্রা স্বামীর কাছে আপনাকে সমর্পণ করিয়া দেয়।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, অমলিন অঘোরে ঘুমাইতেছে। চিত্রার চোখে ঘুম নাই। অসহনীয় পুলকে তাহার সারা দেহ মন অনুরনিত হইয়া উঠিয়াছে। কতদিন—কতদিন পর সে আবার অমলিনকে ফিরিয়া পাইয়াছে।

ঘুমের ঘোরে অমলিন চিত্রাকে আকর্ষণ ক[illegible] বলে,

"মণিকা তুমি এতদিন পর এলে?" একটু চুপ করিয়া আবার বলে, "কই চিত্রার ভেতরে তোমাকে ত পেলাম না।"

দুটি মাত্র অসংলগ্ন কথা, চিত্রার সমস্ত আনন্দ নিমিষে তড়িতাহত হইয়া গেল। তবে কি সে শুধু আর একজনের প্রতিনিধি হইয়া এই উচ্ছল চাপল্যে নিজেকে বিলাইয়া দিল! অমলিনের হাত দুখানি নিজের দেহ হইতে সরাইয়া দিয়া চিত্রা নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল। যন্ত্রণায় তাহার শিরা উপশিরাগুলি দপ দপ করিতেছে।

ময়লার গাড়ির ঘড় ঘড় শব্দ আর হোস্ পাইপের বিচিত্র আওয়াজে নিথর রাস্তা মুখর হইয়া উঠিতেছে। শহরের আকাশেও উষার বর্ণচ্ছটা আলপনা আঁকিয়া দিয়াছে। পশ্চিমদিকে পান্ডুর চাঁদ প্রায় অস্তমিত।

এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস আসিয়া চিত্রার সমস্ত শরীরে যেন প্রলেপ লাগাইয়া দিল। আকাশের ওই বর্ণ সুষমার মত হয়ত তাহার জীবন আর বাড়িয়া উঠিবে না, কিন্তু শুধু কি তাহারই—চিত্রা ভাবে, শুধু কি তাহারই? ওই যে আর একটি মানুষ দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি এমনি যন্ত্রণা নীরবে সহিয়া চলিয়াছে তাহার সহিত তুলনা করিলে কি চিত্রার বেদনা খানিকটা লঘু মনে হয় না? চিত্রার মনে পড়িতে লাগিল বিবাহের দিন হইতে এখন এই মুহূর্ত পর্যন্ত বহু খন্ড বিখন্ড ঘটনা। কত আপ্রাণ চেষ্টা অমলিন করিয়াছে জীবনকে সহজ করিবার জন্য, কিন্তু পারে নাই। আজ তারা উভয়েই এক জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঝরঝর করিয়া চিত্রা কাঁদিয়া ফেলিল।

আকাশের বর্ণসমারোহ মিলাইয়া গেছে। চোখ মুছিয়া ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল চিত্রা। অমলিন তেমনি অকাতরে ঘুমাইতেছে। তাহার ঘুমন্ত সুশ্রী মুখখানি চিত্রার কাছে বড় করুণ মনে হইল। ধীরে ধীরে সরিয়া আসিয়া অমলিনের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে চিত্রা ডাকিল, "ওঠ, চা খাবে না? অনেক বেলা হয়ে গেল যে।"

ভার্জিনিয়া উলফ

(৪৯২ পৃষ্ঠার পর)

সকল দিক দিয়া তাঁহার প্রবন্ধগুলি ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত। অতি আধুনিক সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে অনেকের এই অভিযোগ যে তাঁহারা কেবলমাত্র ঘসা মাজা ঝক্‌ঝকে কথায় পাঠকের মনে চমক লাগাইবার চেষ্টা করেন; তাঁহারা সর্বপ্রকার গভীরতা বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। ভার্জিনিয়া উল্‌ফের প্রবন্ধের দিকে চাহিলে এ অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ হয়।

উপন্যাসের ন্যায় প্রবন্ধগুলিতেও তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের একটি ছাপ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দী অথবা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের সহিত ভার্জিনিয়া উল্‌ফের প্রবন্ধের তুলনা করা চলে না, কেন না তাঁহার দর্শনভঙ্গি ভিক্টোরিয়ানদের দর্শনভঙ্গির ঠিক বিপরীত। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়গুলিকে তিনি ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে এক করিয়া লইয়াছেন, যাহার ফলে সকল প্রবন্ধেই তাঁহার অন্তরের একটি নিবিড় স্পর্শ পাওয়া যায়। খোলাখুলিভাবে তিনি সব কথা বলেন নাই, পাঠককে ভাবিয়া লইবার অবকাশ দিয়াছেন।

ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ আমাদের সমসাময়িক, তাই তাঁহার সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি না। কেননা যে ব্যক্তিকে অতি নিকট হইতে দেখা যায় তাহার সম্পর্কে নিরপেক্ষ সমালোচনা করা সম্ভব হয় না, ব্যক্তিগত ভাবের আধিক্যে সে সমালোচনা পক্ষপাত দোষে দুষ্ট না হইয়া পারে না। দেখা যায়, কোন নূতন বই লইয়া যেরূপ তর্কবিতর্ক চলে পুরানো বই লইয়া ততটা চলে না। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ সম্বন্ধে আমরা আজ যাহাই বলি না কেন তাহা ভবিষ্যতে হয়ত টিকিবে না। তবুও আমাদের ভাল লাগা এবং অভিমতকে অর্থহীন বলিতে পারি না; আর কাহারও কাছে তাহার মূল্য না থাকিলেও, আমাদের কাছে আছে, ইহাই বড় কথা। সেইজন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

কয়েকদিন হইল ভার্জিনিয়া উল্‌ফের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া খবর আসিয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁহার মৃত্যু সংবাদটি নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

লণ্ডন, ৩রা এপ্রিল

বিখ্যাত লেখিকা মিসেস ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ সাসেক্স লিউয়েসএর নিকট উজ নদীতে জলমগ্ন হইয়া মারা গিয়াছেন বলিয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজন আশঙ্কা করিতেছেন। তাঁহার স্বামী বলেন, "মিসেস উল্‌ফের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তিনি শুক্রবারে একটি চিঠি লিখিয়া রাখিয়া বেড়াইতে বাহির হন। তিনি জলমগ্ন হইয়াছেন বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। তবে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া যায় নাই।"

ভার্জিনিয়া উল্‌ফের মৃত্যুতে 'ব্লুম্‌সবেরি স্কুল' তাহার একমাত্র মহিলা সাহিত্যিককে হারাইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে পৃথিবীও কি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক হারায় নাই?

এ কথার পর মিসেস্ ঘোষাল আর অনুরোধ না করিয়া বলিল, "আচ্ছা, তাই ভাল। সুবিধা মত একদিন আপনাকে নিয়ে যাব।"

মিসেস্ ঘোষাল এবং লাবণ্য প্রস্থান করিবামাত্র যত শীঘ্র সম্ভব সরিয়া পড়িয়া অবনীশের সহিত মিলিত হইবার জন্য সুলেখা ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মাত্র মিনিট পাঁচেক পূর্বে মিসেস্ ঘোষালের নিকট লতিকা এবং বসুধার সহিত আলাপ পরিচয় করিবার যে অজুহাত সে করিয়াছিল, বোধ করি তাহার কথা একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছে। এক সময়ে বসুধাকে একান্তে পাইয়া সে বলিল, "আমি এখানে থাক্‌লে তোমার বউদিদি শুতে না পেয়ে মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন বসুধা,—আজ এখন চললাম—শীঘ্র আবার আসব।" এবং ঠিক সেইরূপ একটা সুযোগে লতিকাকে বলিল, "আমি এখন না গেলে বসুধা পড়তে বসতে পারছে না। এবার যখন আসব, বিকেলের দিকে আসব; তা হ'লে আর ওর পড়ার ক্ষতি হবে না।" তাহার পর লতিকা এবং বসুধা দুইজনের মধ্যে কাহাকেও ঠিক সন্তুষ্ট না করিয়া, এবং উভয়কেই খানিকটা ক্ষুব্ধ এবং বিস্মিত করিয়া, দীপালির হাত ধরিয়া গাড়িতে গিয়া উঠিল।

গেট অতিক্রম করিয়া রাজপথে পড়িতেই পিছন হইতে সুলেখা ডাকিল, "গৌরহরিবাবু!"

অবনীশ বলিল, "আদেশ করুন সুলেখা দেবী।"

"আর ত পেরে উঠছিনে মশাই, অসহ্য হয়েছে আমার পক্ষে!"

মুহূর্তের জন্য পিছন ফিরিয়া ভ্রূকুটির দ্বারা সুলেখাকে তিরস্কৃত করিয়া অবনীশ বলিল, "অনুগ্রহপূর্বক অসমীচীনতা করবেন না। উপলব্ধি শক্তির বিষয়ে অপরিণত বয়স্কদের আমরা যতটা অপরিণত মনে করি, সব সময়ে তারা ততটা অপরিণত না হ'তেও পারে।"

অবনীশের এই সুকঠিন ভাষা ব্যবহার করার উদ্দেশ্য যে পাঁচ বৎসর বয়সের দীপালির অর্থোপলব্ধির শক্তিকে ব্যাহত করা, তাহা বুঝিতে পারিয়া সুলেখা বলিল, "অসমীচীনতা সংশোধিত ক'রে নিচ্ছি।" তাহার পর পার্শ্বোপবিষ্টা দীপালির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ডাকিল, "দীপু!"

"কি মাসিমা?"

"কি আমার অসহ্য হয়েছে তা তুমি জান?"

'অসহ্য' কথার অর্থ খুব সম্ভবত না বুঝিয়াই দীপালি বলিল, "না, জানিনে ত।"

সুলেখা বলিল, "তোমাদের দেশের এই ভয়ানক শীত! গৌরহরি বাবু!"

মুখ না ফিরাইয়াই সহাস্যমুখে অবনীশ বলিল, "আদেশ করুন।"

"হাড়ে হাড়ে আমার কন্‌কনানি ধরেছে। শীঘ্র এর যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন।"

অবনীশ বলিল, "আমার কিন্তু ঠিক বিপরীত সুলেখা দেবী। এই দারুণ শীতেও আমার দেহ উত্তপ্ত হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু আমার দেহ থেকে আপনার দেহে খানিকটা যে উত্তাপ সঞ্চারিত করি, আপাতত তার কোন উপায় ত দেখতে পাচ্ছিনে।"

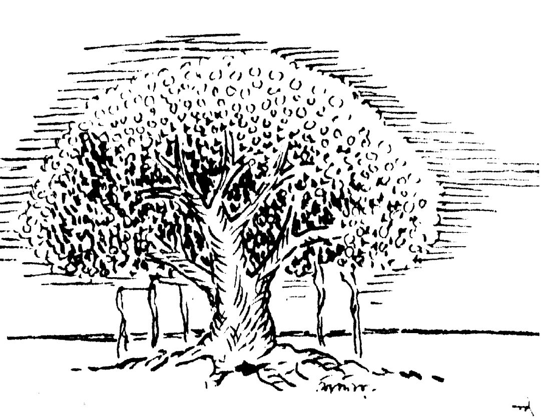
অবনীশের কথা শুনিয়া সপুলক হাস্যে সুলেখার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; বলিল, "না, সে ব্যবস্থা ক'রে এখন কাজ নেই; অন্য আর-কিছু করুন।"

অবনীশ বলিল, "তা হ'লে বাড়ি চলুন, ঘরের মধ্যে ঢেকেঢুকে বসবেন।"

সুলেখা বলিল, "মোটেই না! ঘরের মধ্যে বিষম কন্‌কনানি! তার চেয়ে এমন একটা নির্জন ফাঁকা জায়গায় চলুন, যেখানে একটু রোদ পোয়ানো যায়। রোদ পোয়ালে শরীরটা একটু গরম হবে।"

"সে কথা মন্দ নয়।" বলিয়া সেইরূপ সুবিধাজনক একটা স্থানের সন্ধানে অবনীশ দ্রুতবেগে গাড়ি চালাইয়া চলিল।

(ক্রমশ)



কবিতা

এই নববর্ষ পথে এস প্রভু

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

দূর কোন্ শতাব্দীর গাঢ় ঘন দুরন্ত দুর্যোগে
যে ক্রন্দন-আর্তনাদ উঠেছিল দিগ্ দিগন্তরে,
আনন্দের লেশমাত্র ছিলনাক সর্বচিত্তলোকে,
অভিশাপদগ্ধ এই ভারতের ব্যথিত অন্তরে
যে করুণ সংগীতের অশ্রুসিন্ধু তোমারি সন্ধানে
জীবনের কূল ভাঙি ছুটেছিল চঞ্চল পবনে
বর্ষার বর্ষণ সাথে সংসারের শতদিক পানে,
মহাকাল ভুজঙ্গের অবিশ্রান্ত নিষ্ঠুর দংশনে,
যে বেদনা মরণের আবাহন করেছে হতাশে,—
তাহাদের সবাকারে বক্ষে নিয়া পাষাণ কারায়
হে অরূপ নব রূপে জন্ম নিলে মায়াবন্ধ পাশে
যেথা কাঁপে ক্ষিতিতল শাসিতার শোণিত ধারায়।

অবিচার, অত্যাচার, অন্যায়ের ভীষণ ভ্রূকুটি
পাপের পতাকা বহি' জনারণ্যে আনিল যেদিন
মরণের আর্তনাদ—শান্তি গেল বিশ্ব হ'তে টুটি
ঊষার উদয়লক্ষ্মী কালগর্ভে রক্তস্রোতে লীন,
কংসের করাল মূর্তি উদ্দীপিত পীড়ন উল্লাসে
হিংসারথচক্রে তার নিষ্পেষিত দুর্বল মানব,
ধ্বংসের বিজয়ধ্বজা গর্বোদ্ধত আনন্দ উচ্ছ্বাসে
এনেছিল অভিযান ধরণীতে দুরন্ত দানব
স্রষ্টার বিরুদ্ধে য'বে চূর্ণ করি তীব্র পদাঘাতে—
সত্যশিব সুন্দরের অবদান, মানব সংসার
গ্রাসিতে উদ্যত য'বে ধরণীরে রুদ্র আঁখিপাতে
এসেছিলে সেইক্ষণে দানবেরে করিতে সংহার।

তোমার জীবন-কাব্য বন্দিনীর বক্ষে ধীরে ধীরে
রূপচ্ছন্দে নৃত্য করি' উন্মেষিত শৃঙ্খল বন্ধনে।
তোমার জীবন-কাব্য পুষ্পায়িত যমুনার তীরে,
সে কাব্যের পূর্ণ রূপ উদ্ভাসিত যুগসন্ধিক্ষণে
ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে,—হে জ্যোতিষ্ক! তোমারি মহিমা
নির্বীর্য জাতির শিরে জাগাইল যে ভীষণ শক্তি,
তাহারি স্পন্দনে নব ভারতের বিলুপ্ত গরিমা
আসিল ফিরিয়া পুন, যোগৈশ্বর্যে জাগিল আসক্তি।

হে পার্থ সারথী!—
সে নহে ক্রন্দন-ভরা ক্লীবতার মৌন হতাশ্বাস,
ভাগবত ছন্দে গাথা লীলায়িত জ্ঞানকর্মযোগ;
সুস্পষ্ট কর্তব্য লাগি আত্মদানে দৃঢ় অভিলাষ
শোণিত লালিমা ঢালি শৌর্য বীর্য করিতে সম্ভোগ।

দানবীয় শক্তিময় ক্ষাত্রশক্তি— পাপের প্রতীক,
তাই তুমি নিঃক্ষাত্রিয় করে গেছ হে পার্থ সারথি!
ব্রাহ্মণের মদগর্ব উপেক্ষিয়া দুর্বার নির্ভীক,
শ্রীভাগবদ্ গীতা তুমি করে গেছ জীবন-ভারতী।
যুগে যুগে মহাপাপ যেইদিকে রচিতেছে ব্যূহ
অধর্মের অবস্থিতি দিনে দিনে রক্ষিতে নিয়ত—
সেই ব্যূহ ভেদ করি' উদ্ভাসিয়া সত্য-সরোরুহ
তারি পরে দাঁড়ায়েছ অবিদ্যারে করিয়া নিহত।

সেই দূর শতাব্দী পথ বাহি' আমারি সম্মুখে
যে শতাব্দী আসিয়াছে অধর্মের জীবন্ত প্রতীক—
ন্যায় ধর্ম লুপ্ত করি' ছলনার বীভৎস কৌতুকে
সতীরে লাঞ্ছনা করে দেবালয়ে নিভায়ে প্রদীপ,
পৌরুষ পুরুষে নাহি, স্ত্রৈণতার নানা রঙ্গ হেরি,
বিকৃত নিষ্ঠায় দেশ দৌর্বল্যের সংকীর্তনে রহে।
বীর্যের দারিদ্র্য আজি জীবগণে রহিয়াছে ঘেরি,
পরকীয়া তত্ত্বধর্মী অতনুর ফুলধনু বহে।

মঠে মঠে তীর্থপথে দেবালয়ে হের প্রবঞ্চক
লুণ্ঠনের গৃধ্নুতায় দস্যুতার চলে সমারোহ।
জয়লোভে যশোলোভে অর্থলোভে পাপ প্রবর্ধক
করিতেছে সর্বনাশ স্বার্থতার নিদারুণ মোহে।
ভেদ দ্বন্দ্ব ঈর্ষা দ্বেষ হলাহল করিছে উদ্গার,
শীতার্ত পল্লব সম সর্বহারা কাঁদে প্রাণিগণ;
দুর্দিন দুর্যোগে প্রভু মানবেরে করিতে উদ্ধার
একবার এস তুমি—দিকে দিকে উঠিছে ক্রন্দন।

হে পার্থ সারথী!—
বর্বর সভ্যতা হ'তে মুক্তি দাও সমগ্র জাতিরে
সহস্র বন্ধনে জীব স্থবিরের সম আছে বসি'
নব যুগ প্রভাতের পথে আন দুর্যোগ রাত্তিরে,
চৈতন্যের প্রেমানন্দে চিত্তদল উঠুক বিকশি'।

ধ্বংসের মঞ্জীর বাজে আজিকার নববর্ষ পথে,
ঘুমায়ে পড়েছে শত বসন্তের মাধবী মঞ্জরী।
হে কালের অধীশ্বর! নব রূপে এস রুদ্ররথে,
শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রে সুদর্শন চক্র তব ধরি'।
ধ্বংস কর দানবীয় সভ্যতারে প্রচণ্ড আঘাতে,
মানবের দর্প চূর্ণ করিবারে এস একবার।
অভয় ভৈরব রবে এস তুমি মেঘাচ্ছন্ন রাতে
এই নববর্ষ পথে কাঁদে নিঃস্ব সমাজ-সংসার।

রঙ্গজগৎ

নাট্যনিকেতনে 'ভারতবর্ষ'

গত বুধবার ৯ই এপ্রিল যশস্বী নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নূতন নাটক 'ভারতবর্ষ' নাট্যনিকেতনে মঞ্চস্থ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র, রবি রায়, শৈলেন চৌধুরী, যোগেশ চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, রাধারাণী, ছায়া দেবী, ঊষারাণী, বীণাপাণি, নমিতা প্রভৃতি প্রধান চরিত্রগুলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

মহাযুদ্ধ কিংবা রাষ্ট্র বিপ্লব যখন কোন দেশে বা মহাদেশে দেখা যায়, তখন অপরিসীম দুঃখ কষ্ট, প্রাণহানি, ধন-সম্পত্তি, ঘরবাড়ি শুধু ধ্বংস হয় না—সমাজ জীবনের প্রচলিত রীতিনীতি ও মানব মনেও প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইউরোপের গত মহাযুদ্ধে, ফ্রান্স রাশিয়া প্রভৃতি দেশের অন্তর্বিপ্লবেও তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। বর্তমান মহাযুদ্ধেও ইউরোপের সমাজ জীবনে, রাষ্ট্রে, আদর্শে ও জীবনধারায় যে পরিবর্তন দেখা না দিয়াছে তাহা নয়, কিন্তু তাহার হিসাব নিকাশ ও সত্য রূপ পাওয়া যাইবে মহাযুদ্ধের পরে।

শচীন্দ্রনাথ এই প্রতিক্রিয়াকে মানস-পটে রাখিয়া ভারতবর্ষ নাটিকাটি রচনা করিয়াছেন। বর্তমান মহাযুদ্ধে ভারতের শিল্প, বাণিজ্য ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নিষ্ক্রিয় আন্দোলন ব্যতীত যে অপর কোন বিষয়ে কোন পরিবর্তনের সূচনা হয় নাই, তাহা বিস্মৃত হইয়া নাট্যকার ধার করা কল্পনাকে ভারতের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন।

শচীন্দ্রনাথ প্রগতিপন্থী, দৃষ্টিভঙ্গি তাঁহার প্রখর, অন্তর্দৃষ্টি তাঁহার সুগভীর, নাটক রচনার টেকনিক তাঁহার অদ্ভুত। আলোচ্য নাটকে সমস্ত কিছুই ছিল, কিন্তু নাটকটি কেন জানি না জমাট বাঁধিয়া উঠে নাই, অন্তরের অভিজাত অনুভূতিতে পরশ দিয়াও কেন জানি না তাহার সহানুভূতি পায় না। ইহার কারণ সম্ভবত নাটকের প্রাণশক্তির দুর্বলতা। অর্থাৎ নাট্যকার নাটকের প্রধান অঙ্গ কাহিনীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই বলিয়া নাটকটি অন্তরকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া শেষ পরিণতিতে লইয়া যাইতে পারে নাই।

আমরা নাটকের প্রথম দিকের অভিনয় দেখিয়া যে ধারণা লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহা এখন পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। যুদ্ধ প্রচারকার্য, সুদীর্ঘ বক্তৃতাবলী প্রভৃতি নাটক হইতে ছাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। বহু সংলাপ ও বক্তৃতা ছাঁটিয়া দেওয়ায় এবং প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত আমূল সংস্কার করায় নাটকটি দর্শনযোগ্য হইয়াছে বলা যাইতে পারে। প্রথম দিকের অভিনয় দেখিয়া যাঁহারা নিরাশ হইয়াছিলেন, আমূল সংশোধনের পর এখন দেখিলে তাঁহারা খানিকটা রসোপলব্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। নাটকের গতি অনাবশ্যক বক্তৃতা ও সংলাপে দুর্বল হইয়া পড়ে না, থামিয়াও যাইতে চায় না। শচীনবাবুর সুতীক্ষ্ণ ভাষা, ঘটনার সুনিপুণ কারুকার্য ছায়াচিত্রের মত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইয়া যায় (তৃতীয় অঙ্ক ব্যতীত)। বর্তমানে নাটকটি যে নবরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাতে আমাদের মনে হয় নাটকটি দর্শকদের আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবে। তৃতীয় অঙ্কের প্রতি যদি কর্তৃপক্ষ নির্দয় হইতে পারেন, তবে রঙ্গাবতীর্ণ



মতিমহল থিয়েটার্সের 'আহুতি' চিত্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় নবাবিষ্কৃত অভিনেত্রী শ্রীমতী প্রমীলা ত্রিবেদী। ছবিটি পরি চালনা করিতেছেন ধীরেন গাঙ্গুলী।

উচ্চাঙ্গের নাটকে পরিণত হইবে তৎবিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

অভিনয়ের দিক হইতে শৈলেন চৌধুরী, রবি রায়, ছবি বিশ্বাস, ছায়া দেবী, উষাদেবী সুঅভিনয় করিয়াছেন। নরেশ মিত্র, রাধারাণী, যোগেশ চৌধুরীর অভিনয় ভালই হইয়াছে। নৃত্য পরিকল্পনা সুন্দর, তবে হিল উঁচু জুতা পায়ে প্রাচ্য নৃত্য শ্লেষ হইলেও নিন্দনীয়। সংগীত পরিচালনা ভাল হয় নাই। পরিচালনা ভাল, প্রযোজনা মন্দ নহে। দৃশ্য পরিকল্পনা চমৎকার। বাগান বাড়ির সুন্দর দৃশ্যে, বিশেষ করিয়া বিলাত ফেরতাদের পার্টিতে যে সকল নট-নটীদের সংগ্রহ করা হইয়াছে রঙ্গমঞ্চে তাহারা অচল।

ফার্স্ট এম্পায়ারে সাহায্যাভিনয়

আপার সার্কুলার রোডস্থ প্রেমানন্দ কুষ্ঠ হাসপাতালের সাহায্যার্থে আগামী শুক্রবার ২রা মে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ফার্স্ট এম্পায়ারে বাঙলা রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ নটনটীর সম্মেলনে 'ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক রঘুবীর অভিনীত হইবে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী, সত্য মুখার্জি, শীতল পাল, শান্তি গুপ্তা, রেবা দেবী, শ্রীমতী প্রভা প্রভৃতি বিশিষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রী-বৃন্দ বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন। ইহার প্রযোজনা করিতেছেন মিঃ জে কে রায় এবং সংগঠনার ভার লইয়াছেন মিঃ বারীণ ঘোষ।

মিনার্ভা সিনেমায়—'খাজাঞ্চি'

আগামী ২৬শে এপ্রিল শনিবার হইতে পাঞ্চোলী আর্ট পিকচার্সের হিন্দী চিত্র "খাজাঞ্চি" মিনার্ভায় প্রদর্শিত হইবে। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করিয়াছেন রমলা, মনোরমা, ইসমাইল, জানকী দাস, নারঙ্গ, দুর্গা। আমরা বারান্তরে ছবিটির আলোচনা করিব।



রঞ্জিৎ মুভিটোনের "পরদেশী" চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় মিস্ খুরশিদ।

খেলাধূলা

মহারাষ্ট্র ক্রিকেট দলের পরাজয়

মহারাষ্ট্র ক্রিকেট দল ক্রিকেট মরসুমের সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত অপরাজেয় নাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি বোম্বাইতে ভারতীয় বাছাই দলের সহিত প্রদর্শনী খেলায় যোগদান করিয়া মহারাষ্ট্র ক্রিকেট দল সে ভারতীয় বাছাই দলের বিরুদ্ধে খেলিয়া তাহারা "ফলো অন" পর্যন্ত করিতে বাধ্য হইয়াছে। মহারাষ্ট্র ক্রিকেট দল যাহারা এই বৎসরের রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলায় বহু নূতন ভারতীয় রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে তাহারা ভারতীয় এক বাছাই দলের বিরুদ্ধে খেলিয়া এই শোচনীয় ফলাফল প্রদর্শন করিবে



গৌহাটী কলেজে বাৎসরিক ব্যায়াম প্রদর্শনী: প্রিন্সিপ্যাল বি সেনগুপ্ত ও পরিচালক এইচ সরকারের সহিত জিমনাষ্টিকের ছাত্রদল।

অর্জিত গৌরব রক্ষা করিতে পারে নাই। এই প্রদর্শনী খেলায় মহারাষ্ট্র দল শোচনীয়ভাবে ৯ উইকেটে পরাজিত হইয়াছে। ব্যাটিং বিষয়ে ইতিপূর্বে সকল খেলায় যেরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিল, এই প্রদর্শনী খেলায় তাহাও প্রদর্শন করা সম্ভব হয় নাই। মহারাষ্ট্র ক্রিকেট দল প্রাদেশিক দল হিসাবে শ্রেষ্ঠ হইলেও ভারতীয় শ্রেষ্ঠ দল যে নহে তাহা এই খেলায় প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা অনেকেই কল্পনা করিতে পারেন নাই। এজন্য অনেকেই খেলার ফলাফল অনেকটা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। মহারাষ্ট্র ক্রিকেট দল ভারতীয় একাদশের বিরুদ্ধে যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিল তাহা পূর্বেকার সকল খেলার তুলনায় কোন অংশে নিম্নস্তরের হয় নাই। একরূপ দুর্ভাগ্যবশতঃই তাহাদের শোচনীয় পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু এই পরাজয় খুব

অগৌরবের হয় নাই। তাহাদের পরাজয় হইয়াছে অভিজ্ঞতার নিকট। অধিকাংশ অভিজ্ঞ খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত ভারতীয় দল অধিকাংশ অনভিজ্ঞ খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত মহারাষ্ট্র দলকে পরাজিত করিয়াছে। ভারতীয় বাছাই দলের বিরুদ্ধে তাহারা যেটুকু কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে তাহাই প্রশংসনীয়।

খেলার ফলাফল :—

অবশিষ্ট ভারতীয় দল প্রথম ইনিংস—৪৮৭ রাণ।

(বিনু মানকড় ১০৫, মুস্তাক আলী ৯০, অমরনাথ ৫০, রঙ্গনেকার ১৩৫, আমীর ইলাহি ৪০; ভি হাজারী ১১৯ রাণে ৪টি, সারভাতে ৯৮ রাণে ২টি, সোহনী ৭২ রাণে ২টি ও সিন্ধি ৫৬ রাণে ১টি উইকেট পান।)

মহারাষ্ট্র প্রথম ইনিংস—৩০৮ রাণ।

(সোহনী ১০১, নিম্বলকার ৫২, হাজারী ৪০, দেওধর ৩৩; এস ব্যানার্জি ৭৩ রাণে ৪টি, বিনু মানকড় ৫৫ রাণে ২টি, সি কে নাইডু ২৬ রাণে ১টি, আমীর ইলাহি ৬৪ রাণে ১টি ও সৈয়দ আমেদ ২০ রাণে ১টি উইকেট পান।)

মহারাষ্ট্র দ্বিতীয় ইনিংস—২৯৫ রাণ।

(নিম্বলকার ৭৩, দেওধর ৬৯, যাদব ৩৯, গোখেল ২২; এস ব্যানার্জি ৬৯ রাণে ৬টি, আমীর ইলাহি ৮১ রাণে ২টি ও সৈয়দ আমেদ ৫১ রাণে ২টি উইকেট পান।)

অবশিষ্ট ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংস—(১ উইঃ) ১১৯ রাণ।

(বিনু মানকড় নট আউট ৫৩, মুস্তাক নট আউট ৫৪ রাণ; সিন্ধি ৩১ রাণে ১টি উইকেট পান।)

(মহারাষ্ট্র দল ৯ উইকেটে পরাজিত।)

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা

ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের প্রচেষ্টায় এই বৎসর সর্বপ্রথম আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন এই প্রতিযোগিতার জন্য এসোসিয়েশনের সভাপতি পরলোকগত সন্তোষের রাজার নামে একটি শীল্ড প্রদান করিয়াছেন। আগামী মে মাসের মধ্যভাগ হইতে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে। বিভিন্ন প্রদেশের ফুটবল দলকে বিভিন্ন ৪টি বিভাগীয় বা জোন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে হইবে। এই সকল জোন প্রতিযোগিতায় যাঁহারা বিজয়ী হইবেন তাঁহাদের লইয়া সেমি-ফাইনাল ও ফাইনাল খেলা হইবে। একটি সেমিফাইনাল খেলা দিল্লীতে অপর সেমিফাইনাল খেলাটি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইবে। ফাইনাল খেলা কলিকাতায় হইবে। এই প্রতিযোগিতা পরিচালনা করিবার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হইয়াছে। বিভিন্ন বিভাগীয় বা জোন প্রতিযোগিতা পরিচালনা করিবার জন্য নিম্নলিখিত চারিজন সভ্যের উপর ভার দেওয়া হইয়াছেঃ—"এ" জোন পরিচালনা করিবেন মিঃ সফী, "বি" জোন পরিচালনা করিবেন ক্যাপ্টেন আনোয়ার, "সি" জোন মিঃ মৈনুল হক ও "ডি" জোন পরিচালনা করিবেন মিঃ মূর্ত্তী রাও।

এই প্রতিযোগিতায় দশটি দল যোগদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তালিকা প্রস্তুত করা হইবে। কোন দল কোন বিভাগীয় বা জোন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—

"এ" জোনঃ—উত্তর পশ্চিম ভারত ফুটবল দল।

"বি" জোনঃ—দিল্লী ফুটবল এসোসিয়েশন, যুক্তপ্রদেশ ফুটবল এসোসিয়েশন ও রাজপুতানা ফুটবল এসোসিয়েশন।

"সি" জোনঃ—ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন, ঢাকা স্পোর্টিং এসোসিয়েশন ও বিহার অলিম্পিক এসোসিয়েশন।

"ডি" জোনঃ—মাদ্রাজ ফুটবল এসোসিয়েশন, মহীশূর ফুটবল এসোসিয়েশন ও পশ্চিম ভারত ফুটবল এসোসিয়েশন।

এতদিন হকি ও ক্রিকেট খেলার জন্য আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। ফুটবল খেলার জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন সেই অভাব দূর করিল। ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

বাঙলার কলেজে ব্যায়াম পরিচালনা

বর্তমানে বাঙলার প্রায় সকল কলেজেই ব্যায়াম চর্চা ও খেলাধূলার ব্যবস্থা হইয়াছে। মহিলা কলেজগুলিতেও ধীরে ধীরে ইহার ব্যবস্থা হইতেছে। এই সকল ব্যায়াম ব্যবস্থা ও খেলাধূলা পরিচালনা করিবার জন্য ব্যায়াম পরিচালক বা পরিচালিকাগণ নিযুক্তও হইতেছেন। ইহাতে সাধারণের ধারণা হইতে পারে যে, উচ্চ শিক্ষারত সকল ছাত্রছাত্রী ব্যায়াম বিষয় বিপুল উৎসাহী হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ বিভিন্ন কলেজে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে ব্যায়াম পরিচালক বা পরিচালিকাগণ অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রী লইয়া নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছেন। এই সকল ব্যায়াম পরিচালক বা পরিচালিকাগণকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এইরূপ অবস্থা কেন? তাঁহারা উত্তর দিবেন, "অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী এই বিষয় উদাসীন। ছাত্রছাত্রীগণের এই ঔদাসীন্য দূর করিবার যে আমরা কোন ব্যবস্থা করিব তাহারও কোন উপায় নাই। কলেজ কর্তৃপক্ষগণ আমাদের এই বিষয় সাহায্য করিতে একরূপ নারাজ। ব্যায়াম ও খেলাধূলার ব্যবস্থা আছে ইহাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট। বাধ্যতামূলক করিলে সকল ছাত্রছাত্রী যোগদান করিত কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষগণ তাহা করিতে মোটেই সাহস করেন না। সেইজন্য নিরুপায় হইয়া আমরা যে কয়েকজনকে পাইতেছি তাহাদের ব্যায়াম ও খেলাধূলা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেছি।" এই উক্তি শুনিবার পর অনেকেই বলিবেন, "কলেজ কর্তৃপক্ষগণ ঐ সকল ব্যবস্থা তুলিয়া দিলেই পারেন।" কিন্তু আমরা তাহা বলি না। কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি "ব্যবস্থা থাকিলেই উৎসাহ একদিন জাগিবেই।" তবে ইহার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষগণের কিছু সাহায্য প্রয়োজন আছে। কর্তৃপক্ষগণকে এই সকল ব্যায়াম পরিচালক ও পরিচালিকাগণ যাহাতে মাঝে মাঝে সকল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যায়াম ও খেলাধূলা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, দেশ বিদেশের ব্যায়াম চর্চা ও খেলাধূলার পুস্তকাদি কলেজে আমদানী করিতে হইবে, ব্যায়াম বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণকে মাঝে মাঝে কলেজে আনিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মুখে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, এই সকল ব্যবস্থা করিলেই অল্পদিনের মধ্যে ছাত্রছাত্রীগণের ব্যায়াম ও খেলাধূলা বিষয় উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে সে বিষয়ে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই।

বিচিত্র বার্তা

ফ্রান্সের পরাজয়ে তাদের সামনে বহু সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেইসব সমস্যার সমাধান বিশেষ প্রয়োজন। দেশের লোকসংখ্যার চরম অবস্থাই বর্তমানে এখন তাদের প্রধান সমস্যা। বৃটেন, জার্মানি, ইতালি এবং জাপানে জন্মের হার বৃদ্ধি পেয়ে মৃত্যুর হারকে অতিক্রম করেছে। কিন্তু ফরাসী-বাসী সংখ্যায় বেশী সন্তানসন্ততি পছন্দ করে না। ১৮১৫ সালে ফ্রান্স ইউরোপের একটি প্রধান জনবহুল দেশ ছিল। সেই সময়ে জনসংখ্যা ছিল ২৯,৫০০,০০০। ১৮৭০ সালে ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের সময়ে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৩৮,৩০০,০০০।

বর্তমান যুদ্ধের সময়ে ৮০,০০০,০০০ জার্মানির বিরুদ্ধে ৪১,৯০০,০০০ ফরাসী দণ্ডায়মান হয়েছিল এবং ৪৩,৩০০,০০০ ইতালির সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। ১৯৩৭ সালে ব্রিটেনের ১,২৬,০০০, জার্মানির ৪৭৮,০০০, ইতালির ৩৭৬,০০০ এবং জাপানের ৮০০,০০০ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ফ্রান্সে মৃত্যুর হার জন্মের হারকে অতিক্রম ক'রে ১২,০০০ হাজার হয়েছিল। ১৯৩৭ সালে ব্রিটেনে শিশুর জন্ম হয় ৭২৪,০০০, ইতালিতে ৯৯২,০০০, জার্মানে ১,৪১০,০০০ এবং জাপানে ২,০০০,০০০র-ও বেশী শিশুর জন্ম হয়েছিল। ঐ বৎসরে ফ্রান্সে মাত্র ৬১৬,০০০ শিশুর জন্ম হয়। ফ্রান্সের কোন কোন অঞ্চলে লোকসংখ্যা এরূপ হ্রাস পেয়েছে যে, অল্প সময়ের মধ্যে সেই অঞ্চলগুলি জনশূন্য হয়ে যাবে বলে অনেকেই আশঙ্কা করেন। কোন কোন অঞ্চলে ইতিমধ্যেই তাদের জনসংখ্যার শতকরা পঞ্চাশজন লুপ্ত হয়েছে। প্যারিস, বোরদেয়াক্স, ভূমধ্যসাগরের উপকূল অঞ্চলে এবং রোণী উপত্যকায় জন্মের হার খুবই অল্প। এ ছাড়া, কতকগুলি প্রাদেশিক শহর ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়েছে। সেই অঞ্চলের জনসাধারণ বেশীরভাগই বৃদ্ধ অথবা কিছু কিছু কাজ কর্ম করতে সক্ষম। যুবক এবং মাঝারি বয়সের লোকের সংখ্যা নেই বললেই চলে, যা আছে তাও খুব কম সংখ্যার মধ্যে।

সাধারণত ফরাসী দম্পতির জীবনে দুটি শিশুর আবির্ভাব হয়। বেশীরভাগ স্ত্রী-পুরুষেরই প্রবল ইচ্ছা, একের বেশী শিশুর জন্ম না দেওয়া। একশত বৎসর পূর্বে ফ্রান্সের প্রতি গৃহস্থে গড়পড়তা চারজন শিশুর জন্ম হ'ত। ১৮৯০ সালে সেই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে তিনজনে দাঁড়িয়েছিল। দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করাই হচ্ছে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং বহু সন্তানের জন্ম এ উদ্দেশ্যের অন্তরায় ভেবে ফরাসী দম্পতি অবৈধভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তিগত স্বার্থকে রক্ষা করতে গিয়ে জাতির বৃহৎ স্বার্থকে তারা কিভাবে খর্ব করে এসেছে, তা আজ তারা বেশ বুঝতে পেরেছে। পৃথিবীর সব থেকে বেশী বৃদ্ধালোকের শতকরা হার ফ্রান্সে বাস করে। ফ্রান্সের সমস্ত লোকসংখ্যার শতকরা ... ভাগ লোকের বয়স হচ্ছে ষাটের বেশী। ফ্রান্সে ভ্রূণ-হত্যার অপরাধে দোষীকে অন্যান্য দেশের মত ততখানি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা দেওয়া হয় না। আইনের ঔদাসীন্যের সুযোগ নিয়ে সেখানকার ব্যবসায়ী চিকিৎসকেরা অর্থের বিনিময়ে নিষ্ঠুরভাবে শিশু হত্যা দ্বারা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, ফ্রান্সের আজ যে অধঃপতন দেখা দিয়েছে, তার মূলে রয়েছে অবৈধভাবে দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা। তার ফলেই আজ দেশের জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। কঠোরভাবে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ফলে দেশের জনসংখ্যায় বৃদ্ধ-লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, কর্মঠ যুবকের সংখ্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় শোচনীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। পৃথিবীর কল্যাণকামী মাত্রেই ফ্রান্সের এই অবস্থা দেখে হতাশ হয়েছেন। ব্যক্তিগত দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করতে গিয়ে ফরাসীবাসী জাতির কিভাবে সর্বনাশ ডেকে এনেছে, তা আজ পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করবে। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অপেক্ষা সমগ্র জাতির কল্যাণই বৃহৎ। জাতির বৃহৎ কল্যাণের দিকেই যাদের দৃষ্টি প্রখর, তারাই প্রকৃত দেশহিতাকাঙ্ক্ষী।

* * * * *

একখানি বিলাতী সাময়িক পত্রিকায় সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে ঃ—

নরকে প্রবেশাধিকার

জনৈক খ্যাতনামা সাংবাদিকের এইমাত্র মৃত্যু হয়েছে। দেবদূত তাঁর অভিভাবকরূপে স্বর্গের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। স্বর্গের দ্বারে এসে সাংবাদিককে যখন ভিতরে নিয়ে যাবেন, সে সময়ে সেণ্ট পিটার বাধা দিলেন।

"পেশা?"—সামরিক কায়দায় সংক্ষেপে সেণ্ট প্রশ্ন করলেন।

'সাংবাদিক'—

"তোমার স্থান নেই!"—তিনি মুখের সামনেই সশব্দে স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ করলেন।

'আচ্ছা'—দেবদূত বললেন, এখানে কোন উপায় নেই, তবে আর একটা স্থান আছে।

'পৃথিবীতে তুমি কি করতে?'—শয়তান প্রশ্ন করলে।

'সংবাদপত্র অফিসে কাজ করতাম'—

"এখানে তোমার স্থান নেই, আমি দুঃখিত"—পিশাচ স্থির বিবেচনা করে পিটারের চেয়ে বিনীতভাবে দরজা বন্ধ করে দিলে। কিন্তু সাংবাদিকের ভিতরের সখ্যভাব খুব সহজে দমবার নয়। সেই সাংবাদিক এক লক্ষভ্রষ্ট নক্ষত্রের উপর স্থায়ীভাবে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে এক সংবাদপত্র প্রকাশ করলেন। বলা বাহুল্য এক মাসের মধ্যেই উভয় স্থানে প্রবেশলাভের জন্য তিনি 'প্রেস পাস' পেলেন।

* * * *

ইংলণ্ডের বিখ্যাত ক্রিকেটার লারউড ঘণ্টায় ৯০ মাইল বেগে উইকেটের দিকে বল নিক্ষেপ করতেন।

পুস্তক পরিচয়

কৃষক আন্দোলন ও মধ্যবিত্ত:—শ্রীসুশীল বসু। প্রকাশক—সুধীরকৃষ্ণ মিত্র, পাঁজিয়া সারস্বত পরিষদ (যশোহর)। মূল্য দশ আনা।

"কৃষক আন্দোলন ও মধ্যবিত্ত" গ্রন্থের (আকার বিবেচনা করিলে ইহাকে পুস্তিকাই বলিতে হয়, কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব ও অভিনবত্বের জন্য ইহাকে গ্রন্থ বলাই সমীচীন) লেখক শ্রীসুশীলকুমার বসু সমগ্র জাতির মধ্যে এই দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখাইতে গিয়া ঐতিহাসিক প্রগতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের পক্ষে ইতিপূর্বে কৃষক বা মজুর আন্দোলন সম্বন্ধে বাঙলা সাহিত্যে যে কয়খানি পুস্তক বাহির হইয়াছে, তাহা আদৃত হইবার বস্তু সন্দেহ নাই এবং ঐগুলিই তৎকালীন আন্দোলনের ফিলজফি বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু সে ছিল স্ট্যাটাস কো বজায় রাখিবার আন্দোলন, স্বাধীনতা লাভে সে স্বর্ণযুগ ফিরাইয়া আনা। অথচ সে সমাজ ভাঙিয়াছে, ভাঙিতেছে। কোন্ শক্তিতে এ সমাজ ভাঙিয়াছে বা ভাঙিতেছে? সমগ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর নির্ভর করিয়াছিল, তাহাতেই ইহার পুষ্টি ও বর্তমান রূপ প্রাপ্তি। কিন্তু আজ তাহা অশুভ হইয়া দেখা দিয়াছে। মধ্যবিত্ত সমাজে বা পরিবারে আজ কল্যাণ নাই, সংঘর্ষ দেখা দিয়াছে। তাহার কারণ, আজ পূর্বেকার উৎপাদন সম্পর্ক পাল্টাইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর প্রতিষ্ঠিত যে সমাজ ও সভ্যতা ছিল, তাহার উপর অপর এক শিল্পসভ্যতার প্রভাব আসিয়া ইহাকে তছনছ করিয়া ভাঙিয়াছে। পূর্বেকার সমাজ পুনঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আর নাই। কৃষকের উপার্জন আজ আর ইহাদের উদর পূর্তি করে না। তাই চতুর্দিকে জমিদারী সেরেস্তায়, উকিল ডাক্তার প্রভৃতির চেম্বারে হাহাকার উঠিয়াছে এবং কৃষক শ্রেণীর মধ্যে জমির উপর অত্যধিক মর্মন্তুদ আর্তনাদ উঠিয়াছে।

তবে কি ইহারা বিলুপ্ত হইবে? ইতিহাস সে নির্দেশ দিবে। গ্রন্থকার সুনিপুণ বিশ্লেষণের সাহায্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিটি কথার জবাব দিয়াছেন। ইহা তাহাদিগকে কেবলই চিন্তাকুল করিবে না, পথনির্দেশও করিবে। সেই দিক হইতে বইখানা একেবারে একক।

পরিশেষে বক্তব্য এই, গ্রন্থকার "মধ্যবিত্ত" শব্দটা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদের দেশে—বাঙলা দেশে—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমস্যা নগণ্য; এখানে "নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী"রই সংখ্যা প্রধান। শব্দটা বড়, কিন্তু বড় হইলেই উহাই ঠিক শব্দ।

এ পুস্তকের কেবল বহুল নহে, বাধ্যতামূলক প্রচারের আবশ্যক।

প্রবর্ত্তক:—ষড়বিংশ বর্ষ, বৈশাখ। কার্যালয়—৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রতি সংখ্যা ছয় আনা। বার্ষিক মূল্য ৪৷৷০ টাকা।

বাঙলা দেশে যে কয়খানা প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্র আছে প্রবর্ত্তক তাহার মধ্যে অন্যতম। প্রবর্তকের বিশেষত্ব হইল ভারতীয় কৃষ্টি, সভ্যতা, ধর্ম, সাহিত্য প্রভৃতির সম্বন্ধে তাহার চিন্তাশীল প্রবন্ধ-গৌরবে; নববর্ষের 'প্রবর্ত্তক' এই বৈশিষ্ট্যে সর্বতোমুখী হইয়াছে। রায় বাহাদুর শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের 'বাংলা ভাষা এবং উহার প্রচার', শ্রীযুত মতিলাল রায় মহাশয়ের 'ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য' এবং 'গলদ কোথায়' এই লেখাগুলি প্রবন্ধগৌরবে উল্লেখযোগ্য। পর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের 'যুগোস্লাভিয়া, বলকান' সময়োপযোগী লেখা, লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ইহা বিশেষভাবে উপভোগ্য হইবে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্রমপ্রকাশ্য উপন্যাসখানির পত্তন আকর্ষণীয় হইয়াছে; নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মেঘ ও স্বপ্ন'ও ক্রমপ্রকাশ্য উপন্যাস। জগদীশবাবুর ছোট গল্পটি বেশ উতরাইয়াছে। ছাপা, কাগজ, চিত্র-সম্পদে নববর্ষের 'প্রবর্ত্তক' তাহার প্রসিদ্ধি বজায় রাখিয়াছে। মাতৃক্রোড়ে সন্ন্যাসী নিমাই, শিল্পী পূর্ণচন্দ্র দত্ত চিত্রখানা আমাদিগকে সত্যই মুগ্ধ করিয়াছে। আমরা প্রবর্ত্তকের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

কিশোর বাংলা:—বৈশাখ। মাসিক পত্র। সম্পাদক—সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য। কার্যালয়—৮৯নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। প্রতি সংখ্যা ছয় আনা।

'কিশোর বাংলা'র প্রথম সংখ্যা আমরা খুব আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি। আর পড়িবার মতও হইয়াছে। প্রথমত অঙ্গসজ্জাই পড়িবার দিকে মনকে আকর্ষণ করে। তারপর লেখা যাহা যাহা সব কয়েকটিই সুন্দর এবং সরস। অরূপের 'বৈশাখী পূর্ণিমা', স্বামী প্রেমঘনানন্দের 'শিকাগোর বিবেকানন্দ', শিশুসাহিত্যের 'মধুব্রত', বিমল ঘোষের 'প্রকৃতির দেওয়া যন্ত্রগীতি', পরিমল রায়ের 'বাংলা মায়ের দুরন্ত ছেলে' লেখাগুলিতে রীতিমত মুন্সিয়ানা আছে; অর্থাৎ কিশোর-কিশোরীদের কাছে পরিবেশন করিবার মত মিষ্টত্ব আছে প্রচুর। কবি সাবিত্রীপ্রসন্নের 'কিশোর বাংলা' এবং শিবদাসের 'খোকার কল্পনা'—সুন্দর কবিতা। 'বেচারা' এবং 'ব্রাহ্মণকুমার' গল্প দুইটিও বেশ পাকা হাতের লেখা। 'নতুন বার্ত্তা', 'দেশ-বিদেশের খবর', 'ব্যবসা-বাণিজ্য', সম্পাদকীয়—অপূর্ব। 'কিশোর বাংলা' বাঙলার কিশোর-কিশোরীদের হাতে হাতে শোভা পাইবে, আমরা ইহা স্বচ্ছন্দেই বলিতে পারি।

বাঙলার ধর্ম্মগুরু:—(দ্বিতীয় খণ্ড), শ্রীরাজেন্দ্রনাথ আচার্য সংকলিত। প্রকাশক, শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত, ৫৭।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

গ্রন্থকার বাঙলা সাহিত্যে ক্ষেত্রে সুপরিচিত। 'বাঙলার ধর্ম্ম-গুরু' প্রথম খণ্ড তাহার যশকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ডে সেই প্রতিষ্ঠা অধিকতর সমৃদ্ধ হইল। মহাপুরুষদের জীবনী শুধু ঐতিহাসিক সন তারিখের মধ্যে যেমন নিবদ্ধ নয়, তেমনই ঘটনার আড়ম্বরের মধ্যেও সে জীবনের সূত্রকে ধরা যায় না। তাঁহাদের জীবনীকে বুঝিতে হইলে কতকটা সেই পথের পথিক এবং সেই ভাবের ভাবুক হইতে হয়; গ্রন্থকারের সে ভাবসম্পদ আছে; এই জন্য তাঁহার লেখায় ভক্ত এবং সাধকদের জীবনী সত্যকার মধুরতা লাভ করিয়াছে এবং এই মধুরতাই তো ইঁহাদের জীবন। প্রথম খণ্ডের চেয়ে দ্বিতীয় খণ্ডে এই মধুরতা যেন বেশী খুলিয়াছে; কারণ, গ্রন্থকার এখানে নিজের অনুকূল রসকে অধিকতর একান্ত করিয়া পাইয়াছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথায় তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। জগদ্গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, স্বামী শিবানন্দ মহারাজ, স্বামী অভেদানন্দ, দ্বিতীয় খণ্ডে এই জীবনীগুলি উজ্জ্বল, মধুর এবং অপূর্ব। সাধুকৃপালব্ধ শ্রদ্ধা, ভক্তি, অন্তর্দৃষ্টির একটা ক্ষমতা দান করিয়া তাঁহার লেখাকে সরস করিয়াছে। পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই এবং কাগজ সবই সুন্দর। বাঙলার ঘরে ঘরে এমন পুস্তকের আদর হইবে, এ কথা আমরা স্বচ্ছন্দেই বলিতে পারি।

মাটির মায়া:—শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস, এম এস-সি প্রণীত। মূল্য এক টাকা। ১৬৪নং মাণিকতলা মেন রোড হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত।

বইখানাতে বাইশটি কবিতা আছে। কবিতাগুলি পল্লীভূমির কতকগুলি চিত্র ও পল্লীজীবনের ছোট খাটো সুখ দুঃখের কথা লইয়া রচিত। লেখাগুলি আমাদের বেশ ভাল লাগিল, পল্লীজীবনের স্নিগ্ধ প্রতিবেশের মধ্যে মনকে এগুলি লইয়া যায় এবং পল্লীর সহিত প্রাণপরিচয়ের মধ্য দিয়া আনন্দের আস্বাদ লাভ হয়। দেশের জল বায়ু এবং মাটীর সঙ্গে দরদ মাখাইয়া কবিতাগুলি লেখা। উচ্চ স্তরের ভাব ঘন সাহিত্যের পদবীতে কবিতাগুলি পড়ে না, ভূমিকায় কবিশেখর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয় এই কথা বলিয়াছেন। আমরা কিন্তু মনে করি, উচ্চস্তরের ভাব ঘন সাহিত্যের মর্যাদার মূল্যের চেয়ে কবিতাগুলিতে স্নেহ এবং দরদের যে দৃষ্টি রহিয়াছে, ইহার মূল্যও কম নয়। দেশের প্রাণরসের সম্পর্ক-বিচ্যুত ফাঁকা মর্যাদার চেয়ে এদেশের জল ও মাটির দরদ মাখান এই কবিতাগুলিতে তাই আমরা মিষ্টতা পাইয়াছি। আশা করি, পাঠক-পাঠিকারা কবিতাগুলিতে বাঙলার পল্লীজীবনের আত্মীয়তার স্নেহস্পর্শটিকে লাভ করিবেন এবং প্রত্যক্ষভাবে পাইবেন একটু প্রাণে প্রাণে বাঙলা মায়ের আপ্যায়ন। বর্তমান সাহিত্যে, বিশেষত আধুনিক কবিতায় অনুকরণের আড়ম্বরের বহুল বাচালতার যুগে এই অন্তরের আবেদনটির মধুরতা সত্যই উপভোগ্য।

৮ম বর্ষ]   ২০শে বৈশাখ, শনিবার, ১৩৪৮ সাল। Saturday, 3rd May, 1941   [২৫শ সংখ্যা

দেশ

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভারতসচিবের কূটনীতি—

রবীন্দ্রনাথের "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" দেশের লোকের মধ্যে কেমন সাড়া জাগাইয়াছিল, আমাদের তাহা এখনও স্মরণ আছে। তারপরেই মনে হয় শান্তিনিকেতনে তাঁহার নববর্ষের বক্তৃতা। তিনি এই বক্তৃতায় ভারতের ব্রিটিশ নীতিকে অভ্রান্তভাষায় যেভাবে সমালোচনা করিয়াছেন, সমগ্রভাবে দেশবাসীর যে তাহা সমর্থন লাভ করিয়াছে, এ বিষয়ে কেহ কিছুমাত্র সন্দেহ করিতে পারিবে না; কিন্তু কুগ্রহের ফেরে পড়িলে সহজে মাথায় কোন সুবুদ্ধি ঢোকে না। ভারতের ব্রিটিশ নীতির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিশ্বমানব সমাজের একজন মহামনীষীর সেই সমালোচনা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজনীতিকদের মনে কিছুমাত্র সুবুদ্ধির সঞ্চার করিতে পারে নাই, ভারতসচিব আমেরীসাহেবের বক্তৃতাই সে পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ। জানি না, রবীন্দ্রনাথের সেই বক্তৃতা বিলাতে কর্তাদের কাছে পৌঁছিয়াছে কি না। আমাদের যতদূর মনে হয় পৌঁছিয়াছে, কিন্তু পৌঁছিলে কি হইবে, ঔদ্ধত্য এবং অহমিকা সকল সময়েই জ্ঞানের পরিপন্থী। ইংরেজের অতি ঘোর বিপদের কালে ভারতবাসীদের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন ভারত সচিবের মনে সেই অহমিকা এবং ঔদ্ধত্যই কাজ করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী এজন্য গভীর অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন। গান্ধীজীর এই বিবৃতিও রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, ইহা সর্ববাদীসম্মত যে, বিপদ জনসাধারণের হৃদয় কোমল করে এবং তাহাদিগকে প্রকৃত ঘটনার প্রতি অবহিত করে; কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ব্রিটেনের বিপদ মিঃ আমেরীকে সম্পূর্ণ উদাসীন রাখিয়াছে। ব্রিটিশ প্রভুদের একঘেয়ে এই বড়াইর কথা আছে যে, ভারতে তাঁহারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং ব্রিটিশ শাসনে ভারতের সমৃদ্ধি বাড়িয়াছে। ঐ ধরণের সেকেলে কথা বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ আধুনিক ভারত যে বিশ্বাস করে না, মহাত্মাজী তাহা কর্তাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, 'কয়েকশত গুণ্ডা লুণ্ঠন, নরহত্যা ও গৃহদাহ করিবার অনুকূল অবস্থা পাইলে সহস্র সহস্র লোক প্রাণভয়ে বাড়ীঘর ছাড়িয়া পলায়ন করে, এই দৃশ্য দেখা আমাদের অপেক্ষা ইংরেজদের পক্ষে অধিকতর অবমাননাকর। নামের যোগ্য যে কোন গভর্ণমেণ্টের প্রথম কর্তব্য হইল জনসাধারণকে আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দেওয়া; কিন্তু ভারতের অধিবাসীদিগকে এই প্রাথমিক হিতের জন্য বিদেশী ব্রিটিশ প্রভুদের কোন মাথাব্যথা নাই।' তবে মাথাব্যথা আছে কি জন্য? আজকাল শুনিতেছি ভারতে যাহাতে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই জন্যই নাকি ভারত সচিব প্রমুখ ভারতের ব্রিটিশ কর্ণধারদের মাথাব্যথার অন্ত নাই। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতায় এই মাথাব্যথার নিদানতত্ত্ব ভালভাবেই নির্ণীত হইয়াছে, গান্ধীজীও সে কথা বাদ দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "ভারতীয় রাজনীতিক দলসমূহ একমত হওয়া মাত্র গ্রেট ব্রিটেন সম্মিলিত ভারতের ইচ্ছায় সম্মতি দিবে, মিঃ আমেরীর বিতৃষ্ণা না জন্মা পর্যন্ত পুনঃপুন এই উক্তি করিয়া ভারতীয় মনীষার অবমাননা করিয়াছেন। আমি পুনঃপুন দেখাইয়াছি যে, ভারতীয় রাজনৈতিক দলসমূহকে মিলিত হইতে না দেওয়াই গ্রেট ব্রিটেনের চিরাচরিত নীতি ভারতীয়দের মধ্যে বিরোধের জন্য ব্রিটিশ রাজনীতিক ধুরন্ধরগণ দায়ী এবং যে পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতকে পদানত রাখিবে, সে পর্যন্ত বিরোধ বর্তমান থাকিবে।" মিঃ লাওনেল কার্টিস সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-নীতির সমালোচনা করিয়া আগেই এ কথাটা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "যতদিন পর্যন্ত এই প্রথা বিদ্যমান থাকিবে, ভারতীয়রা কিছুতেই জাতীয়তা লাভ করিতে পারিবে না। যত বেশী দিন এই প্রথা বিদ্যমান থাকিবে ততই ইহা দৃঢ় হইবে এবং পরিশেষে গৃহযুদ্ধ ব্যতীত অন্য কিছুতে উহা নিরাকৃত হইবে না। সাম্প্রদায়িক নির্বাচন নীতি প্রবর্তিত করিয়া ভারতবাসীদিগকে জাতীয়ত্বের পথে উন্নীত করার যে দায়িত্ব আমাদের উপর আপতিত হইয়াছিল আমরা তৎপ্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি।"

দেশ

ভারতবাসীরাও মানুষ—

বড় কথায় ধাপ্পা দিয়া কাজ বাগান রাজনীতির একটা প্রধান নীতি; কিন্তু এই কূটনীতিও দেশ-কাল বুঝিয়াই সার্থক হইয়া থাকে। ভারত সচিব কথার কারসাজি যতই খাটান না কেন, তাঁহাদের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদীদের মতলবটা বুঝিতে ভারতবাসীদের আর বাকী নাই; অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ সম্প্রতি এই সম্বন্ধে একটি বিবৃতিতে সে কথাটা বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন,—ভারত সচিবের এই বিবৃতিতে নৈতিক দিক হইতে ভারতে বৃটিশ নীতির ব্যর্থতাই স্বীকৃত হইয়াছে এবং যুদ্ধের লক্ষ্য সম্বন্ধে ইহা হইতে এই শোচনীয় মন্তব্যই পাওয়া যায় যে, 'ইংরেজের হাতে যেখানে ক্ষমতা আছে, সেখানে সে যুদ্ধের লক্ষ্য সম্বন্ধে ঐ সব বড় বড় কথা কার্যে পরিণত করিতে ইচ্ছুক নয়।' শুধু যে ভারতবাসীদেরই এই কথা ইহা নয়। স্যার জর্জ সুস্টার যিনি নিজে একজন সাম্রাজ্যবাদী এবং স্যার স্ট্যানলী রীড ইঁহারা পর্যন্ত ভারত সচিবের বক্তৃতা সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের সমস্যা উপযুক্তভাবে সমাধান করিবার মত সে বক্তৃতায় কিছু নাই। 'স্টেটসম্যান' পত্রের সম্পাদক মিঃ আর্থার মুর পর্যন্ত এই বক্তৃতায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। ভারত সচিবের বুঝা উচিত ছিল যে, মানুষ শুধু তাঁহারাই নহেন, ভারতের কালা আদমীরাও মানুষ এবং তাহাদের মাথায়ও মগজ আছে।

ব্যবসার ক্ষেত্রে বাঙালী—

ভারতবর্ষ শিল্প বাণিজ্যের দিক হইতে পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম স্থানীয়; আবার ভারতবর্ষের প্রদেশসমূহের মধ্যে বোম্বাই এবং বাঙলা ব্যবসা বাণিজ্যের দিক হইতে অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে উন্নত। কিন্তু বোম্বাইয়ের অবস্থা এবং বাঙলার অবস্থা, এই দুইয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। বোম্বাইয়ের ব্যবসা বাণিজ্য বোম্বাই প্রদেশবাসীদের হাতে; কিন্তু বাঙলা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে বাঙালীর স্থান অতি সামান্য। কলিকাতা ভারতের প্রধান একটি বাণিজ্যকেন্দ্র; কিন্তু এখানকার ব্যবসা বাণিজ্যের কোন মহল্লায় গেলে মনে পড়িবে বুঝি বাঙলা দেশ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছি। শুধু কলিকাতা শহরেই নয়, বাঙলার সর্বত্র ব্যবসা বাণিজ্যে বাঙলার বাহিরের লোকদের প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে এবং এইভাবে বাঙালী হইতেছে শোষিত। বঙ্গীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিতে গিয়া ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ লাহা বাঙালীদের এই দুর্গতির কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালীর পশ্চাতে পড়িয়া থাকার প্রধান কারণ এদেশের যুবকদের চাকুরীর প্রতি মোহ; কিন্তু চাকুরীর প্রতি এই মোহ বাঙালীদের মধ্যে আজও যে মজ্জাগত রহিয়াছে ইহার কারণ হইল শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত শিক্ষা ও ঐতিহ্যের অভাব। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালী কোন ঝুঁকি লইতে সাহস পায় না। বাঙলা দেশের ধনীরা নিশ্চয়তা ছাড়া অনিশ্চয়তার ক্ষেত্রে টাকা খাটাইতে ভয় পান। মামুলী কয়েকটি ধরা বাঁধা ক্ষেত্র ছাড়া নূতন নূতন ব্যবসার ক্ষেত্রে নামিবার প্রবৃত্তি বাঙালীদের মধ্যে নাই। ডাক্তার লাহা এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং তিনি নূতন কোন কথাও বলেন নাই; কিন্তু বাঙালীকে যদি জগতে টিকিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে কেবল চাকুরী করিয়া কিংবা কাঁচা মালের উৎপাদক হইলে চলিবে না, ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে তাহাদের মনের বদ্ধ সংস্কারকে ভাঙিগয়া ফেলিতে হইবে। এপথে প্রধান প্রয়োজন সরকারী প্রেরণার; কিন্তু ডাক্তার লাহা নিজেই বলিয়াছেন যে, এদেশের সরকার শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে উদাসীন; অবশ্য সরকার যে শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারের জন্য কিছু করেন নাই, একথা তিনি বলেন না; তবে এদিকে যে চেষ্টা তাঁহারা করিয়াছেন, তাহা না করারই সামিল। শিল্প বাণিজ্যের কাঁচা মাল সম্পর্কে বাঙলা অন্যান্য দেশের তুলনায় সম্পদশালী; কিন্তু বাঙালীর পেটে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই। সরকারের এ সম্বন্ধে উদাসীনতা ভাঙিগতে হইবে এবং বাঙলা দেশে শিল্প বাণিজ্যের অনুকূল আবহাওয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। বাঙলা দেশে সাধারণ শিক্ষার প্রসার হইতেছে এবং এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মফঃস্বলের নূতন চারটি কলেজ মঞ্জুরী পাইয়াছে; ভাল কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাতে বাঙালীর প্রধান সমস্যা যে অন্ন সমস্যা, তাহা মিটিবে কতটুকু। কলেজ হইতে বাহির হইয়া ছেলেরা "হা অন্ন" "হা অন্ন" করিয়াই ফিরিবে। যাহাতে বাঙালীর এই অন্নসমস্যা দূর হয়, সেজন্যই বৃত্তিকরী শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের সর্বত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। বাঙালীর এই অন্নসমস্যার প্রতীকারই প্রধান প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

স্বাধীনতা না গোলামী—

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় একজন পাকা মডারেট। উঁহারা মনে প্রাণে ব্রিটিশ রাজনীতিকদের সদাশয়তায় একান্ত বিশ্বাসী। সেদিন মাদ্রাজের এক জনসভায় এক বক্তৃতায় বলেন, "এই গুরুতর সঙ্কটকালে আমরা কংগ্রেসকর্মীদিগকে আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে, আমাদের নেতৃত্ব করিতে এবং আমাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে বলিতেছি। যাঁহারা আমাদের আস্থা এবং প্রতিনিধিত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের স্থান আজ আর কারাগারে নহে, তাঁহাদের স্থান আমাদেরই পার্শ্বে।" শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীমহাশয় বলিয়াছেন,—"আমি একজন কংগ্রেসকর্মী না হইলেও সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া আমার মনে হয় যে, বর্তমানে কংগ্রেসের বাহিরে, কংগ্রেসের ন্যায় জনসাধারণের আস্থাসম্পন্ন কোন প্রতিষ্ঠান নাই; সুতরাং কংগ্রেসকর্মীদের প্রতি একান্তভাবে আস্থাবান জনসাধারণকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁহাদের ফিরিয়া আসা এবং ক্ষমতা গ্রহণ করাই কর্তব্য।" কংগ্রেসের প্রতি তাঁহার এই শ্রদ্ধার জন্য শাস্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে, কংগ্রেসকর্মিগণ তো দেশের সেবা করিতেই চাহেন। শাস্ত্রী মহাশয় যে কথা বলিয়াছেন,—"আমরা এমন একটি বাহিনী চাই, যাহারা দেশহিতৈষণার অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া জনগণের

দেশ

সেবক ও রক্ষক হইবে। আমরা কি ইহা চাহি না এবং ইচ্ছা করি না যে দেশ হিতৈষণা ও কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত একটি বাহিনী আমাদের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত থাকিবে?" কংগ্রেসকর্মীরাও সেই কর্তব্যই প্রতিপালন করিতে উৎসুক। পুণাতে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে সেই অভিপ্রায়ই অভ্রান্তভাবে প্রকাশ করা হইয়াছিল। কিন্তু ব্রিটিশ প্রভুরা কংগ্রেসকে সে কর্তৃত্ব দিতে চাহেন না। তাঁহারা কংগ্রেসকর্মীদিগকে কোন অধিকার দিবেন না, মন্ত্রিত্বের নামে করিতে বলিবেন নিজেদেরই গোলামী। কংগ্রেস সে গোলামী করিতে রাজী হয় নাই; এইজন্য আমেরী সাহেবের দুঃখ হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ও দেখিতেছি, আমেরী সাহেবের দুঃখেই দুঃখী হইয়া বলিয়াছেন, "যদি আমাদের অনুরোধে কংগ্রেস আবার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে চাহে তাহা হইলে আমরা কি আশা করিতে পারি যে, মিঃ আমেরী ও বড়লাট তাহাতে কোনরূপ অসুবিধা বোধ না করিয়া বরং সাগ্রহে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবেন।" অর্থাৎ গোলামী মনে করিয়া যাহা ছাড়িয়াছে কংগ্রেস যদি আবার তাহা চায়, কর্তারা তাহা দিবেন না এতটা নির্দয় তাঁহারা নিশ্চয়ই নন। কিন্তু কংগ্রেস চাহে দেশের লোকের হাতে প্রকৃত অধিকার, মন্ত্রিগিরির নামে বিদেশী প্রভুদের পদলেহন নয়।

লাটভবনে নেতৃ সম্মেলন—

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য লাটভবনে যে নেতৃ সম্মেলন চলিতেছিল, তাহার সম্বন্ধে একটি সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচনার পূর্ণ বিবরণ বা সিদ্ধান্তগুলি সব ইহাতে নাই; শুধু এইটুকু আছে যে, জেলা, মহকুমা ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলির ভিত্তিতে বাঙলা দেশের সর্বত্র শান্তি সমিতিসমূহ গঠিত হইবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সদস্য লইয়া এই সমিতিগুলিকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে। গভর্নমেণ্টের পক্ষে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য দৃঢ়তা প্রদর্শন করা উচিত এবং যে কোন সম্প্রদায়ের যে কোন ব্যক্তিকে কোন বিরোধের জন্য দায়ী মনে করিলে অথবা ঐ ব্যক্তি ঐরূপ কোন কাজ করিতে যাইতেছে মনে হইলে তাহার বিরুদ্ধে গভর্নমেণ্ট যথোপযুক্ত আইন-সঙ্গত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। ইস্তাহারে দেখা গেল, সরকার আশ্রয়হীন ব্যক্তিদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছেন এবং আবাদের জন্য তাঁহারা বীজ বিতরণ করিবেন। আমাদের মতে শুধু বীজ সরবরাহই যথেষ্ট নয়, তাহাদিগকে অন্যভাবেও সাহায্য করা উচিত। দেশবাসীদের এ সম্বন্ধে কর্তব্য অবশ্যই আছে এবং যাঁহারা সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহারা সেজন্য মুক্তহস্তে সাহায্য করিবেন, আমরা এমন আশা করিতে পারি এবং বাঙলার তরুণদের উপর আমাদের বিশ্বাস আছে। কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্যালয়গুলির গ্রীষ্মাবকাশ হইবে; তরুণদের উচিত ঐ সময় এইদিকে সেবাকার্যকে সম্প্রসারিত করা। কিন্তু শুধু বীজ দিয়া সাহায্য নয়, বিপন্নদের আর্থিক সাহায্য করাও সরকারের পক্ষে কর্তব্য, এই প্রসঙ্গে আমরা সে কথাটা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। যে সব শান্তি সমিতি গঠিত হইবে, দেশের লোকদের আত্মরক্ষার জন্য সুগঠিত করাও তাহাদের কর্তব্য হওয়া উচিত। দুর্বলের প্রতি দৌরাত্ম্যের সম্ভাবনা সব সময়ই থাকে এবং আইনের কঠোরতার দ্বারা তাহা সব ক্ষেত্রে নিবারণ করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। দৌরাত্ম্য রুদ্ধ করিবার শক্তি সর্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগান দরকার।

রেলযাত্রীর অধিকার—

পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলায় সম্প্রতি একটি উল্লেখযোগ্য মামলা হইয়া গিয়াছে। মণ্টগোমারী হইতে এক ভদ্রলোক লাহোরে যাইবার জন্য ট্রেনে উঠেন। ট্রেনে উঠিয়া তিনি দেখিতে পান যে, যে কামরায় ৩৫ জন লোকের আসন আছে বলিয়া লেখা আছে, সেই কামরায় ৬২ জন যাত্রী উঠিয়া হুড়াহুড়ি করিতেছে, ভিড়ের চোটে একটি বৃদ্ধ লোকের মূর্ছা যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ভদ্রলোক তখন ট্রেনের শিকল টানিয়া ট্রেণের গতি রুদ্ধ করেন। একজন রেল-কর্মচারী ইহার ফলে সেখানে উপস্থিত হন এবং উক্ত ভদ্রলোককে অন্য ট্রেণে যাইবার জন্য পরামর্শ দিয়া চলিয়া যান। কিন্তু ভদ্রলোক নিরস্ত হইবার নহে, ট্রেন চলা সুরু করিবামাত্র তিনি আবার শিকল ধরিয়া টানিয়া ট্রেন চলা বন্ধ করেন। এবার রেলকর্মচারী আসিয়া ভদ্রলোককে অন্য গাড়ীতে তাঁহার স্থান করিয়া দিতে সম্মত হন; কিন্তু ভদ্রলোক তাহাতে সম্মত হন না। তিনি ঐ কামরাতেই অতিরিক্ত লোক লইবার প্রতিবাদস্বরূপে তৃতীয়বার শিকল টানেন। এবার পুলিশের সাহায্যে ভদ্রলোককে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তাঁহার নামে মামলা দায়ের করা হয়। মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন এবং এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, যাত্রীদের অভিযোগের যাহাতে কার্যকর প্রতীকার হয়, তাহা করিবার অধিকার প্রত্যেক যাত্রীর আছে। বিশেষভাবে, এক্ষেত্রে একজন বৃদ্ধ যাত্রীর জীবন যেখানে বিপন্ন হইয়াছিল, সেখানে এমন কার্য অসঙ্গত কিছু হয় নাই। ট্রেনে অত্যধিক রকমের লোকের ভিড়, এদেশে দৈনন্দিন ব্যাপার এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর পক্ষে এই গরমের দিনে রেলভ্রমণ যে একটা জীবনমরণ সমস্যারই সামিল ইহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। এই মামলার রায়ে রেল কর্তৃপক্ষের এদিকে কিঞ্চিৎ চৈতন্য হইবে আমরা আশা করি।

রবীন্দ্র সাহিত্যে ছোটগল্প—

গত ১৩ই বৈশাখ, শনিবার কলিকাতার বিডন স্ট্রীটস্থ ভোলানাথ ধামে কলিকাতা সাহিত্যিকার ষষ্ঠ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্বন্ধে আলোচনার জন্য সাহিত্যিকদের একটি বৈঠক বসে। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলির মধ্যে

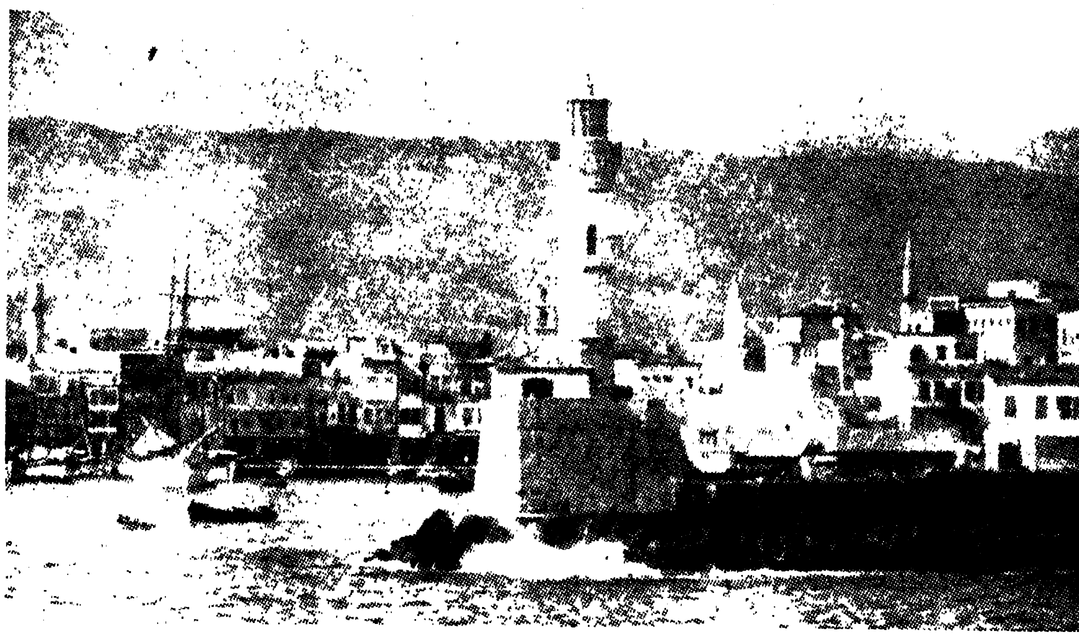
আমরা যে মাধুর্য পাই তাহার মূল কোথায়? বৈঠকের সভাপতিস্বরূপে শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সে সম্বন্ধে বলেন, রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—তিনি বাঙলাদেশের পাড়াগাঁকে যেমন করিয়া দেখিয়াছেন, বাঙলার অন্য কোন গ্রন্থকার তেমন করিয়া দেখেন নাই। কিন্তু দেখিলেই দেখা হয় না, দেখিবার মত করিয়া দেখা চাই। শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় সে কথাটা ভাঙিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রেমের কবিতা লেখেন নাই, তাঁহার গল্পের মধ্যে বাঙলাদেশের নাড়ীনক্ষত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণ দরিদ্র গৃহস্থের জীবনযাত্রাপ্রণালী, সুখদুঃখের কাহিনী যেরূপ চমৎকারভাবে রবীন্দ্রনাথ ফুটাইয়াছেন, তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিলে আমরা তাঁহার বিশ্বজনীন মনের সাক্ষাৎ পাই।' 'বিশ্বজনীন মন এই পরিভাষামূলক কথাটি সাধারণ লোকের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন, সহজ ভাষায় ইহাই হইল প্রেমের দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ গণ-সাহিত্য সৃষ্টি করিবার উপাদান সংগ্রহের কৌতূহল লইয়া বাঙলাদেশের পাড়াগাঁগুলিকে দেখেন নাই, তিনি দেখিয়াছেন প্রাণের দরদ লইয়া, কোন বিধানের বা বিচারের নির্দেশে নয়—প্রাণের গভীরতম প্রদেশের টানে বা আরও একটু বড় কথায় প্রত্যাদেশে। কোনরূপ কৃত্রিমতা এইরূপ সত্যকার দর্শন, সর্বাঙ্গীন দর্শন এবং অখণ্ড দর্শনের ক্ষমতা দান করিতে পারে না; এজন্য আবশ্যক অলঙ্করণ সংগ্রহের গরজই শুধু নয়, প্রাণের একটি স্বাভাবিক সংযোগ। এদেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে কেহ কেহ অনুকরণ প্রবৃত্তির বশে সাহিত্যকে গণসাহিত্য করিবার জন্য কতকটা 'আদেখলে'র মত পাড়াগাঁয়ের জিনিষ বাছাই করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাণের একান্ত দরদের অভাবে সেগুলিতে রস তেমন করিয়া জমে না, রসাভাস কিঞ্চিৎ হয় মাত্র। শুধু একান্ত প্রেমই মনের নিবিড় গহনে প্রবেশ করিয়া স্বরূপকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করিতে পারে। পাড়াগাঁয়ের কথা বেশী থাকিলেই 'পল্লীসাহিত্যিক' হওয়া যায় না, এক্ষেত্রে আবশ্যক প্রাণের অকৃত্রিম দরদ। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে আছে এই দরদীর দৃষ্টি, সেখানে উপদেশ নাই, আছে উপলব্ধি এবং মন প্রত্যক্ষতা ছাড়া কোন কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে না; কৃত্রিমতা বা আরোপে, অনুরোধে বা উপরোধে এই প্রত্যক্ষতাকে পাওয়া যায় না, এজন্য আবশ্যক তাপের—সহানুভূতির।

স্বাধীনতা আগে চাই—

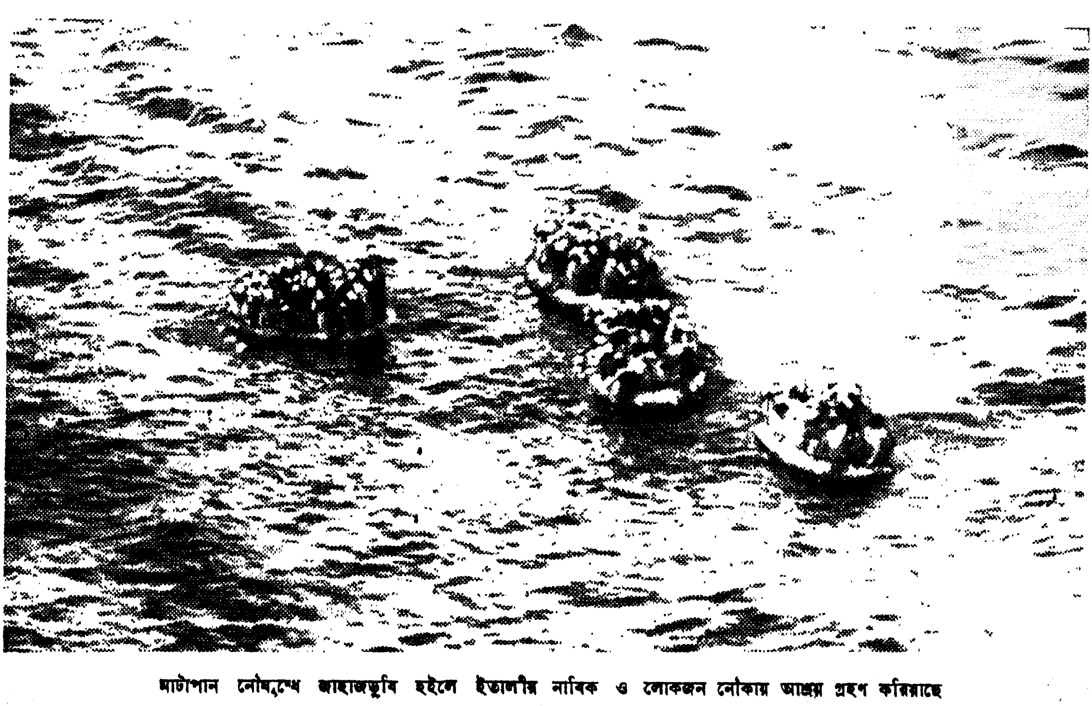
মুর্শিদাবাদ জেলা ছাত্রী সঙ্ঘের সেক্রেটারী শ্রীযুক্তা কিরণ দুগড় বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্রী সম্মেলনের সভানেতৃত্ব করেন। এই অনুষ্ঠানটির সাফল্যে আমরা অত্যন্ত আশান্বিত হইয়াছি। সভানেত্রী তাঁহার অভিভাষণে বাঙলার ছাত্রী সমাজকে যে পথ নির্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি সেই পথ ধরিয়া চলেন, বাঙলাদেশে নূতন জীবনের উদ্বোধন হইবে। সভানেত্রী শিক্ষা বিস্তারের প্রতি ছাত্রীদিগকে মনোনিবেশ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু সব নির্ভর করিতেছে দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার উপর। সভানেত্রী বলেন,—"আপনারা অন্য দেশের দিকে চাইলেই দেখতে পাচ্ছেন যে, রাষ্ট্র যতদিন আপনাদের হাতে না আসবে, স্বাধীন আমরা যতদিন না হব, নিজেদের আইন গড়ার ক্ষমতা যতদিন নিজেদের অধিকারে না বর্তাবে, ততদিন শত চেষ্টাতেও সামান্য মাত্র সংস্কার ছাড়া অন্য কিছুই সম্ভব নয়। আজ তাই প্রয়োজন হয়েছে—ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী একত্রে দাঁড়িয়ে দেশের যাঁরা সংগ্রামমুখী নেতা, তাঁদের নেতৃত্বে বিরাট একটি স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে তোলা। আর এই আন্দোলনের নেতৃত্ব বিশেষ একটি শ্রেণীর হাতে তুলে না দিয়ে যারা নিপীড়িত, যারা আমাদের দেশের নব্বুই ভাগ সেই সর্বহারার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। আমরা চাই রাষ্ট্রের অধিকার, চাই স্বাধীনতা, চাই সমাজ-ব্যবস্থার পূর্ণ পরিবর্তন। মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনই আমাদের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রথম কর্তব্য, তবে আসতে পারে শান্তি, আসতে পারে প্রগতি।" ভারতের বর্তমান দুর্গতির প্রধান কারণই হইল নারী সমাজের মধ্যে শিক্ষার অভাব, নারীর স্বাধীনতার অভাব, এক কথায় নারীর মর্যাদার প্রতি উপেক্ষা; বাঙলার ছাত্রীসমাজ এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করুন, সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বাঙলার এই নারী জাগরণের উপর একান্তভাবে নির্ভর করিতেছে।

দুর্নীতি নিবারণ ও নারীরক্ষা—

নিখিল বঙ্গ নারী সঙ্ঘের নবম বার্ষিক সভায় দুর্নীতি নিবারণ এবং নারী নিগ্রহের প্রতীকারের জন্য কঠোরতর বিধান অবলম্বনের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। নিখিল বঙ্গ নারী সঙ্ঘ নিগৃহীতা এবং দুর্বৃত্তদের কবল হইতে উদ্ধার-প্রাপ্তা নারীদের আশ্রয় দিবার জন্য দমদমায় একটি শিল্পভবন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; কিন্তু শুধু একটি প্রতিষ্ঠান নয়, দেশের সর্বত্র এইরূপ বহু শিল্পভবন প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। আমাদের লজ্জার কথা এবং ঘৃণার কথা এই যে, এদেশে এখনও নারীহরণ এবং নারীনিগ্রহ সম্ভব হয়। নারীর প্রতি মর্যাদা-বুদ্ধিই হইল সভ্যতার মাপকাঠি; এই দিক হইতে বিচার করিলে এ সম্বন্ধে আমাদের সমাজের দৈন্য, দুর্বলতা, ভীরুতার কথা মনে জাগিয়া উঠে ও চিত্ত অবসন্ন হয়, এবং নিজেরা মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে যোগ্যতা আমাদের আছে কি না—এ সম্বন্ধে সত্যই সন্দেহ হয়। দুর্বৃত্ত গুণ্ডাদের দৌরাত্ম্যে যে দেশের নারী এখনও প্রকাশ্য দিবালোকে আশ্রয়শূন্যা হয়, নিগৃহীতা হয়, বলিতে হইবেই যে সে-দেশে পৌরুষ বলিতে কোন বস্তু নাই। এমন পৌরুষহীন হইয়াও আমরা দিনরাত আধ্যাত্মিকতার উচ্চাঙ্গের অভিনয় করিতেছি বিশ্বপ্রেম এবং অহিংসা প্রভৃতি লইয়া—ইহা লজ্জার কথা। যদি এদেশে সত্যকার মানুষ থাকিত, ফলাফলের প্রতি ভ্রূক্ষেপশূন্য হইয়া সে নারী রক্ষায় আগাইয়া যাইত, শুধু চায়ের আড্ডায় বসিয়া সে সম্বন্ধে বৈঠকী আলোচনায় সন্তুষ্ট থাকিত না।



ক্রীটের প্রধান বন্দর কানিয়া—এথেন্স হইতে গ্রীক গভর্নমেণ্ট এইখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে



মাটাপান নৌযুদ্ধে জাহাজডুবি হইলে ইতালীয় নাবিক ও লোকজন নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে

কবিতা

উভচর

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

আমার মরালগুলি চলিয়াছে মানসের পানে,
বলাকা বাঁধিয়া শূন্যে বিরচিয়া চূর্ণচন্দ্রকলা।
বর্ষে বর্ষে আসে তারা, হেথাকার নদীনালা জলা
কোন্ মর্ত্য বাসনায় তাহাদের বন্দী ক'রে আনে
দুর্দিনের নর্মলীলা ফুরালে সে সরসীর টানে
আবার ফিরিয়া তারা যায় চলি বাঁধিয়া জটলা।
এ শ্যামল বনভূমি তৃণাস্তীর্ণ সুজলা সুফলা
তাদেরে ধরিয়া আর রাখিতে পারে না এইখানে।

ধরা আর অমরার আকর্ষণ বেঁধেছে আমায়,
আগুপিছু করি তাই, স্থির নীড় কোথাও যে নাই।

আমার ঝুলনখানি দোলে শূন্যে ধায় ঊর্ধ্বলোকে
তারকার আবাহনে, আবার পাতাল পানে ধায়
কোন্ বাসুকীর টানে? কোথা মোর আছে চির ঠাঁই?
আঁধার অতলস্পর্শে কিম্বা শুভ্র ত্রিদিব আলোকে?

বিগত

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

ঝাপ্‌সা চোখের দৃষ্টি জড়ায়ে ধরে
বিগত দিনেরা করে যায় কোলাকুলিঃ
কেহ কুৎসিত মূঢ় প্রলাপের মতো
ধোঁয়ার প্রলেপে ধাঁধায় ভাবনাগুলি।
চৈত্রের রোদে পিচের রাস্তা যেন,
পায়েরে থামায় হঠাৎ উষ্ণ জ্বালা,
মনের উপরে ধারলো চাবুক হানে,
সারা পথটায় কী-দুঃস্বপ্ন ঢালা।

কেহ রাত্রির কুয়াসার তলে চাঁদ
নিবিড় তন্দ্র জড়ায়ে ধরিয়া দোলে,
তার চোখ দুটি স্বপন পাখীর ডানা
অস্ফুট দূর নীহারিকা লোকে খোলেঃ
সেখানে মনের ভাবনারা মরে থাকে
পথের নীচেতে ঠাণ্ডা আলোর পাশে,
সেই দিনটারে চোখে এনে টেনে ধরি,
ঝাপ্‌সা ক্ষণেতে ধীরে ধীরে নেমে আসে।

ভুল

শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ রায়

(১৯)

কিন্তু ঐ পিয়ানোকে উপলক্ষ করিয়া একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

পিয়ানো কিনিবার জন্য শোভা সরকারমহাশয়ের নিকট টাকা চাহিয়াছিল। তিনি তাহার মতে এমন একটা অনাবশ্যক কাজের জন্য অতগুলি টাকার দাবীকে ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিতে না পারিয়া কথাটা অমলের নিকট উপস্থিত করিলেন। কহিলেন, "আপনি ত জানেন যে, এস্টেটের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। পর পর অনেকগুলি মামলা-মোকদ্দমায় অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে। তার উপর এই বাজে কাজের জন্য এখন কি এতগুলি টাকা খরচ করা উচিত?"

পিয়ানো ক্রয় করাকে অমল নিতান্তই বাজে কাজ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিল না। তবে শোভা এতদিন পর বিশেষ করিয়া তাহার এই দুঃসময়ে কেন যে পিয়ানো ক্রয় করিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিল, সে কথাটাও সে ভাল বুঝিতে পারিল না। সে বিস্মিত হইল, কিন্তু তাহার চাইতেও বেশী বিব্রত হইল ইহাই ভাবিয়া যে, সরকারমহাশয়ের অনুরোধ-মত শোভার ইচ্ছা ও আদেশকে সে বাতিল করিয়া দিবে কেমন করিয়া। যোগেশের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠই হউক না কেন, উহা যে বন্ধুত্বের অতিরিক্ত আর কিছুই নহে এবং হাজার হইলেও শোভার তুলনায় সে যে নিশ্চয়ই বাহিরের লোক, এই কথাটা নিজের কাছে সে অস্বীকার করিতে পারিল না এবং পারিল না বলিয়াই শোভার উপর হুকুম চালাইবার প্রস্তাব শুনিয়া অনেকক্ষণ চিন্তিত গম্ভীরমুখে বসিয়া থাকিবার পর সে ধীরে ধীরে কহিল, "কিন্তু সরকারমশায়, এস্টেটের অধিকারিণী তিনি। তিনি টাকা চেয়েছেন—তা যে কাজের জন্যই হউক, আমরা তাতে বাধা দিতে যাব কোন অধিকারে?"

সরকারমহাশয় কহিলেন, "বাবু নিজের হাতে চিঠি লিখে আপনাকে অধিকার দিয়েছেন। বৌমা হাজার হলেও স্ত্রীলোক, স্বামী বর্তমানে এস্টেটের অধিকারিণী তিনি হতে পারেন না। তাঁর কেবল খোরপোষের—"

বাধা দিয়া অমল বিরক্তকণ্ঠে কহিল, "এ সব আপনি কি বলছেন সরকারমশায়? নিশ্চয়ই এ এস্টেটের মালিক তিনি। তাঁর ইচ্ছায় বাধা দিবার কোন অধিকার আমাদের নেই।"

সরকারমহাশয় প্রবীণ লোক, জমিদারির কাজে মাথার চুল পাকাইয়াছেন। একালের শিক্ষিত যুবকের স্ত্রীভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া দমিবার পাত্র তিনি নন। তবে মূর্খও তিনি নন। তাই উভয়দিক বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলেন, "কিন্তু এতগুলি টাকাও এ সময়ে কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না অমলবাবু।"

অমল একটু চিন্তা করিয়া উত্তর দিল, "সেই কথাটাই বরং আপনি বৌদি'কে বুঝিয়ে বলুন।"

কিন্তু সরকারমহাশয় ঐ প্রস্তাবে রাজী হইলেন না, এই অপ্রীতিকর কর্তব্যটি সম্পাদন করিবার জন্য অমলকেই তিনি পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন এবং শেষ পর্যন্ত অমল স্বীকৃত না হইয়া পারিল না।

...টা বলিবার জন্য অমল যখন এ ...

পড়িবার ঘরে বৈকালের চা-পর্ব সবেমাত্র সুরু হইয়াছে। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতরূপে অমলকে এ ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতে দেখিয়া শোভা ও অতীশ দুইজনেই বিস্মিত হইল।

কিন্তু তাই বলিয়া গৃহকর্ত্রীর কর্তব্যের ত্রুটি হইল না। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়া গেলে শোভা উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কহিল, "অমলবাবু যে! ইস্, কি ভাগ্যি আজ আমাদের। আসুন, আসুন; আমি ততক্ষণ আর এক প্লেট খাবার আনতে বলে আসি।"

জলযোগের পর বাজে কথা সমস্তই যখন শেষ হইয়া গেল এবং বসিয়া থাকিবার বাহ্যত কোন কারণই আর রহিল না, তখন অমল সংকোচ ভাঙিয়া আসল প্রস্তাবটির অবতারণা করিল। কহিল, "আপনি শুনছি বৌদি' পিয়ানো শিখতে চাইছেন?"

শোভা ঈষৎ একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া উত্তর দিল, "হ্যাঁ অমলবাবু, কেমন সখ হল শিখতে। ভাবছি, ওতে হয়ত সময় কাটবে ভাল।"

অমল ক্ষণকাল একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "কিন্তু সরকার-মশায় বলছিলেন, এসময় অতটা টাকা হাতছাড়া করা নাকি সংগত হবে না।"

শোভা ইঙ্গিতটি ঠিক বুঝিল কি না বলা যায় না, কিন্তু অতীশ বুঝিল এবং সে যে সমস্ত ব্যাপারটিই বুঝিতে পারিয়াছে, যেন তাহাই অমলকে বুঝাইবার জন্যই সে কন্ঠস্বরে বেশ খানিকটা বিদ্রূপ ঢালিয়া দিয়া কহিল, "তাই বুঝি আপনি মেজদি'কে বলতে এসেছেন যে, পিয়ানো কিনবার টাকা তিনি এস্টেট থেকে পাবেন না?"

অভিযোগটি মর্মান্তিক। কিন্তু উহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই বলিয়াই লজ্জায় অমলের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। সে প্রতিবাদের ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে শুষ্ককণ্ঠে যাহা বলিল তাহার বেশীরভাগ কথাই শোভা বা অতীশ কেহই শুনিতে পাইল না; কেবল এইটুকু বুঝা গেল যে, এই ব্যাপারে তাহার নিজের কোন দায়িত্ব সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেছে। একটা অপ্রীতিকর আলোচনা ও একটা অস্বস্তিকর অনুভূতির মধ্যে অসময়ে সান্ধ্যবৈঠক ভাঙিয়া গেল।

অমল চলিয়া গেলে অতীশ শোভার মুখের দিকে চাহিয়া খোঁচা দিয়া কহিল, "বেশ আছ তুমি মেজদি'—তোমার নিজের সরকারের উপর তোমার হুকুম খাটে না, অমলবাবুর মত একজন বাইরের লোক এসে তোমার উপর হুকুম চালিয়ে যায়। তোমার স্বামী ভক্তির পুরস্কার পাচ্ছ তুমি চমৎকার।"

শোভা এ মন্তব্যের কোন প্রত্যুত্তর করিল না, কিন্তু পরের দিন সরকারমহাশয়কে ডাকাইয়া আনিয়া সে স্পষ্ট ভাষায় তাহাকে জানাইয়া দিল যে, পিয়ানোর টাকা তাহার চাই-ই।

সরকারমহাশয় প্রতিবাদের মত করিয়া কহিলেন, "কিন্তু বউমা, আজকাল—"

শোভা বাধা দিয়া রুক্ষকণ্ঠে কহিল, "এর মধ্যে কোন 'কিন্তু' নেই সরকারমশায়। টাকা আমার, আমি টাকা চাইছি। এর উপর আর কথা নেই।"

কথা সত্যই চলিল না। পরম প্রভুভক্ত সরকারমহাশয় চরম অধ্যবসায়ের সঙ্গে এই হুকুমের উপরেও আপীল করিবার জন্য

লজ্জাকর আলোচনার কথা স্মরণ করিয়া অমল তাঁহার প্রস্তাব মোটে আমলেই আনিল না। বরং এই ব্যাপারে সরকারমহাশয়ের কর্মচারীসুলভ বশ্যতার পরিবর্তে স্বত্বাধিকারীর ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করিয়া সে রীতিমত বিরক্ত হইয়াই প্রয়োজনীয় টাকা অবিলম্বে শোভাকে প্রদান করিবার জন্য সরকারমহাশয়কে নিজের দায়িত্বেই আদেশ করিল।

সমস্ত ব্যাপারটি আগাগোড়া চিন্তা করিয়া অবশেষে অমল গৌরীকে কহিল, "যোগেশের সাংসারিক ব্যাপারের সংগে আমি আর কোন সম্পর্কই রাখতে চাই না।"

সকল কথা শুনিয়া গৌরীও স্বামীর প্রস্তাবে সায় দিয়া কহিল, "তাই ভাল। তুমি ওঁদের এস্টেটের ম্যানেজারি করতে গেলে শোভাদি'র সংগে প্রায়ই তোমার মতান্তর হবে। মতান্তর মনান্তরে গিয়ে পোঁছতে সময় খুব বেশী লাগে না। কি দরকার তাকে এগিয়ে আনার?"

অমল কহিল, "কেবল এস্টেটে নয়, বৌদি'র সংগেও সমস্ত সম্বন্ধ আমি চুকিয়ে দিতে চাই। এতে ঝঞ্ঝাট অনেক, বিপদের আশংকাও আছে।"

গৌরী গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "অতটা পারবে না, পারা উচিতও নয়। তিনি তোমার বন্ধুর স্ত্রী, বিপদে আপদে তুমি তাঁর পাশে গিয়ে না দাঁড়িয়ে পারবে না। তবে এস্টেটের ঝঞ্ঝাটে তুমি আর থেকো না।"

সরকারমহাশয়কে এই কথাটাই স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিবার পর অমল গৌরীকে কহিল, "নিতান্ত প্রয়োজনে বৌদি' আমায় ডেকে না পাঠালে ও-বাড়িতে আর আমি যাব না।"

ডাক যে একদিন আসিবেই, সে সম্বন্ধে অমলের সন্দেহ ছিল না। কিন্তু যে উপলক্ষে ও যে মূর্তিতে ঐ আহ্বান আসিল, তাহা অমলের সকল প্রত্যাশা, সকল আশংকা ও সকল গণনাকে একেবারে ওলোট-পালোট করিয়া দিল।

মাসছয়েক পর একদিন অপরাহ্ণে কামিনীর মা এ বাড়িতে আসিয়া গৌরী ও অমলকে একত্র করিয়া উভয়ের পায়ের উপর একেবারে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "তোমরা রাগ করে দূরে থাকলে আর ত চলে না। এদিকে সর্বনাশের যে আর কিছুই বাকী রইল না।"

আশংকায় গৌরী ও অমল উভয়ের মুখই কালিবর্ণ হইয়া গেল। অমল জিজ্ঞাসা করিল, "হয়েছে কি আগে তাই বল। যোগেশের সম্বন্ধে কোন দুঃসংবাদ আসে নি ত? না এখানে বৌদি'র কোন অসুখ—"

"না গো না", কামিনীর মা আর্তনাদ করিয়া কহিল, "হতভাগী অসুখে মরলেও যে এর চাইতে ভাল ছিল—এত বড় চাটুয্যেবংশের মানস-ভ্রমও তাতে ডুবত না। এ যে সত্য সত্যই সর্বনাশ! হতভাগী শেষে এই করলে—"

অমল বাধা দিয়া অসহিষ্ণুর মত কহিল, "অমন ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ো না। কি হয়েছে আগে খুলে বল।"

অমলের ধমক খাইয়া বুড়ী কতকটা শান্ত হইল। চক্ষু মুছিয়া প্রথমে অমলের, পরে গৌরীর ও অতঃপর পুনরায় অমলের মুখের দিকে চাহিয়া সে কহিল, "ঐ অতীশবাবু গো। বুড়ো বলে গেল ভাই—কিন্তু ভাইবোনের কোন ব্যাভারই ত আমি তাদের মধ্যে দেখি না। ছোকরা রাতদিন এই বাড়িতেই পড়ে থাকে। দিন নেই রাত নেই, সময় নেই অসময় নেই—দু'টিতে কোথায় কোথায় বেড়াতে যায়। শোবার ঘরে দোর বন্ধ করে দুপুর রাত পর্যন্ত টুংটাং বাজনা, ফিস ফিস গুজ গুজ, হাসি হুল্লোর। আমার বারণ শুনে বল্লে কি না—তুমি দূর হও। এমন ত বাপের জন্মেও—"

"চুপ কর", বলিয়া অমল সশব্দে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শুনিতে শুনিতে তাহার মুখ প্রথমে লাল ও পরে কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। সে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী-সংকেতে কামিনীর মাকে দ্বার দেখাইয়া দিয়া কহিল, "বাড়ির ঝি তুমি; তুমি এসেছ এই সব কথা আমাকে বলতে? যাও এখান থেকে,—শীগগির যাও।"

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া গৌরী কিন্তু ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি থাম। না হয় তুমি তোমার নিজের ঘরে যাও, আমি এর সংগে কথা কইছি।"

কামিনীর মাকে বিদায় করিয়া অতঃপর গৌরী যখন স্বামীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহার মুখের ভাব দেখিয়া অমলের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, যাহা গৌরী জানিতে পারিয়াছে উহাতে শংকিত হইবার কারণ যথেষ্ট আছে। কি লইয়া যে এই আশংকা, তাহা অমল মনে মনে কতকটা অনুমান করিতে পারিল বলিয়াই ঐ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার সাহস তাহার হইল না। সে কতকটা বিহ্বল কতকটা প্রত্যাশীর মত গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আসন গ্রহণ করিয়া গৌরী মৃদু গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "শুনেতে অস্বীকার করলেই সত্য মিথ্যা হয়ে যায় না, চেঁচিয়ে অস্বীকার করলেও নয়। বীরত্ব প্রকাশ পায় সত্যকে স্বীকার করে তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করার মধ্যে।"

"কি সত্য তুমি জানতে পেরেছ তাই আগে বল না শুনি," অমল অসহিষ্ণুর মত কহিল।

গৌরী যাহা শুনিয়াছিল সমস্তই খুলিয়া বলিল। উপসংহারে কহিল, "এ সমস্ত ব্যাপারে সত্য যে কি, তা নির্দিষ্ট দুটি স্ত্রী-পুরুষ ছাড়া স্বয়ং বিধাতাও বোধ করি জানতে পারেন না। বাইরের অভিব্যক্তি দেখে কামিনীর মা একটা সন্দেহ করেছে মাত্র। হয়ত এ সন্দেহ অমূলক, হয়ত অমূলক না হলেও ফিরবার এখনও সময় আছে। শোভাদি'কে ফিরাবার যে চেষ্টা তাই এখন তোমাকে করতে হবে।"

"আমাকে?" অমল বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল।

"তোমাকেই করতে হবে বৈকি!" গৌরী শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল, "যোগেশবাবু তোমার বন্ধু; তাঁর স্ত্রীর এত বড় বিপদের সময় তুমি গিয়ে তার পাশে দাঁড়াবে না ত দাঁড়াবে কে?"

"কিন্তু কি আমি করব?" অমল বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করিল।

গৌরী পূর্ববৎ শান্তকণ্ঠেই উত্তর দিল, "শোভাদি'কে গিয়ে বল যে ভুল হচ্ছে, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে; তবে এখনও সময় আছে। তাঁর কর্তব্য কলকাতা ছেড়ে দেশে ফিরে যাওয়া।"

"অসম্ভব।" অমল উত্তেজিত হইয়া কহিল, "আমি বাইরের লোক, আমি পুরুষমানুষ। আমি কি আমার বন্ধুর স্ত্রীর সংগে এই সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারি?"

"তোমাকে পারতেই হবে," গৌরী দৃঢ়স্বরে কহিল, "তিনি তোমার বন্ধুর স্ত্রী; এ তোমার কর্তব্য।"

"তুমি ক্ষেপেছ," অমল অসহিষ্ণুর মত মাথা নাড়িয়া কহিল, "কোন পুরুষ কাজ করতে পারে না।"

যুক্তিটির সারবত্তা গৌরী অস্বীকার করিতে পারিল না। তাই ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে কহিল, "তুমি না পারলে আমাকেই করতে হবে। কিন্তু তুমিও আমার সংগে চল।"

বহুদিন পরে গৌরী ও অমলকে একত্র এ বাড়িতে আসিতে দেখিয়া শোভা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে ছেলেমানুষের মত উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কহিল, "ইস্, কি ভাগ্যি আমার যে আমার

বাড়িতে আপনাদের পায়ের ধূলি পড়ল। আমি ভেবেছিলাম বুঝিবা আমাকে আপনারা ভুলেই গেছেন।"

উত্তর দিল গৌরী। শোভার হাত ধরিয়া সে কহিল, "ভুলে যে যাইনি তাই প্রমাণ করবার জন্যই এসেছি আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে—খাবার জন্য তত নয় যত গল্প করবার জন্য। যেতে হবে আপনাকে, 'না' বলতে পারবেন না।"

শোভা সহজেই সম্মত হইল, কহিল, "তা যাব। কিন্তু আজ বিনা নিমন্ত্রণেই আমার বাড়িতে আপনাদের খেতে হবে, গল্পও করতে হবে।"

সেই আর একদিনের মত সেদিনও শোভা নিজের হাতে খাবার প্রস্তুত করিল, পরম আন্তরিকতার সংগে নিজের হাতে অমল ও গৌরীকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইল। হাসি গল্প রঙ্গরহস্যের ভিতর দিয়া কোথা দিয়া যে অপরাহ্ন সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা রাত্রির অন্ধকারে মিলাইয়া গেল তাহা কেহই টের পাইল না। বিদায় লইয়া বাড়ি ফিরিবার পথে যতই গৌরী ঐ দিনের ঘটনাগুলি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল ততই তাহার মনে হইতে লাগিল যে শোভার বিরুদ্ধে যে মর্মান্তিক অভিযোগ সে শুনিতে পাইয়াছে উহা কখনই সত্য হইতে পারে না।

অথচ ঐ শোভাই পরদিন যখন অলংকারের ঐশ্বর্যে, শাড়ি ও ব্লাউজের বর্ণবিন্যাসে ও আধুনিক প্রসাধনের সৌরভ ও চাকচিক্যের ঝলক তুলিয়া অতীশকে সংগে লইয়া অমলের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন শোভার জীবনের বিরাট ব্যর্থতার সংগে তাহার আজিকার সাজসজ্জা ও হাবভাবের সামঞ্জস্য খুঁজিয়া না পাইয়া গৌরীর অন্তরে সন্দেহের একখানি কালো মেঘ কোথা হইতে যেন উড়িয়া আসিয়া দেখিতে দেখিতে ঘন হইয়া উঠিল। ভদ্রতা বজায় রাখিয়া কোন প্রকারে অতীশকে সে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল বটে, কিন্তু তাহার সম্মুখে গৌরী এক মুহূর্তও দাঁড়াইতে পারিল না। শোভার হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ সে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল।

সাদর সম্ভাষণ, জলযোগ এবং বাজে গল্প যখন শেষ হইয়া গেল এবং উভয় পক্ষেই বলিবার কোন কথাই যখন আর রহিল না তখন আপ্রাণ চেষ্টায় সাহস সঞ্চয় করিয়া গৌরী আসল কথাটির অবতারণা করিল। সাগ্রহে শোভার হাত ধরিয়া সে সনির্বন্ধকণ্ঠে কহিল, "যদি ভুল না বোঝেন শোভাদি' ত একটা কথা বলি।"

শোভা সবিস্ময়ে গৌরীর মুখের দিকে চাহিল।

গৌরী শোভার হাতখানি নিজের কোলের উপর টানিয়া লইয়া কহিল, "একাকিনী কলকাতায় কতদিন আর আপনি পড়ে থাকবেন? এদিকে যোগেশবাবুর কোন সন্ধানই ত পাওয়া যাচ্ছে না।"

প্রশ্ন শুনিয়া শোভার মুখের বিহ্বল ভাবটা কাটিয়া গেল, কিন্তু সংগে সংগে আবার সে মুখের উপর বিষাদের একখানি কালো ছায়া ভাসিয়া উঠিল। উহারই মধ্যে মুখখানি হাসিবার মত করিয়া সে উত্তর দিল, "আমার যে উপায় নেই গৌরীদি'। ফিরতে তাঁর যত বিলম্বই হউক না কেন, আমাকে যে অপেক্ষা করেই থাকতে হবে।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া গৌরী কহিল, "দেশে গিয়েও অপেক্ষা করতে পারেন। কলকাতায় যে বিপদ অনেক—এখানে চারিদিকে শত্রু।"

"কি বিপদ! কারা এখানে আমার শত্রু?" শোভা গৌরীর মন্তব্যটি বুঝিতে না পারিয়া বিহ্বলের মত জিজ্ঞাসা করিল।

গৌরী বিব্রত হইয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ এ প্রশ্নের সদুত্তর সে ভাবিয়া পাইল না। কিছু একটা বলিবার জন্যই যেন সে কহিল, শত্রু কি কম? তারা রয়েছে চারিদিকেই।"

বিহ্বলের মত আরও ক্ষণকাল গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে শোভা হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "না গৌরীদি'; আমার শত্রু কেউ নেই। মিছামিছি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন।"

কিন্তু গৌরী ঐ হাসিতে যোগ দিল না। সে গম্ভীর স্বরেই কহিল, "শত্রু কেবল বাইরেই থাকে না শোভাদি', মানুষের সব চাইতে বড় শত্রু থাকে তার মনের মধ্যে। বাইরে অনুকূল অবস্থা থাকলে ভিতরের শত্রুর আক্রমণ হয় সব চাইতে মারাত্মক। তাই আমাদের শাস্ত্রে সংযমের এত নির্দেশ, বাইরের প্রতিবেশের বিরুদ্ধে এত সব অনুশাসন।"

শোভার বিহ্বল মুখ শুষ্ক হইয়া আসিল, সে কহিল, "কি আপনি বলতে চাইছেন তা খুলে বলুন শুনি। আমি মূর্খ মেয়েমানুষ,—আপনাদের এই সব হেঁয়ালি আমি বুঝি না।"

ক্ষণকাল একটু ইতস্তত করিয়া বার দুই ঢোক গিলিয়া গৌরী কহিল, "যে অবস্থায় আপনি কলকাতায় আছেন তা নিয়ে নানা কথা উঠছে—মানে উঠতে পারে। কি দরকার দিদি মানুষের বিষাক্ত রসনাকে আক্রমণের সুযোগ দিয়ে?"

শোভার ম্লানমুখ আরও ম্লান হইয়া গেল, সে শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "কে আপনাদের কি বলেছে শুনি?"

গৌরী প্রতিবাদের ভংগীতে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না না; কেউ আমাদের কিছু বলে নি। তবু—"

"তবু কি?" শোভার কঠিনকণ্ঠে যেন দাবী বাজিয়া উঠিল।

আর একবার ঢোক গিলিয়া গৌরী মরিয়ার মত কহিল, "আমায় ভুল বুঝবেন না শোভাদি'। আপনার মঙ্গলের জন্যই বলছি যে, ঐ অতীশবাবুর সংগে আপনার যে সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে তা সহজও নয়, সুন্দরও নয়। হয়ত এই পথেই আপনার চরম বিপদ একদিন আসবে।"

শোভার মুখ চকিতে একবার লাল হইয়া তৎক্ষণাৎ একেবারে কালীবর্ণ হইয়া গেল। সে চৌকির হাতল দুইখানি দুই হাতে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "এই কথা বলবার জন্যই আজ আপনারা আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন?"

গৌরী ক্ষমা প্রার্থনার ভংগীতে কহিল, "আপনার মংগলের জন্যই—"

শোভার ওষ্ঠপ্রান্তে অদ্ভুত এক টুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমার মংগলামংগল আমি নিজেই ভাল বুঝি। আপনাদের কাছে তা আমাকে শিখতে হবে না। এখন তবে আসি? নমস্কার।" বলিয়া শোভা উত্তরের জন্য আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল।

বাহিরের ঘরে একখানি আরাম চৌকির উপরে শুইয়া অমল খবরের কাগজ পড়িতেছিল আর দূরে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া বসিয়া অতীশ পড়িবার ভংগীতে একখানা পুঁথির পাতার দিকে চাহিয়াছিল। ঝড়ের মত এই ঘরে প্রবেশ করিয়া শোভা অতীশের দিকে চাহিয়া কহিল, "চল অতীশ, আমরা যাই।"

অতীশ ও অমল দুইজনেই যুগপৎ শোভার মুখের দিকে চাহিল।

শোভা অধিকতর কঠিনকণ্ঠে কহিল, "চল অতীশ, শীগগির।" এবং বলিয়াই সে ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল। অমলের দিকে একবার সে ফিরিয়া চাহিল না। অতীশ হতবুদ্ধির মত তাহার অনুসরণ করিল।

মিনিট পাঁচেক পর গৌরী শুষ্কমুখে এ ঘরে আসিয়া স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "শোভাদি' বোধ করি রাগ করলেন। কি জানি, হয়ত বা ভাল করতে গিয়ে তার ক্ষতিই করলাম।"

অমল শুধু কহিল, "হুঁ", এবং বলিয়াই সে খবরের কাগজখানি পুনরায় মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল।

শিল্প ও শ্রমিক

শ্রীকৃষ্ণদাস চক্রবর্তী

উপক্রমণিকা

আজকাল চারিদিকেই শিল্প এবং শ্রমিক সম্বন্ধে প্রচুর আন্দোলন হইতেছে। অধুনা আমাদের জাতীয় কংগ্রেস সমগ্র ভারতে শিল্পের উন্নতির জন্য নানারূপ পরিকল্পনা করিতেছেন এবং একাধিক প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট রুষিয়ার অনুকরণে কেহ বা পাঁচ, কেহ বা দশ বৎসর ব্যাপক কর্মপ্রণালীর অবতারণা করিবেন বলিয়া আমাদিগকে ভরসা দিয়াছেন। এই সকল পরিকল্পনা কার্যত কতদূর ফলিত হইবে, তাহা বলা সুকঠিন। ইহাদের কর্ম-প্রণালীর বিশদ বিবরণ না জানা পর্যন্ত সেই বিষয়ে কোনও জল্পনা কল্পনা না করাই শ্রেয়, কারণ কংগ্রেস এবং গভর্নমেণ্ট এই দুই অনুষ্ঠানেই এমন বহু বিজ্ঞ লোক আছেন, যাঁহারা আমাদের সকল সুখ দুঃখের কথা ভাবিয়া চিন্তিয়াই কর্মপ্রণালী নির্ধারণ করিবেন এরূপ আশা আমরা করি, যদিও আশানুরূপ ফল পাওয়া অনেকটা বরাতের জোর। তবু আমরা অনেকে বিশ্বাস করি যে, যত বড় বড় লোকের হাতেই আমাদের ভবিষ্যৎ ন্যস্ত থাকুক না কেন, যে কর্মপ্রণালীর উপর আমার এবং আমার ভবিষ্যৎ বংশধর-গণের জীবিকানির্বাহের উপায় একান্তভাবে নির্ভর করে, সেই কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে আমার মনের যে কথাটি সেইটি দশজনের কাছে প্রকাশ করিবার অধিকার আমার আছে, যদিও আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইতে পারি; দশজনে আমার কথা শুনিবে কি না, সেটা তাহাদের খুসি।

আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা মোটামুটিভাবেই বলিব; সন, তারিখ ইত্যাদি খুঁটিনাটি পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আপনারা আমার সঙ্গে ঝগড়া করিবেন না। ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতির আবির্ভাব এবং প্রাদুর্ভাবের পূর্বে আমাদের এই দেশে শিল্প প্রচুর ছিল, কিন্তু বিরাট কারখানা অর্থাৎ ফ্যাক্টরী ছিল না। শিল্প প্রচুর ছিল, এই কথায় যাঁহারা ভাবিবেন যে, আমাদের শিল্পজাত দ্রব্যের কোনও অভাব ছিল না, তাঁহারা ভুল করিবেন। প্রচুর লোকেরই শিল্পজাত দ্রব্যের প্রচুর অভাব ছিল। কতিপয় ধনী রাজা-জমিদারেরই প্রাচুর্য ছিল। আমার মত সাধারণ লোকের বহু পূর্বেকার প্রপিতামহীরা যে ঢাকাই মসলিনের ঘোমটা পরিয়া বিবাহ করিতেন না, এই কথা জোর করিয়াই বলিতে পারি। মোটা সূতার মোটা কাপড়, লেপের মত কুর্তা, আর তালপাতার ছাতা এইসব অবশ্য আমাদের অনেকেরই ছিল, কিন্তু এই সকল শিল্প-জাত দ্রব্যের একটিও আমাকে কেহ আজ ব্যবহার করিবার জন্য উপহার দিলে আমি তাহার উপর অবশ্যই রুষ্ট হইব, আপনারাও হইবেন। যাঁহারা আবার সেই পুরাতন যুগে ফিরিয়া যাইতে চাহেন, সেই সকল মুষ্টিমেয় অতিমানুষদিগকে আমরা শ্রদ্ধা করিতে রাজি আছি, কিন্তু অনুকরণ করিতে রাজি নই। এটা শুধু আমার মনগড়া কথা নয়, এটা যুগধর্ম। প্রগতিশীল সভ্যতার এমন স্তরে আমরা আসিয়া পৌঁছিয়াছি যে, আমাদিগকে কানে ধরিয়া ট্রেন হইতে নামাইয়া না দেওয়া পর্যন্ত আমরা ট্রেনে চড়িবই চড়িব। গরুর গাড়িতে, এমন কি মহারাজা নলের মত সারথী-বিশিষ্ট এক্কাতেও কলিকাতা হইতে দার্জিলিং অবধি যাইতে আমি রাজী নই, আপনিও নহেন, অপর কেহও নহে।

আমাদিগকে সুখ সুবিধা দিবার এবং আমাদিগের শারীরিক পরিশ্রম এবং অবসাদ হ্রাস করিবার জন্য যেই সকল যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হইয়াছে, সেই সকল যন্ত্রপাতির উপকারিতা অস্বীকার করিলে চলিবে না। যে অস্বীকার করে, তাহাকে অক্ষম অথবা গোঁয়ার বলিতে হয়। বিজ্ঞানের দান প্রত্যেকটিই মহৎ; তাহার অপব্যবহার দূষণীয়। যেরূপ ভাতের অপব্যবহারও দূষণীয়, তাই মুড়িয়া ভাতের উপর বুদ্ধিমান লোক রাগ করেন না।

যাঁহারা বলেন, বর্তমান সভ্যতার সুখ সুবিধা পরিত্যাগ করিয়া পৌরাণিক যুগের সরল আদর্শে চলিয়া যাও, তাঁহাদের সঙ্গে ঝগড়া করিতে হইলে একখানি বই লিখিতে হয়। দৈনন্দিন জীবনের কোন্ কোন্ বিষয়ে পৌরাণিকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সরলতা অবলম্বন করিতেন, তাহা গবেষণার বিষয়। দুই একজন মুনিঋষির আদর্শ দেখাইয়া ছেলে ভুলানো মামুলি বুলি যিনি প্রয়োগ করেন, তিনি অজ্ঞ অথবা জানিয়া শুনিয়া সত্যের অপলাপ করেন। জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা মানুষের ধর্ম। আমাদের পূর্বপুরুষগণও এই বিষয়ে বিশেষ অবহিত ছিলেন। সমগ্র বেদচতুষ্টয়ে ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন আছে। পৌরাণিক সাহিত্য বিবিধ রাজধানীর ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের লোভনীয় বিশদ বিবরণে ভর্তি। বস্তুত সাংসারিকের পক্ষে প্রবৃত্তিযুক্ত ধর্মের ব্যবস্থা পুরাতন আর্যঋষিগণ সম্যক-ভাবেই করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিবার স্থান এটা নয়। সুতরাং প্রচুর অন্নের সংস্থান করা যে মানুষের ধর্ম, এই বিষয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ হইতে দুই এক লাইন উধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

> অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্ব্রতম্।
> অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্ব্রতম্।
> অন্নং বহু কুর্বীত। তদ্ব্রতম্।
> ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্ব্রতম্।
> তস্মাদ্ যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ॥

তদর্থ।

> অন্নের নিন্দা করিবে না। ইহা ব্রতস্বরূপ।
> অন্ন অগ্রাহ্য করিবে না। ইহা ব্রতস্বরূপ।
> বহু অন্নের সংস্থান করিবে। ইহা ব্রতস্বরূপ।
> কাহাকেও আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। ইহাও ব্রতস্বরূপ।
> অতএব যেই উপায়েই হউক, বহু অন্নের সংস্থান করিবে॥

খালি অন্নসংস্থান নয়, আশ্রিতকে আশ্রয় দিবার অনুরূপ অন্নের সংস্থান অবশ্যই করিতে হইবে, যেই উপায়েই হউক। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানবর্জিত হইয়া হাতপা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে কুলির অন্ন ছাড়া অন্য কোনওপ্রকার অন্নের সংস্থান হওয়া দুরূহ।

বহুল পরিমাণে অন্নের সংস্থান অর্থাৎ দুঃখ নিবারণোপ-যোগী দ্রব্যাদির সংস্থান করাই বৈজ্ঞানিকেরও ধর্ম। উপরন্তু মানুষকে দুর্বিসহ শারীরিক পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি দেওয়াও বিজ্ঞানের আদর্শ। পৌরাণিক যুগে পিরামিড্ নির্মিত হইয়াছিল স্বীকার করি, কিন্তু বড়বাজারের গাড়িটানা মহিষের মত টানিয়া টানিয়া হাজার হাজার পঞ্চাশ মণ, একশ মণ পাথরের খণ্ড দুইশত ফুট উর্ধে তুলিতে আমি হাঁড়ি হাঁড়ি পরমান্নের জন্যও রাজী নই।

শুধু শারীরিক পরিশ্রমের লাঘব করা নয়, যন্ত্রাদির সাহায্যে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি অতি অল্প সময়ে প্রস্তুত করাও বৈজ্ঞানিকের একান্ত আকাঙ্ক্ষা; উদ্দেশ্য, মানুষকে পরমার্থিক অথবা অন্যান্য সূক্ষ্ম বিষয়ে চিন্তা করিবার অবকাশ দেওয়া।

সুতরাং বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের সভ্যতার মাপকাঠি হইতেছে এই তিনটি। যথা, (১) দুঃসহ শারীরিক পরিশ্রমের লাঘব হইয়াছে কি না, (২) প্রচুর অবকাশ মিলিয়াছে কি না, (৩) অন্নের অর্থাৎ দুঃখ নিবারণোপযোগী দ্রব্যের বহুল সংস্থান হইয়াছে কি না। একাদিক্রমে এই তিন বিষয়ের আলোচনা করিব।

(ক্রমশ)

রক্তের ধারা

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার

গভীর রাত্রি। আকাশ ভরা জ্যোৎস্না ধারা। হালকা মেঘস্তবকগুলি ইতস্তত খেলিয়া বেড়াইতেছে। গঙ্গার ওপার হইতে মৃদু মন্দ হাওয়া আসিতেছে।

জয়নাল বহুক্ষণ চোখ বুজিয়া ছিল, আর পারিল না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু মুহূর্তের জন্যও ঘুম হয় নাই। কত চিন্তা, কত কথা তাহার মনে ভিড় করিয়া আসিয়াছে। যত সে ভাবিবে না বলিয়া চেষ্টা করিয়াছে ততই সারা রাজ্যের চিন্তা আসিয়া তাহাকে আকাশ-পাতাল ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথায় আসিয়া রক্ত জমিয়াছে। অজানা ভয়ে তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার মনে হইতেছে সে যেন ভুল করিতেছে। জয়নাল আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, অতি সন্তর্পণে উঠিয়া বসিল।

পাশেই চাঁপার মা অকাতরে ঘুমাইতেছে। তাহার মুখের উপর চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। চাঁপার মার উপর চোখ পড়িতেই জয়নালের বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। বেচারী!

সত্যই বেচারী। কত আশায় পুরাতন ঘর নিজের হাতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন ঘর বাঁধিয়াছিল। নূতন ঘরে আগুন জ্বালাইয়া দিতে জয়নালের প্রাণ ব্যথায় মোচড় দিয়া উঠিল।

সে পারিবে না। এ বন্ধন, এ সংসার, এ নীড়, এ সমাজ ছাড়িয়া সে যাইতে পারিবে না। কোথায় সে যাইবে? বৃহত্তর পৃথিবী কি তাহাকে আশ্রয় দিবে—মানসিক দাবানল কি শান্ত করিতে পারিবে?

চাঁপার মাকে ছাড়িয়া সে যাইতে পারিবে না। চাঁপার মা তাহাতে ভালবাসিয়াছে, তাহাকে ভালবাসিতে শিখাইয়াছে।

তাহার জন্যই চাঁপার মা ইমারত দিয়া তৈয়ারী সংসার বিনা সঙ্কোচে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। নূতন জীবন, নূতন মন লইয়া এ সংসার রচনা করিয়াছে। চাঁপার মার ত্যাগ, সেবা, আন্তরিকতা—প্রেমের উন্মাদনা সে কী করিয়া পদদলিত করিয়া যাইবে?

জয়নাল বেড়াতে হেলান দিয়া বসিল। সে উঠিতে পারিতেছে না, শরীর ও মনে শৈথিল্য নামিয়াছে।

জয়নালের মনে পড়িল—এমনি একদিন সে পালক পিতা-মাতার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছিল। কত নরহত্যা, কত অত্যাচার পীড়ন, কত লুণ্ঠন করিয়া সে আনিয়াছিল বিপুল সম্পদ। পুলিশ ও শত্রুর ভয়ে কত দিন-রজনী সে অনাহারে, অনিদ্রায় কত দুর্গম বনবনানী, নদনদী, পাহাড় পর্বত অতিক্রম করিয়াছে। লুণ্ঠিত সম্পদের কোন দিন সে হিসাব করে নাই। বিজাতীয় ক্রোধ এবং উত্তেজনাপূর্ণ লুণ্ঠনকার্য তাহাকে সর্বদা অন্যায়ের পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে যে অবসাদ, যে গ্লানি তাহাকে শ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে তাহা বর্বর পরিবেষ্টনী ও স্বার্থপর পিতামাতা রোধ করিয়াছে। তাহাকে ফিরিবার পথ দেয় নাই।

তারপর পুলিশের সঙ্গে এক প্রবল সংঘাতে সে ভীষণ জখম হইয়া যখন অকর্মণ্য হয় তখন পালক পিতা মাতা, ডাকাতদের বর্বর সংসার তাহার বোঝা বইতে অস্বীকার করে।

জয়নাল ঘুরিতে ঘুরিতে আসে কলিকাতার সহরতলীর একটি বস্তিতে। বস্তির একধারে ছিল কয়েকটি ডেরা ঘর। উহাতে বাস করিত বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারী। তাহাদের কোন জাত নাই, ধর্ম নাই—নির্দিষ্ট কোন পেশাও নাই। ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করে। যাহারা সমর্থ ও চতুর তাহারা চুরি, রাহাজানি ও পকেটমার প্রভৃতি করিয়া রোজগার করে।

জয়নাল পারে না এ সমাজের তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে। মনে হয় তাহার, যাহাদের বাঁচিবার প্রয়োজন নাই, যাহারা পৃথিবীর আবর্জনা তাহারাই শুধু দুর্বিসহ দিন-গুলিকে ফাঁকি দিবার জন্য এ শয়তানি বেসাতি খুলে। ডাকাতিতে তবু উত্তেজনা ছিল, দুঃসাহসিক রোমাঞ্চ ছিল, কিন্তু ভিক্ষা আর সুযোগমত চুরি করার মধ্যে জীবন নাই, আনন্দ নাই। মৃত ব্যক্তির না মরার ভাণ মাত্র।

জয়নাল অবিরত চলিয়াছে, চলাটাই তাহার শেষ পথ। চলতি পথে মাঝে মাঝে দাঁড়ায়। সঙ্গী নাই, সাথী নাই—কোন হিতাকাঙ্ক্ষীও নাই। সে একা, সম্পূর্ণরূপেই সে একা। কিছুতেই ভুলিতে পারে না যে, সে ভুল করিয়া এ সমাজে আসিয়াছিল। যে সভ্য সমাজ তাহাকে সর্বদা আকর্ষণ করে সে তাহারই ছিল। বিরাট একটা ভুলে সে সভ্য সমাজ হইতে বঞ্চিত হইয়া বর্বর সমাজে পতিত হইয়াছে। তাহার মাতা ছিল, পিতাও ছিল। কুৎসিত ষড়যন্ত্রে সে আজ পিতৃমাতৃর পরিচয়হীন।

এত বড় সর্বনাশ যাহারা করিল তাহারা কি বিনা শাস্তিতে রেহাই পাইবে? এর পরিণাম কি শুধু তাহার ব্যর্থ জীবন। শুধু মাত্র তাহার আত্মদানেই কি এত বড় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে? কেন সে মানিবে—নিরপরাধ হইয়া সে, কেন এত বড় অভিশাপ মাথায় লইয়া চিরকাল চলিবে?

জয়নাল এ প্রশ্নের জবাব পায় না, একের পাপে অপরের শাস্তিরও কোন প্রতিকার করিতে পারে না। তাই সে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহা তাহার জীবন নয়। দুর্বিসহ জীবনের আত্মবঞ্চনা মাত্র। যাহারা সংসারী তাহারা সংসারে বিপ্লব সৃষ্টি করে, যাহাদের সংসার নাই, কোন বন্ধন নাই তাহারা এমনিই হয়। সাধারণ মানুষের দর্পণে এদের অন্তরের ছবি প্রতিফলিত হয় না।

এমনি চলার পথেই চাঁপার মার সঙ্গে জয়নালের পরিচয় হয়। আজ তাহার বেশ স্পষ্ট মনে পড়িল, এমনি এক রাতে গঙ্গার তীরে দুজনই দুজনকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল বহুক্ষণ। তাহাদের চোখে ছিল বিস্ময়বিমুগ্ধ আবেশ, মনে ছিল কৌতুক, অচেতন উত্তেজনার পুলক আর যৌবনে ছিল অজ্ঞান মনের তাণ্ডব লীলা। তখন আকাশ [illegible]

তুলার মত শুভ্র কোমল মেঘমালা, সুনীল সমুদ্রের বহুদূরে ভাসিতেছিল নক্ষত্রপুঞ্জ; পূবাকাশে ছিল পূর্ণ চাঁদ; গাছের শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, সবুজ ধরণীর উলঙ্গ দেহে ও গঙ্গার যৌবনতরঙ্গে নামিয়াছিল গলিত রূপের মত জ্যোৎস্না-ধারা।

জয়নাল হঠাৎ সচেতন হইয়া পড়িল। ছিঃ ছিঃ! সামান্য এক পথের নারীর প্রতি তাহার এই আকস্মিক দুর্বলতা সভ্য সমাজের রীতি নয়। সে সভ্য সমাজের মানুষ, তাহার রক্তে-মাংসে সভ্যতার অণুপরমাণু।

জয়নাল আত্মসংযম করিয়া বলিল, মধু সাহার মুদী 'দোকানটা কোন্‌দিকে বলতে পার?

চাঁপার মা মৃদুহাস্যে বলিল, আমায় বলছ?

হ্যাঁ, পথ হারিয়েছি।

কোথায় যাবে?

নাম জানিনে। মুদী দোকানটা চিনি। ও দোকানের উত্তরে যে বস্তি আছে তারি একখানা ডেরায় থাকি।

নতুন এসেছ?

হা।

কোত্থেকে আসা হয়েছে?

বেড়াতে গিয়েছিলাম।

তা' নয়, বলচি ঘর কোথায়?

ঘর নেই।

বউ, ছেলেমেয়ে?

নেই।

করা হয় কি?

পায়ে হেঁটে দেশবিদেশ ঘোরা।

আরে সে ত' বুঝলাম, কিন্তু খাওয়া জোটে কি ক'রে?

ভিক্ষে।

চাঁপার মা হাসিয়া বলিল, তাই বল না বাপু। এ সোজা কথাটা বলতে এত ঢং কেন। তা'হলে আমাদের দলেরই লোক তুমি।

তুমি ভিখারিণী।

হা গো হা। অত সহজ কথাটা বুঝতে এত দেরী হয়। চল।

কোথায়?

যেখানে যেতে চেয়েছিলে। আমিও সেখানেই থাকি।

তবে ত' ভালই হ'ল।

আমার স্বামী আছে। যদিও সে বয়সের তুলনায় আমায় চেয়ে ঢের বড়, কিন্তু ভীষণ বদ্‌মেজাজী, ভারি গুণ্ডা।

জয়নাল মনে মনে হাসিল, কোন জবাব দিল না। সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

কয়েক দিনের মধ্যেই জয়নাল ও চাঁপার মার বেশ ভাব হইয়া গেল।

চাঁপার মাকে জয়নালের ভাল লাগে। তাহার মনে হয়, জীবনে সে একটি মাত্র মানুষের সন্ধান পাইয়াছে, যাহার সান্নিধ্য তাহাকে আনন্দ দেয়।

চাঁপার মা অপূর্ব সুন্দরী নয়, কিন্তু দেহ-সৌষ্ঠব ও যৌবন নিখুঁত ও পরিপূর্ণ।

চাঁপার মাকে লইয়া বহু খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। চাঁপার মার আদি ইতিহাস জানা নাই। প্রথম তাহার আত্মপ্রকাশ হয়, এক বেদের দলে। বেদের দলটি যখন পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া জনসমাজে খেলা দেখাইত, তখন চাঁপার মা ছিল খেলার প্রধান আকর্ষণ। একবার পল্লীর কয়েকটি যুবক চাঁপার মাকে অপহরণ করে। চাঁপার মার সহানুভূতি ছিল, তাই যুবকরা তাহাকে লুকাইয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল।

বেদেরা সাপ লইয়া খেলা করে, সেজন্য তাহারা সাপের মত ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাহারা পাততাড়ি গুটাইয়া চলিয়া যায়। যুবকরা ভাবে বেদেরা পাহাড়ে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু বেদেরা যায় নাই, ছদ্মবেশে চাঁপার মার অনুসন্ধান করিতেছিল। একদিন সুযোগ বুঝিয়া অতর্কিত আক্রমণ করে এবং দুইজন যুবককে খুন করিয়া চাঁপার মাকে উদ্ধার করে। তারপর এ দলকে কেহ এ অঞ্চলে আর কখনও দেখে নাই।

ইহার পর বেদের দলের সর্দারের মৃত্যুর পর নূতন সর্দার চাঁপার মাকে অধিকার সূত্রে গ্রহণ করে। নূতন সর্দারের নিকট চাঁপার মা বেশি দিন থাকিতে পারে নাই। মনসুর তাহাকে ছিনাইয়া আনে। তখন মনসুর ছিল এক ডাকাত দলের সর্দার। তাহার শৌর্যবীর্য ঐশ্বর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে চাঁপার মা তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়। এবং তাহার পরামর্শ অনুসারে একদিন গভীর রাত্রে মনসুর বেদে সর্দারকে খুন করিয়া তাহার বুক হইতে চাঁপার মাকে কাড়িয়া লইয়া যায়। বেদের দল প্রস্তুত ছিল না। ডাকাতগণ অতি সহজে বেদের দলকে পরাজিত করিয়া পলাইয়া যায়।

জয়নালের আজও মনে পড়ে, সে যখন চাঁপার মার মুখ থেকে এ সকল কথা শুনিয়াছিল, তখন আশ্চর্য কম হয় নাই; এবং তাহার আনন্দও কম হয় নাই। রোমাঞ্চময় জীবন তাহাকে আনন্দ দেয়, আকর্ষণ করে। চাঁপার মার যদি এ ইতিহাস না থাকিত, নিজের মুখে এ কাহিনী প্রাণবন্ত করিয়া বলিবার মত ক্ষমতা যদি না থাকিত, তবে হয়ত সে চাঁপার মাকে ভালবাসিতে পারিত না।

মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে চাঁপার মার সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা হইয়া যায়। জয়নালের মনে পড়ে, তখন চাঁপার মা ভারি মিশুক ছিল, মুখে তাহার হাসি আর কথা লাগিয়াই ছিল। এখন আর তেমন হাসি, তেমন কথা নাই। কেমন একটা নিস্তরঙ্গ ও থুম্‌থুমে ভাব। হয়ত চলার পথ যখন নূতন বাঁধে আটকাইয়া যাইবে, তখন তাহাকে জয় করিবার জন্য স্বতস্ফূর্তভাবে মুখে ফুটিয়া উঠিবে বাণী, অধরে আসিবে হাসির ফোয়ারা, নয়ন হইবে বাঁকা।

নিশুতি রাতে চাঁপার মা আসিত। মনসুরের কড়াকড়িতে প্রকাশ্যে আসিবার উপায় ছিল না। শাসাইয়া গিয়াছে দুজনকেই খুন করিবে বলিয়া।

জয়নাল বসিয়া থাকিতে থাকিতে এক সময় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মনসুর যেরূপ ক্ষিপ্ত হইয়াছে, চাঁপার মা আর আসিতে সাহস পাইবে না। চাঁপার মা আর আসিবে না—এ কথা ভাবিতে গিয়া জয়নাল কম বিমর্ষ হয় নাই। তাহার মন অজ্ঞাতে সর্বক্ষণ চাঁপার মার সঙ্গ কামনা করে। কতবার সে ভাবিয়াছে যে, এ যৌবনের ক্ষণিক মোহ। এ মোহ তাহাকে আনন্দ দিবে না, সুখ শান্তি দিবে না। কিন্তু অশান্ত মন কিছুতেই মানিতে চায় নাই। অতৃপ্ত যৌবনকে শুধু ক্ষুধার্ত করিয়াছে, শান্ত করিতে পারে নাই।

পায়ে আঁচড় লাগিতেই জয়নাল চমকিয়া উঠিল। বলিল, কে—কে?

চাঁপার মা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

জয়নাল বলিল, এত রাত্রে।

মড়াটা চোখ বুজে শুয়েছিল। শয়তানের বাচ্চা ত'—আমিও অত বোকা নয়, তামাকের সঙ্গে ভাঙের পাতা মিশিয়ে দিলাম। পোড়ামুখো দিব্বি নাক ডাকিয়ে ঘুম দিয়েছে।

চাঁপার মা জয়নালের বুকে মাথা এলাইয়া পুনরায় খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

জয়নাল দুই হাতে চাঁপার মার মাথাটি বুকে চাপিয়া ধরিল—কোন কথা কহিল না।

অকস্মাৎ চাঁপার মা উঠিয়া দাঁড়াইল।

চলে যাচ্ছিস? বস্।

না বসবার সময় নেই। উঠ।

কেন?

উঠ, আর দেরি করবার সময় নেই, অন্ধকার থাকতে থাকতে পালাতে হবে।

চাঁপার মা জয়নালকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া লইল। জয়নাল কোন কথাই বলিতে পারিল না। দুর্নিবার আকর্ষণে সে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া আসিল এক নূতন রাজ্যে।

আজ তাহার অতীতের সকল কথাই মনে পড়িতেছে। তাহার আশ্চর্য লাগে—সে কি করিয়া এত কাল এই সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ হইয়াছিল। একটি নারীর মধ্যে এমন কি শক্তি, এমন কি সম্পদ থাকিতে পারে, যাহার জন্য সে দীর্ঘ দুই বৎসরকাল একটি বর্বর নারীকে লইয়া এ নোংরা সমাজে বাস করিতে পারিয়াছে। সে যে সভ্য মানব—তাহার রক্তে যে সভ্য মানবের অণুপরমাণু। না, না, সে পারিবে না জীবনটাকে এমনভাবে কুৎসিত করিতে, অকারণে ধ্বংস করিতে।

জয়নাল উঠিয়া দাঁড়াইল।

চাঁপার মা তখনও নির্বিবাদে ঘুমাইতেছে। চাঁদের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছে, একেবারে শেষ হইয়া যায় নাই।

জয়নাল বাহির হইতে দরজাটা বন্ধ করিতে গিয়া মুহূর্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল। এত বড় অবিচার, এত বড় অপরাধ কি তাহার করা উচিত! তাহার জন্যই চাঁপার মা সব ছাড়িয়া আসিয়াছিল, সঙ্গে একটি পয়সাও আনে নাই। অতীতের সব কিছুই সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছিল।

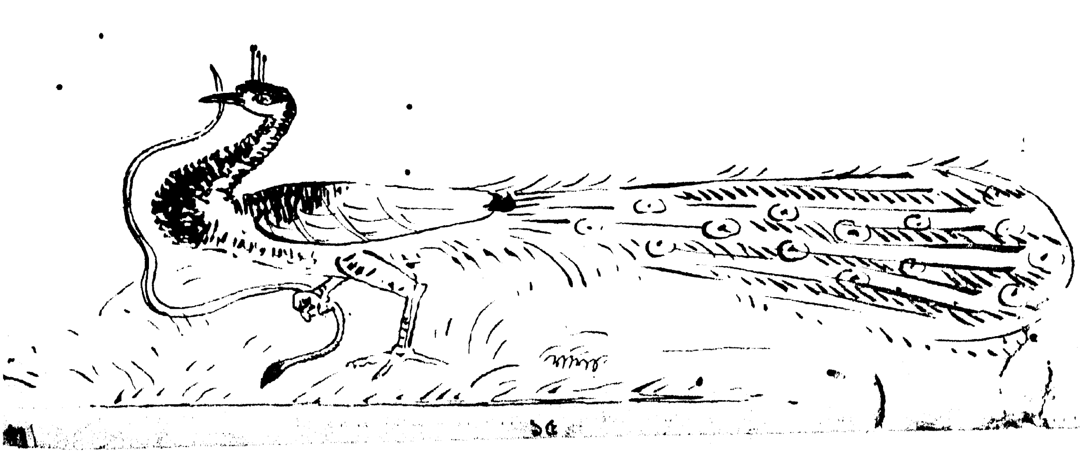
বেচারা মনসুর! কত গভীরভাবে ভালবাসিত চাঁপার মাকে। চাঁপার মার বিরহে সে আজ অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত। এখনও সে গঙ্গার বাঁকে বুড়ো বটগাছটার নীচে বসিয়া থাকে, যাত্রীদের পদধ্বনি কান পাতিয়া শুনে।

চাঁপার মার যে আর ফিরিবার কোন উপায় নাই।

জয়নাল ধীরে ধীরে দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া সরিয়া আসিল।

সম্মুখে তাহার অফুরন্ত পথ, গতি তাহার অনিশ্চিত, ভবিষ্যৎ তাহার অন্ধকারময়। রক্তের টান তাহাকে সকল বন্ধন, সকল আকর্ষণ, রীতিনীতি, বিচারবুদ্ধি উপেক্ষা করিয়া বৃহত্তর পৃথিবীতে টানিয়া লইয়া চলিল।

চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল, ইহাই ত' জগতের ধারা। চাঁপার মার জন্য ত' কোন দুঃখ নাই। যাহারা জীবনের পথে ভীড় করিয়া রহিয়াছে, তাহাদেরই একজনের জীবন-প্রভাতের সূচনা হইল।



বৈষ্ণব কবি ও কাব্য

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

পদ্মাবতীচরণ চারণ-চক্রবর্তী জয়দেবের গীত গোবিন্দ গোবিন্দ গীতের মূল উৎস। বিদ্যাপতির কবি বিদ্যাপতি "না জয়দেব" "রস পর সঙ্গ শুনই সুখ পাওব"—তাঁহার কবিতায় আছে পাণ্ডিত্য ও অলংকার; রস প্রসঙ্গও আছে। কবি চণ্ডীদাস অন্তরে পীরিতি পুষিয়া জীবনে যে নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন এবং শত অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, স্বাভাবিক সহজ ছন্দে সরল ভাষায় তাহাই তিনি গাহিয়াছেন আর সেই গানই হইয়া উঠিয়াছে বাঙালীর প্রাণের গান। সর্ববিজয়ী প্রেম কবি চণ্ডীদাসের ছিল বলিয়াই তিনি মানুষকে দেবতার চেয়েও ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন; —"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই," এই মন্ত্র প্রথম তিনি দিয়া গিয়াছেন মানুষের কানে। বাঙলার সকল বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের ভাবে বিভাবিত, সকল বৈষ্ণব কবিতাই অল্পবিস্তর চণ্ডীদাসের ছাঁচে ঢালা; শুধু বিভিন্ন কবি মনের রঙে রঞ্জিত হইয়াছে মাত্র।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর তাঁহার জীবনেতিহাস ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের মূল কথা বিস্তারিত আলোচনা করিয়া কয়েকখানি মহাকাব্য গ্রন্থ বহু ভাষায় রচিত হইয়াছে। চৈতন্যচরিত গানের ব্যাস বৃন্দাবনদাস কৃত চৈতন্যভাগবত, লোচনদাস কৃত চৈতন্য-মঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্যচরিতামৃত। জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল ও ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ভক্তি রত্নাকরে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পরিকরদের পূর্ণ কাব্যেতিহাস আছে। অবশ্য সংস্কৃতে লিখিত পণ্ডিত মুরারি গুপ্তের করচা চৈতন্য-চরিতের আদি গ্রন্থ। মুরারি গুপ্ত ও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়িয়াছেন নবদ্বীপে। এই করচা উপরিলিখিত বঙ্গ ভাষায় লিখিত গৌরাঙ্গচরিতের বহু উপাদান সংগ্রহে সহায়তা করিয়াছে। চরিত শাখার এই অপূর্ণ গ্রন্থরাজি বঙ্গ কাব্য ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ।

শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাণনাথ ভাবিয়া মধুরভাবে ভজনা করিবার প্রবর্তক নরহরি ঠাকুর। তাঁহার পদানুসরণ করিয়া আসিলেন বাসু ঘোষ, গোবিন্দ, মাধব, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, লোচনদাস প্রমুখ ভক্তবৃন্দ। তাঁহারা মধুর রসে যে গৌরলীলা গান করিলেন তাহার তুলনা নাই। বসন্তের শত শত কোকিলের মত নিতানব মধুর সুরে তাঁহারা প্রাণবিমোহন পঞ্চম তান ধরিলেন। বঙ্গ কাব্যের আসরে সে এক মহা আনন্দের দিন। তাঁহাদের সুরলহরী লীলায় বঙ্গভূমি একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইল—বাঙালীর প্রাণ ভরিয়া গেল সুধারসে। বাঙালী পাইল তাহার সাধনার ধন—অপূর্ব গীতিকবিতা। নদীয়া নাগরীর পদ বাঙালীর সম্পদ। "হাটের পত্তন", "প্রার্থনা" ও "প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা"র কবি নরোত্তমদাস সরল সহজ পয়ারে নাম-সংকীর্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গদেশের পল্লীতে পল্লীতে আজও লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে গীত হয়। বৈষ্ণব কাব্যরাজি পালা আকারে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইত সহজ আনন্দে, কীর্তনে। কানের ভিতর দিয়া রস গিয়া পেঁাছাইত একেবারে মনের গোড়ায়। নাম-সংকীর্তন, পালাকীর্তন, রসকীর্তন, নগর-সংকীর্তন বাঙলার বৈশিষ্ট্য। এই কীর্তনের ধারা গণমনের সঙ্গে আর্যমনের সংযোগ ঘটে অতি সহজে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই কীর্তনের প্রবর্তক—ব্রহ্মহরিদাস ও অদ্বৈত মহাপ্রভু তাহার উত্তরসাধক। প্রভু নিত্যানন্দ সংকীর্তনের উদ্দাম প্রচারক "যাহা হৈতে নাট গীত সভার আনন্দ।" ভারতের সংগীতে বাঙলার কীর্তন এক অপূর্ব অবদান—গড়েনহাটি, মনোহর সাহী, রেনেটি প্রভৃতি বিভিন্ন ছন্দে তাহার বিকাশ। কীর্তনের সুরে প্রাণমন যেমন গভীরভাবে অভিভূত করে এমন আর কোন সুরে পারে না।

বৈষ্ণব কাব্যে সে যুগে প্রেম-ভক্তি প্রকাশের ফলে সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ বিদূরিত হইয়াছিল। ব্রহ্মহরিদাসের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। গদাধরদাস "কাজিগণের মুখে যে বোলাইল হরি" একথা সকলেই জানেন। মুসলমান বৈষ্ণব কবি আলওয়াল, সেখ লাল, আকবর, সাহা, নসীর মামুদ, ফকির হাবিব, সৈয়দ মর্তুজা, অলিরাজা, কবীর, গরীব খাঁ, চাঁদ কাজী, ফতন, সেখ ভিখন, সেখ জালাল—কতজনের নাম করিব? তাঁহাদের ভাবের গভীরতা, বৈষ্ণবোচিত বিনয়, গৌরাঙ্গ প্রেম চিরদিন প্রশংসনীয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা নাই। আজও কি সত্যদ্রষ্টা অসাম্প্রদায়িক মুসলমান ভক্তের অভাব আছে? আজও কি মুসলমান কবির বৈষ্ণব গীত আমরা শুনিতে পাই না?

বৈষ্ণব কবি বলি কাহাকে? কাব্যে বৈষ্ণবতা বলিতে কি বুঝি? এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাক। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বাহ্য প্রকৃতির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মদনমোহন মধুর রাগিণীতে তাঁহার বাঁশি বাজাইয়া প্রতিনিয়ত আমাদের অন্তরাত্মাকে মুগ্ধ ও লুব্ধ করিতেছেন। নিরবচ্ছিন্ন এই বাঁশির সুরে বংশীধারীর অস্তিত্বের ক্ষণ ক্ষীণ ধারণা-মাত্র লইয়া আসিয়া যে ভক্ত সেই অখিল রসামৃত সিন্ধুর পূর্ণাস্বাদন করিয়া পূর্ণানন্দে নানাভাবে নানা ছাঁদে প্রেম-ভক্তি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে অপ্রাকৃত নবীন মদন মহিমা কীর্তন করেন ও কীর্তনের প্রতি পদা-স্বাদনে অনুরূপ অনুভাবানন্দে পাঠক পাঠিকার প্রাণমন ভরিয়া উঠে, সেই ভাগ্যবান ভক্তকেই আমরা বলি বৈষ্ণব কবি। আমরা এই বিশ্ব-রূপের নিকেতনে সেই রসবিগ্রহকে পাইবার শুধু অভ্রান্ত সন্ধান পাই না, একেবারে প্রত্যক্ষভাবে পাই, ভাবানুভবে যে কবির কাব্য পাঠ করি সেই কবিকেই আমরা বলি বৈষ্ণব কবি। প্রেমভক্তি যাঁহার নাই—তিনি এই অভ্রান্ত সন্ধান নিজেই পান না, অপরকে দিবেন কি করিয়া? অন্তরে বাহিরে আনন্দ সুন্দরের রসের মেলা যিনি নিজে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেন নাই, তিনি অপরকে দেখাইবেন কি করিয়া?

সুবিশুদ্ধা প্রেম-ভক্তি-পীরিতের বলে,
রসচিন্তামণি লাভ মহাজনে বলে।

মহাজনের এই উক্তি দার্শনিকের সিদ্ধান্ত নয়, ইহা অন্তরের কথা, ইহা অনুভূত সত্যের সহজ প্রকাশ। ইহা বৈষ্ণব কবির অভিজ্ঞতার কথা।

বৈষ্ণবতা দলগত ভেদবুদ্ধির ও গোঁড়ামীর সংকীর্ণতার বহু ঊর্দ্ধে। বৈষ্ণবের জাতি নাই। সত্যিকারের প্রেম ভক্তি-রসাঢ্য কবিতা, তাহা যে জাতিরই হউক, তাহাই বৈষ্ণব কাব্য। শুধু ছড়া লিখিয়া কোন রকমে তাহার মধ্যে রাধাকৃষ্ণ বা গৌরনিতাই ভরিয়া দিলেই বৈষ্ণব কাব্য হয় না; রসাশ্রিত অনুভূতির দরকার, অনুমানে কুলায় না—চাই প্রত্যক্ষতা, চাই দর্শন।

বৈষ্ণব পদকর্তার সংখ্যা দেড় শতের অধিক। বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহের চেষ্টাও হইতেছে বহুদিন হইতে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ক্ষণদা গীত চিন্তামণি পদাবলী সংগ্রহের প্রথম পুঁথি। ইঁহার অপর নাম হরিবল্লভ বা বল্লভ। তাঁহার পরে যাঁহারা পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের পরিশ্রমের ফলে আমরা পাইয়াছি গীতচিন্তামণি, গীতচন্দ্রোদয়, পদামৃত সমুদ্র, পদকল্পতরু, কীর্তনানন্দ, সংকীর্তনানন্দ; পদরত্নাকর ও পদকল্পলতিকা। অতি আধুনিক কালে পদসংগ্রহের পুস্তকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জগবন্ধু ভদ্রের গৌরপদতরঙ্গিনী ও সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত বৈষ্ণবদাসের প্রসিদ্ধ সংগ্রহ গ্রন্থ পদকল্পতরু। এই দুইখানি গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত। রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর ও নবদ্বীপ ব্রজবাসীর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত পদামৃত মাধুরীরও উল্লেখ করা যায়।

অনুবাদ বিভাগে বৈষ্ণব কবিদের দানও কম নহে। সংস্কৃতের বহু সারাংশ বঙ্গ কাব্যে অনুবাদ করিয়া বৈষ্ণব কবিবৃন্দ বঙ্গভাষাকে ও বঙ্গ কাব্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। রঘুনাথদাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষা, প্রেমানন্দদাসের পদ্যানুবাদ, উক্ত গোস্বামীর গৌরাঙ্গস্তব কল্পতরুর নবদ্বীপচন্দ্র দাসের পদ্যানুবাদ, রূপ গোস্বামীর উপদেশামৃত ও শ্রীশ্রীচাটু পুষ্পাঞ্জলি, যদুনন্দ ঠাকুরের পদ্যানুবাদ, বৃন্দাবনদাসের নিত্যানন্দাষ্টকের কৃষ্ণদাস কবিরাজের পদ্যানুবাদ সমধিক প্রসিদ্ধ। রায় রামানন্দের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক জগন্নাথ বল্লভের কাব্যানুবাদ করেন লোচনান্দ দাস। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বা লীলাসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের কাব্যানুবাদ করেন যদুনন্দন দাস। বরাদনগরের প্রাচীন কবি গদাধরের প্রিয় ভক্ত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কর্তৃক ভাগবতাচার্য এই উপাধি প্রাপ্ত রঘুনাথ উপাধ্যায় কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী নামে ভাগবতের যে পদ্যানুবাদ করিয়াছেন, তাহাই ভাগবতের বঙ্গানুবাদের প্রথম গ্রন্থ।

রঘুনাথ পণ্ডিতের মধুরস বাণী
গীত ছন্দে কহি কৃষ্ণ প্রেম তরঙ্গিণী ।

আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার জ্বালায় জর্জরিত আজিকার শতধা-বিচ্ছিন্ন বঙ্গসমাজ দেখা যাইতেছে, আবার চোখের জলে বঙ্গজননীর শ্রীপদে ফিরিয়া আসিতেছে, মিলনের মহামন্ত্রের সন্ধানে ফিরিতেছে। ব্যবহারিক জীবনেও বৈষ্ণব কাব্যের আবশ্যকতা আছে। কেননা বৈষ্ণব কাব্য ভাষার ভোজবাজী নয়, বুদ্ধির কারসাজী নয়। "শুধু বৈকুণ্ঠের তরে নয় বৈষ্ণবের গান।" প্রচুর প্রাণশক্তি নিহিত আছে বৈষ্ণবের গানে। এ কাব্য শুধু কল্পনার অলস বিলাস নয়। বৈষ্ণবের গান আমাদিগকে শিখাইয়াছে, "দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়রে দেবতা।" বৈষ্ণব কাব্য পাঠের ফল প্রেমের দৃষ্টিলাভ। এই প্রেমের দৃষ্টিতে হয় স্বরূপ প্রকাশ। বৈষ্ণব কবির প্রভাব কালাতীত।

ছেলেধরা

শ্রীগঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রামে দারুণ সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। কোথায় নাকি এক নদীর উপর বিশাল পুল বাঁধিবার বন্দোবস্ত চলিতেছে, কিন্তু উন্মত্ত নদী কিছুতেই বাগ মানিতেছে না। গ্রামের "গেজেট" সারদা পিসির মুখে প্রকাশ, এক সাধু নাকি বলিয়াছে যে, নদীতে ছোট ছেলে-মেয়ে উৎসর্গ করিলে তবে হয়তো দুর্দম নদী শান্ত হইতে পারে। তাই সরকার হইতে গোপনে শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে অসংখ্য চর পাঠানো হইয়াছে ছেলে ধরিবার জন্য।

সকালের আড্ডা শেষ করিয়া বাড়ি আসিয়াই শুনিলাম, একটু আগেই ছেলেধরার মত দেখিতে একজন লোক আসিয়াছিল। দরজায় দাঁড়াইয়া যেন আবার কাহার নাম করিয়া ডাকিতেছিল। চোখ দুইটা এত লাল যেন পাকা তেলাকুচা। এক মুখ দাড়ি গোঁফ। মাথায় এই বড় বড় চুল, মিশমিশে কালো গায়ের রং। সে বিদ্ঘুটে চেহারা দেখিলে নাকি সোমত্ত মানুষেই ভয়ে আঁৎকাইয়া ওঠে।

গৃহিণী এমনই ভাবে লোকটির রূপ বর্ণনা করিলেন যে, আমি তাঁহার কথায় সন্দেহ করিতে পারিলাম না, বরং মন ভারী হইয়া আসিল। ইহাতে দোষ আমার বিশেষ নাই, কারণ গ্রামে আজকাল সবারই মুখে ঐ একই কথা।

আরও শুনিলাম, আমাদের মায়াটা নাকি ছেলেধরাটাকে ভিখারী ভাবিয়া আহ্লাদ করিয়া নাচিতে নাচিতে ভিক্ষা দিতে গিয়াছিল। ভয়ে শিহরিয়া উঠিলাম, উঃ, খুব বাঁচিয়া গিয়াছে। মেয়েটার শরীরে কি ভয় বলিয়া কিছু নাই! মেয়েছেলের এতটা সাহস তো ভাল নয়। মায়াকে ডাকিয়া আচ্ছা করিয়া ধমকাইয়া দিলাম।

এই ঘটনার পর কয়েক দিন কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে ছেলেধরার বিষয়ে আরও অনেক কথা শোনা যাইতেছে। ঘোষেদের নান্টুকে নাকি সেই ছেলেধরাটা সন্দেশের লোভ দেখাইয়া কাছে ডাকিয়াছিল ঝোলায় পুরিবার জন্য। নান্টু নেহাত চালাক ছেলে, তাই লোভ সামলাইয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। হইত যদি মিত্তিরদের মদন, তাহা হইলে আর দেখিতে হইত না, ঠিক যাইয়া তাহার কোলে উঠিত এবং এতদিন নদীগর্ভে সমাধি লাভ করিত। কারণ ছেলেটি এই তরুণ বয়সেই মণ্ডা-মেঠাইএর যম এবং একটি এক নম্বরের পেটুক বলিয়া গ্রামে খ্যাতি অর্জন করিয়া ফেলিয়াছে। সেবার বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ি রাঙা ঠাকুরমার শ্রাদ্ধে খাইতে গিয়া ঐ দশ বৎসরের ছেলে শেষ পাতে পঁচিশটা রসগোল্লা খাইয়া ফেলিয়াছিল। খাইয়া তখন আবার কি কান্না, উঠিবার সামর্থ নাই, বাড়ি যাইবে কি করিয়া।

একদিন যেন কাহার মুখে শুনিলাম যে লোকটা ছেলেধরাও নয়, কিছুই নয়, একজন মস্ত গুণী এবং পিশাচ সিদ্ধ। ধুলায় মন্ত্র পড়িয়া চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে সে যাহা বলে, তাহাই বানাইয়া খাওয়াইয়া দেয়। স্নান করিতে, [illegible] তাহাতে কেহ দেখে নাই, সারাদিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। রাত্রি হইলে আর দেখা যায় না।

এই রকম নানা কথা শুনিয়া শুনিয়া লোকটিকে দেখিবার একটা অদম্য ইচ্ছা মনের মাঝে ঘুরিয়া বেড়াইত, কিন্তু গ্রামের সকলের চোখে পড়িলেও এ অভাগার দৃষ্টিপথে সে আজও পড়ে নাই। সময়টা বড়ই মন্দ যাইতেছে। প্রায় দুই বৎসর পুরিতে চলিল চাকরি নাই। দিন যাইতেছে না যেন বৎসর যাইতেছে। যদি দেখা পাই এবং সে যদি সত্যই গুণী হয়, তাহা হইলে একবার জিজ্ঞাসা করিব যে কবে পর্যন্ত আমার এই দুর্দশার শেষ হইবে।

সেদিন কাশিমপুর গিয়াছিলাম, সেখানকার কয়েক ঘর প্রজার নিকট খাজানার তাগাদায়। ফিরিতে সন্ধ্যা পার হইয়া গেল। ধান ক্ষেতের আলে আলে পথ। অমাবস্যা বিশেষ নিকট না হইলেও অন্ধকার ইহারই মাঝে এমন গভীর হইয়াছে যে, যেন চারিদিক হইতে গিলিতে আসিতেছে। কাছের বাঁশ ঝাড়ের তো ঝিঁ ঝিঁ'র ডাকে প্রায় ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম। কোনদিকে জন মানবের সাড়া নাই। একা পথ চলিতে যথেষ্ট অস্বস্তি ভোগ করিতেছিলাম, কিন্তু উপায়ান্তর নাই, গ্রাম এখনও দূরে।

চলিতে চলিতে সেই ছেলেধরার কথাই ভাবিতেছিলাম। ইচ্ছা করিয়া যে ভাবিতেছিলাম তাহা নয়—স্বতই গৃহিণীর বর্ণিত তাহার চেহারাটি মনের মাঝে প্রতিফলিত হইতেছিল। তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা অন্য সময়ে অদম্য হইলেও বর্তমান অবস্থায় তাহার দর্শন মোটেই প্রার্থনীয় মনে হইতেছিল না। কারণ এই স্থানে সেই ভীষণ দর্শন লোকটির দেখা পাইলে, তাহার সহিত কথা কহিবার শক্তি এ দেহে থাকিবে কিনা সন্দেহ।

ধান ক্ষেত ছাড়াইয়া রায়েদের আম-কাঠালের বাগানের ধারে কালী মন্দিরটার সম্মুখে আসিতে একটু যেন শান্তি পাইলাম। মন্দিরটি বহুদিনের পুরাতন এবং জন্ম হইতেই শুনিয়া আসিতেছি যে দেবীও বড় জাগ্রতা। পুণ্যচিত্তে যে যাহা কামনা করে, সে তাহা পায়। কে যে ইঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহা গ্রামের অতি বৃদ্ধদেরও অজ্ঞাত। এক হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী অনেক দিন হইতে এখানে আছেন, তিনিই পূজারতি করিয়া থাকেন। আশ-পাশের গ্রামবাসীরা যাহা পূজা দিয়া যায়, তাহাতেই তাঁহার দিন চলিয়া যায়।

মন্দিরের সামনে আসিয়া ভাবিলাম, প্রণামটা করিয়া যাই। অবশ্য যখনই এদিক দিয়া যাই-আসি প্রণাম করিয়া যাই। জাগ্রতা দেবী যদি একটা প্রণামেই ও অন্তরের আকুল আবেদনেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং যদি মুখ তুলিয়া চাহেন! সময়টা একদম ভাল যাইতেছে না। এ অবস্থায় অতি অল্পেই মনে নানাপ্রকার দুর্বলতা আসিয়া পড়ে।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে শুনিলাম বাবাজী কাহার সহিত কথা কহিতেছেন। দালানে উঠিয়া দেখি তাঁহার [illegible]

রাখিয়া কে একজন শুইয়া আছে। কাছে যাইতেই আমাকে দেখিয়া তিনি আমার কুশল প্রশ্ন করিলেন। দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বাবাজীর পদধূলি লইয়া তাঁহার কাছে বসিয়া পড়িলাম।

তাঁহার পাশের লোকটিকে মনে হইল, বোধহয় ভিখারী। প্রদীপের ক্ষীণ আলোকেও বেশ বোঝা যায় যে সে রুগ্ন এবং হাত পা-য় অসংখ্য ক্ষত। আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে বাবাজীর প্রতি চাহিলাম। তিনি আমার মনোভাব হয়তো বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন, "কাছাকাছি গ্রামের লোকরা এর ওপর বড় অত্যাচার করছে। দেখ না এমন মেরেছে যে কেটে কেটে ঘা হ'য়ে গেছে।"

আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, চুপ করিয়াই রহিলাম। একটু নীরব থাকিয়া তিনি আবার কহিলেন, "এক তো বেচারা বদ্ধ পাগল, তার ওপর কে ওকে গ্রামে গ্রামে ছেলেধরা বলে চালিয়ে দিয়েছে। যেখানে যায় লোকে না মেরে কথা কয় না।"

এতক্ষণে আসল কথাটা বুঝিলাম। বলিলাম, "কার কথা কে বিশ্বাস করে সেই তো সমস্যা। এত যে কথা শোনা যাচ্ছে সবই কি মিথ্যে? নিশ্চয়ই"—

বাধা দিয়া তিনি বলিলেন, "বাপু, এর নাড়ির খবরও আমার জানা আছে। এর সঙ্গে আমার জানাশোনা তো আজকের নয়!"

বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "কি রকম?"

"তবে বলি শোন," বলিয়া তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মর্মার্থ ইহাই যে, তিনি জাতিতে ভাগলপুরী ব্রাহ্মণ এবং বাড়ি ছিল ভাগলপুর শহরেই। এই পাগলটি তাঁহার বাল্য-সখা, এবং জাতীতে বাঙালী কায়স্থ। শহরের একই পাড়ায় তাঁহারা বাস করিতেন। স্কুলের পড়া হইতে শুরু করিয়া কলেজের পড়া পর্যন্ত একসঙ্গেই শেষ করিয়া দুইজনে যৌবনের অনেকগুলি দিন অতি অন্তরঙ্গভাবে পরস্পর কাটাইয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই সংসারে তাঁহার আস্থা ছিল না এবং তাই একদিন তিনি সংসারের মায়া কাটাইলেন। তখন তাঁহার এই বন্ধুটি বিবাহ করিয়া ভাল সরকারী চাকরি জুটাইয়া বেশ সুখে দিন কাটাইতেছিল। তারপর প্রায় দশ বৎসর পূর্বে যখন তিনি হরিদ্বার হইতে ফিরিবার পথে ভাগলপুরে যান, তখন আর ইহার কোন সন্ধান পান নাই।

শুনিয়াছিলেন যে, গত বৎসরএর মড়কে তাহার পরিবারের এক শিশুকন্যা ব্যতীত সকলেই মৃত্যু কবলিত হয় এবং সে হয়তো ঐ কন্যাটিকে লইয়া কোনও প্রকারে দিনাতিপাত করিতেছিল, কিন্তু একদিন কর্মস্থল হইতে বাড়ি আসিয়া শুনিল যে, কিছুদিন হইতে মেয়েটির কোনও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। বাড়িতে ঝি-চাকরের তত্ত্বাবধানে থাকিত, হয়তো নির্জন দ্বিপ্রহরে তাহাদের অলক্ষ্যে কোনও সময়ে একা বাড়ির বাহির হইয়াছিল এবং সম্ভবত কোনও দুরাচার তাহাকে লইয়া গিয়া গহনার লোভে হত্যা করিয়া থাকিবে।

পুলিসে খবর দেওয়া হইল। বহু খোঁজাখুঁজি চলিল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। কত কাগজে কাগজে পুরস্কার ঘোষণা করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল, কিন্তু কোনই সন্ধান মিলিল না। সে কাজকর্ম ছাড়িল। স্নানাহারের দিকে তাহার লক্ষ্য রহিল না, বাড়ি আসিবারও ঠিক থাকিত না; শুধু এখানে-সেখানে উন্মাদের মত ঘুরিয়া বেড়ানই তাহার প্রধান কাজ হইয়া উঠিল। শেষে সে পাগল হইয়া গেল এবং একদিন আর তাহার কোন সন্ধানই ভাগলপুর শহরে পাওয়া গেল না।

সব শুনিয়া তিনি সন্তপ্ত চিত্তে এখানে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার স্মৃতি দিনের পর দিন তাঁহার অন্তরে ফিকা হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু সহসা আজ আমাদের গ্রাম হইতে ফিরিবার সময় ইহাকে দেখিতে পাইলেন। তখন জনকয়েক গ্রামবাসী নির্মমভাবে ইহাকে প্রহার করিতেছিল ও গালি দিতেছিল। তাহার অপরাধ সে গ্রামের পথে বা কাহারও গৃহে ছোট মেয়ে দেখিলেই ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া নাচিতে আরম্ভ করে, আদর করে, হাসে, কাঁদে। কেন যে সে এরূপ করে, তাহা গ্রামবাসীরা বোঝে না; ভয় পাইয়া ইহাকে মারিতে শুরু করে।

বহু কষ্টে, বহু কাকুতি করিয়া উহাদের কবল হইতে ইহাকে ছাড়াইয়া আনিয়াছেন, কিন্তু ধরিয়া রাখিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।

তাঁহার কথায় বাধা পড়িল। পাগলটি উঠিয়া বসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"আমার মেয়েটিকে দেখেছ তোমরা? বেণু এসেছিল এদিকে......দেখনি তাকে? সেই সুন্দর টুলটুলে মুখ, মাথায় বড় বড় কোঁকড়া চুল, হাতে চুড়ি? গলাতে হারও ছিল। আর কানের দুলটা ছিল একেবারে নতুন। ওঃ! সেটা পরে কি খুশীই হয়েছিল"......বলিতে বলিতে তাহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে।

আবার একটু পরে বলিতে থাকে—"দেখ নি তোমরা তাকে? আহা-হা, কোথায় যে গেল মেয়েটা! সেই কোন সকালে এক মুঠো ভাত খেয়েছে। ওগো, সত্যিই তোমরা কেউ তাকে দেখনি?" সে হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তাহার কথা শুনিতে আমাদের উভয়ের চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। যতই সে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য ছটফট করিতেছিল, ততই তিনি তাহাকে ব্যাকুলভাবে দুই হাতে আপন কোলের মাঝে চাপিয়া ধরিতেছিলেন। রাত্রি অনেক হইয়াছিল। বাবাজীকে বলিলাম—ঠাকুর, আমায় একটু মায়ের প্রসাদ দিন, এবার বাড়ি যাই, রাত অনেক হ'ল।"

তিনি প্রসাদ আনিতে উঠিয়া গেলেন। আমার ইচ্ছা হইতেছিল ইহাকে ডাকিয়া লইয়া যাই আমার সহিত লইয়া গিয়া মায়াকে ইহার বুকের উপর ফেলিয়া দিই। কিন্তু বাড়ির লোকের কথা ভাবিয়া সে ইচ্ছা দমন করিতে হইল। বাবাজীর দেরি হইতেছিল, তাই আমিও উঠিয়া মন্দিরের

ভিতরে আসিলাম। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, “ওকে একা ফেলে চলে এলে? এক্ষুনি হয়তো”—

তাঁহার কথা শেষ হইল না, পাগলাটি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেল। সে বোধহয় এই সুযোগই খুঁজিতেছিল। মুখে সেই মেয়ের নাম—“বেণু, বেণু, ওরে ও বেণু, এদিকে এসেছিস? সাড়া দে না মা”—

ধীরে ধীরে তাহার কণ্ঠস্বর বাঁশ ঝাড়ের ঝিঁঝিঁ’র ডাকের মাঝে ডুবিয়া গেল। বাবাজীর প্রতি চাহিলাম। তাঁহার দুই গাল বাহিয়া অশ্রুর ধারা নামিয়াছে। আমার চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। তাঁহার পদধূলি লইয়া আমি সিঁড়িতে নামিলাম। তিনি সশব্দ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন, “কে জানে, কবে ওর এই খোঁজা শেষ হ’বে!”

পথে নামিয়া গ্রামের পথ ধরিলাম। সারা অন্তরটা মোচড় দিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। বুকখানা যেন ব্যথায় টনটন্ করিতেছিল। চলিতে চলিতে মনে হইল, লোকে না জানিয়া কত অন্যায়ই না করিয়া বসে। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, ইহাই জগতের চিরন্তন রীতি; কোনও কিছু শুনিলেই তাহার সত্যাসত্য নিরূপিত হইবার পূর্বেই তাহা বিশ্বাস করিয়া লইয়া সকলে হুজুকে মাতিয়া যায়। অন্যের কথা কি ভাবিতেছি, আমার নিজেরও যে লজ্জা রাখিবার স্থান নাই। ঐ পাগলটির প্রতি মনে একদিন যে বিদ্বেষ ও আক্রোশ জাগিয়াছিল, তাহা ধুইয়া মুছিয়া গিয়া তাহার প্রতি সমবেদনায় মন ভরিয়া গেল। কেবলই মনে হইতে লাগিল, “ভগবান, মানুষের জন্য অশান্তির কত পথই না খুলিয়া রাখিয়াছে!”

পুস্তক পরিচয়

পৃথিবীর বড় মানুষ:—গোপাল ভৌমিক এম-এ। দাম বারো আনা। প্রকাশক—শ্রীধীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১১, হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান—মডার্ন বুক এজেন্সী, ১০, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

লেখক কিশোর সাহিত্যের ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। সক্রেটিস, আরিস্টেটল, হেলেন কেলার, লুই ব্রেল, হামফ্রি ডেভি, উইলবারফোর্স, লুই স্টিভেন্সন, জোয়ান-অব-আর্ক, কার্নেগী, ম্যাথু ফ্লিণ্ডার্স, রিচার্ড ফ্রান্সিসবার্টন, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ—ই’হাদের জীবনী লইয়া বইখানা লেখা। একেবারে শিশুদের জন্য এ সব রচনা নয়, এগুলি প্রধানত কিশোরকিশোরীদের জন্য। লেখা সরল এবং চিত্তাকর্ষী। এই সব মহৎ জীবনী পাঠে কিশোরকিশোরীরা অনেক নূতন কথা জানিতে ও শিখিতে পারিবে; তাহাদের জ্ঞানোন্মেষ বৃত্তি প্রস্ফুটিত হইবে। এমন বইয়ের যত প্রচার হয়, ততই ভাল। কিশোর সাহিত্যে এই ধরণের অবদান এখনও বাঙলা দেশে পর্যাপ্ত নয়। গোপালবাবুর লেখা এই অভাব পূরণে সাহায্য করিবে। ছাপা, বাঁধাই সুন্দর।

দেশপ্রাণ:—মাসিক পত্র। সম্পাদক—শ্রীপ্রমথনাথ পাল। কার্যালয়—১৬বি, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য আড়াই টাকা। প্রতি সংখ্যা চারি আনা। বৈশাখ সংখ্যা, দ্বিতীয় বর্ষ।

দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা ‘দেশপ্রাণ’ পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইলাম। চিন্তাশীলতাপূর্ণ প্রবন্ধ এবং কবিতার নির্বাচনপটুতায় ‘দেশপ্রাণ’ প্রথম শ্রেণীর মাসিকের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ‘দেশপ্রাণের’ প্রতি সংখ্যায় অনেক কাজের কথা এবং ভাবিবার ও বুঝিবার বিষয় থাকে; ইহাই হইল বিশেষত্ব। আমরা সহযোগীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

অলকা:—মাসিক পত্র, চৈত্র। সম্পাদক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সরকার। বার্ষিক মূল্য পাঁচ টাকা এক আনা। কার্যালয়—এভেনিউ হাউস, **১নং** চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

অনিল রায়ের ‘গীতায় আত্মজ্ঞান ও মোক্ষ’—গীতা ব্যাখ্যাতারূপে লেখক খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধটি সে খ্যাতি বাড়াইবে। ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের ‘পূর্ব ভারত ও আসাম’ সুন্দর, সারগর্ভ, চিন্তাশীল রচনা জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। গল্পের মধ্যে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তাহারা’ এবং সরোজকুমার নন্দীর ‘ভক্তের ভগবান’ উল্লেখযোগ্য। ‘সুরধুনী’ একটি সুন্দর কবিতা। চলন্তিকায় ‘সম্বুদ্ধ’ নামের আড়ালে থাকিলেও রূপকে আড়াল দিতে পারেন নাই। তীক্ষ্ন, সরস এবং ভাবগর্ভ সবল ভঙ্গীর রীতি এবং গতিতে তিনি বাঙালী পাঠক সমাজের সর্বত্র এত সুপরিচিত যে, সকলেই তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিবেন। শিল্পী সুকুমার সেনের ‘জলের ঘাটে’ রেখাঙ্কনটি মনোমুগ্ধকর। ‘অলকার’ উন্নতি অব্যাহতভাবে চলিতেছে।



ধানবাদে দু'মাস

শ্রীসতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম-এস-সি

অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ একদিন গভর্নমেণ্ট মাইনিং কলেজে এসে পৌছলাম। দু' মাসের জন্য কলেজে কাজ কর্তে হবে। বন্ধুবর নৃপেন্দ্রবাবুর উদ্যোগে এবং বন্ধুবর দ্বিজেশবাবুর উৎসাহেই অবশ্য আসা সম্ভব হল। কলেজের কাজ খুব বেশী নয়; সপ্তাহে ২।৩টি ক্লাস। অবসর প্রচুর। কর্মক্লান্ত মুখর কলিকাতা মহানগরী ছেড়ে অলস, জনবিরল, নিস্তব্ধ ধানবাদ মন্দ লাগল না। চারিদিকে ধু-ধু করে মাঠ, অসমতল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়। আর চারদিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কালো দৈত্যের মত গিরিশ্রেণী। মাটির সাথে আকাশ এসে মিশে গেছে। এক আকাশ আর পাহাড়। বাঙলার সমতল ভূমিতে কাটিয়ে হঠাৎ পৃথিবীর এ রূপ বিস্ময় বলে মনে হল।

বিহারকে আমি ভালবাসি, ভালবাসি এর নিঃস্তব্ধতার জন্য। বাঙলার মত বিহার সবুজ, কোমল নয়। একটু রুক্ষ। এর মাটির রঙ্ গৈরিক। এর আকাশে বাতাসে উদাসীর ইঙ্গিত মেশানো রয়েছে। সেইজন্যই বিহার আমার কাছে এত ভাল লাগে। বুদ্ধদেব ও পরেশনাথ এই বিহারেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আমি যখন এর আকাশের দিকে চাই, আমার বিস্ময় লাগে। বৈরাগ্যই যেন এ দেশের কর্মবাণী। এ দেশের মাটী, আকাশ, বাতাস, গাছ, পাথর সবাই মিলে যেন এই বৈরাগ্যের বাণীই বহন করে বেড়াচ্ছে। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' কবির একথা আমার প্রাণে সাড়া দেয় না। মুক্তি বৈরাগ্য সাধনেই সম্ভব। বৈরাগ্যের তুলনায় ভোগ মহাসমুদ্রের কাছে পচা ডোবার মত। ভোগে কোথায় যেন হীনতা, দীনতা রয়েছে। উত্তেজনার ও প্রমোদের মুখে আমরা তা ভুলে যাই বটে, কিন্তু সময়ান্তরে তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। পৃথিবীতে যে আজও যায়গার অভাব হয়নি, জননী বসুন্ধরার বক্ষে যে স্থানাভাব নেই, বিহারে এসে এ কথাটা যেমন স্পষ্ট করে বোঝা যায় এমন আর কোথায়ও নয়।

এ দেশের গ্রাম্য লোকদের 'দেহাতী' বলা হয়। তারা চাষ করে, ক্ষেতের ফসল খেয়ে বাঁচে। দরকার হলে ২০।২৫ মাইল হেঁটে বাজারে গিয়ে পেপে, পেয়ারা বিক্রি করে। উচ্চাকাঙ্ক্ষার বালাই নেই এদের। দিব্যি আরামে আছে। এ দেশের সবটাতেই ঢিলে ছাড়া। কর্ম এরা করে, কিন্তু আমাদের মত কর্মের অন্তরালে আত্মগোপন করে কোনও রকমে দিন কাটিয়ে দেয় না। আমরা ঠিক কাজ করি না। কাজই আমাদের চালায়। কাজ করার এক নেশায় আমরা ছুটে চলেছি। এদেশী লোকদের মধ্যে তা নেই। এ দেশের সবটাতেই একটা নির্লিপ্ততা রয়েছে। আমার তা বেশ লাগে। সভ্যতার যে বড়াই করে আমরা এদের কৃপার দৃষ্টিতে দেখি তার মূল্য কতটুকু? মানুষের জীবনের চেয়েও কি তা বেশী মূল্যবান?

আমাদের দেশের ঘরবাড়ি, ঘন বসতি এবং কোলাহল সবাই মিলে এমন এক আবেষ্টনীর সৃষ্টি করেছে যেখানে মানুষ তার অন্তর ধ্বনি শুনতে পায় না। সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করে তাকে যেন ভুলিয়ে রাখতে চায়। সে এক ছেলে ভুলানো ছড়া বিশেষ। বিহারের এই নির্জন পাহাড়বহুল দেশে এলে মানুষ হঠাৎ তার সম্বিত ফিরে পায়। জনমানব শূন্য দিগন্তপ্রসারী মাঠ তাকে একাকীত্বের ভয়ে ভীত করে তুলতে পারে স্বীকার করি, তবু তাতেই তার আত্মচেতনা জাগ্রত হয়।

এ কলেজের সত্যিকার নাম Indian school of mines. Royal school of mines-এর অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত। Indian Government এটা প্রতিষ্ঠা করেছেন। Geology, Mining, Chemistry, Physics, Electrical Engineering এই কটা বিষয় এখানে পড়ানো হয়। প্রত্যেক বিষয় শেখাবার জন্য ৪।৫জন করে অধ্যাপক রয়েছেন। বৎসরে মাত্র ২৬টি ছেলে নেওয়া হয়। সমগ্র ভারতবর্ষে Mining শেখবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান। ফলে ছেলেদের মধ্যে কঠিন প্রতিযোগিতা হয়। ভারত সরকারকে এ প্রতিষ্ঠানের জন্য বৎসরে ২ লক্ষ টাকা খরচ করতে হয়। তা ছাড়া প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকার ৩।৪টি করে ছাত্রকে বৃত্তি দেন। ভারতবর্ষে খনিজ সম্পদের অভাব নেই। কিন্তু তাকে সার্থক ক'রে তোলবার যোগ্যতার অভাব। Mining শেখবার সার্থতকা অবশ্যই স্বীকার করব।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ মিলে এখানে এক জগন্নাথক্ষেত্র রচনা করেছে। মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, বিহারী, আসামী, মারাঠী, কোনও দেশ বাদ নাই। পোষাক পরিচ্ছদ সকলেরই এক। বাঙ্গালী তার ধুতি চাদর ছেড়ে দিয়েছে, মাদ্রাজী তার লুঙ্গী কুলুঙ্গীতে বন্ধ করেছে। তার বদলে সবাই নিয়েছে International dress. সকলেই পেণ্টুলুন ও কোট চাপিয়ে চলেছে। মন্দ না, কাজ করার পক্ষে এ পোষাক নিশ্চয়ই সুবিধেজনক। তা ছাড়া এ সর্বভারতীয় পোষাক। প্রাদেশিকতার গন্ধ এতে নেই। বাঙলা এত কাছে অথচ বাঙলার কোনও প্রভাব নেই দেখে বিস্ময় লাগে বৈকি?

বাঙলার স্কুলকলেজে একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রে বেদনা পাই। ছেলেদের মধ্যে যেন প্রাণের সাড়া নেই। পাশ করে চাকুরী পাবে না, এ যেন তারা দিব্যচক্ষে দেখছে। তবুও যে কলেজে যায়, তার কারণ এ ছাড়া অন্য উপায় নেই। ছেলেদের চোখে মুখে এ কথাটা এমন স্পষ্ট হয়ে উঠত। Mining স্কুলের ছেলেদের মধ্যে এ নৈরাশ্য একেবারে নেই বললেই চলে। এরা জানে পাশ করলে যা হ'ক একটা চাকুরী পাবেই। ফলে চোখে মুখে আনন্দ-উজ্জ্বল জ্যোতি। স্ফূর্তির অভাব নেই, প্রাণের স্পন্দন তীব্র। শুধু ছাত্রদের মধ্যে নয় মাস্টারদের মধ্যেও যৌবনসুলভ আনন্দ ও প্রমোদের অভাব কুত্রাপি দেখলাম না। Annual sports হলো। Dr. Banerjeeর আনন্দ ধরে না। ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুললেন। Dr. Banerjeeর বয়স ৫০এর কম হবে না। Londonএর Ph.D. চমৎকার লোক। অধ্যাপকদের জন্যও ভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। 1st, 2nd, 3rd এবং —I have stood fourth. মাত্র চারজনই যোগ দিয়েছিলেন। আমার দুঃখ হলো। আমি অন্তত Last Prize অবশ্যই পেতে পারতুম। জীবনে Sportsএ কখনও Prize পাইনি; যাও সুযোগ এলো, তাও পেলুম না!

ছোটবেলা থেকে Technical Educationএর প্রতি একটা বিরূপভাব পোষণ করে এসেছি। Vocational Education চাই বলে চেঁচিয়ে যারা জগত মাত করছে, তাদের সাথে একমত হতে পারিনি। Educationকে ক্ষুন্নিবৃত্তির অভাব পূরণের বন্ধু বলে স্বীকার কর্তে উৎসাহ পাইনি। শতদলবাসিনী বীণাপানিকে স্বর্গলোক হতে মর্তলোকে টেনে আনতে বাধা পেয়েছি। ধানবাদের ছেলেদের আনন্দ উজ্জ্বল মূর্তি দেখে আমার সে ধারণা বদলে ফেলতে হলো। চিন্তাশীলতা কেন, আরও অনেক সংগুণ থেকে হয়ত এরা বঞ্চিত হয়ে রয়েছ। বুদ্ধি বৃত্তির মার্জিত ধারার সাহায্যে জগতকে জানবার ও উপভোগ করবার একটা দিক হয়ত এদের অজ্ঞাত রয়ে গেল। হয়ত

আনন্দ এবং তার পরিবেশনেই এদের জীবনের অবসান ঘটবে। তবু বলব—তাই বা মন্দ কি? আনন্দ বোধের এ তারতম্য ত আপেক্ষিকই। এদের জন্য দুঃখ আমার হতো। কেবল এদের জন্য নয় 'idealism'এর অভাব দেখলেই দুঃখ আমার হয়। মাঝে মাঝে ছেলেদের finer sentimentsএর অভাব লক্ষ্য করেছি। অপরিচিতের সংগে যেচে আলাপ করবার, শারিরীক আনন্দের একটা বন্য চপলতার স্বভাব এদের মজ্জাগত। Curisoty নয়। যে কথাটা পূর্বে বলেছি। এদের অমার্জিত রুচী। এবং তা দিয়ে জগতকে জানবার শেখবার প্রবৃত্তি যাবার নয়। এ থাকতে বাধ্য। আহার সংস্থান ও সুখে জীবনযাপন করবার যে প্রবৃত্তি, যে উদগ্র বাসনা শৈশব থেকে এদের জীবিকা আহরণ উপযোগী শিক্ষায় পেছনে চালিয়েছে, তা মার্জিত রুচির বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়। তা সুকোমল বৃত্তি বিনাশ কর্তে বাধ্য। তা মানুষের আদর্শবাদ, ভাবপ্রবণতার বিকাশে সাহায্য কর্তে পারে না। নিতান্ত Practical ধরণের ছেলে এরা। ভেবে বিস্ময় লাগে—কেমন করে এ শৈশবেই জানলো জীবনের বন্ধুর পথের কথা, মানুষের মিথ্যা আচরণের কথা, পৃথিবীর শঠতা, ভাওতা ও ধূর্তামির কথা! তাই না আদর্শবাদের মূলে কুঠারাঘাত করে, হৃদয়কে অস্বীকার করে দেহ ও পেটের অস্তিত্ব মাত্র স্বীকার করে, ছুটে এসেছে দুমুঠো অন্ন সংস্থানের জন্য। আদর্শবাদের বিরুদ্ধে বর্তমান যুগে বিদ্রূপাত্মক শ্লেষ্মা একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সবাই সচরাচর যা বলে থাকে তার পুনরাবৃত্তিতে যে শ্লাঘার পরিচয় নেই, তা জানা সত্ত্বেও বিদ্রূপকারীর অভাব হচ্ছে না। এটা herd mentality ছাড়া আর কি বলব? আদর্শবাদের উপাসনার দিন শেষ হয়েছে আমি মনে করি না। কেননা আমি বিশ্বাস করি মানুষের উন্নতির এখনও শেষ হয়নি এবং তা কোনও দিন হবেও না। তা যদি না হয় তা হলে স্বীকার কর্তে হবে যে আদর্শবাদের পূজা অজর অমর হয়ে থাকবে।

পরেশনাথ পাহাড়ে যাওয়া ঠিক হলো। ছেলেদের নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠে Experiment দেখানো হবে। ১৯৩০ সালে সেবার গিরিডি থেকে প্রথম পরেশনাথে যাই। পরেশনাথের সে দৃশ্য আমি ভুলতে পারিনি। এবার ধানবাদ থেকে যাত্রা করা গেল। শুক্রবার বিকেল থেকেই চলল মহড়া। শনিবার রওনা হবো। ছেলেদের দেখানো হলো Boiling point এবং Barometric pressure at Dhanbad. আবার পাহাড়ের উপরে উঠে গিয়ে দেখানো হবে। দেখোনো হবে কেমন করে Boiling point এবং Barometric pressure উচ্চতার সংগে সংগে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। যে কথাটা পড়েই এসেছি এবার তা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ এলো। উৎফুল্ল হলুম বৈ কি? বাসে করে Grand Trunk Road ধরে চললাম আমরা। সংগে Mr. Huda এবং পেছনে ২৫টি বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ যুবক। মনে প্রাণে তাদের তারুণ্যের ছোঁয়াচ লাগল। আরম্ভ হলো চিৎকার, গান ও হর্ষধ্বনি। পেছনে পেছনে ডাঃ ব্যানার্জীর গাড়ী ছুটে এসেছে। গাড়ী ছুটেছে জ্যা মুক্ত তীরের মত।

ছুটে চলেছে—পরেশনাথ পাহাড়ের সুদূর চূড়ায় আরোহণ করবে—ধারবাদ থেকে যাকে চিনির ঢিবির মত দেখায় তাকে নাগাল পেতে হবে। যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তাকে পদতলে পেষণ করবার মানুষের একটা জন্মগত প্রবৃত্তি রয়েছে—পাহাড়ে উঠবার মধ্যে যে আনন্দ, তা তারই বিকাশ মাত্র। ভাবটা এই:— আমাদের চোখের সামনে তুমি তোমার উচ্চতা নিয়ে গর্ব করবে, তা আমরা সইব না। তোমাকে আমাদের পদতলে পেষণ করতে হবে। আমরা হাতীকে ভেড়া বানিয়েছি আর তুমি?

ছেলেদের কথা আমি ভুলব না। কি আন্তরিকতা, কি স্নেহ ও শ্রদ্ধা। হতে পারে সবটাই হয়ত আন্তরিকতা নয়, হয়ত এর মধ্যে ভদ্রতার খাদ মেশানো রয়েছে—তবু বলব প্রাচীনকালের গুরু-শিষ্যের দেব-নর, সম্পর্কের তুলনায় এও কিছু মন্দ না। বর্তমানের জিজ্ঞাসু যুগের যে সম্পর্ক তাই বা মন্দ কি? যে সকল গুরুমহাশয়রা প্রাচীনকালের ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক নেই বলে খেদ করেন, তাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্তে ইচ্ছে হয়। বারুণী ত নেই ঠিকই কিন্তু গুরুরাই কি ঠিক আছেন? পাহাড়ের কাছে দাঁড়ালে মানুষ তার ক্ষুদ্রতার পরিচয় যেমন পায় এমন বোধ হয় আর কিছুতেই নয়। এত বড় বিশাল পদার্থ, তার বুকে এত বনানী এবং হিংস্র পশু অথচ সে স্বয়ং নির্বাক নিস্পন্দ। বার বার মনে হয়েছে আমরা কত ক্ষুদ্র, কত সামান্য, কত চঞ্চল। পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে যাদের দেখেছি বড়, আজ দেখলুম তারা নগন্য। পৃথিবীর মধ্যে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর যে রূপ দেখি, আজ তা থেকে তার ভিন্ন রূপ দেখলাম। বুঝি বা এটাই তার সত্য রূপ।

রাস্তায় গিয়ে ওরা কেউ কেউ হাঁপিয়ে উঠলো। সে পূর্বের উৎসাহ আর নেই; ক্লান্তপদ আর বহন করতে পারে না। সামনে পরেশনাথ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। কিন্তু দূরত্ব কমছে না। এত সামনে মনে হয় কিন্তু অফুরন্ত রাস্তা। রাস্তা চলছে পাহাড়ের গা দিয়ে একে বেঁকে; অবশেষে ৩।৪ ঘন্টা হাটবার পর চূড়ায় উঠা গেল। ডাক বাংলোতে বসে প্রচুর পানাহার করে, Boiling point এবং Barometric pressure দেখানো হলো। তারপর আরম্ভ হলো মন্দির প্রদর্শন। ৪টার সময় ধীরে ধীরে নাশবার মুখে যাত্রা করা হলো। সন্ধ্যায় আবার নিমিয়াঘাট থেকে যাত্রা করলুম ধানবাদ মুখে।

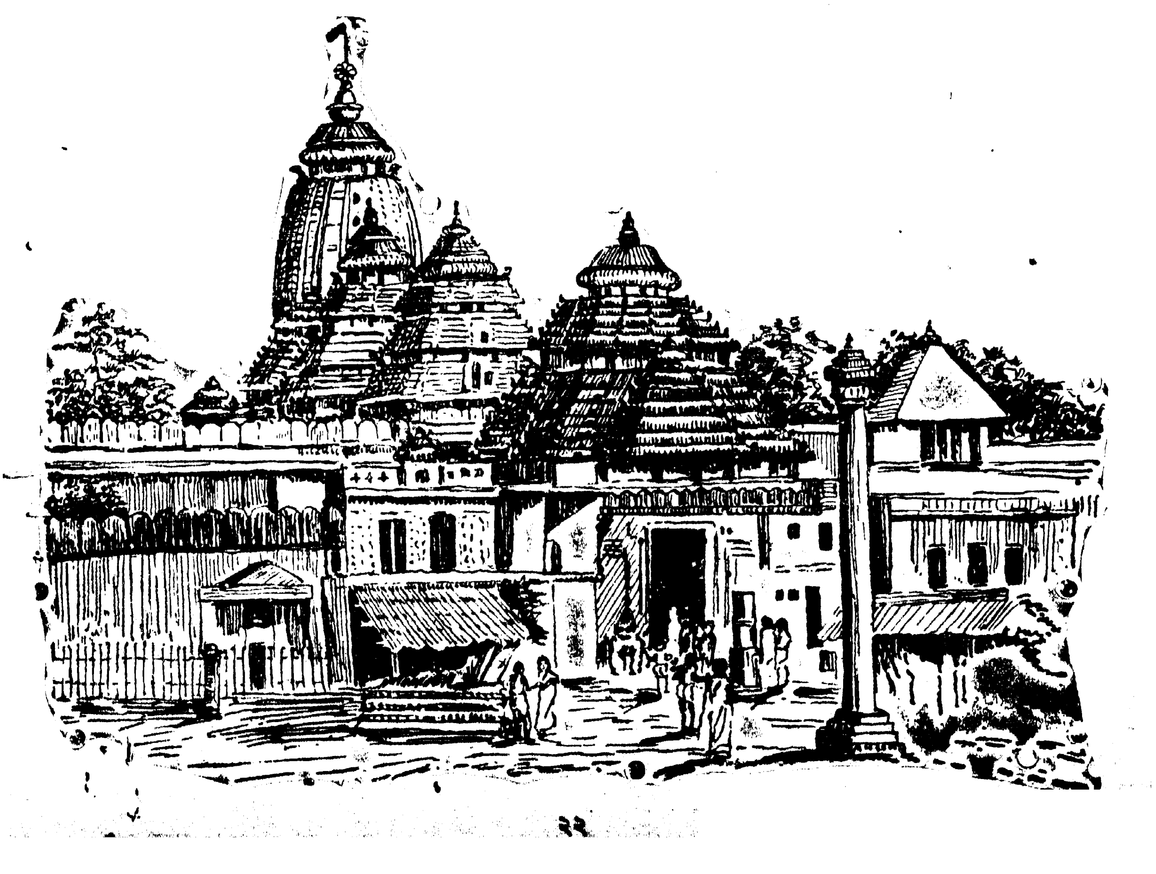
বিহারকে আমি ভালবাসি। বিহারের উন্মুক্ত অসমতল প্রান্তর খোলা আকাশ, তার নির্জন বনানী আমার কল্পলোকে যে হর্ম রচনা করে রেখেছে, তাকে আমি ভুলতে পারি না। তবু যেন কলকাতার জন্য প্রাণ কাঁদছে। কলকাতাকে যে এত ভালবাসতুম আগে জানি নি। যে কলকাতার জনকোলাহলকে এত ধিক্কার দিয়েছি, যার ধূলি ও ধূয়া আমার কাছে সর্বদা আতঙ্ক সৃষ্টি করে থাকত, আজ তা সব ভুলে গেছি। ধানবাদে বসে আমার কেবল চোখে পড়ত তার সৌন্দর্যটুকুর কথা। কলকাতার মায়া, মমতা, স্নেহ, দয়ার কথাই আমার মানসচক্ষে দেখতে পেতুম। তার মোহন রূপেই আমার কাছে মূর্ত হয়ে উঠত। জানি ধানবাদে এসেছি অস্থায়ীভাবে দু মাস বাদেই আবার চলে যাব মহানগরীর চঞ্চল বক্ষে মহাবর্তে যাব ডুবে। জানি তখন আবার এই ধানবাদের আকাশ, ধানবাদের বাতাস, ধানবাদের আকাশ ঘেরা পাহাড় আমার মনের রঙীন নেশা হয়ে উঠবে। এর প্রত্যেক দিনের ঘটনাটি আমার স্মৃতির মহামূল্যবান সম্পদরূপে রক্ষিত হবে। আজ আমার উচিত এর প্রত্যেকটি মুহূর্তকে রূপে রসে গন্ধে, 'ধীরে স্থিরে' উপভোগ করে যাওয়া; ভবিষ্যতের আনন্দের খোরাক হিসাবে একে হারানিধির মত সম আদর করা। তা পারি কই? চিরকালই ত বর্তমানকে উপেক্ষা করে এলুম। সেই উপেক্ষিত বর্তমানই ভবিষ্যতে পরম রমণীয় হয়ে উঠল। একথা কেবল মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে নয়। জাতীয় জীবনেও এর অস্তিত্ব লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছি। সেই জন্যই আমরা আমাদের বর্তমান হতে অতীতকে গৌরবময় বলে মনে করি এবং ভবিষ্যতে আবার এই উপেক্ষিত বর্তমানই গৌরবময় হয়ে উঠে।

যাওয়ার সময় হলো। শুক্রবার দিন ধানবাদ ছেড়ে যাব। হয়ত জীবনে আর ধানবাদ আসব না। কিন্তু ধানবাদ ভুলতে পারব না। নানাকারণে আমার কাছে ধানবাদ অমর হয়ে থাকবে।

যাওয়ার দশ বার দিন আগে আলাপ হলো মিঃ নিয়োগীর সঙ্গে। প্রথম দর্শনেই মনে হলো তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান লোক। আলাপ হলে বুঝলাম কেবল বুদ্ধিমান নন্, চমৎকার লোক। যাওয়ার আগে ধানবাদের জন্য মমতা বাড়তে লাগল। বুঝলাম ধূসর উদাস প্রান্তরের মূকবাণী যে মর্মকথা বহন করে বেড়ায়, তা অতল-স্পর্শী। বাক্ বিমুখ শিলা খণ্ডের অভ্যর্থনা বাক্ সর্বস্ব জনপদ হতে কোনও এক অংশে হীন নয়। বুঝি বা মূক বলেই এমন গম্ভীর। বাক্ চপলা বালিকার ন্যায় সে তার হৃদয় আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে না বলেই সে নিষ্ঠুর বা হৃদয় হীনা নয়। পৃথিবীতে দুঃখ দৈন্য বেদনা অভাবের সীমা নেই, অথচ মানুষ তা সত্ত্বেও অম্লানবদনে ওদের আশীর্বাদ শিরে বহন করে স্বচ্ছন্দে বেঁচে আছে। ভাবি মানুষ মরে গিয়ে এদের হাত থেকে নিষ্কৃতি চায় না কেন? কেন? কিসের লোভে? পৃথিবীকে সে ভালবাসে ভালবাসে এর বেদনা, এর দুঃখ এবং সুখ। ভালবাসাকে কেন্দ্র করেই সে বেঁচে আছে। ভালবাসে, পৃথিবীর দেবত্বকে, ভালবাসে এর বনানীকে, ভালবাসে এর মানুষকে, তার দয়িতকে। মূলমন্ত্র হচ্ছে ভালবাসা। পৃথিবীর সর্বত্র ভালবাসার জন্য একটা আকুতি লক্ষ্য করেছি—করার যথেষ্ট কারণ আছে। ধানবাদে এসে আমি যে স্নেহ মমতা পেয়েছি আমার মনে হয় আমার কাছে তারই মূল্য সব চেয়ে বেশী। বুঝি, হয়ত তারা ভুল বুঝে স্নেহ করেছেন, তবু তা, আমার কাছে অমূল্য সম্পদ। মিঃ ও মিসেস নিয়োগীর স্নেহ ভালবাসা আমার কাছে মহামূল্যবান সম্পদ। প্রখর মধ্যাহ্নের অসহ্য গরমের পর মিসেস নিয়োগীর স্বহস্তে প্রস্তুত এক গ্লাস ঠাণ্ডা সরবত আমাকে যে স্নিগ্ধ করত, তা অবশ্যই স্বীকার করব। কিন্তু আমার মনে হয় সেটা বড় কথা নয়। বা সেটা তার পরিচয়ই নয়। এর পিছনে যে স্নেহশীলা অন্তঃকরণ ও আন্তরিকতার স্পর্শ রয়েছে, যে স্নেহ মমত্ব বোধ রয়েছে, তার মূল্য ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। মনে হচ্ছিল মিঃ নিয়োগীর সঙ্গে আলাপ না হলে আমার ধানবাদ আসা ব্যর্থ হতো।

মানুষের কাছে মানুষের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। আইন-স্টাইন ঠিকই বলেছেন—মানুষের সমগ্র জীবন কৃতজ্ঞতার বোঝা বই কিছুই নয়। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এখানে এসে যা কিছু নূতন জিনিস পেয়েছি, যা কিছু লাভ হয়েছে, তা মানুষেরই মুক্ত দানেরই পরিচয়। অযাচিতভাবে তারা আমায় দান করেছেন—দান করেছেন স্নেহ ভালবাসা, দান করেছেন জ্ঞান, অভিজ্ঞতা। তবু কি বলব মানুষের সমাজ তিক্ত বিষাক্ত? তবু কি বলব মানুষ পশু হতেও হিংস্র?

শ্রদ্ধা ও সম্মান এখানে পেয়েছি—কিন্তু শ্রদ্ধায় লজ্জা হয়েছে—বার বার মনে হয়েছে জ্ঞানদাতা অপেক্ষা জ্ঞানসাধকের স্থান অনেক নির্বিঘ্ন, নিরাপদ! আমার মনে হয় যদি পারি জীবন ভরে কিছু শেখবার কাজেই থাকব, জ্ঞান দানের কাজে নয়। তাই মনে হয়েছে—দরকার নেই এই শ্রদ্ধার, আমার সেই Research Laboratoryর নীরব সাধনাই ভাল।



প্রবাসী বাঙালী

অধ্যাপক ডক্টর কমলকৃষ্ণ বসু, পি এইচ ডি

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্য, সমাজ ও শিক্ষা সকল বিষয়েই বাঙালীর অবস্থা আজ সঙ্কটময়। বাঙলার সংস্কৃতি আজ বিপন্ন। কেবল যে বাঙলা তাহা নহে, অপরাপর প্রদেশেও, যেমন—বিহার, আসাম, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বর্মা,—সেই একই কথা। বিহারের ১৯ লক্ষ বাঙালীর অবস্থার অনুরূপ আসামের ৪০ লক্ষ এবং যুক্তপ্রদেশের ২৭,০০০ বাঙালীর অবস্থা।

এক সময় বাঙালীর প্রতিভা ছিল অতুলনীয়; শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে তাহাদের অবদান ছিল অনন্যসাধারণ। তাহাদের বিজয়বৈজয়ন্তী সুমহান ত্যাগের বজ্রভিত্তিতে ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজ বাঙালীর জাতীয় বিপর্যয় উপস্থিত। কেবল অতীত গৌরব সম্বন্ধীয় গবেষণায় কালক্ষেপ না করিয়া এখন বাঙালীকে এই জাতীয় দুরবস্থা হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে হইবে। তাহাদিগকে অতীতের সেই গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতি ও কৃষ্টির পূত মন্দাকিনী ধারা অব্যাহত রাখিতে হইবে।

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে বাঙালী সমাজে এমনি এক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল বন্যায় বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতি তৃণখণ্ডের ন্যায় তখন ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। ভগবানের আশীর্বাদে বাঙলার কৃষ্টি সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিল প্রতিভাশালী মনীষীগণের অগ্নিপ্রেরণা ও শক্তি-সঞ্চারের ফলে। বাঙালী আবার সেই পুরাতন সংকটের সম্মুখীন। জাতীয়তাবোধ, স্বাধীনতা আন্দোলন, শাসক সম্প্রদায়ের "সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা" এই প্রকার একত্রীভূত কারণের জন্য আজিকার এই দুর্যোগ। রাজনীতি ক্ষেত্রে বাঙলার বিপ্লব-বাদ বাঙালীকে রাজপুরুষ সম্প্রদায়ের চক্ষুশূল করিয়াছে। এই অবস্থার জন্য এখন দুঃখ না করিয়া বাঙালীকে এখন নিজেদের অন্তরের গ্লানি নিরাময় করিতে হইবে; তাহাদিগকে এখন সমাজের ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া জাতীয় জীবনের শ্রী ও মাধুর্য বিকশিত করিতে হইবে।

বাঙালীর বর্তমান গতানুগতিক জীবনের একটা আমূল পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক। লুপ্ত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বাঙালীর ব্যক্তিগত বা জাতিগত জীবনে এক বৃহত্তর ও মহত্তর আদর্শ স্থাপিত হওয়া চাই। নিজেদের জীবন ক্ষুদ্র কথায় সীমাবদ্ধ না রাখিয়া ইহার এক বড় প্রকাশ দেখাইতে হইবে। জীবনের প্রবাহ বিশ্বের দিকে লইয়া যাইতে হইবে।

বাঙালীর জীবনে একান্ত অভাব প্রাণশক্তির। ভাঁটার টানে নদীর জল যেরূপ হ্রাস পায়, বাঙালী সমাজও আজ সেইরূপ নানাবিধ কারণে শীর্ণ ও ক্ষয়িষ্ণু। সঙ্ঘবদ্ধতা ও জাতীয় প্রীতি-বোধের অভাব, ঔদাসীন্য ও অনুদারতা, অসূয়া ও পরশ্রীকাতরতার ফলে বাঙালীর জীবনশক্তি ক্ষয় পাইয়াছে।

বাঙালীর সম্মুখে এখন নানাপ্রকার সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম সমস্যা, সংগঠন। আভ্যন্তরীণ বিরোধ প্রতিহত করিয়া সকলকে অগ্রসর হইতে হইবে সুগঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে। এক গরীয়ান পতাকার তলে একত্রিত হয়ে বর্জন করিতে হইবে অবিশ্বাস ও বিরোধ প্রভৃতি দুর্বলতা। করিতে হইবে এক সুচিন্তিত পরিকল্পনার দ্বারা বিভিন্ন জেলার বাঙলা-ভাষীদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন এবং বঙ্গ ও বঙ্গের বাহিরে বাঙালীদের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ রক্ষণ। প্রকাশ করিতে হইবে দৈনিক পত্রিকায় ও প্রবন্ধে যে, উত্তররাঢ়ীয়গণ দক্ষিণরাঢ়ীয় বাঙালী হইতে বিভিন্ন নন।

দ্বিতীয় সমস্যা, বাঙলা ভাষার অনুশীলন। ভাষা জাতীয় কৃষ্টির মূল উপাদান, বাঙালী ছাত্রকে বাঙলা ভাষায় প্রশ্নপত্রে উত্তর প্রদান করিতে না দিয়া উর্দু বা হিন্দিতে উত্তর প্রদান করা আদেশ জারী হওয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। স্কুল বা কলেজে বাঙলা শিক্ষা সুব্যবস্থা না থাকায় বাঙলা ভাষার অনুশীলন হইতেছে না সুতরাং প্রত্যেক স্কুলে বাঙলা ভাষা পাঠনের ব্যবস্থা থাকা এব প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা ভাষার একটি lecturershi থাকার একান্ত প্রয়োজন। পাটনা, এলাহাবাদ, নাগপুর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসনী প্রচেষ্টার অনুকরণে নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষার অনুশীলনে সহিত বাঙলা ভাষার উৎকর্ষতা সাধনের ব্যবস্থা করিলে ভারতে কৃষ্টি রক্ষা পাইবে।

প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে বাঙলা ভাষা প্রচারের প্রয়োজনীয়ত অনেক। বিরাট অভিযানের দ্বারাই বাঙলা ভাষার প্রচার হইতে পারে। সুখের বিষয় প্রায় দুই বৎসর পূর্বে বিভিন্ন বাঙাল সমাজের মধ্যে বাঙলা ভাষার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য এব নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রচার সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গে বাহিরে বেতার কেন্দ্রসমূহের অনুষ্ঠান লিপিতে বঙ্গভাষা যাহাতে স্থান পায়, এই সমতি তাহার চেষ্টা করিতেছেন। এ ছাড় ভারত সরকারের সেন্ট্রাল বোর্ড অব এডুকেশনের এডভাইসর কমিটি কর্তৃক নিযুক্ত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা কমিটির মধ্যে বাঙাল সদস্য গ্রহণের জন্যও উক্ত সমিতি চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। বঙ্গভাষ প্রচার সমিতির এই শুভ প্রচেষ্টায় প্রত্যেক বাঙালীরই সহযোগিত করা উচিত এবং কার্যপ্রসারের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অর্থ ও কর্ম সরবরাহ করা দরকার।

আর এক কথা। প্রত্যেক বাঙালীই নিজেদের মধ্যে কথা বার্তা বলিবার সময় বা বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের নিকট লিখি পত্রে বাঙলা ভাষা ব্যবহার করিলে এবং বাঙলা মাসিক ও অন্যা পত্রিকাবলী ক্রয় করিলে বাঙলা ভাষার উন্নতি সাধিত হইবে।

তৃতীয় সমস্যা স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যই প্রাণশক্তির উপাদান দুর্বল স্বাস্থ্যই নিষ্ক্রিয়তা ও লক্ষ্যহীনতার জন্য একমাত্র দায়ী ছাত্র-ছাত্রীই দেশের ভবিষ্যৎ কর্মী। ভগ্নস্বাস্থ্য ও প্রাণহীন দে লইয়া তাঁহারা জাতি বা দেশের কোন কার্য করিতে পারে না একমাত্র উজ্জ্বল স্বাস্থ্য ও সংহত চরিত্র ছাত্র-ছাত্রীই দুঃখ কষ্ট ত্যাগের মধ্য দিয়া জাতিকে জয়যুক্ত করিতে পারে। কিন্তু খুব দুঃখের বিষয়, বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীর নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি কো লক্ষ্যই নাই। স্থানে স্থানে হয়তো এক আধটা ব্যায়ামাগার দেখ যায়, কিন্তু সেখানে কয়টি ছাত্র-ছাত্রী নিয়মিত ব্যায়াম করে বাৎসরিক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শনীর সহিত ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসা জলবুদ্বুদের ন্যায় দেখা দিয়া ক্ষণকালেই তিরোহিত হয়।

চতুর্থ সমস্যা, স্ত্রীশিক্ষা। নারীজাতিকে শিক্ষা ও ব্যায়ামের দ্বারা বলশালিনী না করিলে নারীর মর্যাদা ও নারীর সম্মান রক্ষা হইবে না। স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত রীতি অপেক্ষা অন্যরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কুটীর শিল্প সম্বন্ধীয় শিক্ষার দ্বারা নারীদিগকে জীবিকা উপার্জনক্ষম করিতে পারিলে এবং স্ত্রীশিক্ষা গার্হস্থধর্মের উপযোগী হইলেই সমাজের মঙ্গল।

পঞ্চম সমস্যা, সমাজ সংস্কার। বিজাতীয় ভাবপ্রবাহের সংস্পর্শে আজ বাঙালীর সামাজিক জীবন বিষাক্ত। সমাজে ধর্মের বিশেষ প্রভাব নাই। আচার অনুষ্ঠান সমাজ হইতে তিরোহিত। ধর্ম ও সমাজে প্রবল বিশৃঙ্খলতা। সমাজ হইতে কদাচার ও দুর্নীতি দূরীভূত হইলে জাতীয় জীবন আবার উদ্বুদ্ধ হইবে।

নই আবার কার্যে সম্মুখ এবং সাফল্যের মহিমায় আত্মপ্রত্যয়-ন্ন এক নূতন বাঙালী জাতি দেখা দিবে।

ষষ্ঠ সমস্যা, অর্থনৈতিক। বাঙালীর চিত্ত আজ অর্থনৈতিক ঘাতে ক্ষতবিক্ষত। ইংরেজী শিক্ষার ফলে ও তীক্ষ্ণমেধার ণ সহজলভ্য সরকারী বা বেসরকারী চাকুরীর সাহায্যে ঙালীরা এতদিন তাহাদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিয়া সিয়াছে। কিন্তু আজকাল চাকুরী প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও রে সহিত সম্প্রদায় বিশেষের চাকুরী সংরক্ষণ নীতি এবং প্রবল দেশিকতার ফলে দেখা দিয়াছে বেকার সমস্যা ও সামাজিক রিদ্রতা। এখন কালের গতি অনুসারে শিল্প বাণিজ্যের দ্বারা াই সামাজিক অবস্থার উন্নতিকরণ। শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি বধান দ্বারা জাতীয় অর্থের নির্গম রুদ্ধ হয় ও ফলে বেকার সমস্যার সমাধান হয়। শিল্পোন্নতির দ্বারা জাতীয় অর্থসম্পদ বৃদ্ধি এবং কর্মসৃষ্টি ও অন্নসৃষ্টি হইতে পারে।

সুখের বিষয় মধ্যে মধ্যে বাঙলার আর্থিক দুর্গতির কারণ নির্ণয় ও তাহার প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ হইতেছে। কখনও কখনও বা বাঙলার আর্থিক উন্নতি বিধানকল্পে সুচিন্তিত ও যুক্তিসংগত পরিকল্পনা উপস্থাপিত হইতেছে। শিল্পক্ষেত্রে বাঙালীর অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা হইতেছে। শিল্পোন্নতি-কল্পে বিভিন্ন কর্মচেষ্টাকে যথাভাবে নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করিবার জন্য শিল্প সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সভ্য লইয়া শিল্পবোর্ড প্রতিষ্ঠার জন্য পরিকল্পনা যুক্তিসংগত। অল্প মূলধন বিশিষ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য ছোট ছোট পণ্যশিল্পই উপযোগী। বহু অর্থ ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ বৃহৎ শিল্প পরিচালন কার্য পরিকল্পিত শিল্পবোর্ডের উদ্যোগে স্থাপিত লিমিটেড কোম্পানীর উপরই ন্যস্ত থাকিলে ভাল হয়।

মোটের উপর, সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা এবং জাতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারে বাঙলা ও বাঙলার বাহিরের শিল্পসমূহের উন্নতির সহিত বাঙালীর সামাজিক জীবনে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সমাধান হইবে। পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকার ফলে এবং নিয়মানুবর্তিতার অভাব ও দুর্নীতির জন্য বাঙালী যে আজ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহা হইতে রক্ষা পাইয়া তাহারা ক্রমে জীবনের অগ্রগতির পথে যাত্রা করিবে। বাঙালীর জাতীয় জীবন আলস্য ও গ্লানিমুক্ত হইয়া নব নব কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে এবং আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতি আত্মগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবে। *

---

* মজঃফরপুরে অনুষ্ঠিত বাঙালী এসোসিয়েসনের ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।



ছদ্মবেশী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৩

ক্ষণকালের মধ্যে খসরুবাগে উপনীত হইয়া পথপার্শ্বে একটা গাছতলায় গাড়িখানা রাখিয়া অবনীশ গাড়ি হইতে অবতরণ করিল; তাহার পর সুলেখার দিকের দরজাটা খুলিয়া দিয়া সহাস্যমুখে বলিল, "আসুন!"

প্রসন্নমুখে একবার অবনীশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুলেখা গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল।

দীপালিও সঙ্গে সঙ্গে নামিতে যাইতেছিল; অবনীশ তাহাকে বাধা দিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, "তুমি গাড়িতে ব'সে থাক দীপু।"

বিস্মিতকণ্ঠে দীপালি বলিল, "কেন গৌরবাবু?"

অবনীশ বলিল, "তুমি ব'সে ব'সে গাড়িটা আগলাও। গাড়িতে কেউ না থাকলে চোরে যদি চুরি ক'রে নিয়ে যায়, তখন মুস্কিল হবে ত?"

যুক্তির বহর দেখিয়া দীপালিরও মুখে মৃদু হাস্যের ক্ষীণ আভা ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে বিষয়ে কোন মন্তব্য না করিয়া সে বলিল, "আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?"

"আমরা?—ঐ সামনের গাছতলায় রোদ্দুরের দিকে একটা বেঞ্চি রয়েছে না?—ঐ বেঞ্চিতে ব'সে তোমার মাসিমা একটু রোদ পোয়াবেন।"

"কেন?"

"শুনলে ত' এখনি,—ওঁর ভয়ানক শীত করছে।"

এক মুহূর্ত কি ভাবিয়া দীপালি বলিল, "আমারও শীত করছে গৌরবাবু।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অবনীশ বলিল, "ও! তোমারও শীত করছে? তাহ'লে খবরদার তুমি রোদ্দুরে যেয়ো না, চুপটি ক'রে গাড়ির মধ্যে ছায়ায় ব'সে থাক। ছোটদের শীত করলে রোদ্দুরে গেলে অসুখ করে।"

"আর, বড়দের?"

অবনীশ বলিল, "বড়দের রোদ্দুরে গেলে অসুখ ভাল হ'য়ে যায়।"

নামিবার পক্ষে আর কোন পথ নাই দেখিয়া দীপালি হতাশ হইয়া ধীরে ধীরে সীটের উপর বসিয়া পড়িল।

পূর্বোক্ত বেঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে সুলেখা বলিল, "দীপালি এখনো কথামালা পড়েনি, তাই; নইলে সত্যিসত্যিই তোমাকে একটি দুরাত্মা ব'লে মনে করত।"

সহাস্যমুখে অবনীশ বলিল, "কেন বল দেখি?"

সুলেখা বলিল, "কথামালার সেই বাঘের মতো তোমারও ছলের অসম্ভাব নেই দেখে।"

সুলেখার কথা শুনিয়া অবনীশ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; বলিল, "বেশ যা হ'ক! যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর।"

অপাঙ্গে অবনীশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া সুলেখা বলিল, "কিন্তু তোমাকে যদি চোর বলি, তা হ'লে বোধ হয় খুব অন্যায় হয় না।"

সহাস্যমুখে অবনীশ বলিল, "কেন মশাই, কি এত আপনার ধন-দৌলত চুরি করেছি শুনি?"

সুলেখা বলিল, "লিস্ট দেবার দরকার নেই, একটির নাম করলেই যথেষ্ট হবে।" বলিয়া পুনরায় মুখ টিপিয়া হাসিল।

অবনীশ বলিল, "কিন্তু 'আর-একটি'র নাম না করলে ত' যথেষ্ট বাদ দেওয়াও হবে সুলেখা;—সেটি যে সযত্নে সামলে সামলে রেখেছ, সে কথা ভুলে যেয়ো না।"

অবনীশের কথা শুনিয়া সুলেখার মনে কৌতূহল উদগ্র হইয়া উঠিল; বলিল, "'একটি' বলতে তুমি কি বুঝলে শুনি, যে 'আর-একটির' কথা বলছ?"

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে গাছতলায় বেঞ্চের নিকট আসিয়া পড়িয়াছিল। অবনীশ বলিল, "এস, আগে বসা যাক, তারপর বলছি।"। বলিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া বেঞ্চটা ঝাড়িতে লাগিল।

বিস্মিতকণ্ঠে সুলেখা বলিল, "'বসা যাক্' বলছ কি গো! তুমিও বসবে না কি?"

সুলেখার সম্মুখে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া অবনীশ বলিল, "তবে তুমি কি বলতে চাও? শুধু তুমি বসবে, আর আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব?"

সুলেখা বলিল, "নিশ্চয়! প্রভু-পত্নীর বিবাহিতা বোনের পাশে একজন মাইনে-করা ড্রাইভার বসবে, এ কিছুতেই হ'তে পারে না।" তারপর বেঞ্চের উপর উপবেশন করিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিল, "না গৌরহরি-বাবু, অবিবেচনার কাজ আপনি কিছুতেই করবেন না। কাল মোটরে আপনার পাশে বসেছিলাম ব'লে দিদি অত রাগ করেছিলেন। তার ওপর আজ যদি আবার দীপুর মুখে শোনেন যে, আপনার সঙ্গে পাশাপাশি এক বেঞ্চে বসেছি, তাহ'লে আমাকে আর আস্ত রাখবেন না!"

সুলেখার প্রতি ক্ষণকাল নিঃশব্দে তাকাইয়া থাকিয়া অবনীশ বলিল, "তা না রাখেন, না-ই রাখবেন,—কিন্তু তুমি এখন থেকে আমাকে গৌরহরি ব'লে ডাকবে না কি সুলেখা?"

একটা হাল্কা তরল হাস্যে সমস্ত মুখখানা উদ্ভাসিত করিয়া সুলেখা বলিল, ...

ধ'রে ডাকতে ভারি মিষ্টি লাগছে।" তারপর অবনীশের চকিত-বিহ্বল মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তাতে তোমার আপত্তির কি কারণ আছে। এমন ত' অনেক লোকের দুটো ক'রেও নাম থাকে,—একটা পোষাকী, আর একটা আটপৌরে।"

অবনীশ বলিল, "আরে, তুমি শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপার করবে জানলে গৌরহরি না রেখে প্রাণবল্লভ কিংবা হৃদয়নাথ গোছের একটা সরস নাম রাখতাম।"

সহাস্যমুখে সুলেখা বলিল, "তার জন্যে তোমার আক্ষেপ করবার কোন কারণ নেই। ঐ ধরণেরই অনেক সরস নামে নিত্য তোমাকে মনে মনে ডাকি;—গুণলে বোধ হয় একশ' আটের বেশি হ'য়ে যাবে।" বলিয়া খিল্‌খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই প্রসঙ্গটা পরিবর্তিত করিবার উদ্দেশ্যে বলিল, "যে কথা জিজ্ঞাসা করলাম, তার উত্তর দিলে না ত? 'আর-একটা' যে বলছিলে, সেটা কি জিনিস?"

বেঞ্চের পিঠের উপর ভর দিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া অবনীশ বলিল, "তোমার 'একটা'র মত সে জিনিস অস্পৃশ্য, অদৃশ্য, ইন্দ্রিয়াতীত নয়। তার রূপ আছে, ভার আছে;—তাকে দেখা যায়, ছোঁয়া যায়; তাকে টানা যায়, ঠেলা যায়;—তার পরিচর্যার জন্যে তাঁতি, সেকরা, দরজি, মুচি প্রভৃতির সাহায্য বিশেষভাবে দরকার হয়। এখন বোধ হয় বুঝতে পারছ, সে কি জিনিস?"

স্মিতমুখে সুলেখা বলিল, "কতকটা।"

অবনীশ বলিল, "তবু সম্পূর্ণ নয়? কতকটা? আচ্ছা, আজ রাত্রে তাহ'লে সেটাকে চুরি ক'রে তোমাকে নিঃসন্দেহে বুঝিয়ে দেবো সেটা কি জিনিস। তুমি ত' একা একঘরে শোও। চোর অপবাদ যখন দিলে, তখন শুধু ফুল চুরি না ক'রে ফলও চুরি করা যাক।"

অবনীশের কথা শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিয়া সুলেখা বলিল, "ছি, ছি, কখ্‌খনো সে কাজ কোরো না,—কখ্‌খনো চুরি ক'রে ওপরে যেয়ো না। বাড়িভরা চাকর-বাকর,—কেউ কোন রকমে দেখে ফেল্‌লে কি ভাববে বল দেখি?"

অবনীশ বলিল, "কিন্তু শেষ পর্যন্ত ত' তুমি আর আমি স্বামী-স্ত্রী সুলেখা।"

সুলেখা বলিল, "কিন্তু তার আগে তুমি অভিনেতা আর আমি অভিনেত্রী। তুমি ত' বলেছ, আমাদের এ অভিনয়ে উপস্থিত তোমার আর আমার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভুলে থাকতে হবে।"

অবনীশ বলিল, "কিন্তু সে ভুলে থাকতে হবে স্টেজের উপর,—অন্যত্র নয়। রাত বারটার সময়ে ঘুমন্ত বাড়িতে তোমার ঘর স্টেজ নয় সুলেখা, তখন তোমার ঘর গ্রীন্ রুম।"

মাথা নাড়িয়া সুলেখা বলিল, "না, এ অভিনয়ের মধ্যে গ্রীন্ রুম, ব্লু রুম নেই,—এর সমস্তটাই স্টেজ্।"

এক মুহূর্ত সুলেখার দিকে চাহিয়া অবনীশ বলিল, "তুমি অতিশয় গোঁড়া সুলেখা।"

স্মিতমুখে সুলেখা বলিল, "স্বীকার করছি, আমি অতিশয় গোঁড়া।"

"লেখাপড়া করা তোমার বৃথা হয়েছে।"

তেমনি সহাস্যমুখে সুলেখা বলিল, "তা-ও স্বীকার করছি।" তারপর বেঞ্চ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তোমারও ব'সে কাজ নেই, আমারও ব'সে কাজ নেই, চল একটু বেড়িয়ে বেড়াই।"

কথোপকথনের মধ্যে এক সময়ে সুলেখা বলিল, "সময়ে সময়ে তোমার দুঃসাহস দেখে আমার বুক কাঁপে। দিদি-জামাইবাবুদের সঙ্গে তুমি এক এক সময়ে এমনভাবে কথা-বার্তা কও, এমন আচরণ কর যে, আমার মনে হয়—এই বুঝি ধরা প'ড়ে গেলে।"

অবনীশ বলিল, "ওটা দুঃসাহস নয় সুলেখা, ওটা সৎসাহস। ধরা প'ড়ে গেলে তার দণ্ড ত' হবে তোমাকে পাওয়ার পুরস্কার? তাতে ক্ষতিটা কোথায় বল?—সেই লোভেই আমার অতটা সাহস করবার সাহস হয়। যে যুদ্ধে হার হওয়ার ফলে রাজকুমারীকে অধিকারে পাওয়া যাবে ব'লে নিশ্চয় জানি, সে যুদ্ধের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে মাতামাতি করা দুঃসাহসের কাজ নয়,—সৎসাহসের কথা।"

সুলেখা বলিল, "সে না-হয় তোমার দিকের কথা। কিন্তু ওঁরা যে এক এক সময়ে তোমার ছল-চাতুরী কেন ধরতে পারেন না, সে ভেবে আশ্চর্য হ'য়ে যাই!"

সুলেখার কথা শুনিয়া অবনীশ হাসিতে লাগিল; বলিল, "মানুষকে যে কত সহজে ভ্রমের মধ্যে নাকাল করা যায় তার ধারণা নেই তোমার সুলেখা। একজন ব্রাহ্মণ কাঁধে ক'রে একটা ছাগলছানা নিয়ে যাচ্ছিল, তারপর গোটা চারেক লোকের ভুল বোঝানোর ফলে কেমন ক'রে সেই ব্রাহ্মণের চোখে ছাগল-ছানাটা কুকুরছানায় পরিণত হ'য়েছিল, সে গল্প জানত?"

স্মিতমুখে সুলেখা বলিল, "জানি।"

"আচ্ছা, তা যদি জান,—তা হ'লে তুমি, আমি, তোমার দাদা আর বিনয়—এই চারজনের মিলিত ছলনার ফলে একজন ভায়রাভাইকে ড্রাইভারে পরিণত করা আর কায়েম রাখা খুব কঠিন কাজ কি? মানুষের মনের চোখ যদি একবার বিশেষ একটা কোনও রঙ-এ রঙিয়ে দিতে পার, তা হ'লে সে রঙ থেকে দৃষ্টিকে মুক্ত করা সহজ কথা নয়। তোমার আমার ওপর সন্দেহ হবার এমনি যেটুকু আশঙ্কা থাকা সম্ভব, বিনয় আর তোমার দাদার দ্বারা সেটুকুর সম্পূর্ণ কাটান হয়েছে।"

কথায় কথায় বেলা বাড়িয়া উঠিল। সুলেখা বলিল, "আর ত' রদ্দুর ভোগ করতে পারা যায় না, চল গাড়িতে গিয়ে বসা যাক।"

অভিনয়ের ভবিষ্যৎ পরিচালনা সম্বন্ধে যৎসামান্য পরামর্শ এবং আলোচনা করিয়া উভয়ে গাড়িতে আসিয়া বসিল।

দীপালি বলিল, "মাসিমা, তোমার শীত ভাল হ'য়ে গেছে?"

দীপালির কথা শুনিয়া সুলেখা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; বলিল, "হ্যাঁ, গেছে। তোমার?"

"আমারও গেছে।"

দক্ষিণ হস্ত দিয়া দীপালিকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিয়া সুলেখা বলিল, "লক্ষ্মী মেয়ে তুমি।" তারপর নিজের স্কার্ফটা খুলিয়া লইয়া তাহার গায়ে জড়াইয়া দিয়া ডাকিল, "গৌরহরিবাবু!"

অবনীশ বলিল, "আদেশ করুন।"

"কলকাতায় সুতপাকে 'তোমার মনের গোপন কথা' গানটা আপনি যে শেখাচ্ছিলেন, সেই গানটা কাল বিকেলে আমাকে গাইতে শুনেছিলেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনেছিলাম।"

"ঠিক হচ্ছিল ?"

"ঠিকের চেয়েও ভাল হচ্ছিল।"

"তার মানে ?"

"তার মানে, জায়গায় জায়গায় আমার চেয়েও ভাল হচ্ছিল।"

"ও, বুঝেছি। অনুগ্রহ ক'রে গুণগুনিয়ে গানটা একবার গাইবেন ?—তা হ'লে সেই জায়গাগুলো আপনার মতন ক'রে শিখে নিই ?"

সুলেখার কথা শুনিয়া অবনীশ হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "পরিহাস করছিনে, সত্যিই বলছি।"

সুলেখা বলিল, "আমিই পরিহাস করছিলাম, আপনি এখন গান।"

প্রথমে একটু গুন গুন করিয়া সুর ভাঁজিয়া, তাহার পর কাশিয়া গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া গভীর সুমিষ্ট কণ্ঠে অবনীশ গান ধরিল,

তোমার মনের গোপন কথা
আমার মনে বাজে,
তবু বুঝিনা যে, বুঝিনা যে!
বুঝিনা যে কি যে আছে,
তোমার ভাষার পাছে;
বুঝিনা ক কি যে অতল গহন
অন্তর তব যাচে!
আশা-নিরাশার আলোক-ছায়ার
কোন্ খেলা তার মাঝে,
বুঝিনা যে, বুঝিনা যে!

অবনীশকে বাধা দিয়া সুলেখা বলিল, "এবার শুনুন, আমি বলি।" বলিয়া গাহিতে লাগিল—

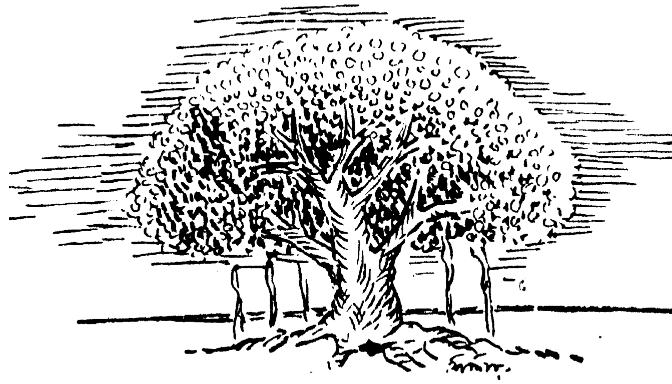
আধেক যখন বুঝি,
ভয়ে ভয়ে মরি মনে!
শঙ্কিত হিয়া কাঁপে
অজানার অকারণে!

তাহার পর অবনীশের বাম স্কন্ধে মৃদু করাঘাত করিয়া সুলেখা বলিল, "আপনিও ধরুন, দুজনে গাই।"

শীতের দিনের শান্ত অলস মধ্যাহ্নের রৌদ্রস্নাত তরুগুল্ম-লতা পর্যন্ত স্তব্ধ আনন্দে যুগল কণ্ঠ নিঃসৃত সেই অপূর্ব সংগীত শুনিতে লাগিল—

তোমার বনের শাখে
না জানি কি পাখী ডাকে!
না জানি তোমার তরুপল্লবে
কি ফুল ফুটিয়া থাকে!
দুঃখ-সুখের অশ্রু-হাসির
কোন্ নির্ঝর রাজে!
বুঝিনা যে, বুঝিনা যে!

ইহার পর অবনীশ যখন গাড়িতে স্টার্ট দিল, তখন ঘড়িতে ঠিক এগারোটা বাজিয়াছে। (ক্রমশ)



বিচিত্র বার্তা

সৌরজগৎ

সূর্য, গ্রহ, গ্রহপুঞ্জ ও উপগ্রহ লইয়া সৌরজগৎ গঠিত। সূর্য একটি জ্যোতিষ্মান বিরাট নক্ষত্র। ইহার চারিদিকে বৃত্তাকারে নয়টি গ্রহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা যথাক্রমে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্, নেপচুন ও প্লুটো। এই সকল গ্রহদের মধ্যে সূর্য হইতে বুধের দূরত্ব সর্বাপেক্ষা কম এবং প্লুটোর সর্বাপেক্ষা বেশী। এ্যাস্টিরয়ডস্ গ্রহাণুপুঞ্জ মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে অবস্থিত। গ্রহের চারিদিকে ঘূর্ণমান উপগ্রহের সংখ্যা গ্রহের আয়তনের উপর অনেকটা নির্ভর করে। বুধ, শুক্র ও প্লুটোর কোন উপগ্রহ নাই এবং এই গ্রহ তিনটি আকারেও অপেক্ষাকৃত অনেক ক্ষুদ্র। পৃথিবী ও নেপচুনের একটি করিয়া,



স্যার জেমস্ জীনস্

মঙ্গলের দুইটি, ইউরেনসের চারটি, শনি ও বৃহস্পতির নয়টি করিয়া উপগ্রহ বর্তমান। বলা বাহুল্য, গ্রহদের মধ্যে বৃহস্পতির আয়তন সর্বাপেক্ষা বেশী। ইহা ছাড়া, সৌরজগতের পরিচিত পরিবারবর্গের মধ্যে মাঝে মাঝে অপরিচিত দুই-একটি জ্যোতিষ্কও দেখা গিয়া থাকে। ধূমকেতু ও উল্কা এই জাতির জ্যোতিষ্ক।

গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি লইয়া গঠিত সৌরজগৎ বহু প্রাচীন কাল হইতেই বৈজ্ঞানিকদিগের বিস্ময় ও চিন্তা আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। বুধ হইতে শনি পর্যন্ত ছয়টি গ্রহের সংবাদ বহু পূর্ব হইতেই পৃথিবীর বিদ্বৎ-সমাজ জানিতেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে হার্সেল সাহেব ইউরেনস্ গ্রহটিকে আবিষ্কার করেন এবং তদবধি প্রায় এক শতাব্দী কাল ইউরেনসই দূরতম গ্রহ বলিয়া পরিচিত ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন জ্যোতির্বিদগণ আবিষ্কার করিলেন, সূর্য ও অন্যান্য পরিচিত গ্রহের আকর্ষণের ফলে ইউরেনসের যে কক্ষপথে ভ্রমণ করা উচিত, তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। ইহাতে সন্দেহ উপস্থিত হইল; এই ব্যতিক্রমের মূলে হয়ত অন্য কোন অপরিচিত গ্রহের আকর্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জে সি এডামস্ (J. C. Adams) ও প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ জে জে লেভেরিয়ে (U. J. J. Leverrier) নামক দুই তরুণ গণিতশাস্ত্রবিদ্ অঙ্ক কষিয়া এই অজ্ঞাত গ্রহের সংস্থান নির্ণয় করিলেন। তাঁহাদের নির্দেশমত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিকগণ এডামস্ ও লেভেরিয়ের অনুমিত কক্ষপথের কাছাকাছিই নেপচুন গ্রহটিকে অধিকার করিলেন। ধীরে ধীরে নেপচুনের সকল তথ্য সংগৃহীত হইবার পর ইউরেনসের কক্ষপথ নূতন করিয়া নির্ধারণ করিতে গিয়া দেখা গেল, তথাপি একটু গরমিল রহিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ ইউরেনসের উপর আরও একটি অনাবিষ্কৃত গ্রহের আকর্ষণ বিদ্যমান। এই গরমিল মিলাইতে হইলে, নূতন গ্রহটির আয়তন, সূর্য হইতে ইহার দূরত্ব প্রভৃতি কতখানি হইবে, তাহা কষিয়া বাহির করিবার ভার আমেরিকার ফ্ল্যাগস্টোন মানমন্দিরের অধ্যাপক পার্সিভ্যাল লওয়েল (Percival Lowell) গ্রহণ করিলেন। দুর্ভাগ্যবশত পার্সিভ্যাল তাঁহার গণনার ফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পনের বৎসর পর ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই অজ্ঞাত গ্রহটি আবিষ্কৃত হয়। এই গ্রহটিই প্লুটো নামে অভিহিত।

অতিশয় গোঁড়া।

সৌরজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু মতবাদ প্রচলিত আছে। কোন না কোন সময় ইহাদের একটি প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই সকল মতবাদ অনুমান ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শাইয়া বিশ্বসৃষ্টির অবিসংবাদিত কারণটুকু বাহির করা এখনও সম্ভব হয় নাই। বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে যেগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল, সংক্ষেপে তাহাদের আলোচনা করিব।

প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক লাপ্লাস্ কর্তৃক সমর্থিত ও পরিমার্জিত নীহারিকাবাদ বহুদিন পর্যন্ত বিজ্ঞান জগতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল। নীহারিকাবাদ অনুসারে নক্ষত্রের পূর্বাবস্থা নীহারিকা। নীহারিকা সুদূর বিস্তৃত উত্তপ্ত ও উত্তেজিত বায়বীয় পদার্থের দ্বারা গঠিত। কালক্রমে এই উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থ শীতল হইয়া সংকুচিত হয় ও পরিশেষে নক্ষত্রে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। কিন্তু নীহারিকা কেবলমাত্র একটি নিশ্চল বায়ুপিণ্ড নহে, ইহা সদা ঘূর্ণমান। শীতলতা প্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার আবর্তন বেগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া এইরূপ অবস্থায় পৌঁছে যে, উত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ড উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়ে। এই গ্যাসপিণ্ডগুলিই শীতল হইয়া পরবর্তীকালে গ্রহ ও উপগ্রহে রূপান্তরিত হয়। মতবাদটি যুক্তিপূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু আবর্তনের গতি যতখানি দ্রুত হইলে বায়ুপিণ্ডের উৎক্ষেপন সম্ভবপর, নক্ষত্রের বায়বীয় অবস্থায় এইরূপ দ্রুত আবর্তন সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। কিন্তু নীহারিকাবাদের সমর্থকগণ ইহাতে দমিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, নীহারিকা বিভিন্ন অংশ পৃথক্ পৃথক্ভাবে ঘনীভূত হইয়া কেন্দ্রস্থ ঘনীভূত বিরাট নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণে বাঁধা পড়িয়া [illegible]

রঙ্গজগৎ

পরিচয়—নিউ থিয়েটার্স ঃ নীতিন বসু পরিচালিত। শ্রেষ্ঠাংশে—কানন, সাইগল, রতীন ইত্যাদি। সংগীত পরিচালনা ঃ রাইচাঁদ বড়াল।

একটা গল্প বলি, শুনুন। পুত্র রামচরণ বিদেশে প্রচণ্ড পাণ্ডিত্য ও বিপুল খ্যাতি অর্জন করিয়া স্বদেশে ফিরিতেছে একথা স্বয়ং পিতা শ্যামচরণ পাঁচখানা গ্রামে ঢোল সহরৎ জানাইয়া দিয়াছেন। শ্যামচরণের ঘুম নাই ; জানিত ও অজানিত বহু সুবিজ্ঞ অভিজ্ঞের সম্মুখে পুত্রকে পরিচয় করাইয়া দিবেন এই সংকল্পও অপ্রকাশ রাখেন নাই ; যথারীতি ব্যবস্থা ও আমন্ত্রণও করিয়াছেন। বহু প্রত্যাশিত পুত্র আসিল ; একা নহে, সংগে একটি বিদেশী তরুণী এবং জাহাজ ঘাট হইতেই পুত্র এমন দ্বিজাতীয় আচরণ সুরু করিল যে, পিতা অপরকে পরিচয় করাইয়া দিবেন কি, আত্মজের পরিচয় পর্যন্ত গোপন রাখিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অতি প্রিয়জন—প্রিয়তম ; তাহার পরিচয় করাইয়া দিতে কুণ্ঠা জাগিবার মত মর্মান্তিক অবস্থা আর কি হইতে পারে। পিতা ভাবিলেন, ইহা অপেক্ষা বাণপ্রস্থ ভাল।

গল্প থাক্। এবার পরিচয়ের কথা বলি। নিউ থিয়েটার্স বাঙালী প্রতিষ্ঠান। ভারতজোড়া তার খ্যাতি। বাঙালীর গৌরব। কিন্তু বাঙালীর দুর্ভাগ্য নিউ থিয়েটার্সের খ্যাতি আজও জীবনমরণের ঊর্ধে উঠিতে পারিল না। চিত্র লইয়া তর্ক তুলিব না ; যদি পয়সার পরিমাপে জনপ্রিয়তা মাপিতে হয়, তবে সেদিক দিয়া জীবন-মরণ অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহার পর ? তাহার পর আসিল আলো-ছায়া, আসিল পরাজয়, ডাক্তার। জীবনমরণে মনে করা গিয়াছিল বুঝিবা অন্তর্ক্ষয়ী যক্ষ্মা ভাল হইল। তেমনি পরাজয়ের পর "ডাক্তার" আসায় ভরসা পাইয়াছিলাম নাভিশ্বাস আবার বোধ হয় ফুসফুসে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাহার পর অভিনেত্রী ও নর্তকীর যে রূপ প্রকট হইল তাহাতে আশাহত হইবার বাকী কিছু থাকিল না। তবু মনে হইয়াছিল, হয়তো বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবার সতর্ক হইবেন। ভাবিয়াছিলাম, নিউ থিয়েটার্সের গল্পে রুচি বদ্‌লাইবে। ডাক্তার চিত্রে সে আশাও জাগিয়াছিল। বাঙলার কথা-সাহিত্য ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ ; সংখ্যাল্পও নহে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সে কথা যেন অপ্রমাণিত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। পরিচয় তাহার প্রমাণ। পরিচালনা, ছবির treatment, সংগীত ভাল হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র কাহিনীর জন্য এমন একখানি ব্যর্থ ছবির পরিচয় দিতে আমাদের কুণ্ঠা জাগিতেছে। গল্পই ছবির মেরুদণ্ড ; যেখানে মেরুদণ্ডই ভাংগা, ছবি দাঁড়াইবে কাহার উপর।

একটি গানের স্কুল। জনৈক সংগীত পিয়াসীর খেয়াল। খেয়ালীর অভিনবত্বের আগ্রহ ও অহংকার আছে। কাহিনীকার ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। যিনি এ ভূমিকায় অভিনয় করিলেন তিনি ইহাকে বিদ্রূপ করিলেন। বলিবার বা চলিবার ভংগী নিছক ব্যংগ। আন্তরিকতার [illegible] সাট পরানোটা নিউ

যাইবে জনার্দন—চাকর নহে, পুরাতন চাকর, বাবুকে তুই বলিয়া ডাকে! হায় শরৎচন্দ্র কবে যে এক গুচ্ছ "রতন" সৃষ্টি করিয়া গিয়াছ তাহারা কি আজ মরিল না। ইহারা যে সেলুলয়েডে ভর করিয়াছে!

বাপ! কলিকাতায় আর এক বজ্জাত বাপ! সতীর বাবা। বাড়িওয়ালা। নীচে মজনু—অনন্ত রায়। ধোঁয়া লইয়া বাড়িওয়ালা-জনার্দনে এক হাত হইয়া গেল—শেষ পুলিশ পর্যন্ত। কিন্তু জেলখানাটা বাঁচিল লায়লী মজনুর জন্য। মজনু যে কবি অনন্ত রায় এ কথাটা জানিতে পারিয়া অমন যে বজ্জাত বাপ সেও জল হইয়া গেল জল গরম হইয়া চা হইল—তারপর যা হয়। পুলিশের সহি ইয়ার্কিটুকু পরিচালক নিজে কিরূপ উপভোগ করিয়াছেন জানি • সাধারণের অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। একে তো অনর্থক হায়রাণি, দ্বিতীয়ত দারোগার হাত হইতে জনার্দন লাঠিটা ছিনাইয়া লইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলে দারোগা কনষ্টেবলকে লক্ষ্য করিয়া যে ভংগীটি করিল তাহা মাতালে করে।

সতীর পিছনে অনন্ত—man persues woman. আসলে তাহা নয় তাহারা যথাক্রমে একই স্কুলের ছাত্রী ও নবনিযুক্ত কবি। সাইগল চ্যাপলিনের ভংগীতে চলে। স্থির হয়, বাৎসরিক উৎসবে সতী গান গাহিবে—অনন্ত রায় কবিতা লিখিবে। সভাপতি আশুতোষ উৎসবের উদ্বোধন করেন—সতীর গানে শ্রোতৃবৃন্দ এমনই মুগ্ধ হয় যে, পরিচালকের সৌজন্যে তাহারা একেবারে সতীর গায়ের উপর আসিয়া পড়ে। মালা, মেডেল সবই গায়িকার প্রাপ্য—কবি উপেক্ষিত। অমনি মেলোড্রামা—উপেক্ষিত কবি কলিকাতা ও সতীকে ছাড়িয়া একেবারে গ্রামে। জনার্দন আসিয়া চিঠি দেয়; আশুতোষবাবুর সহিত সতীর বিবাহ। ব্যস্ মজনু পাগল—'এ হতে পারে না, হ'তে পারে না' করিতে করিতে একেবারে মজনুর ঘরে। লায়লী এক কাপ চা ও মেডেলটি দিয়া সরিয়া পড়ে। কবি অনন্ত রায় নিখোঁজ। কারণ বুঝিলাম না, কবি গ্রামেই ছিল। পাঁচখানা সংবাদপত্রের মালিকের নির্দেশে প্রতিদিন পাঁচবার খোঁচা খাইতে খাইতে এক বস্তা "দুর্নাম" সহ কবি অনন্ত রায়ের পুনরাবির্ভাব। লায়লীর মনে সুখ নাই; সে তাহা স্বামীর সমক্ষে স্বীকার করিল। "উদার হৃদয়" স্বামী কবিহীন লায়লীর জীবনে কবির আবির্ভাব ঘটাইলেন। কবির এমন খ্যাতি, নাম, যশ হইল যে সে সুট্ পরিল। এতক্ষণে কবি নিউ থিয়েটার্সের পুরাপুরি ধাতে আসিল। পরিচালককে ধন্যবাদ, বাঙলা সংবাদপত্রে যাহা নাই তাহাও তিনি জুড়িয়া দিয়াছেন—লেডি টাইপরাইটার। ভাল করিয়াছেন। নতুবা পাঁচখানা সংবাদপত্রের মালিকের মর্যাদা থাকিত না, আর লেডি টাইপরাইটার না থাকিলে বাঙলার বাহিরে জয়জয়কারও হইবে না।

কবির নাম, যশ, অর্থ সবই মিলিয়াছে—এবার চাই কবিত মানসীকে। সতী যে একেবারে গররাজী তাহা মনে হইল না। [illegible]

করেন। বিবাহের বাৎসরিক উৎসবে সতীর অনুপস্থিতিতে সতীকে কবির হাতে সমর্পণ করেন এবং সমস্ত টাকা পয়সাও সতীর নামে লিখিয়া দেন। আশুতোষ এই স্বার্থত্যাগের পরেও যান না—কারণ আরও মেলোড্রামা আছে। কবি উইলটা ছেঁড়ে, আশুতোষ রুখিয়া আসে। কবি বলে সতীকে পাওয়া তাহার একটা খেলা; আশুতোষ অমনি কবির গলা টিপিয়া ধরে। কবি বিতাড়িত হয়। তারপর আবার যেদিন সে আসে সেদিন কবি তাহাদের তাহার লেখা এক নাটক দেখিবার জন্য আমন্ত্রণ করে। স্বামী, স্ত্রী ও স্ত্রীর প্রণয়ী। প্রণয়ী স্বামীর বন্ধু। একদিন গোপন প্রেমালাপ ধরা পড়ে। স্ত্রী প্রণয়ীকে বাঁচাইতে গিয়া স্বামীকে হত্যা করে। সতী দেখিয়াই ক্রুদ্ধ—আশুতোষ তেমনি খুশি। আজ এতদিনকার চাপা বিষুবিয়াস ফাটিয়া পড়ে। আশুতোষ কণ্ঠরুদ্ধাবস্থায় "তুমি কবিকে ভালবাসো বাসো বাসো" বলিয়া থামিতেন আমরা শ্বাস ফেলিতে পারিতাম, কিন্তু আশুতোষ খাট লইয়া টানাটানি সুরু করিয়া দিলেন, তিনি কিছুতেই এক খাটে শুইবেন না। নাটকীয় পরিস্থিতি বটে। সতী একেবারে রিভলভার লইয়া ছুট—সে যে সতী ইহা সে প্রমাণ করিবে। ছুট্ ছুট—একেবারে কবির গৃহে। কবি! তুমি আমায় ভালবাস? তবে আমায় এই সার্টিফিকেট দাও এবং সে *সার্টিফিকেট তুমি নিজেই বহিয়া লইয়া যাও আমার স্বামীর কাছে; তাঁকে বলঃ আমি তোমায় ভালবাসি না; স্বামীকেই ভালবাসি।* কবি কিন্তু এ বিষয়ে নেহাৎ বাস্তববাদী। সে মানসীকে হাতে পাইয়া ছাড়িবে না। ফলে ঝুটোপাটি আর অকস্মাৎ রিভলভার পতন। আবার টাস্‌ল্—ক্রমে একেবারে রাস্তায়; সমান চীৎকার, কিন্তু নির্জনতা ভাঙে না। যখন ভাঙে—অর্থাৎ কাহিনীকার ও পরিচালক মহাদ্বন্দ্বে পড়িয়াছেন, উপসংহারটা কিভাবে হইবে ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না; তাই এত ধস্তাধস্তিতেও ট্রিগার ছোটে নাই (গান্ধীজীকে ধন্যবাদ!)—একটি মোটর আসিয়া একেবারে কবির ঘাড়ে—প্রায় নিকেশ। কিন্তু নাটকের একটু বাকী আছে—সার্টিফিকেটটা দেওয়া হয় নাই। মৃত্যু যখন টিপিয়া ধরিয়াছে তখন কবি স্বার্থত্যাগ করিয়া গেল; স্বামী-স্ত্রীর হাত মিলাইয়া দিল। ইতি।

বহু বিজ্ঞাপিত সাতখানি রবীন্দ্র-সংগীত ইহাতে আছে। রবীন্দ্র-সংগীত বাঙলার সম্পদ ইহা সত্য। ইহাও সত্য যে সংগীত এই চিত্রকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। একথা বলিতেও দ্বিধা নাই যে, সেগুলি সুগীত হইয়াছে। গায়ক হিসাবে সাইগলের নাম আছে; কাননেরও সিনেমা গায়িকা হিসাবে খ্যাতি আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে গানগুলি ইহাতে লওয়া হইয়াছে, সেগুলি পুরানো এবং বহুগীত। রচনা ও গান যতই সুমিষ্ট হউক, অতি প্রচলিত গান চিত্র বা থিয়েটারের দর্শককে খুব বেশী আকৃষ্ট করিতে পারে না। আলোচ্য চিত্রে গানগুলি প্রচলিত গানের ঢঙ্ অপেক্ষা উন্নততর; সুকণ্ঠে গীত হইয়াছে। তবে প্রশ্ন জাগেঃ গান সমগ্র চিত্রের কতটুকু? গানের এত প্রাধান্য থাকিলে লোকে সিনেমা না দেখিয়া রেকর্ড বাজাইয়াই তৃপ্ত থাকিত।

আলোকচিত্র মোটামুটি প্রশংসনীয়। কোথাও কোথাও আলোক নিয়ন্ত্রণের দোষ চোখে পড়ে। শব্দগ্রহণে সামান্য অসংগতি উপেক্ষণীয়।

মিনার্ভা—'খাজাঞ্চী' হিন্দী চিত্র। কাহিনী—দলসুখ পাঞ্চোলী; পরিচালক—মতি গিদ্‌ওয়ানী; ভূমিকায়—মহম্মদ ইসমাইল, আজমল, জানকী দাস, নারঙ, রমলা, মনোরমা, দুর্গা, কমলা প্রভৃতি।

ছবিখানি আগামী সপ্তাহ হইতে তৃতীয় সপ্তাহে পড়িবে। ভারতের সিনেমা শিল্পক্ষেত্রে পাঞ্জাব নাবাগত এবং তাহার প্রথম প্রচেষ্টা 'খাজাঞ্চী'। ইতিপূর্বে পাঞ্জাবী ভাষায় কয়েকটি ছবি তোলা হইয়াছে তন্মধ্যে 'জামলাজাট' নামক একটি ছবি গত বৎসর কলিকাতায় প্রদর্শিত হইয়াছিল। ভাষার জন্য প্রাদেশিক গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ ছিল বলিয়া সর্বভারতীয় প্রদর্শনক্ষেত্রে সেসব ছবি স্থান পায় নাই, 'খাজাঞ্চী' সেই স্থান অধিকার করিয়াছে।

'খাজাঞ্চী' ছবির গল্পের উপাদান বলিষ্ঠ ও ঘটনাবহুল কিন্তু মৌলিক নহে। স্যামুয়েল বাট্‌লারের 'দি ওয়ে অব অল ফ্লেস' উপন্যাসের কাহিনীর হিন্দুস্থানী অনুবাদ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, অথচ কোথাও স্বীকৃতি নাই। শেষের দিকে কাহিনীকার পিতাপুত্রের মিলন দেখাইতে গিয়া বাট্‌লারকে ছাড়িয়া নিজের পথ ধরিয়াছেন এবং সেখানেই তাঁহার পদস্খলন হইয়াছে।

কাহিনীকার যতক্ষণ স্যামুয়েল বাটলারকে অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন ততক্ষণ গল্পটি সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। হাসি, কান্না, আনন্দ ও বিচ্ছেদে দর্শকদের চিত্ত অভিভূত হয়। কিন্তু শেষকালে আদালতের মামুলী দৃশ্য আর পিতার বিরুদ্ধে উকিল পুত্রের ওকালতি ও পরে মিলন এই সব ঘটনাগুলি জোর করিয়া জুড়িয়া দিয়া ছবিটিকে রবারের মত টানিয়া লম্বা করা হইয়াছে।

অভিনয়ের দিক দিয়া খাজাঞ্চীর ভূমিকায় মহম্মদ ইসমাইল কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ইহার পরেই নাম করিতে হয় রমলার। এ পর্যন্ত রমলা যে কয়খানি চিত্রে অভিনয় করিয়াছেন তন্মধ্যে ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ অভিনয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

নিউ সিনেমায় 'চিত্রলেখা'

ফিল্ম কর্পোরেশনের নবতম হিন্দী ছবি **'চিত্রলেখা'** ২রা মে হইতে নিউ সিনেমায় প্রদর্শিত হইতেছে। হিন্দী সাহিত্যজগতের প্রসিদ্ধ উপন্যাসকার ভগবতীচরণ বর্মা এই কাহিনী রচনা করিয়াছেন। ছবিখানি পরিচালনা করিয়াছেন কেদার শর্মা এবং বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন মেহতাব, মণিকা দেশাই, নন্দ্রেকার, রাজেন্দ্র জ্ঞানী, নন্দকিশোর, রামদুলারী প্রভৃতি।

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে পাটলীপুত্র নগরের এক নর্তকীর বিচিত্র জীবনকাহিনী লইয়া চিত্রটি গঠিত। কাহিনীর মধ্যে বস্তু ছিল কিন্তু চিত্রনাট্যকারের অক্ষমতার দরুণ তাহা অবান্তর রকমের দীর্ঘ ও একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। প্রযোজক ও পরিচালকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ এই যে, কুৎসিৎ সাজসজ্জা আর উন্মুক্ত নারীদেহ দেখাইবার জন্যই কি এই ছবিটি তোলা হইয়াছে? বক্স অফিসের জন্য দর্শকদের রুচিকে এইভাবে অবমাননা করার অপরাধ অমার্জনীয়। ছবিটি আমাদের কোনো দিক দিয়াই ভাল লাগে নাই।

স্যার জেমস্ জীনস্

মঙ্গলের দুইটি, ইউরেনসের চারটি, শনি ও বৃহস্পতির নয়টি করিয়া উপগ্রহ বর্তমান। বলা বাহুল্য, গ্রহদের মধ্যে বৃহস্পতির আয়তন সর্বাপেক্ষা বেশী। ইহা ছাড়া, সৌরজগতের পরিচিত পরিবারবর্গের মধ্যে মাঝে মাঝে অপরিচিত দুই-একটি জ্যোতিষ্কও দেখা গিয়া থাকে। ধূমকেতু ও উল্কা এই জাতির জ্যোতিষ্ক।

গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি লইয়া গঠিত সৌরজগৎ বহু প্রাচীন কাল হইতেই বৈজ্ঞানিকদিগের বিস্ময় ও চিন্তা আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। বুধ হইতে শনি পর্যন্ত ছয়টি গ্রহের সংবাদ বহু পূর্ব হইতেই পৃথিবীর বিদ্বৎ-সমাজ জানিতেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে হার্সেল সাহেব ইউরেনস্ গ্রহটিকে আবিষ্কার করেন এবং তদবধি প্রায় এক শতাব্দী কাল ইউরেনসই দূরতম গ্রহ বলিয়া পরিচিত ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন জ্যোতির্বিদগণ আবিষ্কার করিলেন, সূর্য ও অন্যান্য পরিচিত গ্রহের আকর্ষণের ফলে ইউরেনসের যে কক্ষপথে ভ্রমণ করা উচিত, তাহার ব্যতিক্রম [illegible]। ইহাতে সন্দেহ উপস্থিত হইল; এই ব্যতিক্রমের

প্রসিদ্ধ ফরাসী বৈজ্ঞানিক লাপ্লাস্ কর্তৃক সমর্থিত ও পরিমার্জিত নীহারিকাবাদ বহুদিন পর্যন্ত বিজ্ঞান জগতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল। নীহারিকাবাদ অনুসারে নক্ষত্রের পূর্বাবস্থা নীহারিকা। নীহারিকা সুদূর বিস্তৃত উত্তপ্ত ও উত্তেজিত বায়বীয় পদার্থের দ্বারা গঠিত। কালক্রমে এই উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থ শীতল হইয়া সংকুচিত হয় ও পরিশেষে নক্ষত্রে রূপান্তরিত হইয়া থাকে। কিন্তু নীহারিকা কেবলমাত্র একটি নিশ্চল বায়ুপিণ্ড নহে, ইহা সদা ঘূর্ণমান। শীতলতা প্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার আবর্তন বেগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া এইরূপ অবস্থায় পৌঁছে যে, উত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ড উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়ে। এই গ্যাসপিণ্ডগুলিই শীতল হইয়া পরবর্তীকালে গ্রহ ও উপগ্রহে রূপান্তরিত হয়। মতবাদটি যুক্তিপূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু আবর্তনের গতি যতখানি দ্রুত হইলে বায়ুপিণ্ডের উৎক্ষেপণ সম্ভবপর, নক্ষত্রের বায়বীয় অবস্থায় এইরূপ দ্রুত আবর্তন সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। কিন্তু নীহারিকাবাদের সমর্থকগণ ইহাতে দমিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, নীহারিকা বিভিন্ন অংশ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ঘনীভূত হইয়া কেন্দ্রস্থ ঘনীভূত বিরাট নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণে বাঁধা পড়িয়া [illegible]

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

(দেশ—৮ম বর্ষ—১ম সংখ্যা হইতে ২৪শ সংখ্যা পর্যন্ত)



৮ম বর্ষ] ২৭শে বৈশাখ, শনিবার, ১৩৪৮ সাল। Saturday, 10th May, 1941 [২৬শ সংখ্যা

গান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঐ মহামানব আসে
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্ত্য ধূলির ঘাসে ঘাসে।

সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয় ডঙ্ক ;
এল মহাজন্মের লগ্ন
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।

উদয় শিখরে জাগে
মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে
জয় জয় জয় রে
মানব অভ্যুদয়
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

উদয়ন
১লা বৈশাখ, ১৩৪৮

আমাদের রবীন্দ্রনাথ

২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি। এই তিথিতে রবীন্দ্রনাথের একাশীতিতম জন্মোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। দেশব্যাপী এই শুভ উৎসবের মঙ্গল শঙ্খধ্বনির মধ্যে আমরা কবিগুরুর চরণ বন্দনা করিতেছি।

২৫শে বৈশাখ সত্যই বাঙলার পক্ষে পুণ্যতিথি। আকাশে এমন অরুণোদয় সব সময় হয় না, স্বর্ণাভ সেদিনের সূর্যের আলোক; সে আলোকে দিক্‌মণ্ডল সুশোভিত হইল। দিগাঙ্গণাগণ জয়ধ্বনি করিলেন; দেবগণ পুষ্পাসার বর্ষণ করিলেন; গন্ধ তাহার দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল; বাঙলায় সেদিন হইল নূতন জীবনের জাগরণ।

আধুনিক বাঙলা রবীন্দ্রনাথের বাঙলা; এ বাঙলাকে প্রাণ দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। ভাগবতের ঋষির ভাষায় বলিতে গেলে এই কথাই বলিতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের অন্তরাকাশে বাঙলার এই প্রাণটি যেন লুকাইয়া ছিল, সেখান হইতে তাহা ঘোষবান্ হইল এবং ছন্দময় ও অমৃতময় সহস্র আকার ধরিয়া সকল দিকে ছড়াইয়া পড়িল। রবীন্দ্রনাথের অন্তরের রসে যে মধুমাধবী ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, গন্ধ তাহার ছুটিয়া ছুটিয়া বাঙলাদেশকে নাচাইয়া তুলিল, মাতাইয়া তুলিল।

রবীন্দ্রনাথ কবি, তিনি শুধু বাঙলার নহেন, তিনি বিশ্বের। ব্যাস, বাল্মীকি কোন দেশবিশেষের বিশিষ্ট সম্পত্তি নহেন, তাঁহাদের অবদান সমগ্র বিশ্বের উপভোগ্য, তাঁহারা সকল বিশ্ববাসীর। আমরা তাঁহাদিগকে যেমন একান্ত করিয়া পাই, সেইরূপ সমগ্র বিশ্বের লোকই তাঁহাদিগকে দেশ, কাল ও পাত্রের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া আত্মীয়তার মধ্যে একান্ত করিয়া পায়। কবি যিনি, তিনি প্রাদেশিক নহেন, তিনি ভাবরাজ্যের অধিকারী এবং ভাষাই প্রাদেশিক, ভাব সর্বজনীন। রবীন্দ্রনাথ এই হিসাবে বিশ্বজনের—ইহা আমরা জানি; তবু রবীন্দ্রনাথ এই বাঙলাদেশের মাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আমরা বাঙালীরা, ভাবের যে বিশ্বজনীন রাজ্য সেখানে তাঁহাকে তো পাইয়াছিই, আর বিশেষভাবে পাইয়াছি আমাদের ভাষার রাজ্যে। এজন্য আমরা গর্ব করিবই। তাঁহার বিশ্বজনীন ভাব ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে বেশী কিছু দিয়াছেন, দিয়াছেন ভাষা। এ গর্ব তো সোজা গর্ব নয়, ইহাই যে জাতির বড় গর্ব। পদ্মপুরাণের ঋষি বলিয়াছেন, মহাভারত যদি না থাকিত, তাহা হইলে ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি থাকিত কোথায়? রবীন্দ্রনাথ আমাদের বাঙলা ভাষাকে যে অপরিসীম অবদানে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, যদি আমরা তাহা না পাইতাম তবে আমরা এ জগতে কত পিছনে পড়িয়া থাকিতাম, যখন এই বিষয়ে আমরা চিন্তা করি, তখন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীন মর্যাদার মধ্যেও আমরা তাঁহাকে একান্ত মমত্বের মাধুর্যে পাই।

আমাদের মমত্ববোধ এবং কবির মমত্ববোধ এক নহে। আমাদের মমত্ববোধ খণ্ডিত, অন্যকে বাদ দিয়া অপর হইতে পৃথক্ করিয়া আমরা নিজকে এবং নিজেরটিকে দেখি; কিন্তু কবি তাহা দেখেন না! তিনি খণ্ডের মধ্যেই অখণ্ড এবং এক রসের সন্ধান পান; ইহাতে একথা বলা যায় না যে, খণ্ড তাঁহার দৃষ্টি হইতে বাদ পড়ে বা তুচ্ছ হয়। এই দৃষ্টির ফলে খণ্ড তাঁহার নিকট আরও মধুময় হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজনীন দৃষ্টি লাভ করাতে বাঙলাদেশ তাঁহার নিকট মধুরতরই হইয়া উঠিয়াছে। বৃহতের মধ্যে তিনি বাঙলাকে পাইয়াছেন, বিশ্বের যত সুর যত ছন্দ বাঙলার অন্তরের একান্ত স্পর্শে তাঁহার মনে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে। বিশ্বকে বাদ দিয়া রবীন্দ্রনাথ বাঙলাকে দেখেন নাই, বিশ্বের ছন্দে বিশ্বের সুরের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখিয়াছেন। এই দৃষ্টিই সত্যকার দৃষ্টি, এই দৃষ্টিই ঋষির দৃষ্টি। এই দর্শনের বলেই রবীন্দ্রনাথ কবি এবং রবীন্দ্রনাথ ঋষি।

বাঙলাকে রবীন্দ্রনাথ যেমন করিয়া দেখিয়াছেন—এমন আর কে দেখিয়াছে? নিজে দেখা এক কথা, আর সকলকে দেখাইয়া দেখা, সকলের সঙ্গে যুক্ত হইয়া দেখা অন্য কথা। এমন দেখা দেখিতে হইলে অন্তর্হৃদয়ে যাইতে হয়, তপস্যা করিতে হয়, তপস্যার তাপে নিজের গণ্ডীবদ্ধ সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া প্রেমের দৃষ্টি লাভ করিতে হয়। সেই দৃষ্টিতে যিনি সত্য, শিব এবং সুন্দর তাঁহার দর্শন। এমন দেখা দেখিয়া যে কথা বলে, তাহার কথাই হয় মধুর, তাহার মুখে ফুটে ছন্দ, তাহার কণ্ঠেই উঠে গীতি এবং সে গীতি সকলকে আপনার করে, আত্মীয়তার প্রত্যক্ষ স্পর্শ দিয়া উদার করে। রবীন্দ্রনাথের সাধনা আমাদিগের দৃষ্টি উদার করিয়াছে। বাঙলার অন্তরে কত রস আছে, আছে কত মধু, এই বাঙলাদেশের নরনারীর মধ্যে আছে কি অপরিসীম এবং অনৈশ্বর্যের কি অনবদ্য মাধুর্য রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার এই দানে বাঙলায় বলিষ্ঠ জাতীয়তার বিকাশ সম্ভব হইয়াছে। বাঙালী আপনাকে বিকাইয়া বিলাইয়া দিতে শিখিয়াছে বাঙলার জল, বাঙলার বাতাস এবং বাঙলার নরনারীর প্রাণের টানে। রবীন্দ্রনাথ কবি, তিনি বিশ্বের, কিন্তু এই দিক হইতে তিনি বাঙলার নব জাতীয়তার উদ্বোধক এবং ঋত্বিক্।

বিশ্বজনীন দৃষ্টি বা প্রেমের লক্ষণ এই নয় যে, অত্যাচার এবং অবিচারকে সে ছোট করিয়া দেখে বা উপেক্ষা করে, বরং এ দৃষ্টিতে অন্যরকম ফলই হয়, সূক্ষ্ম যে অত্যাচার এবং অবিচার, এই দৃষ্টি যিনি লাভ করেন, তিনি তাহাও উপেক্ষা করিতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রেমিক বলিয়াই দেশ এবং জাতির উপর যে অত্যাচার এবং অবিচার—তিনি তাহা একদিনের জন্যও সহ্য করিতে পারেন নাই। একান্ত অসহায় এবং পরাধীন এই জাতির উপর অত্যাচারী যখনই তাহার বজ্র উদ্যত করিয়াছে, তখন তাহার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের লেখনী অগ্নি উদ্গীরণ করিয়াছে, তাঁহার কণ্ঠ ছড়াইয়াছে আগুনের জ্বালা। প্রভুত্বস্পর্ধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এদেশবাসীর দুর্বলতার সুযোগ পাইয়া যখনই মানুষের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে, মানুষের মর্যাদার পক্ষে দাঁড়াইয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। এ দেশের পীড়িত, নির্যাতিত দেশসেবকগণ রবীন্দ্রনাথের বাণী হইতে লাভ করিয়াছেন শক্তি, মৃত্যুঞ্জয়ী সাহস এবং দুর্বার সঙ্কল্পের পাইয়াছেন প্রেরণা। হৃদয় যতই ব্যাপ্তিকে পায়, বেদনা ততই হয় বড়, প্রেম আত্মাবদানের প্রতীয়মান প্রচণ্ডতার মধ্যে পরম প্রবল মাধুর্যের আকর্ষণ পায়। সে আকর্ষণ তুচ্ছ বিষয় বিচারকে ভুলাইয়া দেয়; মানুষকে করে অকুতোভয়; দুর্গম পথের যাত্রার বেগ দেয়। রুদ্র দীপ্ত জ্বালাময় জ্যোতিষ্কের মত মানুষ তখন ঘনান্ধকারের বুকে নিজেকে ছড়াইয়া দিয়া কৃতার্থতা লাভ করে, কার্পণ্যকে খণ্ডন করিয়া আপনার মহত্ত্বের উপলব্ধির মধ্যে পায় মৃত্যুজয়ী শক্তির আস্বাদ। রবীন্দ্রনাথের সাধনা, এই বীর্যময় প্রেরণা বাঙালীর জাতীয় জীবনে ইহার যে দান, তাহা সত্যই অতুলন। তিনি কেবল মধুর এবং কোমল পদাবলীই কীর্তন করেন নাই, অতি সৌম্য বলিয়াই যে রস অতি রৌদ্র, সেই রসের উপচারে তিনি বাঙালীর বুকে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। তিনি কেবল শুনান নাই বাঁশীর গান, 'খড়্গ তোমার আরও ভালো লাগে' মহাকালিকার এই মাধুর্য রসও তিনি

বাঙলার আকাশে এবং বাতাসে বিকীরণ করিয়াছেন। বাঙলার কালো মেয়ের কাজল চোখের স্নিগ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে অমর-মরণ-রক্ত-চরণের নাচের অধীর রবে তিনি বাঙালীর চিত্তের অবীর্যকে ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন। ভৈরবের বিষাণ তিনি বাজাইয়াছেন; শুনাইয়াছেন পাষাণ পিঞ্জর টুটিয়া বজ্রের গর্জ্জরবকেও, প্রলয়ের অনলের মধ্যে নূতন সৃষ্টির পথ তিনি দেখাইয়া গতানুগতিক দুর্বল চিত্তের সংস্কারন্ধ ভীরুতাকে দূর করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকে ভালবাসিয়াছেন এবং বিশ্বকে ভালবাসিবার দৃষ্টি তিনি পাইয়াছেন বলিয়াই দেশ এবং জাতির মধ্যে সর্বভাবে ভালবাসার সার্থকতার সন্ধান তিনি দিয়াছেন। সেবার মধ্যে আনন্দসত্তাকে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, সেবাই তাঁহার জীবনে নিত্য সত্য হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কবি, রবীন্দ্রনাথ ঋষি, রবীন্দ্রনাথ অন্যায় ও অধর্মের প্রতিরোধকারী এবং ইহার উপর তিনি সেবাব্রতী, সেবাপরায়ণ কর্মী।

শান্তিনিকেতনের আশ্রম-পরিমণ্ডলে রবীন্দ্রনাথের সেবাব্রতী কর্মীজীবনের পরিচয় পাই। বাঙলার পল্লীর সেবায় তিনি এখানে আপনাকে একেবারে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। বাঙলার পল্লীর প্রতি প্রাণের দরদ তাঁহার এই সেবাব্রতে মূর্তি ধরিয়া উঠিতেছে। বিশ্বের মান-মর্যাদা তাঁহার জীবনে তুচ্ছ হইয়াছে বাঙলার পল্লীসেবার এই মাধুর্যের কাছে। বাঙলার এক নিভৃত পল্লীকে কর্মকেন্দ্র করিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, ঋষি রবীন্দ্রনাথ নিরন্তর কল্যাণ সাধনায় নিমগ্ন আছেন। এ সাধনায় তাঁহার শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই; নিজের সুখ, নিজের স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিজের স্বাস্থ্যের প্রতিও সম্যক্ দৃষ্টি নাই। মানবমঙ্গল ব্রতে একান্ত এই আত্মনিবেদনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ অমৃতত্বের সন্ধান পাইয়াছেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ, ঋষি রবীন্দ্রনাথ, ভারতের তপোমূর্তি, ভারতের বাণীমূর্তি রবীন্দ্রনাথ। সেবার মধ্যে, ত্যাগের মধ্যেই অমৃতত্ব নিহিত আছে, ভারতের ঋষিদের এই যে বাণী, আসুরিক বিগ্রহ-বিক্ষুব্ধ জগতে রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবন-সাধনায় সেই নিরাময় জ্যোতিই বিকীর্ণ করিতেছেন। ভারতের সাধক মৈত্রীর দৃষ্টিতে বিশ্বকে দেখিয়া সামছন্দে যে ঝঙ্কার তুলিয়াছিলেন, একদিন বিশ্বজগতে তাহা মধু বিস্তার করিয়াছিল, শান্তিনিকেতনের আশ্রমতরুতল হইতে ভারতের তপোমূর্তি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে সেই সামগান আজও নিনাদিত হইতেছে। ভারতের মর্মদেশ মন্থন করিয়া, বাঙলার বুকে অত্যাচার এবং অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহানলকে উদ্দীপ্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের মঙ্গল-ব্রতে নিজকে অহরহ আহুতি করিয়া দিতেছেন। সে যজ্ঞের হবির্ধূম অন্ধ আসুরিকতার ধ্বংসলীলার পূতিগন্ধে প্রমত্তদিগকে প্রশান্ত করিতে আপাতত কতটা সমর্থ হইবে, সেকথা বলিতে পারি না; তবে একথা সত্য যে, এ সাধনা বৃথা হয় না এবং হইবেও না। বিশ্বজগতের মহামানবদের সাধনার ন্যায় রবীন্দ্রনাথের এই মানবমঙ্গল সাধনাও জগতে আদর্শস্বরূপে সত্য হইয়া থাকিবে এবং মানুষকে বর্বরতা হইতে সভ্যতার দিকে উন্নীত করিতে সাহায্য করিবে।

এই যে উচ্চ আদর্শ, আমাদের নিকট হয়ত ইহা গৌণ; আমরা খণ্ডের মধ্যে, আমাদের এই দেশের নরনারীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রেমের দৃষ্টিসমৃদ্ধ বৃহতের যে অনুভাবনা পাইয়াছি, তাহাই আমাদের কাছে মুখ্য। রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে দেশকে ভালবাসিতে শিখাইয়াছেন, দেশের নরনারীকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয় তিনি তাহা আমাদিগকে দেখাইয়াছেন এবং তাঁহার সেই শিক্ষা দেশের নরনারীর দুঃখ-দুর্দশার প্রতি বেদনাবোধ আমাদের বাড়াইয়া দিয়াছে; অন্যায়ের প্রতিরোধের প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে জাগাইয়া আমাদের মনুষ্যত্বকে প্ররোচিত করিয়াছে, হৃদয়ের রক্ত দিয়া দেশবাসীকে সেবা করিবার জন্য জাগাইয়াছে আমাদের মধ্যে উগ্রতা এবং ঐকান্তিকতা। হিমালয়ের বিশাল এবং উদার সৌন্দর্য মানুষের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও সেইরূপ বিশ্বমানবের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়া থাকে। সৌন্দর্যে, রসে, বর্ণে, গন্ধে সৃষ্টির এমন সুষমা সকল দিক হইতে ফুটিয়াছে আর কাহার সাধনায়? প্রোজ্জ্বল, ভাস্বর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা, সে প্রতিভা সত্যকে একান্তভাবে স্পর্শ করিয়াছে, প্রকৃতির অন্তরালের সকল রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে মানবাত্মার যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে; ঘুচাইয়াছে মানব মনের অসাহয়ত্বকে এবং প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে প্রেমের বলকে। বাঙলার জাতীয় জীবনের সাধনার ক্ষেত্রে আমরা বাঙালী, আমরা তাঁহার এই দানে ধন্য হইয়াছি। রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে দিয়াছেন নূতন দৃষ্টি। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙলার গুরু। হিমালয়ের সৌন্দর্য বিশ্বমানবের উপভোগ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু হিমালয়ের অবদান যে গঙ্গা যমুনা ধারা, অনপেক্ষ হইলেও, অনহঙ্কৃত হইলেও, অনাসক্ত হইলেও উদার পরম প্রেমের ব্যাকুলতায় সে ধারা ছুটিয়া বাহির হইলেও ভারতের মাটিকে তাহা বিশেষভাবে শীতল করিয়াছে, সুজলা এবং সুফলা করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দান গোমুখী মুখ-নিঃসৃত সেই গঙ্গা ধারার মত বাঙলা ভাষাকে সজীব করিয়াছে, সরস করিয়াছে, বাঙালীকে যোগাইয়াছে প্রাণশক্তি। বিশ্বের রবীন্দ্রনাথ এই দিক হইতে আমাদের রবীন্দ্রনাথ। কবি রবীন্দ্রনাথ, ঋষি রবীন্দ্রনাথ, সেবাব্রতী রবীন্দ্রনাথ, বাঙলার মনুষ্যত্বের উদ্বোধক রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গ গুরু রবীন্দ্রনাথ, বাঙালীর সকলের রবীন্দ্রনাথকে আজ আমরা তাঁহার জন্মতিথিতে অভিনন্দিত করিতেছি। বন্দনা করিতেছি আজ আমরা তাঁহাকে—যিনি বাঙলাকে ভাষা দিয়াছেন, ছন্দ দিয়াছেন, আর দিয়াছেন সেবাধর্মের ভিতর দিয়া জ্যোতির্ময় জীবনের আকর্ষণ। বাঙলার মাটিতে তাঁহার এই সাধনা সত্য হউক, নিত্য এবং দীর্ঘ হউক তাঁহার এই জীবন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ভগবান বুদ্ধদেব—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—২৭শে বৈশাখ পূর্ণিমা তিথি ভগবান বুদ্ধের জন্মোৎসব প্রতিপালিত হইবে, আমরা এই মহামানবকে বন্দনা করিতেছি। এত বড় মানুষ জগৎ আর দেখে নাই, মানবত্বের উদার মহিমা বুঝি কাহারও জীবনে এমন উজ্জ্বল হইয়া ফুটে নাই। অশেষ অভয়ত্বের প্রেরণা মানুষ পায় এখনও তাঁহার জীবনলীলার অনুধ্যানে। মানুষ হিসাবে মানুষ কত বড় ভগবান বুদ্ধ তাহা দেখাইলেন, মানুষকে তিনি তুলিলেন দেবতারও উপরে। জগৎ তাঁহার আদর্শ ধরিতে পারে নাই, কবে পারিবে তাহাও জানি না, তবে ইহা সত্য যে, মানুষের অভয়ত্বের আশ্রয়স্বরূপে থাকিবে তাঁহারই আদর্শ। মানুষ তাঁহার মধ্যে পাইবে আপনার অখণ্ড স্বরূপকে। অসহায় এবং দুর্বল ভারতে আজ এই মহামানবের আদর্শের এবং প্রেরণার প্রয়োজন আছে; ধর্মের নামে ক্ষণিক ভাবাবেগ এবং কুসংস্কারাবদ্ধ দুর্বলতা হইতে উদ্ধার পাইয়া আমরা যদি সত্যই মানবের মর্যাদা লাভ করিতে চাই, তবে আমাদের সমাজ-জীবনে আবশ্যক আছে তাঁহাকে। আছেন তিনি; এই ভারতে ধর্ম এবং সমাজজীবনে ভগবান বুদ্ধের অবদান ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বিশিষ্টতা যতদিন কিছু থাকিবে, ততদিন তাহা থাকিবে; কিন্তু প্রয়োজন হইল সে জিনিসকে সত্যভাবে ধরা। শ্রদ্ধাই সত্যকে দেখাইতে পারে, ভারতের ঘরে ঘরে সেই শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠুক। পশুর জীবন, কীটের জীবন ছাড়িয়া তাঁহার করুণার স্পর্শে আমরা আবার যেন মানুষ হইয়া উঠিতে পারি। এই মনুষ্যত্বই ধর্ম, মনুষ্যত্বই জীবন।

ভারতীয় সমস্যায় মিঃ কীথ—

মিঃ বেরিডেল কীথ নিয়মতান্ত্রিক বিধান সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি ভারতীয় সমস্যার সম্বন্ধে 'স্কটস্‌-ম্যান' পত্রে একখানা চিঠি লিখিয়াছেন। এই চিঠিতে তিনি বৃটিশ কর্তাদিগকে কয়েকটি খোলাখুলি কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, ১৯৩৫ সালের ভারতীয় শাসনতন্ত্র ভারতবাসী-দের দ্বারা নির্ধারিত হয় নাই; আমরাই ভারতবাসীর ঘাড়ে উহা চাপাইয়াছি, এখন ভারতীয় শাসনতন্ত্র সংস্কারের জন্যও উদ্যোগী আমাদিগকেই হইতে হইবে। কংগ্রেস ও মোসলেম লীগের মধ্যে নিষ্পত্তি না হইলে ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে না—এই মনোবৃত্তি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। মোসলেম লীগওয়ালাদের মতলব হইল ভারতবর্ষকে নানা খণ্ডে বিভক্ত করিয়া একটা অরাজকতার সৃষ্টি করা; দৃঢ়তার সঙ্গে এই মনোবৃত্তির বিরুদ্ধতা করিয়া ভারতের ঐক্যের উপর জোর দিতে হইবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য পুরাপুরি ব্যবস্থা করিতে হইবে; কিন্তু সংখ্যাগুরিষ্ঠের শাসন, গণতান্ত্রিকতার এই যে মূলনীতি, তাহার মর্যাদা রাখিতে হইবেই। মিঃ বেরিডেল কীথ ভারতীয় সমস্যার সমাধানের যে পন্থা নির্দেশ করিয়া-ছেন, খুটিনাটি বিষয়ে তাহাতে কিছু তফাৎ থাকিতে পারে; কিন্তু কংগ্রেসের প্রস্তাব মোটামুটি উহারই সমর্থন করিয়াছে এবং মিঃ কীথ কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি যদি একটু বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিতেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিতেন যে, ভারতের রাজনীতিকগণ ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য কোন কার্যকর প্রস্তাব উপস্থিত করেন নাই, তাঁহার এই উক্তি ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতবাসীদিগকে গণতন্ত্র দিতেই হইবে—মিঃ কীথ এই যে কথাটি বলিয়াছেন, বৃটিশ কর্তৃপক্ষ অপরের বেলায় ঐ কথার গুরুত্ব স্বীকার করিলেও ভারতের বেলায় তাহা স্বীকার করেন নাই এবং ভারতবর্ষকে যাহারা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিবার চেষ্টায় আছে, বৃটিশ রাজ-নীতিকরা কূটনীতি প্রয়োগে এ পর্যন্ত তাহাদিগকেই প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন এবং এখনও দিতেছেন। এই নীতিগতির পরিবর্তন না হইলে যে ভারতীয় সমস্যার সমাধান হইতে পারে না, মিঃ কীথের নিজের যুক্তিই তাহা প্রতিপন্ন করিবে।

উপেক্ষার যোগ্য—

ভারতের মুসলমান জনসমাজের উপর মোসলেম লীগের বিশেষ যে কোন প্রভাব আছে, ইহা আমরা স্বীকার করি না। মোমিন সম্প্রদায়, অহ্‌রার দল, জমিয়ত-উল-উলেমা, ইহারা কেহই মোসলেম লীগকে মানেন না। আমাদের বিশ্বাস এই যে, কংগ্রেসে মুসলমান যত আছেন, মোসলেম লীগের পিছনে সে পরিমাণ মুসলমানও নাই। এমন অবস্থায় মিঃ জিন্নার দুয়ারে ধর্না দেওয়ার যুক্তি আমরা বুঝি না। আমাদের মতে মিঃ জিন্নার কাছে বার বার ঐক্যের প্রস্তাব করিতে যাওয়াতে মিঃ জিন্নার গুরুত্বই বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী এতদিন পরে নিজে যে উহা বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর সঙ্গে গান্ধীজীর পত্রের আদান-প্রদানে এই তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। গান্ধীজী স্যার তেজবাহাদুরের নিকটে লিখেন,—আমার বিশ্বাস এই হইয়াছে যে, লীগের ঘাঁটি পাকা করাই হইল মিঃ জিন্নার মতলব, ঘাঁটি ঐভাবে পাকা করিয়া তিনি নিজের মনোমত সর্ত মানাইতে শক্তি যতদিন অর্জন না করিবেন, ততদিন পর্যন্ত কোন আপোষ-নিষ্পত্তি তিনি চাহেন না। স্যার তেজবাহাদুর জিন্না সাহেবের সঙ্গে যাহাতে মিটমাট হয় সেজন্য চেষ্টা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু জিন্না সাহেব তাঁহার প্রথম চিঠির যে জবাব দেন তাহাতেই বুঝা উচিত ছিল যে, জিন্না সাহেব কি প্যাঁচে ফিরিতেছেন। জিন্না সাহেব তাঁহাকে লিখেন,—হিন্দুদের প্রতিনিধিস্বরূপে গান্ধীজী কেন, যিনি আসিবেন, তাঁহার সঙ্গেই তিনি সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত আছেন। কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান, মুসলমানদের নয়—ইহাই প্রতিপন্ন করাই হইল জিন্না সাহেবের কৌশল। কংগ্রেস ইহা কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। বোম্বাইয়ের নেতৃ-সম্মেলনের উদ্যোক্তৃগণও জিন্না সাহেবের দৃষ্টিশূল হইয়াছেন। ভারতের ঐক্য, ভারতের কল্যাণ যিনি বা যাঁহারা চাহিবেন তাঁহারাই তাহা হইবেন, স্যার তেজবাহাদুরের প্রতি আচরণে জিন্না সাহেবের এই মূর্তি একেবারে নগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।

সাধারণ ভদ্রতা এবং সৌজন্যের মর্যাদা পর্যন্ত জিন্না সাহেব রাখেন নাই। এমন লোকের সঙ্গে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোন ব্যক্তির কিছুমাত্র সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। মোসলেম লীগের স্বয়ংসিদ্ধ নেতা এবং তাঁহার জনকয়েক সঙ্কীর্ণচেতা ও স্বার্থপর চেলারা ভারতের অনিষ্ট ছাড়া ইষ্ট করিবেন না, ইহা বুঝিয়াই সে অনিষ্ট প্রতিরোধের জন্য দেশের সমগ্র শুভ শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করা কর্তব্য।

রাষ্ট্রভাষার দাবী—

গত শনিবার কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারস্থিত মহাবোধি সোসাইটি হলে বঙ্গভাষা-সংস্কৃতি সম্মেলনের অধিবেশনে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য ভাবের প্রাচুর্যে, শব্দসম্পদে, লেখার বহুলতায় ও ভাষার সম্পদে ভারতের অন্যান্য ভাষাগুলি হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, তাই এই সম্মেলন বঙ্গভাষা ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার একমাত্র উপযুক্ত ভাষা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। সম্মেলনের সভাপতি কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ বলিয়াছেন,—"জাতীয় জীবনের দিকে দিকে যে চেতনার সন্ধান আমরা পেয়েছি, সেই বৈচিত্র্যের রূপ দেওয়ার ক্ষমতা অন্য কোনও ভাষার আছে ব'লে আমার জানা নেই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দানে সমৃদ্ধ বাঙলা ভাষার এ ভার গ্রহণের ক্ষমতা আছে—ইহাই আমার দৃঢ়বিশ্বাস।" একথা অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই; কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, হিন্দুস্থানী ভাষাকে প্রচলন করিবার জন্য যেমন চেষ্টা হইতেছে—বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করিবার জন্য তেমন চেষ্টা কিছুই হয় নাই; শুধু বাঙালীদের মধ্যে নয়, বাঙলার বাহিরে অবাঙালীদের মধ্যে যাহাতে বাঙলা ভাষার প্রচার এবং প্রসার ঘটে, এজন্য সুনির্দিষ্টভাবে কর্মপন্থা লইয়া অগ্রসর হওয়া দরকার; এই দিকে কাজের পথ ধরিবার আগ্রহ বঙ্গ-ভাষানুরাগীদের মধ্যে এতদিনে জাগিয়াছে ইহা সুখের বিষয়।

ইরাকের লড়াই—

গ্রীসের পতনের পর পূর্বদিকে যুদ্ধ প্রসার লাভ করিবে, এমন আশঙ্কা করা গিয়াছিল এবং জার্মানির প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন সৈয়দ রশিদ আলীর প্রভুত্ব ইরাকে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এই আশঙ্কা আরও ঘনীভূত হয়, কিন্তু পরে বৃটিশ সৈন্য বসরাতে অবতরণ করাতে অনেকে মনে করিয়াছিলেন, হয়ত রশিদ আলী ইংরেজকে অন্তত এখন ঘাঁটাইতে সাহস পাইবেন না। পরে দেখা যাইতেছে, আশঙ্কার কারণ দূর হয় নাই, যাহা আশঙ্কা করা গিয়াছিল, তাহাই ঘটিয়াছে। ইরাকী সেনাদের সঙ্গে ইংরেজ সেনার সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। ইংরেজের নৌ বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ এ ভি আলেকজেণ্ডার সেদিন বলিয়াছেন,—"ইংরেজ এখন যুদ্ধের সঙ্কটতম কালের প্রথম অধ্যায়ের সম্মুখীন হইয়াছে। আটলাণ্টিকে, ভূমধ্যসাগরে, এমন কি পারস্যোপসাগরেও তাহাকে নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে।" ইরাকের তৈলের খনির দিকে জার্মানির নজর আছে এবং ইরাকে প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য কিছুদিন হইতে চেষ্টাও সে করিতেছিল, রশিদ আলীর কার্যের ভিতর দিয়া সেই প্রচারকার্যের ফল ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু জার্মানি এখনও ভূমধ্যসাগরের পরপারে। প্রত্যক্ষভাবে এমন অবস্থায় রশিদ আলী জার্মানির নিকট হইতে বিশেষ কিছু সাহায্য পাইবেন, মনে হয় না; সুতরাং ইরাকের এই বিদ্রোহ দমিত হইবে—এমন কারণ রহিয়াছে; বিদ্রোহ দমিত হইলেও বিদ্রোহ ঘটাইবার উপাদান দূর করা কঠিন হইবে। ইরাকের অভিভাবক ছিলেন ইংরেজ; ইংরেজের উচিত ছিল, যাহাতে এমন অসন্তোষজনক উপাদান ইরাকে না সৃষ্টি হয় তাহা করা। ইরাকের লড়াই যদি না থামে, তবে বুঝিতে হইবে লড়াই ভারতের বলিতে গেলে প্রান্তভাগেই আসিয়া পড়িল।

দুর্গতের সাহায্য—

বাঙলার গভর্নর এতদিন পরে ঢাকার পল্লী অঞ্চলের দুর্গতদের অবস্থা দেখিতে গিয়াছিলেন। এতদিন পরে অবস্থা দেখিয়া তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করা কতটা যাইবে, ইহা সন্দেহের বিষয়। ঢাকাতে গিয়া গভর্নর বাহাদুর বলিয়াছেন যে, অশান্তির আর কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এই আশ্বাসদানেই সমস্যার সমাধান হইবে না। এই ঝড় এবং বৃষ্টি বাদলার দিনে যাহাদের অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, মাথা গুঁজিবার জায়গাটুকু পর্যন্ত যাহারা গুণ্ডাদের উদ্দাম দৌরাত্ম্যে, সুসভ্য শাসনের ছত্রচ্ছায়াতলেও হারাইয়াছে, তাহাদের অন্তত কিছুদিনের জন্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান কর্তৃপক্ষের করা কর্তব্য এবং মাথা গুঁজিবার জন্য জায়গা করিয়া দেওয়া উচিত। তাহা ছাড়া দৌরাত্ম্যকারীদের প্রতি দণ্ডবিধান এমন হওয়া উচিত, যাহাতে এমন অপরাধের কল্পনাও তাহারা না করিতে পারে।

কংগ্রেস সোসিয়ালিস্টদের দাবী—

সম্প্রতি পাটনা শহরে কংগ্রেস সোসিয়ালিস্ট দলের কার্যকরী সমিতির একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর অবলম্বিত নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন এবং এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধী অহিংসার পরমতত্ত্বের পরীক্ষার জন্য যতটা ব্যস্ত আছেন, ভারতের স্বাধীনতার জন্য তিনি ততটা ব্যগ্র নহেন। সুভাষচন্দ্র এই সত্য বহুদিন পূর্বেই ঘোষণা করেন; কিন্তু কংগ্রেস সোসিয়ালিস্ট দল তাঁহাকে সমর্থন না করিয়া নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে কংগ্রেসের দক্ষিণী দলের নীতিতেই সায় দিয়া আসিয়াছেন। ত্রিপুরী হইতে আরম্ভ করিয়া বোম্বাই শহরে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে পর্যন্ত সেই নীতিরই তাঁহারা সমর্থন করিয়াছেন। আজ তাঁহাদের যে সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে, যদি কিছুদিন পূর্বে তাহা হইত, তবে ভারতের রাজনীতিক ইতিহাস হয়ত ভিন্ন আকার ধারণ করিত। বৃটিশ রাজনীতিকদের পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য সোসিয়ালিস্টদিগকে অপেক্ষা করিতে হইল

ভারতসচিব আমেরির শ্রীমুখের বাণী শুনা পর্যন্ত, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। বৃটিশ রাজনীতিকদের উদারতার প্রতি একটা অন্ধ আনুরক্তি এদেশের অনেক তথাকথিত নেতার মনের কোণে আছে; কিন্তু কংগ্রেস সোসিয়ালিস্টদের অন্তত সে দুর্বলতা থাকা উচিত ছিল না।

কর্ম ও তাহার ফল—

মহাত্মা গান্ধী 'সর্বোদয়' পত্রিকায় লিখিয়াছেন—'যে আন্দোলন চালাইবার জন্য আমি দায়ী, তাহা ব্যর্থ চেষ্টা হইতে পারে। আমি যদি নিজের ব্যতীত আর কাহারও প্রতিনিধি না হই এবং আমি যদি আমার বিশ্বাসে অবিচলিত থাকি, তাহা হইলে আমি সন্তুষ্ট হইতে পারি, কিন্তু বিশ্ব-শান্তির ব্যাপারে এই চেষ্টা বর্তমান সময়ের পক্ষে অপর্যাপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হইবে। বর্তমান লোকদের জীবিত থাকা অভ্রান্তরূপে অভিব্যক্ত করা আবশ্যক যে, জাতির একটা বড় কালে আকাঙ্ক্ষিত ফল উৎপাদন করিতে হইলে ইহা অংশ এই প্রচেষ্টার পিছনে রহিয়াছে।' শুদ্ধ আধ্যাত্মিক আন্দোলন বা বিশ্বপ্রেমের দিক হইতে ইতিপূর্বেও মহামানবেরা চালাইয়াছেন, কিন্তু ফলাফলের প্রতি তাঁহারা ভ্রূক্ষেপবিহীন ছিলেন। ভারতের রাজনীতিক সমস্যার সমাধান বা ভারতে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা ঠিক সেই ধরণের বস্তু মনে করা যায় না। প্রত্যক্ষ ফলের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক রহিয়াছে এবং জীবিত থাকা কালের মধ্যে আমরা আকাঙ্ক্ষিত ফল চাই: মহাত্মাজী বলিতেছেন, তাহা করিতে হইলে জাতির একটা বড় অংশ যে আন্দোলনের পিছনে রহিয়াছে, তাহা দেখান দরকার; কিন্তু মহাত্মাজী সে সুযোগ দেশের লোককে দিয়াছেন কি? তাঁহার নির্দিষ্ট কায়মনোবাক্যে শুদ্ধ অহিংসার পরীক্ষা, তাঁহার একান্ত অনুগামীদের মধ্যে কয়জন উত্তীর্ণ হইতে পারেন, ইহাই সন্দেহের বিষয়। রাজ-নীতি বাস্তবকে ছাড়া চলিতে পারে না। বিশ্বমানবের কাছে একটা আদর্শ স্থাপন এক কথা, আর ভারতের স্বাধীনতা অন্য কথা।

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার পরিবর্তন—

ভূতপূর্ব ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেনের যুদ্ধ পরিচালন নীতিতে দেশের লোক সন্তুষ্ট হইতে না পারায় মন্ত্রিসভা হইতে তাঁহাকে সরিতে হয়, তাঁহার স্থলে চার্চিল হন প্রধান মন্ত্রী। চার্চিলের মন্ত্রিমণ্ডলের সংস্কার সাধনের জন্যও কিছুদিন হইতে দাবী শুনা যাইতেছিল। গত ২৯শে এপ্রিল পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় এই দাবী করা হয় যে, একটা সমর পরিষদ গঠন করা হউক এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ মেঞ্জিস বা তাঁহার মত কাহাকেও সেই মন্ত্রিসভায় লওয়া হউক। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী এই প্রস্তাব মানিতে স্বীকৃত হন নাই; কিন্তু অবশেষে মন্ত্রিসভায় কিছু রদ-বদল তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। লর্ড বিভারব্রুক এতদিন পর্যন্ত বিমান বিভাগে ছিলেন, তাঁহাকে ইংলণ্ডের স্বরাষ্ট্রসচিব করা হইয়াছে। এই রদবদলে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই। আমাদের মনে হয়, এই রদবদলও বেশী দিন স্থায়ী হইবে না, মিঃ লয়েড জর্জকে হয়ত মন্ত্রি-মণ্ডলে যাইতে হইবে এবং উপনিবেশের কোন বিশিষ্ট রাজনীতিক, মিঃ স্মাটস্ বা মেঞ্জিস ইঁহাদেরও কেহ ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলে স্থান পাইবেন। ভারত অবশ্য এ সম্বন্ধে আলোচনার বাহিরে; সাম্রাজ্যের জল টানা এবং কাঠ বহার কাজ যেমন তাহার আছে, তেমনই থাকিবে।

ছাত্রদের আদর্শ—

কুমিল্লা মোশ্লেম ছাত্র সম্মেলনের সভাপতি স্বরূপে খান বাহাদুর এম এ মোমিন সেদিন বলিয়াছেন—'আজ যাহারা ছাত্র, কাল তাহারা নাগরিক হইবে এবং ক্রমান্বয় রাজনীতিক এবং শাসনতান্ত্রিক সর্বপ্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। এই সময়ে দক্ষতার সহিত কাজ চালাইবার জন্য ছাত্রাবস্থা হইতে সকলকে বিশ্ব রাজনীতির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ গতিও পরিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে। ঐক্যই যাবতীয় ছাত্রসঙ্ঘের মূল নীতি হওয়া উচিত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ প্রতিষ্ঠিত হওয়াও বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। ছাত্রদের মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। একই অধ্যাপকের পদতলে বসিয়া তাহারা অধ্যয়ন করিয়া থাকে, একই বই তাহারা পড়ে এবং একই ক্রীড়াক্ষেত্রে তাহারা আনন্দে কাল কাটায়। কতকগুলি লোক নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধ করিবার জন্য ছাত্রদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার ভাব ঢুকাইতে চেষ্টা করিতেছে, খান বাহাদুর তাহাদের সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। আমরা আশা করি, বাঙলার মুসলমান ছাত্রসমাজ এই শ্রেণীর তথাকথিত নেতা-দের স্বরূপ বুঝিতে পারিবে এবং তাহারা যে মধ্যযুগীয় বর্বরতার আশ্রয়ে নিজেদের পাপ ব্যবসা চালাইতে চায়, তাহাকে কোন রকমেই প্রশ্রয় দিবে না। সেই সঙ্গে খান বাহাদুরের আর একটি উপদেশের উপরও আমরা বাঙলার ছাত্রদিগকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে বলি, তাহা হইল এই যে, ঐক্যের মনোভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সমগ্র প্রদেশের কল্যাণ সাধনে ছাত্রদের ব্রতী হইতে হইবে, এইদিকে ছাত্রদের বিশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। এই দায়িত্ব যেন তাহারা বিস্মৃত না হয় এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ভ্রান্ত প্ররোচনায় সমগ্র দেশের বৃহত্তর স্বার্থকে বলি না দেয়। বাঙলার ছাত্রসমাজ যদি দৃঢ় এবং সচেতন থাকে, তাহা হইলে জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া স্বার্থবাদীরা নেতৃত্বের নামে আর দেশের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতে পারিবে না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

আমার পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয়, তবেই দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটাব, ততই জবাবদিহির দায় বাড়বে, প্রশ্ন উঠবে, প্রাকৃতিক দান তো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গ'ড়ে তোলা হোল। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি



যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারী বীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্যকথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরী নয়, দেশ মানুষে তৈরী।

এই কারণেই দেশ যার মধ্যে আপন ভাষাবান প্রকাশ অনুভব করে, তাকে সর্বজনসমক্ষে নিজের বলে চিহ্নিত করবার উপলক্ষ্য রচনা করতে চায়। যেদিন তাই করে, যেদিন কোনো মানুষকে আনন্দের সঙ্গে সে অঙ্গীকার করে, সেদিনই মাটির কোল থেকে দেশের কোলে সেই মানুষের জন্ম।

আমার এই জয়ন্তী অনুষ্ঠানের যদি কোনো সত্য থাকে, তবে তা এই তাৎপর্য নিয়ে। আমাকে গ্রহণ করার দ্বারা দেশ যদি কোনোভাবে নিজেকে লাভ না ক'রে থাকে, তবে আজকের এই উৎসব অর্থহীন। যদি কেউ এ কথায় অহঙ্কারের আশঙ্কা ক'রে আমার জন্যে উদ্বিগ্ন হন, তবে তাঁদের উদ্বেগ অনাবশ্যক।

যে খ্যাতির সম্বল অল্প, তার সমারোহ যতই বেশি হয়, ততই তার দেউলে হওয়া দ্রুত ঘটে। ভুল মস্ত হয়েই দেখা দেয়, চুকে যায় অতি ক্ষুদ্র হয়ে। আতসবাজীর অভ্রবিদারক আলোটাই তার নির্বাণের উজ্জ্বল তর্জনী সংকেত।

* * * * *

আজ আমার জীবনের সমাপ্তিদশায় সাধারণের কাছে আমার পরিচয় একটা পরিণামে এসেছে। তাই আশা করি, যাঁরা আমাকে জানবার কিছু চেষ্টা করেছেন, এতদিনে অন্তত তাঁরা একথা জেনেছেন যে, আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করিনি। আমি চোখ মেলে যা দেখলুম, চোখ আমার কখনও তাতে ক্লান্ত হ'ল না, বিস্ময়ের অন্ত পাই নি। চরাচরকে বেষ্টন করে অনাদিকালের যে অনাহতবাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত, তাতে আমার মনপ্রাণ সাড়া দিয়েছে, মনে হয়েছে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলুম। সৌর-মণ্ডলীর প্রান্তে এই আমাদের ছোট শ্যামলা পৃথিবীকে ঋতুর আকাশ-দূতগুলি বিচিত্র-রসের বর্ণসজ্জায় সাজিয়ে দিয়ে যায়, এই আদরের অনুষ্ঠানে আমার হৃদয়ের অভিষেক-বারি নিয়ে যোগ দিতে কোনো দিন আলস্য করি নি। প্রতিদিন ঊষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্যে যে, 'যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।' আমি সেই বিরাট সত্তাকে আমার অনুভবে স্পর্শ করতে চেয়েছি, যিনি সকল সত্তার আত্মীয়, সম্বন্ধের ঐক্যতত্ত্ব, যাঁর খুসিতেই নিরন্তর অসংখ্য রূপের প্রকাশে বিচিত্রভাবে আমার প্রাণ খুসি হয়ে উঠছে—বলে উঠছে কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ; যাতে কোনো প্রয়োজন নেই, তাও আনন্দের টানে টানবে, এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারের চরম অর্থ যাঁর মধ্যে; যিনি অন্তরে অন্তরে মানুষকে পরিপূর্ণ করে বিদ্যমান বলেই প্রাণপণ কঠোর আত্মত্যাগকে আমরা আত্মঘাতী পাগলের পাগলামি বলে হেসে উঠলুম না।

যাঁর লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চ'লেছে মানবযাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে।
যাঁর লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক, 'মহাপ্রাণ' সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন তুচ্ছের কুৎসার তলে
প্রত্যহের বীভৎসতা।
যাঁর পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,
যাঁহার উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান।
ছড়াইছে দেশে দেশে।

ঈশোপনিষদের প্রথম যে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন, সেই মন্ত্রটি বার বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বার বার নিজেকে বলেছি—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ; আনন্দ করো, তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে, যা রয়েছে তোমার চারিদিকে, তারি মধ্যে চিরন্তন, লোভ কোরো না। কাব্যসাধনায় এই মন্ত্র মহামূল্য। আসক্তি যাকে মাকড়সার মতো জালে জড়ায়, তাকে জীর্ণ করে দেয়, তাতে গ্লানি আসে, ক্লান্তি আনে। কেননা আসক্তি তাকে সমগ্র থেকে উৎপাটন করে নিজের সীমার মধ্যে বাঁধে—তার পরে তোলা ফুলের মতো অল্পক্ষণেই সে ম্লান হয়। মহৎ সাহিত্য ভোগকে লোভ থেকে উদ্ধার

করে, সৌন্দর্যকে আসক্তি থেকে, চিত্তকে উপস্থিত গরজের দণ্ডধারীদের কাছ থেকে। রাবণের ঘরে 'সীতা' লোভের দ্বারা বন্দী, রামের ঘরে সীতা প্রেমের দ্বারা মুক্ত, সেই-খানেই তাঁর সত্য প্রকাশ। প্রেমের কাছে দেহের অপরূপ রূপ প্রকাশ পায়, লোভের কাছে তার স্থূল মাংস।

অনেকদিন থেকেই লিখে আসছি, জীবনের নানা পর্বে, নানা অবস্থায়। সুরু করেছি কাঁচা বয়সে—তখনো নিজেকে বুঝি নি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরিভূরি আছে, তাতে সন্দেহ নেই। এ সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে, আশা করি, তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালবেসেছি এই জগৎতে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। আমি আবাল্য অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্য-সাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য, আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি—তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ।
আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ, সর্ব-জাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা, —তাঁরি বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহঙ্কার, আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।

আমার যা কিছু অকিঞ্চিৎকর, তাকে অতিক্রম করেও যদি আমার চরিত্রের অন্তরতম প্রকৃতি ও সাধনা লেখায় প্রকাশ পেয়ে থাকে, আনন্দ দিয়ে থাকে, তবে তার পরিবর্তে আমি প্রীতি কামনা করি, আর কিছু নয়। এ-কথা যেন জেনে যাই, অকৃত্রিম সৌহার্দ পেয়েছি, সেই তাঁদের কাছে যাঁরা আমার সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও জেনেছেন সমস্ত জীবন, আমি কি পেয়েছি, কি দিয়েছি, আমার অপূর্ণ জীবনে, অসমাপ্ত সাধনায় কি ইঙ্গিত আছে।

সাহিত্যে মানুষের অনুরাগ-সম্পদ্ সৃষ্টি করাই যদি কবির যথার্থ কাজ হয়, তবে এই দান গ্রহণ করতে গেলে প্রীতিরই প্রয়োজন। কেননা, প্রীতিই সমগ্র করে দেখে। আজ পর্যন্ত সাহিত্যে যাঁরা সম্মান পেয়েছেন, তাঁদের রচনাকে আমরা সমগ্রভাবে দেখেই শ্রদ্ধা অনুভব করি। তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছিদ্র সন্ধান বা ছিদ্র খনন করতে স্বভাবত প্রবৃত্ত হয় না। জগতে আজ পর্যন্ত অতি বড়ো সাহিত্যিক এমন কেউ জন্মান নি, অনুরাগবঞ্চিত পরুষ চিত্ত নিয়ে যাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাকেও বিদ্রূপ করা, তার কদর্থ করা, তার প্রতি অশোভন মুখ-বিকৃতি করা, যে-কোনো মানুষ না পারে। প্রীতির প্রসন্নতাই সেই সহজ ভূমিকা, যার উপরে কবির সৃষ্টি সমগ্র হয়ে, সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশমান হয়।

মর্ত্যলোকের শ্রেষ্ঠদান এই প্রীতি আমি পেয়েছি, একথা প্রণামের সঙ্গে বলি। পেয়েছি পৃথিবীর অনেক বরণীয়দের হাত থেকে,—তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা নয়, আমার হৃদয় নিবেদন করে দিয়ে গেলেম। তাঁদের দক্ষিণ হাতের স্পর্শে বিরাট মানবেরই স্পর্শ লেগেছে আমার ললাটে, আমার যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তা তাঁদের গ্রহণের যোগ্য হোক্।

আর আমার স্বদেশের লোক যাঁরা অতি-নিকটের, অতি-পরিচয়ের অস্পষ্টতা ভেদ করেও আমাকে ভালোবাসতে পেরেছেন, আজ এই অনুষ্ঠানে তাঁদেরই বহু যত্নরচিত অর্ঘ সজ্জিত। তাঁদের সেই ভালোবাসা হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করি।

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
    নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা।
অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমিষে
    মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া।
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নব জীবনের কূলে
    চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা॥
হে মোর সন্ধ্যা, যাহা কিছু ছিল সাথে
    রাখিনু তোমার অঞ্চলতলে ঢাকি।
আঁধারের সাথী, তোমার করুণ হাতে
    বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখী।
কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি,
কত যে সুখের স্মৃতি ও দুখের প্রীতি,
    বিদায় বেলায় আজিও রহিল বাকী॥
যা কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেল চুকে,
    চলিতে চলিতে পিছিয়া রহিল পড়ে,
যে মণি দুলিল যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
    ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক্ অবহেলা,
    পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে॥ *

* সত্তর বৎসরে জয়ন্তী উৎসবের প্রতিভাষণ হইতে উদ্ধৃত।

রবীন্দ্রনাথের বাউল গান

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

আজ আমাদের দেশে শিক্ষিতদের মধ্যে যে পরিমাণ লোক-সংগীতের বা পল্লীগীতির চলন ও সমাদর হয়েছে, এমন যে হবে, ৩০।৪০ বৎসর পূর্বে কেউ তা ভাবতে পারেনি। তখন শিক্ষিত সমাজে এ সংগীতের কোন স্থান ছিল না। সেই দিনে কেউ ভাবেনি একে উচ্চশ্রেণীর সংগীতের আসরে কখনো টেনে তোলা সহজ হবে। আজ আমরা পৃথিবীর সংগীতের বিষয়ে আলোচনা করে জানতে পেরেছি যে বহু মার্গ সঙ্গীতের আবির্ভাব হয়েছে পল্লীগীতি বা লোক-সংগীতের কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করে। ইয়োরোপের বিরাট যন্ত্রসংগীত সিম্ফনী বাজনার প্রবর্তক Hayden যে সংগীতের সুর সংগ্রহ করেন তৎকালীন প্রচলিত নিজের দেশের লোক-সংগীতের কাছ থেকে, এবং তার সঙ্গে মিশিয়ে ছিলেন প্রাচীন উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতপদ্ধতি। উত্তর ভারতের অধুনা-অবজ্ঞাত প্রাচীন ধ্রুপদ সংগীতের ঢং একদিন গোয়ালিয়র অঞ্চলের লোকসংগীতরূপে প্রচলিত ছিল বলে শোনা যায়। সংগীতজ্ঞরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, আধুনিক হিন্দি গানে প্রচলিত বহু রাগরাগিণীর মূলে আছে পল্লীগানের সুরের প্রেরণা এবং আমাদের দেশের কীর্তন সংগীতও একদিন এইভাবে বাঙলার পল্লী থেকে নানা প্রাণ মাতানো সহজ সুর আহরণ করে তার সুর ভাণ্ডার পূর্ণ করেছিল।

আজ একথা স্বীকৃত যে, লোকসংগীত বা পল্লীগানের মধ্যে যে অপূর্ব সম্পদ লুকিয়ে আছে, তা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের কাছেই সমান উপভোগ্য, একথা সর্বপ্রথম শিক্ষিত বাঙালীর কাছে প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর এই চেষ্টা যে কেবল মুখের কথা বা লেখায় প্রকাশ পেয়েছিল তা নয়, তিনি তাকে নিজের গানের ভিতর দিয়েও ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

রবীন্দ্র সংগীতের মূলে আমরা পাই প্রাচীন বিষ্ণুপুরী ঢংএর হিন্দি ধ্রুপদ সংগীতের প্রভাব, তারপরে প্রভাব বিস্তার করেছে বাঙলার কীর্তন ও লোকসংগীতের ভিতর, বিশেষ করে বাউল সংগীত—যেটি আমার বক্তব্য বিষয়। রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালী ও অন্যান্য লোকসংগীত নিয়েও রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু সে ঢং তাঁর অন্তরে প্রেরণা জোগায়নি বলেই হয়তো বাউলের মত তাদের নিয়ে তিনি বেশী গান রচনা করতে উৎসাহিত হন নি। হুবহু রামপ্রসাদী ঢংএর গান তিনি রচনা করেছেন মাত্র তিন চারটি, তাও আবার জীবনের প্রথম অর্ধেকের মধ্যে, অর্থাৎ তাঁর প্রথম গীতিনাট্য বাল্মিকী-প্রতিভার যুগ থেকে ৪০।৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত। পরের জীবনে সে সুর একেবারেই স্পর্শ করেন নি। ভাটিয়ালি ঢংএর গানও খুব বেশী তাঁর নেই। অল্প কয়েকটি আছে কিন্তু তাতে বাউলের প্রভাব এসে পড়েছে।



বাউল — শিল্পী বিশ্বরূপ বসু

বাউল গানের আলোচনার আগে আমাদের জানতে হবে, বাঙলার বাউল কি, বা তার সংগীতই বা কোন্ জিনিস।

বাউলরা হোলো বাঙলার প্রকৃত মুক্তিপাগল সংগীত-সাধক। এদের জীবনে সুরই হোলো প্রাণ, সুরই হোলো আনন্দ, সুরই কথা ও সুরের ভিতর দিয়ে জীবনের প্রকৃত অর্থ তারা খুঁজে পায়। এদের উদার মতবাদ আজকালকার প্রায় সব শিক্ষিত ব্যক্তিরই মন আকর্ষণ করে। এরা হিন্দু সম্প্রদায়েরও নয়, মুসলমান সম্প্রদায়েরও নয়, অথচ এদের জীবনে হিন্দু ও সুফী মতবাদ এক হয়ে একটি নতুন রূপ গ্রহণ করেছে। এই বাউলরা বৈরাগ্য ও নিস্পৃহতার একটি পবিত্র ছবি। তাদের কোন পারিবারিক বন্ধন নেই, তাই ঘর বাড়ির জন্যে তাদের কোন মায়া থাকে না। তাদের আড্ডা জমে আপনা হতে, গড়ে ওঠা আখড়ায় বা মেলায় এবং পথে ও গ্রামে পাগলের মত গান গেয়ে

নেচে সময় কাটায়। এরা সমাজের বন্ধন মানেনা, ধর্মের অনুশাসনকে উড়িয়ে দেয়। যখন হাতের একতারাটি কানের উপর চেপে ধরে ভাবের বিহ্বলতায় সুরে মেতে ওঠে তখন মনে হয় সেই ক্ষুদ্র যন্ত্রটির ভিতর দিয়ে যেন সে বিশ্বসংগীতের অন্তরলোকে পেশছে তার মূল সুরটির সন্ধান পেয়েছে। গায়ের আলখাল্লা ধূলিমলিন, ছেঁড়া তালি দেওয়া। মাথায় লম্বা চুল, যত্ন নেই, চূড়া করে বাঁধা। মুখে গোঁফদাড়ি। এই হোলো বাঙলার বাউলদের প্রকৃত ছবি। এই সম্প্রদায়ে শিক্ষিত লোক নেই ও ছিল না। তাই এরা বরাবরই অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে আদর পেয়েছে ও গানে জনসাধারণের মনে আনন্দ দিয়েছে। আজকাল বাউলদের মধ্যে ভাবের অনেক পরিবর্তন দেখা গেলেও এরা সকলেই পাগল তাঁর জন্যে, যাঁকে বাউলরা গানে প্রকাশ করে "মনের মানুষ," "আলেখ্ সাঁই" ও "দরদী সাঁই" রূপে। তাঁর জন্যেই এ বৈরাগ্য, ঔদাসিন্য এবং তাঁর কারণেই প্রচার করে বেড়ায় সংসারে অনিত্যতার বার্তা ও তত্ত্ববাণী। এদিকে কিন্তু সেই মনের মানুষ কখনো তাদের কাছে ধরা দেয় না, ছোঁওয়া দিয়ে যায় মাত্র। তাই এদের অনুশোচনার আর শেষ নেই। বাউলের আখড়ায় গানের সঙ্গে এদের আপনভোলা নাচ দেখেছি। যতক্ষণ ছিলাম সেই আবহাওয়ায়, অনুভব করেছি যে সত্যই এরা উন্মাদ সেই মরমীর সন্ধানে। তাই এরা "ক্ষ্যাপা" বা "পাগলা" রূপে পরিচিত হতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না। সুতরাং এই সাধকদের কণ্ঠের সুর আমাদের সাধারণের মনকে যে আকৃষ্ট করবে তাতে আর আশ্চর্য কি। বাউল গানের কথার অর্থ ছাড়াও কেবল সুরের করুণতা, সহজ মাধুর্যেও মন আকর্ষণ করে, উদাস করে এবং পার্থিব দুঃখ সুখের বন্ধন থেকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে চায়।

বাউল গানের সুরে আমরা দেখি দুটি ভাগ। সাধারণ নিয়মে এই গানের যত কলিই থাকুক না কেন সুরে পার্থক্য দেখা যায় কেবল প্রথম কলির সঙ্গে দ্বিতীয় কলির। পরের আর সব কলির সুর দ্বিতীয় কলিকে অনুসরণ করে চলে এবং প্রথম কলি ছাড়া অন্যান্য সব কটি কলির ছন্দও এক। বিভিন্ন বাউল গানে পরস্পরের সঙ্গে সুরে থাকে সামান্য তফাৎ, কিন্তু মূলে তাদের কাঠামোটি এক। এ গানের সুরসম্পদ সম্পূর্ণ বাঙলার মাঠে ঘাটের। তাতে নেই কোন প্রাচীন মার্গসংগীতের সুরের বৈচিত্র্য বা জটিলতা। কথার সঙ্গে সহজে চলতে পারে, সেই রকম সহজ ছন্দে গানগুলি তৈরী। গুরুগম্ভীর সুরের বা তালের গান এতে দেখা যায় না। আছে কেবল বাঁশির মত উদাস করা, ব্যথায় ভরা সাধারণ মিষ্টি সুর এবং ভাষার সঙ্গে সে সুরের একতা বিশেষ করে মনকে আকর্ষণ করে। সব লোক-সংগীতের এইটি হোলো একটি বড় বিশেষত্ব।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, প্রকৃত বাউলসুরের গান আজকাল শুনতে পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। গত শতাব্দীর শেষ দিকে বাঙলার "বাউল খেদা" আন্দোলনের চাপে ভালো-মন্দ অনেক কিছু নষ্ট হয়েছে এবং এ যুগের যাত্রা ও রেকর্ড সংগীতের সুর দেশের মধ্যে যত ছড়াতে লাগলো বাউলদের মধ্যে তার ছাপও পড়তে থাকে সেই অনুপাতে। আমি যে বাউল সুরের কথা বলছি সে হোলো যাত্রা বা রেকর্ড সংগীতের পূর্বেকার বাউলদের সুর। সে যুগের বাউল সুরের গান আজকাল পথে ঘাটে শুনতে না পাওয়া গেলেও তার নিখুঁৎ সুর রবীন্দ্রনাথের বহু গানের মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

অনেকেরই মনে ধারণা, এই বাউল গান বা লোকসংগীত রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রথম থেকেই প্রেরণা জুগিয়েছিলো তাঁর সংগীতসৃষ্টির কাজে। কিন্তু সমগ্র রবীন্দ্র সংগীত-সমুদ্র মন্থন করে এই জেনেছি যে, প্রথম জীবনে, অর্থাৎ জীবনের অর্ধেক পর্যন্তই এই বাউল সংগীত তাঁর মনে সৃষ্টির প্রেরণা জোগায়নি, যতটা জুগিয়েছে পরবর্তী জীবনে।

তিনি বাউল সুর নিয়ে প্রথম গান রচনা সুরু করেন বাঙলার স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, ১৩১২ সালে, তাঁর ৪৪ বৎসর বয়সে। ভাটিয়ালী ও অন্যপ্রকারী লোকসংগীত নিয়ে চর্চা সুরু করেছিলেন এ যুগেই। জাতীয় আন্দোলনই প্রথম তাঁকে বাউল সুরে গান রচনা করবার প্রেরণা যোগায় এবং তখনই ব্যাপকভাবে বাউল সুর নিয়ে গান রচনায় প্রবৃত্ত হন। সুরের দিক থেকে এ গানে পরিবর্তন দেখা যায় নি। কিন্তু তিনি তাঁর শক্তির পরিচয় দিয়েছেন গতানুগতিক বাউল গানের আদর্শের পরিবর্তন ঘটিয়ে। এই জতীয় সংগীতে আমরা পাই আশা উদ্দীপনার বাণী, যা কথার ছন্দে ভাবের বলিষ্ঠতায় আপনা হতেই প্রাণবান। চলতি সহজ ভাষায় রচিত জাতীয় সংগীতগুলির সঙ্গে বাউল সুর অতি সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে। এখানে বলবার বিষয় হচ্ছে যে, সব লোকসংগীতের ভাষা সর্বদাই অতি সহজ পল্লীপ্রাণের ভাষা। যে মানুষদের মুখে এ গান ভাষা ও সুরে প্রকাশ পায় তারা চিরকালই অশিক্ষিত, তাই তাদের গানে কখন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের ভাষার স্পর্শ নেই।

খাঁটি বাউল গানে আশা উত্তেজনার প্রেরণা আসেনা। তাদের আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত। এদের গান চিরকালই একটি বিশেষ ভাবকে অবলম্বন করে গঠিত। কখনো অন্য কোন ভাবের সঙ্গে এ সুরকে মেশাবার প্রয়োজন হয় না, কারণ তারা একভাবের ভাবুক। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাউল গানের এ ধারার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। স্বদেশীযুগের প্রেরণা তাঁর গানের যে নতুন উৎসটি খুলে দিয়েছিল, সে আর কখনো থামেনি। বহু বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে এখনো সে ধারা প্রবাহিত। ঋতুসংগীত, জাতীয় সংগীত, প্রেম সংগীত, পূজা বা ধর্ম সংগীত এমন কি গীতিনাট্যের কথাতেও এই ঢং অতি সুন্দর-ভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। কোথাও অকৃতকার্যতা চোখে পড়ে না। আবার খাঁটি বাউল গানের আদর্শে তাঁর বাউল গানগুলিও এত সুন্দর যে, ভাবে ভাষায় ও সুরের সম্মিলনে সেসব গান যে কোন শ্রেষ্ঠ বাউল গানের পাশে স্থান গ্রহণ করতে পারে।

ধ্রুপদ সংগীতের সুরের ভাগে থাকে চারিটি অংশ। যথা অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। গানের পংক্তি-গুলিও সেইভাবে গঠিত, সুরও সেই সঙ্গে আপনার পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলে। অস্থায়ী নীচু সুরের দিকে চলাফেরা করে, অন্তরা করে উপরের দিকে, সঞ্চারীর সুর

আবার আসে নীচুর দিকে নেমে, কিন্তু অস্থায়ীর সঙ্গে তার মিল থাকে না। আভোগ প্রায় সব গানেই অন্তরাকে হুবহু নকল করে। খেয়াল গানে কেবল অস্থায়ী অন্তরাই আজকাল প্রচলিত।

মানুষ সহজ আনন্দে গান গেয়েছে প্রথমে। তার পরে পণ্ডিতেরা আলোচনা করে সুরকে একটা সুসংবদ্ধ নিয়মজালে বেঁধে রাখবার ইচ্ছায় স্বরের ওঠানামার পদ্ধতিটিকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন ও দেখেছেন সুরের সেই গঠন পদ্ধতিটিই গানের মূল কাঠামো। এভাবে গানকে বিচার করে নানা প্রকার রাগরাগিণীতে অভিহিত করেছেন। রাগ বা রাগিণীর উৎপত্তির এই হোলো মূল কারণ। আরম্ভে সে সুরগুলি ছিল সহজ এবং তার চলাফেরার সীমা ছিল অনেক সঙ্কীর্ণ। সঙ্গীতজ্ঞরা তাঁদের গলার সামর্থ্যে এই রাগরাগিণীর আকার আরো বড় ও বিচিত্র করে তুলেছেন। তাই আজ প্রাচীন মার্গ সঙ্গীতের এতো সম্মান ও সমাদর এবং এ সঙ্গীত আয়ত্ব করতে হলে সাধনার প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে বাউল গান এভাবেই বড় ও বিচিত্র হয়ে উঠেছে, যা পূর্বে ছিল ক্ষুদ্র। এই গানে আছে ধ্রুপদের মত চারিটি অংশ। অস্থায়ী, অন্তরা ও সঞ্চারীতে আছে সুরের বৈচিত্র্য ও আভোগ ঠিক ধ্রুপদের মত অন্তরাকে অনুসরণ করে। এই কাজে কৃতকার্য হোতে রবীন্দ্রনাথকে অল্পবিস্তর প্রাচীন রাগরাগিণী বা কীর্তন সুরের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে। সে কাজ এমনভাবে করেছেন তাতে বাউল সুরে তার বৈশিষ্ট্য ঠিকই রেখেছেন, কোথাও বিকৃত হয়নি।

তাঁর বাউল গানে কখনো ইমনকল্যাণ, কখনো পিলু, কখনো মল্লার রাগিণীর সুর ছুঁয়ে চলে গেছে; অথচ বাউলের সঙ্গে চমৎকার একটি সামঞ্জস্য সে রেখেছে। এমনও গান আছে যার আরম্ভের কলি বাউল সুরের বাকি সব কটি কলি শুদ্ধ ভৈরবী ঠাটের। আবার অনেক গানে ভাটিয়ালি বা নৌকার মাঝিদের সুরের আবেগ প্রকাশ পায়. তাই স্বভাবতই মনে সন্দেহ আসে সুরগুলি বাউল না ভাটিয়ালী। সাধারণত বাউল গানের সঙ্গে ভাটিয়ালী গানের অনেক স্থানে সুরে মিল থাকে। কারণ সব লোকসঙ্গীতের সুরের মূল প্রায় এক। অর্থাৎ পল্লীর প্রাণে আপনা হতে সুরের যে আবেগ জাগে, লোকসঙ্গীতের সুর হোলো তারই প্রকাশ। তাই সে এত প্রাণস্পর্শী। এই স্বতউৎসারিত সুরস্পন্দনে সব লোক-সঙ্গীতের কোথাও না কোথাও মিল থাকবেই। কিন্তু ভাটিয়ালী সুরের প্রেরণা বড় নদীর সহজ ধীর গতিকে অবলম্বন করে। সেই কারণে এই সুরের গতি ধীর ও শান্ত।

বাউলের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে কথার ছন্দবদ্ধ সহজগতি। তাই অন্যান্য লোকসঙ্গীতের তুলনায় বাউল গান ছন্দবহুল। তার একমাত্র কারণ বোধ হয় বাউলদের নৃত্যের আবেগ। ভাবের আবেগে যখন তারা নেচে ওঠে, তখন সে উন্মাদনার জন্যে সেরকম ছন্দের প্রয়োজন হয়।

বাউল গানের ছন্দের দিকে রবীন্দ্রনাথ একেবারেই হাত দেন নি। যে ছন্দ মানুষ বুদ্ধি খরচ করে ভেবে বার করেনি, যে ছন্দ মানুষ পেয়েছে আপনা হতে, সেই সহজ ছন্দটি, বাউলদের কেন, প্রায় সব লোক সঙ্গীতেরই একমাত্র লক্ষ্য। সহজ ভাষা ও সুরের সঙ্গে এ গানের ছন্দও সহজ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাই আমরা বাউলদের গানে তিন মাত্রার দাদরা বা কখনো চার মাত্রার কাহারবা জাতীয় ছন্দের পরিচয় পাই। রবীন্দ্রনাথ সেই কারণেই তালের দিক থেকে বাউল গানে নতুন কিছু করবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। কিন্তু তাঁর হাতে পড়ে সুর ও ভাষা পল্লীগীতিকে আপনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাধা চুরমার করে মুক্তির পথে এগিয়ে চলবার সুযোগ দিয়েছে এবং এইভাবে সঙ্গীত সমাজের এই অচ্ছ্যুৎকে তিনিই প্রথম উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত সমাজে টেনে তুলেছেন। এখন উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত সমাজ তাকে স্থান না দিয়ে পারবে কি না সে পরের কথা।

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, এই সৃষ্টির কাজে কোন-দিনই রবীন্দ্রনাথ জোর করে কিছু তৈরী করতে যাননি। আপনা হতে ভিতরের প্রেরণাই সংগীতে এভাবে মুক্তির পথ খুঁজে নিয়েছে। এই বাউল সুরের ধরণকে সুনির্দিষ্ট নিয়ম জালে ফেলে অন্যান্য রাগিণীর মত নাম দেওয়া যেতে পারে। সংগীত সাধক রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একাজ সম্ভব নয়, তাঁর কাজ হোলো আনন্দে গান গেয়ে যাওয়া, অপর কাজ করবে পণ্ডিতেরা, যেমন শুনি যে ভারতীয় মধ্যযুগের সাধকদের সাধনালব্ধ গভীর তত্ত্বকথা প্রকাশ পেতো গানের সুরে। তাঁরা আপন আনন্দে যখন গেয়েছেন তখন সেই সুরের প্রেরণা তাঁদের অন্তরে নব নব সৃষ্টির উৎস খুলে দিয়েছে। পরে গায়কদল তাঁদের কাছ থেকে এই প্রেরণা-লব্ধ সংগীত আহরণ করে, নিয়মে বেঁধে, রাগ সংগীতের পর্যায়ে তাকে স্থান দিয়েছে।

আমরা যদিও দেখতে পাচ্ছি আজ দেশে পল্লীগানের প্রতি লোকের দৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাঙলায় অন্য রচয়িতাদের মধ্যে বাউল বিশেষ সাড়া জাগায়নি, তবে কিছু বাউল গান যে না হয়েছে তাও নয়। এক রবীন্দ্র-নাথ তাঁর জীবনে খাঁটি ও মিশ্র সুরের যত বাউল গান রচনা করেছেন, আধুনিক কোন রচয়িতা তাঁর কাছে দাঁড়াতে পারে না। আধুনিক অনেক বাউল গানে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সুস্পষ্ট।

হালে রচয়িতাদের মধ্যে যারা দেশী সুর নিয়ে কারবার করেছেন, তাঁদের ভিতরে ভাটিয়ালী, জারী, সারী ও বৈরাগীদের সুরের প্রভাব লক্ষণীয়, এবং এখনো তাঁদের মধ্যে বেশী চলেছে সুরে ও ভাবের দিকে অনুকরণের পালা, তবে আশা হয় চেষ্টা যখন আছে ভবিষ্যতে হয়তো কোন শক্তি-শালী রচয়িতা এতে হাত দেবেন ও কৃতকার্য হবেন।

অনেকেরই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের বাউল গান নামে যে গানের কথা এতক্ষণ বললাম সে গানগুলি কি? তাই কিছু গানের নাম উল্লেখ করা উচিৎ মনে করে কয়েকটি নাম দিয়ে দিলাম। এর ভিতর অনেকগুলি জন-সাধারণের মধ্যে আজকাল বিশেষ প্রচলিত। "যদি তোর ডাক

(শেষাংশ ৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি সকল বিষয়েই তিনি এমন একটি বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছেন যাহা একমাত্র মহামনীষীর পক্ষেই সম্ভব। তাঁহার সাহিত্য-ভাণ্ডার সমুদ্রের মত অনন্ত রত্ন পরিপূর্ণ। যে দিক দিয়াই দেখা যাক না কেন, তিনি বাঙলা সাহিত্যকে একটি সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে লইয়া গিয়াছেন এবং বাঙালীর ভাবরাজ্য অতুল ঐশ্বর্যে ভরিয়া দিয়াছেন। তাঁহার কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র প্রবন্ধের কথাই না হোক ধরা যাক্।

রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া এমন একটি অনুশীলনের হাওয়া বহা চাই যাহাতে জ্ঞান এবং ভাবের রশ্মি চতুর্দিকে প্রতিফলিত বিকীর্ণ হইতে পারে" (সাহিত্য, বাঙলা জাতীয় সাহিত্য)। তাঁহার প্রবন্ধ সাহিত্যে এমনি একটি সর্বব্যাপী অনুশীলনের হাওয়া রহিয়াছে। এই বিরাট ও বিচিত্র প্রবন্ধে সাহিত্যের দিকে চাহিয়া একথা বারে বারে মনে হয়, তাঁহার প্রতিভা যদি একমাত্র প্রবন্ধ-সাহিত্যেই নিবন্ধ থাকিত তাহা হইলেও তাঁহার মনীষা সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা কিছু কম হইত না। উক্তিটিকে ভাবের উচ্ছ্বাস বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ইহা আদৌ ভাবের উচ্ছ্বাস নয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কবিতায়, উপন্যাসে বা নাটকে শিক্ষানবীশের ভাব আছে; সম্ভাবনার ইঙ্গিত বা তাঁহার নিজস্ব বিশিষ্টতার ছাপ থাকিলেও এখানে কাঁচা হাতের খানিকটা দাগ থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রথম যুগের প্রবন্ধে কাঁচা হাতের কোন দাগ নাই। মনে হয় এদিক দিয়া তিনি যেন পরিণত মূর্তি লইয়াই আবির্ভূত হইয়াছেন। অতি অল্প বয়সের লেখা 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' সত্যই একটি বিস্ময়ের জিনিষ। ইহা তাঁহার চলতি ভাষার প্রথম রচনা। ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয় যে, এই বয়সে তিনি কি করিয়া এমন অদ্ভুত প্রাঞ্জলতার পরিচয় দিয়াছেন! কেবল তাহাই নয়, এখানে মননশক্তিরও তিনি যে অসামান্য পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেও আশ্চর্য না হইয়া পারা যায় না। 'ভারতী' পত্রিকায় যে সময়ে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার বয়সই বা কত, অথচ এই বয়সেই তিনি নিজস্ব রচনা-ভঙ্গি অর্জন করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহাকে হাতড়াইয়া বেড়াইতে হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের যে কয়টি বৈশিষ্ট্য আছে তাহার মধ্যে প্রাঞ্জলতাই সর্বপ্রধান। প্রাঞ্জলতা সম্পর্কে তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন—"প্রাঞ্জলতার প্রধান গুণ এই যে, সে একেবারে অব্যবহিতভাবে মনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে—তাহার কোন মধ্যস্থ নাই। (পঞ্চভূত, প্রাঞ্জলতা)। তাঁহার সকল প্রবন্ধেই এইরূপ অননুকরণীয় ও অসামান্য প্রাঞ্জলতা রহিয়াছে। তিনি নিজের বক্তব্য সব সময়েই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধে ঝাপসা বা জড়িত ভাব কোথাও আছে একথা কেহই বলিবেন না।

অনেকে বলেন, উপমার বাহুল্যে তাঁহার বক্তব্য অনেক স্থলে চাপা পড়িয়াছে। কিন্তু এ ধারণাও ভুল। আমাদের মনে রাখিতে হইবে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি, তাই তাঁহার সকল রচনাই কবিতাধর্মী। প্রবন্ধে তিনি যে সকল উপমা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা প্রধানত কবিতার উপমা। কিন্তু তাহাতে বক্তব্য কোথাও চাপা পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না, বরং বক্তব্য আরও স্পষ্ট আরও মনোরম হইয়া উঠিয়াছে। পাঠকের মন আকর্ষণ করিতে না পারিলে রচনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। পাঠকের মন আকর্ষণ করিবার জন্যই এই ধরণের উপমার প্রয়োজন। "কুঁড়ির পাপ্‌ড়িগুলি যেমন নিজের মধ্যেই কুণ্ঠিত, তেমনি স্বার্থরত মানুষের শক্তি নিজের দিকেই চিরদিন সঙ্কুচিত, একদিন তাহার বাঁধন ঢিলা করিয়া তাহাকে পরাঙ্মুখ করিবামাত্র ফোটাফুলের মত বিশ্বের দিকে তাহার মিলন মাধুর্যময় অতি সুন্দর বিস্তার ঘটে.............." (সাহিত্য, সৌন্দর্যবোধ)। এখানে উপমার সাহায্যে বক্তব্যটি যেমন সুস্পষ্ট হইয়াছে এমন আর কিছুতেই হইত না।

রবীন্দ্রনাথের উপামাগুলি মনে এক একটি করিয়া ছবি আঁকে, ফলে তিনি যাহা বলেন তাহা মনের মধ্যে চিরতরে গাঁথা রহিয়া যায়। তাঁহার উপমার বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করিবার বিষয়। এত বিভিন্ন জাতীয় উপমা তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার দৃষ্টি বহুপ্রসারী; 'পদ-তলের ধূলি হইতে আকাশের নক্ষত্র পর্যন্ত' সব কিছুই তিনি সমানভাবে দেখিয়াছেন। তাই উপমাগুলি যেন তাঁহার লেখনীমুখে আসিয়া ভীড় জমাইয়াছে। অতুল মানসিক ঐশ্বর্যের অধিকারী না হইলে এরকম উপমা তিনি দিতে পারিতেন না।

তাঁহার রচনা যদি খবরের কাগজের সম্পাদকীয়ের মত মাজাঘসা বাহুল্যবর্জিত হইত তাহা হইলে সে রচনা পড়িবার পরে সম্পাদকীয়ের মত মনে থাকিত না বা রাখিবারও প্রয়োজন হইত না। তাঁহার রচনা যে কারণে আমাদের মানসরাজ্য উদ্ভাসিত করিয়া তোলে তাহা হইতেছে এই উপমার মাহাত্ম্য এবং প্রচ্ছন্ন সংগীত। গদ্য যেখানে ভাবে ও ভাষার দিক দিয়া পূর্ণ পরিণতি লাভ করে সেখানে গদ্যের সঙ্গে কবিতার কোন পার্থক্য থাকে না। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে এমন একটি প্রচ্ছন্ন সংগীত রহিয়াছে যে জন্য তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধই কবিতার মত বোধ হয়। কতকগুলি তো নিছক কবিতা; ইহাদের মধ্যে 'মেঘদূত', 'কাব্যের উপেক্ষিতা' (প্রাচীন সাহিত্য) প্রবন্ধগুলির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'ছিন্নপত্র' এবং 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁহার গদ্য ইংরাজিতে যাহাকে বলে high water mark সেইখানেই পেঁপৌছিয়াছে। ভাল কবিতার "বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝঙ্কারটা ফুরায় না—মিলটাকে লইয়া কানের সংগে মনের সংগে খেলা চলিতে থাকে।" (জীবনস্মৃতি, পৃঃ ৫)। তাঁহার গদ্যে নিহিত মিল থাকার দরুণ কবিতার মত উহার বক্তব্য ফুরাইলেও একটি ঝঙ্কার মনের মধ্যে আনাগোনা করিতে থাকে। কবিতা

যেমন জোরে পড়িতে হয় তেমনি তাঁহার প্রবন্ধগুলিও জোরে পড়িতে হয়, নতুবা তাহাদের ভাব হৃদয় স্পর্শ করে না।

"চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল কিন্তু জগতের সেই আনন্দ-রূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না।" (জীবন-স্মৃতি; পৃঃ ২২৭)।

সামান্য কয়টি কথায় কবির জীবনের একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা কথা কয়টির মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না, উহা আমাদের অনুভূতিকে সক্রিয় করিয়া তোলে; ফলে কবির এই অভিজ্ঞতাটি আমাদের কাছেও একটি অচিন্তনীয় আবির্ভাব বলিয়া প্রতিভাত হয়। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর ক্ষমতার ইহাই বড় পরিচয়। উধৃত লাইন কয়টি মনে মনে পড়িলে আমাদের রসোপলব্ধি কিন্তু কখনই পরিপূর্ণ হইবে না।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের আর একটি জিনিষ আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত করে, সেটি তাঁহার নাগরিকতা। মনের যে বিরাট সংস্কৃতি ও মার্জিত রুচির ফল এই নাগরিকতা তাহা সহজেই অনুমেয়। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের উপাসক, তাই সকল প্রকার মলিনতা হইতে তিনি সযত্নে নিজেকে দূরে রাখিয়াছেন; কোথাও তাঁহার স্খলন হয় নাই। এই জন্য তাঁহার প্রবন্ধে 'sweetness and light' দুই-ই রহিয়াছে। যদিও তুলনামূলক সমালোচনা অর্থহীন, তথাপি নাগরিকতার দিক হইতে যদি কাহারও সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনা করিতে হয় তাহা হইলে আনাতোল্ ফ্রাঁসের নামই প্রথমে মনে আসে। আত্মসংযম, আন্তরিকতা, সত্যানুরাগ এবং সর্বোপরি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি—নাগরিকতার এই কয়টি প্রধান লক্ষণ এই দুই-জনের মধ্যেই বিরাজমান। রবীন্দ্রনাথের নাগরিকতা অনন্য-সাধারণ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যেখানে রাজনৈতিক গ্লানি বা সামাজিক গ্লানির কথা বলিতেছেন, সেখানেও তিনি শান্ত অথচ সত্যভাষী; আর সেই সত্যভাষণের পিছনে রহিয়াছে একটি ক্ষমাপরায়ণ মনের সুগভীর নিবিড়তা। ইহাই তো প্রকৃত বৈদগ্ধ্য।

এই নাগরিকতাই তাঁহার দৃষ্টিকে সুদূরপ্রসারী করিয়াছে। 'ভারতী', 'সাধনা', 'বঙ্গদর্শন', 'সবুজপত্র', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত সকল প্রবন্ধই তাঁহার এই সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির সাক্ষ্য দেয়। সঙ্কীর্ণতার মাঝে তিনি আপনাকে আবদ্ধ রাখেন নাই। 'সত্যকে খুব বড়ো করে ধ্যান করবার এবং উপলব্ধি করবার মতো মনের উদার অবকাশ' তিনি সর্বদা খুঁজিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন "ছোটো সত্য মিটমিটে আলোর মতো ভয়কে প্রশ্রয় দেয়, দৃষ্টিকে প্রতারণা করে এবং মানুষের ব্যবহারের ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ করে রাখে।" (বাতায়নিকের পত্র, প্রবাসী—১৩২৬, আষাঢ়)। তাই কোথাও খণ্ড সত্য লইয়া তিনি তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই, তাঁহার মন হাঁফাইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সকল প্রবন্ধেই বৃহত্তের একটি ইঙ্গিত আছে।

রবীন্দ্রনাথের যৌক্তিকতাও তাঁহার প্রবন্ধের বড় একটি আকর্ষণের বিষয়। কবি সাধারণত হৃদয়াবেগের দ্বারা পরিচালিত হন; তাই তাঁহার রচনায় আবেগের প্রাচুর্য থাকে, কিন্তু যুক্তিতর্কের পরম্পরা থাকে না। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। কিন্তু গভীর আবেগে যেখানে হৃদয় দুলিয়া দুলিয়া উঠিয়াছে, সেখানেও রবীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্য সম্বন্ধে খুব সজাগ, বক্তব্যকে যথাযথ প্রকাশ করিবার জন্য সচেষ্ট। তাঁহার সঙ্গতিবোধ সত্যই অসাধারণ।

প্রবন্ধগুলি পড়িতে পড়িতে আমাদের মনের মধ্যে তাঁহার বক্তব্য যেন দানা বাঁধিয়া উঠিতে থাকে। তিনি যে কথাই বলিয়াছেন তাহাই অত্যন্ত স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সহিত পাঠকের মতের মিল না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রবন্ধের মাধুর্য কিছুমাত্র কমে নাই

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে এমন একটি ঘনসন্নিবদ্ধ ভাব থাকে যেজন্য প্রবন্ধগুলি একটি অখণ্ড পরিপূর্ণতা লাভ না করিয়া পারে না। নিজের বক্তব্য সম্বন্ধে নিজে নিঃসন্দেহান না হইলে এভাবে প্রবন্ধ রচনা সম্ভব নয়। এখানে বহু দিন আগে লেখা 'মেঘনাদ বধ' (সমালোচনা) শীর্ষক একটি প্রবন্ধের নাম করিতেছি। যদিও ইহাতে প্রকাশিত অভিমত সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন থাকিতে পারে, তথাপি বলিবার ধরণটি এমন ও প্রবন্ধটি আগাগোড়া এমন যুক্তিপূর্ণ যে ইহা আমাদিগকে মুগ্ধ না করিয়া পারে না। প্রতিটি জিনিষকে তিনি নানাভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিয়াছেন, ইহা অসামান্য অনুশীলনী শক্তির পরিচায়ক।

এই বিচার বিশ্লেষণের দরুণ তাঁহার প্রবন্ধ একবারও শুষ্ক বোধ হয় না। তাহার প্রধান কারণ, তাঁহার মনে কখনও রসের অপ্রাচুর্য ঘটে নাই। সূক্ষ্ম একটি রসবোধ তাঁহার সকল রচনাকে সরস করিয়া তুলিয়াছে। তিনি জীবনের সর্বত্রই রসের সন্ধান পাইয়াছেন, এমনকি দুঃখের মধ্যেও; তাই সব কিছু লইয়া তাঁহার রসিকতা করিতে বাধে নাই। "দুই দিনের জন্য দার্জিলিঙে ভ্রমণ করিতে আসিয়া, এই দুই জাতের অদ্ভুত একত্র দেখা গেল। একদিকে দেবাত্মা নাগাধিরাজ আর একদিকে বিলাতী-কাপড়-পরা বাঙালী। সাব্লাইম্ এবং হাস্যকর একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।" (সমাজ, নকলের নাকাল, পৃঃ ২৬)। এই রকম সাব্লাইম্ এবং হাস্যকরের মিলন দেখিবার শক্তি থাকা চাই, রবীন্দ্রনাথের সে শক্তি আছে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের অনেক অসঙ্গতি দেখিয়াই হাসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার হাসি কাহাকেও আঘাত করে না, বরং বক্তব্যটিকে উদ্ভাসিত করে। তাহার কারণ, সংসারের শত অসঙ্গতি তাঁহাকে বিরূপ করিতে পারে নাই, ক্ষমার দৃষ্টিতে তিনি সবই গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তাঁহার হাসিতে এতটুকু নির্মমতা নাই, সে হাসি মেঘমুক্ত সূর্যের মত স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়িবার সময় তাঁহার নিজস্ব একটি

স্পর্শ আমরা অনুভব করি। কতকগুলি প্রবন্ধে—বিশেষ করিয়া 'বিচিত্র প্রবন্ধে'—ব্যক্তিগত ভাবটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি নিজেকে আড়াল করিয়া রাখেন নাই, রাখিলে আর যাহাই হউক তাঁহার একটি অদৃশ্য অথচ সুমধুর উপস্থিতি হইতে আমরা বঞ্চিত হইতাম। তাঁহার এই ব্যক্তিগত ভাবটির মাঝে কোথাও এতটুকু খোঁচা নাই, তাই ইহা অনায়াসে পাঠকের সামনে হইতে পর্দা সরাইয়া দিয়া নূতন একটি জগতের সন্ধান দিতে পারে। ইহাই সবটুকু নয়। তাঁহার মনের গহনে একটি বিচিত্র মানুষ আছে, তাঁহার প্রবন্ধে আমরা এই মানুষটির সান্নিধ্যও লাভ করি। নৈর্ব্যক্তিক ভাবে প্রবন্ধ রচনা করিলে রবীন্দ্রনাথ এই মানুষটিকে অবমানতা করিতেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই। তাই দেখা যায় তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া এই মানুষটির কাছেই আসিয়াছেন এবং সকল কথা—সমাজের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বের কথা পর্যন্ত সবই ইহাকেই শুনাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ কত বিষয় লইয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার শেষ নাই। তাঁহার কৌতূহলী মন নানাদিকে ধাবিত হইয়াছে। কি সাহিত্য, কি জাতীয় জীবনের সমস্যা, কি গ্রহ নক্ষত্র সকল বিষয়ের প্রতিই তাঁহার সমান অনুরাগ। জীবনের কোন জিনিষকেই তিনি উপেক্ষা করেন নাই। যিনি 'সাহিত্য', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য' প্রভৃতি লিখিয়াছেন
শ্রাবণ), 'কালান্তর' (পরিচয়—১৩৪০, শ্রাবণ), 'হিন্দু-
তাঁহার হাত দিয়াই 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' (প্রবাসী—১৩৩২,
মুসলমান' (শান্তিনিকেতন পত্র—১৩২৯, শ্রাবণ) ইত্যাদি বাহির হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, 'শব্দ তত্ত্ব', 'বিশ্ব-পরিচয়'ও তাঁহারই লেখা। ইহা কি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার নয়?

তাঁহার প্রবন্ধগুলির দিকে চাহিলে স্তম্ভিত না হইয়া পারা যায় না, একজনের পক্ষে এত বিভিন্ন বিষয়ে মন দেওয়া কি করিয়া সম্ভব হইল! হয়ত সম্ভব হইয়াছে এই জন্য যে, তিনি কোন বিষয়কে পৃথকভাবে দেখেন নাই, একটি বৃহৎ জগতের অংগ হিসাবে সব কিছু গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ফলে অতি সামান্য তুচ্ছ বস্তুও তাঁহার কাছে প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে; কেন না তাঁহার দৃষ্টিতে বস্তুটি সার্থকতা লাভ করিয়াছে সেই জগতটির সার্থকতার মাঝে। ছোট ছোট জিনিষ লইয়াই তো বৃহৎ। তাই বৃহৎকে বুঝিতে হইলে ছোটকে না বুঝিলে চলিবে কেন? এমনি করিয়া প্রতিনিয়ত তিনি ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি সর্বত্রই 'গুটির যুগ থেকে ডানা মেলার যুগে' বাহির হইয়া আসিবার কথা বলিয়াছেন।

তিনি কত বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার তালিকা দেওয়া কঠিন, আর তাহার স্থানও ইহা নয়। তবে এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি মোটামুটি এই কয়টি শ্রেণীর—স্মৃতিমূলক, সাহিত্য বিষয়ক, ভ্রমণ সম্পর্কীয়, সামাজিক ও জাতীয় সমস্যামূলক, ধর্মসম্বন্ধীয়, ব্যক্তিগত বিষয়ক, বিজ্ঞান সংক্রান্ত ও বিবিধ। সাহিত্য বিষয়ক রচনার মধ্যে 'সমালোচনা', 'সাহিত্য', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোক সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য' প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'জীবন স্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' স্মৃতিমূলক রচনা। 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র', 'যাত্রী', 'রাশিয়ার চিঠি', 'পথের সঞ্চয়' ইত্যাদি হইতেছে ভ্রমণ সাহিত্য। 'সমাজ', 'স্বদেশ', 'কালান্তর' প্রভৃতি সামাজিক ও জাতীয় সমস্যা বিষয়ক রচনা। 'ধর্ম', 'শান্তিনিকেতন' ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ। 'ছিন্নপত্র', 'বিচিত্র প্রবন্ধ' প্রভৃতি ব্যক্তিগত বিষয়ের শ্রেণীভুক্ত। 'বিশ্বপরিচয়' বিজ্ঞান সম্পর্কীয় রচনা। 'পঞ্চভূত', 'শব্দতত্ত্ব' ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ক রচনা। এগুলি ছাড়াও তাঁহার পত্রাবলী প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এখানে বলিয়া রাখা দরকার, আমরা যে শ্রেণী বিভাগ করিয়াছি তাহাকে সূক্ষ্ম শ্রেণী বিভাগ বলিলে ভুল করা হইবে, উহা অত্যন্ত স্থূল। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের শ্রেণী বিভাগ আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের উদ্দেশ্য তিনি কত বিষয় লইয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন তাহার মোটামুটি একটা আভাস দেওয়া। স্থানাভাবের দরুণ তাঁহার বহু প্রবন্ধের নাম পর্যন্ত করা সম্ভব হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ বহুভাবে বিশ্বমানবতার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নিজের দেশের কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভোলেন নাই। তাঁহার মনটি তাঁহারই দেশের কাছে চিরদিনের জন্য বাঁধা পড়িয়া আছে। দেশের সহিত তাঁহার নাড়ির যোগ, তাই বিদেশের অভিনবত্বের মধ্যে থাকিয়াও নিজের দেশটির কথা তাঁহার বারে বারে মনে হইয়াছে, দেশের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। দেশের আলো বাতাস, দেশের গাছপালা পশুপক্ষী এমনকি দেশের একখণ্ড তৃণের প্রতিও তাঁহার অপরিসীম মায়া। দেশের সৌন্দর্য বর্ণনা করিতে তিনি কখনও ক্লান্তিবোধ করেন নাই।

দেশের নানা সমস্যা তাঁহাকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের অধঃপতনের কারণ তিনি নানাভাবে অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং সেই কারণগুলি আমাদের চোখের সামনে বারে বারে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাই আমাদের জাতীয় জীবনের, দুর্দিনে আজ তাঁহার কথাগুলিই ফিরিয়া ফিরিয়া মনে হইতেছে—

"বাহিরের দুঃখ শ্রাবণের ধারার মতো আমাদের মাথার উপর নিরন্তর বর্ষিত হইয়াছে, অহরহ এই দুঃখভোগের যে তামসিক অশুচিতা, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? নিজের মধ্যে নিজের ইচ্ছায় দুঃখকে বরণ করিয়া। সেই দুঃখই পবিত্র হোমাগ্নি,—সেই আগুনে পাপ পুড়িবে, মূঢ়তা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে, জড়তা ছাই হইয়া মাটিতে মিশাইবে। এসো প্রভু, তুমি দীনের প্রভু নও! আমাদের মধ্যে যে অদীন, যে অমর, যে প্রভু, যে ঈশ্বর আছে, হে মহেশ্বর তুমি তাহারই প্রভু—ডাকো আজ তাহাকে তোমার রাজসিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে! দীন লজ্জিত হউক, দাস লাঞ্ছিত হউক, মূঢ় তিরস্কৃত হইয়া চির-নির্বাসন গ্রহণ করুক!"

(কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, প্রবাসী—১৩২৪, ভাদ্র)।

রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান শিক্ষা

অধ্যাপক প্রমথনাথ সেনগুপ্ত, বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথকে বিজ্ঞানী বললে আধুনিক বিজ্ঞানীমহলে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব, কঠোর সমালোচনার আশঙ্কাও তাতে আছে। কিন্তু বিবিধ ও বিশিষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে যাঁর সত্য পরিচয় ঘটেছে, জীবনযাত্রায় প্রতিপদে যিনি সকল প্রকার অপবিশ্বাসকে নির্মম আঘাত করেছেন, বলিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে অন্ধ-সংস্কার ও মূঢ়তার নাগপাশ থেকে দেশের জনসাধারণকে মুক্ত করতে প্রতিকূলশক্তির বিরুদ্ধে যিনি আজীবন সংগ্রাম করে এসেছেন তাঁকেই বলব সত্যিকারের বিজ্ঞানী। শুধু জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করাই বিজ্ঞানীর একমাত্র কাজ নয়, এর দান থেকে যাতে অধিকাংশ মানুষ বঞ্চিত না হয় সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা তাঁর প্রধান কর্তব্য। যেখানে মন থাকে অবৈজ্ঞানিক হয়ে কাজের ক্ষেত্রে সেখানে অকৃতার্থতা অনিবার্য। বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথের কোনো নতুন দান না থাকলেও জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলিকে এদেশের চিত্তক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়ে তাতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জাগিয়ে তুলতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন; তাই তিনি বিজ্ঞানী। অনেক বিজ্ঞানী এদেশে আছেন, কিন্তু জনসাধারণ তাঁদের অনেকেরই শিক্ষার দান থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, প্রয়োগের দিক থেকে অভিশপ্ত কচের মতো তাঁদের শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত। দেশের প্রাণের সঙ্গে দেশের শিক্ষিতদের এই ব্যবধান, এবং এই শিক্ষার অপমানজনক স্বল্পতা রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘকাল বেদনা দিয়েছে। তিনি বারবার দেশবাসীকে এই অকিঞ্চিৎকর শিক্ষা ও তার ব্যবস্থার অস্বাভাবিকতার বিষয়ে সজাগ হতে বলেছেন।

বালককাল থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল গভীর অনুরাগ; তাঁর সমস্ত মন উন্মুখ হয়ে থাকত এর রস আস্বাদন করতে। বিজ্ঞানের অতি সাধারণ দু একটি তত্ত্ব যা তিনি তখন জেনেছিলেন তার গভীর ছাপ আজও রয়ে গেছে তাঁর মনে। বারো তেরো বছর বয়সে মহর্ষিদেবের সঙ্গে তিনি গিয়েছিলেন ড্যালহৌসি পাহাড়ে। কাছে বসিয়ে মহর্ষিদেব তাঁকে গ্রহনক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, সূর্য থেকে গ্রহমণ্ডলীর দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য অনেক বিবরণ তখনকার দিনে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর যা আয়ত্ত ছিল, সব তাঁকে শুনিয়ে যেতেন। সৌরলোকের রহস্য ও অন্তহীন মহাশূন্যে অগণিত নক্ষত্রমণ্ডলীর পরিস্থিতি তাঁর বালক মনের উপর এমনি গভীর বিস্ময়ের ছাপ অঙ্কিত করেছিল যে এই বিষয় নিয়ে তিনি তখন একটা বড়ো প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। বিশ্বকবির হাতের প্রথম সুসম্বদ্ধ রচনা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে। তারপর বয়স বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সহজবোধ্য জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞানের যত বই যেখানে তিনি পেয়েছেন পড়তে ছাড়েন নি; আজও বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে সুরক্ষিত তাঁর পড়া অনেক বই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের সাক্ষ্য দিচ্ছে। পরিহাসচ্ছলে গণিতশাস্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর আতঙ্কের কথা প্রায়ই তিনি বলে থাকেন, কিন্তু এসব বইয়ের নানা স্থানে তাঁর নিজের হাতে নোট করা যেসব কথা লেখা আছে তা দেখার সুযোগ যাঁদের হয়েছে তাঁরা নিঃসংশয়ে মেনে নিবেন যে গাণিতিক দুর্গমতা জ্যোতির্বিজ্ঞানে কোথাও তাঁর পথ অবরুদ্ধ করতে পারেনি।

আজও ছাত্রমনোভাব নিয়ে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ও ভূতত্ত্বের অনেক গ্রন্থ তাঁকে পড়তে দেখি। চিত্তের খাদ্য তিনি সংগ্রহ করেন বিজ্ঞান থেকে, তিনি তপস্বী। সব জিনিস সুস্পষ্ট না বুঝে তিনি ছাড়েন না, পাণ্ডিত্যের দৃঢ় গাঁথুনি নিয়ে তাঁর পাকা শিক্ষা হয়েছে; এটা তাঁর পাস-করা বিদ্যা নয়, আপন-করা বিদ্যা, "পরীক্ষকের পেন্‌সিল মার্কার অধিকারগম্য নয়।" ক্রমাগত বিজ্ঞানের বই পড়তে পড়তে ও তার রস আস্বাদন করে তাঁর মন হয়েছে বৈজ্ঞানিক। দেশের চিত্তক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সেচন ব্যাপারকে যথেষ্ট ব্যাপক করে তুলতে না পারলে তার দৈন্য, শুধু বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের চিরদিন অকৃতার্থ করে রাখবে। বিজ্ঞান-শিক্ষার অভাবে অন্ধসংস্কার ও অপবিশ্বাস অবাধে জাতির বুদ্ধি-বিকার ঘটিয়ে দেশজোড়া মূর্খতার বিরাট প্রাচীর গড়ে তুলেছে; তারই চাপে দেশ যে অন্তরে বাহিরে মৃত্যুর অতল তলায় ডুবছে একথা দেশবাসীকে তিনি অনেকবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—"প্রকৃতির সঙ্গে সত্যপরিচয় না থাকলে জীবনযাত্রায় মূঢ়তার দ্বার অবারিত থাকে, সকল প্রকার অপবিশ্বাস অবাধে সমাজের ভাবনা কল্পনা ও ক্রিয়াকলাপকে অধিকার করে বসে, প্রকৃতির সঙ্গে তার সত্যব্যবহার ভ্রষ্ট হয়ে মানুষকে পদে পদে অকৃতার্থ করে দেয়। আমাদের দেশে এই দুর্গতির দৃষ্টান্ত পরিব্যাপ্ত, আমাদের অধিকাংশ পরাভবের মূল এই অজ্ঞানের মধ্যে। এই জন্য আমি মনে করি দেশকে বিজ্ঞানশিক্ষায় অভিষিক্ত করে দেওয়া তার সফলতা সাধনের উদ্দেশে একটি মহৎ কর্তব্য।"

আমাদের দেশে শিক্ষাবিধান এমনি অস্বাভাবিক যে সমাজের এক অতি ক্ষুদ্র অংশে শিক্ষার ক্ষীণ আলোক পড়েছে, তার বৃহত্তর অংশ আজ শিক্ষাবিহীন হয়ে অতলস্পর্শ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তাই দেশ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত। বিজ্ঞানে-গড়া পাশ্চত্য বিদ্যা এদেশে মাপা হাতার ব্যয়কুণ্ঠ পরিবেশনেই পর্যবসিত, তাই এই বিদ্যার সঙ্গে আমাদের মনের যোগ ঘটেনি, যাঁদের ঘটেছে তাঁরা মুষ্টিমেয়। শিক্ষার সেচন ক্রিয়া সমাজের উপরের স্তরকেই সামান্য ভিজিয়েছে, নিচের স্তর রয়েছে মরুময় হয়ে; শিক্ষা-ইমারতের ব্যবস্থা এমনি যে "উপর নিচে সম্বন্ধ স্থাপনের যে সিঁড়ির নিয়মটা স্বাভাবিক ও ভদ্র নিয়ম তার সংকল্প গোড়া থেকেই বাদ পড়ে গেছে শিক্ষাবিধানের প্ল্যানে।" এই অকিঞ্চিৎকর বিজ্ঞানশিক্ষার অনিবার্য ফলে দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত জুড়ে প্রাণকে ব্যঙ্গ করছে অবসাদ, মূঢ়তা, অকর্মণ্যতা ও মৃত্যু। এই সর্বনেশে [illegible]লীলার অবসান ঘটিয়ে দেশকে আবার সহজ, সুস্থ ও সবল করে

তুলতে পারা যাবে জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞানের দ্বার উদ্ঘাটন করে; এই পুণ্যব্রতই গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন বিদ্যায়তনে বিজ্ঞানশিক্ষা এমনভাবে প্রবর্তিত করতে চেষ্টা করেছেন যাতে তার দান দেশের চিত্তক্ষেত্রকে অভিষিক্ত করে দিতে পারে; এই পুণ্যকর্মে তাঁর আয়োজন যদিও অল্প তবু তাঁর দিক থেকে চেষ্টার এতটুকু ত্রুটি হয়নি।

একান্তভাবে ইংরেজি ভাষার ব্যবহারেই এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কাজ এতকাল চলে আসছে। বিদেশী ভাষার ব্যবহারে শিক্ষা তাই দেশের প্রাণগত আপন জিনিস হতে পারেনি, দেশের চিত্ত ও শিক্ষায় একটা বিরাট ব্যবধান রয়ে গেছে। "শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ" এই সর্বজনস্বীকৃত সহজ কথাটা রবীন্দ্রনাথ অনেকবার বলেছেন—"আপন ভাষায় ব্যাপকভাবে শিক্ষার গোড়াপত্তন করবার আগ্রহ স্বভাবতই সমাজের মনে কাজ করে, এটা তার সুস্থ চিত্তের লক্ষণ। বাঙালীর ছেলে ইংরেজিবিদ্যালয় যতই পাকা হোক তবু শিক্ষা পুরো করবার জন্যে তাকে বাঙলা শিখতেই হবে।" বিষয় হিসাবে বিজ্ঞান যাতে সহজে আয়ত্তগম্য হয় তার জন্যে প্রথম প্রয়োজন মাতৃভাষায় সহজ করে বিজ্ঞানের বই লেখা। এই কাজে তাঁর পূর্ণ সহায়তা পেয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ও রায়সাহেব জগদানন্দ রায়। বাঙলাভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে যে সব গ্রন্থ জগদানন্দ রায় রচনা করেছেন তার প্রত্যেকটিই লেখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ মতো।

সহজ সরলভাষায় বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সাধারণের গ্রহণযোগ্য করে তুলতে তিনি ছোটো বড়ো অনেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখেছেন। এসব রচনা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন যে দুরূহ বাক্যজালের আঘাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষার বিষয় যাতে দুঃসহ হয়ে না ওঠে তার প্রতি রবীন্দ্রনাথের কী সতর্ক দৃষ্টি। আর তথ্যের বোঝা হালকা করে অযথা ফেনার জোগান দিয়ে শিক্ষার্থীর পাতটাকে তিনি প্রায় ভোজ্যশূন্য করেননি। মাল খুব বেশী কমিয়ে দিলে পাশ-করা বিদ্যালাভ হতে পারে, কিন্তু আপন-করা বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ তাতে ঘটে না। দেশের যে সব ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে পড়ছে, আর নানা কারণে যারা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত "তাদের নিম্নতন থেকে উচ্চতন পর্ব পর্যন্ত পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট করে পাঠ্য-পুস্তক তৈরী করে দিলে শিক্ষা সুবিহিতভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারবে।" এই আদর্শ নিয়ে লেখা তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানশিক্ষা বিস্তারের এক অভিনব পথ নির্দেশ করেছে। বিজ্ঞানের প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে পাশ্চাত্যদেশ সাহিত্যের সহায়তা গ্রহণ করেছে। এই কর্তব্যসাধনে যাঁরা প্রবৃত্ত তাঁরা শুধু যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তা নয়, ভাষা প্রয়োগেও তাঁরা নিপুণ। বিষয়বস্তু যথোচিত সরল করতে তাঁদের দক্ষতা অসাধারণ। উচ্চতন স্তরের দান নিম্নতন স্তরে নিত্যই বর্ষিত হয়ে উর্বরা করে তুলছে তাঁদের দেশের চিত্তভূমিকে। কিন্তু এদেশে বিজ্ঞানের চর্চা হয়ে থাকে একান্ত-ভাবে ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়েই, অনভ্যস্ত বিদেশী ভাষায় সে-শিক্ষা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করেনি; তাই মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে কি করে এই জনহিতকর কার্য অগ্রসর হতে পারে "বিশ্বপরিচয়ে" রবীন্দ্রনাথ তার একটা সুস্পষ্ট ধারা নির্দেশ করেছেন।

চার পাঁচদিন আগে গিয়েছিলাম তাঁকে প্রণাম করতে, বিজ্ঞানশিক্ষার কথা উঠল, তিনি বললেন "বাইরে দেখে এসেছি সর্বত্রই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের দায়িত্ব একান্ত আগ্রহের সঙ্গে স্বীকৃত, রাশিয়াতে প্রজাসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানশিক্ষার বিস্তার যে অদ্ভুত দ্রুতগতিতে হয়েছে বঞ্চিত এই দেশবাসীর কাছে তা ইন্দ্রজাল বলেই মনে হোলো। চিত্ত ও বিত্তের আদান প্রদান সেখানে বুদ্ধিবিচারের সঙ্গে চালনা হয়েছে বলেই এত দ্রুত বিজ্ঞানশিক্ষা বিস্তার সম্ভব হয়েছে। এদেশে এই জনহিতকর শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা যথাসাধ্য করেছি, হয়তো তাতে একটা ক্ষীণ স্রোত বইছে। বিজ্ঞান শিক্ষার এই স্রোত যাতে কোথাও বাধা না পায় তার দায়িত্ব রেখে গেলুম তোমাদের উপর, এই শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে যারা কাজ করছ তাদের আমি আশীর্বাদ করছি।" যে বয়সে শরীরের অপটুতা স্বভাবতই মানুষের শক্তিকে শিথিল করে আনে সে বয়সে এই কর্মযোগী বিজ্ঞানী কালের ভ্রূকুটিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, অক্লান্ত পরিশ্রমে, জনসাধারণের চিত্তক্ষেত্রে বর্তমান যুগের বিজ্ঞানশিক্ষার ভূমিকা করে দিয়েছেন; বিজ্ঞানকে অন্তরের জিনিস বলে গ্রহণ করেছেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। মূর্খতার অভিশাপে অসাড় হয়ে পড়ে আছে দেশের সহস্র সহস্র মন; তাঁর সঞ্জীবনীধারার স্পর্শ এই জড়তাকে বিনাশ করে দেশময় আজ প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুলবে, দেশের চিত্তভূমিকে বিজ্ঞানরসে অভিষিক্ত করে দেবে, এই আশ্বাসবাণী সত্যিই কি দেশবাসী, আজ তাঁর এই অশীতিতম জন্মতিথিতে তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর জন্মোৎসব

রাধারাণী দেবী

অপরাহ্ণ হ'য়ে এল। সমস্ত দুপুরে জ্বলন্ত রৌদ্র-বিচ্ছুরিত আকাশ হয়েছিল যেন সূর্য-প্রতিবিম্বিত একখানি বিরাট আয়না। চোখ তুলে তার পানে তাকানো যায় নি। পশ্চিমগামী সূর্যের তাপ এখন শান্ত হয়ে এসেছে। কিন্তু সারাদিন প্রচণ্ড অগ্নিতে দগ্ধ পৃথিবীর বুক থেকে এখনও একটা উত্তপ্ত নিঃশ্বাস নিঃসারিত হ'য়ে আসছে। বৈকালী বাতাস এক-একবার হু হু ক'রে বয়ে যাচ্ছে মাটির অন্তরের তাপ শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করে।

উজ্জ্বল অপরাহ্নের সোনালী আলোয় রৌদ্রবিবর্ণ প্রান্তর বেয়ে, আশ্রমের বৃক্ষবীথিপথে আমবনের মধ্য দিয়ে দলে দলে উৎসবযাত্রী দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলেছেন উত্তরায়ণের পানে। ছাত্র ছাত্রী, অধ্যাপক অধ্যাপিকা, বৃদ্ধ যুবা, বালক বালিকা, সর্ব ভারতীয় ও অ-ভারতীয় নানা বিচিত্র মানুষ। আশ্রমবাসী ছাড়া বাহিরের অভ্যাগতের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। গেস্ট হাউস, পান্থনিবাস, রতনকুঠী পূর্ণ হ'য়ে আর স্থান নেই। উত্তরায়ণের উদয়ন, কোণার্ক, শ্যামলী, উদীচী সমস্ত আবাসগুলিই অতিথি পরিপূর্ণ। এ ছাড়া গুরুপল্লী ও অন্যান্য নিবাসে এবার আগন্তুক সংখ্যা যথেষ্ট। কবির দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগই এবার অতিথিসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ।



উৎসবানুষ্ঠানে আশ্রম-বালিকাবৃন্দ



বিশিষ্ট নৃত্যভঙ্গিমায় শান্তিনিকেতনের ছাত্রী

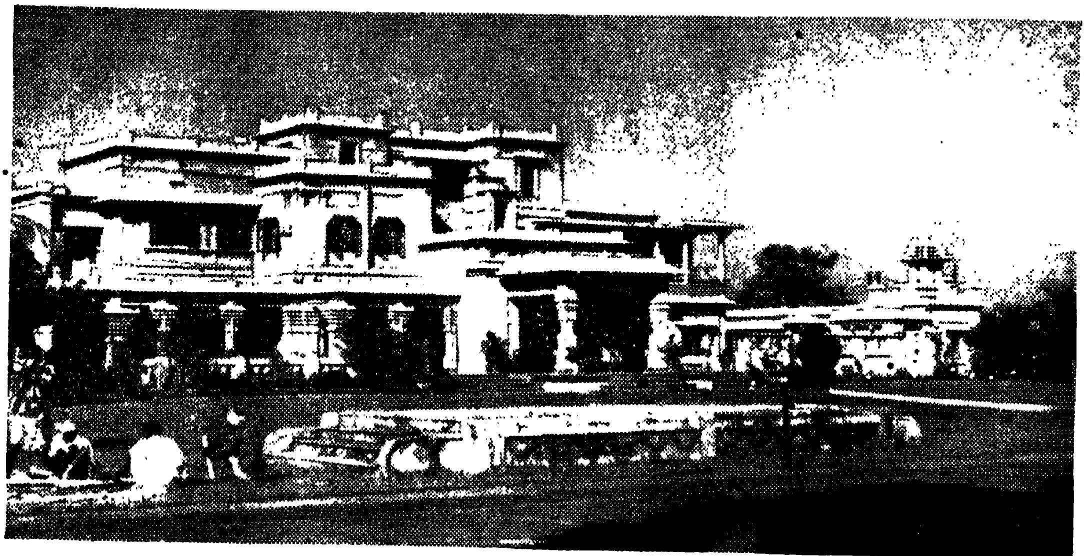
শান্তিনিকেতনে পয়লা বৈশাখ। এই বিশেষ দিনটি শান্তিনিকেতনে বহুবার এসেছে, ভবিষ্যতেও হয়তো বহুবার আসবে, কিন্তু আজকের এই পয়লা বৈশাখ শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে বিশেষ চিহ্নিত হ'য়ে রইল। শুধু নববর্ষ উৎসবই নয়, আজ শান্তিনিকেতনের প্রাণস্বরূপ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মদিন উৎসব।

মঙ্গল উৎসবের আনন্দ-উদ্যোগের মধ্যে রোগপীড়িত গুরুদেবের দুর্বল স্বাস্থ্য সকলেরই মনে কেমন যেন সকরুণ আশঙ্কার ছায়া বিস্তার করে আছে। তাই উদ্যোগ-আয়োজন নিঃশব্দ গম্ভীর। যাঁরা উৎসবে যোগ দিতে এসেছেন, তাঁরাও অন্যান্য বারের মত আনন্দোজ্জ্বল নন, সকলেই শান্ত, স্তব্ধ।

"কবির স্বাস্থ্য ভাল নেই" শান্তিনিকেতনে এ ঘটনা নূতন বললে চলে। মাত্র অল্প কয় বৎসর হ'ল এই বার্তাটির সাথে শান্তিনিকেতনবাসীদের পরিচয় ঘটেছে। এর আগে আশ্রমবাসীরা এ সংবাদটা কখনও বড় একটা শোনেন নি। আর যারই রোগ-ব্যাধির খবর শোনা যাক্ না কেন, "গুরুদেব রোগে শয্যাগত", এ খবর আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা তো আদৌ শোনে নি। অথচ মাত্র অল্পকালের মধ্যেই তিনি হঠাৎ বড় অসুখের ধাক্কায় যেন বেশিরকম দুর্বল হ'য়ে পড়েছেন, তাই সকলেরই মনে বেদনার ছায়া।

উত্তরায়ণে উদয়ন গৃহের সম্মুখে নীল আকাশের নীচে লালরঙের চন্দ্রাতপ। তারই তলায় মাটির উপরে সতরঞ্চী জাজিম চাদর বিছিয়ে পুরুষ ও মেয়েদের বসবার সুচারু সুব্যবস্থা। উদয়নের সামনের অলিন্দটি সংক্ষিপ্ত অনাড়ম্বর, অথচ অতি মনোজ্ঞরূপে মাঙ্গলিক উপচারে সুসজ্জিত করা হয়েছে।

মাত্র কয়েক গুচ্ছ পুষ্প, দুই চার ছড়া পুষ্পমাল্য, কিছু আলিপনা চিত্র ও গন্ধ ধূপের সমাবেশে একটি মঙ্গলোৎসবের আসরকে যে কতখানি শুচি-সৌন্দর্য ও শিল্পরুচির উচ্চ মর্যাদায় মণ্ডিত করে দেওয়া যেতে পারে, কবিগুরুর প্রত্যেক উৎসব-অনুষ্ঠানে অনেকেই প্রত্যক্ষ করে থাকবেন। এইটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, 'পুনরাবৃত্তি' ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে মাত্র নয়, তাঁর জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্ব কর্মেই সুদুর্লভ। তাই তাঁর নানা নব নব উৎসব-অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপ ও আসরসজ্জার অভিনবত্ব প্রতিবারই আমাদের



উদয়ন : সম্প্রতি কবি এই বাসভবনে অবস্থান করিতেছেন



কবির সর্বাধুনিক বাসভবন 'উদীচী'

চিত্ত চমৎকৃত করে। নয়ন এবং মন প্রত্যেক বারই নূতনের দেখা পেয়ে আনন্দ-পরিতৃপ্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বেগবান্ চিত্তের মানবপ্রকৃতি পৃথিবীর সকল কালেই দুর্লভ। চিরাচরিত প্রথা-রূপ পাষাণ গুহার সুদৃঢ় প্রাচীর স্বাভাবিক শক্তিতে উল্লঙ্ঘন করে তাঁর প্রচণ্ড প্রাণস্রোত বিরাট বিশ্বের উন্মুক্ত অঙ্গনে সহস্রধারায় প্রবাহিত হয়েছে। বাল্যকাল থেকেই তিনি আপনার মনন-শক্তিকে স্বকীয়তার পথ কেটে গতিশীল করেছেন। তাঁর সৃষ্ট পথে তাঁর অনুবর্তী বহু জনাকীর্ণ শোভাযাত্রা অগ্রসর হ'য়ে

কবির জন্মোৎসব অনুষ্ঠান বিশ্বভারতীর পক্ষ হ'তে সুষ্ঠুভাবে আচরিত হ'ল। অতিশয় দুর্বল শরীর সত্ত্বেও কবি পদব্রজে এসে সভার মধ্যে আসন গ্রহণ করলেন। উপবিষ্ট জনতা সসম্ভ্রমে উন্মুখ আগ্রহে উঠে দাঁড়ালেন। সকলেরই চোখে আশঙ্কা ও ব্যগ্রতা। মানুষের অন্তরের ঐকান্তিক মঙ্গল কামনাও যে সকল ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয় না, সেদিন যেন বিশেষভাবেই উপলব্ধি করা গেল। এই বৃহৎ জনতার প্রত্যেকেই অকৃত্রিম ঐকান্তিকতায় কবিগুরুর স্বাস্থ্যের বলিষ্ঠ উন্নতি কামনা করেন, কিন্তু সে কামনা



শান্তিনিকেতনের শালবীথিকা

আসছে। আজও এই অশীতিপর বয়সেও তাঁর প্রদৃপ্ত প্রাণ-যাত্রায় নব নব পথসৃষ্টির বিরাম নেই।

ব্যবহারিক জীবনযাত্রাতেও তিনি গতানুগতিকতা বা একঘেয়েমি সহ্য করতে পারেন না। যেমন, আবাস বদল করা। শান্তিনিকেতনের মধ্যেই তাঁর বাসা-ভাঙ্গা ও বাসা-বদল আকাশচারী পক্ষী জাতিকেও হার মানিয়েছে।

গাছের উপরে 'টঙ' রচনা হ'তে শুরু করে ভারতীয় স্থাপত্যকলার সুন্দর নিদর্শন উদয়ন,—কোণার্ক, শ্যামলী, পুনশ্চ, উদীচীর মধ্যে খড়ের কুটীর, মাটীর ঘর, পাথরের বাসা প্রভৃতি রচনা করে বাস করেছেন। তাঁর প্রতিটি গৃহ রচনার মধ্যে উদ্ভাবনীশক্তি ও কল্পনাবৃত্তির লীলা পরিস্ফুট হয়েছে।

কতদিনে যে সফল হবে, কিম্বা সফল হবে কি না, কে বলতে পারে?

উৎসবের প্রাথমিক মঙ্গল সংগীতের পর নিখুঁত প্রাচীন ভারতীয় বেশবাসে আশ্রম কন্যাগণ বহুবিচিত্র অর্ঘডালা নিয়ে শ্রেণীবদ্ধভাবে অগ্রসর হয়ে একের পর একে কবির পদপ্রান্তে সাজিয়ে রাখল অর্ঘসম্ভার। দুটি ছোট বালিকা কবিকে চন্দনচর্চিত ও মাল্যভূষিত করল। তার পর বিশ্বভারতী ও আশ্রমবাসীদের পক্ষ হ'তে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় তাঁর স্বাভাবিক উদাত্ত মধুর কণ্ঠে কবিগুরুর প্রতি শান্তি-নিকেতনবাসীদের অন্তরের প্রেমপূর্ণ শ্রদ্ধা এবং তাঁর স্বাস্থ্যের কল্যাণ কামনাপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করলেন। প্রতি-ভাষণে রোগশীর্ণ কবিগুরু ক্লান্ত দুর্বলকণ্ঠে, অথচ

স্বভাবসিদ্ধ স্বচ্ছন্দ প্রবাহিত ভাষায় তাঁর অন্তরের অকৃত্রিম স্নেহাশীর্বাদ দান করলেন আশ্রমবাসীদের প্রতি।

তারপরেই ক্ষিতিমোহনবাবু পাঠ করে শোনালেন পুস্তিকাকারে মুদ্রিত ও সভায় বিতরিত "সভ্যতার সংকট" শীর্ষক কবির নববর্ষের বাণী। যার মধ্যে কবি তার মন্দভাগ্য স্বদেশের বর্তমান অধোগতি ও দুর্দশার মূল কারণ নির্দেশ করেছেন।

বিচারবুদ্ধিকে স্বাদেশিকতা জাতীয়তা প্রভৃতির ঊর্ধ্বে স্থাপন করে, সকল সংস্কার সকল প্রবণতানির্মুক্ত অনাবিষ্টচিত্তে কবি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের মূল্যবান অভিজ্ঞতার ফল যা' বর্ণনা করেছেন তা' অতিশয় করুণ অথচ কঠোর। ইংরেজ জাতির দোষ ও গুণ, বলিষ্ঠতা ও দৌর্বল্য সম্বন্ধে নিরাসক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে এমন সত্যবিচার ও সত্যভাষণ এর



'চিত্রাংগদা' নৃত্যনাট্যে একটি নৃত্যভঙ্গিমা

আগে কখনও কারুর দ্বারা সম্ভব হয়নি। কবির এই সত্যবাণী একদা আন্তর্জাতিক জগতের গ্রাহ্য হবেই, নিশ্চিত বলা চলে।

সর্বশেষে ছিল সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান। রবীন্দ্রসংগীতের বিশিষ্ট রূপ ও পদ্ধতি আজ বাঙলা দেশের অবিদিত নয়। সুতরাং সংগীত সম্বন্ধে কিছু না বলে শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট নৃত্য সম্বন্ধে সামান্য বলবো। বাঙলা দেশে ভদ্রসমাজে নৃত্যকলার প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ। ভারতের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতির নৃত্য প্রচলিত থাকলেও বাঙলায় এর প্রচলন ছিল না। সমাজের বাহিরে বিশেষ একশ্রেণীর নারী নৃত্যকে উপজীবিকারূপে গ্রহণ করায় নৃত্যকলা ভদ্রসমাজে অনাচরণীয় হয়ে গিয়েছিল। এই কলালক্ষ্মীর অস্পৃশ্যতা দূর ক'রে সমাজে তুলে নিতে রবীন্দ্রনাথকে অনেক নিন্দা সহ্য করতে হয়েছে। দেখে আনন্দ হ'ল অন্তরের কল্পনাকে তিনি তাঁর জীবনকালের মধ্যেই সুন্দর সার্থক ক'রে যেতে সমর্থ হয়েছেন। ভারতীয় নৃত্য, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এবং আধুনিক নব্য বাঙলায় যা দেখা গিয়েছে—তার সঙ্গে শান্তিনিকেতনের নৃত্যের তুলনা করা চলে না। আধুনিক বাঙলায় সর্বত্র সুলভ যে 'ভূঁইফোড়' নৃত্য দেখা যায়,—যা' অজন্তা ইলোরার চিত্রপদ্ধতির ব্যর্থ অনুকরণে কতকগুলি অংগভংগিমাসমষ্টি মাত্র, তাদের কথা বাদ দিয়ে অন্যান্য তাললয়াশ্রিত নৃত্যের সঙ্গে তুলনা ক'রেই আমি একথা বলছি। শান্তিনিকেতনে যে কি আশ্চর্য শিল্পসংগত, রুচিসম্মত ও প্রাণব্যঞ্জনাময় সুরতাললয়াশ্রিত নৃত্য সৃষ্টি হয়েছে স্বচক্ষে উপভোগ না করলে ধারণা করা কঠিন। ভারতীয় নৃত্য ভারতীয় সংগীতসাধনারই মত কঠিন সাধনার সামগ্রী। শান্তিনিকেতনে তাললয়াশ্রিত বহু বিচিত্র নৃত্যের সুন্দর সাধনা হচ্ছে। এখানকার নৃত্যে সর্ব অংগের গতি, ব্যঞ্জনা, স্থিতি, রেখা, তালসংগতি, লয়, অংগহার প্রভৃতি দর্শকের দৃষ্টি ও মন চমৎকৃত করে। একে আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নয়।

নাচের 'টেকনিক'কেই নাচ ব'লে শান্তিনিকেতনে পরিচিত করা হয় নি। এখানকার নৃত্যে 'টেকনিক' উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য হয়ে ওঠেনি। তাইজন্য নৃত্যকলা এখানে বন্দিনী এবং আড়ষ্ট নয়।

কলাপদ্ধতি যতই নিপুণতার সহিত আয়ত্ত করা হোক না কেন, যেখানে সৃজনী-প্রতিভা নেই, কলালক্ষ্মী সেখানে ক্রমশ প্রাণহীন যন্ত্রবৎ হয়ে উঠবেই। কারণ সর্ববিধ কলাক্ষেত্রেই দেখা যায় 'টেকনিক' উপায় বা আশ্রয় মাত্র, সৃজনীশক্তিই তার প্রাণবস্তু। শান্তিনিকেতনে সর্বভারতীয় নৃত্যকেই সমাদরে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে নৃত্যের মধ্যে স্বকীয়তা ও উদ্ভাবনী প্রতিভা বিশেষভাবে বর্তমান থাকায় বিশেষ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে নিঃসন্দেহ।

এই সভায় কবিগুরুকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে মিলিত হয়েছে দেখা গেল, য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের পুরুষ নারী, জাপানী, চৈনিক, যবদ্বীপবাসী। তাছাড়া বর্মী, সিংহলী, দ্রাবিড়ী, উৎকলী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটী, মণিপুরী, আসামী সর্বভারতীয় মানব। এঁদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, নাস্তিক, আস্তিক, সবকিছুই বর্তমান।

ভারতবর্ষের এক মহামানবের পরিকল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত বিশ্বজনীন বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনতীর্থে সম্মিলিত হয়ে দূরদূরান্তের যে সকল মানুষ আজ এই তীর্থদেবতার চরণে প্রণত হওয়ার সুযোগ অর্জন ক'রেছেন, তাঁরা সৌভাগ্যবান। কারণ, তাঁরা কোনও একটি দেশীয়, কোনও একটি জাতীয় বা কোনও একটি বিশেষ ধর্মী মানবের নিকট তাঁদের শ্রদ্ধা অর্পণ করেন নি; তাঁরা নতশির হয়েছেন এক বিরাট মানবতার সম্মুখে, যাঁর ত্রিকালব্যাপ্ত চিত্তসম্পদ দেশকালের সীমা উত্তীর্ণ, সুতরাং নিখিল মানবের বরেণ্য সামগ্রী।

'খাপছাড়া'র কবি

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মনীষী রবীন্দ্রনাথের মনের আড়ালে রয়েছে এক চিরন্তন খেয়ালী শিশু, সে মানে না কোন বাঁধন, ধার ধারে না যুক্তির। বৃদ্ধের গাম্ভীর্যকে উপেক্ষা ক'রে সে হঠাৎ হাসির হিল্লোলে উচ্চকিত ক'রে তোলে আকাশকে, বলে—'বৃদ্ধের ও-বেশ ছদ্মবেশ, ওকে আমি মানব না।' কবিগুরু অমনি সায় দিয়ে বলেন, 'হাঁ, তাই, ওর সঙ্গে আমার মনের বয়স মেলে; আমি হব ওর খেলার সাথী।' তিনি নামেন খেলায়, হয়ত' বালির ঘর তৈরিতে। কিন্তু এখানেও তাঁর নৈপুণ্য। আগন্তুক শিশুর দল মুগ্ধ হয়ে দেখে আর ভাবে, এই আমাদের সত্যিকারের খেলাঘর, ঠাকুরদা আমাদের চিরদিনের খেলার সাথী।

"বালকের প্রকৃতিতে মনের প্রতাপ অনেকটা ক্ষীণ। জগৎসংসার এবং তাহার নিজের কল্পনাগুলি তাহাকে বিচ্ছিন্নভাবে আঘাত করে, একটার পর আর একটা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের বন্ধন তাহার পক্ষে পীড়াজনক। * * * বহির্জগতে সমুদ্রতীরে বসিয়া বালক বালির ঘর রচনা করে। মানস-জগতের সিন্ধুতীরেও সে আনন্দে বসিয়া বালির ঘর বাঁধিতে থাকে।"

—'ছেলেভুলানো ছড়া', রবীন্দ্রনাথ।

তাই শিশুমনের খামখেয়ালী খেলায় মুগ্ধ কবি বালির ঘর রচনা করেছেন, ভাষা দিয়েছেন তার 'খাপছাড়া' ভাবগুলিকে; এলোমেলো ক্ষ্যাপামির বাতাসে উড়ে চলেছে হাল্কা হাসির ফেনা; অর্থ নেই তাতে, আছে প্রাণের সহজ উল্লাস।

কিন্তু এই সহজ উল্লাসকে প্রকাশ করা কাজটি সহজ নয়।

"কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে,
যা' তা' লেখা তেমন সহজ নয়তো।"

সেই ভোজবাজির ঠাট্টায় দেখতে দেখতে ভিড় জমে যায়; কৌতূহলী শিশুর দল বিস্মিত হয়ে ঘিরে দাঁড়ায়; তারা শোনে ছড়ার গুঞ্জন, দেখে কিম্ভূতকিমাকার মজার ছবি। অসম্ভব কল্পনা, আজগুবি ব্যাপার—মনের মধ্যে যেন খুনসুড়ি দিতে থাকে; তা'রা হাসতে থাকে শুনে—



ঘণ্টাকর্ণ—'সে'

তুচ্ছ সব জিনিস নিয়ে যাদুকর দেখান যাদুবিদ্যার খেলা; ব্যাপারটা হয়ত কিছুই নয়, কিন্তু অবাক হয়ে যায় দর্শক, ভাবে—কোথায় পেলেন যাদুকর তাঁর এই অদ্ভুত শক্তি?

"ঠিকানা নেই আগু পিছুর
কিছুর সঙ্গে যোগ না কিছুর,
ক্ষণকালের ভোজবাজির এই ঠাট্টা॥"

"ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির তিন বোন থাকে কালনায়,
শাড়িগুলো তা'রা উনুনে বিছায়, হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়।
কোনো দোষ পাছে ধরে নিন্দুকে
নিজে থাকে তা'রা লোহা-সিন্দুকে,
টাকাগুলো তা'রা হাওয়া খাবে বলে' রেখে দেয় খোলা জানলায়,
নুন দিয়ে তা'রা ছাঁচি পান সাজে, চুন দেয় তারা ডালনায়।"

শুধু কি ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির পাঁচ বোনের গল্প?

তা'রা শোনে মহাগম্ভীর রাজার কথা। রাজা ধ্যানে বসেছেন, বিশজন সর্দার হাঁকছে 'খবরদার'।

"সেনাপতি ডাক ছাড়ে,
মন্ত্রী সে দাড়ি নাড়ে,
যোগ দিল তা'র সাথে
ঢাক ঢোল বর্দার।
ধরাতল কম্পিত
পশুপ্রাণী লম্ফিত,
রাণীরা মূর্ছা যায়
আড়ালাতে পর্দার।"

সন্তোষের কাহিনীও কম মজাদার নয়। জঠরে অগ্নিদোষ হওয়ায় সে হাওয়া খেতে পচম্বা গিয়েছিল।

"নাকছাবি দিয়ে নাকে
বাঘ্‌না পাড়ায় থাকে
বউ তা'র বেঁটে জগদম্বা।"

ডাক্তার গ্রেগ্‌সন্ ইনজেকশন দিতে বউ তো সাতফুট লম্বা হয়ে গেল। সন্তোষের হ'ল রাগ,—সে বলল, "অপমান সহিব কথম্ বা?—ওহে ডাক্তার, শীগ্‌গির আমার পায়া উঁচু ক'রে দাও, খড়মে ওষুধ লাগাও।" ডাক্তার তো "শুনে হতভম্বা।"

এমনি কবিতার পর কবিতা। অবিশ্বাস্য তার ঘটনা, অসম্বন্ধ তার ভাব; অথচ মনোহরণ মিথ্যায় মন ভোলে শিশুর। প্রবীণ পাঠক হয়তো অণুবীক্ষণ ক'ষে আবিষ্কার ক'রতে চাইবেন আমাদের রীতিনীতি আচরণের প্রতি বিদ্রূপ, কিন্তু সে হবে কষ্টকল্পনা। হালকা মেঘের মত এরা ভেসে চলেছে দলে দলে, নির্দিষ্ট অর্থের বন্ধনে কোথাও বদ্ধ নয়।

"নীলুবাবু বলে—শোনো নেয়ামৎ দর্জি
পুরানো ফ্যাশানটাতে নয় মোর মর্জি
শুনে নিয়ামৎ মিঞা যতনে পাঁচশটে
সম্মুখে ছিদ্র, বোতাম দিল পৃষ্ঠে।
লাফ দিয়ে বলে নীলু—একী আশ্চর্য
ঘরের গৃহিণী কয়—রয়নাতো ধর্য।"

রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-বিহারী শিশুকে ইতিপূর্বেও আমরা দেখেছি। 'শিশু'তে এবং 'শিশু ভোলানাথে' শুনেছি তার চপল পদধ্বনি। কিন্তু 'খাপছাড়ার' রস উপরিউক্ত দু'খানি কাব্যের রস থেকে স্বতন্ত্র। 'শিশু'র কবিতাগুলিতে একটি মোহন মায়াস্বপ্ন জড়িয়ে আছে; সেখানে চোখে পড়ে শিশুর ব্যাকুল উৎসুক দৃষ্টি; সম্মুখে জীবনসাগর দুর্বোধ্য কল-গানে মুখর, সে শুনছে তাঁর অশ্রান্ত সংগীত; মনে তার সহস্র স্বপ্ন, অযুত কামনা, দূরেদূরান্তরের কত অজানা দেশের ছবি,—পরীর দেশ, পুরাণের দেশ, রূপকথার রূপরাজ্য জাগিয়ে তুলছে এক অনির্দেশ্য বেদনা। "মধুমাঝির নৌকো-নায়" চ'ড়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিতে চায় সে, রামের মত লক্ষ্মণ ভাইকে নিয়ে বনবাসে যেতেও তার আপত্তি নেই, সাতভাই চম্পা আর পারুল দিদির দুঃখে তার হৃদয় ব্যাকুল, আবার মায়ের জন্যে "সাতরাজার ধন মানিক" নিয়ে আসতে তার একান্ত সাধ। 'খাপছাড়া' কাব্যের রস কিন্তু এ রকমের নয়, এ শুধু কতকগুলি হালকা হাসির ছড়া, উদ্দেশ্যহীন, বেদনাহীন মজাদার কবিতার সম্ভার।

* * * * * *

'ছড়ার ছবি'তে গল্পের মত ক'রে বলা কতকগুলি জীবন-চিত্র, হালকা তুলিতে আঁকা হ'লেও এগুলিতে আছে জীবনের স্বাদ, 'জীবনস্মৃতি' এবং 'ছেলেবেলা'র কথা অনেক জায়গায় স্মরণ করিয়ে দেয়।

"বয়স তখন ছিল কাঁচা, হাল্‌কা দেহখানা
ছিল পাখির মত, শুধু ছিল না তা'র ডানা।
* * * * *
জুটেছি বৌদিদির কাছে ইংরেজী পাঠ ছেড়ে
মুখখানিতে ঘের-দেওয়া তাঁর শাড়িটি লালপেড়ে।
চুরি ক'রে চাবির গোছা লুকিয়ে ফুলের টবে
স্নেহের রাগে রাগিয়ে দিতেম নানান্ উপদ্রবে।
* * * * * *
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে, রাস্তা ভাসে জলে,
ঐরাবতের শুঁড় দেখা যায় জলঢালা সব নলে,
অন্ধকারে শোনা যেত রিমঝিমিনি ধারা,
রাজপুত্র তেপান্তরে কোথা সে পথহারা।"

শৈশবের সুমধুর স্মৃতি-জড়ানো অনেক ছবি ফুটে উঠেছে এর ভাষায়, আর ফুটেছে নন্দলালের অভ্রান্ত তুলির টানে। কি অবলীলাক্রমে দু'চারিটি রেখায় চিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছেন নন্দলাল, না দেখলে তা বোঝা যাবে না।

"ঈশান কোণে উড়তি বালি আকাশখানা ছেয়ে
হু হু করে' আস্‌ছে ছুটে ধেয়ে"

সহজ কথায় সুন্দর ছবি। পাশেই তা'র নন্দলালের আঁকা ছবি—ঝোড়ো হাওয়ায় নদীতে ঢেউ উঠ্‌ছে. দ্রুতবেগে নৌকা চালিয়ে চ'লেছে ত্রস্ত মাঝির দল।

'অচলা বুড়ির বর্ণনা—

"অচল বুড়ি, মুখখানি তার হাসির রসে ভরা,
স্নেহের রসে পরিপক্ক অতি মধুর জরা।"

শুধু তা'র দেহের ছবি নয়, মনের ছবিও ফুটিয়ে তুলেছে। সকলে যাকে ঘৃণা করে, অচলা বুড়ি করে তা'র সেবা; সকল দীনতাকে উদ্ভাসিত ক'রে প্রকাশ পেয়েছে তা'র মনুষ্যত্বের অম্লান মহিমা।

দীনাতিদীন তুচ্ছ জীবন নিয়েই এর অধিকাংশ কবিতা; কিন্তু অবজ্ঞাত মানবের মনোমন্দিরে কবি দেখেছেন দেবতাকে এবং তাঁকেই দেখিয়েছেন—অনাবিল সরল অনুকম্পার আলোকে।

* * * * *

'সে' এক অদ্ভুত গল্প; অসংলগ্ন, অবাস্তব-এর কল্পনা,—পদ্যে নয়, গদ্যে রচিত। ছোট্ট শিশু এর রসগ্রহণ করতে পারবে না, বালক ও কিশোর সাগ্রহে এ কাহিনী শুনবে। 'সে' যে কে, তা কে জানে?

"একদিন ঝমাঝম বৃষ্টি। বসে' বসে' ছবি আঁকছি। এখানকার মাঠের ছবি। উত্তর দিকে বরাবর চ'লে গেছে রাঙা মাটির রাস্তা,—দক্ষিণ দিকে পোড়ো জমি, উঁচুনিচু ঢেউখেলানো,—মাঝে মাঝে ঝাঁকড়া বুনো খেজুর। দূরে দুটো চারটে তালগাছ আকাশের দিকে কাঙালের মতো তাকিয়ে। তারি পিছনে জমে' উঠেছে ঘন মেঘ, যেন একটা প্রকাণ্ড নীল বাঘ ওৎ পেতে আছে, কখন একলাফে মাঝ আকাশে উঠে সূর্যটাকে দেবে থাবার ঘা। বাটিতে রং গুলে এই সব এঁকে চলেছি।

"দরজায় পড়ল ঠেলা। খুলে দেখি, ডাকাত নয়, দৈত্য নয়, কোটালের পুত্তুর নয়—সেই লোকটা।" সুরু হ'ল গল্প। পুপু দিদিমণি একমনে শুনে চলেছে। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে, দাদামশায় জবাব দেন, আবার গল্প চলে। শেয়াল-কাঁটার বনের শেয়ালের গল্প, 'গেছোবাবা'র কাহিনী, তা'র পরেই 'ববকরণ', 'তৈতিলকরণ, বৈকুম্ভযোগ', দেখতে দেখতে এসে গেলেন স্মৃতিরত্নমশায়, "তিনি মোহনবাগানের গোলকীপারি ক'রে ক্যালকাটার কাছ থেকে একে একে পাঁচ গোল খেলেন। খেয়ে ক্ষিদে গেল না, উল্টো হোলো, পেট চোঁ চোঁ করতে লাগ্‌ল। সামনে পেলেন অক্‌টর্লনি মনুমেণ্ট। নিচে থেকে চাটতে চাটতে চূড়ো পর্যন্ত দিলেন চেটে।

বদরুদ্দিন মিঞা সেনেট হলে ব'সে জুতো সেলাই করছিল। সে হাঁ হাঁ করে' ছুটে এলো। বললে—আপনি শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে এতবড়ো জিনিসটাকে এঁটো করে' দিলেন? 'তোবা..তোবা' ব'লে তিনবার মনুমেণ্টের গায়ে থুথু ফেলে মিঞা সাহেব দৌড়ে গেল স্টেট্‌স্‌ম্যান আপিসে খবর দিতে। স্মৃতিরত্নমশায়ের হঠাৎ চৈতন্য হোলো, মুখটা তাঁর অশুদ্ধ হয়েছে। গেলেন মুাজিয়ামের দরোয়ানের কাছে। বললেন—পাঁড়েজি, তুমিও ব্রাহ্মণ, আমিও ব্রাহ্মণ, একটা অনুরোধ রাখতে হবে। পাঁড়েজি দাড়ি চুমরিয়ে সেলাম করে' বললে, কোমা ভূ পোর্তে ভূ সি ভূ প্লে। পণ্ডিতমশায় একটু চিন্তা করে' বললেন, বড়ো শক্ত প্রশ্ন, সাংখ্যকারিকা মিলিয়ে দেখে কা'ল জবাব দিয়ে যা'ব। বিশেষ আজ আমার মুখ অশুদ্ধ, আমি মনুমেণ্ট চেটেছি। পাঁড়েজি দেশলাই দিয়ে বর্মা চুরুট ধরাল। দু'টান টেনে বললে, তাহ'লে এক্ষুনি খুলুন ওয়েবস্টার ডিক্‌সনারি, দেখুন বিধান কি।"

'সে' এসে গল্প জুড়ে দিলেঃ—"তাসমানিয়াতে তাস-খেলার নেমতন্ন ছিল। * *সেখানে কোজুমাচুকু ছিলেন বাড়ির কর্তা, আর গিন্নির নাম ছিল শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরুণ্ডুনা। তাঁদের বড়ো মেয়ের নাম পামকুনি দেবি, স্বহস্তে রেঁধেছিলেন কিণ্টিনাবুর মেরিউনাথু,......আর জালা জালা ভর্তি ছিল কাঙচুটোর সাঙচানি।......এই সঙ্গে মিষ্টান্ন ছিল ইক্‌টিকুটির ভিক্‌টিমাই, ঝুড়িভর্তি।"

আবার গল্পকার দাদামশায়। গল্পের মধ্যে ছড়াও আছে—"সুঁদর বনের কেঁদো বাঘ, গায়ে তার চাকা চাকা দাগ।" সুকুমার দা'র কথায় হয়েছে গল্পের শেষ। গল্পের বাঁধুনি আলগা, ঘটনা এলোমেলো; যেন দার্জিলিঙের আকাশ, এই মেঘ, এই রোদ, এই বৃষ্টি, বুঝি কোন্ সৃষ্টিছাড়া অনিয়মের রাজত্ব। কিন্তু বিচিত্র এই খেলা, ক্ষণিক আলো আর অস্পষ্ট কুয়াশার লুকোচুরি, রং আর ছায়ার বিমোহন আলিম্পন।

রবীন্দ্রনাথের অন্তরের চিরশিশু আজও তা'র স্বপ্নদৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে জগতের পানে। সংসার তার মনের তটে আঘাত ক'রেছে, কিন্তু কল্পনার খেলাঘরটি ভাসিয়ে নিতে পারেনি।

[খাপছাড়া— শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়; কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।
ছড়ার ছবি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়; কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।
সে— শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়; কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।]

রবীন্দ্রনাথের বাউল গান

(৫৩ পৃষ্ঠার পর)

শুনে কেউ না আসে" ও "নিশিদিন ভরষা রাখিস্" গান দুটিতে আশা উদ্দিপনার ভাব সুরে কথায় মিশে সুন্দর প্রকাশ হয়েছে। "বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ় তোমার মালা", "এ বেলা ডাক পড়েছে", "আমি তারেই জানি", "ফাগুন তোমার হাওয়ায়"; গানকটিতে সঞ্চারী ও কখনো কখনো আভোগে নানা রাগ বা রাগিণী কি রকমে বাউলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেছে তার একটা সুন্দর পরিচয় পাই। "বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটাফুলের মেলা", "ডাকবোনা ডাকবোনা এমন করে", এই দুইটি গানের সবটাই বাউলের সুর; কিন্তু ধ্রুপদের মত চারিটি ভাগে সুরগুলি কিভাবে বসেছে সেটি লক্ষ্য করার জিনিস। অস্থায়ী অন্তরা ও সঞ্চারীতে বাউল সুরই বিভিন্ন আকার গ্রহণ করেছে। "আমি কান পেতে রই", গানটি দুটি দিক দিয়ে আলোচনার বস্তু। এ গানে বাউল ও কীর্তন সুরের ঢং একসাথে কাজ করেছে এবং ভাব সম্পদে বাউলের সঙ্গে এর মিল খুব। সঙ্গীত সাধক বাউলদের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের জীবনে কিভাবে কাজ করেছে তা এ গানটির ভিতর দিয়ে আমরা অতি পরিষ্কার অনুভব করি।

যে গান কানে শুনে তার রস গ্রহণ করতে হয় তাকে কলমের সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা না করাই উচিৎ। রবীন্দ্র-সংগীতে উৎসাহী যাঁরা তাঁরা এ গান কয়টি শিখে বা শুনে নিশ্চয়ই আমার কথাগুলি ধরতে পারবেন। এবং আমার মনে হয় এ কয়টি গানকে জানলেই রবীন্দ্রনাথের বাউল সংগীতের ধারাটি সম্পূর্ণ জানা হবে।

কবিতা

রবীন্দ্রনাথ

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্ধকার গিরি গাত্রে কারা যেন চ'লেছিলো হে'টে
'প্রাচী'র দিগন্ত থেকে কোন সূর্য হানেনি আলোক,
তাহাদের শোক
পুঞ্জীভূত হ'য়েছিলো সে-গিরির উপলে উপলে!

নিস্তব্ধ মৃত্যুর মতো তাহাদের সে-অপসরণ,
ফেলিল চরণ,
প্রীতিহীন পৃথিবীর মাটির উপরে,
অন্ধকার গিরি গুহা তলে,
ধ্বংসের করুণ গান শোনা গেল বেশ,
এখানে ওখানে তার রুদ্র জটাজাল,
ছড়ায়ে পড়িল যেন ক্রুর মহাকাল
হাসিল গম্ভীর হাসি!

আমরা দাঁড়ায়ে ছিনু অতীতের স্মৃতিগুলি
বক্ষে আঁকড়িয়া,
সুদূরের মিশরের মমির মতন!
আমরা দাঁড়ায়ে ছিনু,
জীবনের গলিত শবের 'পরে বধির নির্বাক
নির্বোধের মতো,
পথহীন, নিরুপায়, ছিন্ন-কন্থা হাতে!

সহসা চাহিয়া দেখি জ্যোতির শিখাতে
উদ্ভাসিত সমস্ত ধরণী,
এ যে আলো, এ যে গান, আমরা লুকোবো কোথা?
এতো আলো চক্ষে সহে না যে!
বিস্ময়ের হাত ধ'রে আমরা রহিনু চেয়ে
ম্লান দৃষ্টি মেলে
অতীতের মিশরের মমীর মতন!

গান এলো, প্রাণ এলো, এলো আলো
আমাদের জীবনের প্রতি রোমকূপে
সে আলো ছড়ায়ে গেল পৃথিবীর আকাশে আকাশে,
আমরা তুলিনু শির,
অবনত শত শতাব্দীর;
আমরা গাহিনু গান,
প্রভাত সূর্যেরে
পাঠানু প্রণাম আলোকিত গিরিপথ হ'তে!

সেই দিন মনে আছে আমরা দাঁড়ানু দৃঢ়!
আমাদের জয়-যাত্রা লোক হ'তে লোকান্তরে,
দিক্ হ'তে দিগন্তরে,
পৃথিবীর প্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্তভাগে!

রবীন্দ্রনাথ

অরুণ সরকার

স্নিগ্ধ বারিধির বক্ষে জন্ম নেয় দীপ্ত ক্ষণপ্রভা
নির্ঝর বহিয়া আসে পাষাণের গুহাবর্ত্ম টুটে
ক্লিন্ন কর্দমের মাঝে জেগে ওঠে পঙ্কজের শোভা
পরম মিথ্যার ঘাতে সত্যের মহিমা ওঠে ফুটে।
তাই আর বিস্ময় জাগে না। তাই যেন মনে হয়
তোমার প্রতিভা সনে বিশ্বের করাবে পরিচয়
তাহারি প্রতীক্ষা করি কঠোর তপস্যাভারে নতা
বঙ্গের ভারতী ছিল বহুযুগ স্তব্ধ মৌনব্রতা।

সে কঠিন তপস্যার সিদ্ধিরূপে তুমি এলে শেষে
গুঞ্জরি উঠিল গান অনাঘ্রাত বেণুকুঞ্জ বনে—
চকিতে সে ভিখারিণী দাঁড়াইল রাজেন্দ্রাণী বেশে
জাগিল তাহার বীণা মেঘমন্দ্রে বিশ্ববাণী সনে।
যা কিছু লিখেছ তুমি বঙ্গভাষা আজ শুধু তাই,
ভাষার অতীত বুঝি হে কবি যা তুমি লেখ নাই।

রবি-স্তোত্র

শ্রীনরেন্দ্র দেব

কে সেই আদিত্য বর্ণ অমৃতের পুত্র—
দীর্ঘ ঋজু বলিষ্ঠ তনু যাঁর
যিনি প্রিয়দর্শন প্রিয়ম্বদ লোকপ্রিয় কবি?
তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ;
আজ তাঁর অশীতিতম জন্মদিনে
আমরা সেই মহাকবির স্তবগান করি।

*

বাঙলার সাহিত্যালোকে
বিচিত্র কাব্যের অপূর্ব সৌন্দর্যে
অভিনব অমরাবতী সৃষ্টি করেছেন কে?
তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ,
আজ তাঁর অশীতিতম জন্মদিনে
আমরা সেই ছন্দাধিপতির বন্দনা করি।

*

আমাদের জীবন ও মনের কল্পলোকের
শত অকথিত কাহিনী;
ভাবের উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন কে?
তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ,
আজ তাঁর অশীতিতম জন্মদিনে
আমরা সেই অসামান্য কথাশিল্পীর গুণগান করি।

*

সে কার নব নব নাট্যরূপক রঙ্গ প্রহসনে
আমাদের নবাগত নাট্যপীঠ
নটরাজের দিব্য দেউলে পরিণত হয়েছে?
তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ;
আজ তাঁর অশীতিতম জন্মদিনে
আমরা সেই অদ্বিতীয় নটশেখরের অর্চনা করি।

*

আপন সাধনলব্ধ সুরলোকে
সে কার সংগীতের সুস্বর মুরলী
বাঙালীকে ফিরিয়ে এনেছে তার বিস্মৃত সুরপুরে?
তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ;
আজ তাঁর অশীতিতম জন্মদিনে
আমরা সেই অসামান্য সুরস্রষ্টার জয়গান করি।

*

জড়চিত্ত বিত্তহীন বাঙলার
নৃত্যগীত পরিত্যক্ত নিরানন্দ গৃহ
আজ আবার হাস্যে লাস্যে পুলকোচ্ছল করেছেন কে?
তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ;
আজ তাঁর অশীতিতম জন্মদিনে
আমরা সেই আনন্দময় কলাকুশলীর বন্দনা করি।

*

ঋতুচক্রের সুনির্দিষ্ট আবর্তনে
বাঙলার আকাশে বাতাসে বনে বনান্তরে প্রকৃতির যে রূপান্তর ঘটে
তাকে উৎসব-সমারোহে অন্তরে-বাহিরে বরণ করে নিতে
শিখিয়েছেন কে?
তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ;
আজ তাঁর অশীতিতম জন্মদিনে
আমরা সেই বিশ্বপ্রকৃতির পরম অনুরাগীকে প্রণাম করি।

বাঙালীর অনাদৃত পার্বণ অবহেলিত নববর্ষকে
আজ আবার হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে
বিহিত সমাদরে আবাহন করতে উৎসাহিত করেছেন কে?
তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ,
আজ তাঁর অশীতিতম জন্মদিনে
আমরা সেই ঋষভ যজ্ঞেশ্বরের পূজা করি।

*

চারুকারু ও ললিত কলার সুকুমার রসবোধ উদ্বোধিত করে
বাঙালীর শিল্পবিমুখ প্রাত্যহিক জীবনকে
রম্য রুচি ও শুচি সংস্কৃতির শুভ মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন কে?
তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ;
আজ তাঁর অশীতিতম জন্মদিনে
আমরা সেই রসঘন শিল্প-রাজর্ষির আরতি করি।

*

প্রভাত ভানুর অরুণচ্ছটার ন্যায় আপন প্রতিভার প্রদীপ্ত জ্যোতিতে
তরুণ বাঙলার নবীন ললাটপটে আজ
যৌবনের জয়তিলক অঙ্কিত করেছেন কে?
তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ;
আজ তাঁর অশীতিতম জন্মদিনে
আমরা সেই প্রাণোচ্ছল চির-তরুণের অর্চনা করি।

*

বিলুপ্ত তক্ষশীলা ও বিলীন নালন্দার ধ্বংসস্তূপের উপর
আপন অদম্য প্রচেষ্টায় সর্বস্ব পণে
ভুবনবিশ্রুত বিশ্বভারতীর মন্দির রচনা করেছেন কে?
তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ;
আজ তাঁর অশীতিতম জন্মদিনে
আমরা সেই জ্ঞানভিক্ষু মহাস্থবিরের শতায়ু কামনা করি

*

বেদান্তের বরদবাণী ও উপনিষদের অমৃত উপায়নের
অনাবিল সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করে
জীবনের অনন্তক্ষেত্রে ভূমানন্দের সহজ সন্ধান দিয়েছেন কে?
তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ;
আজ তাঁর অশীতিতম জন্মদিনে
আমরা সেই বেদজ্ঞ সত্যদ্রষ্টার আরাধনা করি।

*

স্বীয় স্বজাতিকে আপন গৌরবে
বিশ্বের বিদগ্ধ সভায় সম্ভ্রম ও সম্মানের আসনে
একান্ত সহজ অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন কে?
তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ;
আজ তাঁর অশীতিতম জন্মদিনে
আমরা সেই আদর্শ স্বদেশবৎসলের গুণগান করি।

*

আপন মাতৃভাষা ও মাতৃভূমিকে
বিশ্ববিদিত ও বিশ্ববন্দিত ক'রে তুলেছেন
সে কোন্ বিশ্ববরেণ্য বাণীর অদ্বিতীয় বরপুত্র?
তিনি আমাদের রবীন্দ্রনাথ;
আজ তাঁর অশীতিতম জন্মদিনে
আমরা সেই বিশ্ববীণাধর বাগ্দেবতার বন্দনা করি।

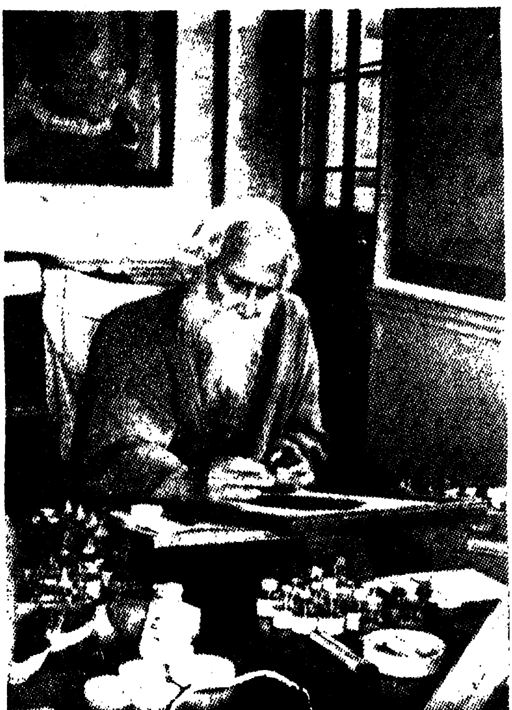
*

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা

শ্রীযামিনী রায়

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার বিশিষ্টতা ও উৎকর্ষের বিষয় কিছু বলতে গেলে প্রথমে চিত্রশিল্প সম্বন্ধে আমার নিজের ধারণা কিছুটা বলা আবশ্যক।

আর্টের ব্যাপারে আমি ঐতিহ্যে বিশ্বাসী। এর একটা ক্রমপরিণতি আছে। আর্ট যুগের চিন্তার প্রতিচ্ছবি। আধুনিক য়ুরোপীয় আর্টের দিক তাকিয়ে প্রথমেই মনে হয় —এ হ'ল ভাঙনের ছবি। যে contradiction ও জটিলতায় আধুনিক য়ুরোপের চিন্তারাজ্য বিক্ষুব্ধ, একদিকে তারই প্রকাশ, অপরদিকে নূতন একটা সৃষ্টির তাড়না, এই দ্বৈত আবেগে য়ুরোপীয় আর্ট আজ অস্থির। অথচ ঐতিহ্যকে



চিত্রাঙ্কণরত রবীন্দ্রনাথ

ছাড়িয়ে বিশেষ কিছু দূর অগ্রসর হতে পারে নি। একটু তলিয়ে দেখলেই বেশ বোঝা যায় সেই রিয়ালিজম এখনও য়ুরোপীয় চিত্রকলার শিরায় শিরায় পুরাতন মোহের মত প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। রিয়ালিজমকে অতিক্রম করে যাবার চেষ্টা ও ইচ্ছা দুই-ই আছে, কিন্তু একমাত্র বিকৃতির পরিবেশন করে সেটা সার্থক করা সম্ভব নয়। সেই ক্লাসিক পারিপাট্যের মধ্যে হঠাৎ কোথাও এক জায়গায় অথবা সর্বত্র এলোমেলো বিরূপতার ছোপ লাগিয়ে দিলেই আর্ট বাস্তবকে transcend করে যায় না। তাতে রূপের হানি ঘটে। বিরূপেরও একটা সুষ্ঠু প্রকাশ আছে। টেকনিকের সাবলীলতায়, সহজতায় ও সারল্যে prettinessকে বর্জন করে যদি বিরূপকেই বিচিত্রিত করা যায় তবে আর্টের দিক দিয়ে তা মহৎ ও ঐশ্বর্যবান হবেই। আমি Formকেই চিত্রের প্রাণ মনে করি। Form লঘু হলে চিত্রও লঘু হবে।

আধুনিক য়ুরোপীয় আর্ট যে লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার প্রয়াস করছে সেই লক্ষ্য একদিন ভারতীয় ও মিশরীয় রূপ-শিল্পে সত্য ছিল। Formএর ব্যঞ্জনার প্রসার ও আবেদনের বিরাটত্ব পৌরাণিক দেবমূর্তির কল্পনায় যেমন ভাবে ধরা দিয়েছে তার তুলনা য়ুরোপীয় আর্টে পাওয়া যায় না। ভারতীয় পুরাণের গরুড় বা হিন্দু Pantheonএর জগন্নাথ অথবা মিশরীয় স্ফিংকস্ নিছক গ্রোটেস্কধর্মী মূর্তি নয়। এখানে Form সমস্ত বাস্তবকে অতিক্রম করে একটি সীমাতিরিক্ত ভাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাই এ সব মূর্তি-কল্পনায় লঘু নয়নাভিরাম বস্তু না থেকেও এর মধ্যে ক্লাসিক মহিমা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ভারতীয় রূপশিল্পের এই ঐতিহ্য যুগ যুগ ধরে অনাবিল ধারায় চলে এসেছে। তবে সময় সময় ভারতের শিল্পজগতে যে মন্দা আসে নি তা নয়। সেই সময় অনেকটা unconsciousভাবে এই ঐতিহ্যেরই ক্রম ধরে ভারতীয় শিল্পের সাধনা পুষ্ট ও সংরক্ষিত হয়ে এসেছে। কিন্তু উচিত ছিল আমাদের ঐতিহ্যের সেই ক্লাসিক পথে সজ্ঞান ভাবে রূপশিল্পের সাধনায় অগ্রসর হওয়া। জীবনে যে চিন্তার, যে ভাবের ভিত্তি নেই, তাকে রঙে ও রেখায় প্রকাশ করার চেষ্টা অপচেষ্টা মাত্র, তার মধ্যে প্রকাশের ঐশ্বর্য ফুটে উঠবে না।

এখন রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার প্রসঙ্গে আসা যাক্। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকে বিশেষ কোন রীতি বা পর্যায়ে ফেলা যায় না। চিত্রচর্চায় তিনি বিশেষ কোন রীতির উপাসক নন। এ পদ্ধতি একান্তভাবে তাঁরই নিজস্ব। তবে এ বিষয়ে তিনি যে মনোদৃষ্টির অবলম্বন করেছেন তা পিকাসো প্রভৃতি আধুনিক য়ুরোপীয় চিত্রকরদের মতই। এখানেও প্রধান বিষয় হল Formএর সাধনা। পিকাসো প্রভৃতির সাধনা এখনও কোন concrete আদর্শের সন্ধান পায় নি। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় য়ুরোপীয় টেকনিকের প্রভাব খুব বেশী ভাবে অবশ্য আশ্রয় করতে পারে নি। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারাটিও তেমনি অনিরুদ্ধভাবে সঞ্চারিত হতে পারে নি। এইখানেই তার রীতির বৈশিষ্ট্য। সাফল্য বা অসাফল্যের প্রশ্ন পরে বিচার্য।

নিজের চিত্রকলা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

অসীম সাদায় কালোর যবে পড়ে
সৃষ্টি সীমায় বাঁধা
তখন তো সেই কালো রূপেই
আপনাকে পায় সাদা।

উপরে উধৃত কবিতার মধ্যে কবি নিজে খুব স্পষ্টভাবে তাঁর চিত্রের প্রকৃতি ও প্রাণধর্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করে গেছেন। সাহিত্যে যে রূপ, শ্রী, ঐশ্বর্য তিনি সৃষ্টি করেছেন, চিত্রের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। বরং বলতে পারা যায়, সাহিত্যের মধ্যে টেকনিকের যে সীমাবদ্ধতা মধ্যে তাঁর শিল্পী মন কাজ করে এসেছে, চিত্রকলার দরবারে এসে তিনি তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।



'সে' পুস্তকের পাহারাল



কঠিনের বুকে টানা করুণের ছবি
বর্ণপট ভূমিকায় দেখেছিল কবি ॥

সুকুমার ও সুচারু mediumএর মধ্যে ছন্দ ও অলঙ্কারের আভরণে তিনি সাহিত্যকে রূপ দিয়ে এসেছেন, চিত্রের ক্ষেত্রে এসে তিনি তাই বর্জন করেছেন। এখানে আভরণ ও অলঙ্কারের আতিশয্য নেই, শিল্পী এখানে তাঁর মনোচ্ছবিকে যথাযথ ব্যঞ্জনা দিয়েছেন, শুধু রূপের আশ্রয়ে নয়—বিরূপের আশ্রয় তিনি বেশী করে গ্রহণ করেছেন।

ভারতের রূপশিল্পে একদিন এই টেকনিকের চরম উৎকর্ষ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রণালীকে হুবহু না গ্রহণ করেও একই লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছেন। Aesthetics অত্যদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাই। যাঁরা স্বয়ং চিত্রশিল্পী, বিশেষ করে তাঁরাই এই দিক দিয়ে কবির চিত্র কার্যের উৎকর্ষ ও অঙ্কনরীতির কুশলতা উপলব্ধি করতে পারবেন। কবিশিল্পী তাঁর চিত্র-চর্চার উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন নগণ্যতম দুটি উপকরণ—কালি ও তুলি (বা কলম)। মাত্র কালো রঙের প্রলেপে বা রেখায় তিনি যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন, তার তুলনা বিরল। মিশরীয় স্ফিংকস মূর্তির অনন্যসাধারণ শিল্পব্যঞ্জনার সঙ্গে এর তুলনা করা যায়।



অসীম সাদায় কালো যবে পড়ে
সৃষ্টি সীমায় বাঁধা,
তখন তো সেই কালোর রূপেই
আপনাকে পায় সাদা॥

সনাতন বন্ধন ছেদ করে তিনি অপরূপ সৃষ্টির সাধনায় তাঁর তুলিকাকে উৎসর্গ করেছেন; আর সাফল্যলাভও করেছেন নিশ্চয়। প্রথমেই বিশেষ করে চোখে পড়ে তাঁর আঁকা ছবির Formএর এই সীমাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা। এই দিক দিয়ে তাঁর তুলির লিখনে অনেকটা স্বতঃস্ফূর্তির মত ভারতীয় ঐতিহ্যগত রূপশিল্পের ক্লাসিক ঐশ্বর্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। Formএর আবেদনের বিরাটত্ব তাঁর চিত্রকলায় যেমনভাবে ফুটে উঠেছে, সমসাময়িক য়ুরোপীয় চিত্রকলায় সহজে ততখানি পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার আলোচনায় তাঁর আর একটি

সাম্প্রতিক চিত্রশিল্পে রবীন্দ্রনাথ অনন্যসাধারণত্বের দাবী করতে তো পারেনই, তিনি অগ্রগামিতাও দাবী করতে পারেন। অন্তশ্চেতনার ভাবময় ফ্যাণ্টাসিকে মাত্র কালি ও তুলির সাহায্যে অল্প পরিসরের মধ্যে নবশ্রী দান করা সাধারণ শিল্পীর কাজ নয়। রবীন্দ্রনাথের অঙ্কন-রীতিতে বিরূপের আশ্রয়ে যে সৌষ্ঠব গড়ে উঠেছে, যে বলিষ্ঠ প্রকাশে তাঁর চিত্রকে সামান্যত্বের মধ্যে অসাধারণ, নিরলঙ্কারের মধ্যে ঐশ্বর্যবান করেছে, সেইটাই তাঁর চিত্র-সাধনাকে একটি মহৎ সমগ্রতায় মূল্যবান করে তুলেছে।*

* রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্বন্ধে শিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের অভিমত—শ্রীযুক্ত সুবোধ ঘোষ কর্তৃক লিখিত।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

রবীন্দ্রনাথ অশীতিবর্ষে পদার্পণ করেছেন,—বাঙলার পক্ষে, ভারতের পক্ষে এ কেবল পরম সৌভাগ্যের কথা নয়, মহাগৌরবের কথাও বটে। এই ৮০ বৎসরের মধ্যে অন্তত ৬০ বৎসরকাল তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, প্রতিভার নব নব দানে মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। আশী বৎসর অতিক্রম করেও তাঁর প্রতিভার দীপ্তি বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নাই, তাঁর লেখনী একদিনের জন্যও বিশ্রাম গ্রহণ করে নাই।

অলোকসামান্য প্রতিভা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। যে কোন দেশে যে কোন যুগেই তাঁর মত প্রতিভা দুর্লভ—শতাব্দীতে একজন দেখা যায় কি না সন্দেহ। অতীতের কথা বলতে চাই না, তবে বর্তমান জগতে তাঁর মত প্রতিভাশালী লোক যে আর কোন দেশেই আবির্ভূত হন নাই, এ কথাটা জোর ক'রেই বলা চলে। 'প্রতিভার' স্বরূপ নিয়ে আধুনিককালের পাশ্চাত্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা নানা গবেষণা করেছেন—আমাদের দেশের প্রাচীন মনীষীরাও করেছেন। এ'দের কারো কারো মতে প্রতিভা সাধনালব্ধ, কারো কারো মতে বা ঐশী-শক্তির প্রেরণায় প্রাপ্ত। আমাদের মনে হয়, 'প্রতিভা' ঐশী শক্তিরই দান। সাধনাবলে অশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু প্রতিভা লাভ করা যায় না। দৈবী প্রেরণায় মানুষের মধ্যে উহার সহজ বিকাশ হয়। প্রাচ্যদর্শনের ভাষায় বুদ্ধির স্তরের উপরে যে 'বোধি'—প্রতিভা সেই স্তরেরই জিনিষ। বাল্মীকী, কালিদাস, সেক্সপীয়রের প্রতিভা এইরূপ দৈবী শক্তির প্রেরণালব্ধ। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও সেই শ্রেণীর। তিনি বুদ্ধিকে অতিক্রম করে বোধির সাক্ষাৎ পেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সব দিক দিয়েই অসামান্য। এমন বহুমুখী প্রতিভার তুলনা মেলে না। কাব্য, নাটক, গীতি কবিতা, কথা-সাহিত্য, দার্শনিক তত্ত্ব, গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ, হাস্যরসের সাহিত্য, শব্দতত্ত্ব, ছন্দতত্ত্ব, লোকসাহিত্য, প্রভৃতি সাহিত্যের এমন কোন বিভাগ নাই, যেখানে তাঁর প্রতিভার দান নাই। এমন কি শিশুদের উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টিতেও তিনি আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গত ৬০ বৎসর ধ'রে তিনি অজস্র ধারায় অকৃপণ হস্তে তাঁর এই বহুমুখী বিরাট প্রতিভার দান বর্ষণ করেছেন। আর তাঁর এই দানে বাঙলা সাহিত্য যে অশেষ ঐশ্বর্যশালী হয়েছে, একথা আমরা সকলেই জানি। আজ বাঙলা সাহিত্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, বিশ্বের দরবারে সে সম্মানের আসন পেয়েছে। কিন্তু এই সম্মানের জন্য বাঙলা সাহিত্য বহুল পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের নিকটে ঋণী। তিনি 'নোবেল পুরস্কার' পেয়েছেন, এ তাঁর পক্ষে বড় বেশী গৌরবের কথা নয়, বরং 'নোবেল পুরস্কারই' তাঁহাকে বরণ করে গৌরবান্বিত হয়েছে, একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। কেননা যাঁরা বিশ্বমানবের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ ক'রেছেন, নূতন নূতন চিন্তাধারায় মানব সভ্যতায় নবযুগের সূচনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেইসব মহামানবদেরই পরিবারভুক্ত।

রবীন্দ্র-প্রতিভার এই পূর্ণরূপ একদিনে বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই। সুদীর্ঘ ৬০ বৎসর ধরে যে রবীন্দ্র-সাহিত্য গড়ে উঠেছে, তার বিবর্তন বা অভিব্যক্তি বিশেষভাবে আলোচনার বস্তু। তরুণ বয়সের রবীন্দ্রনাথ প্রধানত সৌন্দর্যের পূজারী, প্রেমের কবি। নিজের আনন্দে তিনি নিজেই মগ্ন, বহির্জগতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় নাই। পরিণত যৌবনের রবীন্দ্রনাথ দেশ ও জাতির প্রাণের সন্ধান পেয়েছেন, তাই দেশ ও জাতির মর্মকথা, তার আশা, আকাঙ্ক্ষা বেদনা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্র সমস্যা, সমাজ সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা নিয়ে তাঁর চিন্তামগ্ন। আর বার্ধক্যের রবীন্দ্রনাথ এ সকলের উপরে বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য সাধনা করছেন। উপমার ভাষায় বলতে গেলে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিচিত্র গতিকে বেগবতী মহানদীর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। হিমালয়ের পাদ-মূলে সঙ্কীর্ণকায়া গিরিনদীরূপে যার জন্ম, সে যেমন বহু প্রান্তর জনপদ অতিক্রম করে, বহুলোকপালিনী বিশালকায়া স্রোতস্বিনীরূপে অবশেষে মহাসমুদ্রের মধ্যে পরিণতি লাভ করে, রবীন্দ্র-প্রতিভাও তেমনি বহু বিচিত্র ও বিশাল সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। বিরাট রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বুঝতে হলে তার এই বৈচিত্র্য ও বিশালতা উপলব্ধি করতে হবে।

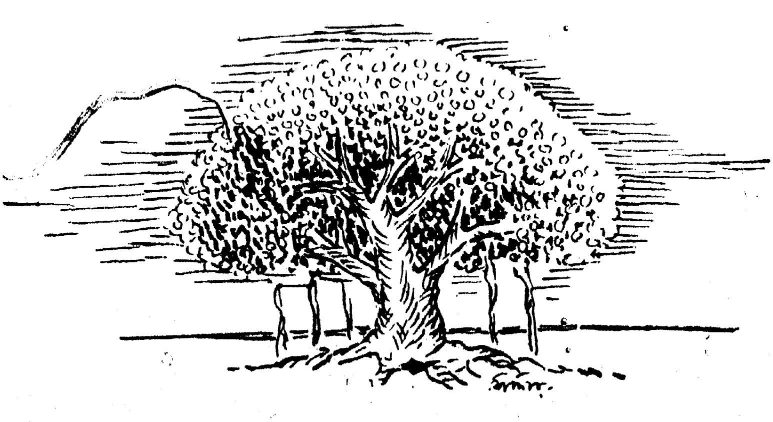
যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন, বাঙলা দেশ ও বাঙালী জাতির সে এক যুগসন্ধিক্ষণ। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে আমাদের এই প্রাচীন দেশ ও জাতির সভ্যতার সঙ্ঘর্ষ সেই যুগে আরম্ভ হয়েছিল। এই প্রাচীন দেশ ও জাতির অন্তরের গহনে যে শক্তি বহুদিন সুপ্ত ছিল, নূতনের সঙ্ঘর্ষে সে যেন বিদ্যুৎস্পর্শে চঞ্চল, প্রাণবান হয়ে উঠল। একটা প্রবল বিদ্রোহের ভাব তার মধ্যে দেখা দিল। অতীতের যা কিছু সব ভেঙ্গে চুরমার করবার একটা দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি এই বিদ্রোহীদের মধ্যে জেগে উঠল। কিন্তু এরই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে উঠল, জাতির অন্তরের রক্ষণশীল ধাত্রী শক্তি।—প্রলয়ের ধ্বংস-লীলার মধ্যেও যে শাশ্বত সনাতনকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, একদিকে বিদ্রোহী শক্তি, অন্যদিকে সংরক্ষিণী শক্তি—এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই নব্য বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছে। আর এই ভাঙ্গা-গড়ার যুগের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া যে রবীন্দ্র-প্রতিভার উপরে অশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে, তাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসামান্য প্রতিভার বলে জাতির অভিব্যক্তির উপর যে অশেষ প্রভাব বিস্তার করেছেন, এ সত্যও অস্বীকার করবার উপায় নাই। গত ৬০ বৎসর ধরে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট সাহিত্য জাতির শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি, তার প্রকৃতি ও চরিত্রের উপর নানাভাবে আঘাত

করেছে, তাকে রূপান্তরিত করেছে। নব্য বাঙলার জাতি গঠনের মূলে রবীন্দ্রনাথের দানের পরিমাণ নির্ধারণ করবার এখনো সময় আসে নাই, ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকেরা সে কর্তব্য নিশ্চয়ই পালন করবেন। তবে একথা বলা যায়, বাঙালী জাতির মনে আজ যে সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পানুরাগ জেগে উঠেছে, মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তার অনুরাগ যে বৃদ্ধি পেয়েছে, এর মূলে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা অনেকখানিই আছে। আমাদের আত্মবিশ্লেষণের শক্তিও তিনি বহুল পরিমাণে জাগিয়ে দিয়েছেন। বিশ্বের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে আজ আমাদের যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছে, এর জন্যও রবীন্দ্রনাথের নিকট আমরা বিশেষরূপে ঋণী। তিনিই প্রধানত আমাদের সাহিত্যের সঙ্গে বিশ্বের সাহিত্য সমাজের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু আমাদের মতে বাঙলার জাতীয় জীবনের উপর রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা বড় দান তার আত্মশক্তির উদ্বোধন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাঙলার কবি ও সাহিত্যিকেরা অল্পবিস্তর এই কাজ করে এসেছেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের বিরাট শক্তি এই মহৎ উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ এদিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ্য উত্তরাধিকারী। এদেশের রাজনীতিতে জাতীয় আন্দোলনে যে ভিক্ষুক নীতি চলছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তার উপর তীব্র কশাঘাত করতে দ্বিধা করেন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমে বঙ্কিম-শিষ্য রবীন্দ্রনাথ সেই কার্যই আরো স্পষ্টভাবে করেছিলেন। বিরাট স্বদেশী আন্দোলনের মূলে যাঁরা শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন, তার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে-ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। স্বদেশী যুগের রবীন্দ্রনাথের দীপ্ত-সূর্যের মূর্তি আমরা স্বচক্ষে দেখেছি এবং তা কোনদিনই ভুলতে পারব না। সে যুগে রবীন্দ্রনাথ গান, কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে জাতীয় জীবনে যে ভাবের বন্যা এনেছিলেন, একালের তরুণেরা তা হয়ত ধারণা করতে পারবেন না। আমাদের মতে রবীন্দ্র-নাথের প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঐ যুগেই হয়েছিল, দেশ ও জাতির সেবায় তিনি তাঁর পূর্ণ শক্তি এই সময়েই নিয়োজিত করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের যুগেই আমাদের জন্ম। কিশোর বয়স থেকে তাঁহার সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। তাঁর চিন্তা ও ভাব নানাদিক দিয়ে আমাদের চিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। সাহিত্যসেবায় তাঁর ভাষা ও রচনাভঙ্গীর দ্বারাই আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমাদের তর্ক, যুক্তি ও বিচার বিশ্লেষণ প্রণালীর উপর রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব আছে। সুতরাং আমরা আধুনিক যুগের বাঙালীরা রবীন্দ্রনাথের নিকট অশেষ প্রকারেই ঋণী। আর ঠিক সেই কারণেই রবীন্দ্র-প্রতিভার মহত্ত্বকে সম্যকরূপে বিচার বিশ্লেষণ করবার যোগ্যতা আমাদের নাই। হিমালয়ের সানুদেশে যারা থাকে, তারা তার বিরাটত্ব সম্যক উপলব্ধি করতে পারে না। দূরের লোকেরাই সে কাজটা ভাল পারে। অতএব সে কাজের ভার অনাগত ভবিষ্যৎবংশীয়দের উপরে দিয়ে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করি।



রবীন্দ্র-সাহিত্য ও জীবন

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য স্বাশ্রয়ী অথবা জীবনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ আছে এবং থাক্‌লে, কতোখানি ঘনিষ্ঠ তার প্রকাশ, একথা সুস্পষ্ট করে বলা কঠিন। বিশেষ করে রবীন্দ্র-সাহিত্য জীবনকে কী ভাবে প্রতিফলিত করেছে, এবং সে জীবনকে ভালোভাবে বোঝবার ও গ্রহণ করবার কাজে কতোখানি সহায়তা করেছে, সেকথা সহজ এবং নতুন না হলেও আজ আবার নতুন করে দেখার সময় এসেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতি সাধারণ পাঠকের মনোভাব পত্রিকান্তরে অন্য প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি। কিন্তু সে মনোভাব যথার্থ নয়, কবি-প্রতিভার ওপর সুবিচারও করে না।

কি স্বদেশী কি বিদেশী সমালোচনায় একটা জিনিস বরাবরই লক্ষ্য করে এসেছি যে, রবীন্দ্র-সাহিত্য জীবন থেকে অনেকটা নাকি বিচ্ছিন্ন আর কবি-প্রতিভা তত্ত্বদর্শী, বিশ্ব-সঞ্চারী। কবির ভাষায় বলতে গেলে তাঁর কাব্য যেন 'নির্বস্তুক', 'আন্তর্জাতিক'। আপাত-দৃষ্টিতে অনেক সমালোচকই বলেছেন, যে দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথ জীবনকে দেখেছেন ও বিচার করেছেন সে তাঁর নিজস্ব, তাঁর কাব্য-প্রতিভার স্বধর্মী কিন্তু মানুষের বাস্তব জীবন থেকে কিছু পরিমাণে বিচ্যুত, অপসারিত। আধুনিকতম কবির উপমা দিয়ে বলতে গেলে কবি যেন "উদ্যতনখ স্বর্ণ-ঈগল",—অমর্ত্য তীর্থলোকের সন্ধানী। আমরা সমতলবাসী জীব, কখনো তার পাখার শব্দ শুনি, কখনো আভাসে তার বিলীয়মান মূর্তিখানি দেখি, কিন্তু সম্পূর্ণ নাগাল পাইনে। অনেকদিন পূর্বে,—বোধ হয় ১৯২৪ সালের Bookman পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের সমালোচনা-প্রসঙ্গে দেখেছিলাম এক ইংরেজ লেখক রবীন্দ্রনাথকে বর্ণনা করেছেন,—

"... this naive writer of interminable and sometimes beautiful platitudes. . . . " ব'লে; 'গোরা'র বিষয়বস্তু সম্বন্ধে লিখেছেন,—

"This, briefly, with the addition of many semi-philosophical dissertations, such as are to be expected from Rabindranath Tagore, is the tale."

সাধারণ পাঠক ও সমালোচকের মনোভাব ছিল এই পর্যায়ের। এর পাল্‌টা জবাব অনেক আছে এবং অনেকেও দিয়েছেন। কৌতূহলী পাঠকের সুবিধার্থে এটুকু বল্‌তে পারি- ইংরেজ লেখকের এ সমালোচনার বহুপূর্বে "সবুজ পত্রে" ধূর্জটিপ্রসাদ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের আলোচনা সম্পর্কে যে মত ব্যক্ত করেছিলেন তা' আজকের দিনেও সম্পূর্ণ উপযোগী। অন্তত রবীন্দ্রনাথের অভিজাত শিল্প-কৌশল বাস্তব জীবনের পরিপন্থী কি না,—তা বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে।

একটা সহজ কথা মনে রাখলে অনেক সাহিত্যিক দ্বন্দ্বের নিরসন হয়। শিল্পী ও সাহিত্যিকের জগৎ অ-বাস্তব না হলেও তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব হতে বাধ্য। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই মনন ও প্রকাশভঙ্গী স্বতন্ত্র, তাঁর দৃষ্টিকোণ ও বিচারপদ্ধতি পৃথক্। কালোয়াতকে নিন্দা করতে হলে শিল্পের আভিজাত্যকে অস্বীকার করতে হয় এবং সব সাহিত্য-শিল্পই যে মুখ্যত জনগণের অথবা এই মাটির পৃথিবীর ধূলোয় লুটাতে থাক্‌বে এমন কিছু সুনির্দিষ্ট আইনকানুন নাই। যদি তাই হ'ত—তা হ'লে সমস্ত শিল্পীর শিল্প-কৌশল নিরর্থক হ'ত—এমন কি টল্‌স্‌টয়েরও। কালিদাস তা হ'লে অপাঠ্য; আর কবিকুলের মধ্যে টেনিসনের স্বপ্নজগৎ, মরিস্‌এর পার্থিব স্বর্গ-কামনা এবং য়েট্‌স্‌এর পৌরাণিক ও পরীর রাজ্য হ'ত নিতান্তই তৃতীয় শ্রেণীর ভাবাকুল পরিকল্পনা। আসল কথা এই প্রত্যেক বড় কবি ও সাহিত্যিকের মনন ও জীবন ভিন্ন পরিবেশ রচনা করে। তারি মধ্যে তাঁর বিকাশ ও অগ্রসৃতি। এবং একবার এই জগৎকে যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় তা হলে সকল তর্কের প্রতিপাদ্য বিষয় হওয়া উচিত যে সেই স্বরচিত পরিকল্পনার মধ্যেই কবি অথবা সাহিত্যিকের শিল্প, চিন্তাধারা, রসসৃষ্টি সুসংগত ও শোভন হয়েছে কিনা। এর মানে নয় যে কবি ও সাহিত্যিক মাত্রেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী খণ্ডিত, বাস্তব জীবনের পঙ্কিল অন্তরঙ্গতা-বর্জিত বলেই তাঁর প্রকাশ-কৌশল বিড়ম্বিত। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মনীষী সাহিত্যের বিচার নিয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, অনেক যুক্তিবদ্ধ তর্কের সৃষ্টি করেছেন বোধ হয় এই কারণেই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও একাধিক রচনায় সাহিত্যের মূলসূত্র, তার বক্তব্য, ও বিচারের অসংহত, একদেশদর্শিতার কথা উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রতিভা যদি সত্যিই জীবন থেকে অতোটা বিচ্ছিন্ন ও দূরান্তিক হ'ত, তা হ'লে তিনি যুগ-সন্ধির উদ্বেলতায় টিঁকে থাকতে পারতেন না। একটা ফ্যাশন-বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই কালধর্মের প্রভাবে তলিয়ে যেতেন। এখনও যখন তাঁর প্রতিভা নতুন আলো দিচ্ছে, তার অর্থ তিনি নিত্য-চলিষ্ণু সমাজ-মনকে স্বীকার করেছেন বরাবরই। সমাজ-সচেতনতায় তিনি অন্ধ নন্, জীবনকে তিনি পরিবর্তনশীল দৃষ্টি দিয়ে নতুন করে দেখে চলেছেন। এই কারণেই তিনি স্থাণু, নির্গুণ এবং যুগ-কাল-ব্যবহারের অতীত আত্মকেন্দ্রীয় সাধক নন্। তাঁর সব চেয়ে বড় পরিচয়,- তিনি মানুষ এবং খাপ্‌ খাইয়ে চলা চিন্তাশীল মানুষ। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ যত্ন করে পড়েছেন, তাঁরাই এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করবেন। বোধ করি জাতীয় জীবন ও সমাজের এমন কোন্ দিক্ নেই, যা তাঁর যাচাই-করা সজাগ মনের আলোয় উদ্দীপিত হয় নি। আমাদের শিক্ষা ও সমাজ, শিক্ষার বাহন, লাইব্রেরি প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়, অথবা ধর্ম, কালের প্রভাব ও ইতিহাসের মতো দার্শনিক তথ্য কিংবা পরনিন্দা, ছেলে-ভুলানো ছড়ার মতো হাল্‌কা এবং

ঘরোয়া বিষয় নিয়ে তিনি কতো সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর সরস মনকে কঠিন করে নি, সংস্কারের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখে নি। যা কিছু দেখেছেন, শিখেছেন এবং যে পরিবর্তন মনে-প্রাণে অনুভব করেছেন, তাকেই রূপায়িত করেছেন, কখনও ছন্দে কখনও ব্যবহারিক ভাষায়। এখনও তাঁর সমীক্ষা ও পরীক্ষা শেষ হয় নি—তাই পুরানো ভাবধারাকে নতুন ছাঁচে ঢালাই করছেন, নতুন আঙ্গিক নিয়ে এখনও তাঁর নিত্য কৌতূহলী উদ্বোধন চলছে। শিল্পী-মনের ও জীবনের এ সততা, এ অন্তর্নিবিষ্ট সযত্ন প্রয়াস ইতিহাসে বিরল। রবীন্দ্রনাথ যদি শুধুই আত্মরত জীবন-বিরাগী শিল্পী হতেন, তা হলে তাঁর রাজনীতি থাকত না, থাকত না জীবন-দর্শন ও ইতিহাসের জ্ঞান। যোগ বিচ্ছিন্ন নিরাসক্ত সাহিত্যিক হয়ে তিনি তা হলে ধূমায়িত নীহারিকার মতোই স্বরচিত ক্লান্তিপথে শীতল ও জমাট হয়ে যেতেন। তাঁর রচনায় প্রাণধর্মের বালাই থাকত না।

তা যখন হয় নি, তখন আমাদেরই কোথায় গলদ আছে। পশ্চিমের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে নবজীবনের ভূমিকা একদা উজ্জ্বল বলে প্রতিভাত হয়ে আজ যদি পরাজয়ের গ্লানিতে ব্যর্থ হয়ে থাকে, তার দোষ কবির নয়। আমাদেরই অক্ষম মোহভঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ আপন ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রতীচ্য ভাবধারার সামঞ্জস্য ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে সৃষ্টির কোনও অংশেই উগ্র বিজাতীয়তার স্পর্শ নেই। রাজনৈতিক জাগরণ ও রাষ্ট্র চেতনার আবির্ভাবের সঙ্গে আমরা ভাবলাম রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রশান্তি ও অবকাশের সুর অবাস্তব, কালিদাসী ঐতিহ্যের অন্ধ পুনরাবৃত্তি মাত্র। কিন্তু সে চেতনাও কবির রচনায় সুপরিস্ফুট যদিও তা অত্যুগ্র নয়, উৎকেন্দ্রীয় নয়। পরাজয়ের গ্লানি তাঁকে কিছু কম আঘাত করে নি, গভীর আত্মানুভূতির উত্তাপে তাঁর মানবত্ব কিছু কম বিগলিত হয় নি। কেবল স্বজাতির দৈন্য ও আঘাতের পরিমাণ নিয়ে তিনি অসুন্দর বিলাপ করেন নি, অথবা ক্ষতের আবরণকে উন্মোচন করেন নি। আমরা যদি বদলে থাকি, জীবনের স্রোত যদি অন্য খাতে বইতে সুরু করে থাকে, আমরা নিজেই সেই পরিবর্তন ও মনোভাবকে স্বকৃত ভাষায় পুরোপুরি প্রকাশ করতে অক্ষম। তাই রবীন্দ্র সাহিত্যের ওপর অনেক সময়ে অযথা দোষারোপ করে বসি। কবির কাণ্ডজ্ঞান এবং লজ্জা বোধ আমাদের চেয়ে বেশী এটুকু সবিনয়ে স্বীকার করাই ভালো।

সাহিত্য ও জীবন নিয়ে তর্কের কখনও শেষ হয় নি, হবেও না। মৃত্তিকারোহী সুচিকণ লতাপ্রতানের মতো যে সাহিত্য জীবনতরুকে ঘিরে বেড়ে ওঠে, সেই তার সত্যিকারের পরিচয়,—না মেঘের মতো যা জীবনাকাশে ঘনিয়ে ওঠে অথচ বিদ্যুৎ-স্ফুরণে দীপ্ত করে দেয়, সেই হল সাহিত্যের সার্থকতা,—এ প্রশ্ন একদিনে মিটবার নয়। যখন জীবনের সম্পদ ফুরিয়ে আসে অথবা ক্ষীণায়মান হতে থাকে তার সরণ-প্রবৃত্তি, তখনই আলোচনার বৃত্তাকার ঘুরতে থাকে বুদ্ধি-বিস্তারে, জীবনের কেন্দ্র যায় হারিয়ে। অথচ প্রাণ-বস্তুর ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ কবির সৌন্দর্য-সৃষ্টি চলতে থাকে অব্যাহত; চিন্তায়, আচরণে ও শিল্প-প্রয়োগে তাঁর প্রতিভা বিকসিত হতে থাকে। শ্রেষ্ঠ কবি হলেন শ্রেষ্ঠ জীবন-শিল্পী,—কি আত্মজীবনে কি সমাজ-জীবনে অথবা বৃহত্তর জাতীয় জীবনে।



বড়দাদার ওজনভারী লেখার পাশেই আমার মতো বালকের কাঁচা লেখাও বেরিয়েছে নির্বিচারে। 'বঙ্গদর্শন' ত বঙ্কিমের খামখেয়াল ছিল না। ওর প্রথম প্রবর্তন সাহিত্যের জগতে একটা ল্যান্ড মার্ক।

লেখকঃ আপনার বালক বয়সের রচনা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যে চিঠির কথা উল্লেখ করেন, তার কিছু কি আপনার মনে পড়ে? জানতে কৌতূহল হয়, কোন্ দৃষ্টিতে তিনি আপনার সেদিনের রচনা দেখেছিলেন!

রবীন্দ্রনাথঃ অক্ষয় চৌধুরী সে পত্রখানি নিয়েছিলেন আমার কাছ থেকে, আর ফেরৎ পাই নি; থাকলে দেখতে পেতে।

লেখকঃ জ্যোতিবাবুর সুরের সঙ্গে আপনি এবং এই অক্ষয়বাবুই ত মুখে মুখে গান রচনা করতেন; সে সব গানের কিছু কি আপনার মনে পড়ে? সেই কি আপনার গান রচনা?

রবীন্দ্রনাথঃ সুর রচনা জ্যোতিদাদার; তারই মাপে, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমি তখন মাত্র কথা জুগিয়েছি কিছু। প্রকৃত গান রচনা আরম্ভ হয় আরো পরে আমেদাবাদে।

লেখকঃ বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিদের গানে সুর যোজনার মধ্য দিয়ে কি আপনার সুর সৃষ্টির প্রথম সূচনা?

রবীন্দ্রনাথঃ 'ভরা ভাদর' প্রভৃতি গানে সুর যোজনা, সে বহু পরের কথা। আমেদাবাদের কথা আমার প্রথম ইংল্যান্ড যাত্রার পূর্বেই; বয়স তখন ষোল কি সতেরো।

লেখকঃ আপনার প্রথম রচিত গানের কিছু কথা কি এখনো মনে আছে? তার কথা ও সুর জানবার বড় আগ্রহ হয়।

রবীন্দ্রনাথঃ প্রথম গান যেটি রচনা করেছিলাম আমেদাবাদে, তা রাখবার সাহস তখনো হয়নি। সেকালের প্রচলিত রীতিমানা তার গড়নো ছিল না, ভাষাও ছিল না। অমিত্রাক্ষরে রচনা করেছিলম তাকে, কোনো মিলই রাখি নি। ভাষায়, ভাবে, গড়নে সে যুগের চেয়ে এ যুগের তোমাদের তাকে ভাল লাগতে পারতো। তাতে ছিল গানের একটি সত্যকারের মুক্তরূপ। একটি কলি মাত্র তার মনে পড়ছে! (কবি গেয়ে উঠলেন)—

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জ্যোছনায়—
ধীরে-ধীরে-ধীরে অতি ধীরে গাও।

কথার ও সুরের এক অতি সরল সহজ মুক্তি ছিল সে গানটিতে। রাখতে সাহস পাই নি, তাই হারিয়ে গেল।

আলাপ শেষ হ'ল। প্রণাম ক'রে স্বপ্নাবিষ্টের মতো ঘরে ফিরলাম। সেদিনের ম্লান জ্যোৎস্নার আলোয় ফিরে ফিরে কানে বাজতে লাগল—ধীরে ধীরে, অতি ধীরে গাও।

কিছু দিন পরে কোনো বন্ধুর কৃপায় হাতে পেলাম 'রবিচ্ছায়া' বইখানি। রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সে রচিত সংগীতের এই প্রথম সংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন শ্রীযোগেন্দ্র-নারায়ণ মিত্র, ১২৯২ সালে। আজকাল বইটি দুষ্প্রাপ্য। 'প্রকাশকের বক্তব্যে' অন্য কথার মধ্যে বলা হয়েছে, "১২৯১ সনের শেষ দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রবাবু যতগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, প্রায় সেগুলি সমস্তই এই পুস্তকে দেওয়া গেল।" 'রচয়িতার নিবেদনে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ "ইহার অনেক গানই বিস্মৃত বাল্যকালের মুহূর্তস্থায়ী সুখ-দুঃখের সহিত দুই দন্ড খেলা করিয়া কে কোথায় ঝরিয়া পড়িয়াছিল সেই সকল শুষ্ক পত্র চারিদিক হইতে জড় করিয়া বইএর পাতার মধ্যে তাহাদিগকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করিলে গ্রন্থকার ছাড়া আর কাহারও তাহাতে কোনো আনন্দ নাই।"

আমার এইরূপ মনের ভাব।

রবিচ্ছায়ার পাতা উল্টে দেখি, প্রথম গানটিই কবির সেদিন সন্ধ্যায় গাওয়া গানখানি। পাঠকদের জন্যে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করে দিলাম এই সুযোগে। একটি কথা, সম্ভবত এ গানটির গড়ন কবির হাতে কিছু মাজাঘষা পেয়ে থাকবে প্রকাশের পূর্বে, কারণ এটি কবির কথামত অমিত্রাক্ষরে রচিত একেবারেই নয়!

মিশ্র—আড়াঠেকা

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জ্যোছনায়।
ধীরে ধীরে অতি ধীরে—অতি ধীরে গাও গো!
ঘুম-ঘোরময় গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো!
নিশার কুহক বলে, নীরবতা সিন্ধুতলে
মগ্ন হয়ে ঘুমাইছে বিশ্ব চরাচর;
প্রশান্ত সাগরে হেন, তরঙ্গ না তুলে যেন
অধীর-উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতের স্বর!
তটিনী কি শান্ত স্বরে! ঘুমাইয়া পড়িয়াছে
বাতাসের মৃদু হস্ত পরশে এমনি,
ভুলে যদি ঘুমে ঘুমে তটের চরণ চুমে
সে চুম্বন ধ্বনি শুনে চমকে আপনি!
তাই বলি অতি ধীরে—অতি ধীরে গাও গো!
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো! ১।

ছদ্মবেশী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(১৪)

সুলেখা যখন গৃহে পৌঁছিল তখনো প্রশান্ত তাহার অফিসঘরে বসিয়া কাজ করিতেছে। লাবণ্য আধ ঘণ্টাটাক পূর্বে ফিরিয়া আসিয়া স্নানঘরে প্রবেশ করিয়াছে।

সুলেখা এদিক-ওদিক খানিকটা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইল, একবার ভিতর দিকের দরজার পর্দাটা ঈষৎ সরাইয়া উঁকি মারিয়া প্রশান্তকে দেখিল, তাহার পর দ্বিতলে গিয়া নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া একটা অর্ধসমাপ্ত উপন্যাস লইয়া শয্যার উপর আশ্রয় গ্রহণ করিল। পশ্চিম দিকের জানালা দিয়া তীব্র কনকনে হাওয়া আসিতেছিল, শয্যাপ্রান্ত হইতে র‍্যাগটা টানিয়া লইয়া কোমর পর্যন্ত ঢাকিয়া দিল।

ক্ষণকাল পরে লাবণ্য কক্ষে প্রবেশ করিল। সমস্ত মুখ-মণ্ডল অপ্রসন্নতার গাঢ় ছায়ায় মলিন।

এই অপ্রসন্নতার কারণ উপলব্ধি করিতে সুলেখার মুহূর্তমাত্রও বিলম্ব হইল না। পুলকিত চিত্তে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া সহাস্যমুখে বলিল, "তোমার নারীমঙ্গল মন্দিরের কাজ হ'ল দিদি?"

রুক্ষস্বরে লাবণ্য বলিল, "নারীমঙ্গল মন্দির নয়, নারী কল্যাণ মন্দির। কিন্তু তোদের ফিরতে এত দেরী হ'ল কেন?"

বইখানা বন্ধ করিয়া পাশের টিপয়ের উপর রাখিয়া সুলেখা বলিল, "আর বল কেন দিদি? ছাড়তে কি সহজে চায়? একজন হ'লেও বা কথা ছিল, দু-দুজন; এ যদি ছাড়ে ত' ও ছাড়তে চায় না, আবার ও যদি ছাড়ে ত' এ ছাড়তে চায় না।"

লাবণ্য বলিল, "সে কথা ত সত্যি। কিন্তু এ আর ও দুজনের হাত থেকে ছাড়িয়ে আসতে তোর কি খুব দেরি হ'য়েছিল?"

প্রশ্নটা মনোনিষ্ঠ গোলমেলে। মনে মনে ঈষৎ শঙ্কিত হইয়া সুলেখা বলিল, "তুমি ওদের ওখানে গিয়ে-ছিলে নাকি দিদি?"

লাবণ্য বলিল, "গিয়েছিলাম। তোরা ওখান থেকে বেরিয়ে যাবার মিনিট দশেক পরেই গিয়েছিলাম।"

লাবণ্যর উত্তর শুনিয়া সুলেখার দুই চক্ষু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; পর মুহূর্তেই দেহ হইতে র‍্যাগটা শয্যা প্রান্তে ঠেলিয়া দিয়া দুই পা ঝুলাইয়া বসিয়া বলিল, "ও! তাই বল, ওখানে গিয়ে শুনেছ, আমরা বেশীক্ষণ ওখানে থাকি নি। কি করি বল দিদি, তুমি চলে গেলে ওখানে থাকতেও ভাল লাগল না, আবার ওখান থেকে বেরিয়ে এসে তক্ষুণি বাড়ি ফিরে যেতেও ইচ্ছে হ'ল না। কে জানে বল, অত শীগ্‌গির তুমি ফিরে আসবে। তাই অমনি এক চক্কর খসরুবাগটা ঘুরে দেখে এলাম। কি চমৎকার পার্ক তোমার খসরুবাগ দিদি! কোথায় লাগে আমাদের কলকাতার ইডেন গার্ডেন।"

মনের সহজ অবস্থা হইলে এই মন্তব্যের সারবত্তা লইয়া হয়ত বিতর্ক উঠিত। কিন্তু সে প্রসঙ্গের মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রবেশ না করিয়া লাবণ্য বলিল, "তুই সেখানে গাড়িতে ব'সে গৌরহরির সঙ্গে গান করছিলি সুলেখা?"

এই প্রশ্নেরই জন্য সুলেখা মনে মনে এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিল; সহাস্যমুখে বলিল, "কে বল্‌লে তোমাকে, দিপু? ঠিকই বলেছে। তবে গান ঠিক করছিলাম না, একটা গান ঠিক ক'রে শিখে নিচ্ছিলাম।" তারপর লাবণ্যকে কোনও কথা বলিবার অবসর না দিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "আসল কথাটাই তোমাকে বলতে ভুল হ'য়ে গেছে দিদি! গৌরহরিবাবু চমৎকার গান গাইতে পারেন। গান শেখাতেও পারেন খুব সুন্দর। দীপুকে তোমরা গৌরহরিবাবুকে দিয়ে গান শেখাও। গৌরহরিবাবু গাড়ি চালাবেন, দীপুকে বাঙলা পড়াবেন আর গান শেখাবেন। কেমন, বেশ হবে না?"

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া লাবণ্য বলিল, "যে গান যে ঠিক ক'রে শিখে নিচ্ছিলি, সেটা বেঠিক ক'রে শিখেছিলি কার কাছে? গৌরহরির কাছে?"

যথেষ্ট সপ্রতিভভাবে মাথা নাড়িয়া সুলেখা বলিল, "হ্যাঁ"।

"কোথায়? কবে?"

স্মিতমুখে সুলেখা বলিল, "কলকাতায় দিদি। গৌর-হরিবাবুর কাছে সুতপা গানটা শিখছিল, সেই সময়ে শুনে শুনে আমিও অনেকটা শিখে নিয়েছিলাম। সঞ্চারীতে একটু তফাৎ ছিল,—সেটা আজ ঠিক ক'রে নিলাম। কোন্ গানটা জান? কাল বিকালে যে গানটা তোমার সব চেয়ে ভাল লেগে-ছিল, সেইটে। সেই 'তোমার মনের গোপন কথা আমার মনে বাজে' সেই গানটা। কাল ত' শুনেছিলে, আজ সঞ্চারীটা শুনলে বুঝতে পারবে আরও কত ভাল হয়েছে।" বলিয়া মৃদুকণ্ঠে গাহিতে লাগিল।

আধেক যখন বুঝি,
ভয়ে ভয়ে মরি মনে।
শঙ্কিত হিয়া কাঁপে
অজানার অকারণে।

কেবলমাত্র সঞ্চারীটুকু এক ফের গাহিয়া, আভোগের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া সুলেখা বলিল, "কেমন দিদি, আগে যা শুনেছিলে তার চেয়ে অনেক ভাল হয় নি?"

সুলেখার রিক্ত কণ্ঠের ওই দুই কলি গানেই লাবণ্যর এত

এ অভিযান নিয়ে কলকাতায় নিশ্চয় খুব হৈ চৈ লেগে গেছে। যখন সে শেয়ালদা স্টেশনে নামবে, তখনি হয়তো দলে দলে লোক আসবে তাকে অভিনন্দন করতে।

স্টেশনে গাড়ি লাগতেই সে দেখলে, তার অনুমান মিথ্যা নয়। অনেক বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের ভিড় দেখলে। সদর্পে সে লাফিয়ে পড়লে প্ল্যাটফরমে।

বন্ধুর দল তাকে ঘিরে দাঁড়াল। সে হাসিমুখে তাদের সম্ভাষণ করলে তাদের সপ্রশংস সম্বর্ধনার প্রতীক্ষায়।

কিন্তু—

প্রথমে তাকে যিনি সম্ভাষণ করলেন, তিনি তার এক পিশে। তিনি বললেন, "এ কি পাগলামী করছ? যুদ্ধ জিনিসটা কাব্য নয়, কল্পনার বিমানে চ'ড়ে বেড়াতে আরাম আছে, কিন্তু কলের বিমান সে বস্তু ঠিক নয় বাবাজী— বিশেষ যদি কিন্তু গোলাগুলির কারবার থাকে। কেন তোমার এ উদ্ভট খেয়াল হ'ল বল তো? ও-সব হবে না বলছি।"

প্রমোদের উৎসাহ তার গৌরব বোধ থেকে এখন আর তেমন জোর পেলে না। বরং এই নিতান্ত বস্তুতান্ত্রিক বাঙালী ভদ্রলোকের কাছে কাব্যময় গৌরবের ছাড়পত্র দাবী করতে সে একটু লজ্জাও অনুভব করলে।

প্রমোদ শুধু হেসে বললে, "সে সব আর এখন ভেবে কি করব? ভর্তি তো হ'য়ে গেছি, এখন তো ইচ্ছা করলেও ছাড়ান যাবে না।"

অমনি আর একজন বললে, "ছাড়ান যাবে না না হাতী। চল তুমি আমার সঙ্গে আমি তোমাকে medically unfit করিয়ে দিচ্ছি।"

"কিন্তু সে পরীক্ষা যে হয়ে গেছে।"

আর একজন অমনি বললে, "তা হলেও হয়। ওই তো নন্দী সেও ভর্তি হয়েছিল। তার পর তার একটা accident হয়েছে বলে ডাক্তার দিয়ে হাতের গোটা দুই আঙুল কাটিয়ে নিয়ে সে দিব্যি খালাস পেয়ে গেল।"

প্রমোদ বললে, "বাবা! আঙুল কাটাতে হবে?"—

"কাঁচা মাথাটা গুঁড়ো হওয়ার চেয়ে তো সে ভাল।"

অমনি আর একজন, "আরে তাও দরকার হবে না। আই বি'কে দিয়ে একটা রিপোর্ট করিয়ে আমি তোমায় ভারত রক্ষা আইনে ধরিয়ে দিচ্ছি চল। আমার এক বন্ধু আছে সেখানে, বললেই সে খুসী হয়ে করবে।"

"তার মানে জেলে পচতে হবে"—

"বিদেশে বিভুঁয়ে কোন খানায় পড়ে থেকে বেঘোরে পচে মরার চেয়ে সে ঢের ভালো।"

ফল কথা, যারা খবর পেয়ে স্টেশন থেকেই তাকে পাকড়াও করতে এসেছিল তার পিশেমেশো, বন্ধুবান্ধব, অবান্ধব ও শত্রু কেউ তাকে তার এ সঙ্কল্পের জন্য সম্বর্ধনা করবার কোনও নমুনা দেখালে না, বরং প্রকাশ করলে যে, তারা তাকে নিবৃত্ত করতে বদ্ধপরিকর। মনে হল যে, সেজন্য তারা তাকে মারধর, চাই কি খুন পর্যন্তও হয় তো করতে পারেন। একজন তো প্রায় স্পষ্ট করেই বললে সে কথা। সে বললে, "আর এর জন্যে ওকে এত সাধাসাধি কেন? সামান্য একখানা ঠ্যাং মটকে ভেঙে দিলেই তো লেঠা চুকে যায়।"

এই দঙ্গলের গতিক সতিক দেখে প্রমোদ স্থির করলে যে এদের হাত থেকে পলায়নই একমাত্র ঔষধ। তাই সে তাদের বললে, "আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি এখনও তো দুদিন সময় আছে!"

কোনও মতে এদের হাত এড়িয়ে স্টেশনের বাইরে আসতেই তাকে এসে সম্ভাষণ করলেন শ্রীযুত বিদূষক!

"এই যে, এসেছেন আপনি। আসুন, আপনার জন্যে গাড়ী নিয়ে এসেছি", বলে বিদূষক ওরফে বিধায়ক একখানা বুইক গাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

প্ল্যাটফরমে বিপরীত সম্ভাষণে প্রমোদের স্বপ্ন ভেঙে গিয়াছিল, তাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললে, "আমার জন্যে গাড়ী! আপনি ভুল করেছেন।"

হেসে বিদূষক মশায় বললেন, "ভুল করবো আমি আপনাকে? প্রমোদ ঘোষকে আমি চিনি না! —আসুন।"

আরও অবাক হয়ে প্রমোদ ভাবলে যা হক, তার আশা আছে। এটা বোধ হয় তার ভক্তদের অভিনন্দনের পূর্ব রাগ, একটু গর্ব হল তার। কিন্তু তবু ফস করে অতবড় ঝকঝকে গাড়ীতে খামখা চড়ে বসতে তার কোথায় যেন খোঁচা লাগতে লাগলো।

সে হেসে বললে, "আমি মোটর চড়বো কি মশায়? আমার চব্বিশ বছরের পুরোনো বন্ধু শ্রীচরণের গাড়ী ছেড়ে? যখন নীচে থাকি মাটি ছুঁয়েই থাকি আমি, আর উঠলে উঠি আকাশে—True to the kindred points of heaven and home."

হো হো করে হেসে বিদূষক বললেন, "হা হা বেশ কবির মত কথা বলছেন। কিন্তু আজকের দিনে আমি আপনাকে ভূমি স্পর্শ করতে দিতে পারিনে। গাড়ী চড়তে না চান কাঁধে করে নেব আপনাকে।"

প্রমোদ দেখলে, ছাড়ান পাওয়া দায়। এ লোকটা বোধ হয় ভক্ত। খুব বেশী না হলেও, সাহিত্যিক হিসাবে প্রমোদ দু একজন ভক্তের পাল্লায় পড়েছে। সে জানে যে তাদের কাছে শিরীষের আটা হার মানে, তারা একেবারে লেপটে জড়িয়ে থাকে।

তাই সে জিজ্ঞেস করলে, "কোথায় যেতে হবে আমার?"

"আপনার সম্বর্ধনার জন্যে সামান্য একটু আয়োজন করা হয়েছে, কয়েকজন খ্যাতনামা লোক থাকবেন আর—"

যা ভেবেছে প্রমোদ তাই! সে খুসী হল, তবু সে বললে, "কিন্তু আমার যে এখন বাসায় গিয়েই বাজারে বের হতে হবে। তারপর কাল একটা দিন! এর ভিতর রাজ্যের কাজ পড়ে আছে; আমাকে মাপ করুন, সময় হবে না আমার।"

"মাত্র এক ঘণ্টা—অনেক আয়োজন করেছি। দয়া করে বঞ্চিত করবেন না আমাদের। আর আপনার যা কাজ নিজে না করলে চলে, আমি ভার নিচ্ছি, সে সব করে দেবো। চাই

কি বিয়ে করতে চান তার জোগাড় পর্যন্ত", বলে বিদূষক হাসলেন।

প্রমোদ দেখলে, এ ভক্ত না হয়ে যায় না। আটার জোরেই বোঝা যায়, এর হাতে মুক্তি নেই। তাই সে সুড় সুড় করে তার ছোট্ট সুটকেস হাতে করে সেই মস্ত মোটরে চেপে বসলো। গাড়ী খানিক দূর গেলে বিদূষক বললেন, "দেখুন প্রমোদবাবু, অনেকে সন্দেহ করছেন যে, আপনার এই যুদ্ধে যাবার সংকল্পের সঙ্গে আপনার 'নিঃশেষ' গল্পটার সম্পর্ক আছে।—মানে ব্যর্থ প্রণয়! কথাটা কি একদম মিথ্যে?

প্রমোদ বললে, "দেখুন আমি ছিলাম ছোট্ট একটা দোকানী—চাল-চুলোর খুব বাহুল্য ছিল না। তার আবার প্রণয়ই বা হয় কোথা থেকে আর ব্যর্থই বা সে হয় কেমন করে।"—বললে হেসে, কিন্তু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বিশ্বাস-ঘাতক হয়ে বেরিয়ে এলো।

"হাঁ দেখুন, আপনি গল্প লেখাটা কি একেবারে ছেড়ে দিলেন? 'নিঃশেষ' গল্পটায় আপনার যে ভয়ানক নাম হয়েছে, আমি ভাবছিলাম আপনার খান কয়েক বই পাবলিস করবো।"

"আপনি কি পাবলিশার?" জিগ্‌গেস করলে প্রমোদ।

"হইনি এখনও, কিন্তু সুযোগ পেলে হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে নেই তা বলতে পারি না।"

"কিন্তু আমার কাছে সে সুযোগ পাবেন না। আমার আর লেখবার ইচ্ছা নেই।"

"তার মানে 'নিঃশেষ' আপনার Parsifal. ঐ রকম শুনেছিলাম সব পাবলিশারদের কাছে। তাইতেই ঐ ব্যর্থ প্রণয়ের গুজবটা উঠেছে।"

"না ম'শায়, বাজে কথা। যুদ্ধ করবো, তার লিখবো কখন? তাই লিখবো না।"

হেসে বিদূষক বল্‌লে, "কিন্তু যুদ্ধ না ক'রে ঘরে বসে আরাম করে লেখবার তো কোনও বাধা ছিল না আপনার।"

গাড়ীখানা সার্কুলার রোড দিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে যেতে যেতে যখন পশ্চিম দিকে মোড় নিলে তখন তার গন্তব্য পথ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে প্রমোদ বল্‌লে, "কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?"

"বেশী দূর নয়, ভবানীপুরে।"

"মাপ করবেন, সেখানে আমি যাব না। দক্ষিণ কলকাতা থেকে জন্মের মত বিদায় নিয়ে এসেছি।"

বিদূষক একটু মুচকি হেসে বল্‌লেন, "দেখুন, আজ দশ বৎসর দক্ষিণ কলকাতায় আছি, এটা এত ভয়ানক জায়গা ব'লে তো জানি না। আর আমার আশা আছে যে আপনিও যদি একে আর একটা 'চান্স' দেন তবে হয় তো আপনার কাছেও এটা আর তেমন ভয়ানক লাগবে না।"

প্রমোদ ব্যগ্রভাবে বল্‌লে, "না, না—আমায় মাপ করুন আমি কিছুতেই—"

"ব্যস্ত হবেন না, ঠিক দক্ষিণ কলকাতা একে না বল্‌লেও চলে, ল্যান্সডাউন রোডের মুখেই—এই তো এসে গেছি।"

এসে যখন পড়েছে তখন প্রমোদের নামতেই হ'ল। যেখানে নামলে সেটা বেশ বড় লোকের বাড়ি।

সেখানে নামতেই একটি ছোট মেয়ে তার গলায় মালা পরিয়ে দিলে—প্রমোদের মনে হ'ল যেন মেয়েটাকে সে চেনে।

তার পরে খাওয়া দাওয়া হ'ল।

রাত হয়ে যায় দেখে প্রমোদ চঞ্চল হয়ে উঠলো। কিন্তু তার পরে যা হল তাতে সে একেবারে হাঁপিয়ে উঠলো।

বিদূষক বলেছিলেন অভিনন্দন হবে। কিন্তু কোথায় অভিনন্দন? খাওয়ার পর সবাই তাকে ঘিরে ধরে নানারকম যুক্তিতর্ক দিয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, তার এই যুদ্ধে যাওয়া কাজটা প্রশংসার কথা তো নয়ই, ভারী নিন্দার কথা। অন্তত প্রমোদের মত লোকের তা করা উচিত নয়। তা ছাড়া ব্যক্তিগত, সমাজগত অর্থনীতিগত, নানাবিধ যুক্তি দিয়ে তারা খুব ভাল করেই প্রমাণ করলে যে প্রমোদের এ অভিযান ভারী অনুচিত হবে।

ভারী অস্বস্তি বোধ করলে প্রমোদ! এঁরা সব গণ্যমান্য লোক, এঁদের কথার উপর কথা কইবার মত ধৃষ্টতা তার নেই, তাই সে সবিনয়ে কেবল পাশ কাটিয়ে যেতে লাগলো করলে না মোটে।

যখন এঁরা ঝাড়া এক ঘণ্টা আক্রমণ করবার করলেন যে, প্রমোদ সম্পূর্ণ কাবু হয়েছে, তখন তাঁরা আলোচনা করতে লাগলেন কি রকম করে এখন প্রমোদকে মুক্ত করা যেতে পারে। সে পরামর্শ যখন স্থির হ'য়ে গেল তখন বিদূষক শেষে বল্‌লেন, "তবে এই পরামর্শই তো স্থির হ'ল, কি বলেন, প্রমোদবাবু।"

তখন প্রমোদ মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লেন, "কখনই নয়। আমি কাপুরুষ নই। একটা কাজের মত কাজ করবার সুযোগ যখন সামনে এসে পড়েছে তখন কাজ করতে না এগিয়ে শুধু হাত গুটিয়ে বসে থাকবার জন্য অজু-হাত খুঁজবো, এতটা অপদার্থ আমাকে কেন মনে করছেন?"

একজন বল্‌লেন, "কিন্তু কাজটা যে অকাজ—"

"মাপ ক'রবেন। পলিটিক্স আমি জানি না—কিন্তু আর্তত্রাণের আবেদন যখন এসেছে, তখন শক্তি থাকতে ঘরে ব'সে থাকা, পলিটিক্সে যত বড় ধর্মই হোক, আমার মনুষ্যত্বে তাতে আঘাত লাগে। আর্তত্রাণের চেষ্টা যে অকাজ এ কথা যুক্তির জাহাজ আনলেও আমাকে বোঝাতে পারবেন না।"

আরও তর্ক ওঠে দেখে প্রমোদ হাত জোড় ক'রে বল্‌লে, "মাপ করবেন, আমার বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে—অনেক কিছু করবার আছে, আমি যাই।"

তখন ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে বিদূষক তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। দু তিনটা ঘর পার হ'য়ে সে যখন নীচে যাবার সিঁড়ির কাছে এসেছে তখন তার পথ আগলে দাঁড়াল প্রহেলিকা!

চমকে গেল প্রমোদ তাকে দেখে। এ যেন সে প্রহেলিকা নয়। ঠোঁটের হাসি তার মিলিয়ে গেছে চোখের জলে মুখ

ভেসে গেছে। কাতর নয়নে প্রমোদের মুখের দিকে চেয়ে সে বল্‌লে, "আমি যেতে দেবো না আপনাকে।"

প্রমোদ এতটা চমকে গেল যে, সে কিছুই বলতে পারলে না। অবাক হ'য়ে বোকার মত সুধু চেয়ে রইলো।

"কেন যাবেন আপনি? আমার অপরাধে?—আমি আপনার কাছে হার মানছি, পায় ধ'রে ক্ষমা চাচ্ছি, আপনি মাপ করুন,—আমাকে মেরে ফেলবেন না।"

ব'লে কাঁদতে কাঁদতে সে প্রমোদের পায়ের উপর গ'লে প'ড়লো। বিদূষক পায় পায় সেখান থেকে স'রে গেলেন।

মহা বিপন্ন হয়ে প্রমোদ কিছুক্ষণ পা ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে শেষে দুহাত ধ'রে তাকে টেনে তুলে বল্‌লে, "আপনি মিছে আমাকে অপরাধী করছেন, আমাকে বিশ্বাস করুন আমি যুদ্ধে যাচ্ছি শুধু গৌরবের লোভে—"

"দেখুন, বাজে কথা দিয়ে আমাকে ভোলাবেন না। আপনি যাচ্ছেন, আমাকে আপনি একটা রাক্ষসী মনে করেন ব'লে। সেই কথাই আপনি "নিঃশেষ" গল্পটায় লিখেছেন। কিন্তু আপনার পা ছুঁয়ে ব'লছি আমি সুচরিতা নই—আমি—আমি আপনাকে সত্যি ভালবাসি। তাই আমি আপনাকে ছাড়বো না।"

প্রমোদ অনেকক্ষণ চুপ ক'রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার পর সে ধীর গম্ভীর স্বরে বল্‌লে, "তাই যদি সত্যি হয় দেবি, ভালই যদি বাসেন আমাকে, তবে কি আপনি আমার গৌরবের পথে অন্তরায় হবেন? আমি মনুষ্যত্বের দর্প ক'রে অগ্রসর হয়ে গিয়ে আজ মরণের ভয়ে পিছিয়ে আসবো, আর সমস্ত পৃথিবী আমাকে ধিক্কার দেবে, এই কি চাইতে পারেন, আপনি যদি ভালবাসেন?"

এ কথায় প্রহেলিকার মুখ বন্ধ হ'ল।

ল্যাণ্ডিংএর এক ধারে একটা সোফা ছিল, প্রহেলিকা ধপ ক'রে তার উপর বসে পড়ে ঊর্ধ্ব দৃষ্টি হয়ে সুধু অশ্রুত্যাগ করতে লাগলো।

প্রমোদ নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলো।

অনেকক্ষণ পর প্রহেলিকা বল্‌লে, "কিছুতেই আপনি ফিরবেন না তা' হ'লে।"

প্রমোদ বল্‌লে, "আমিও ফিরবো না, আপনিও আমাকে ফিরতে বলবেন না, যদি আমায় সত্যি সত্যি ভালবাসেন।"

দাঁড়িয়ে উঠে প্রহেলিকা তখন বল্‌লে, "তবে যাও তোমার জয়যাত্রায়, গৌরবে মণ্ডিত হ'য়ে ফিরে এসো—আমি বাধা দেবো না। কিন্তু যাবার আগে আমাকে একটি ভিক্ষা দিতে হবে, জীবনে মরণে তোমার সব গৌরব, সব সুখদুঃখের সমান ভাগী যাতে হতে পারি সেই অধিকার তুমি আমায় দিয়ে যাও।" আবার সে ভেঙে পড়লো।

বিষণ্ণভাবে প্রমোদ বল্‌লে, "সে হয় না দেবি! মরণের ব্রত নিয়েছি আমি, প্রতি পদে পদে আমার বিপদ। এই বিপদ সাগরের মাঝে আমি আপনাকে নামাতে পারি না।"

"কেন পারবে না? জীবনে হোক মরণে হোক তোমার গৌরবের ভাগ চাই আমি, দিতে পারবে না এত কৃপণ তুমি? যদি ভাল না বাস—"

"ভালবাসি কি না, তা কি এখনও ব'লতে হবে তোমায়? কিন্তু ভালবাসি বলেই তোমার সুখ সৌভাগ্য মলিন ক'রতে পারি না আমি—"

"তোমাকে যদি না পাই তবে ছাই আমার সুখ, ছাই সৌভাগ্য।"

প্রমোদ একটু ভেবে বল্‌লে, "আচ্ছা এখন একথা থাক। এখন তো আর সময় নেই, পরশু আমার যেতে হবে। এর পর ভেবে চিন্তে—"

"ভাবনা চিন্তার সময় আর নেই। পরশু যদি যেতে হয় তবে কাল বিয়ে হ'তে কোনও বাধা নেই। তুমি একবার বল এ ভিক্ষা আমায় দেবে তুমি—তা হ'লে কালই বিয়ে হবে—সে ভার আমার।"

"কিন্তু—কাল তো বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে আপনার বিয়ে!"

"ওঃ। সেই কথা? সে দেখতে পাবেন কাল—ওটা আপনার নিতান্তই ভুল। মাষ্টার ম'শায়ের বিয়ে কাল ঠিকই, কিন্তু তাঁর আর এক ছাত্রীর সঙ্গে।"

* * *

১৫ই ফাল্গুনেই প্রহেলিকার বিয়ে হ'য়ে গেল।

খবরটা শুনে বিধায়ক যেন চমকে উঠে প্রহেলিকাকে বল্‌লে, "অ্যাঁ! তোমার বিয়ে—তাও একটা কদাকার পুরুষের সঙ্গে!"

প্রহেলিকা বল্‌লে, "কি করি বলুন, বেটা ছেলেয় পৃথিবী ছেয়ে গেছে, ওদের হাত থেকে নিস্তার নেই।"

বিধায়ক বল্‌লেন, "আগেই বলেছিলাম, বার বার চার বার। কি জান? পুরুষমানুষগুলো হ'ল ভগবানের ছিপের টোপ, খেলার ছলেও ওতে ঠোকর মারতে নেই, ঠোকরাতে গেলে কখন যে ব'ড়শী বিঁধে যাবে কেউ ব'লতে পারে না।"

(**শেষ**)

ছবি আঁকা

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

দেশ পত্রিকায় পূর্বে "ছবি দেখা" নামক দুই প্রবন্ধে ছবি আঁকার নানা পদ্ধতি এবং ছাপাচিত্রের নানা রীতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। সেই প্রবন্ধ হইতে ছবি আঁকার কার্যক্রম সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান হইতে পারে না। এই প্রবন্ধে ছবি আঁকার (ভারতীয় প্রথা) প্রণালী সম্বন্ধে বিশদভাবে লিখিতে ইচ্ছা করি। ইংরেজীতে ইউরোপীয় টেকনিকে ছবি আঁকার নানা বই আছে; কিন্তু ভারতীয় প্রথায় ছবি আঁকার কোন বই নাই। অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, ছবি আঁকা শেখার কোনো বই আছে কি, যা পড়ে ছবি আঁকা শিখতে পারি? উত্তর দিতে হয়, বই পড়িয়া কেউ ছবি আঁকা শিখিতে পারে না, বই সাহায্য করে মাত্র। ছবি আঁকা সম্বন্ধে যাঁর জ্ঞান আছে, তিনি বই পড়িয়া, তাঁর কাজের উন্নতি করিতে পারেন। যিনি কোনো গুরুর নিকট তুলি ধরিতে শিক্ষা করেন নাই, তিনি বই পড়িয়া কি করিয়া ছবি আঁকা শিখিবেন? "ছবি আঁকা" বিদ্যাটা হাতের কাজ, তাহা কোনো শিক্ষকের কাছেই উত্তমরূপে শিখিতে পারা যায়। যাঁহারা পড়িয়া শিখিতে চান, কিছু অভিজ্ঞতা থাকিলে, আশা করি, এই প্রবন্ধ তাঁহাদের সাহায্য করিবে।

ভারতীয় প্রথায় দুই রকম পদ্ধতি দেখা যায়। একরকম জল রং (ওয়াটার কলার) অন্য টেম্পারা। অবনীন্দ্রনাথের দুই বিখ্যাত চিত্র শাজাহানের প্রয়াণ ও বিরহী যক্ষ, তেল রং-এ আঁকা। প্রাচীন ভারতীয় প্রথায় তেল রংয়ের ছবি দেখা যায় না। অবনীন্দ্রনাথের এই দুই চিত্র তেল রং-এ আঁকা হলেও ইহা ভারতীয় প্রথায় টেম্পারা কাজের মতই আঁকা। এই ছবিতে তিনি ইউরোপীয় তেল রংয়ের পদ্ধতির ব্যবহার করেন নাই।

অবনীন্দ্রনাথের প্রথা (জল রং, ওয়াশ প্রথা)

অবনীন্দ্রনাথ নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার যে ধারা প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি জল রংয়ের রীতির প্রবর্তন করিয়াছেন। বিশুদ্ধ টেম্পারা কাজের উদাহরণ তাঁর নাই। তাঁর চিত্রের বৈশিষ্ট্য হইল ওয়াশের কাজে। অবনীন্দ্রনাথ প্রধানত কালারিস্ট অর্থাৎ তিনি রংয়ের ওস্তাদ।

ওয়াশের জন্য তাঁর রংয়ের মাধুর্য। তিনি প্রধানত মোগলচিত্র হইতে প্রেরণা লাভ করিলেও মোগল চিত্রের ন্যায় টেম্পারা প্রথায় আঁকেন নাই, আঁকিয়াছেন জল রংয়ে। প্রাচীন ভারতের শিল্প ধারার প্রবর্তন করিলেও তিনি পুরোপুরি ভারতীয় প্রথা গ্রহণ করেন নাই। ইউরোপীয় জল রংয়ের



ঝুলন শিল্পীঃ শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথার সঙ্গে ভারতীয় রীতির অপূর্ব সমাবেশ করিয়াছেন। চীনা কি জাপানী রীতির সংস্পর্শও তাঁর চিত্রে আসিয়াছে। ইংলণ্ডের বিখ্যাত চিত্রকর টারনার জল রংয়ের ছবিতে ওয়াশ দিতেন, কিন্তু সেটা শুধু জলের। অবনীন্দ্রনাথ বিভিন্ন রংয়ের ওয়াশ বারবার দিয়া একটি রহস্য সৃষ্টি করেন।

উপাদান

আঁকিবার প্রথা জানিতে হইলে, কি উপাদানে ছবি আঁকা

হয়, সেটা জানার প্রয়োজন। কাগজ, রং, তুলি এই তিনটি দ্রব্য ছবি আঁকার জন্য প্রয়োজন। বিলাতের হোয়াটম্যান কোম্পানীর হ্যান্ডমেড পেপারের খ্যাতি আছে। বহুকাল হইতে ইংলণ্ডের শিল্পীরা এই কাগজে জল রংয়ের কাজ করিয়া আসিতেছেন। মেসিনে নানাপ্রকার ড্রয়িং পেপার হইয়া থাকে। কম দামের সে সব কাগজ ভাল কাজের জন্য উপযোগী নহে। বেশী দামের মোটা রোল কার্টিজ পেপারে ভাল কাজ হইতে পারে। অবনীন্দ্রনাথের প্রথায় ওয়াশের কাজ দেশী হইতে তৈরী তুলট কাগজে সুবিধা হয় না; এ কাগজে ভাল হয় টেম্পারা পেণ্টিং। দেশী তুলট কাগজে আঁকিবার প্রথা ভিন্ন প্রবন্ধে লিখিব। উইণ্ডসর নিউটন কোম্পানির সেবল হেয়ার ব্রাস (উটের লোমে তৈরী তুলি) সরু মোটা Black, উজ্জ্বল সবুজের জন্য Emerald Green রাখা যাইতে পারে; নীল হলদের মিশ্রণে সবুজ রং তৈয়ার হয়। সবুজের মত আরো অনেক রং মিশ্রণে প্রস্তুত, এগুলি না কিনিলেও চলিতে পারে। গোলাপী—শাদা+লাল। কমলা—লাল+হলদে। বেগুনী—লাল+নীল। গ্রে বা ছাই রং—কাল+ইণ্ডিয়ান রেড্ অথবা—কাল+শাদা। গাছের পাতার সবুজ নানারকমের আছে; গাছে ধুলা পড়িয়া এক রকম বাদামী সবুজ হয়। বাদামী সবুজ—বার্ণট্ সায়না+নীল। সকল প্রকার রংয়ের ফর্দ লিখিয়া দেওয়া সম্ভব নহে; হাতে কলমে কাজ করিতে করিতেই শিল্পীর নানা রংয়ের অভিজ্ঞতা হইবে।

পূর্বে আর্টিস্টদের রং প্রস্তুত করিয়া লইতে হইত। গুঁড়া রংয়ের সঙ্গে আঠা মিশাইয়া রং প্রস্তুত হয়। শুধু রং



চাঁদনী রাতের জলসা। শিল্পী : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩।৪টা দরকার। ওয়াশ দেওয়ার জন্য একটি ফ্ল্যাট ব্রাস; বিলাতী ফ্ল্যাট ব্রাস অপেক্ষা জাপানী ফ্ল্যাট ব্রাস ভাল। ছোট ছবির জন্য ৪ ইঞ্চি চওড়া তুলি হইলে চলে; বড় ছবির জন্য আরো চওড়া তুলি পাওয়া যায়। রং ভাল বিলাতের উইণ্ডসর এণ্ড নিউটন কোম্পানির রং। কম দামের রং স্টুডেণ্টস্ কলার; বেশী দামের ভাল রং হইল আর্টিস্‌টস কলার। পূর্বোক্ত রং স্থায়ী হয় না; ভাল ছবি আর্টিস্‌টস কলারেই আঁকা উচিত। কোন্ কোন্ রং ব্যবহার করিতে হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মুস্কিল, কারণ বিভিন্ন শিল্পীর বিভিন্ন রং-এ রুচি। সাদা, হলদে, লাল, বাদামী, নীল, কাল এই কয়টা রংয়ের প্রয়োজন। শাদা রং Chinese White, হলদে Yellow Ochre, Chrome Yellow. বাদামী Burnt Siena বা Burnt Umber, নীল Ultramarine, Cobalt, কাল Lamp জলে গুলিয়া কাগজে লাগাইলে, শুকাইলে ঝরিয়া যাইবে। আজকাল আঠা মিশান রং বাজারে পাওয়া যায়, শুধু জলে গুলিলেই হইল; আর্টিস্টদের আজকাল অনেক মেহেনত বাঁচিয়া গিয়াছে। জলরঙা ছবির জন্য দুই রকম রং আছে কেক ও টিউব। কেক শুকনা রং জলে ঘষিয়া লইতে হয়, অন্য রং থাকে সীসার টিউবে, (যেমন টুথপেস্ট থাকে) টিপিলেই রং পাওয়া যায়। ভারতীয় প্রথায় যে ছবি ঘরে বসিয়া আঁকিতে হয়, তাহাতে কেক্‌ই সুবিধা। বাহিরে অর্থাৎ বিলাতী প্রথায় আউটডোর ছবিতে টিউবে সুবিধা, কারণ তাহাতে তাড়াতাড়ি রং পাওয়া যাইতে পারে।

ড্রয়িং

রং দেওয়ার পূর্বে কাগজে পরিষ্কার করিয়া ড্রয়িং করিয়া লইতে হইবে। ছবি তিন রকমের হইতে পারে, ১ম দৃশ্য চিত্র,

২য় সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের চিত্র ইংরেজীতে বলে জানরে পেণ্টিং, ৩য় পৌরাণিক চিত্র। ছবি আঁকিতে হইলে চাই প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এবং ওল্ড মাস্টারদের কাজের অনুশীলন, চিত্র এবং ভাস্কর্য দুইয়েরই অনুশীলন করিতে হইবে। দেব-দেবী এবং পৌরাণিক চিত্রের জন্য এই কয়খানা পুস্তকের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। Some Notes on Indian Artistic Anatomy by Dr. Abanindra nath Tagore C. I. E. এবং শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের রূপাবলী।

শুধু যে, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, প্রাচীন শিল্প বা ট্রেডিশনের অনুশীলন করিলেই যে ভাল চিত্র হইবে তাহা নহে। এই দুই জিনিসের উপর চাই শিল্পীর কল্পনা। এই তিন জিনিসকে ইংরেজীতে বলা যায়, Nature, Tradition, Imagination। এই তিন নীতির উপর নব্য বঙ্গীয় চিত্র-কলা প্রতিষ্ঠিত, এরূপ বলিতে পারি।

রং লাগান

পেনসিলে পরিষ্কার রেখাচিত্র হইয়া গেলে, কাগজটি জলে ভিজাইয়া লইতে হইবে। জল শুকাইয়া গেলে (কাগজ ভিজা থাকা চাই) রং লাগাইতে হইবে। একখানা পরিষ্কার ন্যাকড়া বা ব্লটিং কাগজ দিয়া জল শুকাইয়া লওয়া যায়। কাগজ বোর্ডের উপর সমানভাবে লাগিয়া থাকা চাই, কোথাও উঁচু নীচু, অর্থাৎ কাগজটা ফুলিয়া থাকিলে, পিছন দিকটা ফ্ল্যাট ব্রাস দিয়া ভিজাইয়া লইলেই, কাগজ সমানভাবে পড়িবে। পাতলা করিয়া প্রথম সব জায়গায় রং লাগাইতে হইবে। রং শুকাইলে আবার ছবিটি জলে ভিজাইতে হইবে; এক গামলা জল রাখিলে ভাল হয়, তাহাতে একেবারে ডুবাইয়া লওয়া যায়। পরে আর একবার রং লাগাইতে হইবে; অতঃপর ফ্ল্যাটব্রাসে শুধু জল দিয়া ওয়াশ, অথবা একটা পাতলা রংয়ের ওয়াশ ছবির উপর আগাগোড়া দেওয়া চলে। ওয়াশ দেওয়ার জন্য chrome yellow, crimson lake, cobalt অথবা emerald green ব্যবহার করা যাইতে পারে। Mauve (পাতলা বেগুনী, crimson lake এবং cobalt এর মিশ্রণে প্রস্তুত) এর ওয়াশ, বেশ মাধুর্য আনে। জল রংএ বিশেষ করিয়া ভারতীয় পদ্ধতিতে crimson lake খুব প্রয়োজনীয় রং; যে কোনো রংএর সঙ্গে এ রং মিশিয়া যায় এবং এক রংএরই বিভিন্ন পর্দা সৃষ্টি করে। এ রং যে কোনো রংএর তীব্রতা কমাইয়া দেয়। শিল্পী কি রংএর ওয়াশ দিবে সেটা নির্ভর করে ছবিটা কি toneএ আঁকিবে তাহার উপর। এক ছবিতে বিভিন্ন রংএর ওয়াশ উপর্যুপরি দেওয়া চলে। সময় অনুসারেও ওয়াশের প্রভেদ হইতে পারে, যেমন ভোর বেলার ছবিতে "ক্রিমশন লেকের" ওয়াশ, রাত্রের ছবিতে নীল রংয়ের ওয়াশ।

ওয়াশ দিলে, ছবিতে রংটা সমানভাবে মিশিবে, কোথাও তুলির আঁচড় থাকিবে না। ছবি জলে ভিজাইয়া লওয়ার কারণ হইল, রং কাগজে ভাল করিয়া লাগিয়া যায়। ওয়াশ দেওয়ার জন্য রং এক-আধটু উঠিয়া যাইতে পারে, অথবা অস্পষ্ট হইয়া যাইতে পারে। একবার ওয়াশ দিয়া আবার রং বুলাইয়া নিতে হইবে। বিভিন্ন রংয়ের সঙ্গে অল্প করিয়া "চাইনীজ হোয়াইট" মিশাইয়া লইলে, রংএর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাইবে। রং লাগান এবং ওয়াশ দেওয়া কয়েকবার করিতে হইবে। আমাদের চিত্রে ইউরোপীয় চিত্রের ন্যায় শেড লাইটের প্রাধান্য নাই, কিন্তু শেড লাইটকে একেবারে অবজ্ঞাও করে নাই। শরীরের ডৌল, নাক মুখের গঠন, কাপড়ের ভাঁজ প্রভৃতি শেডলাইট দিয়া দেখাইতে হইবে।

ইউরোপীয় চিত্র হইল আলোছায়া প্রধান, আমাদের চিত্র রেখা প্রধান। সমস্ত ছবির বহি রেখা (আউটলাইন) সরু তুলি দিয়া সম্পাদন করিতে হইবে; নাক চোখ মুখ চুল প্রভৃতি রেখা দ্বারা সুস্পষ্ট করিতে হইবে। রেখা টানা হইলে ছবি আঁকা শেষ হইল। কি রংয়ের রেখা হইবে? তাহা ছবি অনুসারে নির্ভর করে; লাল, বাদামী, কাল তিন রংয়েই হইতে পারে। "ভারমিলিয়ন," "ইণ্ডিয়ান রেড," "নিউট্রাল টিণ্ট" এই তিন রংএ রেখাঙ্কন হইতে পারে।

যারা বিদ্যার্থী তাহাদের একটা বিষয়ে সাবধান থাকা দরকার। ওয়াশ দিবার জন্য অনেক সময় চিত্রে অস্পষ্টতা আসে, সেজন্য ড্রয়িংএ তাচ্ছিল্য আসিতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় চিত্রকর ড্রয়িংএর অজ্ঞতা ওয়াশের অস্পষ্টতায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। রেখাঙ্কন দুর্বল হইলে, রংএর বাহারে ছবির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় না। অবনীন্দ্রনাথের চিত্র রচনায়, বর্ণ বিন্যাসে অস্পষ্টতা বা একটি রহস্য আছে সত্য, কিন্তু তিনি রেখাঙ্কন সুনির্দিষ্টভাবে করিয়া তারপর বর্ণ বিন্যাসে একটি রহস্য আনিয়াছেন, সেজন্য তাঁর কাজ এত জোরালো।

আমাদের প্রাচীন শিল্প, অজন্তার চিত্র, এলোরার ভাস্কর্য অনুশীলন করিলে দেখা যাইবে, প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীরা অঙ্কনে কি রকম দক্ষ ছিলেন।

শ্মশান কালী

নরেন্দ্রকুমার পাল

পাঁচ সাতখানা গ্রাম নিয়ে একটিমাত্র শ্মশানঘাট।

প্রতি বছর সদর থেকে ঘাট জমা নেবার ডাক হয়। হরিহরই সে ডাক ধরে প্রত্যেক বছর। শুধু হরিহর নয়, তার ঊর্ধ্বতন দু'পুরুষ থেকে এই ব্যবস্থা চলে আসছে। গ্রামে তাদের স্বজাতি বা সমব্যবসায়ী আর কেউ না থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে পেয়ে যায় এই বাৎসরিক ইজারা।

লাভ এর থেকে যা' হয়, তা' নেহাৎ মন্দ নয়। রীতিমত ভালোই বলতে হবে। অনেক ভদ্রব্যবসায়ীরও তা' ঈর্ষার বিষয়। প্রতি লাস পিছু পাঁচ টাকা ক'রে রেট্—ছোট ছেলে মেয়ে হ'লে সাড়ে তিন টাকা। আর লাসের তো অভাবই নেই—মড়ক গ্রামে লেগেই আছে। কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া এসব তো আছেই তা ছাড়া ফাউস্বরূপ আছে খুন-খারাবি, সাপে কাটা, জলে ডোবা প্রভৃতি।

খরচের মধ্যে শবযাত্রীদের দিতে হয় কিছু কাঠ আর পাটকাঠি, মাঝে-মিশেলে শ্মশানঘাটের ভাঙা চালাখানাকে করতে হয় মেরামত, আর কখনও কোন বিশেষ কারণে কালীপুজো ক'রে শ্মশান জাগাতে হয়।

এই শ্মশানঘাটের আয় থেকে দেখতে দেখতে পুরানো আমলের খড়ের চালা রূপান্তরিত হ'ল ইঁট সিমেন্টের পাকা বাড়িতে। এসব অবশ্য তার ঠাকুর্দার আমলের কথা। বাড়িতে তখন লোকজন অনেক। শোয়া বসার অসুবিধা হয় সকলের। ঠাকুর্দা ছিলেন দরাজ দিলের লোক। কারও কোন অসুবিধা দেখতে পারতেন না। সুতরাং খড়ের ঘর ভেঙে তৈরী হ'য়ে গেলো বড় বড় পাকা ঘর। কলরব আর কোলাহলে সমস্ত বাড়িটা মুখরিত হ'য়ে থাকত সারাক্ষণ।

গ্রামের লোক নাইতে যাবার পথে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি-কুটীল মন্তব্য করত—ইস্, বেটা মরা পুড়িয়ে লাট-সাহেব হ'য়ে গেলো।

ঠাকুর্দার ভাগ্য কিন্তু নতুন বাড়িতে বেশীদিন টিঁকল না। তিনি মারা গেলেন শীগ্‌গির।

এবং আশ্চর্য যে, ঠাকুর্দা যাওয়ার পর কয়েক বছরের মধ্যেই সমস্ত বাড়িটা খালি হ'য়ে গেলো। এক এক ক'রে সকলেরই পরিচয় মিলিয়ে গেলো তাদেরই জমা নেওয়া শ্মশান-ঘাটে। এমন কি তার চেয়েও যারা বয়সে ছোট ছিল, তারাও চলে গেলো তাকে পিছে ফেলে।

বাড়ি রইল, কিন্তু যাদের জন্যে বাড়ির প্রয়োজন ছিল, তাদের অনেকেই রইল না।

হরিহর জীবনে অনেক মরা দেখেছে, অনেক ঘেঁটেছে—যেন রাস্তার ইঁটপাথর। কিন্তু নিজের চোখের ওপর কয়েক বছরের মধ্যে পর পর মা বাপ ভাই বোন আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু—মৃত্যুর যেন নতুন রূপ ও অর্থ পেল হরিহর। সমস্ত অনুভূতি কেমন যেন আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো—শেষ পর্যন্ত কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উঠল সে।

অনেকে সেইসময় পরামর্শ দিল—এক কাজ কর হরিহর—তোদের তো খালি মরা ঘাঁটা আর শ্মশান-জাগানো কারবার, বোধ হয় কিরকম খারাপ হাওয়া লেগেছে—একবার কালীপুজো ক'রে হাওয়াটা একটু শোধন ক'রে নে।

হরিহর বেশ জাঁকজমক ক'রে কালীপুজো করল।

এবং—কেন কে জানে কি কারণে, হয়ত বোধ হয় কালী-পুজো করার জন্যেই—একমাত্র তার বৌ মালতী রয়ে গেলো একা।

এতটুকু বয়সে মালতীকে সে বিয়ে ক'রে ঘরে এনেছে। কত সমারোহ, কত উল্লাস সে বিয়েতে। মুদ্দফরাসের ছেলের বিয়ে দেখবার জন্যে গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়েছিল তাদের বাড়ির সামনে। দূর থেকে সকলেই বউকে দেখে প্রশংসা করেছিল—বাঃ খাসা বউ হয়েছে।

সত্যই মালতী খাসা বউ। কাজে-কর্মে, আচারে-ব্যবহারে, কথা-বার্তায় দু'দিনেই ঘরের সকলের প্রিয় হ'য়ে উঠল। হরিহরের সব চেয়ে ভালো লাগত মালতীর চঞ্চল চটুল দেহ-বিন্যাস, গতি-লহরী—নতুন বিহগ শিশুর মত প্রাণ-প্রাচুর্যে সর্বদাই ফুর্‌ফুর্ ক'রে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই নিতান্ত আকস্মিকভাবে সকলে চলে যাওয়াতে মালতীও কেমন যেন বিহ্বল হ'য়ে পড়ল। ভারী হয়ে উঠল অবসন্ন মন্থরতায়। মনে হ'ত সবকিছুর জন্যে যেন সে-ই দায়ী।

নিতান্ত ভয়ার্ত কণ্ঠে হরিহরকে বলত—লোকে বলে আমিই নাকি অলক্ষ্মী। আমি আসাতেই সমস্ত বাড়িটা খালি হ'য়ে গেলো।

হরিহর তাকে সান্ত্বনা দিত—দূর্, যত সব বাজে কথা। আসল কথাটা কি জানিস্, সবই শ্মশানেশ্বরীর ইচ্ছে—হরিহর ডানহাতখানা তুলে শ্মশানের দিকটা নির্দেশ করত।

এরপর একদিন আবার তাদের শূন্য ঘরে নতুন অতিথির আগমন সম্ভাবনা দেখা গেলো। মালতীর দেহে মনে নতুন লঘু মেঘের আনাগোনা দেখা দিল।

অতীত ভুলে ভবিষ্যতের আশায় দুজনে আবার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল।

আরক্তিম লজ্জায় মালতী হরিহরকে বলত—বল্ তো দেখি, ছেলে হবে, না, মেয়ে হবে।

হরিহর বলত—ছেলেই হবে নিশ্চয়, মেয়ে হ'লে তো আবার ঘর খালি ক'রে চলে যাবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের—ছেলে হ'ল না, হ'ল মেয়ে। এবং আরও দুর্ভাগ্য, মালতী দেখতে পেল না সে মেয়েকে মোটেই।

শিল্পীর আত্মার শরীরী উন্মোচন হ'ল, কিন্তু শিল্পীর আত্মা রইল না পৃথিবীতে।

দুদিন ধরে সমানে অসহ্য বেদনা সহ্য করে প্রসবের অব্যবহিত পরেই মালতীর চোখ দুটি বন্ধ হয়ে গেলো চিরতরে।

হরিহর যেন কোন্ দুর্বার নৈসর্গিক টানে ছিট্‌কে পড়ল পৃথিবীর এক কোণ থেকে আর এক কোণে—সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা অনুভূতিহীন দেশ সেটা।

একদিকে মৃত মালতীর রক্তহীন পাণ্ডুর দেহ, আর একদিকে নব জীবনের অস্তিত্ব প্রকাশের কলরব—দুয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হরিহর—নিশ্চল, নিস্পন্দপ্রায়।

আরও কত খেলা চলবে হরিহরকে নিয়ে?

হরিহর কি পাগল হয়ে যাবে?

শূন্য শ্মশানের ওপর দিয়ে হু হু করে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। শর আর ঝাউগাছের মাথাগুলো নুয়ে নুয়ে পড়ছে। কেমন যেন একটা শিরশিরে ভয়ের আওয়াজ চতুর্দিকে। সামনে ছলছল করে চলেছে গঙ্গার জল। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করছে আপন মনে। ইতস্তত মরার মাথার খুলি ছড়ানো। এখানে ওখানে জ্বলছে দু'একটা চিতা। চিতার চতুর্দিকে আগুনের লাল আভায় দাঁড়িয়ে কতকগুলো মানুষ। হঠাৎ দৃষ্টিতে ভয় হয় যমদূত ব'লে। হাতে তাদের লম্বা লম্বা বাঁশের টুকরো। মাঝে মাঝে চিতার মানুষটাকে খোঁচাচ্ছে সেই বাঁশ দিয়ে। মানুষ মানুষকে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে।

এদৃশ্য হরিহর জীবনে কতবার, কত অসংখ্যবার দেখেছে। কত মানুষ তার চোখের সামনে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। তার নিজেরও মা বাপ ভাই বোন—এক এক ক'রে সকলে ঠিক অমনিভাবেই ছাই হয়ে গেছে। কোন চিহ্নই আজ তাদের বর্তমান নেই—শুধু হরিহরের বুকের ভিতরকার স্মৃতি ছাড়া।

হরিহর মালতীর দিকে ভাল করে চেয়ে দেখে—মালতীও ঠিক অমনিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। গতকাল যে আত্ম-উপস্থিতিতে ছিল সমুজ্জ্বল, আগামী কাল সে নির্বাপিত নিশ্চিহ্ন।

না, না—হরিহরের দৃষ্টি ঘুরে যায় ক্ষুদ্র শিশুটির ওপর—মালতী নিশ্চিহ্ন নয়। জীবনের শ্রেষ্ঠ চিহ্ন, সারা জীবনের সাধনালব্ধ ফল সে রেখে গেছে এই রক্তের ডেলাটির মধ্যে।

হরিহর হাত বাড়িয়ে দেয় মেয়েটির দিকে। দাই মেয়েটিকে ধুইয়ে মুছিয়ে হরিহরের কোলে দেয়।

হরিহর মেয়ের দিকে চেয়ে থাকে অভিভূতের মত।

জীবনের কোন্ অরূপ রহস্য এলো শরীরী হ'য়ে?

সময়ের স্রোত চলে হু হু করে। মানুষের জীবনের পলিমাটি ধুয়ে বেরিয়ে যায় সেই স্রোতে। কালকের তরঙ্গ আজ আর ফিরে পাওয়া যায় না।

উঠানের ওপর হরিহরের নিজের হাতে পোঁতা শিরিষ গাছটি আজ বিরাট বৃক্ষে রূপান্তরিত। পশ্চিম দিককার ছোট ডোবাটির ধারে সেদিনকার বকুল চারাটি আজ অসংখ্য শাখা প্রশাখা মেলে বৃদ্ধ প্রপিতামহের মত স্থবির। মাঠের আলের ধারে ধারে কুচো কুচো বাব্লা চারাগুলি আজ জমিদারের আশার সঞ্চার করে। সময়ের ধাক্কা খেয়ে সবাই চলেছে হন্তদন্ত হয়ে আগিয়ে।

হরিহরেরও আজ কত পরিবর্তন। কানের ওপরকার চুলগুলো কেমন শাদাটে হয়ে এসেছে। চোখের কোলে কিরকম কালো দাগ। হাতের আর কপালের চামড়াও যেন কেমন ঢিলে হয়ে গেছে। সেদিনের জোয়ান হরিহর আজ সব সময় সোজা হয়ে হাঁটতেও কষ্ট বোধ করে। সময়ের বিরামহীন ধাক্কায় হরিহরের দেহ পরাজয় মানতে সুরু করেছে।

কিন্তু একদিক দিয়ে সে সময়কে জয় করেছে—সেটা হচ্ছে তার মন। মনের দিক দিয়ে সে অনেকগুলো বছর পেছিয়ে গেছে। মনের বিস্তৃত প্রান্তরে যেন সবুজ ধানের শিষ হেলে দুলে চলেছে আবার নতুনভাবে। সে নাচের কাঁপন জাগে আকাশের বুকেও—মরমী হিয়ায় তাই দরদী ছায়া মাঝে মাঝে মেদুর হয়ে ওঠে।

হরিহর মেয়েকে মানুষ করে তোলে। নাম রাখে দুলারী। মালতীর শূন্য স্থান নিজেই পূর্ণ করে রাখে। দুলারী বুঝতেও পারে না তার মা কোনদিন ছিল কি না। সে জানে আকাশ থেকে টুপ্ করে একদিন সে বাপের কোলে এসে পড়েছিল। শরীরে কোথাও আঘাত পেলে, মাটিতে পড়ে গেলে, খিদে পেলে, সব সময়েই ডাকে—বাবা, বাবা। মা তার মুখেই আসে না।

হরিহরেরও তাই ব্যস্ততার অন্ত নেই। মেয়ের সঙ্গে খেলা করে, মেয়েকে আদর করে, গল্প বলে, কোথা দিয়ে যে দিন কেটে যায় খেয়ালই থাকে না। সকালে উঠে মেয়েকে সঙ্গে করে যায় বকুলতলায়। ফুল কুড়িয়ে কচি কচি গুলেঞ্চ ছিঁড়ে হুটোপাটি করে মালা গাঁথে দুজনে। দুপুরবেলা ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ। ঘুঘুর ডাকে আতুর হয়ে ওঠে পটভূমি। গঙ্গার ওপর দিয়ে মাল বোঝাই নৌকাগুলো বেয়ে যায় মন্থর গতিতে। হরিহর মেয়েকে কাছে বসিয়ে গল্প শোনায়। দুলারীর কিন্তু বেশীক্ষণ বসে থাকতে ভালো লাগে না। হয়ত বাপের তন্দ্রার সুযোগ নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। মাঠে যেখানে রাখাল বালকেরা ঢিল মেরে ফল্সা পাড়ছে, দুলারী দাঁড়ায় সেইখানে গিয়ে। কাছে যেতেই বালকের দল সমস্বরে চীৎকার করে ওঠে—দূর, দূর, ছুঁয়ে দেবে এখুনি।

দুলারী নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

চোখ খুলে মেয়েকে না দেখতে পেয়ে হরিহরও আবার ছোটে মাঠের দিকে। দুলারী এসে অভিমানের সুরে তার অনুযোগ জানায়।

হরিহর মেয়েকে নিয়ে অন্য গাছের গোড়ায় গিয়ে ঢিল ছুড়তে সুরু করে। দুলারী সোল্লাসে ফল্সা কুড়োয়।

মেয়ের জন্যে হরিহর হাট থেকে কিনে এনেছে দুটো খাঁচা, আর দুটো পাখী। একটা ময়না, আর একটা সুন্দর সবুজ টিয়া। দুলারী তাদের নিজের হাতে খাওয়ায়। তাদের সঙ্গে অনর্গল কথা বলে। দুষ্টামি করলে ধমকায়। ময়নাটা মাঝে মাঝে তার দু'একটা কথা অনুকরণ করে, দুলারী আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। হাততালি দিয়ে মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে নাচে।

হরিহর অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মেয়ের ছন্দ-চটুল পদক্ষেপ আর দেহভঙ্গিমার দিকে। আবিষ্ট হয়ে যায় সে।

মালতী কি আবার ফিরে এলো নতুন রূপে?

উঠানে কয়েকটি মামুলি ফুলের গাছ—অপরাজিতা, অতসী, নয়নতারা। এককালে হরিহরের মায়ের আমলে এদের বেশ যত্ন ছিল। মা চলে যাওয়ার পর এরা উপেক্ষিত, অবহেলিত। আজও কয়েকটা কোনরকমে কায়ক্লেশে মাটির

সংগে নিজেদের সংযোগ রক্ষা করে রেখেছে। আজ আবার দুলারীর হাতে এরা পেয়েছে নবজীবনের আস্বাদ। দুলারী তাদের জল দেয়, কঞ্চির টুকরো দিয়ে গোড়া খুড়ে দেয়। অবিন্যস্ত ডালগুলিকে সযত্নে হাত দিয়ে পরিপাটি করে দেয়। বাসন্তী রঙের কাপড়খানি যখন কোমরে জড়িয়ে দুলারী এই ছোট্ট গাছ ক'টির জন্যে মহাব্যস্ত হয়ে পড়ে, হরিহরের তখন মনে পড়ে তার মাকে।

দুলারীর জন্যে হরিহরের ভয়-ভাবনারও অন্ত নেই। সর্বদাই কেমন যেন একটা সন্ত্রস্ত ভাব। মনের কোথায় কিসের যেন একটা দুর্বলতা বাসা বেঁধেছে। সব সময়ে নিতান্ত নিঃসংকোচে শবযাত্রীদের সংগে শ্মশানঘাটে যেতে পারে না, মরার সামনে এসে দাঁড়াতে পারে না—এখনি বুঝি কি যেন একটা অনর্থ ঘটে যাবে।

রাতের বেলা ঘুমের ঘোরে দুলারী মাঝে মাঝে আঁৎকে ওঠে, হরিহরের চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী যেন কাঁপছে। মেয়েকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়—মাথার বালিশের নীচেকার লৌহ দ্রব্যটির স্থিতি পরীক্ষা করে হাত দিয়ে।

দুলারী কোনদিন হয়ত জিজ্ঞেস করে,—বাবা, মানুষ মরে কোথায় যায়?

ডান হাতখানা ওপর পানে তুলে আকাশের দিকে নির্দেশ করে বলে স্বর্গে।

স্বর্গে?—দুলারী কথাটা ঠিক বুঝতে পারে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে—ওখানে মানুষ থাকে কি করে? পড়ে যায় না?

হরিহর হো হো করে হেসে ওঠে পাগলি। কথাটাকে আর বেশীদুর এগুতে না দিয়ে বলে—চল্ আমরা কানামাছি খেলিগে।

দুলারী টপ্ করে লাফিয়ে ওঠে।

হরিহরের অবসর নেই একদণ্ড। অবসন্ন অপরাহ্ণে যেন ঊষার আগমনী আয়োজনে ব্যাপৃত।

এরই মধ্যে একদিন হরিহরের ডাক এলো সদর থেকে। মনে পড়ল বাৎসরিক হিসাব-নিকাশের দিন। সদরে পৌঁছে হিসাব-নিকাশ করতে গিয়ে তো চক্ষুস্থির। অন্যান্য বৎসরের অনুযায়ী লাভ হওয়া তো দূরের কথা, বছরের সমস্ত খরচাটাই ওঠেনি পুরোপুরি। হরিহর যেন একটা নতুন অভিজ্ঞতা পেল জীবনে। শেষ পর্যন্ত মালতীর দু'একখানা গহনা বিক্রী করে, বন্ধক রেখে কোনরকমে হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে দিয়ে আবার নতুন বছরের ইজারা নিল।

মরা-বাঁচার রেজেস্ট্রী আপিসে খোঁজ নিয়ে জানল, মৃত্যু-সংখ্যা নাকি এবছর খুব কম।

হরিহর আশ্চর্য হয়ে যায়। এতখানি বিস্ময় ইতিপূর্বে সে জীবনে কোনদিন অনুভব করেনি—মানুষের মরণের সংখ্যাও নাকি কম হতে পারে?

কয়েকদিন লক্ষ্য করে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। দেখল লাস আজকাল আসে না বললেই চলে। দুলারীর কোন অমংগলের আশংকায় মনে মনে অত্যন্ত ভীত ও দুর্বল হয়ে পড়াতেই ব্যাপারটা তার নজরে পড়েনি।

হরিহর মহা ভাবনায় পড়ল।

একমাত্র ভরসা মা-শ্মশানেশ্বরী। সুদিনের আশায় মনে মনে মা কালীকে মানত করে।

কয়েকটা দিন কেটে গেলো। চিন্তার জটিলতায় হরিহর অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠল। এমন কি চিন্তার স্রোতে দুলারীর কাছ থেকেও সে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে এলো।

সেটা ছিল কৃষ্ণপক্ষ। ক'টা দিন পরেই এলো অমাবস্যা। হঠাৎ সেদিন হরিহরের মনে পড়ল আজ যদি সে শ্মশানে একখানা কালীপুজো করতে পারে এবং কোন অনূঢ়া মেয়েকে দিয়ে দুটো রক্তজবা মায়ের পায়ে চড়িয়ে দিতে পারে, তা'হলে বাকী জীবনটাই হয়ে থাকবে নির্বিঘ্ন, ভাবনাহীন। সেই সংগে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিয়ে দুলারীও হবে নিরঙ্কুশ দীর্ঘজীবী।

একদিন এই কালীপুজো করে কালের মুখ থেকে সে মালতীকে ছিনিয়ে রেখেছিল, আর আজ এতটুকু আশীর্বাদ কি সে পাবে না?—নিজের জন্যে না হলেও দুলারীর জন্যে?

হরিহর মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠল—যেন অসহনীয় রোগ যন্ত্রণার পর হঠাৎ কোন স্বপ্নাদ্য ঔষধ পেয়ে গেছে।

সন্ধ্যে হতেই তাড়াতাড়ি দুলারীকে খাইয়ে দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখল ঘরের মধ্যে। নিজে সেই সুযোগে ছুটল কুমোর পাড়ার দিকে। নগদ পয়সা দিয়ে একখানা কালীপ্রতিমা কিনে বয়ে নিয়ে এলো শ্মশানঘাটে। এক বোতল মদ আর গোটা কয়েক জবাফুলও নিয়ে এলো যোগাড় করে। ঘাটের চালার নীচে কাঠের গাদার ওপর রেখে দিয়ে ফিরে এলো ঘরে।

দুলারী তখনও ঘুমোচ্ছে অঘোরে।

হরিহরও হাত পা ধুয়ে শুয়ে পড়ল তার পাশে। একটুখানি ঘুমিয়ে নিলে মন্দ হয় না? শ্মশানেশ্বরীর পুজো তো সেই নিশীথ রাত ছাড়া হবে না।

ঘুম কিন্তু এলো না। সমস্ত স্নায়ু-শিরায় কিরকম যেন এক অসহ্য উত্তাপ।

রাত বেড়ে চলে। হরিহর শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল কত কি ভাবে।

অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার রাত। ঝম্ ঝম্ করে চতুর্দিকে রাতের গভীরতা ও গাম্ভীর্য। রহস্য ও ভীতির সম্পর্ক যেন আকাশ ও পৃথিবীর। মাটির বুকে ঝিঁঝিঁ ডাকে অবিশ্রান্ত, গাছের পাতায় পাতায় জোনাকীর উৎসব, পেচকের অমাংগলিক চীৎকার, বাদুড়ের পাখা ঝাপ্টানি।

মাঠের মধ্যে একদল শেয়াল ডেকে ওঠে সমস্বরে। শ্মশানের কুকুরগুলোও ওঠে ঘেউ ঘেউ করে সে ডাক শুনে।

হঠাৎ হরিহর বিছানার ওপর উঠে বসে। খোলা জান্‌লা দিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে দুলারীর গায়ে হাত দিয়ে ডাকে—দুলারী, দুলারী, একটু ওঠ্ তো মা।

বাপের ডাক শুনে দুলারী ধড়মড় করে উঠে পড়ে। বিছানার ওপর বসে দু'হাত দিয়ে চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে ঘুম-ভাঙা স্বরে বলে—কি?

হরিহর তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে—চল্ আমরা বেড়িয়ে আসি একজায়গা থেকে।

দুলারী উঠে দাঁড়ায়।

হরিহর মেয়ের হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে চলতে থাকে। বাইরের ঠান্ডা বাতাসে দুলারী মাঝেমাঝে কেঁপে ওঠে।

গঙ্গার ধারে গিয়ে হরিহর জলে নেমে স্নান করে। দুলারীকে ডাকে—আয়।

দুলারী আসে না। পারের ওপর দাঁড়িয়ে বলে—না, বড্ড শীত করছে।

হরিহর হাসতে হাসতে তাকে হাত ধরে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে আসে।

দুলারী ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে থাকে।

শ্মশানের ওপর এসে হরিহর প্রতিমাখানা কাঠের গাদা থেকে নামিয়ে মাটির ওপর রাখে। মরার মাথার একটা খুলিতে খানিক মদ ঢালে। জবাফুল ক'টা একপাশে রেখে দেয়। খানকয়েক কাঠ জড়ো করে আগুন জ্বালায়। ধুনোর গুঁড়ো ছড়িয়ে দেয় তার ওপর। দপ্‌ করে ওঠে আগুনের শিখা।

সেই শিখায় কালীমূর্তির দিকে তাকিয়ে দুলারী ভয়ার্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠে হরিহরকে জড়িয়ে ধরে।

হরিহর তার পিঠে হাত দিয়ে বলে—ভয় কি? ও যে শ্মশানেশ্বরী, আমাদের সকলের মা।

তারপর তাকে হাত ধরে প্রতিমার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলে—এই ফুল ক'টা আর পানপাত্রটা ওঁর চরণে আগিয়ে দে তো মা।

দুলারীর কণ্ঠ থেকে ক্ষীণ জড়িত আওয়াজ আসে—না, আমি পারব না। তুমি চলো এখান থেকে।

হরিহর সান্ত্বনা দেয়—কিচ্ছু ভয় নেই। মাকে আবার ভয় কিসের?

হরিহর আগুনে আবার ধুনো দেয়। দপ্‌ করে ওঠে শিখা। দুলারী কয়েক পা পেছিয়ে আসে।

হরিহর একটু অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে এইবার। তার এত আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে? মহা অপরাধ হবে যে তাতে। কর্কশ কণ্ঠে হাঁক দেয়—শীগ্‌গির আগিয়ে দে বলছি।

দুলারী বাবার দিকে তাকায়। আগুনের আভায় দেখে এলোমেলো সিক্ত চুল, কপালে নীলাভ শির, লাল ড্যাবডেবে চোখ। দুলারী যেন আজ বাবার নতুন মূর্তি দেখছে। ভয়েতে পাংশু হয়ে যায়। সমস্ত চেতনা কেমন ঠান্ডা হয়ে পড়ে।

সম্মোহিতের মত কোনরকমে কাঁপতে কাঁপতে আগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে ফুল ক'টা আর মদখানি রেখে দেয় প্রতিমার পায়ের ওপর।

পেছন থেকে হরিহর চেঁচিয়ে উঠে সোল্লাসে—জয় শঙ্করী, শ্মশানেশ্বরী।

হ্যাঁ হয়েছে, থাক্‌, চলে আয় মা—মেয়েকে উদ্দেশ করে বলে।

দুলারী কিন্তু উঠতে পারে না। নড়বার ক্ষমতা তার নেই। ঠান্ডায় আর ভয়ে সে প্রায় জমে উঠেছে। ধপ্‌ করে মাটির ওপর বসে পড়ে।

হরিহর তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নেয়। ঘরে এসে শুকনো কাপড় দিয়ে গা মাথা মুছিয়ে ঢেকে-ঢুকে শুইয়ে দেয়। ছোট্ট মেয়ে—দেহ ও মনের ওপর অতখানি বীভৎস প্রতিক্রিয়া সইতে পারবে কেন?

ভোরবেলা থেকে এলো ভীষণ জ্বর। জ্বরের ধমকে বেহুঁস হয়ে পড়ল দুলারী।

হরিহর আবার সদরে ছুটল। ডাক্তার নিয়ে এলো, ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা করল।

একটা দিন রাত পুরো কেটে গেলো। হরিহর মেয়ের পাশ থেকে নড়ল না একটুও। পাশে ব'সে গায়ে মাথায় হাত বোলায়, ডাক্তারের নির্দেশমত ঔষধ খাওয়ায়।

হরিহরের আজ আর কোন চিন্তা নেই। চেষ্টা করেও আজ যেন কিছু চিন্তা করতে পারে না। শুধু কাজশেষের শ্রান্তির মত কেমন যেন অবসন্নতা। যেদিকে তাকায় সব ধপ্‌ধপ্‌ করছে শাদা। মনের প্রান্তরেও কেমন গৈরিক নিস্পৃহা।

মেয়ের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ডাকে—দুলারী, মা—

কোন সাড়া নেই।

সমস্ত দিন কেটে গেলো। মাঝরাতের দিকে দুলারী কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করে, ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে। হরিহর একগাদা ঔষধ ঢেলে খাইয়ে দিতে যায়, কিন্তু মুখে হাত দিয়ে দেখে দাঁত-বন্ধ। ভয়েতে হরিহরের বুকটা কেমন ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করে ওঠে।

গায়ে হাত দিয়ে ডাকে—দুলারী, দুলারী, মা আমার, এই ঔষধটুকু খেয়ে ফেলো।

দুলারী নীরব।

অনেকক্ষণ পরে দুলারী মুখ খুলল। হরিহর ঔষধটুকু তার মুখে ঢেলে দেয়। ঔষধ কিন্তু গলা দিয়ে নামে না, দু'কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে যায়।

হরিহর ডুকরে কেঁদে ওঠে ছেলেমানুষের মত। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে মেয়েকে।

দুলারীর দেহের উত্তাপ ঠান্ডা হয়ে যায়—অত্যন্ত ঠান্ডা।

বাইরে একদল বাদুড় উড়ল পাখা ঝাপ্‌টে, একটা পেঁচা ডেকে উঠল বিকট চীৎকার করে।

হরিহরের চোখের সামনে ভেসে উঠল ছলছল করে বয়ে যাওয়া গঙ্গা, পাড়ের ওপর শর আর ঝাউগাছে ঘেরা নির্জন শ্মশানঘাট, প্রজ্জ্বলিত লাল অগ্নিকুণ্ড, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মড়ার মাথা, আর তার মাঝে রক্তাক্ত লোলজিহ্বা উলঙ্গ কালী-মূর্তি, পদতলে ভীত পাংশু দুর্বল এক ক্ষুদ্র বালিকা।

হরিহরকে কে যেন বাইরে থেকে ডাক দিল। ঝড়ের মত সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

শ্মশানে গিয়ে ঘুরে ফিরে দেখল চতুর্দিকে। কী যেন সে ফেলে গেছে—তাই খুঁজতে এসেছে।

কিছুক্ষণ পরে স্থির হয়ে দাঁড়াল। দেখল কালীমূর্তি ঠিক তেমনিভাবেই খাড়া আছে। একেবারে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে খুব ভালো করে নিরীক্ষণ করতে লাগল। দেখতে দেখতে সর্বাঙ্গে কেমন যেন একটা প্রতিহিংসা-স্পৃহার মত জ্বালা ধরল। মাটি থেকে একখানা পোড়া কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে

(শেষাংশ ৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

"কবির স্ত্রী"

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

রবীন্দ্রনাথের "কবির স্ত্রী"র আবেদন আজিকার জীবনেও বহু সাহিত্যিক মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিতেছে। কবি-কল্পিত "কবির স্ত্রী" বলিয়াছিলেন,

রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়
রচিতেছ বসি পুঁথি বড় বড়
মাথার উপরে বাড়ি পড় পড়
তার খোঁজ রাখ কি!

কবি-পত্নীর অভিযোগ ছিল এই যে কথা মেলা জুটাইয়া লাভ কি, যদি তাহাতে অন্ন না জোটে! কাব্য-বৃত্তিতে পয়সা আসে না, কাজেই ভারতীকে ছাড়িয়া লক্ষ্মীর উপাসনা করাই শ্রেয়। প্রাচীন যুগে কবিই ছিলেন বলিতে গেলে একমাত্র সাহিত্যিক কিন্তু এই সাহিত্যাধিকারী লোকের সংখ্যা ছিল নিতান্তই অল্প। সে যুগের পাঠকদেরও অর্থাকাঙ্ক্ষা ছিল নিতান্ত কম—বিশেষত সকল দেশেই প্রাচীন সমাজে কবি-সাহিত্যিকের প্রতি রাজানুগ্রহ ছিল। মধ্য যুগেও এই ব্যবস্থার অভাব দেখিতে পাই না। তবে মধ্যযুগে সাহিত্যিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল কিন্তু এই সব সংখ্যাবহুল সাহিত্যিকদিগের অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই সাহিত্যকে জীবিকারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন—অধিকাংশই ছিলেন সৌখীন অর্থাৎ ভাব-জীবনের তাড়নায় সাহিত্যিক। কাজেই বলিতে হইবে রবীন্দ্রনাথ বরষার দিনে পড় পড় মেটে ঘরে মেজের উপর যদৃচ্ছ ছড়ান পুস্তকরাশির পাশে অধ্যয়ন-মগ্ন অভুক্ত-প্রিয়া-সঙ্গী যে সাহিত্যিকের চিত্র আঁকিয়াছেন তাহার সঙ্গে রাজসভা, মন্ত্রী, উষ্ণীষ, গলমাল্য যত কিছুরই অবতারণা করুন না কেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা আধুনিক যুগের সাহিত্যিকেরই চিত্র। বাঙলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক অবদান লইয়া বলিতে গেলে বলা যায় যে, ফুলিয়া গ্রামের দরিদ্র পরিবারে জন্মাইয়াও কৃত্তিবাসের সাহিত্যসাধনায় ব্যাঘাত হয় নাই, ভারতচন্দ্র রাজানুগ্রহ লাভ করাতে তাঁহারও সাহিত্যচর্চায় ব্যাঘাত হয় নাই। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বর গুপ্ত যদি "প্রভাকরের" পাঁচ হাজার গ্রাহক করিতে না পারিতেন কিংবা মধুসূদন যদি উত্তরপাড়ার জমিদার-বন্ধুর অর্থসাহায্য না পাইতেন তাহা হইলে ইহাদের দুর্দশার অবধি থাকিত না। আজ পর্যন্ত বাঙলাদেশে বৃত্তিগতভাবে সাহিত্যকে বেশী লোক বরণ করেন নাই—ইহা বঙ্গভারতীর সৌভাগ্য। কিন্তু এ সৌভাগ্য আর বেশীদিন টিকিয়া থাকিবে না কিংবা টিকিয়া থাকিতে পারে না। শরৎচন্দ্র যদি বাজে শিবপুরে আস্তানা গাড়িবার সুযোগ না পাইতেন, তবে তাঁহার সাহিত্যিক মনীষার অতখানি বিকাশ হইত কি না সন্দেহ। সাহিত্য-সৃষ্টি আজ আর শুদ্ধ সাহিত্যিকের সহজ প্রতিভার স্ফূর্তি নহে—জীবন আজ জটিল হইয়া পড়িয়াছে, চিন্তা ছাড়া ভাবের স্পর্শ লাভ করা শক্ত, ঐতিহ্যকে আয়ত্ত না করিয়া আধুনিক প্রকাশভঙ্গির দাঁড়ি-পাল্লা ঠিক করা অসম্ভব। কাজেই বহু সাহিত্যিককে আজ সাহিত্য-সাধনা দিয়াই তার আর্থিক অভাবকে মিটাইতে হইবে, তাহার অন্য বৃত্তি পালনের অবকাশ নাই। আধুনিক সাহিত্যিকের জীবনে এইখানেই ঘোর সঙ্কট—তাই বলিতেছিলাম যে, বর্তমান জীবনে সাহিত্যিকের আর্থিক অভাব যেন "কবির স্ত্রী"তে মূর্তিমতী হইয়া প্রতি সাহিত্যিককে প্রেমমিশ্রিত ধিক্কারের সুরে জীবন-বরষার ঝর ঝর নাদের মধ্যে অনুক্ষণ বলিয়া বেড়াইতেছে,

নিশিদিন ধরে একি ছেলেখেলা
ভারতীরে ছাড়ি ধর এই বেলা
লক্ষ্মীর উপাসনা।

আধুনিক সাধনার সৌভাগ্য যে এই অন্তর্গূঢ় ধিক্কার-বাণীতেও সাহিত্যিকেরা অভিভূত হইয়া পড়েন না। অভিভূত হইয়া পড়েন না এই জন্য নয় যে, সাহিত্যিকেরা বিষয়-জ্ঞান-বিবর্জিত ভোলা মহেশ। সাহিত্যিক বিশেষত কবি-সাহিত্যিক সম্বন্ধে এই প্রকার একটা মিথ্যা ধারণা বহুদিন হইতে সাহিত্যের আসরে চলিয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য যে সাহিত্যিক ভাবরাজ্যের সন্ধান খুঁজে বেড়ান বলে বস্তুজগতকে অবহেলা করেন না, বস্তু-নিরপেক্ষ যে ভাব-স্ফূর্তি তাহা সাহিত্যিকের হইতে পারে না, তাহা হইতে পারে সংসার-বিরাগীর কিংবা ঋষি-দ্রষ্টার। রবীন্দ্রনাথ ভারতীস্তোত্রে কবির মুখে যে দিয়াছেন—

এ ধরার মাঝে করিয়া নিনাদ
চাহিনা করিতে বাদ-প্রতিবাদ
যে কদিন আছি মানসের সাধ
মিটাব আপন মনে।
যার যাহা আছে তার থাক তাই
কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই
শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই
একটি নিভৃত কোণে।

ইহা কোন আধুনিক সাহিত্যিকের মনোবাণী হইতে পারে না। শুদ্ধ অন্তর হতে বচন আহরণ করিয়া, প্রেমিকের চুম্বনকে মধুর করিয়া, মাতৃস্নেহের দীনতম প্রকাশকে গরীয়ান করিয়া, জীবনের বাঁশিতে বাঁধা কয়টি গতে সুরের বেসাতি করিয়া সাহিত্যিক মন আজ আর আপনাকে চরিতার্থ করিতে পারিবে না। তবে যে আর্থিক অভাবের মধ্যে পড়িয়াও আধুনিকের বস্তু-সজাগ মন আজ মুহ্যমান হইয়া পড়ে না তাহা এইজন্য যে, আধুনিক ধন-ব্যবস্থায় সাহিত্যিকের পুরস্কারের সম্ভাবনা যত কঠোরই হউক না কেন, সে সম্ভাবনার মাত্রার পরিমাণ করা যায় না। তাহা ছাড়া আরও একটি কারণ এই যে, জীবন সংগ্রামের ব্যর্থতার শান্তি আজিকার দিনের বহু চিন্তাশীল নর-নারী লাভ করিতে পারেন একমাত্র সাহিত্যে। ইহা ঠিক Freudian sublimationএর কথা হইল না, কেন না বাহ্য ঘটনার মধ্যে যে জীবনের যথার্থ মর্ম নাই এ বোধ সকল যুগে সকল সমাজেই কিছু কিছু নরনারীর ছিল এবং মনের রাজ্যে এই অতৃপ্ত সার্থকতার সন্ধানে মানুষ চিরকালই সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে এবং আজিকার ভাঙাচোরার জীবনে এই চিরন্তন সাহিত্যসৃষ্টির

প্রেরণা কিছুমাত্র হ্রাস হওয়া দূরে থাক বহু পরিমাণে বৃদ্ধিই পাইয়াছে। কাজেই সাহিত্যিক-বৃত্তির আধুনিক আর্থিক সমস্যা যত কঠোরই হউক না কেন, সাহিত্য-সাধনার এ যুগেও বিরাম হয় নাই।

বর্তমান জীবনে সাহিত্যিকের আর্থিক অসহায়তার সর্বপ্রধান কারণ সাহিত্যকে আজ আর সাধনার সামগ্রী বলিয়া বিবেচনা করা হয় না, বর্তমান আর্থিক প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে সাহিত্যকেও আজ শ্রমশিল্পজাত আর দশটি পণ্যসামগ্রীর মত একটি পণ্যসামগ্রী বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। সাহিত্যিক আজ শ্রমিক মাত্র; কাজেই তাঁহার শ্রমজাত রচনার ক্রেতৃসংখ্যার উপরই ধনী প্রকাশকের কাছে তার মূল্য নির্ভর করে। সেই সাহিত্যিকের ভাগ্যেই আজ মোটা ভাত মোটা বস্ত্র জোটে বাজারে যাহার রচনার ক্রেতা মিলে প্রচুর। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ইহাতে বিস্ময়ের ব্যাপার কি হইতে পারে, প্রকাশকেরই-বা ইহাতে হৃদয়হীনতার পরিচয় কোথায়? ব্যবসায়ী প্রকাশকের কাছে সহৃদয়তার কোন প্রশ্নই হইতে পারে না; বিস্ময় এইজন্য যে, যে বইয়ের ক্রেতা নেই সে বইয়ের জন্য সাহিত্যিকের সাধনা পণ্ডশ্রম মাত্র—বিস্ময় এইজন্য যে সাহিত্যের আর্থিক মূল্য নির্ভর করে সাহিত্যবাজারের বেসাতি-ব্যবস্থার উপর—বিস্ময় এইজন্য যে সাহিত্যের মূল্যকে আজ যাচাই করিতে হয় গণতান্ত্রিক ভোট-নীতির অনুসরণ করিয়া, মনের যা ফসল তার গুণ বাখাইতে হয় কলকারখানার শিল্পসম্ভারের মত বিজ্ঞাপনের প্রাচুর্যে ও গণমনকে প্রলুব্ধ করিবার শ্রীহীন চেষ্টা দিয়া। গণরুচির সংঘাতে এবং ধন-শিল্পের বেসাতি-ব্যবস্থার আবর্তে পড়িয়া আজও যে কোন কোন সৎসাহিত্যিক মোটা গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন, ইহা সাহিত্য-ভারতীর কম সৌভাগ্যের কথা নয়!

সাহিত্যের আসরে আজ "বামপন্থী"দের আবির্ভাব হইয়াছে। উঁহারা বলিবেন যে, সাহিত্যিকের অন্নাভাব হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কেন না এতদিন সাহিত্যিকেরা যে মাথামুণ্ড রচনা করিয়া আসিয়াছেন তাহাতে শুদ্ধ ভাব-বিলাসী মুষ্টিমেয় শিক্ষিত নরনারীর কৃত্রিম ধ্যান-ধারণারই পরিচয় আছে, তাহার সঙ্গে বিশাল গণ-সংঘের নাড়ীর যোগসূত্র কোথায়! এইসব বামপন্থীদের মতে সাহিত্য থাকিবে কৃষি-শ্রমিক নর-নারীর দৈনন্দিন বৈষয়িক জীবনের শ্রমোজ্জ্বল কাহিনী; তাহাতে থাকিবে কর্মী মানবের কর্ম-সবল মনের উদ্দাম-আবেগ। বামপন্থীরা বলেন যে, সাহিত্য যতদিন এক ভাব-বিলাসী সম্প্রদায়ের অলীক আবর্জনা নিয়া নাড়াচাড়া করিবে, ততদিন সাহিত্যিকের কপালে অন্ন জুটিবে না; কিন্তু যেদিন সাহিত্যিক আসিয়া দাঁড়াইবেন এক বিপ্লবী শ্রমিক-সমাজের পতাকা বহিয়া সেদিন হইতে সাহিত্যিকের স্থান হইবে আর্থিক সমাজের পুরোভাগে; সেদিন হইতে সাহিত্যিক আর সমাজের ঘাড়ে বোঝা হইয়া থাকিবেন না, তাহার রচনা-শ্রম সামাজিক গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া আপনার নিজস্ব আর্থিক মূল্য অর্জন করিবে। বামপন্থীদের এই সাহিত্যাদর্শ এখানে আলোচনা করিবার অবকাশ কিংবা প্রয়োজন নাই। ইহা বলিলেই এখানে যথেষ্ট হইবে—আজ বহু তরুণ সাহিত্যিক বামপন্থী চিন্তা দ্বারা অভিভূত হইয়াও যাঁহারা বামপন্থী সাহিত্যাদর্শকে সাধনার ক্ষেত্রে বরণ করিয়া লইতে পারেন নাই তাঁহারা এক ঘোরতর মানসিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছেন। তাঁহারা ভাবিতেছেন সাহিত্য-সাধনা পণ্ডশ্রম মাত্র, সমাজের আর্থিক ব্যবস্থায় সাহিত্যিকের যথার্থ কোন ন্যায্য বৃত্তি হইতে পারে না, এই ভাব-বিলাসী পেশাদারীদের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে—কালের সোনার তরীতে ব্যর্থতার দেশের নিরুদ্দেশ যাত্রায় নিজেদের বোঝাই করিয়া দিবার লগ্ন উপস্থিত। আর্থিক আত্মগ্লানিতে অভিভূত হইয়া সাহিত্যিক আজ আত্মঘাতী হইতে বসিয়াছেন।

এই বামপন্থী প্রভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহা সত্য যে, প্রতি সাহিত্যিক আজ প্রিয়ামুখের ভর্ৎসনা বিস্মৃত হইতে পারিতেছেন না—"অন্ন জোটে না কথা জোটে মেলা।" বলা বাহুল্য যে, ইহা যে শুধু আধুনিক পুরুষ-সাহিত্যিকেরই সঙ্কট তাহা নহে, বৃত্তিগতভাবে যেসব নারী-সাহিত্যিক আছেন তাঁহাদেরও ঐ একই সঙ্কট। শ্রীমতী ভার্জিনিয়া উলফ তাঁহার "এ রুম অফ ওয়ানস ওন" গ্রন্থে এই সমস্যার কথাই আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীমতী উলফ বলেন যে, নারীর যদি গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা না থাকে, তবে নারীর সাহিত্যিক প্রতিভার বিকাশ হইবে কেমন করিয়া, কাজেই শ্রীমতী উলফ নারী সাহিত্যিকের জন্য সমাজ-ভর্তার কাছে এই গ্রাসাচ্ছাদনের দাবী করিয়াছেন। বলা বাহুল্য সমাজের সঙ্গে সাহিত্যিকের এই ভর্তা-ভর্ত্রী সম্বন্ধ আজিকার দিনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর নয়। একদিকে সমাজের ভরণ-ক্ষমতা যেমন পরিমিত, অন্যদিকে সাহিত্যিকের সংখ্যাও তেমনি বহুল। ব্যবহারিক জীবনের পাকা রাস্তা ছাড়িয়া যেসব নর-নারী আজিকার জীবনেও সাহিত্যের কাঁচা পথ বাহিবার আনন্দ লাভ করিতে চান, তাঁহারা যেন এ কথা বিস্মৃত হইয়া না যান যে, এ পথ-নির্দেশ তাহাদের স্বকৃত, যে এ-পথে চলার আর্থিক অন্তরায় অগণিত। সাহিত্যিক জীবনের আর্থিক অভাব দূর করিবার যথার্থ পন্থা "বুক ক্লাব" প্রতিষ্ঠা করিয়া সাহিত্যের পশার জাঁকাইয়া তোলার চেষ্টা করা নয়, ইহার একমাত্র পন্থা আধুনিক যুগের হালকা গণসেবী সাধনার পরিবর্তে মানব সাধনাকে এক আদর্শানুশাসিত সমাজ-ব্যবস্থার উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠ করা। যতদিন এই আদর্শকেন্দ্রগ মানব সাধনার পুনরুদ্ধার না হইবে, সাহিত্যিককে উঞ্ছবৃত্তি করিয়াই কাটাইতে হইবে; প্রকাশককে দোষ দিয়া লাভ নাই, কেন না প্রকাশক ধনি-সভ্যতার প্রতীক মাত্র; সঙ্গে সঙ্গে এ মিথ্যা শ্লাঘা রটাইয়াও লাভ নাই যে সাহিত্যিক বিষয়ত্যাগী ভোলা মহেশ্বর, কেন না

গাঁথিয়া ছন্দ হ্রস্ব-দীর্ঘ
মাথা ও মুণ্ড ছাই ও ভস্ম
মিলিবে কি তাহে হস্তী-অশ্ব
(যদি) না মিলে শস্য-কণা!

সপ্রতিভ

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলে সপ্রতিভ বলতে হয় রাধানাথকে। কথায় সে কখনও কা'রও কাছে হঠবার পাত্র নয়। প্রশ্ন করলে উত্তর সে দেবেই, তা' তার উত্তর জানা থাক আর না থাক। ছোটবেলা থেকে দেখছি কি না! পাশাপাশি বাড়ি, আমরা স্কুলে ভর্ত্তি হতে গেছলাম এক সঙ্গে। আমি বাড়িতে পড়েছি তখন কিং রীডার পর্যন্ত, রাধানাথের এদিকে সেকেণ্ড বুকও শেষ হয়নি। কিন্তু অধ্যক্ষ মথুরবাবুর প্রশ্নের উত্তরে সে গড়গড় করে তার দাদার সিক্সথ্ ক্লাসের বইগুলোর নাম মুখস্থ বলে গেল। আমি তো অবাক! সে ভর্ত্তি হল আমার চেয়ে তিন ক্লাস ওপরে। অবশ্য চালাকী ধরা পড়তে এবং তার ইনফ্যাণ্ট ক্লাসে ফিরে আসতে বেশী দেরী লাগল না, কিন্তু তাতেও তার কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। বললে, "তোদের ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও থাকব না, তো সিক্সথ্ ক্লাসে। একবার সখ হল, দেখে এলাম।" তারপর থেকে অনেক অপমান, অনেক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে সে তার বিশেষত্বটুকু বাঁচিয়ে চলেছে আজীবন। বই সে বিশেষ পড়ত না, কিন্তু পরীক্ষার দিন প্রত্যেক প্রশ্নের জবাব সে দিত। 'মন্থরা' মানে 'ইন্দুর', 'বৃক্ষ' মানে 'অট্টালিকা', "রোমন্থন" মানে "নেমন্তন্ন", "তৃষ্ণাতুর" মানে "কৃষ্ণবর্ণ" এই-রকম অনেক নতুন মানে সে বলত এবং লিখত বাঙলা ক্লাসে। পণ্ডিত মশায় শেষ পর্যন্ত সেভেন্থ ক্লাসে অনেক করে তাকে অনুরোধ করেছিলেন যে, সে যেন বাইরের কোনও লোকের সামনে বা হেড মাস্টার মশায়ের সামনে অন্তত একটু চুপ করে থাকে, তার বিদ্যার পরিচয়টা না দেয়। রাধানাথ তাঁর কথা রেখেছিল, হেড মাস্টার মশাই ক্লাসে এলে সে সাধ্যপক্ষে মুখ খুলত না। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যে হয়। বল্‌লেন মানে বলো তো, "দি কার্পেণ্টার লুক্‌ড্ আউট দি উইণ্ডো"—

তিনি আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, রাধানাথ দেখলে তাঁকে আর বলতে দিলে নিজেরই খাটুনি বাড়বে, সুতরাং কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠল, "ঐ কোটপ্যাণ্ট পরা লোকটি হ্যাটধারী হিন্দু।" হেড মাস্টার মশায় বোধ হয় এত তাড়াতাড়ি এমন উত্তর আশা করেন নি, রাধানাথ তাঁর হ্যাটকোট নিয়ে ঠাট্টা ক'রছে ভেবে দিলেন ক্লাস থেকে বার ক'রে। তারপর তাঁর ঘরে গিয়ে অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে রাধানাথ সে-যাত্রা রক্ষা পেলে বটে, কিন্তু মাস্টার ছাত্র সকলের কাছেই তার মান্য যে কমে গেছে, সেটা সে দেখেও দেখলে না। কেউ কিছু বললে গায়ে মাখত না, বলত, "জানতাম নাকি, একটু ঠাট্টা ক'রলুম, লোকটা নেহাৎ বেরসিক বুঝলে না।"

রাধানাথ সেই থেকে পারতপক্ষে কোন কথার জবাব দিত না ক্লাসে। কিন্তু কম্‌লী যে ছাড়ে না! ইনস্পেক্টর এলেন স্কুল দেখতে সেবারে। আমাদের ক্লাসে ঢুকে প্রথমত দু'একটা ইংরেজীর প্রশ্ন ক'রলেন। উত্তর যে যা দিচ্ছিল প্রায়ই ঠিক হচ্ছিল। রাধানাথ অযাচিতভাবে দু'একবার কি ব'লতে গিয়েছিল, কিন্তু হেডমাস্টার মশায়ের রক্তচক্ষু তারই ওপর স্থির হ'য়ে আছে দেখে আর কোনও গোলমাল ক'রতে সাহস করেনি। কিন্তু বিধাতা বিরূপ, ইনস্পেক্টর বললেন, "তোমরা স্বাস্থ্যতত্ত্ব পড়েছ?" তিন-চারজন একবাক্যে বললে, "আজ্ঞে হাঁ।" ইনস্পেক্টরবাবু সোজা রাধানাথের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "স্বাস্থ্যতত্ত্ব মানে কি খোকা?" রাধানাথ স্বাস্থ্য-তত্ত্বের ঘণ্টায় অধিকাংশ দিনই ঘুমোত, এক-আধদিন যেটুকু শুনেছিল তাই থেকে তার ধারণা ছিল "কুঁয়া, পুকুর, মশা, মাছি, এই সব সম্বন্ধে কিছু ব্যাপার। সে বললে, "আজ্ঞে এঁদোপুকুরের জলে মশা হয়—" ইনস্পেক্টরবাবু বাধা দিয়ে বললেন, "হ'ল না, স্বাস্থ্যতত্ত্ব মানে কি, তাই বলো।" রাধানাথ অকূলপাথারে প'ড়ল সেটুকু তার জানা ছিল, তা ত কাজে লাগল না, এখন উপায়? রাধানাথ মরিয়া হ'য়ে বললে, "আজ্ঞে, স্বাস্থ্যতত্ত্ব মানে কায়স্থবাড়ির তত্ত্ব।" পণ্ডিত মশায়ের মুখ চুণ, হেডমাস্টার মশায় বললেন, "ওটা একটা ইডিয়ট, ওকে শীগ্‌গীরই তাড়িয়ে দেব ভাবছি।" ইনস্পেক্টরবাবু হেসে বললেন, "খুব সপ্রতিভ কিন্তু। কিসের তত্ত্ব খোকা?" রাধানাথ অকম্পিতকণ্ঠে বললে, "আজ্ঞে ফুলশয্যেরও হ'তে পারে, গায়েহলুদেরও হ'তে পারে।" অর্থাৎ লাগে তাক, না লাগে তুক।

সেই রাধানাথ এখন বড় হয়েছে, বুদ্ধিশুদ্ধি বেড়েছে কিছু। কিন্তু সপ্রতিভ ভাবটি ঠিক আছে। একবার সেই 'সপ্রতিভ'তার জন্যে কি নাকাল হয়েছিল সে, তারই গল্প শুনেছিলাম সেদিন তার কাছে। রাধানাথ গেছল কোন্নগরে, কলেজের এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে। বন্ধুর বাবা পাড়াগেঁয়ে গেরস্ত, দু'চারটে শাকসব্জী হয় তাঁর বাগানে। রাধানাথের কিন্তু খেতে বসেই পিত্তি জ্বলে গেল, চচ্চড়িতে একরাশ উচ্ছে দেখে। বন্ধুর বাবা সঙ্গে বসেছিলেন, বললেন "আমার ক্ষেতের উচ্ছে, খেয়ে দেখ হে, ভারি মিষ্টি।" মিষ্টি না ছাই! রাধানাথ একে উচ্ছে দেখতে পারে না, তাতে আবার বহুদিনের অনভ্যাসের দরুণই হোক আর যে জন্যই হোক এগুলো যেন আরও বেশী তেতো লাগছিল। কিন্তু সপ্রতিভ ছেলে সে, মনের ভাব মুখে প্রকাশ পেতে দিলে না কিছুতেই। বন্ধুর মা নিজে রেঁধেছিলেন, রান্না কি রকম হয়েছে জিজ্ঞেস করাতে রাধানাথ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলে। বললে "চমৎকার রান্না হয়েছে। সত্যি বলছি, এমন উচ্ছে চচ্চড়ি আমি জীবনে কখনও খাইনি" ইত্যাদি। কথাটা সত্যি, অবশ্য 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' গোছের সত্যি। উচ্ছের ওপর তার তীব্র বিরাগের কথা বাড়ির সকলেই জানত, সুতরাং উচ্ছে রান্না হলেও তার পাতে কেউ দিত না কোনও দিন। এদিকে বন্ধুর মা বড় লজ্জায় পড়লেন। তাঁর পরিবেশনের নিয়ম অনুসারে কেউ কোনও জিনিস ভালো লেগেছে বললেই সেটা তাকে আবার দিতে হয়। অথচ সেদিন বাড়ির কর্তাটি বাড়ির মিষ্টি উচ্ছেগুলি পেয়ে এমন হ্যাংলার মতো চেয়ে খেয়েছিলেন যে অতিথির জন্যে আর কিছুই বাকী ছিল না। বন্ধুর মা অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে রইলেন।

তারপর প্রায় বছরখানেক কেটে গেছে আরও। রাধানাথ

আবার গেছে সেই বন্ধুদের বাড়ি বেড়াতে। ফেরবার ট্রেন সাড়ে আটটায়। সন্ধ্যেবেলা বন্ধুর মা বললেন, "ভাত খেয়ে যাবে কিন্তু।" রাধানাথের ন'টার শো-এতে সিনেমা দেখতে যাবার কথা কলকাতার আর দুটি বন্ধুর সঙ্গে। কিন্তু কি করে? সপ্রতিভভাবে বললে, "নিশ্চয়, আপনার রান্না ছেড়ে যেতে পারি। তবে, আমার সাড়ে আটটার গাড়ীটা ধরা চাই-ই।" বন্ধুর মা বললেন, "সে হবে'খন।"

ছ'টা, সাতটা, সাড়ে সাতটা, আটটা, সওয়া আটটা! রাধানাথ ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে, তার বন্ধু বললে, "আজ তোমার এইখানেই রাত্রিবাস। উপায় নেই, মা ভোজের আয়োজন করছেন। না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বেন না।" রাধানাথ বললে, "আজ আমায় ফিরতেই হবে, তাড়া দে ভাই। যা হয়েছে তাই দিতে বল। পাঁচ মিনিটে খাওয়া সারতে পারলে এখনও ট্রেন পেতে পারি।"

কিন্তু কোনো উপায় হল না। আটটা সাঁইত্রিশ মিনিটের সময় বন্ধুর মা এসে বললেন, "তোমরা বসবে চলো বাবা। বড্ড দেরী হয়ে গেল।" রাধানাথ মুখে বললে, "না, না তাতে কি হয়েছে? রোজ তো আর আসা হচ্ছে না।" কিন্তু মনের মধ্যে সে তখন জ্বলে যাচ্ছে। অমন ফিল্মটা, অমন সঙ্গী, সব মাটি! কি করে? তাড়াতাড়ি গিয়ে খেতে বসল। সর্বনাশ! আজও সেই উচ্ছে! আর উচ্ছে বলে উচ্ছে? ডালে উচ্ছে, উচ্ছে বেগুন ভাতে, উচ্ছে দিয়ে আলু দিয়ে তরকারী, উচ্ছে ভাজা, উচ্ছের চচ্চড়ি! উচ্ছের অম্বল কিনা বোঝা গেল না, কারণ অম্বলের বাটিতে সে হাত দেয়নি। কোনও রকমে দুর্গানাম জপতে জপতে সে কয়েক গ্রাস ভাত সেই উচ্ছে ভাজা দিয়ে খেয়ে উঠতে যাচ্ছিল ট্রেন ফেল হওয়ার অজুহাতে, কিন্তু বন্ধুর মা কিছুতেই ছাড়লেন না। বললেন, "সে কি বাবা, না খেয়ে চলে যাবে কি? তুমি অত ভালোবাসো, অথচ বাগানে এখনও উচ্ছে ওঠেনি। তাই চাকরটাকে পাঠালাম বাজারে। তা পোড়া কোন্নগরের বাজারও কি তেমনি গা? বাজারে নাকি উচ্ছে নেই! কি আর করি, ও বাড়ির বিনুকে সাধ্যসাধনা করে আমাদের শ্রীনিবাসের সাইকেলটা দিয়ে শ্রীরামপুর পাঠালাম। সে উচ্ছে এনে দেয় তবে রাঁধি। বুঝতে পারছি বাবা, বড্ড দেরী হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি না খেয়ে গেলে আমাদের আর আফশোষের সীমা থাকবে না।"

ও হরি! সেদিন উচ্ছে চচ্চড়ির প্রশংসা করার এই ফল? রাধানাথ প্রাণভরে, অবশ্য মনে মনে, পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের বুদ্ধিকে গালাগালি দিতে দিতে পেট ভরে উচ্ছে খেলে। তারপর বন্ধুর সাইকেলের পিছনে বসে শ্রীরামপুর গিয়ে ট্রেন ধরলে, কোন্নগরে সে ট্রেনটা থামে না। রাত দশটায় কলকাতায় পৌঁছে বন্ধুদের বাড়ি গিয়ে শুনলে, তারা টিকিট কিনে রেখেছিল সকালের দিকেই, রাত্রে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল তার জন্যে। শেষে অন্য একটি সঙ্গী জুটে গেছে। রাধানাথকে তারা কথা না রাখার জন্যে যথেষ্ট লজ্জা দিয়েছিল পরে।

রাধানাথের সপ্রতিভ ভাবটা সেই থেকে যেন একটু কমেছে। সেদিন রাস্তায় দেখা হল, জিজ্ঞেস করলে, "কোথায় যাবি?" বললাম, "এলগিন লেন। কোনখানে নামলে সুবিধা হবে বলতে পারিস?" আগে হলে সে ঠিক বলত, "পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে, না হয় তো বলত গড়িয়াহাটা আর রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের জংসনে।" সেদিন কিন্তু সাফ বলে বসল, "বলতে পারলাম না ভাই, ওদিকে যাইনি কখনো।" আমি তো অবাক্!

শ্মশান কালী

(৬০ পৃষ্ঠার পর)

দাঁতে দাঁত চেপে দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বিড়বিড় করতে করতে সজোরে আঘাত করল মূর্তির মাথায়।

মাটির ঠাকুর ভেঙে মাটিতে পড়ে গেলো।

শব্দ শুনে ঝোপ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো কুকুরগুলো। সামনে এসেই হরিহরকে চিনতে পারল। কেউ লুটিয়ে পড়ল পায়ের গোড়ায়, কেউ চেষ্টা করে ঝাঁপ দিয়ে কোলে আসতে।

হরিহর তাদের কারও গায়ে হাত বোলায়, কাকেও কোলের মধ্যে চেপে ধরে। মুখে কিন্তু তখনও তার দুর্বোধ্য অস্ফুট ভাষা, হিংস্র দৃষ্টি নিবদ্ধ ভগ্ন মূর্তির ওপর।

হঠাৎ এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস এলো। নদীর জল উঠল কলকল করে -হয়ত জোয়ার এলো। ঝাউ আর শর গাছের ডগাগুলোও চলল নুয়ে নুয়ে শন্‌শন্ শব্দ করে। নিশাচর পাখী একটা উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে কর্কশ চীৎকার করে।

হরিহর শ্মশান ছেড়ে গঙ্গার তীর ধরে চলল আগিয়ে। কুকুরগুলো চলল তার সাথে সাথে হুটোপুটি করে।

বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন

শ্রীসতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, এম এস-সি

(৪)

মানব সভ্যতার ক্রমোন্নতির ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে, স্পষ্টভাবে প্রকট হইয়া পড়িবে যে, সভ্যতার বর্তিকা বহন করিয়া যাঁহারা মানব জাতিকে উন্নতির পথে লইয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অগণিত নয়। বার্নার্ড শ'র মতে গত ২৫ শত বৎসরের মধ্যে আমরা মাত্র এই প্রকার আটজন মনীষীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। ইঁহারা কাল ও যুগধর্মকে অস্বীকার করিয়া মানব জাতির সম্মুখে মহান্ সত্যের বাণী উপস্থিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ব্যক্তিগত প্রতিভা ও আত্মবিকাশের সাধনা ইঁহাদের মূলধন অবশ্যই স্বীকার্য। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও উপলব্ধি না করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে যে, বাহির হইতে আরোপ করা কোনও শক্তি ইঁহাদের সাধনার পথে বাধা সৃষ্টি করে নাই। জীবন ধারণ করিবার জন্য যে প্রকার মুক্ত হাওয়া বাতাস অপরিহার্য, মনের পরিপুষ্টি ও স্বাস্থ্যবান পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যও তদ্রূপ মুক্ত ও স্বাধীন আবহাওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। ব্যক্তিত্বের বিনাশ সাধন করিয়া মানুষকে একই মাপে যন্ত্রের পুতুল প্রস্তুত করিবার আয়োজন, অহমিকাদীপ্ত ডিক্টেটরী মনোবৃত্তির তৃপ্তিসাধন করিতে পারে, কিন্তু তাহা দ্বারা মানব জাতির কোন প্রকার উন্নতি সম্ভব নয়; পরন্তু ইহা মানবের অগ্রগতির অভিযানের পরম আপদ। আইনস্টাইনের ভাষায়ঃ

'Force always attracts men of low morality and I believe it to be an invariable rule that tyrants of genius are succeeded by scoundrels.'

ব্যক্তি-স্বাধীনতার এই একনিষ্ঠ ভক্ত দ্বিধাহীনকণ্ঠে ব্যক্তি-স্বাধীনতার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন এবং ডিক্টেটরী যূপকাষ্ঠে ইহার বলি প্রদানের বিরুদ্ধে তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাইয়া বলিয়াছেনঃ—

"Without freedom, there would have been no Shakespeare, no Goethe, Newton, Faraday, Pasteur or Lister. It is only men who are free who create inventions and intellectual works which to us moderns make worthwhile."

ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের ন্যায় দেশ-বৈশিষ্ট্যতাকেও আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। জার্মানির বৈশিষ্ট্য বীর পূজায়। অবশ্য বীর পূজা সব দেশে সব কালেই কম-বেশী দেখা গিয়াছে। কিন্তু জার্মানিতে ইহা সংক্রামক ব্যাধির মত। যখনই সে দেশের অধঃপতন ও মোহনিদ্রা আসিয়া দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তখনই তাহারা কোনও মানবকে অতি-মানব সৃষ্টি করিয়া পূজা-অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছে এবং এইভাবে তাহাদের সুপ্ত শক্তির বোধন ডাকিয়া আনিয়াছে। জার্মান প্রতিভা গণতন্ত্রের মধ্যে আনন্দ পায় না, যেমন পায় নেতায়। ১৯১৯ সালের ২৮শে মে ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। জার্মান জাতি এ অপমান ভুলিতে পারিল না; তাহারা তাহাদের পরাজয়ের কারণ নির্ণয়ে ব্যাপৃত রহিল। জার্মানির জাতিগত (Racial) অহমিকা দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহুদী-দলন পর্বের সূত্রপাত আরম্ভ হইল। এই সময় হিটলার জার্মানির কোনও হাসপাতালে অবস্থান করিতেছিলেন। গ্যাস আক্রমণে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। জার্মানির পরাজয়ের সংবাদে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। ১৯১৯ সালের গ্রীষ্মকালে হিটলার আরোগ্যলাভ করিয়া হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং বাহিরে আসিয়াই তাঁহার জাতিবিদ্বেষ আন্দোলন আরম্ভ করেন। হিটলার ভার্সাই সন্ধি, গণতন্ত্র, শান্তিবাদ ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে তীব্র অভিমত পোষণ করিতেন এবং এই মতবাদকে প্রকাশ ও কার্যকরী করিবার জন্য ১৯২০ সালে 'ন্যাশনাল সোসিয়ালিষ্ট লেবার পার্টি' প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাই ভবিষ্যতে 'নাজি' দল নামে অভিহিত হয়। হিটলারের এই ইহুদী-বিদ্বেষী আন্দোলনের ফলে আইনস্টাইনের শান্তির বিঘ্ন উপস্থিত হইতে থাকে; যে আইনস্টাইনকে সমগ্র জগতের মানুষ দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে, তাঁহাকেও অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হইতে হয়। হিটলারের ইহুদীবিরোধী আন্দোলনে ক্ষিপ্ত হইয়া জার্মানির যুবকগণ আইনস্টাইনের গৃহের সম্মুখে যাইয়া 'এই ইহুদীটাকে তাড়াইয়া দাও' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। শুধু আইনস্টাইন নহেন, সমগ্র ইহুদী জাতির উপর অত্যাচারের সীমা থাকে না। নির্জনতাপ্রিয় আইন-স্টাইন, বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক আইনস্টাইন, ভাবুক আইনস্টাইন



ভাবুক আইনস্টাইন

এই অত্যাচারের কাহিনীতে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। সমগ্র ইহুদী জাতির করুণ আবেদনে, মর্মান্তিক চীৎকারে সাধকের সাধনার আসন নড়িয়া উঠিল। তিনি ইহুদীদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—

"Yes, I am a Jew, and when the ancestors of the right honourable gentleman were brutal savages in an unknown island, mine were priests in the temple of Solomon."

প্রশ্ন উঠিতে পারে, আইনস্টাইনের ন্যায় মানুষও কি জাতি-গত অহমিকা বিস্মৃত হইতে পারেন না, জাতিকে ভুলিয়া কি জগতবাসীকে স্বগোত্র বলিয়া মনে করিতে পারেন না? পারেন এবং আইনস্টাইন বাস্তবিক পক্ষে তাহাই। কিন্তু স্বগোত্রীয়দের নির্যাতনের সময়ে মানবতার মিথ্যা ভণ্ডামির অন্তরালে আত্ম-বঞ্চনা ও আত্মগোপন করিবার বা অক্ষমতা লুকাইবার বুদ্ধি তাঁহার নাই। সেই জন্যই তিনি বলিয়াছেন,—

"If we did not have to live among intolerent, narrow minded and violent people, I should be the first to throw over all nationalism in favour of universal humanity."

মানবতার দিক হইতেই তিনি ইহুদীদিগকে হিটলারের নির্যাতনের হাত হইতে রক্ষা করা কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। জার্মানির বিখ্যাত ইহুদীদের এক ঘরোয়া সভা হয়। উক্ত সভায় বর্তমান অবস্থায় ইহুদীদের কর্তব্য কি, সেই সম্পর্কে আলোচনা হয়। আইনস্টাইন বিখ্যাত ইহুদী নেতাদের যুক্তিবত্তায় মুগ্ধ হইয়া সম্পূর্ণভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করেন।

এই সময় ডাঃ ওয়াল্টার রথেনু নামক জনৈক জার্মান ইহুদীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং এই পরিচয় পরে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ডাঃ রথেনু প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী ও বহু ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন, তাঁহাকে 'Wizard of the Empire' বলা হইত। রথেনু ধনিক ছিলেন বটে, কিন্তু মতবাদ ছিল সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক। তিনি বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় তুষ্ট ছিলেন না, ধনবণ্টন ব্যবস্থাকে আদর্শ বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, "the equalisation of property and income is prescribed both by ethics and economies." আইনস্টাইন রথেনু ও উইজিম্যান ইহুদী আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে ডাঃ রথেনুকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হয়। তাঁহার —পরিচালনায় জার্মানির আর্থিক দৈন্যের মোড় ঘুরিয়া যায়। তিনি ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের সহিত জার্মানির বন্ধুত্ব স্থাপনে প্রয়াসী হন এবং কতকটা কৃতকার্যও হন। ২৪শে জুন তারিখে মন্ত্রীভবনে ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশের রাজদূত ডাঃ রথেনুর সহিত জরুরী বিষয়ের আলোচনা করিবার অপেক্ষা করিতেছিলেন। ডাঃ রথেনু তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাড়ি হইতে রওনা হইয়াছিলেন। রাস্তায় আততায়ী কর্তৃক নিহত হন। এই হত্যার সংবাদে আইনস্টাইন বিচলিত হইয়া পড়িলেন। জার্মানিতে তখন ইহুদী-বিদ্বেষ কি প্রকার তীব্র ছিল, এই ঘটনা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ (জার্মানির বাহিরের) আইনস্টাইনকে জার্মান ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের দেশে যাইয়া থাকিতে অনুরোধ করিলেন। আইনস্টাইন তাহা গ্রহণ করিলেন না, ভাবিলেন, স্বদেশকে নাজিরাই মুক্ত করিতে পারিলেই আবার শান্তিতে বাস করা যাইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আইনস্টাইনের সে আশা বুঝি আর পূর্ণ হইবে না! ইতালির ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধেও তিনি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং নির্ভয়ে নিঃশঙ্কোচে ইতালির মন্ত্রীর নিকট মুসোলিনীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়া চিঠি লিখেন। তিনি বলেন, সিনর মুসোলিনীর সহিত বৈজ্ঞানিকদের মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, চিন্তার স্বাধীনতা, সত্যের সাধনা ব্যতীত মানব জাতির উন্নতি অসম্ভব। আজ পর্যন্ত আমরা যাহা কিছু করিতে পারিয়াছি, তাহা এই উভয়ের উপর ভিত্তি করিয়াই করিয়াছি। সুতরাং যে আন্দোলন স্বাধীন চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, তাহাকে শুভ আন্দোলন বলা চলে না। ইতালিতে যাহারা বুদ্ধিজীবী অন্তত তাহাদিগকে এই নির্যাতনের হাত হইতে অব্যাহতি না দিলে সমগ্র ইতালির তথা য়ুরোপের অকল্যাণ। অবশেষে তিনি ইতালি ও জার্মানির যুবকগণকে তাহাদের আদর্শবাদী সবুজ মন লইয়া ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে আহ্বান করেন।

আইনস্টাইনের খ্যাতি তখন জগত-বিখ্যাত। ইংরেজ ও ফরাসী জাতির মন তখন জার্মান-বিদ্বেষে পূর্ণ থাকিলেও, আইনস্টাইনের উপর তাহাদের শ্রদ্ধার অভাব নাই। ইংরেজ ও ফরাসী দেশ এই পরম পণ্ডিত 'সুইস্ জু'কে' অভ্যর্থনা করিবার জন্য ব্যাকুল। তাহাদের আমন্ত্রণ আইনস্টাইন প্রত্যাখ্যান করিলেন না; জার্মান জাতির আপত্তি সত্ত্বেও তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। লণ্ডনে কিং কলেজে যাইয়া তিনি প্রথম বক্তৃতা দেন। আইনস্টাইন বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। সভাকক্ষ নীরব। একজন শ্রোতাও উল্লাসধ্বনি করিল না। ধীরে ধীরে আইনস্টাইন তাঁহার বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে মানব জাতির সভ্যতার ইতিহাসে ইংরেজ জাতির দানের উল্লেখ করিলেন। উল্লেখ করিলেন, নিউটনের অসামান্য প্রতিভার কথা; উল্লেখ করিলেন. ইংরেজ জাতির উদারতার কথা। তিনি বলিলেন, তাঁহার বৈজ্ঞানিক সাফল্যে ইংরেজ জাতির দানের কথা—

"I express my personal thanks to my English colleagues for their work; for without it I could not hardly have lived to see the most important implications of my theory tested"

তিনি বিভিন্ন দেশের মধ্যে সৌহার্দ স্থাপনের আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করিলেন এবং যাহাতে জাতিগত বৈষম্য দূর হয়. তজ্জন্য করুণ আবেদন করিলেন। বলিলেন, যাহারা বুদ্ধিজীবী বলিয়া পরিচিত, তাহাদেরই ইহার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। জনতার বিরাগ, তাহাদের জার্মান-বিতৃষ্ণা উড়িয়া গেল, অন্তত মুহূর্তের জন্য তাহারা বিস্মৃত হইল বক্তার দেশ ও কালের কথা, মুহূর্তের জন্য ভুলিয়া গেল মহাযুদ্ধের কলঙ্কময় ইতিহাস ও ইহার ধ্বংস-যজ্ঞ। সমস্ত গৃহ ভরিয়া তুমুল আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। প্রমাণিত হইল, প্রতিভা কোনও দেশের সম্পদ নয়, ইহা সর্বদেশের, সমগ্র জগতের।

১৯২০ সালে তিনি প্যারিসে গমন করেন। প্যারিস বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁহাকে অনারারী ডক্টরেট্ ডিগ্রি প্রদান করে। ফরাসী জাতি তখনও যুদ্ধের আঘাত বিস্মৃত হয় নাই, তাহার সর্ব অঙ্গে তখনও ক্ষত চিহ্ন বিদ্যমান। ফরাসীর প্রকাশ্য রাস্তায় তখনও কেহ জার্মান ভাষায় কথা বলিতে সাহস করে না, এই প্রকার এক মুহূর্তে আইনস্টাইন ফ্রান্সে গমন করেন। আইনস্টাইন শান্তি, মানবতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার বাণী প্রচার করিলেন। তিনি বলিলেন,—যুদ্ধ মানব জাতির স্বাভাবিক ধর্ম নয়। ফরাসী জাতিকে সমগ্র জগতের নিকট এই বাণী প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত ত্যাগ করিতে হইবে। অস্ত্র ত্যাগ না করিলে, সৈন্যবৃত্তির নির্বাসন না ঘটাইলে, জগতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার উপাসক ফরাসী জাতি ইহার নেতৃত্ব না করিলে কে করিবে? স্বাধীনতার লীলাভূমি ফ্রান্স, সভ্যতার অগ্রদূত ফরাসী জাতিকে ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি জার্মান ও ফরাসী দেশের স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সালিশী বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করেন। জাতি ও দেশ সম্পর্কে মানুষের কর্তব্য কি, সমাজের নিকট ব্যক্তিগতভাবে মানুষ কতভাবে ঋণী, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন,—

"We owe our principal advantage over the beasts to the fact that we live in human society. The individual, if left alone from birth, would remain primitive and beastlike in his thoughts and feelings to a degree that we can hardly conceive. The individual is what he is, and has the significance that he has, not so much in the virtue of his individuality, but rather as a member of a great human society which directs his material and spiritual existence from the cradle to the

grave. A man's value to the community depends primarily on how far his feelings, thoughts and actions are directed towards promoting the good of his fellows."

আইনস্টাইনের এই সমস্ত বক্তৃতায় সুফল ফলিল। ফরাসীর প্রধান মন্ত্রী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া য়ুরোপের স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ফরাসী-জার্মানি মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। আইনস্টাইন চ্যান্সেলার স্ট্রেজিম্যানের মতামত জানাইয়া বলিলেন, আপনদের উভয়ের মতের মধ্যে অপূর্ব মিল রহিয়াছে। ইহার ফলে বিখ্যাত লোকার্নো প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হয়।

জাতিসংঘ (Leage of Nations) য়ুরোপে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি কমিশন গঠন করেন। আইনস্টাইন জার্মানির প্রতিনিধিরূপে ইহাতে যোগদান করেন। হলাণ্ডের পক্ষ হইতে লরেন্স প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ১৯২৮ সালে লরেন্স মারা যান এবং আইনস্টাইন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন।

আইনস্টাইনের রাজনৈতিক কার্যের জন্য একদিকে তাঁহার গুণমুগ্ধের সংখ্যা বর্ধিত হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শত্রুরও সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। মেরি ডিক্সন নাম্নী একটি আমেরিকান্ মহিলা তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য একদিন হঠাৎ তাঁহার গৃহে প্রবেশ করে। স্ত্রী এলসার বুদ্ধিমত্তার জন্য কোনও প্রকারে সে যাত্রা আইনস্টাইন্ রক্ষা পান।

বর্তমান যুগের বৈশিষ্ট্য এই যে, এ যুগে দার্শনিক তাঁহার দর্শন লইয়া ব্যস্ত, বৈজ্ঞানিক তাঁহার বিজ্ঞানের চিন্তায় বিভোর। সমাজের সহিত তাঁহাদের চিন্তাধারার সামঞ্জস্য সাধন সম্পর্কে তাঁহারা উদাসীন। লিবনিজ, কাণ্ট, স্পিনোজা প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, এই সমস্ত মনীষীদের যিনি নেতা, তিনি ইহার ব্যতিক্রম। আইনস্টাইন সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হইয়াও (লণ্ডনের ডেলি ক্রনিকেলের মতে world's greatest man) সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতি তাঁহার সজাগ দৃষ্টি রহিয়াছে এবং এই জন্যই পৃথিবীর সর্বত্র তাঁহার উদ্দেশ্যে অগণিত নরনারী এই প্রকার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া থাকে। তিনি বলেন,—

"It is plain that we exist for our fellow-men in the first place for those upon whose smiles and welfare all our happiness depends, and next for all these unknown to us personally but to whose destinies we are bound by the tie of sympathy."

আইনস্টাইনের চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ছোট বলিয়া, অপ্রসিদ্ধ বলিয়া কাহাকেও তিনি অবজ্ঞা করেন না। বার বছরের ছেলেকেও তিনি তাঁহার কঠিন আপেক্ষিক-তত্ত্ববাদ বুঝাইতে চাহেন। বিভিন্ন দেশ হইতে তাঁহার নিকট প্রত্যহ যে অসংখ্য চিঠিপত্র আসে, তাহার উত্তর দিবার জন্য একজন মহিলা সেক্রেটারী রহিয়াছেন। কত লোক এই মহিলার নিকট আসিয়া 'আপেক্ষিক-তত্ত্ববাদ কি' জানিতে চায়। অগত্যা একদিন মহিলাটি বৈজ্ঞানিককে ইহার উত্তর জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন, তাহাদিগকে বলিবে যে, একজন মানুষ একটি সুন্দরী যুবতীর নিকট এক ঘণ্টা বসিয়া থাকিলে এক মিনিটকাল বসিয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হইবে; কিন্তু সে যদি জ্বলন্ত চুল্লীর নিকট এক মিনিটকাল বসে, মনে হইবে এক ঘণ্টাকাল বসিয়া রহিয়াছে। ইহাই আপেক্ষিক-তত্ত্ববাদ; বলিয়াই বৈজ্ঞানিক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। শিশুর ন্যায় সরল সে হাসি। প্রতিভা বুঝি চিরকালই শিশু থাকিয়া যায়। চরিত্রের একটা দিক দেখিলে মনে হয়, ইঁহারা বুঝি বাস্তবিকই শিশু। মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা এই প্রকার শিশুর সারল্য দেখিয়া থাকি। যাঁহাদের চিন্তার সীমা নাই, যাঁহারা মানুষের অনতিক্রম্য রাজ্যেই অবস্থান করেন, তাঁহাদের এই সারল্য বাস্তবিকই বিস্ময়কর। তবে কি শিশুর সারল্য সেই রাজ্যেরই সম্পদ্! আর একটি গল্প বলিতেছি, একদিন একজন আমেরিকান্ চিত্রকর আসিয়া বৈজ্ঞানিকের ছবি আঁকিল। ছবি আঁকা শেষ হইয়াছে। চিত্রকর বিদায় গ্রহণ করিতেছে এবং করমর্দনও শেষ হইয়াছে. এমন সময় চিত্রকর জীবনে সাফল্য লাভের উপায় কি, জিজ্ঞাসা করিল। বৈজ্ঞানিক উত্তর করিলেন, ক যদি জীবনের সাফল্যলাভ হয়, তবে ক=চ+ছ+জ, চ=কাজ, ছ=খেলা; চিত্রকর বলিলেন, 'জ' কি? বৈজ্ঞানিক বলিলেন, চুপ করিয়া থাকা।



নৌকা ভ্রমণে আইনস্টাইন ও তাঁহার পত্নী এলসা

১৯২৯ সালে ১৪ই মার্চ তারিখে তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে বার্লিনে উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তিনি লুকাইয়া নিভৃত এক পল্লীতে যাইয়া অবস্থান করেন। আমোদ-উৎসব শেষ হইলে বার্লিনে প্রত্যাগমন করেন। যখন তিনি সেই পল্লীগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, একজন সংবাদপত্র প্রতিনিধি কি প্রকারে সেই স্থানে যাইয়া হাজির হন্। আইনস্টাইন জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি প্রকারে জানিলেন যে, আমি এখানে আছি? আপনার ঘ্রাণশক্তি বুঝি খুব প্রবল।

বার্লিনের উৎসব শেষ হইলে এক সপ্তাহ পর তিনি তাঁহার পল্লীর নির্জনাবাস ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে তাঁহার অগণিত ভক্ত ও গুণমুগ্ধ শিষ্যগণ তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করিয়া চিঠি বা তার প্রেরণ করিয়াছে। স্পেনের রাজা, জাপানের সম্রাট, আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট, বিখ্যাত পণ্ডিতগণ হইতে আরম্ভ করিয়া দীন দরিদ্রও তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষে উপহার পাঠাইয়াছেন। বেহালা, রুমাল, বই আরও কত কি! এক বন্ধু একটি

সেভিং সোপ পাঠাইয়াছিলেন। তিনি তাহা অনাবশ্যক বলিয়া অন্য কাহাকেও দিয়া দিয়াছেন। কেননা, তাঁহার মতে দাড়ি কাটিবার জন্য ভিন্ন কোনও সাবানের প্রয়োজন নাই। একজন দরিদ্র বেকার শ্রমিক তাঁহার জন্য এক বাক্স তাম্রকূট পাঠাইয়াছিলেন। তিনি ইহা সাদরে গ্রহণ করেন। এই শ্রমিক তাহার উপহারপত্রে লিখিয়াছিল যে,—

The gift was relatively small but it came from a good field

জাপানের নেতৃস্থানীয় বৈজ্ঞানিকদের আমন্ত্রণে তিনি ১৯২২ সালে জাপান যাত্রা করেন। প্রাচ্য ভ্রমণ এই তাঁহার প্রথম এবং শেষ কিনা বলা শক্ত। মার্সেলিজ হইতে জাপানী জাহাজে তিনি রওনা হন। কলম্বোতে তিনি প্রথম ভারতীয় হিন্দুর সাক্ষাৎলাভ করেন। অধ্যাপক আইনস্টাইন হিন্দুদের সম্পর্কে বলেন, 'nobles changed into beggers.' কথাটা ভাবিবার মত। সত্যই ত আমাদের কি ছিল না? আমাদের সভ্যতা ছিল, সংস্কৃতি ছিল, শক্তি ছিল, অর্থ ছিল। বর্তমানে আমাদের আছে কি? নিজস্ব যাহা কিছু ছিল হারাইয়াছি, পাশ্চাত্যের যাহা গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া ভাবি তাহাও গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমাদের নিজস্ব জিনিসের উপর শ্রদ্ধা নাই, পরের সহিতও খাপ খাওয়াইতে পারিতেছি না, গ্রহণ করিতে কোথায় যেন বাধিতেছে?, এতকাল যে মাটীতে দাঁড়াইয়াছিলাম, পায়ের নীচ হইতে তাহা সরিয়া গেল, নূতন মাটীতেও ভর করিতে পারিলাম না।

সিঙ্গাপুর হইয়া সাংহাইর পথে তিনি জাপানে যাইয়া উপস্থিত হন। বীর-পূজার (Hero-worship) দেশ জাপান। বৈজ্ঞানিককে মহাসমারোহের সহিত অভ্যর্থনা করা হইল, স্বয়ং রাজা ও রাণী যাইয়া নতজানু হইয়া তাঁহাদের অভিবাদন করিলেন। লক্ষ লক্ষ লোকের বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি অবতরণ করিলেন। রাজোচিত অভ্যর্থনা ও সমারোহের মধ্যে কয়েক দিন কাটাইয়া ও তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা করিয়া তিনি পুনরায় বার্লিনের পথে রওনা হইলেন। জাপানের প্যাগোডাসমূহ, জাপানের ফুল ও বাগান জাপানের ছোট ছোট পাহাড় ও হ্রদ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। জাপানের সর্বশ্রেণীর লোক তাঁহাকে নানা প্রকার জাপানী জিনিস প্রদান করিল। ছেলেরা দিল তাহাদের আঁকা ছবি পূর্ণ একখানা মোটা খাতা। আইনস্টাইন তাহাদিগকে বলিলেন যে,—তোমরা এখন যাহা কিছু শিখিতেছ তাহা তোমাদের পূর্বপুরুষদের দান। বিবিধ শ্রম স্বীকার করিয়া তাহারা যাহা শিখিয়াছেন তাহাই পুস্তকারে লিপিবদ্ধ আছে। তোমাদিগকেও মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারে নূতন কিছু দান করিয়া যাইতে হইবে। ভবিষ্যতে যাহারা আসিতেছে তাহাদের নিকট ইহাই হইবে তোমাদের কর্তব্য।

কলম্বো সিঙ্গাপুর, সাংহাই প্রভৃতি বৃহৎ শহর পরিদর্শন করিয়া তিনি এই সমস্ত শহরের দরিদ্র অধিবাসীদের অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। খ্যাতি ও যশ-এর মস্ত অসুবিধা এই যে তাহা মানুষকে স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিকভাবে জগতকে দেখিতে দেয় না। পদে পদে মানুষ কৃত্রিমতার সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীর প্রকৃত রূপ হইতে তাহাকে বঞ্চিত রাখিতে চেষ্টা করে। এই সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন। বিস্মিত হইলেন এই ভাবিয়া যে বিজ্ঞানের কল্যাণে যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের উৎপাদিকা শক্তি এত বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও দেশের জনসাধারণের মধ্যে এই প্রকার দারিদ্র্য কেন? কেন লক্ষ লক্ষ মানুষ এখনও অনাহারে থাকিবে? বেকার সমস্যাই বা কেন? পাপ, পুণ্য, সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য, সুখ ও দুঃখ, সমগ্র জাতির মধ্যে যেন মিশিয়া রহিয়াছে। প্রাসাদ ও পর্ণকুটির, রাজা ও ভিক্ষুক পাশাপাশি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইহার মধ্যে তিনি কোনও বিচার দেখিলেন না। ন্যায়-নিষ্ঠার কোনও পরিচয় তিনি পাইলেন না। বুঝিলেন মানুষ এখনও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে যথোপযুক্তভাবে প্রয়োগ করিতেছে না। মানুষের 'বুদ্ধি' যে প্রকার উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, মানুষের চিত্তের উদারতা ততটা সম্প্রসার করে নাই। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ধারাল অস্ত্রের সহিত তুলনা করিয়া বলা যায় যে, অস্ত্র দ্বারা আমরা কেবল মানুষ কাটিতেই শিখিয়াছি; ইহা দ্বারা যে বন্য পশুও হত্যা করা যায় তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। মানুষ তাহা পারে নাই বলিয়াই এখনও ধনী ও দরিদ্র পাশাপাশি বাস করিতেছে। সেইজন্যই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা এইপ্রকার যে যাহার ক্ষুধা নাই, সে ভূরি ভোজন করিতেছে এবং যে অনাহারী সে বাঁচিয়া থাকিবার মত আহার্যও পাইতেছে না। যন্ত্র সভ্যতা যে পরিমাণ উন্নত হইয়াছে, মানুষের সমাজ ব্যবস্থাও যদি তদ্রূপ উন্নত হইত, তাহা হইলে এই প্রকার হইত না। তিনি বলেন যে,—

"As it is in the hands of our generation these hard-own achievements are like a razor wielded by a child of three. The possession of marvellous means of production has brought care and hunger instead of freedom."

যাহারা বলেন যে, যন্ত্র সভ্যতা মানুষের দুর্গতির কারণ, তিনি তাহাদের সহিত একমত নন। তিনি বলেন যে, যন্ত্রসভ্যতার জন্য মানুষ কম সময় পরিশ্রম করিয়া তাহার যাহা প্রয়োজন তাহা পাইতে পারে, অবসর সময় মানুষ রুচি অনুযায়ী সভ্যতা ভাণ্ডারে দানোপযোগী কিছু সৃষ্টি করিবে। তিনি বর্তমান সমাজব্যবস্থার নিন্দা করেন এবং বলেন যে, ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকগণ মানুষের বর্তমান দুর্গতির কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া বলিবে যে,

"The childhood ailments of an aspiring humanity, due entirely to the excessive speed at which civilization was advancing." তিনি আরও বলেন, "An independent and honest man who, unburdened by class or national prejudices, desires nothing but the good of humanity and most harmonious possible scheme of human existence."

দুর্ভাগ্য মানুষের, আজও আমরা এই প্রকার কোনও scheme স্থাপন করিতে পারি নাই, আজও পৃথিবীতে দুস্থ অসহায় নরনারীর সংখ্যার শেষ নাই। শত বর্ষ পূর্বে যখন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বলিয়া কিছু ছিল না বলিলেই চলে, তখনও মানুষ যে অসহায় ছিল আজও তাহাই আছে। বরং দারিদ্র্য, দুঃখ বাড়িয়াছে। তিন দিন পরিশ্রমের পর মানুষ যখন এক গজ কাপড় বুনাইত তখনও মানুষ যে প্রকার অসহায় ছিল, আজ বিজ্ঞানের সাহায্যে এক ঘণ্টায় তাহা পারে বলিয়া তাহার সম্পদ বাড়ে নাই। কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কে?

বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন জাপান ভ্রমণ শেষ করিয়া বার্লিনে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর ১৯৩০ সালে তিনি ক্যালিফর্নিয়াতে International school of Advanced Scienceএর এক বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য আমেরিকায় গমন করেন। জাহাজে তাহার জন্য সুন্দর একখানা কামরা ঠিক করা হইল। আইনস্টাইন আপত্তি তুলিলেন, তিনি অত সুন্দর কেবিনে যাইবেন না। স্ত্রী এলসা বৈজ্ঞানিককে বুঝাইলেন যে, তিনি এখন ইহাতে না গেলে জাহাজের কর্মচারীরা ক্ষুন্ন হইবে। সুতরাং তিনি রাজি হইলেন। জাহাজে আরোহণ করিবার পূর্বেই জানাইয়া দিলেন যে, তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে আমেরিকা যাইতেছেন—ভ্রমণ উদ্দেশ্যে নহে। সুতরাং কোনও প্রকার ছবি তোলা বা বক্তৃতা দেওয়া হইবে না। কিন্তু নিউইয়র্কে যাইয়া দেখেন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা ছবি তুলিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

নিউইয়র্কে তিনি যে পাঁচ দিন ছিলেন, তাঁহাকে সমস্ত সময়ই কর্ম-ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—অধ্যাপক আইনস্টন! আপনি এক কথায় আপেক্ষিক তত্ত্ববাদ বুঝাইতে পারেন কি?

আপেক্ষিক তত্ত্ববাদের সংজ্ঞা সংক্ষেপে বুঝাইতেই আমার তিন দিন লাগিবে—বৈজ্ঞানিক উত্তর করিলেন।

আপনার সঙ্গে বেহালাটি আনিয়াছেন কি?—

না, এই দেশের উত্তাপে তাহা নষ্ট হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া আনি নাই।

ধর্ম জগতের শান্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিতে পারে বলিয়া আপনি মনে করেন কি?

এখন পর্যন্ত ধর্ম ইহা করিতে পারে নাই—ভবিষ্যতে পারিবে কিনা জানি না। কেননা আমি ভবিষ্যৎ বক্তা নই।

ফটোগ্রাফারদের হাত হইতে নিস্তার পাইবার কত চেষ্টা তিনি করিলেন। কিন্তু নিস্তার পাইবার উপায় নাই। আমেরিকা তাঁহার জন্য বিপুল অভ্যর্থনার আয়োজন করিল। তাঁহাকে শোভাযাত্রা সহকারে আমেরিকার অধিবাসীরা সাদর আহ্বান জানাইল। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে তিনি আমেরিকা হইতে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। আমেরিকাবাসীদের আন্তরিকতায়, সাদর সরল ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হন। তাঁহার একজন আমেরিকান গুণমুগ্ধ বন্ধু তাঁহাকে ৬ হাজার পাউন্ড মূল্যের একটি বেহালা দান করেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না—বলিলেন যে, A superb violin like this should be played only by a master. আমেরিকাবাসীদের আনন্দময় জীবন ও কর্মব্যস্ত জীবন দেখিয়া তিনি প্রীতিলাভ করেন। তিনি আরও বলেন,—

Added to this is the spirit of ambition which prevades your very being, and seems to make the day's work like a happy child at play

ইতিমধ্যে হিটলারের ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহুদী নির্যাতনও বাড়িয়া চলিল। আইনস্টাইন সাধ্যমত ইহার বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। তিনি পুন পুন শান্তি ও মানবতার বাণী উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। মদ-দীপ্ত জার্মানির সম্বিত ফিরাইবার জন্য আকুল আবেদন করিলেন। তিনি বলিলেন,—

"There is no higher religion than human service. To work for the common good of man is the greatest creed. We are all on this earth with the same mission of life."

ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক কাজের জন্য পুনরায় তিনি আমেরিকায় গমন করেন। তিনি যখন আমেরিকায় অবস্থান করিতেছেন, সংবাদ পাইলেন যে, জার্মান জাতি হিটলারকে ডিক্টেটর মনোনয়ন করিয়াছে। তিনি শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থির করিয়া ফেলিলেন যে, এই অবস্থায় তিনি আর জার্মানি ফিরিবেন না। শুনিলেন যে, নাজি সরকার এই ইহুদীর হত্যাকারীকে এক হাজার পাউণ্ড মূল্যের পুরস্কার দিবেন ঘোষণা করিয়াছেন। আইনস্টাইন Prussian Academy of Scienceএ Resignation letter প্রেরণ করিলেন। তিনি লিখিলেন যে, বর্তমান গভর্নমেণ্টের অধীনে থাকিয়া তাঁহার পক্ষে জার্মানিতে বাস করা নিরাপদ নয় বিবেচনা করিয়া তিনি পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিলেন। Academy ইহা গ্রহণ করিল। আইনস্টাইনের বিরুদ্ধে সরকারী-ভাবে প্রবল নিন্দা ও অভিযোগ উত্থাপন করা হইল। তাঁহাকে 'বিশ্বাসঘাতক' দেশদ্রোহী প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিতে লাগিল। নাজি সৈন্যবাহিনী বৈজ্ঞানিকের পল্লীকুটিরে যাইয়া হানা দিল। এবং খানাতল্লাস করিল। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল।

জার্মানি হইতে তিনি নির্বাসিত হইলেন বটে, কিন্তু অন্যান্য দেশ এই সাধককে সাদরে আমন্ত্রণ করিল। বর্তমানে তিনি আমেরিকায় অবস্থান করিতেছেন এবং তথাকার citizen হইয়াছেন।

সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসু সন্দিগ্ধ মনে প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, আইনস্টাইনের এই আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কারে তাহাদের প্রত্যক্ষ-ভাবে কি লাভ হইবে? বিশ্বজগতের যে চিত্র আইনস্টাইন অঙ্কিত করিলেন, যে রূপ তিনি প্রদান করিলেন, তাহাদের সহিত মানুষের সম্পর্ক কি? দৈনিক জীবনে ইহার সহিত যোগ কোথায়? জগতের সভ্যতা ভাণ্ডারে ইহার মূল্যই বা কতটুকু? ইহার উত্তরে শুধু এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, নিউটন সপ্তদশ শতকে বিশ্বজগতের যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই বর্তমান সভ্যতা বিংশ শতাব্দীর গৌরব স্তম্ভ রচিত হইয়াছে। বর্তমান সভ্যতার সহিত মানুষের সম্পর্ক কি, মানুষ এই সভ্যতার দান হিসাবে কি লাভ করিয়াছে তাহা বাহুল্য বোধে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। আইনস্টাইন যে জগৎ রচনা করিলেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই ভবিষ্যৎ সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে এবং উঠিতে বাধ্য।



মনে ছিল আশা

(উপন্যাস—অনুবৃত্তি)

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

(২৩)

পরের দিন সকালেই অমল কলিকাতা যাত্রা করিল। জ্যোৎস্না রবিবার দিনটা থাকিয়া যাইবার জন্য পীড়াপিড়ী করিল, ডাক্তারবাবুও যথেষ্ট অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে রাজী হইল না। ভয় তাহার জ্যোৎস্নাকেই, পাছে এখানে বেশীক্ষণ থাকিলে নেশা লাগে! জ্যোৎস্নার মোহ তাহাকে আচ্ছন্ন করিবার পূর্বেই সে চলিয়া যাইতে চায়।

ডাক্তারবাবু স্টেশনে তুলিয়া দিতে আসিয়াও বারবার বলিতে লাগিলেন, এমন গেরো হল যে, কাল রাত বারোটার আগে ছুটীই পেলুম না। না হল আপনার সঙ্গে আলাপ করা ভাল করে, আর না হল আপনার একটু ভাল রকম খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করা। ভারী অন্যায় হয়ে গেল।

অমল কহিল, আপনার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করা হল না, সে দুর্ভাগ্য আমারই। তবে আদর-যত্নের কোন ত্রুটী হওয়া যে সম্ভব নয় আপনার স্ত্রীর কাছে, সে-ত আপনিই ভাল জানেন!

ডাক্তারবাবুর মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, তা অবিশ্যি বটে। বলতে নেই, ওর আদর অভ্যর্থনায় ভুল ধরবে, এমন লোক এখনও জন্মায় নি।...তা যাই হোক মাষ্টার-মশাই, আপনি কিন্তু একেবারে ওকে ভুলে যাবেন না। বড্ড একলা থাকে, তবু আপনারা এলে দুদিন কাটে ভাল। বিশেষ করে আপনাকে ও বড্ডই শ্রদ্ধা করে। আপনার আঁক কষে দেওয়া, নাম লিখে দেওয়া খাতাগুলো এখনও বাক্সে আছে—

ট্রেন আসিয়া পড়িল। অমল ডাক্তারবাবুর হাত দুইটি ধরিয়া তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাইয়া ট্রেনে উঠিয়া পড়িল। তাহার পর ট্রেন ছাড়িয়া দিতে একটা জানলায় মাথা রাখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, খুব বাঁচিয়া গেলাম! জ্যোৎস্নার জীবন সুখী হউক, মহত্তর হউক, সার্থক হউক—আমার দ্বারা তাহার এমন সোনার সংসারের কোন অনিষ্ট না হয়। যে সুর সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে তাহাকে আর নূতন করিয়া জাগাইয়া লাভ নাই—

কিন্তু কলিকাতাতে আসিয়া দেখিল যে জ্যোৎস্না একটি বড় অনিষ্ট তাহার করিয়াছে, সে আর কোন কাজেই মন দিতে পারে না। অবাধ্য মনকে যতই শাসন করে, ততই কখন্ আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া জ্যোৎস্নার কাছে আসিয়াই উপস্থিত হয়। অফিসের খাতা খুলিয়া রাখিয়া অন্যমনস্ক হইয়া কী ভাবে, অন্য বাবুরা ঠাট্টা করেন। শেষে জোর করিয়া সে নিজের বিবাহের কথা ভাবে, পারুলকে চিন্তা করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন মনটা আড়ষ্ট হইয়া ওঠে। কমলার মত কি জ্যোৎস্নার মত করিয়া তাহার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই পারুল নানা কাজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একথাটা যেন কিছুতেই কল্পনা করা যায় না, কেমন যেন স্বপ্নভঙ্গ হয়। অবশেষে কোন এক সময়ে সে আশ্চর্য হইয়া লক্ষ্য করে, পারুলকে বাদ দিয়া সে সোজাসুজি কমলা বা জ্যোৎস্নাকেই স্বপ্ন দেখিতে শুরু করিয়াছে। ইহা পাপ, মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি-কর, ইহার মধ্যে ভবিষ্যৎ অশান্তির বীজ লুকান আছে—এই সব বলিয়া মধ্যে মধ্যে সে মনকে শাসন করিতে বসে, কিন্তু ফল হয় না—

মঙ্গলবার পর্যন্ত দেখিয়া সে অফিসে বসিয়াই ইন্দুকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিল, লিখিল, 'বিয়ের সমস্তই ঠিক, কিন্তু মনে যেন কোন উৎসাহ পাচ্ছি না। এখন বন্ধ করতে গেলেও কেলেঙ্কারী বাধবে। অথচ কী করি ভেবে পাচ্ছি না। আপনারা কি কোন রকমেই আসতে পারেন না? আপনারা এলে তবু একটু বল পাই।'

জবাব আসিল বৃহস্পতিবার দিনই। চিঠির উত্তর ইন্দু দেয় নাই, দিয়াছে কমলা! সে লিখিয়াছে—

'উনি আমাকেই জবাব দিতে বললেন। বললেন, এ ব্যাপার নাকি আমারই বেশী বোঝা উচিত। ...আপনি কেন মিছামিছি ভয় পাচ্ছেন? আপনাকে যে পাবে, তার ত জন্ম জন্মান্তরের সৌভাগ্য—সে কি তা বুঝবে না বলতে চান? আর সে ত বুঝলেই আপনাকে সুখী করার জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করবে। এই চেষ্টাই যে মেয়ে মানুষের সব কিছু সুখ-শান্তি। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, সে আপনাকে শান্তি দিতে পারবে নিশ্চয়ই।

যাওয়ার কথা যা লিখেছেন, এখন ত কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না। বিভাসবাবুর ভয়ানক অসুখ, তিনি ইস্কুলের ভার আপনার এই দুই বন্ধুর হাতে তুলে দিয়েছেন—এক্ষেত্রে যাওয়া মুস্কিল। তবে যদি কোন মতে যাওয়া সম্ভব হয় শেষ পর্যন্ত বৌভাতের দিনও গিয়ে উপস্থিত হবো, এ আপনি নিশ্চয় জানবেন। কিচ্ছু ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

চিঠিখানা পাইয়া ভরসা কিছু পাইল না সত্য কথা, কিন্তু তবু যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হইল।

অফিসে কিছু জানাইবে কিনা, ক'দিন ধরিয়াই ভাবিতে-ছিল শেষে ভাবিয়া দেখিল যে পরে অন্য লোকের মুখে শোনা অপেক্ষা আগে তাহার মুখে শোনাই শ্রেয়। সে সেই দিনই ছুটির পর বড়বাবুর টেবিলের কাছে গিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। বড়বাবু মুখ তুলিয়া কহিলেন, কি বাবা অমল?

ইদানীং তিনি তাহার সঙ্গে খুব স্নেহের সুরেই কথা কহিতেন। অমল মাথাটা একটু চুলকাইয়া লইয়া কহিল, আপনার কাছে একটা অনুমতি নেবার আছে—

তিনি জিজ্ঞাসু নেত্রে চহিয়া রহিলেন। অমল প্রায় মরিয়া হইয়াই বলিতে শুরু করিল, এবার ছুটি নিয়ে বাড়ী গেলে বাবা আমাকে বিয়ে করবার জন্য বড্ড ধরে পড়েছেন। আমি অবিশ্যি কিছুতেই রাজী হইনি, কিন্তু তাঁদেরও যে খুব কষ্ট হচ্ছে এ-ও সত্য কথা। বাবা একেবারেই অথর্ব হয়ে পড়েছেন, চোখে দেখতে পান না; ভাই-বোনরাও খুব

ছোট। সংসারে লোকের অভাব খুবই—। তার ওপর বাবা বলছেন যে, যে মেয়েটি তিনি দেখেছেন তাকে আমি বিয়ে করলে তার ভায়ের সঙ্গে আমার এক বোনেরও বিয়ে দেওয়া চলতে পারে।

সে চুপ করিয়া গেল। বড়বাবু কতকটা শুষ্কস্বরেই কহিলেন, তা আমার কাছে কিসের অনুমতি?

তাঁহার সে কণ্ঠস্বরে অমল দস্তুর মত ভয় পাইয়া গেল। তবু, কোনমতে সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল, আমার আর মাথার ওপর কে আছে বলুন, আপনারা একটু স্নেহ করেন, আপনারা ছাড়া উপদেশই বলুন আর পরামর্শই বলুন আর কে দিতে পারে?

অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বড়বাবু জবাব দিলেন, তা বটে! তাহার পরই কিন্তু যেন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, ভাগ্যিস্ কলেজে বেশী লেখাপড়া করোনি, তাই আমাদের কাছে পরামর্শ চাওয়ার যে দরকার আছে একথাটা মানলে! কিন্তু ঐ সব গ্র্যাজুয়েট ছোক্‌রাবাবুরা যদি একথা শুনতে পায় ত তোমার গায়ে ধুলো দেবে। ওরা বলে, 'বড়বাবু আছে বড়বাবু আছে, অফিসেই আছে, বাড়ির কথায় কি?' একেবারে ডোণ্ট কেয়ার—বুঝলে না! ঐ যে নকুল, বোশেখ মাসে বিয়ে করলে তা আমাদের জানালে না পর্যন্ত! অফিসের বন্ধুবান্ধবদের পরে একদিন খাওয়ালে তাও আমাকে একবার বলা দরকার বিবেচনা করলে না!...তা তুমিও ইতস্তত করো না, বুঝলে? এ মাসে আর বিয়ের দিন কৈ?

অমল কহিল, এই আসছে রবিবার শেষ দিন—

বড়বাবু যেন লাফাইয়া উঠিলেন, আর তুমি এখনও এখানে? যাও যাও, আজই বাড়ি চলে যাও, আমি কাল থেকেই এক হপ্তার ছুটী দিলুম তোমাকে। গিয়ে সব ঠিক-ঠাক করে ফেলগে। অত ভাবলে কি চলে? পুরুষস্য ভাগ্যম্—তা ছাড়া তোমার স্ত্রীও-ত একটা বরাত নিয়ে আসবে গো?

অমল কহিল, কিন্তু মাইনে যে পাই মোটে তিরিশটি টাকা, বড্ডই ভয় করে—

বড়বাবু কহিলেন, পনের টাকা! বুঝলে ,আমি যখন বিয়ে করেছি তখন পনের টাকা মাইনে পাই আমি। তাতে কি? ওসব ঠিক হয়ে যাবে—। বরং এক কাজ করো না কেন, তোমার ত বিকেলে সময় থাকে, আমার ছোট দুটো ছেলে-মেয়েকে, আর নাতিটাকে পড়াও না কেন? অবিশ্যি বেশী দিতে পারব না বটে—

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া অমল কহিল, আপনার ছেলে-মেয়েকে পড়াবো তার জন্যে টাকা নেবো?...নানা ও কথা বলবেন না, আমি যাব নিশ্চয়ই—

কৃত্রিম ধমক দিয়া বড়বাবু কহিলেন, তুমি থাম হে ছোকরা, জ্যাঠামি করতে হবে না।...টাকা, আমি পুরোনো মাস্টারকে দু'টাকা দিতুম, তা তোমাকে না হয় পুরোপুরি আট টাকা করেই দেবো।...তোমার খরচ যা বাড়বে তার ব্যবস্থা করে দিলুম, আর কি? তা ছাড়া, সুবিধে পেলেই আমি ওদিকের ব্যবস্থাও করে দেবো এখন—। তুমি এখন যাও, আজই যাতে রাত্তিরের গাড়ীতে যেতে পারো, তার ব্যবস্থা করোগে, ছুটির একটা দরখাস্ত দিয়ে যেও, আর কিছু ভাবতে হবে না।

অমল হেঁট হইয়া একেবারে তাঁহার পদধূলি লইল। তিনি 'থাক্ থাক হয়েছে, করকি ছোকরা', বলিয়া যথারীতি বাধা দিলেন, তাহার পর মনিব্যাগ হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিলেন, যাবার সময় বৌমার জন্যে একটা রুপোর সিঁদুর কৌটো কিনে নিয়ে যেও, বুঝলে। নাও, নাও, আমার কথা অমান্য করতে নেই—

সেখান হইতে দেবেশবাবুর টেবিলে তাঁহাকেও চুপি চুপি কথাটা জানাইল, সঙ্গে সঙ্গে অপরকে জানাইতে বারণ করিয়া দিল। দেবেশবাবুর ছোট ছোট চোখ দুইটি উজ্বল হইয়া উঠিল, থাবার মত তাঁহার ডান হাতখানা দিয়া প্রবল এক ঝাঁকুনি দিয়া কহিলেন, ভালই হল মাস্টার, ঘুরেত ঢের দিন বেড়ালে, এইবার সংসারী হওগে। আর বড়বাবুর সুনজরে যখন পড়েছ তখন আর চিন্তা কি, মাইনে বাড়তে বেশী দেরী হবে না।

তাহার পরই তিনি তাহাকে বসাইয়া চট্ করিয়া পাশের টেবিলে চলিয়া গেলেন, সেখানে এক বাবুর কাছ হইতে দুইটা টাকা ধার করিয়া আনিয়া তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিলেন, তোমার জন্যে একখানা ধোয়া কাপড় কিনে নিও, আইবুড়ো ভাতের কাপড়! যেতে আমি পারব না, শালা ছোট সাহেবের স্টেটমেণ্ট তৈরী হয়নি এখনও, একটি বেলার ছুটি দেবে না। মোদ্দা, কাপড়টা কিনে নিও মাস্টার ঠিক, নইলে মনে বড় দুঃখ করব।

২৪

দুই একটা খুচরা বাজার সারিয়া লইয়া পরের দিন সকালের গাড়ীতেই অমল দেশে গেল। আয়োজন সামান্য, সুতরাং হৈ চৈ বিশেষ কিছু নাই। তবু দূর সম্পর্কের দুই একজন আত্মীয় ইতিমধ্যেই আসিয়া হাজির হইয়াছেন বলিয়া অধিক দিন পরে বাড়ি যেন একটু সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মায়ের যাহা কিছু ছিল সব বিক্রয় করিয়া বোনের দুইটি অলঙ্কার তৈয়ারী হইয়াছে, গৃহের সামান্য সংস্কার হইয়াছে এবং এই সব খরচ চলিতেছে। হরনাথবাবু চুপি চুপি শুনাইয়া দিয়াছেন যে পুটির বিবাহের ও তাহার বৌভাতের দিনের খাওয়ার খরচা খুব কম করিয়া সারিলেও একশ' টাকা পড়িবে এবং সেই টাকাটা বোধ হয় ধার করিতে হইবে। তাঁহার পুরাতন মনিব অর্থাৎ ইস্কুলের সেক্রেটারী ও গ্রামের জমিদার কিছু দিবেন বলিয়াছেন, কিন্তু সে যে কত তাহা এখনও জানা যায় নাই। মেজ ভাই যেখানে কাজ করে সেই সরকার বাবুরাও বোধ হয় গোটা দশেক টাকা দিবেন আশা করা যাইতেছে। বাকী যাহা লাগিবে তাও তাঁহারাই ধার দিবেন, মাহিনা হইতে মাসে মাসে কাটা যাইবে।

প্রায় ভিক্ষা করিয়াই বিবাহ করা! অপমানে অমলের কান-মাথা আগুন হইয়া ওঠে, কিন্তু নীরবেই তাহা পরিপাক্ করে, উপায় কি?......

আর একটি দিন আছে মাত্র, কিন্তু তবু কে জানে কেন মনে উৎসাহ আসে না। সে নির্জনে ঘুরিয়া বেড়ায়, বাগানে বা মাঠে। কোন কাজেই যোগ দিতে পারে না। সধবা স্ত্রীলোক দরকার বলিয়া এক পিসতুতো বোনকে আনা হইয়াছে, সে ঠাট্টা করিয়া বলে, কী দাদা, সুন্দরী বউ আসবে বলে কি এখন থেকেই আমাদের ত্যাগ করলে ?

অমল হাসিবার চেষ্টা করে, কিন্তু না ফোটে হাসি, আর না দিতে পারে জবাব। তাড়াতাড়ি বাগানে গিয়া একটা আম-গাছের তলায় মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়ে।

দুপুর বেলা নাগাদ মেজ ভাই আসিয়া কাছে বসিল। কহিল, দাদা, বাবা বলছিলেন যে, 'ওর কি মেয়ে পছন্দ হয় নি? সবাই ত বলছে সুন্দর মেয়ে তবে ও অমন ভাবে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন ?'

অমল তাড়াতাড়ি জবাব দিল, না, না সে সব কিছু নয়। একে খরচা বাড়ল, তায় ধার দেনা হ'ল—কত রকম ভাবনা হয় বোঝ ত !

সেও ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, তা বটে। আমার মাইনেতে ত এখন পাঁচ-ছ মাস হাত দেওয়াই যাবে না।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া অমল কহিল, তুই এদের চিনতিস্ ভাল ক'রে ? বিমল জবাব দিল, কাদের ? বৌদি'দের ?

অমল ঘাড় নাড়িল। বিমল কহিল, চিনতুম বৈকি ! ওদের বাড়িতে আমি কতবার গেছি, পুঁটির বর হবে যে শান্তি-পদ, ওর কাছে পড়া বলে নিতে যেতুম আগে।......বৌদি বেশ সুন্দরই হবে দাদা, তুমি কিছু ভেবো না !

লজ্জায় অমল লাল হইয়া উঠিল। কহিল, দূর ! সে কথা কে জিগ্‌গেস করছে। কেমন কুটুম্ব হবে তাই ভাব-ছিলুম। ওরা লোক কেমন ?

বিমল অত বোধ হয় কোন দিন ভাবিয়া দেখে নাই। সে খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, লোক ভালই হবে, খারাপ হবে কেন ?

অমল আর কথা কহিল না। খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বিমলও উঠিয়া গেল। থাক্—মেয়ে তা হ'লে খুব সুন্দরী না হইলেও ভালই দেখিতে ! নিজের দেখার অপেক্ষা এ সব ব্যাপারে বাহিরের লোকের কথাতেই যেন ভরসা পাওয়া যায় বেশী। যত দুঃখের আঘাতই পাক্ তবু অমলের বয়স কাঁচা, সুন্দরী বধূ আসিতেছে একথা বার বার শুনিলে, এ বয়সে যে কোন অবস্থাতেই লোভে মন দুলিয়া ওঠে। তাহারও মন দুলিয়া কাঁপিয়া উঠিল। অনেকদিন আগে পারুলকে দেখিয়াছে, তাও ভাল করিয়া চাহিতে পারে নাই, সুতরাং চেহারাটার স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে, তবু যতটা মনে পড়ে তাহারই উপর নির্ভর করিয়া কল্পনায় একটা মূর্তি গড়িয়া লইল।

এতক্ষণে তাহার বিবাহের নেশা লাগিয়াছে। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। অপরাহ্ণ বেলায় মাইল-দুই মাঠ পার হইয়া ক্ষীণকায়া নদীর ধারে উপস্থিত হইল এবং সেখানে বহু রাত্রি পর্যন্ত নির্জনে বসিয়া ভাবিতে লাগিল পারুলের কথা।......পারুলও হয়ত তাহার কথা ভাবিতেছে, তাহাকে সেও কি একবার চুরি করিয়া দেখিয়া লয় নাই ? কে জানে পছন্দ হইয়াছে কি না ! তবে ছেলে বেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছে যে চেহারাটা তাহার মন্দ নয়, বরং অনেকে ভালই বলিয়াছে। হয়ত পারুলের অপছন্দ হয় নাই, হয়ত বা সেও বিবাহ বাড়ির সহস্র গোলযোগের মধ্যে সখী ও আত্মীয়দের অজস্র হাস্য পরিহাসের অবসরে অমলের কথাই ভাবিতেছে, ভাবিতেছে হয়ত যে অমলের ঠিক কতটা পছন্দ হইল !

অমল আপন মনেই হাসিয়া উঠিল। দু'টি সর্বাধিক নিকট লোকের এই একই দুশ্চিন্তা—মজা মন্দ নয়।......

......তাহার মনে পড়িল ইন্দুর ফুলশয্যার পরের রাত্রির কথাটা। এমনিই হয়, দুটি লোকেরই পরস্পরকে ভালবাসি-বার ইচ্ছা, সর্বস্ব অর্পণ করার ইচ্ছা, অথচ কি দুর্নিবার লজ্জা। সে কল্পনা করিতে লাগিল পারুলও অমনি লজ্জায় জড়ো-সড়ো হইয়া শয্যার এক পাশে বসিয়া আছে ঘাড় গুঁজিয়া আর সে সাধ্য সাধনা করিতেছে কথা কওয়াইবার জন্য। সুন্দর ললাটের চন্দনবিন্দুগুলি স্বেদবিন্দুর সহিত মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হইতে বসিয়াছে, তাহার হাতের মুঠার মধ্যে নরম ফুলের মত স্বেদসিক্ত হাত দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, মুখে সলজ্জ হাসি একটুখানি, চোখ দুইটি নত। সেই দীর্ঘ পক্ষ্মের মধ্য হইতে এক একবার অপাঙ্গে চাহিয়া লইতেছে বটে, কথা কহিবারও ইচ্ছা কিন্তু মুখে কিছুতেই কথা ফুটি-তেছে না। হয়ত বা এই ভাবেই ফুলশয্যার সেই অবশিষ্ট সামান্য রাত্রিটুকু কাটিয়া যাইবে, পারুলের কথা কওয়াই হইবে না।

কিন্তু তা না হউক, তাহাতে অমলের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই—সেই সাধনাতেই তাহার বুক ভরিয়া যাইবে। বহুদিনের তৃষাতুর বক্ষ তাহার খুঁজিয়া পাইবে অমৃত।

অমল উত্তেজনায় স্থির থাকিতে পারিল না। উঠিয়া নদীর ধারে পায়চারি করিতে লাগিল। পরের দিনও আবার তেমনি সাধ্য সাধনা করিতে হইবে, সেদিন কথা ফুটিবে, কিন্তু সে সামান্য দুই-একটা। তবু তাহাতেই রাত্রি ভোর হইয়া যাইবে, নিদ্রার অবকাশ মিলিবে না; পরের দিন আত্মীয়রা আরক্ত চক্ষু ও নেত্রকোণের কালিমা দেখিয়া উপহাস করিবেন। সেই উপহাস, আর তাহারই ফাঁকে ফাঁকে চুরি করিয়া চাওয়া, ছল করিয়া দুই জোড়া চোখের দৃষ্টি বিনিময়—এ ক'দিনের এইটুকু গোপন মধুই তাহাদের অবশিষ্ট জীবনের পাথেয় হইয়া থাকিবে।

এইটুকু সম্বল করিয়াই ইন্দু আর কমলা সেই সুদূর পল্লীগ্রামে অতি সামান্য আয়েই কি সুখের সংসার পাতিয়া বসে নাই ? নাই বা রহিল ভবিষ্যতের আশা এবং বর্তমানের স্বাচ্ছন্দ্য—ঐ অমৃতই তাহাদের অজেয় ও অমর করিয়া তুলিবে, ভুলাইয়া দিবে এ জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা!

(আগামীবারে সমাপ্য)

রঙ্গজগৎ

'এককালে বাঙলা ছিল রূপকথার দেশ। আজকাল বাঙলা হচ্চে মৃত্যুকথার দেশ। আজকালকার বাঙালী আর রূপকথা ভালবাসে না; ভালবাসে মৃত্যুকথা।'

উক্তিটি আমার এক শিখ বন্ধুর। যুক্তি দেখাতে গিয়ে বন্ধুটি বল্‌তে চান—'বাঙলার বায়োস্কোপের ছবিগুলিই তার প্রমাণ। তাদের দৃশ্যে দৃশ্যে মৃত্যু ও কান্নার কলরোল।



ওয়াদিয়া মুভিটোনের 'রাজনর্তকী' চিত্রে সাধনা বসু। ছবিখানি মার্চ মাসে কলিতাকায় প্রদর্শিত হইবে

বাঙালী সাহিত্যিক ও পরিচালকরা উঠে পড়ে লেগেছেন—প্রতি ছবিতে কতগুলো করে মৃত্যু কত রকমে দেখাতে পারেন। বাঙলার দর্শকরাও কে বড় পরিচালক তা' বিচার করেন—মৃত্যুকথা দেখাবার কারসাজী কার সবচেয়ে বেশী তা' দিয়ে।'

'এজন্যই শ্রীযুক্ত বড়ুয়া সবচেয়ে বড় পরিচালক বলে গণিত হচ্চেন। ছবিতে মৃত্যুর সংখ্যা দেখাতে ও নূতন নূতন মৃত্যুর তরিখা বাংলাতে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি নিজেও ছবিতে নানাভাবে মরতে জানেন।'

বন্ধুটি একজন নামজাদা সৈনিক। একটা মিলিটারী ডিভিশনের পরিচালক। বহু দেশে বহু রকমের মৃত্যু তিনি দেখেছেন। বহু মৃত্যু তিনি ঘটিয়েছেন। পরিচালক বড়ুয়ার তিনি একজন বড় সমজ্‌দার। কোলকাতায় তিনি এসেছিলেন—বড়ুয়া সাহেবের সাথে দেখা করে তাঁকে একটা বিশেষ অনুরোধ করবার জন্য। কিন্তু হঠাৎ লিবিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র হতে ডাক আসায়, তাঁকে তাঁর ডিভিশন পরিচালনা করতে সাগর পাড়ি দিতে হয়েচে।

কুমার বাহাদুরের সাথে দেখা হল না বলে তিনি একখানা চিরকুটে তার অনুরোধটা লিখে ডাকে দিয়েছেন; যার মর্মার্থ হচ্ছে—

রাজকুমার বড়ুয়ার কাছ হতে তিনি এবার এমন একখানা ছবি দেখ্‌তে চান; যাতে মৃত্যুর একটা অভিনব তরিখা দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। যাতে নায়কের মৃত্যু ঘটবে—লজ্জায়। তাঁর

দৃঢ় বিশ্বাস মৃত্যুকথা-প্রিয় বাঙালী 'দর্শক সে ছবির তারিফ করবেই। সে মৃত্যুগাথা মরমিয়া বাঙালী মরম দিয়ে কীর্তনে গাইবে—

'লাজেতে মরিয়া গেল।
আহা—কি তার মরমে ছিল—সখিগো।'



বম্বে টকিজের 'পুনর্মিলন' চিত্রে স্নেহপ্রভা। ছবিটি শীঘ্রই 'জ্যোতি' সিনেমায় মুক্তিলাভ করিবে

আর সে ছবির নায়ক হবেন—কুমার বাহাদুর স্বয়ং।

বাঙলা দেবদাসে গাওয়া বড়ুয়া সাহেবের সেই মরমীয়া কীর্তনের লাইনটি গাইতে গাইতেই আমাদের সৈনিক বন্ধুটি মৃত্যুমহোৎসবের প্রাঙ্গণ অভিমুখে রওনা হয়ে গিয়েছেন।

* * * *

শ্রীযুক্ত বিনায়ক—বোম্বের জয়ঢাক পেটানো চিত্র পরিচালক, প্রযোজক ও অভিনেতা। রূপবাণী কাগজের প্রতিনিধির নিকট আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলছেন—

"To me purposeless comedies means nothing. Even for a comedy, a realistic, and authentic back ground is essential; and against such back ground and themes of social significance the comedy situations must be set. Those who have seen the comedies of Laurel and Hardy or Ritz Brothers on one hand and those of Charlie Chaplin and Frank Capra on the other, and have noticed the differance between these two varieties will easily understand my point. *My object of course is the same as that of Chaplin.*

হাঁ—চার্লির Object ও শ্রীযুক্ত বিনায়কের Object এক।—একাধারে পরিচালক, প্রয়োজক ও অভিনেতা হওয়া। কেবল একটা Object চার্লির নেই। সে পারেও না।—আত্মম্ভরিতায় ভরা ধৃষ্টতাব্যঞ্জক এরকম উক্তি একমাত্র 'ঘর-কি-রাণী'র পরিচালকই করতে পারে। কাজেই আমাদের মতে চার্লির চেয়েও বিনায়ক বড়।

'ঘর-কি-রাণী' দেখেছেন কি? দেখেননি!!—দেখবেন। গোপাল ভাঁড় ফুরসুৎ পেলেই দেখতে আসবেন। রমাই ভাঁড় সাত সাতবার করে দেখেছেন। Frank Capra রীতিমত ঘেবড়ে গেছেন। চার্লিকে বলা হয়েছে ছবিখানার ইংরাজী করতে। এত উঁচুদরের কমেডি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে তিনি অত্যন্ত ভয় পাচ্ছেন।

—দুরবীণ

খেলাধুলা

বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টস

বাঙলার শ্রেষ্ঠ এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টস সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। বাঙলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১৫০শত এ্যাথলীট এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। নবাগত তরুণ এ্যাথলীট কে সিংহ এই প্রতিযোগিতার ১৫০০ মিটার দৌড়, ১০০০০ মিটার দৌড়, ৫০০০ মিটার দৌড় ও ৩০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করায় সর্বাধিক পয়েণ্ট লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠ এ্যাথলীটের পুরস্কার লাভ করিয়াছে। আই এ ক্যাম্পে এ্যাথলিটগণ বিভিন্ন বিভাগে সাফল্য লাভ করিয়া সর্বাধিক পয়েণ্ট সংগ্রহ করিয়া দলগত চ্যাম্পিয়ানসিপ পাইয়াছে। শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা হিসাবে এই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগের ফলাফল যেরূপ উচ্চাঙ্গের হওয়া উচিত ছিল সেইরূপ হয় নাই। ইতিপূর্বে যে সকল স্পোর্টস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার অনুরূপই ফলাফল প্রদর্শন করিয়াছে বলিলে অন্যায় হইবে না। বাঙলাদেশের এ্যাথলিটগণ যে ক্রমশই অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছে এই প্রতিযোগিতা তাহারই প্রমাণ দিয়াছে। গত বৎসরের ফলাফল এইরূপই নৈরাশ্যজনক হইয়াছিল। তখন মনে হইয়াছিল হয়ত বা পরবর্তী বৎসরে উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবে। কিন্তু তাহা হইল না। অদূর ভবিষ্যতে যে উন্নতি করিবে তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। ইহা প্রকৃতই পরিতাপের বিষয়।

এম ফেরনের কৃতিত্ব

তরুণ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এ্যাথলীট এম ফেরন ইতিপূর্বের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যেরূপ ফলাফল প্রদর্শন করিয়াছিল বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছে। নিয়মিত অনুশীলন যে সে করিয়া থাকে তাহার পরিচয় সে দিয়াছে। শীঘ্রই সে যে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ এ্যাথলীট হইবে ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। এই তরুণ এ্যাথলীটের বর্তমান বয়স মাত্র ১৯ বৎসর। সে এই বৎসরে যতগুলি বিষয় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছে, তাহার সবগুলিতেই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। সে সেণ্ট জোসেফ কলেজের একজন ছাত্র। বর্তমান বৎসরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

সিটি এ্যাথলেটিক স্পোর্টস ঃ—১০০ মিটার, ২০০ মিটার ও ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে।

মোহনবাগান স্পোর্টস ঃ—১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

বেঙ্গল এ্যাথলেটিক স্পোর্টস ঃ—১০০ মিটার দৌড় ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে।

কালীঘাট স্পোর্টস ঃ—১০০ মিটার, ২০০ মিটার ও ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টস ঃ—১০০ মিটার, ২০০ মিটার ও ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

মাদ্রাজ ক্রিকেট দলের সাফল্য

মাদ্রাজ ক্রিকেট দল রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সেমিফাইন্যাল খেলায় যুক্তপ্রদেশ দলকে মাত্র ২৫ রাণে পরাজিত করিয়াছিল। খেলাটি তীব্র প্রতিযোগিতামূলক হইয়াছিল। খেলার প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ দিন পর্যন্ত কোন্ দল বিজয়ী হইবে বলা বিশেষ কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। মাদ্রাজ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় রামসিংয়ের সাহায্য হইতে একরূপ বঞ্চিত হয়। তিনি প্রথম ইনিংসের খেলার সময় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠেতে আঘাত পান। সেই আঘাত গুরুতর হয়। ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা যায় যে হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহার জন্য তিনি যুক্তপ্রদেশ দলের দ্বিতীয় ইনিংসের সময় বল করিতে পারেন না। এমন কি দলের দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাট একরূপ অনিচ্ছা সত্ত্বেও করিয়াছেন। তাঁহার অভাব এই সময় দলকে বিশেষভাবে অনুভব করিতে হয়। শেষ পর্যন্ত সৌভাগ্য প্রসন্ন থাকায় মাদ্রাজ দল খেলায় জয়ী হইয়াছে। মাদ্রাজ দলের প্রথম ইনিংসের খেলায় গোপালন ১০১ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। যুক্তপ্রদেশ দলের অধিনায়ক পি ই পালিয়াও যুক্তপ্রদেশ দলের প্রথম ইনিংসে ১১০ রাণ করিয়া নট আউট থাকিয়া গোপালনের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। মাদ্রাজ দলের রঙ্গচারী ও যুক্তপ্রদেশ দলের আফতাব আমেদ ও আলেকজাণ্ডার বোলিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। মাদ্রাজ দল রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে খেলিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে। ইতিপূর্বে মাদ্রাজ দল এই প্রতিযোগিতায় ফাইন্যালে খেলিবার যোগ্যতা অর্জন করে নাই। সুতরাং মাদ্রাজ দলের এই সাফল্য প্রশংসনীয়। নিম্নে মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশ দলের খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল ঃ—

মাদ্রাজ দল প্রথম ইনিংস ঃ—২৭১ রাণ (সি পি জনস্টন ৩৭, এ জি রামসিং ৯১, এম গোপলন ১০১ নট আউট; সালাউদ্দিন ৪০ রাণে ২টি, পালিয়া ৪১ রাণে ৩টি, আফতাব আমেদ ৯৬ রাণে ৫টি উইকেট পান)।

যুক্তপ্রদেশ দলের প্রথম ইনিংস ঃ—২৫৫ রাণ (এ মূর্ত্তি ২৬, গরুদাচারী ৪৪, পি পালিয়া নট আউট ১১০, মকবুল আলাম ২৬; পার্থসারথী ৫৬ রাণে ২টি, রঙ্গচারী ৭৫ রাণে ৫টি, কৃষ্ণরাও ৬৬ রাণে ২টি উইকেট পান)।

মাদ্রাজ দ্বিতীয় ইনিংস ঃ—১৫৮ রাণ (আর নেলয়র ৫৫, ভেঙ্কটসন ২১; আলেকজাণ্ডার ২৯ রাণে ৭টি, সালাউদ্দিন ২৫ রাণে ১টি, আফতাব আমেদ ৩৫ রাণে ১টি উইকেট পান)।

যুক্তপ্রদেশ দলের দ্বিতীয় ইনিংস ঃ—১৪৯ রাণ (রঙ্গচারী ৩১ রাণে ৩টি, কৃষ্ণরাও ৫২ রাণে ২টি, ভেঙ্কটসন ২৩ রাণে ৩টি, পার্থসারথী ১৩ রাণে ২টি উইকেট পান)।

(মাদ্রাজ দল খেলায় ২৫ রাণে বিজয়ী হইয়াছে)

রণজি ক্রিকেট খেলায় মহারাষ্ট্র দল

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় মহারাষ্ট্র দল ৭ উইকেটে পশ্চিম ভারত রাজ্য দলকে পরাজিত করিয়াছে। এই খেলায় মহারাষ্ট্র দলের দুইজন খেলোয়াড় সোহনী ও হাজারী যেরূপ ব্যাটিংয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন ইতিপূর্বে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ইতিহাসে কেন, ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে কখনও শোনা যায় নাই। একরূপ ইহারা দুইজনেই দলকে বিজয়ী করিয়াছেন। পশ্চিম ভারত দলের ৪৫৯ রাণের বিরুদ্ধে খেলা আরম্ভ করিয়া মহারাষ্ট্র দল প্রথম তিনটি উইকেট ১১৮ রাণে হারাইলে পর সোহনীর সহিত হাজারী যোগদান করেন। সকলেই ধারণা করিতে থাকেন মহারাষ্ট্র দল পরাজিত হইবে। দ্বিতীয় দিনের শেষে দেখা যায় মহারাষ্ট্র দল তিন উইকেটে মাত্র ১৬৮ রাণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। সোহনী ৭২ রাণ ও হাজারী ২৭ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। তৃতীয় দিনের খেলার সূচনায় কেহই কল্পনা করিতে পারেন নাই যে এই দুইজন খেলোয়াড় দলের জয়লাভের প্রয়োজনীয় রাণ-সংখ্যা

সংগ্রহ করিতে পারিবেন। খেলা আরম্ভ হইবার এক ঘণ্টা পরে দেখা যায় মহারাষ্ট্র দলের দুইশত রাণ পূর্ণ হইয়াছে। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় মহারাষ্ট্র দলের ৩ উইকেটে ২৫৭ রাণ হইয়াছে। সোহনী ১২০ রাণ ও হাজারী ৬২ রাণ করিয়া নট আউট আছেন।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর খেলা আরম্ভ হইলে দেখা যায় হাজারী ও সোহনী বিপুল বিক্রমে খেলিতেছেন। পশ্চিম ভারত দলের বোলারদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া রাণ-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে হাজারী ও সোহনীর প্রচেষ্টায়। ২টা ৩৫ মিনিটের সময় মহারাষ্ট্র দলের ৩০০ রাণ পূর্ণ হইয়াছে। হাজারীও সাড়ে তিন ঘণ্টা খেলিয়া নিজস্ব শত রাণ পূর্ণ করিয়াছেন। ইহার পর সোহনী হাজারী দ্রুত রাণ তুলিতে আরম্ভ করেন। চা পানের সময় মহারাষ্ট্র দলের ৩ উইকেটে ৩৮৭ রাণ হয়। সোহনী ১৯৩ ও হাজারী ১১৮ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন।

চা পানের পর সোহনী নিজস্ব ২০০ রাণ পূর্ণ করিলে মহারাষ্ট্র দলের ৪০০ রাণ হয়। প্রতিপক্ষ বোলারগণ পরাজয় রোধ করিবার বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সোহনী ও হাজারী নট আউট থাকিয়া বেলা ৪টা ৪৫ মিনিটের সময় ৪৬০ রাণ করিতে সক্ষম হন। পশ্চিম ভারত দল খেলায় ৭ উইকেটে পরাজিত হয়। দর্শকগণ আশাতীত ফলাফল দেখিয়া চমৎকৃত হন।

মহারাষ্ট্র দল এই খেলায় কেন, রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার এই বৎসরের প্রত্যেক খেলায় ভারতের সকল ক্রীড়ামোদীকে চমৎকৃত করিয়াছেন। ইহারা রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা মারফৎ ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে যুগান্তর সৃষ্টি করিবেন বলিয়া সকলের ধারণা হইয়াছে। রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় এই দলের খেলোয়াড়গণ কয়েকটি নূতন রেকর্ড করিয়াছেন। এই যুগান্তর সৃষ্টিকারী মহারাষ্ট্র দল যে এই বৎসর রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হইবে সেই বিষয় এখন কাহারও সন্দেহ নাই।

রণজি ক্রিকেট খেলায় মহারাষ্ট্র দলের রেকর্ড

(ক) মহারাষ্ট্র দল প্রথম খেলায় বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে ৬৭৫ রাণ করে। ইহাই রণজি ক্রিকেটের মোট রাণ সংখ্যার নূতন রেকর্ড। এই খেলা শেষ হইতে সাড়ে চারিদিন সময় লাগিয়াছিল। ইতিপূর্বে ভারতীয় কোন খেলায় দুইটি দলের প্রথম ইনিংস শেষ হইতে এত অধিক সময় লাগে নাই।

(খ) মহারাষ্ট্র দল এই পর্যন্ত রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার তিনটি খেলায় যোগদান করিয়াছে এবং তিনটিতেই বিজয়ী হইয়াছে। এই তিনটি খেলার প্রত্যেকটিতে এই দলের দুইজন করিয়া খেলোয়াড় শতাধিক রাণ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে কোন দলের পক্ষে এইরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করা সম্ভব হয় নাই। নিম্নে কোন্ খেলায় কোন্ কোন্ খেলোয়াড় শতাধিক রাণ করিয়াছেন তাহা প্রদত্ত হইলঃ—

প্রথম খেলায় বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে এস ডবলিউ সোহনী ১৩০ ও অধ্যাপক দেওধর ২৪৬ রাণ করেন।

দ্বিতীয় খেলায় গুজরাট দলের বিরুদ্ধে সোহনী ১৩৪ রাণ ও ভি এস হাজারী ১১৭ রাণ।

তৃতীয় খেলায় পশ্চিম ভারত রাজ্য দলের বিরুদ্ধে ডবলিউ সোহনী ২১৮ নট আউট ও ভি এস হাজারী নট আউট ১৬৪ রাণ।

(গ) রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার তৃতীয় খেলায় পশ্চিম ভারত রাজ্য দলের বিরুদ্ধে সোহনী ও হাজারী একত্রে ৫০৩ মিনিট খেলিয়া শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকিয়া ৩৪২ রাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইতিপূর্বে রণজি ক্রিকেট ইতিহাসে এইরূপ দুইজন খেলোয়াড়ের একত্রে এক অধিক রাণ করিতে কখনও শোনা যায় নাই। ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসেও এইরূপ কোন ঘটনার কথা উল্লেখ নাই। ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সূচনা করিয়াছে।

(ঘ) একটি খেলোয়াড় সোহনী পর পর তিনটি খেলায় যে শতাধিক রাণ করিয়াছেন তাহাও এক নূতন রেকর্ড।

সোহনী ও হাজারী

মহারাষ্ট্র ক্রিকেট দলের কৃতিত্ব অর্জনে দুইটি খেলোয়াড় সোহনী ও হাজারী বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। সোহনী এই পর্যন্ত মহারাষ্ট্র দলের পক্ষে খেলিয়া প্রত্যেকটি খেলায় শতাধিক রাণ করিয়াছেন। তিনি প্রথম খেলায় বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে ১২০ রাণ, দ্বিতীয় খেলায় গুজরাট দলের বিরুদ্ধে ১৩৪ রাণ ও তৃতীয় খেলায় পশ্চিম ভারত রাজ্য দলের বিরুদ্ধে নট আউট ২১৮ রাণ করিয়াছেন। হাজারীও গুজরাট দলের বিরুদ্ধে ১১৭ রাণ ও পশ্চিম ভারত রাজ্য দলের বিরুদ্ধে নট আউট ১৬৪ রাণ করিয়াছেন। বোলিং বিষয়েও ইহাদের দান প্রশংসনীয়। এই দুইটি অলরাউন্ডার ক্রিকেট খেলোয়াড় কেবল মহারাষ্ট্র দলের কেন, ভারতীয় দলের গৌরবের যে কারণ হইবেন ইহা আমরা দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি। হাজারী মহারাষ্ট্র দলের পক্ষ ছাড়াও এই বৎসর বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অবশিষ্ট দলের হইয়া ১৮২ রাণ ও অমৃতশহর ট্রায়াঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার অবশিষ্ট দলের পক্ষে ১৭১ রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ভারতের একজন যে অদ্বিতীয় ব্যাটসম্যান সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। হাজারী ও সোহনী ক্রিকেট খেলায় আরও উন্নতি করিয়া পৃথিবীর ক্রিকেট ইতিহাসে ভারতীয় খেলোয়াড়দের সম্মান বৃদ্ধি করুন ইহাই আমাদের কামনা। নিম্নে এই বৎসরের রণজি ক্রিকেটের পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনাল খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

পশ্চিম ভারত রাজ্য দল ঃ—৪৫৯ (ব্যারিট ৩৪, আব্দুল খালেক ৩৬, নাশিরুদ্দীন ৩০, পৃথিরাজ ৪৫, শান্তিলাল গান্ধী ৪১, মানভাদারের নবাব ৬২, আকবর খাঁ ৫৭, সৈয়দ আমেদ নট আউট ৮০; ভি হাজারী ১১০ রাণে ২, সোহনী ৬ রাণে ১টি, যাদব ৩৯ রাণে ২টি, সারভাতী ১০৭ রাণে ৪টি উইকেট পান)

মহারাষ্ট্র ঃ—(৩ উইঃ) ৪৬০ রাণ (সোহনী নট আউট ২১৮, ভাজেকার ৩৫, হাজারী নট আউট ১৬৪; সৈয়দ আমেদ ৭৬ রাণে ১টি, শান্তিলাল ১২৪ রাণে ১টি, নেয়ালচাঁদ ৯৬ রাণে ১টি উইকেট পান)।

(মহারাষ্ট্র দল ৭ উইকেটে বিজয়ী)

গিয়াছিল যে, তাহার মন বলিতে চাহিল, 'সমস্ত গানটা ভাল ক'রে না শুনলে সে কথা বলতে পারছিনে'। কিন্তু যে প্রসঙ্গের অবতারণা সে করিয়াছে, ঐ ধরণের কথার দ্বারা পাছে তাহার গুরুত্ব ক্ষুণ্ণ হয় সেই বিবেচনায় সে বলিল, "তা আমি বলতে পারিনে সুলেখা। কিন্তু তোর কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে! তুই কি বলতে চাস, কলকাতায় গৌরহরি সুতপাকে গান শেখাত?"

সুলেখা বলিল, "না, ঠিক নিয়ম ক'রে মাইনে নিয়ে শেখাতেন না। তবে মাঝে মাঝে সুতপা যখন শিখতে চাই ত, এক আধটা গান শিখিয়ে দিতেন।"

কথাটা ঠিক ষোল আনা সত্য নহে। অশ্বত্থামা হত শ্রেণীর সত্য। অর্থাৎ, সুলেখা মাঝে মাঝে এক আধটা গান শিখিত বটে, তবে গৌরহরি 'গজে'র নিকট নহে, অবনীশের নিকট।

লাবণ্য বলিল, "মরুক গে, কলকাতায় কি হ'ত না হ'ত সে আলোচনায় কাজ নেই,—এলাহাবাদে কিন্তু তুই এলাহাবাদের ধারাই অনুসরণ ক'রে চলিস। গৌরহরির চালানো গাড়িতে ওঠা ছাড়া গৌরহরির সঙ্গে আর কোনও সম্পর্কই রাখিস নে।"

"কোনও সম্পর্কই না?"

"না,—কোনও সম্পর্কই না।"

সুলেখার দুই নেত্র-কোণে নিরুদ্ধ কৌতুকের অবাধ্য দীপ্তি মুহূর্তের জন্য ঝিলিক মারিয়া গেল। পর মুহূর্তেই মুখ গম্ভীর করিয়া লইয়া সে বলিল, "কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ দিদি, কলকাতার ধারা শুধু আমাদের বাপের বাড়ির ধারাই নয়, কিছুদিন থেকে আমাকে আমার শ্বশুর বাড়ির ধারাও মেনে চলতে হচ্ছে। তোমার ভগ্নীপতি যদি জানতে পারেন যে, গৌরহরিবাবুর মত একজন পরিচিত সচ্চরিত্র ভদ্রবংশীয় লোকের সঙ্গে একমাত্র ড্রাইভারের সম্পর্ক ছাড়া আর আমি কোনও সম্পর্কই রাখতে চাইনে, তা হ'লে তিনি খুব খুশী হবেন না।"

সুলেখার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া লাবণ্য বলিল, "আমাকে তুই ক্ষমা করিস সুলেখা, দু দিনের জন্যে তুই এখানে বেড়াতে এসেছিস, তোকে এমন ক'রে রূঢ় কথা বলতে আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে,—কিন্তু যা বলছি, তোর ভালর জন্যেই বলছি। স্বামীর সঙ্গে ত' কারবার তোর মাত্র মাস দুয়েকের,—স্বামী বস্তুকে চিনতে এখনও তোর অনেক বিলম্ব আছে। শুধু ওদের মুখের কথা শুনে চললেই ঠিক চলা হয় না রে, ওদের মনের কথা বুঝে চলতে পারলে, তবে ঠিক চলা হয়। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও বোধ হয় সে বোঝার শেষ হয় না।"

এ বিষয়ে আলোচনা আর অধিক অগ্রসর হইতে পারিল না, অদূরে চটি জুতার শব্দ শোনা গেল এবং পর মুহূর্তেই বারান্দা হইতে প্রশান্ত বলিল, "সুলেখা আছ নাকি ঘরে?"

সুলেখা বলিল, "আসুন জামাইবাবু, দিদিও আছেন এখানে।"

কক্ষে প্রবেশ করিয়া একবার সুলেখার দিকে ও একবার লাবণ্যর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রশান্ত বলিল, "দুই ভগ্নীতে মিলে বিশেষ কোনও গুপ্ত মন্ত্রণা চলছিল নাকি?"

লাবণ্য বলিল, "হ্যাঁ চলছিল। স্বামী নামক জীবের সঙ্গে সংসারের পথে কি ভাবে চলতে হয় সে বিষয়ে সুলেখাকে কিছু উপদেশ দিচ্ছিলাম।"

চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া প্রশান্ত বলিল, "জীবই বলেছিলে ত' লাবণ্য? জন্তু বল নি ত?"

স্মিতমুখে সুলেখা বলিল, "দিদি যে ভাবে স্বামীর পরিচয় দিচ্ছিলেন আর লক্ষণ দেখাচ্ছিলেন তাতে কিন্তু ঠিক জীব বলছিলেন ব'লে মনে হচ্ছিল না।"

প্রশান্ত বলিল, "তা বুঝতেই পারছি। কিন্তু কোন্ শ্রেণীর প্রাণী সুলেখা? গাছের?—না, গোয়ালের? বলি, এ ছাড়া কোনও তৃতীয় শ্রেণীর নয় ত'?" বলিয়া প্রশান্ত উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল।

প্রশান্তর হাতে একটা পোস্টকার্ড লক্ষ্য করিয়া লাবণ্য বলিল, "তোমার হাতে ও কার চিঠি?"

ব্যস্ত হইয়া প্রশান্ত বলিল। "এই দেখ, আসল কথাই বলতে ভুলে গেছি। শ্বশুরমশায়ের চিঠি। এইমাত্র এল। পাটনা থেকে অবনীশের সহিত একত্র হ'য়ে তোমাদের দাদা আগামী সোমবারে এখানে পৌছবেন।" চিঠিখানা সুলেখার হাতে দিয়া বলিল, "সুসংবাদ। বক্‌সিস দাও।"

লাবণ্য বলিল, "এখনও কাটা হয় নি, কাটা হ'লে দেবে।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া প্রশান্ত বলিল, "কি বস্তু লাবণ্য? ফল; না, ঘাস?"

প্রশান্তর কথা শুনিয়া লাবণ্য ও সুলেখা উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে সুযোগ মত মুহূর্তের জন্য সুলেখার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবনীশ বলিল, "আজ তোমার ঘরের পুব দিকের দোরটা খুলে রেখো সুলেখা। রাত্রি এগারটার সময়ে দেখা করব।"

উদ্বিগ্ন মুখে সুলেখা বলিল, "কেন?"

"অভিনয়ে তোমার আর আমার অংশ শেষ হ'য়ে এল,—এবার দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হবে। তার জন্যে কিছু পরামর্শ দরকার।"

অদূরে পদধ্বনি শোনা গেল।

প্রস্থানোদ্যত হইয়া সুলেখা বলিল, "না, না, কখ্খনও এসো না। আমি দোর খুলে রাখব না।"

"তা হ'লে কিন্তু বাধ্য হ'য়ে দরজায় ধাক্কা দিতে হবে।" বলিয়া অবনীশ নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। (ক্রমশ)

আজ-কাল

ধর্মঘট

ভারতের নানা জায়গায় শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। যুদ্ধের দরুণ জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এর প্রত্যক্ষ কারণ। শ্রমিকেরা মাগ্গি ভাতা দাবী করছে এবং না পেলে ধর্মঘট করছে। ইন্দোরে ধর্মঘটী শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে চরম পন্থা নিয়েছিল। তারা দুটো থানা আক্রমণ করে এবং একটা সরকারী অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের চেষ্টা করে। পুলিশের গুলীতে চারজন শ্রমিক নিহত হয়। এর পর ইন্দোর কর্তৃপক্ষ মিটমাটের জন্য শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। নাগপুরে এম্প্রেস ও মডেল মিলের কুড়ি হাজার মজুর ধর্মঘট আরম্ভ করেছে। তারা প্রথমে অবস্থান-ধর্মঘট করবে বলে ঠিক করেছিল; কিন্তু গভর্নমেণ্ট সে ক্ষেত্রে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করবে বলে জানানোর পর তারা বাইরেই ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত করে। পুণায় রাজা বাহাদুর মোতিলাল মিলে ধর্মঘট চলছে; শ্রমিকরা পিকেটিং করছে।

পাঞ্জাবে বিক্রয় কর বিলের প্রতিবাদে প্রদেশের সর্বত্র দোকানদারেরা ধর্মঘট আরম্ভ করে। ফলে গভর্নমেণ্ট অক্টোবর মাস পর্যন্ত আইনটা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করেছেন।

গত ১লা মে সব জায়গায় 'মে দিবস' উপলক্ষে শ্রমিকদের সভা ও মিছিল হয়। কলকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিরাট সভা হয়।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

গত ২রা মে থেকে ঢাকা শহরে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আবার মাথা চাড়া দিয়েছে। আরো কয়েকজন লোক ছোরার আঘাতে মারা গেছে। শহরে সামরিক টহলের ব্যবস্থা হয়েছে এবং বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ঢাকা শহরে মোট ৫৮ জন মারা গেল। বিহার শরিফে ও নিকটবর্তী গ্রামে দাঙ্গায় এ পর্যন্ত [illegible] ৩০ জন নিহত ও ৯৭ জন আহত হয়েছে। গয়াতে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ হওয়ায় ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে।

গত সপ্তাহে বাঙলায় কালবৈশাখী কিছু নাড়া দিয়েছে। পটুয়াখালির কাছে একটা স্টীমার ডুবে অনেক লোক মারা গেছে। পূর্ববঙ্গে আরো বহু জায়গায় ঝড়ে বাড়িঘর পড়ে গেছে এবং লোকের বেশ ক্ষতি হয়েছে। কলকাতাতেও দমকা ঝড়ে দু'একটা দুর্ঘটনা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক

বল্কান-মধ্য-প্রাচ্য-আফ্রিকা

গ্রীসের যুদ্ধ জার্মানী একমাসের কম সময়েই শেষ করে' দিয়েছে এবং সেখানে গ্রীক এপিরাস বাহিনীর সেনাপতি জেনারেল ৎসোলাকোগ্লুর অধীনে এক তাঁবেদার গ্রীক গভর্নমেণ্ট গঠন করেছে। হাজার ষাটেক বৃটিশ সৈন্যের মধ্যে ৪৩ থেকে ৪৫ হাজার সৈন্য পালিয়ে আসতে পেরেছে, ৩ হাজার মারা গেছে এবং হাজার বারো সৈন্য বন্দী হয়েছে।

কিন্তু বল্কানের গোলমাল মিট্তে না মিট্তেই মধ্য প্রাচ্যের ইরাকে গোলমাল বেধে উঠেছে। ইরাকী সৈন্যদের সঙ্গে বৃটিশ সৈন্যের সংঘর্ষ আরম্ভ হয়েছে। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আরো সৈন্য বস্রাতে পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ইরাকী গভর্নমেণ্ট বলেন যে, আগের সৈন্য বস্রা থেকে না সরালে আর সৈন্য নামাতে দিতে তাঁদের আপত্তি আছে। কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ১৯৩০-এর ইঙ্গ-ইরাকী চুক্তি বলে আরো সৈন্য বস্রায় নিয়ে যান। এর পর ইরাকী সৈন্যেরা হাব্বানিয়ায় বৃটিশ বিমান ঘাঁটির কাছে সমবেত হতে থাকে এবং পরে ঐ ঘাঁটির উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করে। দুই পক্ষের সংঘর্ষ এখনো চল্ছে; বৃটিশ সৈন্যেরা বস্রা দখল করে' নিয়েছে; ইরাকীরা মোজলের তৈলখনি এবং হাইফাগামী তৈল পাইপ লাইনের স্টেশনগুলি দখল করে' নিয়েছে। ইরাকের প্রধান মন্ত্রী রসিদ আলি নাকি জার্মানীর সাহায্য চেয়েছেন। এখন তুরস্ক ও মিশর দুই পক্ষের মধ্যে একটা মিটমাটের চেষ্টা করছে।

উত্তর আফ্রিকায় অবস্থার বেশী কিছু তারতম্য ঘটে নি। জার্মান-ইতালীয় সৈন্যেরা তোব্রুকের বহির্ব্যূহ এক জায়গায় ভেদ করে, কিন্তু বৃটিশ সৈন্য তাদের গতি প্রতিহত করে' ভিতরকার ব্যূহের আগে আর একটা ব্যূহ রচনা করে। সোল্লুম এলাকায় লড়াই চলছে; স্পষ্ট ফলাফল কিছুই জানা যায় না। আবিসিনিয়ায় বৃটিশ সৈন্যেরা দেসী দখল করে' আম্বা আলাগির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

নাৎসী কূটনীতি

জার্মানী এখন পূব পশ্চিম দুই দিকেই কূটনীতি মারফৎ ভবিষ্যৎ সংগ্রামের ব্যবস্থা ঠিক করছে। শোনা যাচ্ছে যে স্পেনের ভিতর দিয়ে জিব্রাল্টার আক্রমণের বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে আছে; ফ্রান্সকেও এদিককার ব্যবস্থার মধ্যে টেনে আনবার চেষ্টা হচ্ছে। এডমিরাল দারলাঁ বার বার প্যারিসে ছোটা-ছুটি করছেন। পূব দিকেও জোর নাৎসী কর্মতৎপরতা চল্ছে। তুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক ও ইরাণে বহু জার্মান চর পর্যটকের ছদ্মবেশে আছে। ইরাকী গভর্নমেণ্ট তো ইতিমধ্যে জার্মানীর পক্ষে ভিড়ে পড়েছেন; গুজব রট্ছে যে, তুরস্কেও জার্মানীর পক্ষপাতী গভর্নমেণ্ট গঠন আসন্ন। তুরস্ককে হাতে আন্তে পারলে মধ্য প্রাচ্যে জার্মান বাহিনীর গতি দুর্দমনীয় হয়ে উঠ্বে।

সোভিয়েট-জার্মানী

সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট সোভিয়েট রাজ্যের ভিতর দিয়ে সমরোপকরণ প্রেরণ নিষিদ্ধ করে' দিয়েছেন। এই সময় আবার এক জার্মান সৈন্য দল ফিনল্যাণ্ডে গেছে। এই নিয়ে আসন্ন জার্মান-সোভিয়েট সংঘর্ষের নানা রোমাঞ্চকর ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করা হচ্ছে। অতীত অভিজ্ঞতা এ সব সংবাদ বিশ্বাস করতে আমাদের নিষেধ করে।

হের হিটলার রাইখস্ট্যাগে এক বক্তৃতায় বৃটেনকে আমেরিকার সাহায্যদানের উল্লেখ করে' বলেন যে, ১৯১৮ সালের পুনরাবৃত্তি এবার হবে না। তিনি গ্রীক যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দেন।

বিমান হানা

জার্মান বিমান বহর এখন বৃটেনের এক একটা শহর ধরে' প্রবল আক্রমণ চালাচ্ছে। প্লিমাথ, লিভারপুল ও বেলফাস্টে (উত্তর আয়র্ল্যাণ্ড) প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ চলে। ডোভারে বেলুনের বেড়াজালও তারা আক্রমণ করে। প্রথম তিনটি জায়গার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত বৃটেনে বিমান আক্রমণে মোট ২৯ হাজার লোক নিহত ও ৪০ হাজার লোক আহত হয়েছে।

বৃটিশ বিমান বহরও এসেন, ডুসেলডর্ফ, হাম্বুর্গ, ক[illegible] প্রভৃতি জার্মান শহরে এবং নরওয়ে থেকে ফ্রান্সের বৃটেনি প[illegible] বিভিন্ন জার্মান ঘাঁটির উপর পর পর আক্রমণ চালিয়েছে।

৬-৫-৪১

—ওয়াকিবহাল

সমর বার্তা

৩০শে এপ্রিল।—

জেনারেল সোলাকিগলুর অধীনে এথেন্সে এক তাঁবেদার গভর্নমেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে। ইনি এপিরাসে গ্রীক বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন।

লণ্ডনে বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, গ্রীসের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে তিন হাজার বৃটিশ সৈন্য হতাহত হইয়াছে। সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, গ্রীস হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণ সন্তোষজনকভাবে চলিতেছে। গ্রীসে প্রেরিত ৬০ হাজার বৃটিশ সেনার মধ্যে ৪৫ হাজার সেনাকে ইতিপূর্বে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া হইয়াছে।

ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের প্লিমাথ শহরের উপর গত রাত্রে জার্মান বিমানবহর পুনরায় প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এই লইয়া পর পর পাঁচরাত্রি প্লিমাথের উপর বিমান আক্রমণ হইল।

গতকল্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করেন যে, পশ্চিম গোলার্ধের সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রণতরীসমূহ "যুদ্ধাঞ্চলেও" প্রবেশ করিতে পারে।

চীনে জাপানের বিমান আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ইউনান প্রদেশের রাজধানী এবং চীন-ব্রহ্ম রোডের প্রান্তভাগে অবস্থিত কুনমিংএর উপর ২০টি জাপ বিমান একশত বোমাবর্ষণ করে। অন্যান্য স্থানের উপরও বোমা বর্ষিত হয়।

১লা মে।—

ইঙ্গ-ইরাক সন্ধির ব্যাখ্যা লইয়া বৃটিশ ও ইরাক গভর্নমেণ্টের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আরও একদল সৈন্য বসরায় নামাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। কিন্তু উত্তরে ইরাক গভর্নমেণ্ট জানান যে, ইতিপূর্বে ইরাকের মধ্য দিয়া যাইবার জন্য যে সকল সৈন্য বসরায় অবতরণ করিয়াছে, তাহারা বসরা ছাড়িয়া না গেলে আর সৈন্য নামান চলিবে না।

২রা মে।—

আজ প্রত্যূষে ইরাকে বৃটিশ বিমানঘাঁটি হাব্বানিয়ার উপর ইরাক গোলন্দাজ বাহিনী গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে এবং ইরাক-বাহিনীর গোলাবর্ষণের প্রত্যুত্তরে বৃটিশ বাহিনী প্রতিআক্রমণ চালায়। সমস্ত দিন ধরিয়া সংগ্রাম চলে। বসরা অঞ্চল হইতে বৃটিশ নারী ও শিশুদিগকে স্থানান্তরিত করা হয়।

ভারতীয় মেল জাহাজ "ব্রিটানিয়া" গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল; প্রতিপক্ষের আক্রমণে জাহাজখানি জলমগ্ন হইয়াছে।

বৃটিশ মন্ত্রিসভায় রদবদলের কথা ঘোষিত হইয়াছে। লর্ড বীভার ব্রুক রাষ্ট্রসচিবপদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩রা মে।—

বাগদাদের এক ইস্তাহারে বলা হয় যে, ইরাকের তৈলখনি এবং তৈলবাহী পাইপ লাইনের পার্শ্ববর্তী স্টেশনগুলি অবরোধ করা হইয়াছে।

আনকারা রেডিওতে ঘোষণা করা হয় যে, মসুল তৈলখনি অঞ্চল প্লাবিত করা হইয়াছে এবং তৈলকূপ ও কারখানাসমূহ এখন ইরাকী সৈন্যদের দখলে আছে।

অস্ট্রেলিয়ার সমরসচিব মিঃ স্পেণ্ডার ঘোষণা করেন যে, গ্রীক যুদ্ধের পর প্রায় ১২ হাজার বৃটিশ, অস্ট্রেলিয়ান ও নিউজিল্যাণ্ড সৈন্যের কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

৪ঠা মে।—

ইরাকের বসরা অঞ্চলে বৃটিশ ও ইরাকী বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ ... বৃটিশ বাহিনী ইরাকী বাহিনীকে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে। ...শ সমর দপ্তরের ইস্তাহারে এই কথা ঘোষণা করিয়া বলা হইয়াছে, "২রা মে হাব্বানিয়ার সংঘর্ষ আরম্ভ হইবার পর বৃটিশ বাহিনী বসরার ডক অঞ্চলটি, বিমানঘাঁটি ও পাওয়ার স্টেশনটি দখল করে।"

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ যে, বৃটিশ বোমারু বিমানবহর বাগদাদের বহির্ভাগস্থিত ইরাকী বিমানঘাঁটির বারুদখানা এবং পেট্রল গুদামের উপর প্রবল বোমাবর্ষণ করে। বোমার আঘাতে সামরিক অট্টালিকাসমূহ ধ্বংস হয়।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ যে, তব্রুকে প্রতিপক্ষের আক্রমণ বন্ধ হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষের ট্যাঙ্কসমূহও ফিরিয়া গিয়াছে।

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ যে, বৃটিশ বিমান বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ বোমারু বিমানবহর ২রা মে তারিখে ভূমধ্যসাগরে ডেস্ট্রয়ার পরিরক্ষিত বিপক্ষের একটি বাণিজ্য কনভয়ের উপর আক্রমণ চালায়। ডেস্ট্রয়ারসমূহ এবং তিনটি বাণিজ্য জাহাজের উপর বোমা বর্ষিত হয়।

হের হিটলার রাইখস্ট্যাগের এক অধিবেশনে বক্তৃতা করেন। উক্ত বক্তৃতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে হের হিটলার বলেন, "গণতান্ত্রিক আন্দোলনকারীরা যদি তাহাদের গণতন্ত্র এবং সমর-সম্ভারের ভয় দেখাইয়া ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট স্টেটের কণ্ঠরোধ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করিয়া থাকে, তাহা হইলে জার্মান জাতি এই উত্তরই দিবে যে, ১৯১৮ সালের ন্যায় অবস্থা আর ঘটিবে না।"

৫ই মে।—

কায়রোতে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, ইরাকী বিমান-বাহিনীর অধিকাংশই বিধ্বস্ত হইয়াছে।

ইরাকের বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, "আমাদের সৈন্যবাহিনী নিরুপদ্রবে বসরা অধিকার করিয়া আছে।" উক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ইরাকী বাহিনী ২রা মে তারিখে রাটবা দখল করিয়াছে।

ইরাকের রিজেণ্ট আমির আব্দুল ইলাহ্ প্যালেস্টাইনে এক ঘোষণা প্রকাশ করিয়া ইরাকবাসিগণকে রসিদ আলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে আহ্বান করিয়াছেন।

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ যে, তব্রুকে বৃটিশ বাহিনীর পাল্টা আক্রমণে বিপক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

৬ই মে।—

কমন্স সভায় যুদ্ধের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয়। আলোচনার প্রথমে পররাষ্ট্রসচিব মিঃ এন্টনী ইডেন বলেন যে, গ্রীসে সাহায্য প্রেরণ লইয়া ইম্পিরিয়াল জেনারেল স্টাফের অধ্যক্ষ, মিঃ ইডেন এবং মধ্য প্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরের প্রধান সেনাপতি এবং বিমানবহরের প্রধান সেনাপতি—এই তিনজন প্রধান সেনাপতির মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে বলিয়া যে বিদ্বেষপ্রসূত গুজব রটিয়াছে, তাহা একেবারে ভিত্তিহীন।

তুর্কী গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ ও ইরাকী গবর্ণমেণ্টের মধ্যে মধ্যস্থতার প্রস্তাব করিয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তুর্কী গবর্ণমেণ্টের এই বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, কোনরূপ আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্বে হাব্বানিয়া হইতে ইরাকী সৈন্যগণকে অপসারিত করিতে হইবে।

কায়রোর সামরিক কর্তৃপক্ষের এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, সোমবার বৃটিশবাহিনী হাব্বানিয়া অঞ্চলে পুনরায় কর্মতৎপর হয়।

তুর্ক-ইরাকী সীমান্ত সুরক্ষিত ও নিরাপদ করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে বলিয়া আনকারা রেডিও ঘোষণা করেন।

'টাইমস্' পত্রিকার কায়রোস্থ সংবাদদাতা তার করিয়াছেন যে, প্যালেস্টাইনে আরবদের নেতা বৃটেনের চিরশত্রু ভূতপূর্ব গ্র্যাণ্ড মুফ্‌তি রসিদ আলির সহিত যোগদান করিয়াছেন এবং ইরাকে বৃটিশ বিদ্বেষ প্রচার করিতেছেন।

সোমবার রাত্রিতে বৃটেনের উপর ব্যাপক নাৎসী বিমান আক্রমণ হয়।

নাইরোবীর সংবাদে প্রকাশ যে, গতকল্য সম্রাট হাইলে সেলাসী বিজয় গর্বে আদ্দিসআবাবায় প্রবেশ করিয়াছেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

৩০ এপ্রিল।—

চব্বিশ পরগণা জিলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার অন্তর্গত চৌদ্দটি গ্রামে অতিরিক্ত পুলিশ ফৌজ মোতায়েন করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, উক্ত অঞ্চলে অশান্তিজনক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। অতিরিক্ত ফৌজ মোতায়েনের খরচ স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

ইন্দোরে একদল ধর্মঘটী শ্রমিক একটি রাইফেলপূর্ণ অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে উদ্যত হইলে পর একজন পুলিশ কনেষ্টবল তাহাদের উপর গুলীবর্ষণ করে, ফলে ১৪ জন আহত হয় এবং তাহাদের মধ্যে পরে চারিজন হাসপাতালে মারা যায়।

বাঙলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রবল ঝড় বৃষ্টির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আগড়তলা, কুষ্টিয়া, প্রভৃতি স্থানে ঝড়ের ফলে বহু বাড়ী ঘর ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং শস্যের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। কয়েকজনের মৃত্যু সংবাদও পাওয়া গিয়াছে।

১ মে।—

কলিকাতায় মে দিবস উদ্‌যাপনকল্পে কলিকাতা শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ডাঃ হারাচন্দ্র ব্যানার্জির সভাপতিত্বে এক বিরাট শ্রমিক সমাবেশ হয়। সভায় শ্রমিকদের দাবী সমর্থন করিয়া এবং মন্ত্রি-মণ্ডলীর অনুসৃত দমননীতির প্রতিবাদ করিয়া কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

দাঙ্গা সংবাদ—বিহার শরীফে দাঙ্গায় মোট ১৫ জন নিহত এবং ৪০ জন আহত হইয়াছে। বোম্বাইয়ে সাম্প্রদায়িক অবস্থার প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। কাণপুরে গুলীবর্ষণ সম্পর্কে সরকারী তদন্ত শেষ হইয়াছে। [illegible] গভর্নর ঢাকায় দাঙ্গাপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন করেন।

নাগপুরে এমপ্রেস ও মডেল মিলের প্রায় ২০ হাজার শ্রমিক মজুরীর হার বৃদ্ধি ও অন্যান্য দাবী করিয়া ধর্মঘট সুরু করে।

২ মে।—

[illegible]পুরে আশুতোষ কলেজ হলে নিখিল ভারত বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য প্রচার সমিতির এক সাধারণ অধিবেশন হয়। এতদুপলক্ষে অ-বাঙালীদের বাঙলা ভাষা শিক্ষা দানের জন্য একটি বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হয়। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্য ভবানীপুরস্থ আশুতোষ কলেজেই আপাতত চলিবে। সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাঙলা ভাষা ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হইবার দাবীর যৌক্তিকতা বিবৃত করেন।

বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা মৌলবী আশরফুদ্দীন আমেদ চৌধুরী পুনরায় ভারতরক্ষা বিধানে কুমিল্লায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন। অভিযোগ এই যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে প্রকাশ্য সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তিনি তাহা লঙ্ঘন করিয়াছেন। নিষেধাজ্ঞা অমান্যের অভিযোগে কুমিল্লায় আরও সাত জন ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মী ভারতরক্ষা বিধানে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

কলিকাতার প্রবীণতম সংবাদপত্র রিপোর্টার শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র চ্যাটার্জি তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৩ বৎসর হইয়াছিল।

পাঞ্জাব বিক্রয়কর আইনের প্রতিবাদে লাহোর, দিল্লী প্রভৃতি নানাস্থানে হরতাল প্রতিপালিত হয়।

৩ মে।—

গতকল্য ঢাকা শহরের বিভিন্ন অংশে কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছে। রাত্রে আজিমপুরায় একটি বাড়ী আক্রান্ত হয় ও এক ব্যক্তি আহত হয়। এই সকল ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ প্রায় ৮০ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু নারায়ণগঞ্জের দাঙ্গাপ্রপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শনের জন্য ঢাকায় পৌঁছিয়াছেন।

মৌলবী আশরফুদ্দীন আমেদ চৌধুরী কুমিল্লায় নিষেধাজ্ঞা অমান্যের অভিযোগে ভারতরক্ষা বিধান অনুযায়ী পুনরায় ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। অপর সাত জন ফরোয়ার্ড ব্লক কর্মীকেও ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটি হলে কুমার বিমলচন্দ্র সিংহের সভাপতিত্বে বঙ্গ ভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন। সম্মেলনে বঙ্গ ভাষাকে ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হইবার দাবী জানাইয়া পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে বাঙলা সরকারের সাম্প্রদায়িক নীতির নিন্দা করিয়া কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৪ মে।—

পুলিশ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অফিসে খানা-তল্লাসী করে। খানাতল্লাসীর পর বি, পি, সি, সির অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারকদাস ব্যানার্জির উপর ভারতরক্ষা বিধানানুসারে এক আদেশ জারী করিয়া তাঁহাকে যশোহর জেলায় যাইয়া বাস করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গীয় এড হক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহকে ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়।

দাঙ্গা সংবাদ—বিহার শরিফের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় এ পর্যন্ত মোট ২১ জন নিহত হইয়াছে। ঢাকা শহরের তিনটি অঞ্চল হইতে ছোরা মারার খবর পাওয়া গিয়াছে। আজিমপুরায় যে লোকটিকে ছোরা মারা হইয়াছিল, সে লোকটি হাসপাতালে মারা গিয়াছে।

৫ মে।—

ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে তিনজনকে ছোরা মারা হয়। গতকল নর্থব্রুক হল রোড ও এক্রামপুরে যে দুইজনকে ছোরা মার হইয়াছিল, উহারা হাসপাতালে মারা গিয়াছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য এবং শ্রমিক নেতা শ্রীযু নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের উপর অদ্য পুলিশ কমিশনার ভারত রক্ষা বিধানে এক আদেশ জারী করিয়া ২৭শে এপ্রিল হইতে সুর করিয়া এক মাসের জন্য তাঁহাকে কোন সভাসমিতিতে যোগদান ব বক্তৃতা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

মুর্শিদাবাদের মাসুন্দী গ্রামে দুইদল মুসলমানের মধে সংঘর্ষের ফলে এক ব্যক্তি নিহত ও কয়েকজন গুরুতররূপে অহত হইয়াছে।

৬ই মে।—

দাঙ্গার সংবাদ—ঢাকায় নবাবপুর লেভেল ক্রসিংএর নিকট এক ছুরিকাঘাতে আহত হয়। এই ঘটনা ব্যতীত সহরের অবস্থা শান্ত ছিল। পুলিস উক্ত অঞ্চল হইতে ৭২জনকে গ্রেপ্তার করে গতকল্য এবং গত পরশ্ব ছুরিকাঘাতে আহত দুই ব্যক্তি আজ হাস পাতালে মারা যায়। ইহাদের লইয়া দাঙ্গায় নিহতদের সংখ্যা মোট ৫৮জন হইল। বিহার শরীফের দাঙ্গার ফলে আর এ পর্যন্ত মোট ৩০জন নিহত ও ৯৭জন আহত হইয়াছে। বিহার শরীফের অবস্থার উন্নতি হইতেছে।

গত ১৫ দিন প্রবল বৃষ্টির ফলে নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ সেনবাগ, লক্ষ্মীপুর, রায়পুর ও রামগঞ্জ থানার প্রায় চারশত বর্গ মাইল স্থান প্লাবিত হইয়াছে। ধান ও পাটের ক্ষতি হইয়াছে এবং কৃষি কার্যের দ্বারা জীবিকা অর্জনকারী সহস্র সহস্র লোক কর্মহীন হইয়া পড়িয়াছে।

বিচিত্র বার্তা

এক নম্বর সুখাদ্য মাছ

খাদ্য হিসাবে রুই মাছের জনপ্রিয়তা আমাদের দেশে সব থেকে বেশী। হারিং মাছ পৃথিবীর এক নম্বর সুখাদ্য মাছ বলে বিশেষ পরিচিত। বৎসরে বার শত কোটিরও বেশী হারিং মাছ খাওয়া হয়। এটলাণ্টিকের উত্তর অঞ্চলে এই জাতীয় মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমরা মাছের বিশেষ ভক্ত, কিন্তু কোন্ জাতীয় মাছ কি পরিমাণ খাওয়া হয়, তা আমাদের জানা নেই।

* * * *

মস্কোতে মেয়েদের মোটর চালানো শেখাবার জন্যে একটি স্কুল আছে।

* * * * *

উত্তর আমেরিকার কোন কোন উপজাতির মধ্যে এক অদ্ভুত প্রথা আছে। সেখানে বিধবারা পুনরায় বিবাহ করতে ইচ্ছা করলে, তাদের মাথার চুল কেটে দেওয়া হয় এবং যতদিন না মাথার চুল পূর্বেকার অবস্থায় না পৌঁছায়, ততদিন পর্যন্ত তাদের বিধবার সমস্ত কিছু আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে বাধ্য করা হয়।

* * * *

হীরক পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে শক্ত পদার্থ এবং কাচের চেয়ে প্রায় ৮০ গুণ শক্ত হ'লেও কোন সুদক্ষ লোকের এক নির্ভুল ঘষিতে বিদীর্ণ হ'য়ে পড়ে।

* * * *

চড়ুই পাখী দীর্ঘজীবী। কোন একটি পোষা চড়ুইয়ের মৃত্যুর পূর্বে তার মনিবের উদ্যোগে ৪০তম জন্মবার্ষিকী উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হ'য়েছিল।

* * * * *

Rayon (নকল সিল্ক) আবিষ্কার করেন একজন ফরাসী। তাঁর নাম Count Hilaire de Chardonnet. এই ভদ্রলোক অনেকদিন ধরে গুটী পোকা এবং তাদের খাদ্য তুঁতগাছের পাতার রসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষা ক'রে নকল সিল্ক আবিষ্কার করেছিলেন। তুঁতগাছের পাতা প্রধানত cellulose সংযোগে গঠিত, এই প্রমাণ লাভ করায় তিনি cellulose'কে রসায়ন প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত ক'রে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নকল সিল্ক প্রস্তুত করবার উপায় নির্ধারণ করেন। তিনি তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতিকে ১৮৮৪ সালে পেটেণ্ট হিসাবে ঘোষণা করেন এবং আজ পর্যন্ত তাঁর পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে।

* * * * *

মাত্র এক টন কয়লা থেকে এই জিনিসগুলি পাওয়া যায় —১০,০০০ কিউবিক ফিট লাইটিং গ্যাস, ২৫ পাউণ্ড এ্যামোনিয়া সালফেট, ৩ গ্যালন বেঞ্জল, ৬ পাউণ্ড তরল এ্যামোনিয়া, ৫ গ্যালন টার, ১,৫০০ পাউণ্ড পোড়া কয়লা।

* * * * *

জনৈক বিমান বিশারদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যুদ্ধের ক্রম অগ্রসরের ফলে এমন সব কাজের জন্যে বিমান তৈরী হবে, যা ঘণ্টায় ২০০ থেকে ৩৫০ মাইল অনায়াসে উড়তে পারবে। Transoceanic বিমানগুলি ১৫০ জন আরোহী নিয়ে ঘণ্টায় যে ৪০০ মাইল পর্যন্ত উড়ে যেতে পারবে সে সম্বন্ধে বর্তমানে অনেকের সন্দেহ হ'লেও নিকট ভবিষ্যতে তা সম্ভব হবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে মানুষ যে শীঘ্রই ঘণ্টায় ৭৫০ মাইল আকাশপথে ভ্রমণ করে বিমান-চালনায় রেকর্ড স্থাপন করতে সক্ষম হবে, তা তিনি বিশ্বাস করেন।

* * * * *

একই বংশের তিন'পুরুষ উপন্যাস লিখে সুনাম অর্জন করেছে, এ খুব কমই দেখা যায়। মিঃ গিলবার্ট ফ্রাঙ্কুর বংশের তিনজন লেখক উপন্যাস রচনা ক'রে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। মিঃ 'ফ্রাঙ্ক ডানবি' এই ছদ্মনামে মিঃ গিলবার্টের মা উপন্যাস লিখে প্রচুর নাম করেন। মিঃ গিলবার্টের প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয়, যখন তাঁর বয়স কুড়ি। বাজারে তাঁর লিখিত উপন্যাসগুলির বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। আগামী এপ্রিল মাসে তিনি . বৎসরে পড়বেন। তাঁর মেয়ে পামেলা ফ্রাঙ্কু এরই মধ্যে ডজনখানেক উৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখে পাঠক সমাজের জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। এই তিনজন উপন্যাস লেখকই তাঁদের বংশের একটা সুনাম বজায় রেখে সাহিত্যের আসরে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। বাঙলা ঔপন্যাসিক-দের এমনি ধরণের একটা ইতিহাস সংগ্রহ করলে মন্দ কি? ভবিষ্যতে ফলাফল ঘোষণার ইচ্ছা রইল।

* * * * *

আমাদের মনে প্রায় এ প্রশ্ন জাগে, কোন্ বয়স থেকে ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া আরম্ভ করা উচিত। বহু দিন পূর্বে আমেরিকার একজন অনুসন্ধানকারী বলেছিলেন, ৬ই বৎসর বয়সই লেখাপড়া আরম্ভ করার পক্ষে ছেলে মেয়েদের সব থেকে ভাল সময়। অপর এক ব্যক্তি গবেষণা করে বলেন, মেয়েরা পড়া আরম্ভ ক'রে যত শীঘ্র বর্ণ-পরিচয় লাভ করতে পারে ছেলেরা তা পারে না। সেই জন্যই মেয়েরা খুব তাড়া-তাড়ি অনেক কিছু শিখতে পারে। কিন্তু তাদের বুদ্ধি বিকাশের একটি সাধারণ সীমা আছে। ত্রিশ বৎসর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বুদ্ধির প্রখরতা হ্রাস পেতে থাকে। তাঁর মতে, যে সব ছেলে সাধারণত একটু বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ করে তারা পড়াশুনায় ভাল হয়। পড়াশুনায় অমনোযোগী ছেলেদের দেহ ক্ষীণ হয়; তারা সহজভাবে অপরের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে না, তাদের মধ্যে প্রতিভার একান্ত অভাব দেখা যায়।